নূত
সম্পাদক শ্রীভূপতিভূষণ
৮ বাংলা ১৩৩৩ ॥
মূল্য ৬৫ পয়সা
মাশুল ৭ পয়সা

...র সহায়

...ত্রিত হাত। সরীসৃপ ...

...প্রকাশ যাবে। মেয়ে ...

...আজকে সমস্ত এই ...

...ঘাটে বাইরের ...

...ত্রিত অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম আপনার ...

CENTRAL LIBRARY

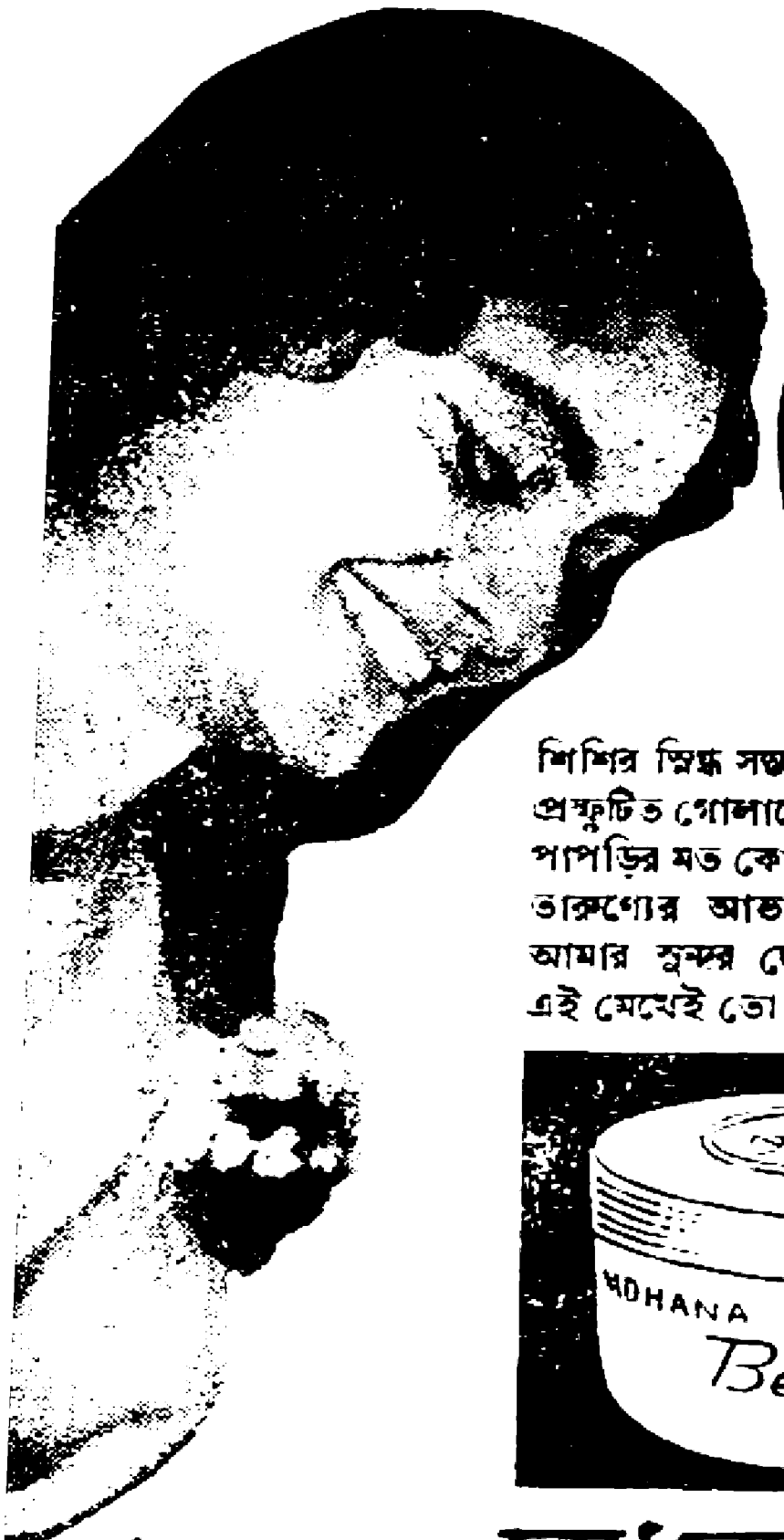

এত কোমল স্পর্শে
সৌন্দর্য
বিকশিত হয়

শিশির স্নিগ্ধ সন্ত
প্রস্ফুটিত গোলাপের
পাপড়ির মত কোমল ও
তারুণ্যের আভায় উজ্জ্বল
আমার সুন্দর দেহশ্রী
এই মেয়েই তো !

সাধনা
বিউটি স্নো
একটি অতি আধুনিক
অঙ্গরাগ

SBS-1/70

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা
কলিকাতা-৫

সুভাষ সমাজদারের অসাধারণ গ্রন্থ

গঙ্গা থেকে কাস্পিয়ান

ভারত - সোভিয়েত মৈত্রীর পটভূমিকায় রচিত বাঙালীর বাণিজ্য-যাত্রার ঐতিহাসিক এই উপনাস—বাংলা তথা ভারতীয় অন্য কোন ভাষায় আজও এ ধরনের গ্রন্থ লিখিত হয়নি। দাম—আঠারো টাকা

কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের নবতম উপন্যাস

থৈ থৈ হাহাকার ১৮.

পর্তুগীজ জলদস্যু কর্তৃক অপহৃত এক বাঙালী কিশোর পরবর্তী পর্যায়ে ফরাসী রাজ-পরিবারে এবং ফরাসী-বিপ্লবে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে তারই শিহরিত রোমাঞ্চকর কাহিনী।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর সাড়া জাগানো উপন্যাস

স্বাতী ও দীপু ১২.

স্বাতী নামে একটি মেয়ে দীপুকে ভালবেসেছিল। কিন্তু যেদিন দীপুর ভাই দীপুকে দেখল সেদিন নতুন করে তার মনে ভালবাসার বোন্যা এলো। কিন্তু দুর্ভাগ্য, এই ভালবাসাতে গিয়ে সে এক নতুন বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ল। নাম এল এক নিদারুণ অভিশাপ। তারই মর্মন্তুদ কাহিনী।

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের নতুন উপন্যাস

ভালোবেসেছিলাম ৮.

বর্তমানের বিভ্রান্ত যুবসমাজের দিনপঞ্জী—তাদের বুঝতে হলে, তাদের মনের পরিচয় জানতে হলে এই বই অপরিহার্য।

নটরাজন-এর দুঃসাহসিক প্রয়াস

থানার মাটি নোনা ১৬.

শাসকের হাতের গবুক আর শাসিতের চোখের জল—থানার পটভূমিকায় স্বদেশী-আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী এক বিপ্লবিনী আর শাসনের দণ্ডধারী এক সাব-ইন্সপেক্টরের ভালোবাসার কাহিনী, সাথে আরও নানা ধরনের অপরাধ ও অপরাধীর মিছিল।

নিমাই ভট্টাচার্যের নতুন উপন্যাস কল্হনের নতুন উপন্যাস

অন্যদিন ৫. খবরে প্রকাশ ১০.

একটি সাধারণ যুবকের অসাধারণ প্রতিজ্ঞার কাহিনী

একটি আত্মকেন্দ্রিক যুবকের রূপান্তরিত জীবন ও প্রেমের আনন্দ-বেদনার কাহিনী

ব্রজমাধব ভট্টাচার্যের নতুন উপন্যাস

স্বর্ণভ্রমর

স্বপক্ষ ও প্রতিপক্ষ নিয়ে জীবন-সংগ্রাম। সৎ অসৎ নিয়ে মানুষ-সমাজ। বিপদের টান, প্রাণের টান; অন্ধকার সর্বনাশে টেনে নিয়ে গিয়ে ফেলবার জন্যে ছায়ে ছায়ে। প্রেমের আকর্ষণ, ঘরের আবেগ থেকে জাগবার আলোয় পথে দেয় বাড়ায় আকাশ। এ নিয়ে যে পৃথিবী তা ভূগোলের বা সীমান্তের নয়, কালো-সাদা চামড়ার বিচারের কথা নয়। সংঘাতে সংঘাতে ছিন্নভিন্ন মানুষ তবু মানুষই একমাত্র সত্য।...কালোর প্রাণ, আলোর কণা, মনো পরিবেশ, আদিম ক্ষুধা, বর্বর তাড়না, চূড়ান্ত সংঘর্ষ—আরণ্যক সম্মোহনের পটভূমিতে অদম্য ক্ষুধার সঙ্গে নিষ্ঠুর সংগ্রামের পাণ্ডুলিপি—স্বর্ণভ্রমর। দাম—চৌদ্দ টাকা

আবদুল জব্বারের নতুন গ্রন্থ

পল্লীর পদাবলী ১৬.

রবীন্দ্রনাথের পর বাংলা সাহিত্যে যাঁরা সার্থক এসেছেন তিনি, তাঁদের মধ্যে যাঁর মৌলিকতা বহু বিচিত্র ভঙ্গীতে নবনবরূপে সৃষ্টি-উন্মুখ তিনি একক—এই গ্রন্থ সেই লেখকের অন্তর্দৃষ্টির কারণ হবে। কোন দেশের কোন লেখকের জন্য এমন গ্রন্থ জন্মেছে বলে জানা নেই।

দৃষ্টিহীনের নতুন উপন্যাস

মঞ্চ ১০.

এক অভিনেতার জীবনের হাসি-কান্নায় অনুপম কাহিনী। যে ভালবেসে নিজেকে উজাড় করে দিল; বিনিময়ে পেল না কিছুই।

রবীন্দ্র লাইব্রেরী

১৫/২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩
ফোন : ৩৪-৮০৫৬

অস্পৃশ্য পায়খানা!

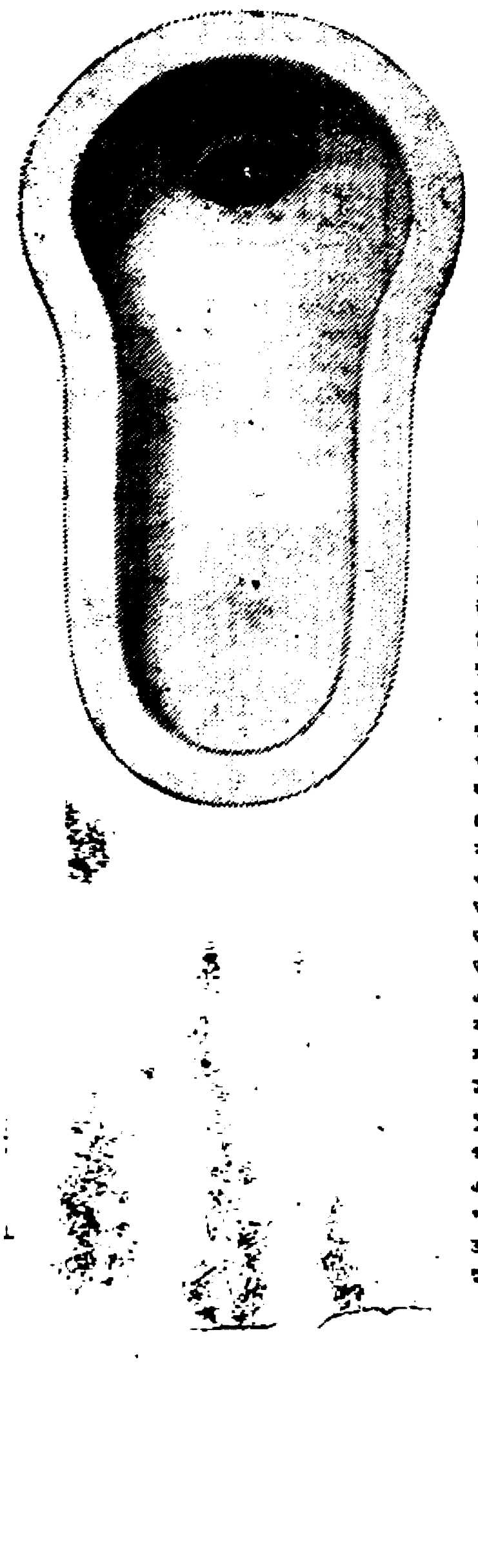

ভারতে কথাটা বলতেও ঘেন্না! কিন্তু তা হওয়া উচিত নয়।

অধিকাংশ লোক তাঁদের পায়খানা সম্বন্ধে দারুণ অপরিচ্ছন্ন থাকেন। বাড়ীর অন্যান্য ঘরের তুলনায় সবচেয়ে কম নজর শুধু ওই পায়খানার বেলায়। ভাবটা—না দেখলেই মাথা ঘামাতে হবে না। কিন্তু মাথা ঘামবে কারণগুলো দেখলে:

ময়লা পায়খানা শুধু দেখতে বিশ্রী আর দুর্গন্ধময় তাই নয়—তা যেমন অস্বাস্থ্যকর আর স্বাস্থ্যবিধির প্রতিকূল তেমনি দারুণ বিপজ্জনক।

এটাই হল সরল সত্য কথা। একটুও কমিয়ে বা বাড়িয়ে বলা হচ্ছে না। তাহ'লে আপনার নিজের মনকেই জিজ্ঞেস করুন তো···

আপনার পায়খানা আপনি যেমন পরিষ্কার চান সেই রকম কি?

উত্তরটা ভাল ক'রে জেনে রাখা দরকার একমাত্র—আপনার।

রোজ সকালে পরিষ্কার করার জন্য মেথর রাখলেও সে কি ঠিক মত কাজ করছে, না বক-বক ক'রে কাজ সেরে পালাচ্ছে? উত্তরটা আপনার যদি খারাপ লাগে একটা জিনিসের বিষয় জেনে রাখলে আপনি সুখী হবেন···স্যানিফ্রেশ

স্যানিফ্রেশ জিনিসটা কি?

স্যানিফ্রেশ হল পায়খানা পরিষ্কার করার পদার্থ যা সব ময়লা সাফ ক'রে পায়খানা ঝকঝকে রাখে। প্রথমে পায়খানায় জল ঢেলে দিন। তারপর পায়খানার গামলার মধ্যে প্রচুর স্যানিফ্রেশ ছিটিয়ে দিন। ৩-৪ ঘণ্টা তাকে কাজ করতে দিন। আরও ভাল হয় যদি একরাত অবধি রেখে দেন। তারপর আবার জল ঢেলে দিন। তাতে যদি ভাল পরিষ্কার হচ্ছে না দেখেন, তাহলে একবালতি জল জোরে ঢেলে দিন। বস্! আপনার পায়খানা পরিষ্কার রাখার সব ঝামেলা দূর।

স্যানিফ্রেশ ৩ ভাবে কাজ করে

১. স্যানিফ্রেশ পুরোপুরি পরিষ্কার করে।

এতে রয়েছে অত্যন্ত কার্যকর পরিষ্কার করার পদার্থ যা দারুণ শক্ত দাগও উঠিয়ে দেয়। ব্রাশ যেখানে পৌঁছয় না সেখানেও স্যানিফ্রেশ সাফ করে।

২. স্যানিফ্রেশ বিপজ্জনক রোগজীবাণু বিনাশ করে।

পায়খানায় রোগজীবাণু জন্মাতে পারে। তাতে অসুখবিসুখের সম্ভাবনা খুব বেশী। যে কাজ সাধারণ 'ফিনাইল' করতে পারে না সে কাজ স্যানিফ্রেশ করে—আপনার স্বাস্থ্য রক্ষা করে। তাই আপনার পায়খানা যে একেবারে নিরাপদ সেবিষয়ে আপনি একদম নিশ্চিন্ত।

৩. স্যানিফ্রেশ বিরক্তিকর দুর্গন্ধ দূর করে

কখন কখন পায়খানায় দুর্গন্ধ প্রায় অসহ্য। পায়খানায় হাওয়াবাতাস খেলার পথ না থাকলে দুর্গন্ধ আটক থাকে আর তখন বাকে বলে গোটের ওপর বিষফোড়া! স্যানিফ্রেশে এমন দুর্গন্ধনাশক পদার্থ আছে যা সব বদগন্ধ দূর ক'রে বাতাস নির্মল ক'রে তোলে।

স্যানিফ্রেশ কতবার ব্যবহার করা দরকার? পায়খানা পরিষ্কার রাখার গুরুত্বের কথা চিন্তা করলে এ প্রশ্নের উত্তর একটাই—প্রত্যেক দিন।

স্যানিফ্রেশ সব ময়লা দূর ক'রে আপনার পায়খানা পরিষ্কার রাখে।

বালসারা
উন্নততর জীবনযাত্রার আধুনিক সহায়ক
BALSARA বালসারা আলকে কোম্পানী (ইণ্ডিয়া) লিঃ
৮৩ বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড কলিকাতা ১৯০ ০২৯

CHAITRA-BLS-82 BEN

নিয়তি

লেখক—সুরপতি ঘো

৫-০০

ইতিহাস মরে না। হে প্রহ্লাদবংস
নবাব। হে বাঙ্গলার শেষ স্বাধী
নরপতি। এই মকর বিশেষণে সিরাজ
দৌলাকে ভূষিত করা হইয়াছিল। শু
ওয়াকিবহাল মহলের চমক জা
যাচ্ছিল। সঠিক ইতিহাস প্রকাশ হও
চাই। নিয়তিতে সেই চেষ্টাই ক
হয়েছে।

ভারতজ্যোতি প্রকাশনী—কলিকাতা-২

প্রাপ্তিস্থান— ডি. এম. লাইব্রেরী-

কলিকাতা-৬

আপনার সহযোগিতা পেলে আমরা মেয়াদপূর্তিজনিত দাবীর টাকা আরো তাড়াতাড়ি শোধ করতে পারি

৬৪,৮৮৯
ক্ষেত্রে দাবীর নিষ্পত্তি হয়নি
(বীমাপত্রের মালিক প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠান সম্পাদন করেননি)
বীমাপত্রের অঙ্কে যার মোট পরিমাণ হ'ল
১১৯১ লক্ষ টাকা

৩,২৪,০০০
ক্ষেত্রে দাবীর টাকা
শোধ করে দেওয়া হয়েছে
(প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠান সম্পাদিত হয়েছে)
৮১২৪ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে

মেয়াদপূর্তিজনিত দাবীর টাকা শোধ করতে দেরী হবার একটি কারণ হল বীমাপত্রের মালিক কর্তৃক প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠান সম্পাদন না করা।

এল.আই.সি. সচরাচর বীমাপত্রের মালিকদের বীমার মেয়াদপূর্তির একমাস আগে 'পরিশোধ পত্র' (ডিসচার্জ ভাউচার) পাঠিয়ে থাকেন। সেটি ঠিকমত পূরণ না করা হলে এবং বীমাপত্রসহ এল.আই.সি.র অফিসে জমা না দেওয়া হলে টাকা শোধ করতে দেরী হয়ে যায়।

হয়ত, আপনার বীমার মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে অথচ আপনি 'পরিশোধ পত্র' পাননি (সেক্ষেত্রে হয়ত ডাকঘরে বা অন্যান্য কারণেও এ ধরণের ভুল হয়ে থাকে), সেক্ষেত্রে সঙ্গে সঙ্গে তাগাদা দেবেন। আপনার বীমাপত্র যে অফিসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

কয়েকটি ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে এল.আই.সি. যে 'পরিশোধ পত্র' পাঠান, তা বীমাপত্রের মালিকের কাছে আদৌ পৌঁছোয় না, কারণ তাঁরা যখন ঠিকানা পরিবর্তন করেছেন তখন এল.আই.সি.-কে তা জানাননি। এসব ক্ষেত্রে এল.আই.সি. নিরুপায়।

১৯৭৩-৭৪ সালে ৪,০০৪ বীমাপত্রের মালিকদের ক্ষেত্রে ঠিকানা না জানার দরুন দাবীর টাকা শোধ করা সম্ভব হয়নি।

১৯৭৩-৭৪ সালে যে সব মেয়াদপূর্তিজনিত দাবী অমীমাংসিত ছিল তার মধ্যে ৫১,৫৫২ বীমাপত্রের অর্থাৎ ৭৯% ভাগের ক্ষেত্রেই দাবী শোধ করা যায়নি কেননা এল.আই.সি.-র কাছে পরিশোধ পত্র বা বীমাপত্র ফেরৎ দেওয়া হয়নি।

প্রথামত অনুষ্ঠান সম্পাদিত দাবীর টাকা শোধ করা হয়েছে

পরিশোধ পত্র যথাযথ পূরণ করা হলে এবং বীমাপত্রসহ ফেরৎ দেওয়া হলে সচরাচর সঙ্গে সঙ্গেই টাকা শোধ হয়ে যায়।

১৯৭৩-৭৪ সালে এল.আই.সি. ৩,২৪,০০০টি ক্ষেত্রে মেয়াদপূর্তিজনিত দাবীর টাকা শোধ করে দিয়েছেন যার পরিমাণ হ'ল ৮,১২৪ লক্ষ টাকা।

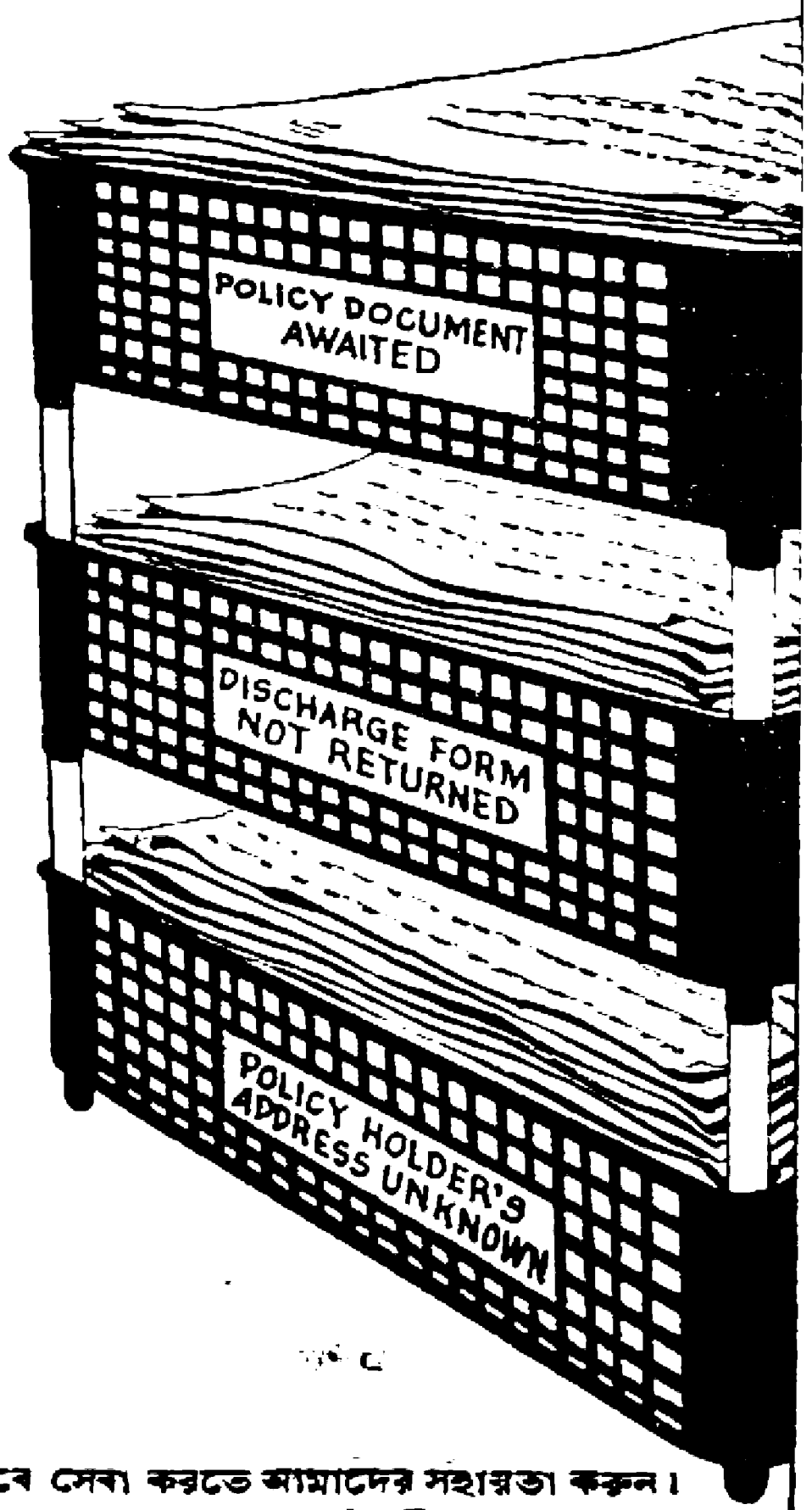

আপনাদের আরো ভালভাবে সেবা করতে আমাদের সহায়তা করুন।

লাইফ ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া

RADEUS LIC/AS-9

সূচীপত্র

বিষয়		লেখক
ী এলেন্ড	(উপন্যাস)	শ্রীবিমল মিত্র
ঃে পাখোয়াজ না		শ্রীঅরুণ ভট্টাচার্য
ঃ অশনি		শ্রীসন্তোষ সেন
ঃা ও সংস্কৃতি		শ্রীবীরেন্দ্র দত্ত
সব মানুষ	(উপন্যাস)	শ্রীসুবোধ বসু
শ্ন		
্যে [illegible]	(উপন্যাস)	শ্রীসৈয়দ মুস্তফা সিরাজ
ন্ত		শ্রীকল্পতরু
ি [illegible]	গল্প	শ্রীশৈবাল মিত্র
[illegible]		শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
[illegible]		শ্রীসুবল বসু
চলা		শ্রীসুমন্ত
ঃ নগর		শ্রীদিপালি বন্দ্যোপাধ্যায়
[illegible]		শ্রীসুব্রত
[illegible]		শ্রীঅময়
ছাত্রের সংবরণ সম্পর্কে		
[illegible]	চীনের কথা	শ্রীপ্রফুল্ল দাঁ
মাটির টব		শ্রীরতন মজুমদার
স্কন		শ্রীনির্মল ধর
থা		শ্রীনির্বাচিত
ও সংবাদ		
	প্রচ্ছদ :	নিতাই ঘোষ

কলাশিল্পে কয়েকখানা
অননাসাধারণ বই

১। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
আদিপর্বের শিল্পকর্ম
(ইংরেজী সংস্করণ)
(১০ খানি রঙীন চিত্র সম্বলিত)
মূল্য : ১৫-০০ টাকা

২। ঐ বাংলা সংস্করণ
মূল্য : ১০-০০ টাকা

৩। অধ্যাপক ডঃ নীহাররঞ্জন রায় প্রণীত
মোঘল কোর্ট পেন্টিং
(ইংরেজী
(৩৩ খানি রঙীন চিত্র সম্বলিত)
মূল্য : ১২৫-০০ টাকা

৪। শ্রীমনোজকুমার ভট্টাচার্য প্রণীত
চম্বা রুমাল (ইংরেজী
(১৭ খানি রঙীন চিত্র সম্বলিত)
মূল্য : ৫৫-০০ টাকা

প্রকাশক :—
ভারতীয় সংগ্রহশালা
পুস্তক বিক্রয় কেন্দ্র
২৭, জওহরলাল নেহরু রোড,
কলিকাতা-১৩।

বিঃ দ্রঃ—এজেন্ট বা পুস্তক বিক্রেতাদিগের বিশেষ সুবিধা।

বিশদ বিবরণের জন্য লিখুন :—
ডিরেক্টর, ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম
২৭, জওহরলাল নেহরু রোড
কলিকাতা-১৩

লেখাপড়ার ওপর নজর

আমাদের স্কুলগুলোতে লেখাপড়া ঠিকমত চলছে কিনা তা দেখবার জন্য মধ্যশিক্ষা পর্ষদ এই প্রথম স্কুল পরিদর্শনের ব্যবস্থা করেছেন। খবরটা শুনে সবাই একটু আশ্চর্য হবেন বৈকি। এতদিন তাহলে কি স্কুল পরিদর্শনের কোনো ব্যবস্থা ছিল না? ছিল, তবে সেটা নমো নমো ভাবে সারত সরকারী শিক্ষা বিভাগ জেলা স্কুল পরিদর্শকদের মারফৎ। কিন্তু এই পরিদর্শন লেখাপড়ার ওপর যতটা না ছিল তার চেয়ে বেশি এবং প্রধানত ছিল সরকারী অর্থ অনুদান, শিক্ষক নিয়োগ অনুমোদন ও অন্যান্য প্রশাসনিক ঝুটঝামেলা নিয়ে। তার ফলে স্কুলে মাস্টারমশাই ও দিদিমণিরা ঠিকমত পড়াচ্ছেন কিনা, স্কুলের সিলেবাস বছরের শেষে বাকি থাকছে কিনা এসব নিয়ে খোঁজখবর করবার সময় তাঁরা পেতেন না। যেমন চলছে স্কুল তেমনি চলে আসছিল। শিক্ষকরাও নানাভাবে বঞ্চিত থাকায় সরকারের কাছ থেকে তাঁদের দাবা পাওনা আদায় করবার জন্যই আন্দোলন। স্মারকলিপি, আন্দোলন, অবস্থান ধর্মঘট ইত্যাদি লেগেই ছিল গত দুই দশক ধরে।

সুখের ও আশার কথা শিক্ষা নিয়ামকদের খানিকটা টনক নড়েছে। বহু বছর পর তাঁরা স্কুল পরিদর্শনে যাচ্ছেন। শিক্ষাব্যবস্থায় যে নৈরাজ্য চলছে তার জন্য শুধু ছাত্রদের ওপর দোষ চাপিয়ে বসে থাকলে চলবে না। শিক্ষকরা তাঁদের কর্তব্য করছেন কিনা সেটাও যাচাই করে দেখা দরকার। সম্প্রতি স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় ব্যাপক ছাত্র-ফেল দেখে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগবে, স্কুলগুলোতে ঠিকমত পড়াশোনা চলছে তো? ছাত্রেরা উচ্ছৃঙ্খল হয়ে গেছে কিংবা তারা নকলের ওপর ভরসা করে থাকে এটা হল আংশিক চিত্র। চিত্রের অন্যদিক হচ্ছে শিক্ষকসমাজের একটা অংশের গাফিলতি শিক্ষাদানে অনুৎসাহ এবং অযোগ্যতা। ডিগ্রী থাকলেই শিক্ষক হওয়া যায় না। শিক্ষাকে আমাদের দেশে ব্রত বলা হয়। মনের তাগিদ না থাকলে এবং ছাত্রদের প্রতি মমতা ও ভালবাসা না থাকলে শুধু বিদ্যার গুণে বিদ্যাদান করা যায় না, আদর্শ শিক্ষকও হওয়া যায় না। শিক্ষক-শিক্ষণের ব্যবস্থা যা আছে সেটাও শুধু কোনোরকমে একটা ডিগ্রী অর্জন করবার জন্য। ডিগ্রী না থাকলে চাকরিতে উন্নতি হয় না, মাইনে বাড়ে না, তাই ডিগ্রীর জন্য এত কাড়াকাড়ি। প্রকৃত শিক্ষক নিজেকে প্রতিনিয়ত ছাত্রের অনুসন্ধিৎসায় যোগাতর করে তুলবেন। জ্ঞানের পরিধি বাড়ছে, নিত্যনতুন সিলেবাস হচ্ছে, কিন্তু তার সঙ্গে সমান তালে চলার আগ্রহ কি শিক্ষকসমাজের মধ্যে দেখা যাচ্ছে? গতানুগতিকতার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে এবং একটা আহত মর্যাদা নিয়ে শিক্ষকদের একটা প্রধান অংশ জীবিকার দায় নিষ্পন্ন করছেন।

স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় সর্বত্রই কমবেশি একই চিত্র। শিক্ষকদের মধ্যে দলাদলি এবং সেই দলাদলিতে ছাত্রদের টেনে আনার ঘটনাও হামেশাই দেখা যায়। পড়াশোনা এই আবহাওয়ায় কিভাবে ভাল হতে পারে? ছাত্ররা তাদের সামনে যদি আদর্শ শিক্ষক পেত তাহলে ছাত্র বিক্ষোভ এমনভাবে বিপথগামী হতে পারত না। শিক্ষারও আজ এই হাল হত না। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কাছে নির্দেশ পাঠিয়েছেন, শিক্ষকদের জন্য আচরণবিধি তৈরি করতে। শিক্ষকদের জন্য নতুন বেতনক্রম চালু হবার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকরা যাতে এই আচরণবিধি মেনে চলেন তা দেখতে হবে। মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শিক্ষকরা অবশ্য বঞ্চিত হয়ে আসছেন দীর্ঘদিন। তাঁরা সরকারের কাছে সে কারণেই একটা ভদ্রগোছের বেতন দাবি করে আসছেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলেজ শিক্ষকদের সঙ্গে মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শিক্ষকদেরও বেতন হার সংশোধন করেছেন। শিক্ষকদের তাঁরা ন্যায্য মাইনে দিন, এবং শিক্ষকরাও তাঁদের যথাসাধ্য শক্তি ও মেধা প্রয়োগ করে আমাদের স্কুল-কলেজগুলোকে আদর্শ শিক্ষাক্ষেত্রে পরিণত করুন। শিক্ষাকে এভাবে তলিয়ে যেতে দেওয়া যায় না।

বৃষ্টির শব্দ

ফনিভূষণ আচার্য

ওর চোখের সামনে শুধু একটা গুনের গোলা হুল করে নেমে এসেছিল। ছাড়া আদুরীর আর কিছু মনে নেই। ঐ পলকে কী যে ঘটে গেল, তা বুঝে ার আগেই তার অনুভূতিগুলো হঠাৎ ম মেরে গেল। ঝিড়কির পুকুরটা যেমন ল, তেমনি আছে, তাতে একটা জলটোড়া তার কাটছিল, সেও তেমনি সাঁতার টছে। গড়ানে ঘাটের কাছের তালগাছের তায় একফোঁটা-দুফোঁটা বৃষ্টি টপটপ র পড়ছে, একমনে কাড়, তার পাশে ংকারী তালগাছটা, ওর পাতায় বাদুড়ঝোর া নিয়ে শ্রীমন্ত—সব ঠিক আছে, ঠিক ো যেমনটি ছিল। কিন্তু এক পলকে কেমন যেন বদলে গেল। টপটাপ বৃষ্টির শব্দ ছাড়া আদুরীর অনুভূতিতে আর কিছু আসছে না। বাতাসে কেমন একটা গন্ধ—প্রথম বৃষ্টিতে পৃথিবীর গায়ের তাপের সঙ্গে বারুদের গন্ধের একটা মাখামাখি—লুকনো শিলনোড়া কিছুক্ষণ ঘষলে কিংবা হাতে দু টুকরো পাথর নিয়ে ঘষড়ালে যেমন গন্ধ হাওয়ায় ভেসে ওঠে, ঠিক তেমনি।

আদুরী কিছু ঠাহর করতে পারছে না।

পুকুরের কোণে জলঝাঁসর আড়াল থেকে একটা ডাহুক ডেকে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে তালগাছের পেছন দিকের ঝোপঝাড়ের ভেতর থেকে অনেকগুলো ডাহুক ওই ডাকে সাড়া দিল। কিছুক্ষণ চললো সেই ডাকাডাকি—তারপর সব চুপ।

আদুরীর গায়ে কাঁটা দিল। কেমন ভয় ভয় করছে ওর। একটু আগে আকাশ আলো ছিল। দেখতে দেখতে সেই আলো মিলিয়ে আসছিল। সারাদিন বাঁশঝাড়ের পাতাগুলো পালকের মতো হাওয়ায় ঝাপটা মারছিল, ওগুলোও হঠাৎ মিলিয়ে পড়লো। এখন শ্রীমন্ত যদি আসে, সে তার পায়ের শব্দ শুনে বলে দিতে পারবে, শ্রীমন্ত আসছে। শ্রীমন্তর পায়ের শব্দ ও চেনে। এমন অহংকারী পায়ের শব্দ এ গাঁয়ের আর কারো নয়। সবাই বলে, শ্রীমন্ত হাঁটে যেন ঠিক মিলিটারি। গাঁয়ে যুদ্ধের সময় পাঁয়ের শেষ সীমানায় একটা মিলিটারি ছাউনি পড়েছিল। ছেলেবুড়ো সবাই ওদের চলাফেরা হাঁ করে চেয়ে দেখতো। যুদ্ধের পর ওরা,

গেছে। কিন্তু শ্রীমন্তর চলাফেরার মধ্যে ওরা সেই বিশিষ্টতার পায়ের শব্দ পায়।

সেই শ্রীমন্ত আজ আসবে বলে গেছে। আজ সারাদিন তাই আদুরীর মনের কাজে মন ছিল না। হাতের জিনিস হাত থেকে খসে পড়ে মাটিতে। একটা কাচের গেলাস মাটিতে পড়ে ভেঙে গেছে, সূর্যদেবের আয়ু বাড়ি সন্ধের আকাশ ওপর উল্টে পড়েছে। কিরণশশী মনে মনে খোঁকিয়ে উঠেছে—আবার কি ভাবছিস?

আদুরী মনে মনে হেসেছে। সে বুঝতে পারছে, বুক হয়ে যাচ্ছে তার, হাতের মুঠোয় জোর নেই। কোনদিন এমন হয় না। চার বছর সহদেবের সঙ্গে ঘর করছে সে। কোনদিন ঘরের কাজে তার এমন ভুল হয় না। মনে হয় আজ শ্রীমন্ত আসবে।

কিরণশশী দাওয়ায় বসে পাট কাটছিল। উঠোনে একেবারে চোখের সামনে ওর ছেলে শ্যামের ডাঙ্গিগুলো রোদ্দুরে বুক চিতিয়ে পড়েছিল। ওদিকে খিড়কির পুকুর-পারের শ্যাওড়ার জঙ্গলের মাথায় কখন অস্ত-রক্তের মেঘেরা জট পাকাতে শুরু করেছে, কিরণশশী তা ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেনি। উঠোনের রোদ্দুরের রং একটু একটু করে বদলে যাচ্ছিল, হাঁড়ির কালো চোখে তাও ধরা পড়েনি। কিরণ খেতে খুব চারদিক কেমন যেন একটা থমথমে করে রেখেছিল, বাতাস নড়ছিল না একেবারে, মেলানো পাটের আঁশগুলো করে সহদেবই ওর হাতের মুঠোয় ধরা পড়ছিল আজ। ঠিক তখনই গুড়গুড় করে মেঘ ডেকে উঠলো।

আদুরী ঘরের ভেতর বাসনকোসনগুলো গুছিয়ে-গাছিয়ে রাখছিল প্রতিদিনের মতো। বুকের মধ্যে একটা এসে আচমকা ধাক্কা মেরে দাওয়া থেকে কিরণশশীর ডাক ছুটে এলো—বউ, ও বউ—

—কি বলছো?

—আমের ডাঙ্গিগুলো ঘরে তোল্—

আদুরী হাতের বাসনগুলো মাটিতে রেখে উঠোনে ছড়িয়ে থাকা আমের ডাঙ্গিগুলো বুকে আগলে নিলে। সে মুখ তুলে একবার আকাশে তাকালো। আকাশে রোদ্দুর ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে, মেঘ জমছে, বৃষ্টি আসবে মনে হয়। যদি বৃষ্টি হয়, তাহলে শ্রীমন্ত কি আজ আসবে না? বৃষ্টিতে যদি বৃষ্টি জোর হয়। কি করেই বা সে আসবে? মনটার ওপরে আকাশের মেঘের ছায়া গড়িয়ে পড়ে।

—হাতদুটো ধোয়া পরিষ্কার আছে তো বউ?

আদুরী কিরণশশীর দিকে একবার তাকিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নেয়।

—সাবধানে তুলিস্। মাটিতে ফেলিস নে যেন। তোর হাত লাগলেই যে সব আবার—

কিরণশশীর কথার ঝাঁজ আর মুখের বকবকানি সমানে চলতে থাকে। তাই শুনে আদুরী বুকের আমের ডাঙ্গিগুলো ঘরে তোলে এবং আর একটু মুখে পড়ে কিছুক্ষণ ঘরের ভেতর বাসনগুলো ঠুনঠান করে। সে কিছুতেই আর স্থির করতে পারছিল না—যদি শ্রীমন্ত এসে ফিরে যায়?

খিড়কির দরজা দিয়ে বাইরে তাকাতেই নিস্পলক পুকুরটা ওর চোখের ওপর আছড়িয়ে পড়লো। শ্যাওড়ার জঙ্গলের মাথায় ওর মনের ভেতরটার মতো মেঘগুলো কেমন যেন থোর হয়ে উঠেছে। পুকুরের জলে আলো আছে এখনও—খুব মিহি মসলা কাপড়ের মতো একটা আলো। তালগাছের পাতায়, বাবইয়ের বাসায় এখনো একটু আলো থমকে লেগে আছে। কিন্তু ঘোর-হয়ে-আসা শ্যাওড়ার জঙ্গলের দিকে একটু একটু করে চিন ফারিয়ে আসছিল।

একঝোড়া নেউল শ্যাওড়ার জঙ্গলের দিক থেকে বেরিয়ে এসে এদিক ওদিক খুব

পরের সংখ্যায় গল্প লিখবেন
অদ্রীশ বর্ধন

ভয়ে ভয়ে তাকালো, তারপর পিলপিল করে ছুটতে ছুটতে হলধরের পেছনে বুনো গাছগাছালির ঝোপের ভেতরে হঠাৎ ডুবে গেল।

আদুরীর বুকটা টিপটিপ করে উঠলো একবার। ওটা ঘিতের আসবার আগেই একটা মানুষের পায়ের শব্দ কানের পর্দায় ওপর হিসহিস করে পড়তে লাগলো। স্পষ্ট গা-টা ওর কাঁটা দিয়ে উঠলো।

—ঠিক আসবো, তুই দেখিস; ঠিক সন্ধেবেলা—

হঠাৎ শ্যাওড়ার জঙ্গলের মাথার ওপর আকাশটা ওর দিকে চোখ পিটপিট করে তাকালো। এখন শ্যাওড়ার জঙ্গলটাকে ওর কেমন যেন ছুতুড়ে-ছুতুড়ে লাগছে। ওদিকে তাকাতে ওর গা-টা এখন ছমছম করে ওঠে।

পুকুরের কাঁপন জলে একটা মানুষের ছায়া ছিলছিল করে কেঁপে উঠলো। চালতার গাছের আড়াল থেকে সে বেরিয়ে আসবার জন্যে পা বাড়ালো। মাথার ওপর ঝুঁকে-পড়া পাতাগুলোর আড়াল সরিয়ে মোকটার মুখটা দেখবার জন্যে ওর সমস্ত মন হানাহানি করছিল। আদুরী দু-পা এগিয়ে গেল। পাতার আড়াল সরে যেতেই সে মাথার ঘোমটা টেনে দিয়ে পিছিয়ে এলো। নাহ শ্রীমন্ত নয়। আদুরীর ভাসুর—বাসুদেব; বোধহয় আকাশে মেঘ দেখে খুব দুতে কাজ সেরে বাড়ি ফিরছে।

আদুরী মাথার ঘোমটা ফেলে দিয়ে জোরে একটা শ্বাস নিল। তারপর ইতউতি তাকিয়ে নিজেকে চালতার গাছের নিচে ঝুঁকেপড়া পুরনো ডায়াটার মতো গুটিয়ে আনলো। ঠিক তখনই তালগাছের নিচে নেউলদুটো বেরিয়ে এসে আদুরীকে সরা-সরি দেখতে পেয়ে হুড়মুড় করে করমচা গাছের ভেতর নিজেদের লুকিয়ে নিল।

চারদিক এখন ভীষণ থমথম করছে। আদুরীর নিজের নিশ্বাসের শব্দটাই এখন ছুপ্পোড়ির ওর কানের পর্দার ওপর জোরে জোরে আছড়িয়ে পড়ছে।

শ্যাওড়ার জঙ্গলের মাথার ওপরে ঘোর-বাঘ। মেঘ এবার ওর দিকে দাঁত খিঁচিয়ে ভেংচি কাটলো। আদুরী ওদিকে তাকালো একবার। আকাশের মেঘগুলো ধীরে ধীরে চারদিকের সমস্ত আলো শুষে নিচ্ছে। এরপর সব কিছু খুব অস্পষ্ট হয়ে যাবে—ঠিক মতো কিছু চেনা যাবে না।

পুকুরের জলে মেঘের ছায়া ঘোর হয়ে উঠেছিল। ওখানে আর একটা কালো মেঘ চুপিচুপি এসে নিঃশব্দে দাঁড়ালো, চারদিক তাকাতে লাগলো চোখ নর্মময়ে। আদুরী ঠিক তখনই ওর বুকের ভেতর একটা মাছের ঘাই মারার শব্দ শুনতে পেল।

আসলে শ্রীমন্তই। শ্রীমন্তর গায়ের রং কালো। মাজা চেহারা। মাথায় লম্বা চুল—ঘাড়ের ওপর টাল-খেয়ে-ওঠা। এই চেহারাটা আদুরীর অনেকদিনের চেনা—যখন সে গায়ে শাড়ি জড়িয়ে পুরোপুরি মেয়েমানুষ হয়ে ওঠেনি, তারও অনেক আগে—তখনও গায়ের শাড়িটা সে ঠিকমতো পরতেও শেখেনি। তিনকুলে কেউ ছিল না শ্রীমন্তর। পাঁচ বছর বয়সে যখন ওর মা মারা যায়, বাপ গা ছেড়ে কোথায় চলে গেল সেই থেকে শ্রীমন্ত একা। তখনও শ্রীমন্ত কিংবা আদুরী কিছুই বুঝতে শেখেনি। একসাথে গাছে চড়ে আম পেড়ে ভাগাভাগি করে খেতে গিয়ে ওরা দুজন কতদিন মারামারি করেছে বেল ডালভাটার নিচে মাছ ধরতে গিয়ে দুজনে কাদা ছোড়াছুড়ি করে ভূত সেজে যে যার ঘরে ফিরে এসেছে।

আদুরী মেয়ের জাত বলে একটু আগে-ভাগেই বুঝতে শিখেছিল সব কিছু। তখনই সে বুঝে নিয়েছিল শ্রীমন্ত বড়ো একা। বড়ো মায়া হতো ওর ওপর। একদিন না দেখলে বুকের ভেতরটা কেমন হানটান করতো ওর। কিন্তু শ্রীমন্তকে এসব বলতে গেলেই কিংবা ওকে একটু মায়ামমতা দেখাতে গেলেই হতো মুশকিল। সঙ্গে সঙ্গে চোখমুখ পাকিয়ে মারতে আসতো। আদুরী পা ফেলে ও রেললাইনের দিকে উধাও হয়ে যেত। সারাদিন একে আর ধারেকাছে কোথাও দেখা যেত না।

আদুরীদের ঘরের উঠোন থেকে বেতের বাড়ের ফাঁক দিয়ে নিলিপ্তার বেড়া-দেওয়া শ্রীমন্তর কুঁড়েঘরটা দেখা যেত। আদুরী যখন তখন উঠোনে এসে ওদিকে তাকিয়ে দেখতো—দরজা বন্ধ। মনে মনে ভীষণ রাগ হতো ওর।

—অত দেমাক ভালো নয়।

নিজের মনে গজরাতে গজরাতে আদুরী ঘরের ভেতর ঢুকিয়ে যেত।

তার ঠিক বছর কয়েক বছরের মধ্যেই আদুরীর বাপ সেবদাসপুরের রেলকলের ঠিকে-কুলী সহদেবের সঙ্গে আদুরীর বিয়ে দিয়ে পাশের গাঁ লোহাগুঁড়িতে পাঠিয়ে দিল। সহদেবের রোজগারপত্তর ভালো। বাড়িঘরদোরের ঐশ্বর্যাদি যা থাকলে গাঁয়ের মানুষের চোখ যায়, সহ-

...সা।—কাট্ট ...খছে না ...ত্রা ওদের ...
...শ্রীভদ্র বক্তের স্রোত ...ত সমস্ত ...ির ...
...নোম ...কল্প। ...সে ...ার্ট ...িল এবার। ...
...ক ...মেমান ...মেন ...ম্ব সল্প ...রে ...াঁড়ুর ...
...নিস্পলক ...োখে ...ওষ্টি ...রের ...
...কে ...ুঁরিয়ে ...ুরিয়ে। ...ক্তারের ...ালল ...
...িয়ে একটা ইঞ্জেক্শন মাত্তর মাত্রা ...ত ...সন্ত ...ারাণী ...ঁপায়ে ...াচ্ছে ...ক্ত ...ি ...ারে। শ্রীমন্ত ...োধহয় ...াঁর ...েখতে ...ন। ...াক্তারবাবুর ...নিট ...ারার ...ন্য ...ি ...েবলমাত্র ...াড়, ...ার ...ময়ের ...া ...াধারণ

শ্রীমন্ত ...াক্তারবাবুর ...নিট ...রে ...াড়িয়ে ...ই ...মস্যায়। ...ার একটু ...ড়িয়ে ...ে। ...ত্যন্তবারই ...োগীর ...রের ...াড়ির ...ইয়া ভালো। ছোটবেলায় ...রবোসগুলো একটু, ...ায়ামমাত্রার ...থা ...ত্যন্ত ...িয়ে ...ত্যন্ত ...াবধানে ...ত্যন্ত ...াবধানী ...ওয়া ভালো নয়।

শ্রীমন্তর ...রিক্ত ...াড়িয়ে ...াছে ...ক ...াক্তার ...ত্যন্ত ...ুঁ ...াড়িয়ে ...াছেন ...ীমন্তর ...রে ...ুব ...াড়ো ...ক—...ত্যন্ত ...াড়ে—...ায় ...াড়িয়ে ...ই ...ীমন্ত—...াকে ...ুই ...াবধানের ...াসে ...েখছেন ...থা ...লে ...ুঁকে ...ুঁকে

...াক্তারী ...রিক ...াবে ...ক ...াক্তার ...লে ...ুঁকে ...ুঁকে ...ক্তারের ...াবধানী ...াক্তারের ...াড়ির ...ুঁকে ...ুঁকে ...ক্তারের ...াবধানী ...াক্তারের ...াড়ির

১৪ আগষ্ট শেষ তারিখ

শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখুটির সম্পাদিত

বেদ

চার বেদ। ঋগ্বেদ ৩ভাগ। অথর্ব পাঁচ খণ্ড। ৭৫৲

মহামূল্য মূল্য বিশালায়তন চার বেদ ৩৫ সহজ সরল অথচ মূলানুগ অনুবাদ ও প্রয়োজনীয় টীকাসহ ক্রাউন ৮পেজী পনেরো পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ ১৫ই শ্রাবণ মধ্যে ১০৲ নিম্ন গ্রাহক হলে ৭৫৲ টাকায় পাবেন। ঐ তারিখের পর মূল্য বেড়ে ১২৲ হবে। ঐ তারিখের মধ্যে ১০৲ মণি অর্ডার করলেও ৭৫৲ টাকায় গ্রাহক হতে পারবেন। প্রস্তাবকে ডাক খরচ লাগে না

গীতা

মূল অন্বয় অনুবাদ ও বিশদ ব্যাখ্যা। আগষ্টে বেরুবে। গ্রাহক মূল্য ১৮৲। ৩, নিম্নে গ্রাহক হোন।

উপনিষদ

২য় খণ্ড মূল অন্বয় অনুবাদ ও টীকা। ১৯৲ ৩, নিম্নে গ্রাহক হোন। উপনিষদ ১ম বেরিয়েছে।

বেদ, গীতা এবং উপনিষদ তিনটির গ্রাহক হতে হলে ২০৲ টাকা মণি অর্ডারে পাঠান। ঠিকানা স্পষ্ট করে নাম ঠিকানা লিখুন।

হরফ প্রকাশনী। এ-১২৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট। কলকাতা-১২

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষের

নতুন বই

চিত্র বিচিত্র

একাল-সেকালের বিচিত্র কথা ও রসমধুর কাহিনী-সম্ভারোহ

দাম : সাত টাকা।

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড

১৪, বঙ্কিম চাটার্জ্জো স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

আদুরী চোখ বুজে ভেবে নিল সব। নাহ্ কেউ কোথাও নেই। ছাতার মতো চালতা-গাছের ছায়ার ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে সে শ্রীমন্তের দিকে তাকালো। নেউলদুটো কোপের নিচ থেকে বেরিয়ে এসে শ্রীমন্তকে দেখে ভয় পেয়ে আবার কোপের নিচে লুকিয়ে পড়লো। ওরা বোধহয় শ্যাওড়ার জঙ্গলের ভেতর কোথায় ওদের ঘর ফেলে এসেছে, খুঁজে পেতে পারছে না।

আদুরী কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে ডাকলো—এই—

—আদুরী—

শ্রীমন্ত ওকে দেখতে পেয়েছে। আদুরী মুখ সংগে ঠোঁট আঙুল তুলে শব্দ করলো—স্ স্—

ঠিক তখনই আদুরীর চোখের সামনে একঝলক আগুনের গোলা হয়ে ফেটে এলো। তারপর মাথার ওপর শব্দ তীব্র তীব্রী একটা ছিঁড়ে ভেঙে পড়ার কড়াৎ একটা শব্দ। তারপর সব চুপ-চাপ যেন ছুটে গেল চক্কের পলকে। আদুরী ভয়ে ভয়ে তাকাতে পারলো না। চারদিকে সে একবার বুলিয়ে নিল। পুকুরটা যেমন ছিল, তেমনি আছে—ছাতার মতো চালতা গাছ, ওড় চেহারার শ্যাওড়ার জংগল ওদিকে কোপ তার পাশে অহঙ্কারী গাছ, তার পাতায় বাবুইয়ের বাসা, নিচে সব ঠিক আছে, ঠিক আগে যেমনটি। শুধু চালতাগাছের পাতার বড়ো বড়ো ফাঁক দিয়ে বৃষ্টি পড়ছে টুপটাপ শব্দে। বেশি এক ফোঁটা-দুফোঁটা। আদুরী তাকালো শ্রীমন্তের। তাকে যেমন একটা স্বপ্ন পেয়ে আছে—ভীষণ নিবিড় ভাবের আদুরের গলার একটা গোপন মেলামেশা—শুকনো শিলনোড়া বহুদিন হাতে পাথরের বুখানা নুড়ি নিয়ে কোরে রগড়ালে যেমন একটা গন্ধ বেরোয়, ঠিক সেইরকম।

আদুরী চুপ্ এগিয়ে গেল।

—এই—

শ্রীমন্ত চুপচাপ ওর দিকে চেয়ে আ তেমনি হাসি-হাসি মুখ, ভাসা-ভাসা।

আদুরীর পায়ের তলায় ঘাস ভিজে সপসপ করছে। সে এবার থমকে চারদিক ভালো করে দেখে নিল। ধোঁয়া-ধোঁয়া লাগছে করমচার কোপের দি এত ধোঁয়া কোত্থেকে এলো—যেন চার একটা ধোঁয়ার পর্দা আকাশ থেকে পড়েছে। চারদিকে শুধু ধোঁয়া নিঃশব্দতা। তার আড়াল থেকে আদুরী একবার একসঙ্গে ডেকে উঠলো। মুহূর্তের জন্যে নিঃশব্দতা সরে গেল, পর আবার সব চুপচাপ।

ধোঁয়ার গায়ে বারুদের গন্ধ আছে। আদুরী চোখ কুঁচকে এবার সব তাকালো তালগাছের নিচে। ধোঁয়ার আড়াল থেকে শ্রীমন্তকে আবছা দেখা যা আদুরী ভয়ে ভয়ে ডাকলো—এই শুনো

শ্রীমন্ত আদুরীর গলা শুনতে পে কিনা বোঝা গেল না। মনে হচ্ছে, সে ভেতর ঘরে সে যেন অনেক দূরে সরে —গ্রাম, মাঠ রেললাইন পেরিয়ে অনেক আদুরী বোধহয় না অতদূরে থেকে ওর শোনা যায় না।

সে আরো পা এগিয়ে যায়।

এগিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ থমকে যেতে হলো তাকে। করমচার ঝো ভেতর থেকে নেউল দুটো বেরিয়ে

ইতিহাসে এমন ঘটনা ঘটে যখন একজন মানুষের জীবনের উপরে সারা জাতির ভাগ্য তার ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। তাঁর কণ্ঠের বাণী তখন জাতির অন্তরাত্মার বাণী। জাতির জীবনে শ্রীঅরবিন্দ এমনি একজন মহান্ পুরুষ। প্রথম যৌবনে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁকে চিনতে পেরে নমস্কার জানিয়ে বলেছিলেন, স্বদেশ আত্মার বাণীমূর্তি তুমি'। শেষ বয়সেও তিনি আবার প্রণাম জানিয়ে বলেছিলেন, 'আত্মার বাণী বহন করে আপনি আমাদের মধ্যে ফিরে আসবেন। আমরা তবেই অপেক্ষায় থাকব।'

জাতির অন্তরপুরুষ সেই শ্রীঅরবিন্দের জীবনকে জানুন,—

শ্রীঅরবিন্দায়ন ৪্ টাকা
নীরদবরণ

শ্রীঅরবিন্দের জীবন ও যোগ ৫-০০ টাকা
অমলাকুমার সেন

শ্রীঅরবিন্দ ৩্ টাকা
পদ্মপতি ভট্টাচার্য

এছাড়াও শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমায়ের জীবন ও সাধনা সম্পর্কে মূল্যবান গ্রন্থ এখানে পাওয়া যায়।

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির, ১৫ বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলি : ১২ (ফোন : ৩৪২০৭৬)
শ্রীঅরবিন্দ ভবন, ৮ শেক্সপীয়র সরণী কলি : ১৬। (ফোন : ৪৪০০৫৭)

চালের ওপর ঝিরঝির করে বৃষ্টি যা। কিরণশশী শান্ত হলো—আকাশ ডাকবে না। বৃষ্টি নামলে আকাশের পড়ে যাক।

শেষরাত্রির বৃষ্টি থামলে সহদেব বোন বাড়ি ফিরলো। এ অবস্থায় সে কিছু দেখে না। আজও দিল না। তাতে হাতড়াতে বিছানায় উঠে শুয়ে পড়লো।

আদুরীর চোখে ঘুম ছিল না। বুকটা ঢিপঢিপ করছিল ওর। ঘরের ভাল-ভাল অন্ধকার দেয়ালে পিঠ মাঝে মাঝে হিসহিস শব্দ করে স। আদুরী দু হাতে চোখ চেপে ক্ষণ বিছানার এক পাশে পড়ে রইলো। চোখের ভেতরেও অন্ধকার কই ছে, আর একটা ঠাণ্ডা কনকনে বাতাস শরীর ভিতর দিয়ে হুহু করে বয়ে ।

স মনে মনে ঠিক করে রেখেছিল বকে এ ব্যাপারে কিছু জানতে দেবে স কিছু জানতে পারে, জানতে সে ই, নিজের থেকে জানুক। সহদেব ফিরে শুয়ে আছে এভাবেই সে শুবে । কিন্তু আদুরী আর পারলো না। ক্ষণ এপাশ-ওপাশ করে সে ডাকলো—নুনছিস—

সহদেব সাড়া দিল না। আদুরী এবা ওর পিঠে হাত ছোঁয়ালো। সহদেব শ্রীমন্তর মতো শক্ত হয়ে যাচ্ছে না তো সে ওর পিঠে চিমটি কেটে দেখলো।

—এই—

—উঁ?

সহদেব বেঁচে আছে, আদুরী আশ্বস্ত হলো। কিন্তু ওকে আদুরী কি বলে ডেকে পাচ্ছিল না। সহদেব জোরে এক হাই তুললো।

—এদিকে ঘোর—

—কেন?

সহদেব ভারী মানুষ, পাশ ফিরতে সময় লাগে। হাই তুলে আড়মোড়া ভেঙে সে খুব অনিচ্ছায় ওর দিকে পা ফিরলো।

—কি?

—আমার কেমন ভয় করছে—

—কেন? কি হয়েছে?

—জানি না। আমার ভীষণ ভয় করছে আজ—

আদুরী অন্ধকারে সহদেবের বুকের ভেতর মুখ লুকিয়ে হু-হু করে কেঁদে উঠলো। সহদেব কিছুই বুঝতে পারলো না। সে কান পেতে শুনলো, আকাশে মেঘ ডাকছে, আর ঘরের চালে বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়তে ঝিরঝির করে।

বিমল মিত্রের

দুঃসাহসিক উপন্যাস

পরস্ত্রী ২৫

বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চে সগৌরবে অভিনীত হচ্ছে

* * * *

একালের এবং সর্বকালের আর একটি বিস্ময়কর উপন্যাস

বিমল মিত্রের

আমি ১৬

দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের নবতম সুবৃহৎ উপন্যাস

তিনে একে চার ২০

অসাধারণ উপন্যাস

পাও নাই পরিচয় ৫

অমর সাহিত্য প্রকাশন, ৭, শ্যামাচরণ লেন, কলিকাতা-৯

এই বাংলার খবর

পিছিয়ে পড়া জেলায় শিল্প

সাধারণ বিচারে পশ্চিম বাংলা শিল্পোন্নত বলেই গণ্য, কিন্তু সে-বিচারে একটা বড় রকমের ভুল থেকে যায়। গোটা রাজ্যকে শিল্পোন্নত বললে মোটেই ঠিক বলা হয় না। কলকাতা-হাওড়া-হুগলি-কল্যাণী বাদ দিলে কল-কারখানার বিস্তার এ-রাজ্যে তেমন হয়নি। কয়েক বছর ধরে, এই বৈষম্যের দিকে নজর পড়েছে এবং পিছিয়ে-পড়া নানা জেলায় নতুন কল-কারখানা বসাবার চেষ্টাও হচ্ছে। শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী তথ্যপ্রসঙ্গে জানিয়েছেন যে-বিষয়ে তিনি তাঁর দপ্তর থেকে কী কী করছেন। এই চেষ্টা এখন বেশ কিছুটা সফল হচ্ছে। পিছিয়ে-পড়া জেলাগুলোতে মোট ৫১টি প্রকল্প রূপায়িত হচ্ছে। তার মধ্যে ১৫টি হলো নতুন শিল্প-প্রকল্প। মোট লগ্নীর অঙ্ক হবে ১০ কোটি টাকা। এই সব প্রকল্পে কাজ পাবেন সাড়ে ছ'হাজারের মতো লোক। উত্তর বাংলার চা-বাগিচা ছাড়া সে তেমন কোনো শিল্প গড়ে ওঠে নি, এ-কথা শিল্পমন্ত্রী অস্বীকার করেন নি। এ-ব্যাপারে উত্তর বাংলার মানুষের কোনো অভিযোগ নয়, এই তাঁর মত। উত্তর বাংলায় নতুন কল-কারখানা বসানোর প্রধান বাধা বিদ্যুতের অভাব। সেই বাধা দূর করার জন্যে সরকার চেষ্টা করছেন।

পশ্চিম বাংলার সাধারণভাবে শিল্পে সম্ভাবনার যে উজ্জ্বল চেহারা তিনি তুলে ধরেছেন। আশা যে-সব প্রকল্পের কথা বলা হচ্ছে তা ছাড়া আরো অনেক প্রকল্প এখন রূপায়ণের পথে। ১৯৭১-৭৫ থেকে ১৯৭৫-৭৯ সালের মধ্যে রাজ্যে যে-সব কোম্পানি রেজিস্টার্ড হয়েছে তার মোট অনুমোদিত মূলধনের অঙ্ক ৫৮৭ কোটি টাকা। তার আগের পাঁচ বছরে এই অঙ্ক ছিল মাত্র ১২৮ কোটি টাকা।

অর্থকষ্টে বিশ্ববিদ্যালয়

রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আর্থিক সংকটের কথা এখন সবাইই জানেন। সবচেয়ে যে বড়—শুধু রাজ্যের নয়, গোটা দেশের—অর্থাৎ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থাই তার মধ্যে সবচেয়ে খারাপ। এই হলো উপাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ সেনের মত। তিনি এমন অভিযোগও করেছেন যে, রাজ্যের অন্যান্য বিশ্ব-বিদ্যালয়ের তুলনায়ও কলকাতা উপেক্ষিত। সে যাই হোক, উনিশ-বিশ যেমনই হোক অবস্থা কোনো বিশ্ববিদ্যালয়েরই ভালো নয়। তাই এ-বিষয়ে বিশদ আলোচনার জন্যে রাজ্যপাল আগামী উপাচার্যদের এক বৈঠকে ডেকেছেন। মুখ্যমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীও বৈঠকে আমন্ত্রণ পেয়েছেন। এঁদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থসঙ্কটের কথা তুলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বাধ্যক্ষ এ-কথা জানিয়েছেন যে, তাঁদের অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, তাঁরা অনেক কর্মচারীর মাসমাইনে দিতে পারছেন না। বর্তমান আর্থিক বছরে এই ঘাটতি ছিল মাত্র ১২৮ কোটি টাকা।

পাস-ফেল

স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার সময় ফেলেংকারির কোনো অভাব হয় নি। এখন ফল প্রকাশের পরে দেখা গেল, পাস-ফেলের ব্যাপারেও একটা ফেলেংকারির পথ দিয়ে ফেলা যেতে পারে। এক শব্দে মধ্য হাইজাম্পের বেঁধেই অকৃতকার্যের ফলে। গত বছর এই হার ছিল কম, শতকরা ৫৩ জনের মতো। অকৃতকার্যের হারটাই উল্লেখ করা হলো, তার কারণ তাতে অবশ্যপাঠ্য মুক্তিতে সুবিধে হয়। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের মতে ব্যাপকহারে ফেলের কারণ, পরীক্ষার্থীদের মধ্যে অধিকাংশই প্রাইভেট পরীক্ষার্থী। প্রায় প্রতি তিনজন পরীক্ষার্থীর মধ্যে দু'জনই প্রাইভেট। মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা যেখানে এক লাখ ৯৭ হাজারের কাছাকাছি, সেখানে নিয়মিত পরীক্ষার্থীর সংখ্যা মাত্র ৬৮ হাজারের মতো। প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের মধ্যে কৃতকার্য হয়েছে একশজনে মাত্র ৩৬ জন। তাই সব মিলিয়ে পাসের হার এত কম দেখাচ্ছে। তবু এটাকেও যথেষ্ট পুরো ব্যাখ্যা বলা যায় না। কারণ কথা যাচ্ছে, কৃতকার্যদের মধ্যে মাত্র ১৫৭ জন প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে। ৫৯০১ জন দ্বিতীয় বিভাগে। আর বাকি সকলেই হয় তৃতীয় বিভাগে, অথবা নেহাই পাস। প্রাইভেট পরীক্ষার্থীরা কেন এমন ব্যাপকহারে অকৃতকার্য হচ্ছে সে-বিষয়ে তদন্তের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। এ-বছর স্কুল ফাইনালে প্রথম বর্ণটি স্থান যারা পেয়েছে তা এখনও জানানো হয় নি। কারণ ফলের ২৫ জনের খাতা আবার পরীক্ষা করা হচ্ছে।

আরো সুন্দর দার্জিলিং

এই রাজ্যের পর্যটকদের কাছে সেরা আকর্ষণ দার্জিলিং। সেই দার্জিলিং যাতে আরো বেশি আকর্ষক হয়ে ওঠে তার জন্যে রাজ্য সরকার চেষ্টা শুরু করেছেন। কিছুদিন আগে পর্যন্ত দার্জিলিং যেতে বিদেশীদের বিশেষ অনুমতি লাগতো। সেটা ছিল পর্যটকের সংখ্যাবৃদ্ধির পথে একটা বড় বাধা। অল্প ক'মাস আগে রাজ্য সরকারের প্রচেষ্টায় এই বাধা দূর হয়েছে। এখন দার্জিলিংয়ে এবং তার আশপাশে পর্যটকদের সুযোগের জন্যে নতুন কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে। প্রথম দরকার অবশ্যই পর্যটকদের থাকার জায়গা। তাই সরকারি টুরিস্ট লজগুলো সম্প্রসারিত করা হচ্ছে। তা ছাড়া তৈরি হচ্ছে একটি ইন্দুস হস্টেল। কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যে এটি তৈরি হচ্ছে। পুজোর আগেই এটি চালু হয়ে যাবে আশা করা যায়। অন্যান্য লজ বা হোটেলের তুলনায় এখানে থাকতে খরচ হবে কম। টাইগার হিলে গিয়ে সূর্যোদয় দেখা পর্যটকদের একটা অবশ্যকর্তব্য। টাইগার হিলের অবজারভেটরি প্যাভিলিয়নটি এখন সরকারই দেখাশোনা করছেন। এটির নতুন রূপ দেওয়া হয়েছে। টাইগার হিল টুরিস্ট লজটিতেও এখন আরামের আরো সুযোগ করা হয়েছে। তবে সবচেয়ে বড় কর্মসূচী হলো লেপচা কাপুচিন হিলসে একটি হোটেল তৈরির প্রকল্প। ৮০ লাখ টাকা খরচ হবে এর জন্যে। হোটেলের সঙ্গে সঙ্গতিরক্ষা হোটেল তৈরির কাজ সুরু হয়ে গেছে। আসছে মরশুম মার্চ থেকে পর্যটকরা সেখানে উঠতে পারবেন বলে আশা করা যায়। ঘোড়ায় চড়ে বেড়াবার ব্যবস্থাও সম্প্রসারিত হচ্ছে।

১৮।৭।৭৯

বিদেশের কথা

ভারত মেক্সিকো সম্পর্ক

লাটিন আমেরিকা নামে পরিচিত মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার যে অল্প কয়েকটি দেশে দীর্ঘকাল ধরে স্থিতিশীল সরকারের সুশৃঙ্খল শাসন চলছে মেক্সিকো তাদের অন্যতম। লাটিন আমেরিকার অন্যান্য দেশের মত মেক্সিকো থেকে যখন-তখন অভ্যুত্থান ও কুটচক্রান্তের সরকার উৎখাত হওয়ার খবর আসে না। এক সময়ে যুদ্ধ, রক্তপাত, রাজনৈতিক হত্যা ইত্যাদি এই দেশের উপর দিয়ে কম যায় নি। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে শক্তিশালী প্রতিবেশী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধ করে তার অর্ধেক এলাকা খোয়াতে হয়েছে। কিন্তু ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে গৃহীত যে সংবিধান অনুসারে সেদেশে যুক্তরাষ্ট্রীয় গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেই সংবিধান লাটিন আমেরিকার এই তৃতীয় বৃহত্তম দেশকে এমন একটা স্থায়িত্ব দিয়েছে যেটা লাটিন আমেরিকার দেশগুলিতে দুর্লভ বলা চলে।

শুধু সরকারের স্থায়িত্বের জন্যই নয় জনকল্যাণমূলক নীতি ও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর জন্যও মেক্সিকো অন্যান্য দেশের নজরে এসেছে। আজও সেদেশে গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব স্বীকৃত রয়েছে, তাহলেও গত প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে সেখানে প্রায় একচ্ছত্র আধিপত্য করে আছে একটি দল, স্প্যানিশ ভাষায় যার নাম পার্টিদো রেভলিউশনারিও ইনস্টিটিউশনাল' সংক্ষেপে পি আর আই) ইংরাজিতে বলা হয় ইনস্টিটিউশনাল রেভলিউশনারী পার্টি। এই দল একটা প্রগতিশীল নীতিতে দেশের শাসন চালিয়ে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, গৃহসংস্থান, কৃষি ও শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি ইত্যাদি দিক থেকে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। তাদের সাফল্যের একটি বড় প্রমাণ হল, ১৯৬০ সালে মেক্সিকোবাসীদের গড় আয়ু যেখানে মাত্র ৩৯ বছর ছিল সেখানে ১৯৬৮ সালে গড় আয়ু দাঁড়িয়েছে ৬৭ বছর।

১৯৭০ সালের জুলাই মাসে লুই একেভেরিয়া আলভারেজ মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার সব থেকে তাঁর [illegible] মেক্সিকো বহির্জগতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক স্থাপনের জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করে যাচ্ছে। ইস্পাত, রাসায়নিক, বৈদ্যুতিক সাজ-সরঞ্জাম ইত্যাদির ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করে সে যেমন এক দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপর তার অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতার বন্ধন ছিন্ন করার চেষ্টা করছে অন্যদিকে তেমনি সে বিশ্বের জোটনিরপেক্ষ ও উন্নয়নশীল দেশগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর যোগ স্থাপন করে নিজেকে আমেরিকার রাজনৈতিক প্রভাব থেকে মুক্ত করে নেওয়ার চেষ্টা করছে। ১৯৭৩ সালের মার্চ ও এপ্রিল মাসে প্রেসিডেন্ট একেভেরিয়া কানাডা, বৃটেন, বেলজিয়াম, ফ্রান্স সোভিয়েট রাশিয়া ও চীন সফর করে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে মেক্সিকোর স্থান সুচিহ্নিত করে নিয়েছেন। প্রেসিডেন্ট একেভেরিয়ার এই আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক প্রয়াসের দুটি প্রধান লক্ষ্য রয়েছে। এক, পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক অধিকার ও কর্তব্য নির্দিষ্ট করে রাষ্ট্রসঙ্ঘ থেকে একটি সনদ পাশ করাবার জন্য তিনি চেষ্টা করছেন। এই সনদে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশগুলির প্রতি উন্নত দেশগুলির কর্তব্যের সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকবে। দুই, লাটিন আমেরিকাকে পারমাণবিক বোমা থেকে মুক্ত রাখা হবে বলে একটা আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতি প্রেসিডেন্ট একেভেরিয়া সংশ্লিষ্ট সব দেশকে দিয়ে অনুমোদন করিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছেন।

এরকম একটা দেশের সঙ্গে ভারতের সম্বন্ধ যে ঘনিষ্ঠ হবে, এটা খুবই স্বাভাবিক। দুই দেশই দরিদ্র, ঔপনিবেশিক শোষণে দীর্ঘকাল ধরে জর্জরিত এবং এখন বৃহৎ শক্তির অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে একটা বিকাশশীল আধুনিক অর্থনীতি গড়ে তোলার চেষ্টা করছে। মেক্সিকোর আয়তন ভারতের দুই-তৃতীয়াংশের কিছু কম এবং তার লোকসংখ্যা ভারতের এক-দশমাংশেরও কম। দুই দেশের মধ্যে ভৌগোলিক ব্যবধানও অনেক। কিন্তু উভয় দেশের সমস্যা ও সেসব সমস্যা সমাধানের প্রয়াসের মধ্য দিয়ে দুই দেশের ভিতর অনেক মিলও আছে। ভারতের মত মেক্সিকোও দরিদ্র দেশ এবং সেই দারিদ্র্য সবচেয়ে ঘনীভূত হয়ে রয়েছে গ্রামের ভিতর। আমাদের মত মেক্সিকোকেও তাই গ্রাম ও কৃষির সমস্যার উপর বিশেষভাবে দৃষ্টি দিতে হয়েছে। সেদেশে এক ধরনের বাঁধ খামার আগে থেকেই ছিল। অন্যদিকে ছিল বড় বড় জমিদারদের বিরাট বিরাট খামার। ঐ সব বড় বড় খামার রাষ্ট্রায়ত্ত করে প্রায় ১৬ কোটি একর জমি ঐ সব যৌথ খামারের মধ্য দিয়ে কৃষকদের বিলি করা হয়েছে। মুদ্রাস্ফীতি আয়ত্তে রাখার জন্য ১৯৭৩ সালের আগস্ট মাসে যে ১৬ দফা কর্মসূচী তাঁরা গ্রহণ করেছেন তার সঙ্গে আমাদের মুদ্রাস্ফীতিনিরোধক কর্মসূচীর অনেকখানি মিল আছে। কৃষির ফলন বাড়াবার দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। (এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, নোবেল জাতের যে সংকর গম তৈরী করে কৃষিবিজ্ঞানী ডঃ নরম্যান বোরলগ তথাকথিত সবুজ বিপ্লবের সূচনা করেছিলেন সেই গম এই মেক্সিকোতেই প্রথম উৎপন্ন হয়েছিল।) গ্রামে গ্রামে পাঁচ হাজার ডাক্তার পুরো নিঃস্বার্থভাবে তিনবছর যোগান দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন মেক্সিকো সরকার। যেখানে যাটের প্রায়োজন বিদেশী মুদ্রাধন ও বিদেশের কারিগরী জ্ঞানের সাহায্য নিয়ে বিদেশী পুঁজিপতিদের শোষণ থেকে দেশের অর্থনীতিকে কিভাবে রক্ষা করা যায় তার সমস্যা নিয়ে মেক্সিকোর সরকার আমাদের সরকারের মতই চিন্তিত। সেদেশেও শিল্পের ও বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়েছে।

মেক্সিকোর সঙ্গে ভারতের আরো একটি প্রায় নিকট সূত্র নিহিত রয়েছে দুই দেশের অতীত ইতিহাসের মধ্যে। স্পেনীয়রা মেক্সিকোতে আসার আগে সেখানে যে মায়া সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল তার সঙ্গে মেক্সিকোর ভারতীয় সভ্যতার মিল অত্যন্ত লক্ষণীয় এবং মায়াদের তৈরী নগরী ও মন্দিরের ধ্বংসাবশেষে আজও সেই সব সাদৃশ্যের লক্ষণ চোখে পড়ে। অনুমান করা হয় যে, মেক্সিকোর ভারতীয় নাবিকরা হয়তো সমুদ্র পার হয়ে ঐ অঞ্চলে গিয়ে বসতি স্থাপন করেছিলেন।

৩০ বছরের মধ্যে প্রেসিডেন্ট একেভেরিয়া সম্ভবতঃ ভারত সফর করে গিয়ে দুই দেশের মধ্যে এই বন্ধন আর একটুখানি ঘনিষ্ঠতর করে দিয়ে গেলেন। ১৯৬৫ সালে লাটিন আমেরিকার দেশগুলিতে সফর করে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী পৃথিবীর ঐ দূরবর্তী অঞ্চলের সঙ্গে ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক যোগাযোগের যে সড়কটি তৈরী করে দিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট একেভেরিয়ার এই সফরের মধ্য দিয়ে সেই সড়কটি আরও দৃঢ় হল। জোটনিরপেক্ষ দেশ হিসাবে এই দুই রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক চিন্তায় যে সাদৃশ্য আছে এবং বিকাশশীল দেশ হিসাবে তাদের উভয়ের সমস্যাগুলি ও সেগুলির সমাধানের ক্ষেত্রে তারা যে পরস্পরের কত কাছাকাছি তা এই সফরের মধ্য দিয়ে আর একবার প্রমাণিত হল।

পরমেশ্বরীক

২৫-৭-৭৫

ফাদার দ্যতিয়েন রোজা গমচা

শীবেনবাবুর প্রথম সন্তান মারা যায় জন্মের পরদিন। দ্বিতীয় সন্তান মারা যায় ছ' মাস বয়সে। তৃতীয় সন্তান মেয়ে। তার নাম রাখা হয় অশোক। অশোক বেঁচে আছে। বয়স তার সাতাশ। ইতিমধ্যে বিয়ে করেছে—আর সন্তানের বাবা হতে চলেছে।

শীবেনবাবুর ইচ্ছে ছিল না ছেলে ডাক্তার হোক। তিনি চেয়েছিলেন ছেলে ইঞ্জিনীয়ার হবে। তাই অশোকের জন্ম থেকে তিনি ছিলেন ইঞ্জিনীয়ারিংপ্রেমী। শীবেনবাবুর চোখে পড়েছে, বন্ধুবান্ধবের ছেলেরা ডাক্তারি পড়ে ডাক্তার হয়েছে। ডাক্তারি করতে করতে কেউ কেউ বিয়ে করেছে। ডাক্তারি করতে করতে কেউ কেউ বিয়ে করেনি। ডাক্তারি করতে করতে কেউ কেউ বিয়ে করেছে, আবার করেনি। শীবেনবাবু নিজের মনের কথা কাউকে বলেননি। তাঁর মনে হয়েছে, ডাক্তারি করতে গেলে ছেলেকে বিয়ে করতে হবে।

হবে, কিম্বা...ওর অসুখ বিসুখ করে নি তো?

অশোকের পাবক নামে এক বন্ধু আছে। একদিন চায়ের দোকানে বসে ছেলেটি বড়াই করে ঘোষণা করে, ওর আধ ডজন মেয়ে-বন্ধু আছে, প্রত্যেক দিনই প্রত্যেকের সঙ্গে দেখা করে সে। পকেট থেকে কলকাতার এক মানচিত্র বের করে অশোককে দেখায় ওর অভিসারমন্ডিত রুট: শ্যাম পার্ক রাধা সিনেমা, মানিকতলার পোল...' পাবকের অবশ্য এক সাইকেল আছে। সেদিন মঞ্জুর অদর্শনে মনঃক্ষুণ্ণ অশোক নিজের আইনের সমস্যা বাংলায়ে পাবকের সহানুভূতি ও পরামর্শদান ভিক্ষা করে। অশোকের মানসিক বৈকল্যের নিদান বুঝে পাবক ওকে সক্রিয় ও নির্ভীক পন্থা অবলম্বন করতে বলে, বোঝায় যে বন্ধু-ধন্যা নিতান্তই বীরভোগ্যা। ফীজ হিসেবে সে নেয় এক ভাঁড় দই আর গোটা দুই দরবেশ।

পরের দিন মঞ্জুকে একলা পেয়ে অশোক বলল আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারি কি? মুখ না তুলেই মেয়েটি বলল, 'কালাতু ছেলের সঙ্গে আমি কথা বলি না।'

পাবক-প্রস্তাবিত দুঃসাহসিক পদ্ধতি অবলম্বনের এই অপ্রত্যাশিত পরিণামে মর্মাহত, হতমান অশোক সারাদিন কর্মশালায় প্রতিশোধস্পৃহরূপ আত্মনিয়ের পরিকল্পনা ফাঁদতে থাকল: পরের দিন, কিম্বা—সেদিন বৃষ্টি হলে—পরের দিনের পরের দিন 'আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়...ভটচাজ-গিন্নীর মেজো মেয়ে ছাড়া' ধরনের এক চিরকুট প্যান্টের পকেটে পুরে ঐ কলতলায় দাঁড়িয়ে পাষাণহৃদয়ার সামনেই অবজ্ঞাত প্রণয়ী হারাকিরি করবে!... ধীরেন্দ্রনাথ প্রামাণিক অ্যান্ড সন্স-এর কারখানায় ধারালো যন্ত্রপাতির অভাব নেই।

পর পর তিন দিন বৃষ্টি পড়ল, অনবরত মুষলধারায়। অশোক কারখানায় গেল না, ঘরে বসে আত্মহত্যার নতুন নতুন কায়দা উদ্ভাবন করতে থাকল। তৃতীয় দিনে মায়ের মুখরোচক খিচুড়ি পরিপাক করতে করতে সে হঠাৎ বুঝল বসন্ধরায় এত উৎকৃষ্ট উপভোগ্য সামগ্রী থাকতে শুধুমাত্র এক দুর্মুখীর অসদ্ভাবে নয়ন উদ্বন্ধন করে নিজেকে বঞ্চিত করার কোনো মানে হয় না। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল, মেয়েটির আনন-মণ্ডল কত মিষ্টি, নয়নযুগল কত মিষ্টি নাসিকাদ্বয় কত মিষ্টি... দেহের প্রতিটি অবয়বই মধুক্ষরা শুধু রসনা ছাড়া। এবার বলুন, একটিমাত্র দেহাবয়ব দণ্ডনীয় যার, সর্বাপেক্ষা শাস্তি কি তার প্রাপ্তব্য? মঞ্জুর রসনা-ই একমাত্র যখন অপরাধী তখন অশোকের অপমৃত্যুতে মেয়েটির হস্তযুগলকে বন্ধ্যত্ব করার, হৃৎযন্ত্রটা নিংড়িয়ে দেওয়ার, শিরঃপীড়া জাগিয়ে তোলার প্রয়োজনটা কি? বরং ওর ওষ্ঠাধর আবৃত করে যৌন সন্ন্যাসিনীর মৌনতাবলম্বনে বাধ্য করা হোক!... কিন্তু জৈন সন্ন্যাসিনীরা চির-কুমারী যে...অশোক চায় না মঞ্জু চিরকুমারী থাকুক।

নিজের হাস্যকর ভাবধারায় অসংলগ্নতা উপলব্ধি করে একটু প্রকৃতিস্থ বোধ করল অশোক; বৃষ্টি থেমেছে দেখে গামবুট পরিহিত হয়ে বেরিয়ে পড়ল—পুকুর বাগীর অন্বেষণে। ছেলেটি জানে, প্রকাণ্ড বাগী মেলে পঞ্চমমন্ত্র বিরল কেশের আশ্রয়ে। পঞ্চমমন্ত্র বিরল কেশরের এহেন প্রাদুর্ভাব থাকতে ছেলেটি যে কেন আমারই দরজায় কড়া নাড়ল, সে-কথা শ্রীমানকেই জিগ্যেস করবেন। অশোকের পরিবারের সঙ্গে আমার অনেক দিনের পরিচয়। ওর ঠাকুরদার সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ ঘটে এক বন্ধুর বৌভাতে: শংকর সেদিন কনের বাড়ি থেকে মাথায় করে জালা-ভর্তি ছত্র নিয়ে এসেছিল।

অশোকের সমস্যাটা শুনে (সমস্যার শ্রবণই তার অর্ধ সমাধান) কলকাতার নাগরিক-সংখ্যার প্রতি ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বোঝালাম যে, উক্ত নাগরিক-সংখ্যা থেকে যাবতীয় অনধিকারী পুরুষ ও সধবাকে বাদ দিলেও অশোকের সম্ভাব্য প্রণয়িনীর সংখ্যা কোনো মতেই নৈরাশ্য-জনক নয়। আরও বোঝালাম যে অপ্রতিভ মেয়েটি প্রতিকূল পরিস্থিতিতে যে-বিশ্লেষণটা ব্যবহার করেছে, সেটা বোধহয় অশোকের প্রতি তার সঠিক মনোভাবের যথাযথ বহিঃপ্রকাশ নয়। ছেলেটিকে পরামর্শ দিলাম এক মাস ঘুরে ঘুরে পথে—অর্থাৎ বটবৃক্ষের ছায়াচ্ছন্ন জলকল ও ধূলিধূসর বাড়িটার দর্শন এড়িয়ে—কর্মশালায় যাওয়ার। সেগুন কাষ্ঠ নির্মিত না হলে মেয়েটি অশোকের এই দীর্ঘায়িত অনুপস্থিতি লক্ষ্য করে অনুদ্বিগ্ন হয়ে থাকতে পারবে না: বান্ধবী-দের কাছে তার স্বতঃস্ফূর্ত উৎকণ্ঠা প্রকাশ করতে সে বাধ্য...

এক সপ্তাহ যেতে না যেতে পাবকের ছোট বোন জানাল যে, মঞ্জুদের বাড়িতে গোয়েন্দাগিরি করতে গিয়ে সে লক্ষ করেছে অশোকের প্রসঙ্গ উঠলেই মেয়েটি কৌতূহল প্রকাশ করে, আর শুধু তাই নয়, কৌতূহলটা সে কৌশলী চাতুর্যে প্রচ্ছন্ন রাখার অপটু চেষ্টা করে।

কালক্রমে অশোক মঞ্জুর হৃদয়েশ্বর হয়ে ওঠে। ভটচাজের বৌ ছেলেটিকে আন্তরিক অভ্যর্থনা জানান; মঞ্জুর দাসী ভাইটি মেজদিকে জামাইষষ্ঠীতে ছাড়ে না। 'অশোকবাবু, জামাইবাবু...।'

একদিন ভটচাজের বৌ সদ্য-কাচা একটা থান পরে অশোকদের বাড়িতে গিয়ে অনেক ইনিয়ে-বিনিয়ে সতর্কভাবে প্রশ্নটা পাড়লেন। বললেন, উনি নাকি উদারচেতা ছিলেন খুব, জাত মোটেই মানতেন না: বরং বলতেন, ব্রাহ্মণত্বের কোনো শ্রেষ্ঠতা থাকলে মানবসেবার মধ্য দিয়েই তার প্রকাশ হওয়া প্রয়োজন। সেই মানবসেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে কত মিশ্র বিবাহে পৌরোহিত্য করে উনি গোঁড়া সমাজের নিন্দা কুড়িয়েছেন, যার ফলে কর্পদকশূন্য হস্তে স্বর্গারোহণ করে আমাদেরও নিঃসম্বল রেখে গিয়েছেন। আমার মক্কু এক হীরের টুকরো, আর আপনাদের অশোকের গুণগানেও পাড়ামহর পঞ্চমুখ। যাওয়ার আগে উনি বলেছিলেন, মেয়েটিকে জাতটাত না দেখেই ভালো ছেলের হাতে দিও। আপনাদের আর পাল-বাড়ির ছেলের কথা বলেছিলেন...। তা পালেরা তো পাড়া ছেড়ে চলেই গিয়েছে...। শুনুন, আমার টাকা নেই, তবে গয়না কিছু আছে, আর আছে দশ কাঠা জমি...আপনারা যদি রাজি হন...'

ধীরেনবাবু কানা নন, আর তাঁর গিন্নীরও চোখ আছে। বেশ কিছুদিন হয়েছে তাঁরা বুঝেছেন, টেপী আর মিতা যা পারে নি, পেরেছে মঞ্জু: অশোকের মাথাটা নাটুর মতো ঘুরিয়ে দিয়েছে। ভটচাজের বৌয়ের নম্র ব্যবহার দেখে—এবং ওঁর মুখে তাঁর আত্মজের প্রশংসা শুনে—ধীরেনবাবু মুগ্ধ হলেন: কোনোদিনই তিনি ভাবেন নি সেই বাড়ি থেকে প্রস্তাব আসতে পারে। এদিকে ভটচাজও তিনি জানেন, কেননা মাতই ঐ বিয়েতে তিনি সম্মতি দেবেন না। জাতের অভিমান তাঁর নেই, তবে জাতে তিনি বিশ্বাসী: বংশানুগত বৃত্তি তিনি ত্যাগ করতে পারেন, ছেলেকেও ত্যাগ করতে বলতে পারেন রক্তের সংমিশ্রণ কিন্তু তাঁর দ্বারা সম্ভব হবে না। যে রক্ত তাঁর পিতার কাছে তিনি পেয়েছেন, তাঁর পৌত্রকে তিনি তা-ই দান করে দেবেন। টেপী কিম্বা মিতা না হোক, আপন জাতের বাইরে কোনো বৌকে তিনি ঘরে আনবেন না।

ভদ্রলোক একটু থামলেন, তারপর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'অশোক অবশ্য সাবালক। ওর স্বার্থান্ধতায় আমরা হস্তক্ষেপ করব না। সমাজ ও পৈতৃক আসন ও বাড়ি ধানতে রাজি না হয়, তবে বাড়ি ও কর্ম-শালার অংশীদারি ত্যাগ করে জনকের অভিশাপ মাথায় নিয়ে যে-কোনো সাঁওতালীর সঙ্গে অপৌত্তলিক কোনো ভিটেয় গিয়ে সংসার পাততে পারে...'

ছ মাস পরে অশোকের বৌভাতে নিমন্ত্রিত হয়ে টেপীর হাতে এক বাইবেল উপহার দিতে গিয়েছিলাম। ঘরে ফিরে শুনলাম, ভটচাজের বৌ খবর পাঠিয়েছেন তাড়াতাড়ি যেতে বলেছেন: মঞ্জুর নাকি এখন-তখন অবস্থা। না হারাকিরি নয়, শিলিপিং পিল।

(ক্রমশ)

কবিতা

অসুস্থতা ॥ তরুণ সান্যাল

অসুস্থতা, ঘন বনে বৃষ্টি পড়ে, অরণ্য ঘনালো ঘনমেঘ,
কী সবুজ কী কোমল তবু হিংস্র তীব্র লোলজিহ্বা পাতায় উদ্যত,
চিত্রপরম্পরা বয়ে বৃষ্টি পড়ে, ধরে আসে ক্রম বর্ষাগান
নদী ও নিঝরে একা অরণ্য অসহায় মুখ দেখে গা আদুল বন মৃগ,
অসুস্থতা শরীরের নিপুল জটিল সূক্ষ্ম শিরায় কুয়াশা

রয় নিস্তব্ধ গহনে,
মাতাল নৌকার মাস্তুল ডেউয়ের গভীরে যায়, মাঝিহীন গলাজল হয়,
অন্ধ স্রোতে স্রোতোপথে বহে যায় কী রক্তসাঙ্কেতিক অর্থহীনতাগান
সে কী শুধু ভ্রান্তি, শুধু রক্তের প্রহারে বড়ো দুঃসময়

হয়ে দুঃসময়!

যেন বুক, নাবি মৃত্তিকার তলে, ঢের নিচে অধঃলোকে যেখানে
ধ্বনির প্রাণবীজ
চলে যায় ধীর পায়ে সেখানে জীবন?
যেন ঊর্ধ্বে উঠে যায়, ঢের ঊর্ধ্বে, যেখানে সমস্ত গান—
ঋষি বা বনস্পতি
ভাষা ভুলে যেতে চায়, সেখানে কী ঘনায় আষাঢ়?
না কেবল আকাশের অশ্রুর হৃদয় বিদরণ অরুণিমাগে ধীর শুকায় প্রপাত?

অসুস্থতা, ঘন বনে, নাকি শিরাপুঞ্জ সৃষ্টি বহে আনে বুকভারি
স্মৃতি কোনো নীল নীলপদ্মের ভুবন?
অসুস্থতা, প্রতি কোষে কথার করুণ, প্রতি উপল পেশীতে শিকার
আছাড়ে পড়ে উদাস উৎসার

কোনো বেদনার মধ্যে, অবচেতনার সংজ্ঞিপথে দূরন্ত পা হরিণী নাকি
করুণ শব্দগুলো বয় যেমনি অর্থহীন নিজে
মানুষীর বড়ো নিরুদ্ধ হাত।।

রাত্রি ॥ অজয় নাগ

পৃথিবী আদর খেলতে চলে গেলে
বন্ধুরা স্থান নির্ণয় করে
আকাশের প্রত্যেকের মাঠে তিন হাত জায়গা চাই
অন্ধ হাতের পাঁচ তো একই মাপের নয়
একটা গোটা দিন সর্বনাশ যায়
অবশেষে স্থির হয় নিস্তব্ধতায়
সেই ছোট্ট ঘা-হাতোড়া করে
প্রস্তাবিত তালিমার
কেউ হাসে
মাটির ফাঁকে চাঁদের টুকরো উঁকি মারে
সোনালি ফসলের চাষাও পায় সুগন্ধি ছড়ায়...
সবুজ পাতীর খেলা আসানি একদিন
শুধু পায়ে মাত্র রাত্রি

অসমাপ্ত ॥ অর্পিতা মজুমদার

পরিশ্রান্ত দিনের সীমান্তে
একটি নতুন মুহূর্ত পেয়েছিলাম।
শান্ত আকাশের মনে গোধূলি রঙ
হাল্কা করেছিল চোখ।
বহুদিন পরে ভরসা নিল মনে
একটি ভালোবাসাময় সময়।
আমলার পাকাচুল ভরসার
মুঠো ভরা রবি।
রূপসী ধরণীর দিকে বহুবছর পরে
এইবার সে চোখ মেলে চাইবে।
সেই আনন্দটুকু ও এল ফুরালো
নিমেষের ভুলে
কেড়ে নিল নীলিমার অনিন্দ্যের সিন্দুর।

আর কথা শেষ করতে পারলেন না। ফারুক তাঁর কথায় বাধা দিলেন।

: হ্যাঁ এই দুটি তাস দুই রাজা। আর আমি হলুম তিন রাজা। না এই ডিলের টাকা আমার প্রাপ্য।

এই কথা বলে ফারুক বোর্ডের সব টাকা পকেটে পুরে নিলেন। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন : পাশা, চলো। আহমদ জগ বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে রইলেন। এমন ধরনের কাণ্ড তিনি এর আগে কখনও দেখেন নি।

ফারুক হয়ত আহমদ জগের মনের কথা বুঝতে পারলেন। বললেন, ইয়োর ম্যাজেস্টি দিন পাল্টাচ্ছে...রাজত্বের বদল হবে, শুধু মনে রাখবেন একটি কথা। পৃথিবীতে বেঁচে থাকবেন শুধু পাঁচজন রাজা। না আমরা সবাই যাবো। কিন্তু ঐ পাঁচ রাজার ধনে নেই।

: পাঁচজন রাজা? আহমদ জগ মুখ খুলবার আগে বিস্মিত কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলুম। : এই পাঁচজন রাজা কে? ইয়োর ম্যাজেস্টি...

ফারুক তাসের খেলার আসর থেকে উঠে বসেছেন। এবার তিনি মুখে একটি লম্বা হাভানা সিগার পুরলেন। তারপর একগাল ধোঁয়া ছেড়ে বললেন : পাঁচ রাজা; হ্যাঁ, এই পাঁচ রাজা কে জানো? কিং অব ডায়মণ্ডস কিং অব স্পেডস কিং অব হার্টস, কিং অব ক্লাবস, আর...

আবার ফারুক সিগারে এক লম্বা টান দিলেন। তারপর মুখ থেকে একগাল ধোঁয়া ছেড়ে বললেন : আর পাঁচ নম্বর রাজা হলেন : কিং অব ইংলাণ্ড।

নাইট গার্ল নাইট ক্লাব সমুদ্রের ধারে আনফ্লসী এলাকায়। আনফ্লসীতে ছেলে-মেয়ের বসবাস। তাই রাত বারোটার সময় আমাদের গাড়ী যখন নাইট ক্লাবের কাছে এসে দাঁড়াল তখন সামনে লোকের ভিড় দাঁড়িয়ে গেল।

আজ বাজীতে অনেকগুলো টাকা জিতে ফারুকের মনটা খুশী ছিল। তিনি রাস্তার জনতার দিকে তাকালেন না, সোজা নাইট ক্লাবের ভেতরে ঢুকলেন। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আমি আর এলিয়াস এণ্ড্রুজও ঢুকলাম।

বেলী ডান্স তখনও শুরু হয় নি। ফারুক এক লোকল কোকা কোলার অর্ডার দিলেন। কোকাকোলা ছিল তাঁর অত প্রিয় ড্রিঙ্ক। তারপর এলিয়াস এণ্ড্রুজের সঙ্গে ব্যবসা, শেয়ার মার্কেট নিয়ে আলাপ-আলোচনা করলেন। আমার দৃষ্টি ছিল অন্য দিকে। নাদিয়া সুলতান কোথায়?

নাদিয়া সুলতান ফ্লোরের কাছেই এক বসেছিল। তার টেবিলে কেউ নেই। আমি দূর থেকে নাদিয়া সুলতানের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করলুম। নাদিয়া সুলতান মিষ্টি হাসলেন।

ফারুক ইতিমধ্যে এলিয়াস এণ্ড্রুজের সঙ্গে ব্যবসার আলাপ-আলোচনায় আসর জমিয়েছেন। এণ্ড্রুজ ফারুককে বোঝা-চ্ছিলেন লণ্ডন শেয়ার মার্কেটে শেয়ার বেচা-কেনা করলে সহজেই প্রচুর টাকা রোজগার করতে পারবেন। এই শেয়ার বেচা-কেনার টাকা দিয়ে তিনি তাঁর ঋণ পরিশোধ করতে পারবেন।

আলোচনায় বাধা পড়ল। নাইট ক্লাবের বেলী ডান্সার হিকমত ফাহামী স্টেজে এলেন। দর্শকের আসরে গুঞ্জন ধ্বনি শুরু হোল। এই গুঞ্জন ধ্বনি করণ শুধু হিকমত ফাহামীর রূপ নয়—অসুল গত যুদ্ধের সময় হিকমত ফাহামী ছিলেন জেনারেল রোমেলের গুপ্তচর।

স্টেজের বাজনা বাজতে শুরু করেছে। স্পেনিশ ভায়োলিন বাজছে আর একটা লোক ড্রামটুপি বাজাচ্ছে। অন্ধকার ঘর, মৃদু আলো মনে হোল ঘরের ধোঁয়ার ভেতর তামাটে গন্ধ আর এই ধোঁয়া কিসের আমি জানতুম হাসিসের।

এলিয়াস এণ্ড্রুজ একটি হাসিসের সিগারেট ফারুককে দিলেন। আমি একটা সিগারেটে আগুন ধরালুম।

হিকমত ফাহামী তাঁর গান শুরু করলেন।

: ইয়া হাবিবী আনতী ইয়া বিনত আন মা সফক মিন জমানি...হে প্রেয়সী সুন্দরী কতদিন তোমাকে দেখি নি...

দর্শকেরা হিকমত-এর গলার স্বরের সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠস্বর মিলিয়ে গাইতে লাগল...ইয়া হাবিবী, আনতী, ইয়া বিনত...

কিছুক্ষণের মধ্যে আসর জমে উঠল। পুরুষদের মন ভোলাবার ক্ষমতা হিকমত ফাহামী জানে। তা নইলে কি বৃটিশ সৈন্য-বাহিনীর কাছ থেকে গুপ্ত খবর বার করতে পারতো?

হঠাৎ আমি দেখতে পেলুম ফারুক নাদিয়া সুলতানের পানে তাকিয়ে আছেন। বুঝতে পারলুম ওষুধ ধরেছে।

: পাশা, ফারুক আমার কানে কানে মৃদু স্বরে বললেন : ঐ মেয়েটি কে?

: কোন মেয়েটি? আমি না চিনবার ভান করলুম।

: ঐ যে ফ্লোরের পাশে একটা টেবিলে এক বসে বসে শ্যাম্পাইন খাচ্ছে।

এবার এলিয়াস এণ্ড্রুজ তার মুখ খুলল। বলল : মেয়েটি সিরিয়ন, নাদিয়া সুলতান, বেলী ডান্সার। আমি তাকে চিনি...

এলিয়াস এণ্ড্রুজের কথা ফারুকের কানে গেল কিনা জানি না, কারণ ইতিমধ্যে ফারুক আমাকে ডেকে বললেন, পাশা, ঐ মেয়েটিকে আমার টেবিলে আসতে বল।

আমি মৃদু আপত্তির সুর তুললুম। হয়ত উনি আমার সঙ্গী হবেন। ওর কর্তা একটুখানি সময়ের জন্য বাইরে গেছেন।

আমি শুধু কায়রোতে নাচওয়ালী জানা এই কথাগুলো বলেছিলুম, কারণ আমি জানতুম যে মেয়েটির ব্যাপারে ফারুক বাধা বিপত্তি শুনবেন না, মেয়েটির বাপ, স্বামী যেই থাকুক না কেন, ফারুক তাকে তাঁর নিজের কাছে চাইবেন।

: ওকে এখানে নিয়ে এসো। ফারুকের গম্ভীর আদেশের কণ্ঠস্বর।

আমাকে নাদিয়া সুলতানের টেবিলের কাছে যেতে হোল না। কারণ আমাদের পানে নাদিয়া সুলতান অনেকক্ষণ থেকে তাকিয়ে ছিলেন। হয়ত তিনি আমাদের আলাপ-আলোচনার বিষয় বস্তু বুঝতে পারলেন। এলিয়াস এণ্ড্রুজও তাঁর দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন। আর এই হাসির অর্থ হোল : চলে এসো।

নাদিয়া সুলতান ফারুকের সঙ্গীদের সঙ্গে চলে এলেন। ফারুক তাঁর পাশে বসে মৃদু নীচু স্বরে বললেন : ইসা মাসলক, আনা নাদিয়া সুলতান মিন সিরিয়া...সম্রাট, আমি নাদিয়া সুলতান, সিরিয়া থেকে এসেছি।

আলবী, আনা মুস মাসলক...আনা করুক...প্রেয়সী, আমি সম্রাট নই, আমি হলুম ফারুক। বসো।

নাদিয়া সুলতান সম্রাটের পাশে বসলেন। ফারুক নাদিয়া সুলতানের কাঁধে হাত দিলেন। মুহূর্তের জন্য নাইট ক্লাবের সবাই ফারুক এবং নাদিয়া সুলতানের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

নাচের স্টেজে হিকমত ফাহামী তখনও এক মনে গাইছেন : ইয়া হাবিবী, ইয়া আলবী...

কিন্তু ফারুক যে নাদিয়া সুলতানের গলা জড়িয়ে ধরে আছেন আর নাইট ক্লাবের সবাই তার পানে তাকিয়ে আছে একথা বুঝতে হিকমত ফাহামীর অসুবিধে হোল না। আমি হাসিসের সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে দেখতে পেলুম যে হিকমত ফাহামী কড়া দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। আর এই বাঁকা দৃষ্টির অর্থ হোল আমিই হলাম এই পরিস্থিতির মূল কারণ।

কাজী নজরুল ইসলামের
শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ
১। রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম ---- ১৪·০০
২। গুল বাগিচা---৩·৫০. ৩। কাব্য আমপারা--৪·০০
৪। পুবের হাওয়া----২·০০ ৫। ঘুমপাড়ানী মাসীপিসি--২·০০
মোহন লাইব্রেরী ৩৫ এ, সূর্যসেন স্ট্রীট
ফোন-৩৫ ০৬৩৩ কলিকাতা-৯

ওয়াটার ওয়ার্কসের মালিক ছিলেন শ্রী। তিনি আমাদের নজনকে বেশ টাকা ঘুষ দিলেন। আমি অন্য এন্ড্রুজ দের ঠকার অংশ থেকে একটা মোটা ফাংকোকে দিলুম।

এবার এলিয়স এন্ড্রুজ ফাংকোকে বলল : আপনি দেশে ফিরে যান। আমাকে পাত্তা দেবেন না। ঠিক আমদানী করা মাল পাঠিয়ে দিন। বাজারে কোন পাত্তার নাম ব্যবহার করবেন। পরে আপনি আপনার ইচ্ছামতো নামে এই পণ্য বাজারে বিক্রী করবেন।

প্রস্তাবটি ফাংকোর মনঃপূত হোল। প্রথমে আমদানী করবে ঠিক করলেন। বাজারে আমাকে না দেখে সেখানে আমাকে না করে দেন অনেক ফাংকো আমার কিনলেন। এবং আমদানী বন্ধ হয়ে যাবে। আমাদের মাল ফুরিয়ে গেলে ফাংকো প্রচুর টাকা রোজগার করবেন।

তিনি এবার সাকুল্যে কতো মাল থেকে তিনিস কিনবার জন্যে প্রস্তুত আগ্রহ নিলেন। কিন্তু বাজার থেকে সব জিনিস কেনা হোল না।

এমনি করে বিরাট উপায় দেখে যোগাড় থেকে টাকা আদায় লাগলেন।

টাকা দেবার প্রয়োজন ছিল। পাঁচদিন ফাংকো তাদের বেশী হয়ে মাকেটিং বাজী হয়েছিলেন।

তার প্রধান চিন্তা হোল টাকা, এই টাকা যোগাড় করবার জন্যে এক নতুন পন্থা অবলম্বন করলেন।

এই নতুন পথ হোল [illegible] মাল সম্বন্ধে বলা যায় [illegible] এবং এই মাল বিক্রির [illegible] প্রধান নায়ক ছিলেন মিঃ [illegible] নায়ক ছিলেন মিঃ ফেলটন।

কায়েত নিমের মতো মাটিতে মুখ ঘষে ফাংকোর প্রেম বেশ কুলপী মত জমে উঠলো।

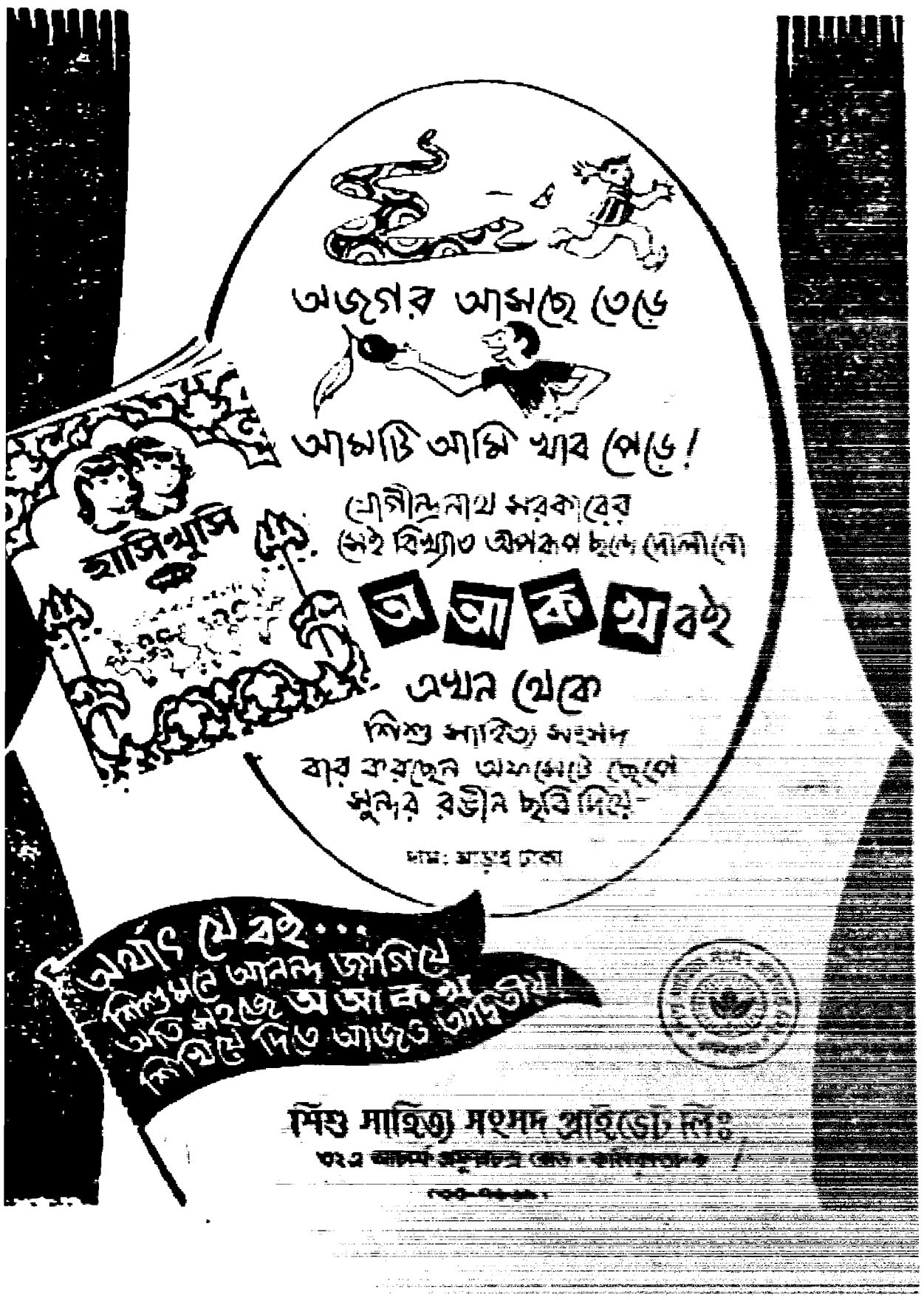

ফারুকের সুপারিশে নাদিয়া সুলতান হলেন অবারজ দা পিরামিডের প্রধান বেলী ডান্সার। আর এই ব্যাপার নিয়ে আর্টিস্ট এবং দর্শকমণ্ডলীর ভেতর তুমুল আলোড়ন শুরু হোল। কারণ এই সময়ে অবারজ দা পিরামিডের প্রধান বেলী ডান্সার ছিলেন সামিয়া গামাল।

সামিয়া গামাল শুধুমাত্র সুন্দরী নয়, তার দেহ, চোখের মাদকতা দর্শকদের মুগ্ধ করে রাখত। প্রতিদিন রাত্রে আরব দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু আরব গণ্যমান্য অতিথি সামিয়া গামালকে দেখবার জন্যে ভিড় করে দাঁড়াত।

সামিয়া গামালের পরিবর্তনে আমি মনে মনে খুশী হয়েছিলুম। তার প্রধান কারণ ছিল যাঁরা সামিয়া গামালকে দেখতে আসতেন তাঁরা অবারজ দা পিরামিডের বারম্যান আনোয়ার পাশার জন্যে একেবারে তোয়াক্কা করতেন না। কিন্তু যেদিন থেকে নাদিয়া সুলতান হলেন অবারজ দা পিরামিডের প্রধান বেলী ডান্সার সেদিন থেকে আমার পসার সম্মান বেড়ে গেল। কারণ সবাই জানত যে আনোয়ার পাশাকে খুশী না করলে বেলী ডান্সার নাদিয়া সুলতানের সুন্দর মুখ দেখা যাবে না।

আরো একটু খুলে বলা দরকার। নাদিয়া সুলতানের নাচ দেখবার জন্যে আমি অতিরিক্ত পয়সা আদায় করতুম। অর্থাৎ কেউ যদি আমাকে পয়সা টিপস না দিত তাদের বলতুম : সরি, টেবিল নেই।

আর বাজারের সবাই জানত নাদিয়া সুলতান হলেন রাজার গার্ল ফ্রেন্ড, রাজার গার্ল ফ্রেন্ডকে দেখা ছিল একটা ফ্যাসান।

ফারুকের সঙ্গে নাদিয়া সুলতানের হৃদ্যতা দৃঢ় হোল, আর আমিও নাদিয়া সুলতানের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হলুম। দু-এক দিনের মধ্যে আমরা বুঝতে পারলুম আমাদের একের অনেক প্রয়োজন আছে। শুধু তাই নয়, আরো কয়েক দিন পরে উপলব্ধি করলুম যে, নাদিয়া সুলতান আমাকে ভালোবাসেন। আর আমার কথা নাই বা বললুম। মেয়েদের প্রতি আমার কোন মোহ কিংবা অন্ধ ভালোবাসা ছিল না। আমি জানতুম যে, জীবন উপভোগ করবার প্রধান জিনিস হল টাকা। আর এই টাকার জন্যে আমি সবকিছু করতে পারতুম।

প্রতিদিন সন্ধ্যার পর ফারুক এসে আমাদের নাইট ক্লাবে ধর্ণা দিতেন। তারপর বাকীটা সময় নাদিয়া সুলতানকে নিয়ে কাটাতেন। অনেকদিন এর জন্যে নাদিয়া সুলতান স্টেজে নাচবার সুযোগ পান নি। দর্শকেরা চিৎকার হল্লা করত। অবারজ দা পিরামিডের কর্তারা রুষ্ট হতেন কিন্তু কারু মুখ ফুটে বলবার সাহস ছিল না : ইয়োর ম্যাজেস্টি, নাদিয়া সুলতানকে ছেড়ে দিন। নাচের সময় হয়েছে।

একদিন আমি বারে বসে ককটেল বানাচ্ছিলুম। নাচের আগে নাদিয়া এই ককটেল খাবে। ফারুক হয়ত আরো ঘন্টা খানেক বাদে আসবেন। তাই নাদিয়া ককটেল খেতে চায়।

হঠাৎ নাদিয়া সুলতানের খাদাম (চাকর) এসে আমাকে বলল : মাদাম আপনাকে ডাকছেন।

নাদিয়া সুলতান হঠাৎ ডাকলেন কেন। সাধারণ ফারুক আসবার আগে আমি কখনও নাদিয়া সুলতানের ঘরে গিয়ে দেখা করিনে। এই সময়টা বিপজ্জনক। যদি ফারুক এসে দেখেন আমি নাদিয়া সুলতানের সঙ্গে প্রেম করছি তাহলে আমার গর্দান যাবে।

কিন্তু সেদিন নাদিয়া সুলতান ছিলেন বেপরোয়া। কারণ আমি নাদিয়া সুলতানের ঘরে গিয়ে দেখলুম উনি পোষাক পাল্টাচ্ছেন। কারণ একটু বাদেই নাচ শুরু হবে, ব্যান্ড বেজে উঠবে, স্তাবকের দল চিৎকার করে উঠবে।

প্রথমে আমি নাদিয়া সুলতানের দিকে তাকাতে লজ্জা পেলুম। কারণ নাদিয়া সুলতান ছিলেন বিবস্ত্রা। নগ্ন দেহে আমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে উনি একটুও লজ্জা পেলেন না। শুধু তাই নয়। উনি তাঁর ব্রেসিয়ার পরছিলেন। আমাকে ব্রেসিয়ারের বোতাম দুটি দেখিয়ে উনি বললেন : লাগিয়ে দেবে পাশা?

আমার বুকের কাঁপুনি বাড়ল। সর্বনাশ করছি কী?

একবার যদি ফারুক আমাকে ঘরে এই অবস্থায় নাদিয়া সুলতানের সঙ্গে দেখতে পান তাহলে যে আমি বিপদে পড়ব। আমি সম্রাটের মোসাহেব, তাঁবেদার, ওঁর লবণ খেয়েছি, আমি কী ওঁর বান্ধবীর সঙ্গে ফষ্টি-নষ্টি করতে পারি? নাদিয়া সুলতান আবার ধমকের সুরে বললেন : চুপ করে দাঁড়িয়ে আছ কেন পাশা? যা বলছি তাই কর।

আমি ব্রেসিয়ারের বোতাম দুটি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলুম। কী করব ভেবে পেলুম না। আমি কী আগুন নিয়ে খেলা করব? বুকের কাঁপুনি বাড়ল।

বাইরে নাচের ব্যান্ড জোরে বেজে উঠেছে। এক্ষুনি নাদিয়া সুলতানকে স্টেজে যেতে হবে। কিন্তু নাদিয়া সুলতান তাঁর ড্রেসিং রুম থেকে বেরিয়ে যাবার কোন লক্ষণই দেখালেন না। বরং উল্টে আর একটি দুঃসাহসিক কাজ করে বসলেন। আমাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে লাগলেন। নাদিয়া সুলতানের নরম ঠোঁটের দু-তিনবার চুমু খেয়ে আমি উত্তেজিত বোধ করলুম।

নাদিয়া তুমি করছ কী? যদি—আমার গলার স্বর মিহি এবং ভেজা ছিল, আমার কথা শেষ করতে পারলুম না।

নাদিয়া সুলতান আমার মুখে হাত দিলেন। : নো, নো ডার্লিং আমার নাম নাদিয়া সুলতান নয়, লিলি। লিলি কোহেন।

: লিলি কোহেন? আমি এই নাম শুনে বিস্মিত হতবাক হলুম। কী ব্যাপার? লিলি কোহেন যে ইস্রাইলী নাম। তাহলে এখানে উনি করছেন কী? আর ফারুকের সঙ্গে প্রেম করছেন কেন?

কী উদ্দেশ্য? অনেকগুলো চিন্তা এসে আমার মাথায় জড়ো হোল।

নাদিয়া সুলতান আমাকে বেশ ভাল করে জড়িয়ে ধরেছিলেন। বন্ধন ছাড়বার কোন লক্ষণ দেখালেন না।

আমি ভীত কণ্ঠে বললুম : লিলি, যদি ফারুক আমাদের এই অবস্থায় দেখতে পায় তাহলে আমি বিপদে পড়লো।

মিষ্টি হাসলেন নাদিয়া সুলতান। বললেন : আমাকে তুমি লিলি বলে ডেক না। তাহলে ওরা জানতে পারবে আমি কে? ওদের মনে সন্দেহ ঢুকবে। না আমি লোকের মনে কোন সন্দেহ সৃষ্টি করতে চাইনে। আর তোমাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খাচ্ছি কেন জানো?

: কেন? আমি জানবার আগ্রহ প্রকাশ করলুম।

: কারণ যদি ফারুক কিংবা তার শনি আনতোয়ান পুলি আমাদের দুজনকে এই অবস্থায় দেখতে পান তাহলে কী হবে জানো?

: কী?

: ফারুকের মনে জেলাসি হবে। আমি ফারুকের মনে জেলাসি সৃষ্টি করতে চাই। কারণ ফারুক যদি একবার জেলাস হন তাহলে উনি আমার কথানুযায়ী কাজ করবেন। আর আমি কী চাই জানো পাশা?

: কী? আমার গলার স্বর ছিল মিষ্টি নরম?

: আজ ফারুকের অর্থের প্রয়োজন, সম্প্রতি উনি লন্ডনের শেয়ার মার্কেটের লেনদেনের ব্যাপারে প্রচুর টাকা লোকসান দিয়েছেন। আমার বন্ধু এলিয়াস এপ্তুজ ফারুককে পরামর্শ দিয়েছেন যে পয়সা করবার সব চাইতে সহজ উপায় হোল অস্ত্র বেচা-কেনা। এই অস্ত্র বেচা-কেনা থেকে উনি প্রচুর পয়সা রোজগার করতে পারবেন। আর শুধু ফারুক নন এলিয়াসও এই আর্মস ডিল থেকে পয়সা বানাবে। আমি এই ব্যবসার একটা মোটা অংশ চাই। আর এই কাজে তুমি আমাকে সাহায্য করবে।

আমি এবার নাদিয়া সুলতানের বাহু বন্ধন থেকে নিজেকে ছাড়ালুম। কারণ নাদিয়া সুলতানের কথা শুনে আমি অবাক হয়েছিলুম। প্রথমত জানতে পারলুম যে লিলি কোহেন মানে নাদিয়া সুলতান হলেন ইস্রাইলী স্পাই। দ্বিতীয়ত বুঝতে পারলুম যে ফারুক এবং এলিয়াস এপ্তুজ আর্মস কিনবার পরিকল্পনা করছেন। আর এই বেচাকেনা ব্যবসা থেকে দুজনেই বেশ মোটা টাকা লাভ করবেন। তৃতীয়ত নাদিয়া সুলতানও এই ব্যবসা থেকে বখরা চান। অষ্ট চার নম্বর : আমি হব নাদিয়া সুলতানের বিজনেস ম্যানেজার। আমাকে কী করতে হবে?

(ক্রমশ)

শ্লীলতা পরিবর্তনশীল

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

।। এক ।।

আত্মহত্যার মতো ব্যক্তিগত ব্যাপার আর কিছু নেই। এবং যদিও আমরা নরওয়েজীয় লেমিং নামক ইন্দুরদের কয়েক বছর পর পর আত্মনিমজ্জনের কাহিনী শুনেছি; তবু এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে: আত্মহত্যা একান্তই মানবিক ঘটনা। বেঁচে থাকাকে যে-প্রাণী অনুভব করেই ক্ষান্ত হয় না; বেঁচে থাকাকে যে বিশ্লেষণ করতে চায়; খুঁজতে চায় বেঁচে থাকার মানে—সে-ই আত্মহত্যার কথা ভাবতে পারে—জটিলতাকে দুর্মোচনীয়; গূঢ় ভেবে। সে প্রাণী মানুষ। যখন বাঁচাকে মনে হয় মরার থেকে বেশি যন্ত্রণাময়; তখনই মানুষ পা বাড়িয়েছে আত্মনাশের পথে। সমাজ রাষ্ট্র ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান—কেউই মানুষের এই আত্মনাশ স্বাধিকার স্বীকার করে না। তাই আত্মহত্যার মুহূর্তে মানুষ একা—একেবারেই একা। যে বিপন্ন বিস্ময় তার রক্তে খেলা করে সেই বিপজ্জনক শেষ শান্তিহীন অপরাধ-সাফল্যের প্রাক-মুহূর্তে তার কেউ নেই: স্ত্রী; কন্যা; পুত্র; বন্ধু তো নেইই: তার আর তখন সমাজ নেই: ভগবান নেই: সে তখন আর কোনো রাষ্ট্রের নাগরিক নয়।

কিন্তু আত্মনাশ মানেই আত্মহত্যা নয়। ভারতীয় সাধক সন্ন্যাসী যখন জরাজীর্ণ নশ্বর দেহটাকে সাধনার ক্ষেত্র অক্ষম ভেবে; দুর্গম গিরি চূড়া থেকে নিজেকে নিক্ষেপ করেছে কায়া পরিবর্তনের জন্য; সে ভৃগুপতনকে আত্মবিনাশ বলা গেলেও: তা আধুনিক অর্থে আত্মহত্যা নয়। প্রথমটির আত্মদানকেও এ আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। আবার কৃত্তিবাসী রামায়ণে উত্তরাকাণ্ডে লক্ষ্মণের সরযূতে আত্মবিসর্জনের যে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা পাওয়া যায়—

> পরশিল প্রভু সীয় কুন্দিল মেলানি।
> চাহিয়া সবার পানে চক্ষে বহে পানি ।।
> ব্রহ্মখড্গ ছাড়ি ধরি সব সর্বজন।
> সরযূ নদীর তীরে করেন গমন।।
> প্রার্থনা করেন তারে করিয়া প্রণাম।
> আমাতে প্রসন্ন যেন থাকেন শ্রীরাম।।
> সরযূর স্রোত বহে অতি খরশান।
> লক্ষ্মণ নামিয়া স্রোতে ত্যজিলেন প্রাণ।—

তাকেও আধুনিক অর্থে আত্মহত্যা বলা যাবে না। যদিও: চাহিয়া সবার পানে চক্ষে বহে পানি—এ বর্ণনার লক্ষণের মানব-স্বরূপকে বেশ ভালোই চেনা যাচ্ছে; তথাপি যে-আত্মহত্যার অচিরে লোকান্তর-গমনের পথ প্রশস্ত হয় সে-আত্মহত্যা ঠিক আত্মহত্যা নয়; বড় জোর লীলা সম্বরণ। অস্তিত্বের লিপি পড়ে মহাপ্রভু যখন বুঝলেন লীলা সম্বরণ করার সময় এসেছে; তখনই তিনি অপ্রকট হলেন। আধুনিক বস্তুবাদী দৃষ্টিতে এসকল ঘটনার বিচার করতে না যাওয়াই ভাল।

গীর্জাসমূহের প্রাথমিক অধ্যায়ে আত্মহত্যা সম্বন্ধে পোষিত হয়েছে এক বিস্ময়কর নিরপেক্ষতা। একজন প্রাথমিক 'ফাদার' যিশুর মৃত্যুতেও একধরণের আত্মহত্যা বলে মনে করেছেন। সে সব বিষয়ও আমাদের বর্তমান আলোচনার বাঞ্ছনীয় নয়।

মধ্যযুগে ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে যে-সব আত্মবিসর্জন ঘটেছে যেমন জহর ব্রত সতীদাহ সেগুলিকেও আমাদের বর্তমান আলোচনায় টেনে না-আনাই ভাল। সেগুলি আত্মহত্যা নয় এ কারণে যে ব্যক্তির কোনো একান্ত নিরুপায় সঙ্কট থেকে ঘটনাগুলি ঘটে নি। ঘটনার পাত্র পাত্রীরা ঘটনাক্রমে যদি অন্য ধর্মাবলম্বী হত তাহলেই এমন আত্মবিনাশের ঘটনা এভাবে ঘটতে পারত না। ওলড টেস্টামেন্টে চারটি আত্মহত্যার কথা আছে কোনোটির জন্যই দোষের নাজেল হয়নি। জুডাসের আত্মঘাত তার পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত। কিন্তু পরবর্তী নীতিশাস্ত্রীরা নাকি জুডাসের বিশ্বাসঘাতকতা অপেক্ষা তার আত্মহত্যাকেই বেশি পাপাত্মক বলে ভেবেছিল। ব্যক্তিগত আত্মহত্যাকারীর প্রতি তাদ্বতীয় স্মৃতিশাস্ত্রের মমতাহীন এবং সহানুভূতিহীন মনোভাবের কথাটিও এখানে স্মরণ করি। আত্মহত্যাকারীর জন্য শোকও নিষিদ্ধ ছিল স্মার্ত রঘুনন্দন তার জন্য কোনো প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থাও রেখে যান নি। 'তাদের গতি হয় না' অতীব হিন্দু কল্পনায় এই ভয়াবহ পরিণাম বর্ণনা বুঝি বা সামাজিক নীতিবোধেরই নির্দেশ-সম্ভূত। ইংলন্ডের এক সময়ের সেই আইনটির কথা তুলনাথেই আমরা স্মরণ করতে পারি—'আত্মহত্যাকারীর সমস্ত সম্পত্তি রাজা বাজেয়াপ্ত করে নেবেন।'

ব্যক্তির অনিবার্য ভবিতব্য কেন তাকে ঠেলে দেয় এ পথে সমাজতাত্ত্বিকেরা নানা আলোচনা করেছেন তা নিয়ে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার প্রদত্ত পরিসংখ্যান থেকে জানি প্রতাহ এক হাজারের মতো মানুষ নিজের হাতে যবনিকার দড়ি ধরে টানে। টেকনোলজির উৎকর্ষ যত জীবনকে অধিকৃত এবং বশীভূত করেছে যত জীবন বাইরের দিক থেকে সফল হতে হতে ভেতরের দিক থেকে অনুভব করেছে এক নির্বোধ সফলতার্থতা—যতই আলোক-সজ্জা সব হয়ে উঠেছে অন্ধকারের ছদ্ম এবং বার্থ আবরণ এই ক্লান্তি এই প্রবণতা তত বেড়েছে। মানুষের সব থেকে বড় সমস্যা একটাই—সেটা হল মনুষ্যত্ব। মানুষ যত মনে করে যে তার মনুষ্যত্ব খণ্ডিত হয়ে যাচ্ছে তত তার এ প্রবণতা বাড়তে থাকবে। বিশেষ করে এ সমস্যা তার যার কল্পনা আছে কিন্তু কল্পনা মুক্তির কোনো পথ জানা নেই। কিছু মনস্তাত্ত্বিকেরা অন্য কথা বলেন; তাঁরা বলেন এ জগৎ অবাধ্যের। অপর ব্যক্তি কারে চিরদিনের জন্য খিল এঁটে আছে এ জগৎ: আমরা জানি স্বেচ্ছামৃত্যুর একটি বিশেষ ধরণ আমাদের এই বাংলাদেশেই জীবনের পরিমায় প্রতীক হয়ে রয়েছে অশিক্ষিত গ্রাম্য যুবকদের মৃত্যু কাণ্ডের মধ্যে। সেটা কিন্তু খিল-আঁটা সুবোধ্য ব্যাপার নয়। বরং কোনো আত্মহত্যার যদি আধুনিক অর্থ লৌকিক থাকে তবে তা এখানেই লভ্য। অথবা অপরাজেয় হলেও বহু মাংসে কিংবা স্নায়ু দুর্বল হয়ে পড়তে পারে। টেগার্টটী নির্যাতন যদি দলের ক্ষতি করে তাই স্বেচ্ছায় সমাধি করে আত্মবিনাশের ভিতর দিয়ে দলকে বাঁচিয়ে গেল সে যুবক। এখানে মৃত্যু নয় জীবনই ছিল সাধ্য-সাধন। আমাদের আলোচনার এসব বহু কিন্তু আপাত প্রাসঙ্গিক আমাদের মূল প্রসঙ্গ বাংলা সাহিত্যে আত্মহত্যার ব্যবহার। তা বলে আমরা বাংলা সাহিত্যে আত্মহত্যার একটা পূর্ণ পরিসংখ্যা হাজির করতে যাই না।

।। দুই ।।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে প্রথম আত্মসন্ধানী আত্মহত্যার রচয়িতা বঙ্কিমচন্দ্র—

রচনার নাম 'বিষবৃক্ষ' ঘটনার নায়িকার নাম কুন্দনন্দিনী। এই আত্মহত্যাটির সামাজিক তাৎপর্য অসীম। সেই স্বাধীনতা-পূর্ব সময়ে ভিক্টোরিয়ান এই বোধের দ্বারা অধিকৃত ছিলেন যে সামাজিক স্থিতাবস্থার যে কোনো আলোড়নই বিষময় পরিণাম সৃষ্টি করে। ব্যক্তির পক্ষে স্থিতিই সত্যের যা তাকে ক্ষুণ্ণ করা যা ব্যক্তির পক্ষে পরিহার্য। কুন্দনন্দিনী তার স্বপ্নের নির্দেশকে সমান করে লঙ্ঘন করেছে তার ভবিতব্য। বঙ্কিমচন্দ্রের মোট দুটো আত্মহত্যার ঘটনা রয়েছে—একটা 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের ললীর বিষপানের ঘটনা—পুরো ভিক্টোরিয়ান প্যাটার্নের ঘটনা। এখানে ব্যক্তিত্বের কোনো নিগূঢ় প্রশ্ন জড়িত ছিল না। একটা নিরুপায় অবস্থার কাছে ললনা আত্মসমর্পণ করেছে মাত্র—স্বামীর বা রাজার নির্দেশ বলে যাকে সে জেনেছে এ বিশ্ব পান তারই নাটকীয় অস্বীকার। কিন্তু কুন্দনন্দিনীর আত্মহত্যা সম্পূর্ণ আলাদা জাতের ঘটনা। সে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে তার স্বপ্ননির্দিষ্ট ভবিতব্যের কাছে গিয়ে। মৃত্যুর আমন্ত্রণের সে উপেক্ষা করেছে তার রচয়িতার ইঙ্গিতে নয়েও। পুকুরের কালো জলের নিবিড় হাতছানি কুন্দনন্দিনীকে সামনে ধরিয়ে দিয়ে তার রচয়িতা বলছেন:—

> কুন্দনন্দিনি! —দেখ পুষ্করিণীর কেমন পরিষ্কার সুশীতল সুবাসিত—বায়ুর হিল্লোলে তাহার নীচে তারা কাঁপিতেছে। ডুবিবে? ডুবিয়া মর না? কুন্দনন্দিনী মরিতে চাহে না।

আশ্চর্য এই বর্ণনাংশ। পুকুরের জলের বিশেষণগুলি যেন কুন্দের আত্মজ্ঞানিতে ভরা জীবনের সব আক্ষেপের অবসান ঘটাবে। জলের নিচে কলঙ্কমান নক্ষত্র—যে নক্ষত্রলোকে তার মা তাকে চলে যেতে বলেছিল। কিন্তু কুন্দ মরতে চায় না। আত্মহত্যা নয় আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্যই তখনও হৃদয় যা কিছু আকুলতা। কিন্তু সেই শেষ পর্যন্ত কুন্দকে মরতেই হল। পুকুরের জল অপেক্ষা বিষই হল তার কাছে অধিকতর গ্রাহ্য। ভিক্টোরিয়ান নয় শেক্সপীরিয়ান নায়িকার প্যাটার্নে অঙ্কিত নায়িকা দুবিধা মৃত্যু-চিন্তাতেও রূপসচেতনতা ছাড়তে পারে না—পুকুরের জল খেয়ে মরতে কুন্দনন্দিনী হয়ে উঠত রাক্ষসীর মত বীভৎস হয়ে যেত যে!

যাই হোক, মৃত্যুমুহূর্তে কুন্দনন্দিনী নিজের কথা পরোক্ষে বলে গেল। এক বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে তার রচয়িতার মনে যে দ্বিধাই থাক নগেন্দ্রনাথ যে তার আইনসম্মত এবং যথার্থতঃ স্বামী সে কথা চরিত্রটিকে দিয়ে সে স্বীকার করিয়ে নিয়েছে। সেও একথা বুঝিয়ে গেছে শৈবলিনীর মতোই বুঝিয়ে গেছে যে বঙ্কিমচন্দ্রের মানস-কন্যারা এমন কি বঙ্কিমচন্দ্রকেও মানত না। [illegible] নিজেকে [illegible] একথা পরোক্ষে [illegible]

নিজে মরে সে কথা সে প্রমাণ করেছে। তিল তিল মৃত্যু অপেক্ষা জীবন যদের সঙ্গে যদি বাঁচা যায় ঠিক মতো। রোহিণীর সঙ্গে কুন্দনন্দিনীর একাত্মতাও মনে লাগ কাটে। ডুবতে চেয়েছিল রোহিণীও। ডুবতে চেয়েছিল কুন্দনন্দিনীও। কিন্তু কুন্দনন্দিনী তোবার জন্য এক পা বাড়িয়েও ডুবতে পারল না। কেননা তার আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াই তখনও শেষ হয় নি। মরতে পারুক বা না পারুক রোহিণী ডুব দিতে পিছপা হয়নি। কেননা আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াই তার শেষ হয়ে গিয়েছিল। অথচ আসল সময়ে কুন্দনন্দিনী মারুন বেপরোয়া তার বিশ্বাসের মুখরতাই তার নারীর মৌলিকতাকে তুলে ধরেছে মৃত্যু তারই জয়ধ্বজা। আসল সময়ে রোহিণী কিন্তু পিছিয়ে এসেছে—সে বলেছে মরিব কেন?' তার রচয়িতা বলছেন যে দিন অনায়াসে অতলে বারুণীর জলে ডুবিয়া মরিতে গিয়াছিল, আজি সেদিন রোহিণী ভুলিল। সে দুঃখ নাই সুতরাং সে সাহসও নাই।' স্মরণীয় কুন্দের আত্মহত্যা সমাজ-জীবনে আত্মহত্যার একটা প্যাটার্ন তৈরি করেছিল স্বয়ং রচয়িতার সংসারও তা ঠেকে রোহাই পায় নি। রোমান্টিক ধরনের আত্মঘাত অনুকরণীয় হিসাবে কতখানি আন্তর্জাতিক ব্যাপকতা পেতে পারে তার ছেদবৈষম্য-নিদর্শন পুঞ্জ তো আমাদের অজানা নয়।

।। তিন ।।

সব আত্মহত্যাই কিন্তু হতাশা বা জটিলতার অথবা গতান্তরবিহীন নিরুপায়তার পরিণাম নয়। চতুরঙ্গের নলিনাক্ষের মৃত্যু-বরণের কথা আমরা স্মরণ করতে পারি। তার চোখের জল খুব প্রবল। কেননা মেয়েদের চোখের জল কখন কিসের সাক্ষ্য দেয় তা বলা মুস্কিল। তা নইলে বেনারসী-সজ্জিত নলিনাক্ষের দু' চোখের অবিরল অশ্রু আমরা আনন্দাশ্রু বলে ভুল করব কেন। তারপরেই পেলাম সুসজ্জিতা সুভূষিতা নলিনাক্ষের মৃতদেহের পাশে সেই মর্মান্তিক পত্র—কিন্তু তাকে যে আজও ভুলিতে পারি নাই।' জগমোহন যে প্রত্যক্ষবাদী জগতের মানুষ সেখানে নলিনাক্ষ তার মৃত্যুর ভিতর দিয়ে প্রমাণ করে গেল সব থেকে অপ্রত্যক্ষ ব্যাপার মানুষের হৃদয়। জগমোহনের মিল-বেন্থাম খৈ পেল না। এই অতি নয় সুকুমার তরুণীটির জীবন রহস্যের। নলিনাক্ষ ঐ কয় ছত্রলিপিটির মাধ্যমে জানিয়ে গেল ব্যক্তি-মানুষের সব গাণিতিক হিসাবের বাইরে।

আত্মহত্যার বিষয়ে বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের অন্তত একটি ভাবনা-সাদৃশ্যে কোনো সন্দেহ নেই। দুজনেই পরোক্ষে প্রত্যক্ষে প্রায় এই কথাই বলতেন যে মরতে পারা সাহসের কাজ। নলিনাক্ষকে শচীশ বিয়ে করলে লম্পট পুরন্দর আত্মহত্যা করবে বলেছিল। পুরন্দরের মতো হীন প্রকৃতির লোক মরলে আপদ চোকে কিন্তু [illegible]

না একথা তার স্ত্রী ঠিকই বুঝেছিল। রোহিণীও মরার সাহস হারিয়ে ফেলেছিল বলে মরতে চায় নি—অন্তত তার স্রষ্টার ব্যাখ্যা এই। কিন্তু আত্মহত্যা-ভাবনায় রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্র থেকে নূতনতর একটি স্তর যোজনা করেছিলেন। আত্মহত্যা রবীন্দ্রনাথের নাটকে ও গল্পে-উপন্যাসে দুই প্যাটার্নের ঘটনা হয়েও এই স্তর-বৈশিষ্ট্যে সমমূল্যের ঘটনা। রাজা-ও-রানির কুমারের অথবা বিসর্জনের জয়সিংহের আত্মবলি অনেকখানিই ভেতর-বাইরের জটিলতার গণ্ডি-মোচন, বিষম অবস্থাকে মৃত্যুর অভিঘাতে স্ব-ছন্দে ফিরিয়ে আনা। কিন্তু নলিনাক্ষ বা চার অধ্যায়ের এলার মৃত্যুবরণ অন্য স্তরের ব্যাপার। ব্যক্তির একেবারে নিজস্ব নিরুপম স্বাধীনতায় ভালোমন্দ কিছুর হস্তক্ষেপই চলে না। ব্যক্তির সহজাত অমোঘ স্বাধীনতাই এখানে মৃত্যুর রূপ নিল। এলা এর মধ্যে সর্বোত্তমা। সে কোনো কিছুকেই এমন কি পার্টি বা দলের মতো নিষ্প্রাণ বস্তুর সঙ্গে তুলনীয় কোনো পেষণ-সোষ্ঠি বা প্রেসার-গ্রুপকেও স্বীকৃতি দেয়নি। তার মৃত্যুবরণ, যদি তা আত্মহত্যা নাও হয়—এই উৎকল ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের শুদ্ধ নয়, ব্যক্তিস্বাধীনতার স্বীকৃতি। স্মরণীয় তার অধ্যায় যখন লেখা হয়েছে তখন আন্তর্জাতিক ইতিহাসে ফ্যাসিবাদ নাজিবাদ জাগ্রত।

(৪)

মানুষ সর্বজ্ঞানিমান নয়। কিন্তু সর্বজ্ঞানিমান হবার অভিমান মাঝে মাঝে তাকে পেয়ে বসে। বিচিত্র সংসার এটাই যে, এই অভিমানের কাছে সে বড় দুর্বল। পুতুলনাচের ইতিকথা'য় যাদব শশীকে সূর্য-বিজ্ঞান শেখাতে চেয়েছিল। এ যে জানে, সে নাকি জীবন-মরণের রহস্য অধিগত করতে পারে। নিজ মৃত্যু-দিবস রথের দিন বলে ধার্য করে যাদব আফিম খেয়ে মরে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় দেখালেন মানুষ কত দুর্বল। আত্মহত্যা-ভাবনায় তিনি সম্পূর্ণ উল্টো কথা হাজির করলেন। কামু তাঁর বিখ্যাত 'দ্য মিথ অভ সিসিফাস অ্যান্ড সুইসাইড' প্রবন্ধের শেষ পর্যন্ত বলেন, 'দি পয়েন্ট ইজ টু লিভ'। আত্মহত্যার অধিকার গ্রহণও পরোক্ষে কামুর আগেই মানিকবাবু একথা বলে গেছেন। বিংশ শতাব্দীতে আত্মহত্যা-ভাবনা আর সামাজিক ভাষা পেল না। জীবনের দুর্বোধ্যতায় কিম্ভূত কিমাকারত্ব মৃত্যু-ভাবনার উপর নতুন আলো ছড়াল। প্রথম মহাযুদ্ধের পরের দিনগুলিতে বাড়তে বাড়তে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে এই চেতনা আরো প্রবল হল। জীবনানন্দের 'আট বছর আগের একদিন' কবিতায় আত্মহত্যার কোনো হেতু-নির্দেশের চেষ্টা নেই। জীবন সহজ ব্যাপারটাই যখন বুদ্ধিসিদ্ধ নয়, তখন মৃত্যুই বা কেন কোনো যুক্তি মানবে? যে-বিপদ বিশ্বময় আমাদের রক্তকে [illegible]

মৃত্যু। এই অসম্বিগ্ন অস্তিত্ব-বোধ একান্ত ভাবেই অ-স্বাভাবিক অ-নৈতিক অসামাজিক অ-পারিবারিক।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য আট বছর আগের একদিন'-এর নায়ক মৃত্যুর জন্য যে-পদ্ধতি নির্বাচন করেছিল তার অকাট্যতা। জীবনানন্দ অসীম উদাসীনতায় গলায় দড়ি-দেওয়ার মতো রুঢ় পদ্ধতিকে নির্বাচন করেছেন তাঁর নায়কের জন্য। ঊনবিংশ শতাব্দীতে জল অথবা বিষ ছিল প্রশস্ত। মাঝারি সা পদ্ধতি-গুলো কিন্তু পৃথকভাবে একটু ভেবে দেখা দরকার। জীবনের দাবদাহ থেকে নিষ্কৃতির জন্য জলকে ব্যবহার করে মরণাকাঙ্ক্ষা জানিয়ে গেল তার জীবনের স্বরূপ। জল সেই প্রশান্ত জীবনের চিরশান্তির প্রতীক। বিষ আত্মহত্যার বাজারে সব থেকে সুলভ্য। তা সহজে জল বা আগুনের মতো নিষ্কৃত করবে না—তবুও পৌঁছে দেবে মৃত্যুতে। কিন্তু বিষের শতাব্দীতে এসেছে কৌশলের বৈচিত্র্য। টেকনোলজির উৎকর্ষের কালে পিস্তল, ব্লেড, হাতের শিরা-কাটা, এবং ঘুমের ওষুধ, বিষের জায়গায় ব্যবহৃত হয়েছে। আট বছর আগে একদিনের নায়ক সেক্ষেত্রে এমন এক পদ্ধতি অনুসরণ করল গলায় দড়ি দিয়ে যা কাব্যখাত নয়। কিন্তু এই পদ্ধতিটিই এই কবিতায় বড়ো প্রয়োজনীয় ছিল। ঘরের মধ্যে বিষ বা ঘুমের ওষুধ থেকে মরে থাকলে এ মৃত্যু তার যোগ্য পটভূমিকা পেত না। প্রথমে লোকটা ছিঁড়েছে বৌ এবং ছেলের বাঁধন। কোনো পিছুটান সেখানে সে অনুভব করেনি। তারপরে সে এসে দাঁড়িয়েছে উন্মুক্ত প্রকৃতির মাঝখানে, সেখানেও পলাশীর চাঁদ, শিলির, জোনাকির ঝাঁক, গাছ এদের কারো কাছ থেকে সে কোনো প্রতিবাদ পায়নি শোনেনি। এই বিমূঢ় করে-দিচ্ছে-পারে এমন ভবিতব্যটি স্পষ্ট হত না, যদি না লোকটি ঘর থেকে উঠে আসতো। যে-আংগুলিগুলো ইঙ্গিত করে—(জানিবার গাঢ় বেদনার অবিরাম অবিরাম তবু সহিবে না আর')—সেই মহা-নুভাতা, উটের গ্রীবা যার নিস্তব্ধতার উপমান তার জন্যই ঘরের বাইরের পরিবেশটির প্রয়োজন আবশ্যিক হয়ে উঠেছে।

অথচ ঊনবিংশ শতকের ক্ষের-টানা নাটকীয় আত্মহত্যা তখনও বিদায় নেয় নি। তারাশঙ্করের গল্পে এরকমের আত্মহত্যার ঘটনা দুর্লভ ঘটনা নয়। 'পিতাপুত্র' গল্পের শশিশেখরের রেললাইনে ট্রেনের তলায় আত্ম-বিনাশের ঘটনাটি স্মরণীয়। কিন্তু এ-নাটকীয়তা তখন বাস্তবজীবনে প্রায় অবান্তর হয়ে গিয়েছে। অস্তিত্বের স্বরূপজ্ঞান জটিলতাই তখন অচ্ছেদ্য বন্ধনের আকার নিয়েছে। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'মীমার দুপুর' উপন্যাসে হীরেনের মরার পদ্ধতি ও কারণ দুই-ই এখানে উল্লেখ করার মতো। ক্ষুর গলায় ঘাসিয়ে সে নিজেকে শেষ করে। মুখন ছিল তার জীবন, মুখন তার মৃত্যুও। তাকে মখন থাকতে হয়েছে যার সঙ্গে সে স্বাস্থ্যবতী, ক্ষুধাবতী মীরা। এই মীরা তথা জীবনই ছিল হীরেনের কাছে দুঃসাধ্য। একটি প্রতীকী ঘটনার উল্লেখ করি :—

> শাড়ি খুলে ফেলেছিল আগেই পরণে জংলি সায়া। পানের রসে অধরোষ্ঠ রাঙা। সুটকেস খোলার কারুনিতে খোঁপাটা মুখ থুবড়ে পড়েছে এসে ঘাড়ে গালে। হীরেন কতক্ষণ নিঃশ্বাস ফেলতে পারল না। মীরা ডাকলো 'এসো'। সেই ডাক মৃত্যুর মতো সুন্দর, হীরেন খাটের কাছে যেতে যেতে ভাবল, এমন ঠাণ্ডা লরীর জুড়োনো ডাক আর কোনো দিন সে মীরার কাছে পায় নি।

হীরেনের রুগ্নতায় ক্লেম হিসাবে পাওয়া ছিরে ভাজা গরম পরটা, মুরগির ঝোল, ডিমের কুসুমের সোনালি-মাখা ভাত বা ভাতের থালা গরম ঘি, আলু কাইয়ের কোল,' চাটনি দুইয়ের বিবরণ। হীরেনের অসুস্থ অক্ষমতাকেই আরো বেশি প্রকট করে এই বর্ণনা। পরিশেষে শতাব্দীর জটিলতম কারণে হীরেন নজেকে হত্যা করে—মন্থর নদীতে হীরেন ঢলে পড়েছে। দুই কান পর্যন্ত বিস্তৃত হাঁ-করা কত গলায়। জীবন হত্যা বটেই মৃত্যুও কত অসুস্থ হতে পারে হীরেন তার প্রমাণ। একটা রোগা বোবা নদী আপন অক্ষমতায় একটি, যা ঐ শিল্পী ছেলেটিকে ধরলে দুটি, বেগবান নদী-নয়ের পাশে বালুকায় মাথা গুঁজে মরল। মুখদেব বসুর 'নির্জন স্বাক্ষর'-এর নায়ক সোমেনের জীবনেও এক মীরা। 'মীমার দুপুরে' ও 'নির্জন স্বাক্ষর'-এ দুজন মীরাকে দেখে মনে হয় মীরা বোধহয় আবহমানকালের দাম্পত্য-গোলমালের নামপ্রতীক। আমি অবশ্য একথা মানতেই পারি না। মুখদেব কবি। 'নির্জন স্বাক্ষর'-এর নায়কের অন্তিম মুহূর্তটিও কবিত্বময়—দরজা বন্ধ করে চেয়ারে বসে আছে খাড়া পিঠে। সামনের টেবিলে কাচের গেলাস গলা অবধি ভর্তি। ঘন রক্তের জল; লাল মদিরার মতো রক্তের মতো লাল।—এরই সামনে দাঁড়িয়ে আনা কারেনিনার আনা-র রেল লাইনের চলতি ট্রেনটির সামনে যেমন মনে পড়ে গিয়েছিল জীবন-কথা, সোমেনেরও মনে পড়ে গেল—যৌবনের দিন। ছেলেবেলা কোনো এক দুপুর রাতে ঘুম ভেঙে বৃষ্টি শোনার সুখ। এই মৃত্যুতে জীবনের কথাই বেশি মনে পড়ে: মৃত্যু অনিবার্য, জীবন অপ্রতিরোধ্য, একথাকেই সোমেন ধ্বনিয়ে দেয়—যদি কোনো আশ্চর্য উপায়ে এখনি ফিরে আসে মীরা, এখনই এই মুহূর্তে যদি পায়ের শব্দ শোনে সিঁড়িতে, একটু পরেই কাঁচ গলায় ডাকে, দাদা'—তাহলে কী হত তা আমরা জানি না। হয়তো আজকের মতো ফিরে যেত মৃত্যু, দোর কাল বলে। কিন্তু কাল...পরশু...তারও পরে?

।।পাঁচ।।

তবু, আজকের জিজ্ঞাসা—এরা কি কোনো মানে হয়? যদি জীবনেরই কোনো মানে খুঁজে না পাওয়া যায়, তাহলে মৃত্যুতেই বা অর্থবান ভাবা চলে কি? মধ্যবিত্ত আপন অসহায়তায়, আপন অনাগতকে নাগালসিদ্ধতায় যখন থেকে যাচ্ছে যে, সামাজিক, ঐতিহাসিক ভবিতব্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা তার আর নেই, তখন থেকেই সে আত্মচেতনাকেই সর্বস্ব করে তুলেছে। তার এই শক্তি-নিরপেক্ষ জগৎ থেকেই সে জগৎ-জীবনকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছে বলে সে করেছে সবই নিরর্থক। বড় বড় নগরীর সুকেতুরা বাধ্য। উদ্যমের উদ্যোগের অমলা স্পষ্টত্রা মানুষ কুমেই হারিয়ে ফেলে। তাই এই মানুষের কাছে মৃত্যুর কোনো সংশয়ের আলোকছটা নেই। মরার ইচ্ছে জাগতে পারে কিন্তু না মরলেও চলে। যেমন না বাঁচলেও চলে, তবু বাঁচতে হয়। দেখা যায় এ সময়ের লেখায় চরিত্রেরা মরতে গিয়েও মরতে পারে না। প্রেতে অথবা মরে কিছুই যখন প্রমাণ করা যায় না, দুই-ই যখন সমান অসঙ্গত তখন একটার বিকল্প আর একটা ভেবে লাভ নেই। আত্মপ্রকাশের নূরজাহান একবার আত্মহত্যার চেষ্টা করে। পারে নি। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় এ যুগের নায়কের মনোভাবটিকে ফুটিয়েছেন চমৎকার :—

> আর একদিন সে হাত-আয়নাটা মুখের সামনে ধরে জবাফুলের মতো গলা বাড়িয়ে ডানহাতের চকচকে ব্লেড কণ্ঠনালির ওপর রাখল। সড়সড় একটু চাপ দিল। বড় আরাম! কিছুক্ষণ পদ্মে সরু রক্তের রেখা আর গেঞ্জীর ওপর নেমে বুক ভাসিয়ে দিল। ব্লেডটা ছুঁড়ে ফেলে সে হেসে বলল ধ্যাৎ বড্ড নাটুকে। তারপর তোয়ালে দিয়ে গলা মুছে ফেলল। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখল রাস্তায় জীবন্ত মানুষজন চলাফেরা করছে। কণ্ঠের ওপর ভেজা তুলো চেপে সে চোখ বুজলো। আঃ! বড় আরাম!

গলায় ব্লেড চেপে ধরেও 'বড় আরাম' আবার কণ্ঠের ওপর ভেজা তুলো চেপে ধরেও 'বড় আরাম'। 'আরাম' একান্তই আপাতিক ভাবে বলা। না-মরার কবলটি আরো হাল্কা। 'বড্ড নাটুকে'—না হলে হয়তো দেখা যেত। না-মরাটা এখানে মরার চেয়েও জটিল।

এই জটিলতাই বুঝি অভাবিত মধ্যবিত্তকে নিত্য জানার এক গভনা। তবু কামনা করুন, দি পরেন্ট ইজ টু লিভ।

সুরের আগুন

এ হেন সত্যকথন আপনার মতো গুণীরই উপযুক্ত ভূষণ। সবজনশ্রদ্ধেয় হলেও আপনার সম্বন্ধে কিছু দুর্বলতা থাকার সুনাম অথবা দুর্নাম এ অধমের আছে। অতএব নিজের কোনো মতামত প্রকাশ করবার আগে শ্রোতৃবিদগ্ধমণ্ডলীর স্বীকৃতির উদাহরণগুলিই স্মরণ করছি। রবীন্দ্রমেলা বরীন্দ্রসদন, সম্প্রতি মার্কেস প্যালেসের রবীন্দ্রসঙ্গীতের আসরে তুষার বাবু, শৈলজাবাবু, সুবিনয় রায়ের সঙ্গে আপনার সম্বর্ধনা এবং মনে নাই-পড়া আরো অনেক রবীন্দ্রসঙ্গীতের আসরে সম্বর্ধনা ছাড়াও গান্ধর্বীতে পংকজবাবু ও বিড়লা একাডেমীতে আপনার প্রধান অতিথি হবার ঘটনা ত বেশীদিনের নয়। কিন্তু এই রাজ্য।

এইতো সেদিন। শান্তিদেববাবু ও রবীন্দ্রসঙ্গীতের শিল্পীদের আলোচনা প্রসঙ্গে ছায়াচিত্রে আপনার গুরু পংকজ-বাবু ছাড়াও আপনার ও সায়গলের কথা বললেন। কিছুদিন আগে মোহরদি অধুনাকালের রবীন্দ্রসঙ্গীতের অন্যতমা নায়িকা হয়েও রেডিওতে অতীত স্মৃতি আলোচনায় রবীন্দ্রসঙ্গীতের পর্যায় আসতে শ্রদ্ধেয় পংকজবাবুর ও আপনার দুটি গান 'প্রলয় নাচন' ও 'আজ সবার রঙে' বাজিয়ে শোনালেন এবং বিশেষভাবে উল্লেখ করলেন 'পরো, পরো, পরো তবে' উচ্চারণের কথা—যে উচ্চারণ অনুভবের আলোরেখার আণ্ডারলাইনের মতই গানটির মর্ম সত্যকে যেন মূর্ত করে তুলেছে। শুনেছি শান্তি-নিকেতনের সবাই তাঁর এ নির্বাচন খুব আপ্রিশিয়েট করেছেন। তাছাড়া এবারে ২৪ বৈশাখ রবীন্দ্রসদন কবির মর্মর মূর্তি উন্মোচন অনুষ্ঠান পূর্তমন্ত্রী শ্রীযুক্ত ভোলানাথ সেন মহাশয় স্টেজ থেকে অডিটোরিয়ামে নেমে এসে করজোড়ে আপনাকেই অনুরোধ জানালেন একটি রবীন্দ্রসংগীত গাইবার জন্য। তাঁর অনুরোধের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলো সেদিনের সভায় অংশগ্রহণকারী অধুনাকালের সেরা রবীন্দ্র-সঙ্গীত শিল্পীদের (হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, ছবিরা বন্দ্যোপাধ্যায়, মায়া সেন) আবেদন।

এতগুলি যথার্থ গুণী ও সংস্কৃতি প্রেমিক মানুষের মতামত তো উড়িয়ে দেওয়া যায় না। অতএব আপনার যুক্তিও কোনোটিই মানা যাচ্ছে না। আর তারই অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতি সেদিনের অনুরোধ-এ সঙ্গীত-গুরোহিত ঐ মধুর নামটির সংযোজন।'

অগত্যা আত্মসমর্পণ না করে উপায় কি? কানন দেবীর মুখে ফুটে ওঠে সেই ঝলমলে হাসি, আজ তা স্নিগ্ধ আশ্বাসের মতই। কিন্তু তাঁর সমসাময়িক রসিক-মণ্ডলীর কাছেই শুনেছি এ হাসি ছিলো সাহিত্য ও কাব্যের সেই সুপ্রসিদ্ধ হাসি যা দেখে 'মুনিগণ ধ্যান ভাঙি দেয় পদে তপস্যার ফল।'

রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্ষেত্রে কানন দেবীর প্রথম [illegible] সঙ্গীতের ক্ষেত্রে কানন ইজ দি ফার্স্ট সিংগিং স্টার ইন নিউ থিয়েটার্স।'

ফার্স্ট সিংগিং স্টার—এইজন্য যে অভিনয়ের মধ্যে গান হয়ত আগে গেয়েছেন অনেকে, কিন্তু সাংগীতিকারের গায়িকা বলতে যা বোঝায় সে পর্যায়ে তাঁদের মধ্যে কেউ পড়তেন না। ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকে নামী ও দামী শিল্পীর লোভনীয় তালিকা আজ ছায়াছবির অন্যতম আকর্ষণ। যে কোনো সঙ্গীতপ্রধান চরিত্রও সঙ্গীতহীনার পক্ষে রূপায়ন করাটা আজ আর মাছাসদৃশির মত অসম্ভব নয়। কিন্তু কানন দেবী যে যুগের নায়িকা সে যুগে চলচ্চিত্রশিল্পীকে একাধারে অভিনয়, সঙ্গীত, নৃত্য সবই আয়ত্ত করতে হোতো। কারণ ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক তখনকার মানুষের কল্পনাতেও আসেনি। তার ফলে স্বাভাবিকভাবেই অভিনীত চরিত্রের শিল্পী নির্বাচন সীমিত হয়ে পড়তো। সামান্য কয়েক লাইন গান পাওয়া অন্যদের পক্ষে সম্ভব হলেও সাংগীতিক যে চরিত্রের অপরিহার্য অংশ সেখানে নির্বাচিত শিল্পী সাংগীতিকারের সঙ্গীতশিল্পী না হলে রূপায়িত চরিত্র দুর্বল হয়ে পড়বে এবং চিত্রকারের উদ্দেশ্যও ব্যর্থ হবে। আর ভূমিকাতেই অবতীর্ণা ছিলেন কানন দেবী।

ঐ একটি নাম একটি যুগকে প্রতি-নিধিত্ব করছে আজ? কানন দেবী সৌন্দর্য-ময়ী, অভিনয়শিল্প অনন্যা, সঙ্গীতময়ী বাক্তিত্ব—এ সবই সত্য। কিন্তু আমার কাছে এ-সবের চেয়ে অনেক বড় তাঁর সঙ্গীত-প্রতিভা। সঙ্গীতপ্রতিভা বলতে যা বোঝায় সুরের অনুভব, সঙ্গীতের অনুভব, ধারণা, শিক্ষিত কণ্ঠ, সূক্ষ্ম কারুকাজ প্রতি শ্বাস প্রতিমাধুর্যে—এতগুলি দুর্লভ সমন্বয় ঘটেছিলো তাঁর কণ্ঠে। সঙ্গীতময়ী কানন দেবীর জুড়ি সে যুগে ত কেউ ছিলেনই না এ যুগেও তাঁর কাছাকাছি পৌঁছবার মত কোনো সঙ্গীত-শিল্পী চলচ্চিত্র জগতে সম্ভবত কেউ নেই। আজকের যুগে বাংলার চিত্রজগতে কত যুগবিপ্লবী পরিবর্তন ঘটেছে, কতো বিস্ময়কর গৌরব পেয়েছে বাংলা চলচ্চিত্র। কতো শক্তিমান প্রতিভার আবির্ভাবে আজ বিশ্বের দরবারে বাংলার চিত্রশিল্প আজ অভ্যর্থিত। কিন্তু এমন কোনো সুকণ্ঠীর আবির্ভাব ঘটলো না যিনি কানন দেবীর সঙ্গীতপ্রতিভার দীপ্তিকে এতটুকুও ম্লান করতে পারেন। তাই কানন দেবী কানন দেবীই। আপন মহিমায় ভাস্বর।

একদিন সঙ্গীতাচার্য পংকজবাবুর সঙ্গে আলোচনা করতে করতে প্রশ্ন করে-ছিলাম—'একটা জিনিস আমার কাছে খুব আশ্চর্য লাগে। একান্তভাবে রবীন্দ্র-সঙ্গীতেই সমর্পিতা শিল্পী কানন দেবী নন; জনসাধারণের কাছে রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রচারের উদ্দেশ্য নিয়েও তিনি রবীন্দ্র-সঙ্গীত গাননি। গেয়েছেন অল্প কয়েকটি রবীন্দ্রসঙ্গীত (সবশুদ্ধ বাইশ কি তেইশ-খানি) তাও ছবির প্রয়োজনে। তবু কেই কটি গানের স্মৃতিই রসিকচিত্তে কেমন করে এমন অনপনেয় ছাপ ফেলতে পারলো? কেন ঐ কটি গানের নামের সঙ্গে কানন দেবীর কণ্ঠ এমনভাবে মিশে রইলো যে অন্য কারো কণ্ঠে এবং গান শোনার কথা ভাবাই যায় না?' সবাব হয়ে যে উত্তর হবে ঐ একটি গানেই বোধহয় রবীন্দ্র-সঙ্গীতের জনপ্রিয়তা একশ বছর এগিয়ে নিয়েছে। এটা আমার ব্যক্তিগত উচ্ছ্বাসের কথা নয়। সকল শিল্পী, শিল্পের সব এমন কি রবীন্দ্রসঙ্গীতের গুরুরাও যাঁদের কাছে বলেছি তাঁরাও রবীন্দ্রসঙ্গীতের একজন 'কংবদন্তীতুল্য শিল্পী এবং যথার্থ গুরু) এ বিষয়ে একমত। কেন?'

সাধক শিল্পী শ্রদ্ধেয় পংকজবাবু হেসে উত্তরে বলেছিলেন, তার কারণ এটাকে সে বীজমন্ত্রের মত করে নিয়েছিলো। শাস্ত্রে আছে 'নাস্তি মূলম অক্ষর নাস্তি'—এমন কোনো অক্ষর নেই যা দিয়ে মন্ত্র রচনা করা যায় না। অপেক্ষা কেবল যোগাযোগের। এই

বেনারসী শাড়ী
ইস্তিয়ান সিল্ক হাউস
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা

অনুকূল যোগাযোগের দুর্লভ লগ্ন কাননের শিল্পীজীবনে এসেছিলো।' 'প্রতিভা যাহা স্পর্শ করে তাহাই সোনা হইয়া ওঠে।' বঙ্কিমচন্দ্রের এই কথাটি কাননের ক্ষেত্রে আশ্চর্যভাবে সত্য হয়ে উঠেছে। সে কখানা রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়েছে অথবা কি উদ্দেশ্যে গেয়েছে সেটাই তার গান সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় কথা নয়। যে কটি গান সে গেয়েছে তার ওজন, মর্মগ্রাহিতা একসপ্রেশনের অনন্যতা সে গানে এমন একটা স্বতন্ত্র মর্যাদা সৃষ্টি করেছে যাকে না মেনে উপায় নেই। এ স্বাতন্ত্র্য তার অননুসাধারণ প্রতিভাজাত সম্পদ। হীরকদ্যুতিকে কেউ অস্বীকার করতে পারে কি? সে দ্যুতি ছোট এতবড় হীরেরই হোক কিংবা মস্তবড় হীরে থেকেই বিচ্ছুরিত হোক না কেন। কানন দেবীর রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রথম দীক্ষা আপনারই কাছে ত—তাই এ বিষয়ে আপনার ধারণা ও মতামত দিয়েই এ নিবন্ধ সুরু করতে চাই।

'মুক্তি' কথাচিত্রের সময় কাননকে গান শেখানোর সুযোগ আসে আমার। তার আগে অবশ্য একটা রেকর্ড ও আমার সুরে করেছিলো। রবীন্দ্রসঙ্গীতের শিক্ষা তার সেই সময় থেকেই। সেই সময় তার শিল্পী-জীবন সার্থকতার দিকে মোড় নিচ্ছে। তার মানসপদ্মের পাপড়িগুলি যেন একটি একটি করে দল মেলছে। ও গ্রহণ করতে পেরেছিলো। মেয়েদের মধ্যে সী ইজ দি ফার্স্ট সিংগিং স্টার ইন নিউ থিয়েটার্স— এই হিসেবে যে ওর অনুভব ছিলো, গানের শিক্ষা ছিলো, অতুলনীয় কণ্ঠ ছিলো..... সবার ওপর ছিলো শিল্পীর অন্তর্দৃষ্টি। কবির কাছে শিখের শেষে গানটি নিজের সুরে গাইবার অনুমতি ভিক্ষা করতে যখন বাই উপরি-পাওনা হিসেবে তিনিই 'আজ সবার রঙে' ও 'তার বিদায় বেলার মালা-খানি' গান দুটি ঐ ছবিতে ব্যবহার করার উপদেশ দিলেন। এবং উনিই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এ ছবির নামকরণ করলেন 'মুক্তি'।

এ দুটি সংবাদ পঙ্কজবাবুর—নিবন্ধে ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে। পুনরুল্লেখ করলাম এই কারণে যে রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিধাতাই হয়ত চেয়েছিলেন কানন দেবীর কণ্ঠে এ সঙ্গীত ধ্বনিত হোক তা না হলে এ হেন যোগাযোগ ঘটলো কেমন করে?

প্রসঙ্গের পঙ্কজবাবু আরও বলেছিলেন, ও দুটি গান প্রয়োগের অনুমতি পেতেই আমার কাননের কথাই মনে এলো'—পঙ্কজবাবু বলে চললেন 'আমি যখন ওকে বোঝাতাম 'আজ সবার রং-এ রং মেশাতে হবে' ছোলির গান নয়, পূজোর গান। মনে কর প্রশান্ত তোমার স্বামী ('মুক্তি' চিত্রে) সে একজন শিল্পী। তার তুলি থেকে সাতটি রঙের যে রং ফুটবে সেই রংয়ের উত্তরীয়খানি দেখবার জন্য তুমি ব্যাকুল। তুমি যে তার সহধর্মিণী, তাই তার শিল্পী-সত্তার নানা রংয়ের বিকাশেই তোমার আনন্দ। 'সেই রাতের স্বপ্ন ভাঙা—আমার হৃদয় দোলনা রঙা' কেন রাঙ্গা হবে? না, 'তোমার হৃদয়েই গৌরবে'।

কানন খুব মন দিয়ে শুনতো। ওর বিরাট দুটি চোখ কেন স্বপ্নে ভরে উঠতো, সেই মন নিয়ে গাইতো। তাই আজও সেইসব গান তোমাদের মন ভরাতে পারে।

শিল্পীমন বলে একটা কথা আছে। কানন সেই মনের অধিকারী। কোনো গান শেখবার আগে সে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানান প্রশ্ন করে সে গানের মর্মের ভাষা বুঝতে চাইত। এমন জিজ্ঞাসু মন আমি দেখিনি আর কেমন করে শিখতে হয় সেটা আমি কাননের কাছে শিখেছি। একটা উদাহরণ দিচ্ছি। বিহারের ভূমিকম্পের সময় একবার এক চ্যারিটি শোতে ওকে আমি স্টেজে গাইতে বললাম। ও ছোটো মেয়ের মত কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, 'এখানে আমি কি গাইব?' আমি বললাম, 'তোমার ঐ সুন্দর প্রশ্নটির মধ্যে তোমার সমাজসচেতন শিল্পীমন কথা বলেছে।' ও তো ইচ্ছে করলে কোনো ফিল্মের গান গেয়ে অনায়াসলব্ধ হাততালি নিয়ে চলে আসতে পারত? কিন্তু ঐ যে ওর মনে হোলো এই পরিবেশে, এই পট-ভূমিকায় আমি কি গাইব? এখানে ত ফিল্মের গান চলবে না। এইখানেই ও প্রকৃত শিল্পী।

এইত গেলো ওর প্রকৃতির খবর। তাছাড়া প্রথমের দিকে ভালো ওস্তাদের কাছে শিক্ষার দরুন ওর গলার বেস ছিলো ভারিক্কি। উচ্চারণও ছিলো স্পষ্ট এবং সুন্দর।

কানন দেবীর গানের প্রসঙ্গে প্রবোধ শান্তিদেব ঘোষও বলেছিলেন 'ওঁর শিক্ষা হয়েছে ভালো লোকের কাছে। সেই শিক্ষার গুণগুণ ওঁর গানে পাওয়া যায়।

তারপর কতদিন, কি নিভৃত মুহূর্তে কি কোলাহলের মধ্যে কানন দেবীর রেকর্ড শুনেছি আর ভেবেছি কি যাদু আছে ওঁর গানে? ওঁর পূর্ণকণ্ঠের (ফুলথ্রোটেড ভয়েস)। শিক্ষার গুণে? না দরদ? যখনই যে গান গেয়েছেন রসোত্তীর্ণ ত হয়েইছে এবং সে রস যেন গহনসঞ্চারী প্রাণরসের মত মর্মের মধ্যে প্রবাহিত হয়ে এক অনাস্বাদিত মাধুর্যে মন ভরে দিয়েছে। 'আমি বনফুল গোর মত ছড়াজাতীয় গানও যেন ওঁর কণ্ঠের মোহাগস্পর্শে প্রাণ পেয়েছে।

একদিন ওঁর রেকর্ডের সুরূপ নিয়ে শুনতে বসেছিলাম আধুনিক, চিত্রগীতি, ঠুংরী, দাদরা থেকে সুরু করে রবীন্দ্র-সংগীত সব গানই আপন আপন বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত। রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভাবমাধুরী কানন দেবীর তুলনাবিহীন কণ্ঠে যে উতলা আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলো তারই রেশ আজও অবিস্মরণীয় হয়ে আছে শ্রোতাদের মনে। 'আজ সবার রঙে' কি সবার মনে এমন রং ছড়াতে পারতো যদি না ঐ যাদু কণ্ঠে অনুরণিত হোতো? 'বিদায় বেলার মালাখানি' 'আমার হৃদয় তোমার আপন হাতের দোলে', 'তোমার সুরের ধারা' 'আমার বেলা যে যায়', সেদিন দুজনে এমনি কত গান ভাবে সুরে, অনুভবের গভীরতায় মনকে যেন কোথায় নিয়ে যায়? 'তার বিদায় বেলার মালাখানি'র কথাই ধরি। গান সুরু হোলো যেন জমাট স্তব্ধতার মধ্যে। সযত্নরুদ্ধ নিভৃত বেদনাকে ব্যক্ত করার সসংকোচ মাধুর্যে। তারপর আত্মাহারা চিত্ত অজান্তে কখন কোন মাঁড়ের সূক্ষ্ম শ্রুতিতে, অস্ফুট গুঞ্জনের ভাষায়, (বুকের কাছে পাল পলে) কোথায় কোন পর্দার ওপর আলতো ছোঁয়া লাগিয়ে কোথাও জোর দিয়ে ব্যঞ্জনার কি ভারে (গন্ধ তাহার ক্ষণে ক্ষণের পরই ভা-আ-গে তে) উদ্গত অশ্রুরোধের ক্ষণবিরতি। পরমুহূর্তেই যখন বার সপ্তকে (ফাগুন সমীরণে) পৌঁছয়, মনে হয় যেন কত রংবাহারের ঝিকিমিকি, আলো, রং, ছায়া মিলে লক্ষ কোটির নানারঙা আলো, ছড়িয়ে দিয়েই মিলিয়ে গেলো। কানন দেবীর গান যতবারই শুনি 'ক্যালিডোস্কোপিক বিউটি' কথাটা মনে আসে। সে কি তাঁর ডাইনামিক একসপ্রেসনের কারণে?

ক্লাসিক্যাল গানের কোনো এক শীর্ষ-স্থানীয় শিল্পী কানন দেবী ও লতা মঙ্গেশকরের গলার তুলনা করে বলেছিলেন দুজনের একজাতের গলা। কিন্তু লতার গলার যে লিমিটেশন আছে কানন দেবীর কণ্ঠে তা অতিক্রম করে অলংকৃত হয়ে উঠেছে। দুজনের গলাই উঁচু সুরে বাঁধা। কিন্তু কানন দেবীর কণ্ঠে সুর যেন মহামূল্য বেনারসী সাড়ীর মত ঝলমলো। লতার গলা একটু পাতলা। কিন্তু কানন দেবীর ভরাট এবং গাম্ভীর্যপূর্ণ। লতা মঙ্গেশকরের গলা সময় সময় একটু শ্রিল্ শোনায়, যদিও সেটা শুনতে ভালই লাগে। কিন্তু এই শ্রিলনেস কানন দেবীর গলায় সুস্থ হয়ে যেন পালিশের মত ঝকমক করছে। আর কি অরনামেনটেশন।

এই 'অরনামেনটেশন' কথাটি আমার মনকে খুব স্পর্শ করেছিলো। যখন গান বুঝতাম না তখনও একটা নাম-না-জানা ভালো লাগার দরজায় দাঁড়িয়ে মুগ্ধ হয়ে শুনতাম ওঁর গান। শুনে মনে হোতো প্রতি চরণের প্রতিটি শব্দের সঙ্গে অলক্ষ্যে যেন ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকের মত নানা যন্ত্রের অর্কেস্ট্রা বেজে উঠছে। সে কি ঐ অরনামেনটেশনের ফলশ্রুতি?

কানন দেবীর কণ্ঠে আবেগের তীব্রতা ফুটে ওঠে পঙ্কজবাবুর ভাষায়। হীরক-দ্যুতির মত, তবু মাধুর্যের অভাব ছিলো নাত। ঘোলা গলা, কিন্তু কাঠিন্য নেই এতটুকু। 'এতদিন যে বসেছিলেম গানটির অন্তরায়

'গন্ধে উতল হাওয়ার মত

উড় তোমার উত্তরী

স্বর্গে তোমার কুঞ্চড়ার মঞ্জরী'—

কানন দেবীর দীপ্ত অগ্নিশিখার মত কণ্ঠস্বর কি রসিক শ্রোতা কোনোদিন ভুলতে পারবে? না ভুলতে পারবে 'মঞ্জরী' কথাটির উচ্চারণের সৌন্দর্য? মন্+জরী—এখানে ব্যাকরণের ভাষার বিপ্রকর্ষ হয়ে গেছে। তাতেই যেন মঞ্জরীর দোদুল্যমান রূপটি ফুটে উঠেছে।

এই রকম ছোট্ট কাজ, সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে যেমন গীতিকারের মধুরতা—আবার ওস্তাদের

পর্দায় পৌঁছলে সেতারের সাতটি তার বেজে ওঠার ধ্বনি-মাদকতার সমন্বয় ঐ একটি কণ্ঠেই মেলে। রেঞ্জ এবং ভল্যুম দুটি সম্পদেই তিনি ঐশ্বর্যময়ী।

ওস্তাদ আলা রাক্কা, কৃষ্ণচন্দ্র দে জ্ঞানদেব চট্টোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, হাইচাঁদ বড়াল, দীলিপকুমার রায়, অনাদি দস্তিদার, পঙ্কজ মল্লিক প্রমুখ গুণীদের শিক্ষার পরিমার্জিত তাঁর বিধিদত্ত কণ্ঠ, সুরের আরোহ, উচ্চারণ, সর্বোপরি শিল্পীর আপনহারা অনুভবে ডুবে প্রত্যেকটি গানই যেন রং ও রসের সমুদ্রে স্নান করে উঠেছে।

'সবার রাঙা' ও 'বিদায়বেলার মালাখানি' দুটি বিপরীতধর্মী ভাবের গান তাঁর কণ্ঠে যেমন গভীর মাধুর্যে লীলায়িত, তেমনই 'আমার বেলা যে যায়' ও 'আমার হৃদয় তোমার আপন হাতের দোলার একটিতে আত্মসমর্পণের আবেগ ফুটে ওঠে। অন্যটিতে দার্শনিক ভাবের ধ্যানস্তব্ধতার অতল মৌনতা গোধূলির রাঙা আলোর রহস্যমধুর হয়।

'প্রাণ চায় চক্ষু না চায়'-এর মত হাল্কা মেজাজের গানে প্রেমিকার অন্তরে ও বাইরে বিপরীত ভাবের রূপবর্ণনায় কৌতুকের সূক্ষ্ম সুরটি অনুভব করা যায়। 'মর্মে যে বেদনাধ্বনি'-তে মন্দ্রসপ্তকের প্রান্তে অস্ফুট স্বরে আত্মগোপনের বিরতির পরই পূর্ণ আবেগে 'মাল্য যে দর্শাছে হায়'-এর উচ্চগ্রামে পৌঁছেই (যে পর্দায় যাওয়া রীতিমত আয়াসসাধ্য) আবার 'শয্যা যে কণ্টকশয্যা'-তে যখন নেমে এলো মনে হোলো সুরের লীলাবিহারিণী যেন খেলার ছলেই এক লাফে আকাশ ছুঁয়ে এলো। গলার ওপর কতটা দখল থাকলে এ-বস্তু সম্ভব—সংগীতরসিক মাত্রেরই তা জানা।

'রবীন্দ্রসংগীতকে এমন একান্তভাবে ভালবাসতে পারলেন কেমন করে?'—'সুরের আগুন'-এর জন্য সাক্ষাৎকারে এইটেই ছিলো কানন দেবীর কাছে আমার প্রথম প্রশ্ন।

'একান্তভাবে কথাটা আমার ক্ষেত্রে খাটে না। অন্ততঃ যখন রবীন্দ্রসংগীত গেয়েছিলাম, তখন একথা বলা চলত না। বরং এখন এই মুহূর্তে বলতে পারি—ক্ল্যাসিক্যাল গান বাদ দিলে রবীন্দ্রসংগীত ছাড়া শোনবার যোগ্য গান নেই। অবশ্যই নজরুল, অতুলপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলালের মত কয়েকজন মর্মী স্রষ্টার গান ছাড়া।

'এখন গানের জগৎ থেকে ছুটি নেবার পর যে-কথা বলতে পারেন—দোর্দণ্ডপ্রতাপে রাজত্ব করবার সময় সে-কথা বলতে পারতেন না কেন?'

সে-প্রশ্নের জবাব পরে দিচ্ছি। তার আগে একটা কথা জানিয়ে রাখি সংগীতের ক্ষেত্রে আমি একেশ্বরবাদীতে বিশ্বাসী নই, এখানে আমি বহুবল্লভী। সংগীত যদি একটা সমুদ্র হয়, তবে প্রতিটি ঢেউ-এর দুরন্ত উচ্ছ্বাসে দোলায় দুলতে আমার যতখানি ভালো লাগে, ঠিক ততখানিই ভাল লাগে নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের শান্তরূপের অতলে তলিয়ে যেতে। জ্যোৎস্না রাতে যখন সমুদ্র থেকে বেলাভূমি অবধি আলোয় ভেসে যায়, তখন সমুদ্রতীরে বসে থাকতে ভাল লাগে না কার? কিন্তু জ্যোৎস্নাহীন রাতে আঁধার-কালো প্রকাণ্ড ঢেউগুলো যখন আলোর মুকুট পরে নাচতে নাচতে এসে তীরের বুকে ভেঙে পড়ে—আমার যে কি দারুণ থ্রিলিং লাগে বলতে পারি না। আর ঢেউ-এর এই ওঠাপড়া, অন্ধকারের জোয়ার আলোর নূপুরে বাজানো জ্যোৎস্না-রাত—এই সব মিলিয়েই মহাসমুদ্র।

সংগীতের ক্ষেত্রেও তাই। রবীন্দ্রসংগীত গাইতে আমার ভালো লাগতো নিশ্চয়ই; কিন্তু সে-সময় অন্য যেসব গান গাইতাম সে-সব গানের ওপরও আমার কিছু কম আকর্ষণ ছিলো না। মুস্কিল কথাই ধরুন। এ-ছবিতে পপুলার হয়েছিলো 'আজ সবার রং-এ'। কিন্তু আমার গাইতে অনেক বেশী ভালো লাগতো 'ওগো সুন্দর' (সজনীকান্ত-বাবুর লেখা)। ও-গানটা যেন আমায় হন্ট করতো.....

কাননদেবীর কথার সঙ্গে সঙ্গে অন্তঃস্থিতে যেন বেজে উঠলো—

'আঁধারে আলোকে যুগ যুগ ধরি প্রিয়
বিরহমিলনে চিরদিন জানাজানি'

এখানে বিরহের 'র'-তে জোর দিয়ে দিয়ে 'মিলন'-কে আলতোভাবে ছুঁয়ে 'জানাজানির শেষে ছোট মাঁড়ের উদ্দাম টানে যে উদাসী ব্যাকুলতার যে চকিত আভাস ঝলকে ওঠে, তার তুলনা কই?

কিন্তু এখানে আমারও কিছু বক্তব্য আছে। 'ওগো সুন্দর' গানটির বক্তব্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের কি কোনো তফাৎ আছে?' ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া-আসা-র বার্তা নিয়েই ত রবীন্দ্রসংগীত ও রবীন্দ্র-সাহিত্য। অন্য গান বলতে যদি আধুনিক বা ভাবসংগীতকে বোঝান—তবে তার নাম দেওয়া যাক 'সমসাময়িক কালের গান'। রবীন্দ্রনাথ ও তার বাইরে নন।'

'আমিও ত সেই কথাটাই বলতে চাই এঁরা সবাই মিলে একটি পরিবার—রবীন্দ্রনাথ তাদের গুরু। তোমরাই রাবীন্দ্রিক অমুক, তমুক বলে গানের জগতে পার্টিশন করা ছোট ছোট ঘর তুলে—সিভিল-ওয়ার বাধিয়ে তুলতে চাও। আমি সামান্য মানুষ। রবীন্দ্রনাথকে বোঝবার মত বিদ্যাবুদ্ধি কোনোটাই নেই। শুধু এইটুকুই বুঝি ভালবেসেছি সবার ছোঁয়া বাঁচিয়ে চারদিকে স্বতন্ত্র দেয়াল তুলে—নিজের শ্রেষ্ঠত্বের ধ্বজা উঁচিয়ে তিনি নেমে চলেননি। 'সব ঠাঁই মোর ঘর আছে' সেই ঘরই সারাজীবন ধরে খুঁজেছেন। নানা রাগ, নানান ছাঁদের গানের অন্তরালোকে-ছিলো যেন তাঁর অবাধ অনাসোনা। তবেই পুলক রোমাঞ্চ আবেশ ও আনন্দ ছড়ানো কবির গানে।

'এই ত বেশ বলছেন। তাহলে এতক্ষণ ধরে এ অধমের সঙ্গে ছলনা করছিলেন কেন যে রবীন্দ্রসংগীতের প্রতি আপনার বিশেষ কোন আকর্ষণ ছিলো না?'

'ছলনা ঠিক নয়—মানুষে অনেক সময় অনেক গোপন বেদনার তাগিদে অনেক কথা বলে ফেলে যার—সবটা সত্যি নয়। আবার—এ অন্তর্দৃষ্টি সবসময় সে নিজেও সচেতন নয়। কিন্তু সে প্রসঙ্গ থাক—'

থাকবে কেন—কবির গানকে ভাল-বেসেছেন—সে কথা স্বীকার করতে এত কুণ্ঠা কিসের?'

'কুণ্ঠা হয় কি সাধে? মনে আছে ভুলাদা ('প্রশান্ত মহানবিশ) একবার আমাদেরই আত্মীয়ের কবির একখানি ছবি তাঁর অটোগ্রাফ করে এনে দিয়েছিলেন। তাই নিয়ে উঁচু মহলে তুমুল পুলকোচ্ছ্বাস ঝড় উঠে-ছিলো—কেন একজন চিত্রতারকার কাছে কবির নিজের হাতে স্বাক্ষরিত ছবি থাকবে? কোলকাতা থেকে অনেকে ট্রাংক কল করেও তাঁকে উত্যক্ত করেছেন। সেই প্রথম নিজের ওপর ধিক্কার এসেছিলো—আমি অযথাই মানুষটার অশান্তির কারণ হলাম। তাকে না তা সাময়িক। হলাম ত ঠিক সেই মুহূর্তে মনে হয়েছিলো—রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর গান আমার মত সমমনা মানুষের জন্য নয়। ও সম্পদ মুষ্টিমেয় কয়েকজন জ্ঞানীর জন্য। যা আমার নয় তার জন্য লোভ করবার দরকার কি? তারচেয়ে পরীরের সাগ্যে যেটুকু জল কাড়া ছোটে তাই নিয়ে খুসী থাকাই ভালো।'

'তারপর?'

'তারপর—এক-একটি ছবির জন্য যখন মাঝে মাঝে রবীন্দ্রসংগীত গাইতে হোতো তখন নিজের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব চলতো। একটা—অনামী অভিমানে সারা হৃদয় ছেয়ে আসত। এ অভিমান কেন? কার ওপর? তাও ঠিক বুঝতাম না। অথচ এ গান গাইব না—এমন কথা ত বলা যেতো না। তারপর সেটা স্পর্ধার মতই শোনাবে। —অতএব গাইতে হোতো। সে এক মজার অনুভূতি। গাই না গাইতে সঙ্কল্প করতাম—আমারই বিদ্রোহী মনের বক্র-ভাব উদ্ধত অভিমান কোন মন্ত্রবলে যেন গলে যেত

অদ্ভুত ঠেকে। কোন এক ছাত্রকে দেখে যেন কণিকের জন্য প্রবেশাধিকার পেতাম। মনে হোতো আমার মনের কথাটিরই কি আশ্চর্য সুন্দর প্রকাশ। আমার কথাটির মধ্যে কেউ যেন আবার ইলোইজমের ফালাসি করে না বসেন। আমি বলতে চেয়েছি—আমাদের সকলের মনের কথা। গান গাইবার সময় নিজেকে হারিয়ে ফেলতাম। এই মুহূর্তে মনে পড়ছে এই সন্দিগ্ধ সময়ে তার গানটি। 'এই জনমে ঘটলো মোর জন্ম-জন্মান্তর'—গাইবার সময় গায়ে যেন কাঁটা দিয়ে উঠতো। জীবনে আর্তাভিতেই এক-একটা বৈপ্লবিক চেতনা আসে। উপলব্ধির সেই পূর্ণিমা-লগ্নে মনে হয় যেন অন্তর্বিহীন বেলা-পাথার পেরিয়ে এক জ্যোতির্ময়ীর সামনে এসে দাঁড়ালাম। এতদিন এ জনমে পার হওয়া যায় না—হয়ত যে হৃদয় এতো তারই করুণা। নিশ্চয় ও গহনের যেন হাত ধরাধরি করে চলে এই করুণাবই প্রসাদে।...আমার গান শেষ হবার পর সম্বিৎ ফিরে এলেই চমকে উঠতাম এ কার গান গাইলাম? এ গান ত আমার গাইবার অধিকার নেই। তাহলে এত অভিভূত হলাম কেন?—নিজের সঙ্গে যেন লুকোচুরী খেলা চলতো।'

এবার অনামনস্ক হবার পালা আমার। এমন ভক্তিনত চিত্ত বলেই কি 'তিমির দুয়ার খোলো' আমাদের যাত্রা হোলো সুরু? হেমার সুরের ঘরার গানগুলি তাঁর কণ্ঠে এমন অনুপম মাধুরীতে বিকশিত? সে কোনো রবীন্দ্রসংগীত যখনই তাঁর কণ্ঠে শুনেছি মনে হয়েছে এ যেন একান্তভাবে কানন দেবীরই গান। তবু তিনি বলছেন—রবীন্দ্রসংগীত তাঁর কাছে একমেবাদ্বিতীয়ম নয়?

'আপনার নিজের প্রোডাকশনেও ত আপনি রবীন্দ্রসংগীত ব্যবহার করেছেন। তবু এ গানের ওপর এত অভিমান?

'প্রোডাকশন করবার অনেক আগেই আমার অভিমানের বদলে তাঁর আশীর্বাদের মালা পাওয়া হয়ে গেছে।'

'কেমন করে?'

সে এক স্মরণীয় ঘটনা। হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানীতে রবীন্দ্রনাথ রেকর্ড করতে আসছেন শুনে অগণিত মানুষের ভীড় জমেছিলো। দর্শনার্থীদের মধ্যে আমিও একজন। ভূলাদার ভাই বুলা আমায় সঙ্গে করে তাঁর কাছে নিয়ে গেলেন। প্রণাম করতেই চিবুক ধরে আদর করে বললেন 'কি মিষ্টি মুখখানিরে তোমার? তুমি গান গাইতে পার?' ওখানেই অনেকে বলে উঠলেন স্বহস্তের ছাপতে আপনার একটি দুটি গান দেয়ার ও চারিদিক ভালোয় ভরে গেছে?' উনি হেসে বললেন, 'তাই নাকি? আমাকে একদিন তোমার গান শোনাও।' তারপর ভূলাদার ভাইকে ও আমাদের (সবে) বললেন, 'ওকে একবার শান্তি-নিকেতনে নিয়ে এস। খুব ভাল করে শেখ।' সেই মহাপুরুষের স্নেহ-করা দৃষ্টি ও স্পর্শের সামনে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছিলো যেন—আমার সমস্ত দান করছি—

এরপর মনের মধ্যে আর কোনো অভিযোগ অভিমান কিছুই ছিলো না। মনে হোলো তিনি আকাশ আর সে আকাশ এতই উচুতে যে কোনোরকম দাবিদাওয়ার প্রশ্ন সেখানে পৌঁছতেই পারে না। অন্তর্যামী বলেই বুঝি। আমার মত অনাত্মীয়দেরও কাছে এসেছিলেন সকল দুঃখকে শুভ্র করে দিতে। এ ঘটনার পর তাঁর গান গাইতে গেলেই মনে হোতো...

'থামলেন কেন?'

'নয় থাক। বড্ড সাজানো কথা বলে মনে হবে।'

'আপনি সাজানো বাগানো পোষ্যের ধার ধারেন না—আপনার ভক্তমাত্রেরই এ খবর জানা। তবু যদি কেউ ভাবেন সে ধারির আপনার নয়।'

মনে হোতো যেন তাঁকেই শোনাচ্ছি। অবশ্য এরকম ধারণার মূলে পংকজবাবুর অবদানও বড় কম ছিলো না। রবীন্দ্রসংগীতে প্রথম দীক্ষা ওঁরই কাছে। আর ওঁরই কাছে আমার প্রথম শেখা গান 'আজ সবার রং-এ'। শেখাবার সময় কি সুন্দর করে যে তিনি রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর গানের দর্শন বুঝিয়ে দিতেন। এছাড়া উনি সব সময় আমায় স্মরণ করিয়ে দিতেন মনে রেখো মুক্ত কণ্ঠচিত্তেই তুমি প্রথম রবীন্দ্রসংগীত শোনাবে অগণিত মানুষকে আর শোনাবে সেই গান যে গান স্বয়ংস্কৃত আবেগে কবি উপহার দিয়েছেন ও ইঙ্গিতে গাইবার জন্য। এতবড় অধিকারের অমর্যাদা যেন না ঘটে। মনে রেখো তোমার জন্যই কবি এই গান দুটি দিয়েছেন।'

'আমার জন্য যেন বলছেন?'

'নইলে তোমায় দিয়ে গাওয়াবার কথাই বা আমার মনে এলো কেন?'

'পংকজবাবু শুধু বড় শিল্পীই নন' শিল্পী ছাড়াও শিল্প সম্বন্ধে যে বাস্তববোধ থাকলে—একথারে গান গাওয়া ও শিক্ষা দানের নিশ্চিত সার্থকতায় পৌঁছানো যায় সেই বাস্তববোধ ছিলো বলেই পংকজবাবুর গাওয়া এবং শেখানো প্রতিটি গান যুগের সীমা অতিক্রম করতে পেরেছে। রবীন্দ্র-সংগীত গাইবার দায়িত্ব সম্বন্ধে এমন সচেতন হয়ে উঠতে পেরেছিলাম বোধহয় পংকজবাবুর বারবার উচ্চারিত সাবধান-বাণীর জন্যই। নিখুঁত উচ্চারণ সুরের প্রতিটি শ্রুতির স্পষ্টতা ছাড়াও গলার স্বরের বিভঙ্গে কোন পর্যায় কি সেন্টিমেন্ট এসব দিকেও ওঁর সদাসজাগ দৃষ্টি থাকত।'

এখনই যে বাস্তববোধের কথা বললেন, সেটা কি রকম? আর গান গাইতে গেলেই কবি শুনেছেন মনে হবার দিকেটা আর একটু স্পষ্ট করেন না?'

প্রশ্নের পংকজবাবু বলতেন কোনো গান গাইতে হলে সে গানের রচয়িতা কি বলতে চাইছেন বুঝে নিতে হবে। মনে কর কবি এ গান দুটি দিয়ে যে কথা বলতে চান—তা তোমারই জন্য। দুজনের এই আন্তরিক-ভাবটি নিবিড় না হলে গানে সুর লাগে না। গানের যেটুকু যে বলছে সে যেটুকু আর যাকে বলছে সে। উনি ভারী সুন্দর একটা রূপক বলতেন। একটি ছায়ের মেয়ে যেন কিছুটা লেখাপড়া শিখে শ্বশুরবাড়ী গেছে। সে যে লেখাপড়া জানে একথা তার স্বামী ছাড়া কেউ জানেন না। একবার স্বামী গেছেন বিদেশে। যাবার সময় স্ত্রীকে বলে গেছেন পঞ্চকাল বাদে ফিরবেন। পঞ্চকাল গেলো। কিন্তু তিনি ফিরলেন না। মেয়েটি তখন দুই পংক্তির একটি কবিতা লিখে শ্বশুরকে দিয়ে বলল—বাবা দেখুন ত এটা ওঁর খুব দরকারী কাগজ অথচ নিয়ে যেতে ভুলে গেছেন। আসতে যখন দেরী হচ্ছে পাঠিয়ে দিন। কাগজে লেখা ছিলো—

'মন পাখি বলে মন সঁপেছিনু তোমা বনে
বেন পক্ষহীন তুমি নাহি জান স্বপনে।'

শ্বশুর পড়ে কিছু বুঝলেন না। কোনো দরকারী কাগজপত্র ভেবে ছেলের কর্মস্থলে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি পড়েই স্ত্রীর মনের কথাটি বুঝে নিলেন। তারপর মনে মনে উত্তর পাঠালেন—

'ভুবনে ভুবন দিয়া যাবে-চন্দ্র মিশাইয়া
রস তাহে নিহাড়িয়া ভালবাসি বরাবরে।'

'বেনপক্ষহীনের অভিযোগের' উত্তরে ছিলো।

'বনে চন্দ্র মিশাইয়া—কিন্তু এই উত্তর প্রত্যুত্তরে তারা যে বলছে সে যেকে আর যাকে বলছে সে।

পংকজবাবুর এই গল্পটি আমার মনকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিলো। তারপর থেকে গাইবার সময় অনুভব করবার চেষ্টা করতাম—কি বলেছেন এ গানের স্রষ্টা? এ গানের মধ্যে এমন কি কথা আছে যা আমার উদ্দেশ্যে লেখা?'

'কি বুঝতেন?'

'গান দিয়ে যদি সে কথা বোঝাতে না পেরে থাকি বক্তৃতা দিয়ে বোঝাবার বিড়ম্বনার মধ্যে না ঢোকাই ভালো।' —কানন দেবীর কণ্ঠে অভিমানের সুর।

'বক্তৃতার প্রশ্ন নয়। আপনার উপলব্ধিতে আমাদের ভাবকল্পনাকেও একটু শানিয়ে নেবার ক্ষীণ আশার কথাই।'

আমার কথা বোধহয় কানেই গেলো না—অনামনস্কভাবে তাঁর অপরূপ আলোছায়া-ভরা কণ্ঠে বলে গেলেন 'অধিকাংশ সময় কিছুই বুঝতাম না। সেই অক্ষমতার বেদনাকে গোপন রাখবার জন্যই হয়ত বড় বেশী তীব্র হয়ে পড়তো এক-একটা একসপ্রেশন।'

'আমাদের অভিজ্ঞতা কিন্তু তার উল্টো' অন্তরবাসী দেবতা চোখের সামনে আবির্ভূত না হলে এ আবেগ কণ্ঠে আসতে পারে না।'

'যদি এসে থাকেন তাঁর করুণাতেই এসেছেন—আমি তাঁর যোগ্য নই।

যখনই রবীন্দ্রসংগীত গাইবার মনে হোতো রবীন্দ্রসংগীতের মধ্যে সবচেয়ে বড় জিনিস রচয়িতার আত্মোপলব্ধির এসেন্টিয়াল সেন্স এমন একটা অপার্থিব সৌন্দর্যচেতনা যার তুলনা নেই। এই কথাটা যখন চিন্তার ভাবতে পারি তখনই বুঝি আমাদের কত সৌভাগ্য যে রবীন্দ্রনাথের দেশে জন্মেছি। নৈলে এমন আমার মোরা কণ্ঠস্বরে [illegible]

আঙিনায় কি এমন করে প্রত্যক্ষ করা যেতো?—

রবীন্দ্রনাথের গান নানাদিক থেকে আমাদের অন্তর্দৃষ্টি খুলে দেয়। সত্যদিন না এ দৃষ্টি খোলে আমাদের মর্মগহনে জেগে ওঠে না উপলব্ধির সেই অনন্ত-ঝঙ্কার যার ঘরে অন্তরঙ্গ চেতনার সংগে আমাদের মিলন ঘটে।

ক্লাসিক্যাল গানের প্রতি আমার প্রবল আকর্ষণ সত্ত্বেও রবীন্দ্রসংগীত বা ভাব-সংগীত গাইতে গাইতে আমার অনেক সময় এমন কথাও মনে হয়েছে যে ওস্তাদের সুর-বিলাস আমাদের অন্তরে আবেগ জাগালেও সে আবেগ স্থায়ী হতে পারে না। এইজন্য যে সে কিছুতেই ভুলতে পারে না যে সমঝ-দার শ্রোতার সাড়া তার চাই-ই। কিন্তু এ সংগীতে গুণী যেন জগতে রূপান্তরিত হন। বাইরের শ্রোতা যদি নাও থাকে নিজের মনের সংগে কথা বলারও একটা আনন্দ আছেই।

'আমি এখানে আপনার সংগে একমত নই। কেন ভীষ্মদেবের 'তব লাগি ব্যথা' বা 'যদি মনে পড়ে—শুনলে কি মনে হয় যে শিল্পী কারো বাহবা-র জন্য ব্যাকুল এ-ও তো আত্মগত বেদনার পাথারে অবগাহন?'

'ভীষ্মদেব বা আবদুল করিমের কথা ছাড়ো। ভীষ্মদেববাবু যখন গাইতেন কবির ভাষায় মনে হতো, 'যেন কেহ নাই, কিছু নাই তার সম্মুখে'। কিন্তু তা সত্ত্বেও বলব—তুমি যে গান দুটির উল্লেখ করলে রাগ-প্রধান হলেও তারা ভাবসংগীতের মধ্যেই পড়ে (এ সম্বন্ধে কোন দিবসে কাছে আর যা কিছু শুনেছি আধুনিক বা ভাবগীতির পর্যায়ে তার সুবিস্তৃত আলোচনা করব)। আমি বলতে চেয়েছি ওস্তাদি গানে বিস্ময়ের হাজারো কারুকলা ফুটে উঠলেও বুকের মধ্যে অশ্রুসায়র তেমন করে দুলে ওঠে না যেমন উঠতো বা এখনও ওঠে গলা ছেড়ে তুলতলে গাইলে বা শুনলে।

জীবনের মত সংগীতের ধর্মও গতানু-গতিকতার খাদেই গড়িয়ে চলে না। সময়ে সময়ে অনন্যসাধারণ প্রতিভার হাতে পড়ে নতুনভাবে গড়ে ওঠে। ভাবসংগীতে এমনই এক অসামান্য ব্যক্তিত্ব রবীন্দ্রনাথ।

'কথায়? না সুরে?'

'সুরেতেই। যদিও অনেক সময় আমার মনে হয়েছে তাঁর কথার কাছে সুরও যেন হেরে গেছে?'

'যথা?'

'যেমন যদি এ আমার হৃদয়দুয়ার'—এখানে হৃদয়ের স্বতোৎসারিত অর্থ কথার মধ্যেই কি সুন্দরভাবে নিবেদিত? —এই প্রথম আমার কথার কাছে সুরকে নিরর্থক মনে হয়েছে। কেন জানি না, বিদগ্ধ মহলের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে নির্ভেজাল মনের কথাটি বলার তাগিদেই বলছি কথা এখানে সুরকে ছাপিয়ে অনেক দূরে এগিয়ে গেছে। অন্যভাবে বলা যায় শুধু কথাই যা বলতে সুর তার চেয়ে বেশী কিছু বলতে পারে নি। আমার সেদিন রবীন্দ্রসদনে বড় বিস্ময় লাগে' গানটি কণিকার কণ্ঠে শুনে মনে হয়েছে সুর ও কথা যেন হরিহর আত্মা হয়ে উঠেছে। একটিকে বাদ দিয়ে অপরটিকে ভাবা যায় না। সংগে সংগে এ কথাও না বলে পারছি না কণিকা তাঁর অনুপম কণ্ঠস্বর, ভংগী, মীড় মূর্ছণা দিয়ে গানের আবেদন-টিকে যেন হৃদয়ে পৌঁছে দিয়েছিলেন।'

'রবীন্দ্রসংগীতের শ্রেষ্ঠতম আবেদনটি আপনার মতে কোথায়?'

'হৃদয়ের পরিবর্তনশীল অতি পেলব অনুভূতিগুলিকে গানের মূর্ছনার প্রতি-বিম্বিত করায়—যা রবীন্দ্রনাথ ছাড়া কেউ পারতেন না'—

'আর একটু স্পষ্ট করে'।

'আমাদের হৃদয়রাজ্যের অন্তঃপুরেই সব-চেয়ে গোপন। যেন ঘেরাটোপে ঢাকা। সে পর্দানশীনতা কতটুকুই বা ঘুচেছে? কিন্তু রবীন্দ্রপ্রতিভার স্পর্শমণি যেন এই গভীর রহস্যের পর্দা আচমকা সরিয়ে দিয়ে পরিচয় করিয়ে দেয় এমন এক আশ্চর্য অনুভূতির সংগে যা আমাদের অন্তরেই আছে কিন্তু আমরা তার খবর রাখি না। সেটা হয়েছে এত সুকুমার সুললিত ভংগীতে যে ঘোমটা খোলাটা মোটা হাতের নির্দয় কৌতূহলের স্পর্শ না হয়ে যেন দরদী হাতের আদর হয়ে উঠেছে।'

'কোন গানটির কথা ভেবে এই মুহূর্তে এমন সুন্দর কথাগুলি বলছেন?'

'অনেক গান। যেমন ধর 'কিশোর ওগো তোমারই দ্বারে'। সুরের মধ্যে যেন নাট্য-সংগীতের স্থাপত্য পরিকল্পনা। প্রথমটায় সুর হলো বিলম্বিত লয়ে—তারপর লাগল দোলের তানফেরতায় যত মাতনই লাগুক সেই মাতনের তালে তালে যখন অনেক দিন বুকের কাছে বসের স্রোত থাকি আছেতে পৌঁছয় মনে হয় ঐ কটি কথার মধ্যেই যেন ডুবে থাকি।

যেমন প্রকৃত শিল্পী অতি-জানিত পর্দা পরম্পরায় মধ্যেই এমন স্বরবিন্যাস রেখে নিয়ে থাকেন যে বিন্যাস। অতি সহজ হলেও শিল্পী হৃদয়ের কাছেই ধরা দেয়। অনেকটা যেন ইন্দ্রজাল বিদ্যার মতই। ব্যাপারটা কি দেখিয়ে দিলে জলের মতই সোজা হয়ে যায় —না দেখিয়ে দিলে সচকিত না হয়ে পারে না। এইখানেই রবীন্দ্রসংগীতে মহাকবির সংগে মহাশিল্পীর মিলন ঘটেছে।

রবীন্দ্রসংগীত বা শিল্পে যে জিনিসটি আমায় অবাক করে দেয় সেটি হলো এর প্রথার সরলতা সহজ সৌন্দর্য। মানুষ যুগ-যুগের সাধনায় শিল্পকলায় যে সরলতার সৌন্দর্যকে অনুভব করতে শিখেছে সেই সরলতা যেন কবির কাছে আপনাকে ধরা দিয়ে বসে আছে। 'বুঝেছিলেম অনুমানে ও কণ্ঠতার দিলে ধারে'—এত সহজ কথায় এত গভীরতাকে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেউ কি পারতেন এভাবে প্রকাশ করতে? এবং ঠিক এই কারণেই 'সুনীল সাগরের শ্যামল কিনারে' মনে হয় বড়ত্ত বেশী সুবিন্যস্ত সৌন্দর্যে 'তলনাহীন' যে মনে করেছেন সৌন্দর্যের তিলোত্তমাকে মূত করবার জন্য এখানে যেন খানিকটা সচেতন মনের প্রয়াস আছে খুবই ভাল লাগে। কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশী মন টানে কিছু বলব বলে এসেছিলেম। কিন্তু বলতে এসে হঠাৎ ছোট্ট একটা কথার সৌন্দর্যে বিমো-হিত হয়ে দাঁড়ানো। মুগ্ধতার আবেশ এখানে যেন ছবি হয়ে উঠেছে।

আপনি খানিকক্ষন আগে বলছিলেন রবীন্দ্রসংগীত যখন গাইতেন তখন প্রশান্ত ভাবে এ গানকে ভালবাসেননি। বেসেছেন এখন। এ কথাটা ঠিক হৃদয়ংগম হয় নি।

খুবই সোজা ব্যাপার। হৃদয়ংগম না হবার কি আছে? এক নম্বর তখন রবীন্দ্র-সংগীতের এত শিল্পী ছিলেন না এবং সেই কারণেই এত ভারাইটির গান শোনা যেতোনা। সেইজন্যই কিছুটা একঘেঁয়ে লাগতো একই ধরণের গান বারবার শোনার ফলে। দু নম্বর, সব সময় শুনতে শুনতে একটা সংস্কার গড়ে ওঠার ব্যাপারও আছে। সবচেয়ে বড় কারণ—তখন যাঁরা ছিলেন সব গীতিকার এবং সুরকার ছিলেন তাঁরা খুবই উচ্চমানের। (তুলনামূলকভাবে বলছি না কিন্তু)। আর সেই কারণেই মনকে স্পর্শ করার ক্ষমতা তাঁদের গানের ছিলো। একটা পছন্দমত আশ্রয় সহজে পেয়ে থাকে মানুষ চট্ করে অন্য কোথাও যাবার কথা ভাবে না। সুরেনদাকে পংকজবাবু, বাইরেবাবু, অজয় ভট্টাচার্য, অনিল ভট্টাচার্য, ধীরেন কুমার, শৈলেন রায় সুকুমারীদেবী, প্রফুল্ল রায়, কমল দাসগুপ্ত এবং তারও পরের গ্রুপের অনেক গীতিকার ও সুরকার অনুপম ঘটক, রবীন চ্যাটার্জি নির্মল ভট্টাচার্য (হয়ত নাম মনে করতে পারছিনা ক্ষমাপ্রার্থী)—সকলের আর্টিস্ট ছিলেন তাই ক্ষণস্থায়ী পরিধি এত বড়ই হোক আর এতটুকুই হোক তাঁদের গান বা সুর মন কেড়ে নিতো।

কিন্তু এখন? কি গীতিকার কি সুর-কার (কিছু ব্যতিক্রম অবশ্য সুরকারদের ক্ষেত্রে আছে) দুই-এর জগতেই প্রতিভার দুর্ভিক্ষ এবং সেই কারণেই কল্পনার দৈন্য দেখা দিয়েছে। তাই আজকের শিক্ষিত মন এসব গান শুনে অস্থির হয়ে উঠছেন এবং যতবেশী তিক্তবিরক্ত হচ্ছেন ততই প্রবলবেগে রবীন্দ্রসংগীত আসরে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন। সেই কারণেই বোধহয় আধুনিক গানের সুরে রবীন্দ্রসংগীতের আসরেরই এখন সবচে আকর্ষণ। আমি শিল্পীদের ছোটো করছি না। এই বাংলাদেশের মত এত সংখ্যক শিক্ষিত, সংগীতে পরিচালনার আর কোনো দেশে আছে কিনা জানিনা। 'ভাল ভাল গানের অভাবে এমন সব কণ্ঠের গানও ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। এ প্রশ্নের যথার্থভাবে সমাধান (সংগীতকারদের সমাধান জানেন কজন?) হবে-এর সুর রচনায়ও বিরাম নেই আর তার সংগে মানিয়ে অতি সম্ভ্রান্তরের কথা বলবার উৎসাহেরও অভাব নেই। যেখানে মানুষ পারসপেকটিভ হারিয়ে বসে থাকে আর কিছু বোঝাবার চেষ্টাই বিড়ম্বনা। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রসংগীত ছাড়া গতি কোথায়?

"রবীন্দ্রসংগীতের গায়কী সম্বন্ধে কিছু বলবেন ?"

"কোনো সুরকার যখন অজস্র সুরে রচনা করে যান বৈচিত্র্য সত্ত্বেও তার মধ্যে তাঁর সংগীত চিন্তার একটা ছাপ থাকেই। এইটেই তাঁর গায়কী আর আমি মনে করি যেহেতু রবীন্দ্রনাথ থাকবে সূর্যের মত তখনও একটা গায়কী থাকে এই বইটিতে মিলিয়েই রবীন্দ্রসংগীত। এই বইটিকে যিনি যতখানি ধ্বনিষ্ঠ করে তুলে রবীন্দ্র উপলব্ধির স্বাদে শ্রোতাদের মনকে পৌঁছে দিতে পারবেন তিনিই ততখানি সুস্পষ্ট রূপে গায়কী সৃষ্টির গৌরব অর্জন করবেন। রবীন্দ্র গায়কীর এই বৈশিষ্ট্য ঠিক কি সেটা বুঝিয়ে বলা কঠিন। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ করছি। মুগ্ধ হয়ে রবীন্দ্রসংগীতে আকৃষ্ট হয়ে অনাদিবাবুর কাছে রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষাতে সুরু করি।

পঙ্কজবাবুর কাছে নয় কেন ? তিনিই ত এ ক্ষেত্রে আপনার পথপ্রদর্শক ?

পঙ্কজবাবু তখন ছবির কাজ, রেডিও রেকর্ড-এর পরিচালনা ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত। আলাদা করে শেখাবার মত অবকাশ তাঁর ছিলোনা। কাছাকাছি অনাদিবাবু আমায় খুবই স্নেহ করতেন আর শেখাতেনও ভারী যত্ন করে। —মনে পড়ে উনি কোনো গান শেখাবার সময় গাইতে গিয়ে কঠি আবারোপের অত্যধিক প্রীতি ও অলংকার লাগিয়ে ফেলতেন তখন উনি হেসে বলতেন এটা করছ সুন্দর কিন্তু এখানে এ জিনিষ চলবেনা।"

"কেন চলবেনা বুঝিয়ে দেবেন ? অল্প বয়সের অসাবধানতায় স্বাভাবিক ভঙ্গিমা। সব গানেরই একটা নিজস্ব ছাঁদ আছে তাকে মাঁচিয়ে গাওয়া কর্তব্য।

এ কথা উনি বলেছিলেন আরো অনেক পরে যখন আমিও অনেক বেশী অলংকরণ করে ফেলেছি উনি তারিফই করতেন। আমি প্রশ্ন করেছি "আমি এত কাজ নিয়ে গাইলাম আপনি আপত্তি করলেন না ?"

উনি বললেন এসব কাজ গানের ভাবের সঙ্গে এত সুন্দর সংগতি রেখেছে যে আপত্তি করবার কোনো উপায় নেই। তোমার গানে এখন অসম্ভব কাছুঁয়াটি এসেছে। আর যা বলেছিলেন তা বলাই ভালো। কারণ তিনি এখন নেই। এসব কথা বলানো কাল মনে হতে পারে। যাক যা বলছিলাম আমি আজও যতখানি নিষ্ঠার সঙ্গে গাইতাম তখনও তাই। কিন্তু এই মাত্রাবৃদ্ধি অথবা কিভাবে গানে এসে আলোর সম্পদের সঙ্গে অন্ধকারের গভীরকে আলাদা করে কিনারা করে রচনা করেছেন সেসব কথা আজও মনে নেই। শুধু গায়কী রবীন্দ্রনাথের —এসব কিছু আমার কোনো প্রশ্ন না করাই ভালো। আমার কাছে ও সবের কোনো অর্থ নেই।

সকলে এত শ্রদ্ধা ও আগ্রহে আপনার গান শুনতে চান আপনি তাঁদের নিরাশ করেন কেন ?

না শ্রদ্ধা ও আগ্রহকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যই।"

"তার মানে ?"

"সব শিল্পীরই উচিত নিঃশেষ হবার আগেই কর্মক্ষেত্র থেকে বিদায় নিয়ে অনাগত যুগের শিল্পীদের তৈরী হবার জায়গা করে দেওয়া। তাদের সৃষ্টিতে যৌবনের স্বপ্নের রং জলজ্বল থাকতে থাকতে চলে এলেই সে ছবি অনাহত গৌরবে সকলের মনে আসা থাকবে। অতীত গৌরবের প্রতিধ্বনি হয়ে বেঁচে থাকায় আমার কোনো লোভ নেই। শিল্পের ক্ষেত্রে আমি অনন্ত যৌবনের ভবিতেই বিশ্বাসী।

এই প্রসঙ্গেই বলি এখন যদি গাইতাম সে গানে আগেকার বং, আবেগ মাদকতা কখনই ফুটে উঠতে পারত না। কিন্তু বিদগ্ধ-শ্রোতারা আমার বয়সের প্রতি সম্ভ্রম দেখিয়ে বলতেন 'যাঃ কানন দেবী এখনও কি সুন্দর গান।' তোমারাও ভদ্রতা করে কাগজে সুখ্যাতি করে দু-পাঁচ কথা লিখতে। তার সেইটেই হোতো আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ট্রাজিডি। শিল্পীকে শ্রোতাদের সৌজন্যবোধের উপর নির্ভর করে গাইতে হয়—এমন স্টেজে পৌঁছবার আগেই তাঁদের আসর থেকে সরে আসা উচিত। ক্ষমতার শেষপ্রান্তে এসেও মঞ্চ আঁকড়ে পড়ে থাকার সখ প্রৌঢ়ের লালসার মতই জঘন্য ও ঘৃণ্য।

শুনেছি আজকাল অনেক শিল্পী কাগজের কর্তৃপক্ষকে বাড়িভাড়া করে তোলেন কেন তাঁর চেয়ে অনেক বেশী কর্মশিয়াল দেওয়া হলো অথবা তাকে কেন যথেষ্ট পাবলিসিটি দেওয়া হোল না। শুনে এত লজ্জা করে। এঁরা ত আমারই আত্মার তুলা। কেন এঁরা ভুলে যান গান শুনে গুণগ্রাহীরা গুণের প্রতি সম্মান দেখিয়ে জয়মালা পরিয়ে দেওয়ার যতখানি গৌরব নিত ততখানি অগৌরব কলহ দিয়ে জোর করে প্রশংসা আদায় করে নেওয়ায় ? 'অপরাজিত' গল্পের কবি রাজসভার আবহাওয়ায় নীরবে মেনে নিয়ে চলে এসেছিলেন বলেই মরণমুহূর্তে অভিভূত হয়ে উঠেছিলো স্বয়ং রাজকুমারীর হাতের বরণমালায়।—এসব কথার উত্তর কবি কবেকার আগেই রেখে গেছেন তাঁর অন্তর্দৃষ্টিতে।' একটু থেমে আত্মগতভাবেই শিল্পী বলে চলেন, 'তাই মনে হয়, রবীন্দ্রনাথকে বহুমুখী প্রতিভা না বলে সর্বতোমুখী প্রতিভা বলাই ভালো। তাঁর সীমাহীন দাক্ষিণ্যে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের রাজপথগলিকেই নয় অলিগলিকেও আলোকিত করে গেছেন। সমৃদ্ধ করে গেছেন তাঁর রসালো ফুলে ফলে পাতায়।"

আপনি যে যুক্তিই দিন আপনি শোনবার মত গলা এখনও গাইতে পারেন না—একথা আমরা বিশ্বাস করি না।'

'একবারের গান আপনজনে গাইবার যতটুকুর গোপালকে (ও'র নাতি) শোনাবো বাস। সভার গান নয়'। তারপর একটু হেসে বললেন, 'এখন এত শক্তিশালী শিল্পীর সমাবেশ ঘটেছে যে এ ক্ষেত্রে গলা খোলা না হলেও রসের হানি ঘটবে না। কণিকা, সুচিত্রা, নীলিমা, মায়া, সুবিনয়বাবু, কল্যাণ বিশ্বাস, হেমন্তবাবু এবং আমার অন্যান্য ভাইবোনেরা—তাঁদের অপূর্ব কণ্ঠের আবেগ দিয়ে আজ সারা দেশের আকাশ বাতাস মুখরিত করেছেন। এঁদের স্বপনে, কল্পনায় আমিও সার্থক। আর অমৃতের কর্তৃপক্ষকে সব শিল্পীদের হয়ে আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি তাঁদের সাধনার পরিপ্রেক্ষিতে আপন আপন বক্তব্যকে নিরাসক্তক্ষেত্রে যাচাই করবার স্বাধীনতা দেবার জন্য। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অমৃতবাজার পত্রিকার অন্যান্য অনেক অবদানের মত এ অবদানও স্মরণীয় হয়ে থাকবে।'

'রবীন্দ্রসংগীতের ভবিষ্যৎ ?'

'শিল্পের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতোই। মানব প্রকৃতিতে বহুমুখী। একই বিষয়ে চিরদিন অটলপ্রতিষ্ঠ থাকতে পারে না। নানা মুখী রুচির তৃপ্তি মেটাবার তাগিদেই হয়ত বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে কিছুদিন সরে যেতে পারে। কালবিবর্তের পরই আবার নতুন প্রাণশক্তি নিয়ে' রবীন্দ্রসংগীতের রসগ্রহণে আগ্রহী হবে। 'তোমায় নূতন করে পাব বলে হারাই ক্ষণেক্ষণ।'

এই বিষয়ে আর একটি বক্তব্য, প্রথম সারির শিল্পীদের বাদ দিলে পরবর্তী শিল্পীরা সত্যিই বড় অসহায়। এ সম্বন্ধে কণিকা ও মায়ার সঙ্গে আমিও একমত।

পরবর্তী যুগের শিল্পীগোষ্ঠী গড়ে তোলার কাজে সরকারী বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান ব্যাপকভাবে এগিয়ে আসুন। অর্থ-সামর্থ্য সম্বন্ধে আনুকূল্য দিয়ে এদের উদ্যমকে সার্থক করে তুলুন। নিজেদের চেষ্টায় অনেক বাধা ঠেলে তারা এতদূর এগিয়ে এসেছেন বাকীটুকু আপনারা করলেই বা।

গত সপ্তাহে কলামন্দির ও রবীন্দ্র-সদনের দুটি আসরে তন্দ্রা ও সুমিত্রার (সেন) গান শুনলাম। দুজনেই অপূর্ব। একজনের উঁচুপর্দার খোলা গলা যাকে বলে সর্বালংকারভূষিতা। দাপটে, বিভবে একেবারে ঝলমল করছে। সুমিত্রা তার বিপরীত। শুনে তুলনা দিতে ইচ্ছে করছিলো কবিরই একটি কবিতার চরণ দিয়ে 'এসো সুন্দর নিরলংকার'। অলংকৃত সুরে কিন্তু কি মধুরে আজ ভাবসিদ্ধ। এখনই অন্তরে কত রত্ন নিশ্চয় আছে বলানী, বাণী, গীতা ঘটক। সেদিন শর্মিলা রায়ের গানও ভারী ভালো লাগলো। সবাইয়ের গান তো সব সময় শোনা হয় না। অর্ঘ্যর গান খুব প্রাণবন্ত, সুশীলের গান একবারই শুনেছি। আরো শুনতে ইচ্ছে করছিলো। ঈশ্বর এঁদের সকলের স্বপ্নকে সার্থক করুন। কোনো অবাঞ্ছিত বাধায় এঁদের তারুণ্য যেন বিড়ম্বিত না হয়। এঁদের মধ্যেই ত আমরা বেঁচে থাকব।'

কণিকা মজুমদার

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

প্রাচীন জার্মানীর ইতিহাস সম্পর্কে নতুন তথ্য :

প্রাচীন রোমের স্বনামধন্য ইতিহাসবিদ টাসিটাসকে ইউরোপের প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য লেখক মনে করা হয়। কিন্তু পশ্চিম জার্মানীর কলোন শহরের এক প্রদর্শনীর কয়েকটি মূর্তি দেখে আজকের অনেক ইতিহাসবিদ টাসিটাস লিখিত তথ্যের সাধুবত্তা সম্পর্কে নতুন করে মূল্যায়নের কথা বলছেন। টাসিটাস লিখে গেছেন যে প্রাচীন জার্মানরা ভাস্কর্য শিল্পের সন্ধান জানত না; এবং মাটি, পাথর বা কাঠ—কোনো মাধ্যমেই তারা কখনো কোনো মূর্তি তৈরি করে যায়নি। কিন্তু কলোনের প্রদর্শনীর দুটি কাঠের মূর্তি অন্ততঃ ২৫০০ বছর আগের তৈরি বলে বিশেষজ্ঞগণ মত প্রকাশ করেছেন। মূর্তি দুটি দেব-দেবীর। জার্মানীর এক জলাভূমি অঞ্চলে মূর্তি দুটি পাওয়া যায়। একই সঙ্গে তিনটি মমিও পাওয়া গেছে। সেগুলিও কমবেশী ২৫০০ বছর আগের। এই প্রাচীন বস্তুগুলি ফ্লেনসবুইগ-হল্‌স্টিন মিউজিয়মের।

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট কর্তৃক পাঠ্যবই প্রকাশের আয়োজন :

১৯৭০ সাল থেকে আজ পর্যন্ত ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টের উদ্যোগ ও অর্থানুকূল্যে প্রায় ৭০টি বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের পাঠ্যবই প্রকাশ করা হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে পঞ্চম পরিকল্পনায় প্রায় ২ কোটি ১০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। এই ব্যবস্থার ফলে আশা করা যায় যে ভারতীয় লেখক কর্তৃক লিখিত বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের অন্ততঃ তিনশখানা বই প্রকাশ করা যাবে। প্রকৃতি-বিজ্ঞান, অঙ্কশাস্ত্র, এঞ্জিনীয়ারিং, কৃষি-বিজ্ঞান ও ভেষজ-বিজ্ঞান সম্পর্কিত বইগুলি এই পরিকল্পনার প্রকাশের অগ্রাধিকার পাবে বলে জানা গেল। এই পরিকল্পনার সুযোগ গ্রহণের জন্য বাঙালী লেখক এবং প্রকাশকগণ নিশ্চয়ই তৎপর হবেন।

পুরনো পত্রিকার প্রদর্শনী :

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় মিউজিয়মের উদ্যোগে সম্প্রতি জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীতে এ-রাজ্যের পুরনো সাময়িক পত্রিকার একটি আকর্ষণীয় প্রদর্শনী হয়ে গেল। [illegible] প্রকাশিত দিগ্‌দর্শন, কবি ঈশ্বর গুপ্তের সংবাদ প্রভাকর, বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত বঙ্গদর্শনের প্রথম সংখ্যাটি, (বৈশাখ ১২৮০) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, এডুকেশন গেজেট, ধর্মতত্ত্ব, বালক, ভারতী, সাহিত্য, হিতবাদী, সাধনা, মানসী ও মর্মবাণী, বিচিত্রা, প্রবাসী ভারতবর্ষ প্রভৃতি পত্রিকা।

পরলোকে প্রবাসী বাঙালী সাহিত্যিক

প্রবাসী বাঙালী সাহিত্যিক অমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অমৃত পাঠকের একটি পরিচিত নাম। গত ৮ জুলাই তিনি লণ্ডনে পরলোকগমন করেছেন। কলকাতার এক বিশিষ্ট পরিবারের সন্তান শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের কর্মজীবন ছিল বিচিত্র এবং বৈশিষ্ট্যময়। এক সময় তিনি আসামের সবেধন সিঁড়ি সাব-ডিভিসনের এক চা বাগানের ম্যানেজার ছিলেন। ঐ সময়ের অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি 'সুবর্ণসিঁড়ি' উপন্যাসটি রচনা করেন। 'কাকীরাৎ' নামে গল্পসংগ্রহটিও তাঁর আর একটি উল্লেখযোগ্য রচনা। ঐ দুটি রচনাই 'অমৃত' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, অমৃত সম্পাদক শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যকর্ম যথেষ্ট উৎসাহ জুগিয়েছেন। সাহিত্য ছাড়াও সঙ্গীত ও সংস্কৃতির বিভিন্ন দিকেও শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুরাগ ছিল।

জরৎকার,

নতুন বই

সিকিমের আদিবাসী লেপচা—অরুণ মিত্র। এ মুখার্জি এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, ২, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা—১২। আট টাকা।

উত্তরবঙ্গের প্রত্যন্ত অঞ্চল হল সিকিম। দার্জিলিং জেলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত এই সিকিম অঞ্চল বহু উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল। এখানে আদিম লেপচা জাতির বাস। তাদের জীবনাচার, সমাজ-সংস্কার, শিক্ষা, নানা বিশ্বাস, ধর্মবোধ, আধুনিক ভিক্ষাদের সঙ্গে ভোজ—এইসব নিয়ে শ্রীযুক্ত অরুণ মিত্র তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত 'সিকিমের আদিবাসী লেপচা' নাম গ্রন্থটি রচনা করেছেন। লেপচারা শুধু সিকিমে নয়, ভুটান, নেপালেও বহুসংখ্যায় ছড়িয়ে আছে।

লেপচারা হল পশ্চিমবাংলার [illegible] উপজাতি এবং তুলশীল সম্প্রদায়ভুক্ত

প্রকাশিত হয়েছে

বর্ষপঞ্জী ১৩৮২

(২৯শ সংস্করণ)

দেশবিদেশের তথ্যে পূর্ণ বাংলা ভাষায় অসাধারণ 'ইয়ার-বুক'

বাংলাভাষায় এই শ্রেণীর একমাত্র তথ্যগ্রন্থ। দীর্ঘ ২৯ বছর ধরে সগৌরবে চলেছে। চলতি দুনিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখতে হলে বর্ষপঞ্জী চাই-ই। প্রতি শিক্ষিত পরিবার, স্কুল কলেজ ও গ্রন্থাগারের পক্ষে অপরিহার্য গ্রন্থ। 'ভারতের প্রথম আণবিক বিস্ফোরণ' এবং 'মহাকাশে ভারতের প্রথম উপগ্রহ' বর্তমান সংখ্যার দুটি রোমাঞ্চকর নতুন বিভাগ। তা ছাড়া আছে আরও ৬০টি বিভাগ।

প্রায় ৮০০ পৃষ্ঠা; মূল্য ১২ টাকা ৫০ পয়সা; ভি পি বায় স্বতন্ত্র

এস. আর সেনগুপ্ত অ্যান্ড কোম্পানি

৩৫ এ, গোয়াবাগান লেন, কলকাতা-৬। ফোন : ৩৫-৪৭৯৭

স্বভাবতই তপশীলী উপজাতি সম্পর্কে বিস্তৃত পরিচয় দিতে গেলে তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে না মিশে তা দেওয়া সম্ভব নয়। অরুণবাবু গবেষকের শ্রম ও পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা নিয়ে উত্তরবঙ্গের লেপচা-অধ্যুষিত অঞ্চলে দীর্ঘকাল কাটিয়েছেন। আলোচ্য গ্রন্থে তাঁকে একজন জাতিতত্ত্ব গবেষকের শ্রমকায় দেখে শ্রদ্ধান্বিত হই।

উপজাতিদের ধর্ম, সংস্কার, পালা-পার্বণ, সমাজ, শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়কে সচেতন গবেষকের মূল্যনিষ্ঠ মন নিয়েই দেখতে হয়। তা না হলে জাতিবিচার ও তার সমাজ পরীক্ষা অসম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক থেকে যায়। অরুণবাবুর সাফল্যও এক্ষেত্রে খুবই প্রশংসার যোগ্য। তিনি বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গে কঠিন নিরাসক্ত নিয়ে একটি বিশিষ্ট উপজাতির পরিচয় দিতে প্রবৃত্ত হয়েছেন। তাঁর কঠিন শ্রম ও মৌলিক সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই অভিনন্দনযোগ্য।

ইতিপূর্বে বিদেশী বহু জাতিতত্ত্ব গবেষক—যেমন জালটন, মরিস, রিজলে, বিউভেয়ার, এডকার, ওয়াডেল প্রভৃতি লেপচাদের জীবনচর্যার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জিজ্ঞাসুদের কাছে আলোকপাত করেছেন। তাদের ভাষা সম্পর্কে বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন গ্রীয়ারসন, মেইনওয়ারিং ইত্যাদি। বেশ কিছু বাঙালী অনুসন্ধিৎসু উপজাতি গবেষক কিছুকাল আগে পর্যন্ত লেপচা জাতির বাইরের দিকের খবর আমাদের শুনিয়ে গেছেন। শ্রীযুক্ত অরুণ মৈত্রর গ্রন্থটি সেখানে একটি উজ্জ্বল ব্যতিক্রম এই কারণে যে, এতে লেপচা জাতির একেবারে ঘরের কথার কিছু নূতন তথ্য আছে যা ইতিপূর্বে কেউ খোঁজ পাননি।

শ্রীযুক্ত মৈত্র গ্রন্থের সামগ্রিক বিষয়কে আট আটটি অধ্যায়ে ভাগ করেছেন। লেপচা জাতির উৎপত্তি ও বর্তমান অবস্থিতি, তাদের দৈহিক গঠন গৃহনির্মাণ ও অর্থনৈতিক অবস্থা এবং পেশা, লেপচাদের ভাষা, সমাজব্যবস্থা, ধর্মাচার, লোকজীবন-স্বভাব, হস্তশিল্প ও চিত্রকলা এবং সিকিমে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা—এই বিষয়গুলিই প্রধানত অধ্যায়গুলিকে সমৃদ্ধ করেছে। গ্রন্থ মধ্যে বেশ কিছু আলোকচিত্র মুদ্রিত হওয়ায় গ্রন্থের গবেষণাসুলভ মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে।

অরুণবাবুর রচনাভঙ্গি গ্রন্থটির সুখপাঠ্য হওয়ার অন্যতম শর্ত। সহজ সরল অথচ নিরাসক্ত বর্ণনাভঙ্গিমায় বিষয়বস্তু বর্ণিত হওয়ায় উপজাতি জীবনকথাটি মনোজ্ঞ হয়েছে। ইতিহাস, সাহিত্য ও সমাজতত্ত্ব একত্র হওয়ায় গ্রন্থটি লেখকের রচনা কৃতিত্বের ধারক হয়ে উঠেছে। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, সুগভীর পর্যবেক্ষণশক্তি, জাতি সম্পর্কে তাঁর অনুসন্ধিৎসু মন এবং সুবিশ্লেষিত মননসমৃদ্ধ গবেষকের শ্রম ও সততা থাকায় শ্রীযুক্ত অরুণ মৈত্র রচিত 'সিকিমের আদিবাসী লেপচা' নামের গ্রন্থটি লেপচা উপজাতির মূল্যবান দলিলে পরিণত হয়েছে। সাধারণ ও উৎসাহী পাঠক এবং গবেষক, সর্বস্তরের শিক্ষার্থী ও শিক্ষক এবং চিরকালের ভ্রমণরসিক মানুষ এই গ্রন্থটি অবশ্যই সংগ্রহ করতে আগ্রহী হবেন বলে আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস।

বীরেন্দ্র দত্ত

নদীর ঠিকানা (উপন্যাস)। প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়। জ্যোতি প্রকাশন, ২এ নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা—৯। সাত টাকা।

লেখক প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সদ্য-প্রকাশিত নদীর ঠিকানা উপন্যাসে চমৎকার কাহিনী বর্ণনা করেছেন। কালোবৌদি, তার স্বামী শংকর, আর শংকরের সঙ্গে রাগিণীর প্রেম শেষে রাগিণীর সঙ্গে শংকরের ছোটোপুরের নদী ধরে তিনমোহানার জল-জংগলের ভিতর দিয়ে এক অজানা নূতন জীবনের দিকে অভিযাত্রা এ কাহিনীর চমৎকার অন্তিম পরিণতি। কিন্তু চমৎকারিত্ব শুধু বর্ণনায় বা কাহিনীর ইচ্ছাপূরণ জাতীয় পরিণতি চিত্রে নয়, আছে রাগিণীর সর্বশেষ অন্তর্দ্বন্দ্বে। শংকরের শেষ উপহার কালোবৌদির অতি প্রিয় চেহারার রাগিণীকে দেওয়ার পর রাগিণীর যে মানসিক জ্বালা এবং সেই জ্বালা থেকে মুক্তি তথা বড় জীবনে স্বামী নিয়ে নতুন বিশ্বাস জীবনে উত্তরণের যে চিত্র লেখক এঁকেছেন তা চমৎকার।

উদ্ভ্রান্তের ডায়েরী—উদ্ভ্রান্ত। প্রকাশক—রমায়ণী প্রকাশ ভবন। ১০৬।১, রাজা রামমোহন সরণী, কলকাতা—৯। তিন টাকা।

লেখকের মোট তেত্রিশটি লেখা গ্রন্থটিতে ঠাঁই পেয়েছে। এর মধ্যে টুকরো টুকরো ফিচার 'জোক' ছাড়া সব কিছুই আছে। লেখাগুলি খুবই ছোট ছোট হলেও বিদ্যুতে সিন্ধুদর্শন করাবে পাঠককে। বর্তমান সমাজ সংসার দেশকালের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মিঠে-কড়া স্বাদের কখনও বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গির, কখনও বিজ্ঞ ভঙ্গির এই লেখাগুলি। ভাষা ঝরঝরে। প্রচ্ছদ সুন্দর।

অবক্ষয় : নিভৃতিভূষণ কুন্ডগ্রামী। প্রকাশক: বিমল কুন্ডগ্রামী, মহেশতলা, ২৪-পরগণা। চার টাকা।

একটি নিষ্প্রদীপনগরীর পটভূমিকায় এই কাহিনীর বিন্যাস। কাহিনীতে অনেকগুলিই চরিত্র এসেছে, বিভিন্ন ধরনের। কেউ স্থানীয় কেউ কেউ বহিরাগত। প্রত্যেকটি চরিত্রকে খন্ড খন্ড ভাবে দেখানো হয়েছে। কোনটিই সম্পূর্ণভাবে ধরা পড়েনি। এখানেই লেখকের ব্যর্থতা। শেষটাও যেন হঠাৎই আসে। লেখকের লিখনকুশলতা আছে। কোথাও কোথাও বৈচিত্র্যেরও স্বাদ পাওয়া গেছে। মুদ্রণ ও প্রচ্ছদ ভালোই।

সংকলন ও পত্রপত্রিকা

সাম্প্রতিক। সম্পাদক অশোককুমার মহন্তী। রঘুনাথপুর। ঝাড়গ্রাম। দাম ষাট পয়সা।

লিখেছেন স্বপন মল্লিক, মুরারিশঙ্কর ভট্টাচার্য, দুলাল ভঞ্জ, হিমাংশুশেখর বাগচী এবং আরও অনেকে। ছাপার বিষয়ে যত্ন নেওয়া দরকার।

সপ্তদীপা। জীবনময় দত্ত সম্পাদিত। ৩। ১২৪ কংকর বাগ লেন। পাটনা-২০। দাম একটাকা।

বিহার থেকে প্রকাশিত বাংলা ত্রৈমাসিক সপ্তদীপার জানুয়ারী—মার্চ সংখ্যাটি সম্প্রতি হাতে এলো। এই সংখ্যায় লিখেছেন, পূর্ণেন্দুনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, অশোক ভট্টাচার্য, কাবেরী চৌধুরী, বিদ্যুৎকুমার পাল, আনন্দ দাশগুপ্ত এবং তাপতী চৌধুরী।

অহংকার। সম্পাদনা ভাস্বতী রায়চৌধুরী। ৩৫-বি চাঁদ এভিনিউ। কলকাতা-৩৩। দাম একটাকা পঞ্চাশ পয়সা।

মণীন্দ্র রায়, তারাপদ রায়, কৃষ্ণ ধর এবং কাবিরুল ইসলামের কবিতা ভালো লাগল। শক্তি চট্টোপাধ্যায় এবং নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতার ইংরেজী অনুবাদগুলিও উল্লেখ করার মতো। গল্প লিখেছেন সম্পাদিকা নিজেই।

চিত্রজগৎ। হিরন্ময় দাশগুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত। ১।৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট। কোলকাতা-৯। একটাকা।

চলচ্চিত্র সম্পর্কিত বেশ কিছু লেখা রয়েছে যা প্রত্যেক চলচ্চিত্রানুরাগীরই চিন্তার বিষয় হতে পারে। ছাপ ভালো। প্রচ্ছদে অবিস্মরণীয় অভিনেতা প্রমথেশ বড়ুয়ার ছবি।

সারস্বত অর্ঘ্য : সম্পাদক : প্রদীপ পাল। ভূদেব স্মৃতি সংঘ, ১ কাঁসার পুকুর লেন হাওড়া থেকে প্রকাশিত।

এই সংকলনটিতে গল্প কবিতা খেলাধূলা প্রভৃতি সব বিভাগেরই লেখা আছে। লেখকদের মধ্যে রয়েছেন ডঃ রমা চৌধুরী আশা দেবী, রাম বসু, সাধনা মুখোপাধ্যায়, সিদ্ধার্থ বসু, নির্মলেন্দু ঘোষাল অলীক বাস ও আরও অনেকে।

উচ্চারণ (প্রথম সংখ্যা) : সম্পাদনা : অরুণাভ সেনগুপ্ত এবং শরৎ ধর। ২৩ই শাঁখারীটোলা স্ট্রীট। কলকাতা ১৪। দাম : এক টাকা।

গুটিকয়েক কবিতা দুটি গল্প একটি প্রবন্ধ এবং একটি ব্যঙ্গরচনা নিয়ে উচ্চারণ পত্রিকার প্রথম সংখ্যাটি আত্মপ্রকাশ করেছে। প্রথম সংখ্যার লেখকসূচীতে রয়েছেন মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়, শ্যামল সেনগুপ্ত প্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায়, বিশু ব্যানার্জি এবং আরও কয়েকজন। বেশ কিছু মুদ্রণ প্রমাদ চোখে পড়লো—এ বিষয়ে একটু যত্ন নিলে ভালো হয়।

উপন্যাস

মনোজ বসু

সেই সব মানুষ

।। ২১ ।।

স্বারিক সংবাদ নিয়ে এলেন : চাল কেটে বসত ওঠাবো—রাগের মাথায় সেই যে বলেছিলেন, নিজে থেকেই সত্যিসত্যি বসত উঠিয়ে যাচ্ছে।

বিষয়ী মানুষের কতজনের সঙ্গে কত রকমের বিরোধ—ভবনাথের তত মনে পড়ছে না। বললেন, কার কথা বলছ?

স্বারিক ছড়া কাটলেন : কচুর বেটা খেচু বড় বাড়েন তে মান। ফটিক আমাদের পুড়িকচু, তার বেটা নবনে হয়েছে মহামানী মানকচু। মানে ঘা পড়েছে—আপনাদের শরিক বংশীধর কেনাখোলায় কিনে সর্দারের দরুন জমিটা দিয়ে দিলেন, সেইখানে সে ঘর তুলবে।

ভবনাথ অবাক হয়ে বলেন, বলো কি হে। মামলায় মামলায় অঢেল খরচা করে অনেক কষ্টে জমি খাস করে নিয়েছে, খাসা কলসা জমি, আম-কাঁঠাল নারকেল-সুপারি—দিয়ে দিল সেই জমি?

বিনি সেলামিতে, আধেলা পয়সাটি না নিয়ে।

ভবনাথ বললেন, আমি তো কিছু জানিনে—

কেউ জানত না, চুপিসারে কাজ হয়েছে। বাঁশ কিনে এনে জমির উপর ফেলল, তখনই জানাজানি হয়ে গেল।

ভবনাথ গম্ভীর হয়ে গেলেন। স্বারিক আবার বলেন, বাঁশও বোধহয় বংশীধর কিনে দিয়েছে। শরিক জব্দ করতে ও-মানুষ সব পারে।

ভবনাথ শুধান : ওর বাপ ফটিক কি বলে? কথাবার্তা হয়েছে তার সঙ্গে?

স্বারিক বলেন, তার তো কেঁদে ফেলার গতিক। হুটকো গোঁয়ার বলে ছেলেকে গালিগালাজ করতে লাগল। বলে, বংশীবাবু এসে রাতদিন ফিসির ফিসির করেন—

ভবনাথ বিরস কণ্ঠে বলেন, দিনকাল বদলাচ্ছে বলছিলে না স্বারিক, সত্যি সত্যি তাই। নইলে তিনপুরুষে চাকরান প্রজা ভিটে ছেড়ে বংশীর জমিতে ঘর তুলছে—

স্বারিক বলেন, খুটোর জোরে মেড়া লড়ে। বংশীধর যে খুটো হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সে তো হবেই। ওরা আমাদের জব্দ করার ফিকির খুঁজে বেড়ায়, আমরাও খুঁজি। নতুন কিছু নয়। কিন্তু নবনে টকর দিয়ে বাস ওঠাবে—তল্লাটে তা হলে মুখ দেখাতে পারব না, আমাকেও সোনা-খোলায় ঘর তুলতে হবে।

নিচু নিচু লণ্ঠনের আলোয় দুজনের মাথায় মাথায় বসে উপায়-চিন্তা হল। পাঁচ-সাত কলকে তামাক পুড়ল। তারপর রাতদুপুরে একলা স্বারিক চুপিসারে বেরুলেন। চলে গেলেন কোনাখোলায়, কিন্তু সর্দারের দরুন সেই জমিতে। জমির উপর বাঁশ ফেলে রেখেছে। বাঁশ গণলেন স্বারিক—এক কুড়ি তিনটা। দু-তিনবার গণে নিঃসংশয় হয়ে এলেন।

পুবেবাড়ির অনেক বাঁশঝাড়। গাঁয়ের বাইরে গোয়াল বাথান নামে দ্বীপের মতন একটা জায়গা—কতক জমিতে পাট ও আউশধান আর্জায়। তা ছাড়া আছে খেজুর বাগান, পাঁচ-সাতটা ডোবা এবং ঠাসা বাঁশবন। দিনমানে স্বারিক সেই বাঁশবনে গিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখলেন, রাতে শিশুবর অটল আর একজোড়া কুড়াল নিয়ে ঝাড়ের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। ঝাড় থেকে বাঁশ কাটার সময় গোড়ার দিকে খানিক খানিক পড়ে থাকে। তবে বাঁশ কেটে নিয়ে গেছে—স্বারিক গোড়া পছন্দ করে দিচ্ছেন, শিশুবর আর অটল ছ-আঙুল আট-আঙুল এক-বিঘত কখনো বা এক হাত নিচে কেটে ফেলছে। ফাঁকা বিলে জ্যোৎস্না ফুটফুট করে, ঝাড়ের মধ্যেও জ্যোৎস্নার ফালি এসে পড়ায় কাজের পক্ষে সুবিধা হল খুব। কিন্তু ছোট ছোট বাঁশের টুকরো কোন কাজে লাগবে, মাথামুণ্ডুদের বোধে আসে না। বাড়িতেও নিলনা যে উনানে পোড়ানোর কাজ হবে। ডোবার জলে সমস্ত ধুয়ে দিয়ে খালি হাতে সকলে ফিরল।

বুধেল পরের দিন, ভবনাথের কর্মচারী হিসাবে স্বারিক যখন পঞ্জের থানায় গিয়ে এজাহার দিলেন : নবীন মোড়ল কোনা-খোলায় ঘর তুলবে, তার যাবতীয় বাঁশ রাত্রিবেলা ভবনাথের গোয়ালবাথানের ঝাড় থেকে চুরি করে কেটেছে। দারোগা এসে পড়ল, কোনাখোলায় গিয়ে জমির উপর বাঁশ দেখল, গোয়ালবাথানের ঝাড়েও গেল—সব বাঁশ কেটেছে, গোড়া দেখে যে-না সেই বলবে। গুনতিতে ছত্রিশ গেল—ঠিক ঠিক তেইশ। এর চেয়ে অকাট্য প্রমাণ আর কি হবে। বাঁদাই বা কিছু হতে হয়, ভবনাথ চোরাগোপ্তা সেটুকু সেরে দিয়েছেন। চুরির দায়ে নবীনের কোমরে দড়ি বেঁধে টানতে টানতে থানায় নিয়ে তুলল। নবীন কাকুতি-মিনতি করে, দু-চোখে জলের ধারা বয়—ভবনাথ দেখতে পান না, কানেও শোনেন না। পরের দিন নবীনের কচি বউ এসে বড়-দিদির পায়ে আছাড় খেয়ে পড়ল। পথে এসো যাদুমণিরা! ভবনাথ শুনিয়ে শুনিয়ে বললেন, তোমাদের দোষ নেই মা-জননী—তোমরা কোনরকম কষ্ট না পাও, আমি দেখব, নবনেটা মাস ছয়েক জেলের ঘানি ঘুরিয়ে আসুক। গায়ে বড্ড তেল হয়েছে, তেল কিছু শুকোনোর দরকার।

তার পরের দিন খোদ ফটিক এলো। নবীনকে সদরে চালান দেয়নি, এখন অবধি সে থানায়। বাপে-ছেলেও সামানা দেখা হল। ছোঁড়াটা খুব ঘাবড়ে গেছে। ইহজন্মে আর গোয়ার্তুমি করবে না, মানীর মান রেখে চলবে—

ভবনাথ পরিতৃপ্তির সঙ্গে শুনছেন। বললেন, ছাড়িয়ে আনার চেষ্টা দেখি তবে—কি বলো? সর্বদা তুমি শাসনে রাখবে, কথা দাও ফটিক।

ফটিক বলে, কাউকে আর লাগবে না কর্তা। দুটো দিনেই শিক্ষা হয়েছে খুব। চেহারা সিকিখানা। কান মলছে, নাক মলছে : কক্ষনো আর বংশীবাবুর কথায় নাচবে না।

কিসে কি হল—থানা থেকে ছাড়া পেয়ে রাত্রিবেলা নবীন বাড়ি এসে উঠল। কয়েকটা দিন তারপরে বেরুলেই না ঘর থেকে।

কুক্কুরের নামে চিঠি এসে গেছে। এক-জোড়া—একটা এস্টেটের তরফ থেকে, একটা দেবনাথ নিজে লিখেছেন। কলকাতায় ফেরবার জোর তাগাদা।

ভবনাথ বললেন, পড়লে তো চিঠি?

কুক্কুর বলল, পড়তে হয় না—কি আছে, না পড়লেও বলা যায়। বাড়ি আসার কথা উঠল, সেরেস্তার ভিতর তখন থেকেই চিঠির বয়ান তৈরি হচ্ছে। দর্গা, দুর্গা—বলে আমি বেরুলাম, চিঠিও সঙ্গে সঙ্গে ডাকবাকসে পড়ল। বাড়ির উঠোনে পা ঠেকাতে-না-ঠেকাতেই চিঠি এসে হাজির।

যেজার মুখে সে বলে, আসামাত্রের খোঁচাখুঁচি জুড়ে দেবেন তো ঠেলেঠুলে পাঠানো কেন? দিব্যি তো ছিলাম সেখানে।

ছিল তাই বটে—মিছা নয়। কুক্কুরের স্বভাব এই। শেষ কলকাতায় তো দারাপুত পরিবার তুমি কার কে তোমার—এই গোছের ভাব তখন। একখানা এনভেলপ কিনে কাউকে চিঠি লিখবার পিত্তেশ নেই। বলে, সরকারমশায়ের হরদম চিঠি যাচ্ছে, তাতেই তো টের পাচ্ছে যেঁচেবর্তে রয়েছি আমরা। কবে করে আলাদা আমার কি

লিখতে বাব? বরঞ্চ কেলে ছেলের কথা শুনুন একবার! বলে, এক পয়সায় তিন-খানা কচুরি আর এক পয়সার হালুয়ার একটা বিকেল ভরপেট হয়ে যায়, সে পয়সা আমাকে কেন গবর্নমেণ্টের ঘরে দিতে হবে? বলুন

আবার সেই মনুষ্য বাড়ি বন্ধ এসে গেল নড়তে আর সহজ বর্ম হয়ে না পাড়ব এ-বাড়ি ও-বাড়িও নড়তে চায় না দিনরাত ঘরের মধ্যে—লোকে বলে, বউয়ের আঁচল ধরে থাকে। চিঠি সবে তো দু-খানা এসেছে—হয়েছে কি এখনো, গাদা-গাদা আসবে। এক নজর চোখ বুলিয়ে কৃষ্ণময় কুটি কুটি করে ছিঁড়ে বাতাসে উড়িয়ে দেয় ভিড় জমতে দেয় না। চিঠির মেজাজ চড়া হতে থাকবে ক্রমশ শেষটা রোদ বড় মানিবের সইও নাটক আসবে : অমুক তারিখের মধ্যে হাজির না হলে নতুন লোক নিয়ে নেওয়া হবে প্রথম দুইশিলের এই ক্ষতি বরদাস্ত করা যাচ্ছে না।

মেজো-বউ ঘাবড়ে গেছে। বলে আর দেরি নয়—চলে যাও তুমি।

তাড়াচ্ছ?

চাকরি গেলে সমাজেই লোকে দুষবে।

কৃষ্ণময় অভয় দিয়ে বলে, চাকরি কেন হবে পাগল? ফেলে পরে না।

কিন্তু একে স্কুলের ছুটি কমবেশী—স্বামীর ও প্রবোধ মানে না। বলে, জমিদার বাবু নিজে লিখেছেন—

কখনো যে যা বলে ফেলেন। অমন কত লেখে—যাই হোক, পাকা কোনো উত্তর এখনো ভাড়াতাড়ি নয় গোপাল ছুটিতে বাড়ি এলে তার সঙ্গে একটা

বিনা অস্ত্রোপচারে
অর্শের
জ্বালা-যন্ত্রণা
থেকে
দ্রুত আরাম
পেতে হলে
প্যাডেসা
মলম
ব্যবহার করুন!

ভাল দিন দেখে দিন জ্যেঠামশায়। কলকাতা হল পশ্চিম দিক এখান থেকে—

উঁহু, পশ্চিম ঠিক নয়—দক্ষিণ ঘেঁষে গেছে। নৈঋর্ত কোণ মোটামুটি।

ভাঁটি-ভাঙা দশমা নাকের উপর তুলে গোপাল পাঁজির পাতা উলটোতে লাগলেন। ক্ষণ পরে চোখ তুলে বললেন মঙ্গলবার দশমী ১১টা ২০ মিনিট ২৫ সেকেণ্ড পরে। উত্তরে নাস্তি, তা কলকাতা বরং দক্ষিণই ঘেঁষে থাকুক।

তিথি-নক্ষত্র কেমন?

অষ্টমী তিথি, পূর্বাষাঢ়া নক্ষত্র। মন্দ হবে না।

কাদিনী?

ঈশানে, গাবড় নয়।

মাহেন্দ্রযোগ?

নেই, অমৃতযোগও নেই। সিদ্ধযোগ—চলে হবে মোটামুটি।

পাঁজি কৃষ্ণময় নিজ হাতে টেনে নিল। বলে, যাতু মধুসূদন স্মরণ জ্যেঠামশায়।

যাত্রানাস্তি তো নয়—ঘাবড়াচ্ছ কেন?

না জ্যেঠামশায় বিদেশ-বিভূঁয়ে যাওয়া—দিনটা সর্বাংশে যাতে উৎকৃষ্ট হয় আপনি তাই দেখুন।

গোপাল বিরক্ত হয়ে বলে ফেললেন অত খুঁতখুঁতুনির এখন কি দরকার—এই গোড়ার দিকে। করবার যত্ন ভাববে, তার লক্ষণাক্রান্ত নেই। পেট কামড়াবে, জ্বরভাব হবে, আসবে একবার বমনের—কত রকমের কত ভণ্ডুল ঘটে যায়। যার কাজ আলাদা ঘরে কাটিয়ে যত্ন ভোগ করবে আপন ঘরে ফিরে এসে। জানি তো তোমায় বাবা—

স্পষ্টভাষী গোপাল মিথ্যে বলেননি। এমনি সব ব্যাপার বরাবর হয়ে এসেছে। একারও হবে, সন্দেহ কি। কৃষ্ণময়ের বরেণ্যযাত্রা গাঁটখান কথা নয়।

কৃষ্ণময় রাগ করে বলে, মাথা খরচ করেন করে যে রাত হয় বুঝিনে। আপনি ভাল দিন দেখে দিন, যাই-না-যাই তখন দেখতে পারেন।

কলকাতার চাকরে বলে কৃষ্ণময়ের জন্য ইঠানের পশ্চিম দিকে পৃথক একটা ঘর—লাট শেষটা কেলেঙ্কারীর কারণ হয়ে উঠল। দুপুরবেলা খাওয়াদাওয়ার পাট সেরে তরঙ্গিণী তাকের উপর থেকে মহাভারত নামাতে যাচ্ছেন, বিনো এসে দুঃসংবাদ করে বৃত্তান্ত বলল : কাণ্ড দেখো ছোট খুড়িমা দুয়োরে খিল এঁটে দিয়েছে।

গোড়ায় তরঙ্গিণী ধরতে পারেননি। জিজ্ঞাসা করলেন : কে খিল আঁটল?

আবার কে! তোমাদের চাকরে ছেলে আর তার বউ।

তরঙ্গিণী এক মুহূর্ত অবাক হয়ে রইলেন। বিনো হাত ধরে টেনে : সাজ না দিখো দ্যাখসে এসে।

হাত ঝাড়িয়ে নিয়ে তরঙ্গিণী বলেন, ছড়ান দে বিনো। ওদিকে না গেলাম আমরা, চোখে না-ই বা দেখলাম—

বিনো বলছে, তোমার কাণ্ডজ্ঞান—আমাদের বুড়ো ঠানদিদি গো—বলতেন, তিন পোলার মা হয়ে গিয়েও ঘোমটা কোনদিন মুখ দেখতে দিইনি। রাতদুপুরে আলো নিভিয়ে ঘর অন্ধকার করে তবে ঘোমটা খুলেছেন। সেই পরেরবাড়িতে ভরদুপুরে এই বেলেল্লাপনা—দিনদুপুরে সর্বাঙ্গের সামনে বড়ম করে হুঁকো এটে দিল।

তরঙ্গিণী আমল দেন না : ওদের কথা ধরতে নেই। কেন বিনদ-বিভূঁই-এ পড়ে থাকে। কখনই বা একসঙ্গে থাকতে পায় পাঁয়ের বারোমেসে মনুষ্যের বেলা যে নিয়ম, ওদের উপর সে-নিয়ম খাটাতে গেলে হবে না।

বিনো করকর করে উঠল : বিদেশ-বিভূঁয়ে কাকামশায়ও তো থাকেন। ওদের ঘর, তোমাদেরও ঠিক তাই। কই, তোমাদের তো কোনো কথনো বেহায়পনা দেখিনি।

আমরা বলে বুড়ো হয়ে মরতে গেলাম—আমরা আর ওরা! বিনো ছাড়ে না : আজ নাহয় বুড়ো, চিরদিন তো বুড়ো ছিল না : তোমাদের নিয়ে কেলেঙ্কারি তো কখনো ওঠেনি।

তরঙ্গিণী বলেন, দিনকাল বদলেছে রে বিনো, এদের কাল আলাদা। অসহ্য ঠেকে তো তোরই চোখ বুজে থাকবি।

বিনোটা বড়কেও ছিনেন : বাড়ির কথা বাইরে না যায়। নিমিষেও ভাল করে সমঝে দিবি তুই।

একটা রাস্তা বিল থেকে সোজা পাঁয়ে এসে উঠেছে : রাস্তা মানে বর্ষায় হাঁটুজল, কোথাও বা কোমরজল, বর্ষা অন্ত কাদা। সেই কাদা কার্তিক অবধি। তারপরে শুকনো। কাদায় জলে বরঞ্চ চলতে ভাল, শুকনো পথ সমান পথ নয়। কাদার মধ্যে কিছু মানুষ হেঁটেছে, গরু হেঁটেছে, ধান বওয়ার গরুর গাড়ি সব আসা-যাওয়া করেছে—কাদা শুকিয়ে সার পথ গর্ত-গর্ত হয়ে আছে এখন। পা ফসকে সুখ নেই, পায়ের তলায় খোঁচা লাগে, গর্তের মধ্যে পা পড়লে প্রাণ বেরিয়ে যায়। কাদা-জলের পথ নাও, লোকে হেলতে-দুলতে দশ ক্রোশ পথ চলে যাবে, কিন্তু বিল থেকে গ্রাম অবধি এইটুকু আসতে-যেতে প্রাণ বেরিয়ে যায়।

তা প্রাণ থাকল কি গেল, এখন দেখতে গেলে চলবে না। বছর-খোরাকি ধান গোলায় উঠে যাবে, গাঁট হয়ে বসে প্রাণ ও মান-সম্মানের কদর কি বজায় আছে, বিবেচনা করা যাবে। পূর্বপাড়ার বড়কর্তা ভবনাথকে সকাল বিকাল ঐ বিলের পথ ভাঙতে হচ্ছে। ধান কাটতে বাকি আছে কিনা, কাটা-ধান ক্ষেতে পড়ে আছে কিনা আল চেঁসে আধ হাত জমি কেটে নিজের দখলে নিয়ে নিয়েছে কিনা — বিলের এদিক-সেদিক তদারক করে বেড়ান। বসতে পিঁড়ি দিল কিনা, দুকোশ হেঁটে—উঠোনে পাঁজির

কার্তি-মিনতি : আর্জেনো ফসল ইঁদুরে-বাঁদরে খাওয়াবে নাকি ও কুজা? নড়চড়া দাও এট্টু, তাড়াতাড়ি—

বিলের রাস্তা গ্রামে পৌঁছেই দু-দিকে দুই মুখ হয়ে গেছে। তেমাথার উপর বিশাল কাঠবাদাম গাছ। মস্ত মস্ত পাতা। সবুজ পাতা পেকে লাল হয়ে যায়, লাল টুকটুক করে, যেন আলতায় চুবিয়ে দিয়েছে। দিবারাত্রি পাতা ঝরে। এ-পাতা ভাল পোড়ে না বলে কুমোরে অথবা মলদরে কুড়োতে আসে না। তলায় কাঁড়ি হয়ে পড়ে থাকে। বিল ভাঙতে পায়ের তলায় বাধা হয়ে গেছে—পথিকজন সেই সময়টা বাদাম-তলা পেয়ে বসে যায়, আচমকা যেন গাঁয়ের উপর উঠে গেছে। পাতায় গলায় পা বসে বসে যাচ্ছে—ইচ্ছাসুখে দু-পায়ে ছড়িয়ে দেয়, টুকটুকে পাতা তুবড়ি বাজির মতো চতুর্দিকে উঁচু হয়ে ওঠে।

ছেলেপুলেরা এক একসময় গিয়ে বাদামতলা হাতড়ায়, পাতার গাদার ভিতরে দুটো-চারটে বাদামও মিলে যায়। আম জাম জামরুলের মতন গাছে চড়ে কষ্ট করে পাড়বার বস্তু নয়। কঠিন পুরু খোলা, শাঁস যৎসামান্য—খোলা ভেঙে সে-অবধি পৌঁছনোর সাধ্য পাখি-পশুর নেই। মানুষের পক্ষেও সহজ নয়, কাটারি কুপিয়ে কুপিয়ে তবে খোলা ভাঙে। কাকে বাদুড়ে উপরের ছাল ঠুকরে ঠুকরে খায়, বোঁটা ভেঙে তখন টুপ করে ফল পড়ে পাতার মধ্যে ঢেকে।

হন্তদন্ত হয়ে ভবনাথ বাড়ি ফিরছেন —বাদামতলায় দেখতে পেলেন কমল আর পল্টু গাদা গাদা বাদামপাতা দু-হাতে তুলে ছড়িয়ে দিচ্ছে। অর্থাৎ ঠিক দুপুরে কেউ কোথাও নেই দেখে বাদাম খুঁজে বেড়াচ্ছে। পল্টিরই মাথায় অমন এসব—তাড়া দিতে দুটিতে দুড়-দুড় করে পালাল।

কয়েকটা দিন পরে ভীষণ ব্যাপার। বাদামগাছের লগোরা গো-ভাগাড়—মরা গরু ফেলে যায়, শিয়াল-শকুনে খুবলে খুবলে খায়। সন্ধ্যা গড়িয়ে গেছে, বাদামতলায় ঘুটঘুটে অন্ধকার। সেদিনও ভবনাথ বিলের দিক থেকে ফিরছেন, দেখলেন একটা লোক পাশের পগারের মধ্যে কি যেন করছে। চোর-টোর ভেবেছেন উনি—বিল অঞ্চল থেকে গ্রামে উঠে আত্মগোপন করে আছে, খানিকটা রাত্রি হলে পাড়ার মধ্যে ঢুকবে।

কে ওখানে? উঠে আয় বলছি—

আসে না, শব্দ সাড়াও দেয় না। ভবনাথ কাছে চলে গেলেন। তড়াক করে সেই লোক উঠে দাঁড়াল। ওরে বাবা—লম্বায় হাত দশেক পাঁটা-গোটা চেহারা রস-জ্বালানো জালয়োর মতন বিশাল মাথা। বাঘাবিলেবুর সাইজের চোখের মণি অবিরত পাক খাচ্ছে অক্ষি-গোলকের ভিতর। পগারের মধ্যে হাড়গোড় —নরাকার ঐ জীব মজা করে হাড় চিবাচ্ছিল ছুলে-ডাঙার মতো।

ঘুরে দাঁড়ালেন ভবনাথ, উচ্চৈস্বরে রাম-রাম করছেন। চর্বন ছেড়ে তক্ষুনি সে চৌচা দৌড়। পলকে অদৃশ্য। বাড়ি ফিরে ভবনাথ হৈ-চৈ লাগালেন : ছুটে যা শিলু-ঘর, বাঁকবড়শি হেমন্ত ঠাকুরের কাছে। আমার নাম করে বলবি। দোয়ার আর খোল-করতাল নিয়ে যে অনন্থায় থাকেন চলে আসুন। একপালা গাইতে হবে আমায় উঠোনে।

কি, হল কি হঠাৎ?

ভবনাথ বললেন, তাগাড়ে আজ গরু পড়েছে। মুচিতে চামড়া খুলে নিয়ে গেছে, শিয়াল-শকুনে খেয়েছে সারাদিন ধরে। গোভুত সন্ধান পেয়ে হাড় চিবোতে বসে-ছিল। আমি একেবারে মুখোমুখি পড়ে-ছিলাম। কষে রাম-নাম এখন, ভূত অঞ্চল ছেড়ে পালাবে।

নিমি ও রাজি দুই চক্ষুশূলে এরা। মেয়েরা সই পাতায়, এরা নতুন কিছু করেছে—সইয়ের বদলে চক্ষুশূল পাতি-য়েছে। ও ভাই চক্ষুশূল—বলে এ-ওকে ডাকে। দুজনে ওরা মায়ের কোঠায় ছুটুর-ছুটুর করছে। শ্বশুরবাড়ি থেকে রাজি সদ্য এসেছে, শ্বশুর-শাশুড়ি ভাসুর-দেওর জা-ননদের কথা এবং বরের কথা। কথা অফুরান—ফুরুলে ছাড়ছে কে? রাজি ছাড়লেও শ্রোতা নিমি তো ছাড়বে না।

ধানের পালার অধিকাংশ মলা-ডলা হয়ে গেছে, উঠান প্রায় ফাঁকা। একদিকে তাড়া-তাড়ি গোটাকয়েক মাদুর-সতরঞ্চি পেতে ফেলল। মেইবাঠের সঙ্গে একফালি বাঁশ বেঁধে তার গায়ে লণ্ঠন ঝোলাল। ঘরের চালে আর আড়ের খুঁটিতে চারকোণা বেঁধে একটা কাপড় গাঁথিয়ে দিল—মাথে উপরের চন্দ্রাতপ। আর কি চাই—পুরো দস্তুর আসর। হেমন্ত ঠাকুরও এসে পৌঁছলেন। খুব একটু খোল পেটাচ্ছে লোক যাতে জমে যায়।

রাজি বলে, উঠি ভাই চক্ষুশূল—

নিমি টেনে বসাল। বলে, তাড়া কিসের সবে তো সন্ধ্যে। দু-দিনের তরে বাপে বাড়ি এসেছিস, তোকে কেউ কুটোগাছটি ভাঙতে বলবে না।

রাজি বলে, সেজন্যে নয়। রাত্তিরবেলা জঙ্গলে পথ ভেঙে যাওয়া, তার উপর যা সব দেখে এলেন জেঠামশায়—

তুইও যেমন! কী দেখতে কি দেখেছে হয়তো বা ভয়-দেখানো কথা—

উঠানে গান। আকন্ঠ আসর-বন্দন চামর দুলিয়ে হেমন্ত ঠাকুর উত্তর-দক্ষিণ পূব-পশ্চিম চতুর্দিকে চালোর মারছে। নিমি বলল, একটুকু শুনে তো যাবি। আ তোকে পৌঁছে দিয়ে আসব।

রাজি ধমকের দাওয়ায় অন্ধকারে দাঁড়িয়ে গিয়ে বসল। 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' পালা নিমি অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে। কান্না আর কেবলই। রাজিকে বলে, যদি তো একটু ওঠ। লক্ষ্মণ শক্তিশেলে পড়েছেন হাসপা —বেঁচে না ওঠা পর্যন্ত আসর ছেড়ে ও যাবে না।

উঠান-ভরা লোক। দুজনে টিপিটি বেরিয়ে পড়ল। রাম-লক্ষ্মণ মাথায় থাকুন তাঁদের পুণ্যকথা হেলা করে নিজের সামান্য কথায় মশগুল। কথা ফুরোয়

হিরণ্ময়ী দেবী কি শরৎচন্দ্রের বিবাহিতা স্ত্রী, না শুধুমাত্র 'জীবনসাঙ্গিনী'? শরৎচন্দ্র তাঁর সম্পত্তি কাকে উইল করে দিয়েছিলেন? তাঁর অস্ত্র কি শুধু লেখনী ছিল, না সেই সঙ্গে তিনি বন্দুক-রিভলবারও ব্যবহার করতেন? গান্ধী-দেশবন্ধু-সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর রাজনৈতিক পরামর্শের খবর টেগার্ট সাহেব কতটুকু পেয়েছিলেন? আর সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের সঙ্গেই কেন তিনি গোপনে যোগাযোগ রেখেছিলেন? 'পথের দাবী' নিষিদ্ধ হবার পর রবীন্দ্রনাথকে লেখা শরৎচন্দ্রের চিঠির উত্তর ও প্রত্যুত্তরে উত্তরের মধ্যে যে মত-পার্থক্য দেখা দিয়েছিল সেই সব চাঞ্চল্যকর ঘটনার রোমাঞ্চকর বিবরণে ঠাসা গবেষণা-মূলক গ্রন্থ যা প্রতিটি লাইব্রেরী, শরৎরচনাবলী গ্রাহক ও ছাত্রছাত্রীর পক্ষে একান্তই অপরিহার্য।

রমেন দাসের

ঘরে বাইরে শরৎচন্দ্র

১০-০০

সাহিত্য সংস্থা, ১৮সি টেমার লেন, কলি-৯

রাজিরই—নিমি কান বাড়িয়ে শুনতে যায়। বড়দিনের সময় বাড়ি এসে বর এক কাণ্ড করেছিল, সে কারণে কথা বন্ধ সারা বিকাল এবং রাত্রের শেষ যাম পর্যন্ত। সেইকালে—কাউকে বলিস নে ভাই চক্ষুশূলে, পা জড়িয়ে ধরতে যায়—তখন মাপ করে দিই। রাতে তো ঘুমোনোর জো নেই—কিছু উশুল করে নিচ্ছিলাম দুপুরে ঘুমিয়ে। শাশুড়ি উঠোনে মাদুর পেতে রোদ পোহাচ্ছেন। ঐ তো বাম্বের ঘরের শাশুড়ি—তারই পাশ দিয়ে পা টিপে টিপে এসে ঘরে ঢুকেছে। জাগানোর চেষ্টা করছে কথাসাধ্য—অথচ তিল পরিমাণ শব্দ সাড়া করার জো নেই, এতে রাজি জাগতে যাবে কেন? দোয়াতে আঙুল ডুবিয়ে ডুবিয়ে বর তখন সারা মুখে চিত্রকর্ম করল। সুপুষ্ট একজোড়া গোঁফ দিয়েছে ঠোঁটের উপর, থুতনিতে চাপদাড়ি। দু-পাশের গাল দু-খানাও বাদ রেখে যায় নি। এত সমস্ত করে চোরের মতন বেরিয়ে গেছে। বড়-জার সকলের আগে নজরে পড়ল, সে-ই খানিকটা রক্ষা : ওরে বাচ্চা, গোরু-বাড়ি উঠে গেছে যে ভোর। আয়না ধরে হাসি কি কাঁদি, ভেবে পাইনে।

দত্তবাড়ির সামনে এসে পড়েছে। গলা খাঁকারি দিয়ে রাজি বলে, আসি তবে ভাই—

নিমি বলল, বাঃ রে, আমি বুঝি একলা যাব?

তবে?

ঠেলে এগিয়ে দিলাম, তুই যে আমার। পুরো না দিস, খানিকটা যে।

চলল আবার। রাজির মুখে খই ফুটছে। বর হয়ে গিয়ে তারপর শাশুড়ি নিয়ে পড়ল। এবং বড় জা। শাশুড়ি দজ্জাল। বড় বউ কিন্তু সোনার বউ—জগদ্ধাত্রীর মতন রূপ। বাপ-মা তুলে শাশুড়ির এত গালিগালাজ, বড় বউ রা কাড়ে না, চুপচাপ কাজ করে যায়। একবাটি নাকি বাজে না—কথাটা কত বড় মিথ্যা, শুনে এসো একবার রাজির শ্বশুরবাড়ি গিয়ে। কাঠির মতন রোগা শাশুড়িঠাকরুণ একখানি মাত্র মুখে একলাটি অবিশ্রান্ত জবর রকম বাজিয়ে যাচ্ছেন—যে এমন ঘরের চালে কাক বসতে ভরসা পায় না। বড় বউয়ের সুখ্যাতি সকলের মুখে মুখে, কেবল ঐ শাশুড়ি ছাড়া। শাশুড়ির বলে সম্প্রতি আর একটি জুটেছে—বলতে পার কে? বলো দিকি। আমি, রাজবালা, বাড়ির নতুন বউ—কেননা, কাণ্ডখণ্ড আমি এক সকালবেলা দেখে ফেলেছিলাম। বড় দিদি গো, ঘরে তোমায় শতেক নমস্কার!

মুখে আর কথা বেরোয় না, হাসিতে ফেটে পড়ছে। হাসে আর বারম্বার নত হয়ে দূরবর্তিনী বড় জায়ের উদ্দেশে মাটিতে হাত ঠেকায়। বলে, অন্য বউরে যাবা! ঘরে নমস্কর!

এসে গেছে তারা পরবাড়ি। হেমন্ত ঠাকুর ঘোর বেগে চালিয়েছেন। নিমি বলে, বাড়ি এলাম।

তা তো এসেছিস। আমি এখন একলা ফিরব নাকি?

নিমি বলে, চল দিয়ে আসি তোকে।

অতএব নিমি চলল আবার রাজিকে পৌঁছতে। গল্পের সেই মোক্ষম জায়গা, যার জন্য রাজি বন্য ধন্য করে পরম শান্ত বড় বউকে টিটকারি দিচ্ছে। জানলায়, হঠাৎ চোখ পড়ে গিয়ে উঠানের কায়দাটা দেখে ফেলেছিল রাজি। শাশুড়ি রান্নাঘরের দাওয়ায় গোবরমাটি লেপছেন। বড় বউয়ের ঘর থেকে বেরুতে আজ কিছু বেলা হয়ে গেছে—তাই নিয়ে শাশুড়ি কখন যুগ ধরে গালিগালাজ করছেন, শোলোক পড়ছেন।

বড় বউ জবাব দেয় না। ঝাঁটা হাতে নিঃশব্দে উঠান ঝাঁট দিচ্ছে। নতুন বউ দেখতে পাচ্ছে জানলা দিয়ে। বকতে বকতে বুড়ো শাশুড়ি ক্রমশ ঝিমিয়ে এলেন, থেমে যাবার গতিক। হঠাৎ সব ক্লান্তি ফেড়ে তুমুল কণ্ঠে বড় বউয়ের মৃত চোদ্দ পুরুষের নামে এই দিনের প্রারম্ভে বিবিধ খাদ্যের ব্যবস্থা করতে লাগলেন, বিশ দিন নিরন্ন থেকেও মানুষ যা মুখে তুলতে নারাজ। বড় বউয়ের ভ্রূকপাত নেই না-রাম না-গঙ্গা রা কাড়ে না। বাক্য বিনা কাজ হচ্ছে তো কোন দুঃখে গলাবাজি করতে যাবে? নতুন বউ জানলার পথে সমস্ত দেখে নিয়েছে। কাট দিতে দিতে একবার বা ঝাঁটা তুলে শাশুড়ির পানে ঈষৎ নাচিয়ে দিল। অথবা দু-পাটি দাঁত মেলে মুখভঙ্গিমা করল রান্নাঘরের দিকে চেয়ে। ব্যস, আর রক্ষা নেই। নিপাট ভালমানুষ বড় বউ দীর্ঘ ঘোমটা টেনে দিয়ে পরম মনোযোগে অবার নিজ কর্ম করে যাচ্ছে।

ইতিমধ্যে দত্তবাড়ি পৌঁছে গেছে তারা। নিমি বলল, ঘরে উঠলে হবে না চক্ষুশূলে, আমার সঙ্গে চলো।

নিমি রাজিকে দত্তবাড়ি পৌঁছে দেয়, দত্তবাড়ি থেকে রাজি আবার নিমিকে পরবাড়ি নিয়ে আসে। কতবার যাতায়াত, গুনতে গেছে কে? অবশেষে পালা শেষ—শক্তিশেলে নিহত লক্ষ্মণ বিশল্যকরণীর গন্ধে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠলেন। হরিবোল দিয়ে আসরের মনুষ্যও উঠে পড়ল। যে যার বাড়ি যাচ্ছে। রাজি এবার তাদের একটা দলে ভিড়ে পড়ল।

ভবনাথের উল্লাসটা এবার দেখবার মতো। লোভী গোভূত ময়ূরপুরে খোঁজে খোঁজে গ্রাম অবধি ঢুঁ মেরেছিল, তার দুর্গতি মনের চোখে যেন স্পষ্ট দেখছেন। রয়-নাম তাড়া করেছে—শালের খুঁটির মতন বড় বড় পায়ে বিল ভেঙে ধপাধপ করে ভূত পালিয়ে যাচ্ছে। নাস্তিক অবিশ্বাসী কেউ কেউ তো আছে—তারা বলে, বড়কর্তার ভয়-দেখানো কথা। ছেলে-পুলে যখন তখন গিয়ে পড়ত, এমনি কায়দা করলেন, ইতরভদ্র কেউ আর বাদাম-তলা মুখো হবে না।

সে যাই হোক, পুঁটি-কমল ও তাদের সঙ্গী-সাথীদের সত্যিই বাদাম সংগ্রহ বন্ধ। নিতান্ত যদি লোভ ঠেকাতে না পারে, তবে দিনমানে দস্তুরমতো দলবল জুটিয়ে। জল্লাদ ছেলেটাই শুধু ভ্রূভঙ্গি করে উঁড়িয়ে দেয় : রাজি রাখো, আমি যাবো। ভাদ্দাড়ে যে দিন পড়ে, একলা রাতদুপুরে গিয়ে আমি বাদাম কুড়িয়ে আনব। যদি বলো তো বাদাম দিনের বেলা কুড়োনো, রাত্তিরবেলা গাছের গায়ে গোটাকয়েক দায়ের কোপ দিয়ে আসব, সকালে গিয়ে দেখতে পাবে।

তা পারে হয়তো জল্লাদ—দুনিয়ার মধ্যে ও-ছেলের অসাধ্য কিছু নেই শুধুমাত্র পড়া ও লেখা ছাড়া।

মলনের কাজ সারা। মেইকাঠ আছে এখনো, বন্ধন থাকে থাকুক না। সন্ধ্যাবেলা ফান খাওয়াতে গরু ভিতর-উঠানে নিয়ে আসে। সেই কাঠে বাঁধা যায় তখন। কমল-পুঁটিদেরও কাজে লাগে—মলনের গরুর মতন সেই কাঠ ধরে ওরা গোল হয়ে ঘোরে। খাসা মজা।

উঠান জুড়ে ইঁদুরে কি করেছে দেখ। গর্ত, গর্ত, গর্ত—মাটি তুলে তুলে ভাই করেছে। ধানের পালায় ঢাকা ছিল বলে তেমন নজরে পড়ত না, পালা উঠে গিয়ে ফাঁকা উঠান তো গুণমণি এসে পড়ল পাত-কোদাল নিয়ে। ইঁদুরের গোষ্ঠিকে বাপান্ত করে, আর জোরে জোরে কোপ ঝাড়ে গর্তের উপর। কোপ কি ইঁদুরের ঘাড়ে? যমের ঘাড়েই বা নয় কেন, গুণোর ছেলেগুলো কেড়ে নিয়েছেন যিনি। ইঁদুরে ধান নিয়ে তুলেছে গর্তের ভিতরে—খেয়ে কতক তুষ করেছে, কতক বা ভাণ্ডারে সঞ্চয় করেছে। গর্তের জায়গা কুপিয়ে গুণমণি ধান-মাটিতে ঝুড়ি বোঝাই করে, পুকুর ঘাটে নিয়ে ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে ধোয়। মাটি ধুয়ে গিয়ে ধান ঝিকমিক করে ওঠে। পুরো এক ঝুড়ি মাটি ধুয়ে মুঠো দুই-ধান। সমস্তটা দিন ধরে গুণমণি এই করছে—ধান এনে এনে রোদে দিচ্ছে উঠানের উপর, শেষ পর্যন্ত পরিমাণে নেহাৎ মন্দ হল না; দু'তিন খুঁচি তো বটেই। গুণমণি হুঙ্কার দিয়ে ওঠে : ধান উঠানে পড়ে রইল, তোলা পাড়ার নাম নেই। তবে যে ঠাকার হয়েছে ঠাকুরুণ!

উমাসুন্দরী বলেন, ইঁদুরের মুখ থেকে কেড়ে ঝেড়ে বের করেছিস, ও ধান তোর। তুই নিয়ে যা গুণো।

তা গুণমণি এমনি এমনি নেবার লোক নাকি? উঠান পিটিয়ে দরমুশ করে গোবর-মাটি লেপল ক-দিন ধরে।

ধান নিয়েছে, তার মূল্যশোধ।

প্রথম পর্ব সমাপ্ত।

যে স্বাদ
সকলের
মুখে মুখে !

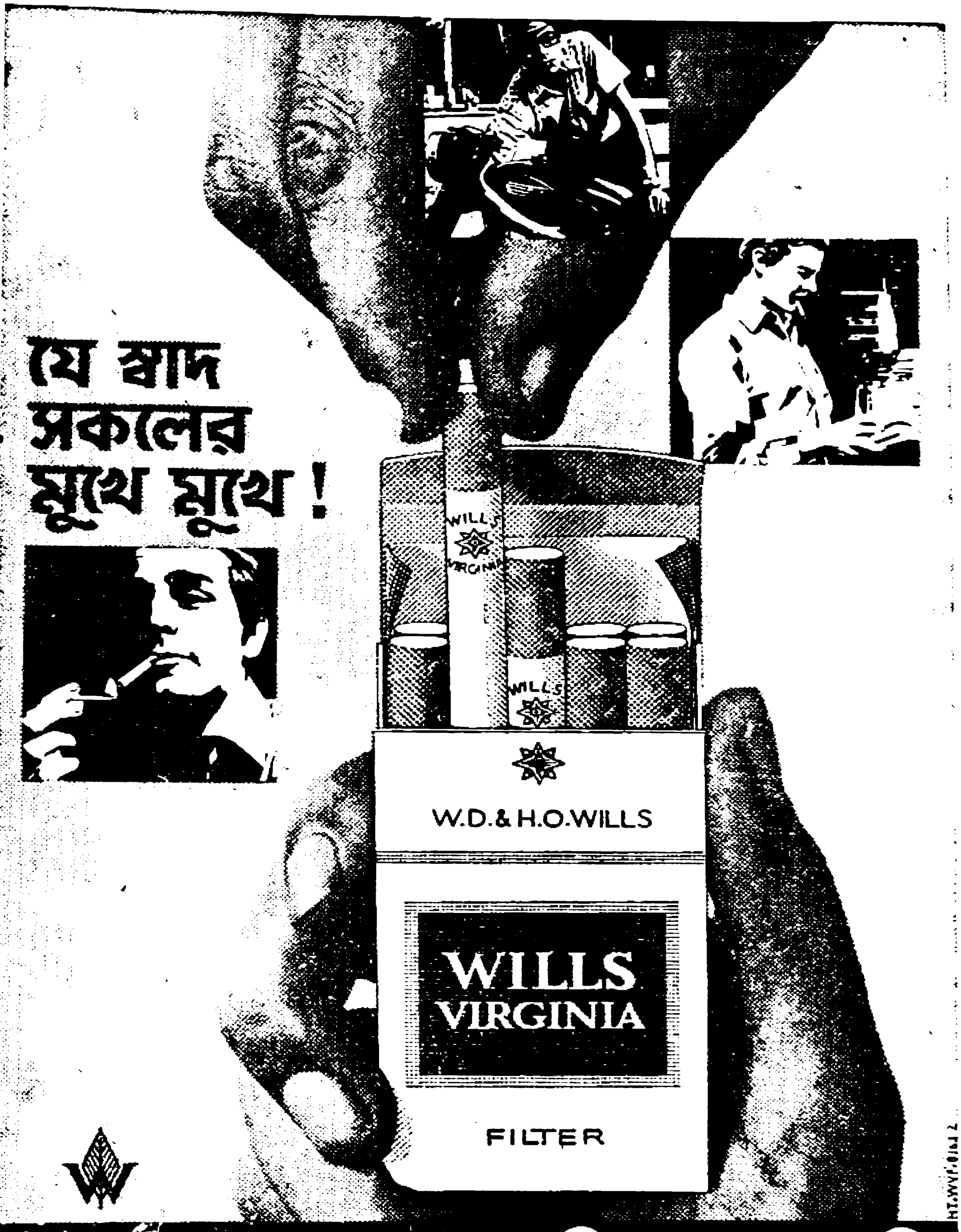

উইলস-এর নামডাক যেমনি স্বাদও তেমনি

সর্বাধিক মূল্য ২ টাকায় ২০টি, ১ টাকায় ১০টি ফ্লাস্টার যুক্ত সিগারেট

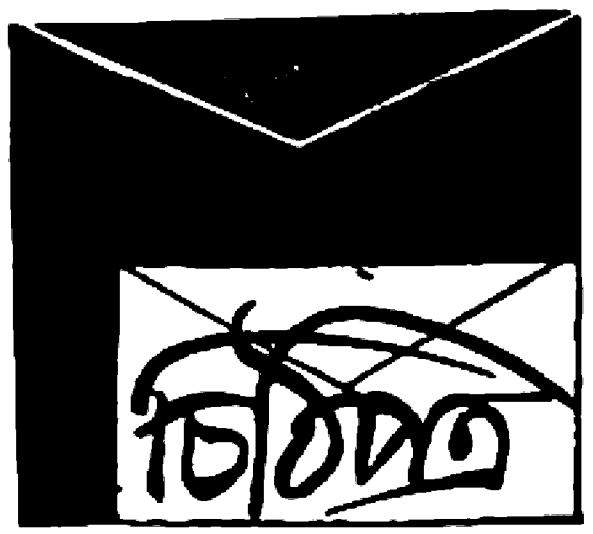

পঙ্খের কাজ প্রসঙ্গে

১৮-৪-৭৫ তারিখের অমৃত পত্রিকায় প্রকাশিত আমার 'পঙ্খের কাজ' নামের প্রবন্ধটি কয়েকজন সমালোচকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

প্রথম সমালোচনা-বিশেষজ্ঞ শ্রীস্বৈপায়ন দেবশর্মার ২০-৫-৭৫ তারিখের চিঠির কয়েকটি অংশ এইরূপ : '...বিষয় সম্পর্কে লেখকের অজ্ঞতা দেখে অবাক হলাম'. অমিয়বাবু...কোনটাই বুঝে উঠতে পারেন নি': 'চুনের (এই বানানই আছে) প্রলেপের আরেকটি (এইভাবেই মুদ্রিত) মহাগুণ সম্পর্কে লেখকের কোন ধারণা নেই দেখে অবাক হলাম': 'বাংলার পুরকীর্তি সম্পর্কে অমিয়বাবুর ধারণা কতটা জানি না': 'এই আবোল-তাবোল তথ্য তিনি কোথায় পেলেন? ইত্যাদি ইত্যাদি

'বঙ্গদর্শনে'র কাল থেকে শিক্ষিত ভদ্র বাঙালীসমাজে, স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র, বিদ্যাসাগর রবীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, নলিনীকান্ত গুপ্ত, অতুলচন্দ্র গুপ্ত প্রমুখের সবত্ন পরিচর্যায়, ব্যক্তিগত চাহিদার পরিবর্তে নৈর্ব্যক্তিক ও বিষয়-মুখী বাংলা সমালোচনা-সাহিত্য আজ এতদূর পুষ্টিলাভ করেছে যে, এ অধীনের পক্ষে সে শিষ্ট ও মার্জিত ঐতিহ্য কিছুতেই বিস্মৃত হওয়া সম্ভব নয়। দুর্ভাগ্যবশত (সৌভাগ্যও হতে পারে), আমার শিক্ষাদীক্ষা, সামাজিক ও পারিবারিক পরিবেশ অতি দীর্ঘকাল এমন ভাবে দৃষ্টিবদ্ধ যে, সহসা স্বৈপায়নবাবুর মনীষিকতা ও ভাষার স্তরে অবতরণ করে তাঁর যোগ্যমাত্রায় কিছু লিখতে এ মন একেবারেই অপটু।

আলোচ্য সমালোচনা-বিশেষজ্ঞের কাছ থেকে কিছু কটাক্ষও পেয়েও, তাঁরতে একেবারে প্রথম শ্রেণীর মনীষীদের দৃষ্টির কিছু ক্ষুদ্রের সোঁড়াও স্পর্শেছি। সে জন্যেদের সেসব জানবার কথা।

দ্বিতীয় সমালোচনা-বিশেষজ্ঞ শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত 'পঙ্খের কাজ' প্রবন্ধটি এবং শ্রীপ্রণব রায় ও শ্রীস্বৈপায়ন দেবশর্মা কর্তৃক পূর্বোক্ত প্রবন্ধের আলোচনা দুটি পড়বার সুযোগ আমাদের হয়েছে। মূল প্রবন্ধ এবং তার আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত বক্তব্য পেশ করছি।

(১) অমিয়বাবু চলন্তিকায় উল্লিখিত 'পঙ্ক' শব্দটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন 'বন্ধনীর মধ্যে ব্যবহৃত পঙ্ক কথাটি মুদ্রণ প্রমাদ বলে মনে হয় অ না হলে পূর্বোক্তমী পঙ্খ ও তার ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গতি থাকে না।' কিন্তু অমিয়বাবু তাঁর বহুল পঠিত, আলোচিত ও প্রশংসিত 'বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি' গ্রন্থে 'পঙ্খ' শব্দটি মাত্র একবারই ব্যবহার করেছেন 'ঘুটগোড়িয়া' এন্ট্রীতে, অন্যত্র 'পঙ্ক' শব্দটিই বজায় রেখেছেন। যাইহোক, পূর্বোক্ত লেখক এবং আলোচকদ্বয় পঙ্ক শব্দ এবং তজ্জাত ব্যাখ্যাত নিয়ে যে আলোচনা করেছেন তার প্রত্যুত্তরে জানাই—চলন্তিকায় মুদ্রণ প্রমাদ ঘটেনি। সর্বজনশ্রদ্ধেয় হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' গ্রন্থে 'পঙ্ক' শব্দের একাধিক অর্থের মধ্যে চতুর্থ অর্থটি নিম্নরূপ : '(বাঙ্গলায়) অট্টালিকার ভিত্তিতে বা তলদেশে লেপনার্থ দ্রব্য বিশেষ।' পঙ্খ শব্দের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে : পঙ্খ অর্থ পঙ্ক (৪)। —অর্থাৎ পঙ্ক এবং পঙ্খ বা পঙ্খ সমার্থক শব্দ। সুতরাং অমিয়বাবুর মন্তব্যানুসারে চলন্তিকায় মুদ্রণ প্রমাদ ঘটেনি এবং প্রণববাবু ও স্বৈপায়নবাবু যা নিয়ে বিতর্ক করেছেন তার অবসান এখানেই ঘটল বলে আমার ধারণা।

(২) পঙ্ক শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে প্রণববাবু তাঁর দীর্ঘ পত্রে (৬।৬।৭৫ তারিখে অমৃতে প্রকাশিত) প্রশ্ন তুলেছেন : 'পঙ্খ শব্দটি যদি মূল সংস্কৃত শব্দ থেকে জাত হয় তাহলে পঙ্কের কাজ বলতেই বা ক্ষতি কি? —ব্যাকরণগত বা অর্থগত দিক থেকে ক্ষতি হয় না। তথাপি বিশেষ ক্ষেত্রে বা এবং সম্পর্কিত আলোচনায় পঙ্খ শব্দের ব্যবহার বা প্রয়োগ অনুমোদন যোগ্য কারণ যে কোন শব্দ প্রচলিত হওয়ার ক্ষেত্রে লক্ষণীয় হচ্ছে (ক) শব্দটির ধ্বনি মাধুর্য বা শ্রুতি-মাধুর্যে আছে কি না, (খ) শব্দটির উচ্চারণে বা ভাবানুষঙ্গে কোনপ্রকার চিত্রকল্প বা ইঙ্গিত আমাদের জাগায়। একথা বলা বাহুল্য পঙ্খ শব্দটির ধ্বনি মাধুর্য অনেক বেশী আর পাঙ্ক শব্দের উচ্চারণ সাধারণ ভাবেই আমাদের মনে চাপা অন্ধকারের সঙ্গে যুক্ত অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকা বা কাদা বাংলায় বলে থাকি। বাস্তুবিদ্যার ক্ষেত্রে ইংরাজী ভাষায় বলা হচ্ছে : Black Cotton Soil সুতরাং চিত্রকল্পের দিক থেকেও পঙ্ক শব্দ হেয় প্রতিপন্ন হতে পারে না—বিশেষত বৈশিষ্ট্যের দৃষ্টিকোণ থেকে। প্রণববাবু যে মন্তব্য করেছেন ...পঙ্কের ওপর কোন রঙ বা নকশা অঙ্কন করলে তা যেমন সহজ সবলীল এবং আসলের নয় অবিকল মনে হয়.....' অথবা—সর্বোপরি পাঙ্কের পেলবতার সঙ্গে.....' ইত্যাদি অংশ যুক্তিবাদী মনে হাস্যোদ্রেক করার মাত্র।

আমার মনে হয়, পঙ্খ শব্দের সঙ্গে পঙ্খ শব্দের অর্থগত বৈষম্য থাকলেও ধ্বনির বা শ্রুতিমাধুর্যের সাদৃশ্যবশত তা আমাদের মনে পঙ্খের শ্বেতশুভ্র কান্তির আভাস এনে দেয়। এ ধরনের সাদৃশ্য ব্যাকরণসিদ্ধও বটে। শুধু তাই নয়, পঙ্খ শব্দে পঙ্কের অনুভূতা ও কঠিনা এবং কাঠিনা ও কমনীয়তা—এই চতুর্বিধ গুণেই প্রকাশ পাচ্ছে এবং এই চতুর্বিধ গুণের সঙ্গে শৈল্পিক দক্ষতা যুক্ত হলে তা যে আমাদের নয়নলোভন হয়ে ওঠে সে কথা সকলেই মানবেন। এইসব দিক দিয়ে বিচার করলে পঙ্খ শব্দ শিল্পশাস্ত্রে অধিকতর কাম্য।

(৩) প্রণববাবু টেরাকোটা শব্দের বিস্তৃত আলোচনার প্রশ্ন তুলেছেন : তৈজসপত্র যে কি করে টেরাকোটার অন্তর্ভুক্ত হয় তা বুদ্ধির অগম্য'। এখানে আমার মনে হয় প্রণববাবু প্রাথমিকভাবে অমিয়বাবুর ভাষার প্রয়োগটা ধরতে পারেন নি। অমিয়বাবু লিখেছেন : '.....পোড়ামাটি বা তার তৈরি যে কোন জিনিস তা সে মন্দির অলঙ্করণই হোক বা হাঁড়িকুঁড়ি বা অন্য তৈজসপত্র হোক—এই হাঁড়িকুঁড়ি বা তৈজসপত্র অবশ্যই মাটির তৈরী। অমিয়বাবু কি এখানে বাস্তব তৈজসপত্রের কথা বিন্দুমাত্র উল্লেখ করেছেন? আর বৃহত্তর অর্থে প্রথমিকভাবে পোড়ামাটির জিনিসপত্র কি টেরাকোটা-গ্রুপের অন্তর্গত নয়? 'Terra' শব্দটির অর্থই হেল মৃত্তিকা বা মৃত্তিকা নির্মিত। তথাপি পোড়ামাটির হাঁড়িকুঁড়ি বা তৈজসপত্রাদিকে পটারি এবং পটস্রাডস দুটি বিভাগে ভাগ করা হয়েছে—বৈজ্ঞানিকভাবে নির্দিষ্ট অর্থ বা শব্দ প্রয়োগ দ্বারা সুনির্দিষ্টভাবে একটি বিষয়কে বোঝানোর জন্য। টেরাকোটা—শব্দের ব্যাখ্যায় বলা হচ্ছে

> Fine Hard brownish-red pottery used as ornamental building Material for staluettes & vases, a work of art made in it its colour .....

ইত্যাদি। এখানে

> It-baked earth. (The Pocket oxford Dictionary of current English-compiled by Fowler & Fowler. 1939)

সুতরাং বৃহত্তর অর্থে সাধারণভাবে পোড়ানো ইট বা পোড়ামাটির গার্হস্থ্য সামগ্রীকে টেরাকোটা বলা যায় না কি? আমার ধারণা অমিয়বাবু, কৌতূহলী জনসাধারণের জন্য সহজপাচ্য প্রবন্ধ লিখেছেন —তাই তাঁর প্রবন্ধে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা প্রয়োগ করতে চান নি। যদি প্রণববাবু শিল্পশাস্ত্রে ব্যবহৃত ইংরাজী শব্দ যথা টেরাকোটা, পটারি, পটস্রাডস ইত্যাদির বাংলা বৈজ্ঞানিক পরিভাষা ব্যবহার করে প্রয়োগ পার্থক্য এবং অর্থপার্থক্যটুকু বুঝিয়ে দিতে পারতেন তবে তাঁকে নিশ্চিন্তায় অভিনন্দন জানাতে পারতাম।

শিবপুর, হাওড়া,

নিবেদিকা [redacted]

(২)

অমৃত পত্রিকার গত ৭২ সংখ্যায় (পৃঃ ১৮-৪-৭৫) প্রকাশিত শ্রীঅমিয়কুমার

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বাল্টু হাঁটুতে থুতনি গুঁজে বসে আছে। আস্তে আস্তে শরীরটাকে দোলাচ্ছিল। বললাম, তুমি এই পাহাড়ে ফেলে বিয়ের অনুষ্ঠান দেখেছ বাল্টু?

বাল্টুর হাসিটা মুছে গেল। ও হাঁটুর ওপরে রাখা মুখখানা কাৎ করে আমার দিকে চেয়ে বলল, মনে।

বললাম, বিয়ের ভেতর তো অনেক অনুষ্ঠান থাকে কোনটা তোমাকে সবচেয়ে বেশী নাড়া দেয় বাল্টু?

ও তার হাঁটুতে তেমনি মুখ গুঁজে বসে রইল। সোজা হয়ে বসে অনেকক্ষণ মুখ ফিরিয়ে কি বলবে তাই বোধহয় ভাবতে লাগল। এক সময় বলল, যখন আমার ভাই বরাই বরটিকে দাঁড়িয়ে আছে। বর ভাবনায় অনেক দূরে চলে গেছে। এই সময়টা বাল্টুর খুব ভাল লাগে। তারপর বর কাছে এসে বরাই যখন তাকে বরের ভেতর ঢোকে তখন মনে হয় সে মানুষটি যেন বাড়ীর সকলের অনেক অনেক দিনের চেনা। এ ব্যাপারটাও বাল্টুর কাছে খুব অদ্ভুত লাগে।

হেসে বললাম, এ সবই তো বিয়ের প্রথমের ব্যাপার দেখছি।

বাল্টু বলল, তাহলে শেষের কথা শোনাই। সে বড় দুঃখের বাবুজী। মেয়ে কাঠী ছেড়ে চলে যাচ্ছে এতদিনের সব আলাদুলো ফেলে। বেটী কি বিদাই শুরু হয়ে গেল। সবার চোখে তখন জল নেমেছে।

বললাম কি রকম সে অনুষ্ঠান বাল্টু?

ও বলল, বরের আর নিজাতীয় পরা দাঁড়িয়ে থাকে কাঁদতে কাঁদতে বলে তোমার ঘরের ভেতর আমার পুতুল ছেড়ে যাচ্ছি।

তোমে মহুয়া কে অন্দর কী
বাবা মাইয়া পুতুরা রহিয়া।

পিতাজী তখন মেয়েকে বুকিয়ে-সুকিয়ে বলে তুমি বড়ী যাও মা, আমি তোমার পুতুলগুলো তোমার নতুন ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে আসব।

তোরিয়া পুতিরী দিয়ে পঠাই
হাঁয় যা তু অপন।

বললাম, বাল্টু তোমার যখন বিয়ে হবে তখন তুমার পিতাজীকে ছেড়ে যেতে খুব কষ্ট হবে তাই না?

ও প্রথমে কোন কথা বলতে পারল না। তারপর এক সময় বলল, বাবুজী, আপনি তো আপনি তো সবই জানেন। পিতাজীকে ছেড়ে কোন জায়গায় যাওয়া আমার পক্ষে কি আর সম্ভব?

কথাটা বলেই ও আবার ওর মুখখানা হাঁটুর ওপর রেখে অন্যদিকে চেয়ে রইল। আমি ওর কথার কোন জবাব দিতে পারলাম না। সহজ করে ছন্দ সুরু করেছিলাম কথা কিন্তু কথাটা যে এমন একটা নির্মম সত্যের মুখোমুখি আমাদের দাঁড় করিয়ে দেবে তা ভাবতে পারি নি।

একটি মেয়ে তার অসহায় বাবাকে ছেড়ে চলে যেতে পারছে না, অথচ তার যৌবন স্বামীপ্রাপ্তির কুঁড়ির ভেতর অবরুদ্ধ গন্ধের মত গুমরে গুমরে কাঁদছে, এ ছবি আমাকে বিহ্বল করে তুলল।

এক সময় বললাম, বাল্টু, জীবন কখনো বাজানো ছকে ঘর গুনে গুনে চলে না। সামনে ঘিরে কখন কি ঘটে যায় তা কে বলতে পারে! তুমি যা ভেবেছ হয়তো তা আর হবে, তার সবকিছুকে তুচ্ছ করে দিয়ে ঐ ওপরওয়ালার জীবনটাই তছনছ করে যায়।

বাল্টু আমার দিকে হাঁটু থেকে মুখখানা ফিরিয়ে উদাস চোখে চেয়ে রইল।

আমি পরিস্থিতিটাকে লঘু করে তোলার জন্যে বললাম, দেখি তোমার হাতখানা বাল্টু।

ও হাঁটু থেকে মুখ তুলে সোজা হয়ে বসল। আমার দিকে নিঃসঙ্কোচে ওর হাতখানা বাড়িয়ে দিল। আমি ওর হাত ধরেই বুঝলাম, বাল্টু উত্তেজনায় কাঁপছে।

আমি ওর হাতের পাতাখানা আমার হাতের ওপর রেখে চোখে আলোয় রেখা-গুলো পড়তে লাগলাম। খুব বিজ্ঞের মত অনেকক্ষণ এদিক-ওদিক মাথা নাড়াতে নাড়াতে বললাম, হুঁ!

পৃথিবীতে যে ব্যাপারগুলো মানুষের কৌতূহল সবচেয়ে বেশী জাগিয়ে তোলে, তার ভেতর হাতরেখা অন্যতম। এব্যাপারে নরনারীবৃন্দের আগ্রহ কোন ভেদ নেই। তবু আমার কেন যেন মনে হয়, মেয়েদের আগ্রহ এব্যাপারে সীমাহীন।

বাল্টু এতক্ষণে একেবারে ঘুরে বসেছে আমার দিকে। আমি হুঁ বলতেই ও ওর বড় বড় চোখের পরিপূর্ণ চাউনি মেলে ধরল আমার মুখের ওপর।

বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে বললাম, কোন সময় একটা বড় রকমের অসুখে পড়েছিলে বাল্টু?

হাঁ, বাবুজী।

[illegible] কথায় উত্তেজনা কাঁপছে। আমি [illegible] হেসে-খেলে কাটিয়েছি, [illegible] সে-রকম সংকটই নেই।

বললাম, তোমার হাতের রেখা তাই বলছে বাল্। ছেলেবেলায় নিশ্চয়ই তুমি কোন কঠিন অসুখে ভুগেছিলে।

আপনি ঠিকই ধরেছেন বাবুজী। কি একটা অসুখে ভুগতে ভুগতে আমি প্রায় মরতে বসেছিলাম। এক আঙ্রেজ ডাক্তার ছিলেন তখন, তাঁর চিকিৎসায় ভাল হয়ে যাই।

বাল্র ছেলেবেলার অসুখের ব্যাপারটা আমি অন্য কথায় একদিন পণ্ডিতজীর মুখ থেকেই শুনেছিলাম। আজ ওটা দিয়েই আমার হাতদেখা বিদ্যেতে পাসমার্ক পেয়ে গেলাম।

আমার দ্বিতীয় কথা আর বাল্র অতীতকে নিয়ে নয়, কারণ সেখানে আর কোন পুঁজি নেই আমার। এখন ওর বর্তমানকে নিয়ে বিজ্ঞের মত একটা চাল চেলে বসলাম।

বললাম, বাল্, দয়ুল একটা অশান্তি আজকাল মাঝে মাঝে তোমার মনটাকে বড় চঞ্চল করে তোলে, তাই না? অন্য থেকে তুমি বেরিয়ে আসার জন্যে খুবই চেষ্টা কর, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোন পথই খুঁজে পাও না।

বাল্ মাথা নেড়ে বলল, আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি বাবুজী, আপনার কথা শুনে। আমার মনটা একেবারে আয়না ধরে আপনি দেখে নিয়েছেন।

মেয়েটির যৌবনের পাখিটা রঙীন পাখা মেলে উড়ছে। কোন উদ্ভ্রান্ত নীড় থেকে হয়ত তার কাছে আসে অভ্যাসে ইশারাতে আমন্ত্রণ। তার সারা দেহমন সে ডাকে সাড়া দেবার জন্যে উন্মুখ হয়ে ওঠে। কিন্তু একটা কঠিন কর্তব্যের সুতো ঘুড়ির মত তার সব ইচ্ছাকে টেনে টেনে নামিয়ে আনে একটা নির্দিষ্ট গণ্ডীর ভেতর।

বাল্র মত তরুণী মনের অবদমিত ইচ্ছার কথাটা আমার অজানা নয়, তাই ওর বর্তমান নিয়ে ঐ ধরনের একটা মন্তব্য করা আমার পক্ষে কোন ভাবনার ব্যাপারই ছিল না। কিন্তু বাল্! কি সহজ আর গভীর বিশ্বাসে এই মিথ্যাচারী মানুষটার সব কথা নির্ভেজাল সত্য বলে মেনে নিচ্ছে।

এবার ওর ভবিষ্যতের ওপর কিছু বলতে হবে। আমি বাল্র ভবিষ্যৎ ভাগ্যের ওপরই কিছু মন্তব্য করতে চেয়েছিলাম। আর তাই ওর বিশ্বাসটাকে পাকা করে নেবার জন্যে অতীত আর বর্তমানের অবতারণা করেছিলাম।

বললাম, বাল্, আশ্চর্য তোমার হাতের রেখা। তুমি খুব সুখী হবে একদিন। এখন যত কষ্ট, তখন তত সুখ। চাঁদের আলোতেও তোমার হাতের ভাগ্যরেখাটা তারের মত জ্বলজ্বল করছে।

বাল্ হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। অমনি আমার মনে হল, ভাদ্দির দিনে কুলুর পাহাড়েরা তপ্ত ভালিতে হঠাৎ এক একটা হাওয়া কোথা দিয়ে ঢুকে পড়ে। তারপর সেই হাওয়া সতেজ পাইনের পাতা কাঁপিয়ে পাহাড়ে পাহাড়ে ধাক্কা খেতে খেতে আবার কোথায় চলে যায়। ক্ষীণ আশার একটা আভাস জাগিয়ে গভীর নিরাশায় ভেতর ফেলে দিয়ে যায়।

বাল্র দীর্ঘশ্বাসে সেই নিরাশার সুর বেজে উঠল দেখে বললাম, নিজের ওপর বিশ্বাস রেখো বাল্। সব হতাশার মেঘ একদিন তোমার বুকের ওপর থেকে কোথায় উড়ে চলে যাবে, তুমি জানতেও পারবে না। আমার কথা মিথ্যে হবে না বাল্।

শেষের বাক্যটা আমার মন যেন একটা সত্যের বেদীর ওপর দাঁড়িয়ে উচ্চারণ করল। আমি বুঝতে পারলাম না, এতক্ষণ মিথ্যার অভিনয় করতে গিয়ে কেন হঠাৎ একটুখানি সত্যের জন্য আমার সমস্ত প্রাণ এমন প্রার্থনার মত বেজে উঠল।

বাল্ কিন্তু আমার হাত থেকে ওর হাতখানা তুলে নিয়ে দুহাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফেলেছে।

আমি বললাম, কান্নার এতে কি আছে বাল্। আমি এ বয়সে যতটুকু দেখেছি, সেই অভিজ্ঞতায় বলতে পারি ভাগ্য দীর্ঘদিন কাউকে দুঃখে বা সুখে ফেলে রাখে না।

কিছুক্ষণ পরে আবেগটুকু উপচে পড়ে মনটা যখন স্থির হয়ে এল, তখন জোৎস্নার মত নরম গলায় বাল্ বলল, বাবুজী, সুখ যদি আসে সে আমার ভাগ্য। তবে সেই দুয়োরাণীর ছবি কোনদিনও আমি দেখি না।

আমি বললাম, তুমি যেমন সহজ তেমনি সুন্দর। তাই তোমার চারদিকে বিপদ এবং পেতে থাকবে বাল্। কিন্তু তুমি তোমার নিজের শক্তিতেই সব বিপদআপদের বেড়া ভেঙে বেরিয়ে আসবে।

বাল্ এ কথার কোন জবাব দিল না।

কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই বুঝলাম, আমার এ ধারণা কত ভুল। একটি মেয়ের সরলতা আর সৌন্দর্য তার কতবড় শত্রু হতে পারে, সে প্রমাণ পেয়ে শিউরে উঠেছিলাম। কস্তুরী হরিণীর মত সে কখন শিকার হয়ে পড়ে যে কোন সুচতুর লোলুপ ব্যাধের।

বাহাদুর ভাগতু একা গিয়েছিল নাগপুরে। ক'দিন কাটিয়ে ফিরে এল। এবার একা নয়, সঙ্গে এলো যে তাকে সন্ধ্যার অবছায়ায় চিনতে পারি নি। সে আপেল গাছের ডালভরা সবুজ ফল আর পাতার তলার সন্ধ্যার ধূসর আলোয়ানখানা গায়ে জড়িয়ে দাঁড়িয়েছিল।

ইদানীং ডেলিভারী কেসগুলোতে ডাক পড়ছে প্রায়ই। প্রথম প্রথম কিছু কিছু সঙ্কোচ আর সংস্কার ছিল পাহাড়ীদের মনে। এখন বাল্ সঙ্গে থাকার সঙ্কোচ কাটিয়ে উঠতে আর সময় লাগছে না। তাছাড়া অনিবার্য প্রয়োজন মুখোমুখি এসে দাঁড়ালে মানুষ স্বাভাবিকভাবেই তার সংস্কারের ঢাকাখানা সরিয়ে ফেলতে বাধ্য হয়।

আমি বাংলোর পাশ দিয়ে যখন বাল্র সঙ্গে ভ্যালির দিকে কিছু পথ এগিয়ে যাচ্ছিলাম তখন আকাশে শেষ আলোর রাই রাই ভাব। বাল্ আমার টাট্টুর লাগাম ধরে টানতে টানতে নিয়ে চলেছিল। আমরা কিছু পথ একসঙ্গে গিয়ে আবার বিচ্ছিন্ন হলাম। বাল্র হাতে দিলাম আমার টর্চ। ও ভ্যালিতে নেমে গেল, আমি বাঁধান রাস্তা ধরে ফিরে এলাম টাট্টুতে চড়ে।

বাংলোর সামনে টাট্টু থেকে নেমেই যে ছায়ামূর্তি দেখলাম তাকে ঘন সন্ধ্যার আলোয় চেনা সম্ভব ছিল না। সে যে আমার রাঁধুনী মুরলী নয় তা আমি জানতাম। কারণ মুরলী কোথাও দাঁড়িয়ে থাকার মেয়ে নয়। সে স্বভাবে ক্ষিপ্র। দ্রুত কাজ সেরে সে সরে যায়। একটি পলকও সে কাজের বাইরে তাকিয়ে অকারণে খরচ করে না।

তবে মেয়েটি কে! কোন কথা বলছে না সে। মনে হল আমার দিকেই চেয়ে আছে। আমিও কোন কথা না বলে টাট্টুটাকে টেনে নিয়ে এসে বেঁধে রাখলাম যথাস্থানে।

সামনে এসে দাঁড়াল ভাগতু। মিটি মিটি হাসছে।

বললাম তুই কখন এলি?

আমার গলার স্বরে আনন্দের উত্তেজনা টুকু চেপে রাখা গেল না। ভাগতুর উপস্থিতির ভেতর তখন নতুন একটা জগতের ছবি দেখছিলাম আমি।

ভাগতু বলল এসেছি সেই দুপুরবেলা। তখন সবে আপনি রোগী দেখতে বেরিয়ে গেছেন।

তাড়াতাড়ি স্নানের ঘরে ঢুকে পড়লাম। সারা দুপুরের ক্লান্তির পর আমি একটু বিশুদ্ধ ঝরঝরে হতে চাই। তারপর ভাগতুকে পাশে বসিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নেব আমার কিন্নরী কথা।

স্নান সেরে পোশাক বদলে বেরিয়ে আসতেই ভাগতুর মুখোমুখি হলাম।

ভাগতু বলল খাবার ঘরে যান আপনার চা দেওয়া হয়েছে।

ঢুকে পড়লাম ডাইনিং রুমে। টেবিলের ওপর একটা প্লেটে কিছু জলমুট মুখরোচক বিস্কুট। মৃদু নীচু করে কাপে চা ঢালছে ঝিন্নি।

আমি প্রায় চেঁচিয়ে উঠলাম ঝিন্নি তুমি!

ও মুখ তুলে শান্ত গলায় বলল এসো খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছ কিছু খেয়ে নাও।

আমি পলকে ঝিন্নির পাশে গিয়ে ওকে প্রায় জড়িয়ে ধরতে যাচ্ছিলাম ঝিন্নি একটু তফাতে সরে গিয়ে বলল আঃ কি হচ্ছে ভাগতু বাইরে দাঁড়িয়ে না?

চেঁচিয়ে ডাকলাম ভাগতু।

ভাগতু কাছেই ছিল এসে দাঁড়াল। বললাম দিদি এসেছে মোটেই জানিসনি বোকা-রাম। বুদ্ধি খরচ করে একটু তো করতে হয়। যা এখুনি বাজার থেকে নিয়ে আয়।

আমি এই মুহূর্তে ভাগতুটাকে ঘর থেকে ভাগাতে চাইছি।

কিন্তু এবারও বাদ সাধল ঝিন্নি। বলল কোন দরকার নেই ওর বাজারে গিয়ে। আমি মেঠাই এনেছি।

বোটাং ত্রিপ্রপাল

ঝিলি ভেতরে চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে কফি কেটে এনে রাখল খাবার টেবিলে। টোস্টো খুলে একটা প্লাস্টিক বের করে আমার প্লেটে রেখে বলল নাও খাও।

ঘেমে গেলাম। আমি যেন সত্যি লাজুক হতে চলেছি।

বেশ খানিকটা অভিমান নিয়ে তাকালাম ঝিলির মুখের দিকে। আমি চা খাচ্ছিলাম। পাশের চেয়ারটা চেয়ারে বসে ঝিলি তার চায়ের কাপ নিয়ে ঠোঁটে ছোঁয়াচ্ছিল। কোন কথা হচ্ছিল না আমাদের ভেতরে। এখন আমি প্রতি মুহূর্তে ঝিলির মুখ থেকে কিছু শোনার জন্যে কান পেতে ছিলাম।

ঝিলি কথা বলল আর কিছু নেবে?

সঙ্গে সঙ্গে নিজের কথার উত্তর নিজেই করে নিয়ে বলল এখন বেশী কিছু খেলে তো আবার রাতের খাবার খেতে হবে না। তার চেয়ে থাক।

বললাম আমি যখন বাংলোতে ঢুকে তুমিই কি বাগানের আবছায়ায় দাঁড়িয়েছিলে ঝিলি?

ঝিলি সঙ্গে সঙ্গে বলল সে অন্য কোন মেয়ে।

বললাম কে সে ঝিলি?

ও বলল কি দরকার তার খবর জেনে? যার খোঁজ নেবার দরকার থাকলে বাংলোতে এসে তার মুখেই জিজ্ঞেস করে জেনে নিতে [redacted]

আমি বললাম ক্ষমা চাইছি ঝিলি। আমি অন্ধকারে তোমাকে চিনতে পারি নি।

ঝিলি অমনি বলল বলেছি তো আমি নই।

আমার কেন সন্দেহই ছিল না যে আপেল গাছটার তলায় সন্ধ্যার আবছায়ায় ঝিলিই দাঁড়িয়েছিল। ওকে কোন প্রশ্ন করি নি তখন তাই বুঝি একটা অভিমানে ও নিজেকে কঠিন করে তুলেছে।

আমি চা খাওয়া শেষ করে শুধু বললাম তুমি আজ তোমার ঘরে এসেছ ঝিলি কারো ডাকের অপেক্ষা রাখনি। তাই বলছি এ ঘরের সুবিধে অসুবিধে সুখ দুঃখ সবই তোমার।

ঝিলি কোন কথা বলল না। কেবল দু-একবার আমার দিকে তাকিয়ে নেমে তাকল।

চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে ওর চেয়ারের পেছনে দাঁড়িয়ে নীচু গলায় বললাম আজ আমার উৎসবের রাত ঝিলি তুমি সেই উৎসবের দীপ জ্বালাবে মনোমতো বাংলোতে।

কথাটা বলে আমি সরে এলাম আমার বসার ঘরে।

ঝিলি একটু পরেই আমার পাশ দিয়ে চলে গেল আমার শোবার ঘরের দিকে।

বেশ কিছু সময় কেটে গেল ঝিলির আর দেখা নেই।

আমি পায়ে পায়ে শোবার ঘরের দরজার পাশে এসে দাঁড়ালাম। আধভেজানো দরজার ফাঁকে উঁকি দিয়ে দেখলাম আমার বিছানায় সুন্দর কারুকার্য একটি মেয়েলী শাল রয়েছে বুঝলাম ঝিলির হাত পড়েছে বিছানায়।

ঝিলি কিন্তু ওখানে নেই। আমি আস্তে করে ঠেলে ঘরে ঢুকলাম। ঘরের এককোণে টিপায়ের ওপর রাখা ফুলদানির ফুলগুলোর ওপরে ঝুঁকে আছে ঝিলি।

বললাম আপনার ঘরখানার চেহারা একদম পাল্টে ফেলেছ দেখছি।

ঝিলি এবার আমার দিকে ফিরে দাঁড়াল আমার কথার উত্তরে না দিয়ে বলল ফুল দানির এ ফুলগুলো কোথায় পেলে? আমাদের বাগানে তো নেই।

বললাম বাবু কোথা থেকে এনে সাজিয়ে রেখে গেছে।

ঝিলি এখান থেকেই বলল বাবু কে?

বললাম দার্জিলিং এসোসিয়েশন এক পরিচালক ওনেন ডাক্তার মেয়ে। বড় অসুখ তাই ডাক্তারখানার কাছে থাকিয়ে দিয়েছি।

ঝিলি পায়ে পায়ে সরে এল আমার পাশে। আমার মুখের ওপর ওর স্থির দৃষ্টি চোখের দৃষ্টি ছোঁয়া বলল তুমি তো কোনদিন এসবের কথা আমাকে জানাও নি।

ঝিলির গলার স্বরে কি ছিল জানি না ঠিক সেই মুহূর্তটিতে আমি কেমন যেন অসহায় বোধ করতে লাগলাম। যাকে কাল রাত ঘর তার কাছ থেকে বুঝি কোন কিছু গোপন করে রাখতে নেই। এই সত্যটা এতদিন মনে জাগে নি কেন হয়তো একটা ক্ষোভ জন্মাল নিজের ওপর। আমি সহজভাবেই

হায় অবস্থার কিছুটা সমাধান
ছিলাম কিন্তু সেটা যে আর
নানো দরকার তা আমি জান-
। কিন্নির কাছে তাই বারবার
ই ফেরে লাগে।
ন্নার উত্তর দিতে গিয়ে বললাম
হেকথা না জানিয়ে খুব অন্যায়
। কিন্নি। আমি জানতেও পারি
ন একটা তুচ্ছ ঘটনা তোমাকে
ার উচিত ছিল।

কিন্নি বলল তুচ্ছ ঘটনা বলছ কেন। তোমার আমার ভেতর ছোটবড় বলে তো কিছু থাকতে পারে না। দুজনে আমরা দুজনের কাছে সব কথা খুলে বলব তা যত তুচ্ছই হোক না কেন।

বললাম ভুল যদি হয়ে থাকে তার জন্যে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি কিন্নি।

হয়ত আমার গলায় স্বরে একটা অভিমান বেজে উঠে থাকবে কিন্নি হঠাৎ হাত বাড়িয়ে ঘরের সুইচটা অফ করে দিলে।

আর সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন আমার মাথা খাঁপিয়ে পড়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল।

আমি ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলাম। সেই মুহূর্তে কোন কথা দিয়ে ওর কান্না থামাতে চেষ্টা করি

একটা সন্দেহের কীট সূক্ষ্ম পায়ে ঢুকে পড়েছে কিন্নির মনের কীট ইতিমধ্যেই তার ধ্বংসের কা

CENTRAL LIBRARY

পাহাড়ের পথে মালবাহী টা

পাশে বসে ওকে আমার বুকের টেনে নিলাম। ও সঙ্গে সঙ্গে আমার ওপর ওর দু-হাতের আঙুলে দুষ্টো স ফুটিয়ে তার মধ্যে ডুবিয়ে রাখল ।।

মি আর ওর মুখ দেখতে চাইলাম না। নামী চুলে ভরা মাথার ওপর আমার । আলতো করে চেপে ধরে চুপচাপ নুভব করতে লাগলাম।

য়া হয়ে গেলে জাগতে বাগান চলে গেল বাইরের ঘরে শুতে। আমি ঘরে আসার পথে দেখলাম বসুই-পাশে অবস্থীতে আর একখানা বিছানা

থমকে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলাম ক তাহলে এখানে শোবার আয়োজন

র নীচে শেষে জাগন্তুর সঙ্গে। চাঁদটা যেন পাছের ডালে পাতায় আটকে ায় আলো এসে পড়েছে বাগানে। াবার ঘরে গিয়ে বসলাম। ল্যাম্পটা ালোয় মনে হচ্ছে পাতলা দুধে ভরা। উত্তরের পাহাড়ের ছবি স্পষ্ট হয়ে ন তখনও। তবে তার ওপারে পীর-র চূড়োয় সাদা বরফ চাঁদের আলোয় টে উঠেছে।

ার শোবার ঘরের আলো নেভানো। আলো জ্বলছে। আমি ল্যাম্পের ঘরখানার অবস্থিতি বরফ চেষ্টা করছি। কিন্তু অনেক তি ঘরে একখানা কোঠা দিয়ের ই স্পষ্ট দেখা যায় না রাতের আব-ই, দেওয়ার হাঁচের মেঝে!

এখন বাবু কি করছে? সারা ক্লান্তির পর ঘরের মেঝেতে বিছানা বি ওপর শুয়ে পড়েছে। হয়ত এখন অঘ ঘুমোচ্ছে সে। হয়ত বা সে আজ ঘুমোচ্ছে না। কোরকার রুদ্ধপথে আ মত চেয়ে আছে ভ্যালির দিকে। এমনও পারে আমারই মত বাবুও খুঁজছে এক ঘর, যে ঘরখানা ভ্যালির রহস্যময় পরপারে।

বাবুর ভাবনার সঙ্গে আমার কোন যো নেই তার কাজের সঙ্গে আমার পরিচয় কম কথা বলে। আমার ইংলিশগুলো সহজে ধরে নিয়ে ভাঙ্গা ভাঙ্গা করে বলবার ষ্টা করে। ভারতীয় হিসেবে ওরই খুশী। কিন্তু একটি তরুণীর কুমারী নিশ্চয়ই শুধু তার কর্তব্যের সীমানা শেষ হয়ে যায় না, চাঁদের আলোর জীবনের রহস্যময় অন্ধকারকে ছুঁয়ে যাওয়াতেই তার সুখদুঃখ। মাটির এ হলার ফুলের গন্ধ নিতে নিতে কেন দীর্ঘশ্বাস ফেলে তা সে জানে না। বসন্ত উতল হাওয়া যখন ফুলেদের আপোসে ছুঁয়ে যায় তখন কেন সে চঞ্চল স্থির হয়ে দাঁড়ায় তাও তার কাছে অজা তবু এই অচেনা আবেগের কারণটাই ভাবনার রাজা। এ রাজ্যের পথে পথে উদাসী পথচারিণী। বন্ধু হলেও হাওয়া হতে যেতে যেতে ফিরে দাঁড়ালো এ ন্যার চাঁদে।

প্রসঙ্গ

সাধারণতঃ রচনার নানা বিষয়কে আমরা সাহিত্য শ্রেণীভুক্ত করে থাকি। তার মধ্যে প্রধানতঃ কবিতা, গল্প-উপন্যাস, রম্যরচনা ও প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রভৃতিকে ধরা হয়ে থাকে। অবশ্য কবিতার মধ্যে আবার যেমন লেমেরিক, সনেট, গাথা প্রভৃতি শ্রেণী বিভাগ আছে তেমনি গল্প-উপন্যাস ও প্রবন্ধ-নিবন্ধের মধ্যেও আছে নানা শ্রেণী। মূলতঃ কাব্য-সাহিত্য, প্রবন্ধ-সাহিত্য ও কথা-সাহিত্যই (গল্প-উপন্যাস) আমাদের সাহিত্যের উপাদান এবং এই সকল বিষয়গুলিই আমরা নিজেদের রুচি অনুযায়ী পাঠ করে থাকি।

এবংবিধ সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে কাব্যের ন্যায় উপন্যাসেরও একটি বিশিষ্ট স্থান আছে এবং পাঠক শ্রেণীর মনে এর প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এই উপন্যাসের লক্ষণ ও উদ্দেশ্য নিয়ে বহুভাবে বহুস্থানে যেমন আলোচিত হয়েছে, তেমনি এই উপন্যাসই খ্যাতির দ্যোতক ও অর্থকরী হিসাবে লেখককে অধুনা অধিকতর মর্যাদাদান করেছে।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত 'নবজীবন' পত্রিকার ১২৯৪ সালের শ্রাবণ সংখ্যায় 'উপন্যাস' সম্বন্ধে একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। নিবন্ধটি বর্তমান কালের উপন্যাস লেখকদের মনে যেমন আলোকপাত করবে, তেমনি নূতন রচনায় যাঁরা উদ্যোগী তাঁদেরও পথনির্দেশে উৎসাহিত করবে সন্দেহ নেই।

।। উপন্যাস ।।

উপন্যাস-বিচারে দুইটি বিষয় প্রতিই সমান দৃষ্টি রাখিতে হয়—উপন্যাসের উদ্দেশ্য ও উপন্যাসের শিল্প-নৈপুণ্য (আর্ট)। আমরা বর্তমান প্রবন্ধে উপন্যাসের উদ্দেশ্য বা বিষয় সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিতে চাহি।

উপন্যাসের উদ্দেশ্য যদি সৌন্দর্যসৃষ্টি হয়, তবে অযথা তাহা প্রমাণ করিয়া ভাবিতে হইবে কেন? সব উপন্যাসের উদ্দেশ্য যখন একই হইল, তখন উপন্যাস-বিচারে সে উদ্দেশ্য নূতন করিয়া ভাবিবার আবশ্যকতা কি? বিচার তো, তুলনা দ্বারা? তবে যাহা সকল গ্রন্থেই এক, বিচারকালে সেটি তো ভাবিবারই দরকার নাই—এইরূপ প্রশ্ন সহসা মনে উঠিতে পারে। সৌন্দর্য সৃষ্টি যে উপন্যাসের উদ্দেশ্য, এ কথা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু এই বলি যে, 'সৌন্দর্য' এইখানে ইহার বিস্তৃত অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কথার অর্থ লইয়া কসরৎ করিতে গেলে, অনেক কথা বলিতে হয়, আমরা এখানে সেইরূপ করিতে প্রস্তুত নহি। স্বীকার করিয়া লইলাম যে, সৌন্দর্য-সৃষ্টিই সকল প্রকার চরিত্রের, সকল প্রকার উপন্যাসের উদ্দেশ্য। এই সৌন্দর্য যখন একটা গুণ, তখন ইহার বিভাগ অসম্ভব; সুতরাং স্বীকার করি সকল প্রকার উপন্যাসেরই উদ্দেশ্য একই প্রকার। কিন্তু এই গুণটি অবশ্য কোনও কিছুগত এবং এই কোনও কিছুর সহিত যোগেই ইহাকে সৃষ্টি করিতে হইবে, তবে সেই সৃষ্ট পদার্থটির প্রকার ভেদ থাকা সম্বন্ধে তর্ক না থাকিলে, ভিন্ন ভিন্ন উপন্যাস বা ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের উদ্দেশ্য বা বিষয় আছে, এ কথাও নির্দ্বিবাদে বলা যাইতে পারে। ফলতঃ ইহাই প্রকৃত কথা। উপরের কথা ভুল না হইলেও হয় অতি স্থূল, নহিলে অতি সূক্ষ্ম। মুখে সে কথা বলিলে কিছুই বলা হয় না।

বিবিধ প্রকার ভাবাদিগত চরমোৎকর্ষ সৃজনই উপন্যাস-চরিত্র-স্রষ্টার সাক্ষাৎ লক্ষ্য। কিন্তু গৌণভাবে আরও একটি লক্ষ্য আছে। সেটি পাঠকবর্গের চিত্তশুদ্ধিবিধান। পাঠকের চিত্তকে সৌন্দর্য অনুভব করাইয়া ইহার চিত্তশুদ্ধি বিধানই কাব্যের ধর্ম্ম। আমরা 'কাব্য' কথার অর্থ গোলে না পড়িয়া বলিব—উপন্যাসের ধর্ম্ম। কাব্যের অন্যাংশ আমাদের আলোচ্য নহে।

উপন্যাস এই দুইটি লইয়া—সৌন্দর্য ও চিত্তশুদ্ধি। কেহ কেহ এইরূপ মনে করেন যে, এই সৌন্দর্য প্রেমমূলক—শুধু তাহাও নহে, রমণী-প্রেমমূলক। কেহ কেহ এইরূপ মনে করেন, নীতি বা ধর্ম্মতত্ত্ব হইলে, তথায় সৌন্দর্যের অবস্থান অসম্ভব ব্যাপার। প্রচলিত অর্থ হইতে বিভিন্ন অর্থযুক্ত অথবা বিস্তৃত বা অনির্দ্দিষ্ট অর্থযুক্ত কথার ব্যবহারে প্রায় সর্বত্রই এইরূপ একটা ফল দাঁড়ায়। আমরা বলি, যে চরিত্র লইয়া উপন্যাস, সেই চরিত্রে যাহা কিছু আছে, ধর্ম্ম হউক অধর্ম্ম হউক, পাপ হউক পুণ্য হউক, তদ্বারাই সৌন্দর্য সৃষ্টি করা সম্ভব। যাঁহারা পাপ চরিত্র-দ্বারা আবার সৌন্দর্য-সৃষ্টি কি, বুঝেন না, তাঁহাদিগের সৌন্দর্য-সৃষ্টিই উপন্যাসের উদ্দেশ্য এ কথা বলিবার অধিকার নাই। কিন্তু পাপ-চরিত্রে যে পুণ্যচরিত্রেরই সৌন্দর্য প্রকাশিত হয়, উপন্যাস পাঠককে একথা বলিতে হইবে না। পাপ চরিত্র পুণ্য চরিত্রেরই ব্যাখ্যা করিয়া থাকে। কেবলমাত্র ইহা লইয়াও উপন্যাস হইতে কোন বাধা দেখি না। ইহাও পুণ্যের সৌন্দর্য অনুভব করাইয়া চিত্তশুদ্ধি বিধানে সমর্থ।

হৃদয়ের স্থায়ী ভাবমাত্রই লোকের নীতি হইতে পারে। চরিত্র তো এই স্থায়ী ভাব লইয়া? তবে উপন্যাস নীতিমূলক বলিতেই বা কি আপত্তি হইতে পারে? নীতির উল্লেখ অবশ্য উপন্যাসের কার্য নহে—নীতির ব্যাখ্যা বা তাহার কার্যাকার্য প্রদর্শনই উপন্যাসের কার্য। বঙ্কিমবাবু একস্থলে লিখিয়াছেন, কাব্যগ্রন্থ মনুষ্য-জীবনের কঠিন সমস্যার ব্যাখ্যামাত্র। কাব্য অর্থ যেরূপ বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে সংজ্ঞায়ও কিছু অর্থ-বিস্তৃতি আবশ্যক; কিন্তু আমাদিগের আলোচ্য উপন্যাস সম্বন্ধে কথাটি বড়ই সুন্দর ও যুক্তিযুক্ত।

উপন্যাস গ্রন্থ মনুষ্য-জীবনের সমস্যার ব্যাখ্যা মাত্র, কঠিন বা সহজ, উপন্যাসের বিচারকালেই দ্রষ্টব্য—উপন্যাস এই সমস্যা লইয়া। যাহাকে আমরা সদাচার নীতি বলি, সেই নীতি এই ব্যাখ্যা হইতে সংগৃহীত। এই নীতিতে যুক্ত হইয়াই উপন্যাসের চরিত্র সৃষ্ট হয়—উপন্যাস সৃষ্ট হয়। নীতিকে প্রচ্ছন্ন রাখে, তাই স্থূলদৃষ্টিতে তাহা পরিদৃষ্ট হয় না। উপন্যাসের নীতি-ব্যাখ্যা অনাবশ্যকীয় কার্য্য নহে। কারণ ইহা বুঝিলে 'আর্ট' ভাল বুঝা যায়। চিত্র ও চরিত্র এ সম্বন্ধে একরূপ নহে। চিত্রে ফুটাইতে 'আর্ট' নিয়োজিত হয়, চরিত্রে প্রচ্ছন্ন রাখিতেই 'আর্ট' ব্যবহৃত হয়। কারণও বড় সুন্দর, কিন্তু তাহা বলিবার এ স্থান নহে।

উপন্যাসের এই যে উদ্দেশ্যের কথা বলা হইল, উপন্যাসের প্রকৃত বিচারে তাহা নিতান্তই দ্রষ্টব্য বিষয়। এই উদ্দেশ্য বল, সমস্যা বল, নীতি বল, তত্ত্ব বল, ইহা না বুঝিলে, লিপি-নৈপুণ্য বুঝা যায় না। এই 'সাবজেক্ট' না বুঝিলে তৎপ্রতি নিয়োজিত 'আর্ট' বুঝা যায় না। এই আর্টের মাত্রা না বুঝিতে পারিলে, উপন্যাসের সৌন্দর্য উপলব্ধি হইল না এবং তাহা না হইলে উপন্যাসের বিচারই অসম্ভব।

দৃষ্টান্ত দ্বারা কথাটি বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

দুইটি চিত্রকর দুইটি চিত্র অঙ্কন করিল। একটি সরল রেখার—অপরটি মনুষ্যমূর্তির। প্রথমটি নিষ্কলঙ্ক হইল দ্বিতীয়টির স্থানে স্থানে কিছু কলঙ্ক রেখা গেল। ইহা দেখিয়া কি কোন বিচারক বলিতে পারেন যে, এই সরল রেখার চিত্রকর মনুষ্যমূর্তির চিত্রকর অপেক্ষা ভাল চিত্রকর? কখনই নহে। কারণ একটির বিষয় অতি সহজ, অন্যটির বিষয় অপেক্ষাকৃত অনেক কঠিন। আবার মনে কর, একটি অতি সুন্দর ভাবযুক্ত ছবি ও অন্য একটি বিবিধ উজ্জ্বল বর্ণরাজী বিভাসিত অনর্থযুক্ত ছবি তুমি একটি বালকের সম্মুখে ধরিলে; বালক ইহার কোনটি লইবে। অবশ্যই শেষেরটি। কেন? না, প্রথমটি অপেক্ষা সে শেষেরটিতে অধিক সৌন্দর্য দেখিতে পায়। কেন পায়? না, সে প্রথমটির 'আর্ট' বুঝিতে পারে না, সুতরাং সৌন্দর্যই বুঝিতে পারে না।

কেহ যদি এইরূপ বলিতে চাহেন, 'অত কথায় কাজ কি? যাহা আমার নিকটে সহজে ভাল লাগিবে, তাহাই ভাল বলিব, যাহা ভাল লাগিবে না, তাহাই মন্দ বলিব।' আমরা তাঁহাকে বলিব যে, এ তাঁহার বিচার হইল না। সৌন্দর্য দ্বারা বিচার করিতে হইবে বলিয়াই যে বুদ্ধিবৃত্তি প্রয়োগের আবশ্যকতা নেই এরূপ নহে। উপন্যাস বিচারকালে তাহাকে ধীরভাবে উপন্যাসের বিষয় ও তদুপরি প্রযুক্ত 'আর্ট' ভাল করিয়াই দেখিতে হইবে, নহিলে সুবিচার অসম্ভব।

কৃপাময়

CENTRAL LIBRARY

পৃথিবী তখন আলোর স্বল্পতায় ভুগছে। সূর্য ডুবছে। চাঁদ উঠতে বেশ দেরী। পাখিরা ফিরছে। মানে বেশ একটা পরিবেশ। ঠিক তখন আমি তার শোবার ঘরের দরজায় দাঁড়ালাম। সে আলগোছে শুয়ে কি পড়ছিল অন্যমনস্ক হয়ে।

আমার প্রথম ডাকে সে সাড়া দিল না। দ্বিতীয় ডাকে ধড়মড় করে বিছানায় সোজা দাঁড়াল। পাখিরা যেমন ধুলোয় গড়াগড়ি দেয়, গলা ডুবিয়ে মাটি মাখে। টানটান ডানা মেলে, ঠোঁট নখ দিয়ে সব ঝেড়েঝুড়ে ফরতে। তেমনি সেও শাড়ীর অবিন্যস্ত ভাঁজগুলো ঠিকঠাক করে একটি মেয়েলি মন্ত্রদোষ সারল। অর্থাৎ বাকের কাপড় একটু টেনে দিয়ে আলতো করে ঘাড় কুলুল—সত্যিই আসবেন, ভাবিনি।'

আমি ছোট্ট একটা অমায়িক হাসিতে পরিবেশ আরো মনোরম করে বললাম, বলেই তো রেখেছিলাম।'

আমার একটা স্বভাব, সবাই জানে, বসার সুবন্দোবস্ত থাকলেও শুতে পেলে ছাড়ি না। অবশ্য সটান শুয়ে পড়া নয়। বাম কাতে বাম পা লম্বা করে বিছানায় রাখব। তারই ওপর ডান পা কৌণিকভাবে আলতো ছুঁইয়ে বাম হাতের তালুতে মাথাটার ভর রেখে থাকি। আর ডান হাত সর্বদাই মুক্ত থাকবে, এই কারণে, যেন আমার বক্তব্যে সবিশেষ ভূমিকা নিতে পারে। মানে বেশ একটা ইয়ার্কি মাখা ভঙ্গি বলা যায়।

যাই হোক, এইভাবে খোঁপা নিয়ে ওর সামনে আমার লেখাটা তুলে ধরলাম। আপাত উদ্দেশ্য, আমার গল্পের নায়িকাকে নিয়ে একটা ম.স্কিলে পড়া গেছে। যেহেতু সেও নরুণী, অবশ্যই সে, সেই দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করে বলে দেবে নায়িকার কোন অবমাননা করে ফেলেছি কিনা। তার মতামত পেলে, তবেই আমার নায়িকাকে ওভাবে এগুতে দেব। এ-সময়ে কাঁধে একটা প্রবল চড়ুরীর কাঁকি দিয়ে সিগারেটের প্যাকেটটাকে এগিয়ে দিয়ে বললাম—এই হল, ধরো, অমলেন্দুর শয্যা।'

সে এতক্ষণ কুলের মিষ্টি সুবাস হয়ে বসেছিল। যেন সব পাপড়িগুলো মেলে দিয়ে ফুল। কিন্তু আমার প্রস্তাবে একটু নড়েচড়ে যথাসম্ভব চোখ দুটোকে ভাসিয়ে রেখে সিগারেটের প্যাকেটের দিকে তাকিয়ে

হইলো। যেন ঐ শয্যায় অমলেন্দুকে স্পষ্টই সে দেখতে পাচ্ছে।

'ধ্যেৎ এই হল অমলেন্দুর দরজা'—বলে দেশলাই কাঠিকে সিগারেটের প্যাকেটের অদূরে দেখে আবার বললাম—'এই দরজার কাছে সুষমা দাঁড়িয়ে, বিশেষ একটা দাবী নিয়ে। আর নিভৃত অমলেন্দু, হঠাৎ শব্দে চোখে অন্ধকার।'

মনে হল এবার সে একটা কঠিন দৃশ্যের মধ্যে পড়ে যাবে। তার প্রস্তুতি ছিসেবে শরীরের হাড়গোড়কে একটু শক্ত করে এনে দুই হাঁটুর ওপর থুতনি ছুঁইয়ে বলল—বলে যান, শুনতে পাচ্ছি।"

এই ফাঁকে আমিও আমার সেই টেরাকি-মাখা ভঙ্গিকে একটু বদল করে ফেললাম। এবার পা দুটোকে সামান্য মুড়ে সুস্থানতলে ফেলে রাখলাম। আর বাম কনুইয়ের ভর দিয়ে একটু উঠতেই দুষ্টু চোখ বিদ্যুতে পিছলে গেল। তার সামনের দিকে ঝুলে থাকা শরীরের শাড়ী জামা শিথিল। বুকের ওপর আলতো হয়ে লেগে থাকা ভারী রঙীন স্বপ্ন দুটো নিশ্বাসে উঠছে-নামছে। ভোরের কুয়াশার রং-মাখা সেই স্বপ্ন দুটোর ভাঁজ আমার চোখকেও নিবিড় মোহময় করে তুলছে। আমি যেন তার সুগন্ধও পেয়ে যাচ্ছি। এবার ওর আরো গভীরে প্রবেশ করতেও আমার আর কোন লজ্জা থাকছে না। সেই সাহস আমি অর্জন করে ফেলেছি। আসল প্রসঙ্গে আসতে আমার যা কিছু লজ্জা বাকী ছিল তা কাটিয়ে উঠেছি। ওর কাছে আরো সহজ হয়ে পড়ছি, এই ভাবটা এসে পড়তেই বলে ফেললাম—কি যেন বলছিলাম, হ্যাঁ। তার আগে ভূমিকা হিসেবে বলে রাখা ভাল—অমলেন্দু, সংযমের স্বামী সৌমেনের বিশেষ বন্ধু। ওদিকে, কুলশব্যার রাতে লজ্জায় এবং সংকোচে সুষমা এবং স্বামী সৌমেনের মধ্যে কোন দৈহিক সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারেনি। অথচ তারই পরদিন বিশেষ কেনাকাটা করতে গিয়ে শহরে দুর্ঘটনায় সৌমেন মারা যায়।

এই সময়, সৌমেনের আকস্মিক মৃত্যুকে সে সহ্য করতে পারছিল না। মনে হল তার নাভিমূলে আচড় দিয়ে উঠে বুকে বেরে এসে নাক দিয়ে একটা সমবেদনার শব্দ উঁহু বেরিয়ে এল।

আমি কিন্তু আমার গল্পের নায়িকার স্বামীর হত্যাকাণ্ডকে গ্রাহ্যই করলাম না। দুটো রঙিন চোখে আমি কলাই হয়ে গেছি। সৌমেন সেখানে তুচ্ছ। নাটকের ক্লাইম্যাকসে অমলেন্দুকে এনে ফেলতেই আমি ব্যস্ত।

তাই মনে সেই হাতটাকে সজোরে নাড়িয়ে বললাম—তবু ঐ সময়ের মধ্যে সৌমেনের মুখে অমলেন্দুর নাম বহুবার সুষমা শুনেছে। আচ্ছা, এবার হচ্ছে—ধরো, অবশ্য গল্পে যেভাবে লিখেছি—গ্রামের বাড়িতে সৌমেনের বাবা একা থাকতেন। সেখানেই সদা-বিধবা সুষমা থেকে যাবে। শ্বশুরের জন্যই। ফিরেও সে যেতে রাজী নয়। অথচ থেকে যেতেও কষ্ট। কারণ, এদিকে কিরণ ধোপার বাড়ি। শ্বশুরের মাসা গেলে একা। অবলম্বনহীনা। অন্যদিকে নারীর চিরন্তন মাতৃত্ববোধ। সব মিলে এক ব্যূহ যন্ত্রণা।'

ঠিক এই সময়ে ওর যেন চা দিয়ে গেল। গেলাসের মধ্যে বিস্কুট-ফিস্কুট থাকতে পারে। আমি ওদিকে চাইছি না। আসলে আমি ওর যেন্দকে এই মুহূর্তে আমাদের মধ্যে আড়ী সহ্য করতে পারছি না। কারণ ওর দিদির সঙ্গে একটু বাদেই একটা যৌন প্রশ্ন এসে যাবে। তারই ভূমিকা হিসেবে একটা প্রসঙ্গের ভাব তৈরি করে ফেলেছি। এটুকু নষ্ট হয়ে যেতে দিতে চাই না। তাছাড় এটও যাতে প্রকাশ না হয়ে যায়, অন্ততঃ রাজী নই যে আমার মনের উঠোনে যে অরণ্যানি, তাতে এলোমেলো যে হাওয়া সেই অরণ্যকে কাঁপিয়ে দিয়ে যায়, সে কে, কাউকে বুঝতে দিতে চাই না। সেই অরণ্যের আনাচে-কানাচে সেই হাওয়া ছাড় আর কোন কীটকেও প্রবেশ করতে দিতে চাই না। তবু, স্বাভাবিক সৌজন্যে এবং একটা যেন মমত্ববোধ ওদের সারা পরিবারের জন্য, এই ভাবটা ফুটিয়ে ওর বোনকে বললাম—কি বেবন, বেশ ভাল তো?'

কিন্তু উত্তরের অপেক্ষা না করেই আসল প্রসঙ্গে ফিরে যেতে ওর দিদির দিকে প্রশ্ন ছুঁড়লাম—কি যেন বলছিলাম!'

আসলে আমি চাইলাম, এই ফাঁকে যেন ওর বোনটি চলে যায়। দেখলাম সেই বোনটি সেটাই একটু হাসি ছড়িয়ে চলে যাচ্ছে।

চেতনের অসাড়ত্বদোষ ঘামটা শুকিয়ে আসতে বাহুতে বলপ্রয়োগ করে ওকে বললাম—'ওদিকে' অমলেন্দু তার বন্ধু সৌমেনের বিয়েতে আসতে পারেনি। কাজে আটকে পড়েছিল। বিয়ের দিন কুড়ি বাদে হঠাৎ চমকে সেবে ভেবে সেই গ্রামের বাড়িতে এসে শোনে সৌমেন মৃত। অমলেন্দুর মনে হবে যেন এই মাত্র একটা ডিনামাইট ফেটেছে। সামনের যা-কিছু সব মুহূর্তে ছিন্ন, উৎক্ষিপ্ত, ধ্বসিত। তার জ্ঞান ফিরেছিল সুষমা যখন ঘরে প্রবেশ করে।'

এই সময় সে তার বসার ভঙ্গি সামান্য পাল্টে ফেলল। আঁচলের খুঁটে কপালের ঘাম মুছে নেয়ালের দিকে তাকাল। বিশেষ কিছু ভেবে আমিও তাকালাম। দেখি একটা টিকটিকি আকারণ ঠোকাতে ঠুতে পালাতে গিয়ে মেঝেতে থপ করে চিৎ হয়ে পড়ে গেল। মুখ ঘুরিয়ে ওর দিকে তাকাতেই চমকে গেলাম। মনে হল যেন কোন শিল্পী ধৈর্যের বাটালি দিয়ে কুঁদে কুঁদে রেমাণ্ডের শিখা ছড়িয়ে দিচ্ছে ওর স্থবির মুখে। অনিচ্ছা, অনীহার এই স্থাপত্যকে শিল্পীর যেন পছন্দ নয়। একটা আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে দিতেই শিল্পী ব্যস্ত। আর সে, সেই আঘাতে আঘাতে ক্রমশঃ মসৃণ উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। আমি যেন তারই ইঙ্গিত দেখতে পেলাম।

'হ্যাঁ'—আমি বললাম—'এইবার আমার আসল প্রসঙ্গে এসে যাচ্ছি।' বলেই ভাবলাম, আসলে এটাই কি আমার আসল প্রশ্ন? আমার উঠোন প্রাঙ্গণে যে অরণ্য, তাতে একটু ঝড়ঝড় উঠুক। কেঁপে-ফেঁপে উঠুক পাগল হয়ে ঝড়ুক পাতাটাতা। আসলে এই সবই কি চাইছি না মনের গভীরে? কিন্তু আসলে আমি ভীরু। ঝড়ের সম্ভাবনাকে স্বীকার করতে পারছি না। তাই ফাঁদ গল্পের মাঝেস এঁটে সন্তর্পণে তাকে বললাম—সুষমার সুপ্ত মাতৃত্বের যে বোধ ঘুমিয়েছিল, তা অমলেন্দুকে দেখেই জেগে ওঠে। অমলেন্দু সম্পর্কে স্বামীর কাছে যা শুনেছিল তাতে করে একটা শ্রদ্ধা তৈরি হয়েই ছিল। অমলেন্দুকে দেখে তৈরি হয়ে গেল একটা আকর্ষণ, পাবার একটা আকাঙ্ক্ষা। আর এমন অন্বিষ্টার সুযোগ ফিরে নাও আসতে পারে এই জন্য যে, স্বামীর মৃত্যু সংবাদে অচেতনা অমলেন্দুকে যে-ঘরে শোয়ান হয়েছে, স্বভাবতই তার দরজা খোলা। সুষমা অনায়াসে সেই ঘরে প্রবেশ করে অমলেন্দুকে জাগিয়ে দেখাতে পারবে যে, অন্ততঃ এই রাতের জন্য সুষমার মিলিত হতে চায়—যা হবার জন্যই।"

আমি সিগারেটের প্যাকেট দেখিয়ে বললাম ওকে—এখানেই অমলেন্দু থাকে। আমি পুরুষের বিচারে বলে দিতে পারি যে, এ-ধরনের আকস্মিক প্রস্তাবে অমলেন্দু যতই অবাক, হতচকিত বা বিহ্বল হয়ে যাক, তবু সে পুরুষ। একজন পুরুষের

মুকুল চক্রবর্তীর

সাহেব বোষ্টম

৮-০০

বিজ্ঞানের একজন ছাত্র ও ছাত্রী নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে ধনছুমের পাহাড়ে জঙ্গলে ঘরে ঘরে ইউরেনিয়াম সংগ্রহ করে মার্কিনীতে পাঠিয়েছিল তারই অভিনব কাহিনী।

নাথ ব্রাদার্স

১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট

কলিকাতা-১২

পশ্চিমবঙ্গের পরিবেশক :

স্যান ট্রেডিং কর্পোরেশন

৩৬, বহু বাজার স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০২০

কাছে গভীর রাতে এভাবিনী: যার সর্বাঙ্গে যুবতীর। যে দেহ থেকে ঝকঝকে রং আর যৌবনের আগুনে ঝলসে এবং কেরোসিনের আলোকের স্বল্পতায় যথেষ্ট না খুব স্পষ্ট, তা ওর চোখ দুটি। চিকচিক করছে। একেই কি বলে কামনা? মানে ন্যায়-অন্যায়, বিবেক-বিবেচনা ইত্যাদির স্বপক্ষে অমলেন্দুর মনে যতই আসুক, ছেড়ে যেতে হবেই, মানে সে ছেড়ে যাবেই। যেহেতু সম্ভাব সে আগেই পেয়ে গেছে।'

একটানা এতক্ষণ মনের ভাবনা প্রকাশ করে ফেলতে পেরেছি ভেবে স্বাস্তির নিশ্বাস ফেললাম। সেই সঙ্গে একটা সিগারেট ধরিয়ে ওর দিকে চাইতেই চমকে উঠলাম। মনে হল ওর চোখ-মুখ অসম্ভব রকমের লাল। জ্বর এসেছে নাকি। উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম — কি হল শরীর খারাপ লাগছে নাকি?'

সে সঙ্গে সঙ্গে সপ্রতিভ উত্তর দিল ঠোঁটের কষ আঁচলে একটু মুছে—না কিছু না এই এমনি।'

যাক আমি তাহলে কিছু বুঝি—বলে ভাল করে তাকিয়ে ওকে দেখলাম। বেশ বুঝলাম এতক্ষণ যে স্নানটা দিয়ে ঘরের পরিবেশ গরম করে রেখেছিলাম তার উত্তাপ ওর গাল থেকে এখনও মিলিয়ে যায় নি। কানের লতি এখনও বেশ রক্তিম।

এও মনে হল এটাই হয়ত ঠিক সময় আমার চরম পাবার। এই ভেবে একটু সাহসী হয়ে উঠে ওকে জিজ্ঞাসা করলাম—'এইবার তুমি নারীর বিচারে বলে দাও যে সুরমা ঐভাবে সন্তান কামনায় অমলেন্দুর কাছে পৌঁছুতে পারে কিনা। বা আমার গল্পের সুরমাকে ঐভাবে দাঁড়িয়ে নারী চরিত্রের কোন অবমাননা করে ফেলেছি কিনা?'

সে তার কথা বলার অভ্যাস ভঙ্গিতে ঘেড়ে শরীরের একটা মৃদু ঝাঁকুনি দিল. চুলের খোঁপা থেকে শুদ্ধ অবধি একবার হাত বুলিয়ে বলল—'কি বলব?'

ওকে দেখে মনে হচ্ছিল তার মনে বলবার মত অনেক কথা জমে আছে। সব তৈরি শুধু করতে পারলেই গলগল করে বের হবে। এবার আমি মৃদু অথচ কপট উষ্ণ রাগে বলে উঠলাম—'কি বলব মানে? এতক্ষণ যা বলে এলাম তাই বলবে বলে।'

এবার সে তার স্নেহহীন হাসকা অথচ যেখানে যেমন সব ঠিকঠাক সেটার দিকে একবার তাকিয়ে বলল—'আমার মতে বিয়ের আগের ফলশ্রুতি সন্তান। সুরমার বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু [illegible]

আগেই স্বামীকে হারায়। শহরে কুল কলঙ্কে সর্বশিষ্ট একলুব। দ্বিতীয় কেউ নেই। এর অবর্তমানে দীর্ঘ একাকীত্ব। অথচ পিতৃগৃহেও ফিরবে না।'

'ঠিক কথা আমি এটাই তোমাকে বোঝাতে চেয়েছি'—অকারণ ওর কথার মধ্যে প্রবেশ করে আবার বললাম—'তারপর?'

সে বলল—একেত্রে তার মানে সুরমার সন্তান কামনার অমলেন্দুকে মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করতে সংকোচ বা দ্বিধা নাও আসতে পারে।'

একটু থেমে সে আবার বলতে থাকল—'তাছাড়া সাহিত্যে এমন নজির নেই এমন নয়। সেদিক থেকে দেখতে গেলে সুরমা চরিত্রের অবমাননা করে ফেলেছেন বলে আমি মনে করি না।'

উত্তরে আমি আত্মহারা হয়ে—'যাঃ ঠিক তাই'—বলে খুশীর আমেজে আরো একটা সিগারেট ধরিয়ে ওকে একটু ছুঁয়ে ফেলব কিনা তাই ভাবছি। ঠিক সেই সময়ে আমার সেই বোন এসে উপস্থিত। হাতে মিষ্টির প্লেট। রেখেই চলে গেল।

আঃ। বাঁচা গেল। সবে আমার খুশীর পালে সবাতাস বইতে সুরু করেছিল, এই সময়ে কেন বোন-ফোন, কেন রকম প্রতিবন্ধকতাই আমি সহ্য করব না। এখনই তরতরিয়ে বেয়ে চলব। যেতে যেতে কোন অজানা দ্বীপে পৌঁছে যাব। সেই দ্বীপে এবার মনোরম পাখিদের, সমুদ্রের নগ্ন জীবনের আমি দেখব, সোনালী বালুকে আমি কুড়িয়ে নেব। তারা কি বলে 'প্রয়োজনের কথা এগিয়ে যায়, ঘনিষ্ঠ হয়, দৃষ্টি দিয়ে আস্বাদন করে, এই সব আমি ভাবব। আকাশের নীল তারাদের দিকে তাকিয়ে দেখব তারা কি করে ছুটে যায়। এই সব। আরে কিছু।

এইসব অনেক কিছুর ভাবনা মিশ্রিত মায়াময় চোখে তার দিকে তাকালাম। সেও কি এসব ভাবছে? তার স্নেহের প্রতিটি ভাঁজে কোন রোমাঞ্চের ঢেউ খেলে যাচ্ছে কি এখন? তার চোখের অতলে যে সাগর সেই সাগরের অতলে যে অমৃত; তা কি আমারি দৃষ্টির রোমন্থনে উঠে আসবে? বা আমি দেখতে পেয়ে যাব? হয়ত হচ্ছে। উঠে আসছে। এসে গেছে। সে এখন আগের থেকে অনেক বেশী উজ্জ্বল অনেক বেশী প্রগলভ। আগের মত আড়ষ্ট আর সে নয়। অনেক সহজ হয়ে এসেছে সে আমার কাছে।

এই তো কি সুন্দর আমার মুখের দিকে তাকাচ্ছে। তার মাথার বালিশ আমার দিকে [illegible]

সঙ্গে লেগে থাকা অংশের তলায় ওটা দিয়ে যাতে আমি আরাম করতে পারি। সেই বালিশের ঢাকনা থেকে এখন চুলের মৃদু সৌরভ আমি পেয়ে যাচ্ছি। এতক্ষণ এই বালিশ বুকে চেপে অমলেন্দুর দয়ার দিকে তাকিয়ে ছিল। সেই বালিশ থেকে এখন আমি তার নরম বুকের মিষ্টি স্নিগ্ধ স্পর্শও পেয়ে যাচ্ছি। এবার সে আমার আহারের দিকে তাকাচ্ছে। প্লেটের সবটুকুই যাতে খেয়ে নিই তার জন্য যেন চাপ দিচ্ছে। স্নেহের প্রতিমূর্তি। সবটুকুই আমি একা খেতে পারি না। কষ্ট। সেটা জানানোতে যেন দৃষ্টি দিয়েই শাসন করতে পারছেই নারীর বিচিত্র রূপ ওর দেহে একযোগে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। এবং তারই প্রতিক্রিয়ায় মোহিনী হয়ে উঠতেই লজ্জায় একটুকু হয়ে বলে ফেলল—'আহা! ওইটুকু তো খেয়ে নিন না।'

একা খাওয়াতে কোন আনন্দ নেই। সুখ নেই। স্বার্থপরের মত খেয়ে ফেলা। তার থেকে আধাআধি ভাগাভাগি। যেন সব কিছুতেই তাই। চমকে দিয়ে মিষ্টি কেটে একেও দিতে চাইলে প্রথমে প্রবল আপত্তি। কিন্তু করুণ করে তাকিয়ে বাধ্যের জন্যকোপ করতে সে যেন একটু নরম হয়ে এল। তাতেই আরো সাহসী হয়ে ওর দেহের গন্ধের কাছাকাছি গিয়ে চামচের মিষ্টিটা তুলে ধরে রেখেই বললাম—'নাও ধরো। টলছে পড়ে যাবে।'

আমার ইচ্ছার কাছে সে হেরে গেল। কিম্বা ইচ্ছাকে সে করুণা করল। বুঝলাম না। কিন্তু মিষ্টি নিল হাত পেতে। একবার নয়। মিষ্টির রকম ফের তিন টুকরো।

এবার আমার ওঠা উচিত। আমার গল্পের জটিলতা যা আমারই সৃষ্টি: মানে যাকে জটিল মনে ভেবে এখানে আসতে চেয়েছি তা কুড়িয়ে গেল। মানে গুট জাড়িয়ে দিয়েছে। তবু এই নিয়ে বেশ খানিক সময় কাটিয়ে দেওয়া গেছে। অর্থাৎ আমার সেই অরণ্যে যা আমার মনের উঠান জুড়ে মোটা-মুটি একটা অনুকূল বাতাস বয়ে গেছে। অবশ্য ঝড়ের কোন সম্ভাবনা দেখছি না। আপাতত পর্ব শেষ। জলতা উঠতে হয়।

কিছুদিন আগে কবে যেন? হ্যাঁ মনে পড়েছে। গত বৈশাখে সে এসেছিল। অপ্রয়োজনীয় অনেক কথার পর একটি প্রয়োজনের কথা বলেছিলাম। আমার দৃষ্টিটু অভ্যাসের প্রতিটি আসবাবপত্র মানে খাট আলমারী বাকস ইত্যাদি অর্থাৎ যারা আমার নিত্যসঙ্গী: তাদের কাছে পেয়ে সাহসী হয়ে বলতে পেরেছিলাম—সে আমার প্রেরণা। কিন্তু আমার এতবড় একটা বুক ভরা কথা শুনেও তার মনের বা দেহের তলে কোন [illegible]

বাচ্চাদের বড়সড় করে গড়ে তুলুন ইনক্রিমিন* দিয়ে

ছেলেবেলার দিন—হেসে খেলে টিকমত বেড়ে ওঠার দিন! এই সময়ে ওকে ইনক্রিমিন সিরাপ নিশ্চয়ই দেবেন। তারপর দেখবেন ওর খাওয়ার আগ্রহ! খাওয়া নিয়ে আলাতন তো দূরের কথা, খিদে বেড়ে গিয়ে যেমন খুশি হয়ে যাবে তেমনি চটপট বেড়ে উঠবে।
ইনক্রিমিন উপকারী ভিটামিন আর আয়রনে ভরপুর তো বটেই, তার চেয়ে বড় কথা— এতে যে বিশেষ অ্যামিনো অ্যাসিড, লাইসিন আছে—তা আপনার বাচ্চাকে আহারের পুরো পুষ্টি গ্রহণ করতে সাহায্য করে।

ইনক্রিমিন* টনিক ড্রপস্—৭ মাস থেকে ২ বছরের বাচ্চাদের জন্যে
সিরাপ—১৪ মাস থেকে ৭ বছর পর্যন্ত বয়সের বাচ্চাদের জন্যে

বাড়তি আহারকে বাড়তি বৃদ্ধিতে পরিণত করে

ডাক্তারের কাছে নির্ভরযোগ্য নাম—

গ্লাক্সো লাবরেটরিজ (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড-এর একটি বিভাগ *আমেরিকার গ্লাক্সো কোম্পানীর রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক

CENTRAL LIBRARY

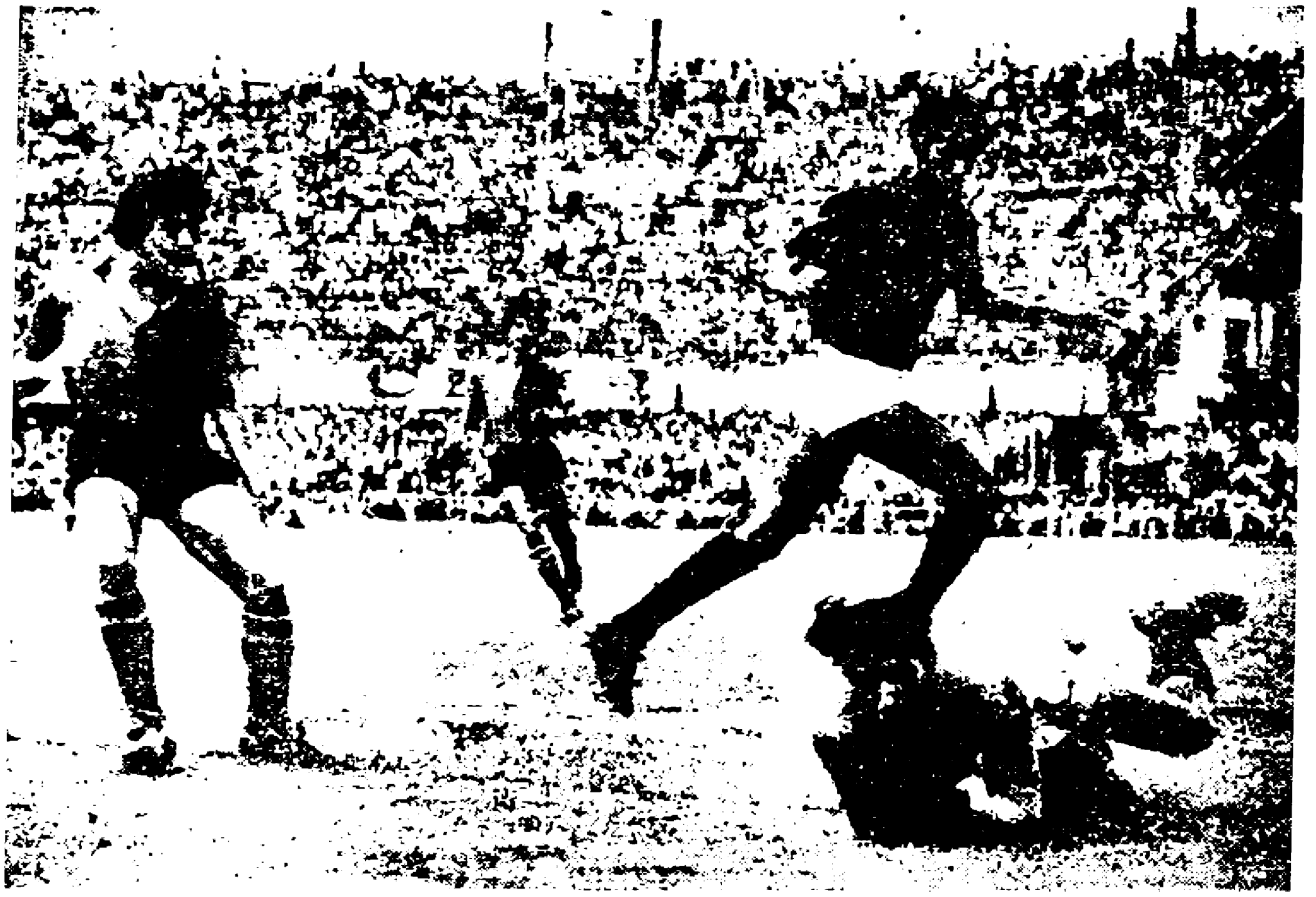

মাঠথেকে ফেরা

লীগ মরশুমের বড় ফুটবল

গত ১২ জুলাই ফুটবলের আসর ভাঙার পর ইডেন থেকে বেরিয়ে আসার সময় সোরগোড়াতে দেখা জনকয়েক নামী দামী ফুটবলারদের সঙ্গে। দল বেঁধে ওঁরা লীগ মরশুমের বড় খেলা দেখতে গিয়েছিলেন। দেখার পালা শেষ করে দল বেঁধেই ফিরছিলেন। আমাকে দেখতে পেয়ে একজনই যেন কাঁপিয়ে পড়ে বললেন এই কি বড় খেলা হলো? স্ট্যান্ডার্ডের কি হালই হয়েছে! তোমরা লিখতে পারো না। বড়দের ড্রপ গেল কোথায়!

যেন অপরাধ আমাদেরই, যারা কলম ধরি। যাঁরা খেলেন, যাঁরা খেলান তাঁদের নয়!

তোপের মুখে পড়ে তাৎক্ষণিক জবাব দেবার মতো পুঁজি খুঁজে পাই নি। আমতা আমতা করে সেদিন পাশ কাটিয়ে ছিলাম। কিন্তু ওঁদের অভিযোগ যে মনকে নাড়া দেওয়ার মতো এক অভিমত তা অস্বীকারই বা করি কি করে!

সত্যিই তো বড়দের বড় কাজের নজনো কোথায়? স্ট্যান্ডার্ডের যা ছিরি তা তো ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের মুখোমুখি প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবকাশেই দেখতে পেলাম। নাম নামী দল, দামী দামী খেলোয়াড়। আয়োজন ঘিরে সোরগোলেরও অন্ত ছিল না। কল্পনা কল্পনা বিশেষজ্ঞদের সোচ্চার মত ঘিরে ধরে তখাই না ছড়িয়েছিল খেলা আরম্ভ আগে। কিন্তু আসলে খেলা যা হলো, ে জাতের ফুটবল হলো পরিবর্তিত যু কৌলীন্য মর্যাদা কি অটুট ছিল? যেমন সে ভোলো অনুষ্ঠান। উদ্যোক্তাদের প্রচ মাতো ছিল দর্শক আর খেলোয়াড়দের মনে ত্বা সিক ভাগের স্পর্শেও আসল খেলাটি উ হয়ে উঠতে পারেনি।

জাত ফুটবলের মূল সম্পদ হলো ত প্রাণবন্ত মেজাজ। বুদ্ধির ছোঁয়ায় যা পরি র্শতে উজ্জীবিত। ফুটবলের কাঠামোয় এ প্রাণ সঞ্চারিত হয় খেলোয়াড়দের সক্রিয়তায় এই সক্রিয়তার উৎস শুধু দৈহিক সংগঠ নয়। মস্তিষ্কের প্রেরণাও বটে। ফুটবলে সক্রিয়তা মানেই অর্থপূর্ণ কিছু ক্রিয়াকলাপ একপক্ষ বাধা দেয়। সেই বাধার অচলায়ত ভেদ করার দেহের সঙ্গে মস্তিষ্কের সমন্ব ঘটিয়ে পাতা ফাঁদ এড়িয়ে যাওয়ার কৌশলে সক্রিয়তার যোগাড় রাখতে হয়। নইলে শু ছোটাছুটি, লাফালাফি করলে তা নিরর্থ পণ্ডশ্রমেই পর্যবসিত হয়ে পড়ে।

যাঁরা অর্থ ও উদ্দেশ্যপূর্ণ ক্রিয়াকলা অভ্যস্ত তাঁরাই পারেন ফুটবলকে জাতে তে

তুলতে। যারা নিরর্থক হাত-পা ছোঁড়ার দাস, তাঁরা উজাড় করা প্রাণশক্তির বিনিময়েও মূল অনুষ্ঠানকে তন্দুরুস্ত মানে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন না। শনিবারের ঘটনাবলীর দিকে তাকিয়ে দুঃখের সঙ্গেই আজ স্মরণ করতে হচ্ছে যে এই অনুষ্ঠান প্রাণের উষ্ণতায় প্রাণময় হতে পারেনি। নিরর্থক কিয়া-কলাপের পরিণামে মাঠমুখো অবক্ষয়ের স্তূপটিই ক্রমশই বড় হয়ে উঠছিল। মেহনত করতে করতে হয়তো অনেকে বেদম হয়ে পড়ছিলেন। কিন্তু সে সবই যুক্তি উদ্দেশ্য-বিহীন, নিরর্থক হয়রানির ফলশ্রুতি।

আমরা যতোই বলি না কেন যে ফুটবল শক্তি, সমর্থ জোয়ানদের খেলা, আসলে মস্তিষ্ককে ছাঁটাই করে শুধু দৈহিক সম্পত্তিকে আঁকড়ে ধরলে ভাল ফুটবল খেলা সম্ভব নয়। শুধু ফুটবলই বা বলি কেন। সব খেলা উপলক্ষেই এই কথাটি বেবাকের মতো খুব সত্য। মন-মাথা চলে আগে। তাদের টানে দেহ এগোতে শুরু করে পরে। বলতে দ্বিধা নেই যে শনিবারের ওই আসরের নায়কদের অনেকেই মনের দিক থেকে আগে-ভাগে প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁদের প্রতিবর্তী ক্রিয়া ছিল জমাট-বাঁধা বরফের মতো শীতল। সম্ভাব্য পরিস্থিতি আন্দাজে তাই দীর্ঘ-সূত্রতা প্রশ্রয় পেয়েছে। দেখে মনে হয়েছে যে কেউ কেউ যুদ্ধি মাঠে নেমেছেন খেলা দেখতে। খেলতে নয়। হঠাৎ তাঁর কাছে বল আসা মাত্র কিছু করতেই হবে এই ভাবনার তাগিদে অকস্মাৎ সক্রিয় হতে চেয়েছেন। কিন্তু হঠাৎ কিছু করতে গেলে সব কাজকে গুছিয়ে করা সম্ভব হয়? না, তা করে তোলায় অযাচিত সুযোগ বিপক্ষের খেলো-য়াড়েরা তাঁদের উপহার দেন? অপরপক্ষকে যাঁরা নির্বোধ ভাবেন, তাঁরা নিজেরা কি সত্যিই বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ?

সবচেয়ে নিরাশ করেন দুপক্ষের ফরো-য়ার্ডেরা। একালের সুসংগঠিত ক্রীড়া পদ্ধতি-প্রকরণের কল্যাণে রক্ষণভাগের খেলোয়াড়েরা আরও আটোসাটো রক্ষণব্যূহ গড়ার মন্ত্র জেনে ফেলেছেন। এই মন্ত্রগুপ্তির দৌলতে তাঁরা ওপক্ষের পুরোভাগের খেলোয়াড়দের নিত্য নতুন সমস্যার মুখে ঠেলেও দিচ্ছেন। এই সমস্যা সমাধানে ফরোয়ার্ডদের আগের চেয়ে আরও বেশি পরিমাণে ক্রীড়াগত উৎকর্ষের মূলধন যোগাড় রাখতে হয়। উজ্জীবিত হতে হয় সৃষ্টিধর্মিতায়। কিন্তু বাড়তি তো দূরের কথা, অতি সামান্য মূলধন যোগাড় করতেই যেন সেদিন ইস্টবেঙ্গল ও মোহন-বাগানের ফরোয়ার্ডদের হিমসিম খেতে হয়েছে। যার ফলে দু পক্ষের বেশির ভাগ ফরোয়ার্ডদের আচরণ ঘিরে তেমন কোন আশার ছবি ফুটে উঠতে পারে নি।

ফরোয়ার্ডেরা খেলতে পারলে, নিজেদের দায় দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন থাকলে, সৃষ্টি-ধর্মিতার তাগিদে যেমনে সমন্বয় ঘটাতে পারলে খেলায় গোল হয়। অথবা গোলের সুযোগ সৃষ্টি করা যায়। ওই শনিবারে কটি গোল হয়েছে? এবং কবারই বা গোল করার অনুকূল পরিস্থিতি ফরোয়ার্ডেরা গড়তে পেরেছেন?

গোল হয়েছে মাত্রমাত্র একটি। আর ফরোয়ার্ডদের সামনে গোলের সুযোগ এসে পড়েছে বার তিন-চার। সত্তর মিনিট ধরে ঘর্মাক্ত কলেবর চেষ্টার সূত্রে এই কটি কাজ ফরোয়ার্ডেরা করতে পেরেছেন। এ থেকে কি বোঝা যায় যে দু পক্ষের ফরোয়ার্ডেরা নিজেদের নাম ডাক, অর্থমূল্য এবং দর্শক-দের প্রত্যাশার প্রতি সুসমঞ্জস থাকতে পেরেছেন?

আর গোল করার সহজ সুযোগ হেসে-খেলে উড়িয়ে দেওয়ার দৃষ্টান্তগুলিকেও কি ভাল খেলার নমুনা বলে তারিফ জানাতে হবে না কি? গোলের জন্যেই খেলা। গোল করার চেষ্টাতেই এতো পরিশ্রম, মন বোঝা-বুঝি, বুদ্ধির প্রয়োগ এবং কৌড়া প্রথা প্রকরণ অনুসরণ। আর সেই গোলের সুযোগ যখন আসে তখন বিত্তবান পরিবারের বাউন্ডুলে ছেলের মতো সেই সুযোগ অকাতরে অন্যের হাতে তুলে দেওয়া নিশ্চয়ই ভাল খেলার পরিচায়ক নয়। দৃষ্টান্তগুলিকে নিছক ভাগ্যের কারসাজি বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। যেহেতু যে কোনো খেলার আসরে ভাগ্যের ভূমিকা যতো থাকে তার চেয়ে শতগুণে বেশি থাকে খেলোয়াড়দের নিজেদের কর্মকাণ্ডের প্রভাব! খেলায় ভুল করলে দৃষ্টান্তটি 'ব্যাড লাক' বলে তাচ্ছিল্য জানানোর অর্থই হলো ভুলচুকের যথাযথ মূল্যায়ন না করা। একের অপরাধের বোঝাটিকে হালকা করার উদ্দেশ্যে আঙ্গুর এক কৈফিয়ৎ খাড়া করা। ব্যাড লাক আর ব্যা খেলার মধ্যে মৌল পার্থক্য রয়ে গেছে। দুটি জিনিষ যে এক নয়, একথা কি বলে বোঝাবার দরকার পড়ে?

দু শরিকের ক্রীড়া দ্বন্দ্বের অবকাশে বিক্ষিপ্ত লগ্নে ফরোয়ার্ড হিসেবে নজরে পড়েছেন শ্যাম থাপা ও উলগানাথনে। বাকীরা খরচের খাতায় তাও থাপা বা উলগা, কেউই সাফল্যের ধারাবাহিকতায় আকর্ষণীয় নন। উলগা বুদ্ধিদীপ্ত। তাঁর পায়ের কাজ সুক্ষ্ম, শরীর দুলিয়ে প্রতিপক্ষকে ভুল বোঝাতে জানেন। কিন্তু মনের ভয়কে তাড়িয়ে সর্বক্ষণ চেষ্টায় নিজেকে জাঁকিয়ে রেখেছে তাঁর প্রবল অনীহা। ভয় তাড়ানে মনের শাসানিতে তিনি যেন বড্ড বেশি সঙ্কুচিত। সেদিনের থাপা গোল করার লগনে মস্তো এক স্বীকারোক্তি। শরীর দুলিয়ে পায়ের এক একটানে তিনি তিন-তিনটি বাধা অনায়াসে টপকে গিয়ে একার সামর্থ্যেই নিজের দলের ভাগ্য গড়ে দিয়েছেন এবং বিপক্ষের কপাল দিয়েছেন পুড়িয়ে। কিন্তু অন্য মুহূর্তে তিনি নিছকই এক মেহনতী কারিগর। সৃষ্টি-শীল শিল্পী নন। শিল্পকর্মে অধিকার থাকতে পারলে শ্যাম থাপা সেদিন ইস্টবেঙ্গলের পুরোভাগকে সচল রাখতে পারতেন। অমন রেখে দিতেন মহম্মদ হাবিব। কিন্তু হাবিবের ছায়ার প্রতিফলন ঘটান শ্যাম থাপা বা সতীর্থদের অস্তিত্বে। কাজেই ইস্টবেঙ্গলের পুরোভাগের অগ্রিমপথ অরক্ষিতই রয়ে গেছে।

কোনো সন্দেহ নেই যে ফরোয়ার্ডদের অচরণগত ত্রুটির জের মেটাতে গিয়ে শুধু ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগানের নয়, সেই সঙ্গে ভারতীয় ফুটবলের মানের গতি নিম্নমুখী হয়ে পড়েছে। আগের অনুপাতে রক্ষণভাগের খেলার মান অনেকটা উন্নত। যেহেতু একালের রক্ষণভাগ পরিপাটী বিন্যাসের আশীর্বাদপুষ্ট। ডিফেন্সের কাজ কিছুটা সীমায়িত ও নির্দিষ্ট। স্বল্প মূলধনের কার-বারীরাও এই সীমিত ও নির্দিষ্ট কাজ করে তুলতে পারেন। তবে রক্ষণব্যবস্থা উন্নততর বলেই ফরোয়ার্ডদের সামনে আরও বৃহত্তর দায়িত্ব পালনের তাগিদ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সেই দায়িত্ব পালনে যে পরিমাণ পুঁজির প্রয়োজন তা অনেকেই সংগ্রহ করতে পারছেন না। তাই চাওয়া ও পাওয়ায় এমন গরমিল দেখা দিচ্ছে।

আজকাল প্রশিক্ষণের যুগ। অর্থব্যয়ের হিড়িক চলেছে। অপরিমিত অর্থ ব্যয় ও প্রশিক্ষণের আয়োজনের সূত্রে হাতে কি পাওয়া যাচ্ছে তার মূল্যায়ন হওয়া উচিত। শুধু নাম কা ওয়াস্তে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ও অঢেল অর্থ ব্যয় করা নিরর্থক মানসিক বিলাস ছাড়া আর কিছুই নয়। কাজেই দেখা দরকার যে একালের চিরাচরিত ত্রুটি

রমেশ বক্সীর
সদ্য প্রকাশিত রহস্য উপন্যাস
রাতের অন্ধকারে ৪-০০
শিবরাম চক্রবর্তীর হাসির গল্প
দুর্ঘটনার পর দুর্ঘটনা ৫-০০
চিত্তরঞ্জন সেনগুপ্তের অসাধারণ উপন্যাস
শবরীর তিয়াস ১৫-০০

ভবেশ বক্সীর ভক্তিমূলক গ্রন্থ
তারাপীঠের সাধক ৮-০০
সাধক হরিদাস ৫-০০
সাধক তুলসীদাস ৫-০০
উমাপতি ভট্টাচার্যের
শক্তিপীঠের সাধক ৫-০০

ডঃ রমেশ দাসের অসাধারণ বই
মন ৭-০০
শিশুমন ১০-০০

ভোলানাথ প্রকাশনী
কলিকাতা-৯
৩৭।১১ বেনিয়াটোলা লেন,
ফোন : ৩৪-৯০৪৮

সম্মোহনে অর্থব্যয় ও প্রশিক্ষণের আয়োজন সহায়তা করছে কিনা। না করে থাকলে যাঁরা দু হাতে টাকা ছড়াচ্ছেন এবং যাঁরা খেটে-খুটে ছেলেদের খেলা দেখাচ্ছেন, দু পক্ষেরই নতুন করে ভেবেচিন্তে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করা বিধেয়। খেলেন যাঁরা তাঁদের মতো যাঁরা খেলান তাঁদেরও ক্রীড়া মানোন্নয়নে দায়দায়িত্ব রয়েছে।

যাঁরা খেলোয়াড়দের খেলান, মাঠের বাইরে থাকলেও যাঁদের ভূমিকা প্রকৃতই অর্থবহ, সেই প্রশিক্ষকদের সম্পর্কেও আমার কিছু নিবেদন আছে। তার আগেই বলে নিই যে ইস্টবেঙ্গলের প্রদীপ বানার্জি ও মোহনবাগানের অরুণ ঘোষ, দুজনেই ভারত-বিখ্যাত প্রশিক্ষক। কৃতজ্ঞচিত্তেই স্বীকার করি যে ওঁদের ক্রীড়ানিপুণতার আমি গুণগ্রাহী। তাঁরা কেউ আমার ভুল বুঝবেন না এই বিশ্বাসে প্রশ্ন রাখতে চাই যে ইস্টবেঙ্গলের কোচ একজন স্টপারের বদলে আর একজন তাজা খেলোয়াড়কে এবং মোহনবাগানের কোচ একজন স্ট্রাইকারকে বদলে নতুন এক-জনকে মাঠে নামিয়ে পরখ করে দেখার প্রয়োজনীয়তা কি সত্যই উপলব্ধি করতে পারেন নি? পরীক্ষামূলক রীতি অনুসরণে এই সঙ্কোচ কেন? পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমেই তো সত্যের স্বরূপ চেনা যায়। আমার ধারণা ইস্টবেঙ্গলের পক্ষে এক বিকল্প ফরোয়ার্ডকে মাঠে নামানো এবং মোহন-বাগানের তরফে কাউকে না নামানোর মধ্যে অর্থবহ কোনো চালের ঠিকানা ছিল না। অদলবদল করা এবং না করা, সবটাই যেন নিয়মমাফিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

ওই শনিবার রক্ষণভাগের সামগ্রিক ক্রীড়া-মানের অবস্থাই বা কি রকমটিতে দাঁড়িয়ে-ছিল? একটানা পাঁচবারের লীগ চ্যাম্পিয়ান ইস্টবেঙ্গল দলের রক্ষণব্যূহের মাঝখানটি ছিল নিতান্তই নড়বড়ে। দুই স্টপার যেভাবে টানে যে কতোবার বেওয়ারিশ ফুটফেড করে এসেছিলেন তার ঠিক-ঠিকানা কি! তাঁরা বেওয়ারিশ ছায়গায় সরে যাওয়ার ফলে মাঝ-খানের ফাটল মেরামত করতে ইস্টবেঙ্গলের গোলরক্ষককে এগিয়ে এসে অবস্থা সামলাবার চেষ্টায় বারবারই ফুলের ফাঁদে জড়িয়ে পড়তে হয়। ওই দুটি ক্ষেত্রেই যদি দলের বিরুদ্ধে গোল হয়ে যেতো তাহলে মূল অপরাধের বোঝা কাঁধে তুলে নিতে হোত স্টপারদেরই। অন্য কাউকে নয়।

মোহনবাগানের রক্ষণভাগের অবস্থাও আশাপ্রদ ছিল না। তবে ইস্টবেঙ্গলের আক্র-মণধারা বহুবার শূন্যে পর্যবসিত হয়ে যাওয়ার ফলে মোহনবাগানের শীর্ষাকাঙ্ক্ষী স্টপার সুব্রত ভট্টাচার্য লাফিয়ে আরও উপরে উঠে পরিস্থিতি মোকাবিলায় অযাচিত সুবিধে পেয়ে যান। অবশ্য অনুসারে সুব্রতর খেলা মন্দ হয় নি। প্রশান্ত মিত্রের সহযোগিতায় সুব্রত মোহনবাগানের রক্ষণব্যূহকে বিচ্ছুটে নিভরযোগ্য করে তুলতে পেরেছিলেন। শ্যাম থাপা বা ইস্টবেঙ্গল যখন সমতাকে হাত-ছানাতে পারে ঠিক তখনই গোলের দরজা উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। গোলরক্ষক প্রশান্ত মিত্রের বরাতটাই মন্দ। বেচারী সেদিন ঘাড়ে চোট পেয়ে মাঠ ছেড়ে যেতে বাধ্য হন। যতোদূর মনে পড়ে, এর আগেও একদিন ইডেনের ফুটবল আসরে তিনি আঘাত খেয়েছিলেন। ইডেনে খেলার অভিজ্ঞতা তাঁর পক্ষে সুখকর নয়।

দু দলের রক্ষণব্যবস্থার সামগ্রিক অগোছালো চেহারার পাশে একা সুধীর কর্মকারই ছিলেন আত্মপ্রত্যয়ে অটল। কাজের কাজ করে তোলার সিদ্ধকর্ম। তাঁর প্রতি-বর্তী ক্রিয়া তীক্ষ্ণ। বল কাড়ার ও এবং সতীর্থদের বল যোগান দেওয়ার ব্যাপারে নিয়তই মুন্সীয়ানার পরিচয় রেখে খেলোয়াড় হিসেবে তিনি তাঁর যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখে দিয়েছিলেন। হার মেনেও তিনি হাল ছাড়েন নি। উলগানাথন বাঁ দুয়েক তাঁকে ডিঙিয়ে এগিয়ে যাওয়ার পরও নাছোড়বান্দা সুধীর আবার মুখোমুখি ফিরে এসে উলগার পা থেকে চকিত মেরে বলটি কেড়ে নিয়েছেন। কোনো সন্দেহ নেই যে সেদিনের আসরে সুধীরের আত্মবিশ্বাসী ভূমিকা নিজের দলকে যেমন নিয়তই ভরসা যুগিয়েছিল, অপরপক্ষে তেমনি বিপক্ষের চলার পথে অনতিক্রম্য বাধার পাঁচিল তুলে রেখেছিল। সামগ্রিক নীচু মানের খেলার পট-ভূমিকায় সেদিনের সুধীর ছিলেন মস্তো এক ব্যতিক্রম। সংবাদপত্রের প্রশংসাগানে। ছবি এই ছবির পাশে মানানসই হয়ে কেউই দাঁড়াতে পারেন নি। অমন খোঁগা পরিস্থিতি ও পরিপাটি মেজাজের পোতম সরকারও নন। সেদিনের মাঠে সুধীরই ছিলেন সারা মাঠের সরা। বোঝার মুডিতে সুধীর চলাফেরা না করলে হয়তো প্রাণবন্ত ফুট-বলারের সন্ধানে সেদিন আমাদের গোটা মাঠে নজর ফেরাতে হোত। কিন্তু সুধীর সে সুযোগ কাউকে দেননি।

ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানের খেলাটি হয়েছে বর্ষাস্নাত ইডেনে। খেলার আগে এক পশলা বৃষ্টি হওয়ায় ইডেনের এ'টেল মাটির পিচ্ছিলতা বেড়ে যায়। খেলোয়াড়েরা দৌড়াদৌড়ি আরম্ভ করতেই বুটের সঙ্গে চাপচাপ নরম মাটি এবং গোছা গোছা দূর্বা-ঘাস পেড়ো থেকে উপড়ে আসতে শুরু করে। বর্ষণসিক্ত এ'টেল মাটিতে দেহের ভারসাম্য বজায় রেখে দ্রুতগতিতে বল নিয়ে দৌড়ের কথা, দুলকি চালে ফুটবল খেলাই কঠিন। হয়তো এমন পরিস্থিতিতে খেলতে হয়েছে বলে খেলোয়াড়েরা তাঁদের ক্রীড়ামানের আশ্বাস-জনক ছবি ফুটিয়ে তুলতে পারেন নি। ঘোষ দোষ তাঁদের ছিলই। তার ওপর মাঠের এই প্রতিকূলতা। সব মিলিয়ে গোদের ওপর বিষফোড়ার জ্বালায় মারাই।

কলকাতার বড় বড় দলের খেলোয়াড়দের পরম দুর্ভাগ্য এই যে বর্ষাকালে যে মাঠে ফুটবল প্রায় অসম্ভব, সেই মাঠেই এখনো তাঁদের পরীক্ষার ব্যবস্থা হচ্ছে। এ পরীক্ষায় পাশ করা শক্ত। যাঁরা ফেল করাচ্ছেন তাঁদের দেখছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা। অথচ যাঁরা ব্যবস্থা করার পাণ্ডা তাঁরা আড়ালই থেকে যাচ্ছেন কর্তাব্যক্তিদের আড়াল থেকে প্রকাশ্যে টেনে আনার জন্যে ওঁদের একদিন ভিজে সপসপে ইডেনে ফুটবলের প্রদর্শনী খেলা খেলতে আহ্বান জানালে কেমন হয়। খেলোয়াড়েরা দল বেঁধে ব্যবস্থাপকদের উদ্দেশ্যে এই চ্যালেঞ্জটুকু ছুঁড়ে দিতে পারেন না?

বর্ষায় ইডেনে ফুটবলের আয়োজন ঘটায় খেলোয়াড়দের যতো অসুবিধে হয়ে থাকুক না কেন, দ্বিগুণসংখ্যক দর্শক গ্যালারিতে বসে এই খেলা দেখার সুবিধে পেয়েছেন। ইডেন ফুটবলের প্রতিকূল। বর্ষাকালে এখানে ফুটবল খেলা হলে ক্রিকেট উদ্যানের সর্ব-নাশের রাস্তাও পাকা হয়ে যায়। তবে সান্ত্বনা এইটুকু যে হাজার পঁয়ষট্টি মানুষ ইডেনের গ্যালারিতে বসে খেলা দেখার সুযোগ পান। এমন সুবিস্তৃত গ্যালারিযুক্ত একটি বড় ফুটবল স্টেডিয়াম গড়ের মাঠে গড়া গেলে

নব্য প্রকাশিত সম্পাদিত গ্রন্থ
মানুষ ও মন
(সঙ্গীত)
রচয়িতা—কালী কর
ডঃ অশুতোষ ভট্টাচার্য (কঃ বিঃ)
ভূমিকায় ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।
বহু উদ্দীপনাপূর্ণ প্রচুর আধুনিক ও লোকসঙ্গীত এবং ভক্তিমূলক গান। সাবলীল ও মনোহর রচনাভঙ্গী এবং নতুন চিন্তাধারা গ্রন্থের বিশেষ আকর্ষণীয় বস্তু। মূল্য ৭-৫০ মাত্র।
পরিবেশক—ওরিয়েন্টাল বুক সিন্ডিকেট
৪৪।১এ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা—৭০০০০৯

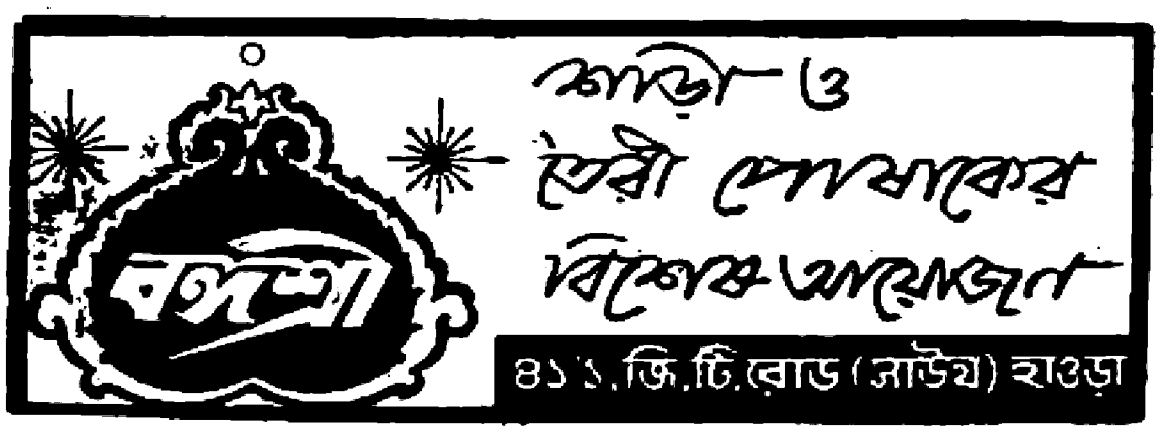

ক্রিকেট উদ্যানকে বাঁচিয়ে সর্বাধিক রক্ষা করা যেতো। কিন্তু কলকাতার ভাগ্যে সে স্টেডিয়াম আর জুটলো কোথায়। স্টেডিয়াম নির্মাণে এই অক্ষমতা ঢাকার জন্যেই তো ইডেনে ফুটবল খেলানোর এই ব্যবস্থা। এ তো জেনেশুনেই এই গোঁজামিল হাত পাকানো হচ্ছে।

ইডেনে বড় ফুটবল স্থানান্তরিত হওয়ায় জনতা ও যানবাহন নিয়ন্ত্রণে পুলিসের সুবিধে হয়েছে। শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখায় পুলিস যথেষ্ট চেষ্টাও করেছে। সেই চেষ্টা প্রশংসনীয়। তবু বিক্ষিপ্তভাবে দু একবার মাঠের আভ্যন্তরীণ শান্তিশৃঙ্খলা ভেঙে পড়ার নজীরগুলি দুর্ভাগ্যজনক।

খেলা আরম্ভের আগেই আকাশবাণী ভবনের দিকে এক গ্যালারিতে একদল দর্শকের মধ্যে হাতাহাতি, ছাতা লেঠালেঠি, ইট ছোঁড়াছুঁড়ি শুরু হতে বেশ কজন আহত হয়ে পড়েন। অনুমান আহতদের দলে নিরীহ দর্শকের ও ছিলেন। খেলার শেষদিকে এক টুকরো ইটের ঘায়ে একজন লাইনম্যানের মাথাও কাটিয়ে দেওয়া হয়। কেন? ত্রুটি কি অপরাধ? খেলা পরিচালনায় রেফারী ও লাইনম্যানেরা, কোনো পক্ষই অযোগ্যতার পরিচয় দেন নি। বরং নিজেদের সাধ্যমত পালন তাঁরা প্রশংসনীয় কুশলতা নিয়ে গেছেন। তবু অকারণ রোষে সমস্ত তাঁদের মধ্যে দেওয়ার এই উল্লাস কেন? মাঠে অকারণে, বিনা প্ররোচনায় মাঠে মাঠে এতসব উত্তেজনা কাজ করতে পারেন, তাঁদের মন বোঝা ভার। তবে তাঁরা যে কলকাতার ফুটবল মাঠে বাস্তব এক সমস্যা সেকথা অনস্বীকার্য।

এঁদের অপরাধের তুলিকায় আজ লাইনম্যান সেদিন মাঠ ছেড়ে চলে যেতে চেয়েছিলেন। তাঁর অনুরোধে হাতের কাছে যদি অন্য লাইনম্যানকে না পাওয়া যেতো এবং যদি রেফারী নির্দিষ্ট সময়ের আগেই খেলাটি পরিত্যক্ত ঘোষণা করতেন তাহলে অসময়ে খেলা ভঙ্গের দায়দায়িত্ব কি অসহযোগী লাইনম্যানের ওপর না যিনি ইট মেরে নিজের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে চেয়েছিলেন তাঁরই ওপর চাপানো হোত? কলকাতার মাঠে ইটের ঘায়ে যাঁরা নিরতই খেলাধুলোর আদর্শের অবমাননা ঘটাচ্ছেন, খেলা ভাঙছেন আর না হয় অসমর্থিত দলের স্নায়ুর ওপর প্রভাব খাটাচ্ছেন, তাঁরা কিন্তু চিরদিনই পার পেয়ে যাচ্ছেন। দোষীরা শাস্তি পাচ্ছে না বলেই উচ্ছৃংখলতার জোয়ারে অসমর্থিত দলের খেলার আসরে অনেক ক্ষেত্রে তাদের প্রতিপক্ষদের পিছু হটতে হচ্ছে। এ এক অসহনীয় অবস্থা। কোনোদিনই কি এর সুরাহা হবে না? খেলা হয় দলে দলে। দল ও খেলোয়াড়েরাই যেন মুখ্য। গৌণ ভূমিকা দর্শক ও সমর্থকদের। দর্শক ও সমর্থকেরা যদি ক্রীড়ানুষ্ঠানে সহায়তা না করেন, উল্টে ব্যাঘাত ও বিশৃঙ্খলা করতে থাকেন তাহলে দর্শক-সমর্থকদের বাদ দিয়েও যে খেলার ব্যবস্থা করা যায় সেকথা স্পষ্টাস্পষ্টি বলার সময় কি এখনও হয় নি? অনা গেল কিন্তু এই সার কথা অনেক আগেই সোচ্চারে বলে ফুটবল মাঠে ঘুমেলা এড়াবার পথ তৈরী করে রেখেছে।

ওই শনিবার ইডেনে ইস্টবেঙ্গল সহজভাবেই খেলা আরম্ভ করেছিল। প্রাথমিক দর্শনের অভিজ্ঞতায় বোঝা গিয়েছিল যে ইস্টবেঙ্গলের খেলোয়াড়েরা স্নায়ুর চাপে ভুগছেন না। ফুটবলকে ঠিয়া করতে তাঁরা মন করছে। দেখে আশা জেগেছিল যে খেলার মাঠকে উঁচুতে তুলে ধরে ইস্টবেঙ্গল তার সুনাম অক্ষুণ্ন রাখতে পারবে। কিন্তু বাস্তবে তা হয় নি। কিছুক্ষণের মধ্যেই ইস্টবেঙ্গল খেলার সুর হারিয়ে ফেলে এবং একগোল এগিয়ে থাকার সুবাদেরে ওই সময় কুয়াশাচ্ছন্ন এক নদী হাতের মতো নিজের ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যাচ্ছে তখন মাঠের বাইরে মন দিয়ে বসে। ফল হয় উল্টো।

অযথা মোহনবাগানের খেলোয়াড়দের স্নায়ুর চাপ ও মানসিক উত্তেজনা উপেক্ষা করতে পারেননি তাই সেই রাগে যতদূর সম্ভব বিপক্ষের বিরুদ্ধে কঠোর করছেন। পরে নিজেদের অনেকটা সামলে নিয়েই মোহনবাগান নিজেদের কিছুটা অধিকার তাদের হাতে তুলে দেয়। তারই সূত্রে তাঁদের সমান গোলের সুযোগ আসে।

সব মিলিয়ে খেলা হয়েছে প্রায় সমানে সমানে। গোড়ার পর্বে ইস্টবেঙ্গলের আক্রমণাত্মক চেষ্টায় প্রতিশ্রুতি যদি থেকে থাক তাহলে মোহনবাগানের গোলে পরিশোধের প্রয়াসে ছিল সংকল্পের দৃঢ়তা। আর গোলের সুযোগ পেয়েছে অপেক্ষাকৃত বেশি, মোহনবাগান দলই।

এর সুযোগ পাওয়া আর সুযোগ সদ্ব্যবহার করার মধ্যে যে দূরত্ব তফাত থেকে যায় সেই তথাই প্রকাশ করে দিয়েছেন শ্যাম থাপা। একদল সুযোগ পেল। আর একদল গোল করলো। ফাল প্রয়োগিক মূল্যায়নে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হলো সেই পরিস্থিতিতে বিজয়ী বেশে মাথা উঁচু করে একদল মাঠ থেকে বেরিয়ে গেল। আর অন্যদলকে বিমর্ষ, বিষণ্ণচিত্তে আনত থাকতে হলো। গোলই যে ফুটবলের অনেকখানি, এই খেলাই তার নিশ্চিত প্রমাণ।

তবে একথাও ঠিক যে গত পাঁচ বছর ধরে যে ইস্টবেঙ্গলকে আমরা কলকাতার মাঠে দেখে আসছি, যে দল অন্য প্রতিযোগীদের থাকার কারণ সেই দলের ক্রীড়াগত মূল্যায়নে দশাতেই ঘাটতি ঘটে গিয়েছে। মনে হয়, নতুন শক্তি সঞ্চয়ের তাগিদই এখন বড়। আত্মতুষ্টি ফেড়ে ফেলে ইস্টবেঙ্গলের এখন উচিত আত্ম-সমীক্ষায় হাত দেওয়া। কারণ পরা যবনের আকাশ বুঝি স্পষ্ট হয়েই উঠছে।

পক্ষান্তরে ইস্টবেঙ্গলের কুয়াশাকে গুটিয়ে আনতে না পারলেও মোহনবাগান অন্য প্রতিদ্বন্দ্বীকে ঠিক চালেঞ্জের মুখে ফেলে দিয়েছিল। সভাই লড়াই প্রতিপক্ষের মনে তবুও ধরিয়ে দিয়েছিল। কে জানে সাহারপক্ষীদের সঙ্গলাভে মোহনবাগান আক্রমণের বাজ পাখার প্রাণপ্রতিষ্ঠার মূল কিনা কথা মাঠ সমাধানে এই এবারকার অভিজ্ঞতাই সংগ্রহ করতে পারবে কিনা। তবে মোহনবাগানের এই রূপান্তরিত মূর্তি দেখে ইস্টবেঙ্গল যে নতুন চিন্তার উপকরণ খুঁজে পাবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

গত কয়েকবছর ধরে ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগানকে ভাবিয়ে তুলেছিল। এবার মোহনবাগানই যেন ইস্টবেঙ্গলকে ভাবনায় ফেলতে এগিয়ে আসছে।

অজয় বসু

ডঃ ক্ষেত্রমোহন কর এম.বি.(লিভ.)
ডঃ এস. এন. পাণ্ডে এম.বি.(লিভ.)
যৌবনের রহস্য
প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য · মূল্য ৬·
যৌনবিজ্ঞানের রঙীন ও বহুচিত্রে
চিত্রিত অতি আধুনিক সংস্করণ ·
মোহন লাইব্রেরী ৩৩এ, হারিসন রোড, কলিকাতা-৯
অগ্রিম ৬·টাকা পাঠাইলে ডাকমাশুল ফ্রি

সাড়ীর মেলা
নিউ বেনারসী হাউস

খেলাধুলা

দর্শক

আন্তর্জাতিক টেবল টেনিস প্রতিযোগিতা

আফ্রিকার নাইজিরিয়ার রাজধানী
ন আয়োজিত দ্বিতীয় আফ্রো-
মৈত্রী টেবল টেনিস প্রতিযোগি-
এশিয়া মহাদেশ বিরাট সাফল্যের
দিয়েছে। প্রতিযোগিতার মোট
খেতাবই এশিয়া মহাদেশের তিনটি
এইভাবে জয় করেছে—চীন ৪টি
দুটি এবং উত্তর কোরিয়া ১টি।
রুষ ও মেয়েদের সিঙ্গলস বিভাগের
য় সঙ্গে পুরুষ ও মেয়েদের
স খেতাবও পেয়েছে। জাপান
পেয়েছে পুরুষদের ডাবলস ও মি
ডাবলস খেতাব এবং উত্তর কো
মেয়েদের ডাবলস খেতাব। প্রতিযো
আটটি বিভাগের মধ্যে ৬টি বিভ
ফাইনালে কেবল এশিয়ার খেলো
খেলেছিলেন। পুরুষদের ডাবলসের
নালে জাপানের বিপক্ষে খেলেছিল
আমেরিকার খেলোয়াড়রা। চীন ৬টি বি
ফাইনালে খেলে ৪টি খেতাব
মেয়েদের সিঙ্গলসের ফাইনালে
খেলোয়াড়রা পরস্পরের সঙ্গে খেলে
জাপান ৬টি বিভাগের ফাইনালে
খেতাব পেয়েছিল দুটি। উত্তর কো

ডিসকাস নিক্ষেপে বিশ্বরেকর্ড : আমেরিকার জন পাওয়েল ২১০ ফুট
ফুট ডিসকাস নিক্ষেপ করে নতুন বিশ্বরেকর্ড করেছেন।

মায়েরা !
এক বেবীফুডে ডাক্তাররা যা যা চান তাঁরা সে-সবই পান আমূলস্প্রেতে

আমূলস্প্রেতে ভিটামিন, খনিজ-পদার্থ আর প্রোটিন রয়েছে যা আপনার শিশুকে সুস্থ আর সবল ক'রে গ'ড়ে তোলার পক্ষে দরকার।

ভিটামিন সংক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য আর খিদে বাড়াবার জন্য, সুস্থ স্নায়ু, মাড়ি, চোখ আর দাঁতের জন্য। নিরামিষ হজম শক্তি আর পরিপাক ক্রিয়া সবল ক'রে তোলার জন্য, সুস্থ ত্বকের জন্য, ক্যালসিয়াম ও ফসফোরাসের মত খনিজ পদার্থ হাড়ের গঠন স্বাভাবিক ক'রে তোলার জন্য। আয়রণ সাহায্য করে রক্ত গঠনে।

প্রোটিন কোষ গ'ড়ে তোলা আর পুষ্টিতে সাহায্য করার মূল উপাদান। আর আমূলস্প্রেতে আছে উঁচুমানের পর্য্যাপ্ত প্রোটিন।

আমূলস্প্রে কয়েক দিনের শিশুও হজম করতে পারে

প্রতি বিশুদ্ধ দুধ গুঁড়োয় চমৎকার মিহি পাউডারে পরিণত করা হয়। ক্যাটটাও সেভাবেই ছড়িয়ে দেওয়া হয় এবং এটি হজম হয় সহজে।

আমূলস্প্রে চটপট এবং সহজেই তৈরী ক'রে নেওয়া যায়

আমূলস্প্রে দুই পদ্ধতিতে গুঁড়ো দুধ পাউডারে পরিণত করা হয় বলে এটি গুলতে খুব তাড়াতাড়ি আর সহজে। এর ফলে দোকানের দিশুলে জমাট বেঁধে যায় না, আর শিশুকেও অনেকটা হাতের দিশুল খেলতে হয় না।

বালআমূল এবং বাড়ন্ত শিশুরা

[illegible] থেকে শিশুকে আমূলস্প্রে চটপট অভ্যস্ত বালআমূল ক'রে তুলুন।

আরও নানান তথ্য জানবার জন্যে বিনামূল্যে আমূল পুস্তক—মা ও শিশু পালন

বিনামূল্যে আমূল পুস্তক মা ও শিশুপালন পেতে হ'লে এই ঠিকানায় চিঠি দিন—পোঃ বাঃ নং ১০১২৪, বোম্বাই ৪০০ ০০১। মনে রাখবেন পুরো ঠিকানা লেখা

আমূলস্প্রে

মায়ের দুধের আদর্শ বিকল্প

Indian Standards Institution

বাজারে ছেড়েছে :
গুজরাট কোঅপারেটিভ মিল্ক মার্কেটিং ফেডারেশন লিঃ, আনন্দ।

বি গ্রুপের সেমিফাইনালে ফ্রান্স ৩—২ খেলায় ইতালীকে এবং চেকোশ্লোভাকিয়া ৪—১ খেলায় হাঙ্গেরীকে পরাজিত করে।

ইউরোপীয় জোন ফাইনাল

এ গ্রুপের ফাইনালে সুইডেন ৩-২ খেলায় স্পেনকে এবং বি গ্রুপের ফাইনালে চেকোশ্লোভাকিয়া ৩-২ খেলায় ফ্রান্সকে হারিয়ে ইস্টার-জোন সেমিফাইনালে খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছে।

ইস্টার-জোন সেমিফাইনালে সুইডেন খেলবে চিলির সঙ্গে এবং অপর দিকে চেকোশ্লোভাকিয়ার সঙ্গে খেলবে অস্ট্রেলিয়া।

বিশ্ব রেকর্ড

নং বীচ-এ আয়োজিত আমন্ত্রণমূলক অথলেটিকস অনুষ্ঠানে সদ্য জোসের পুলিশ কর্মচারী জন পাওয়েল ৬১-০৮ মিটার ২২৬ ফুট ৮ ইঞ্চি) থ্রোয়ে ডিসকাস নিক্ষেপ করে নতুন বিশ্ব রেকর্ড করেছেন। ডিসকাস নিক্ষেপে পূর্বের বিশ্ব রেকর্ড ছিল ৬৮-৪৬ মিটার (২২৪ ফুট আট ইঞ্চি)—দক্ষিণ আফ্রিকার জন ভান রেনেনস কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

গত ১৬ই জুলাই হ্যাম্পসায়ার বনাম গ্লামর্গান দলের বিরোধী ক্রিকেট খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান ব্যাটসম্যান গর্ডন গ্রিনিজ হ্যাম্পসায়ার দলের পক্ষে ১৭৭ রান করার সূত্রে নির্দিষ্ট একদিনের ক্রিকেট খেলায় স্বপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রানের বিশ্ব রেকর্ড করেছেন। পূর্বের রেকর্ড ছিল ১৭০ রান (১৯৭০ সালে প্রতিষ্ঠিত)।

এই খেলাতেই হ্যাম্পসায়ার দল ৫৫১ রান (৬ উইকেটে) করে নির্দিষ্ট একদিনের ক্রিকেট খেলায় দলগত সর্বোচ্চ রানের বিশ্ব রেকর্ড করেছে। এ দিয়ে পূর্বের বিশ্ব রেকর্ড— প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট কাউন্টি খেলায় ভারতের বিপক্ষে ইংল্যান্ডের ৫৫৩ রান।

আমেরিকার স্টেভ ঈভান্সের ১-১ সেকেণ্ডে ১০০ মিটার দৌড় শেষ করে দ্বিতীয়বার এই বিষয়ে বিশ্ব রেকর্ড স্পর্শ করেছেন। প্রথম করেন গত বছর। তাঁকে নিয়ে ৭জন অ্যাথলীট ১০০ মিটার দৌড় ১-১ সেকেণ্ডে শেষ করলেন।

রাশিয়া বনাম আমেরিকা

ডিয়েগোতে ১৯৭৫ সালের রাশিয়া বনাম আমেরিকার সৈয়দ আথলেটিকস প্রতিযোগিতায় রাশিয়া পুরুষ ও মহিলা—উভয় বিভাগেই প্রথম স্থান লাভ করেছে। রাশিয়া পুরুষ বিভাগে ১২১—৮১ পয়েন্টে এবং মহিলা বিভাগে ১৬—৪১ পয়েন্টে আমেরিকাকে পরাজিত করে। রাশিয়ার অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন ভ্লাসোভ বোগডভ পুরুষদের ১০০ মিটার দৌড় ১০ সেকেণ্ডে শেষ করে প্রথম হন। ১৯৭২ সালের অলিম্পিকে ভ্লাসোভ বোগডভ ১০০ ও ২০০ মিটার দৌড়ে স্বর্ণ পদক পেয়েছিলেন।

রাশিয়া বনাম আমেরিকার এই সৈয়দ অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতার উদ্বোধন ১৯৫৮ সালে। এ পর্যন্ত ১৩ বার এই প্রতিযোগিতার আসর বসেছে। এই ১৩ বারের আসরে পুরুষ বিভাগে প্রথম স্থান পেয়েছে আমেরিকা ৯ বার এবং রাশিয়া ৪ বার। অপরদিকে মেয়েদের বিভাগে প্রথম স্থান পেয়েছে রাশিয়া ১২ বার এবং আমেরিকা ১ বার। পুরুষ এবং মেয়েদের বিভাগে সংগৃহীত মোট পয়েন্টের ভিত্তিতে প্রথম হয়েছে রাশিয়া ১০ বার, আমেরিকা ২ বার এবং একবার (১৯৭১ সালে) দুই দেশেরই মোট পয়েন্ট সমান সমান হয়েছিল। পয়েন্টের ভিত্তিতে একই বছরে উভয় বিভাগেই প্রথম স্থান লাভ করেছে রাশিয়া ৪ বার (১৯৬৫, ১৯৭০, ১৯৭৫ ও ১৯৭৫) এবং আমেরিকা ১ বার (১৯৬১ সালে)।

একই বছরের আসরে মোট ২০০ পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে রাশিয়া ৩ বার (১৯৭০ সালে ২০০ ১৯৭১ সালে ২১৬ ও ১৯৭৫ সালে ২২৫ পয়েন্ট)। অপরদিকে একটি আসরে আমেরিকার সর্বাধিক মোট পয়েন্ট ১১৫ (১৯৬১ সালে)।

বিশ্বজনীন নিক্ষেপ প্রতিযোগিতা

ডিসকাস চ্যাম্পিয়ান

পুরুষ বিভাগ : আমেরিকা
মহিলা বিভাগ : রাশিয়া

ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ান

পুরুষ বিভাগ : ১৮ বছরের ডাগলেস রোজ (আমেরিকা) নতুন বিশ্ব রেকর্ড পয়েন্টে ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ান হয়েছেন।

মহিলা বিভাগ : রাশিয়ার ভেরোনিকা বাস্তাসেভা নতুন বিশ্ব রেকর্ড পয়েন্টে ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ান হয়েছেন। গত বারের চ্যাম্পিয়ান আমেরিকার লিণ্ডা সেরার্স এবার ৫ম স্থানে নেমে গেছেন।

ডিভয়ার দাবা কাপ

আন্তর্জাতিক ডিভয়ার দাবা প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান লাভের সূত্রে রাশিয়ার ২৪ বছরের বিশ্ব দাবু চ্যাম্পিয়ন অনাতোলি কারপেভ ২০০০ পাউণ্ডের নগদ প্রথম পুরস্কার ও ডিভয়ার কাপ লাভ করেছেন। মোট পনেরটি খেলার মধ্যে কারপেভ সাতটি খেলায় জয়ী হন এবং আটটি খেলা ড্র করে মোট ১১ পয়েন্ট সংগ্রহ করেছিলেন। তিনি তাঁর নিকট প্রতিদ্বন্দ্বীর থেকে মাত্র এক পয়েন্ট বেশী পেয়েছিলেন।

উইম্বলেডন আসরে ভারতের ভূমিকা

১৯৭৫ সালের উইম্বলেডন টেনিস আসরে ভারতীয় টেনিস খেলোয়াড়রা ভালোভাবে সুবিধা করতে পারেন নি। পাঞ্চকন ভারতীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে মাত্র একজন—বিজয় অমৃতরাজ এবং আনন্দ অমৃতরাজ সরাসরি মূল প্রতিযোগিতায় খেলেছিলেন। বাকী পাঁচজন—চিরদীপ মুখার্জি প্রেমজিৎ লাল লক্ষ্মী মেনন, অশোক অমৃতরাজ এবং জে রয়স্রাপাক বাছাই পর্বে খেলতে হয়েছিল। এই পাঁচজনের মধ্যে একমাত্র চিরদীপ মুখার্জি বাছাই পর্ব থেকে মূল প্রতিযোগিতায় খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছিলেন। চিরদীপ মূল প্রতিযোগিতার প্রথম রাউণ্ডে প্রায় তিন ঘণ্টা প্রাণ পণ করে খেলে শেষ পর্যন্ত পোলাণ্ডের ওয়লউ ফিবককে হারিয়ে দেন। কিন্তু দ্বিতীয় রাউণ্ডে তিনি চিলির জেমি ফিলসের কাছে ৩-৬, ৬-৩, ২-৬ ও ৩-৬ গেমে হেরে যান। বিজয় অমৃতরাজ দ্বিতীয় রাউণ্ডে গত বছরের সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ান এবং এক নম্বর বাছাই জিমি কোনর্সের কাছে হেরে যান ৮-১, ৩-৬ ও ৬-৮ গেমে। আনন্দ অমৃতরাজ পরাজিত হন প্রথম রাউণ্ডেই রাশিয়ার আলেকসি মেত্রেভেলীর কাছে স্ট্রেট সেটে।

ডাবলসের খেলাতেও ভারতীয় খেলোয়াড়রা শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছিল। পুরুষদের ডাবলসে আনন্দ এবং বিজয় অমৃতরাজ দ্বিতীয় রাউণ্ডে বিদায় নিয়েছিলেন এবং মিকসড ডাবলসে বিজয় অমৃতরাজ এবং আমেরিকার ক্যাথি মে ৩য় রাউণ্ড পর্যন্ত খেলেছিলেন।

প্রাক অলিম্পিক হকি প্রতিযোগিতা

মন্ট্রিলে আয়োজিত প্রাক-অলিম্পিক হকি প্রতিযোগিতার ফাইনালে পশ্চিম জার্মানী ৫-২ গোলে পাকিস্তানকে পরাজিত করেছে। এখানে উল্লেখ্য, এই আসরেই লীগ পর্যায়ের বিভাগীয় খেলায় পাকিস্তান ভাবে ১-৫ গোলে এই পাকিস্তানেরই কাছে হেরেছিল। গত মার্চ মাসে মালয়েশিয়ায় তৃতীয় বিশ্ব হকি প্রতিযোগিতার সেমিফাইনালে কিন্তু পশ্চিম জার্মানী শোচনীয় ভাবে ৩-৫ গোলে এই পাকিস্তানেরই কাছে হেরে যায়। ১৯৭৫ সালের তৃতীয় বিশ্ব হকি প্রতিযোগিতায় ভারত স্বর্ণ, পাকিস্তান রৌপ্য এবং পশ্চিম জার্মানী ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছিল।

সদ্য সমাপ্ত মন্ট্রিলের প্রাক অলিম্পিক হকি প্রতিযোগিতায় এই আটটি দেশ অংশ গ্রহণ করেছিল—পশ্চিম জার্মানী, পাকিস্তান নেদারল্যাণ্ডস, আর্জেন্টিনা, গ্রেটব্রিটেন, কানাডা, কেনিয়া এবং মেক্সিকো। ১৯৭৫ সালের তৃতীয় বিশ্ব হকি প্রতিযোগিতায় স্বর্ণপদক বিজয়ী ভারত এই আসরে অংশ গ্রহণ করে নি। এই প্রাক অলিম্পিক হকির সেমিফাইনালে পশ্চিম জার্মানী ৪-১ গোলে আর্জেন্টিনা এবং পাকিস্তান ৫-২ গোলে হল্যাণ্ডকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছিল।

চূড়ান্ত ফলাফল : ১ম পশ্চিম জার্মানী,

২য় পাকিস্তান, ৩য় হল্যাণ্ড, ৪র্থ আর্জেন্টিনা, ৫ম গ্রেটব্রিটেন, ৬ষ্ঠ কানাডা, ৭ম কেনিয়া এবং ৮ম মেক্সিকো।

'হাতে সময় ছিল বড়ো জোর সেকেন্ড কুড়ি। এগিয়ে যাওয়ার পথ দুর্গম, পিচ্ছিল। সামনে গোল। হঠাৎ এক অদৃশ্য, অলৌকিক শক্তি আমার ওপর যেন ভর করলো। এক, দুই, তিন—চারজনকে অবলীলাক্রমে কাটিয়ে বলটা জালে ঠেলে দিলাম। ইডেনে বিস্ফোরণ ঘটলো। ইডেনের ঐ মুহূর্তটি আমার ব্যক্তিগত জীবনেও ছাব বটে। অনেক বাধা হয়েই তো আজ আপনার সামনে এসে দাঁড়াতে পেরেছি আজ আমি সুখী, আমি ধন্য

—শ্যাম।

কি—এবারের মহড়াটা শ্যাম আপার আদৌই ভাল যাচ্ছিল না। খেলতে পারছিলেন না আদানুরূপ। কিন্তু ইন্টারভ্যালের এই ছাদের মত গোলের পর তাঁর মাথার ওপর থেকে দুর্ভাবনার কালো মেঘ কেটে গিয়ে—নতুন সম্ভাবনার আলো ছড়িয়ে পড়ছে। ফিরে পেয়েছেন আত্মবিশ্বাস। নিজেকে নতুন করে যেন আবিষ্কার করেছেন তিনি। উপর্যুপরি ছ'বছর লীগ চ্যাম্পিয়ন করতেই হবে ইস্টবেঙ্গলকে।

এই আত্ম-আবিষ্কারের অনেক আগেই কিন্তু ফুটবলে কেলোয়াড় শ্যাম আপাকে আবিষ্কার করেছিলেন তাঁর বাবা শ্রীকৃষ্ণ আপা এবং মা ইন্দিরা দেবী। উৎসাহ এবং আগ্রহ দেখে তাঁরাই শ্যামকে একেবারে ছেলেবেলা থেকেই খাটিয়েছিলেন কেরোসিনের ফুটবলে মাঠে। ১৯৬৮ সালের মে মাসে এখানেই শ্যামের জন্ম। বাবা সেনাবাহিনীতে জুনিয়র কমিশনড অফিসার ছিলেন। এখন রিটায়ার করেছেন। শ্যাম বাবার সবচেয়ে বড়ো ছেলে। ছোটো ভাই—অর্থাৎ ওদের কনিষ্ঠ হিসেবে মাদুরা চাকরী করে বাপের মত সেনা-বাহিনীতে। বাকী দুটি ভাই এবং একটি বোন স্কুলে পড়ছেন কেরোসিনে।

পরের কথা বলতে বলতে শ্যাম যেন অন্যমনস্ক হয়ে যান। মন ছোটে যায় কাপড়ে কেরোসিনের সেই বাড়ীটিতে। ছোট বাড়ী, কিন্তু কি নিবাট শান্তি, কি নিবিড় শান্তি! কোর্থ ক্লাসে পড়ার সময় ১৯৬৩।১৯৬৪।১৯৬৫ তিন বছর শ্যাম আপা রাজধানীর স্কুলে স্কুলে খেলেছেন। ১৯৬৫ সালে ওখান থেকেই পাশ করেছেন স্কুল ফাইনাল। ১৯৬৫ সালে দিল্লীতে খেলা দেখে ইস্টবেঙ্গলের কর্তা-কর্তারা ওঁকে কিনে আনেন কলকাতায়। ৬৬ সালে ইস্টবেঙ্গলে খেলার পর ফিরে যান কেরোসিনে সামরিক বাহিনীতে চাকরী নিয়ে (কোপারেল ৬১ নম্বর। রিগেড)। শ্যাম বলতে গেলে প্রায় প্রত্যেক পরিবারেই খেলতে পারেন। ইনসাইড, সেন্টার ফরোয়ার্ড এবং ব্যাকেও। গত কয়েকটি বছর মহমেডান স্পোর্টিংয়ে হয়ে নিয়মিতভাবে মাঠে খেলেছেন। এবার ইস্টবেঙ্গলে প্রদীপ আলোয় শ্যামকে পুরোভাগে টেনে আনলেন। ১৯৬৮ সালে সেনাবাহিনীতে যোগ দেবার সূত্রে তিনি জাতীয় ফুটবলে সাগ্নালোরে (কর্ণাটক চ্যাম্পিয়ন)। পরের বছর আসামের নওগাঁওয়েও শ্যাম ছিলেন সার্ভিসেস দলের অন্যতম খেলোয়াড়। সার্ভিসেস সেক্টর গোলার্স আপ ট্রফিটা ফাইনালে বাংলার কাছে অপ্রত্যাশিতভাবে হেরে গিয়ে। ১৯৭০ সালে ফিরে এলেন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে। বাংলার হয়ে খেললেন জলন্ধরে অনুষ্ঠিত জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায়। তারপর '৭১ সালে আর হয় খেলেন নাম। ৭২, ৭৩, ৭৪ সালে খেলেন মহমেডানের হয়ে হায়ার্ড লীগে। ৭২ সালে মহমেডান সারডিউরন্স লীগ চ্যাম্পিয়ন এবং নাসরুলার কাপ রানার্স আপ। ইতিমধ্যে ১৯৭০ সালে নিজের কীর্তিকৃতির সূত্রেই শ্যাম আপা কেরোলালাম্পুরগামী (মারডেকা ফুটবল। ভারতীয় দলে স্থান পেলেন। স্থান পেলেন এশীয় ক্রীড়ায় (ব্যাংকক)। রাশিয়া সফরকারী ভারতীয় ফুটবল দলেও শ্যাম ছিলেন অন্যতম ফরওয়ার্ড। সুতরাং ৭২ সালে মারডেকা দলেও যান পড়লেন না। কেরোসিনে স্থানীয় প্রতিযোগিতায় খেলার সুযোগও ঘটলো। ১৯৭৪ সালে ইন্ডিয়ান শ্যামকে ভারতীয় ফুটবল দল থেকে বাদ দেওয়া সম্ভব হয়নি। খেলেছিলেন ইরাক ও উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে।

চলতি বছর শ্যাম ভাল করতে না পারলেও শ্যামের বাঁকানো হেড করার, ইন সাইড, আউট সাইড শুট করার শ্যাম আপার জুড়ি নেই ইন্ডিয়ান কলকাতার মাঠে। গতিবেগ ক্ষিপ্র তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে দুখোড় তিনি। প্রতিপক্ষের ডিফেন্সকে ফাঁকি দিয়ে বলকে পায়ে পায়ে দলকে নিয়ে যাবার যাদুময় লক্ষ্যণীয় ভেতো বাঙালী অনুকরণপ্রিয়তাও বটে। গোর্খা বলেই বোধহয় এতো কষ্ট সহিষ্ণু পরিশ্রমী আর ঠাণ্ডা মেজাজী।

শ্যাম আপা বিবাহিত। কেরোসিনের প্রায় কাছাকাছি ক্যাসলায় (মনমাদার) মেয়ে শাশুনকে নিয়ে ঘর করছেন তিনি। ছোট মেয়ে কুনুকে নিয়ে কাজল এখন কেরোসিনায় পিতৃগৃহে। শ্যাম থাকেন কলকাতায় কলটন হোটেলে। খেলার অবসরে শ্যামার কাজলকে মনে পড়ে, মনে পড়ে টুকটুকে কুনুকে। লিগের শেষ খেলেই মহমাদানার পাশে ওটবেন শ্যাম। ছুটে যাবেন কাজল আর কুনুর কাছে।

বিপ্লব বন্দ্যোপাধ্যায়

খেলার জগতে মেয়ে

পর্বতারোহণে ভারতী দুবে

বিশ্ব মহিলাবর্ষ উপলক্ষে ভারতীয় মেয়েদের একটি পর্বতারোহী দল ৩১ মে কুলু-হিমালয়ের ১৯৯১০ ফুট বা ৬০৭৫ মিটার উঁচু মাকারবে শৃঙ্গ জয় করেন। এই দলে ছিলেন, অধিনেত্রী উষা চারী, সহনেত্রী ভারতী বাদামিকি (দিল্লী), রাণী পুরী (দিল্লী), ভারতী দুবে (কলকাতা) নাজনিন কাঞ্চিক (বোম্বাই) এবং ফিটি মাডি (বোম্বাই)। এই সঙ্গে ডাঃ কুমুদিনী পুজারী ছিলেন দলে মেডিক্যাল অফিসার হিসাবে।

কলকাতার মেয়ে ভারতী দুবের সঙ্গে দেখা করলাম এই মাকারবে শৃঙ্গ জয়ের কাহিনী তার কাছে শোনবার উদ্দেশ্যে। ভারতী হল পরলোকগত শ্রমিক নেতা বিশ্বনাথ দুবের মেয়ে। ওর মা সীমাপানি দুবে ছিলেন সেনুরের বিপ্লবী দলের সদস্যা, নিজে ভূরি ভূরি জুজুৎসু প্রভৃতিতে পারদর্শিনী। মেয়ের মনের এই নির্ভীক আচরণ মার কাছ থেকেই উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া।

যাই হোক, ভারতীকে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমরা মাকারবে শৃঙ্গ কেন ঠিক করলে ?

—ঐ শৃঙ্গটা আমরা ঠিক করিনি। দিল্লী মাউন্টেনিয়ারিং এসোসিয়েশনের সভাপতি মেজর এইচ পি এস আলুওয়ালিয়ার সঙ্গে পরামর্শ করে উনি সংস্থ মহিলা অভিযাত্রী দলের অভিযানের জন্য এই শৃঙ্গটি বেছে নেন।

কুলু-হিমালয়ে অবস্থিত এই শৃঙ্গটি ১৯২০ সালে কর্ণেল ব্রুসের নজরে পড়ে। তারপর বহুবার এটিকে জয় করার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ১৯৬৭তে জিওগ্রোহিল দলের শেরপা পেম্পা ও সুরেনকুমার সহ এই শৃঙ্গের পায়ের কাছে প্রাণ হারান। বৃটিশ অভিযাত্রী দলের তিনজন ও শেরপা ওয়াংদিল ১৯৬৮তে এই শৃঙ্গ জয়ের চেষ্টা করেন। এদের মধ্যে শেরপা ওয়াংদিল ও বৃটিশ সদস্য আল বার্ণার মাকারবে শৃঙ্গে উঠতে সক্ষম হন। এটি মানালি শৃঙ্গের পরেই অবস্থিত, তাছাড়া ঐ অঞ্চলের আবহাওয়া অভিযানের পক্ষে প্রচণ্ড প্রতিকূল। তাই '৬৮র পর থেকে কেউ আর মাকারবে অভিযানে যান নি।

এবার বিশ্ব মহিলা বর্ষে মেয়েদের জন্য এই শৃঙ্গটিই নির্বাচন করা হল। ভারতী এর আগে শৃঙ্গারোহণে বেসিক রক ক্লাইম্বিংয়ের পাঠ শেষ করে। হিমালয়ান এসোসিয়েশনের অ্যাডভান্সড রক ক্লাইম্বিংয়ের

গলাব্যথা-
কাশি থেকে
নিমেষে আরাম

দৃশ্য। বরং মনালি শৃঙ্গ পর্যন্ত গিয়ে ফিরে এসে কিন্তু রঙ্গনেদীসহ আমরা সবাই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

মানালীতে এসে আমরা স্থির করলাম বিতস্তার উৎসমুখে বিতস্তাকুণ্ডে আরও শিবির বসাব। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য বর্ণনার ভাষা আমার জানা নেই। এক কথায় বলতে বলতে হয়—অপূর্ব—অনবদ্য। এই পথে আরও দুটি স্থান সোলাং নালা ও রুহ্লিতে শিবির বসানোর উপযোগী চমৎকার জায়গা ছিল। সোলাং নালায় প্রচণ্ড হাঁটা শুরু হওয়ায় আমাদের এখানে দু দিন অপেক্ষা করতে হল। এখানেই আমাদের গুজরাটের একটি অভিযাত্রী বন্ধের সঙ্গে দেখা হল। তাঁরাও মাকারবে শৃঙ্গ জয় করতে গিয়েছিলেন, কিন্তু প্রকৃতির নিদারুণ প্রতিকূলতায় তাঁদের সে সংকল্প ত্যাগ করে ফিরে আসতে হয়। এখান থেকে-গোয়ে দু দিন হাঁটিয়ে আমরা বিতস্তা কুণ্ডের দিকে এগোতে আরম্ভ করলাম। কিছুকাল পরেই এক অদ্ভুত পরিবর্তন চোখে পড়ল. সমগ্র নিসর্গ দৃশ্যে কোথাও কোন শ্যামলিমা. তৃণলতা বা সবুজের চিহ্ন মাত্র নেই। সামনের দিকে পর্বতের গায়ে যা বিস্তীর্ণ সমতল কেবল শুভ্র তুষার। সারা প্রকাণ্ড হেমন্ত তুষারের আবরণে আচ্ছাদিত। বিতস্তা কুণ্ডে পৌঁছলাম। পশ্চিম দিকে ১৯,৪৫০ ফুট উঁচু হনুমান টিব্বা যেন সমস্ত অঞ্চলের সামন্ত নৃপতি রূপে বিরাজ করছেন। পথ ধরে এগোতে লাগলাম আমরা। কত ছোট-বড় নালা. স্রোতস্বতী পেরিয়ছি তুষার সেতুর ওপর দিয়ে. তার হিসাব নেই। পথের বিলাস সামান্য এদিক-ওদিক ঢুকে পড়লে তুষার সোজা হাঁটুর নেড়ে। স্রোত ছোট স্রোতস্বিনী কিন্তু বেশ গভীর। পর্বতের বুক কেটে বয়ে চলেছে। কাজেই জায়গায় কেবল আলগা পাথরের ওপর পা দিয়ে দিয়ে জল পার হতে হয়। বিতস্তা কুণ্ডের মূলে শিবিরে পৌঁছে দেখি আমাদের আগের আগেই এক বিরাট হিম বাহ এসে গেছে। ২৫ মে আবহাওয়া আমাদের অত্যন্ত খারাপ করে গেল। ঐ প্রচণ্ড শীতের মধ্যে প্রবল শিলাবৃষ্টি ও তুষার ঝড় শুরু হল। আমরা একটা হাল্কা তৈরী করে নিম্ন প্রকাণ্ড দহটার উদ্দেশে উৎসর্গ করলাম যদি তার কৃপায় আবহাওয়া অনুকূলে হয়। আশ্চর্যের বিষয় শিবিরে পৌঁছে দেখি আবহাওয়া বেশ পরিষ্কার হয়ে গেছে। সংক্ষেপ বলি. প্রথম শিবির স্থাপনের জন্য প্রায় তিনশো মিটার এগিয়ে যাবার পর আমাদের চক্ষুস্থির। সামনে ভয়াবহ আকারের বরফ আর তুষার জমাট বেঁধে রয়েছে। হিমবাহ পেরিয়ে তুষারের ওপর দিয়ে আমাদের পর্বতের ঢালুতে উঠতে হবে। আমরা ঐ জায়গাতেই তাঁবু গাড়তে থাকলুম। পরদিন নীচের তাঁবু থেকে এক নম্বর তাঁবুতে জিনিসপত্র আনা হল। আমাদের টেনুন খারাপ হওয়ায় ঐ মালভার আরও কঠিন অবস্থা হয়েছিল। ২৭ মে দিনটি ভাল ছিল। কিন্তু এর আগে মাকারবে শৃঙ্গ জয়ের সুযোগ মাত্র দুদিন পর্বতের খারাপেই ছিল। এবার আমরা মাকারবে এবং মানালি দুটি শৃঙ্গই দেখতে পেলাম। ২৮ মে. তুষারপাতের জন্য বিশেষ কাজ হল না। আমরা মানালির পায়ের কাছে তিন নম্বর তাঁবু বসালাম। ২৯ তারিখে আবহাওয়া ঘোলা হলেও খুব খারাপ ছিল না। তাই আমরা মানালি শৃঙ্গে উঠতে লাগলাম। কঠিন খাড়া উঁচু পাহাড়ের গায়ে দড়ির সাহায্যে একে একে উঠলাম। ১৯৬৫র এভারেস্ট অভিযাত্রী দলের শেরপা নওরাং আমাদের এখন পথ প্রদর্শক। মাঝে মাঝে পর্বতের গায়ে যেখানে পা রাখছি ভয়ঙ্কর আলগা পাথর পড়ে যাচ্ছে। কখনও বা হঠাৎ পা দিলে পা ভুস করে ডুবে যাচ্ছে। এ এক অদ্ভুত ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা। যে কোন মুহূর্তে পা একটা ফসকালে বা মাটি থেকে হাত আলগা হলে একেবারে হাজার ফুট গভীর গাঁয়ের ভিতর চিরকালের জন্য অদৃশ্য হয়ে যেতে হবে। ঐ প্রচণ্ড শীতেও হাত-পা ঘামছি যেন কলের মত। মস্তিষ্কে যেন কোন চিন্তা করার শক্তি নেই। মাঝে মাঝে শেরপার হুঁসিয়ারী ফীলডাসে শুনতে পাচ্ছি। তবু উঠছি—এগোচ্ছি। দু নম্বর তাঁবু থেকে প্রায় এক ঘণ্টায় তিন নম্বর তাঁবুতে আসা যায়। আমরা টিনের খাবার আর কিছু বাদাম নিয়ে আবার পর্বতে ওঠা সুরু করলাম। ৩০ মে বেলা সাড়ে দশটায় পর্বতের শীতাল কিনারায় উঠে সেই সামান্য জায়গায় চার নম্বর তাঁবু পাতা হল। জায়গাটা এতই ছোট যে দু জনে সরলেই অতলস্পর্শী খাদে সমাধি। ৩১ মে আবহাওয়া পরিষ্কার হবার জন্য আমরা প্রার্থনা করতে লাগলাম। ঐ দিন সকাল সাড়ে ছটায় ভারতী ব্যানার্জি ও গিটি বার্ডি. রঙ্গনেদীর নির্দেশে শেরপা নাওরাং সোনাম ও তাসিকে নিয়ে আমাদের লক্ষ্যস্থল মাকারবে শৃঙ্গের দিকে উঠতে সুরু করল।

আগেই বলেছি প্রথম দল শৃঙ্গে পৌঁছুবার পরদিন আমি রাণী ও নান্দানিনও উঠতে আরম্ভ করি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চারিদিক এমন ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে গেল যে. আমাদের অভীষ্ট আর সিদ্ধ হল না। ১০ জুন আমরা ফিরে ফিরলাম। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী স্বয়ং আমাদের উৎসাহিত করলেন।

—শৃঙ্গের থেকে ভারতী ব্যানার্জিরা কিছু আনেন নি।

—হ্যাঁ। '৬৮ সালের অভিযাত্রীরা মাকারবে শৃঙ্গে যে নাইলনের পতাকাটি রেখে এসেছিলেন, ওঁরা সেটি নিয়ে এসেছেন।

—পর্বতারোহণের পর এখন কেমন লাগছে ?

—অপূর্ব লাগছে। দেশবন্ধু বালিকা বিদ্যালয় আর যোগমায়া কলেজের বি এস সির ২য় বর্ষের ছাত্রী আমি এই ভারতী দুবে যে মাকারবে শৃঙ্গ বিজয়ী দলের একজন একথা ভাবতেও চমৎকার লাগছে।

—এবার কি করবে ?

পড়াশোনা। আরও পর্বতারোহণ আর নিত্য খেলা অনুশীলন।

—অনেক শুভেচ্ছা রইল।

অমৃত

বয়সভিত্তিক সন্তরণ সম্পর্কে দু'চার কথা

শ্রীপর্ণা ব্যানার্জী

মৌসুমী নাথ

মন্দাক্রান্তা দাসচৌধুরী

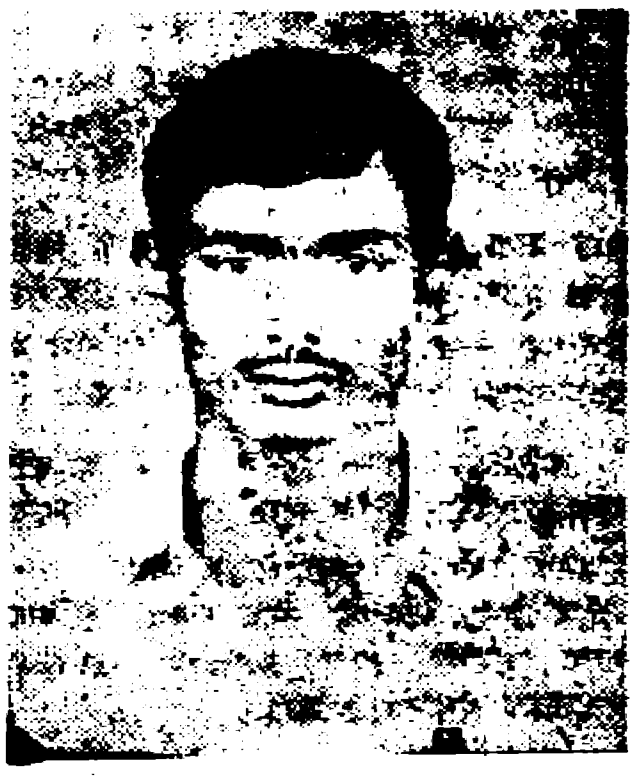

অর্পিতা বসু

জলক্রীড়ায় পশ্চিম বাংলার রবরবা আজ কোন নতুন ঘটনা নয়। বয়সভিত্তিক দ্বিতীয় বার্ষিক জাতীয় সন্তরণ প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি লাভ করে পশ্চিমবঙ্গ তার সেই অতীত সুনামকে অক্ষুন্ন রেখেছে অক্ষরে অক্ষরে।

এদেশে বয়সভিত্তিক সন্তরণ প্রতিযোগিতার সূত্রপাত ১৯৭৪ সালে। পশ্চিম বাংলার অনুপস্থিতিতে গতবছর মহারাষ্ট্র ছিল একাই একশো। এবার পশ্চিমবঙ্গের সাঁতারুদের নৈপুণ্যের কাছে প্রতিযোগী সব রাজ্যকেই সহজেই হার স্বীকার করতে হয়েছে।

বালকদের চারটি বিভাগ ছাড়াও বালিকাদের চতুর্থ বিভাগে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ানসিপের স্বীকৃতি আদায় করে নিতে পশ্চিম বঙ্গকে মোটেই বেগ পেতে হয়নি। কেবলমাত্র বালিকাদের প্রথম ও তৃতীয় বিভাগে মহারাষ্ট্র এবং দ্বিতীয় বিভাগে রাজস্থান বাংলার হাত থেকে চ্যাম্পিয়নসিপ ছিনিয়ে নিয়েছে।

বিভাগীয় চ্যাম্পিয়ানসিপের প্রশ্ন ছেড়ে দিয়ে ব্যক্তিগত নৈপুণ্যের দিকে দৃষ্টি ফেরালেও বালক বিভাগে বাংলার কৃতিত্ব বড় বেশী করে চোখে পড়ে। প্রথম গ্রুপে অর্পিতা বসু তৃতীয় গ্রুপে বিশ্বজিৎ দে চৌধুরী ও চতুর্থ গ্রুপে সিদ্ধার্থ বসু সেবা সাঁতারুর স্বীকৃতিতে উজ্জ্বল। অবশ্য তৃতীয় গ্রুপে রিপুরা ও পশ্চিম বাংলা যুগ্ম বিজয়ী।

ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ানসিপের মহিলাদের ক্ষেত্রে তুলনামূলক বিচারে পশ্চিম বাংলা একটি আসনও অধিকার করতে পারেনি। পক্ষান্তরে মহারাষ্ট্র তিনটে বিভাগে তাদের বিজয় পতাকা সগৌরবে উড্ডীন রেখেছে। এরা তিনজন হলেন করুণা মীরচন্দানী (প্রথম গ্রুপ), শর্মিলা বক্সী (তৃতীয় গ্রুপ) ও আল্পনা অধিকারী (চতুর্থ গ্রুপ)।

বালিকাদের দ্বিতীয় গ্রুপের ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ানসিপে রাজস্থানের গেলডা ডিসুজা এক অঘটন ঘটিয়েছে বলা যায়। দশটি স্বর্ণপদক সম্ভারের সুবাদে ডিসুজা গোল্ডেন গার্ল। ডাইভিং-এ দশটি ইভেন্টের দশটিতেই সেরা। গত বছরের সাতটি রেকর্ড ম্লান করেছে। চারটি ইভেন্টে তার দক্ষতা সিনিয়ার গ্রুপকেও ছাড়িয়ে গেছে। ডাইভিংএ ডিসুজা অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় রেখেছে। প্রসঙ্গক্রমে জানিয়ে রাখি পশ্চিমবঙ্গ ডাইভিং-এ অংশ গ্রহণ করেনি। ডাইভিং-এ উৎসাহী প্রতিযোগীর সংখ্যা এখানে এত সীমিত যে প্রায় হাতে গোনা যায়। এর মূল কারণ দুটি। একটি ডাইভিং বোর্ডের অভাব। হেদুয়া বা কলেজ স্কোয়ারে সকলের স্থান সংকুলান হওয়া অসম্ভব। বেলেঘাটার ডাইভিং বোর্ডটি আধুনিক কায়দায় তৈরী আন্তর্জাতিক আইন স্বীকৃত হলেও জলের পরিমান হাঁটু সমান। অবস্থিতি শহরের এক প্রান্তে বলে শিক্ষা বা অনুশীলনে ইচ্ছুক অনেকেই এটি ব্যবহার করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। দ্বিতীয়তঃ ডাইভিং শিক্ষাপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকের অভাব। সমস্ত বিভাগে পশ্চিমবঙ্গ পারদর্শিতা দেখালেও ডাইভিং প্রতিযোগিতায় অনুপস্থিতি হেন সাফল্যের অন্তরালে পরাজয়ের বেদনার মত মনে বাজে।

পদক জয়ের মাপকাঠিতে ব্যক্তিগত উৎকর্ষতা বিচার করতে গেলে ডিসুজার পর মহারাষ্ট্রের করুণা মীরচন্দানীর (গ্রুপ এক) নাম করতে হয়। সাতটি সোনা হাতানো ছাড়াও পাঁচটি রেকর্ড গড়েছে করুণা। পশ্চিম বাংলার অর্পিতা দাস (গ্রুপ এক) চারটি সোনা সমেত তিনটি বিষয়ে জাতীয় রেকর্ড রচনা করেছে। চতুর্থ গ্রুপে পশ্চিম

বাংলার একরাশ মেয়ে বুলা নাথ চারটি সোনা ও একটি ব্রোঞ্জসহ তিনটি ইভেন্টে নতুন রেকর্ড তৈরী করে অসাধারণ দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছে।

আশিস ও বুলা দুজনেই এসেছে নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘর থেকে। দুজনকেই এগিয়ে আসতে হয়েছে নিদারুণ অর্থনৈতিক সঙ্কটের প্রতিবন্ধকতার বেড়া ডিঙিয়ে। কোলকাতার বুকে গোপনের মত সঁাতার পুষ্করিণীতে অনুশীলনের জন্যে আশিসকে রোজ ছুটে আসতে হয় বালী থেকে। চাকরী পাবার আশায় মুহূর্ত গোনে সে। অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। চাকরী না পেলে হয়ত অদূর ভবিষ্যতে তাকে সাঁতার ছাড়তে হবে। বুলা নাথ আটজনের সংসারে কনিষ্ঠতমা। বাবা পোষ্টে এন্ড টেলিগ্রাফের সামান্য মাইনের ছোটখ ড্রাইভার। দৈনন্দিন অচল সংসারে বুলা তার বাবার কাছে আশ্রোকবর্তিকার মত। সপ্তমশ্রেণীর ছাত্রী বুলা তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কিন্তু এই প্রতিকঠিন দৃঢ়তা অভাবের তাড়নায় জব্দ হয়ে গলে না যায়।

দিল্লীর এন আই এস পুলে অনুষ্ঠিত বয়স ভিত্তিক দ্বিতীয় বার্ষিক জাতীয় সন্তরণে মোট ৬৩টি নতুন রেকর্ড রচিত হয়েছে। তার মধ্যে ২৭টি ফাইনালে ও বাকীটি রেকর্ড হয়েছে হিটে। এর মধ্যে পশ্চিম বাংলার সাঁতারুরা ২২টি রেকর্ড গড়েছে এবং ৩৭টি সোনা, ২৯টি রৌপ্য ও বারোটি ব্রোঞ্জ জয় করেছে।

আশিস ও বুলা ছাড়া যারা রেকর্ড তৈরী করেছে তাদের মধ্যে আছে গৌর গুহ-কারোত (দ্বিতীয় গ্রুপ), সিদ্ধার্থ দে চৌধুরী ও সিদ্ধার্থ বসু, সুশীল ঘোষ। মেয়েদের বিভাগে ইলা পাল (তৃতীয় গ্রুপ), মৌসুমী রায় (দ্বিতীয় গ্রুপ) ও মন্দাক্রান্তা দাসচৌধুরী (চতুর্থ গ্রুপ) নতুন রেকর্ড স্থাপনের কৃতিত্ব অর্জন করেছে।

এদের অধিকাংশই সাঁতার সুরু করেছে

বুলা নাথ

মাত্র এক বছর আগে। অনেকেরই প্রতিযোগিতার অভিজ্ঞতা এই প্রথম। সপ্তম শ্রেণীর এক কোঁটা মেয়ে মন্দাক্রান্তা প্রতিযোগিতার এই প্রথম আবির্ভাবেই দুটি রেকর্ড করেছে। বাড়ীতে এখনও সে প্রত্যহ পুতুল খেলে ও তাদের বিয়ে দেয়। মৌসুমীর জলের সঙ্গে পরিচয় এক আধ বছর আগে। স্কুলে পড়ে। চেহারা বড়সড় হলেও বয়স অল্প। এখনও লাঠাই নিয়ে ঘুড়ি ওড়ায়। জাতীয় সন্তরণে প্রথম আবির্ভাব লগ্নেই সে আগে ভাগে দুটি নজীর রচনা করে ফেলেছে।

দলনেত্রী শ্রীপর্ণা ব্যানার্জীকে নিয়ে আমাদের আশা ছিল আকাশছোঁয়া। কিন্তু তার ফলাফল আশানুরূপ হয়নি। ২০০ মিঃ ব্রেস্ট স্ট্রোকে মেয়েদের প্রথম গ্রুপে শ্রীপর্ণাকে হারিয়ে পাঞ্জাবের গীতসা গিল (৩ঃ ২৩-১) প্রথম হয়েছে। অথচ ২০০ মিঃ প্রথম ব্রেস্ট স্ট্রোকে অল ইণ্ডিয়া ওপেন

বালক বিভাগ

নাম	গ্রুপ	ইভেন্ট	রেকর্ড সময়
আশিস দাস	প্রথম	১০০ মিঃ ব্যাক স্ট্রোক	১ঃ ১০-৮
আশিস দাস	প্রথম	১০০ মিঃ ফ্রি স্টাইল	১ঃ ০২-৬
আশিস দাস	প্রথম	৪০০ মিঃ মেডলি	৫ঃ ৫২-৫
এস গোস্বামী	তৃতীয়	২০০ মিঃ ব্রেস্ট স্ট্রোক	৩ঃ ১৬-২
অরুণ সরকার	চতুর্থ	১০০ মিঃ ব্রেস্ট স্ট্রোক	১ঃ ৩৪-৬
গৌর গুহ-কারোত	দ্বিতীয়	৪০০ মিঃ মেডলি	৫ঃ ৫৯-৮
পল্লব হালদার	প্রথম	৪০০ মিঃ ফ্রি স্টাইল	৫ঃ ২২-১
সিদ্ধার্থ বসু	চতুর্থ	১০০ মিঃ ব্যাক স্ট্রোক	১ঃ ২৬-৮
সিদ্ধার্থ বসু	চতুর্থ	২০০ মিঃ মেডলি	৩ঃ ৮-৬
সুশীল ঘোষ	চতুর্থ	১০০ মিঃ বাটারফ্লাই	১ঃ ২৯-৩
আশিস দাস (জুনিয়ার)	তৃতীয়	১০০ মিঃ বাটারফ্লাই	১ঃ ২৮-৩
বি সি চৌধুরী	তৃতীয়	১০০ মিঃ ব্রেস্ট স্ট্রোক	১ঃ ২০-৮
বি সি চৌধুরী	তৃতীয়	২০০ মিঃ ব্যাক স্ট্রোক	৩ঃ ০১-৩

বালিকা বিভাগ

বুলা নাথ	চতুর্থ	১০০ মিঃ বাটারফ্লাই	১ঃ ৫২-৮
বুলা নাথ	চতুর্থ	১০০ মিঃ ফ্রী স্টাইল	১ঃ ২৫-২
বুলা নাথ	চতুর্থ	২০০ মিঃ মেডলি	৩ঃ ৪১-৩
ইলা পাল	তৃতীয়	২০০ মিঃ ব্রেস্ট স্ট্রোক	৩ঃ ২৫-৬
ইলা পাল	তৃতীয়	১০০ মিঃ ব্রেস্ট স্ট্রোক	২ঃ ৩৪-৩
মৌসুমী রায়	দ্বিতীয়	১০০ মিঃ ব্রেস্ট স্ট্রোক	১ঃ ৩৬-৩
মৌসুমী রায়	দ্বিতীয়	২০০ মিঃ ব্রেস্ট স্ট্রোক	৩ঃ ২৩-৫
মন্দাক্রান্তা দাসচৌধুরী	চতুর্থ	৫০ মিঃ ব্রেস্ট স্ট্রোক	৪৭-৬
রিনা চক্রবর্তী	চতুর্থ	১০০ মিঃ ব্যাক স্ট্রোক	১ঃ ৪৫-০

চ্যাম্পিয়নশিপে শ্রীপর্ণার রেকর্ড (৩ঃ ২২-২) এখনও অম্লান রয়েছে। ১০০ মিঃ ব্রেস্ট স্ট্রোকেও শ্রীপর্ণাকে হার মানতে হয়েছে পাঞ্জাবের এই গীতসা গিলের কাছে (১ঃ ৩৩-৫)। ব্যর্থতার কথা জিজ্ঞেস করতে শ্রীপর্ণা বলল সে এ বছরে অনুশীলনের সুযোগ পেয়েছে অল্প। মামসে হওয়ার দরুন দীর্ঘদিন জলে নামতে পারেনি। দিদির বিয়ের জন্যেও তার বেশ কিছু সময় গেছে কাজে কাজে। তার ওপর দিল্লীর আবহাওয়া সয় নেয়েছে। তার শরীর ভাল যায়নি। অসুস্থ হয়ে পড়ায় রেকর্ডও খারাপ হয়েছে।

শ্রীপর্ণাকে খাঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—আমাদের মেয়েরা মহারাষ্ট্রকে প্রতিযোগিতায় হারাতে পারল না কেন? একটু ভেবে শ্রীপর্ণা বলল—অনুকূল পরিবেশের জন্যে ও প্রদেশের মেয়েরা প্রায় সারা বছর অনুশীলনের সুযোগ পায়। সেই অনুপাতে আমরা দশ থেকে তিন মাসের বেশী জলে নামার সুযোগ পাই না। তার ওপর দিল্লীর নতুন পরিবেশকে আমরা কেউই মানসিকভাবে করে নিতে পারিনি। প্রত্যেকেই কোন না কোন শারীরিক অস্বস্তি ও অসুস্থতায় ভুগছে। বালক বিভাগের দলনেতা আশিসের মন্তব্যও প্রায় একই ধরনের। নানান অসুবিধা ও গোলযোগ না থাকলে আমাদের ছেলেমেয়েরা আরও ভাল টাইমিং করতে পারত।

নিম্নে রেকর্ডধারীদের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হল।

আর যারা একাধিক সোনা পেয়েছে তাদের মধ্যে বুলা নাথ, মন্দাক্রান্তা দাসচৌধুরী, সিদ্ধার্থ বসু, সুশীল ঘোষ, আশিস দাস (জুনিয়ার) প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

ওয়াটারপোলোর প্রসঙ্গ টেনে আলোচনা আজকের মত ইতি করা যাক। পশ্চিমবঙ্গ চূড়ান্ত খেলায় মহারাষ্ট্রের কাছে ৮—৫ গোলে হেরে রানার্স হয়ে যায়। প্রশিক্ষক কণক ঘোষের ধারণা ফলাফল ছাঁড়াধারা অনুযায়ী যথাযথ হয়েছে।

—শান্তনু দা

সেন্টিমেন্টাল টক

স্থান হিমালয়। হৃষিকেশের শান্ত সমাহিত আকাশ সেদিন হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠল সেই আহ্বানে—হিউম্যান লাইফ ইন ডেঞ্জার, হিউম্যান লাইফ ইন ডেঞ্জার, হিউম্যান লাইফ ইন ডেঞ্জার...

একজন প্রবীণ সন্ন্যাসী হৃষিকেশের চড়াই উৎরাই পথ ধরে ছুটছেন আর প্রাণপণে চেঁচাচ্ছেন—হিউম্যান লাইফ ইন ডেঞ্জার...

পিনাকী মুখার্জি আমাকে গল্পটা বলছিলেন। বেশ কয়েক বছর আগেকার কথা। পরিচালক অর্ধেন্দু মুখার্জির সঙ্গে ওঁরা সেবার হৃষিকেশে গেছেন 'বন্ধন' ছবির আউটডোর শুটিং করবার জন্যে। সন্ধ্যা রায়, অনিল চ্যাটার্জি, দীপক মুখার্জি, জীবেন বসুরাও আছেন সেই আউটডোরে। আর আছেন একদল কলাকুশলী।

এখন হয়েছে কি—অর্ধেন্দু মুখার্জি যেই এই হৃষিকেশ-লছমনঝুলার আউটডোরের স্কীমটা করেছেন, কোথায় ছিল আমাদের সনুদা (খাতনামা সুনীল রায়চৌধুরী, এঁর কথা পাঠকদের স্মরণ থাকতেও পারে), অমনি এসে অর্ধেন্দুবাবুকে প্রায় পাঁজাকোলা করে ধরে বসে রইল—দাদা, তাহলে আমাকেও তোমাদের সঙ্গে নিয়ে চল, তীর্থটা করেই আসি এই সুযোগে—

অর্ধেন্দু মুখার্জির তখন টটাবিং অবস্থা। কোন গতিকে ছবিটা শেষ করে রিলিজ দিলে তবে বাঁচোয়া। পয়সাকড়ি আর বিশেষ নেই। হঠাৎ সনুদার এহেন আব্দারে অর্ধেন্দু মুখার্জি ঈষৎ চটে গেলেন—আরে আমরা যাচ্ছি শুটিং করতে, গাটের পয়সা টাক খরচা করে, আর তুমি তীর্থের কথা বলছ? আচ্ছা পাষন্ড হে তুমি!

এসব বাকো টলিত হবার পাত্র সনুদা অন্তত নয়। হেসে বললে—পাষন্ড বলেই তো যেতে চাইছি দাদা। যদি তীর্থগুণে পাপক্ষয় হয়।

—তা বলে মাগনায়?

—আহা, মাগনায় কেন? তোমাদের শুটিং-এ কত কম্মো করে দেব গতর দিয়ে। তার জন্যে আমার কোন পারিশ্রমিক দিতে হবে না, আমি পেটে-ভাতে থাকতেই রাজী—

বলে ওই বিশাল বপু ফেলে বসে রইল। নড়বার লক্ষণ নেই। ঘুরে ফিরে ওই এক কথা—নিয়ে চল দাদা আমায় নিয়ে চল...। শেষে অর্ধেন্দু মুখার্জি, যদিও তিনি সনুদাকে বিলক্ষণ স্নেহ করেন—ক্ষেপে গিয়ে বলেই ফেললেন—'চল তোকে দিয়ে অসি সাগরের জলে—'। সনুদার কি হাসি! স্টার্টে পারলেই কার্যোদ্ধার, এটা কলকাতার ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রীতে কে-না জানে!

সনুদা শীতকাতুরে। সনুদার বড় ভূতের ভয়ও। কনফার্মড ব্যাচেলার। অথচ রাজপুত্তুরের মত চেহারা। জমিদার বাড়ির ছেলে। এখনও গিলে করা আদ্দির পাঞ্জাবি আর চুনট করা ধুতি পরে মাঝে মাঝে সনুদা একটিবার টল টল হয়ে দাঁড়ালে—অনেক মেয়েরই বুক-ফিয়া শুরু হয়ে যায়। তবে সনুদা প্রেমের লাইনে বেশী হাঁটাহাঁটি করে নি। যৌবনে নিশ্চিত কোথাও বড় রকম একটা দাগা খেয়েছে। তাই এহেন ব্যাচেলার অবস্থা। সাবিত্রী চ্যাটার্জির সঙ্গে সনুদার বন্ধুত্ব দীর্ঘদিনের—মনে হয় সাবিত্রী অনেক গোপন কথা সনুদার ইয়ের ভেতর থেকে টেনে বের করেছে। আর সনুদা কার না বন্ধু! উত্তমকুমার বলুন বা সুচিত্রা সেন—সবই বন্ধু। সনুদা সর্বত্র হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ করে গিয়ে হাজির। বাস একবার জমিয়ে বসলে কোথা দিয়ে যে দিনমান কেটে যাবে কেউ হদিশও করতে পারবে না। মজলিশি গল্পে সনুদার কোন জোড়া নেই, আর মাঝে মধ্যে পান জর্দা আর এক-আধটা দামী সিগারেট। এই রকম চরিত্র বিরল—পরোপকারী, বন্ধুবৎসল, হৃদয়বান সজ্জন মানুষ। জমিদারি চালচলন, কিন্তু মেজাজটা এখনও আছে। মাঝে মাঝে নানা হাঁকে ডাকে আমরা স্টুডিওতে তা বিলক্ষণ অনুভব করতে পারি। আপাতত মানুষটি 'ভোলা ময়রা' ছবিটি কনট্রোল করছে। সেদিন স্টুডিওতে দেখা হতে শুনলাম, ল্যাবরেটরীর স্কোরিং চেম্বারে ও ছবির গান রেকর্ডিং হচ্ছিল।

হৃষিকেশে চলেছে পুণ্যকামী সনুদা, সম্বল একখানি কম্বল। পিনাকী মুখার্জিকে গোপনে বলল—হ্যাঁরে পানু, গরম জামা কাপড় নিয়েছিস তো?

—নিয়েছিই তো, শীতের দেশে শুটিং করতে যাচ্ছি...

—খুব ভাল করেছিস

পিনাকী মুখার্জির কেমন যেন সন্দেহ হল। জানতে চাইল—কেন, তুমি নাও নি?

সনুদা সহাস্যে—'বলক্ষণ, কম্বল নিয়েছি একখান। কুলিয়ে যাবে না?

—সে তো রাতের বেলা। আর দিনের বেলায়?

সনুদা অক্লেশে বলল—তাইথো করতে বেরিয়েছি তো, তাই লটবহর নিলুম না। আমার সাইজ দেখে নিস একখানা পুলোভার বা সোয়েটার, গায়ে দেবাখন।

বলেই পরম তাচ্ছিল্যের সঙ্গে সনুদা একটি নিঃশ্বাসে বলল—কী আর এমন একটা শীত! যদি খুউব বাড়াবাড়ি দেখি, নিয়ে নেবখন তোর আর একটা শাল বা আলোয়ান হা দীলস্—

পিনাকী মুখার্জি সনুদার কথা শুনে যেন স্তম্ভিত।

—তাহলে আমি কি গায়ে দেব?

—কেন, আমার কম্বলখানা—ভাল ব্যাপেকট, বলছি, রোয়া কুট কুট করে না—

—বঃ, উনি আমার আলোয়ান উড়িয়ে কাপ্তেনী করবেন আর আমি ওঁর ঢাউস কম্বল গায়ে দিয়ে দিনমান হৃষিকেশের পথে পথে ঘুরব! ভাল ভেবেছে কিন্তু সনুদা, তোমার জবাব নেই—

—কেন কম্বলটা খারাপ হলো কিসে?

—না, খারাপ হবে কেন! খুউব ভাল। তবে ওটি আমি গায়ে দিতে রাজী নই এবং তোমাকেও আমার আলোয়ান দিয়ে কৃতার্থ হতে রাজী নই। সাফ কথা।

সনুদারও তৎক্ষণাৎ সাফ কথা— ও আমি নেবই। শীত আমার বড় ভয়, আর ভূতে ভয়। বাস, এ-দুটো হচ্ছে আমি বেপরোয়া—

ফিল্ম ইউনিটের জন্যে হৃষিকেশে যে বাড়িটি ভাড়া করা হয়েছিল, কে একজন বেমক্কা রটিয়ে দিল—বাড়িটি ভূতের বাড়ি। মনে হচ্ছেও তাই। হৃষিকেশে মরে যারা এ-অব্দি ভূত হয়েছে, তারা সবাই নাকি ও-বাড়িতে ঘাঁটি গেড়েছে। রাতের বেলায় ওঁদের কারবার। সন্ধ্যা নাগাদ নেড়া পীপুল শুরু হয়ে রাত দুপুরে তা নাকি রীতিমত বাঁজিয়ায় পরিণত হয়।

শুনে আমাদের সনুদার তো ধড় ছেড়ে যাবার দাখিল। —হ্যাঁরে পানু, এসব কি শুনছি? এটা নাকি ভূতের বাড়ি—

পানুদা মৃদু হেসে বলল—বাড়ি কি বলছ? বল প্রাসাদ! তবে তোমার চিন্তার কিছু নেই। বড় বড় ভূতই হোক না কেন তারা, বায়োস্কোপের লাইনের লোকের কাছে ঘাপ খুলতে আসবে না। হলেও ভূত, প্রাণের মায়া আছে তো!

আসলে পিনাকী মুখার্জি এটা বুঝতে পেরেছিলেন, সনুদাকে কেউ ভয় দেখাবার জন্যে গল্পোটি ফেঁদেছে।

তবুও সনুদার খাঁতখাতানি যায় না। ধন্যে করতে এসে শেষে কি ভূতের কৃপায় প্রাণ যাবে! পানু-টানুর কথায় বিশ্বাস কি? ওদের তো হুট্ বললেই ছুট্,

জয় সন্তোষী মা
কানন কৌশল

ব। আনন্দ এসেছে ভূতের ভয়
াতে। ভয় আমি অমনি ভয় পেয়ে এই
কার বাড়িটা ছেড়ে দিয়ে সব্বার হাত
হৃষিকেশের গাছের তলায় গিয়ে
াই—হুঁ।

পাশের ঘরে জীবেন বসু আর পিনাকী
র্জি বসে চিনেটা নিয়ে আলাপ-
লোচনা করছিলেন। সেখানে শুকনো
খ সুনন্দার আগমন। জীবেন বসু
ৎসাহে বললেন—এসো সুনু এসো।
া।

বসলেন।

ওর মুখের ভাব-ভঙ্গী দেখে এক
ন্ন জীবেন বসু প্রশ্ন করলেন—তোমার
হয়েছে বলত সুনু? মুখটা শুকনো
কনো লাগছে।

সুনন্দা বিরস বদনে বললেন—জীবুদা,
র্বন্দুদা আমাদের খতম করার প্লান
টছে।

জীবেন বসু অবাক। —খতম? তার
ানে?

অমনি সুনন্দা ঝেঁজে উঠলেন
আর ন্যাকে খেলাচ্ছো জীবুদা,
জানো অথচ চেপে যাচ্ছো, কালা
(অর্ধেন্দু মুখার্জির ডাক নাম) ভ

—না, বিশ্বাস কর সুনু, আমি
জানি না। ব্যাপারটা কি একবার
করে বলতো?

—আর দাদা, পুণ্যি করতে এসে
পর্যন্ত বেঘোরে না প্রাণ যায়!

—আঃ কি হয়েছে বলবে তো।

—ভূত!

—ভূত?

—হ্যাঁ, এটা হন্টেড হোস,
রাখো? আচ্ছা জীবুদা, হন্টেড
কারেক্ট বাংলাটা কি বল তো?

জীবেন বসু স্খলিত কণ্ঠে ব
হানবাড়ি। ওরে এটা কি বাস্তবিক
বাড়ি? আমার আবার এটা ইয়ে আ
হার্টের ব্যামো। উল্টোপাল্টা কিছু
দেখলে আমি কিন্তু প্রচন্ড নার্ভা
পড়ি—

পিনাকী মুখার্জি বিরক্ত হয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেল। তখন সুনন্দাতে আর জীবুদাতে সংলাপ শুরু হল। দুজনেই ভূতের ভয়ে কাতর।

—জীবুদা, রাত্রে তুমি কোথায় শুতে ফেলছো?

—আমি ভাবছি ক্যামেরার ঘরে থাকব। ওরা অনেকগুলো লোক। ওদের মধ্যে বিছানা পেতে লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ব। ক্যামেরার লোকদের টপকে ভূত-প্রেত আমার কাছে আসতেই সাহস পাবে না। তুমি কি বলো?

সুনন্দা আপ্লুত হবল। —হ্যাঁ, সেটা মন্দ নয়। কিন্তু আমাকে দোতলায় থাকতেই হবে। পানুর সঙ্গে।

—কেন? তুমিও ক্যামেরার ঘরে চলে এসো।

—উপায় থাকলে আসতুম। কিন্তু আমি নিরুপায়, অসহায়।

—কেন কেন?

—আর বল কেন। আসার দিন তাড়া-হুড়োয় সব ফেলে চলে এসেছি। বাকস, বেডিং এন্তারিধং—

—আর মানি ব্যাগ?

—ওটা তো তুমি জানো দাদা, ওটা ফেলে আসতে আমি ভীষণ ভালবাসি। পার্টিকুলারলি কোন ছবির আউটডোরে। আফটার অল আমার ব্লাড ওয়াটার করা পয়সা নিয়ে পকেটমারেরা বেঙ্গল টানবে, এ আমি কিছুতেই সহ্য করব না।

—তা কি এনেছ সঙ্গে?

—একটি কম্বল। এবং তোমাদের।

—উফ... সুনু, তুমি একটি ক্যারেকটার। যাই হোক। যাই হোক, আমি তোমার আমার একটা বালিশ জোন দিতে পারি। একসট্রা আছে।

—বাস বাস, ওতেই চলবে। পানুর বিছানায় শুয়ে পড়ব। উঃ, কি বেজায় শীত এখানে জীবুদা। গঙ্গায় ডুব দেব কি করে তাই ভাবছি। তারও ওপর শুনেছি, ভূতেরা ধরলে নাকি গঙ্গায় চুবিয়ে.....

বলা শেষ হলো না। অর্ধেন্দু মুখার্জি ঘরে ঢুকলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে সুনন্দা স্পিকটি নট। —চলি জীবুদা, তুমি আর এ-বিষয়ে—বলে চোখে ইঙ্গিত করলেন—যেন কালাচাঁদাকে ঘাঁটাতে যেও না। ভীষণ ফেপচুরিয়াস হয়ে আছে।

জীবেন বসুও ইঙ্গিতে—আরে তুমি ক্ষেপেছো। কালাচাঁদকে আমার আর ঘোলাতে হবে না—

সুনন্দা বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, থমকে দাঁড়াতে হল অর্ধেন্দু মুখার্জির কথায়—কোথায় চলেছো?

—আ, মানে নোতলায়—

—এটু বাজারে যাবে দয়া করে! আমার সঙ্গে—

সুনন্দা সংক্ষণাৎ—নিশ্চয় নিশ্চয়। আমার এটু বেড়ানোও হবে। চলো। একটুন বেরিয়ে পড়া যাক। জীবুদা যাবে নাকি? চলই না এটু শরীরের জট ছাড়িয়ে আসা যাক।

দু' পাশে পর্বতশ্রেণী আর ঠিক তার মাঝখান দিয়ে একটা খাতের মধ্যে দিয়ে পবিত্র বাহিনী গঙ্গা বয়ে চলেছে। গঙ্গায় নামলে মনে হবে—দু' পাশে কে যেন থাকে থাকে দেয়াল তুলে দিয়েছে গগনচুম্বী।

দিনের বেলায় আলো ঝলমল, সূর্যের কিরণে গঙ্গার জল চিকচিক করছে, কিন্তু সূর্য যেই পশ্চিমে হেলেছে আর রক্ষা কোথা। কোথায় ছিল ঠাণ্ডা হাওয়া, হু হু হু শব্দে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে হৃষিকেশের ওপর। কি প্রচণ্ড তার গর্জন আর কি অসম্ভব শীতল। হাড় কাঁপিয়ে দেয়।

লোকেশন মানে সন্ধের পর বাড়িটার গায়ে যখন সেই হাওয়া এসে আছড়ে পড়ল আর সঙ্গে সেই ভয়ঙ্কর উঁ উঁ উঁ শব্দ—তখন সবাই মুহূর্তের জন্যে কেমন যেন হয়ে গেল। ক্রমেই যেন হন্টেড হৌসের চেহারা নিচ্ছে এই বাড়িটা। সাক্ষাৎ যেন এডগার এলেন পো-র সেই আপ্! নিভুল এবং নির্মম।

সুনন্দার মুখে আর রা-টি নেই। রাত্রে কেনগাইকে নাকে মুখে গুঁজে পানু বিছানা নেবার আগেই সুনন্দা ঢুকে পড়েছে এবং বিছানার সিংহভাগেই দেহরক্ষা করেছে। অন্ধকার ঘরে শুয়ে শুয়ে সুনন্দা শুনছে ক্রমবর্ধিত আওয়াজ উত্তর দিক থেকে ক্রমেই হৃষিকেশের দিকে এগিয়ে আসছে। বাতাসে তাদের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। সুনন্দার ভীষণ ভয় করতে লাগল।

(চলবে)

রঞ্জন মজুমদার

শুভারম্ভ ঃ ৮ই আগষ্ট ! স্বপ্ন চেয়েছিলো অতীতকে ভুলে যেতে—আর ভবিষ্যৎ চোখে ছিলো ভবিষ্যতের বিভীষিকা.....

গ্লোব ০ দর্পণা ০ মেনকা ও অন্যত্র
পরিবেশনা ঃ নেপচুন পিকচার্স প্রাঃ লিঃ

CENTRAL LIBRARY

কিছুক্ষণ

অনিল চ্যাটার্জী

ঘরখানায় ঢুকলেই বলতে হয় মনটা খুশী হইইই করে ওঠে। ছবিতেই বাড়ি ভরা নয়। তার ওপর ঘরময় বই-টইএর বাহার থাকে—তা সে যতো সোনায় মোড়াই না। বইএর আলমারি তার হাত না দিয়ে উপায় নেই। সেখানে সেই রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ থেকে শুরু করে আচার্য চন্দ্রসেন—সবার কাছের সদ্যপ্রকাশিত হিন্দী নভেলটি পর্যন্ত মজুত। হিসেবের বইতো নেই।

বসবার টেবিলটার ওপর অগোছাল বই, ম্যাগাজিন। বলয় থেকে শুরু করে ইন্দ্রি করার তুলি অব্দি। ডানদিকে রাখা আছে সে বছরের একখানা ছবি। যার মধ্যে যা যাবে বিখ্যাত নয় অভিনেতা বলরাজ সাহানী ও সিমলা পাইতয়ের-এর সঙ্গে [illegible] বাড়ীর মালিক—অর্থাৎ অনিল চ্যাটার্জী হিসেবে। (ছবিখানা বার্লিনে তোলা)।

কাছে পিঠে সেদিন ওটা ছবি নয়, একটা কিংবদন্তী হয়ে গেছে। বাস্তব ছবিখানা। অনিলবাবু বললেন—'এটি এঁকেছে আমারই এক ছাত্র।'

ছোটবেলা থেকেই অনিলবাবুর শিল্পীমন ছবি আঁকা আর লেখার মধ্য দিয়ে স্ফুরণের পথ করে নিচ্ছিল। অবশ্য সেই পথে তিনি বেশীদিন এগোননি। পরিচালক হৃষিকেশ মুখার্জির হাত ধরে এঁরা বাংলা ছবির জগতে চলে এলেন। তাও অভিনেতা হয়ে নয়, অ্যাসিস্টান্ট ডিরেকটর হয়ে।

কিন্তু শিল্পীমন তাঁর বেশীদিন ক্যামেরার পেছনে দাঁড়িয়ে অপরের অভিনয় দেখে সন্তুষ্ট থাকতে পারেনি। মন চেয়েছে অভিনয়ের জগতে হারিয়ে যেতে। আর এই বাসনার কথাটুকু মুখ ফুটে বলার পরই অভিনয়ের পথে তাঁর জয়যাত্রার গাড়ী চলতে শুরু করল। অ্যাসিস্টান্ট ডিরেকটরী ছেড়ে দিলেন।

কিন্তু পুরনো ইতিহাস নিয়ে আলোচনায় যতটা সময় ব্যয় করা হবে, ততটা সময় হারিয়ে যাবে। বন্ধু-বান্ধব, শুভানুধ্যায়ী, অনেকের প্রার্থনা অনিলদাকে চিনতে গেলে অতীত ইতিহাস ঘাঁটার দরকারও নেই।

যে কোনোদিন যে কোনো সময়ে যে কোনো স্টুডিওর পাঁচ মিনিটের জন্য আলাপ করলেই অনিলবাবুকে চিনতে পারা যাবে। মুখভর্তি পান আর দোক্তার ঝোঁকা নিয়ে দেখবেন কারও না কারও সঙ্গে তিনি গল্প করছেন। স্টুডিওর সামনে ক্যান্টিন বয় থেকে শুরু করে দাদে পরিচালক অব্দি সবার সঙ্গে তাঁর সমান ঘনিষ্ঠতা। অনেকদিন বাদে দেখা হলে খপ করে জিজ্ঞেস করে বসবেন—'কেগো, তোমাদের আর টিকিটি দেখা যায় না যে! অনিল চ্যাটার্জিকে ভুলে গেছ নাকি?'

যাকে উদ্দেশ করে এই কথা বলা সে বেচারী তো তখন কাঁচুমাচু। সত্যিই হয়তো সে কিছুদিন কলকাতায় ছিল না। যখনি তাঁর কাছ থেকে জবাব পেলেন—না দাদা, দেশে ফ্যামিলি রয়েছে তো, সিমেন্টিডের কার্ডের জন্য দেখে আসতে। অমনি অনিলবাবুর সুর বদলে গেল। এগিয়ে এসে কাঁধে সস্নেহে হাত রেখে হিত বচন—

কেমন? বাড়ীর সব ভালোতো? কি করে ধারা ছোলেমেয়ে মেড়ে এতদূরে?"

•

কদিন আগে ওঁর বদলির ঘটনা নিয়ে যখন ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে আলোচনা করছিলুম তখন তিনি হেসে ফেলেছিলেন সশব্দে বলে উঠেছিলেন "ইন্ডাস্ট্রির কথা ও আর বলবে, বাবা! ইন্ডাস্ট্রিটাই ওঁকে ছাড়ে না। এখন সবই যেন কিরকম নিজের মধ্যে গুটিয়ে যাচ্ছে।"

ফোনটা তাহলে বা একদম নয়। কলকাতার স্টুডিওগুলো খুলেছিল অনিলদার কথাটা বুঝতে দেরী হয় না তবুও জিজ্ঞেস করলুম—"এই প্রযোজকদের কারুর কি ডেট নেওয়া?"

—নিশ্চয়ই ভেবেছ। এতু সংস্কৃতে একটা শ্লোক আছে জানো তো—অপ্রিয় সত্য কথা বলা উচিত নয়। তাই বলতে চাইছি না। বলে কিছু পড়ে থাকিয়ে কি লাভ? তাছাড়া অপ্রিয় সত্যগুলো বলে তো আর প্রবন্ধকার কোনো চেক করতে পারবো না!

•

বছর দুই আগে পর্যন্ত অনিল চ্যাটার্জির হাতে কাজ ছিল প্রচুর। বাজার বেশ মন্দা যাচ্ছিল তবি। এমন অবস্থায় প্রযোজকরা বলতে গেলে ভালো অভিনেতা হিসাবে খাতে পেলেও মাঝখানে কয়েকটা বড়ো প্রোডিউসাররা বুদ্ধি আনল চ্যাটার্জিকে ছুটে নেয়ার জন্যে। এখন আবার সবার মনে পড়েছে তাঁকে। একে শব একে ডাকা হবে। অনেকে বলছেন—অমানুষ হিট হবার পরই নাকি প্রোডিউসারদের ঘুম ভেঙেছে।

এই প্রসঙ্গে ওঁকে টেনে তুলে জিজ্ঞেস করলাম—"অমানুষ আপনার ফিল্ম ক্যারিয়ারে কিভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে বলে আপনার মনে হয়? এখন যে আপনার সামনে এতো ডাক এগুলো কি অমানুষ-এর সাফল্যের ফসল নয়?"

অনিলদার এতক্ষণ অন্যমনস্ক অবস্থায় ছিলেন প্রশ্নটা শুনে উঠে বসলেন। বেশ কিছু সময় চুপ করে বসে রইলেন। অমানুষ-এর আগে আমার কোনো ছবি এ ডিটে করেনি বলতে গেলে—তবুও উঠে কথা বলেন।

—না, এ কথা বলতে পারি না। তবে একটা ব্যাপার কোন ধরণের ছবিতে আপনার ইমেজ আছে কি না তা নিয়ে চিন্তা করতে চাইনি আদৌ কিছু।

ভাবলেন একটু, প্রশ্নটা ওঁকে বেশ একটু ভাবিয়ে তুলেছে মনে হলো। কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন—"অমানুষ-এর ফল কখনই বলব না।

ভাল, খারাপ তবে তেমন কোন কথাই বলেই নাকি কিছুদিন ধরে সংসার বন্ধ ছিল।

আর এখন বট ধরার বেশ ভালো ছবি। ইন্ডিয় ধরার মুখে বনশ্রী ধরতাম। কাজে মন বসছে কই

আমার এই সমস্যাটার কথা শুনে কেমন সময় বলেন কাজে। এ ব্যাপারে ওঁকে নিয়ে এই সময়ে কতজন আলোচনা করেছেন তা জানি না।

কথাটা সত্যি। একই সময়ে একই ধরণের একাধিক ভূমিকা পাওয়া একজন অভিনেতার পক্ষে সমস্যা বলা যায়। সাধারণত দেখা যায়, একই ধরণের একাধিক ছবিতে কাজ করে যদি বা একটা একই ধরণের চরিত্র এড়ানো। কিন্তু একজন অভিনেতা যদি সত্যি রোমান্টিক নায়ক, কোনো চরিত্রে যদি সত্যিকারের চরিত্রে কাজ করে যায় তাহলে খুব বেশি দেখা যায়।

অনিল চ্যাটার্জির ক্ষেত্রে এই ধরণের সমস্যা বেশী বেশী দেখা যায়। অভিনয় করা হয় সাধারণত অভিনেতার ব্যক্তিত্বের প্রয়োজনে তাঁকে পাবেন এবং প্রতিটি চরিত্রেই তাঁর করতে তেমন কোনো বৈশিষ্ট্য ফলে একঘেয়েমি সৃষ্টিকারী হয়।

—ঠিকই এবং স্বীকার করি আমার ক্ষেত্রে তাই হয়েছে। প্রযোজক পরিচালকরা আমাকে যে ধরণের চরিত্রে পেয়েছেন সেই ধরণের চরিত্রে আমাকে দেখতে চেয়েছেন। আমি নিজে থেকে কখনো কোনো চরিত্রের জন্যে কাউকে অনুরোধ করিনি।

তপন সিংহর প্রথম প্রাপ্তবয়স্কদের ছবি

গঠনপথে মাঃ প্রিন্স অভিনীত ছোটদের ছবি 'লাট্টু'

নেই। বলছিও না।' কথা শুনে মনে হোল এই ছবি দুটো সম্পর্কে ওঁর প্রচণ্ড দুর্বলতা আছে। থাকতেই পারে।

ঃ বহুদিন হোল আপনাকে সত্যজিৎ রায় বা মৃণাল সেনের ছবিতে দেখতে পাচ্ছি না। কি ব্যাপার?

প্রশ্নটা শুনে প্রথমটায় কিছুক্ষণ ভাবলেন। তারপর বললেন—'জানো—একটা সময় গেছে যখন সত্যজিৎবাবু চিত্রনাট্য করার সময় আমার কথা মাথায় রাখতেন, কাঞ্চনজঙ্ঘায় আমার চরিত্র তো উনিই তৈরী করেছিলেন। জানি না কেন আজকাল আর তেমন যোগাযোগ ঘটছে না। আর তাছাড়া সত্যজিৎবাবু তো সবসময়ই চরিত্রের সঙ্গে মিলিয়ে অভিনেতা সিলেক্ট করেন। এখন পর্যন্ত আমায় নেবার মতো চরিত্র হয়তো তাঁর ছবিতে নেই। হলে নিশ্চয়ই ডাকবেন।'

ঃ আর মৃণালবাবুর ছবির ব্যাপার...

মুখ থেকে কথাটা কেড়ে নিয়ে বলে উঠলেন—'ঐ একই ব্যাপার। মাঝে মাঝে দেখা হলেই মৃণালবাবু আমাকে বলেন—আপনাকে নিয়ে কাজ করার খুব ইচ্ছে যোগাযোগ হচ্ছে না।'

একসময় অনিল চ্যাটার্জি প্রতিটি ছবিতেই কাজ করেছেন। এবং সত্যি কথা বলতে কি ঐসব ছবিগুলোতেই (অযান্ত্রিক, কোমল গান্ধার, মেঘে ঢাকা তারা) তাঁর অভিনয়ক্ষমতা বুঝতে পেরেছিল দর্শক। এখন তো অধিকাংশ প্রায় ছবিই করছেন না। সুতরাং সে প্রশ্ন আর তুলিনি।

•

রাত বাড়ছিল। বৌদি এসে খাবার দিয়ে গেছেন। ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির দুরবস্থা—শিল্পী সংসদ তার বিভিন্ন চরিত্র নিয়ে অগোছাল আলোচনা চলছে। বক্তা অনিল চ্যাটার্জি শ্রোতা আমি। ইতিমধ্যে দুটো ফোন অ্যাটেন্ড করে এসেছেন। ঘরটায় চারদিক চোখ বোলাতে গিয়ে দেখি ঠিক দরজার ওপরে খুব সুন্দর একটা অয়েলপেন্টিং।

ফোন ছেড়ে ঘরে ঢুকতেই জিজ্ঞেস করলাম—'ওটা কার আঁকা?' বেশ সলাজ উত্তর এলো—আমারই প্রথম আঁকা ছবি ওটা। দাঁড়াও, এ ছবির একটা মজা আছে—তোমায় দেখাই' বলে তিনি পটপট করে ঘরের সব আলোগুলো নিভিয়ে দিলেন। জ্বালিয়ে রাখলেন শুধু একটা জিরো পাওয়ারের হাল্কা লাল আলো। দারুণ দেখাচ্ছিল ছবিখানা। পাহাড়ী এলাকায় কুয়াশা-ঢাকা একটি শৃঙ্গ। কুয়াশার একেবারে ন্যাচারাল।

ঃ এতো সুন্দর আঁকতেন তা ছবি আঁকা ছাড়লেন কেন?

প্রশ্নটা শুনে নেশা ত্যাগের মাথা ব্যথা ছাপল মনে। একটু চুপচাপ থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন—'ছাড়িনি ঠিক, এখনও ছেলের সঙ্গে ছবি আঁকি মাঝে মাঝে।'

'ঐতো দেখো না' বলে আঙুল বাড়িয়ে উল্টো দিকের দেয়ালের আরেকখানা ছবি দেখালেন—'ছেলে অরূপের আঁকা।'

অরূপ এখনও আঁকে।

শিল্পীর ছেলে খাঁটি শিল্পীমন নিয়েই এসেছে।

রাত আরও বেড়েছে। উসখুস করছি ওঠবার জন্য। শেষ বাস বোধহয় চলে গেছে। আর বেশী দেরী হলে বোধহয় মিনিবাসও পাব না। বুঝতে পারলেন আমার অবস্থা। তাই বলে উঠলেন—কি, তোমার লেখার মশলা পেলে তো?'

হাসি ছাড়া উত্তর দেবার মত কথা আসছিল না। মনে মনে বললাম—'আপনার সঙ্গে কিছুক্ষণ আড্ডা দিলেই অনেকক্ষণের মশলা পাওয়া যায়! একজন শিল্পীর কথা বলার ধরনই তো সেরকম হবে। নইলে লোকদেখানো ফর্মাল হয়ে থাকলে কি আর জীবনমুখী অভিনয় করা যায়?

নির্মল ধর

শক্তি সেন

কথায় আছে নটুয়ার কাজ নাকি—'রং মেখে রং মাখা।' নটুয়া সং সাজেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর রং মাখার কাজটা সারতে হয় বেশির ভাগ সময়েই অন্যজনকে। নাম তাঁর রূপসজ্জাকর, চলতি কথায় মেকআপম্যান।

'সিনেমার যতগুলো ডিপার্টমেন্ট আছে তার মধ্যে মেকআপ ও ক্যামেরার কাজ সবচাইতে কঠিন এবং সৃষ্টিমূলক'—কথাগুলো বললেন আজকের কলকাতার অন্যতম সেরা রূপসজ্জাকর শ্রীশক্তি সেন। আকাডেমির লনে বসে কথা হচ্ছিল সেদিন ওঁর সঙ্গে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার কি জানেন, এই কঠিন আর ক্রিয়েটিভ আর্টকে এখনও পর্যন্ত যোগ্য সম্মান কেউ দিচ্ছে না।' গলায় বেশ ক্ষোভের সুর।

থাকাটাই স্বাভাবিক। যিনি প্রায় পঁয়ত্রিশটা বছর ধরে সিনেমার এই গুরুত্বপূর্ণ বিভাগটির সেবা করছেন—সেই বিভাগটির প্রতি অবহেলা দেখলে ক্ষোভের পাহাড় জমা অযৌক্তিক নয় নিশ্চয়ই। শক্তিবাবুর ছোটবেলা থেকেই ঝোঁক ছিল ছবি আঁকার। একসময় পড়াশুনো ছেড়ে দিয়ে ঢুকেছিলেন ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুলে। আই-পি-টি-এতে অভিনয়ও করছেন বহুদিন। আর্ট ডিরেক্টর হবেন এমন বাসনা ছিল, কিন্তু পরিচালক দেবকী বসু ওঁকে বলেছিলেন—'মেকআপ নাইনে লোক খুব কম—তুমি এই লাইনে এসো।'

এবং দেবকীবাবুই তাঁকে প্রথম সুযোগ দিলেন 'কৃষ্ণলীলা' ছবিতে স্বাধীনভাবে কাজ করার। এর আগে টুকটাক কিছু কাজ করার অভিজ্ঞতা ছিল শক্তিবাবুর। ছড়ুয়া সাহেবের নিজস্ব মেকআপম্যান রঘুর (রহমান) সঙ্গে স্টুডিওর যাতায়াত করে করেছিলেন কয়েক বছর আগে থেকেই। 'কৃষ্ণলীলা'র পর করলেন 'চন্দ্রশেখর'। এই [illegible]

ইতিমধ্যে টালিগঞ্জে আই-পি-টি-এর লোকেরা আসতে সুরু করেছেন। ঋত্বিক ঘটক 'অযান্ত্রিক' ছবিতে নিলেন শক্তিবাবুকে। এই ছবিতে তিনি কাজ করে প্রচণ্ড সন্তুষ্ট। তারপর তিনি একের পর এক কাজ করেছেন সত্যজিৎ রায় (অপুর সংসার, জলসাঘর, পরশপাথর, তিন কন্যা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (দেবী), মৃণাল সেন (নীল আকাশের নীচে, পুনশ্চ) তপন সিংহ (লৌহকপাট, অতিথি, আপনজন, এখনই, রাজা, হারমোনিয়ম), তরুণ মজুমদার (নিমন্ত্রণ, শ্রীমান পৃথ্বীরাজ, ঠাকুরমা ফুলেশ্বরী) আর ঋত্বিক ঘটক (মেঘে ঢাকা তারা, বাড়ী থেকে পালিয়ে) সঙ্গেতো বটেই।

একসময় বিশ্বরূপা থিয়েটারে দশ বছর কাজ করেছেন। এখন আছেন নান্দীকর দলে। রবীন্দ্রভারতীতে পার্টটাইম লেকচারও দেন।

আয়নার সামনে নটুয়াকে বসিয়ে রং মাখাতে যখন বসেন শক্তিবাবু, তখন তাঁর মনে সুক্ষ্ম অন্য চিন্তা। নটুয়ার ছয় ইঞ্চি মুখটা তাঁর ক্যানভাস। রং তুলির আঁচড়ে কখনও সেই ক্যানভাসকে করে তুলছেন আশী বছরের বুড়ো, বা হতাশাগ্রস্ত যুবক। একটা ছবির আসল চেহারাটাই রূপ পায় তাঁর হাতে। 'নীল আকাশের নীচে' 'অযান্ত্রিক' বা 'দেবীর' মুখ্য চরিত্রগুলোর মেকআপ দেখলেই বুঝতে পারবেন আমার কথাটা কতখানি সত্যি! আর শক্তি সেন কতবড় শিল্পী!!

নিরীক্ষিৎ

ষ্টার

শারদেশ নিবেদিত
ফোন : ৫৫-১২৩৯
প্রতি বৃহস্পতি ৬।।
শনি রবি ও ছুটির দিন : ৩ ও ৬।।

বঙ্কিমচন্দ্রের
কৃষ্ণকান্তের উইল

প্রযোজনা : মহেন্দ্র গুপ্ত
নাট্যরূপ : কুনাল মুখোপাধ্যায়
নির্দেশনা : বঙ্কিমেশ কাঞ্জিলাল
আবহ-সঙ্গীত : বিশ্বজিৎ রায়
গান ও সুর : চন্দ্রীদাস বসু

ডাঃ মহেন্দ্র গুপ্ত বাসন্তে ঘোষ রবীন মুখো: দিলীপ রায়চৌধুরী সন্তোষ ভট্টা: রূপক মজুমদার মঞ্জু ভট্টা: ঝুমা মুখার্জী এবং অসীমকুমার ও সুব্রত ভট্টা:

—বুকিং চলছে—

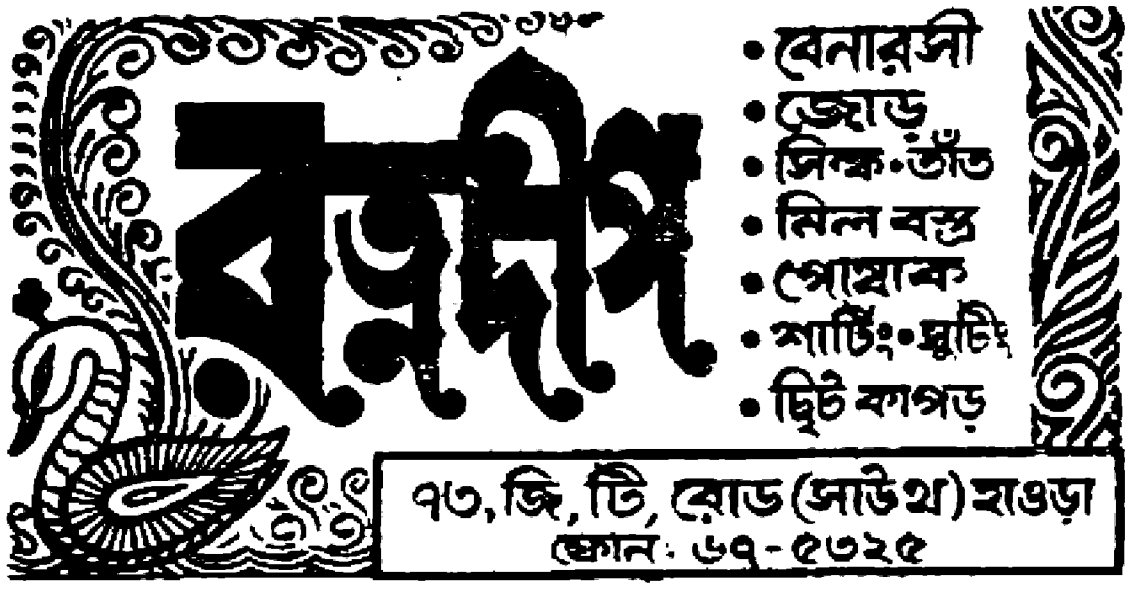

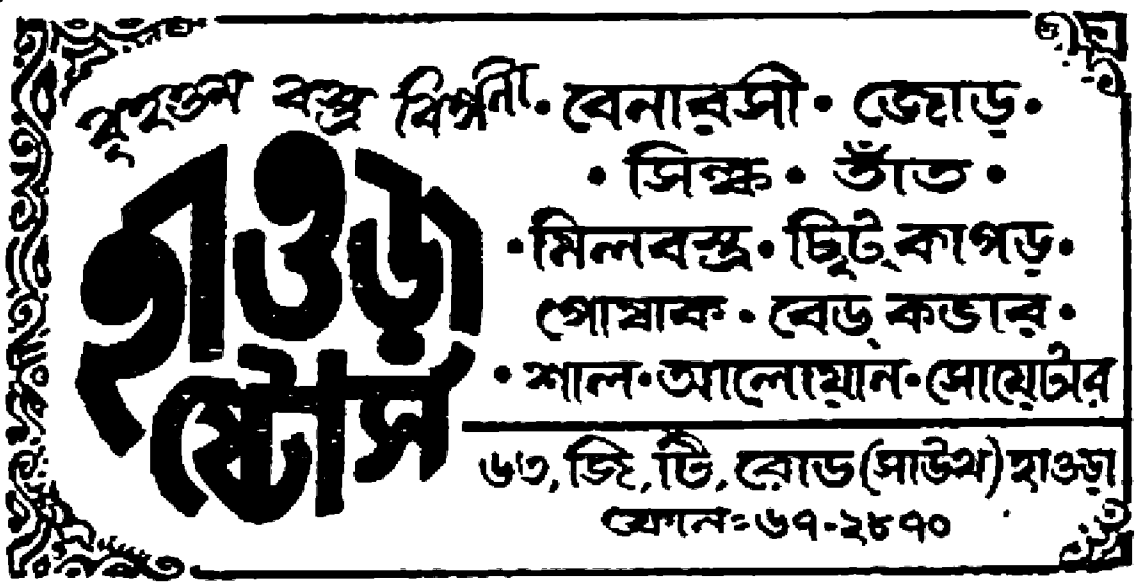

স্টুডিও সংবাদ

অসাধারণ

সম্প্রতি নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে চিত্রকর ফিল্মসের প্রথম ছবি 'অসাধারণ'-এর কাজ মহরৎ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবিটি পরিচালনা করছেন কালিপদ সেন প্রযোজনা করছেন প্রণব বসু। এতে অভিনয় করছেন উত্তমকুমার ও আরতি ভট্টাচার্য। সঙ্গীত পরিচালনা করছেন নচিকেতা ঘোষ। গীতরচনা করছেন গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। চিত্রগ্রহণ করছেন কৃষ্ণ চক্রবর্তী, সম্পাদনা করছেন বৈদ্যনাথ চ্যাটার্জি এবং শিল্পনির্দেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন সুর্য চ্যাটার্জি।

জীবন নাটক

সম্প্রতি ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওতে ট্রায়ো ফিল্মসের রঙিন সবাক ছবি 'জীবন নাটক'এর শুভ মহরৎ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই মহরতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। মহরৎ ক্লাপ দিয়েছেন উত্তমকুমার। মহরৎ দৃশ্যে অভিনয় করেছেন বিশ্বজিৎ, সন্ধ্যা রায় ও মঞ্জুশ্রী রায়চৌধুরী। ছবির অন্যান্য শিল্পী হচ্ছেন সবিতা বসু, বীরেন চ্যাটার্জি, নির্মল ঘোষ এবং মনোজ মুখার্জি। ছবিটি পরিচালনা করছেন মৃণাল চক্রবর্তী। চিত্রগ্রহণ, শিল্পনির্দেশনা এবং রূপসজ্জার দায়িত্ব নিয়েছেন যথাক্রমে বিজয় দে, সুনীল সরকার ও কমল সেন। ক্যালকাটা মুভিটোন পর পর দুদিন চিত্রগ্রহণের পর পরিচালক তাঁর শিল্পী ও কলাকুশলীদের নিয়ে ছাবর কিছু বহির্দৃশ্য গ্রহণ করতে কলকাতার বাইরে চলে যাচ্ছেন।

জয় সন্তোষী মা সম্পর্কে

গণেশ পত্নী রিদ্ধি দেবী সন্তোষীর নাম মর্ত্যলোকে কে আর না জানে। তবু দু-একজন হয়ত আছে যারা এঁর সম্বন্ধে তেমন জানেন না। তাদের জন্য দেবী সন্তোষীর সামান্য মহিমা এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে।

পুরাণকাহিনীতে আছে, রাখী পূর্ণিমার দিন গণেশের জননী দেবী মনসা ভাইয়ের হাতে রাখী বন্ধন করতে এসেছিলেন। সেই সময় গণেশের দুই পুত্র মনসাকে তাদের হাতে রাখী বেঁধে দিতে বলে। গণেশ জানান একমাত্র ভগ্নীই ভাইয়ের হাতে রাখী বন্ধন করে।

তখন গণেশের পুত্ররা পিতার কাছে একটি ভগ্নী প্রার্থনা করে। এই সময় দেবর্ষি নারদ সেখানে উপস্থিত হন এবং পুত্রদের মনস্কামনা পূর্ণ করার জন্য অনুরোধ করেন। গণেশের দুই পত্নী সিদ্ধি এবং বুদ্ধিও দেবর্ষিকে সমর্থন করেন।

তখন ভগবান গণেশ তাঁর তৃতীয় নয়ন থেকে জ্যোতি নির্গত করে একটি পদ্মের উপর রাখেন। সেই পদ্ম থেকে এক পরমা সুন্দরী দেবকন্যার আবির্ভাব হয়। তিনি গণেশ পুত্রদের হাতে রাখী পরান।

দেবর্ষি নারদ দেবকন্যাকে বরদান করে বলেন জগতে ইনি 'দেবী সন্তোষী' নামে পূজিত হবেন, এবং জগতের প্রতিটি মানুষের বন্দনা লাভ করবেন। প্রতি শুক্রবার এর পূজো করলে মর্তবাসীর সকল মনস্কামনা পূর্ণ হবে এবং জীবনে আর কোন দুঃখ থাকবে না।

এই পত্রিকা পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

JEWISH LIBRARY.

CENTRAL LIBRARY

সংসার সীমান্তে ছবিতে সন্ধ্যা রায়

Régd. No. WB NC-13
Gram AMRITA Calcutta-700003

AMRITA

Friday 8th August, 19
Phone 55-5231 (15 lines)

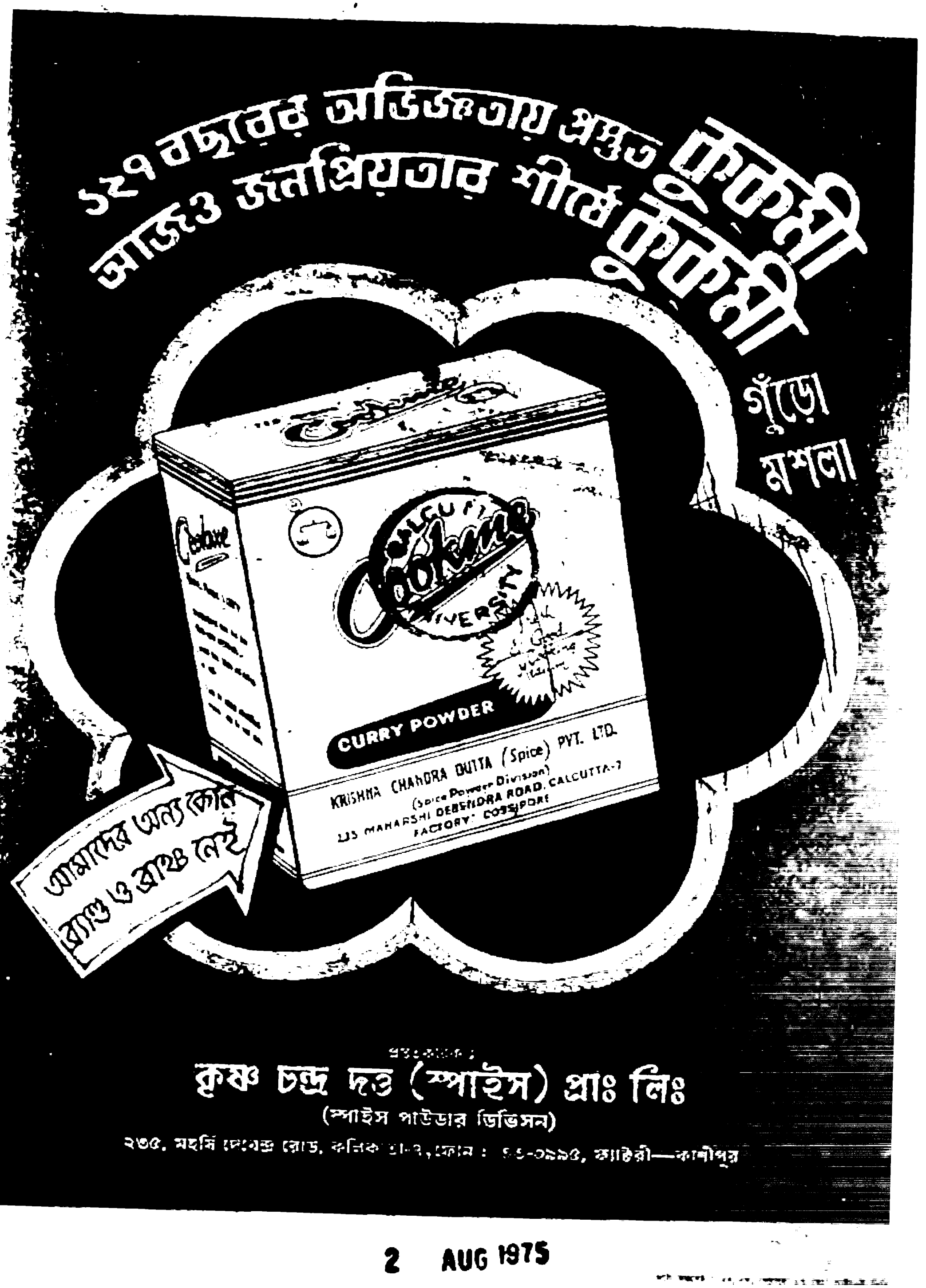

2 AUG 1975

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৮২তম জন্মদিনে

মিত্র-ঘোষের সশ্রদ্ধ উপহার

বিভূতিভূষণ-গল্পসমগ্র

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পগুলি পড়লে, সদ্য ভাগীরথী স্নানের স্বাদ লাগে মনে—মনে হয় সমস্ত মলিনতা দীনতা কেটে নির্মল ও পবিত্র হয়ে উঠলাম। শুধু তাই নয়—আনন্দ, সৎগ্রন্থ পড়ার সজ্জনসঙ্গ করার মতো একটা অহেতুক আনন্দে মন ভরে যায়, জীবন সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গী যায় বদলে। বিভূতিভূষণ দরিদ্র ভাগ্যতাড়িত জীবনের অন্তস্তলে প্রবেশ করেছেন, যেন তাদেরই একজন হয়ে তাদের ছবি এঁকেছেন—কিন্তু সে জীবনের বেদনা অনুভূত হ'লেও তার গ্লানি স্পর্শ করে না পাঠকদের। অর্থাৎ লেখক পাঁকে নামলেও সে পাঁক তার গায়ে লাগেনি। হংসের মতোই তিনি অনায়াসে পঙ্কে বিচরণ করেছেন আবার হংসের মতোই সুন্দর নির্মল নীলাকাশে বিহার করেছেন। স্বর্গ-মর্ত্যে তাঁর অবাধ অধিকার, সেই সঙ্গে পাঠকদেরও।

বিভূতিভূষণের এতাবৎ প্রকাশিত বা জ্ঞাত সমস্ত ছোটগল্প মাত্র দুটি বিপুল খণ্ডে প্রকাশিত হচ্ছে। প্রথম খণ্ড এই জন্মদিনে পাওয়া যাবে।

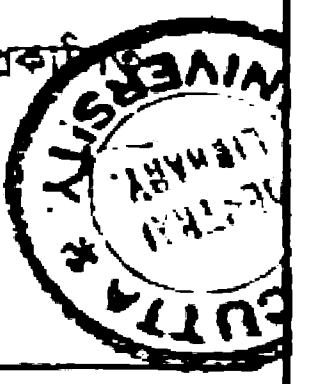

॥ প্রথম খণ্ডের নাম মাত্রমূল্য — চল্লিশ টাকা ॥

॥ বিশেষ সানন্দ ঘোষনা ॥

আগামী ২রা সেপ্টেম্বর হইতে ১৫ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিভূতিভূষণের জন্মদিন উপলক্ষে বিভূতিভূষণের নিম্নলিখিত বইগুলি ও বিভূতি রচনাবলী খুচরা বা সম্পূর্ণ সেট সাধারণ ক্রেতাদের বিশেষ কমিশনে দেওয়া যাইবে। ১ম, ২য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ ৯ম, ১১শ, ১২শ, খণ্ড এখন ছাপা আছে—মোট মূল্য ১৭৪৲। এই কয়খণ্ডের সম্পূর্ণ সেট লইলে সাধারণ ক্রেতারা ১৩৯৲ টাকায় পাইবেন। এজেন্ট বন্ধুগণও প্রাপ্য কমিশনের উপর অতিরিক্ত ৫% কমিশন পাইবেন।

পথের পাঁচালী ১২৲ ঐ (পেপার ব্যাক) ৬৲ **ইছামতী** ১৮৲ ঐ (পেপার ব্যাক) ৮৲ **কুশল পাহাড়ী** ৫৲ **দেবযান** ১০৲ **মেঘমল্লার** ৭৲ **শ্রেষ্ঠগল্প** ১২৲ **ছায়াছবি** ৪৲ **নীলগঞ্জের ফালমন সাহেব** ৪৲ **সৃষ্টি প্রদীপ** ৮৲ **অশনি সংকেত** ১০৲ **অরণ্য মর্মর** ৭॥ **আরো একটি** ২৲ **হীরামানিক জ্বলে** ৫৲

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নবতমা — নীহাররঞ্জন গুপ্তর

পায়ে পায়ে প্রতিধ্বনি ৯৲ কালোঘোড়ার (৩য়/৪র্থ) ১২॥

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ ৮৬।১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯ ফোন ঃ ৩৪-৩৪৯২ ৩৪-৮৭৯১

"জরুরী অবস্থা হল-অনুশাসন পর্ব"

—আচার্য বিনোবা ভাবে

নতুন সাফল্য

জাতীয় তৎপরতার প্রতিটি ক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় উন্নতি

- অত্যাবশ্যক সামগ্রীর মূল্যহ্রাস
- উৎপাদন বর্ধিত; বিদ্যুৎ-সরবরাহ অধিক
- শিল্প সম্পর্কের উন্নতি
- ধর্মঘট, লক-আউট ও বন্ধ্-এর অবসান
- অপরাধ, হিংসা ও অন্যান্য সমাজবিরোধী কার্যকলাপের সংখ্যা-হ্রাস লক্ষ্যণীয়
- বন্দরে কর্মীদের ও কর্মকুশলতা
- জনগণের কঠোর পরিশ্রম
- মুদ্রাস্ফীতির মাত্রাহ্রাস—1974এর এপ্রিলে 30.1% 1975এর 19 জুলাই-এ মাইনাস 2.1%
- কৃষকদের জন্যে অধিকতর পরিমাণে উন্নততর কৃষিউপকরণ ও ঋণের সুবিধা।
- সরকারী বিতরণ ব্যবস্থার উন্নতি
- সব রাজ্যের জন্যে কেরোসীনের পর্যাপ্ত যোগান
- নিয়ন্ত্রিত মূল্যের বস্ত্রের উৎপাদন 1974এ ছিল 10 কোটি বর্গ মীটার—এ বছরের লক্ষ্য 16 কোটি বর্গ মীটারে আনার
- বছরে আড়াই লক্ষ নতুন গ্রাহককে রান্নার গ্যাসের সরবরাহ যোগান
- 117টি অত্যাবশ্যক ওষুধের (ব্রাণ্ড) উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্য
- দুর্গম ও পার্বত্য এলাকায় অপেক্ষাকৃত কম দামে সিমেন্ট যোগান
- মধ্যআয়ভোগীদের জন্যে করের ব্যাপারে রেহাই
- অধিকতর নিয়মানুবর্তিতা

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর

কুড়ি দফা কার্যসূচী রূপায়ণে

সহযোগিতা করুন

কঠোর পরিশ্রম করুন, অধিক উৎপাদন করুন, নিয়মানুবর্তিতা বজায় রাখুন

davp 78/219

অমৃত

১১ সংখ্যা

"ইণ্ডিয়ান অ্যান্ড ফরেন ফরেন
পেপার সোসাইটিক সদস্য"

19th August, 1975 শুক্রবার ১২ ভাদ্র ১৩৮২

সূচীপত্র

বিষয়		লেখক
ামকীয়		
নেী	(গল্প)	শ্রীসতীকান্ত গুহ
ত্যের সাজঘরে		শ্রীশান্তিলতা চক্রবর্তী
বাংলার খবর		শ্রীদেবব্রত
শের কথা		শ্রীপাঞ্চজন্য
এজেন্ট	(উপন্যাস)	শ্রীবিরূপাক্ষ
নবলকে 'খল' বলি কেন		শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন
নমঞ্চা		কালার শার্পহেন
র আগুন		শ্রীঈশ্বা সেন
বাদর	(কবিতা)	শ্রীকৃষ্ণ ধর
ন স্মৃতির এই বসন্ত প্রহর		
	(কবিতা)	শ্রীশিশির ভট্টাচার্য

সম্পূর্ণ নতুন পরিকল্পনায়
মন্ত্রীশ বর্ধন (আকাশ সেন)
সম্পাদিত
শারদীয়
ফ্যানটাস্টিক
কল্পলোকের গল্প পত্রিকা
১লা সেপ্টেম্বর প্রকাশিত হচ্ছে
পত্রিকা স্টল থেকে প্রতি মাসে বেরোবে
৫টি উপন্যাস ও অনেক গল্প
লিখছেন : সত্যজিৎ রায়, সমরেশ বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শ্রীবরেন জালমুন্সী, সমরজিৎ কর, বীরু চট্টোপাধ্যায়, শ্রীবরেন মাইতি, বাণেন ঘোষ, অমিতানন্দ দাশ, লীলা মজুমদার, এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়, নবারুণ সিংহ, রাজকুমার মজুমদার, নীলাঞ্জন সরকার ও অন্যান্য লেখক।
এ ছাড়াও ফ্যানটাস্টিক অন্যান্য বিভাগ
পৃষ্ঠপোষক :
সত্যজিৎ রায়, শ্রীবরেন জালমুন্সী ও প্রদীপ বানার্জী।
দাম : ৬.০০ টাকা
প্রাপ্তিস্থান :
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড
কলকাতা-১২

সোভিয়েত দেশ দর্শন

সোভিয়েত দেশ আপনাকে নিয়ে যাবে পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশে—জীবন যেখানে রঙ আর আলোয় ভরপুর, মুক্ত শ্রম আর স্বাধীন চিন্তার যেখানে অবাধ বিকাশ—গৌরবময় সোভিয়েত ইউনিয়ন আর তার মানুষ। অনেক ছবিতে সাজানো এই সুন্দর পাক্ষিক পত্রিকাটি ভারত-সোভিয়েত বন্ধুত্ব আর সহযোগিতার মুখপত্র। সুখপাঠ্য বিষয়ে সমৃদ্ধ এই ঝকমকে পত্রিকাটি সেই কারণে সব বয়সের মানুষের কাছে এত প্রিয়। ইংরাজি, বাংলা এবং অন্যান্য ১১টি ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত হয়। আপনার মনের মত পত্রিকা সোভিয়েত দেশ।

আজই সোভিয়েত দেশ এবং অন্যান্য সোভিয়েত পত্রিকার গ্রাহক হন।

৩১-৩-৭৬ অব্দি যাঁরা গ্রাহক হবেন তাঁদের প্রত্যেকে পাবেন বিনামূলে অপূর্ব একটি ১৯৭৬ সালের বহুরঙা ক্যালেণ্ডার

আপনার ভাষা, ঠিকানা আর পছন্দসই পত্রিকার নাম স্পষ্ট করে লিখে মানি অর্ডারযোগে বা পোস্টাল অর্ডারে আপনার চাঁদা পাঠান। রেজিস্টার্ড পোস্টে আপনার কাছে ক্যালেণ্ডার পৌঁছে যাবে। আপনি আমাদের অনুমোদিত এজেণ্টদের কাছে গ্রাহক হয়েও সরাসরি আপনার ক্যালেণ্ডার পেতে পারেন।

৩১-৩-৭৬ অব্দি চলতি চাঁদার হার

		এক বছর	তিন বছর
১। সোভিয়েত দেশ (বাংলা ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষা	...	৬-০০ টাকা	১২-০০ টাকা
(ইংরাজি)	...	৭-০০	১৪-০০
২। ইয়ুথ রিভিউ (সাপ্তাহিক) (ইংরাজী ও হিন্দি)	...	৪-০০	১০-০০
৩। সোভিয়েত সমীক্ষা (বাংলা, ইংরাজী এবং অন্যান্য দশটি ভাষায় মাসে ৫টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়)		৪-০০	১০-০০

সোভিয়েত দেশ

১।১, উড স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
৩০	বেনো জলে	(কবিতা)	শ্রীশান্তি মিত্র
৩২	নতুন বই		শ্রীকৃষ্ণ ধর
৩৩	নির্জনে খেলা	(উপন্যাস)	শ্রীচিত্তরঞ্জন মাইতি
৩৭	প্রদর্শনী		শ্রীদর্শক
৩৯	সূর্যমুখী ও দুপুরের দুঃখ	(গল্প)	শ্রীসমর দত্ত
৪৩	রূপেলীর যাত্রা		শ্রীবরবর্ণিনী
৪৪	মাঠ থেকে বলছি		শ্রীঅজয় বসু
৪৭	খেলাধুলো		শ্রীদর্শক
৪৮	দেশবিদেশের খেলা		শ্রীপ্রশান্ত দা
৪৯	মাঠের নায়ক		শ্রীবিপুল বন্দ্যোপাধ্যায়
৫০	খেলার জগতে মেয়ে		শ্রীঅমর
৫২	সিনেমাটিক টক		শ্রীরঞ্জন মজুমদার
৫৪	ক্লোর থেকে বলছি		শ্রীমুসাফির
৫৭	চিত্রসমালোচনা		শ্রীচিত্রদূত
৫৮	কিছুক্ষণ		শ্রীনির্মল ধর
৬১	নাট্যগুঞ্জ		নাট্যসমালোচক
৬২	বিদেশী ছবি		শ্যা র ড
৬৩	শতবর্ষের স্মরণীয়		শ্রীকালীন মুখোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ : শ্রীপ্রণব মজুমদার

হোমার রচনা সমগ্র

সুবৃহৎ এক খণ্ডে সম্পূর্ণ। গ্রাহক-মূল্য দশ টাকা

সারা বিশ্বের মোট চারটি মহাকাব্যের মধ্যে গ্রীক মহাকবি হোমারের দুটি অমর মহাকাব্য ইলিয়াড ও ওডেসীর সরল গদ্যানুবাদ শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে। ভাষান্তর সত্ত্বেও মহাকাব্যিক অলঙ্কার ও রসসমন্বিত মহান ভাবসমুন্নত যাতে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ন না হয় সেদিকে দৃষ্টি রেখে যথাযোগ্য সততা ও সতর্কতার সঙ্গে অনুবাদ করেছেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক অনুবাদক সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ। নির্দিষ্ট সংখ্যক ছাপা। অবিলম্বে পাঁচ টাকা অগ্রিম দিয়ে গ্রাহক হোন। মজবুত বাঁধাই। সুদৃশ্য জ্যাকেট।

শেক্সপীয়ার রচনাবলী

পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ। চার খণ্ড বেরিয়েছে। আক্ষরিক অনুবাদ। এতে আছে ৩৭টি নাটক, ১৫৪টি সনেট। গ্রাহক-মূল্য ৫০ টাকা। পাঁচ টাকা অগ্রিম দিন।

মপাসাঁ রচনাবলী (চার খণ্ডে সম্পূর্ণ)

দুই খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। তৃতীয় খণ্ড সেপ্টেম্বরে।
চার খণ্ডে সম্পূর্ণ : ৪০৲ গ্রাহক-মূল্য।

অধ্যাপক ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্ত

অপ্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ ১০৲

কৌটিল্য গুপ্ত

পাথরের শিহরণ ১০৲

অবধূত

ভোরের গোধূলি ১৬৲

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

কালরাত্রি ১০৲

আমার চোখে দেখা ১০৲

অভিনেত্রী ৬৲

শেরা লেখকদের সংকলন

অন্তরঙ্গ শরৎচন্দ্র ৬৲

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

সূর্যমহল ৮৲

রিপু সংহার ৬৲

গুপ্ত-সদন : ১, কলেজ রো, কলকাতা-৯

সম্পাদকীয়

পশ্চিমী নিন্দুকদের জবাবে

সাধারণ একদলীয় শাসনের বিপক্ষে প্রধানমন্ত্রী সুস্পষ্টভাষায় অভিমত প্রকাশ করেছেন। বস্তুত ভারতের তিনটি রাজ্য তামিলনাড়ু, গুজরাট এবং গোয়ায় কংগ্রেস বিরোধী সরকার অধিষ্ঠিত। কেন্দ্রীয় সরকার তাঁদের সঙ্গে সহযোগিতা করে চলেছেন। কোনোরূপ বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়নি। জরুরি অবস্থায় দেশের ভিতরকার অশান্তি ও উপদ্রব দমনে সরকার যে-সমস্ত ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হয়েছেন তা সংসদ অনুমোদিত এবং আমাদের সংসদই সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। এমন অনেক দেশ আছে যেখানে গণতান্ত্রিক নির্বাচন ব্যবস্থা নেই। কিন্তু আপাত অর্থনৈতিক সাফল্য বা ভিসিপ্লিন দেখে তাদের প্রশংসায় পশ্চিমীরা পঞ্চমুখ। অথচ ভারতবর্ষ তার সংসদীয় গণতন্ত্র বজায় রেখে, বিরোধীদের হিংসাত্মক আন্দোলনের মোকাবিলা করে নিজের প্রচেষ্টায় এই বিশাল দেশে যতটুকু অগ্রগতি করেছে তার কোনো স্বীকৃতি নেই। এই তথাকথিত গণতন্ত্রপ্রেমী ও ভারতবন্ধুরা ক্রমাগত আমাদের দেশের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার করে চলেছে। প্রধানমন্ত্রী এদের সম্পর্কে সাবধান হতে বলেছেন।

সংসদীয় গণতন্ত্র সংসদের ক্ষমতাই সর্বপ্রধান। যেহেতু সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে জনগণের প্রতিনিধিরা এতে নির্বাচিত। সামাজিক কল্যাণ ও অগ্রগতির জন্য সংসদ সংখ্যাগরিষ্ঠের মতানুযায়ী যে আইন পাশ করে এবং কোনোটি ত্রুটি দেখিয়ে বিচারালয় যদি নাকচ করে দেন তাহলে বুঝতে হবে সামাজিক মূল্যবোধের চেয়ে আইনের খুঁটিনাটিই সেক্ষেত্রে প্রাধান্য পেয়েছে। এরকম ঘটনা ভারতে অনেকবার ঘটেছে। তখন সংসদকেই আবার তার অভিমত ব্যক্ত করতে হয়েছে। কিন্তু আমরা দেখেছি তখনও পশ্চিমীরা বিচারালয়ের স্বাধীনতা খর্ব হল বলে কাঁদুনি গেয়েছে। আসলে এরা চায় না ভারতবর্ষ শক্তিশালী হোক কিংবা সামাজিক অসাম্য দূরীকরণে কেন্দ্রীয় সরকার দৃঢ়তা দেখাক। ভারতবর্ষকে পশ্চিমী সংবাদপত্রে সব সময়েই রুগ্ন রোগা বা সিক জায়েন্ট বলে বর্ণনা করা হয়েছে। একটা উপেক্ষামিশ্রিত কৃপাদৃষ্টি ছিল তাদের। ভারতবর্ষের দ্বারা কোনো কিছু করা সম্ভব এটা তারা বিশ্বাস করত না। এদেশে দুর্ভিক্ষ, দারিদ্র্য ও মহামারী লেগে থাকুক আর পশ্চিমীরা খানিকটা দয়াদাক্ষিণ্য দেখাক, এই ছিল তাদের ভারতপ্রীতির মূল কথা। ইন্দিরাজীর আমলে তার পরিবর্তন দেখেই তাদের উষ্মা বেড়ে গেল। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় এই গণতন্ত্রপ্রেমীরা কিন্তু একবারও পাকিস্তানী জল্লাদদের বিরুদ্ধে কথা বলেনি। ভারতবর্ষ যখন এক-কোটি শরণার্থীকে আশ্রয় দিল তখনও এদের মানবিকতাবোধ জাগ্রত হল না। কিন্তু সেই আক্রান্ত ভারত বাংলাদেশে পাকিস্তানী বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযান চালাল যখন শুরু হয়ে গেল পশ্চিমীদের কুৎসা। সপ্তম নৌবহর দিয়ে ভয়ও দেখানো হল।

এসব কথা সহজে ভোলবার নয়। নিজেরা একটার পর একটা পরমাণু বোমা বানিয়ে তার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ করে। পশ্চিমপন্থীরা তাকে হোয়াকা বলে না। কিন্তু সেই ভারতীয় বিজ্ঞানীরা শান্তিপূর্ণ কাজে লাগানোর জন্য পরমাণু-শক্তির বিশ্লেষণ ঘটাল যখন চারদিকে এই পশ্চিমী নিন্দুকদের মহলে ভারতকে চিহ্নিত করা হল এক আগ্রাসী শক্তি হিসেবে। কিন্তু ভারত যখন গত দুই দশক ধরে বিশ্বনিরস্ত্রীকরণ ও পরমাণু বোমা নিষিদ্ধকরণের জন্য আবেদন জানিয়ে আসছে তখন তাতে এরা কর্ণপাত করার কোনো ফুরসত খুঁজে পায় না। কারণ, ভারতের না আছে তাদের মতো শক্তি, না আছে তাদের মতো অতুল বিত্ত। ভারতের আভ্যন্তর শান্তি ও শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হলে এই গণতন্ত্রপ্রেমীদের কোনো দুশ্চিন্তা নেই। এদের মতে, এশিয়ায় তো এরকম না হওয়াটাই আশ্চর্য। পঁচিশ বছর ধরে এশিয়ার এক ক্ষুদ্র দেশ ভিয়েতনামকে এরা মেরেছে। তাদের সব কিছুই বর্বরের পাশবিকতায় ধ্বংস করে দিয়ে এসেছে। এই মানবতাবাদী গণতন্ত্র ও স্বাধীনতাপ্রেমীরা তখন ভিয়েতনামীদের পাশে গিয়ে দাঁড়ানো প্রয়োজন বোধ করেনি। বার্ট্রান্ড রাসেলের মতো মহান দার্শনিক যখন এর বিরুদ্ধে ধিক্কার দিয়েছেন তখন তারা মুচকি হেসেছে, বলেছে, লোকটা পাগল।

ভারতবর্ষ তার নিজের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের অধিকার কারো ওপর ছেড়ে দিতে পারে না। প্রধানমন্ত্রী যথার্থই মনে করিয়ে দিয়েছেন যে আমেরিকা কিংবা ইয়োরোপের কয়েকটি দেশই পৃথিবী নয়। তাদের সার্টিফিকেট পেলেই সব ভালো, না পেলেই খারাপ—এই মানসিকতা সুস্থও নয়, স্বাধীন মানুষের উপযুক্তও নয়। ভারত তার নিজের পায়ে দাঁড়াতে চায়, সে সর্বদিক থেকেই হতে চায় স্ব-নির্ভর, শুধু বাক্চাতুর্য আর রাস্তার আন্দোলনে তা সম্ভব নয়, এ সত্য উপলব্ধির সময় এসেছে।

কাহিনী

সতীকান্ত গুহ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আমি বলেছিলাম, সবিস্তারে বলুন। লীলাবতী বললেন, সম্ভব নয়। সংক্ষেপে বলি, শুনুন।' নিজেকে সংযত করে লীলাবতী বললেন, ছোটভাই প্রত্যাখ্যাত হয়ে একটি কথাও না বলে বিদায় নিয়েছিলেন। যাবার সময় একবার আমার দিকে তাকিয়েছিলেন। আমি এরকম দৃষ্টি মানুষের চোখে দেখি নি। আপাদ-মস্তক কেঁপে উঠেছিলাম। তারপর দু ভাই আমার বর্ষিষ্ণুত জীবনের আকাশে দুটি গ্রহের মতো আবির্ভূত হয়ে স্ব স্ব কক্ষে অধিষ্ঠিত হলেন। দিনের আলোয় তাঁরা আড়ালে থাকতেন। রাত্রে আমার বাড়ির সম্মুখে তাঁরা মহাসপ্তে আবির্ভূত হতেন। যে-বিষয় আমাকে বিস্ময়ে অভিভূত করত তা হচ্ছে এই যে আমার বাড়ির সম্মুখে যে-রাজপথ গভীর রাতেও কখনো জনশূন্য দেখি নি তা মধ্যরাত্র হতে না হতে নির্জন হয়ে যেত। শুধু মানুষ নয়, ইতর প্রাণীরাও এই নতুন নিয়ম মেনে নিল।

রাত বারোটার পর প্রথম আগন্তুকের গাড়ির হর্ন শুনেছিলাম। প্রত্যুত্তরে দ্বিতীয় আগন্তুকের গাড়ির হর্ন। পর পর দুজনের কণ্ঠে আমার নাম উচ্চারিত হত। আমি শয্যা ছেড়ে জানালায় এসে দাঁড়াতাম। তাঁদের দুজনের আহ্বানে এমন কিছু ছিল, আদালতের পরোয়ানার মতো আমাকে জানালার কাঠফলক দাঁড় করাতো। আমি সন্মোহিতের মতো প্রতি রাত্রে একই দৃশ্য নতুন করে দেখতাম। প্রথমে আগন্তুক তাঁর সাদা গাড়ি থেকে নেমে এসে ঊর্ধ্বে দৃষ্টিপাত করে আমার উদ্দেশে হাসতেন। তাঁর ইঙ্গিতে আঙুল তুলে আমি তাঁর দেওয়া আংটিটা দেখাতাম। সঙ্গে সঙ্গে কালো গাড়ি থেকে দ্বিতীয় আগন্তুক গ্রহণের ছায়ার মতো গাড়ি থেকে বার হয়ে আসতেন। রাহুর দৃষ্টি আমার উপর এসে পড়ত। আমি কাঁপতে কাঁপতে আর একটা আঙুল তুলে তাঁর আংটিটা দেখাতাম। তারপর দুজনে পরস্পরের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকতেন। তাঁদের পরস্পরের দৃষ্টিবিনিময়ে কী কথা হত, কী সংগ্রাম চলত বুঝতাম না। অনুমান করতাম। রহস্যরসে জীর্ণ হবার পক্ষে ঐ অনুমানই যথেষ্ট ছিল। আমি নিজের সম্বন্ধে চিন্তিত হলাম।

চিকিৎসাধি দেখে আমার শরীর আক্রমণ করল। পরিশেষে চিকিৎসক এলেন। এক সপ্তাহ দিনে দুবার এসে আমাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করে বললেন, 'পরীক্ষার প্রয়োজন নেই। ব্যাধির শিকড় মনে। মন দেহকে আক্রমণ করেছে। মনের চিকিৎসা প্রয়োজন। সবচেয়ে জটিল হচ্ছে মনের চিকিৎসা। এই জটিল চিকিৎসা সরল হয়ে যায় যখন রোগী নিজেই চিকিৎসার ভার নেয়। তোমার ধৈর্য্য ও সাহসের অভাব নেই। চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কী নিজের মন কতটা পোষ মানাতে পারো!'

চিকিৎসক সকালে এসেছিলেন। আমি মন স্থির করে ফেললাম। মাঝরাতের নাটকে আর ভূমিকা নেওয়া চলবে না। টাকাকড়ি যা ছিল ব্যাঙ্ক থেকে তুলে, নগদ কিছু হাতে রেখে বাকী টাকার ব্যাঙ্ক ড্রাফট নিয়ে, অলঙ্কার ও জামা-কাপড় দুটো সুটকেশ ও একটা ট্রাঙ্কে ভরে নিয়ে, বিস্তর-আসর বাড়িঘর ফার্নিচার ইত্যাদি আটর্শীর জিম্মায় রেখে আমি সে রাতেই কাশ্মীরে পাড়ি দিলাম।'

লীলাবতী দম নেবার জন্য একটু থেমেছিলেন। আমি মন্তব্য করেছিলাম, 'আপনার মন ও হাত-পা, সবই দেখছি অত্যন্ত দ্রুতগামী চলে!'

লীলাবতী আমাকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখতে দেখতে বলেছিলেন, 'আপনি ডিটেকটিভ। আপনার বোঝা উচিত বিপদ মানুষকে কী শক্তি দেয়! কী পরিমাণে সঞ্চয় ও সঞ্চালন করে তোলে।'

আমি তাঁর উক্তির সমর্থনে মাথা নেড়েছিলাম।

লীলাবতী বলেছিলেন, 'কাশ্মীর প্রকৃতির হাতে মন সমর্পণ করে, এক উপত্যকা থেকে আর এক উপত্যকা—এভাবে এক মাস কাটিয়ে দিল্লী, দিল্লী থেকে বম্বে শহরে পৌঁছে বিজ্ঞাপনে খবর পেয়ে এই গেস্টহাউস কিনে কেরালায় চলে এলাম। ভেবেছিলাম আত্মগোপনের ব্যবস্থা পাকা-পাকি হল।'

আমি বলেছিলাম, 'কিন্তু তাদের নজর এড়াতে পারলেন না। তারা ঠিক পিছু নিল।'

লীলাবতী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, 'এ রকমই হয়তো হয়।'

আমি বলেছিলাম, 'বিশেষ করে তাঁদের ক্ষেত্রে যাঁরা জীবন থেকে গল্প-উপন্যাস বাদ দিতে পারেন না।'

লীলাবতী জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'তাঁরা না তাঁদের অদৃষ্ট?'

আমি জবাবে বলেছিলাম, 'সঠিক উত্তর আমার চেয়ে আপনি ভালো জানেন। অন্তত তা-ই স্বাভাবিক।'

লীলাবতী আমাকে স্থিরদৃষ্টিতে দেখতে দেখতে বলেছিলেন, 'হয়তো তা-ই।' তারপর কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক পর্দায় এনে বলেছিলেন, 'কয়েক বছর ধরে তারা আলাদা আলাদা আসতো। এখানকার দুর্জেয় প্রকৃতির কিছুটা আমার চরিত্রে ঢুকেছে। আমার মনের উপর তাদের একক আক্রমণ অনায়াসে প্রতিহত করেছি। কিন্তু আবার তারা জোট বেঁধেছে। একই দিনে এক-সঙ্গে আসছে। যদি একা তাদের যুগপৎ আক্রমণে মনের জোর হারিয়ে ফেলি, আপনার শরণ নিতে বাধ্য হয়েছি।'

আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'তারা কী চায়?'

লীলাবতী উত্তরে বলেছিলেন, 'আমাকে। তাদের লক্ষ্য যেহেতু আমি। আমাকে না পেলে মাঝ রাতের অপুরী নাটকের আমৃত্যু অভিনয়।'

আমি ডিটেকটিভ। আমার মনের চামড়া নিতান্ত নরম নয়। তবু লীলাবতীর শেষ উক্তিতে আমি দেহে-মনে শিউরে উঠেছিলাম। লীলাবতীর কাহিনীর চরিত্রদুটি অপ্রাকৃতস্থ? না নাট্যলীলায় যাদের জীবনতন্ত্রের শুরু ও লয় সেই গন্ধর্ব-জাতের দুটি ছদ্মবেশী নায়ক? নাটক কাকে বলে পৃথিবীর একটি নারীকে শেখাতে এসেছে। যদি সত্য হয়, তাহলে এ ঘটনা এক চূড়ান্ত কবিতা। মনোহর নয়। ভয়ঙ্কর। ভয়ঙ্কর রসের মহিমার মহা-কাব্যের কাছাকাছি। আমার ভিতর কে অশ্রুত ভাষায় বলল, 'অবিশ্বাস্য!'

আমি শুয়ে শুয়ে ভাবছি। হঠাৎ কপাটে কে আস্তে ঘা দিল। উঠে কপাট খুলে দিলাম। দেখলাম লীলাবতী। বুঝলাম তাঁরও একই দশা। বিছানায় ছটফট করেছেন। ঘুম আসে নি। তাঁর নিশ্বাস বিস্রস্ত। তাঁর দুটি চোখ ক্লান্ত।

আমি বললাম, 'বসুন।'

লীলাবতী বললেন, 'ঘরে দমবন্ধ হয়ে আসছে।'

আমি অস্বস্তি বোধ করলাম। কিন্তু সৌজন্যের খাতিরে ও রুগ্না নারীর বিশ্ববিদিত আকর্ষণের উত্তরে বললাম, 'বাইরে বারান্দায় বসা যাক। প্রকৃতির ধ্যানে যদি ঘুম আসে।'

লীলাবতী উত্তর দিলেন না। কিন্তু ঘরের নাইটল্যাম্পের অস্পষ্ট আলোয় দেখলাম তাঁর দু চোখ এক জোড়া তারার মতো জ্বলছে।

বারান্দায় আমার পাশে বেতের চেয়ারে বসে লীলাবতী বললেন, 'এ রকম রাতে চাঁদের আলোয় প্রকৃতিকে যখনই দেখি, মনে হয় জন্ম-মৃত্যুর রহস্য বুঝতে তার বাকী নেই। সে একা। কিন্তু অসহায় নয়। সে ক্ষয় হবে। ক্রম ক্ষয়ে। না হলে অকস্মাৎ! তবু তার ভয় নেই। ক্ষয়ের তত্ত্ব বুঝে সে নির্বাণের সত্যে নির্ভর। আমি কেন ওরকম হতে পারি না?'

আমি বললাম, 'আর কে পারে জানি না, তবে আপনি পারেন।'

লীলাবতী সবিস্ময়ে বললেন, 'পারি?

আমি বললাম 'নিঃসন্দেহে।'

লীলাবতীর একটা হাত রাতের তৃতীয় প্রহরের দুর্লঙ্ঘ্য অনুশাসনে আমার একটা হাতের উপর নরম চাপ দিয়ে বসেছে। তাঁর সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হল। লীলাবতী সঙ্কুচিত বা কুণ্ঠিত হলেন না। চেয়ারটায় আমার পাশে আর একটু কাত হয়ে বসে বললেন, 'নিঃসন্দেহে?' আপনার এ কথার অর্থ কী?'

লীলাবতীর হাত আমার হাতে আরো শক্ত হয়ে বসল। আমি বুঝলাম প্রয়োজনে লীলাবতী নারীসুলভ লজ্জা বিসর্জন দিতে পারেন। তাঁর ভিতর নারীর লজ্জার চেয়ে নারীর শক্তি বেশী। বললাম, 'আমার কথার অর্থ সহজ, আপনি শুধু প্রকৃতি নন। আকারে যা-ই হোন, প্রকৃতিতে পুরুষ ও প্রকৃতি দুই-ই। পুরুষের মস্তিষ্ক ও শৌর্য আপনার ভিতর নারীর সমর্পণের আকাঙ্ক্ষা কর্ষিত হয়ে ক্ষয় হয়ে ফসলের প্রতিশ্রুতিতে সচ্ছন্দে মিলেছে। শুধু তাই নয়। আপনার ভিতর রুদ্র ও মোহিনীর আশ্চর্য সমন্বয় দেখছি।'

লীলাবতী একটু সরে বসলেন। কী চিন্তা করে বললেন, 'ঐ সমন্বয়ের আড়ালে আরও কিছু দেখছেন?'

আমি বললাম, 'দেখছি।'

লীলাবতী নীচু গলায় বললেন, 'কী দেখছেন?'

আমি বললাম, 'তুরুপের তাসের মতো যে সত্য জীবনের পাকা খেলোয়াড় হাতে রাখে, সেই সত্য।'

লীলাবতী বললেন, 'আপনাকে বোঝা ভার।'

আমি বললাম, 'নিষ্প্রয়োজন। ডিটেক-টিভ হিসেবে আমার প্রথম কর্তব্য আপনাকে বোঝা।'

লীলাবতী বললেন, 'আমাকে না আমার প্রতিপক্ষকে?'

আমি বললাম, 'উভয়কেই। চিকিৎসক

পরের সংখ্যায় গল্প লিখবেন
শৈলেন রায়

ার উপেক্ষা করে আমি আমার চিরা-
ত প্রণালী অনুসরণ করে প্রথমেই বাথ-
ম ঢুকে দিয়েছিলাম।

যা পেলাম তা আমাকে মোটেই বিস্মিত
ল না। কিন্তু চিন্তার খোরাক যোগালো।
া আসবে বলে কাঁসিয়েছি, আসল
মেকী তাদের আঁতস্কা চোখে সহজেই
পড়বে। তারপর এই মেকী আর্টি

সংশোধন

গত সংখ্যার ৮ পৃষ্ঠার ২য় কলমের
থেকে সপ্তম লাইন চতুর্থ লাইনের পরে
সরে।

ই নিয়ে এই অন্যায়ীদের সংস্কৃতি
ং লক্ষ্মীবাবুও কি আসল ও মেকীর
ং বোঝেন না? সভ্যতা কি অভিনয়?
সভ্যতা নিজেকে নিয়ে? চিন্তায় ছেদ
ল. লক্ষ্মীবাবুর প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায়
ন এল। ফাঁক খোলা হল। গাড়ি
দে পাহাড়ী রাস্তাকে ধিক্কার
ত দিতে লন-এ ঢুকলো। আমি ক্ষিপ্র

হাতে কেশবদাস কার ফিটফাট
বারান্দায় একটা বেতের চেয়ার
বসলাম।

দু মিনিট বাদে লীলাবতী উপ
এলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, ঘুমিয়ে

আমি বললাম, ঘুমের ভান
ছিলাম। একবার ভিতরে ঢুকে দেখে
নিলাম লন্ডভন্ড অবস্থা।'

লীলাবতী বললেন, 'ডায়াপোকার
পেড়াও বুঝি?'

আমি জবাবে বললাম, 'যে-পুঁটি
মস্যার সিভান্স জোগায়ে দিয়েছেন,
উপদ্রবে ডায়াপোকার কথা মনেই
দিনিদ্রার দুঃস্বপ্নে ঐ চ
আমাকে ধাওয়া করে হয়রান করে
একটু আগে ঘুম ভেঙেছে। চা
বলেছি।'

লীলাবতী কিছুক্ষণ আমার
করলেন। বললেন, 'তারা কখন এসে
ভালো।' একটু থেমে বললেন,
হলেও পরশু না এসে যাচ্ছে না।' ল
অন্যত্র পাশে বসলেন।

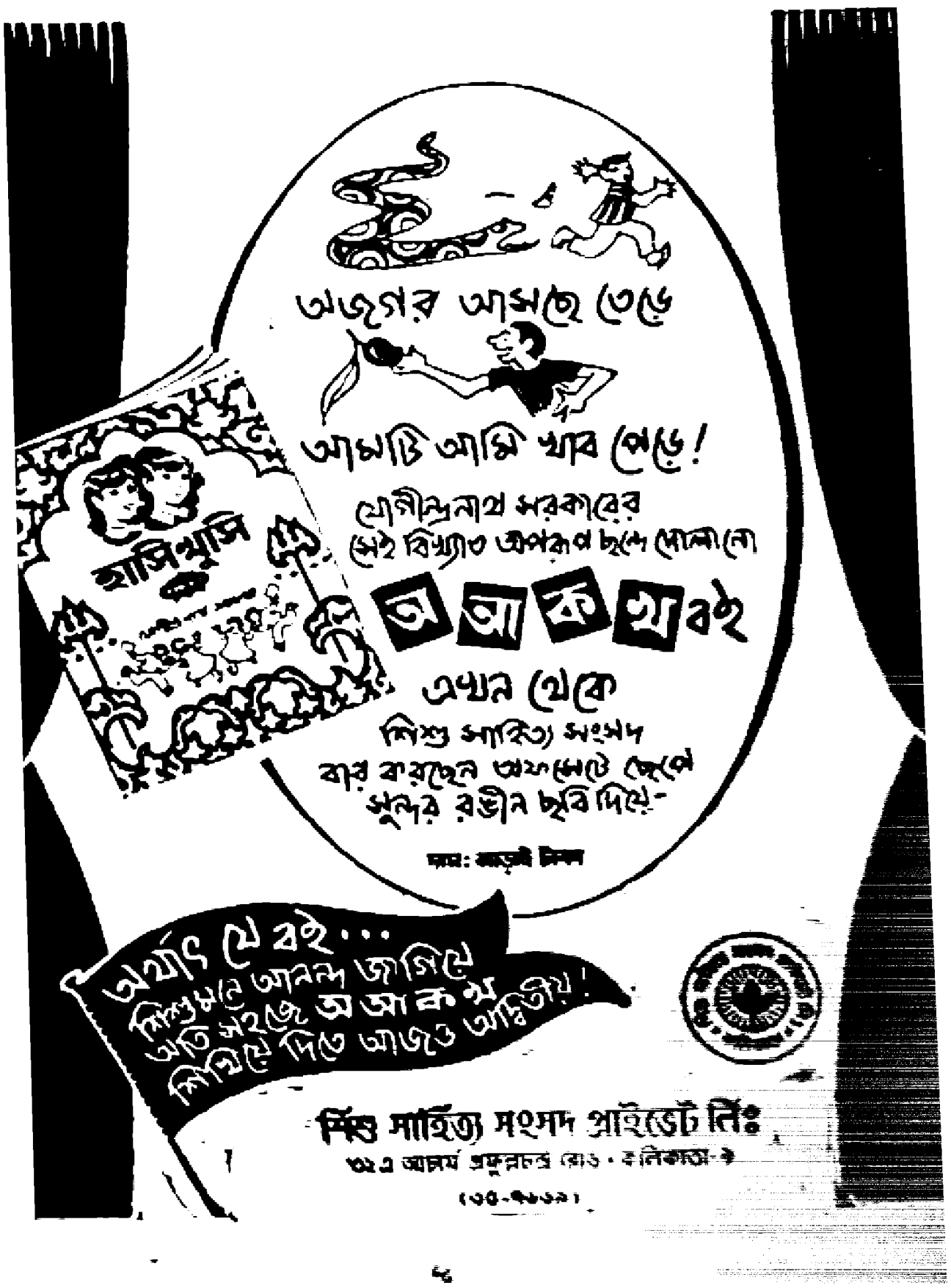

চা এসে গিয়েছিল। আমার হাতে একটা কাপ তুলে দিয়ে লীলাবতী বললেন, 'মানুষ আকাঙ্ক্ষার অভিঘাত নিয়ে জন্মেছে। হানাহানি দ্বন্দ্ব, বিরোধ—সব কিছুর মূলে হচ্ছে আকাঙ্ক্ষা।'

আমি বললাম, 'আহার ও আসংগের জন্য হানাহানি প্রাণীর ধর্ম। ঐ হানাহানি বাদ দিলেও মানুষের জীবনে সহস্র হানাহানি থেকে যায়। কারণ মানুষের সহস্র আকাঙ্ক্ষা, আকাঙ্ক্ষা মানুষের ধর্মের চেয়েও বড়। আকাঙ্ক্ষা তার অস্তিত্ব। জয় প্রমাণ করা আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার ইতিহাস, সংগ্রামে সাহসে এগিয়ে যাওয়ার আদিম ঐশ্বরিক ইচ্ছাতে প্রশ্ন জেগে ওঠার ইতিহাস — সব মিলিয়ে সভ্যতার বিচিত্র ইতিহাস।'

লীলাবতী বললেন, 'ঐ সভ্যতার রঙ না লাগলে এই বারান্দায় বসে প্রকৃতির সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার কী অপার শান্তি!'

আমি বললাম, 'তারের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে, সংগম ও ত্যাগের কঠোর ব্রত পরের হাতে তুলে দিয়ে, সভ্যতার প্রতীক নীল ঘেরা হোটেলের বারান্দায় বসে শান্তির মূল উচ্চারণ করার কী দাম!'

লীলাবতী তপ্ত কণ্ঠে বললেন, 'কয়েক মুহূর্তের জন্য সভ্যতার ক্লেশ ও গ্লানি থেকে মুক্ত হবার ইচ্ছা কি অপরাধ?'

আমি হাসলাম। বললাম, 'অপরাধ কিনা জানি না। তবে ইচ্ছাটা স্বাভাবিক। আমিও ঐ ইচ্ছার বশবর্তী হয়ে কম্বলের তলায় চুকেছিলাম। মাঃস্বপ্নে প্রাণ হাতে করে প্রত্যহ হাজার মাইল ছুটতে হয়।'

লীলাবতী খিলখিলিয়ে হেসে বললেন, 'হাজার হাজার মাইল? আপনার বিছানার মাপ হচ্ছে জোর সাড়ে ছ ফুট, পাশে সাড়ে তিন ফুট।'

আমি বললাম, 'আপনার বয়েস বড়জোর ত্রিশ। কিন্তু আপনার চোখে কোটি বছরের ক্লান্তি।'

লীলাবতী মুখের দৃষ্টি প্রসারিত করে বললেন, 'কি দেখছেন। আমি ক্লান্ত। অত্যন্ত ক্লান্ত। মনে হয় আকাশের তলায় পৃথিবীর ধুলোর মত খুব সস্তা আমি। এ এক আশ্চর্য নির্মম নির্বাসন। ক্লান্তি দিয়ে পালানোর পথ নেই। সন্ধ্যাকে দুর্ভেদ্য করে নিয়েছে জাল।'

আমি বললাম, 'বুদ্ধির অসাধ্য কী আছে? জাল ছিন্ন করে এসেছেন।'

লীলাবতী বললেন, 'ছিন্ন করে এসেছি? কী করে? আশ্চর্য!'

আমি বললাম, 'জাল ছিন্ন হয়। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। তবে বিপদ এই জালের অন্তও জাল থাকতে পারে।'

লীলাবতীর দু চোখে এক মুহূর্তের জন্য প্রাচীরান্তর থেকে নির্বাসিত নিঃসঙ্গ অরণ্যের ছবি ফুটে উঠল। তারপর ক্লান্ত মুদ্রকণ্ঠে বললেন, 'জাল না এলেও তাকে পরশু আসবে। না হয় তার পরের দিন। সময়ের ওপর কবি শেলীর লেখার মতো ঘুমে বিভোর হওয়া দেওয়া যেত!'

পরিহাস জমল না। লীলাবতী আমার চোখ থেকে চোখ সরিয়ে অন্যদিকে সরে গেলেন। সাময়িক প্রয়োজনে না ফেরার, বুঝলাম না, কিন্তু তিনি আমার সতর্ক দৃষ্টি এড়াতে পারলেন না। কয়েকবার তিনি হোটেলের বাইরে গেলেন। এক আধ ঘণ্টা ভিতরই ফিরলেন। দুবার আমার অগোচরে আমাকে দেখতে গিয়ে ধরা পড়লেন। ধরা পড়ে অপ্রতিভ হলেন। অনায়াসে নিজেকে ঢাকতে পারতেন। ঢাকলেন না। আমি চিন্তাস্রোতে ভাসলাম। লীলাবতীর মনস্পন্দনের নৌকো কোথায় পাড়ি দিচ্ছে জানা দরকার।

যে আশ্চর্য দেশলাইয়ের বাকস-প্রমাণ ক্ষুদ্র যন্ত্রের মন্ত্রে আমি অরণ্যে মরু ভূমিতে বসেও সভ্যজগতে আমার কয়েকটি ঘটির সঙ্গে যোগাযোগ রাখি, ঘরের জানালা একটু ফাঁক করে ধারে একটা চেয়ার টেনে বসে সেই যন্ত্রের সংকেতে একটার পর একটি ঘটির সঙ্গে কথোপকথন চলল। যে-খবর পাবো আশা করেছিলাম, পেলাম। বিস্ময়ের জন্য প্রস্তুত হয়েই নীলাগিরি হাটেলে এসেছিলাম। তবু যে-খবর পেলাম তা আমাকে বিস্ময়ের অতল সমুদ্রে কোমরে কলসি বেঁধে ছেড়ে দিল।

চিন্তাকুল চিত্তে বারান্দায় অপরাহ্নে একাই চা খেলাম, লীলাবতী দু-একবার ঘরে ঢুকে সন্তর্পণে কিছুক্ষণ পরই বার হলেন। আমাকে এড়িয়ে যাবার ভান করলেন। এ অভিনয় কেন আমার কাছ থেকে পাওয়া খবরের সঙ্গে মিলিয়ে তার অর্থ ও লীলাবতীর রহস্যের উৎসে কী প্রায় বারো আনা বুঝলাম। তবু মানুষের চরিত্র ও জীবনের বিস্ময় সম্বন্ধে নাটকের শেষ অঙ্কের উপর যবনিকা যতক্ষণ না উঠছে, আমরা হৃদয়ে উঠে যতক্ষণ না নিভৃতে নিশ্চয় করে কিছু বলা চলে না। আমি উৎসুক মন শান্ত করে প্রতীক্ষায় রইলাম।

রাত নিঝুম ভাইব্রেশনে আমি একা, বিতাড়িত বেদুইনের মতো, নিঃসঙ্গতা ভোজন শেষ করলাম। লীলাবতী কোথায় জানবার আগ্রহ প্রকাশ করলাম না। দুবার তাঁর বেরী কাটিন সরবে বার হয়ে লন মুখর স্তব্ধে সরবে ফিরে এল। এ অকৃত কাণ্ড আমার শ্রুত খবরের সঙ্গে এক বিস্ময়কর শব্দিতরঙ্গের নক্সায় মিলে গেল। জীবনের নকশা কী বিচিত্র! কী আশ্চর্য রকমে বোনা! অথচ সবকিছুর ছক পরীক্ষিত। এরা ধ্রুবব্রত।

রাত দশটায় শয্যা নিলাম। নিদ্রার প্রয়োজন। মাথা ঠাণ্ডা রাখার এর চেয়ে উপকরণ নেই। মনে সন্দেহ ছিল না তারা আসবে না আসবে শেষ রাত্রে আসবে।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম জানি না। কপাটে কে সন্তর্পণে আঘাত করল। উঠলাম। আগুনেয়াস্ত্রটিকে সংগে করে নিলাম। যন্ত্রচালিতের মতো আমি কপাট খুললাম। দাঁড়িয়ে লীলাবতী। চাঁদের আলোয় মুখটি ফ্যাকাশে। মাথার কাছে চাঁদের আলো সরে যাওয়ার কাছাকাছি। আমি আমার লীলাবতীর মধ্যে কোনও পরিবর্তন দেখলাম না। অন্তরঙ্গ মুহূর্তে যে-মানুষ আমার কাছে ধরা দিয়েছে, তার কাছে আমি। এবং আমার কাছে?

মনকে বললাম, 'ধৈর্য ধরো। সময় হয়ে এসেছে। বুঝতে বিলম্ব হবে না।'

লীলাবতীর নির্দেশে তাঁর সঙ্গে চললাম। সোজা পথে না গিয়ে হোটেলের পছনে একটা খাড়া উতরাই বেয়ে একটা সংকীর্ণ পাহাড়ী পথে নেমে নদীর ধারে ধারে এক সার গাছের আড়ালে আড়ালে ওপরে চললাম।

লীলাবতী বললেন, 'এ পথে কেউ আমাদের দেখবে না।'

আমি বললাম, 'তারা?'

লীলাবতী বললেন, 'তাদের নিয়েই যত ভয়। তারা দেখতেও পারে।'

আমি বললাম, "দেখলেও আড়াল থেকে মারবে না। হয় আপনার আঙুলের আংটি দেখতে চাইবে। নয় আপনাকে। তৎক্ষণে বুলেট খানিকে আমরা প্রতিআক্রমণের জন্য তৈরী হতে পারবো।'

লীলাবতী দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। হঠাৎ তোচট খেলেন, আমি তাঁকে তুলতে গেলাম। তিনি ক্ষিপ্রগতিতে ঘুরে ঘুরে আমার পিছনে দাঁড়ালেন। বহু বর্ষের অভিজ্ঞ ইঁদুর। বুঝতে বাধা হল না তিনি আমার কোমরে রিভলভার চেপে ধরেছেন। উত্তেজিত অথচ চাপা গলায় বললেন, ঐ আংটি দুটোর দাম এক কোটি টাকার বেশী। বার করুন। না হলে যারা এসেছিল তাদের আজ রাত যেখানে পাঠিয়েছি সেখানে পাঠাতে দ্বিধা করব না।'

আমি বললাম 'তবে কাঁদবো না হাসবো?'

লীলাবতী এক মুহূর্ত নীরব থেকে বললেন, 'মূর্খ!'

আমি হা হা করে হেসে উঠলাম। আমার কানেই আমার হাসি প্রেতের উল্লাসের মতো ঠেকল। শেষরাতে অতীন্দ্রিক পরিস্থিতে এ হাসি লীলাবতীকে কোমরে নাড়া দিল অনুমান করা কঠিন হল না।

লীলাবতী বিস্ময়ে কঠোর ভুলে বললেন, 'আপনি কি উন্মাদ?' বুঝলাম তিনি অবশ্যই হয়ে পড়েছেন।

বিদ্যুৎবেগে ঘুরে পাঁড়ুর চাঁদের থেকে আমার হাতে মারণাস্ত্র বার করে তাঁর বক্ষ লক্ষ্য করে বললাম, 'ভিজবেন না। সজ্ঞানে হাতে বাধা হয়েছি।'

লীলাবতী রোষে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, 'আপনি আমার ভিটেকটিভ!'

আমি জবাবে বললাম, 'আমি প্রথম আমার রক্ষী। পরে আপনার ভিটেকটিভ।'

লীলাবতী বললেন, 'রাতে একা আপনার সঙ্গে বার হয়েছি। সতর্ক হতে হয়েছিল। তা বলে আপনাকে প্রাণে মারতাম না।'

আমি সহজ কণ্ঠে বললাম, 'প্রাণে না মেরে বুদ্ধিতে মারতেন। কেন?'

লীলাবতী নিষ্পলক চোখে আমাকে লক্ষ্য করছেন।

আমি তাঁকে দেখতে দেখতে বললাম, 'আপনার এযাবের কাহিনী কাউকেই না মেরে শুরু ও শেষ করা যায়।

লীলাবতী হাল না ছেড়ে আবার বললেন, 'আমার আংটি দুটো?'

আমি বললাম, 'কোটি টাকার আংটিও নেই। দুটি রঙিন কাঁচ-নকল মাল্যের

...ী সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করি নি।
...ত্নাম তিনি সান্ত্বনার অতীত।
...র সবচেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষার মাটি
...াক্রান্ত। তিনি যা গান একদিন নিজে
...ক না লিখে সে দেবে? তুখাগড়ের
...য় বসবেন? না পৃথিবীর প্রাচীনতম
...। আশ্রয় নেবেন?

...র্বদিন তাঁহাদের বাড়ীর ছেলে জীলাবতীর দেবী প্রকাশ উঁহাদের 'দিয়ে কেহলাম' তুলি ...ত্রাপিশাচের হাতে ছাইনিংহাসের কথাটির ...য়ায় চাঁড়ার নীরব নিশ্চল। একটা বজ্রের ...আলোর ...ঘোষ করলাম। তবু ...য়বাক্ 'দিয়ে ...ফরলাম না। পর্তুগাল উঁহারা ...কাল সাহসের ...হৃদয়ের কাহিনীর চেয়ে অনেক সুন্দর বেশী।

বিমল কর-এর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস

কেরানী পাড়ার কাব্য ১৬·০০

অমিতাভ রায়-এর 'দ্বিতীয় বস্ত্রযজ্ঞের

কিংবদন্তি-খ্যাত জেনারেলের রুদ্ধশ্বাস কাহিনী

রোমেল ১০·০০

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় -এর ভিন্নস্বাদের উপন্যাস

অনিলের পুতুল ১৩·০০

সমরেশ বসু	চেতনার অন্ধকারে	৭·০০
বিমল কর	নির্বাচিত গল্প	২০·০০
শওকত ওসমান	রাজা উপাখ্যান	৭·০০
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়	ফেরা	১০·০০
হাইনরিখ বোল	যুদ্ধ যখন সুরু হয়	১০·০০
চিরঞ্জীব	নেপথ্যে	১০·০০

সাংবাদিক তাপস গঙ্গোপাধ্যায়-এর বন্দীদের জবানবন্দী নিয়ে লেখা

দ্ব্যবাই এবং হাইজ্যাক ৮·০০

বিমল কর	ক্ষণকাল	৭·০০
শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়	আলোয় কালোয়	৭·০০
নিখিলচন্দ্র সরকার	ধস	১২·০০

অমিয়কুমার সেন -এর অসামান্য রম্যগ্রন্থ

দেখেছি পথে যেতে ৮·০০

এই লেখকের **সুরের গুরু** ১৬·০০

অনন্য প্রকাশন, ৬৬, কলেজ স্ট্রীট (দ্বিতল), কলকাতা-১২

সাহিত্যের সাজঘরে

আশাপূর্ণা দেবী

পুজো সংখ্যার একটা গল্প বলি শুনুন:

সালটা ৮৫-৬৫ হবে তখন উপন্যাস নিয়ে একটা লাগাতার হুজুগ চলছে। লড়াই চলেছে—কে কটা বেশী উপন্যাস দিতে পারে। সুপার হিট লেখক আর কারুর সুতরাং চলালো কোনরকম বেঁধে ফেলা। মুখ থেকে একবার হ্যাঁ করিয়ে নেওয়া। একদিকে বিজ্ঞাপন, অপরদিকে চলালো হার্ডসেল কেস। লেখকদের অবস্থা সাপের ছুঁচোর না বলা সয় না, গেলা যায় কি করে? এক একজন লিখতেন আটটা, নটা, দশটা। কেউ বা আরো বেশী। সময় মাত্র তিন মাস।

তখন আমার মনে হয়েছিল সেই আলেকজান্ডার ডুমার কথা। ফরাসী লেখক ডুমা মাত্র বেয়াল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত। বেঁচে ছিলেন। এবং যার—তিনি লিখেছেন খুব বেশী হলে ৫৮ থেকে ৭০ বছর পর্যন্ত। এই সময়ের মধ্যে গল্প উপন্যাস নাটক মিলিয়ে যা তিনি লিখেছেন, তার সংখ্যা হবে পুরো দুশো। একজন ডুমা আর বারোশো পুলিশ রাখা। তবে হ্যাঁ যায় না এক সে সময়ে সবাই করেছিলেন। বাজারে তখন তিন-চার সুপারহিট লেখক ডুমা। যার নভেল যেনতেনরূপে ছেপে বেরিয়ে যাবে। সুতরাং ডুমাকে চাই-ই-চাই সুযোগ ছাড়লেন না, ডাকিয়ে নিলেন। আর মজা সাপলাই করছেন কি ছাড়ছে কি করে ছাড়ছে বোঝা যাচ্ছে কেউ বুঝছে না। একটা গল্প আছে। ডুমা একজন ওঁর ছেলেকে জিজ্ঞেস করেছিলেন—হ্যাঁ আমার শেষ লেখাটা কি তুমি পড়েছো? ছেলেও হেঁকে বলেছে সঙ্গে সঙ্গে বাবাকে নীচের দিলো—বাবা, তুমি লিখে পড়েছো তো?

এখন সে অবস্থা আর নেই। তবু কমও লিখছেন না অনেকেই। কিন্তু যাক এসব কথা। আমরা বরং পাড়ায় থেকে ঘুরে আসি।

—জানো বাবা, জীবনে কখনো স্কুল পাঠশালা যাইনি। পড়াতো ঘরের কথা। ছাপাখানা ঠাকুমা তাঁর মুখের ওপর কথা বলে কার সাধ্যি। পড়াশোনা করা মানে মেয়েদের খেস্টান হওয়া। তা তিনি বেঁচে থাকতে এ কখনো হতে দেবেন না ভেবেছিলাম। দাদারা পড়াশুনো করতো। আর উল্টোদিকে বসে হাতের সুখো মুখস্থ হয়ে যেতো। বইয়ের অক্ষর আর বইয়ের পাতা। সেভাবেই জ্ঞান হৈমবতী পরিচয় হয়ে গেল অক্ষরগুলোর সঙ্গে। এত অল্পবয়সে অক্ষরজ্ঞান হওয়া আত্মীয়-স্বজনদের বিশ্বাস হয় না তাই কেউ এলেই ডাক পড়তো আশাপূর্ণার—ও আশা একটু পড়ে দেখাওতো সোনা। গড়গড় গড়গড় করে বইকে উল্টো দিকে রেখে পড়ে যেতো আশাপূর্ণা বই সোজা করে দিলেই গণ্ডগোল কারণ তখনতো সোজা করে অক্ষর চেনা হয়নি। তারপর বর্ণ পরিচয় কিনে দিলে অনায়াসে বর্ণ পরিচয় হয়ে গেল। তারপর আমার স্বপ্ন ছোট বোন জ্ঞানে তখন আদুড়ঘরে ঢোকা বারণ মা বেরুতে পারছেন না, জ্বরে হাসপাতাল হাতে না করে মা পদ্য পড়তে বলতেন। আশাপূর্ণা মাকে সুর করে শোনাতো পদ্য।

—তারপর?

—তারপর...দাঁড়াও কথা। ভেতরের ঘরে বোধ হয় কিছু দরকার ছিল উঠে গেলেন লেখিকা।

এ সময় আশাপূর্ণা দেবী তিনখানা উপন্যাস লিখছেন একটা জমাতে একটা সনেরো জমাতে, আরেকটা নয় কলমারো আরেকটা বোধ হয় ছোট একটা কাগজে দিতে হতে পারে। তাছাড়া ছোটদের বড়দের মিলিয়ে গল্প প্রায় ডজনখানেক হবে।

কাজ সেরে আবার ঘরে এসে গুছিয়ে বসলেন আশাপূর্ণা দেবী। সংসারের সর্বময়ী এই গৃহকর্ত্রীর বাড়ির পুরোটা কাজ বাঁধা নিয়মে হয়ে চলেছে। নিজে সকালের কটা কোটেন, গৃহদেবতার পুজো থেকে সামাজিকতা, পুজো পার্বণ, কি নেই দিকে সজাগ দৃষ্টি।

—আচ্ছা, দেবী নিলেন কেন?

—আর কেন? সাধে কি নাম লিখিয়েছি। ধরো বিয়ের আগে ছিলাম বিয়ে হয়েও গুপ্ত। সুতরাং গুপ্ত অসুবিধের কিছু ছিল না। কিন্তু তা মেয়েরা নাম ছাপবে নিজের পদবী থাকাই যেতো না। তখনই শুরু হয়ে যাবে ঝগড়া বিবাদ। আশালতা সিংহ প্রথম ছাড়লেন। ব্যাস শুরু হল আওয়াজ—সিংহ বেরিয়েছে। এবার বেরুবে সাথে বাবা, আমার পদবীতে দরকার এমনিতেই তো মরে আছি তার আবার খাঁড়ার ঘা।

একটা ব্যাপার শুনলে তুমি হবে। তখন বেশ বয়স হয়েছে। বাজারে লেখার চিঠি এসেছে, মস্ত সাপাল মশাই লেখা নিতে আমার স্বীটের বাড়িতে এসেছেন। হা পরপ সামনে বেরুবো? লেখাটা অন্য লোকের দিয়ে তাঁর হাতে দিয়ে দিলাম। উপন্যাস প্রায় জোর করে লেখালেন মুখোপাধ্যায়। কোনো কাগজে যে একেবারে বই হয়ে বেরিয়েছিল। যে সেটা হবে ১৯৭০ সাল।

—পুজোয় একসঙ্গে সবচেয়ে উপন্যাস কটা লিখেছেন?

—হা এক বছর প্রায় দশটা লিখেছিলাম।

—দশটা?

—হ্যাঁ।

—এক পুজোয়?

—হ্যাঁ। ধরো একটা শেষ করি আরেকটা ধরি। আবার একটা শেষ করি, আমি বাপু একসঙ্গে অনেকগুলো লিখতে পারি না। আর যদি একবার কথা দিয়ে ফেলি তখন যে তারিখে বলবো সেই তারিখে দোবোই। কথার আমার কোনো নড়চড় নেই। আজকাল বয়স হয়েছে। তারিখের একটু গোলমাল হয়ে যায়। আমার লেখার ব্যাপারটা কি জানো? ধরো কোনো উপন্যাস মনে মনে তৈরী হল প্লটটা যাতে ভুলে না যাই তক্ষুনি আগে দু-তিন পাতা লিখে ফেললাম। পরে তাকে নিয়ে পরিপাটি হয়ে বসলাম।

—এত সংসারের কাজ চারদিকে চোখ রেখে, কলম নিয়ে বসেন কখন? সংসারে অশান্তি হয় না? পাশে শ্রীযুক্ত কালিদাস গুপ্ত বসেছিলেন—বললেন, ওটি হবার নয়। নিশ্চিন্তভাবে ও যে রকম সংসার চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তাতে ওর ওপর আমাদের কোনো অভিযোগ কিছু নেই।

—সত্যি আপনি ওর প্রেরণাও তো বটে।

—কে প্রেরণা—ও? আশাপূর্ণা দেবী বললেন—আমাকে কেউই প্রেরণা দেয়নি। সাহিত্যই আমার প্রেরণা। সাহিত্যকে দেখেই সাহিত্য করতে শিখেছি। শান্তিলা তুমি আমার নাতির বয়সী তোমাকে আর কি বলবো তবু বলতে পারো আমাকে কেন কেউ জিজ্ঞেস করে না, আপনার কোনো প্রেম-ট্রেম আছে কিনা?

—আছে নাকি? আমি সোজা হয়ে বসলুম।

—আরে না না.. আমি এই মজা করছি। একেবারে ছোট বয়সে বিয়ে হয়েছে, প্রেম করার বয়সে আমি শ্বশুরবাড়ীর ঘর করছি।

কফি এলো প্লেটভর্তি মিষ্টি নোনতা সাজানো। —শোনো, তোমাকে যে গল্পটা বলতে বলতে চলে গিয়েছিলাম। কফিটা খেয়ে নাও ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

বুঝেছো তারপর ওই বাড়ির মেয়ে ধরো যায় আপাদমস্তক পর্দা দিয়ে মোড়া। আমার ভীষণ শখ ছিলো স্কুলে পড়ার। জানো, শান্তিলা রোজ স্কুলের টাইমে জানলার শিক ধরে দাঁড়িয়ে দেখতুম—পাশের বাড়ির দুটো মেয়ে পর্দা ঢাকা গাড়ি করে যেখানে চলে গেল। একলা জানলায় দুটো চোখ আমার জলে ভরে উঠতো। মনে হোতো ওরা যেন স্বর্গে যাচ্ছে: স্কুলে পড়ার

সন্তোষ কুমার

আমার এত ইচ্ছে ছিল। মনে হত ওই গাড়ির পেছন পেছন গিয়ে স্কুলের বেঞ্চিতে বসে পড়ি। হোলো না। স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে গেল।

স্কুলে গেলাম জীবনে প্রথম স্কুল দেখলাম। সেই বেখুন স্কুল তবে পড়ার নয়। প্রাইজগুলো মেয়েদের হাতে তুলে দিতে। একে একে কৃতী মেয়েরা আমার হাত থেকে তাদের পুরস্কার নিয়ে গেল। সভা শেষে সেদিন আমার এই দুঃখের গল্পটা প্রথম ওদের বললাম: জীবনে সভা কাকে বলে জানতাম না। অথচ প্রথম সভায় গেলাম সভানেত্রী হয়ে। এর আগে এত লোককে বসে মিটিং করতে কখনো দেখিনি শুনিনি মাইক্রোফোনের গলার আওয়াজ। দেখিনি গ্রামও।

—আশ্চর্য তো! তা হলে তারবার যে আপনার গল্প উপন্যাসে গ্রামবাংলার মানুষ প্রকৃতি যে এসেছে। তারপর অন্য মাটি অন্য রঙের আলতায় কারখানা?

—ওসব কল্পনা। জীবনে গ্রাম শহর বলে কখনো কিছু দেখিনি। যা দেখেছি মনে, বাকীটুকু কল্পনার রঙের সঙ্গে মিশিয়েছি আরো রং। অবাক হয়ে ভাবছি—আমার পাশে বসে বাংলা সাহিত্যের একজন পুরুষ ঔপন্যাসিক যিনি প্রথম জীবনে ঘরের বাইরে বেরোননি চলমান পৃথিবীর হাজার আলেখ্যে মুখ দেখেননি। পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত যিনি আদ্যোপান্ত বাংলার পরিচিত চেহারার সলাজ গৃহবধূ। তিনি লিখেছেন আজ পর্যন্ত সব মিলিয়ে প্রায় দেড়শোরও বেশী বই।

—দেড়শো? আরো কিছু বেশী হতে পারে। যাঁর উপন্যাস অনুবাদ হয়ে বেরিয়েছে ইংরেজী হিন্দী মারাঠি উর্দু তামিল তেলেগু ভাষায়। দক্ষিণ ভারতের ভাষার সিনেমা হয়েছে। হয়েছে হিন্দীতে ও বাংলায়।

সাহিত্যে আশাপূর্ণা দেবী চিরযৌবনা। বার্ধক্য ওঁর সাহিত্যকে কখনো স্পর্শ করেনি। আজো লিখে যাচ্ছেন একজন তরুণের মতো। বয়স তাঁর চেয়ে কিছু বেশী। আচার্য সুনীতিকুমার আশাপূর্ণা দেবীকে বলেছেন—বাংলা সাহিত্যের মর্যাদা সম্বন্ধে যাঁহারা সচেতন এবং যাঁহারা এই মর্যাদাকে স্বকীয় প্রতিভা বলে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন আশাপূর্ণা দেবী তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

অন্নদাশঙ্কর রায় বলেছেন—তিনি লব্ধ প্রতিষ্ঠা তো হয়েছেন। প্রতিষ্ঠার চূড়ায় উঠেছেন।

কেউ কেউ আশাপূর্ণা দেবীকে গড়নে-বরনে স্বভাবে পার্ল বাকের সঙ্গে তুলনা করেন।

—কবিতা লিখতেন শুনেছি?

লিখতাম মানে—এখনো লিখি। তবে চুপি।

আমার সামনে বাংলার এক স্বনামধন্যা লেখিকা গল্পে উপন্যাসে কখনো নারীস্বাধীনতার চাপলা প্রশ্রয় দেননি। একজন নিপুণ চিত্রকরের মতো বারবার ফুলদার তুলির টানে রূপায়িত করেছেন সমাজজীবন। বিরাম নেই ৬০—৬৫ বছর ধরে যাঁর সাধনার। বারবার ঘাতকের মতো আঘাত পড়েছে নির্মমতা ও রূঢ়তার। জগদ্দল পাথরের মতো সমাজ বারম্বার সরিয়ে। সেই ঐশ্বর্য পৌরবে জাহ্নবীর মতো গল্প। আর অজস্র কথা দিয়েছে প্রথম প্রতিশ্রুতি। শুধু শ্রেষ্ঠ, নয় লেখিকার নিজেরো প্রিয় উপন্যাস হল—সতীর এই উপাখ্যান। ঊনবিংশ শতাব্দীর সেকেলে পড়া সমাজ এবং তার গতি ছাড়ে মোড়া গোঁড়ামি নারীর প্রথম দিকের হৃদয়পুরবাসিনীদের দীর্ঘশ্বাসের আলেখ্য এই মহাউপাখ্যান নতুন স্বাদে চিত্রিত। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফিলজী প্রথম প্রতিশ্রুতি সুবলালতা বকুলবালা অক্ষয় হয়ে থাকবে চিরকাল।

রাজশেখর বসু তাই তাঁকে শ্রদ্ধেয়া জানিয়ে বলেছেন—'সাধারণ বাঙালীর জীবন গভীর সহবেদনা আর সরল ভাষা এত অসাধারণ কুশলতার সঙ্গে আর কেউ ফোটাতে পারেননি।'

—জানি হয়তো আমার অনেক কিছু দেবার ছিল এই পৃথিবীর পাঠশালার হাজার মুখের মিছিলে কটাই বা স্পষ্ট করে দেখতে পেয়েছি। হয়তো ভুলও কিছু হয়ে গেছে। এই অপেক্ষা জাগে চিরকাল আমার হাতে অতটাই রয়ে গেল।

হায় এই কেননা একজন সৎ সাহিত্যিক আত্মসচেতন সাহিত্যিকেরই বেদনা। এবং সেজন্যেই তিনি এত বড়।

•

এরপর গেলাম সমরেশ বসুর খোঁজে:

—পুজোয় এবার কি লিখছেন? দুটো উপন্যাস। একটা আমার নামে আরেকটা কালকূটের। একেলা আমি ওকেলা কালকূট। দুটোই শিলপ দিয়ে যাচ্ছি। তাছাড়া লিখছি একটা ছোটদের বড় গল্প দেবসাহিত্য কুটিরের জন্যে। আর অনেকটা ছোট গল্প। আমার ছোটদের বড় গল্পটা ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে। কখনো তো ছোটদের জন্যে বড় গল্প তো লিখিনি।

—আচ্ছা, আপনি একসঙ্গে কটা উপন্যাসে হাত দিয়েছেন? সবচেয়ে বেশী ' হল চারটে। —কি করে পুঁছিয়ে হোলেন একসঙ্গে? —না, আমার অসুবিধে হয় না। কারণ চারটে উপন্যাসের প্লট ঘটনা চরিত্র এবং সমাপ্তি—আমার নোট বইয়ে আগে থেকে টোকা থাকে। যাতে ভুলে না যাই।

—কিন্তু পুজোর উপন্যাসগুলো তো পুজোর পরেই বই হয়ে বেরোয়? যা ছাপা হোলো তাই দিয়ে দেন? —হ্যাঁ, একদমই নয়। কারণ কি জানো, পুজোয় সব উপন্যাসই একটা সেনসেশন হয়ে বেরিয়ে যায়। ইচ্ছে করলেও খুব একটা এদলবদল যায় না। তবে জায়গায় জায়গায় ডিটেলসের কাজ আছে, সেটুকু এখন করা হোলো না বটে, তবে পরে করা থাকে। পরে বাড়িয়ে দিই। যেখানে কলপ আটকানো থাকে তাকে খুলে দিই।

—তাতে গোটা উপন্যাসের ঘোল নষ্টে পাল্টে যায় না? —না। কাঠামোটাতো একই থাকে শুধু একটু বাড়তি পোষাক পরিয়ে দেওয়া।

যেটা লিখছেন—তার বিষয় পটভূমি কি নির্বাচন করেছেন?

আমার আগের উপন্যাসের মতো এই সময় মানুষ আর সোসাইটি। পরের চোখ দিয়ে দেখা নয় নিজের দেখা এই অবহেলিত সমাজের জীবন যন্ত্রণা বিষাদ।

—আচ্ছা সমরেশদা আমি একটা কথা বুঝতে পারি না। আপনার আগেকার লেখা পসারিনী জগদ্দল গঙ্গাতেও তো আদি-রসাত্মক অংশ কম ছিল না। দশ-পনেরো বছর আগে সমাজও তো আরো রক্ষণশীল ছিলো। কিন্তু তখন তো 'গেল গেল' রব ওঠেনি। তাহলে এখন এত অশ্লীলতা নিয়ে হৈ-চৈ হয় কেন?

সমরেশ বসু হাসালেন। ইতিমধ্যে টুনি বৌদি এসে চা দিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সহকারী জুড়েছেন — উল্টোপাল্টা লিখেছো কি এবাড়িতে ঢোকা বন্ধ।

লেখার টেবিল থেকে সিগ্রেটের প্যাকেট নিয়ে একটা বের করে ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন লেখক — দাখো শ্লীল অশ্লীল বলে কোনো কোনো পাঠকের এত রাগ এত উষ্মার কারণ কি জানো? এরা অপরের দুঃখ জীবন গোপনতম লজ্জা দেখতে ভালবাসে। কিন্তু যে মুহূর্তে 'ক্যামেরাটা' উল্টো দিকে ঘুরিয়ে ধরা হল তখনই হাহি হাহি রব। কি করে ফুল ফোটে চলবে এই সমাজের বুকের বুকে বাঁসা বেঁধেছে ঘুণপোকা: শিকড়ে শিকড়ে জাঁকিয়ে উঠছে অন্ধকার? জানো, স্তাঁদালের একটা কথা আমার মনে পড়ে। স্তাঁদাল বলছেন—একটা লোক পিঠে আয়না বেঁধে শহরে ঘুরছেন সেখানে অন্যান্য দৃশ্যের সঙ্গে জমা আবর্জনা পাঁকের নর্দমা প্রতিবিম্বিত হচ্ছে। হবেই: তার জন্যে তো আয়নাকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। এর জন্যে দোষী তো স্যানিটারী ইনস্পেকটর তাই না? ফলে এর তো শেষ নেই। যতদিন দৃশ্য আমার মনের ক্যানভাসে আঁকা হয়ে যাচ্ছে তাতো সাহিত্যে প্রতিফলিত হবেই। তার জন্যে এবারও লিখছি নতুন উপন্যাস—যার পটভূমি হল আজকের এই বিধ্বস্ত সমাজ। আজকের জীবন আজকের এই সময়। তাছাড়া দাখো একটা বৃহৎ রচনার কোনো বিশেষ অংশ তুলে ধরে তার সামগ্রিকতা বাদ দিয়ে যে বিচার তা কি বিচার হোলো? যেন সুন্দর শরীর থেকে কেউ সরু দিয়ে অশ্লিলটুকু তুলে নিচ্ছে। যা সুন্দর শরীরে মানিয়ে যায় আলাদাভাবে তা বীভৎস। তাই না?

তুমি রামায়ণেও দেখবে যেখানে রক্তকে শৃঙ্গার আহ্বান করা হচ্ছে। কিংবা ধরো মুক্তারসম্ভবের কথা। যেখানে শিব বিকলন হয়ে পার্বতীর কাছে মিলন প্রার্থনা করছে। পার্বতী বাধা দিচ্ছে পারছে না। অবশেষে খসে পড়লো সমস্ত বাধা। সামনে দাঁড়িয়ে শিব লজ্জায় পার্বতী শিবের চোখদুটোয় হাত চাপা দিয়ে দিলেন। শিব হেসে বললেন—আমার তো ত্রিনয়ন আরেকটা চোখে তো আমি সব দেখতে পাই। ধরো শুধু এই জায়গাটুকুই যদি তুলে নেওয়া যায়। তাহলে? কিন্তু সেটা সাহিত্যবিচার নয়। কেননা তাহলে পৃথিবীর সব ক্লাসিকই অশ্লীল।

শিল্পীর যা বিশ্বাস দৃশ্যমান, জগৎ তাইতো বিধৃত হয়েছে ইজেলে। সাহিত্যের ধর্মই তো তাই। সমরেশ বসু তাই-ই বিশ্বাস করেন। আর এই বিশ্বাসের সোপানে দাঁড়িয়ে একদিকে কালকূট, আরেকদিকে সমরেশ বসু তাঁর পদযাত্রা সুরু করেছেন। যাঁর দুপাশে আউল-বাউল আর মনের দুই বেহুন আছিল ভবের ইস্টিশনে' আর অপরদিকে জীবনের আলো অন্ধকার কলকাতা মানুষ, কুলি আর চটকলের শ্রমিক।

—কখন লেখেন? সব সময়?

—হ্যাঁ! সকাল থেকে দুপুর দুপুর গড়িয়ে বিকেল। সন্ধে হলেই পাট উঠলো। তারপর আর কলম ধরা নেই। —এই চাকরীর মতো রোজ নিয়ম করে কলম ধরতে ভালো লাগে?

—নাঃ রোজ ভালো লাগবে না এটা জানি তবু বসতে হয় মাঝে অফ-মুড হলে আর লিখতে ইচ্ছে হয় না।

সেই কোন সময় থেকে শুধু লেখা সম্বল করে জীবনের পথে পাড়ি দিয়েছেন সমরেশ বসু। সঙ্গে তুলে নিয়েছেন প্রিয় মানুষের মুখ, জীবনে জীবন। জড়িয়ে রেখেছেন বুকের কোটরে ভালবাসা যে ভালবাসার শরিক হয়েছে রেলের ডেডাম বাউন্ডুলে তরুণ বেকার চটকলের শ্রমিক। রাতের অন্ধকারে অপরাধী অন্ধকারের কোনো জীবন। সেই প্রথম জীবনকে সমরেশ বসু আজো ভোলেন নি। যখন প্রথম উপন্যাস যার বাঁধাই ছিল ছিন্নে, তা বুকে লুকিয়ে শেষ ট্রেনে নৈহাটির বন্ধুদের কাছে সেগুলো বিক্রি করে চলে কিনে দোরী বসরের হাতে তুলে দিয়েছেন।

আজ ধাপে ধাপে সেই কলম ছড়িয়েছে মহীরুহের মতো শাখা-প্রশাখা। লক্ষ্মী এসেছে পায়ে পায়ে ঊজ্জ্বল আলোর সংসারে। তাই এত প্রাচুর্যের কোলকাতা আজো ভালো লাগে না সমরেশ বসুর। যেন হাঁপ ধরে যায়। তাই শনিবারের বিকেলের ট্রেনে চলে আসেন নৈহাটির বাড়িতে। সমরেশ বসুর কাছে আসেন পুরনো বন্ধুরা। সেই পুরনো মাটির গন্ধ বুক ভরে নেন।

তাঁর পাশে জেগে থাকে আমার অকাল বৃষ্টি ইতিহাসের সঙ্গে গল্পে জগদ্দল বি টি রোডের ধারে।

সমরেশ বসু এখন তাঁর সৃষ্টির মধ্যাহ্ন-কিরণে ভাস্বর। শান্তিলতা চট্টোপাধ্যায়

CENTRAL LIBRARY

এই বাংলার খবর

টেলিভিশন এলো

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর এই বাংলায় টেলিভিশন এলো, এই বাংলায় মানে আপাতত কলকাতা এবং তার আশে পাশে ৫০ কিলোমিটার এলাকায়। অন্তত কলকাতার চারদিকে ৭৫ কিলো-মিটার পর্যন্ত এলাকায় যাতে ভাগ্যবানদের টেলিভিশন সেটের পর্দায় টালিগঞ্জের টেলিভিশন কেন্দ্র থেকে প্রচারিত অনুষ্ঠান ভেসে ওঠে তার ব্যবস্থাও অল্প দিনের মধ্যে হবে বলে আশা করা হচ্ছে। টালিগঞ্জ থেকে অনুষ্ঠান নিয়ম করে রোজই সন্ধ্যায় তিন ঘন্টা প্রচারিত হবে কিন্তু টেলিভিশন কেন্দ্রটি এখনও পর্যন্ত সাময়িক, যেমন সাময়িক টেলিভিশন টাওয়ারটি। ভূতপূর্ব রাধা ফিল্ম স্টুডিওটি সাময়িক টেলিভিশন কেন্দ্র তৈরি করতে হয়েছে, কারণ গল্ফ কোর্স এলাকার পাকা স্টুডিও তৈরি হতে এখনও দেরি হবে। এখনকার টাওয়ারটিও ছোট, ওটির উচ্চতাও বাড়বে। এমনিতেই টেলিভিশনের গৌরব-তিলক কপালে আঁটার ব্যাপারে পশ্চিমবাংলা বা কলকাতার ঠাঁই হয়েছে পঞ্চম (দিল্লি, বোম্বাই, অমৃতসর, শ্রীনগরের পরে)। পাকা স্টুডিও বা আরো লম্বা টাওয়ারের জন্যে অপেক্ষা করতে হলে পাল্লায় আরো পিছিয়ে পড়তে হতো।

১ আগস্টের পুণ্যলগ্নে কলকাতায় টেলিভিশন অনুষ্ঠান প্রচারের সূচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়। বাংলার যে সব শহীদ দেশের জন্যে আত্মবিসর্জন দিয়েছেন তাঁদের স্মৃতিতে তিনি এই প্রকল্পটি উৎসর্গ করলেন। ১ আগস্টের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে তিনি বললেন, মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ঐ দিনই সুরু হয়েছিল 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন। টেলিভিশন যে শুধু শহরের মুষ্টিমেয় মানুষের মুখ চেয়েই চালু করা হলো না তা তিনি স্মরণ করিয়ে দিলেন। টেলিভিশন চালু করার উদ্দেশ্য সেদিনই সফল হবে যেদিন গ্রামের মানুষের কাছে টেলিভিশন পৌঁছে দেওয়া যাবে। স্কুল-কলেজ-স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানে টি ভি সেট বিতরণের চেষ্টা করবেন সরকার যাতে সাধারণ মানুষ এই অনুষ্ঠান দেখতে পায়। কেন্দ্রীয় তথ্যমন্ত্রী বিদ্যাচরণ শুক্লও উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসেছিলেন। তাঁর ধারণা, গোটা দেশ টেলিভিশনের আওতায় আসতে, এমন দিন বেশি দূরে নয়। কলকাতায় টি ভি সামাজিক পরিবর্তন আনবে, ব্যাপক উন্নয়নের কাজে লাগবে, এই আশা প্রকাশ করেন কেন্দ্রীয় তথ্য উপমন্ত্রী অম্বিকা সিংহ।

মাটির নিচে তেল

কথা ছিল, জুলাই মাসের শেষ তারিখে ২৪ পরগণার বকুল-তলায় মাটির নিচে তেল আছে কিনা তার খোঁজ সুরু হবে। কিন্তু ড্রিল থেকে যাকে বলা হয় 'সবুজ সঙ্কেত' তা পেতে দেরি হলো কয়েক দিন। তাই আগস্টের ১২ তারিখের দুপুরে ১৮৫ ফুট উঁচু রিগ থেকে ইস্পাতের তৈরি ঘনন যন্ত্র মাটি ফুঁড়ে নিচে নামতে সুরু করলো তেলের খোঁজে, যে-তেল এখন সত্যিই 'কালো সোনা।' এই অনুসন্ধানের কাজ চালাচ্ছে সরকারি প্রতিষ্ঠান তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশন (ও এন জি সি)। অনুষ্ঠানের সূচনায় কোনো আড়ম্বর ছিল না, কোনো গণ্যমান্য অতিথির উপস্থিতিও নজরে পড়ে নি। কমিশনের কর্তাব্যক্তিদের আশায়, উৎসব-আড়ম্বর হবে তখন তেলের সন্ধান মিলবে যখন। এ-সবই হয়ত দেশের পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রতিফলন। সব মিলিয়ে তেলের খোঁজ চলবে বছরখানেক ধরে। প্রথমে মাটি, তারপর পাথর ভেদ করে সাড়ে তিন কিলোমিটার পর্যন্ত নিচে নেমে যাবে ঘননযন্ত্র। মাটির তলে তেল বা গ্যাস আছে কিনা, দু কিলোমিটার পর্যন্ত খোঁড়া শেষ না হলে তার কোনো আঁচই পাওয়া যাবে না। খোঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে চলবে পাথর পরীক্ষার কাজ। বিভিন্ন স্তরের পাথর পরীক্ষা করা হবে। অবশ্য রীতিমত ভূতাত্ত্বিক পরীক্ষার পরই তৈল খোঁজার কেন্দ্র হিসেবে বকুলতলাকে বেছে নেওয়া হয়েছে। এখানকার পাথরে হাইড্রোকার্বণ পাওয়া যাবে বলেই তাঁদের ধারণা (এটাই তেল থাকার ইঙ্গিত)। তবু তাঁরা বলছেন, যদি এখানে তেল না-ও মেলে তাতে ভেঙ্গে পড়ার কিছু নেই। এই পরীক্ষা থেকে অনেক মূল্যবান তথ্য পাওয়া যাবে যা ভবিষ্যতে কাজে লাগবে। অনেক বছর আগে মার্কিন স্ট্যান্ডার্ড-ভ্যাকুয়াম কোম্পানি পশ্চিমবাংলার অরেকটা জায়গায় মাটির নিচে তেলের খোঁজ করে। সে চেষ্টা সফল হয়নি। বছর সাতেক আগে কানিংয়ের বোদরায় ও এন জি সিই আর একবার তেল খোঁজার চেষ্টা করে। কিন্তু সে-চেষ্টা পরিত্যক্ত হয়।

পরীক্ষার ফল

স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার ফল যে রকম হতাশব্যঞ্জক হয়েছিল তারপর হায়ার সেকেণ্ডারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণের হার কী দাঁড়াবে তা নিয়ে চিন্তা ছিল অনেকেরই। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, এই হার একশ' জনে ৫৯ জনের মতো। গত বছরের তুলনায় শতকরা এক-ভাগের কিছু বেশি। পরীক্ষার্থীর মোট সংখ্যা ছিল এক লাখ ৫৯ হাজারের বেশী। বিভিন্ন শাখার সাফল্যের হিসেব এই রকম : বিজ্ঞানে প্রতি একশ জনে ৭২, বাণিজ্যে ৫৬, মানবিক বিদ্যায় ৫২, ফাইন আর্টসে ৫৮, কৃষিতে ৫১, কারিগরি বিভাগে ৪৯ এবং হোম সায়েন্সে ৫০ জন। প্রথম বিভাগে ঠাঁই পেয়েছে ২৯৭০ জন, দ্বিতীয় বিভাগে ২০,২৪২ জন, তৃতীয় বিভাগে ৪৫,৫০৬ জন। তা ছাড়া কোনো বিভাগ না-পেয়ে শুধুই উত্তীর্ণের সংখ্যা ১১,০৬৭ জন। রাজ্যের বিভিন্ন এলাকার ফলাফলের বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, বর্ধমান এলাকার ফলই সবচেয়ে ভালো। সব গ্রুপ মিলিয়ে বর্ধমান এলাকায় উত্তীর্ণের হার শতকরা ৬০ ভাগের কিছু বেশি। তুলনায় উত্তরবঙ্গের উত্তীর্ণের হার সবচেয়ে কম—একশ জনে ৪১ জনের মতো। কলকাতা এলাকায় উত্তীর্ণের হার একশ জনে ৬০ এবং মেদিনীপুরে ৫৯ জন। প্রতি বছর যেদিন ফল প্রকাশিত হয় সেদিনই বিভিন্ন শাখার শীর্ষস্থান অধিকারীদের নামও ঘোষণা করে দেওয়া হয়। এবার তা হয় নি। কারণ মূল্যায়ন পর্ষদ ঠেকে শিখছেন। গতবছর শীর্ষস্থান অধিকারীদের যে তালিকা প্রথম প্রকাশিত হয় তা একবার নয়, দুবার সংশোধনের দরকার হয়। এর ফলে অনেক পরীক্ষার্থীর ভাগ্যের হেরফের ঘটে। এবার তাই প্রথম দশ জনের খাতা আবার ভালোভাবে পরীক্ষা করার পর শীর্ষস্থান অধিকারীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে।

১৪-৮-৭৫

দেবব্রত

বিদেশের কথা

আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট মারিয়া এস্টেলা ওরফে ইসাবেলিটা পেরন এক মাসের প্রথে ভেনিজুয়েলা তাঁর মন্ত্রিসভার পুনর্গঠন করেছেন। এবারকার রদবদলের মধ্যে সবচেয়ে বড় ব্যাপারটা হল, নতুন মন্ত্রিসভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে এসেছেন সামরিকবাহিনীর একজন অফিসার। ১৯৭০ সালের মার্চ মাসে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আর্জেন্টিনায় যে সামরিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তারপর এই প্রথম আর্জেন্টিনার সরকারে একজন সৈন্যবাহিনীর অফিসারের স্থান হল।

রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকে সেই ক্ষমতা আবার ফিরে পাওয়ার চমকপ্রদ দৃষ্টান্ত একবা রেখে গিয়েছিলেন ইসাবেলিটার স্বামী জুয়ান পেরন। ১৭ বছর নির্বাসনে কাটিয়ে ৭৮ বছর বয়সে জুয়ান পেরন তাঁর স্বদেশ আর্জেন্টিনায় ফিরে এসেছিলেন সৈন্যবাহিনীর নেতাদের কাছ থেকে শাসন-ক্ষমতা পুনরায় গ্রহণ করার জন্য। জুয়ান ফিরে আসবার এক বছরের মধ্যেই প্রশ্ন উঠেছে তাঁর প্রাক্তন প্রাইভেট সেক্রেটারি ও তৃতীয় পত্নী, একসময়ের কাবারে নর্তকী ও প্রেসিডেন্টের স্নেহ তাঁর উত্তরাধিকারিণী ইসাবেলিটা কি মিলিটারীর হাতেই ক্ষমতা ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হবেন?

জুয়ান পেরন বেঁচে থাকতেই তাঁর স্ত্রীকে তাঁর উত্তরাধিকারিণী করে গিয়েছিলেন। জুয়ান পেরন ছিলেন প্রেসিডেন্ট আর ইসাবেলিটা পেরন ভাইস-প্রেসিডেন্ট। গত বছর ১ জুলাই জুয়ান মারা গেলে প্রেসিডেন্টের পদ গিয়ে বসলেন ইসাবেলিটা। এই প্রথম পৃথিবীর কোন রাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট হলেন একজন নারী। একজন প্রাক্তন ক্যাবারে নর্তকীর পক্ষে এমনভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতায় চড়ার আরোহণ করা একটা বিরল ঘটনা। ১৯৫২ সালে জুয়ান পেরনের সঙ্গে ইসাবেলিটার প্রথম দেখা হয়। জুয়ান পেরন তখন সদ্য স্বদেশ থেকে নির্বাসিত, তাঁর দ্বিতীয় পত্নী ইভা ওরফে এভিতা কয়েক বছর আগে মারা গেছেন। প্রথম সাক্ষাৎকারের পরেই জুয়ান ইসাবেলিটাকে তাঁর সেক্রেটারির পদে নিযুক্ত করেন। ১৯৬২ সালে তাঁরা বিয়ে করলেন। জুয়ানের বয়স তখন ৬৭ আর ইসাবেলিটার ৩১। এভাবে গত ২০ বছর ধরে জুয়ানের পাশে পাশে থেকে ইসাবেলিটা রাজনৈতিক ক্ষমতার সিঁড়ি বেয়ে ক্রমাগত উপরে উঠেছেন।

ইভা পেরনও এক সময়ে আর্জেন্টিনার রাজনীতিতে একটা বড় নাম হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু ইসাবেলিটার সঙ্গে তাঁর তফাৎ এই যে, ইভা নেতৃত্ব পেয়েছিলেন নিজেরই জোরে। পেরনিস্ট আন্দোলন গড়ে তুলতে জুয়ানের তুলনায় ইভার অবদান কম খাটো ছিল না। আর্জেন্টিনার শ্রমিকদের তিনি যেন যাদু করে রেখেছিলেন। হাত পত্নীর নেতৃত্বের এই জোরালো ডিটেক্টাটা ইসাবেলিটার নেই।

তার উপর আবার ইদানীং নানা কারণে প্রেসিডেন্ট ইসাবেলিটা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন। শ্রমিক সংগঠনের সঙ্গে সরকারের সম্পর্ক ভাল যাচ্ছে না। শ্রমিকদের বেতন বাড়ানোর আড়াই গুণ পর্যন্ত করা হবে বলে শ্রমিক সংগঠনের সঙ্গে মালিকদের একটি চুক্তি হয়েছিল। এদিকে আর্জেন্টিনায় প্রচণ্ড মুদ্রাস্ফীতি চলছে। এর মধ্যে শ্রমিকদের বেতন এক লাফে এতখানি বেড়ে যাওয়া ঠিক হবে না বলে ইসাবেলিটার সরকার শ্রমিকদের বেতনবৃদ্ধির হার ৫০ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার হুকুম দিলেন। এতেই বিস্ফোরণ পাকিয়ে উঠল। কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠন জেনারেল কনফেডারেশন অব লেবার (সি জি টি) সরকারি হুকুমের প্রতিবাদে ৪৮ ঘণ্টাব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিল। ধর্মঘটের পর শ্রমিকদের কাছে নতিস্বীকার করে ইসাবেলিটা সরকারি হুকুম রদ করে দিলেন।

ইসাবেলিটাকে আরও একটা অপ্রিয় কাজ করতে হল। তাঁর মন্ত্রিসভা থেকে সমাজকল্যাণমন্ত্রী জোস লোপেজ রেগাকে সরিয়ে দিতে হল। এই জোস লোপেজ রেগা লোকটিকে বলা চলে ইসাবেলিটার শনি। ১৯৬২ সালে এই রেগা ছিলেন আর্জেন্টিনার পুলিশবাহিনীর একজন কর্পোরেল। ইসাবেলিটার মতো তাঁরও আর্জেন্টিনার রাজনীতিতে উত্থান হয়েছে ধূমকেতুর বেগে। প্রথমে মাদ্রিদে নির্বাসিত পেরনের প্রাইভেট সেক্রেটারি, পেরন প্রেসিডেন্ট হওয়ার পরও তিনি একই সঙ্গে তাঁর মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্য ও প্রাইভেট সেক্রেটারি হিসাবে কাজ করে গেছেন। প্রেসিডেন্ট ইসাবেলিটার প্রাইভেট সেক্রেটারির কাজও তিনিই করছিলেন। অত্যন্ত ক্ষমতাশালী মানুষ হিসাবে তিনি কুখ্যাতি লাভ করেছেন, তিনি নাকি জ্যোতিষ ও অন্যান্য গুপ্তবিদ্যার চর্চা করে থাকেন। এইসব কারণে ও প্রেসিডেন্ট ইসাবেলিটার উপর তিনি যে প্রভাব বিস্তার করেছেন, সেজন্য আর্জেন্টিনার মানুষ তাঁকে 'এল ব্রুজো (ব্ল্যাকবার্ড) ও রাসপুটিন নামে অভিহিত করে। তাঁর পদত্যাগ দাবি করে যে আওয়াজ উঠেছিল, সেটা ইসাবেলিটাকে মেনে নিতে হয়েছে। রেগা পদত্যাগ করে দেশ ছেড়ে চলে গেছেন।

ইসাবেলিটার ক্ষমতার আসন এখন রীতিমতো টলমল করছে। পেরনিস্ট আন্দোলন এখন ছিন্নভিন্ন। যে শ্রমিক সংগঠনকে জুয়ান পেরন একদিন 'পেরনিস্ট আন্দোলনের মেরুদণ্ড' বলে বর্ণনা করেছিলেন, তার সঙ্গে ক্ষমতাসীন দল জাস্টিসিয়ালিস্ট পার্টির চরম বিরোধ। দেশে প্রচণ্ড অর্থনৈতিক সংকট চলছে। উগ্রপন্থী মনটোনেরো দল আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে। সম্প্রতি একটি সাংবাদিক সম্মেলনে এই মনটোনেরো দল জানিয়েছে আর্জেন্টিনার একটি বড় ব্যবসায় সংস্থার মালিক দুই ভাইকে আটকে রেখে তারা মুক্তিপণ হিসাবে নগদ ৬ কোটি ডলার ও আরও ১২ লক্ষ ডলারের খাদ্য ও কাপড়-চোপড় আদায় করেছে। ঐ টাকা দিয়ে তারা অস্ত্রশস্ত্র কিনবে ও নিজেদের অস্ত্র-কারখানা তৈরী করবে।

১২-৮-৭৫

পুণ্ডরীক

শ্রীভূমি প্রকাশিত দুইটি জ্ঞানগর্ভ গবেষণা গ্রন্থ

রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ—একজন কবি, অন্যজন সেবী—দুজনেরই কর্মক্ষেত্র পৃথক। একজন গৃহী, অন্যজন সন্ন্যাসী—দুজনের রুচিও পৃথক। কিন্তু তাঁদের চিন্তাধারা? ভাববারা? তাও কি পৃথক? এই জটিল প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে

ডঃ আশিতাভকুমার মজুমদারের

চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ ১৮·০০

রবীন্দ্রনাথের ক্লাসিক কবিতা ও তার ভাবার্থ বুঝতে হলে চাই

অশোক সেনের

রবীন্দ্র কাব্য পরিক্রমা ১০·০০

স্বল্প সাবলীল ভাষা আর বিশ্লেষণে একটি অপূর্ব গ্রন্থ।

শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী । ৭১ মহাত্মা গান্ধী রোড । কলিকাতা-৯

CENTRAL LIBRARY

UNIVERSITY

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

: পাশা, আবেদীন প্যালেসে আমাদের একজন লোকের দরকার, আজ থেকে তুমি হবে আমাদের সেই লোক। না না, তোমাকে আর পাশা বলে ডাকব না। তাহলে তোমার প্রকৃত পরিচয় বেরিয়ে পড়বে। আজ থেকে তোমার কভার নাম হোল 'লাকি শ্যাইক।'

: 'লাকি শ্যাইক'! আমার এই ছোট্ট প্রশ্নে ছিল বিস্ময়।

: হ্যাঁ, লাকি শ্যাইক হোল তোমার কোড নেম। ইন্টেলীজেন্স সার্ভিসের খাতায় তোমার এই নাম লেখা থাকবে।

আবেদীন প্যালেসে প্রতিদিন কি ঘটনা ঘটছে তার পুরো বিবরণী তুমি আমাদের কাছে পাঠাবে, আর কখনও যদি দেখ যে কারুকে রাগে উত্তেজনায় মুসলিম ব্রাদারহুডকে বে-আইনী বলে ঘোষণা করবার চেষ্টা করছেন তাহলে তুমি তার সেই প্রচেষ্টায় বাধা দেবে। যদি হাসান বান্নাকে গ্রেপ্তার করবার হুকুম দেন তাহলে তুমি সেই খবর আমাদের দেবে।

জানিনে কেন ফস করে আমার মুখ দিয়ে একটি কথা বেরিয়ে গেল : ধরুন যদি আমি আপনাদের নির্দেশানুযায়ী কাজ না করি?

আমার কথা শুনে প্রথমে স্যাম্পসন হাসলেন। তারপর তার মুখ দৃঢ় হোল। বললেন, না, তুমি আমাদের সঙ্গে বেইমানী করতে পারবে না। পাশা, আমাদের সঙ্গে বেইমানী করে কেউ রেহাই পায় নি। তুমিও নিষ্কৃতি পাবে না, একটা কথা মনে রেখ। তোমাকে যেন বার বার এই নির্দেশের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে না হয়।

CENTRAL LIBRARY

আমি মাথা নেড়ে সম্মতি জানালুম। স্যাম্পসন আমাকে আরও বললেন : পাশা, এই শহরে কায়রোই একমাত্র ইংরেজ বিদ্বেষী নয়। আর একটা লোককে আমাদের তীক্ষ্ণ নজরে রাখতে হবে। না না, লোকটা অতি ধূর্ত, বুদ্ধিমান। ওকে সহজে ধরবার উপায় নেই।

: পাশা সব কিছু করতে পারে? বলুন না লোকটির নাম কি?

স্যাম্পসন আমার প্রশ্ন শুনে খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর গম্ভীর কণ্ঠে বললেন : লোকটির নাম হোল আনোয়ার একস।

: আনোয়ার একস? আমার কণ্ঠে ছিল বিস্ময় আর উত্তেজনা।

: তুমি ওকে চেনো নাকি? স্যাম্পসন প্রশ্ন করে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

কিন্তু আমি এর কি জবাব দেব ভেবে পেলাম না। আমি কি আনোয়ার একসকে চিনি? না,হ্যাঁ! ওকে আমি নিজের চোখে দেখি নি বটে, তবে প্রসাদ এবং আনতানিও পুলির কাছে আনোয়ার একস-এর নাম শুনেছিলুম।

আর শুনেছিলুম আমার নাইট ক্লাবের গার্ল ফ্রেন্ড হিকমত ফাহামির কাছে। হয়ত আনোয়ার একস-এর আসল পরিচয় দিতে গেলে আমাকে হিকমত ফাহামির ভাষায় এক একটা গল্প বলতে হবে। আমি চট করে স্যাম্পসনের কথার কোন জবাব দিলুম না। কারণ আজ আমি স্যাম্পসনের মুখে আনোয়ার একস-এর কথা শুনে স্যাম্পসনের চরম পরিচয় পেলুম। বেলী ডান্সার হিকমত ফাহামী আমাকে বলেছিল : পাশা, এই কায়রো শহরে দুজন বুদ্ধিমান লোক আছে। একজন হলেন ব্রিটিশ ইন্টেলীজেন্স অফিসার স্যাম্পসন, আর একজন আনোয়ার একস। আমি ক্ষণিকের জন্যে অন্যমনস্ক হলুম। আমার মন চলে গেল আর এক যুদ্ধে, আর এক রাত্রে।

১৯৪১-৪২ সাল, কায়রো শহর।

কায়রোর শহরতলী হোল সাহারা সিটি। এই শহরতলীতে মরুভূমির উপর তাঁবু টাঙিয়ে সাহারা সিসিট নাইট ক্লাব তৈরী করা হয়েছে। সাধারণ মানুষ এই নাইট ক্লাবে ঢোকার সুযোগ পায় না, শুধুমাত্র ইংরেজ সৈন্যবাহিনীর জন্যে সংরক্ষিত হোল সাহারা সিটি নাইট ক্লাব।

হিকমত ফাহামীর রূপের কথা আর নাই বা বললুম। হিপ্পিছিপে, পাতলা ছোখে সুর্মা-কাজল এবং একটি সুক্ষ্ম গড়ন পরে হিকমত ফাহামী যখন নাচের আসরে এসে দাঁড়াতেন তখন জনতা প্রায় উন্মত্ত হয়ে উঠত। না, হিকমত ফাহামী শুধুমাত্র সুন্দরী ছিল না, সে ছিল মধ্যপ্রাচ্যের একজন প্রতিভা বেলী ডান্সার। সেকালে তার সমকক্ষ বেলী ডান্সার আর কেউ ছিল না। প্রতিদিন রাত্রে হিকমত ফাহামী এই সাহারা সিটি নাইট ক্লাবে নাচত আর বড় বড় ইংরেজ আর্মি অফিসারদের সঙ্গে বসে চুটিয়ে প্রেম করত। কিন্তু এই সব অফিসাররা হিকমত ফাহামীর একটি পরিচয় জানত না। হিকমত ফাহামী ছিল জার্মান স্পাই।

সময়টা উল্লেখযোগ্য।

জার্মান জেনারেল রুমেল এসে মিশরের সোরে সৈন্যবাহিনী নিয়ে দাঁড়িয়েছেন। মিশরের দুটি বড় শহর মারসা মাথরু ও এল আলামাইনের পতন হয়েছে। যে কোন মুহূর্তে রোমেল তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে মিশরের বন্দর আলেকজান্দ্রিয়া এবং কায়রো শহর আক্রমণ করতে পারে। রোমেলের অগ্রগতি সমস্ত জগতকে স্তম্ভিত করেছে। ইংরেজ সরকার বিচলিত এবং চিন্তিত। কারণ জার্মান সৈন্যবাহিনী যদি কায়রো শহর দখল করে নিতে পারে তাহলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যাবে।

ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর বড় কর্তা অকিনলাক আলেকজান্দ্রিয়া কায়রো শহরকে এই আক্রমণের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে নতুন পরিকল্পনা করছেন। সেই পরিকল্পনার প্রতিটি সংবাদই গোপনীয় এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই পরিকল্পনার খবর জেনারেল রোমেলের চাই-ই চাই।

রোমেল এবার জার্মান ইন্টেলীজেন্স সার্ভিসের প্রধান কর্মকর্তা এডমিরাল কানারীর শরণাপন্ন হল। কায়রো শহরে প্রতিদিন কি ঘটছে তার খবরাখবর চাই। সে কানারীকে অনুরোধ করল কায়রো শহরে আমাদের বিশ্বস্ত লোক পাঠাতে হবে। তারা কায়রো থেকে ওয়ারলেস মারফত এই খবর আমলকে দেবে।

এডমিরাল কানারী কায়রো শহর থেকে খবর সংগ্রহ করবার জন্যে দুজন বিশ্বস্ত স্পাইকে পাঠাল। এই দুই স্পাইর নাম হোল হান্স এপলার এবং পিটার মনকস্টার। এপলার এবং মনকস্টারকে নির্দেশ দেয়া হোল, যেন কায়রো শহরে গিয়ে তারা জার্মান এজেন্ট হিকমত ফাহামী এবং আনোয়ার একস-এর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে।

হিকমত ফাহামী হলেন সুন্দরী বেলী ডান্সার, আর আনোয়ার একস হলেন তার বন্ধু এবং ঘোরতর ইংরেজ বিদ্বেষী।

এপলার অনর্গল আরবী ভাষা বলতে পারত। তার কারণ তিনি ছেলেবেলায় কায়রো শহরে কাটিয়েছেন। শৈশব কাটিয়ে এপলার যখন যৌবনে পা দিলেন তখন সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করল। আর তার নাম হোল : হুসেন গফর। কিন্তু যেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হোল হুসেন গফর আবার তার শৈশবের নাম গ্রহণ করে জার্মান সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিল।

এপলার তার বালাজীবনের বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখত। এই বালাজীবনের সঙ্গীদের মধ্যে আনোয়ার একস ছিলেন একজন। এডমিরাল কানারীর নির্দেশ পেয়ে এপলার গোপনে আনোয়ার একস-এর কাছে খবর পাঠালেন : আমি আসছি, তৈরী থেকো।

এডমিরাল কানারী এপলার অপারেশনের কোড নাম দিলেন : অপারেশন কেওস। ঠিক হোল এপলার এবং তার সহকর্মী সাহারা মরুভূমি অতিক্রম করে ব্রিটিশ ইন্টেলীজেন্স সার্ভিসের চোখে ধুলো দিয়ে কায়রো শহরে গিয়ে পৌঁছবে। আর একবার কায়রো শহরে গিয়ে পৌঁছলে এপলারের পরিচয় কে আর জানতে পারবে। এপলার হবেন হুসেন গফর, শুধুমাত্র আরব নয়—ইজপশিয়ান।

কায়রো নীল নদীর পাশে হোল গেরিল ক্লাব। প্রতিদিন এই ক্লাবে আড্ডা দিতে আসেন বড় বড় ইজপশিয়ান এবং ব্রিটিশ আর্মি অফিসার। এই গেজিরা ক্লাবের পাশে আনোয়ার একস-এর একটি ছোট ফ্লাটস বোট ভাড়া নিলেন। তাতে বসানো হোল ওয়ারলেস ঠিক হোল প্রতিদিন রাত্রে হিকমত ফাহামী এবং আনোয়ার একস ইংরেজ সৈনাদের কাছ থেকে মূল্যবান খবর সংগ্রহ করবেন। আর এপলার এই সব খবর কোড ভাষায় রোমেলের হেড কোয়ার্টারে পাঠাবেন।

একদিন ব্রিটিশ কউন্টার ইন্টেলীজেন্স বিভাগ জানতে পারল যে কায়রো শহর থেকে গোপনে খবর ট্রান্সমিট করা হচ্ছে। কি খবর? কে পাঠাচ্ছে তার কোন হদিস কাউন্টার ইন্টেলীজেন্স জানতে পারল না। শুধু তারা ডাইরেকশনাল কাইন্ডার যন্ত্রযোগে জানতে পারল যে প্রতিদিন রাত বারোটার সময় নীল নদীর প্রান্ত গেজিরা ক্লাবের এলাকা থেকে এই খবর পাঠানো হচ্ছে। ব্রিটিশ ইন্টেলীজেন্স বিভাগ এই খবর পেয়ে বিচলিত হল। তারা জানবার চেষ্টা করল, কে ওয়ারলেসে এই গোপন খবর পাঠাচ্ছে। কায়রো শহরে কোন জার্মান স্পাই কাজ করছে?

রোমেলের দ্রুত আক্রমণ কায়রো শহরে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। সবার মনে দৃঢ় ধারণা ছিল, যে কোন মুহূর্তে কায়রো শহরের পতন হতে পারে। ব্রিটিশ আর্মির কর্তারা তাদের গোপনীয় কাগজপত্র পোড়াতে শুরু করেছিল। শুধু তাই নয়, বাজার ব্রিটিশ কারেন্সীর দাম কমে গিয়েছিল। সবার বক্তব্য হোল, কি হবে ব্রিটিশ পাউন্ড রেখে। আজ বাদে কাল তাদের জার্মান মার্ক মুদ্রা ব্যবহার করতে হবে।

এমনি সময় ব্রিটিশ ইন্টেলীজেন্স সার্ভিস আর একটি মূল্যবান খবর জানতে পারল। কায়রো শহরে অতি অল্প দামে ব্রিটিশ পাউন্ড বিক্রি করা হচ্ছে। খবরটা অতি গুরুত্বের, কারণ এইভাবে ব্রিটিশ মুদ্রা কালো বাজারে অল্প দামে বিক্রি করলে মুদ্রার দাম কমে যাবে এবং ব্রিটিশ সরকারের মর্যাদায় হানি হবে।

ব্রিটিশ সরকার বিচলিত হল। কায়রোর ব্রিটিশ এম্বাসীতে নির্দেশ গেল তদন্ত করে দেখো অল্প দামে ব্রিটিশ মুদ্রা বিক্রি করছে কে?

ব্রিটিশ ইন্টেলীজেন্স অফিসারেরা খোঁজ নিয়ে জানতে পারল যে, এক সুপুরুষ ভদ্রলোক প্রতি রাত্রে সাহারা সিটি নাইট ক্লাবে যান। আর তিনি প্রতি রাত্রেই এই নাইট ক্লাবে প্রচুর টাকা মদ এবং মেয়েদের পেছনে খরচ করেন।

কিন্তু নাইট ক্লাবে প্রতি রাত্রে অর্থ ব্যয় করা আপত্তিজনক কিছু নয়।

ইন্টেলীজেন্স অফিসার এই তিনটি ব্রিটিশ পাউন্ড সম্পর্কে

র মনে সন্দেহ জাগল। আচ্ছা, লগুলো সাচ্চা মাল তো? জাল হতে পারে। নোটগুলো লন্ডনে ইংলাণ্ডের কাছে পাঠানো হোল। তের মধ্যে ব্যাঙ্কের কর্তারা ৎ অফিসারদের কাছে খবর

তাদের সন্দেহ অমূলক নয়.

করেছেন ব্রিটিশ পাউন্ড নোট জাল। এই ধরনের জাল ভুয়ো নোট বাজারে ছাড়ায় জনসাধারণের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করা হচ্ছে।

আমির অফিসার ইউনিট অবার ইন্টেলীজেন্স অফিসারদের কাছে খবর পাঠাল : নিয়মিত দুটিন মাফিক কয়েকার তারপর স্পাই প্লেনে করে গোপালের হেড কোয়ার্টারে খবর পাঠাচ্ছে। কি ধরনের খবর? অফিসার ইউনিট এর কোন সঠিক

করার নিতে পারল না। কার পাঠাবার সময় কোড ব্যবহার ব এই কোডের অর্থ উদ্ধার

তবে এক সময় কোডের

একদিন একজন ব্রিটিশ ই অফিসারকে তারই এক সহ দেয়া বাদ অফিসারের ব দাঁত মাজা তুলে নিজেন। বই

ঠিক যে তেলটি আমি চাই !

সংসারের ঝাটুনির পর
মাথায় একটু তেল মেখে স্নান
করে উঠলে সব ক্লান্তি যেন দূর
হয়ে যায়—তবে তেলটি এমন
হওয়া চাই যার মনোরম
গন্ধ দিনভোর আমায় সতেজ
ও ঝরঝরে রাখবে—
আর তাই আমার পছন্দ
মৃদু সুবাসিত

কেয়ো-কার্পিন

কেয়ো-কার্পিনে চুল
চটচটে হয় না।

ডে'জ মেডিক্যালের তৈরী।

PK/DM/KO-878

দিয়ে সহকর্মী বললেন, বস, আমি এই বইটি কোথায় পেয়েছি জানো?

ইনটেলীজেন্স অফিসার ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন কোথায়?

সেই প্রশ্নের জবাব থেকে কী ভাষায় গোপন-খবর পাঠানো হচ্ছে সেই খবর জানা যাবে, একথা তিনি একেবারে কল্পনাও করেননি। বইটা পাওয়া গেল এক জার্মান বন্দীর কাছে। অথচ আশ্চর্য, বন্দী একটিও ইংরেজী শব্দ বলতে পারে না। বলতো এই ইংরাজী বইটি নিয়ে জার্মান সৈনিকটি কী করছিল?

ইনটেলীজেন্সী অফিসার এই জবাব থেকে যেন কোড উদ্ধার করার একটা সূত্র খুঁজে পেলেন বেবেকো। ইংরেজী বই অথচ একজন জার্মান সৈনা এই বই নিয়ে কী করছিল।

তিনি বইটি আবার ভালো করে নেড়ে-চেড়ে দেখলেন। হঠাৎ দেখতে পেলেন যে বই-য়ের জ্যাকেট থেকে বইটির মূল্য রবার দিয়ে উঠিয়ে দেয়া হয়েছে।

অর্থাৎ বইটি বিদেশে কোথাও বিক্রি করা হয়েছে। নইলে লন্ডনের দোকানের দাম মুছে দেয়া হবে কেন।

কোথায় বিক্রি করা হয়েছে? একটি খুব জোরদার লেন্স দিয়ে দেখা গেল যে বইটিতে খুব ক্ষীণ পেন্সিল দিয়ে লেখা আছে : দাম পঞ্চাশ এসকুডস।

এসকুডস হোলো পর্তুগালের মুদ্রা। অর্থাৎ বইটি পর্তুগালের কোন দোকানে বিক্রি করা হয়েছিল।

কায়রোর ব্রিটিশ ইনটেলীজেন্স অফিসার এবার পর্তুগালে তার এক সহ-কর্মীর কাছে টেলীগ্রাম পাঠালেন। বিদেশে যেখানে ইংরাজী ছাড়া বলা হয় না সেখানে ইংরাজী গল্পের বই বা উপন্যাস খুবই কম বিক্রি করা হয়। অতএব যে এই বই কিনেছে, দোকানী তাকে নিশ্চয় চিনতে পারবে কিংবা তার পরিচয় দিতে পারবে।

পর্তুগাল থেকে পাল্টা জবাব এল : গত তিন সপ্তাহের মধ্যে লিসবনের জার্মান এজেন্সী ছয় কপি রেবেকা বইটা কিনেছে।

ব্রিটিশ ইনটেলীজেন্স অফিসার বুঝতে পারল যে কায়রোর জার্মান স্পাই এই রেবেকা বইটি কোড মেসেজের হিসেবে ব্যবহার করছে।

মনিটারিং ইউনিট আবার খবর দিল : স্পাই কায়রোর কোন অঞ্চল থেকে খবর পাঠাচ্ছে বলা সম্ভব নয়। কারণ সে প্রতি মিনিট ওয়েভলেংথ সেটের কৃস্টাল পাল্টাচ্ছে এবং ওয়েভলেংথ পরিবর্তন করছে। অতএব ট্রান্সমিশনের সঠিক জায়গা জানা যায়নি। শুধু তাই নয়, মনিটারিং ইউনিট বলল যে, বর্তমানে জার্মান স্পাই কোন মূল্যবান খবর পাঠাচ্ছে না। কারণ খবর পাঠালে রমেলের হেড কোয়ার্টার রিপিটিশন চাইত এবং প্রতিটি সংবাদের স্ল্যাশড সংখ্যা দিত।

অনেক চেষ্টা করেও বেশ কিছুদিন এই কোডের রহস্য ভেদ করা গেল না।

সাহারা সিটি নাইট ক্লাব। সিগারেটের ধুয়োয় ঘর আচ্ছন্ন। কেউ কফা তালাকের সিগারেট খাচ্ছে, আবার কেউ বা হ্যাভিনস খাচ্ছে। হঠাৎ একদিন ব্রিটিশ ইনটেলীজেন্স অফিসার দেখতে পেল যে একজন অল্প বয়সের লোক ব্রিটিশ পাউন্ডের নোট দিয়ে সিগারেট বানিয়ে খাচ্ছেন।

: লোকটি কে?

: বারম্যান ছোট্ট জবাব দিল : উনি তো প্রতিরাত্রেই আমাদের বারে আসেন। কথাবার্তা শুনলে মনে হয় উনি মিলিটারী কনট্রাকটর। ওঁর পকেটে অঢেল টাকা।

: এর সঙ্গে আমার একটু আলাপ পরিচয় করিয়ে দেবে কি? ব্রিটিশ ইনটেলীজেন্স অফিসার তার নিজের পরিচয় গোপন করে বলল : আর এই প্রশ্ন করবার সময় সে বারম্যানের হাতে একটি পাঁচ পাউন্ডের নোট গুঁজে দিল।

বারম্যান একবার হাতের নোটটির প্রতি তাকালো আর একবার ব্রিটিশ ইনটেলীজেন্স অফিসারের দিকে তাকাল। তারপর একটু উৎসাহিত হয়ে বলল নিশ্চয়। গফর এদিকে নোন। বারম্যান সংগ্রহের ভদ্র লোকের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল : তোমাকে আমার এক বন্ধুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। মিঃ স্মিথ : না, না আমার নাম ব্রিটিশ ইনটেলীজেন্স অফিসার প্রতি-বাদ করবার চেষ্টা করলো।

: আমার নাম হুসেন গফার.....আমি হলুম মিলিটারী কনট্রাকটর। বেশ পরিষ্কার স্পষ্ট আরবী ভাষায় হুসেন গফার তার দুই হাত বাড়িয়ে জবাব দিল।

তার আরবী শুনলে কারু মনে কোন সন্দেহ হবে না যে লোকটি ইংরেজশিবরান নয়।

: আপনার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করে সুখী হলুম ইনটেলীজেন্স অফিসার বললেন।

: আমিও সুখী হলুম। হুসেন গফারের মুখে ছিল হাসি। আপনি কী করেন?

: প্রফেসর, ইংলান্ডে আরবী ভাষা শেখাই। ইনটেলীজেন্স অফিসার বিশুদ্ধ আরবী ভাষায় জবাব দিল।

: লাইক গার্লস সুন্দরী মেয়ে? হুসেন গফার হেসে জিজ্ঞেস করলেন।

ব্রিটিশ ইনটেলীজেন্স অফিসার বুঝতে পারলেন যে এই মাছ ধরতে হলে জলে নামতে হবে। আর প্রতিটি কথার এমন জবাব দিতে হবে যেন হুসেন গফারের মনে একটুও সন্দেহ না হয়।

: কী যে বলেন। সুন্দরী মেয়ে কার না ভালো লাগে?

: স্টেজে যে মেয়েটি নাচছে, ওর সঙ্গে আলাপ করবেন? হুসেন গফার আবার কৌতূহলী কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন।

: কী যে বলেন। উনি তো হিকমত ফাহামী। আমি তো শুনেছি যে ওর সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে শহরের বড় বড় কর্তারা আমির ওমরাহ তাবড় তাবড় জেনারেলরা ঝাপটি মেরে বসে আছে। আমি কি ওর সঙ্গে আলাপ করতে পারবো?

: নিশ্চয় পারবেন। হুসেন গফার তার নতুন বন্ধুকে উৎসাহ দিয়ে বললো : হিকমত হোল আমার ডিয়ারেস্ট ফ্রেন্ড।

কিন্তু হিকমত ফাহামী যেন বিপদের গন্ধ পেল।

ব্রিটিশ ইনটেলীজেনস অফিসারের মুখের দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে গম্ভীরস্বরে জিজ্ঞেস করলেন : বলুন তো এর আগে আপনাকে কোথায় দেখেছি? আপনার মুখটি আমার কাছে বিশেষ পরিচিত।

: কী যে বলেন আমি সদা কায়রো শহরে এসেছি। এখানে এসে আপনার কথা কত শুনলুম। সবাই বলে আপনি হলেন মধ্য প্রাচ্যের বিখ্যাত বেলী ডানসার।

হয়তো এই স্তুতিবাক্যে হিকমত ফাহামী বিশেষ সন্তুষ্ট হল। সে এবার হুসেন গফারের পানে তাকিয়ে বলল : গফার চল আমরা হাউস বোটে ফিরে যাই। ওখানে বসে ড্রিংক করা যাবে।

হুসেন গফার কিছুক্ষণ কি ভাবল। তারপর হিকমত ফাহামীর প্রস্তাব সমর্থন করে বলল : ঠিক বলেছ হিকমত, হাউস বোটে বসেই ড্রিংক করা যাক।

কিন্তু হুসেন গফার এবং হিকমত ফাহামী মস্তবড় একটা ভুল করল।

তাঁরা ব্রিটিশ কাউন্টার ইনটেলী-জেনসের ফাঁদে পা দিল ফলে বিপদ ঘনিয়ে এল। (ক্রমশ)

হাউস বোটে ড্রিংকের আসর বেশ জমে উঠলো।

কিছুক্ষণ পরে সবাই বেশ প্রাণ খুলে কথা বলতে লাগলো।

ইতিমধ্যে একজন ভদ্রলোক এসে এই আলাপ আলোচনায় যোগ দিল। ভদ্রলোকের নাম স্যান্ডি। আসল নাম মনক্রিফ্টার।

আলাপ আলোচনার সময় হুসেন গফার তার ব্রিটিশ বন্ধুকে বলল আমার কাছে কিছু ব্রিটিশ পাউন্ড নোট আছে। ভাংগাতে চাই। কোথায় এই টাকা ভাংগাতে পারি বলতে পার?

ব্রিটিশ ইনটেলীজেনস অফিসার প্রথমটা চুপ করে রইল। চট করে কোন জবাব দিল না। তারপর খানিকক্ষণ ভেবে বললেন : তোমাকে কোন কথা দিতে পারছিলে। চেষ্টা করে দেখবো।

সবাই আবার মদ গিলতে লাগলো। রাত প্রায় সাড়ে বারোটা। হঠাৎ আলাপ আলোচনায় বাধা পড়লো। হাউস বোটের বাইরের দরজায় কে যেন ধাক্কা দিল।

: কে? ভিতর থেকে হিকমত ফাহামী জিজ্ঞেস করল।

বিশুদ্ধ আরবী ভাষায় জবাব এল : দরজা খোল হিকমত। আমি—আমি আলোয়ার কথা বলছি।

: আলোয়ার? ব্রিটিশ ইনটেলীজেনস অফিসার তার মদের গ্লাসে এক লম্বা চুমুক দিয়ে জিজ্ঞেস করল।

: আলোয়ার একদা আমাদের একজন বন্ধু, এই বলে হিকমত ফাহামী উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিল।

(ক্রমশঃ)

সিলেবল্ কে 'দল' বলিবেন

প্রবোধচন্দ্র সেন

কিছুকাল পূর্বে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের একটি ছোট প্রবন্ধের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। প্রবন্ধটির মূল বক্তব্য এই :— সিলেবলের প্রতায় ভারতীয় ব্যাকরণ ও ছন্দঃশাস্ত্র বরাবরই ছিল অক্ষর লক্ষ দিয়ে তা নির্দেশ করা হত এবং এখনও করা হয়ে থাকে। 'যে কোনও অভিধানে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়।' কিন্তু 'আজকাল' এবিষয়ে কিছু মতভেদ দেখা যাচ্ছে এবং 'বর্তমানে' কেউ কেউ সিলেবল্-এর প্রতিশব্দ হিসাবে 'দল' শব্দটি ব্যবহার করতে 'আরম্ভ' করেছেন। অমূল্যবাবু সিলেবল অর্থে 'দল' শব্দ প্রয়োগের কোনো নজির বা পূর্ব-দৃষ্টান্ত কিংবা আভিধানিক প্রমাণ খুঁজে পান নি। অতএব তাঁর মতে সিলেবল্ অর্থে 'দল' শব্দের প্রয়োগ 'অসিদ্ধঃ প্রমাণাভাবাৎ'।

সিলেবল্ অর্থে 'দল' শব্দটা আমি ব্যবহার করে থাকি। আমার পূর্বে আর কেউ এই অর্থে 'দল' শব্দ প্রয়োগ করেছেন, এমন প্রমাণ পাইনি। অর্থাৎ শব্দটা নবাগত এবং আমারই উদ্ভাবিত। সুতরাং সিলেবল্কে কেন 'দল' বলি, তার জবাব দেবার দায়িত্বটা আমার উপরেই আসে। কিন্তু অমূল্যবাবু, বোধকরি সৌজন্যবশতঃই কোথাও আমার নাম উল্লেখ করেন নি এবং আমার দেওয়া যুক্তি প্রমাণগুলি খণ্ডন করার প্রয়োজনীয়তাও বোধ করেন নি। অথচ এবিষয়ে আমার বক্তব্যকে উপেক্ষা করেই আমার 'ভ্রান্তিনিরসন' করা কর্তব্য বলে বোধ করেছেন। সুতরাং তাঁর কাছে কোনো জবাবদিহির দায়িত্ব আমার থাকতে পারে বলে মনে করি না। তবে পাঠকদের কাছে স্বভাবতঃই আমার একটা দায়িত্ব আছে, তা এড়িয়ে যাওয়া চলে না। কারণ তাঁরা অমূল্যবাবুর প্রবন্ধ পড়ে বিভ্রান্ত বা সংশয়াক্রান্ত হতে পারেন। তাই আমার এই প্রবন্ধ তাঁদের ও অনাসব নিরপেক্ষ পাঠকদের উদ্দেশ্যেই রচিত হল। বিচক্ষণ পাঠকরাই বিচার করুন, বাংলা ছন্দসাহিত্যের আসরে 'দল' শব্দের এই আবির্ভাব অনধিকার-প্রবেশ বলে গণ্য ও নিন্দিত হতে পারে কিনা।

প্রথমেই বলে রাখি আমি বিনা দ্বিধায় বা বিনা বিচারে সহসা 'দল' শব্দ চালাতে শুরু করি নি। দীর্ঘকাল পূর্বে সিলেবল্-এর একটি স্বার্থক্যহীন সংব্যবহার্য প্রতি-শব্দের প্রয়োজনীয়তা বোধ করি। ফলে অনেক সন্ধান ও চিন্তার পরে দুটি শব্দ আমার মনে আসে—একটি 'দল', অপরটি 'লব'। দুটিই খণ্ডবোধক ফলে এই দুই শব্দের দ্বারাই সিলেবল্ অর্থাৎ লব্ধাংশ বোঝাতে পারে; দুটি সমার্থতাহীন ও সুপ্রযোজ্য। অনেক বিবেচনার পরে এই দুই শব্দের মধ্যে 'দল' শব্দটিকেই সুষ্ঠুতর এবং অধিকতর সুপ্রযোজ্য বলে মনে হয়। বস্তুতঃ যথেষ্ট সতর্কতা সহকারে বহু তথ্য প্রমাণ সংগ্রহ করেই আমি সিলেবল্ অর্থে 'দল' শব্দটিকে স্বীকার করে নিয়েছি। আর আমার নানা প্রবন্ধ ও গ্রন্থে সেসব তথ্যযুক্তিও উপস্থাপন করেছি। এখানে সেসব প্রবন্ধ ও গ্রন্থের নাম এবং পৃষ্ঠাসংখ্যাদি নির্দেশ করেই আমার কর্তব্য শেষ করতে পারতাম। কিন্তু সেসব প্রবন্ধ নানা সময়ের নানা পত্রিকায় ছড়িয়ে আছে। সেগুলি খুঁজে নেবার দায়িত্ব পাঠকদের উপরে চাপিয়ে দিলে তাঁদের প্রতি অবিচার করা হবে। আমি শুধু ছন্দ-আলোচনা প্রসঙ্গেই দল কথাটা ব্যবহার করেছি। কিন্তু আমার সব পাঠকই যে ছন্দসাহিত্যে আগ্রহী, এমন মনে করা যায় না। তাছাড়া, সিলেবল্ কথাটা শুধু ছন্দ-শাস্ত্রে নয়, ব্যাকরণশাস্ত্রেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এসব কারণে শুধু ছন্দপ্রবন্ধ ও ছন্দগ্রন্থের নির্দেশ দিয়ে নিরস্ত হওয়া অনুচিত। তাই কিছু পুনরুক্তির অপবাদ স্বীকার করেও পাঠকসাধারণের কাছে সিলেবল অর্থে দল শব্দ প্রয়োগের যৌক্তিকতার কথা কিছু বিশদভাবেই নিবেদন করছি।

(১)

অমূল্যবাবু তাঁর প্রবন্ধে বলেছেন— "অক্ষর শব্দের ব্যবহারে অনেক সময় বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয় বলিয়া বর্তমানে কেহ কেহ সিলেবল্ অর্থে 'দল' শব্দটি ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।" অক্ষর শব্দের যে অর্থই ধরা হোক, ছন্দ-আলোচনায় এই শব্দের ব্যবহারে যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়, এবিষয়ে আমি অমূল্যবাবুর সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। পার্থক্য শুধু এটুকু যে, বিভ্রান্তি ঘটে অধিকাংশ সময়েই, 'অনেক সময়' নয়। আর, এই বিভ্রান্তি ঘটে বলেই যে, আমি 'অক্ষর' শব্দ বর্জন করে দল শব্দ ব্যবহার করি তার একথাও সত্য। তবে আমি যে 'বর্তমানেই' সিলেবল্-এর প্রতিশব্দ হিসাবে 'দল' শব্দটি ব্যবহার করতে আরম্ভ করেছি, একথা একেবারেই সত্য নয়। কারণ বিভ্রান্তি-জনক 'অক্ষর' শব্দ ব্যবহার সম্বন্ধে আমার আপত্তিটাও হাল-আমলের নয়। তাই এখানে 'অক্ষর বর্জন ও 'দল' গ্রহণের ইতিহাসটা সংক্ষেপে বিবৃত করা প্রয়োজন।

চল্লিশ বৎসরেরও অধিককাল পূর্বে 'বিচিত্রা' পত্রিকায় (১৩৩৮ অগ্রহায়ণ) প্রকাশিত বাংলা অক্ষর বৃত্ত ছন্দের স্বরূপ নামে এক প্রবন্ধে (বর্তমানে 'ছন্দ-জিজ্ঞাসা' গ্রন্থে সংকলিত) আমি 'অক্ষর' শব্দের প্রয়োগ সম্বন্ধে প্রবল আপত্তি উত্থাপন করি। এই প্রবন্ধকে উপলক্ষ করে তখন বাংলা ছন্দ নিয়ে তুমুল তর্কবিতর্ক এবং উত্তর-প্রত্যুত্তর চলতে থাকে 'বিচিত্রা' ও অন্যান্য পত্রিকায়। এই ছন্দ-বিতর্কে অমূল্যবাবুও নিষ্ক্রিয় ছিলেন না। অতএব ১৩৩৮ সালেই অমূল্যবাবু অক্ষর সম্বন্ধে আমার আপত্তির কথা অবগত হয়েছিলেন, এমন অনুমান অসঙ্গত নয়। তারপর থেকে দীর্ঘকাল যাবৎ বহু প্রবন্ধে আমার 'ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ (১৩৫২) ও 'ছন্দ-পরিক্রমা' গ্রন্থে (১৩৭২) এবং আমার সম্পাদিত রবীন্দ্রনাথের ছন্দ গ্রন্থে (১৩৬২) সিলেবল্ অর্থে 'অক্ষর' শব্দ প্রয়োগ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আপত্তি জানিয়ে আসছি। 'ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ' এক খণ্ড অমূল্য-বাবুকে উপহার পাঠিয়েছিলাম এবং তিনি এক সৌজন্যপূর্ণ পত্রে তার প্রাপ্তি স্বীকারও করেছিলেন। আর রবীন্দ্রনাথের 'ছন্দ' গ্রন্থের আমার কৃত সম্পাদনার যথেষ্ট প্রতিকূল সমালোচনাও তিনি করেছিলেন। তাই ধরে নিতে পারি 'অক্ষর' সম্বন্ধে আমার আপত্তিটা নেহাত সাম্প্রতিক নয়, এবিষয়ে তিনি অবহিত আছেন। অন্ততঃ তাঁর পক্ষে অবহিত থাকাই প্রত্যাশিত।

দ্বিতীয়তঃ, 'দল' শব্দটাও আমি 'আজকাল' বা 'বর্তমানে' ব্যবহার করতে 'আরম্ভ' করিনি। ১৩৬৮ পৌষ মাসে 'ভারতী-ঐতিহ্য' গ্রন্থে প্রকাশিত 'বাংলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথের দান' নামে এক প্রবন্ধে আমি 'দল' শব্দটি প্রথম প্রয়োগ করি (দ্রষ্টব্য উক্ত 'ছন্দ-জিজ্ঞাসা' গ্রন্থ, পৃ ১৫৩)। এই প্রবন্ধের একটি কপি অমূল্য-বাবুকেও পাঠিয়েছিলাম এবং তিনি তা

পড়েও ছিলেন (দ্রষ্টব্য অন্নদাবাবুর চিঠি, ছন্দ-জিজ্ঞাসা পৃ ৪৭১-৭২)। তারপরে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলোচনা-প্রসঙ্গে আবার 'দল' শব্দের প্রয়োগ করি সিলেব্‌ল্ অর্থে। কবির অনুমোদনক্রমে সে আলোচনা বিচিত্রা পত্রিকায় (১৩৩১ জ্যৈষ্ঠ) প্রকাশিত হয় ছন্দবিচার নামে (দ্রষ্টব্য ছন্দ-জিজ্ঞাসা পৃ ২৭৩) তখনও বিচিত্রায় ছন্দ-বিতর্ক চলছিল। তাই সিলেব্‌ল্ অর্থে 'দল' শব্দের এই দ্বিতীয়বারের প্রয়োগটাও তাঁর চক্ষু এড়িয়ে যায় নি মনে করলেই তাঁর প্রতি সুবিচার করা হবে। যতদূর স্মরণ হয় 'দল' শব্দ দুইবার প্রযুক্ত হয় ১৩৫২ আষাঢ় মাসে প্রকাশিত আমার ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থে (পৃ ১৯১-১১৫)। এই বইও এক কপি অন্নদাবাবুকে পাঠিয়েছিলাম এবং তিনি সৌজন্যপূর্বক এক পত্রে তার প্রাপ্তি স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু তখন পর্যন্ত 'দল' শব্দটি ব্যাপক ভাবে চালানো সংগত মনে করি নি। হঠাৎ একটি নূতন শব্দ ব্যাপকভাবে চালালে পাঠকদের মনে বিভ্রান্তি ঘটতে পারে, এমন আশঙ্কা ছিল মনে। তাই মাঝে মাঝে 'দল' লিখলেও 'সব সময়ই বন্ধনীতে মূল ইংরাজি-সহ। সিলেবল্ অর্থে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করতাম 'ধ্বনি' শব্দটি—যেমন, 'বর্ণমিতা' শব্দে তিন ধ্বনি বর্ণ্-র্ণ-তা প্রথমটি যুগ্মধ্বনি (জোড়ক সিলেবল্) বাকি দুটি অযুগ্মধ্বনি (ওপন সিলেবল্)।

রামমোহন তাঁর 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' সিলেব্‌ল্-এর প্রতিশব্দ হিসাবে তৈরি করেছিলেন ধ্বন্যাঘাত শব্দটি। এইশব্দটি আমার চোখে পড়ে ১৩৫২ সালে। রামমোহনের এই ধ্বন্যাঘাত শব্দ থেকে সিলেব্‌ল্ অর্থে 'ধ্বনি' ব্যবহারের পরোক্ষ সমর্থন পাওয়া গেলেও আমার মন প্রসন্ন হয়নি। কারণ ছন্দের আলোচনায় অপারিভাষিক অর্থেও ধ্বনি শব্দ ব্যবহার করতে হয়—যেমন, ধ্বনি গাম্ভীর্য, ধ্বনি-মাধুর্য। কোনো আলোচনার একটি শব্দকে পারিভাষিক ও অপারিভাষিক ভেদে দুই অর্থে ব্যবহার করা যুক্তিসংগত নয়। তাছাড়া, সে সময় সিলেবিক অর্থে 'স্বরবৃত্ত' শব্দটাও পূর্ববৎ বহাল ছিল, 'ধ্বনিবৃত্ত' একেবারেই অচল বলে বোধ হয়েছিল। তাই 'বাংলাছন্দ ও ধ্বনিশাস্ত্র' নামে এক প্রবন্ধে শারদীয় আনন্দবাজার পত্রিকা ১৩৫২, পৃ ২৪১) বলেছিলাম—"সিলেব্‌ল্ অর্থের আরও নির্দোষ প্রতিশব্দ হওয়া বাঞ্ছনীয়।" তার কিছুকাল পূর্ব থেকেই আমি রাজশেখর বসু-প্রমুখ কয়েকজন পণ্ডিত ব্যক্তির কাছে পত্রযোগে বা সাক্ষাতে সিলেবল্ শব্দের একটি স্বার্থকতাহীন সুষ্ঠু প্রতিশব্দ কি হতে পারে তা জানতে চাই। আমি কেন সিলেব্‌ল্ অর্থে 'অক্ষর' শব্দ ব্যবহার না করে অগত্যা 'ধ্বনি' শব্দটাই চালাচ্ছি তাও জানাই। কিন্তু কেউ সিলেব্‌ল্-এর সন্তোষজনক প্রতিশব্দ বলতে পারলেন না। রাজশেখর এক চিঠিতে জানালেন—সিলেব্‌ল্ মাত্র অক্ষর অভিন্ন নয়, সুতরাং নূতন শব্দ দরকার আর যতদিন যোগ্য প্রতিশব্দ উদ্ভাবিত না হচ্ছে ততদিন 'ধ্বনি'ই চলুক। তার অল্পকাল পরেই তিনি বাংলা ছন্দের শ্রেণী নামে এক প্রবন্ধে [১] (পরিচয় ১৩৫২ কার্তিক) ওই পত্রালাপের প্রসঙ্গে উল্লেখ করে বলেন—

"সংস্কৃত 'অক্ষর' শব্দে সিলেব্‌ল্ ও হরফ দুই-ই বোঝায়। তাছাড়া ইংরেজি ও সংস্কৃতের সিলেব্‌ল্ একই উপায়ে নিরূপিত হয় না। এই গোলযোগের জন্য প্রতিশব্দ দরকার।...এখন প্রবোধবাবুর 'ধ্বনি'ই মেনে নিচ্ছি। আশাকরি পরে আরও ভাল সংজ্ঞা উদ্ভাবিত হবে।"

এই 'আরও ভাল' প্রতিশব্দ উদ্ভাবনের প্রসঙ্গে স্থির করলাম আমার পূর্বপ্রযুক্ত 'দল' শব্দটাকেই সাহস করে চালিয়ে দেওয়া ভাল। সংস্কৃত ভাষা ও শব্দ সম্বন্ধে আমার যা জ্ঞান ছিল তাতে আমি নিঃসন্দেহ ছিলাম যে, এই নূতন অর্থে 'দল' শব্দ প্রয়োগ করলে তা ব্যাকরণ বা অভিধান-বিরুদ্ধ হবে না। তাই সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের কাছ থেকে প্রতিবাদের কোনো আশঙ্কা ছিল না। আশঙ্কা ছিল শুধু এটুকু যে, হঠাৎ একটা নূতন শব্দ ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করলে সাধারণ পাঠকের মনে প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। তবু মনে ভরসা ছিল যে, মাঝে মাঝে 'দ্বিদল, ত্রিদল শব্দ ব্যবহারে যখন বিশেষজ্ঞ-অবিশেষজ্ঞ কারও কোনো খটকা লাগে নি, বিশেষতঃ যখন রবীন্দ্রনাথের কাছেই অনুমোদন পাওয়া গেছে তখন এই শব্দটা কিছুদিন চালিয়ে গেলেই নূতনত্বের বাধা কেটে যাবে। তার কিছুকাল পরে বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে চিঠিপত্র ও সাক্ষাতে ছন্দ-পরিভাষা নিয়ে আমার যে মতবিনিময় হয় তাতে আমার আশঙ্কা অনেকটাই কেটে যায়। কিন্তু তবু আমি হঠকারিতা করিনি। সুধী-সমাজের মতামত যাচাই করার অভিপ্রায়ে 'ছন্দ-পরিভাষা' নামে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করে 'পূর্বাশা' পত্রিকায় প্রকাশ করি (১৩৫৫ মাঘ)। এই প্রবন্ধে আমি পূর্বতন পরিভাষার পরিবর্তে বহুলাংশে নূতন এক শ্রেণীর পরিভাষা ব্যবহারের সমীচীনতা দেখাতে চেষ্টিত হই। তাতে স্পষ্ট করেই জানিয়ে দিই যে, নির্বিচারে সব পরিভাষা বর্জন না করে শুধু যেসব পরিভাষাকে অসার্থক, স্বার্থবোধক ও ভ্রান্তিজনক বলে বোধ করেছি তারই স্থলে নূতন শব্দ ব্যবহার করা সংগত মনে করেছি।' শুধু পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশ করেই আমি নিরস্ত হই নি। এই প্রবন্ধের মুদ্রিত কপি প্রায় পঞ্চাশজন বিশেষজ্ঞের কাছে পাঠিয়ে প্রত্যেকের কাছে স্বতন্ত্র পত্রযোগে আমার প্রস্তাবিত পরিভাষা সম্বন্ধে তাঁদের সুচিন্তিত অভিমত জানতে চাই। উদ্দেশ্য তাঁদের মতামতের সহায়তায় প্রস্তাবিত পরিভাষাগুলির গুণাগুণ বিচার করে শেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পূর্বাশায় কিম্বা অন্য কোনো পত্রিকায় কেউ এ বিষয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হলেন না, আর পত্রযোগেও দু-একজন ছাড়া আর কেউ তাঁদের সুনির্দিষ্ট মতামতও জানালেন না। ছয়-সাতজনের কাছ থেকে শুধু সৌজন্য বা উৎসাহসূচক উত্তর পেয়েছিলাম। অনেকের কাছ থেকে কোনো উত্তরই পাই নি। যে সব উত্তর পেয়েছিলাম সেগুলি সম্প্রতি ছন্দ-জিজ্ঞাসা গ্রন্থে মুদ্রিত হয়েছে (পৃ ৪৭৩-৭৯)। যাঁদের কাছে পাঠিয়েছিলাম তাঁদের মধ্যে ছিলেন তৎকালীন সব প্রধান কবি, ছান্দসিক, ভাষা-তাত্ত্বিক, ছন্দ-শিল্পিক ও ছন্দ-রসিক। ছান্দসিকদের মধ্যে একমাত্র মোহিতলালের কাছ থেকেই সামগ্রিকভাবে আমার প্রস্তাবিত পরিভাষাগুলি সম্বন্ধে একটা সুনির্দিষ্ট অভিমত পেয়েছিলাম। তিনি লিখেছিলেন—

'পরিভাষা-নির্মাণের আপনি যে নজির ও যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা খণ্ডন করা দুঃসাধ্য। সম্ভবতঃ উহার চেয়ে ভালো কিছু উদ্ভাবন করা যাইবে না।'

তিনি অবশ্য একথাও জানিয়েছিলেন যে, সব নাম তাঁর সুষ্ঠু বলে মনে হয় নি, নামগুলিতে একটু পরিচিত রূপ রক্ষা করতে পারলে আরও ভাল হত। আবার সঙ্গে সঙ্গে লিখেছিলেন—আমার মনোভঙ্গি আদৌ বৈজ্ঞানিক নয়; অতএব এ বিষয়ে আমার মতামত গ্রাহ্য হইতে পারে না। আপনি সেজন্য কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইবেন না। আরও জানিয়েছিলেন যে, সেটুকু আপত্তি তিনি জানালেন—সে আপত্তি সাহিত্যিক আপত্তি, তাহার কোন বৈজ্ঞানিক মূল্য নাই।...উহা আমার ব্যক্তিগত পছন্দের কথা। তাঁর এই সহৃদয় স্পষ্টভাষিতায় আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম।

আমার অভিপ্রায় ছিল সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় একপ্রস্থ সর্বসম্মত ছন্দ-পরিভাষা স্বীকার করে নেওয়া। তার জন্য আমি চেষ্টার ত্রুটি করি নি। জানি না এর পূর্বে বা পরে এরকম প্রচেষ্টা আর কেউ করেছেন কিনা। কিন্তু আমার প্রয়াস সফল হল না। প্রায় পঞ্চাশজন অভিজ্ঞ ব্যক্তির কাছ থেকে অভীষ্ট বা যথাযোগ্য সাড়া ও সহায়তা না পেয়ে অবশেষে আমাকে একলা চলার সিদ্ধান্তই মেনে নিতে হল। সুখের বিষয়, আমাকে বেশি দিন একলা চলতে হয় নি। ক্রমে ক্রমে অনেকেই এসব পরিভাষার সমীচীনতা স্বীকার করে নিয়েছেন। সে কথা একটু পরে বলা যাবে।

এস্থলে সব পরিভাষা আমাদের বিবেচ্য নয়। আমাদের বিবেচ্য শুধু 'দল' শব্দ ব্যবহারের যৌক্তিকতা। উক্ত 'ছন্দ পরিভাষা' প্রবন্ধে আমি সিলেব্‌ল্ অর্থে 'অক্ষর' শব্দের

---

১ এই প্রবন্ধটি পরে রাজশেখরের 'লঘুগুরু' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। দ্রষ্টব্য 'পরশুরাম গ্রন্থাবলী', প্রথম খণ্ড (১৩৭৪), পৃ ৫১০।

পরিবর্তে 'দল' শব্দ ব্যবহারের সমীচীনতার কথা সর্বাধিক গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করি। কারণ বাংলা ছন্দের আলোচনায় এ শব্দটা নূতন আমদানি। পরবর্তীকালে এই 'ছন্দ পরিভাষা' প্রবন্ধটা প্রথমে নীলরতন সেনের 'আধুনিক বাংলা ছন্দ' গ্রন্থে (১৯৬২) এবং পরে আমার 'ছন্দ পরিক্রমা' গ্রন্থে (১৯৬৫) পুনর্মুদ্রিত হয়। তাছাড়া আমি আরও অনেক প্রবন্ধেই 'দল' শব্দ ব্যবহারের যৌক্তিকতার প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছি। এ বিষয়ে সর্বশেষ ও সবিস্তার আলোচনা পাওয়া যাবে আমার 'ছন্দ-জিজ্ঞাসা' গ্রন্থের (১৯৭৪ এপ্রিল) পরিভাষা-পরিচয় বিভাগে (পৃঃ ৪১৮-১৯ এবং ৪২২-২৬)।

দেখা যাচ্ছে, 'দল' শব্দটা ছান্দসিক ও ভাষাবিদদের কাছে ব্যাপকভাবে এবং ঘনঘন উপস্থাপিত হয়েছে প্রায় সাতাশ বৎসর ধরে (১৯৪৮-৭৪)। আর তারও আগে এই শব্দটা তাঁদের সামনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল, অবশ্য একটু সংকুচিতভাবে, আরও ষোলো বছর আগে ১৯৩২ সালে। এই ষোলো বছরের মধ্যেও সাহিত্যসমাজে তার সশঙ্ক আবির্ভাব ঘটেছে বার বার। তারপরে তো সে ঘটা করেই হাজির হয়েছে ছান্দসিক দরবারে। অনেকে তাকে স্বাগতও জানিয়েছেন। কেউ তো তার উপস্থিতিতে আপত্তি জানিয়ে বলেন নি, 'কেন এলে?' অবশেষে, প্রায় তেতাল্লিশ বছর পরেও যে এই আগন্তুক শব্দটির প্রতি অমূল্যবাবুর মতো একজন প্রবীণ ও পণ্ডিত ব্যক্তির দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে এবং তিনি যে তথ্যপ্রমাণ যোগে আমার 'ভ্রান্ত ধারণা নিরসন করা প্রয়োজন' বলে বোধ করেছেন তাতেই আমি নিজেকে সম্মানিত বোধ করছি। কারণ 'দল' শব্দটি কমপক্ষে প্রায় তিন দশক কালেও মনস্বী বিদ্বজ্জনের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয় নি। অবশেষে এই উপেক্ষিত শব্দটি যে অমূল্যবাবুর ন্যায় সুধী ব্যক্তির বিচারাধীন হয়েছে তাকে সৌভাগ্যের বিষয় বলেই মনে করি। কারণ, প্রথমতঃ আমি অমূল্যবাবুকে মনস্বী বিদ্বজ্জনের প্রতিভূ-স্থানীয় বলেই গণ্য করি। দ্বিতীয়তঃ আমার বিশ্বাস আছে, সুধীজনের সমক্ষে বিচারের অগ্নি-পরীক্ষায় এই নির্দোষ সুচারু শব্দটির সুবর্ণকান্তি উজ্জ্বলতর হয়েই প্রকাশ পাবে। কঠিনতর বিচারেও এই শব্দটির অযোগ্যতা প্রতিপন্ন হতে পারে বলে মনে করি না।

(২)

অমূল্যবাবু প্রশ্ন করেছেন—'সিলেবল অর্থে 'দল' শব্দ প্রয়োগের কোনও নজির বা পূর্বদৃষ্টান্ত কিম্বা অভিধানিক প্রমাণ আছে কি?' আমার সবিনয় উত্তর এই যে—ভারতীয় মনে ওপেন-কোজড নির্বিশেষে সিলেবল-এর কোনো 'প্রত্যয়ই ছিল না' তাই শুধু 'দল' কেন, ভারতীয় ভাষায় সিলেবল-বোধক কোনো নজির বা আভিধানিক প্রমাণ থাকাই সম্ভব নয়। যদি থাকত তা হলে তো সমস্যাই দেখা দিত না; আর রামমোহন থেকে রাজশেখর-কালিদাস রায় পর্যন্ত এতজনকে সিলেবল-বোধক নূতন শব্দ রচনার জন্য এমনভাবে মাথা ঘামাতে হত না। সত্যেন্দ্রনাথকেও একটা রূপকের আশ্রয় নিয়ে 'অক্ষ-পাপড়ি' বলে সিলেবল বোঝাতে হত না। অক্ষর যা বর্ণ শব্দ যে সর্বতোভাবে ইংরেজি সিলেবল শব্দের সমার্থক নয় (বিশেষতঃ বাংলা ভাষায়), তা পরেই নানা প্রসঙ্গে সবিস্তারে দেখানো হয়েছে।

অতএব সিলেবল-বোধক একটি নতুন পারিভাষিক শব্দ রচনার বা উদ্ভাবনার প্রয়োজন যে আছে তাতে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে বলে মনে করি না। তাই প্রয়োজন বোধে আমি 'দল' শব্দটিকে পারিভাষিক অর্থে সিলেবল-এর প্রতিশব্দ বলে স্বীকার করে নিয়েছি। সঙ্গতভাবেই প্রশ্ন হতে পারে, সিলেবল অর্থে 'দল' শব্দ প্রয়োগের পক্ষে তথাগত যুক্তিপ্রমাণ কি আর আমার দেওয়া তথ্য প্রমাণগুলি সমীচীন কিনা তাও বিচার করে দেখা যেতে পারে। তাতে আমার আপত্তি থাকতে পারে না। আমার তথ্য প্রমাণগুলি উপস্থাপিত করার পূর্বে আমি সোজাসুজি অমূল্যবাবুকেই একটি প্রশ্ন করতে চাই। চল্লিশ বৎসরের অধিককাল যাবৎ অমূল্যবাবুর সঙ্গে আমার চিঠিপত্রের যোগ এবং দেখাসাক্ষাতের পরিচয় আছে। তাই আমি 'কেন কেহ, 'বাঁহারা' ইত্যাদি পরোক্ষ উহ্যির আড়াল থেকে প্রশ্ন করে আমাদের দীর্ঘকালের সম্পর্ককে মলিন করতে চাই না। জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে মতভেদ কখনও ব্যক্তি সম্পর্কে মালিন্যের হেতু হতে পারে না, অন্ততঃ হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি না। তাই সোজাসুজি অমূল্যবাবুকে জিজ্ঞাসা করি—তিনি তো ছন্দ-আলোচনায় সত্যেন্দ্রনাথের অনুসরণে বিশেষ পারিভাষিক অর্থে 'পর্ব' শব্দটি ব্যবহার করে থাকেন, ওই বিশেষ পারিভাষিক অর্থে 'পর্ব' শব্দটি প্রয়োগের কোনও নজির বা পূর্ব দৃষ্টান্ত কিম্বা আভিধানিক প্রমাণ আছে কি?' তিনি তো অবশ্যই জানেন সত্যেন্দ্রনাথও নিঃসন্দেহেই জানতেন যে প্রাকৃত পৈঙ্গলম গ্রন্থে গণ শব্দটির বহুল প্রয়োগ আছে (যেমন—চতুষ্কলগণ, পঞ্চকলগণ, ষট্‌কলগণ) এবং যে নজির 'পর্ব' শব্দের বদলে 'গণ' শব্দটিকে অনায়াসেই স্বীকার করে নেওয়া যেত, তাতে নজির-প্রমাণ হাজির করার দায়িত্বও থাকত না। তথাপি সত্যেন্দ্রনাথের ন্যায় অমূল্যবাবুও 'গণ' শব্দ বর্জন করে 'পর্ব' শব্দটিকেই স্বীকার করে নিয়েছেন। এই নির্বাচনের কোনো সন্দেহজনক কারণ তিনি দেখাতে পারেন কি?

আমি প্রথমে সত্যেন্দ্রনাথের 'পর্ব' শব্দ গ্রহণ করি নি। তার বদলে নিয়েছিলাম পদ বা পাদ (এবং কখনও কখনও 'চরণ', পদ বা পাদের প্রতিশব্দ হিসাবে)। আমার এই নির্বাচনের মূলে ছিল ইংরেজি foot শব্দের প্রত্যক্ষ প্রেরণা এবং হয়তো রবীন্দ্রনাথের 'পদক্ষেপ' কথার পরোক্ষ প্রভাব। কিন্তু অচিরকালেই আমি foot অর্থে 'পর্ব' শব্দটিকেই স্বীকার করে নিই এবং 'পদ' শব্দটিকে ছন্দের বহুতর বিভাগ অর্থে প্রয়োগ করাই সমীচীন মনে করি, তাতে পূর্বাগত ত্রিপদী, চৌপদী প্রভৃতি পারিভাষিক নামের সঙ্গেও সঙ্গতি রক্ষিত হয়। কিন্তু পূর্বাগত গণ শব্দটি বর্জন করে 'পর্ব' শব্দটিকেই পারিভাষিক মর্যাদা দেওয়া সর্বাংশেই সঙ্গত মনে করি। কারণ—প্রথমতঃ গণ শব্দ মূলতঃ পূরকযোগের ন্যায় পর্ব বিভাগসূচক; দ্বিতীয়তঃ ছন্দশাস্ত্রে 'গণ' শব্দের অর্থ কতকটা কৃত্রিম ও অনির্দিষ্ট, পক্ষান্তরে ছন্দ-আলোচনায় 'পর্ব' শব্দটি একেবারেই নবাগত, তার পক্ষে কোনো নির্দিষ্ট বা পূর্ব দৃষ্টান্ত কিম্বা আভিধানিক প্রমাণ নেই। নেই বলেই ছন্দ-পরিভাষায় এই শব্দটির উপর যে অর্থ আরোপ করা হয়েছে তাতে পূর্ব সংস্কার-জাত সংশয়ের কোনো অবকাশ ঘটে নি। নূতন পরিভাষা রচনার এইটেই সবচেয়ে বড় সুবিধা। কিন্তু যে-কোনো শব্দেই পারিভাষিক অর্থ আরোপ করা চলে না। শব্দের ব্যাকরণগত তথা আভিধানিক অর্থকে মনে নিয়ে তাকে ব্যবহারগত কোনো নির্দিষ্ট অর্থে স্বীকার করে নিলেই সেটি পারিভাষিক শব্দের মর্যাদা লাভ করে। এবার দেখা যাক 'পর্ব' শব্দের আভিধানিক অর্থ কি। মণিএর উইলিয়ম্স-এর অভিধানের প্রাসঙ্গিক অর্থগুলি এই—পর্বন—

> a knot, a joint esp- of a cane or other plant, but also of the body); limb, member (lit. and fig-); division, section (esp- of a book); the step of a stair-case.

আপ্তের অভিধানে অধিকন্তু আছে—পর্বন—a part, portion; a period, fixed time ইন্দ্রিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বঙ্গীয় শব্দকোষে আছে : পর্ব—অংশ, খণ্ড; গ্রন্থাংশ; সিঁড়ির ধাপ; (বাঙলায়) গ্রন্থিস্থলের মধ্যস্থিত ভাগ, পাব (আঙুলের পর্ব)। আর বাংলা 'পাব' (সংপর্ব) শব্দের দৃষ্টান্ত আছে—বেত, বাঁশ কঞ্চির পাব। যোগেশচন্দ্র রায়ের বাঙ্গালা শব্দকোষে ও পাব (সংপর্ব) শব্দের অনুরূপ অর্থই দেওয়া আছে।

ছন্দ-পর্বের কথা কোথাও নেই। দেখা যাচ্ছে 'পর্ব' শব্দের মূল অর্থ গ্রন্থি (গাঁট) বা সন্ধিস্থানের পরবর্তী অংশ বা খণ্ড। এই দ্বিতীয় অর্থটা ক্রমে নানা ক্ষেত্রে প্রসারিত হয়। যেমন—ইতিহাস-কালের, মহাভারতের, আখ্যানের, বাঁশ, বেত আঁখ দূর্বা ইত্যাদির পর্ব। এই দ্বিতীয় অর্থটা স্বীকার করে নিয়ে কবি কালিদাস 'পর্ব' শব্দটিকে সিঁড়ির ধাপ অর্থেও প্রয়োগ করেছেন। যেমন—'গুরুদ্বারপর্বকানাং সোপান

পর্বাণি' (রঘু ১৪।৬৬)। অনুমান করা যায়, কালিদাসের সোপান পর্বের মতো 'পুষ্পপর্ব' কথাটাও এক সময়ে প্রচলিত ছিল। কেননা, (ফুলের) পাবড়ী বা পাপড়ী শব্দ পর্ব শব্দ থেকেই উদ্ভূত হয়েছে (ে ডি বি এল পৃঃ ৩৭৬ ও ৫১১)। আর এই নীতি অনুসরণ করেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'আমাদের হাতে তিন পর্ব আছে। মণিবন্ধ পর্যন্ত এক, এটি ছোটো পর্ব, কনুই পর্যন্ত দুই, কনুই থেকে কাঁধ পর্যন্ত তিন; সাকে আমরা বাহু বলি সে এই তিন-পর্ব মিলিয়ে।' —ছন্দ, ছন্দের মাত্রা (দ্বিতীয় পর্যায়)।

এই অর্থটিকে ভাষার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলেও অর্থ বুঝতে অসুবিধা হয় না। তাই রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন—'যদি জোর দিতে চাই তবে বাক্যের পর্বে পর্বে জোর দিয়ে থাকি' (বাংলা ছন্দ, সবুজপত্র ১৩২১ শ্রাবণ), তখন 'পর্ব' শব্দের এই বিশেষ অর্থে প্রয়োগের নজির বা আভিধানিক প্রমাণ দেখাবার প্রশ্ন ওঠে না। বোধ করি এটাই ভাষার ক্ষেত্রে 'পর্ব' শব্দের প্রথম প্রয়োগ। আর আমার ধারণা সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি থেকেই ইঙ্গিত পেয়ে সত্যেন্দ্রনাথ 'পর্ব' শব্দটিকে ছন্দ-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করেন। এ-রকম মনে করার কিছু হেতুও আছে। বাংলা ছন্দ-পরিভাষায় এই অনন্যসা 'পর্ব' শব্দটাই সত্যেন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ দান।

অনুরূপভাবেই 'দল' শব্দটিরও অর্থ-বিস্তার তথা অর্থান্তর ঘটেছে। ইস্কুলের উচ্চতর পর্বে সংস্কৃত পড়ার সময় আমাচরণ পণ্ডিত মহাশয়ের মুখে শুনেছিলাম—দল বিদারণে, ছেদনে' অর্থাৎ দল্ ধাতুর অর্থ বিদারণ করা, খণ্ডিত করা আর 'দল' শব্দের অর্থ খণ্ড বা অংশ। তখন আমাদের শিক্ষার একটা প্রধান অঙ্গ ছিল সংস্কৃতকে ইংরাজিতে এবং ইংরেজিকে সংস্কৃতে অনুবাদ করা। এই কাজে আমাদের প্রধান সহায় ছিল ভি এস আপ্তের দুই খন্ড অভিধান। এই অভিধান প্রয়োজনমতো এখনও ব্যবহার করে থাকি। এই অভিধান থেকেই শিখেছিলাম—দল্ ধাতুর মানে to split to crack ইত্যাদি এবং 'দল' শব্দের মানে a piece portion, part fragment ইত্যাদি; আর a division of an army

কিংবা a detachment of troops

কথার সংকেত হবে সৈন্যদলের। আরও শিখেছিলাম দল অংশে খন্ড ভাগ শকল ইত্যাদি সমার্থক শব্দ। এটুকু বিদ্যা নিয়েই তখন আমার উভয়বিধ অনুবাদের কাজ চলে যেত এবং ভালই চলত। তাছাড়া তখনই সংস্কৃত অমর কোষের সংজ্ঞাসূত্রে দল ও শকল শব্দের প্রয়োগও লক্ষ্য করেছিলাম। সেকথা একটু পরেই পুনরুত্থাপন করা যাবে। মোট কথা দল মানে যে খন্ড বা অংশ এ ধারণাটা জ্ঞাতসারেই মনে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল। তাই পরবর্তীকালে সিলেবল্ অর্থাৎ এক প্রযত্নোচ্চারিত শব্দাংশ বোঝাতে 'দল' শব্দ প্রয়োগ করলে ভাল

সংস্কৃত-জানা পাঠকের মনে কোনো সংশয় দেখা দিতে পারে এমন আশঙ্কা আমার ছিল না কিন্তু তবু আমি যথেষ্ট সতর্কতা সহকারেই অগ্রসর হয়েছিলাম। তাই আমার অভিধান দেখে নিলাম। দেখা গেল মনিয়র উইলিয়ামসের অভিধানে খন্ডার্থক 'দল' শব্দের প্রয়োগ দৃষ্টান্ত হিসাবে 'দ্বিদল' শব্দের উল্লেখ আছে। আর আপ্তের অভিধানে পেলাম 'দ্বিদল' মানে হ্যাভিং টু পার্টস্। তাই নিঃশঙ্কচিত্তে লিখলাম দ্বিদল ডিসিসিলেবিক এ ত্রিদল (ট্রিসিলেবিক)। এই শব্দদুটি আজ বাংলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথের দান প্রবন্ধে (১৩৩৮ পৌষ) এটি রবীন্দ্রনাথ-প্রমুখ অনেকেই পড়েছেন, অনুশীলনও পড়েছেন। কারও কাছ থেকে আপত্তির কথা শুনিনি। তবু এ শব্দটি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করতে সাহসী হইনি। কারণ পাঠকমাত্রই সংস্কৃতজ্ঞ নন, তাই অনভ্যাসের বাধা আসতে পারে এমন আশঙ্কা ছিল মনে। তারপরে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাতেই এ-দুটি শব্দ ব্যবহার করলাম ওই বিশেষ অর্থেই (দ্রষ্টব্য 'ছন্দ-বিচার' প্রবন্ধ, 'ছন্দজিজ্ঞাসা' গ্রন্থ, পৃ ২৭৩)। মনে ভরসা ছিল তার অনুমোদন পাওয়া যাবে। আমাকে নিরাশ হতে হল না। ভাষীকালে পন্ডিত মহলে এ নিয়ে আপত্তি উঠতে পারে, মনে এমন আশঙ্কা থাকলে তখনই কবির স্বাক্ষরিত দলিল সংগ্রহ করে রাখা যেত। আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ তখন মনে এমন আশঙ্কা দেখা দেয়নি। তারপরে ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থেও (১৩৫২ আষাঢ়) দ্বিদল ও ত্রিদল শব্দ দু-বার ব্যবহার করেছি। এবারও কোনো আপত্তি শোনা গেল না। অবশেষে সিলেবল্ অর্থে 'দল' শব্দটি ব্যাপকভাবে প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা বোধ করে ভাষাবিৎ ছন্দোবিৎ অধ্যাপক কবি প্রভৃতি অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের অভিমত সংগ্রহে চেষ্টিত হই। কিন্তু তার পূর্বে সংস্কৃত ব্যাকরণ, অভিধান ও ছন্দশাস্ত্রের সাক্ষ্যপ্রমাণ ভাল করে সন্ধান ও বিচার-বিবেচনা করে দেখে নিতে হয়েছিল। দেখা গেল 'পর্ব' শব্দের মতো 'দল' শব্দটিও অংশ বা খন্ড বোঝায়। 'পর্ব' শব্দের ব্যুৎপত্তি কি কি জানি না। কিন্তু দল শব্দ ধাতুগত মৌলিক অর্থেই যে খন্ড বা অংশ তাতে সন্দেহ নেই। তবে সে খন্ড পর্বের ন্যায় দুই সন্নিহিত্বের মধ্যবর্তী হতেও পারে নাও হতে পারে। আরও দেখা গেল পর্ব শব্দের ন্যায় দল শব্দেরও অর্থবিস্তার ও অর্থান্তর ঘটেছে নানাভাবে। শব্দকল্পদ্রুমে আছে—দলং (দলতীতি/দল+অচ্) : উৎসেধঃ। খন্ডম। যথা

ভার্যা পুত্রে দাসে শিষ্যে ভ্রাতা

চ সোদরঃ।

প্রাপ্তাপরাধাস্তাড্যাঃ স্যু রজ্জ্বা

বেণুদলেন বা।।

—মনু, ৮।২৯৯

অর্থাৎ—ভার্যা, পুত্র, দাস, শিষ্য এবং সহোদর ভ্রাতা অপরাধী হলে রজ্জু বা বেণুদলের দ্বারা (মৃদুভাবে) তাড়নীয় মানে 'দন্ডনীয়' হবে। এখানে 'বেণুদলেন' মানে বেণুখন্ডের দ্বারা। মাঘের শিশুপালবধ কাব্যে (৪।৪৪) আছে—বাপীয়ং অন্তর্লীন মহানীলদলাসু। টীকায় আছে—মহানীলদলানি ইন্দ্রনীলবিশেষ খন্ডানি।' অর্থাৎ দল মানে খন্ড। এই হচ্ছে দল শব্দের আদিম অর্থ। সৈন্যদল মানে সমগ্র বাহিনীর একটা অংশ (ডিভিশন, ডিটাচমেন্ট রেজিমেন্ট) কোনো সত্ত্ব ভেঙ্গে দ্বিধাবিভক্ত হলে এক-একটা ভাগকে বলা হয় 'দল' (তুলনীয় দলাদলি)। শিম মটর ছোলা প্রভৃতি বীজের বহিরাবরণের মধ্যে যে দুটি ভাগ থাকে তাকে বলা হয় 'দল' (কটিলীডন)। এই জাতীয় বীজকে বলা হয় দ্বিদলবীজ (ডিকটিলীডন)। আর এক ভাগবিশিষ্ট দলকে বলা হয় একদল বীজ (মোনোকটিলীডন)। বীজদলের নামান্তর বীজপত্র। গাছের ফুল যে বিভিন্ন খন্ড নিয়ে গঠিত হয় সেগুলিকেও বলা হয় 'দল' (পেটাল)। যেমন চতুর্দল বা পদ্মদল পুষ্প, শতদল কমল, রঘুনন্দনের 'ফুলদল দিয়া কাটিলা কি বিধাতা', রবীন্দ্রনাথের 'মালা হতে খসে পড়া ফুলের একটি দল' ইত্যাদি। এসব ক্ষেত্রেও 'দল' শব্দ মূলতঃ খন্ডবোধক। তাই বীজের বা ফুলের দল বললে আসলে বোঝায় বীজের বা ফুলের এক-একটি ভাগ, রূঢ়ার্থে বীজপত্র বা পাপড়ি। ক্রমে অর্থবিস্তারের ফলে এই একই শব্দের দ্বারা নানা ক্ষেত্রে নানাবস্তু বোঝায়। 'দল' শব্দের একটি সুপ্রচলিত অর্থ গাছের পাতা। যেমন বিল্বদল দূর্বাদল কালিদাসের নলিনীদল তালবৃন্ত (শকুন্তলা ৩।১৭ শ্লোকে পদ্মপত্রের পাখা) শঙ্করাচার্যের নলিনীদলগত জলমতিতরলম (মোহমুদ্গর)। তারপরে পাতার সাদৃশ্যে দল শব্দের দ্বারা অস্ত্রের ফলাও বোঝায়—যেমন অসিদল (স্মরণীয় 'অসিপত্র'), এমনকি, দল শব্দের দ্বারা কখনও কখনও গাছের ছালও বোঝায়। যেমন বাচস্পত্য অভিধানে—দলনির্ম্মোক' শব্দের অর্থ—পলতীতি দলং সঞ্চলং নির্ম্মোক ইব যস্য, ভূর্জপত্রবৃক্ষে।' ভূর্জপত্র মানে ভূর্জ বৃক্ষের ছাল। এভাবে দল শব্দের অর্থ নানাভাবে বিস্তৃতি লাভ করেছে। কিন্তু সব প্রয়োগের প্রতি লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, দল শব্দের মৌলিক খন্ডার্থেই প্রাধান্য। তাই গণিতশাস্ত্রে দল মানে হয় ভিন্নী এবং ছন্দশাস্ত্রে দল শ্লোকাংশ।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

ফাদার স্তিফেন রোজারিও লামচা

(২১)

লোকটি আসলে আর কেউ নয়—শঙ্করদা, শ্যামলের বন্ধুপ্রতিম বসের ভাই। কল্পনার গল্প সে শুনেছে, ছবিও দেখেছে, অত্যন্ত স্বাভাবিক সুরে হাই মেয়েটিকে সে জিগ্যেস করল, আপনি কল্পনা মুখার্জি? আসুন বসুন—বলে বিকাশের ভাড়া চুকিয়ে নিজের কাজে সে বেরিয়ে গেল। পূর্ণাঙ্গনীর আগমনের সংবাদ অবশ্যই শ্যামল নিজে যখন ওকে জানানো উচিত বলে বিবেচনা করেনি, তখন শঙ্করদাও প্রশ্ন-টশ্ন না করাই যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করল।

কল্পনা তো অবাক...শ্যামল সেনগুপ্ত নামক ঐ অপরিচিত লোকটি ওকে কি করে চিনল? ওর নাম ও পদবী কোত্থেকে জানল সে?...মেয়েটি এমনিভাবে হতবুদ্ধি হয়ে কতক্ষণ যে বসেছিল, তার নিজের কোনো খেয়াল নেই সহসা কিন্তু সেন যন্ত্রচালিতের মতো রান্নাঘরের দিকে সে পা বাড়াল। দেখল, রান্নাঘরে কাজ করছে ওরই সমবয়সী এক আদিবাসী ছেলে। কাছে এসে জিগ্যেস করল, 'এ-ঘরে কজন থাকে বলতে পার কি?'

'বড়দা আর ছোড়দা।'

'ওদের নাম জান?'

'না।'

সেই মুহূর্তে বারান্দা থেকে ঐ অপরিচিত লোকটির কণ্ঠস্বর শোনা গেল, আদিবাসী ছেলেটির উদ্দেশে করে সে বলছে 'ওকে ফটিক, উনি আজ রাতে এখানে খাবেন।'

সন্ধ্যাবসার অন্ধকার, বাইরে মাঠ পড়ছে। কল্পনা এবার সাহস করে আবার জিগ্যেস করল: 'তোমার ঐ ছোড়দাটি কখন ফেরেন?'

'ঠিক নেই, রাত দশটাও হতে পারে।'

'আচ্ছা, বল তো, বড়দার নাম কি শ্যামল?'

'তা হবে বোধহয়।'

'ছোড়দারও নাম শ্যামল না তো?'

ফটিক ছেলেটি স্তম্ভিত। লিখিয়ে এখানে খাবেন আর এদিকে কাদের বাড়িতে তিনি এসেছেন, সেই কথাটা পর্যন্ত তিনি জানেন না! কথাবার্তায় ইতি পড়ল।

রহস্য উদ্ঘাটন করতে না পেরে কল্পনা ঘরে ফিরল। একটু প্রকৃতিস্থ বোধ করে চারিদিকে দেখতে লাগল। চিনতে পারল শ্যামলের বেপরোয়া জামা, কাপড়ের লেদা-সুটকেস আর আলমারির উপর ঘাড় কাত করানো—টুকরো-টাকরা কবের যুগলমূর্তির ফটো। কিন্তু বাড়িওয়ালা লোকটি যেই থাকে না কেন, ঘরটা তারই শ্যামলের আবাস!

কিছুক্ষণ পরে কল্পনা শুনতে পায় বারান্দায় কার যেন বর্ষাতি পরাক্ষেপে আওয়াজ—আর সঙ্গে সঙ্গেই শ্যামলের কণ্ঠস্বর। ক্লাব থেকে ফিরছিল সে, চলতি এক গানের কলি ভাঁজতে ভাঁজতে ঢুকছে। শঙ্করদাকে দেখতে পেয়ে সে বলল 'ওহে শঙ্করদা, কৈফিয়ৎ বলছিল কি জান? পশ্চিমপাড়ায় এক বাঙালী মহিলা পথ না চিনে কাকে খুঁজছিল...কে তোমারই সুযোগ্যা নন্দ তো?'

'সে তোরই হৃদয়েশ্বরী, বুদ্ধু!'

'ইয়ার্কি মারছ!'

'তবে বরাবর ভেতরে যা...'

কল্পনার শিরা-উপশিরায় রক্ত চিম হয়ে এল...এই প্রথম সে জানল, না বলে সে এসেছে, শ্যামল রাগ করবে না তো? তাকে তাড়িয়ে দেবে না তো?...

রান্নাঘর থেকে ফিরে এসে শ্যামল ও শঙ্করদাকে অনির্বাচিত পরস্পরকে 'আনা-পঁচল, হঠাৎ আধ-খোলা দরজার ফাঁ দিয়ে দেখল এক নিস্তব্ধ নারীমূর্তি শ্যামলও নিস্তব্ধ হয়ে উঠল, ভাবল কল্পনার ভূত!

...খাওয়া হল, দাওয়া হল, শঙ্করদা রসিকতা করতে ছাড়ল না। বলল, ওকে পরীবিখানায় অবস্থানের যাবতীয় 'অ বিপদ জন্য যাক্তব্যলালী যেন হাঁর এ দায়ানুদায়ত্বরতে স্বকীয় মাহাত্ম্যে মাক্তন করেন; প্রতিশ্রুতি দিল, উক্ত পরীবিখান শনিবার যদি কোনোদিন নঙ্গকরদার চরণ তলরেণুযোগে সুরভিত হওয়ার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হয়, তবে সে, শঙ্কর দাস, নিজের হাতেই পরিবেশন করবে ভূপাতিতনন্দিনীর উপযুক্ত ভোজ: বাক্তলফল ও রাজপুঁটি (ইলিশ আর ফলুই মৎস্য) বাক্তজন্তু (ওরফে পোলাপক্কাম) আর বাক্তভোগ... হতভাগা ফটিক অবশ্য আজ রাজকীয় কিছুই পায়নি, রেঁধেছে বাক্তফল, অর্থাৎ কিনা পটল!

খাওয়া-দাওয়া সেরে রাত্রিযাপনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। খোলা বারান্দায় একটা খাট দেখে কল্পনা বলে, আমি এখানে শোব।' জায়গাটা নিরাপদ নয় জেনে শঙ্করদা আপত্তি জানায়: 'মশারি-টশারি মশক করবেন, খাটটা অন্যায়...মাটিতে শুলে আমার জ্বর আসে!' নিরুপায় মেয়েটি এই ঘরের দুটি কোণে দুটি বিছানা পাতে। বালিশ কিন্তু একটাই: কার ভাগে পড়বে? কল্পনা বলে শ্যামলকে, শ্যামল বলে কল্পনাকে। শেষ পর্যন্ত স্থির হয়, কেউ কাউকে বঞ্চিত না করে দুজনেই পাশাপাশি শোবে। সারারাত কাটল মধুর আলাপনে: বিয়াহে আমন্ত্রিতদের নিকট, মধুচন্দ্রিকার সম্ভাব্য স্থল বর্ণানুক্রমিক ক্রোনোলজেশের নাম—কুনাজ, খেয়া, গৌরী, কিন্নর, সপ্তর্ষি শান্ত মতে, সাগর বেলাই প্রশস্ত মধুরী প্রার্থ...

পরের দিন শঙ্করদা ঘোষণা করে এ বন্দীকালের রাজা নরেন্দ্রনন্দনের পশ্চাতে বাবেন্দ্র ফেলিয়ে দিতে বিলম্ব করবেন না; বহুর ভাসী জামাতা যথা শীঘ্র সম্ভব ভূপতিনন্দনকে পিতৃগৃহে পৌঁছিয়ে দিবে ক্রুসেডার পর্যন্তে নরাধিপাপজার পাপ-শ্যামল বলে, 'বিকেলের ট্রেনে ওরা হবে।' মেয়েটিকে সে মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন অঞ্চল ঘোরাল, সাড়িও কিনল। কল্পনা বলল, শুধু সাড়ি নয়, ব্লাউজ পেটি সব...' কোয়ার্টার্সে ফিরে নতুন-কেনা জামা-কাপড় পরিধান করে কেচে-দেওয়া সাড়িটা ছাদে ঝুলিয়ে কল্পনা বলে, 'এবার আমি পুরোপুরি তোমার: সাড়ির আর কিছুই বাকি নেই...বাড়ির কাপড়গুলো ফটিকের মধ্যে দেওয়া হোক।'

(ক্রমশ)

CENTRAL LIBRARY

'সৌন্দর্যচেতনা রবীন্দ্রসঙ্গীতের মধ্যেকার সবচেয়ে বড় কথা। এ বোধটা জন্মালে গায়কী আপনা থেকেই গড়ে ওঠে।

ঋত্বিক ঘটকের

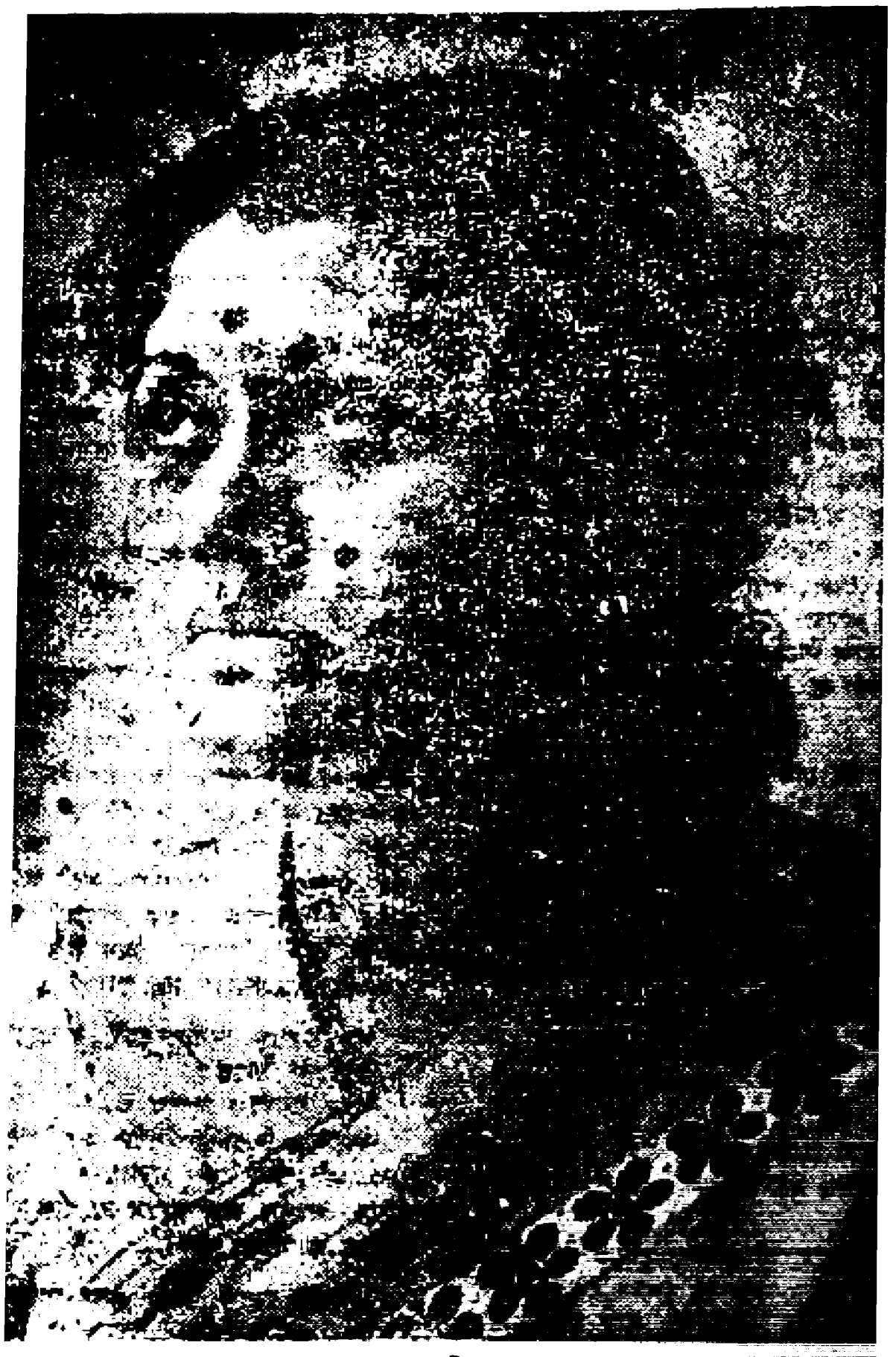

সুরের আগুন

হঠাৎ হঠাৎ বললেন—'গা ত গানটা? তোর কেমন শুনেছিস?' গাইতাম। ভাল হলে উচ্ছ্বসিত বাহবার বাড়ী মাথায় করে তুলতেন। আবার ঠিকমত না হলে বলতেন 'আবার শোন, শুনে ঠিকমত গোনা'—সে যে কোনো গানই হোক, ক্লাসিক্যাল, মডার্ন বলে কোনো বাছবিচার নেই। একবার এইরকম করেই শুনিয়েছিলাম 'এবার আমি ভালো হবোঁ'। শুনে বাবা এত খুশী হয়েছিলেন যে সেইদিন সন্ধ্যাবেলাতেই শচীনকর্তা, ভীষ্মবাবু আরও কে কে যেন আসতে না আসতেই বললেন 'শুনবে আমার মেয়ে কি সুন্দর গাইছে' বলে সেই রামপ্রসাদী গানটিই গাইতে বললেন।

বাবা সকলকে খাওয়াতে খুব ভালবাসতেন। হঠাৎ সোরগোল তুললেন আজ ডাকরোস্ট হবে সবাইকে ডাকা হোক। সন্ধে থেকে সবার আসা শুরু হোলো। আসর জমজমাট। অভ্যাগতদের মধ্যে কেউ হয়তো বললেন, 'এত তাড়াতাড়ি খাওয়া হবে নাকি? সবে ত সন্ধ্যে।'

'তাহলে একটু গানবাজনা হোক?' বাবার চোখে যেন আলো জ্বলে উঠতো।

তারপর গানবাজনার আসর চলতে চলতে সন্ধ্যে কখন রাতদুপুরে গড়াতো সে হুঁশ কারো থাকতো না। আমাদের বাড়ীতে তখন শৈলজাদা খুব আসতেন। তিনি ছিলেন আমাদের ছোটদের খেলার সাথী। দুপুরে হয়তো ঘুমোতে ইচ্ছে করছে না শৈলজাদা বলতেন চলো আমরা খেলিগে। শৈলজাদা রোগী, আমি ডাক্তার সিন্ধ্যা (ঘোষ) কম্পাউণ্ডার। সিন্ধ্যা আমার পিসতুতো বোন জানো ত? শৈলজাদা রোগী সেজেই গান গাইতে শুরু করতেন। আমাদের বলতেন, 'ডাক্তারবাবু কম্পাউণ্ডার বাবু, আপনারাও যদি আমার সঙ্গে গান তাহলে আমার অসুখ এক্ষুনি সেরে যায়।'

শুরু হোতো আমাদের কোরাস। এমনি করে কত গান যে শিখেছি।

আমরা হয়তো রাত্রে শুতে যাচ্ছি দেখলাম মোহরদি ঘরে শুয়ে গুনগুন করে কাকিমাকে গান তোলাচ্ছেন। আর ঘুমোনো হোলো না। ঐখানে বসে মুগ্ধ হয়ে শুনতে বসে যেতাম মোহরদির সেই গুনগুন করে গাওয়া গান। চাঁদের আলো, নিস্তব্ধ রাত মোহরদির মধুর কণ্ঠ সব মিলিয়ে সেই মায়াময় পরিবেশ আজও ভুলতে পারি না।

তাছাড়া বড় হয়ে গান শেখার সঙ্গে সঙ্গে বাবা ও কাকার সঙ্গে রাত জেগে রেকর্ডের শোনাও শুরু হয়ে গিয়েছিলো। যতখানি শিখেছি তারচেয়ে অনেক বেশী শুনেছি, যে-সে লোকের গান নয়। সেরা শিল্পীদের গান-বাজনা। বিলায়েৎ খাঁ সাহেবও আমাদের বাড়ীতে বাজিয়েছেন। অবিরাম ভাল গানবাজনা শুনে শুনে কান তৈরী হয়ে গিয়েছিলো। আর কানের চেয়ে বেশী তৈরী হয়েছিলো বোধহয় মন। নিজেই নিজের সমালোচক হয়ে বসেছিলাম ভাল করে গান শেখবার আগেই। গাইতে গেলে অজান্তেই ঝোঁক চাপতো কি করে প্রতিটি শ্রুতি, তান ঠিক ঐভাবেই স্পষ্ট সুন্দর হয়ে উঠবে। কিছুতেই যেন মনের মতো হোতো না। সব সময় মনটা খুঁত-খুঁত করতো।'

'শিক্ষা শুরু হয়েছিলো কি রবীন্দ্র সঙ্গীত দিয়েই?'

'ঠিক তা হয়নি। সবচেয়ে মজার কথা কি জানো? আমি গীতবিতানে (তখন কাকাও ওখানে ছিলেন) প্রথম শিক্ষতে আরম্ভ করেছিলাম নাচ গান নয় কিন্তু। অজিতদার কাছে শিখতাম। সেদিন অজিতদার সঙ্গে দেখা হতে হেসে বললেন ঋতু নাচটা একেবারেই ছেড়ে দিলে? ভাবতে এত মজা লাগে।' ঋতু একটু থামে।

'এটা নিছক মজার ব্যাপার নাও হতে পারে। হয়তো নাচ দিয়ে সঙ্গীত শিক্ষা শুরু হয়েছিলো বলেই তোমার লয়টা এত ভালো আর তোমার গানে নাচের মতই একটা প্রত্যক্ষ আবেদন সৃষ্টি হয়। রবীন্দ্রসঙ্গীতের শিক্ষা শুরু হোলো কবে থেকে?'

'কোনোরকম শিক্ষা শুরু হবার আগেই সব গান শুনে শুনে গাওয়ার এবং সকলকে শোনাবার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিলো সে কথা ত আগেই বলেছি। মনে আছে ১৯৫২তেই বোধহয় কাকা ছাদে বসে 'আনন্দধারা বহিছে ভুবনে' গানটি শিখিয়েছিলেন। কাকা পিয়ানো বাজাতেন আমি গাইতাম। তখনও ঐ গানটির খবর কেউ জানতেন না। মোহরদির রেকর্ডও তখন হয়নি। কাকাই শান্তিনিকেতনে গিয়ে দেবোমাথা, রোল করে পড়ে থাকা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ও আনন্দসঙ্গীত থেকে 'আনন্দধারা বহিছে ভুবনে' ও 'জোছনা রাতে সবাই গেছে বনে' গান দুটি আবিষ্কার করেছিলেন। পরে মোহরদি ঐ গান দুটি রেকর্ড করে কি দারুণ হিটসং করে তুলেছেন সে ত জানই?

যাইহোক দক্ষিণীর একটা ফাংশনে আমি ঐ গানটি গেয়েছিলাম। এত এ্যাপ্রিশিয়েশন পাব ভাবিনি। মনে আছে কাগজে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলো। বাবা সেই কাটিং রেখে দিয়েছিলেন।

শিক্ষার পর্ব শুরু দক্ষিণীতেই। ওখানে তখন রবীন্দ্রসঙ্গীত শেখাতেন সুনীল রায়, কমলা বসু, সুচিস্মিতা। হাতে স্টেজ ছিলো। সেখানে বাল্মীকি প্রতিভা অভিনয় হয়েছিলো। দাদা (অরুণ গুহ-ঠাকুরতা) বাল্মীকি হয়েছিলেন। আর দাদাকে বাল্মীকির গান শেখাতেন। আর শুনে শুনে সেইসব গান আমাদেরও শেখা হয়ে যেতো। পাশ্চাত্য সুরের গান, ব্রহ্মসঙ্গীত ভক্তিসঙ্গীত, গানে গানে সংলাপ—এতগুলি কণ্ঠ মিলে খননের মধ্যের নাটকীয় রস সম্বন্ধে মনকে যেন সজাগ করে তুলেছিলো। যখন তখন আপনমনে একসুরে বাঁধা গাইতে গাইতে মনের মধ্যে কেমন একটা বিচিত্র ভাব জেগে উঠতো। এ গানে প্রাণকে মাতিয়ে তোলার ছন্দ আছে অথচ তার মধ্যে একটা বেশ গাম্ভীর্যও আছে। ঠিক যেন রাজদরবারে যাবার ছন্দ। বুকের রক্ত নেচে ওঠে।

কিন্তু রবীন্দ্রসংগীত শিখতাম বলে শুধু তারই মধ্যে কেন্দ্রীভূত থাকতাম না। এক সঙ্গে গীতবিতানেও (দক্ষিণীর ক্লাসিক্যাল গানের ডিপার্টমেন্ট) রাগ-সঙ্গীতের ক্লাস করতাম। গীতবিতানে তখন শেখাতেন গোপাল মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রিকা-মোহন ঠাকুর, সুনীলবাবু। পরীক্ষা নিতেন সুরেশ চক্রবর্তী। গোপালদা বারবার বলতেন 'তোমার গলা ক্লাসিক্যাল গানের। তুমি এতেই মন দাও।'

'ও কথাটা ত আমিও সব সময় বলে থাকি আর আমার মনে হয় সবাই তোমার সম্বন্ধে সেই কথাই ভাবেন। না হলে আসরে তুমি গাইতে বসলেই 'দিন ফুরোলো' 'আজি তোমায় আবার চাই শুনোবারে'। 'কে বসিলে আজি' গাইবার অনুরোধ আসে কেন?'

'অথচ রেকর্ডে আমার ঐ গানগুলির সঙ্গেই তাঁরা পরিচিত বলে?'

'রেকর্ড করবার সময় ঐ গানগুলির কথাই বা তোমার মনে এলো কেমন করে?'

'ঐ ধরনের গান আসরে গেয়ে এ্যাপ্রি-শিয়েশন পেয়েছি বলে?'

'তাহলে ঘুরেফিরে কথাটা দাঁড়াচ্ছে ঐ একটি জায়গাতেই—সবরকম গান জানলেও তোমার কাছে সবাই ক্লাসিক্যাল ঢঙের গানই শুনতে চান কারণ তোমার গলায় ঐ ধরনের গানের বাহারই খোলে ভালো।'

'সত্যি ক্লাসিক্যাল গান আমার খুব ভালো লাগে। কি অদ্ভুত সম্ভার। জানো ছোটোবেলায় কথা হয়েছিলো ওস্তাদজি-বাবার কাছে আমি গান শিখব, উনিও সাগ্রহেই রাজী হয়েছিলেন। অসুস্থ হয়ে না পড়লে কি হোতো বলা যায় না।'

'আর রবীন্দ্রসঙ্গীত?'

'কাল নিশ্চয়ই লাগে। নাহলে ঐ নিয়ে আছি কি করে?'

'কোনটা বেশী আপনার মনে হয় ক্লাসিক্যাল? না রবীন্দ্রসঙ্গীত?'

'কি জানি। ঠিক বলতে পারব না। দুটোর আকর্ষণ দু রকমের—'

'বাইরে গান গাওয়া শুরু হোলো কিভাবে?'

প্রথমে বাড়ীতে কোনো বড় শিল্পী বা আত্মীয়স্বজন কেউ এলেই বাবা গান গাইতে বলতেন সে ত আগেই বলেছি। এমনই করে সকলের সামনে গাইতে গাইতে অপরিচিত লোকের সামনে গাইবার জড়তা কুণ্ঠা একেবারেই কেটে গিয়েছিলো। সে সময়টাকে স্টেজ ফ্রি হওয়ার রেওয়াজও বলা যায়।

এছাড়া ১৯৪৮ থেকে ১৯৬০ সাল অবধি দক্ষিণীর প্রতিটি বাৎসরিক অনুষ্ঠান

রেডিওতে রিলে করা হোতো। মনে আছে আমার তখন তের বছর বয়স। দক্ষিণীরই কনফারেন্সে গেয়েছিলাম 'আমরা চাষ করি আনন্দে' অনেকেই মন্তব্য করেছিলেন সে গান নাকি খুব প্রাণবন্ত হয়েছিলো।

দক্ষিণীর প্রথম কনফারেন্সে আমি গেয়েছিলাম, 'কাল-মৃগয়া' নৃত্যনাট্য হয়েছিলো। সিন্ধ্যা হয়েছিলো বালক আর বালিকা। দাদা (অরুপ গুহঠাকুরতা) দশরথ সেজেছিলেন।

১৯৫৭তে প্রথম রেডিওতে গেয়েছিলাম 'এ মোহ আবরণ', 'ভুল কোরোনাগো' চুপুরবেলার অডিশনে।

এখন গ্রামোফোন কোম্পানীর আর্টিস্ট হলেও আমার প্রথম রেকর্ড বেরিয়েছিলো মেগাফোনের লেবেলে, রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে। কাকার ট্রেনিংএ সেই প্রথম রেকর্ডের গান দুটি ছিলো 'আষাঢ়ের বাদরী' ও 'আজি এ নিরালা কুঞ্জে'।

'ফাল্গুনী' নাটকেও গেয়েছি বেশ কয়েকটি গান।

পি কে সেনের আমলেই গ্রামোফোন কোম্পানীতে এলাম। ভালো ভালো সব গানের রেকর্ড হয়েছে এখানেই। 'বর্ষামঙ্গল' এল পিতে—'আজ তোমার আবার চাই শুনাবারে' ও 'বাজে করুণ সুরে' 'টুয়েলভ ক্লেমস ষ্ট্রিট টেগোর-এ (এল, পি) কাল রাতের বেলা গান এলো মোর বাকীগুলোর সব মনে পড়ছে না, কয়েকটার কথা বলতে পারি। যেমন 'এ কি লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণে', 'মম দুঃখের সাধন', 'মোর পথিকেরে বারি', 'তোমার প্রেমে ধন্য করো বারে' কে বলিলে আজি', 'চরণধ্বনি শুনি' 'তুমি কোন কাননের ফুল', 'ওলো সই ওলো সই', 'আমারেও করো মার্জনা', 'আমার নিখিল ভুবন', 'আজ কেন ওহে পান্থ' রাত্তে বারে আলোর লিখা'। এবারের চারটি গানের কথা ত জানোই?

আর কি? আদর্শ শিক্ষক? এদিক থেকে কাকার (শুভ গুহঠাকুরতা) জোড়া কেউ নেই। যেমন উদার দৃষ্টিভঙ্গি তেমনই শিক্ষাপদ্ধতি। রবীন্দ্রসঙ্গীতেরই শুধু নয়, সকল সঙ্গীতেরই গভীরে প্রবেশ করেছেন যেন আপন অধিকারেই, ক্লাসিকাল কিংবা জানা সঙ্গীতের ধারা সম্বন্ধেও তাঁর সম্পূর্ণ ধরণা আছে বলেই রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্বতন্ত্র স্বরূপটি তিনি এমন করে নিজে হৃদয়ঙ্গম করেছেন এবং শিক্ষার্থীদের হৃদয়ে পৌঁছে দিতে পেরেছেন। শুধু আমি নয় কাকার কাছে একবারই যে শিখেছে এই শিক্ষকেই সে মনপ্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছে। যে পরিচ্ছন্ন পরিবেশনার জন্য দক্ষিণীর অনুষ্ঠান বিদগ্ধ সমাজে এমন জনপ্রিয়, তার মূলেও আছে কাকার অতন্দ্র দৃষ্টি। অনুষ্ঠানগুলি এমন করে সাজানো হয় যাতে সমবেত কণ্ঠের গানেও ধ্বনিবৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলতে এবং গানের বিষয়বস্তুর অনুযায়ী অনুষঙ্গ থাকে। তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ প্রতিটি অনুষ্ঠানেই একজন, দুজন করে নতুন শিল্পীর গান দেওয়া হয় যাতে সম্ভাবনার প্রতিভা থাকলে রসিকজনমাত্রের তাদের সঙ্গে পরিচয় ঘটে।'

'এইভাবেই আমরা বর্তমান বক্তা এবং শ্রোতাকেও পেয়েছি'

হাসি-ঝলমল মুখে ঋতু বলে চলে—'দক্ষিণীতে শিখেছি দশ কি বার বছর। কিন্তু সে শিক্ষার চর্চা, সাধনা আজও শেষ হয়নি। বোধহয় সারাজীবনেও হবে না। শুধু রবীন্দ্রসংগীত কেন, যে কোনো সঙ্গীতবিদ্যাই বোধহয় তাই। চর্চার সঙ্গে সঙ্গে তার নতুন নতুন রূপ আবিষ্কার সঙ্গে তার নতুন নতুন রূপ আবিষ্কার করবার কোমাণ্ড লাগে। রবীন্দ্রসংগীতে সতেরোটি ধারার প্রবাহ এবং রবীন্দ্র-কর্মবিকাশের তিনটি স্তরকে কাকাই প্রথম অনুভব করেছিলেন এবং এই অনুভূতিটি আমাদের হৃদয়ে সঞ্চারিত করতে চেয়েছিলেন। ঐ উপলব্ধির আলোতেই কবির গানকে চেনবার সুযোগ পেয়েছি।'

'শিশুকাল থেকে আজ অবধি সঙ্গীত-সাধনার কোনো ছেদ পড়েনি?'

'বিয়ের পর চার পাঁচ বছর আমার নিজের দিক থেকেই একটা শৈথিল্য এসে পড়েছিলো। রেডিওতে গাইবার তাগিদ না থাকলে বোধহয় গান গাওয়ার সঙ্গে কোনো সম্পর্কই থাকতো না।'

'কেন? শ্বশুরবাড়ীর এ বিষয়ে কোনো উৎসাহ ছিলো না?'

বরং ঠিক তার উল্টো। গানকে ওঁরা সত্যি করে ভালবাসেন বলেই গান আমার জীবনের সঙ্গে আজও এমন করে জড়িয়ে আছে।'

'সেইটেই স্বাভাবিক। কারণ বুদ্ধদেব-বাবু (গুহ। বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যসেবী। সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গীতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক অস্বীকার করবার মত বে-বরদাস্ত মানুষ তিনি নন।'

বুদ্ধদেব গানও ভালো গাইতেন এবং এখনও ভালো গান। উনিও দক্ষিণীতে অনেকদিন শিখেছেন। তবে নিয়মিতভাবে চর্চা করবার ধাত ওঁর নয়।'

'দক্ষিণীতে কি দুজনেই স-তীর্থরূপে শিখেছিলে?'

'হ্যাঁ, ১৯৬২ সালে দক্ষিণীর ছাত্র ছিলেন। আমিও তখন শিখতাম।'

তারপরের অধ্যায় সহজেই অনুমেয়। অতএব এ পর্বের বিস্তৃত বিবরণ নিষ্প্রয়োজন। ঋতুর গানে আবেগ ছাড়াও যে বুদ্ধিমার্জিত বৈদগ্ধ্যের স্বাক্ষর মেলে আমার ধারণা তার মূলে শুদ্ধতার শিক্ষা, পারিবারিক ঐতিহ্য ছাড়াও বুদ্ধদেববাবুর দৃষ্টিভঙ্গিরও বেশ বড় একটা অংশ আছে।

'একালের রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিপুল উচ্ছ্বাস? এ কি বুদ্বুদ না সাগরের মতন গভীরতার সমধর্মী?'

'এক কথায় এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া কঠিন। দেখ, ভারতীয় বিদ্যা গুরুমুখী। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে সর্বার্থে গুরুর শিক্ষা পেয়ে গানের ডিটেইলসে যাবার চেষ্টাটা আপনা থেকেই জন্মেছে। ভালো ভালো শিল্পীর অজস্র গান শুনে এ সম্বন্ধে একটা ধারণা গড়ে নেবার সুযোগ পেয়েছি। তবু আমার গানে আমি খুশী নই। মনে পড়ে প্রথম যখন দক্ষিণীর ফাংশনে অথবা রেডিওতে গাইতাম, অনেক জায়গা থেকে চিঠিপত্র আসতো, অভিনন্দন জানিয়ে, গানের তালিকা দিয়ে সেইসব গান গাইবার অনুরোধ জানিয়েও। সেসব চিঠি কাকা বা বাবাকে দেখাতাম। কিন্তু দেখাবার আগে ভয়ও করতো। ওঁরা যদি মনে করেন এইসব প্রশংসাকে বিশ্বাস করে নিয়ে নিজের সম্বন্ধে মস্তবড় কোনো ধারণা নিয়ে বসে আছি? কিন্তু ঠিক এইভাবেই একদিন অনাদিদার (অনাদি দস্তিদার) চিঠি এসেছিলো, তাঁর আশীর্বাদ বয়ে নিয়ে। সে মুহূর্তটি আজও অবসর সময়ে মধুর আশ্বাসের মতই মনের নিভৃতলোককে সরস করে তোলে।

আর আজ? প্রোগ্রামের পর বহু লোকের অকৃপণ অভিনন্দনে আনন্দ নিশ্চয়ই হয়—নইলে গাইবই বা কেন? কিন্তু কিছুক্ষণ বাদেই মনে হয়, এঁদের মধ্যে অনেকেই হয়ত ভদ্রতার খাতিরে ভালো বলতে হয় বলেই ভালো বলে গেলেন। কই তেমন কিছু ভালো ত গাইনি? প্রথমেই তোমায় বলেছি কান ও রুচি তৈরি হবার দরুন শুধু নিজেই নিজের সমালোচক বনে যাইনি। আমরা ভাইবোনেরা পরস্পর পরস্পরের ক্রিটিক। অনেক সময় গান গেয়ে মনে হয়েছে, সুর-তাল সবই ঠিক হয়েছে কিন্তু কিসের যেন একটা অভাব থেকে গেছে। যে একসপ্রেশনটি হওয়া উচিত ছিলো হয়নি। হতে না পারার কারণ, ঐ সময়ে মনটা একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলো। গানের পর বাড়ীতে এসে আশিসদা (ডকুমেন্টারী ফিল্মের সুবিখ্যাত আশিস মুখোপাধ্যায়) রণো কিংবা বাপি যেই বলতে এলো 'আজ তোর গানটা—' আমি ওদের বাধা দিয়েই বলে উঠি—থাক আর বলতে হবে না। আমি জানি তোরা কি বলবি? এই, এই কারণে গানটা তেমন উতরোয়নি। এই ত? সে-কথা আমি গাইবার সময়ই বুঝতে পেরেছি।'

নিজের সম্বন্ধে এই বলিষ্ঠ, গঠনমূলক সমালোচনাও শিল্পীর একটা অংশ বলে আমি মনে করি। বাবা, কাকা, কাকিমা (সুবী গুহঠাকুরতা) সবাইর গান গাওয়ার এবং সকলের গান সম্বন্ধে মন্তব্য করবার অভ্যাস থাকার দরুন এ-শিক্ষাটা এত সহজে আমাদের মধ্যে ঘটেছে।

কিন্তু এখন রবীন্দ্রসংগীতের আসরে দেখেছি একটু শিখতে-না-শিখতেই জাহির-পনা ও হাততালি নেবার উৎসাহে সকল নাটকীয়তা সৃষ্টির নেশা অনেক অল্প-বয়সীদের গাইয়েদেরও এমন করে পেয়ে বসেছে যে এ-মোহ আবরণ ছিন্ন করে মুক্ত দৃষ্টিতে নিজের যথার্থ মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়। আর এ-মূল্যায়ন করার যোগ্যতা অর্জন না করলে রবীন্দ্রসংগীত কেন কোন সংগীতেই স্থায়ী কোনো আবেদন সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। অথচ এঁরা

অনেকেই সুকণ্ঠের অধিকারী। কাজেই রবীন্দ্রসংগীতের এ-উচ্ছ্বাস স্থায়ী হবে কিনা সেটা নির্ভর করে এঁদের দায়িত্ব-জ্ঞানের ওপর।

বাইরে গাইবার জন্য ব্যস্ত না হয়ে নিজেকে তৈরি করার দিকে মন দিলে এঁরা রবীন্দ্রসংগীতের এই প্রবাহকে (১৯৬২—৬৭ অবধি যার গতি উত্তাল) অব্যাহত রাখতে পারবেন বলেই আমার বিশ্বাস।'

'তুমি কোনোদিন বাইরে গাইবার জন্য ব্যস্ত হওনি?'

'কোনোদিনও না। কারণ আমাদের কানের কাছে সবসময় মন্ত্র পড়ার মতো শেখানো হোতো—আগে নিজেকে তৈরি করতে হবে, তারপর অপরকে শোনাবার প্রশ্ন। গাছের ঘন-পাতার আড়ালেই কুঁড়ির সাধনা চলে ফুল ফোটার মহৎ পরিণতিতে পৌঁছবার। তারপর ফুলটির যখন পূর্ণ বিকাশ ঘটে, কাউকে খবর দিতে হয় না। গন্ধই তার ফোটার বার্তা সকলের কাছে পৌঁছে দেয়।

বাইরে গাওয়ার ব্যাপারে আমাদের অভিভাবকেরা বড়ই রক্ষণশীল ছিলেন। চট করে সব-জায়গায় গাইতে দিতেন না। এবং তাঁদের এ-শাসন আমরা শুধু মেনেই নিইনি, ভালোবেসে মেনেছি। আর তার ফলে দেখেছি ভালোই হয়েছে। নিজের সম্বন্ধে সব দুর্বলতাকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে নিজেকে না ঠকিয়ে, নিজের যোগ্যতা-অযোগ্যতা সম্বন্ধে ধারণা গড়ে নিতে হয়। নিজেকে যদি নিজে না ঠকাই, তাহলে পৃথিবীতে কঠোরতম সমালোচকও আমাদের দুঃখ দিতে পারবেন না। এইভাবে ভাবাটাই আমাদের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে।'

'রবীন্দ্রসংগীতে তোমার আদর্শ কে?'

'অফকোর্স মোহরদি। কণ্ঠ মাধুর্য, গায়কী গাইবার তন্ময়তা সব দিক বিচারেই।'

'তোমার গানে মোহরদির আদলটা বেশ পাওয়া যায়—কিন্তু তার সঙ্গে তোমার মৌলিকতাও আছে বলেই নকলনবীশ বলে মনে হয় না। যেমন হেমন্তদা কিংবা অজস্র নকলনবীশরা অনেকদিন ধরে গাওয়া সত্ত্বেও মনে কোনো দাগ কাটতে পারছেন না যদিও প্রথম দিকে এঁদের ওপর সকলের আশা ছিলো অনেক।

এটা আমাদের পরিবারগত সমালোচনার সম্মার্জনীর অবদান। মোহরদির গান খুব ভালো লেগেছে—বলে অলক্ষেই তাঁর প্রভাব গানে এসে পড়েছে। কিন্তু সচেতন মন নিয়ে যখন বিচার করে দেখেছি—কি. কি. কারণে মোহরদির গায়কী ওঁকেই মানায় এবং তার কতটা 'গ্রহণ' করলে—আমার স্ব-বিকাশের অনুকূল হবে, কতটা নয়—তখনই বুঝেছি ভাল লাগলেও কোথায় সীমারেখা টানা প্রয়োজন।

'তোমার বৈশিষ্ট্য তোমার মতে কোথায়?'

'প্রথমতঃ আমি খোলা গলার গাইবার পক্ষপাতী—তারপর স্কেলেরও একটা ব্যাপার আছে। এই দুটিকে বজায় না রাখলে আমার গান কলে চেনা যাবে না।

'রবীন্দ্রসংগীতের 'গায়কী'—নামে যে গোলমেলে কথাটা আছে সে সম্বন্ধে তোমার বক্তব্য?'

'গায়কী-তৈরী হয় প্রতিটি শিল্পীর প্রতিভাভঙ্গির নকসা অনুযায়ী। রবীন্দ্রসংগীত গাইবার আগে বুঝে নিতে হয় তাঁর টেম্পারামেন্ট বা মেজাজ। আর সেই মেজাজ অনুযায়ী কোন শ্রুতিতে কতটা দাঁড়াতে হবে, কোন পর্দা ছুঁয়েই চলে যেতে হবে—এসব খুঁটিনাটি স্কিলিস নিয়ন্ত্রণ এই দুটি বস্তুর সমন্বয়েই গায়কী গড়ে ওঠে। অন্যভাবে বলা যায়, সৌন্দর্য-চেতনাটাই রবীন্দ্রসংগীতের মধ্যেকার সবচেয়ে বড় কথা। এই বোধ জন্মালে গায়কী আপনা থেকেই গড়ে ওঠে।'

'এই বোধটা যার সহজাত অবশ্যই পারে সে ফুল ফোটাতে।' কিন্তু সহজাত সৌন্দর্যচেতনা নিয়ে যারা জন্মায় না, তাদের ক্ষেত্রে?'

'ভিতেলসে যাবার চেষ্টা করতে হবে সদ্গুরুর নির্দেশে। তখন মন্ত্রসিদ্ধির মতই গায়কী আপনা থেকে গড়ে ওঠে।'

'আজকাল অনেক সময় একটা অভিযোগ শুনতে পাওয়া যায়—অমুকের গান রাবীন্দ্রিক নয়, অতএব রবীন্দ্রসংগীত তার গাওয়া উচিত নয়। এ-সম্বন্ধে তোমার অভিমত?'

'এরকম কোনো গোঁড়া এবং সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিতে আমার মন কোনোদিনও সায় দেয় না, যে ভালোবেসে কবির গান গাইতে চায় তারই এ-গান গাইবার অধিকার আছে বলে আমি মনে করি। আন্তরিকতার একটা মূল্য নিশ্চয়ই আছে। একনিষ্ঠতার সঙ্গে গাইতে গাইতে একদিন-না-একদিন আপনা থেকেই উপলব্ধির দ্বার খুলে যায়।'

'উদার দৃষ্টিভঙ্গির পক্ষপাতী হলেও, একটি বিষয়ে আমি খুব স্পর্শকাতর। কিছু গান, কয়েকটি শিল্পী যা গেয়েছেন এবং গানের বক্তব্যকে এমন করে হৃদয়ে পৌঁছে দিয়েছেন যে, যতদিন তাঁদের গাইবার শক্তি থাকবে, এসব গান আর কারো গাওয়া উচিত নয় বলেই আমি মনে করি।'

আশিসবাবু উপস্থিত ছিলেন এ-আলোচনা-সভায়। তিনি ও কতু প্রশ্ন একসঙ্গেই বলে উঠলেন। 'সেট অনেকটা নির্ভর করে মনের কোন্ অবস্থায় কোন্ বিশেষ মুহূর্তে আপনি কোন শিল্পীর কণ্ঠে কোন্ গান শুনেছেন তার ওপরে। একবার কোনো এক শিশু সম্মেলনে 'মা' স্লাইড রিলিজ হবার আগে পংকজবাবু উদ্বোধনী জাতীয় বলে একটি গান গেয়েছিলেন — 'আজ ভুবনমনমোহিনী'। প্রথমেই এমন করে মা-আ-আ তানটি দিয়ে গান শুরু করলেন—প্রত্যেকটি শ্রোতার মন কেন জানিনে কেঁপে উঠেছিলো। সেই মুহূর্তের জন্যই ঐ গানটার সঙ্গে পংকজবাবুর নাম আমাদের মনে এমন করে একাকার হয়ে গেছে।

আর একবার বাবুলেরই একটা ফাংশনে হেমন্তবাবু ও মোহরদির পৈতে অনুষ্ঠানের আগে মোহরদি একা গাইলেন 'বিনোদ বেলার'। খুব সহজ সুর। সোজা গান।— আশিসবাবু বিভোর হয়ে বলে চলেন, কিন্তু মোহরদি এমন করে গেয়েছিলেন যে, আমাদের সকলের চোখে জল এনে দিয়েছিলো। পাশে অরুন্ধতীদা বসেছিলেন। দেখলাম উনিও ঢোক গিলছেন। কাজেই ওটা খানিকটা অ্যাসোসিয়েশনের ওপর নির্ভর করে না কি?'

'যার ওপর নির্ভর করুক আমার মত অনড়'—

'সবরকম গানকে ভালোবাসলেও রবীন্দ্রসংগীতকে সবচেয়ে ভালোবাসলে কি কারণে?'

'রবীন্দ্রসংগীতকেই সবচেয়ে ভালোবাসি এমন কথা ত বলিনি? রবীন্দ্রসংগীতের কথা, সুর এবং তাদেরও অতিক্রম করা ভাবের জন্য মন টানে সত্যি। কিন্তু ক্ল্যাসিকাল গানে ভাবের অন্তহীন বিস্তার? এরই বা তুলনা কোথায়? কি জানি, কোন গান যে সবচেয়ে ভালোবাসি ঠিক বুঝতে পারি না। চীফবাবু অসুস্থ হয়ে না পড়লে আমার গানের জীবন কোনদিকে মোড় নিতো বলা শক্ত।'

এই অকপট স্বীকারোক্তিতে শিল্পীর মুক্ত অজস্র মনটি যেন নিবাহ সরলতায় তার গানেরই মত মন কেড়ে নিলো।

মনে পড়ে গেলো জিলীপদার (রায়) একটি ইংরাজী কবিতার সুন্দর অনুবাদ। একটি মেয়ে ভালোবেসেছিলো, পাহাড়, নদী, আকাশ, ফুল সকলকেই। তাকে একদিন বলা হোলো সবার মধ্যে থেকে একজনকেই বেছে নিতে। কিন্তু সে পারলো না। কারণ?

ঐশ্বরাচারিণী হোতো নিতে,
যদি দিতো জানা
শুধু একটি পথ।'

'ইউফুলনেস ইজ ওয়ানস সেলফ'—অজুর গলে এ-কথা সত্যি হয়ে উঠেছে বলেই তার গানকে জানার আনন্দ ফোনোদিন ফুরোবে না।

সন্ধ্যা সেন

CENTRAL LIBRARY

কবিতা

ভরা বাদর ॥

কৃষ্ণ ধর

আকাশে স্বল্প আর বাদল মেঘের ছাউনি
পড়েছিল একসঙ্গে
আপিস যাবার মুখে ভি অই পি রোড
জাম্বুড়া গাছের তলায়
আকাশের সেই প্রমথস্ত্র রেখাপথ নিম-রোদের দিকে তাকিয়ে
মনে হল বর্ষা নামল বলে

ওই কালো মেঘটা আস্তে আস্তে গাঢ় হতে হতে
ফাদা মেঘের চেহারা নেবে
এবং তারপর জলকাদা ছিটিয়ে
ভয়াট করে দেবে
বিখ্যাত বাঁশতলা, প্রবল নর্দমা, বাহারী বাঁশঝাড়, বাবুদের।

বাস থেকে তখন আশ্রয় নিয়েছে
একটা পাগল, ছন্নছাড়া ভিখিরি, গুটিকয় যাত্রী
আর একটা উটকো ষাঁড়
সবাই পালাপালি ঘেঁষাঘেঁষি সন্তর্পণে সহ অবস্থান
এর মধ্যেই বাতাসে জলের ঘনঘন শ্বাস
মোরতে-যাওয়া চারা গাছটার ছুটকো দু-একটা পাতা
থরথরে কাঁপছে।

এখন স্মৃতির এই বয়স্ক প্রহরে ॥

শিশির ভট্টাচার্য

এখন,
স্মৃতির এই বয়স্ক প্রহরে
নিতান্ত সম্ভব নয় হলুদ বিকেল কোন
নতুন কালের চাষ। স্পষ্টতই,
সাবলীল ওড়ুপ মালীর মত
শেফালী সকাল থেকে বকুল বিকেল ছুঁয়ে
রোজ ঘরে ফেরা যেন কানামাছি খেলা—
হাসাকর অতি।।
এখন দুরন্ত পায়ে আশ্বিন সময়
ঐশ্বর্যবান সতত ছোঁয়ার আগে,
পিছে পিছে সামাজিক আসনে বসনে
আর রেশনের থলে কিংবা কেরোসিন
খুঁজে ছোটাছুটি বিপন্নীত বাঁকে।।
ছেঁড়াখুঁড়ি আকাশে, নিলাম্বুদ নাহ মনে
আশ্বিন মাসের মত জলজগুল্মের জালে
শরৎ জড়াজড়ি। অথবা
চাঁদমল শীতে ছিঁড়ে আন বাঁশ চাঁছ
বকুল থলে ঘোরাটে আকাশে।।

বেনো জলে ॥

তৃপ্তি মিত্র

অসতী ভাস্বতী তুমি
বেনোজলে ভেসে আসা
চাঁদ।
আমাদের লুব্ধ করে
ঊর্ধ্বে সৃষ্টি,
প্রখর প্রমাদ।
নিতান্ত বাঁদরা ঘাই
অন্ধ অন্বেষায়;
রক্তকরা হৃৎপিণ্ড
বিস্মরণে স্তব্ধ
হতে চায়।

তোমার কিঙ্কিণি ধ্বনি
মর্মান্তিক
চাবুকের প্রায়,
নেমে আসে চকিত বিদ্যুৎ
নিশার অন্তরে আমি
রক্তের অঞ্জলি
ধরি যে প্রস্তুত।

অমৃত

শারদীয় অমৃত ১৩৮২

অমৃতের শারদীয় সংখ্যা এবার মহালয়ার অনেক আগেই বেরোবে

॥ এ সংখ্যার একটি বিশেষ আকর্ষণ ॥

শরৎচন্দ্রের অপ্রকাশিত
একটি নাটকের পাণ্ডুলিপি

অসম্পূর্ণ এই পাণ্ডুলিপির অজস্র ফ্যাকসিমিলি রকসহ শরৎ-বিশেষজ্ঞ
শ্রীগোপালচন্দ্র রায়ের মূল্যবান টীকা ও পটভূমি বর্ণনা

৫ খানি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস

তার মধ্যে একটি রহস্য উপন্যাস লিখছেন—

আশাপূর্ণা দেবী ।। উত্তর পুরুষ
নিমাই ভট্টাচার্য ।। ইন্‌কিলাব
চাণক্য সেন ।। 'সতীদাস কলকাতায় বেঁচে আছেন
অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় ।। ফুল ফুটছে
অদ্রীশ বর্ধন ।। বনমানুষের হাড়

অরণ্যের পটভূমিতে সুদীর্ঘ কাহিনী

বুদ্ধদেব গুহ ।। রৌদ্র

বাংলার প্রবীণতম থেকে শুরু করে নবীনতম গল্প লেখকের প্রায় কুড়িটি বাছাই করা গল্প
মূল্যবান সুখপাঠ্য কয়েকটি নিবন্ধ। সুনির্বাচিত কবিতাগুচ্ছ ও অন্যান্য রচনা

দাম—৭·৫০পঃ

নতুন বই

আমি হতে চাই : হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। মনীষা, ৪।৩ বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-১২। কুড়ি টাকা।

স্বচ্ছ ও ঝরঝরে গদ্যে রচিত এই গ্রন্থটিকে লেখক স্মৃতিচারণ বা আত্মজীবনী বলতে কুণ্ঠিত হলেও পাঠকের কাছে তা হলেও স্মৃতিকথা এবং উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতার চিত্ররূপেই গৃহীত হবে। আত্মকথা রচনায় যে-প্রলোভন অনেক লেখকের নিজের গুরুত্বকে অযাচিতভাবে গুরুত্বে বিভ্রান্ত করে, হীরেন্দ্রনাথের লেখা বাহুল্যবর্জিত সেই-বিষয়ে নির্মোহ। তিনি এতে পরিবেশ প্রত্যক্ষ ও প্রত্যয়ের বক্তব্যে আখ্যা দিয়েছেন নিতান্ত আনংকারিক বর্ণনার জন্য নয়। এ-তিনেরই চিত্রণ ও বিশ্লেষণ তাঁর অভিষ্ট। তাঁর জীবনে অভিজ্ঞতা কিভাবে ধীরে ধীরে উন্মোচিত হয়েছে এবং কিভাবেই বা জীবন-প্রত্যয় হয়েছে অর্জিত নানা সংঘাতের বিরুদ্ধে, এ-গ্রন্থ তারই ভাষ্য। লেখক একজন সুবিদিত বুদ্ধিজীবী, সাম্যবাদী এবং সংসদীয় রাজনীতিতে খ্যাতিমান। কীভাবে সাম্যবাদকে বিশ্ববীক্ষারূপে নিজের জীবনে ও কর্মে গ্রহণ করলেন পাঠকের কাছে তার কোতূহলও অপরিসীম। ভারতবর্ষের সাম্যবাদী আন্দোলন আজ বহুধা-বিভক্ত এবং প্রাক্তন সহকর্মীরা পরস্পর বিরোধী শিবিরের অন্তর্ভুক্ত হয়ে লেখায়, বলায় ও আচরণে জাতিশত্রুতার চরম নজির রাখছেন অনেকেই। হীরেন্দ্রনাথের রচনায় তার কিছুমাত্র নেই। প্রাক্তন সহকর্মীদের বিষয়ে সশ্রদ্ধ উল্লেখ, কখনো বা তাঁদের সম্পর্কে বেদনাতুর স্মৃতি ও আবেগ এই রচনাকে অসামান্যতা দিয়েছে। কুদ্রতা, সংকীর্ণতা বা দৃষ্টিভঙ্গির গোঁড়ামির কোনো আবিলতা তাঁর সহিষ্ণু, সর্বোত্তভদ্র ও পরিশীলিত মনকে স্পর্শ করতে পারেনি। গ্রন্থটিতে সে-কারণেই মাননীয় গুণাগুণের প্রভূত পরিচয় আবিষ্কার করতে পারবেন পাঠক এবং তা একজন প্রসিদ্ধ সাম্যবাদীর কলমনিঃসৃত বলে বিস্মিত ও পুলকিত হবেন। লেখক গোড়াতেই বলেছেন যে, যথাসম্ভব সত্য কথনই তাঁর প্রচেষ্টা। সজ্ঞানে সত্য গোপন তিনি করেননি কিংবা অসত্যের আশ্রয়ও নেননি। এটা মহামূল্যবান কথা। এর ফলে লেখকের সঙ্গে যে-পাঠকের মতের অমিল ঘটবে, তার কাছেও লেখকের প্রচেষ্টার প্রতি শ্রদ্ধা থাকবে অবিচল।

একেবারেই কলকাতিয়া নাগরিক তিনি। আলভলায় শিক্ষিত, সচ্ছল, মর্যাদিত ব্রাহ্ম ঘরের ছেলে। সেই পরিমণ্ডলে থেকেও বিপ্লবী মেজাজ ছিল অনুপস্থিত। ছিল চোখাপড়ার পরিবেশ, ইংরেজি শিক্ষার আগ্রহ এবং সংস্কৃত ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা।

সাংবাদিক ও আইনজীবী পিতা শচীন্দ্রনাথের সূত্রে অল্পবয়সেই তিনি সে-যুগের লেখক, সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদদের সংস্পর্শে আসেন। কিন্তু প্রত্যক্ষ রাজনীতি তিনি কখনো করেননি, কলেজে বা য়ুনিভার্সিটিতে পড়বার সময়েও না। বরং তাঁর আকর্ষণ ছিল সাংবাদিকতার প্রতি। সাহিত্যও তাঁকে টানত। এই গ্রন্থেও ঘুরে-ফিরে সাহিত্য ও শিল্পের কথাই বেশি এসেছে। রাজনীতির বর্ণনা এসেছে পারিপার্শ্বে ও পটভূমিকে ফুটিয়ে তোলার জন্যই। কেননা, হীরেন্দ্রনাথ কম্যুনিস্ট পার্টিতে আসেন অনেক পরে, অক্সফোর্ড থেকে ফেরার পর, ১৯৩৬ সালে প্রেমচন্দ হোশীর বাক্তিত্ব ও সংগঠন ক্ষমতায় আকৃষ্ট হয়ে। অবশ্য কমিউনিজম সম্পর্কে তাঁর আকর্ষণ ঘটে ছিল অনেক আগেই, কলকাতায় অ্যালবার্ট হলে বিলাতের হাউস অভ কমন্সের ভারতীয় কম্যুনিস্ট সদস্য শাপুরজী সাকলাতওয়ালার আশ্চর্য বক্তৃতায় ও বাড়িতে এবং তার কিছুকাল পর অক্সফোর্ডে পড়বার সময়ে সংবাদ ফ্রহীরের প্রভাবে। এক জায়গায় তিনি বলেছেন পুনর্জন্মের স্বপক্ষে শাস্ত্রীয় মতে উপনয়নের সময়ে দ্বিজত্ব-বোধ মনে আসেনি, কিন্তু ১৯৩৬ সালে বিশ্ববিশ্রুত কম্যুনিস্ট পার্টির অন্তর্ভুক্ত হয়ে এবং অনন্তপুর কম্যুনিস্ট আইতে হয়ে জীবনের এক অভিনব অধ্যায়ে যেন প্রবেশ ঘটল।' কিন্তু তাঁর স্বভাব ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্যই বোধহয় তাঁর মনে হয়েছে 'এই অদ্ভুত অথচ মোহনীয় এক পরিবারে যেন আমি দত্তক' হয়ে ঢুকেছি।' তাই বিপ্লবী কমিউনিস্টের তীব্রতা ও অধীরতার পরিবর্তে এই গ্রন্থের ধর, পড়েছে এক-জন ভদ্র শিক্ষিত, রুচিশীল, সহিষ্ণু ও উদারচেতা মানুষের বোধ ও বুদ্ধির পরিচয়। প্রেসিডেন্সী কলেজে তাঁর শিক্ষক প্রফুল্ল-চন্দ্র ঘোষ, কুরাতিয়া জাকারিয়া সম্পর্কে তাঁর আবেগ যেমন সৎ ও আন্তরিক, তেমনি সহজ ও অনুরোধ তাঁর পরবর্তী যুগের সহ-কর্মী স্নেহাংশু আচার্য বা অন্য শিবিরভুক্ত দিল্লীর সাদাৎ আলী খানের বন্ধুত্ব ও সৌজন্যের প্রতি। কিংবা সেই সিংহল তরুণী পার্টি কমরেড উচ্ছল, শীতল প্রণয়নিষ্পৃহা অনিল ডি সিলভার মধুর স্মৃতিও তিনি এখনও অকপটেই লালন করেন। সমানা বিরূপতা যাঁদের প্রতি প্রকাশ পেয়েছে, যেমন মানবেন্দ্রনাথ রায়ের প্রতি, তা ব্যক্তিগত নয়, এই বহুকর্মা ব্যক্তির প্রতিভা স্বীকার করেও তাঁর ভ্রান্তির জন্য।

গান্ধীজী বা জওহরলালের প্রতি তাঁর আকর্ষণের হেতু অন্য। তাঁদের নীতির জন্য নয়, তাঁদের ব্যক্তিত্ব ও ভারত-ইতিহাসে তাঁদের কতখানি ঐতিহাসিক ভূমিকার জন্য। ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির বহু বিষয়ে ভুলও তিনি অকপটেই স্বীকার করেন। যথা, দ্বিতীয়বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী যোগ না দেওয়া কিংবা যুদ্ধের সময় সুভাষচন্দ্রের বিরোধিতা। পার্টি সেক্রেটারি অজয় ঘোষ পরে সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে পার্টির বক্তব্য প্রত্যাহার করে ভুল স্বীকার করেন।

স্তালিন বিষয়েও হীরেন্দ্রনাথ মনে করেন স্তালিনের রচনা থেকেই লেনিনবাদের শিক্ষা এত সহজ ও সুগম হয়েছিল। হীরেন্দ্রনাথের গ্রন্থে রাজনীতি প্রায়শ উপস্থিত হলেও, এতে শিল্পী, সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদদের কথাও যথেষ্ট সন্নিবিষ্ট হয়েছে। এতে তাঁকে খুব বড় কিংবা ক্রিয়াকর্মী রাজনীতিবিদ হিসেবে খুব বেশি পাওয়া যায় না। কেননা, সবে তিনি পার্টিতে ঢুকেছেন এবং তাঁর কাজ মুখ্যত সাংস্কৃতিক ফ্রন্টে, পার্টিও তখন বে-আইনী। তবে পাওয়া যায় তাঁর চোখ দিয়ে পার্টির কাজ-কর্মের ব্যাখ্যা ও বিচার যা তিনি কারো মুখাপেক্ষী না হয়েই করেছেন নিঃশব্দ-ভাবে। বইয়ের সময় পরিধি ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত। অর্থাৎ লেখকের সংসদীয় জীবন তখন আরম্ভই হয়নি। সুতরাং তাঁর রাজ-নৈতিক কর্মের পরিপূর্ণ বিকাশের সময় তাঁর উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতার পরিচয় জানতে হলে গ্রন্থের পরবর্তী খণ্ডের জন্য আমাদের সাগ্রহে অপেক্ষা করতে হবে। তবু হতে তাঁর নামকরণে একটা পূর্ণতা বা সমাপ্তির ইঙ্গিত আছে। লেখকের জীবন ও কর্ম তা বলেবলিষ্ঠ। সুতরাং এবার তাঁর কাছে হয়তো চাওয়া যেতে পারে সেই প্রত্যয়ের যুগ বিশ্লেষণ যা স্বাধীনতার পর থেকে আজ এই সত্তরের দশকে বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনে চরম বিরোধ ও তার বৈশ্বিক প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে বিপন্ন জিজ্ঞাসায় উদ্যত ও আকুল।

কৃষ্ণ ধর

মগরা থেকে আগ্রা (উপন্যাস)—শ্রীঅবনী সাহা। জ্যোতি প্রকাশন, ২-এ, নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা—৯। তিন টাকা।

রেজগাঁদাদা মগরায় থাকে। বঙ্কাবাবুকে ডেকে পাঠালো মগরায়—ওখন থেকে আগ্রা রওনা হবে। বয়স পঁয়তাল্লিশ, গোল চেহারার রেজগাঁদাদার বড় পাটাই গোঁফ, সে অবশ্য নিম্নতলার কঠের কারবারী। এর সঙ্গী হল তার শালা সুরসিক সিকদার-বাবু, 'ছাটভাই দু-আনী ইত্যাদি. এদের সদলবলে যে আগ্রা ভ্রমণ এবং সেই সূত্রে গড়গড়িয়ার সঙ্গে যোগাযোগ—এইসব মিলিয়ে শ্রীঅবনী সাহা ছোটদের জন্যে একটি চমৎকার ভ্রমণ-কাহিনী লিখেছেন মগরা থেকে আগ্রা নামে। উপন্যাসের কাহিনী, বিবিধ বিচিত্র ঘটনা সংস্থান, সংলাপ গড়গড়িয়া ও রেজগাঁদাদার চরিত্র—ইত্যাদি উপন্যাসটিকে মনোজ্ঞ ও স্বতঃস্ফূর্ত করেছে। হাস্যরসের তুফান আছে এ গ্রন্থে। অসম্ভাবিতপূর্ণ কাহিনীর উপস্থাপনে ও কোথাও বাড়াবাড়ি মনে হয়নি। গ্রন্থটি সার্থক শিশুসাহিত্যের ইতিহাসে স্থান পাবার যোগ্য।

CENTRAL LIBRARY

নির্জন খেলা

চিরঞ্জন সাহিতি

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আমি বন্ধ কাচের জানলায় মুখ ঠেকিয়ে চোখ পেতে বসে আছি। মেঘে মেঘে বন্দুকীর চন্দ্রমল্লিকা খেলা শুরু হয়ে গেছে। বাজের আওয়াজ পাচ্ছি মাঝে মাঝে। এখানে মেঘের ডাক বড় অদ্ভুত বাজতে থাকে। মেঘ ডাকলে আমি জানালার পাল্লা একটুখানি খুলে কান পেতে থাকি। শব্দটা একবার বুকে উঠে গেলেই হল। তারপর পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে গিরিগহ্বরে ভেতরে ভেতরে সেই ভারি আওয়াজটা বাঘের গর্জনের মত ঘুরপাক খেতে খেতে ফিরতে থাকবে। কিছুক্ষণ পরে হাঁফাতে হাঁফাতে শব্দটা চলে যাবে পাহাড়ের পর পাহাড় ডিঙিয়ে।

একটা বাজ পড়লেই দারুণ আওয়াজ হবে। সঙ্গে সঙ্গে একটা ফুরফুরে পাখি ডানার বুকে বয়ে আওয়া দুই বা তারধারটির তীব্র থেকে লম্বা পাখা দুটিতে ভাসিয়ে উড়ে গিয়ে আবার একটু দূরে বসল।

ভাগ্যিস এসে জানাল, এ বৃষ্টিতেও কাটি পেসন্ট আমার ডিস্পেনসারির বাইরে বসে অপেক্ষা করছে।

নীচে নেমে এলাম। চাষাভুষো কাটি লোকেরা ছেলেবুড়ো সবাই গুটিসুটি মেরে বসে আছে। একটি জোয়ান ছোঁড়া হিহি কাঁপুনি কাঁপছে।

বর্ষা শুরু হলেই দারুণ মশার উপদ্রব হয়। সারা আবাদী টিকাগুলো যেন তাদের দখলে। চাষাভুষোদের চামড়ার জো নেই। হলে ইঞ্জেক্শন দেওয়া মানেই শাইকে দেওয়া। বর্ষায় সারা অঞ্চলটার চল্লিশ মানুষগুলোর প্রায়েক ম্যালেরিয়ায় ভুগছে।

ওষুধ দিয়ে ওদের বিদেয় করলাম। যে লোকটা ম্যালেরিয়ার কাঁপুনিতে কাহিল হয়ে পড়েছিল, সে কাঁপুনি না থামা পর্যন্ত বসে রইল। ভাগ্যিস তার সম্বলে কয়লার উনুনখানা বাঁচিয়ে দিলে। লোকটা আগুন পেয়ে যেন বর্তে গেল।

একটু অবস্থাপন্ন চাষুন, ক্ষেত্রীশ্রেণীর লোকেরা বর্ষায় ধানক্ষেতের পাশ দিয়েই হাঁটবে না। তাদের ধারণা, মশা কামড়াক আর নাই কামড়াক ধানক্ষেতের হাওয়া গায়ে লাগলেই নির্ঘাৎ ম্যালেরিয়াতে পেড়ে ফেলবে।

এই বর্ষার ভেতর কতজন রোগী দেখতে বেরোতে হল। পাহাড় থেকে জলধারাগুলো যেন লাফিয়ে লাফিয়ে হাড়ল বেয়ে নেমেছে। জহর, বুহল, নালা, নালু ছাই সবরকমের ছোটবড় খাদ বেয়ে জল চলেছে তোড়ে পাক খেতে খেতে। গড়িয়ে পড়ছে ছোটবড় শিলা। আঘাতে আঘাতে ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। সব নদী যেমন সমুদ্রে মেশে, এখানকার সব কটি জলস্রোত মেশে বিপাশায়।

আমার টাট্টুর নাম রেখেছি চৈতক। বড় প্রভুভক্ত। প্রভুকে পিঠে নিলে সে অতি সন্তর্পণে পা ফেলে চলে। বিপদের আঁচ পেলেই সে থমকে থেমে দাঁড়াবে। প্রভুকে পথে কখনও পা বাড়াবে না।

বর্ষার ভেতর পথ চললে ভারী সুন্দর একটা ছবি চোখে পড়ে। পাহাড়ি ক্ষেতের পাশে মেয়েরা গায়ের কাপড় ভিজিয়ে মুহূর্মুহু চাষে মেতেছে। হাটুর একটু নীচের থেকে অনাবৃত পাগুলো ঠিক হলুদ মোমের মত মনে হয়। পাকের গোছ কাদায় ডুবিয়ে মাথা নুইয়ে ধানের চারা রোপণ করে। গলায় বড়ই একটানা পাহাড়ী সুরের গান। বড় মিঠে সে সুর। বাঁশুরি সরোদ, সেতার মাদলের সঙ্গে সে গানের সুর আশ্চর্য সঙ্গতি রেখে বাজতে থাকে।

রোপণের কাজটা মেয়েরাই করে। ওরা যখন কাজের ফাঁকে উঠে দাঁড়ায়, তখন ওদের রঙীন ভেজা কাপড়গুলো স্তনের উপর স্থির আর উপত্যকাগুলোতে লেপটে থাকে। ঠিক মনে হয় রেনোর আঁকা এক একটি নগ্ন স্টাডি।

আমি যখন টাট্টুতে চড়ে ওদের পাশ দিয়ে যাই তখন ওরা লজ্জা পায় না, উঠে দাঁড়িয়ে মিষ্টি হাসি আর টাটকা উপহার দেয়। অনা কোন পাহাড়ী যুবক হোলে তার সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করে আর জল ঘোলা ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারে। আমি দূর থেকে হেসেও ওদের হাসির জলতরঙ্গ বারবার বেজে উঠতে শুনি।

এ দুটো মাস পাহাড়ী হেল্থটাতে যেন বিপ্লব হয়ে গেল। পথঘাট, কাঠের ব্রীজ ধসে ভেঙে ভেসে গেল কত। রোগী নেই বাইরের। বেড়িয়ে বেড়ানোর সুযোগও নেই। ঘরের ভেতর বসে বসে হাঁপিয়ে ওঠে মন। এ সময়গুলোতে স্ত্রীপুত্র কাছে পেতে সাধ হয়। মাঝরাতে পলকা ঘুমটুম আওয়াজে যখন ঘুম ভেঙে যেত, তখন জানলার কাছে উঠে গিয়ে বসতাম। মনে হত, এমন দিনগুলোতে কিরি থাকলে পেছন থেকে গলা জড়িয়ে আমার কাঁধের ওপর ওর থুতনি রেখে আমারই মত জানলা দিয়ে চেয়ে থাকতে বাইরে। আকাশ তবু ছড়িয়ে যখন বিদ্যুৎ চমকাত, তখন ও সঙ্কেতে

আমাকে জড়িয়ে ধরে মুখ লুকোত আমারই বুকে।

চিঠি লিখতে আর ভাল লাগে না। শুধু তুমি নেই তুমি নেই বলতে বলতে জনা কয়েক পাতের কলম উড়ে গেল। সেদিন বেলা শেষে মেঘের ফাঁকে হঠাৎ গোলাপের হলুদ আলোটুকু ফুটে উঠলে আমি বাগানে নেমে গিয়ে ঐ আলো গায়ে মেখে নিতাম। রঙটা আবরণ খসা ঝিনুকের বুকের মতো। একটা রোমাঞ্চ আমার সারা শরীরে হেমন্তের ভোরবেলাকার বাতাসের মত শিউরে শিউরে উঠত।

কদিন বৃষ্টি ছিল না। মাঝে মাঝে মেঘছেঁড়া মাঝে মাঝে কোমল রোদের লুকোচুরি খেলা চলছিল আকাশে। আমি ঘরে থাকতে না পেরে টাটু নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম ভ্যালির দিকে।

জঙ্গলের ছোট্ট পথ থাকলেও আমার চৈতক অতি সাবধানে পাথরের ওপর পা রেখে স্রোতের বেগ ঠেলতে ঠেলতে ওপারে গিয়ে উঠল। তারপর ভ্যালি পেরিয়ে অনেকক্ষনের পরে পৌঁছলাম আমার নির্দিষ্ট জায়গাটিতে।

ওপরে অচেনা কলের আওয়াজ পাচ্ছিলাম। শব্দটা অনেকদিন পরে শুনছি, তাই কানে বেশ মিষ্টি লাগল। চৈতককে বেঁধে রেখে বসলাম আমার নির্দিষ্ট আসনে। পাথরটা সারা বর্ষা ধোলাই হতে হতে কেমন যেন চকচকে হয়ে গেছে। পাথরের তলা থেকে কটি ফুল উঁকি দিচ্ছিল। আমি বসে বসে বর্ষাশেষের অপরাহ্ণ-প্রকৃতিকে দেখতে লাগলাম।

হঠাৎ কার সাড়া পেয়ে পেছন ফিরে দেখি, একটি মেয়ে আমার চৈতকের গায়ে হাত বোলিয়ে দিচ্ছে। আমি পাশ থেকে মেয়েটিকে চিনতে পারিলাম না। ওর পাশে বসানো একটি থলেতে বোধহয় পেচাই করা গম রয়েছে।

মেয়েটি চৈতকের গা থেকে হাত নামিয়ে থলেটা তুলে নিতে যেই মুখ নামাল, অমনি আমি চমকে উঠলাম।

বালু! এমন চেহারা হয়েছে বালুর! চেনাই যাচ্ছে না। জীর্ণ রঙচটা একটি অচেনা মেয়ে যেন আমার একটু দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

বালু চলে যাবার জন্যে পা বাড়াতেই আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, চলে যাচ্ছ বালু?

বালু থামল। তারপর মুখখানা নীচু করে পায়ে পায়ে আমার সামনে এসে দাঁড়াল।

বললাম, কতদিন তোমাকে দেখি নি বালু। সেই যে তুমি বাবলো থেকে চলে গেলে, আর একটিবারও এলে না।

বালু চোখদুটো পথের ওপর পেতে রেখে পায়ের আঙুল ঘষতে লাগল।

আবার বললাম, ভুল যদি আমি কিছু করে থাকি তাহলে সেটাই কি চিরকাল মনে করে রাখবে বালু? এতদিন একসঙ্গে যে কাজ করলাম, পথ চললাম, তার কি কোন দাম নেই?

বালু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

বললাম, সেদিন আমি তোমাকে আঘাত দিয়েছিলাম বালু, কিন্তু তুমিও আমাকে কম আঘাত দাও নি।

বালু আমার কথার অর্থ বুঝতে না পেরে ভেজা চোখে আমার দিকে তাকাল।

বললাম, আমাকে আমার ভুলটুকু শুধরে নেবার সুযোগ তুমি দিলে না। এতে আমি কম আঘাত পাই নি।

বালু লজ্জায় মাথা দোলাতে লাগল। সে যে ঘুনেপ্রাণে আমাকে আঘাত দিতে চায় নি, তাই বোধহয় বোঝাতে চাইল মাথা দুলিয়ে।

এক সময় বালু বলল, আমার ভাগ্য মন্দ। আমি আপনার কাছে ফিরে গেলাম না, তাই নিরুপায় হয়ে গেলাম।

বললাম, শরীরটা তোমার বড় ভেঙে গেছে বালু। কাল থেকেই তুমি চলে এসো ডিসপেনসারিতে। কাজ যেমন করছিলে, তেমনি করবে। শরীর মন দুটোই ভাল থাকবে।

বেলা পড়ে আসছিল। বালুকে বললাম, নীচের দুই-এর স্রোত এখন খুব বেশী। টাটু নিয়ে সন্ধ্যার পেরোনো ঠিক হবে না। আমি আজ চললাম, কাল সকালে যেন তোমাকে চেম্বারে দেখতে পাই।

বালুর ভিজে চোখে ম্লান একটা হাসি ফুটে উঠল।

আমি চৈতকের বাঁধন খুলে নিয়ে চেপে বসলাম। পাহাড়ী পথে ঘুরে ঘুরে নামছি আর মাঝে মাঝে মুখোমুখি হচ্ছি বালুর। ও ঠায় দাঁড়িয়ে আছে আমার দিকে চেয়ে। কেমন যেন বিষণ্ণ ধূসরতার মূর্তি বলে মনে হয়।

আবার তেমনি বারান্দায় বসে আমি রোজ সূর্য ওঠার আগেই ফুল নিয়ে বালুকে নীচের রাস্তা থেকে ওপরে উঠে আসতে দেখছি। ছোঁড়া জামাটা পরিয়ে তানপুরোটাকে বেঁধে নিয়ে যেন রোজকার রওয়াজ শুরু হয়েছে। কোথাও কিছু অপূর্ণতা নেই।

ঝিনুকের একটি অনুরোধই শুধু রেখেছি। আমি আর বালুকে নিয়ে বাইরের কলে বেরোই না।

দেখতে দেখতে আরও দুটো মাস কেটে গেল। সেপ্টেম্বরের শেষে গাড়োজী এলেন ফলের বাগিচার হুদারকির কাজে।

বালুকে বললাম, এবার আর মিঃ বেনেলের বাগানের কাছে গিয়ে তোমার যাবার দরকার নেই বালু। তুমি ইচ্ছে করলে আমার বাগিচায় কাজ করতে পার। আমি গাড়োজীকে বলে দেব।

বালু মাথা নেড়ে সায় দিল, আর আমি গাড়োজীকে বালুর জন্যে অনুরোধ জানিয়ে কথা আদায় করে নিলাম।

পুরো সেপ্টেম্বর আর অক্টোবর ফল সংগ্রহ আর প্যাকিংএর কাজে মেতে রইল মালালীর তরুণী মেয়েরা। আর ঠিক অক্টোবরের শেষেই অভাবনীয় ঘটনাটা ঘটে গেল।

একদিন বাগিচা থেকে নীচে নামছিল বালু, হঠাৎ আছাড় খেয়ে পড়ে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরা তাকে প্রায় অচেতন অবস্থায় ধরাধরি করে নিয়ে এল আমার চেম্বারে।

বালুকে পরীক্ষা করে আমি চমকে উঠলাম। কি সর্বনাশ, বালু সন্তানের মা হতে চলেছে! আমি ডাক্তার হয়েও এতকাল ধরতে পারি নি ওর দেহের পরিবর্তন, ওর পোষাকের আড়ালে ও নিজের ভুলের ফসলকে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে এতকাল! আর আমি গভীর আকর্ষণে অসহায় ভেবে মেয়েটিকে আগলে নিয়ে বেড়াচ্ছি।

কিন্তু বেশী কিছু ভাবার তখন সময় নেই। জরুরী একটা অপারেশনের জন্যে তৈরী হলাম। তাড়াতাড়ি অপারেশন না করলে রোগীকে বাঁচানোই দায় হয়ে উঠবে। যত বড় অপরাধ করুক বালু, তার বিচার এই মুহূর্তে নয়। সব বিচারের চেয়েও বড় কথা এখন ডাক্তারের কর্তব্যটুকু নিষ্ঠার সঙ্গে করে যাওয়া।

বালুকে পাঠিয়ে দিলাম পণ্ডিতজীর কাছে। বলে পাঠালাম একটু সুস্থ হলেই মেয়ে যাবে তার কাছে। চিন্তিত হবার কারণ নেই।

এদিকে কম্পাউন্ডার শিউশরণজীর সাহায্য নিয়ে শেষ করলাম অপারেশনের কাজ। বালু বেঁচে গেল এ-যাত্রায়। নির্জীবের মত বেডের ওপর পড়ে রইল সারারাত।

আমি আলো জেবলে বসে আছি বালুর মাথার কাছটিতে। ও আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে রয়েছে। শিউশরণজীকে পাঠিয়ে দিয়েছি তাঁর কোঠীতে। একবার শুধু চাচাজী এসে দাঁড়ালেন দরজার বাইরে। যতটুকু আলো বাইরে পড়েছিল তাতে দেখলাম একটি ঘন-পক্ক গম্ভীর মুখ ঘরের ভেতরের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে আছে। মুহূর্তে সে মুখ দরজার কাছ থেকে সরে গেল।

সকালবেলা চাচাজী কম্পাউন্ডার শিউশরণজীর কাছ থেকে ঘটনাটা জেনে থাকবেন।

রাতে বসে বসে আর কোন কথা মনে এল না। বালুর করুণ মুখখানা শুধু চোখের ওপর বারবার ভেসে উঠতে লাগল।

অপরাধ করেছে বালু? না কোন অপরাধই সে করেনি। যা করেছে তাকে বড় জোর একটা বড় রকমের ভুল বলা যেতে পারে।

বালুর সঙ্গে বহুদিন আগে ভ্যালিতে সেই চাঁদের আলোয় ওর হাত দেখার মিথ্যে অভিনয় করেছিলাম। সে রাতটার কথা মনে পড়ল। বালুর বিয়ের প্রসঙ্গ তুলেছিলাম সেদিন। লজ্জা সঙ্কোচ তরুণী মনের গভীর থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস টেনে এনেছিল। পদ্মু পিতাজীকে নিঃসঙ্গ পথের সাথী রেখে স্বামীর ঘরে কি করেই বা সে চলে যাবে।

আপনি কি আপনার পায়খানা সম্বন্ধে সামান্য লজ্জিত?

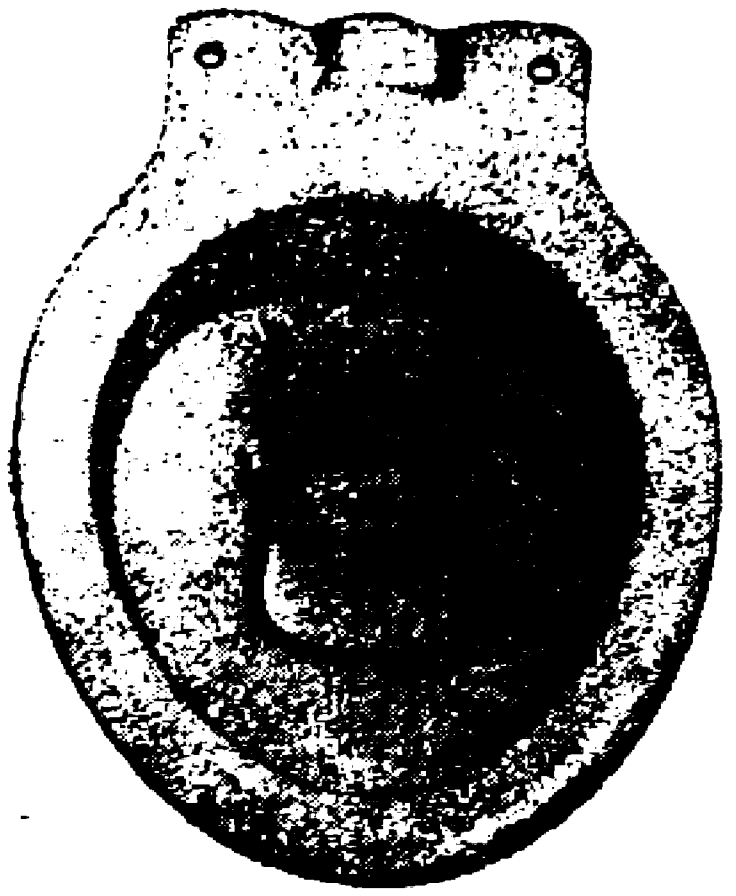

আমাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই নিজেদের পায়খানার ভাল সম্বন্ধে বিব্রত বোধ করেন। বিব্রত বোধ করাই সবটা নয়। তার চেয়েও সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার হল :

নোংরা পায়খানায় রোগের জীবাণু জন্মায় আর সেখান থেকে রোগ সংক্রামিত হয়। ময়লা পায়খানা আপনার ও আপনার পরিবারের সকলের স্বাস্থ্যের পক্ষে বিপজ্জনক।

সেই জন্যে অবহেলা করবেন না। আপনি কি একেবারে নিশ্চিত জানেন যে, আপনার পায়খানা পরিষ্কার? লোক সকালে যেমন এলেও সে কি তার কাজ পুরোপুরি করছে? কিম্বা তাড়াতাড়ি কাজ সেরে পালাচ্ছে? এসব ব্যাপারে আপনি আপনার বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকলে ব্যবহার করুন— স্যানিক্রেশ।

স্যানিক্রেশ— পায়খানা পরিষ্কার করার শক্তিশালী পদার্থ।

স্যানিক্রেশ ৩ ভাবে কাজ করে:

১. স্যানিক্রেশ সব দাগ উঠিয়ে দেয়

স্যানিক্রেশ আপনার পায়খানা পুরো-পুরি পরিষ্কার করে। এতে রয়েছে এমন জোরালো পরিষ্কার করার পদার্থ যা খুব শক্ত দাগও নিশ্চিহ্ন করে দেয়। এমনকি ময়লের দাগও উঠে যায়। ফলে আপনার পায়খানা পরিষ্কার হয়ে ঝকঝক করে।

২. স্যানিক্রেশ রোগজীবাণু দূর করে

নোংরা পায়খানা সাঙ্ঘাতিক বিপজ্জনক, কারণ সেখানে রোগের জীবাণু জন্মায়। সাধারণ 'ফিনাইল' তা রক্ষা করতে পারে না স্যানি-ক্রেশ তা রক্ষা করে—আপনার ও আপনার পরিবারের সকলের স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখে।

৩. স্যানিক্রেশ দুর্গন্ধ দূর করে।

বিশেষ ক'রে যে পায়খানার হাওয়া-বাতাস খেলে না সেখানকার দুর্গন্ধ তো লেগেই থাকে। সেই জন্যে স্যানিক্রেশে রয়েছে এমন অত্যন্ত কার্যকর দুর্গন্ধনাশক পদার্থ যা হাওয়া নির্মল ক'রে তোলে আর বদ গন্ধ দূর করে।

স্যানিক্রেশ ব্যবহার করা খুবই সহজ

বিশেষ কিছু করতে হয় না বললেই চলে। প্রথমে পায়খানার জল ঢেলে দিন। তারপর পায়খানার গামলার মধ্যে প্রচুর স্যানিক্রেশ ছিটিয়ে দিন। ৩-৪ ঘণ্টা ওই ভাবে রেখে দিন। আরও ভাল হয় একেবারে রেখে দিলে। তারপর জল ঢেলে দিন। তাতে যদি তেমন পরিষ্কার না হয় তাহলে একবালতি জল ফেলে ঢেলে দিন। তারপর দেখুন আপনার পায়খানা কেমন ঝকঝকে পরিষ্কার হয়েছে।

স্যানিক্রেশ কতবার ব্যবহার করা দরকার?

নিয়মিত—প্রত্যেক দিন ব্যবহার করুন।

স্যানিক্রেশ সব ময়লা দূর ক'রে আপনার পায়খানা পরিষ্কার রাখে।

বালসারা
উন্নততর জীবনযাত্রার আধুনিক সহায়ক
BALSARA

CHAITRA-BLS-86 BEN

তার তরুণী মনের দমিত ইচ্ছাগুলো হয়ত মুকুলিত হচ্ছিল আমাকে কেন্দ্র করে। প্রকাশের সাহস তার হয়নি কোনদিন। শুধু কাজের ফুর্তিতে ঘুরেছে আমার সঙ্গে ছেলে-মানুষ ছায়ার মত।

তাই কোন কোনদিন ওকে কোঠীতে পৌঁছে দিয়ে ফেরার পথে আমি চাঁদের আবছা আলোয় ঝাউ থেকে মুখ ফেরালেই দেখেছি ও তেমনি আমার চলার পথের দিকে চোখ পেতে চেয়ে আছে। এর অর্থ একটিই মাত্র হতে পারে। একটি হৃদয়ের উত্তাপের জন্য তরুণী মনের অনুচ্চারিত প্রার্থনা।

বালুর ওপর আমার সহানুভূতির অন্ত নেই। কিন্তু আমার সারা বুক জুড়ে রয়েছে কিন্নি। সেখানে কোন প্রতারণার খেলা চলে না।

কিন্নি ছোঁড়া এল সেদিন বালু নিশ্চয়ই মেয়েদের বিশেষ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বুঝতে পেরেছিল তার স্থান আমার কাছের ভেতর থাকলেও হৃদয়ের ভেতর নেই। সে নীরবে হয়ত স্বীকার করে নিত তার ভাগ্যকে। কিন্তু আমার কাছ থেকে হঠাৎ অপ্রত্যাশিত আঘাত পেয়ে তার ছোট বুক-খানা বোধহয় ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল সেদিন।

তার রেস্টোরেণ্টের কাজ নেওয়ার ছেলেরাও নিজেকে যে কোন কাজে যুক্ত করে রেখে আসল কর্মজীবনটাকে ভুলে যাবার তাগিদ থাকতে পারে।

তারপর মাকরাতে যখন সে ফিরে গেছে ভাঙ্গির পথে কোঠীর দিকে হয়ত কোন লোভী ট্যুরিস্ট তাকে সঙ্গ দিয়েছে। রাতের পর রাত নির্জন পথে দুটি তরুণ তরুণীর চলার ভেতর দিয়ে বুঝি ঘটেছে তাদের নিবিড়তা। বালুর অবদমিত বাসনা হয়ত তার বিদেশী বন্ধুর আলিঙ্গনে সাড়া না দিয়ে পারেনি। তারপর জীবন করে গেছে প্রকৃতির স্বাভাবিক খাতে। বিদেশী পাখি যখন উড়ে চলে গেছে অসমাপ্ত বাসাখানা হেলায় ফেলে রেখে।

বালুর মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম একটা অসহায় বেদনার ছাপ ফুটে আছে সেখানে।

ভোরবেলার দিকে আমি ডেকচেয়ারের ওপর মাথা রেখে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম হঠাৎ চেঁচামেচিতে ঘুম ভেঙ্গে গেল।

তবে দাঁড়িয়ে চোখ বালু অনেক স্বাভাবিক চোখে তাকাচ্ছে শুধু নিষ্প্রভ একটা সংকোচ তার সারা মুখখানাকে ম্লান করে তুলেছে।

বাইরের দাওয়ায় বেরিয়ে এলাম। বেলা অনেকখানি বেড়ে গেছে। ইতিমধ্যে ভাগুভূ ফিরে এসেছে পণ্ডিতজীর কোঠী থেকে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ও কি নিয়ে যেন আলোচনা করছিল। একটু দূরে দাঁড়িয়ে চেঁচামেচি ওর পাশে দাঁড়িয়ে কলকাউ-ডার শিউ শরণজী। চেঁচামেচির মুখখানা কেন যেন পাথরের মত শক্ত দেখাচ্ছে।

শুনলাম ভাগুভূ তার ক্লাচখানা পাথরের ওপর ঠুকে ঠুকে বলছে না এলো ভারী বয়েই গেল। যতক্ষণ ভাগুভূর হাত আছে ততক্ষণ সে কাউকে ডরাবে না।

বললাম কি হল এমন চেঁচাচ্ছিস কেন ?

ভাগুভূ বলল, মুন্নুনী মাক জবাব দিয়েছে সে আর মায়ার কাজে আসবে না।

একটু অবাক হলাম বৈকি। কারণ মুন্নুনীর মুখেই শুনেছি এ ভল্লাটের লোকেরা নাকি বলে ডাক্তারবাবুর মত মনিষ পাওয়া ভার।

বললাম, তুই কি ওর কাছে গিয়েছিলি? কেন আসবে না কিছু বলল?

ভাগুভূ বলল বেলা বাড়ছে দেখে ওকে ডাকতে গিয়েছিলাম। ও বলল কি তোর ডাক্তার বড় লোক আছে ও বাংলোতে আর কোন মেয়ে নোকরি করতে যাবে না।

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। ব্যাপারটা তাহলে এতদূর গড়িয়েছে। বালুর এই স্কলনের পুরো দায়িত্বটা ওরা তাহলে আমার ওপরেই চাপিয়ে দিয়েছে। সম্ভবত এ সব ঘটনা কলকাউ-ডার শিউশরণজীর। তাঁর রাজ্যে বালুর প্রবেশকে তিনি কোন-দিনই সুনজরে দেখেন নি। আবার এমন হতে পারে কাল যখন জাপেল বাগিচার মেয়েরা বালুকে অষ্টজনা অবস্থায় বয়ে আনে তখনই ব্যাপারটা ওদের কাছে আর গোপন থাকে নি।

বালু দীর্ঘদিন আমারই কাছে কাজ করেছে। দু পাঁচখানা টিকার মেয়ে পুরুষে জানে ডেলিডারী কেসে বালু আমাকে সাহায্য করে। আজ কৌতূহলী কেউ সে রাতের বেলা আমাদের নির্জন ভ্যানি বেরিয়ে যেতে দেখে থাকবে। তাই কি আমাকে বালুঘটিত অঘটনের আসামী ভেবে নিয়েছে ওরা!

ভাগুভূর দিকে তাকিয়ে গম্ভীর হয়ে বললাম তুই কাজে যা।

ভাগুভূ চলে যাবার আগেই দেখলাম শিউশরণজী আর চাচাজী আউট হাউসের দিকে সরে গেলেন।

আমি আবার ফিরে এলাম বালুর কাছে। বাইরের কথাগুলো অবশ্যই ঘর পর্যন্ত পৌঁছে থাকবে তাই বালুর গাল বেয়ে দেখলাম ফোঁটা ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ছে।

আমি তোয়ালে দিয়ে ওর মুখ চোখ মুছে দিলাম। ভেবেছিলাম আমার সহানু-ভূতির ছোঁয়া পেয়ে বালু হয়ত আরও চোখের জল ফেলবে কিন্তু তা ও করল না। ওর চোখে মুখে কেমন যেন ভয়ের ছায়া ফুটে উঠতে দেখলাম। মুহূর্তের ও অন্য-মনস্কতার কারণেই পরে ভবিষ্যৎ আশঙ্কার কথা ভেবে শঙ্কিত হয়ে পড়েছে।

বললাম, নিশ্চিন্তে শুয়ে থাক বালু, কোন ভয় নেই। তোমার পিতাজীর জন্যে ভাবনা করো না, তার ব্যবস্থা আমি করছি।

এবার বুঝি অসীম কৃতজ্ঞতায় বালুর চোখ দিয়ে জল উপচে পড়তে লাগল। মুখ ঠেলে যে কান্নার শব্দটা বেরিয়ে আসতে চাইছিল অধর দংশন করে তাকে প্রাণপণে ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা করছে সে। তারপর একসময় যখন সব চেষ্টা ব্যর্থ হল তখন দুহাতে মুখ ঢেকে ডুকরে ডুকরে কেঁদে উঠল বালু।

শরতের অর্ধেক ফসল আর ঘরে এল না। আমার ফলের বাগিচায় মালালীর কোন মেয়ে আর কাজ করতে আসেনি। চাচাজী বালুর ঘটনার পরের দিনই কুলু চলে গিয়েছেন। যাবার সময় শুধু বলে-ছিলেন দাদাজীর কাছে কি কৈফিয়ৎ দেব বাবুজী! আপনার কাজ আজকে আপনি সামলে নিন।

কথাটা বলেই দুহাত ওপরের দিকে তুলে বোধ করি আমার পরলোকগত পিতার কাছে মার্জনা ভিক্ষা করেছিলেন।

আমি কোন কথা বলি নি। প্রতিবাদ নয় থেকে যাবার জন্যে অনুরোধও নয়। শুধু স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম।

ডিসপেন্সারিতে রোগীর ভীড় কমে গেছে। মেয়েরা আসে না রোগ দেখাতে। সারাদিন বাংলোর ভেতর কেটে যায়। শুধু দুপুরে অবাহত আছে পাহাড়ী ছেলেগুলোর হুটোপাটি খেলা। ওদের এখন দিয়ে দিয়েছি ফলের বাগানের পুরোপুরি অধিকার। রেলুফিশ অপারেশনের পাঁচিল উঠে গেছে। এখন আমার বাগানের গাছে গাছে নিষ্পাপ শিশুদের দুরন্ত কলরোল।

বালু সুস্থ হয়ে উঠলে ওকে সঙ্গে নিয়ে গেলাম ওর কোঠীতে। আশপাশের মেয়েপুরুষ আগে আমাকে পথ চলতে দেখলেই সম্ভ্রমে মাথা নোয়াতো। কখনো বা তরুণী মেয়েরা মিষ্টি হাসি উপহার দিত। মায়েরা তাদের শিশুদের হাতজোড় করে নমস্কার করতে শেখাত।

কিন্তু বালুর সঙ্গে আমাকে পথে বেরোতে দেখে উঠোন থেকে মেয়েরা ঘরের ভেতর গিয়ে ঢুকল। চলতি পথের লোকেরা একবার তাকিয়ে পাশ কাটিয়ে হনহন করে চলে গেল।

আমি কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে বালুর সঙ্গে গল্প করতে করতে এগিয়ে চললাম।

বালু পথের ওপর চোখ পেতে চলছিল। আমি এ কদিন অনেক যুক্তিতর্কে ওর মনের ওপর থেকে অপরাধবোধের কালো লেপটা অনেকখানি মুছে ফেলতে পেরেছিলাম, কিন্তু স্বাভাবিক সংকোচ চোখ তুলে কথা বলার শক্তি ও হারিয়েছিল।

(ক্রমশঃ

শিল্পীর শিক্ষণীয় বিষয়

বর্তমান শতাব্দীতে বস্তুত আমরা এমন এক পরিবেশের মধ্যে রয়েছি যেখানে প্রতি নিয়ত অজস্র রূপকল্প নানান আকারে আমাদের দৃষ্টির সামনে উপস্থিত হচ্ছে। চলচ্চিত্র টেলিভিশন বিজ্ঞাপন মাধ্যম সচিত্র পুস্তক ও সাময়িকপত্রগুলি যেন এর উৎস। এরই ভিতর দিয়ে নানা ভাবনা অনবরত আলোড়িত করে আমাদের। আর সেগুলি বহুবিধ সংকেতরূপে আমাদের অনুভূতির বাদ্যযন্ত্রে এসে বার বার সুর তোলে। তার ফলে কখনও অনুকূল কখনওবা প্রতিকূল প্রতিক্রিয়ার সঞ্চার হয় আমাদের মনে। অনুভবের মাত্রাবোধে এর ব্যাখ্যা করি নিজেদের ভাবনা মত আকার-গুলো সাজিয়ে তৃপ্ত হই। স্থায়িত্বের অবসান ঘটে ঐ সব রূপকল্পের গঠনে। আর যে কোন শিল্পকর্মের রূপ নির্মাণের ক্ষেত্রে যা মৌল সত্য যেমন রেখা বস্তুর ঘনত্ব তল ও বিন্যাস পদ্ধতির রকম ফের তা যাচাইয়ের উচ্ছল হয়ে ওঠে শিল্পীর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীর দর্পণে।

সম্প্রতি সারফেস ইন আর্ট ও অরগ্যানাইজেশন ইন আর্ট—এই দুটি সিরিজে মোট ৪৮টি শিল্পকর্মের প্রিন্ট নিয়ে ভিক্টোরিয়া আলবার্ট মিউজিয়ম কর্তৃপক্ষ ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল অফ দি মিউজিয়াম অফ মডার্ন আর্টের সহায়তায় ও সেনহোল্ড বুক কর্পোরেশনের সৌজন্যে ভিক্টোরিয়াস অব আর্ট টিচিং (পার্ট টু) এই শিরোনামায় নিজস্ব গ্যালারীতে একটি নতুন ধরণের প্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন। প্রদর্শনীটি নিঃসন্দেহে শিক্ষামূলক। এখানে সাধারণের পক্ষে কতটা না রসোপলব্ধি করা সম্ভব তার চেয়ে বেশি বোধহয় উপকৃত হবেন শিল্পী ও শিল্প শিক্ষকেরা। তল (সারফেস) ও বিন্যাস পদ্ধতি (অরগ্যানাইজেশন) প্রসঙ্গে দৃষ্টান্তস্বরূপ বিভিন্ন যুগের ও দেশের বিভিন্ন মাধ্যমের বিচিত্র প্রকাশ ঢংএর শিল্পকর্মকে দুটি ভাগে বিন্যস্ত করে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এক-একটি সিরিজের শিল্পকর্মগুলি এমন নিখুঁত ও দক্ষতার সংগে সাজানো ও সম্পাদনা করা হয়েছে যাতে মনে হয় যে প্রত্যেক শিল্পকর্মের উপস্থাপনা ও গঠন কৌশলের গভীরে যে মৌল শর্তগুলি রয়েছে তা স্থানকাল পাত্রের অনেক ঊর্ধ্বে। এক-একটি সিরিজ দেখতে দেখতে মনে হয় রূপকল্পগুলি রং ও আকারের ক্ষেত্রে পরস্পরের কোথাও সদৃশ্য কোথাওবা বিরুদ্ধবাদী। জ্যামিতিক আকারগুলিতে কখনও সরল রেখার স্বাভাবিক উপস্থাপনা কখনও ত্রিভুজে কখনওবা অর্ধ-বৃত্তকারে বা বৃত্তে পরস্পরায় একটি সূক্ষ্ম সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এর ভিতর জন্ম নেয় এক আশ্চর্য গতি বা শিল্পকর্মকে সজীব করে তোলে। অরগ্যানাইজেশন ইন আর্ট সিরিজে উল্লেখনীয় যেমন রয়েছে হেনরী মাতিসের স্টেন গ্লাস কোলাজ স্মিটের পোস্টার, শেলডন ব্রাডির ফটোগ্রাফ, দুচ্ছোর রুশিফিকশন ও রুশোর ট্রপিকস ছবি দুটি নাইজেরিয়ার আদিম দেবতার ভাস্কর্য জাপানের ত্রয়োদশ শতাব্দীর একটি পুঁথি-চিত্র; তেমনি অন্যদিকে সারফেস ইন আর্ট সিরিজে জো টিলসনের একটি স্ক্রীন প্রিন্ট নাইজেরিয়ার ব্রোঞ্জ হেড ত্রয়োদশ শতকীয় একটি চীনা পানপাত্র নিউগিনির শিরস্ত্রাণ মুখোশটি এবং ভিনসেন্ট ভ্যানগগের সানফ্লাওয়ার ও ফ্রাসপার জোনসের 'ফিফড পেন্টিং' ছবি দুটি বিশেষভাবে প্রদর্শনীর মুখ্য উদ্দেশ্য স্পষ্ট করে তুলেছে। তবে প্রদর্শনীতে শেলডন ব্রাডির ফটোগ্রাফের ছড়াছড়ি ও দৃষ্টান্তস্বরূপ ভারতীয় শিল্প-কর্মের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতির অর্থটা ঠিক বোঝা গেল না।

কয়েকটি সাংগীতিক কম্পোজিশন

সম্প্রতি ব্রিটিশ কাউন্সিল নিজস্ব গ্যালারীতে পলিন হর্থনের লিথোগ্রাফ ও চিত্রকলার একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। শ্রীমতী হর্থন উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের তরুণ শিল্পীদের ভিতর অন্যতম। ইতি-পূর্বে বেলফাস্ট লিস্টার ও ইংল্যাণ্ডে শিক্ষা-পাঠ সমাপ্ত করে গত দু বছর যাবৎ তিনি অধ্যয়নে রয়েছেন। এর ভিতর এক বছর বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়ে ও আর এক বছর শান্তিনিকেতনে প্রখ্যাত শিল্পী অধ্যাপক সোমনাথ হোড়ের তত্ত্বাবধানে কাজ শেখেন। শান্তিনিকেতনে অবস্থানকালে তিনি যে কটি লিথোগ্রাফ প্রিন্ট তৈরী করেছেন সেগুলি অন্যান্য চিত্রকলার সঙ্গে বর্তমান প্রদর্শনীতে রাখা হয়। সিল্ক স্ক্রীন পদ্ধতিতে আঁকা ছবিগুলি ইংল্যাণ্ড থেকে বয়ে এনেছেন।

তাঁর ছবির সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল তিনি আকার ও গড়নের উপর বরাবর জোর দিয়েছেন। এক্ষেত্রে তিনি অনেক বেশি সংযত, নিখুঁত, নিভুল ও জ্যামিতিক। তবে তল বিন্যাসের ক্ষেত্রে এই অভিনব নান্দনিক ও আকারের এমন আংকিক সহ অবস্থানের বিষয়টি এই শতকের বহু শিল্পীকেই ভাবিয়েছে। স্বভাবতই শ্রীমতী হর্থনের ছবিতে সুপারম্যাটিজমের অন্যতম ধারক ও বাহক যুগ শিল্পী মালেভিচের প্রভাব সুস্পষ্টরূপে ধরা পড়ে। স্থপতি-ধর্মী এই সব ছবিগুলিতে ঋজু, সরল ও নিরপেক্ষ রেখাগুলি এমন এক আশ্চর্য চতুষ্কোণ ক্ষেত্র তৈরী করেছে যেগুলি স্বাধীন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েও ছবিতে এক অভিনব বেগ বয়ে এনেছে। শিল্পীর ভাষায় বা ম্যাজিক স্কোয়ার' বহুক্ষেত্রে তা 'মিউটি-ক্যাল স্কোয়ার' হয়ে দাঁড়িয়েছে। রংয়ের কম্পন যেন সাংগীতিক ধ্বনির মতো কাজ করেছে। তিনি বহুবার জোরালো রং—লাল, হলুদ ও নীল ব্যবহার করেছেন, আবার কোথাও বা এমন এক হাল্কা রংয়ের আভাস দিয়েছেন যেখানে এক স্বপ্নময় পরিবেশ দর্শকের অনুভূতিকে জাগিয়ে তোলে। অজস্র ছোট-বড় রংয়ের চতুষ্কোণগুলি ভিতরে কোথাও এক যোগসূত্রে গড়ে তোলে, আপাত পরস্পর ক্রমে এক অপরকে আত্ম-সাৎ করতে চায়, ছবি জুড়ে দেখা যায় এক

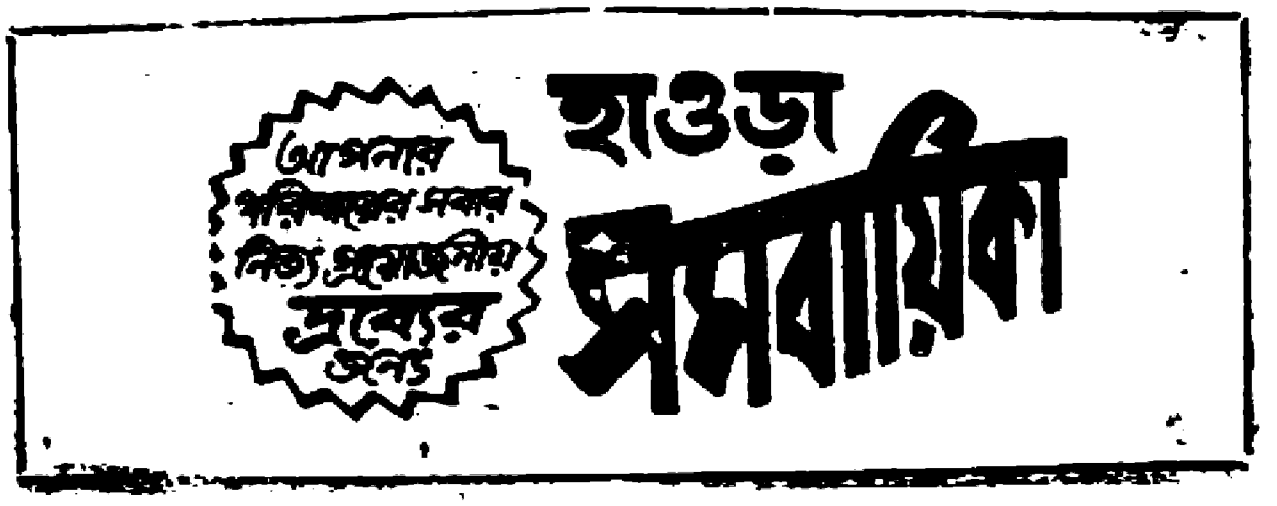

ঘনীভূত স্তব্ধতার ভিতর তাঁর প্রতিমূর্তরা, যা তাঁর ছবিগুলিকে অনেক সময়ই ও মানবিক করে তোলে। বিশেষভাবে তাঁর দু ধরনের চতুষ্কোণ সহযোগে পড়ে তোলা ডায়াগ্রামের সিরিজটির কথা মনে পড়ে। এক্ষেত্রে রং ও আকার যেন আঙ্কিকসূত্রে গাথা। সাদা ও কালোর তৈরী লিথোগ্রাফগুলির আকারে তিনি এমন এক রূপান্তর ঘটিয়েছেন যাতে সাদা যা পরিপূর্ণ নৈঃশব্দের প্রতীক, তার উপর কালো রেখাগুলি যেন এক চলমান গতি।

তবে শ্রীমতী হুবন কোনভাবেই ভারতীয় চিত্রকলার দ্বারা প্রভাবিত হননি, কারণ তিনি কখনই নিজস্ব পরিধির বাইরের বস্তু হতে চাননি ও বোধহয় সচেতন ভাবেই জানেন বর্তমান রূপোপার শিল্পদায়িত্বের তাঁকে কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে।

টার্নারের শ্বিশত জন্মবার্ষিকী

এ বছর ইংলণ্ডের রয়্যাল আকাদেমি প্রখ্যাত ইংরাজ শিল্পী জোসেফ টার্নারের শ্বিশত জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে কয়েক মাস ধরে একটি বিশাল চিত্রপ্রদর্শনীর আয়োজন করেন।

এক প্রখর উজ্জ্বলতা দিবালোকের মতো স্পষ্ট ও স্বচ্ছ, বর্ণ ও রূপের ভারসাম্য, আবেগ নিরপেক্ষ, সূর্যের মতো একটা কিছু কিংবা আলো—কখনও উষ্ণ, নরম, পেলব, স্পর্শকাতর, কখনও তীব্র জোরালো কঠোর সব শাণ-দেওয়া একখানা ছুরির মতো চোখ ধাঁধায়; কখনও দোষ পাহাড়ের মাথায়, মেঘের আড়াল, ঘরের জানালায়, জাহাজের মাস্তুলে, সমুদ্রের জলে, একটা মুখের মতো উঁকিঝুঁকি মারে, বোঝা যায় না, ধরেও ধরা যায় না, আভাসে, ইঙ্গিতে আলো পালায় বেড়ায়; যেন এক দুরন্ত দুষ্টু চঞ্চল প্রকৃতির সঙ্গে। দেখতে দেখতে আমরা হারিয়ে যাই, স্থানকালের পরিধির বাইরে এক রহস্যময় আলোর জগতে। আর ঐ রহস্যময় আলোর জগত থেকে যিনি সত্যকে খুঁজে পেয়েছিলেন সেই শিল্পী হলেন যোসেফ মালর্ড উইলিয়াম টার্নার।

১৭৭৫ সালে যোসেফ টার্নার ইংল্যাণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। এই ইংল্যাণ্ড যা তাঁর জন্মভূমি তাকে যে তিনি কত ভালবেসেছিলেন তা কৈশোরে আঁকা তাঁর অজস্র স্কুইং ও জলরঙের ছবিগুলি দেখলেই বোঝা যায়। চিত্রকলার প্রাথমিক পাঠগুলি শুরু করার কিছু পরে বছর বয়সে তিনি রয়্যাল একাডেমিতে প্রবেশ করেন। মাত্র দু বছরের মধ্যেই একবারে দক্ষ শিল্পীদের মতো ল্যাণ্ডস্কেপ এঁকে তিনি সকলকে বিস্মিত করলেন। ১৭৯১ সালে রয়্যাল একাডেমিতে তাঁর প্রথম চিত্র-প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। পল্টোহাট, খোলা পার্ক, ছোট জলাশয়, জনশূন্য গ্রাম্যপথ, নির্জীববিল নদীর ধার, কিংস্কিয়ে বৃষ্টি, কুয়াশায় ঢাকা ডোভার, দুএকটি মানুষ—এমন বিষয় বস্তুর মধ্যে আড়ম্বরহীনতা থাকলেও ঐ ছবিতে পারস্পেকটিভ তৈরীর অসাধারণ ক্ষমতা তাঁর আত্মবিশ্বাস গড়ে তুলল। মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে তিনি আকাদেমির বিশেষ সদস্য নির্বাচিত হন ও তিন বছর পরেই ঐ সংস্থার অন্যতম হিসেবে যোগদান করেন। ১৭৯৬ সালে আয়োজিত তাঁর প্রথম তৈল চিত্রপ্রদর্শনীটি দেখে সকলেই আশা পোষণ করলেন যে তাঁর ছবি আর একটা মোড় নিচ্ছে। তিনি রংয়ের প্রতি অনেক আকৃষ্ট হয়ে উঠলেন। তবে একটা প্রভাব যা শিল্পীজীবনের কাঁকগুলোকে পূরণ করে নিয়েছিল, পুসাঁ বা ক্লদ লরেনের ল্যাণ্ড স্কেপ ও সীস্কেপ আঁকতে যে আবেগ ও রোমান্টিকতা লক্ষ্য করা যায়, তাকে তিনি কোন দিনই কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। ১৭৯৯ সালে তিনি ইতালীতে পাড়ি জমালেন। ভালবেসে ফেললেন ইতালী ও ভেনিসকে। ভেনিসীয় প্রভাব জোরদার হয়ে উঠল তাঁর চিত্রে। ছবি ভরে উঠল উজ্জ্বল আলোয় ও রঙকালো রঙে। যেন ক্যানভাস জুড়ে রংয়ের আগুন ধরিয়ে দিলেন। আর সেই আগুনের ভিতর থেকে বার করে আনতে চাইলেন সেই শরীরটাকে —এক নিষ্কলংক পবিত্র আলোর শরীর।

তিনি যা দেখেছেন তাই এঁকেছেন। তুচ্ছাতিতুচ্ছ কোন ঘটনা, বস্তু বা পরিবেশ কোন কিছুই তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। স্কেচবুক জুড়ে অজস্র স্কেচগুলি যেন রাশি রাশি প্রজাপতির মতো ডানা মেলে উড়তে চায়। যা অপ্রকাশিতরা তাকেই প্রকাশ করতে চেয়েছেন আলো-আঁধারের লুকোচুরি খেলার ভিতর। ঘরোকিয়ে আসে এক সূর্য কিংবা উজ্জ্বল আলো যাকে আড়াল করে রাখে ভাসমান মেঘখণ্ড।

সূর্য অপেক্ষা সূর্যাস্ত প্রিয় বিষয় হয়ে উঠেছে তাঁর চিত্রে। মেঘ বা কুয়াশার ঢাকা থাকে সূর্য যাতে তার ঔজ্জ্বল্য নিস্তেজ হয়ে যায়। সব হয়েও হয় না, শুধু আলো ঐ সূর্যের আভাসটুকু ধরে রাখার চেষ্টা করে। কারণ হয়তো তিনি বিশ্বাস করতেন যে মানুষের সৃষ্ট কোন রঙ এত সূর্যের ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ করতে পুরো অক্ষম।

তাঁর ছবিতে রঙ কোন পৃথক সত্তা নয়, স্বাধীনভাবে, স্বয়ংসম্পূর্ণতায়, আবেগে উজ্জ্বল হয়ে উঠে আপন সত্তায়। বিষয় হারিয়ে গেল রঙের আভাসে। কখনো বা ঐ রঙ পরস্পরকে মিশে বার করে আনে এক দীপ্ত আলোর প্রতিবিম্বকে। সাদা বড় হয়ে দাঁড়াল তাঁর ছবিতে। এ প্রসঙ্গে 'ইয়ট এ্যাপোচিং দি কোস্ট' কলা স্টেল্লা, নরহাম ক্যাসেল, 'দি বার্নিং হাউস' হল পার্লামেণ্ট, ফায়ার এট সি' প্রভৃতি ছবিগুলির কথা মনে পড়ে।

আলোর কখনও ফিকে বিশ্লেষণে নৈসর্গিক জগতের সমস্যার মধ্যে, বিশাল, ব্যাপ্ত পরিধির ভিতর প্রচ্ছন্ন যেন তার অন্তর্নিহিত নিজস্ব শক্তি নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে। এক অখণ্ড কাল সেই মুহূর্তের রূপ নিয়ে গ্রাস করে সবকিছু—শুধু জেগে থাকে আলো কালের অনন্ত ক্রন্দনে। 'ট্রাফলগারের যুদ্ধ', 'সোডম', 'গমোরা' 'কাপ্রেজ' ছবিগুলি ভেসে ওঠে চোখের সামনে। কুয়াশা, আবছা আলো আর কালো জাহাজের মাথা ঘিরে ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে উড়তে থাকে—যেন চলার সব শক্তি হারিয়েছে জাহাজেরা, সমুদ্রের শান্ত জলে ছায়া পড়ে, সময় স্থির হয়ে থাকে এক গভীর বিষণ্ণতায়। সমুদ্রের ঝড়ে ভাসমান জাহাজ, ঘাবড়ানো উড়ু, চরম বিপদে মানুষেরা মন্ত্রণায় চঞ্চল করে—সব মিলিয়ে 'স্লেভ শিপ' ছবিতে মুক্তির প্রার্থনা উঠেছে বেজে। নিঃসন্দেহে তিনি মানবতাবাদী ছিলেন।

তবে জীবনের শেষভাগে তাঁর ছবি আশ্রয় নিয়েছে ইতিহাস, কিংবদন্তী, মিথ অথবা মহাকাব্যে। 'ডেথ অন এ পেল হর্স' ছবিতে ঐ মৃত্যুকে আশ্চর্য অলৌকিক বোধ হয়। 'দি ইভিল স্পিরিট', 'দি ব্ল্যাক শিপ' প্রভৃতি ছবিতে মৃত্যু ব্যঞ্জনাময় হয়ে উঠেছে। তাহলে কি তিনি কোন যাদুতে বিশ্বাসী হয়ে পড়েছিলেন? এসেছে রূপকথা, পরীর কাহিনী, 'কুইন ম্যাবস কেভ' 'ফ্লাকবস লাডার', 'এ্যাঞ্জেল অন সান' আবার ঐ যাদু যেন আলো হয়ে ধীরে ধীরে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়। তাকে ঘিরে চক্রাবর্তের মতো আবর্তিত হতে থাকে বড়ঋতু, জল-বাতাস-মাটি, স্থান-কাল পাত্র-পাত্রী। সব যেন এরই সূত্রে গাঁথা। সূর্য যেন সেই যাদুর দেবতা। তাই মৃত্যুর শেষ মুহূর্তে তাঁকে বলতে শুনি 'হে আদিত্য, তুমিই আমার ঈশ্বর'।

—রূপায়ক

কাজী নজরুল ইসলামের
শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ
১। রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম--- ২০.০০
২। গুল বাগিচা---৩.৫০. ৩। কাব্য আমপারা—৪.০০
৪। পূবের হাওয়া---২.০০ ৫। ঘুমপাড়ানী মাসীপিসি—২.০০
মোহন লাইব্রেরী ৩৫ এ, সূর্যসেন ষ্ট্রীট
ফোন-৩৫-০৬৩৩ কলিকাতা-৯

CENTRAL LIBRARY

সূর্যমুখী ও দুপুরের দুঃখ

ধ্রুব দত্ত

সুদর্শন দরজাটা টেনে দিয়ে নেমে গেল। গীতা এই মাত্র স্কুল থেকে ফিরল।

এতক্ষণ ও ঘরেই ছিল। আবার মেঘ এসে চারিদিক ঘিরে ধরল। ঘরের আলো জ্বাপসা। খাবার তৈরী করতে বসেছে গীতা সুদর্শনের জন্যে।

সুদর্শন ওদের বাড়ীতে এসে উঠেছে। এমন মাঝে মধ্যে দু-একজন আসে। কেউ জিজ্ঞেস করলে গীতা বলে, ওদের আত্মীয়।

সুদর্শনকে দেখিয়ে ওর এক বান্ধবী বলেছিল, কে রে? আগে তো দেখিনি?

গীতা বলেছে, আমার মামাতো ভাই! অথচ ওর মায়ের কোনো কালে কোনো ভাই-ই ছিল না। না আছে না-ঘরে।

এমন কথা ওকে বাড়ী থেকেই শিখিয়ে দিয়েছিল। এইভাবেই নাকি বলতে হয়। আসলে সুদর্শন ওদের কেউ নয়। বেনারস না কোথায় যেন একটা অফিসে কাজ করে। দার্জিলিং এসেছে বেড়াতে।

দার্জিলিং স্টেশনে যখন একটার পর একটা গাড়ী আসতে থাকে। তখন মাঝে মধ্যে গীতার বাবা স্টেশনে গিয়ে দাঁড়ান। ছোট পরিবার বা ভদ্র ঘরের ছেলে দেখলে পাশে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, আপনারা কি থাকার ঘর খুঁজছেন?

যখন কেউ বলে, হ্যাঁ। আপনার সন্ধানে ভাল ঘর আছে নাকি?

গীতার বাবা তখন হেসে বলেন, আসুন আমার সঙ্গে। একটা ঘর আপনার জন্যে দিতে পারি কয়েকদিনের জন্যে। আপনি কদিন থাকবেন?

সুদর্শন বলেছিল, তা একমাসও থাকতে পারি।

এক-মা—স? গীতার বাবা একটু ঘোরে গিয়েছিলেন। তারপর সুদর্শনের পা থেকে মাথা পর্যন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখলেন। সঙ্গে কোন মেয়েছেলে নেই। অথচ ঘরটা প্রায় দিন দশেক খালি পড়ে। পরের সময়টাতেই যা মানুষের ভীড় হয়। তারপর সেই নিস্তব্ধতা। উপার্জনের রাস্তাও বন্ধ। সেই সুদর্শন এসে উঠল গীতাদের বাড়ী। ওর মা-ই ব্যাপারটা করে দেয়। গীতার বাবা একদিন বললেন, খাকা-খাওয়া নিয়ে তোমাদের সাড়ে পাঁচ শো'র মত পড়বে।

সুদর্শন হেসে জবাব দিয়েছে, এমন আর বেশী কি।

ওর বাবা ভাবলেন, সাহেব লোক বলেই হয়তো ছোড়ো। নিজের আঙুল নিজেই কামড়ে ধরেন।

গীতা এখন বড়ীর বড়। দাদাকে অনেক টাকা-পয়সা খরচ করে লেখাপড়া শেখালেন বাবা। হল কাজও একটা পেল। তারপর দাদা ভালোবাসলো। বিয়ে করলো। নেবে আলাদা। এ-সংসারে একটি পয়সাও দেয় না। অথচ ওর বাবার এখন কোন স্থায়ী চাকরি নেই। আর অনিয়মিত। গীতা কোনরকমে বিএটা পাশ করে প্রেমের স্কুলে একটা কাজ পেয়েছে। কতই বা আর পায়।

খাবার তৈরী। সুদর্শন তখনও ফেরে নি। গীতা তাড়াতাড়ি ওর ঘরটা পরিষ্কার করে দিল। বাথরুমে ঢুকে চোখে-মুখে জল দিয়ে পরিষ্কার হল। তারপর ঘরে এসে একটু প্রসাধন।

ও-ঘরের দরজায় শব্দ হতে বুঝতে পারল সুদর্শন ফিরেছে। গীতা এখনও কিছু মুখে দেয় নি। সুদর্শনটা সত্যিই ছেলে-মানুষ। ওর জলখাবার থেকে গীতাকেও খেতে হবে। একেবারে হাত ধরে টানাটানি। একদিন গীতা রুষ্ট হয়েছিল। চেনা নেই জানা নেই, একটা মেয়েকে এইভাবে সাধা-সাধি কেন? পরে ও নিজেই লজ্জিত হোলো। নাঃ, শুধু খাওয়ার আন্তরিকতাটাই ওর প্রবল।

সুদর্শন বলেছিল, জানেন, খাবার জিনিস সবসময়ই ভাগ করে খেতে হয়।

তাই বুঝি? সামলা হেসেছিল গীতা।

ওই টানাটানির জন্য গীতার অবশ্য রাগ করার কারণও ছিল। সুদর্শন আসার কিছু দিন আগে এক ভদ্রমহিলা তার কলেজে পড়া আদুরে ছেলেকে নিয়ে উঠেছিলেন ঐ ঘরেই। তারপর সেই ছেলে—যা কাণ্ড করলো, সে কাউকে বলা যায় না। বললে হয়তো বাবা তার ওপরেই রেগে যেতেন।

এই নিন আপনার খাবার। গীতা বাড়িয়ে ধরলো থালাটা।

সুদর্শন বলল, দাঁড়ান, আপনারটা নিন।

একটা মৃদু প্রতিবাদও করল গীতা। সুদর্শন শুনেও শুনলো না।

গীতা বলল, এ কিন্তু আপনার জবরী অন্যায়। আপনি নিজের খাবার থেকে আমাকে রোজ তুলে দেবেন কেন? এবার থেকে আমার খাবারের থালাটাও এখ সঙ্গে নিয়ে আসবো।

যদিও গীতা ভালরকম জানে, তার খাবারটা দেখাবার মত নয়। বাবা সব হিসেব করে জিনিস কেনেন। কেজি সে টাকা দিলে তার জন্যই সব। তোমরা কি খেলে না খেলে সেদিকে তাঁর দৃষ্টি নেই।

সুদর্শন গীতার কথার কোনো জবাব দেয় না। শুধু খাবার খেতে খেতে চেয়ে থাকে তার দিকে।

কিছে এসে চা করতে বসল গীতা। উনুন ধরে বসাল একটা। অস্বস্তি হয়। নীচের দিকে চোখ রেখেছে। ওর শাড়িটাও কেমন ছিমছাম। কত বয়স হোল ওর? কুড়ি পর্যন্ত মনে রেখেছিল। এখন হিসেব করতে মন চায় না। তা হবে বৈকি ছাব্বিশ-সাতাশ। এক সংসারে থাকার সময় দাদা ওর বিয়ের প্রসঙ্গ মাঝে মাঝে তুলতো। গায়ও দেয়। সেকথা আর কেউ মুখেও আনে না। বিয়ে হয়ও না। কারণ ওর কোলে দুটি ভাই-বোন আছে। তারা ছোট। ওদের মানুষ করতে হবে। তাই গীতার উপার্জনের টাকাটা এ সংসারে খুব দরকার। কেটলির মুখ দিয়ে গরম বাতাস বেরুচ্ছে। ঢাকনিটা খুব খির করছে। বসে বসে আপন মনে চা থাকতে শুরু করল সে।

এ সংসারে গীতার অস্তিত্বের আর একটা মূল্য আছে। এই যে অল্পবয়সী ছেলেরা আসে—থাকে, তারও একটা করুণ সে নিচ্ছে। তা না হলে এরা দু-চারদিন পরেই চলে যেত। গীতা এসব জানে, বোঝে। অথচ করার কিছু নেই। ওর বাবা তা পরিবারে পরসা ছাড়া কোনো কিছুই বোঝেন না। চা তৈরী করে দুটো পেয়ালা নিয়ে উঠতে যাবে—হঠাৎ খোলা হোল চিনি ফুরিয়ে গেছে। চামচ দিয়ে দুটো কাপ থেকে পরখ করে দেখল। আসলে ও আজকাল বড্ড বেশী ভাবে।

সুদর্শন ওকে ধরে বসাল, চলুন একটু বাইরে ঘুরে আসা যাক।

গীতা বলল, মাথা খারাপ? সন্ধ্যে হয়ে এলো—এখন আবার কেউ বাইরে যায় নাকি?

সুদর্শন ওকে কিছুতেই ছাড়বে না। শেষে ওর দাদার কাছ থেকে সম্মতি আদায় করে আনল।

এর উপর আর কথা নেই। গীতা কাপড়-জামা বদলে নিল। চুলে চিরুনি দিল। মুখে পাউডার দিতে গিয়েও প্যাকটা রেখে দিল। বের হওয়ার সময় ওর মা চুপি চুপি বলল—তোর বাবা আসবার আগেই ফিরে আসিস কিন্তু।

ওরা উঠতে উঠছে। উঠছে আর উঠছে। এক সময় সুদর্শন বলল, বাববাঃ আমার পেটা ছাপ ধরে গেল। আপনার তো কিছুই হয়নি মনে হচ্ছে!

আমাদের অভ্যেস হয়ে গেছে। আপনিও কিছুদিন থাকলে—

সুদর্শন দাঁড়িয়ে পড়েছে। বলল, আচ্ছা, সমতলে ফিরে গেলে আপনাদের কষ্ট হয়?

গীতা হাসল। কষ্ট হবে কেন? সমতলে যাবার কষ্ট কিসের? তবে সমতলে হাঁটতে মনে হয় হাঁটাই হল না। কোলকাতা গেলে এই বেশীদিন থাকতে ইচ্ছা করে না।

ভারী মজার তো!

ওরা আবার হাঁটছে। এবার দোকানপাট পড়ল দুদিকে। একটু এগোলেই বাজার।

সুদর্শন বলল, চলুন, একটু চা খাওয়া যাক।

গীতা প্রতিবাদ করল।

সুদর্শন বিরক্ত হয়ে বলল, একটু চা খেলে আপনার কি আর যাবে? চলুন না।

না, সেজন্যে নয়। আমার ভালোলাগছে না কিছু খেতে।

এতক্ষণে সুদর্শনের খেয়াল হোল গীতা শুধু একটা জামা পরেই চলে এসেছে। তাও গরমের নয়। ভাবল, ওর বোধহয় শীত লাগছে। বলল, আপনি বুঝি চাদর আনতে ভুলে গেছেন?

না, ভুলবো কেন? আমরা এসময় গরম জামা বাদহাত করি না। এই সময়টাতেই যা একটু গরম পড়ে।

এই আপনাদের গরম? তাহলে শীত কাকে বলে?

কাকে বলে, একবার শীতে এসে দেখে যাবেন। সুইসাইড করতে হলে খালি গায়ে শীতের মধ্য রাতে তিন মিনিট বাইরে দাঁড়ালেই যথেষ্ট।

সুদর্শন বলল, আপনি যা জোড় দেখালেন—অন্তত সুইসাইড করবার জন্যেও দার্জিলিং-এ শীতকালে একবার আসতে হবে।

থাক, ও বীরত্ব আর দেখাতে হবে না। আপনার এখনও জীবনের অনেকখানি পড়ে আছে।

আর আপনার?

আমি তো দার্জিলিং-এই থাকি। তাছাড়া শীত ভয় [illegible] সুদর্শন পাল্টে গীতা বলল, আসুন, তাড়াতাড়ি এক কাপ চা খেয়ে নেওয়া যাক। সুদর্শন রাজী হোল। ও ভাবতেই পারে না যে গীতা নিজে থেকেই চায়ের প্রস্তাব করবে।

একটা রেস্টুরেন্টের টেবিলে চুকে মুখোমুখি বসল দুজনে। নেপালী মেয়েটি অর্ডার নিতে এল।

সুদর্শন বলল, কি চা না কফি?

যা হোক কিছু বলুন। বেশী দেরি করবো না কিন্তু।

সুদর্শন কফির আদেশ দিতেই মেয়েটি অদৃশ্য হোল। যাওয়ার সময় পর্দার দুটো টেনে দিল।

এখন শুধু ওরা দুজন। সুদর্শন ওর মুখের দিকে চাইতেই গীতা চোখ নামাল। দুজনেই চুপচাপ। একটা অস্বস্তিকর সময়।

আপনি সব সময় কি অত ভাবেন বলুন তো? সুদর্শন এক সময় প্রশ্ন করে।

সে তো আপনাকে দেখলেও মনে হয়।

তারপর দুজনেই হঠাৎ হেসে ফেলল।—

এখানে দিনগুলো বেশ ভালই কাটল। শুধু আপনাদের যা বিরক্ত করলাম—এই কথাটা বড্ড বেশী পীড়া দেয়।

আমরা বিরক্ত হলাম কখন? বরং বলুন এখান থেকে বাড়ী গিয়ে বলবেন, আচ্ছা এক পাল্লায় পড়েছিলাম। খাওয়া-দাওয়া আর বড্ড আদ্যির যা ছিরি—

মোটেই না, মোটেই না। আমি জানি আমি চলে গেলে আপনারাই বরং স্বস্তির নিশ্বাস ফেলবেন। ভাববেন—

থাক, আপনাকে আর বলতে হবে না। আমরা ঘর ছাড়া নিই। যদি সাময়িক কোন অসুবিধা হয়, সেটা আমাদের হাসি মুখেই

স্বীকার করে নিতে হয়। কিন্তু আপনারা? আপনারা তো পয়সা খরচ করে থাকেন?

দয়া করে এবার একটু থামবেন? সুদর্শনের গলার স্বরে গীতা চকিত হয়ে ওঠে।

সঙ্গে সঙ্গে দু পেয়ালা কফি নিয়ে এল সেই মেয়েটি।

বাইরে বেশ ঠাণ্ডা। অথচ কেবিনের মধ্যে গরম। বরং গরমটা একটু বেশীই। বোধহয় কিচেনটা সামনেই হবে। সুদর্শন গলায় জড়ানো মাফলারটা খুলে রাখল। গীতা ওর অনাবৃত গলাটা দেখে বলল, আপনি নিশ্চয় ভাল গান জানেন?

আমি নয়, আমার বোন জানে। কি করে কথাটা জানলেন?

আপনার গলায় একটা তিল আছে দেখছি। এবং গানটা আপনার বোন নয়, আপনারই জানার কথা। গীতা সামান্য হাসল। তারপর মুখটা নীচু করে গরম কফিতে চুমুক দিয়ে মেয়েটিকে ডেকে নেপালী ভাষায় কি যেন আনতে নির্দেশ দিল। একটু পরে চিনি আর চামচ রেখে দিয়ে গেল সে।

সুদর্শন বলল, আপনি তো ওদের ভাষা ভালই বলতে পারেন।

শুনতে শুনতে অভ্যাস হয়ে গেছে।

চামচেতে চিনি নিয়ে নাড়ছে গীতা কাপের মধ্যে। সুদর্শন ওর হাতের দিকে চেয়ে আছে। বলল, আপনার হাতটা বেশ লালচে বলে মনে হয়। গীতা লজ্জা পেল এখানকার জল-হাওয়া এই রকম; বলে গম্ভীর হোল সে। সুদর্শন ওর মুখের দিকে চেয়ে আরও কিছু বলতে চেষ্টা করল, পারল না।

গীতা একমনে কফির পেয়ালার চামচটা নেড়ে চলেছে। এক সময় নিজের প্লেটে চামচেটা নামিয়ে রেখে বলল, আপনাকে একটা কথা বলবো?

গীতার গলার স্বর ও বলার ভঙ্গিতে সুদর্শন একটু বিব্রত বোধ করল। মুখে হাসি টেনে বলল, স্বচ্ছন্দে।

কফির পেয়ালাটা সামান্য তুলে, মুখটা নীচু করে একটা চুমুক দিল গীতা। তারপর মুখ না তুলেই বলল, আপনার কাছে আমার বিশেষ অনুরোধ, আপনি যেন আমার কাছ থেকে আর কিছু চাইবেন না।

সুদর্শন কথাটা শুনলো। 'আর কিছু' শব্দ দুটো কেন তার কানের মধ্যে এবং কেবিনের মধ্যে আটকে গেছে বার বার বাজছে। সঙ্গে সঙ্গে কোন কথা বলতে পারলো না সে। গীতার আনত মুখের দিকে কেমন এক দৃষ্টিতে শুধু চেয়ে রইল।

তারও পরে এক সময় গীতার প্লেট থেকে চামচেটা তুলে নিয়ে নিজের পেয়ালায় কিছু চিনি মিশিয়ে অকারণ শব্দ তুলে নৈঃশব্দ্য ভাঙ্গতে চেষ্টা করল।

গীতা মুখটা তুলে অবাক। ওকি! আপনি আমার চামচেটা কফির মধ্যে ডুবিয়ে দিলেন কেন?

সুদর্শন নির্বিকার। বলল, কেন? চামচেটা কফিতে ডোবালে কি হয়?

না না, এ ভারী অন্যায়। আমার ভাল লাগছে না—গীতা কথাগুলো হাসতে হাসতে একটু রাগ মিশিয়েই বলল।

সুদর্শন সে কথার জবাব দিল না।

ওরা বাইরে চলে এল। ঠাণ্ডা আরও বেড়েছে। খাওয়া শেষ হতেই সুদর্শন মাফলারটা ভাল করে গলায় জড়িয়ে নিল।

এরপর দুজনেই চুপচাপ। এখন ওরা কেবল নামছে। সুদর্শনের তেমন কষ্ট হচ্ছে না।

রাস্তার আলোগুলো বড় ম্লান।

চলতে চলতেই সুদর্শন বলল, আপনার কথাটা মনে রাখবার চেষ্টা করবো।

অন্য কোন কথা হলে গীতা প্রশ্ন করতো হয়তো। এখন আর কিছু বলল না। তবে কথাটা যে সুদর্শন খুব ভালভাবেই বুঝতে পেরেছে এ সম্পর্কে সে নিঃসন্দেহ হল।

এরপর থেকে গীতা ওর পরিবর্তনটা লক্ষ করল। কেমন যেন নিজের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে সুদর্শন। বাইরে বেড়ানো একরকম বন্ধ। দিন-রাত শুধু বই মুখে নিয়ে বসে থাকে। যেটুকু কথা না-বললে নয়, ততটুকুই বলে। গীতার অস্বস্তি লাগে। কথাটা না বললেই ভালো হোত। ওর প্রতি কোন অশোভনা ব্যবহার করেনি তো? পর-দিন সুদর্শন জলখাবার খেতে কিছু অংশ ওকে দেওয়ার চেষ্টা করলে গীতা সরাসরি 'না' বলে সরে দাঁড়াল।

সুদর্শন সঙ্গে সঙ্গে খাবারটা নিজের প্লেটে ফিরিয়ে নিয়ে বলল, থাক, সীতা যদি আপনার আপত্তি থাকে তবে নাই-বা খেলেন। এমনভাবে কথা বললে কেউ থাকতে পারে? গীতা শিশুর মত হেসে হাত বাড়িয়ে বলে, দিন।

তারপর খাবারটা খেয়ে বলল, হয়েছে?

সুদর্শন কোন জবাব দেয়নি। শুধু খুশীর চোখে ওর দিকে একবার চাইল।

গীতা ওর এই দৃষ্টির মায়ায় নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছে নাকি? এই চোখ, এই ব্যবহার, এই বয়সের অভিমান সে কিন্তু আর কারও সঙ্গে মেলাতে পারল না।

সেদিন রবিবার। বেলায় খাওয়া। গীতা ওর ভাইকে দিয়ে একটা বই চেয়ে নিল সুদর্শনের কাছ থেকে। খাওয়া-দাওয়া সেরে মা রান্নাঘরে ব্যস্ত। গীতা ওর ঘরে যেতে গিয়েও কি ভেবে শুয়ে পড়ল বইটা মুখে দিয়ে। তারপর ঘুম।

ঘুম ভাঙ্গতে ভাবল বুঝি বিকেল হয়ে গেছে। না, ঘড়িতে দেখল মাত্র দুটো। বাবা এই সময় থাকেন না। ছোট ভাই-বোন দুটো হয়তো পাশের বাড়ীতে খেলছে। মা অঘোরে ঘুমোচ্ছে। গীতা উঠে পড়ল। একবার যাবে নাকি সুদর্শনের ঘরে? ভেবে ওর দেওয়া বইটা হাতে নিল। উদ্দেশ্য বইটা ফিরিয়ে দেওয়া এবং দিয়েই চলে আসা। ওদের ঘর থেকে সুদর্শনের ঘরে যাওয়ার দরজাটা খোলা থাকে। সুদর্শন ঘুমোচ্ছে। তাহলে আর কথা বলার অবকাশ নেই। বই-হাতেই এগিয়ে গেল টেবিলের কাছে। বইটা রাখল। খাটের পাশেই টেবিল। গীতা ওর দিকে চাইল। ঘুমোলে মানুষকে বড় অসহায় দেখায়। একটা হাত খাটের বাইরে ঝুলছে। গায়ের চাদরটা পাশে পড়ে। মাথাটা বালিশের পাশে। জামার বোতাম মাত্র একটা লাগানো। রোমশ বুক দেখা যাচ্ছে। পাজামার দড়িটা বোধহয় আলগা। নাভির নীচে নেমে গেছে। গীতার মনে হল, আর দাঁড়ানো ভাল নয়। 'ভাল নয়' ভেবেও চেয়ে রইল। ও এর আগে এত কাছ থেকে ঘুমন্ত কোন যুবা পুরুষকে দেখেনি। অন্তত এইভাবে। পাজামার একটা প্রান্ত হাঁটু পর্যন্ত উঠে এসেছে। অনাবৃত পায়ের পেশী স্পষ্ট। গীতার ঘাম দিচ্ছে। ও মন্ত্রমুগ্ধের মত চেয়ে রইল। মসৃণ মুখ—রোমশ বুক—অনাবৃত নাভি বলিষ্ঠ পেশী—সব জড়িয়ে ও কেমন আচ্ছন্ন হয়ে উঠল। কিন্তু সেই বুলে থাকা অসহায় হাতটা চোখে পড়তে ওর বুক দুরু দুরু করে উঠল। ওকে যেন ঐ হাতটা স্পর্শ করতে আসছে। আর দাঁড়াতে পারলো না। দ্রুত নিজের ঘরে আসতে গিয়ে কিসে যেন ধাক্কা খেল। তবু পিছন ফিরে দেখার সাহস হোল না। নিজের ঘরে এসে হাঁপাতে লাগল। বড় আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখে ভয় হোল। যদি শব্দে সুদর্শনের ঘুম ভেঙ্গে যায়? যদি চেয়ে সে ওকে দেখতে পায়? একবার এঘর থেকে উঁকি মেরে দেখার সাহসও হোল না। সে কতক্ষণ ওর সামনে দাঁড়িয়েছিল? ওর মনে হল—অনেকক্ষণ।

রাতে দুপুরের কথাটা আবার মনে পড়ল। সুদর্শনের থাকার মেয়াদটাও ফুরিয়ে আসছে। ক্যালেন্ডার দেখে হিসেব করল আর মাত্র তিন-চার দিন সে হয়তো থাকবে। এই জন্যেই কি সুদর্শন ওর ঘনিষ্ঠতা থেকে নিজেকে দূরে রাখছে?

সুদর্শন চলে যাবে। একটা অহেতুক ব্যথায় বুকটা গুমরে উঠল। তবু শুয়ে শুয়ে গীতা হাসল। হাসল তার নিজের মনের এই অদ্ভুত ভাবান্তর দেখে। সুদর্শন তো একেবারে থাকার জন্যে আসেনি। সে চলে গেলে বাবা আবার নতুন যাত্রী নিয়ে আসবেন। সুতরাং কে গেল আর কে এল তা নিয়ে তার কেন এত মাথা ব্যথা?

অন্যায় ব্যাপার, যার সম্বন্ধে তার কোন মাথাব্যথা না থাকার কথা, বার বার তার চিন্তাই বিব্রত করছে। আচ্ছা সুদর্শন চলে যাওয়ার সময় কি ওকে ঠিকানাটা দেবে? গীতা চাইবে না। যদি ও দেয় নিতে পারে। কিন্তু নিয়ে সে কি করবে? চিঠি দেবে? বলবে কিছু কথা? ছিঃ। ছিঃ। তাই কি কেউ বলতে পারে নাকি? এমন যদি হয়, সুদর্শন ওর বাবার কাছে তার মনের ইচ্ছাটা জানাল। কিন্তু সে ইচ্ছাটা কি? অনেক সময় অসম্ভবও তো সম্ভব হয়?

সুদর্শনকে বলা সেদিনের কথাটা তার মনে পড়ল। কষ্ট হল। চোখ দুটো কেমন

কেন আপসরা হয়ে আসছে। গীতা কি কাঁদবে? কেউ এ-কথা শুনলে কি মনে করবে? তাদের ভাল যে মনের কথাগুলো সাধারণে প্রকাশ হয় না। গোপন ইচ্ছাগুলো কিংবা একান্তই ভাল লাগা চিন্তাগুলো অন্যের চোখের সামনে স্পষ্ট হয় না। হয় না বলেই রক্ষা। হয় না বলেই আমরা অত্যন্ত সুসভ্য মানুষের মত সমাজ সংসারে চলাফেরা করতে পারি। তা না হলে দুপুরের সেই ঘটনাটা বাবা বা মায়ের কাছে প্রকাশ হয়ে যেত? যদি সুদর্শন তার বুকের মধ্যে লুকানো অদ্ভুত ভালো লাগা অনুভূতিটা পড়ে ফেলতে পারতো? ছিঃ। ছিঃ। কি যা-তা ভাবছে গীতা? না, না, গীতা অকল্পনা শিক্ষয়িত্রী। সে একটা উচ্চ আদর্শ নিয়ে চলে। ছোট ছোট মেয়েরা তার আদর্শ, তার চলাফেরা, চিন্তা-ভাবনাকে আশ্রয় করে ভবিষ্যতে উন্নত মানের জীবন গড়ে তুলবে। পায়ের কাছের মেঝেটা দুলে গেল। ডুবিয়ে দিল তার ভিতর। কোথায় যেন বাঁশী বাজছে। রেডিওর না কেউ এমনি বাজাচ্ছে বুঝতে পারল না। বাঁশীর সুরে বড় মিষ্টি। গীতা তার মধ্যে হারিয়ে গেল। কখন, কেমন করে, নিজেই বুঝতে পারল না।

সেদিন ঘুম থেকে উঠেই গীতা আবিষ্কার করল সুদর্শন পরের দিনই চলে যাবে। ট্রেনের রিজার্ভেশন হয়ে গেছে। এ-রকম একটা কথা ওর মাকে যেন বলছিল। গীতাকে নয়। গীতা শুনেছে মাত্র। তার ব্যবহারে একটা প্রচ্ছন্ন মিষ্টতা আছে।

সকালবেলা স্কুলে যাওয়ার সময় দেখল সুদর্শনের ঘর শূন্য। ভাবলো, হয়তো বেরিয়েছে কিছু কেনাকাটা করবে বলে। পাহাড়ী পথে উঠতে হয় গীতাদের। স্কুল তার বাড়ী থেকে অনেক উঁচুতে। আজ নিজেকে নিতান্ত নিঃসঙ্গ মনে হল। মনে হল, তার জন্যে কাল থেকে কেউ আর অপেক্ষা করবে না। নিজের জলখাবার থেকে ভাগও দেবে না। কিংবা অহেতুক ভালবাসা দিয়ে কাছেও ডাকবে না।

স্কুলে বার বার অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছে গীতা। ইতিহাসের শিক্ষয়িত্রী মিস মণ্ডল বললেন খুব চিন্তিত দেখাচ্ছে?

তাড়াতাড়ি বাড়ী ফেরতে হবে আমাকে। আমার এক আত্মীয় কাল চলে যাবেন। একটু মার্কেটিং-এ বেরোতে হবে তাঁকে নিয়ে।

• ঘড়ি •
• জামা কাপড় •
গ্যারান্টিসহ ঘড়ি মেরামত
রায় কাজিন এণ্ড কোং
জুয়েলার্স এণ্ড ওয়াচমেকার্স
৪, জলাহোমী মেয়ার ইষ্ট
কলিকাতা-১

নিশ্চয় যাবে। বড়দিকে বললেই ছেড়ে দেবেন।

এটা গীতার একটা ভনিতা। সে মনে মনে ঠিক করেছে আজ তাড়াতাড়ি ফিরে সুদর্শনকে অবাক করে দেবে। সুদর্শনকে বলবে, দেখুন, আজ কত তাড়াতাড়ি স্কুল থেকে চলে এসেছি। আপনি কাল চলে যাবেন তো? আপনার সম্মানে এই আসা। খুশী হবে না সুদর্শন? আপন মনেই হাসল গীতা কথাটা ভেবে। একদিন গীতার সঙ্গে ওর স্কুল পর্যন্ত এসেছিল সুদর্শন। স্কুলের কাছে এসে বলেছিল, আমি হলে এ স্কুলে কাজ করতাম না।

কেন?

এই চড়াই-এ দিনের পর দিন উঠতে হলেই একেবারে খতম হয়ে যেতাম।

গীতা ওর কথা শুনে হেসেছিল অনেক।

ছুটি হওয়ার এক ঘন্টা আগে স্কুল থেকে বেরিয়ে পড়ল গীতা। টুকরো টুকরো সাদা মেঘ ভেসে আসছে দক্ষিণ দিক থেকে। রোদে ঝলমল করছে দার্জিলিঙ-এর পাহাড়। প্রতিদিন এই পথে ফিরেছে সে। আজ যেন কেমন সব নতুন আর ভাল লাগছে।

আর একটু নামলেই স্টেশন রোড। ওখান থেকে ওদের বাড়ীটা স্পষ্ট দেখা যায়। রাস্তার ধারে একটা রাডোডেনড্রন দেখে একবার দাঁড়াল। সুদর্শন সেদিন স্কুলে আসার পথে বার বার বলেছিল, একটা রডোডেনড্রন দেখান না? গীতা এই গাছটাই দেখিয়েছিল।

সুদর্শন বলেছিল, এই রডোডেনড্রন? ফুল কই?

আ-হা! ওর ফুল কি এখন হয় নাকি?

ফুল না হলে গাছের কোন মূল্যই নেই। সব গাছই তো সমান।

সুদর্শনের কথাটা ওর ভাল লেগেছিল। সত্যিই তো! পরিচয় না থাকলে তো সব মানুষই সমান।

গীতা নামছে আর নামছে। বাড়ীটা এখন আরও স্পষ্ট। সুদর্শনের ঘরের জানালাটাও। ঐ জানালায় দাঁড়িয়ে সুদর্শন ওর আগমন বার্তা পায়। একদিন তো ঘরের দরজা ঠেলতেই খুলে গেল। কি ব্যাপার? সুদর্শন হেসে বলেছে, জানি তো, আপনার আসার সময় হয়েছে। তাই আগে থেকেই খুলে রেখেছি।

আসল কথাটা গীতা জানে। সেটা ঐ জানালা। গীতার চলার এবার আড়ষ্টতা দেখা দিল। সুদর্শন তার দৃষ্টি দিয়ে নিশ্চয়ই গীতার শরীরকে জড়িয়ে ধরেছে। আর হাঁ ঘুমোয়? যা ঘুম-কাতুরে ছেলে, ঘুমোলে গীতা আজ তাকে ঠেলে তুলবে। গায়ে হাত দেবে? দেবে কোথায় হাত দেবে? মাথায় না বুকে হাত দেবে?

ঐ তো বাড়ীর সামনেকার ফুলের বাগান। চলার গতি মৃদু করে আনল। ব্যস্ততা নেই যেন। অথচ বুকের মধ্যে একটা ধক ধক শব্দ। মা নিশ্চয়ই ঘুমোচ্ছে। বাবা এখন বাইরে। ছোট ভাই বোন দুটো হয় খেলছে না হয় ঘুমোচ্ছে।

বাড়ীতে ঢুকতে গিয়ে একটা সূর্যমুখী ফুল দেখে তুলে নিল। ভারী সুন্দর ফুল। বাঁ হাতে বেণীর গোড়াটা ধরে ডান হাতের ফুলটা গুঁজে দিল। তারপর সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল নিঃশব্দে। জুতোর কোন শব্দ করল না। নিজেকেও যেন জানাতে চায় না। সুদর্শনের ঘর বন্ধ। ঠেলতে দেখল ভিতরে খিল। নাঃ, নিশ্চয়ই ঘুমোচ্ছে। আস্তে শব্দ তুলল দরজায়। তবুও কোন সাড় নেই। এত ঘুমোতে পারে ছেলেটা? আরও জোরে ধাক্কা দিতেই ভিতরের ঘর থেকে মায়ের গলা শুনতে পেল। দরজা খুলে গেল। ভিতরে ঢুকে দেখল, ঘর ফাঁকা। সুদর্শন কোথায়? জিজ্ঞাসাটা মনের মধ্যে চেপে নিজের ঘরে চলে এল গীতা। একটু পরেই ওঘরের দরজাটা বন্ধ করে মা এসে দাঁড়াল। গীতার মনে হল, মা যেন কিছু বলবে। কিন্তু মা যা বলল তার জন্য সে আদৌ প্রস্তুত ছিল না।

দুপুরেই পুলিশ এসেছিল সাদা পোশাকে। সুদর্শনকে ধরে নিয়ে গেছে। গীতার বাবা ভয়ে এতটুকু হয়ে গিয়েছিলেন। কোথাকার কোন ব্যাঙ্ক ডাকাতির সঙ্গে ছেলেটা জড়িত। পুলিশের চোখ ধুলো দিয়ে আজ দু মাস লুকিয়ে ছিল। নামও তার সুদর্শন নয়। অন্য কি যেন একটা নাম।

ওর বাবা নাকি বলেছেন, কেমন ভাল মানুষের মত বাড়ীতে এসে উঠেছিল, আর একটু হলেই সবার হাতে দড়ি পড়তো। এবার যাদের নিয়ে আসবেন, আগে তাদের নাম-ধাম জেনে নেবেন—তারপর থাকার ব্যবস্থা। আর কাউকে বিশ্বাস করবেন না।

মায়ের প্রথম কথায় গীতার মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছিল। এখন নিজেকে অনেকটা সামলে নিয়েছে। কিন্তু কোন উত্তর ছিল না। মুখ-হাত ধুয়ে নিজের ঘরে এসে দাঁড়াল।

ছেলেটা তবে সব মিথ্যে বলেছিল? সমস্ত কিছু? গীতার হাসি পেল। পায়ে-পায়ে সুদর্শনের শূন্য ঘরটায় এসে দাঁড়াল। তার বিছানায় বসল। আজ খাবার তৈরীর তাড়া নেই। খিদেও তেমন পাচ্ছে না। শুধু সেই ছেলেটা আর কোনদিন এখানে আসবে না। সুদর্শন তার বাবাকে ঠকায় নি। থাকা-খাওয়ার টাকাটা আগেই দিয়ে দিয়েছে। তার মাকেও অসম্মান করতে দেখে নি কোনদিন। আর তাকে?

শুধু নামটা তার আসল নয়। তাতে কি আসে-যায়?

হঠাৎ পায়ের কাছে টুপ করে একটা শব্দ হল। চেয়ে দেখে, সেই সূর্যমুখী ফুলটা বেণী থেকে মেঝেতে পড়ে গেছে। সুন্দর ফুল। কুড়িয়ে নিল গীতা। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখল। তারপর কখন তার পাপড়িগুলি একটি একটি করে ছিঁড়ে নিজের কোলের ওপর, কিছু দূরে বিছানায় এবং মেঝের ওপর ফেলেছে সে, খেয়াল নেই তার।

এবারও কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর দেবো। যারা এবারও উত্তর পেলেন না, তারা এর পরের যে-কোনো সংখ্যায় পাবেন। এর কারণ আগামী সংখ্যাতে নতুন কিছু তথ্য পরিবেশন করার ইচ্ছা রাখি। প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়ার আগে আমাকে কয়েকটি বিষয় আপনাদের জানাতে হচ্ছে। আপনারা অনেকেই এমন সব প্রশ্ন করেন যার উত্তর বহুবার বহু রকমভাবে দেওয়া হয়ে গেছে। তাই সে-ধরনের প্রশ্ন এলে আর উত্তর দিচ্ছি না। তবে এমন অনেক প্রশ্ন এসেছে যে সম্বন্ধে বহু আগের দিকের সংখ্যায় আলোচনা করেছি। ফলে তারা জানিয়েছেন যে, সেই পুরোনো সংখ্যা তারা জোগাড় করতে না পারায় নতুন করে সে বিষয়ে আবার আলোচনা চাইছেন। যাই হোক, এবারে উত্তর দেওয়া শুরু করছি।

(১) সংঘমিত্রা ঘোষ : আপনার চিঠিতে এতো সুন্দর করে রূপসীর খাতার গুণ বর্ণনা করেছেন দেখে সত্যি ভাল লাগল। আমার কলমে আপনাদের উপকার হচ্ছে—এর জন্য ধন্যবাদ। (ক) আপনি বাড়িতে তৈরী ডিমের শ্যাম্পু সম্বন্ধে যে ভয় পেয়েছেন সেটা অমূলক। এ্যালকোহল শুধু ব্যবহার করলে শুনেছি চুলের রংফের হয় কিন্তু যেভাবে বানাতে বলেছি এবং তার সঙ্গে আর যেসব ব্যবহার করতে লিখেছি, তাতে আমার বিশ্বাস কোন ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

(খ) ল্যানোলিন যে-কোন ভাল ওষুধের ও কসমেটিকের দোকানে পাবেন। ল্যানোলিনের সঠিক বাংলা শব্দ আমার জানা নেই।

(গ) ইতালিয়ান অলিভ তেলের সত্যি খুব দাম, তবে একটা বড় টিন কিনলে মনে হয় একজন সেটা অন্ততঃ আট-নয় মাস ব্যবহার করতে পারেন। কিন্তু সত্যি বলতে কি, একটু খরচ করলে খুব ভাল ফল পাওয়া যায়। তবে এর বদলে দেশী অলিভ তেল ব্যবহার করা চলে। চুলের ব্যাপারে একেবারে খাঁটি নারকেল তেলও ভাল। তবে ত্বকের জন্য অলিভ তেলের তুলনা নেই।

(ঘ) ব্যায়াম সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করেছি। তবে আজ আপনার অনুরোধে আবার দু-একটা বিশেষ ব্যায়াম দিতে পারতাম কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা কি জানেন? ব্যায়াম দেহের কোন অংশের জন্য চাই? চোখ মুখ ঘাড় গলা পিঠ বুক পা—কোন অংশের জন্য? সেটা জানলে ভাল করতেন। তবে আমি দুটি ব্যায়াম সম্বন্ধে লিখছি, আশা করি এটা মোটামুটি আপনাকে সাহায্য করবে। প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই সোজা টান টান হয়ে দাঁড়াবেন—তারপর একবার বাঁ ও একবার ডানদিকে সমস্ত শরীরটা বিছানার ওপর ঘোরাবেন। তারপর এক গেলাস শুধু জল খাবেন। মেদ যদি বেশী থাকে, তাহলে সামান্য গরম জলে একটি পাতিলেবুর রস দিয়ে খেয়ে নেবেন। তারপর মাইলখানেক খালি পায়ে ঘাসের ওপর হেঁটে আসা। এবং পূর্ব দিকে যখন সূর্য ওঠে, সেই লাল আভার দিকে বড় বড় চোখ করে চেয়ে সোজা দাঁড়িয়ে থাকা। এভাবে প্রতিদিন করুন, স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে ও শরীরের কমনীয়তা আসবে। দ্বিতীয়টি হোল দুপুরের ও রাত্রের প্রধান খাদ্য খাওয়ার পর পা মুড়ে দুটি হাঁটু ও পায়ের পাতা জোড়া করে তার ওপর শিরদাঁড়া সোজা করে বসবেন। এভাবে পাঁচ-দশ মিনিট প্রতিদিন বসবেন, এতে হজম ভাল হয় ও বায়ু হয় না। ফলে ত্বক ও শরীর সজীব থাকে। দিনে অন্ততঃ দুবার পদ্মাসন করে বসা ভাল। এছাড়া আপনি অনুরোধ করেছেন নতুন তথ্য কিছু মাঝে মাঝেই দিতে। আমি তো দিয়েই যাচ্ছি।

(২) কৃষ্ণা মিত্র, বর্ধমান : রূপসীর খাতা ভাল লাগে শুনে ধন্যবাদ দিচ্ছি। (ক) চোখের নীচে যে কালো দাগের কথা লিখেছেন ও চোখ বসে গেছে লিখেছেন, এর প্রতিকারের আলোচনা আগেই করেছি। তবু লিখছি। চোখের নীচের কালো দাগ অনেকগুলি কারণে হয়ে থাকে। যেমন অনিদ্রা বা লিভারের দোষ। সেইসব ক্ষেত্রে ডাক্তারের পরামর্শ নেবেন। কিন্তু অনেক সময় আপনি যে কারণ দেখিয়েছেন, তার জন্যও হয়ে থাকে। সেই সব ক্ষেত্রে কতকগুলি করণীয় আছে। প্রথমত সকালে ঘুম থেকে উঠেই ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা দিয়ে চোখ বার বার ধোয়া। তারপর চোখের ব্যায়াম করা। মাথা সোজা রেখে চোখের মণি বাঁদিক থেকে ডানদিক ও ডানদিক থেকে বাঁদিকে গোল করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে হবে। শুধু তাই নয়, সেই সময় চোখ যথাসম্ভব বড় করে চাইতে হবে। একদম মিনিট পাঁচ-সাত করার পর চোখ বন্ধ করে বিশ্রাম দিতে হবে চোখকে। অন্ততঃ পাঁচ মিনিট। এরপর গোলাপ জলে তুলো ভিজিয়ে সেই তুলো চোখের ওপর-নীচ চেপে রাখতে হবে দু-তিন মিনিট। এতে চোখ তাজা ও সুন্দর দেখাবে। এছাড়া দুধ ও দইয়ের সর চোখের নীচের কালো রেখাগুলির ওপর বুলিয়ে রেখে দিতে হবে। তুলো ঠাণ্ডা দুধে ভিজিয়ে সেটা চোখের নীচে চেপে চেপে দিতে হবে। এভাবে দিনে একবার ও পরে সপ্তাহে দু-তিনবার করলে উপকার হবে।

(খ) কনট্যাকট লেন্স ব্যবহার করা উচিত কিনা সেটা ভালো ডাক্তারের সঙ্গে আলোচনা করে নেওয়া উচিত। তবে আমার বিশ্বাস যে, চব্বিশ ঘণ্টা চোখের সঙ্গে একটা কিছু লেগে থাকা ভাল না। তবে মাঝে মাঝে ব্যবহার করলে হয়তো ক্ষতি হবে না। কনট্যাকট লেন্স মেডিকেল কলেজে চোখের বিভাগে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কম দামে ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। এছাড়া গড়িয়াহাট রোডে ও কলকাতার আরও বহু জায়গায় পাওয়া যায়। কাগজের বিজ্ঞাপন দেখলেই এসব খোঁজ পাবেন।

(গ) আইলাইনার পুরো চোখ ঘিরে পর সম্ভব নয়—অর্ধ বৃত্তাকার অবস্থায় পরা যায়। সুতরাং ব্রজকের মতন আপনার সব প্রশ্নের উত্তর শেষ হোল।

(৩) রমলা সেন, কলিকাতা : আপনার মুখের ত্বক সম্বন্ধে ভীষণ বিচলিত হয়েছেন। কোন ভয় নেই। আপনার খসখসে ত্বক ঠিক হয়ে যাবে একটু যত্ন নিলেই। আপনাকে একটা ঘরের তৈরী প্রলেপের কথা জানাচ্ছি। সেই প্রলেপটি বেশ করে মুখে ও গলায় মেখে রাখতে হবে অন্ততঃ দশ-বারো মিনিট। তারপর সামান্য গরম জলে মুখটা বেশ করে আস্তে আস্তে ধুয়ে ফেলতে হবে। এবং সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা জল দিয়েও মুখ ধোবেন। এভাবে নিয়মিত করুন, তাহলেই দেখবেন সাতদিনের মধ্যেই মুখের ত্বক ঝকঝকে ও মোলায়েম হয়ে গেছে। এবার এই পদার্থটি কিভাবে তৈরী করতে হবে জানাচ্ছি। ১। একটি টমেটো জিনের কুসুম, ২। বড় চামচের এক চামচ অলিভ তেল, ৩। তিন-চার ফোঁটা লেবুর রস, ৪। দু-তিন ফোঁটা মধু এবং ৫। এক চামচ দুধ।

এগুলি বেশ করে একসঙ্গে মেশিয়ে মুখে মাখতে হবে। একটু করে দেখুন, ফল পাবেন।

ব্রজকের মত এখানেই শেষ করছি। সবাইকে আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি—আপনাদের চিঠিগুলি খুব ভালো লাগছে শুনে।

বরবর্ণিনী

ফুটবলের পাঠশালা। উৎসাহের জোয়ারে ভাসছে। কাঁচা বয়সের কচি কাঁচি শিক্ষার্থী। কিন্তু ওদের কারুরই ভবিষ্যতের পথ্যা বাঁধা গড়ে ওঠার সম্ভাবনা আছে।

ওত খাঁক ছোট ছোট ছেলে, বয়স কতোই বা হবে, বারো থেকে চোদ্দর মধ্যে, হাফপ্যান্ট জেঞ্জী পরে, পায়ে একজোড়া বুট গলিয়ে মহানন্দে ফুটবল খেলছে। ছুটছে, লাফাচ্ছে, করছে কান্না কি। চেষ্টার অন্ত নেই। নিজেদের প্রাণশক্তি উজাড় করে দেওয়ার সবাই আন্তরিক। কিন্তু তাদের আচরণে বিন্দুমাত্র বিশৃঙ্খলতার ছাপ নেই। সবেতেই নিয়ন্ত্রণের ছাপ।

কখনো খেলছে বল নিয়ে। কখনো বা বল ছাড়াই খালি হাতে সম্ভবতঃ যান্ত্রিক অনুশীলন। অতোটুকু বয়স। কি তাদের করতে হবে, তা বা কি তারা নিজেরাই জানে না। তাই করণীয় কাজের হদিশ জানাতে আশেপাশে বড়রাও রয়েছেন। বড়দের নির্দেশ ছোটদের কাছে বেদবাক্যের মতো। সেই নির্দেশ জারী হতেই যোড়শ টেপা কলের মতো নির্দেশিত কাজগুলি ক হোলায় হুড়োহুড়ি পড়ে যায়।

সারা মাঠ জুড়ে ছেলের দল ছ রয়েছে। এক দল খেলা শেষে পুটি পায়ে মাঠের বাইরে চলে আসতেই একদল লাইন দিয়ে মাঠে নেমে আ মাঠেই সারা মাঠ জুড়ে বসছে। একটির একটি করে এমনি অনেক দল, সব মিলি শতাধিক কিশোর হবে। উৎসাহ তা অপরিসীম। স্ফূর্তি অফুরান। ফুটবল কলাকৌশলে কৃত হতে তারা এই পাঠশা নাম লিখিয়েছে।

পাঠশালাটির স্থিতি কলকাতার ক্রীড়াকেন্দ্র যুবের মাঠেরই একধারে। ব পাশের বড় ফুটবলের হুটগোলে এর অ ঢাপা পড়ে গিয়েছে। তা যাক, ওখ কিন্তু মস্তো কাজের বনিয়াদ গড়ার প্র পাওয়া হচ্ছে। পাঠশালাটি খুলে ডেটারেন্স স্পোর্টস ক্লাব। বিগতকালের ন নামী খেলোয়াড়দের নিজস্ব সংস্থা ডেটারেন্স ক্লাব গঠনমূলক চিন্তার ভা বাড়ন্ত ছেলেদের ফুটবল খেলা শেখাবার পরিকল্পনা নিয়েছেন সেই পরিকল্প অনুযায়ী হলো ফুটবলের এই পাঠশাল

ফুটবলের পাঠশালা

একটানা পাঁচ বছর ধরে ফুটবলের প্রাথমিক কলাকৌশল সম্পর্কে বিবিধ পাঠ গ্রহণের পর একদল শিক্ষার্থী সম্প্রতি এই পাঠশালা থেকে বেরিয়ে গেল। এই উপলক্ষে সেদিন সার্টিফিকেট বিতরণ করা হয়। এতোদিন কি শিখেছে ছেলেরা তার নমুনাও রাখলো। ছোট ছোট ছেলে সব। সামর্থ্য সংগতি সীমাবদ্ধ। তাদের কাছ থেকে মস্তো কিছু উপহার পাওয়ার প্রত্যাশা ছিল না। তাই ছোটদের ছোট ছোট কাজ দেখেই খুশি হয়ে দিকপাল ফুটবলার প্রবীণ গোষ্ঠ পাল ও বাঘা সোম দু হাত তুলে তাদের আশীর্বাদ জানালেন। ছেলেরাও ওঁদের পায়ে প্রণাম ঠুকে এক আবেগমণ্ডিত মুহূর্ত সৃষ্টি করে দিলো।

খেলা সমস্টি ব্যায়াম দৌড় ও কুচকাওয়াজের নানান ছবি দেখতে দেখতে কেবলই মনে হচ্ছিল যে শিক্ষার্থীদের আচরণে নিয়মানুবর্তিতার আশীর্বাদের ছোঁয়া লেগেছে। গড়ার কাজে এই নিয়মানুবর্তিতার শিক্ষাই ফয়দা তুলতে পারবে। নিয়মশৃঙ্খলার প্রভাবে ছেলেদের সামগ্রিক জীবন খাতে সুনিয়ন্ত্রিত হতে পারে পাঠশালার পরিচালকেরা তার দিকেও নজর রেখেছেন। ছেলেরা যখন মাঠে আসে তখন তাঁদের নজরে থাকেই। পাঠশালা ছেড়ে যখন অন্যত্র চলে যায় তখন তারা কি করে তা জেনে রাখাতেও পরিচালকদের কুণ্ঠা নেই। তাই প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে একটি করে কার্ড দেওয়া হয়। এই কার্ডে অভিভাবক ছেলেটির বাড়ী ছাড়ার সময় লিখে দেন। পাঠশালার পরিচালকেরা কার্ড দেখে ছেলেটির আনুষ্ঠানিক হালচালের হদিশ জানতে পারেন। কার্ডের হিসেবে গরমিল দেখা দিলেই কৈফিয়ৎ চাওয়া হয়। সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ না পাওয়া গেলে অভিভাবকের কাছে রিপোর্ট যায়। পাঠশালায় যোগদান বিনা কারণে অনিয়মিত হয়ে উঠলে শিক্ষার্থীর নাম কেটে দেওয়া হয়।

বাড়ীতে কোন্ ছেলে কিভাবে মানুষ হচ্ছে, তার আহার্য তালিকা কি পাঠশালার পরিচালকেরা তাও জেনে নেন। কড়া নিয়ম কোনো শিক্ষার্থীই বিনা অনুমতিতে কোনো দলের পক্ষে খেলতে পারবে না। প্রাথমিক শিক্ষা শেষ হলে তবেই পরিচালকেরা ছেলেদের কোনো দলের পক্ষে খেলায় অনুমতি দেন।

বুট—বলের যুগে বিনা শিক্ষায় ভাল ফুটবল খেলা যে সম্ভবপর নয়, এই ধারণা আমাদের মনে দৃঢ়মূল হয়ে গিয়েছে। তাই আমাদেরই ঘরের ছেলেরা আজ শিখতে চাইছে। অভিভাবকেরাও ছেলেদের হাত ধরে নিয়ে আসছেন শিক্ষাকেন্দ্রের দ্বারে। ভেটারেন্স ক্লাবের ওই শিক্ষাকেন্দ্রে দূর-দূরান্ত থেকে ছেলেরা আসছে। বাসে চেপে ট্রেনে চড়ে। পায়ে হেঁটে। রোদ, জল, ঝড় বা পথযাত্রার পরিশ্রম, কোনো কিছুর তোয়াক্কা না রেখে তারা নিয়মিত হাজিরা দিচ্ছে। তাদের উৎসাহ দেখে অবাক হতে হয়। পশ্চিমবাংলার অনুরূপ আরও কটি শিক্ষাকেন্দ্র যদি প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে বাড়ন্ত ছেলেদের উৎসাহকে সংহত করার উপায় খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু তা আর হলো কই! প্রতিযোগিতামূলক ফুটবল নিয়েই যেন আমাদের যতো মাতামাতি। গঠন কাজে মন দেওয়ার মতো ধৈর্য, চিন্তা ও নিষ্ঠা, কিছুই নেই!

পাঠশালায় ছেলে ভর্তি করার আগে প্রত্যেককেই মেডিক্যাল বোর্ডের সামনে হাজির করানো হয়। বোর্ডের সুপারিশ ছাড়া কারুর নাম শিক্ষার্থী হিসেবে খাতায় লেখা হয় না। মেডিক্যাল টেস্টে কারুর শারীরিক অসঙ্গতি ধরা পড়লে বিষয়টি অভিভাবকের গোচরে আনা হয়। পাঠশালা চলার সময় প্রতি সপ্তাহে শিক্ষার্থীদের শারীরিক সক্ষমতা চিকিৎসকেরা যাচাই করেন এবং রুমেন্টির রিপোর্ট লিখে রাখেন। মাঝে মাঝে দলবাঁধা ছেলেদের বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কলেজে শারীরতত্ত্ববিদদের কাছে পাঠানো হয়। এইসব বিশ্লেষণের নির্দেশে শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ শিক্ষাকলাপ নির্ধারিত হয়ে যায়। চিকিৎসক ও শারীরতত্ত্ববিদদের সুপারিশে কোনো কোনো শিক্ষার্থীকে অসময়ে ছুটিইয়ের কোপেও পড়তে হয়। এক কথায়, শিক্ষা-কেন্দ্রটিকে চালু রাখায় বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে চিন্তা করা হয়েছে। এলোমেলো ভাবনা প্রশ্রয় পায় নি।

ভেটারেন্স স্পোর্টস ক্লাব পরিচালিত ফুটবলের এই পাঠশালাটি বর্ষা বাদ দিয়ে বছরের অন্য সময়ে চালু থাকে। সপ্তাহে দুদিন করে ক্লাশ বসে, শনি ও রবিবারে। জিমনাস্টের তত্ত্বাবধানে শিক্ষার্থীরা খালি হাতে ব্যায়াম করে। তাদের মধ্যে বসে ফুটবলের নিয়মকানুন শেখে এবং মাঠে নেমে কোচের নির্দেশে ফুটবলের প্রাথমিক দক্ষতা অর্জনে প্রয়াস পায়। মেহনতের পর ছেলেদের টিফিন দেওয়া হয়। খাদ্য-তালিকায় থাকে ছোলা, আদা, ডালের স্যুপ, স্যালাড, ডিম, রুটি, বালির সরবৎ।

শ'খানেক ছেলের টিফিনের ব্যবস্থা করা, খেলার ও ব্যায়াম অনুশীলনের সরঞ্জাম যোগাড়ে রাখা ব্যয়সাপেক্ষ। বছরের পর বছর এই খরচ টেনে যাওয়া কি করে সম্ভব হচ্ছে? প্রশ্ন শুনে ভেটারেন্স স্পোর্টস ক্লাবের কর্মসচিব প্রখ্যাত প্রবীণ খেলোয়াড় শ্রীপরিতোষ চক্রবর্তী জানালেন, ভেটারেন্স ক্লাবের সব সদস্যই প্রাক্তন ক্রীড়াবিদ। তাঁরা খেলাধুলা ভালবাসেন বলেই প্রশিক্ষণের সহায়তার বাড়তি চাঁদা দেন এবং তাঁদের চাহিদা অনেকেই শিক্ষকদের ভাব গ্রহণে হাসিমুখে এগিয়ে আসেন। এরই ফলে প্রশিক্ষকদের জন্যে আমাদের কিছুই খরচ পড়ে না বললেই চলে। তাছাড়া পশ্চিম-বঙ্গ সরকারের শিক্ষা দপ্তর গত কয়েক বছর ধরেই শিক্ষাকেন্দ্রের অনুকূলে অর্থ সাহায্য মঞ্জুর করে আসছেন। প্রথম পর্বে রাজ্য সরকার মঞ্জুরীকৃত অর্থের পরিমাণ ছিল পাঁচ হাজার। সম্প্রতি তা বৃদ্ধি পেয়ে অষ্ট হাজারে দাঁড়িয়েছে। কর্মসচিব আরও বলেন, রাজ্য সরকার যে এই শিক্ষণ পরিকল্পনার যাথার্থ্য উপলব্ধি করে সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছেন, তা আমাদের কথা। তবে পশ্চিমবঙ্গের চাহিদা অনুসারে আরও অনেক শিক্ষাকেন্দ্র খোলা দরকার। কাজটা ব্যাপক। তাই রাজ্য সরকার ছাড়া আর কোনো পক্ষের তরফে এমন ব্যাপক কর্মযজ্ঞের সূচনা ঘটানো সহজ নয়। রাজ্য সরকারকে শিক্ষণ পরিকল্পনা সম্পর্কে যে সচেতন করতে পেরেছি, এটাও তো আমাদের সান্ত্বনা।

ভেটারেন্স স্পোর্টস ক্লাব ময়দের মাঠের একপ্রান্তে ফুটবলের এই পাঠশালা চালু রেখেছে গত পাঁচ বছর ধরে। তার আগে এই শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত ছিল দক্ষিণ কলকাতার রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে।

মাঠের দখলের গোড়ার পর্বে যখন রবীন্দ্র সরোবরে পাকা স্টেডিয়াম গড়ে ওঠেনি, তখনই কাজের সুরু। নিতান্তই বেসরকারী উদ্যোগ। মাঠদখল যুদ্ধমামানার সম্বল বলতে প্রবীণ ফুটবলারদের আন্তরিক উদ্যম। তাই দিয়েই কাজের সূত্রপাত ঘটানো হয়। কাজ হচ্ছিল কতকটা নেপথ্যেই, নমো নমো করে। তবুও ব্যাপারটা শ্রীশৈবাল গুপ্তের নজরে পড়ে যায়।

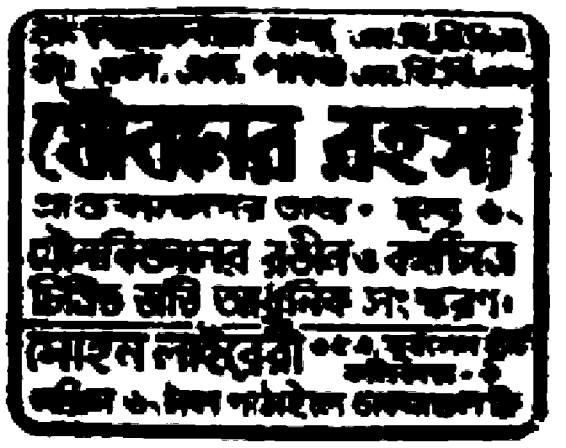

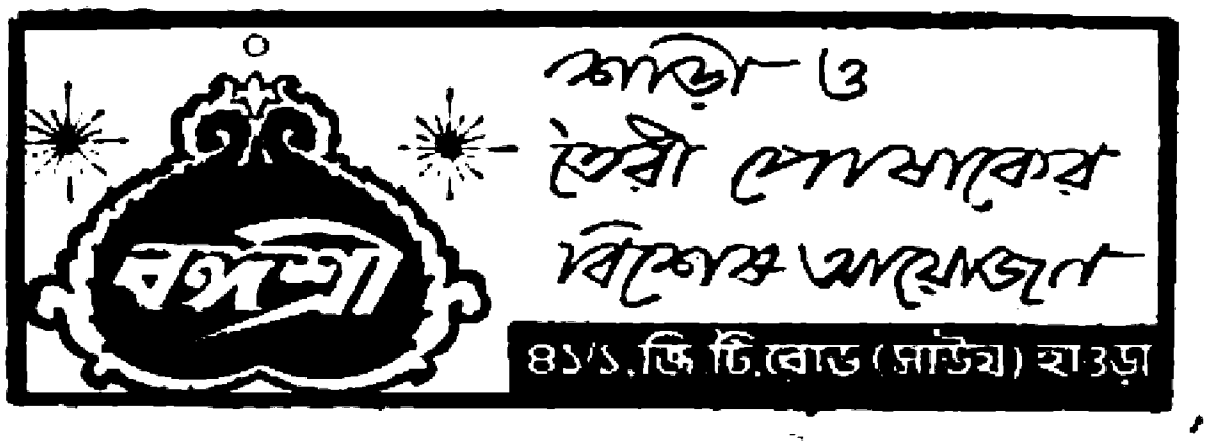

শ্রীগুপ্ত তখন কলকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের কর্ণধার। খেলাধুলোয় তাঁর অনুরাগ ছিল অকৃত্রিম। ক্রীড়া ও ব্যায়ম চর্চার মাধ্যমে জাতীয় স্বাস্থ্য যে অর্জন করা যায় এ সম্পর্কে তাঁর নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল বলেই তিনি তখন ট্রাস্টের পক্ষ থেকে সহর কলকাতাকে একটি পাকা স্টেডিয়াম উপহার দেওয়ার কথা ভাবছিলেন। যে স্টেডিয়ামে বড় খেলার আসর বসানো না গেলেও শিক্ষা-কেন্দ্র স্থাপনে অসুবিধে হবে না। বিশালকায় স্টেডিয়াম না হোক, একটি ছোটখাটো পরিচ্ছন্ন ক্রীড়াঙ্গন গড়া গেলে ছেলেদের অনুশীলন ও প্রশিক্ষণের সহজ সুযোগ পাওয়া যাবে, এই ধারণাতেই বহুকাল একার চেষ্টাতেই ট্রাস্টের সদস্যদের বোঝাতে করে শ্রীশৈবাল গুপ্ত রবীন্দ্র সরোবরে স্টেডিয়াম গড়ে দিয়েছেন। অবশ্য তাঁর চেয়ে অনুরাগীর পক্ষে মুখে মুখে অনেক লম্বা চওড়া প্রতিশ্রুতি আউড়েও এখনও পর্যন্ত মহানন্দময়ীতে মাত্র স্টেডিয়ামের বনেদ পর্যন্ত গড়তে পারেন নি। শূন্য কুম্ভের আস্ফালন ভুলে যে সব তথাকথিত বহুজন নিজেদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি নির্দ্বিধায় ভুলে বসেছেন তাঁদের আমরা ভুলে যাবো। কিন্তু শিবরাম ও কাজের মানুষ শ্রীশৈবাল গুপ্তকে কেউ ভুলতে পারবো না। কাজের মূল্যায়নেই তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। রবীন্দ্র সরোবরে স্টেডিয়ামের অস্তিত্ব থাকবে যতোদিন ততোদিনই শ্রীশৈবাল গুপ্তের নামটি আমাদের মনে পড়ে যাবে।

রবীন্দ্র সরোবরে পাকা স্টেডিয়াম গড়ে উঠতেই ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের চেয়ারম্যান শ্রীশৈবাল গুপ্ত ওই ক্রীড়াঙ্গনে ফুটবল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু রাখার ভেটারেন্স ক্লাবকে আমন্ত্রণ জানান। তিনি নিজেও কিছু টাকা পয়সা যোগাড় করে দেন। এই সময় কালকাটা রেঞ্জার্স ক্লাবও শিক্ষণ কেন্দ্রের অনুকূলে অর্থ সাহায্য মঞ্জুর করেছিলেন। পাঁচজনের সাহায্যের সম্পত্তি নিয়ে ভেটারেন্স ক্লাব বেশ কয়েক বছর স্টেডিয়াম ফুটবলের এই পাঠশালাটি চালু রেখে ছিলেন। কিন্তু শ্রীগুপ্ত ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট থেকে অবসর নেওয়ার পরই পরিস্থিতি যায় বদলে।

ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের চেয়ারম্যান পদে শ্রীশৈবাল গুপ্তের উত্তরাধিকার হিসেবে যিনি আসেন তিনি ছিলেন খেলাধুলোর বীতরাগ। তাঁর ধারণা, স্টেডিয়াম গড়ে ট্রাস্ট অর্থ ও শক্তির অপচয় ঘটিয়েছেন। প্রকাশ্যে তিনি একদিন বলেও বসেন, স্টেডিয়াম না গড়ে রবীন্দ্র সরোবর অঞ্চলের চিহ্নিত জমিতে যদি চাষ আবাদ করা যেতো তাহলে অনেক ফসল মিলতো। যে প্রশাসকের মনোভাব খেলাধুলোর এমন পরিপন্থী তাঁর আমলে ট্রাস্টের এলাকায় ক্রীড়া শিক্ষণ কেন্দ্রের যে ঠাঁই হতে পারে না, তা বলাই বাহুল্য। কাজেই ভেটারেন্স ক্লাবকে তখনকার মতো স্টেডিয়াম থেকে পাততাড়ি গুটোতে হয়। এবং শিক্ষাকেন্দ্রটি স্থানান্তরিত হয় গড়ের মাঠে। গড়ের মাঠে শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ভেটারেন্স ক্লাব রাজ্য ক্রীড়া সংস্থার ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্পোর্টস বোর্ডের অকুণ্ঠ সহযোগিতা পেয়েছে। তা না পাওয়া গেলে শিক্ষাকেন্দ্র চালু করা সম্ভবপর হোত না। কারণ, গড়ের মাঠে ভেটারেন্স ক্লাবের নিজস্ব কোনো ক্রীড়াঙ্গন নেই। কলকাতা পুলিশের কর্তৃপক্ষের কাছে নিরন্তর দরবার করেও ভেটারেন্স স্পোর্টস ক্লাব শিক্ষাকেন্দ্র চালু করার সুবিধেমত গড়ের মাঠে একখণ্ড সীমানা বরাদ্দের অনুমতি পায় নি। গড়ের মাঠের জোগাদ্দার সাধারণ ক্লাব ব্যবসায়ী সংস্থা ও জুয়াড়ীদের দখলে থাকতে পারে, কিন্তু জাতি গঠনে যাঁরা বাস্তব পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন তাঁদের উদ্দেশ্যে এই সব প্রসারিত করা যায় না। বাস্তব ব্যবস্থা সত্যিই কি বিচিত্র!

রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়াম এবং গড়ের মাঠের পাঠশালায় ফুটবলের প্রাথমিক পাঠ নিয়ে যাঁরা উপকৃত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই উত্তরসূরী ফুটবলার হিসেবে নাম কিনেছেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ জাতীয় ফুটবল বা সন্তোষ ট্রফিতে বাংলার আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অনুন্যূন ভারতের এবং অনেকেই কলকাতার ফুটবল আসরে প্রথম সারির দলের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। এঁদের সকলের নাম আমার সংগ্রহে নেই। তবে জনকয়েক সকল ক্রীড়া-রসিকের নাম আমি এখনই বলে দিতে পারি। যথা সুনীল ভট্টাচার্য, শিবরাম বসাক, বিভূতি মজুমদার, ভাস্কর ঘোষ, অচ্যুত বানার্জি, ক্লান্সিস, প্রেওরালাল, রবীন মুখার্জি, অবনী বসু, সনৎ শেঠ, সত্য সোম প্রমুখ। এঁদের দু' একজন পাঠিয়ালার নেতাজী সুভাষ জাতীয় ক্রীড়া শিক্ষায়তন স্বীকৃত কোচ। ডাঃ হরিহর বানার্জি, ডাঃ বিশ্বনাথ মণ্ডল, ডাঃ অমিতাভ সেন, ডাঃ পশুপতি চ্যাটার্জি প্রমুখ চিকিৎসকেরা বিনা পারিশ্রমিকেই নিয়মিত ছেলেদের স্বাস্থ্য পরীক্ষায় নিজেদের নিয়োজিত রেখেছেন।

সব মিলিয়ে ফুটবলের পাঠশালার ছবিটি সত্যিই আশ্বাসজনক। প্রার্থনা করি, প্রতিষ্ঠানটির বাড়বাড়ন্ত ঘটুক এবং এরই অনুকরণে পশ্চিমবাংলার দিকে দিকে আরও অনেক ক্রীড়া শিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে উঠুক।

অজয় বসু

না

দর্শক

ডেকাথলনে বিশ্ব রেকর্ড

রাশিয়া, আমেরিকা, পোল্যাণ্ড—এই দেশের সম্মিলিত ক্রীড়ানুষ্ঠানে আমেরিকার ডেকাথলনে ৮৫২৪ পয়েন্ট সংগ্রহ করে নতুন বিশ্ব রেকর্ড করেছেন। আগের বিশ্ব রেকর্ড ছিল ৮৪৫৪ পয়েন্ট। রাশিয়ার লেনিনগ্রাদে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে ৮৩১১ পয়েন্ট সংগ্রহ করে দ্বিতীয় স্থান পান।

মেনথোসা শৃঙ্গজয়ে অভিযান

ইংরাজী ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহে পর্বতারোহণের সংস্থায় কলকাতা হতে অভিযাত্রী দল নেপালের চান্দা-লাকুলে অঞ্চলের ২১ হাজার ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট মেনথোসা শৃঙ্গ আরোহণের জন্য আগামী ৫ মে যাত্রা করেছেন। হিমালয়ের অভিযান লক্ষ্য বিজয়ের প্রথম ভারতীয় সংগঠন ও পর্বতারোহণে নেতৃত্ব তারানাথ বসু ও তাপস ভট্টাচার্য। আটজন পুরুষ ও দুজন মহিলা সহ অন্যান্য গাইড, বহন সহায়ক, রসদ নাগ, প্রশান্ত দাস, বিজনাথ বসু, ব সাহা, ভারত অধিকারী, শ্রীতি সহিত ডাঃ সুব্রত বসু রায়চৌধুরী এবং শেরপা। অভিযানটি সম্পন্ন করতে লাগবে ২৫ দিন।

বিশ্ব যুব ফুটবল কাপ

আন্তর্জাতিক ফুটবল ফেডারেশন উদ্যোগে ১৯৭৭ সালের ফেব্রুয়ারী তিউনিসিয়াতে প্রথম বিশ্ব যুব প্রতিযোগিতার আসর বসবে। প্রথম এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ ছাড়া এই ১৬টি দেশ—ইউরোপের ৬, আমেরিকার ৩, আফ্রিকার ২, এশিয়ার আমেরিকার ২ এবং উদ্যোক্তা তিউ-।

ম্যামেরিকার জিম রাইউন ৩ মিনিট ১ সেকেণ্ডে এক মাইল দৌড় শেষ ম বিশ্ব রেকর্ড করেছিলেন। আট বছর অক্ষুণ্ণ ছিল। এই মে মাসে জিম রাইউনের সেই বিশ্ব ভাঙ্গেন তাঞ্জানিয়ার ফিলবার্ট বাইল ৩ মিনিট ৫১·০ সেকেণ্ডে।

প্রবীণ ফুটবল খেলোয়াড় শ্রীশাই পাল প্রবীর দেকে বছরের শ্রেষ্ঠ স্কুল ফুটবল খেলোয়াড় করছেন।

দেশ বিদেশের খেলা

পঁচিশ বছরের আলোয়

জীবনের স্মৃতিপটে কে ছবি আঁকিয়া যায় জানি না। যেই আঁকুক সে ছবিই আঁকে।' দিবারাত্র আমরা অসংখ্য ছবি দেখি। কিন্তু চোখ যা দেখে মন তার সব নেয় না। কেবল কিছু ভাললাগা ছবি চিরস্থায়ী হয় স্মৃতির পাতায়। কোন এক ব্যক্তিত্বের চরিত্রকে বলতে গেলে এই মুহূর্তে মনের পর্দায় ভেসে উঠছে তেমনই এক অতীত স্মৃতিচিত্র।

মন পেছু হাঁটছে ১৯৭২ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে রৌদ্রকরোজ্জ্বল এক মুখর মধ্যাহ্নে। কলকাতার সাউথ ক্লাবে তিল ধারণের স্থান নেই. নবীন প্রবীণের লড়াই বেশ জমে উঠেছে। উৎসুক চোখে সবাই তাকিয়ে আছে জয় পরাজয়ের নিষ্পত্তির জন্যে। প্রতিদ্বন্দ্বিতা ডাবল্স।

বর্ষীয়ান খেলোয়াড়টি দুই দশকেরও ওপর দেশ-বিদেশের টেনিস-কোর্টে একনাগাড়ে যুদ্ধ চালিয়ে প্রায় ক্লান্ত। বয়সের ভারে দৈহিক সামর্থ্যও অনেকটা শিথিল। শেষ পর্যন্ত এই প্রবীণ নায়ক তাঁর চেয়ে অনেক বেশী দৈহিক সম্পত্তিসম্পন্ন প্রাণপ্রাচুর্যে উচ্ছল বিজয় অমৃতরাজের কাছে হার মানলেও যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা তুলে ধরতে পেছপা হন নি। মুহূর্তে পরাজিত করে শিল্প জাতীয় চ্যাম্পিয়ান হলেন বটে। কিন্তু খেলার ফলাফলের দিকে না তাকিয়ে গুণগত উৎকর্ষের বিচারে কৃষ্ণান ছিলেন সেদিন অপরাজেয়। জনতা।

সত্যি বলতে কি কৃষ্ণান টেনিসের নিপুণ শিল্পী। এর আগেও অনেকবার দেখেছি এই শিল্পীর র‍্যাকেটের সূক্ষ্মগতি-সৃষ্টি কারুকার্য। দক্ষ শিল্পীর তুলির টানের মত কব্জির কেরামতিতে ও র‍্যাকেটের সূক্ষ্ম ছোঁয়ায় টেনিস কোর্টে কারুকার্য সৃষ্টিতে কৃষ্ণান অদ্বিতীয় আর্টিস্ট। সিদ্ধহস্ত টাচ আর্টিস্ট হিসেবে কৃষ্ণান আন্তর্জাতিক টেনিস আসরেও সর্বজন স্বীকৃত ও সমাদৃত।

ভারতীয় টেনিস ইতিহাসে কৃষ্ণান এক নবযুগের প্রবর্তা। চিরচরিত ছাঁচাশৈলীর পরিবর্তন ঘটিয়ে সেন্টার-কোর্টে তিনি এক নতুন আঙ্গিকের সূচনা করেন। সার্ভিস ও রুলির সঙ্গে 'পাওয়ার' ও 'টাচ'-এর সংমিশ্রণে তিনি সৃষ্টি করেন এক নতুন ক্রীড়াধারা। কৃষ্ণান প্রবর্তিত এই নব ক্রীড়া-পদ্ধতিই তাঁর প্রধান মূলধন। নতুন আবিষ্কারও বলা যায়। কারণ একটি নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে দাঁড়িয়ে খেলার পুরোনো অভ্যাসের মনোভাবকে ভেঙ্গে দিয়ে তিনি বিশ্ব টেনিস প্রতিযোগিতায় ভারতকে অনেকটা এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছেন নিঃসন্দেহে।

কৃষ্ণান মনেপ্রাণে শিল্পী। কি মাঠের ভেতরে কি মাঠের বাইরে। বিনয়ী নম্র শান্ত। স্বল্পবাক। ভেতরের উচ্ছ্বাস বাইরে বেরিয়ে আসে কদাচিৎ। সাধকের মত সমাহিত। তাঁর এই মধুর ব্যবহারের জন্যে তিনি সকলের কাছেই প্রিয়। কোর্টে খেলোয়াড়োচিত সুন্দর আচরণের জন্যে ফিলাডেলফিয়া টেনিস সংস্থা কৃষ্ণানের হাতে তুলে দিয়েছিল 'ফী বোর্ড ট্রফি'।

রমানাথ কৃষ্ণান

রমানাথন কৃষ্ণানের জন্ম ১৯৩৭ সালের ১১ এপ্রিল। টেনিসের প্রতি তাঁর আসক্তি জন্মগতসূত্রে। পিতা ট্রি কে রমানাথন ছিলেন সুদক্ষ টেনিস খেলোয়াড়। টেনিস ছাড়াও বালক কৃষ্ণানের অসাধারণ অনুরাগ ছিল ক্রিকেটে। বাবার ইচ্ছেতে টেনিসে আত্মনিয়োগ করতে না হলে হয়ত বা আজকের কৃষ্ণানকে আমরা দেখতে পেতাম একজন আদর্শবান সার্থক এবং সফল ক্রিকেটার হিসেবে।

কৃষ্ণানের টেনিস শিক্ষায় হাতেখড়ি ও উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে পিতার শিক্ষা ও সাহচর্যে। ছেলের টেনিসের উন্নতি সাধন ও তাকে উপযুক্ত পরিবেশ দানের জন্যে ট্রি কে রমানাথন সপরিবারে তিরুনেলভেলি জেলার তেনকাশী থেকে মাদ্রাজ শহরে চলে আসেন। এখানে মাত্র তের বছর বয়সে কৃষ্ণান মাদ্রাজ লয়েল কলেজ আয়োজিত বেটরান মেমোরিয়াল টুর্নামেন্টে জয়ী হয়ে স্ট্যানলী কাপ লাভ করেন।

পরের বছর অর্থাৎ ১৯৫০ সালে কলকাতার সাউথ ক্লাবে প্রথম আবির্ভাবেই নিরাজ খানাকে ফাইনালে হারিয়ে কৃষ্ণান জাতীয় জুনিয়ার টেনিস চ্যাম্পিয়ানের গৌরব অর্জন করেন। ঐ একফোঁটা ছেলে সিনিয়র প্রতিযোগিতার ডাবলসে বাবার জুটিতে চ্যাম্পিয়ান হয়ে আর এক কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। ঐ বছর অল ইন্ডিয়া হার্ডকোর্ট জুনিয়ারস চ্যাম্পিয়নের খেতাবটিও দখল করেছিলেন কৃষ্ণান। ১৯৫১ ও ১৯৫২ সালেও ন্যাশনাল জুনিয়ারস ও অল ইন্ডিয়া হার্ডকোর্ট জুনিয়ারস প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ানের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন।

১৯৫২ সালে কৃষ্ণান মাদ্রাজের পয়লা নম্বর ও ভারতের চতুর্থ বাছাই খেলোয়াড়ের স্বীকৃতি লাভ করেন। কৃষ্ণান জাতীয় টেনিসের ফাইনালে উঠেছেন বহুবার। চ্যাম্পিয়ানশিপ পেয়েছেন আটবার—(১৯৫৩ ১৯৫৫ ১৯৫৮ ১৯৬১ ১৯৬০ ১৯৬৩ ১৯৬৪ ১৯৬৫)। ১৯৫৩ সালে ষোল বছরের কৃষ্ণান ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতায় ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৯৫৪ সালে এসজে কুপারকে হারিয়ে কৃষ্ণান জুনিয়ার উইম্বলেডন চ্যাম্পিয়ান হন। ১৯৫৯ সালে এশিয়ান চ্যাম্পিয়ানশিপের সিঙ্গলসে বিজয়ীর খেতাব ও ১৯৬২-৬৩, ১৯৬৩-৬৪ ১৯৬৪-৬৫ সালে সিঙ্গলস ও ডাবলস প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়ে শীর্ষাসন অক্ষুণ্ণ রাখেন। উপর্যুপরি এই খেতাব অর্জন করতে কৃষ্ণান হদানীন্তন খ্যাতিমান বিশ্বসেরাদের অনেককেই হারিয়েছেন বিস্ময়কর। উদাহরণস্বরূপ রড লেভার, নীল ফ্রেজার ফ্রাডনী মাড 'পাটী বাল্লাটা থমাস কক প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

১৯৬০ ও ১৯৬১ সালে উইম্বলেডন সেমিফাইনালে উত্তরণ কৃষ্ণানের জীবনের আর এক স্মরণীয় অধ্যায়। ১৯৬১ সালে কোয়ার্টার ফাইনালে বিশ্ববিখ্যাত রয় এমার্সনকে হারিয়ে শেষাবধি সেমিফাইনালে বড লেভারের কাছে পরাজিত হয়ে কৃষ্ণান লেভরক্কা করতে পারেননি। ১৯৬২ সালে পায়ের আঘাতের দরুন কৃষ্ণান উই ম্বলেডন প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারেননি।

বিশ্ব টেনিসের অঙ্গনে এই ভারতীয় নায়কের স্থান উল্লেখনীয়। ওয়ার্ল্ড র‍্যাঙ্কিং-এ কৃষ্ণান ১৯৫৯ সালে তৃতীয়, ১৯৬০ সালে দশম ১৯৬১ সালে ষষ্ঠ ১৯৬২ সালে অষ্টম এবং ১৯৬৫ সালে নবম বাছাই খেলোয়াড় হিসেবে স্বীকৃত হয়েছিলেন।

১৯৬৬ সালের ডেভিস কাপে কৃষ্ণানের ভূমিকা স্মরণীয় হয়ে থাকবে বহুকাল। সেইবারই প্রথম ভারত ডেভিস কাপের চ্যালেঞ্জ রাউন্ডে উত্তীর্ণ হয় কৃষ্ণানের অভাবনীয় সাফল্যের জোরে। নিরপেক্ষ পর্যায়ে জার্মানীর ডবলে বার্নার্ট্টকে ও কলকাতায় ডাব্লিলের থমাস কককে সিঙ্গলসে এবং ডাবলসে জয়দীপ মুখার্জির জুটিতে কক ও ম্যানডারিনো জুটিকে এবং পরে চ্যালেঞ্জ রাউন্ডে নিউকাম্ব ও রোচে জুটিকে হারিয়ে কৃষ্ণান মূল্য নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

রমানাথন কৃষ্ণানের ঘটনাবহুল টেনিস-জীবনের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা নিম্নরূপ।

১৯৫৮ সালে ইটালীয়ান চ্যাম্পিয়ানশিপের সেমিফাইনালে পেত্রাঙ্গলির হাতে হার। এই বছর উইম্বলেডন প্রতিযোগিতার চতুর্থ রাউন্ডে ব্যারী ম্যাকের কাছে পরাজয় ঘটে।

১৯৫৯ সালে বুস্টল চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভ। কুইন্স ক্লাব টুর্নামেন্টের চূড়ান্ত পর্বে নীল ফ্রেজারকে পরাজিত করে বিজয়ী। রীডকে ফাইনালে হারিয়ে এই বছর আমেরিকান হার্ডকোর্ট খেতাব অর্জন করেন।

১৯৬৫ সালে কোরাবিয়ান সার্কিট-এ খেলতে গিয়ে সার্কিট প্রতিযোগিতার ফাইনালে উত্তীর্ণ হন। জুটিতে বিজয়ী। তার মধ্যে ট্রেকশাসে অনুষ্ঠিত বিশ্বর ওকস চ্যাম্পিয়ানশিপের নাম উল্লেখযোগ্য।

শিক্ষাগত দিক থেকেও কৃষ্ণান কম যান না। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি অর্থনীতিতে এম-এ পাশ করেছেন।

১৯৭৪ সালের জাতীয় লন টেনিস প্রতিযোগিতায় ২৫ বার চ্যাম্পিয়ান উপলক্ষে উদ্যোক্তারা কৃষ্ণানকে অভিনন্দিত করার জন্য এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। এই সম্বর্ধনা সভায় জাতীয় লন টেনিস সংস্থা কৃষ্ণানের হাতে রৌপ্যনির্মিত থালা তুলে দিয়ে তাঁকে সম্মানিত করেন।

কৃষ্ণানের বয়স এখন চল্লিশের উপর। স্বাভাবিক কারণে দৈহিক সংগঠনে ভাটার টান দেখা যাচ্ছে। কৃষ্ণান না চাইলেও অসংখ্য অনুরাগী এখনও তাঁর ফিফথ সিডের খেলা দেখার জন্যে পাগল। সত্যিই কৃষ্ণান জাত-শিল্পী। ভারতীয় টেনিসে তাঁর অনায়াস অবস্থান ও নিপুণ ক্রীড়াশৈলী চিরকাল ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

রঙ্গ সিঙ্গলসে যদি সিকোটের মাস্কি মিয়ান ও ধানচান্দকে যদি হকির যাদুকর বলে আখ্যায়িত করা যায়, তবে রমানাথন কৃষ্ণানকে নিঃসন্দেহে টেনিসের যাদুকর বলে ভূষিত করা যায়। এ সম্পর্কে এক বিদেশী সাংবাদিকের মন্তব্য উদ্ধৃত করে বলতে ইচ্ছে হয় —কৃষ্ণান ক্যান বি মার্কড্ এজ এনাদার টাইগার্ড ইন স্পোর্ট অফ ইণ্ডিয়া, এলসেইজ বীয়ং এন্ড ব্যানচাস।

প্রশান্ত দা

প্রবীর দে

'সবাই আমাকে আশীর্বাদ করুন। আমি যেন প্রাপ্ত সম্মানের যোগ্য হয়ে উঠতে পারি। পারি যেন ভাবীকালে এই সম্মানের পূর্ণ মর্যাদা দিতে। আমি যেন পথভ্রষ্ট না হই। অহমিকা, আত্মম্ভরিতা যেন আমাকে স্পর্শ না করে। এখনও যে আমার অনেক পথ চলতে হবে'।

বিশ্ববিদ্যালয় মাঠের কোণে সলজ্জ ভঙ্গিতে দাঁড়ানো সেদিনের ঐ ছেলেটিই যে বছরের সেরা স্কুল ফুটবলার সে কথা পরিতোষদা বলে না দিলে কেউ হয়তো বুঝতেই পারতেন না। মিতবাক, শান্ত, নম্র অথচ কথাবার্তায় কি বিপুল আত্মপ্রত্যয়ের সুর!

প্রবীরের কথা বলছিলাম। প্রবীর দে, এ বছর ডেটারেন্স স্পোর্টস ক্লাব চিহ্নিত সেরা স্কুল ফুটবলার। ডেটারেন্স স্পোর্টস ক্লাবে অতীত দিনের দিকপাল সব খেলোয়াড়দের সমাবেশ। গুণীজনের সমাদর। অজুরীদের যাচাই করা হীরের টুকরো প্রবীর। তাই সেদিন পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের পূর্বাহ্নে একান্তে কথা বলার সময় প্রবীরকে আমার মনে হচ্ছিল আদর্শ খেলোয়াড়ের প্রকৃত প্রতিনিধি বলেই। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভাল যে, পশ্চিম বাঙলার ডেটারেন্স স্পোর্টস ক্লাব শুধু ক্রীড়াগত নৈপুণ্যের ভিত্তিতেই বর্ষশ্রেষ্ঠ নির্বাচন করেন না। নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিচার করা হয় সংশ্লিষ্ট খেলোয়াড়ের চরিত্র, ভদ্রতা, নম্রতা এবং মাঠের ভেতর এবং মাঠের বাইরের সামগ্রিক আচরণের। ঐ চরিত্র, ভদ্রতা, নম্রতা যা মাঠের ভেতর বাইরের ব্যবহারে ফুটে থাকলে শত বড়ো খেলোয়াড় হলেও ডেটারেন্স স্পোর্টস ক্লাব তাঁর কোন মূল্যই দেন না। যেমন দেননি শেষ পর্যন্ত এ বছর গড়ের মাঠের কোন খেলোয়াড়কে বর্ষশ্রেষ্ঠের স্বীকৃতি। নির্বাচন প্রায় ঠিক হয়েই ছিল কিন্তু সাম্য ঘোষণার মাত্র একদিন আগে ডেটারেন্স স্পোর্টস ক্লাবের মনোনয়ন পত্রটি মাঠের ভেতর একটি বিসদৃশ ফাউল করে ফেলায়—নায়করা ঐ খেলোয়াড়টির নাম বাতিল হয়ে যায়।

সেদিক দিয়ে প্রবীর ভাগ্যবান বটে। ভাগ্যবান এই কারণেও যে, শ্রেষ্ঠ স্কুল ফুটবল খেলোয়াড়ের স্বীকৃতি স্মারক তাঁর হাতে তুলে দিয়েছেন প্রতীতের দিকপাল খেলোয়াড় পদ্মশ্রী শেখ পাল। প্রবীরের হাত থেকে সেই পারিতোষিক তুলে নেওয়ার মুহূর্তে আবেগে, আনন্দে, অনুপম অনুভূতিতে প্রবীরের গণ্ড বেয়ে অশ্রুধারা নেমেছে; কণ্ঠ হয়েছে বাণীহারা। সম্বর্ধনার প্রত্যুত্তরে প্রবীর শুধু এই কথাগুলিই বলেছেন : 'আমি ধন্য। আমি কৃতজ্ঞ। ধন্য এই কারণে যে, দেশ দেশ নন্দিত ও বন্দিত এককালের দিকপাল খেলোয়াড়রা আমাদের শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান দিয়েছেন বলে। আমি যেন ভাবীকালে এই সম্মানের পূর্ণ মর্যাদা দিতে পারি। আমি যেন পথভ্রষ্ট না হই। অহমিকা যেন স্পর্শ না করে আমাকে আমায় আপনারা আশীর্বাদ করুন'।

শহরতলীর ঈশ্বাস্থু অধ্যুষিত এলাকার ছেলে প্রবীর। নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে। লেখাপড়া এবং সেই সঙ্গে খেলাধুলো চালিয়ে যাওয়ার পথে প্রতিবন্ধক প্রচুর। কিন্তু অদম্য অধ্যবসায় আর মনোবলের মূলধনে মাত্র ক্যাপ্টেনসির স্তরে মহেন্দ্র কলেজীয় শ্রীধীরেন্দ্রলাল দের যোল বছরের ছেলে প্রবীর সব প্রতিবন্ধক পার হয়েছে। ধীরেনবাবুর বিরাট সংসার (চার ছেলে, চার মেয়ে)। আয়ক্ষম শুধু দুই জন

CENTRAL LIBRARY

প্রবীর দে

লেফট ষ্টপ্রাইকার শান্তি মল্লিক

রে

লেয়

র প্রমীলা ফুটবল দলের আরও
টি মেয়ের সঙ্গে আলাপ আলোচনার
শান্তিকেও নানা কথা জিজ্ঞাসা করি।
ঃ লেফট, রাইট দুদিকেই স্ট্রাইকারের
ায় খেলতে অভ্যস্ত।

শান্তি কালীঘাটের দেশবন্ধু শিশু
লয়ের ছাত্রী। এরই মধ্যে রাজ্যের
দের হ্যান্ডবল দলে সর্বভারতীয় প্রতি-
গিতায় খেলার জন্য মনোনীত হয়।
বলে দক্ষ শান্তিকে ওদের ক্লাবের
ক্ষক হরিদাসবাবুই 'প্রমীলা' ফুটবল
গঠনের কথা জানায়। প্রমীলা ফুট-

বলের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ও দেখা করে
দলের প্রশিক্ষক সুশীল ভট্টাচার্য
প্রাথমিক বাছাইকালে দলে নেন।

এবার লক্ষ্ণৌ-এ আয়োজিত এই
ভারতীয় প্রমীলা ফুটবলে বাংলাদল
পর্যায়ে দিল্লী, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান
উত্তরপ্রদেশের সঙ্গে খেলে। দিল্লী ও
প্রদেশকে ওরা ৩—০ গোলে হারায়
স্থানও প্রথম ১৫ মিনিটে তিন গ
পিছিয়ে পড়ার পর খেলা ছেড়ে
স্পীকার করে। একমাত্র উত্তরপ্রদেশের
বাংলার খেলা গোলশূন্য থেকে যায়।
জিজ্ঞাসা করাতে শান্তি বলল, ও
অনুশীলন করেছি বড় মাঠে, ঘাস
পোস্টে। কিন্তু এক রাজস্থান ছাড়া
সব দলের সঙ্গেই খেলতে হয়েছে
মাঠে আর হবি গোল পোস্টে।
পোস্টের জন্যই আমরা দুটো গোল
নষ্ট করেছি। লীগের খেলাগুলো হ
দুই অর্ধে ২৫ মিনিট করে আর ফাই
তিন মিনিট করে। উত্তর প্রদেশের গু
সবাই গোলের সামনে ভীড়
আমাদের রুখছিল। তাছাড়া ওরা বেশ
বল খেলছিল। কিছু ছোঁড়া বা
দিয়ে বা হাত টেনে ধরে আমাদের

CENTRAL LIBRARY

শান্তি মল্লিক

। অথচ উত্তরপ্রদেশের ক্যোরী
ও দেখেও দেখেছিলেন না।
-তাই নাকি? অন্য সব বলের
কিরকম দেখলে?

একটি দল লক্ষ্ণৌয়ে এই চিন্তার
খেলতে এসেছিল তাদের মধ্যে
বহারের খেলার ধরন অনেকটা
র মত। বাকী সব দলই বলের
জটলা করে মাঠ ছোট করে
ল, তাই আমাদের খুব সুবিধা হয়।
সূচীলনার নির্দেশমত ছড়িয়ে
ফলে, জন্য পাশে আমরা প্রতিপক্ষ-
ব্যবস্থা ভাঙতে সক্ষম হই।
তঃ একদিকের আউট থেকে আক্রমণ
হত আর অন্যদিক থেকে গোল করা
এই পদ্ধতিতে খেলার জন্যই আমি
ন, মধ্যপ্রদেশ আর কাইনালে
র বিরুদ্ধে গোল করি। ফাইন্যালে
র গোলটি করে দীপ্তি মল্লিক।
। আমাদের লিঙ্ক হাফ নূতন
ঙ্গের খুব সাহায্য করেছে। সেন্টে

লিঙ্ক হাফ নুতনও (নূতনের ভোকাল
পিন্নীর বিরুদ্ধে কর্ণার শটের সময়
এসে বলটি শট থেকে বল নিয়ে
করেছে। হাঁ, ভাল কথা, বিহারের
কিন্তু ফুটবল খেলাটাকে তেমন
দেয়নি। মনে হল, হায়দরাবাদই
এ খেলাটাকে তেমন [illegible]
ওদেরই মাঠে সবচেয়ে আগুন ঝরে
হচ্ছিল। অথচ, বিহারেই [illegible]
ভাল খেলা হয়।
আমাদের তাই ফাইনাল খেলা দেখে
অবাক লাগছিল। তবে বিহার যদি
ফাইনালে আমাদের [illegible]
তাহলে হয়ত আমরা খুব [illegible]
প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ পেতাম।
দলে দুটি বাঙালী মেয়ে ছিল,
একজন লক্ষ্মণ হয়ে [illegible]
আমাদের আক্রমণে [illegible]
সবসময় খেলার [illegible]
হলেও [illegible]
সংগঠনের [illegible]

CENTRAL LIBRARY

সত্যমাণিক

চম্বল সম্পর্কে আপনার কোন ইন্টারেস্ট আছে? সেই চম্বল যেখানে দুর্ধর্ষ ডাকাতের দল এখনও বিভীষিকা সৃষ্টি করে চলেছে। পুলিশ এবং সিকিউরিটি ফোর্সের জোরানর এখনও ওখানকার ডাকাতী সমস্যা সম্পূর্ণ সমাধান করতে পারে নি। চম্বলের বেহড় কিনিসটা আমি লিখে কখনও বোঝাতে পারব না। প্রকৃতির অদ্ভুত একটা সৃষ্টি এই বেহড়। গিরিখাত বলতে যে ছু-প্রকৃতি আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে এটা যেন কতকটা তাই। আর সেই গিরিখাতের বাঁকে বাঁকে বিপদ ওৎ পেতে লুকিয়ে থাকে। কখন যে কার ওপর কাঁপিয়ে পড়বে তা আগাম কেউই বলতে পারে না। এই প্রসঙ্গে সেখানকার একটা ঘটনা আমার স্মরণ হচ্ছে। সেটা এই অবসরে আপনাদের বলে রাখি।

সিকিউরিটি ফোর্সের পাহারায় আমরা একদিন রাজস্থান বর্ডারের খুবই কাছে একটা ঘন বেহড়ের মধ্যে ছবির শুটিং করছি। গিরিখাতগুলো চারপাশে অসংখ্য গলির মত আমাদের আশপাশ দিয়ে বেরিয়ে গেছে। আর এই বাওয়াটা কোথাও থেমে নেই। চলেছে তো চলেইছে। একটা খাত কিছুদূর এগিয়ে নানা উপখাত সৃষ্টি করেছে। আবার সেই উপখাত কিছুদূর গিয়ে আরও কিছু গলি সৃষ্টি করে এগিয়ে গেছে। এইভাবে চলেছে মাইলের পর মাইল। মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান আর উত্তরপ্রদেশের সীমান্ত ধরে ধরে—প্রায় তিনশো মাইলের মত জায়গা জুড়ে।

আর যেখানে আমরা এই বেহড়ে, সেটা মোটামুটি যেন একটা পাহাড়। সমতল থেকে আমরা বেশ কয়েক শো ফিট নীচ দিয়ে এসেছি। লোক-লস্কর আর যন্ত্রপাতি নিয়ে। সঙ্গে রয়েছেন ছবির প্রিন্সিপাল আর্টিস্ট হরু যে আর শেখর চ্যাটার্জি। এই ছবিতে শেখর চ্যাটার্জি এক দুর্ধর্ষ ডাকাতের চরিত্রে রূপ দিচ্ছিলেন। আর পরিচালক হরু যে দিচ্ছিলেন পুতলী বাইয়ের চরিত্রে।

পুতলী বাইকে সর্দার সুলতান সিং এক মাইফেল থেকে ধরে নিয়ে এসেছিল। গান-বাজনাই ছিল পুতলীর বংশগত পেশা। প্রথম দর্শনেই সুলতান সিং তার প্রেমে পড়ে যায়। তারপর থেকে সে সুযোগের অপেক্ষায় ছিল—কিভাবে ওই বাইজীকে লুঠ করে বেহড়ের গভীরে এনে ফেলা যায়। অবশ্য পুতলী বাই এসবের কিছুই জানতে না। একবার এক ধনী ব্যবসাদার শেঠজী তাকে বায়না করে নিয়ে গেল চম্বলের এক মফস্বল শহরে। সেখানে শেঠজীর মাইফেলে তাকে নাচ-গান করতে হবে। তার বিনিময়ে পাওয়া যাবে বেশ মোটা পারিশ্রমিক। পুতলী রাজী হয়ে গেল। আর এই সংবাদটা, সে কোন ভাবেই হোক—বেহড়ের বিভীষিকা সর্দার সুলতান সিংয়ের কানে পৌঁছে গেল।

গোয়ালিয়রে পুলিশ দপ্তরের রেকর্ডে এইসব কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে।

একদিন গভীর রাতে শেঠজীর সরবরাহিত মাইফেল থেকে অতর্কিতে পুতলী বাঈ ছিনতাই হয়ে গেল। রাইফেলের নলের সামনে কেউ টাঁ-ফোঁ করে নি। সুলতান সিং সদলবলেই এসেছিল। আতঙ্কে সিঁটিয়ে যাওয়া পুতলী বাইকে হুকুম করেছিল—প্রাণে বাঁচতে যদি চাও তো আমার সঙ্গে চলে এসো—

পুতলী যেতে চায় নি।

তখন সর্দারের অনুগত—দলের সবচাইতে নৃশংস যে ডাকাত, শেখর চ্যাটার্জি ছবিতে যে ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন, সে এগিয়ে গিয়ে পুতলীকে পাঁজাকোলে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল।

তারপর পরপর কয়েকটি গুলির শব্দ। কিছু আকাশ বাতাস কাঁপানো মর্মান্তিক চীৎকার। অনর্থক কিছু নরহত্যা। এরপরের ঘটনা দ্রুত ঘটেছিল। সর্দারের অনুপস্থিতির সুযোগ অনুগত ডাকাতটি পুতলীকে বরণ করেছিল বেহড়ের নির্জনতায়। সে খবর সুলতান সিং জানতেও পারেন নি। পরে পুতলী বাই সুলতান সিংয়ের প্রেমে পড়ে গিয়েছিল। সুলতান সিংয়ের প্ররোচনায় পুতলী বাই পরপর কয়েকটি নরহত্যাও করেছিল। পুলিশের রেকর্ডে পুতলী বাইয়ের নাম উঠেছিল। তার মাথার ওপর হাজার হাজার টাকার পুরস্কার ঘোষিত হয়েছিল। ততদিনে পুতলী বাই এক দুর্ধর্ষ ক্রিমিনালে রূপান্তরিত। যে মেয়ে আগে, নেচে গেয়ে দলের ডাকাতদের মনোরঞ্জন করতে সাধা হত, পরবর্তীকালে সেই মেয়ে দলের নেত্রী হিসাবে একটার পর একটা ডাকাতী করে গেছে নির্ভুল হিসাবে—পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে নির্দোষ নিরীহ মানুষকে দাঁড় করিয়ে শুটিং প্র্যাকটিস করেছে। ভাবা যায় না। আমি মোরেনার বহু লোকের কাছে পুতলী বাইয়ের এ-হেন নৃশংসতার কাহিনী শুনেছি। শুনেছি পুতলী বাই ডাকাতি করতে বেরিয়ে মেয়েদের শরীরের অলঙ্কার কখনও খুলে নিত না—ছিঁড়ে নিত। মোরেনা শহরের বাসিন্দা ছিল পুতলী। পরে মোরেনার লোকেরা পুতলীর নাম শুনে আতঙ্কে কাঁপত। চম্বলের অত বড় যে কুখ্যাত ডাকাত অমৃতলাল—অত্যাচারের ক্ষেত্রে যে ছিল শয়তানেরও অধম—পুতলী বাই যেন তাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

আমার মনে আছে, গোয়ালিয়রের এক ইংরিজী দৈনিকের রিপোর্টার এসব কাহিনী প্রদীপকুমারকে একদিন গল্পচ্ছলে বলেছিল। প্রদীপকুমার তখন ছিলেন মোরেনার সার্কিট হাউসে। চারিদিকে কড়া পুলিশের পাহারায়। সেদিন রাতে আমি ওঁর ওখানে যেতে উনি বললেন—বসুন ভাই এসব কি শুনছি?

—কি প্রদীপদা?

—এই পুতলী বাই সম্পর্কে? ভেঙ্কারাস ওম্যান—

—ইতিহাস তাই তো বলছে প্রদীপদা।

—তাহলে ভাই এখানে থাকা বিপজ্জনক—আমি সেকথা শুনে তো অবাক।

—কেন বলুন তো?

—মানে রাতে যদি এ্যাটাক-ফ্যাটাক করে বসে!

এ্যাটাক? পুতলী বাই? আমি সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলাম প্রদীপকুমার সব গুলিয়ে ফেলেছেন। সহাস্যে বললাম—দাদা, আপনি ভুল করছেন। পুতলী বাই তো কবে মরে গেছে।

আসলে সান্ধ্য আসরে রিপোর্টার ভদ্রলোক এমনভাবে কাহিনীটি বলে গিয়েছিলেন যে প্রদীপকুমার বেশ নার্ভাস হয়ে পড়েছিলেন। উনি ভুলেই গিয়েছিলেন যে মাঝখানে বেশ কয়েকটি বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে।

কিন্তু পুতলী গেলেও চম্বল ডাকাত, এখনও তার বিভীষিকা মুছে যায় নি। আমরা যখন ওখানে শুটিং করছি—মাইলের পর মাইল ধরে—দিনের পর দিন—চম্বলে তখন অন্ততঃ কুড়ি থেকে পঁচিশটি নটোরিয়াস দল অপারেট করে ফিরছে। প্রতিদিনই কিছু না কিছু ডাকাতি হচ্ছে। হচ্ছে হাইওয়ে রবারি, কিডন্যাপিং। হচ্ছে খুন-জখম-লুঠতরাজ।

সে অন্য কাহিনী। সুযোগ পেলে আলাদাভাবে আপনাদের শোনাবার চেষ্টা করব। আপাতত আমরা মূল কাহিনীতে ফিরে যাই।

অনুগত শিবোর হাতে সর্দার সুলতান সিং একদিন খুন হয়ে গিয়েছিল। আর মূলে ছিল ওই পুতলী বাই। লোকটি সর্দারকে সরিয়ে পুতলীর ওপর নিজের প্রতিষ্ঠা কায়েম করতে চেয়েছিল। পুলিশ রেকর্ডেই একথা পরিষ্কার উল্লেখ করা হয়েছে। লোভই মানুষকে সর্বনাশের দিকে টেনে এনে দাঁড় করিয়ে দেয়। আর তা যদি নিছক মেয়ে মানুষ সংক্রান্ত হয় তাহলে তো মহাকাব্যের সবচেয়ে ধ্বংসোন্মুখ কাহিনী

রামানন্দ সেন কোন রিহার্সাল ছাড়াই
। নিতে রাজী হয়ে গেলেন। রামানন্দ
আমাদের দেশের একজন গিফটেড
ারাম্যান। বিলেতে গিয়ে উনি কালার
ফোটোর ট্রেনিং নিয়েছেন একবারে। এবং
ার 'দি রিভার' ছবির অপারেটিং
রাম্যান হিসাবে কাজ করেছেন। অজ-
সৌমেন্দু রায়, দীনেন গুপ্ত, কৃষ্ণ
ী—এঁরা সবাই ওঁর সহকারী হিসাবে
র পর বছর কাজ করেছেন ওঁর সঙ্গে।
শেখর চ্যাটার্জির হাতে স্পেশাল
াটিজ হিসেবে তুলে দেওয়া হল একটি
ট-গ্রী রাইফেল। তারপর খুব সন্তর্প-
উনি পাহাড়ের মাথায় উঠে গেলেন।
শন নিলেন। ওখান থেকে উনি ক্যামে-
দিকে লক্ষ্য করে গুলি চালাবার অভিনয়
ন। কারণ ক্যামেরার দিকটা তখন হচ্ছে
পক্ষের দিক।
নিচে থেকে চেঁচিয়ে জিগ্যেস করলাম—
ইউ আর ফিলিং?
—ও কে। আই অ্যাম কম্ফোর্টেবল
র। তোমরা টেক করতে পারো—

তার আগে একবার ফাইনাল চে
ল জায়গাটার। চম্বলের মাটি খুবই ঝ
রাস। অভিজ্ঞ মানুষেরা গোড়ায় সতর্ক
'য়েছিলেন—এখানকার মাটিতে নাকি ি
নাসের জার্ম মিলে আছে। কখনও শরী
কোথাও কেটে-কুটে গেলে সঙ্গে
সেখানে ডেটল লাগিয়ে দেবেন। নইলে
টেনাসে মৃত্যু প্রায় অনিবার্য! ফলে স
আমাদের আর কিছু থাকুক চাই না-থা
বোতল বোতল ডেটল সারাক্ষণ থাকত।
পাহাড়ের ঢাল বেয়ে শেখর চ্যাট
গড়াতে গড়াতে নামবেন, তাই আমরা ক
গায় বলতে আশে পাশে যা ছিল, তা
সবই উপড়ে ফেলে দিলাম। আর পাথ
ছোট-বড় টুকরো।
আমরা সিগনাল দিলাম—রেডি ফর
টেক্।
শেখর চ্যাটার্জি রাইফেল তুলে দাঁ
জানালেন—উনিও তৈরী। কাম অন।
(চল

রঞ্জন মজুমদ

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষের

নতুন বই

চিত্র-বিচিত্র

একাল-সেকালের বিচিত্র কথা

ও

রসমধুর কাহিনী সমারোহ।

দাম: সাত টাকা।

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ

CENTRAL LIBRARY

ফ্লর থেকে বলছি

[illegible]বির নাম সন্ধ্যায় সর্বে। নবাগত লক আমায় বললেন—আমার এই চিত্রগ্রহণ যোল আনাই মেরে। আজ লিংকিং শট নিচ্ছি। আসুন দেখবেন। [illegible]ছায়ে একটা এল পিস সেট তৈরী হয়েছে। সাজনয় করেছিলেন দেবরাজ আর রাজশ্রী বসু। ছবিতে এঁদের নাম [illegible]ন রাজা এবং রুমকী। একেবারে নিখুঁত পরিবারের সেট-আপ। পোষাকে [illegible]ন পারিপাট্য। সবাইকেই খুবই স্মার্ট। [illegible]ি পারে, সামাজিক অবক্ষয়ের ফলে যে [illegible]ত বাঙালী সমাজ আজ প্রায় নিঃশেষ [illegible]ছে মঞ্চের—রাজা এবং রুমকী তাদেরই প্রতিনিধি। বক্সিতে আজ [illegible]ই হয়েছে। কালে হয়ত এসব [illegible]কেই আবার ফ্ল্যাট বাড়িতে দেখতে [illegible]া যাবে।

পরিচালক অমিতাভ মিত্র একজন [illegible]যাক যুবক। উনি একটা শট নিয়ে [illegible]র পাশে এসে বসলেন। মৃদুকণ্ঠে বললেন—এই গল্পটা নিয়ে ছবি করবার আগে আমি একটা স্লেজ প্রোডাকশন করেছিলাম—

—আপনারই লেখা?

—না। এই গল্পের লেখিকা হচ্ছেন শেফালী ব্যানার্জি নামে এক ভদ্রমহিলা। প্রথম পড়ে আমার খুব ভাল লেগেছিল। তাই প্লট করেছি। তারপর যেই ছবি করবার সুযোগ পেলাম—এই গল্পটা-ই বেছে নিলাম।

রাজা নামের ছেলেটি হচ্ছে এ-ছবির সেন্ট্রাল ক্যারেকটার। গ্রাজুয়েট হবার পর চাকরীর চেষ্টায় দোরে দোরে ঘুরে ব্যর্থ হয়ে শেষ পর্যন্ত তাকে পেশা হিসেবে ফিনতাই-য়ের লাইন বেছে নিতে হয়েছে। ছবির ওপেনিং সীনেই দেখা যাচ্ছে—ট্রাম লাইনের ধারে রাজা অপারেট করছে। একটি মহিলার না কার যেন হাত ব্যাগ ছিনিয়ে নিয়ে সে দৌড় পালাচ্ছে। আর তাকে তাড়া করে ছুটছে একদল লোক। কিন্তু রাজা তাদের হাত এড়িয়ে—

—পালিয়ে গেল তো?

অমিতাভ মিত্র একটু যেন হকচকিয়ে গেলেন—এ্যাঁ? হ্যাঁ, রাজা পালিয়ে গেল.....

সিনেমার প্রয়োজন মত ক্রিমিনালরা পালায়। এ শুধু বাংলা ছবিতে নয়। পৃথিবীর সব দেশের ছবিতেই পালায়; না পালালে গল্প হয় না। রাজা যদি ছবির ওপেনিং সীনে ধরা পড়ে যেত—তাহলে আর নাটক হতো না। শুরুতেই শেষ হয়ে যেত সব কিছু: ধরা পড়লে রাজা ক্ষিপ্ত জনতার হাতে বেদম প্রহৃত হতো। তারপর তার জেল হয়ে যেত। ছবিখানা হয়ে যেত: অনাদরে আরও মেয়াদ বাড়ত: সবই ফুরোলেট হয়ে যেত:

অমিতাভ সহাস্যে স্বীকার করলেন—তা অবশ্য হতে পারত,...তবে আমার এই গল্পটা স্বতন্ত্র.....।

হলবার উপক্রম করতেই নায়িকা রাজশ্রী হন্ হন্ এগিয়ে এসে সব ভণ্ডুল করে দিলেন।

আমার দিকে কিছুক্ষণ হাসি হাসি মুখে চেয়ে থেকে হঠাৎ বললেন—আপনাকে আমি চিনি।

—তাই নাকি? কিভাবে বলুন তো?

রাজশ্রী বললেন—আচ্ছা আপনার নাম ইয়ে না? মানে মুসাফির না? অনুষ্টুপ কাগজের?

সবিনয়ে আমি—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আপনি আমার আর জয়শ্রীর ঢাকার কাপড়া নিয়ে লিখেছিলেন না?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আমি সেটা পড়েছি।

—থ্যাঙ্ক য়্যু, কোন মন্তব্য করবেন?

রাজশ্রী সামান্য ভেবে নিয়ে জবাব দিলেন—আমি ফিরে আসি, তারপর একদিন আপনাকে সব খুলে বলব।

—ফিরে আসবেন মানে? আপনি কোথাও চলে যাচ্ছেন নাকি?

—বিলক্ষণ—রাজশ্রীর মুখে [illegible] আনন্দের উজ্জ্বল হাসি।—আমি আগামীকাল কানাডা চলে যাচ্ছি।

—সেকি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ মুসাফির। কানাডায় আমার স্বামী থাকেন। আমি কিছুদিনের জন্যে ওঁর কাছে যাচ্ছি—

—ভেরী গুড নিউজ। সম্প্রতি এই রকমই একটা খবর যেন কোথাও পড়ছিলাম। ইয়েস! বঙ্গান্তর পত্রিকায়। তাহলে শেষ পর্যন্ত আপনি কানাডায় যাচ্ছেনই?

—নিশ্চয়। এ-বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নেই। আগামীকাল বিকেল সাড়ে চারটেয় আমি কলকাতার ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট থেকে ফ্লাই করছি দিল্লীর জন্যে। তারপর গভীর রাত্রে দিল্লী থেকে ক্লার্মান এয়ারলাইনার লুফ্‌থান্সায় চেপে সোজা মন্ট্রিয়ল গিয়ে নামব। তারপরের তিনমাস [illegible] এর আমার স্বামী—নো থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নয়—ডেটিং নয়—ডায়েটিং নয়—ওনলি রোমান্স—

—আপনার স্বামী ওখানে কি করেন? আই মীন প্রফেশনালী?

অধ্যাপক। হি ওনলি টিচেস্.....

রাজশ্রীর খুব সম্প্রতি বিয়ে হয়েছে। মানে নোগোশিয়েটেড নয়—প্রেমেরই পরিণতি। যখন ওঁদের রোমান্স আরম্ভ হয়েছিল—রাজশ্রী তখন স্বভাবতই স্কুলের বা কলেজের ছাত্রী ছিলেন। এখন ফিল্মের নায়িকা। গ্ল্যামারাস নায়িকা। ভদ্রলোক মন্ট্রিয়লে তাঁর বৌ-কে প্রেজেন্ট করবেন হয়ত এইভাবে—দি ইজ এ ফিল্মস্টার! নিঃসন্দেহে কিছু আওয়াজ হবে মন্ট্রিয়লে। প্রেসের লোকেরা লোকাল কাগজে নিশ্চয় ইন্টারভিউ-টিউ ছাপবে। টি-ভিতে প্রোগ্রামও হবে কিছু না কিছু।

—বেস্ট অফ লাক রাজশ্রী—মুসাফির বলল—নভেম্বর মাস পর্যন্ত তাহলে ঢাকার কাপড় মুলতুবী রইল। ফিরে এসে ফিনে আরম্ভ করবেন তো?

অসমঞ্জ

পার্থ মুখোটি মহাশয়/পরিচালনা : ইন্দর সেন

—তাই কিছু হিন্দুস্তানী লোকের সন্ধান হচ্ছিল। রাজা সেই ফাঁদে পা দিয়ে। মালিক বলল—দেখ রাজা, চাকরী কে আমি নিশ্চয় দেব। কিন্তু তার তোমাকে একটা কাজ করে প্রমাণ হবে যে তুমি খুব অনুগত লোক, র লোক—

—বেশ। আমি করব। বলুন কি সেই ?

ালিক সমানা ইতস্ততঃ করে বলল—আমি যদি তোমাকে গোপনে কোথাও ন লাগাতে পাঠাই—তুমি রাজী থাকবে?

—আগুন? রাজা চমকে উঠল।

—হ্যাঁ—আগুন। যদি পারো তোমাকে আমি প্রচুর টাকা দেব। কার্যসিদ্ধির হয়ে গেলে পার্মানেন্ট চ একটা পাবে—

রাজার মনের ভেতর তখন ঝড় বলল—বেশ, বলুন কবে কোথায় আগুন লাগাতে হবে।

মালিক আশ্বস্ত হয়ে বলল—কারখানায়। ওখানে ডিপার্টমেন্টে থেকে সব ব্যবস্থা করা থাকবে। তু টিন পেট্রোল ঢেলে দিয়ে আগুন সরে পড়বে। কারপক্ষও টের পাবে

অনবদ্যমতা

ইন্দ্রকুমার/অনুপকুমার

সেই চোখ

শ্রাবণী বসু, উত্তমকুমার ও শৈলেন মুখার্জি

রাজা রাজী হয়ে গেল। মালিক সঙ্গে সঙ্গে তার হাতে এক বান্ডিল কারেন্সী নোট গুঁজে দিয়ে বলল—ঠিক সময়মত খবর যাবে তোমার কাছে।

আর তার পরেই এই রোমাঞ্চিক সীন। ঘরে ভাত ঢাকা পড়ে রয়েছে। রাজা খেতে পারেনি। অস্থির হয়ে পায়চারী করে বেড়িয়েছে। এমন সময় কুমরী এসেছিল রাজার খবর নিতে। সে রাজাকে অমন অস্থির দেখে অবাক হয়ে প্রশ্ন করেছে—রাজা, রাজা কি হয়েছে তোমার? এখনও খাওনি। খাবার যে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

—আমার খিদে নেই।

কুমরী অবাক।—খিদে নেই! কেন কি হয়েছে তোমার?

—কিছু হয়নি — রাজার কণ্ঠস্বর অস্বাভাবিক রকম গম্ভীর।—আমায় একটু একলা থাকতে দাও—

—নিশ্চয় কিছু হয়েছে, আমাকে খুলে বলো রাজা—

রাজা একটু পায়চারী করে নিয়ে বলে—কুমরী, আমি ফ্যাকটরীর মালিককে কথা দিয়েছিলাম—তিনি যা বলবেন আমি তাই করব। এটাই আমার চাকরীর শর্ত। আর আজই সেই শর্ত পালন করার দিন...

—তার মানে?

রাজা বলে—সে বড় নির্মম। আমার ওপর নির্দেশ এসেছে—ফ্যাকটরীর স্টোর-রুমে আগুন ধরিয়ে দিতে হবে—

ভীষণ চমকে ওঠে কুমরী।

—বলো কি রাজা!

—হাঁ কুমরী।

ওকে তৎক্ষণাৎ দু' হাতে ধরে ঝাঁকুনি দিতে দিতে কুমরী পাগলের মত বলে ওঠে —না না রাজা, তা কিছুতেই হবে না—এত-গুলো মানুষের যেখানে জীবন-মরণ সমস্যা ...না না, এ অন্যায়—ভীষণ অন্যায়—এ কাজ তুমি কিছুতেই করতে পারো না—সর্বনাশ হয়ে যাবে—রাজা—বল রাজা—

রাজা তখন স্থির দৃষ্টিতে ঘরে তাকিয়ে আছে। সে বঞ্চিত। সে অভুক্ত। সে নির্যাতিত। তাকে এবার একটা কিছু করতেই হবে। না করলে সে আর বাঁচবে না, শক্ত কঠিন গলায় সে উচ্চারণ করে—তবুও আমায় করতে হবে। রাজা আর যাই হোক—বেইমান নয়।

আমি জানতে চাইলাম — শেষ পর্যন্ত রাজা কি আগুন লাগালো?

—নাঃ। পারল না। সোজা মালিকের কাছে গিয়ে বলে এলো—এ-কাজ সে কিছুতেই পারবে না। পাপ সম্ভব নয়। মালিক হেসে খেল সেকথা শুনে। সে প্ল্যান করেছিল—আগুন লাগিয়ে রাজা যখন পালাবে তখন পেছন থেকে তাকে গুলী করে মেরে ফেলা হবে। তারপর পুলিশের কাছে প্রমাণ করা হবে যে রাজা শ্রমিকদের পক্ষ নিয়ে কারখানা ধ্বংস করে দেবার জন্যেই আগুন লাগিয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাজা যখন বেঁকে বসল তখন আর তাকে বাঁচিয়ে রাখার কোন কারণ থাকতে পারে না। এদের ষড়-যন্ত্রের কথা একমাত্র রাজা-ই জানে।

তাই রাজাকে খুন করে ফেলা হল।

রাজা মরল. কিন্তু বাঁচিয়ে দিয়ে গেল বহু মানুষকে। এটাই রাজা চেয়েছিল। সে সত্যিই এমন একটা কিছু করতে চেয়েছিল যাতে মরে গিয়েও সে চিরদিনের জন্যে বেঁচে থাকে। তার মৃত্যু কেন গৌরব ভূষিত হয়।

স্টুডিওর তখন ক্রমাগত আলো জ্বলছে আর নিভছে। প্রধান সহকারী পরিচালক কনক চক্রবর্তী একজন অভিজ্ঞ চিত্র-কুশলী। তিনি চিত্রনাট্যের খাতা খুলে নায়ক দেবরাজ রায়ের সঙ্গে কি-যেন আলো-চনা করছিলেন। এবার নায়ক ও নায়িকার ক্লোজ কম্পোজিটে একটা শট নেওয়া হবে। ক্যামেরাম্যান সুবোধ বানার্জি তাই বেশ সতর্কতার সঙ্গে সেটে আলো তৈরী করছেন। ছবির সম্পাদক নিকুঞ্জ ভট্টাচার্য ও স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন। চারিদিকে বেশ একটা কর্মব্যস্ততা। এটা দেখতে বেশ ভাল লাগে। কোন্ ছবি যে দর্শকের ভাল লাগবে —কেউ তা জানে না। তবে সবাই এই বিশ্বাসে ছবি করে যে তার ছবিটি জনপ্রিয় হবে। আর সেই বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ হয়ে কলাকুশলীরা স্টুডিওতে যখনই কাজ করেন তাঁদের সেই কাজে সততাকারের আন্ত-রিকতা চোখে পড়ে।

ক্যামেরাম্যান হঠাৎ বলে উঠলেন—অল লাইটস—

পরিচালক তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর শিল্পীদের সেটে আহ্বান করলেন—স্টার্টিং।

আমি বেরিয়ে পড়লাম। বাইরে তখনও বৃষ্টি পড়ছে। তবে অল্প-স্বল্প।

সন্ধ্যার সূর্য ছবির বিভিন্ন চরিত্র রূপায়ণ করছেন রাজশ্রী বসু, দেবরাজ রায়, বিকাশ রায়, উৎপল দত্ত, বাসন্তী বানার্জি, চিন্ময় রায়, দিলীপ রায়, শোভা সেন, পদ্মা দেবী, গোবিন্দ চক্রবর্তী, মৃণাল কুমার ও মাঃ রাজা। এ-ছবির সঙ্গীত-পরিচালনা করেছেন পি এন সাহা। চিত্রনাট্য পরিচালক অমিতাভ মিত্র নিজেই লিখেছেন।

স্বাতী চিত্রের সঙ্গীত গ্রহণকালে শ্রীকুমার চ্যাটার্জি, সরোজ দে, মমতাশংকর, তনুশ্রী-শংকর, আনন্দশংকর, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, অরুন্ধতী বোস।

CENTRAL LIBRARY

ব 'গণেশ'কে
. কোন মেয়ে
হারিয়েছে।
ষ্টি করলেন,
সন্তোষী মা'
জো করলে,
রেন।
বিবাহ হোল
ভাইরা তার
স্তু বড় ভাই
কে খুব ভাল
ও গুণ দেখে
বরুদ্ধে উত্তে-
কার, যতদিন
এই প্রতিজ্ঞা
র্ষি নারদের
ক্ষের দাবীতে,
কিন্তু তাকে

ভ গিয়ে ব্যর্থ
দোকানে কাজ
চ্ছা হয় এবং

সত্যবতীকে ভুলে যায়। তখন মা সন্তোষী স্বপ্নে দেখা দি
ওকে সত্যবতীর কাছে ফিরে যেতে বলেন, প্রচুর ধন সম্ভার নি
ফিরে আসে বিরজু এবং ধর্মধ্বজের সঙ্গে সত্যবতীকে নিয়ে
সন্তোষীর মন্দিরে পূজা-অর্চনার ব্যবস্থা করে। বিরজুর
বৌদি 'মার প্রসাদে বিষ মিশিয়ে দেয়, ফলে অনেক ভক্তই অস
হয়ে পড়লেও, মা সন্তোষীর দয়ায় বেঁচে ওঠে সকলে। বি
বৌদিরা ও ভাইয়েরা দেবীর কাছে কৃতকর্মের জন্যে ক্ষমা চা
ইতিপূর্বে মা সন্তোষীর প্রতিকথা নিয়ে বেশ কতে একা
ধর্মমূলক ছবি তৈরী হয়েছে। কিন্তু ছবি দেখতে দেখতে দর্শকের
মন ভরে ওঠে নি। পরিচালক বিজয় শর্মার কৃতিত্ব উ
সত্যবতীর 'মা সন্তোষীর' পূজার উপাখ্যানকে এমনভাবে প
উপস্থিত করেছেন, যে দর্শকরা ভক্তিসহকারে ছবি প্রত্যক্ষ কর
বাধ্য। এছাড়া অন্যতম সম্পদ অভিনয় ও সঙ্গীত। অভিনয়ে—
সন্তোষীর' ভূমিকায় অনিতা গুহ, সত্যবতীর ভূমিকায় ক
কৌশলে এবং বিরজুর ভূমিকায় আশীষকুমার অসামান্য অ
করেছেন। অন্যান্য ভূমিকায় রজনীবালা, ভারতভূষণ, বেলা বে
অশা পোদ্দার, লীলা মিশ্র, বি এম ব্যাস, মনোহর দেশাই প্র
সুন্দরভাবে অভিনয় করেছেন। সঙ্গীত পরিচালনায় সি অর্জু
তাঁর সুনাম অক্ষুণ্ন রেখেছেন।

চিত্রদ

CENTRAL LIBRARY

কিছুক্ষণ

ক্লায় সবাই বলতো পাকা ছেলে। স্বভাবিক। করুণ হাস এই ছেলে যদি বাজারের হিট ছবি স্তব্য করে 'দূরে এসব ছবি নাকি'? যে ছবি দেখে উচ্ছ্বাসিত। হিট সুপার-ছবি সেসব। আবার শিশির ভাদুড়ীর ছবি দেখে বাড়ী ফিরে চার দেয়া-ালে তারা পুরু করত রিহার্সাল। মনমত চরিত্রগুলোকে রূপ দিত। সব কিছুকে ছুয়ে ছুঁকে নস্যাৎ করতে চাইত।

বলর সময়ের সাহিত্য পত্রিকা বের নেশায়ও তখনকে বেশ ঝোপ । অলোক ঘোষাল (এখন ইন কোন প্রোডাকসনের স্টোরি ডিপার্ট-াজ করেন শুনেছি) তার প্রধান সাথী

ই কিশোর, আজ তার যৌবন পেরোই করছে। পর্দায় তাঁকে দেখলে এখন ম্বরলিতা হাসি চাপতে পারে না। ছে যে চরিত্রই হোক না, সাদা পর্দায় না ফুটে উঠলেই হাসি কাব সাধা। দুটি চোখ পিটপিটনি খল কিল হাসি দেখলে বোঝাও মুস্কি ভদ্রলোকের নাম রবি ঘোষ

আজকের বাংলা ছবির নাম্বার কমেডিয়ান।

এই মুহূর্তে তিনি আমার শুয়ে আছেন, বন্ধ দরজায় নক করার সদ্য ঘুম ভাঙ্গা চোখ নিয়ে তিনিই খুলে দিয়েছিলেন। 'এসেছো তাহলে? একটু জিজ্ঞাসা আর বিস্ময়ের সুর লেন গলায়।

আগের দিন বলেছিলেন 'আ থাকবে— বম্বে থেকে কখন আগে এ কিন্তু ঘরে ঢুকে দেখি কেউ নেই। ঘরে লোহার খাটিয়ায় রবিবাবু নিজেই আছেন। ঘুমের ঘোরটা কাটিয়ে নেবার বললেন 'একটু বসো'।

এই ফাঁকে ঘরটার চারদিকে. নিয়েছি। খাটের এক প্রান্তে অনন্তা দেবীর ছবিখানা বেশ সুন্দর একটা ফ্রেমে বাঁধানো। সামনের ছোট শুধু মাত্র বই-ই নেই কিছু খেলনা ব কাপ, কিছু প্রাইজও সাজানো। ঠি ওপর জয়া ভাদুড়ির সঙ্গে মালিকের একখানা ছবি। আর তার হাতে আঁকা রবিবাবুর বাঘের ছ দেয়ালে বাকি জায়গা ছড়িয়ে ছিটিয়ে নিজের কয়েকখানা

যে ছবগুলোয় আছি ?— তার কোনটাতে কি ভাববার আছে ?' আমি কিছু বলতে যাচ্ছিলাম উনি আমাকে হাতের ইশারায় থামিয়ে দিয়ে বললেন 'ভেবে চিন্তে নেবার মত রোল এখানে পাই-টাই না বলতে পারো। দু-পাঁচ বছরে দু-একজনের ছবিতে যদিও বা কাজ পাই— সেখানে আমার ভাববার আগেই তিনি অনেক কিছু ভেবে রাখেন চরিত্রটা নিয়ে। সুতরাং চরিত্র নেবার ব্যাপারে লম্বা-চওড়া কথা বলে লাভ কি।'

এখানেও থামলেন না তিনি। বলিষ্ঠ কিং সাইজের একখানা সিগারেট ধরিয়ে বলে উঠলেন— 'আমার কিছু টাকা আছে আমি জানি। প্রোডিউসাররা যখন আমায় বলেন, তাঁরা আমার সেই জনপ্রিয়তাকে একসপ্লয়েট করতে চান স্টেজ আমার অজানা নয়, সুতরাং সেই মত কাজও করি।'

তবে নায়ক-নায়িকাদের প্রসঙ্গ উঠতে তিনি বললেন যে ওদের তবুও কিছুটা সেফ আছে চরিত্র নিয়ে ভাববার। উত্তমকুমার এখনও যে কারণে জনপ্রিয়তার টপে। এই পপুলারিটি দীর্ঘ পনের বছর ধরে কন্টিনিউ করা কি চাট্টিখানি কথা। ঐ পপুলারিটির ধারেকাছে যাবার কেউ নেই।

রবি ঘোষ প্রকৃতপক্ষে স্টেজের লোক। অভিনয়ের হাতেখড়ি যদিও হয়েছিল চল্লিশের মধ্যে কিন্তু শচীন সেনগুপ্তর সংস্পর্শে প্রথম যোগাযোগ হোল মিনার্ভায় লিটল থিয়েটার গ্রুপের হাত ধরে। তখন উৎপল দত্ত দোর্দণ্ড প্রতাপে মিনার্ভায় নাটক করছেন দল নিয়ে। রবিবাবুর অভিনয়ের বিকাশ ঘটেছে এই মঞ্চে। ফিল্মে আসবেন এমন কোনো বাসনা ছিল না কোনোদিনই। তপন সিংহের 'হাসুলী বাঁকের উপকথা' আর সত্যজিৎ রায়ের 'অভিযান' দিয়ে শুরু হয়েছিল ফিল্ম রাজ্যে তাঁর অভিযান। থিয়েটার তখন ছেড়ে দিয়েছিলেন। ভলেন্টিয়ানদের মধ্যে বেশ নতুনত্বের স্বাদ নিয়ে দর্শকের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠতে তাঁর সময় লাগেনি। বাংলা ছবির জগৎ নতুন এই অভিনেতাকে পেয়ে পুরোনো অনেককে ভুলে গেলেন। রবি ঘোষের ফিল্ম জয়ের অভিযান আজ সফল। এক সময় ভানু-ভূষর রায়ের যে জনপ্রিয়তা ছিল এখন তিনি সেই জায়গাটিতে চলে এসেছেন বলা যায়। এবং দর্শকরাও তাঁর প্রতিটি নতুন ছবিতে পায় নতুনত্বের স্বাদ।

কিন্তু ফিল্মে অভিনয় করে আজ অভিনেতাদের কি মন ভরে ? কোথায় যেন একটা অপূর্ণতা থেকে যায়— নিজের মধ্যে। অভিনয় করে প্রাণের সাড়া পাওয়া যায় না যেন। তাই তো তাঁকে বারবার ফিরে আসতে হয় মঞ্চের কাছে। পৃথিবীর প্রায় সব খ্যাতিমান শিল্পীদের জীবনে এমনটি ঘটেছে, ঘটছে। পল মুনি, ক্যাথরিন হেপবার্ণ, চার্লস লটন থেকে শুরু করে আজকের রিচার্ড বার্টন, ম্যাকস ভন সিডোও অব্দি প্রত্যেকে সুযোগ পেলেই থিয়েটারে কাজ করে যান। স্টেজে অভিনেতার যেমন স্কোপ কিন্তু তা কোথায় ?

CENTRAL LIBRARY

প্রসাদ শারদ সংখ্যা ১৩৮২

৮টি উপন্যাস লিখছেন
প্রেমেন্দ্র মিত্র ॥ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ॥ নিমাই ভট্টাচার্য ॥ প্রফুল্ল রায় ॥ নীহাররঞ্জন গুপ্ত ॥ মহাশ্বেতা দেবী ॥ চিত্তরঞ্জন মাইতি এবং এমর

৩টি বড়গল্প লিখছেন
শংকর ॥ বিমল কর ॥ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

৮টি গল্প লিখছেন
সমরেশ বসু ॥ বনফুল ॥ ভারাশঙ্কর ॥ অন্নদাশংকর রায় ॥ আশাপূর্ণা দেবী ॥ সত্যেন্দ্রকুমার মিত্র শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় এবং বিমল মিত্র

৩টি বিশেষ রচনা লিখছেন
প্রমথ নাথ বিশী ॥ শচীন ভৌমিক ॥ অশোক ঘোষাল ফোরেনসিক ॥ দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ॥

৩টি রম্যরচনা লিখছেন
শিবরাম চক্রবর্তী ॥ বিরূপাক্ষ ॥ বহুরূপী ॥
বাংলা ও বোম্বের চিত্রপরিচালকরা লিখছেন
আমার জীবনের দুর্বলতম মুহূর্ত

সরকার চোখে সরকার
ক্রীড়াবিদের চোখে ক্রীড়াবিদ
রাজনীতিবিদের চোখে রাজনীতিবিদ
কণ্ঠশিল্পীর চোখে কণ্ঠশিল্পী
পরিচালকের চোখে পরিচালক
—এ ছাড়া

বাংলা বোম্বের অজস্র রঙীন ছবি / ছবির ফিচার
সচিত্র কাহিনী / কার্টুন
বেরুচ্ছে সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকে
দাম : দশ টাকা

'শিল্পীর কাছে স্টেজটা স্বর্গ মনে হয়। অন্তত আমার কাছে তো সেই রকমই মনে হয়।' বলে রবিবাবু উঠে দাঁড়ালেন। কোলের ওপর টানলেন বালিশটা। —স্টেজটাই কি এতদিন বাদে আবার স্টেজে ফেরেন করলেন? প্রশ্নটা শোনবার জন্য যেন তিনি তৈরীই ছিলেন। মুহূর্ত দেরি না করে বলে উঠলেন— 'নিশ্চয়ই। তাহলে আর কেন স্টেজে যাব? ফিল্মের স্টারও টাইপ বন্ধ মার্কা সব কাজ করে করে কেমন যেন ভোঁতা হয়ে যায়ছিল চেহারাটা। স্টেজে কাজ করে যে আনন্দ পাচ্ছি তাতে মনেপ্রাণে ভাবে এগোচ্ছিও অনেক। এ ব্যাপারটা অন্যকে বলে বোঝাবার নয়; শিল্পীরা বুঝতে পারবেন।'

আজকালকার অভিনেতাদের কথা উঠতে তিনি বললেন— 'এখনকার ছেলেদের কথা বাদ দাও, দুটো ছবিতে কাজ করে ভাবলে কি নাকি হয়ে গেছে। হিরোর মেজাজ নিয়ে বসে থাকে। এরা জানে না অভিনয়টা আসলে অভ্যাসের ব্যাপার। ডেকোরেটো ফিটফাট রাখার জন্য ব্যায়াম করে, মাসেজ করায়, বাস! আসল কাজটাই অনেকে করে না। ভয়েস, মুভমেন্টস, গ্যাস্টিকুলেশন কতজন করে বলো? মেয়ে ভোলানো চেহারা থাকলেই তো আর আর্টিস্ট হওয়া যায় না।'

যেমনি বললাম— 'আপনি কবেন এই সব?' বললেন— 'এতদিন ধরে কাজ করতে করতে ওগুলো প্রায় অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে। চুপচাপ বসে থাকলেও ভেতরে ভেতরে কাজগুলো হয়ে যায়। এখন একটা লোককে আধঘন্টা দেখলেই তাকে অবিকল রূপ করতে পারব।'

এই আত্মবিশ্বাস রবিবাবুর নিশ্চয়ই একদিনে আসেনি। বহুদিনের সাধনার ফল এই আত্মবিশ্বাস। আর তাই আজ তিনি শিল্পী।

ব্যক্তিগত জীবনে রবি ঘোষের মত মিশুকে মানুষ কজন আছে হাতে গুনে বলা যায়। স্বভাবিক-সাদামাটা জীবনযাত্রায় তিনি বিশ্বাসী। বিলাস তাঁর ঘৃণার পাত্র। তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দেবার ব্যাপারে তাঁকে একটু বেশী দুর্বলই বলা যায়। সন্ধ্যায় তাঁর এই বসবার ঘরটা হয় তাদের আসর। প্রথম যেদিন ঐ আসরে গিয়েছিলাম, রবিবাবু আমায় বলেছিলেন 'এই বিখ্যাত 'মাতাল' ক্লাবের নাম শোনেন নি, সেকি?— এখানে থিয়েটারের দিনগুলো বাদ দিয়ে রোজই আসর পাবেন।'

শুধু ওঁকে নয়, ফিল্ম লাইনের কি আসে না এই ক্লাবে! আর্টিস্ট টেকনিসিয়ান আর আমার মত রবাহূতে পরিচিতের ভিড় লেগে থাকে সেখানে।

শুনেলাম— 'মাতাল' ক্লাব এখন ওঠবার দাঁখল। রবিবাবু আবার নতুন করে 'চলাচল' চালু করতে চলেছেন। নতুন নাটক 'রাম শ্যাম যদুর রিহার্সালও চলছে পুরোদমে। বললাম 'ফিল্ম— প্রফেসনাল স্টেজ (থিয়েটার) আবার এই চলাচল' চালাবেন কি করে এক সঙ্গে?'

হাসতে হাসতে বললেন— 'যতদিন বাঁচো, কাজ করে যাও এই আমার মতো এখন।'

যাঁর কাছে অভিনয়ই জীবন, যাঁর মনে হয় পল মুনি, চার্লস লটন, শিশির ভাদুড়ি, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, অহীন্দ্র চৌধুরীকে অভিনয়ের আদর্শ, যিনি বিশ্বাস করেন টু প্লেস এন্ড ডেভলাপ আজ জান আকটর, ইউ মাস্ট প্র্যাকটিস প্র্যাকটিস এন্ড প্র্যাকটিস' তাঁর কাছে এই খটুনিতে কষ্ট হবার কথা নয়। হাসিমুখে স্টেজ আর অভিনয় নিয়ে তিনি এখন মেতে আছেন। বিশেষ করে স্টেজের অভিনয় যেখানে রবি ঘোষ নিজে নতুনরূপে উপস্থিত। অভিনয় নিয়ে খেলা সবে সেখানে, অভিনয় খেলা। যে খেলায় রবি ঘোষ নিজেই পরিচালক নিজেই অভিনেতা।

নির্মল

CENTRAL LIBRARY

নাটমঞ্চ

টাকার রং কালো

শিশিরকুমার ইনস্টিটিউটের অ্যাম্বুলেন্স, নার্সিং ও ক্যাডেট ডিভিসনের সভ্যরা গত ৪ আগস্ট 'রঙ্গনা' মঞ্চে সুনীল চক্রবর্তী রচিত টাকার রং কালো নাটিকাটি অভিনয় করেন। গত বছরে 'ফাঁস' নাটিকাটি প্রযোজিত হয়েছিল। শিল্পীরা হালকা সামাজিক নাটকাভিনয়ে যথেষ্ট পটু এবং সুন্দর অভিনয় উপভোগ্য।

দিগম্বর চরিত্রের রূপদান করেন মুকুলকান্তি ঘোষ। নাট্যকার যেভাবে বিভিন্ন চরিত্র সাজিয়েছেন, তাদের মধ্যে দিগম্বর চরিত্রে সাফল্য অর্জন করা কঠিন, কিন্তু শিল্পী দক্ষতার সঙ্গে তার পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। এই শিল্পীর অভিনয়ে যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর অভিনয়ের ছাপ দেখতে পাওয়া যায়। সহজ সরলভাবে কথাগুলি বলে সুনাম অর্জন করা শক্ত। কিন্তু শিল্পী সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন।

এর পরেই উল্লেখযোগ্য পশুপতি চরিত্রে সুশীল মুখোপাধ্যায় ও নাদু চরিত্রে অসীমরতন গাঙ্গুলীর অভিনয়। দুজনে বেশ ভালভাবে নিজে নিজ বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে দর্শকের মনে রেখাপাত করেছেন যাতে তাঁদের শিল্পীমনের পরিচয় পাওয়া যায়। এঁদের সঙ্গে বনমালী চরিত্রে বরুণ দত্তের অভিনয় প্রশংসনীয়। তার অভিনয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ নেই কিন্তু তার অভিনয় আকর্ষণীয়। এর পরেই গৌতম সরকারের ট্যাপা চরিত্র সুঅভিনীত। জগা চরিত্রে অলোক মিত্রের অভিনয় আরও উন্নত হওয়া উচিত ছিল। অন্যান্য পুরুষ চরিত্রে যাঁরা অভিনয় করেছেন, তাঁরা সাধ্যমত চেষ্টা করেছেন 'টীম ওয়ার্ক' বজায় রাখতে।

স্ত্রী চরিত্রের মধ্যে করালিনীর ভূমিকায় তপতী সরকারের অভিনয় অনবদ্য। অন্যান্য দুটি স্ত্রী চরিত্রাভিনয় চলনসই।

পার্শ্বচরিত্রগুলির মধ্যে বিপদের ভূমিকায় চিত্তানন্দ রায়চৌধুরীর অভিনয় রসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়।

আবহ সঙ্গীত ভাল। পরিচালনার সুধীর মুস্তাফির মুন্সিয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়। সব মিলিয়ে নাটিকাভিনয় দর্শকবৃন্দকে তিনঘন্টা প্রেক্ষাগৃহে ধরে রাখবার যোগ্যতা অর্জন করেছে।

টাকার রং কালো নাটক চিত্তানন্দ রায়চৌধুরী, মুকুল ঘোষ এবং গীতা চট্টোপাধ্যায়

চেতনা'র সাম্প্রতিক নাটক 'স্পার্টাকাস'

'স্পার্টাকাস' এর সমকাল এবং পটভূমি খৃষ্টপূর্ব রোম। যখন রোমান সাম্রাজ্যে চলত নির্বিচার শোষণ ও অবাধ লুণ্ঠন। সাধারণ মানুষ তখন শুধু দাস নয়, ক্রীতদাসেরও অধম হয়ে এবং অনিশ্চিত জীবন যাপন করত। প্রভুরা এদের গোলাম করে রাখত। সমস্ত জীবন নিংড়ে নিঃশেষ করে এক সময় যখন তাদের প্রয়োজন ফুরিয়ে যেত তাদের নৃশংসভাবে হত্যা করা হোত।

অন্যদিকে অর্থবান মানুষেরা দিন কাটাত বিলাসে, ব্যসনে, খেয়ালখুসী মত—দরিদ্র মানুষদের শোষণ করে যত না আনন্দ পেত, তার চেয়ে বেশী রোমাঞ্চিত হোত তাদের সম্মুখ সমরে নামিয়ে দিয়ে রক্তাক্ত হত্যাকান্ড অবলোকন করে। অর্থাৎ সেই সময়কার রোমান সাম্রাজ্যে শোষিত মানুষের জীবন ছিল মূল্যহীন।

এই ক্রীতদাসদের একজন স্পার্টাকাস। শান্ত, কষ্টসহিষ্ণু এক নীরব শোষিত ও অত্যাচারিত দাস। কিন্তু মানুষকে পশুর জীবনযাপন করতে দেখে তার ভাল লাগত না। তাই ভেতরে ভেতরে সে প্রচন্ড এক জ্বালা অনুভব করত। তার মনে তখন একটাই প্রশ্ন ঝড় তুলত—পৃথিবীতে যখন মানুষের সৃষ্টি হোল, কৈ তখন তো গোলাম বলে কিছু ছিল না? তবে কেন অর্থবান মানুষদের কাছে দরিদ্র মানুষ গোলাম হয়ে থাকবে?

ক্রমে সেই প্রশ্নই তার মনে মানুষের প্রতি মমত্বের সঞ্চার করল। সে নিষ্পেষিত মানুষের মনে স্বাধীন হয়ে বেঁচে থাকার মত শক্তি সঞ্চয় করার জন্য তাদের ঐক্যবদ্ধ করে তুলল। কালক্রমে সেই ঐক্যবদ্ধ মানুষগুলিই একদিন বিদ্রোহ করল। সেই আগুন ক্রমে ছড়িয়ে পড়ল সমগ্র দেশে। তারা অস্ত্র সংগ্রহ করে নেমে এলো সংগ্রামে। যাকে বলা যায় স্বাধীনতার সংগ্রাম। মনুষ্যত্বের স্বীকৃতির লড়াই।

কিন্তু সেই বিদ্রোহ এবং শোষকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম জয়যুক্ত হয়নি। শোষকের কূট বুদ্ধি ও অত্যাচারের কাছে সে নিষ্ঠুর ভাবে পরাজয় স্বীকার করেছিল এবং তাতে শেষ বিদ্রোহীটিকে পর্যন্ত রোমান প্রভুরা নির্মমভাবে হত্যা করে বিদ্রোহ দমন করেছিল। কিন্তু শেষ বিদ্রোহী গোলামের কণ্ঠস্বর আজও নিপীড়িত মানুষের মন সাড়া তোলে। স্পার্টাকাস যেন শোষিত মানুষের বিপ্লবের বহ্নিশিখা বা প্রতীক।

স্পার্টাকাস নাটকের (হাওয়ার্ড ফাস্টের উপন্যাস অনুসরণে নাটক ও নির্দেশনা অরুণ মুখোপাধ্যায়) মোটামুটি গল্প এবং বক্তব্য এই। 'চেতনা' নাট্যগোষ্ঠীও তাকে নিষ্ঠার সঙ্গে ও সার্থকভাবে মঞ্চে উপস্থাপিত করবার চেষ্টা করেছেন।

যাত্রিকের

এ মাসের অভিনয় :

রবীন্দ্র ভট্টাচার্যের

সোমক ও কালীচরণ

এক যে ছিল রাজা

কেষ্টধনের কেরামতি

'স্পার্টাকাস' এর উপস্থাপনা সুন্দর, কোন কোন ক্ষেত্রে অভিনবত্বও রয়েছে সন্দেহ নেই। দর্শককে একাগ্র করে তোলার সঙ্গে সঙ্গে তার মন বিষণ্ণও হয়ে ওঠে। তবে সবিনয়েই বলা যায়, বোধহয় সেই অনুপাতে কিছুটা অস্বস্তি এবং ক্লান্তিকরও ঘটে।

তার একটা প্রধান কারণ মনে হয়েছে, নাটকে অতিরিক্ত নিষ্ঠুরতার সংযোজন। নাটক হিসেবে সেটা সার্থক বলে বিবেচিত হলেও, দর্শক বোধহয় এক সময় তাতে ক্লান্তি বোধই করেছে। যদিও নাটকের মূল উদ্দেশ্যই হোল দর্শককে স্বাধীনতা-স্পৃহায় উদ্দীপিত করে তোলা। কিন্তু তা হলেও মধ্যভাগের পর থেকেই যেন কিছুটা পুনরাবৃত্তির ভারাক্রান্ত মনে হয়েছে নাটককে। দর্শকরা তখন মাঝে মাঝেই 'বিরক্ত' চাইছিল। সেটা অবশ্য কাটিয়ে উঠেছিল প্রায় শেষের দিকে গিয়ে। নাটকের প্রথম দৃশ্যের উপস্থাপনাটি কিন্তু বড় সুন্দর। যে-দৃশ্যটির ওপরে সমগ্র নাটকটি মোড়া। এর জন্য নাটকার নির্দেশককে ধন্যবাদ। নাটকীয় মর্যাদা এবং গাম্ভীর্যে নাটকটি সেই দৃশ্য থেকেই দর্শককে বিহ্বল করে রেখেছিল দীর্ঘ সময়।

অভিনয় প্রথমেই যিনি দর্শককে প্রায় নির্বাক বিস্ময়ে রেখেছিলেন, তিনি এই নাটকের নাম-ভূমিকার অভিনেতা শিবশঙ্কর ঘোষ। তাঁর অভিনয় যেমন মর্যাদাসম্পন্ন, দৃঢ়চেতা, তেমনি সহৃদয়। প্রায় একাই তিনি নাটকটিকে পরিণতির দিকে টেনে নিয়ে গেছেন।

কল্যাণ চক্রবর্তীর 'মোজার'ও দর্শকদের ভাল লেগেছে।

তেমনি মর্যাদার সঙ্গে অভিনয় করেছেন তাপস চট্টোপাধ্যায়, বিপ্লবকেতন চক্রবর্তী, মিহির বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌতম চক্রবর্তী, গৌরাঙ্গজীবন ঘোষ, দিলীপ ভট্টাচার্য, অরুণ মুখোপাধ্যায়, ধীরেন চট্টোপাধ্যায়, দিলীপ সরকার, শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায় ও দুই ঠিকাদারের ভূমিকায় অলোক দত্ত ও সমীর মুখোপাধ্যায়।

এছাড়া সুবিমল রায়, প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়, স্নেহময় মুখোপাধ্যায়, শ্যামল দাশগুপ্ত, অপূর্ব সেনগুপ্ত, দিলীপ চক্রবর্তী

মনোরঞ্জন সরকার, পল্লবকেতন চক্রবর্তী, কানাই দত্ত, জয় দাস ও দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় চরিত্রোচিত অভিনয় করেছেন।

মঞ্জু ব্রহ্মচারীর নাতাসিয়া এবং কাজল চৌধুরীর ভেরিনিয়া যেন চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন।

হিমাংশু বিশ্বাসের আবহসংগীত ও দীপক মুখোপাধ্যায়ের আলো নাটকটির পরিবেশ সৃষ্টির সহায়ক হয়েছে। মঞ্চ পরিকল্পনা ও নির্মাণ (রঞ্জলাল শর্মা) এবং মঞ্চসজ্জা সুন্দর। রবি ঘোষের রূপসজ্জা এবং হরিপদ দেবনাথের পোশাক তৈরি তারিফ করবার মত। শ্রীপতি দাসের ধ্বনি প্রয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ মাঝে মাঝে চমক সৃষ্টি করেছে।

পরিশেষে একটি কথা। স্পার্টাকাস গর্জাস প্রোডাকশন সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই অনুপাতে কিছু কিছু অভিনেতার অভিনয়ে বোধহয় আরো কিছুটা অনুশীলনের অবকাশ রয়ে গেছে। এবং নাটকটিকে আরো একটু কমপ্যাক্ট করার জন্য সময় আরো কিছুটা কমিয়ে আনলে ভাল হোত।

নাট্য সমালোচক

সোফিয়া ভাদুড়ী

খবরাখবর

ডিজনীল্যান্ডের নতুন আকর্ষণ

তামাম পৃথিবীর শিশুর আলোকপ্রাপ্ত পরিবারের শিশু থেকে বৃদ্ধ সবার কাছে সমান আকর্ষণীয় এবং বিস্ময়কর আনন্দের এবং বলা যায় নতুন জগতের দুয়ার যিনি আলিবাবার রত্নভাণ্ডারের মত খুলে দিয়েছেন তিনি নিঃসন্দেহে ওয়াল্ট ডিজনী। অভিনয়ে যেমন চার্লি চ্যাপলিন, যাদুতে তেমনি ডিজনী।

পৃথিবীতে এই দুটি মানুষের আজও তুলনা নেই। ভবিষ্যতেও এঁরা সমান অপ্রতিদ্বন্দ্বী থাকবেন এঁদের অবিস্মরণীয় দানের জন্য।

ডিজনীর দুটি বিস্ময়কর জগৎ আছে। একটি ফ্লোরিডার ওরল্যান্ডোতে এবং অন্যটি কালিফোর্ণিয়ার অন্তর্গত লস এঞ্জেলসে। এই দুটি ডিজনীল্যান্ডে পৃথিবীর যাবতীয় বিস্ময় যেন ডানা মেলে ছড়িয়ে আছে।

সেই দুটি ডিজনীল্যান্ড আগামী বছর যে উৎসব পালন করবে তা নাকি বিস্ময়ের এক অভাবনীয় চমক হয়ে থাকবে। অবশ্য ১৫ মাসব্যাপী এই উৎসবের সূচনা এ বছরের গত জুন মাসেই শুরু হয়েছে। আমেরিকার দ্বিশততম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে (আগামী বছর) ১২ শতেরও বেশী অনুষ্ঠানের মধ্যে অন্যতম আকর্ষণ হবে একটি প্যারেড। এই প্যারেড ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন আমেরিকা

বর্ধমান
• বেনারসী
• জোড়
• সিল্ক-তাঁত
• মিল বস্ত্র
• গেঞ্জিক
• শার্টিং • সুটিং
• ড্রিপ কাপড়
৭৩, জি, টি, রোড (সাউথ) হাওড়া
ফোন: ৬৭-৫৩২৫

CENTRAL LIBRARY

বন্ধু বন্ধকির শেখর চ্যাটার্জি / রেহানা সুলতানা ফটো : অমৃত

শতবর্ষের স্মরণীয়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে পুরুষের বয়স জন্ম গ্রহণ করেন। বয়সে বিনোদিনীর ছোট ছিলেন তিনি। ধনী মাড়োয়ারীর একমা ছেলে। বড় হবার সাথে সাথে ঐশ্বর্যবা পিতা-মাতার প্রশ্রয় বিপথগামী হও স্বাভাবিক। পিতার জীবিতকালেই পুরুষ বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে থিয়েটারে যাতায়া সুরু করে এবং বিনোদিনীর সাথে যোগ স্থাপনে তৎপর হয়। আইন-সঙ্গতের ম ১৮ বছর বয়সে পুরুষোত্তম পিতৃ গদ্ দাস মুৎসুদ্দি মারা যান। এ-বিষয়ে ড চন্দ্রলাল গুপ্তের সাথে আমি একমত হ পারিনি, যাই হউক পিতার মৃত্যুর প মাতা রূপা দেবী পুরুষোত্তমের বিয়ে দেন স্ত্রী লক্ষ্মী দেবীর গর্ভে পুরুষোত্তমের স্ত্রী জন্ম সন্তান জন্মগ্রহণ করে। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে পুরুষোত্তমের মৃত্যু হয় এবং পুরুষোত্তমের মায়ের ইচ্ছায় তাঁর সম্পত্তি রক্ষণা বেক্ষণের জন্য পুরুষোত্তমের স্ত্রী লক্ষ্ম-পু গ্রহণ করেন।

১৮৮২ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে অল্প ১৮ বছর বয়সে প্রতাপ জহুরীর থিয়েটা

এই পৃথিবীর অন্য সব দেশগুলি থেকে লক্ষ লক্ষ দর্শক তখন উপস্থিত থাকবেন বলে ডিজনীল্যান্ডের কর্তৃপক্ষ আশা করছেন। ঐ পার্কের অনুষ্ঠানে ডিজনীর বিস্ময় মিকি মাউস, গুফি এবং ডোনাল্ড ডাক অন্যতম আকর্ষণ হবে বলে প্রকাশ। প্রায় দেড় কোটি নতুন চরিত্র, আট ফুট লম্বা পতুলের মত দিপল অফ আমেরিকা, দশটি ঘূর্ণায়মান ইউনিটে অংশ গ্রহণ করবে। এছাড়া এতে আমেরিকা আবিষ্কার, প্রথম পতাকার নিদর্শন, পশ্চিমদেশ আবিষ্কারের মত ঐতিহাসিক বিষয়সমূহও স্থান পাবে। সিনেমা ইত্যাদি অন্যান্য আমোদপ্রমোদের অনুষ্ঠান তো আছেই।

ডিজনী সম্পর্কে আর একটি চাঞ্চল্যকর খবর হোল, ডিজনী স্টাইলে মহাকাশ অভিযান।

এছাড়া মহাকাশ সম্পর্কিত যাদুঘর অভিজ্ঞতা লাভের জন্য আমেরিকান ছাড়া বিদেশের মহাকাশচারীগণও ডিজনীল্যান্ড দেখতে যাবেন। কারণ মহাকাশ সম্পর্কিত বিষয়গুলির কোথায় কি পাওয়া যেতে পারে, কি ধরণের পাহাড় ইত্যাদির অবস্থান আছে এবং অন্যান্য ব্যাপারগুলি কতদূর আছে ওয়াল্ড ডিজনী ইতিপূর্বেই সেগুলির কল্পনা থেকে বাস্তবে রূপ দিয়ে রেখেছিলেন সেখানে। যার সঙ্গে অভিজ্ঞ মহাকাশচারীদের প্রদত্ত বিবরণ প্রায়শই মিলে গেছে। নমুনা সেখানে ইতস্তত ছড়ানো রয়েছে। যাঁ তাদের বিস্ময় এবং অভিজ্ঞতাকে যথেষ্টভাবেই নাড়া দেবে বলে বিশ্বাস। আর এর সঙ্গে ডিজনী ল্যান্ডের অন্যান্য বিস্ময়, আকর্ষণ ও মনোহারী ব্যাপারগুলি তো আছেই।

ওয়ার্ণার ব্রাদার্সের দি টাওয়ারিং ইনফার্নো

ওয়ার্ণার ও টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী ফক্সের পক্ষে আরউইন এ্যালেনের প্রোডাকশন দি টাওয়ারিং ইনফার্নো ইতিমধ্যেই বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় চাঞ্চল্য এবং ব্যবসায়িক সাফল্যের এক রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। ওয়ার্ণার কর্তৃপক্ষের ইতিপূর্বের চাঞ্চল্যসৃষ্টিকারী ছবি দি একজরসিস্ট এর রেকর্ডও ছাপিয়ে যাবে।

দি টাওয়ারিং ইনফার্নো লন্ডনসহ অন্যান্য ১৭টি দেশের বিভিন্ন স্থানে রিলিজ হয়েছে এবং সেই সব জায়গায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে।

ছবিটি পরিচালনা করেছেন জন গ্লেইলারমেন। চিত্রনাট্য স্টার্লিং সিলিফ্যান্ট কর্তৃক এবং প্রযোজনায় রয়েছেন পল নিউম্যান স্টীভ মাকুইন উইলিয়ম হলডেন ফেই ডানাওয়ে ফ্রেড এ্যাসটেয়ারে ও জেনিফার জোন্স।

শা. ব. চ

গুরুমুখের সঙ্গে বিনোদিনীর পরোক্ষ সংযোগ গড়ে ওঠে বলে অনুমান করা যায়। পিতার মৃত্যুর পর পিতৃবন্ধু ও পরিবারের শুভানুধ্যায়ী সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার অভিভাবকের গুরুমুখ চলতে থাকেন। এবং এই সময়ই বিনোদিনীর সঙ্গে গুরুমুখের সরাসরি যোগ গড়ে ওঠে। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ৩রা ফেব্রুয়ারী প্রতাপ জহুরীর থিয়েটারে গিরিশচন্দ্রের পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস মঞ্চস্থ হয়। বিনোদিনী দ্রৌপদী চরিত্র অভিনয় করেন। এই সময়ই বিনোদিনীর সঙ্গে গুরুমুখ বাবুর সরাসরি যোগাযোগ, ব্যক্তিগত সংযোগ সাধনের সূত্রাবলী নিয়ে আলোচনা—প্রতাপ জহুরীর থিয়েটার পরিত্যাগ—স্টার থিয়েটার প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি ঘটনাগুলি পর পর অনুষ্ঠিত হয়। থিয়েটার প্রতিষ্ঠা এবং বিনোদিনীর জন্য গুরুমুখ দুই লক্ষ টাকার ওপর ব্যয় করেন। গুরুমুখের মাতা এবং সুরেন্দ্রনাথবাবু ও আত্মীয়স্বজন গুরুমুখের এবং পরিবারের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন এবং থিয়েটার বিক্রী করে দেবার সুপারিশ করেন। বিনোদিনীর সঙ্গে গুরুমুখের ব্যক্তিগত সম্পর্কের পরমায়ু এক বছরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

কুড়ি বছরও তখন পূর্ণ হয়নি। যুবক এবং রাজকন্যা পরিত্যাগ করে গুরুমুখ কিছুদিন বাদে কাশীবাসী হন এবং পরমার্থ লাভে দীক্ষা গ্রহণ করে শান্তভাবেই জীবন কাটাতে থাকেন। তাঁর এই শান্তির জীবন বেশী দিন স্থায়ী হলো না। মাত্র বাইশ বছর বয়সে গুরুমুখ মারা গেলেন। ব্যক্তিজীবন নিয়ে আলোচনা করলে তাঁর প্রতি সহানুভূতি জাগা স্বাভাবিক। অভিভাবক এবং আত্মীয়স্বজনদের নির্দেশে থিয়েটার বিক্রী করে দেবার সংকল্পের কথা সর্বপ্রথম গিরিশচন্দ্রকেই ব্যক্ত করলেন গুরুমুখ। গিরিশচন্দ্রের নিঃস্বার্থ পরামর্শের প্রতি তিনি আস্থাশীল ছিলেন। ছিলেন শ্রদ্ধাশীল।

বাইরের কারোর কাছে থিয়েটার বিক্রী না করে গিরিশচন্দ্র তাঁর শিষ্যদের কাছেই থিয়েটার বিক্রী করার পরামর্শ দিলেন। গিরিশ-শিষ্যরা হাতে স্বর্গ পেলেন। কিন্তু এবারও তাঁরা চরম কৃতঘ্নতা ও হীনমনস্কতার পরিচয় দিলেন। বিনোদিনীকে অংশীদার রাখতে রাজী হলেন না। অথচ গুরুমুখ জেদ ধরলেন, বিনোদিনীর জন্য সমান অংশ রাখতে হবে।

শিষ্যদের ঘৃণ্য স্বিতীয়বার গিরিশচন্দ্র বিনোদিনীর ওপর অবিচার করলেন তিনি বিনোদিনীর মাকে বোঝালেন : বিনোদের মা, ও-সব কথাটে তোমাদের কাজ নাই, তোমরা স্ত্রীলোক অত কথাট বহিতে পারিবে না। আমরা আদার ব্যাপারী, আমাদের জাহাজের খবরে কাজ নাই। তোমার মেয়েকে ফেলিয়া তো আমি কখন অন্যত্র কার্য করিব না; আর থিয়েটার করিতে হইলে বিনোদ যে একজন অতি প্রয়োজনীয়, কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না। আমরা কার্য করিব, বোঝা বহিবার প্রয়োজন নাই। গাধার পিঠে বোঝা দিয়া কার্য করিব।' যাহাতে গিরিশচন্দ্র বিনোদিনীর ওপর অবিচার করলেন, মঞ্চতঃ কিন্তু তিনি বিনোদিনীকে আরো কাছে টেনে নিলেন এবং শিষ্যদের দূরে করে দিলেন নিজের থেকে। সুপরিচিত সম্প্রদায় গিরিশচন্দ্র বিনোদিনীর ওপর যেভাবে অবিচার করলেন, শিষ্যদের স্বার্থান্ধ মনোভাব তাঁর পক্ষে উপলব্ধি করতে বিলম্ব হয়নি। শেষ পর্যন্ত এগার হাজার টাকায় বিক্রয়-কবলা প্রস্তুত হয়।

নতুন মালিকদের হাতে প্রথমেই লাঞ্ছিতা হলেন বিনোদিনী। শেষ পর্যন্ত তাঁকে স্টার থিয়েটার পরিত্যাগ করতে হয়। বিনোদিনী ত ছিলেন পতিতা নারী। স্বয়ং গিরিশচন্দ্র শেষ পর্যন্ত একাধিকবার লাঞ্ছিত হয়েছিলেন শিষ্যদের কাছে। নল স্বয়ম্বরা অসম্ভব জনপ্রিয়তার্জন করে। গড়ের মাঠে তখন চলছিল এক প্রদর্শনী। এই প্রদর্শনীতে অভিনয় করে নতুন মালিকেরা ঋণমুক্ত হন। নতুন স্বত্বাধিকারীদের স্টার থিয়েটারে মঞ্চস্থ হলো গিরিশচন্দ্রের নূতন নাটক 'কমলে কামিনী' ২০শে মার্চ, ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে। শ্রীমন্ত বনবিহারিণী আর খুল্লনা চরিত্রে অভিনয় করলেন বিনোদিনী। ২৬ এপ্রিল হীরার ফুল গীতিনাট্য আর মূল বসন্তকেতু নাটকে বিনোদিনী যথাক্রমে শশীকলা আর পদ্মাবতী চরিত্রে অভিনয় করেন। ৭ জুন ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে মঞ্চস্থ শ্রীবৎস চিন্তায় বিনোদিনী চিন্তা আর শ্রীবৎস চরিত্রে অমৃত মিত্রকে দেখা যায়।

২ আগস্ট, ১৮৮৬ এলো চৈতন্যলীলা। একদিন নদীয়া টলমল হয়ে উঠেছিল যে গৌরাঙ্গ-প্রেমে, সেই প্রেমের বন্যা নেমে এলো বাংলার নাট্যশালায়। চৈতন্যলীলা অভিনয়ের সময় মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ প্রায়ই রিহার্সালে এসে নানান উপদেশ দিতেন। গিরিশচন্দ্র মহাত্মা শিশিরকুমারকে খুবই শ্রদ্ধা করতেন। তাই এ-বিষয়ে নিজেও তাঁর পরামর্শ নিতেন সব বিষয়ে। বিনোদিনীকে নানান উপদেশ দিয়ে বলতেন : সব সময় চৈতন্য পাদপদ্ম চিন্তা করবে। তিনি অধমতারণ পতিতপাবন—কর পাময়। তিনিই শক্তি দেবেন। চৈতন্যলীলার পূর্বরাত্রি শ্রীমতী বিনোদিনী চৈতন্য-ধ্যানেই কাটান। ভোরে উঠে গঙ্গাস্নান করে ১০৮-বার দুর্গানাম লিখে প্রার্থনা জানান। বিনোদিনী এই সময় উপলব্ধি করেন—সেই দয়াল ঠাকুরের আশীর্বাদ তিনি লাভ করেছেন। চৈতন্যলীলায় অভিনয়াংশে ছিলেন বিনোদিনী—চৈতন্য, বনবিহারিণী—নিতাই। প্রবোধ ঘোষ—জগাই। অমৃত মিত্র—মাধাই। কিরণবালা—বিষ্ণুপ্রিয়া, ক্ষেত্রমণি—মালিনী। প্রমোদা—লক্ষ্মী নীলমাধব চক্রবর্তী—জগন্নাথ মিশ্র। অমৃত বসু—প্রতিবেশী। উপেন্দ্র মিত্র—অদ্বৈত। মহেন্দ্র চৌধুরী—শ্রীবাসদাস।

কালীশ মুখোপাধ্যায়

(ক্রমশঃ)

স্টার

নাটারূপ নিয়ন্ত্রিত

ফোন : ৫৫-১১৩৯

প্রতি বৃহস্পতি, ৬॥

শনি রবি ও ছুটির দিন : ৩ ও ৬॥

বঙ্কিমচন্দ্রের

কৃষ্ণকান্তের উইল

প্রধান উপদেষ্টা : মহেন্দ্র গুপ্ত

নাট্যরূপ : কুনাল মুখার্জী

নির্দেশনা : রবিজয় কাংকারিয়া

আবহ-সঙ্গীত : তিমিরবরণ

গান ও সুর : চন্ডীদাস বসু

ডাঃ মহেন্দ্র গুপ্ত কর্তৃক ৫৩ বিধান সরণি হইতে দিলীপ রায়চৌধুরী কর্তৃক স্টার হইতে রূপক মজুমদার কর্তৃক ৬ অমৃত মুখার্জী কর্তৃক প্রকাশিত ও মুদ্রিত চন্দ্রা হইতে

—বুকিং চলছে—

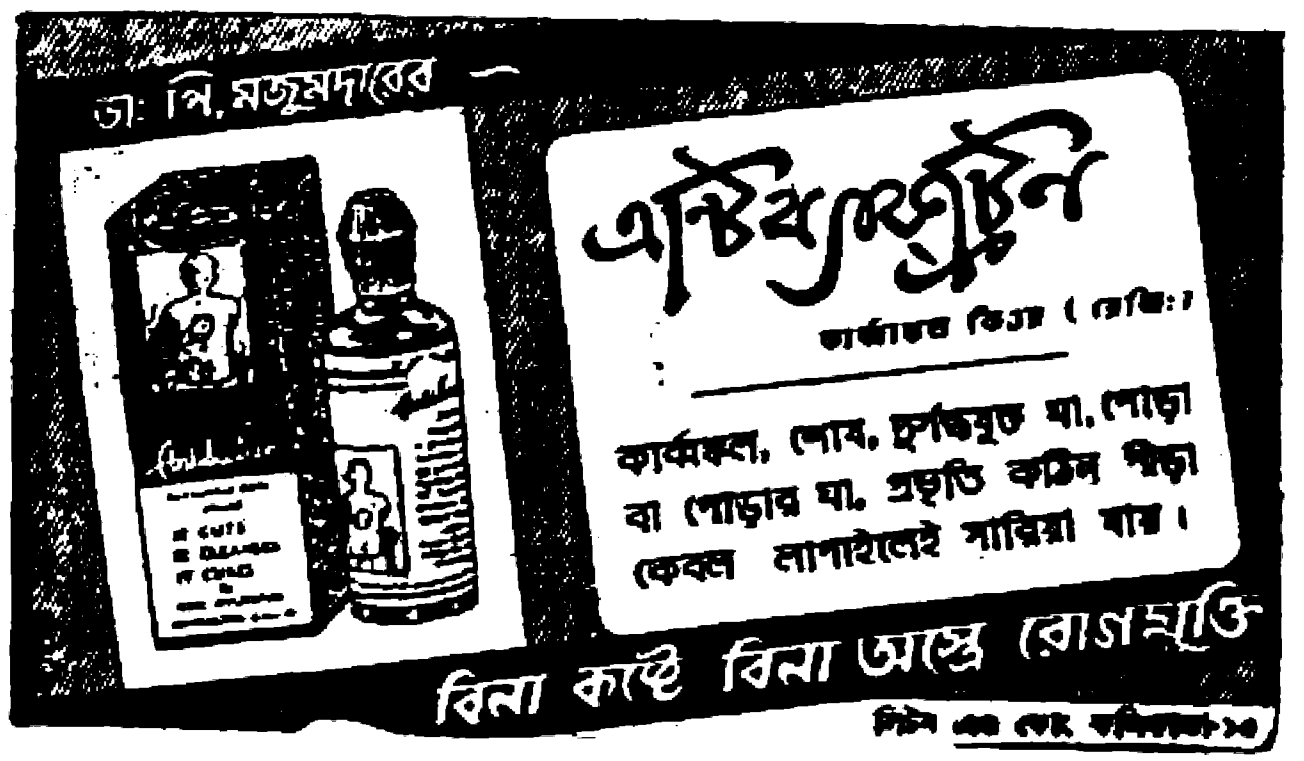

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩, হইতে মুদ্রিত ও সংকলক ১১/১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

CENTRAL LIBRARY

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষের

নতুন বই

চিত্র বিচিত্র

একাল-সেকালের বিচিত্র কথা

রসমধুর কাহিনী সমারোহ।

দাম : সাত টাকা।

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ

১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিঃ-১২

রবীন্দ্রসাহিত্য

জাতীয় আদর্শ, স্বদেশ চিন্তা ও শিক্ষা-প্রসঙ্গে

কয়েকখানি গ্রন্থ

The Centre of Indian Culture	1.00
A Vision of India's History	1 50
The Co-operative Principle	1.50
Crisis in Civilization	1.00

স্বদেশ ॥ ২·৭৫ — ইতিহাস ॥ ২·৫০

পল্লীপ্রকৃতি ॥ ৩·৫০ — সমবায়নীতি ॥ ২·০০

স্বদেশী সমাজ ॥ ৩·০০ — শিক্ষা ॥ ৫·৭৫

সভ্যতার সংকট ॥ ১·৫০ — বিশ্বভারতী ॥ ২·৫০

আশ্রমের রূপ ও বিকাশ ১·২৫

শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম ২·০০

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ

কার্যালয় : ১০ প্রিন্সেপ স্ট্রীট । কলিকাতা ১৩

বিক্রয়কেন্দ্র : ২ কলেজ স্কোয়ার / ২১০ বিধান সরণী

আফিস এবং ইনজিনীয়ারিং-এর

নিখুঁত সরঞ্জাম

এখানে এসে কিনে নিয়ে যান

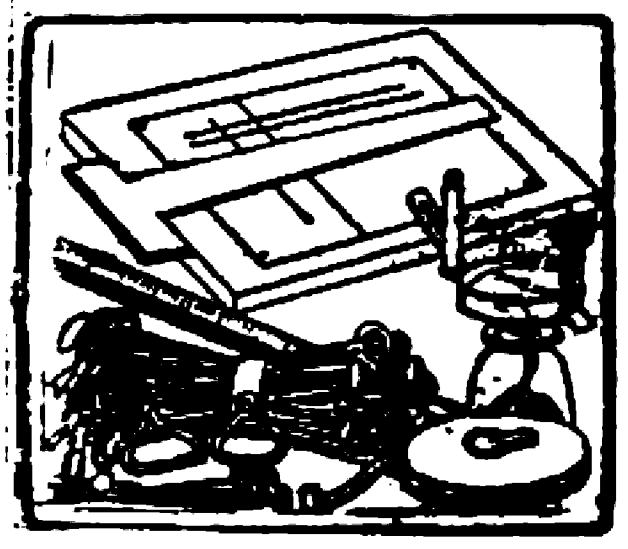

সার্ভে, ড্রইং, নানা রকম কাগজ

খাতা, লেজার, ক্যাশবই, কালি ও

উৎকৃষ্ট ছাপার জন্য

অন্যতম প্রতিষ্ঠান

কুইক ষ্টেশনারী ষ্টোর্স

৬৩ই, রাধাবাজার স্ট্রীট কলিঃ-১

ফোন : ২২-৬৫৮৪, ৬৭-৫০৬৪

গ্রাম : আরাধিন, কলিকাতা—৩৮ হাওড়া

পরিচালক : কালীপদ প্রতিহার

(ষ্টেশনারী মিলস)

শরৎচন্দ্র সম্পর্কিত এমন বই বাংলা সাহিত্যে প্রথম

রমেন দাসের

ঘরে বাইরে শরৎচন্দ্র ১০·

আশাপূর্ণা দেবীর নতুন উপন্যাস

হে ঈশ্বর, তোমার যবনিকা ১০-০০

ভালবাসার মুখ ৫-০০ তরঙ্গহীন ৫-০০

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় — অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

ফেরারী অতীত ৭-০০ — সব ফুল কিনে নাও ৮-০০

নীরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়

ঘরের পথ ৬-০০ সুখের আড়াল ৫-৫০

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

তোমার আমার ৪-০০

নীল লোহিতের চোখের সামনে ৫-০০

সাহিত্য সংস্থা ১৮সি টেমার লেন, কলি-৯

১১ বর্ষ

অমৃত

১৬ সংখ্যা

"ইণ্ডিয়ান অ্যান্ড ফরেন নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য"

Friday, 5th September, 1975 শুক্রবার, ১১ ভাদ্র, ১৩৮২

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
১৬	সম্পাদকীয়		
৭	চাঁদ	(গল্প)	শ্রীশৈলেন রায়
১৩	সাহিত্যের সংস্কার		শ্রীনির্মলা চক্রবর্তী
১৩	এইসপ্তাহে যারা		শ্রীসব্য সন্ত
১৪	বিদেশের কথা		শ্রীপুণ্ডরীক
১৫	সোভিয়েত		নারায়ণ সান্যাল
১৭	তরল এভেরেস্ট	(উপন্যাস)	শ্রীবিমলকুমার
২২	সাহিত্যের আসরে		সাধনা বসু
২৭	নতুন বই		
২৮	চিঠিপত্র		

বিকাশপদ চক্রবর্তী-র আলোড়ন সৃষ্টিকারী ছোটদের বই

ছড়ায় গল্পে বিজ্ঞান ৪.

অমিতাভ দাশগুপ্ত-র ছোটদের যে বই নিয়ে হৈচৈ পড়েছে

জলের নীচে

ডালমুট মামা ৩.

অবনী সাহার ছোটদের নতুন বই

মগরা থেকে আগ্রা ৩.

রেজগী বাবুর রাজগীর ভ্রমণ ৩.

সদু খুড়ী পুরী গেলেন ৩.

শচীন্দ্রনাথ বিশ্বাস সম্পাদিত — ডাঃ মহাবনচন্দ্র বাগচীর ছোটদের উপন্যাস

জলছবি ১২. **আঁধারের আলো ৩.**

সরোজব্রতা কর-এর ছোটদের বই — অমরনাথ রায়-এর নতুন বই

মিন্টুর খেলা ৩. **রূপকথার রাজপুত্র ৩.**

রবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়-এর — অর্ডিজিৎ বিশ্বাস-এর ছোটদের বই

রঙ মশাল ৩. **মর্জিনা আবদাল্লা ৩.**

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী-র — নিখিল সেন-এর

এক যে ছিল বাঘ ৩. **ব্ল্যাক বয় ৪.**

জ্যোতি প্রকাশন ॥ ২এ, নবীন কুণ্ডু লেন ॥ কলিকাতা—৯

কলেজ পাঠ্যপুস্তক

দর্শন (Philosophy)

অধ্যাপক—প্রমাননন্দ সেনগুপ্ত প্রণীত

ভারতীয় দর্শন—
১ম খণ্ড—৪র্থ সংস্করণ ॥12.00

ভারতীয় দর্শন—
২য় খণ্ড ৩য় সংস্করণ 7.00

ভারতীয় দর্শন—
৩য় খণ্ড (বেদ ও উপনিষদ) 7.00

পাশ্চাত্য দর্শন—১০ম সংস্করণ ॥12.00

নীতিবিজ্ঞান
৮ম সংস্করণ ॥12.00

সমাজদর্শন ৯ম সংস্করণ 12.00

মনোবিদ্যা
৭ম সংস্করণ 22.00

Hand Book of Social Philosophy—
2nd edition 16.00

পাশ্চাত্য দর্শনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—
৩য় সংস্করণ (বেকন-হিউম) 12.00

পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস
(কান্ট) 7.00

ধর্মদর্শন Philosophy of Religion) 22.00

সমাজ-মনোবিজ্ঞান 10.00
(Social Psychology)

শিক্ষা (Education)

অধ্যাপক অরবিন্দকুমার রায় প্রণীত

শিক্ষাতত্ত্ব—৩য় সংস্করণ ॥14.00

ভারতের শিক্ষা সমস্যা—৩য় সং 15.00

অধ্যাপক সেনগুপ্ত ও রায় প্রণীত
শিক্ষা মনোবিজ্ঞান—৩য় সং 22.00

শিক্ষক শিক্ষণ (B.Ed., Basic)

অধ্যাপক গৌরহরি রায়চৌধুরী প্রণীত
শিক্ষণ প্রসঙ্গে পদ্ধতি ও পরিবেশ ॥16.00

শিক্ষণ প্রসঙ্গে অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান ॥14.00

শিক্ষণ প্রসঙ্গে ইতিহাস ॥15.00

ভারতের শিক্ষা সমস্যা
(প্রাচীন ও মধ্যযুগ) 4.00

অধ্যাপক রায়চৌধুরী ও রায় প্রণীত

শিক্ষণ প্রসঙ্গে শিক্ষার ইতিহাস 16.00

অধ্যাপক সেনগুপ্ত, রায় ও ঘোষ প্রণীত

শিক্ষণ প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞান 25.00

অধ্যাপক ঘোষ ও রায় প্রণীত

শিক্ষণ প্রসঙ্গে শিক্ষাতত্ত্ব ॥16.00

BP

ব্যানার্জী পাবলিশার্স
৫।১।এ: কলেজ রো: কলি-৯
ফোন ৩৫-৭৪০৩

মহাত্মা শিশিরকুমারের

কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ

কালাচাঁদ গীতা ৪র্থ সংস্করণ ৩-০০

নিমাই সন্ন্যাস (নাটক) ২য় সংস্করণ ২-০০

নরোত্তম চরিত ৩য় সংস্করণ ২-০০

ঃ ১লা সেপ্টেম্বর প্রকাশিত হচ্ছে ঃ

০ এবার পূজার সেরা আকর্ষণ ০

শারদীয়া

পিলে চমকানো রহস্য পত্রিকা

॥ ৪টি সুবৃহৎ উপন্যাস ॥

লিখেছেন

চিরঞ্জীব সেন * অদ্রীশ বর্ধন

গুলশান নন্দা ও সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

ঃ ৫টি অভিনব অথচ চাঞ্চল্যকর ফিচার ঃ

লিখেছেন

ডঃ পঞ্চানন ঘোষাল * প্রলয় সেন

সুচক্র

অলোক সেন ও বীরু চট্টোপাধ্যায়

ঃ১২টি রাতের ঘুম কেড়ে নেওয়ার মত গল্প

লিখেছেন

ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্ত * আশুতোষ মুখোপাধ্যায় * হরিনারায়ণ চট্টোঃ প্রফুল্ল রায় * অজাত শত্রু * বরুন সেন শেখর সেনগুপ্ত * ভাস্কর রাহা * জয়ন্ত দত্ত * ডাঃ অভিজিৎ দত্ত * কিন্নর রায় ও তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী

. বইটির মূল্য ধার্য করা হয়েছে মাত্র পাঁচ টাকা পঞ্চাশ পয়সা

ক্রিমিনাল কার্যালয় : ৫।১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

সূচীপত্র

বিষয়		লেখক
...ম. যাদুলের নাম	(গল্প)	শ্রীগিরিধারী কুণ্ডু
...নন্ত		শ্রীকিপলক
...লেবলুকে 'দল' বলে কেন?		শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন
...লা ডাঙা	(কবিতা)	শ্রীজয়ন্তকুমার
...ক্ষেত্র	(কবিতা)	শ্রীঅতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
...ক ডুঁইয়ে	(কবিতা)	শ্রীগোবিন্দ ভট্টাচার্য
...সীর খাতা		শ্রীবরবর্ণিনী
...জানের কথা		শ্রীঅমৃতকান্ত
...পন খেলা	(উপন্যাস)	শ্রীচিত্তরঞ্জন মাইতি
...ঠ থেকে বলছি		শ্রীঅজয় বসু
...ঠর নায়ক		শ্রীবিপুল বন্দ্যোপাধ্যায়
...নোটিক টক		শ্রীরঞ্জন মজুমদার
...পথে		শ্রীনিরীক্ষিৎ
...ক্ষণ		শ্রীনির্মল ধর
...মিশ্র		নাট্যসমালোচক
...র থেকে বলছি		শ্রীনুরুন্নাফর
...বর্ষের স্মরণীয়		শ্রীকালীশ মুখোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ : শ্রীমানব বসুমা

সারদা-রামকৃষ্ণ

সন্ন্যাসিনী শ্রীদুর্গামাতা রচিত।

যুগান্তর—সর্বাঙ্গসুন্দর জীবনচরিত গ্রন্থখানি সর্বপ্রকারে উৎকৃষ্ট হইয়াছে। বহুচিত্র শোভিত সপ্তম মুদ্রণ—৮.

গৌরীমা

শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলার অন্যতম জীবনচরিত। সন্ন্যাসিনী শ্রীদুর্গামাতা রচিত। বঙ্গভাষায় মুদ্রিত হইয়াছে—৮.

দুর্গামা

শ্রীসারদামাতার মানসকন্যার জীবনকথা শ্রীসংঘজননী দেবী রচিত। বেতার জগৎ:—অপরূপ তাঁর জীবনলেখ্য অসাধারণ তাঁর তপস্যা। বহুচিত্রসহ ৮.

সাধনা

বসুমতী:—এমন মনোরম স্তোত্রগীতি-পুস্তক বাঙ্গলায় আর দেখি নাই।। পরিবর্ধিত ষষ্ঠ মুদ্রণ—৬.

শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম

২৬ গৌরীমাতা সরণী, কলিকাতা-৪

বিখ্যাত ডাটা গুঁড়ো মশলার প্রস্তুতকারক কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুকমী) প্রাঃ লিঃ এখন আপনাদের দিচ্ছেন একটি নতুন অতি সুদৃশ্য টিনের কৌটায় সবরকম গুঁড়ো মশলার অপূর্ব সংমিশ্রণ

এক কৌটা ডাটা রেডিমিক্সড কিচেন কুইন প্যাক কিনলে আর কোনরকম মশলা এমন কি পেঁয়াজ, আদা, রসুন প্রভৃতি আলাদা কার ব্যবহার দিতে হয় না। ডাটা রেডিমিক্সড কিচেন কুইন প্যাকএ মাছ, মাংস, ডিম ও সবরকম মুখরোচক তরিতরকারি অল্প সময়ে চটপট রান্না করা যায়। আপনার সবরকম রান্নায় আজই ডাটা রেডিমিক্সড কারি পাউডার (কিচেন কুইন প্যাক) ব্যবহার করুন।

ডাটা রেডিমিক্সড কারি পাউডার কিচেন কুইন প্যাক

প্রস্তুতকারক : কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুকমী) প্রাঃ লিঃ

২০৭, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭. [পোষ্ট বক্স নং ৬৭৭৪.

ফোন : ৩৬-১৩৩৭, ৩৪-১৭০৮

PAH—KCD-74

CENTRAL LIBRARY

সম্পাদকীয়

আমরা মর্মাহত

আমাদের প্রধানমন্ত্রীর ভাষায় প্রতিধ্বনি করে আমরাও বলি, বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান, তাঁর পরিবার ও তাঁর কয়েকজন সহযোগীকে যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তাতে আমরা গভীরভাবে মর্মাহত। শেখ সাহেব পৃথিবীর সর্বত্র একজন মহান জাতীয় নেতা এবং রাষ্ট্রনীতিবিদ হিসেবে স্বীকৃত। তাঁর জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামকে তিনি অসীমসাহস ও দৃঢ়তার সঙ্গে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। প্রধানত ভারতবর্ষের মানুষ তাঁকে গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসার চোখে দেখে। এই উপমহাদেশে শান্তি ও মৈত্রী স্থাপনে তিনি ছিলেন একজন মহান প্রবক্তা। এমন একজন নেতার শোচনীয় মৃত্যুতে আমাদের মর্মবেদনার শরিক হবেন পৃথিবীর সকল শান্তিকামী ও গণতন্ত্রমনস্ক মানুষ।

সিংহলের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী বন্দরনায়েক যথার্থই বলেছেন যে, এ ধরনের হত্যা মানবিকতার মৌলিক ধারণার সম্পূর্ণ বিরোধী। ইসলামী রাষ্ট্র কুয়েতের পররাষ্ট্রমন্ত্রীও বলেছেন যে, হত্যাকাণ্ডের সহায়ে এমন একজন নেতার অপসারণ কোনোমতেই সমর্থনযোগ্য নয়। বাংলাদেশ আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র। তাদের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে মাথা গলাবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমানকে যেভাবে নৃশংসভাবে হত্যা করা হল তাতে ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষ মর্মাহত ও বিচলিত না হয়ে পারে না।

বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে কি ঘটেছে তার বিচারের দায়িত্ব আমাদের নয়। বাংলাদেশের নতুন রাষ্ট্রপতি আমাদের হাইকমিশনারের কাছে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন, এ সংবাদও আনন্দের। আমরা জানি শেখ মুজিবুরের আমলে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদী পারস্পরিক মৈত্রী ও সহযোগিতার চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। নতুন সরকারী ভাষ্যে বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশ সরকার সমস্ত আন্তর্জাতিক নিয়মকানুন চুক্তি মেনে চলবেন। এটাও নিশ্চয়ই আশার কথা। বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক নীতিও অক্ষুণ্ণ থাকবে। এ আশ্বাসও নিশ্চিতই অভিনন্দনযোগ্য। ভারতবর্ষের মানুষ এ সংবাদ শুনেও আশ্বস্ত হয়েছে যে বঙ্গবন্ধুর দেওয়া নাম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ তার পরিচয় অক্ষুণ্ণ রেখেছে। কোনো ধর্মীয় সংজ্ঞা সে গ্রহণ করবে না।

তা সত্ত্বেও সামরিক অভ্যুত্থানের ফলে বঙ্গবন্ধু ও নতুন একটি রাষ্ট্রের জনকের এই নৃশংস হত্যার কথা মনে হলেই মন বিষাদে ও বিক্ষোভে ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। দুর্দান্ত স্বৈরাচারী পাকিস্তানী সরকার যে অসম সাহসী আপস-নিরপেক্ষ মানুষটিকে স্পর্শ করতে সাহস পায়নি, পশ্চিম পাকিস্তানের জেলে থাকার সময়ে যে মানুষটির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার জন্য কবর পর্যন্ত খোঁড়া হয়ে গিয়েছিল সেই মানুষ তাঁর মাতৃভূমি, তাঁর চিরসাধনার চিরস্বপ্নের সোনার বাংলায় তাঁরই স্বদেশবাসীর হাতে এমনভাবে নিহত হলেন। এই কাপুরুষোচিত হত্যার কোনো ক্ষমা আছে কি? আমরা স্মরণ করতে পারি মাত্র তিন বছর আগে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারির সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর নয়নের মণি, তাঁদের মুকুটহীন সম্রাট তাঁদের ভালবাসার ধন বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমান পাকিস্তানী জেল থেকে মুক্ত হয়ে ঢাকায় ফিরলেন। ঢাকা রেসকোর্স ময়দানে সেই ঐতিহাসিক জনসম্বর্ধনার উত্তরে মুজিবের অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে সেদিন উচ্চারিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের দুটি কবিতার অবিস্মরণীয় পংক্তি—দুইই বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতির উদ্দেশে—'সাত কোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননি' এবং 'নমো নমো নমো সুন্দরী মম জননী জন্মভূমি'। বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতি ছাড়া মুজিবের অন্য কোনো চিন্তা ছিল না। সংগ্রামে অকুতোভয় অথচ সহৃদয় ও কোমল প্রাণ এই মানুষটি সকলকেই ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। নৃশংসে যুদ্ধাপরাধী পাকিস্তানীদের কিংবা বিশ্বাসঘাতকদেরও তিনি কোনো শাস্তি দেননি। এমন একজন রাষ্ট্রনায়কের এমন শোচনীয় মৃত্যু শোকাবহই শুধু নয়, ভাবতে গেলে অকল্পনীয়ই মনে হয়। আমরা আশা করব নতুন বাংলাদেশ সরকার গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক লক্ষ্যে অবিচল থাকবেন। শান্তিকামী প্রতিবেশী হিসেবে ভারতের মানুষ আজ এটুকুই প্রত্যাশা করে। আমাদের মৈত্রী যেন অক্ষুণ্ণ থাকে।

CENTRAL LIBRARY

চাঁদ

শৈলেন রায়

ওরা দুজন।

নিরিবিলি পরিবেশ। দু-একটা পাখি মাঝে-মধ্যে ডেকে উঠছিল। সূর্য মধ্যগগনে। ঝলমলে। আকাশে খন্ড খন্ড মেঘ। গাঢ় নীল আকাশ। ওরা পাথরের আড়ালে বসেছিল। পা ঝুলিয়ে বসেছিল। ওদের পর ঘুরে ঘুরে ক্ষীণ একটি জলরেখা কুলু কুলু শব্দে বয়ে যাচ্ছিল। ওরা তন্ময় হয়ে নিজ নিজ পায়ের দিকে তাকিয়েছিল। যেন সেখানে কিছু আবিষ্কারের চেষ্টা করছিল।

আসলে ওরা কিছুই দেখছিল না, ভাবছিল। ভাবছিল নিজেদের কথা। নিজেদের কথা ঠিক না, ভাবছিল শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা কী দাঁড়াবে। কী দাঁড়াবে বলতে কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে।

ঠিক যে জল দাঁড়াবার কথাটাই ভাবছে ওরা ঠিক তাও না। ওরা ভাবছে, ব্যাপারটা এত দূর পর্যন্ত না গড়ালেও চলতো। আর একটু আগে—এই কলকাতায় থাকাকালীনই ব্রেক কষা উচিত ছিল। কিন্তু কবে কবে করেও কষা হয়নি। হড় হড় করে নীচের দিকে নেমে এসেছে। এসে বসেছে এখানে। পৃথিবীতে এমন নিরিবিলি একটা পরিবেশ যে থাকতে পারে ওদের জানা ছিল না। মাঝে মাঝে নিজেদের নিশ্বাস প্রশ্বাসের শব্দে ওরা সচকিত হয়ে উঠছিল। মনে মনে ভয় পাচ্ছিল।

একসময় মেয়েটি বলল, 'তারপর?'

ছেলেটি আরও নিবিষ্ট দৃষ্টিতে নিজের পায়ের দিকে তাকিয়ে রইলো। পাহাড়ি ঝরণার জল খুব ঠান্ডা। পা দুটো অসাড় হয়ে আসছিল। সে চোখ তুলে একবার মেয়েটিকে দেখলো, তারপর দৃষ্টি নত করতে খুব নীচু স্বরে বললো, 'তারপর আর কি?'

'তা-ই তো জানতে চাইছি। এরপর কি হবে? কি হবে মানে কোথায় যাব, কি করবো?'

'দেখি।'

'কি দেখবে? তখন থেকেই তো দেখছো।' একটু হেসে, 'নিজের পা।'

ছেলেটিও হাসলো। কথা বললো না।

মাথার ওপর দিয়ে বিরাট ডানা ছড়িয়ে একটা পাখি উড়ে গেল। ওর ঘন ছায়া ওদের ওপর দিয়ে সর সর করে চলে গেল। মেয়েটি ওপর দিকে তাকালো, নিজের মনেই বললো, 'বেশ আছে।'

ছেলেটি নির্বিষ্টচিত্তে তখনও পা দেখছিল, হঠাৎ চমকে উঠে বললো, 'কে বেশ আছে?'

মেয়েটি কৌতুকভরা কণ্ঠে বললো, 'তুমি।'

ছেলেটি উষ্ণ নিশ্বাস চাপতে চাপতে বললো, 'হ্যাঁ আমি।'

'তুমি বেশ নেই?' মেয়েটি ঘাড়ের পাশ দিয়ে ওর দিকে তাকালো। 'উত্তর দাও। বেশ নেই তুমি? মুখ মরছে যে কোন সময় পোষা বেড়ালটির মত মার আঁচলের নীচে আশ্রয় নিতে পার।'

'তুমিও পার।' জলের নীচে পা দুটোকে ভীষণ রকম আলাদা দেখাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, এরা কোন মানুষের পা। ছেলেটি সেই পা দেখছিল।

'না, আমি পারি না।'

'কেন পার না?'

'মেয়েরা পারে না, পারতে দেয় না।'

'কে দেয় না?'

'তোমরা—পুরুষেরা। ছি ছি করো।'

ছেলেটি উত্তর দিল না। অন্যমনস্কভাবে পকেটে হাত দিল। সিগারেটের প্যাকেটটা তুলে ফেলে এসেছে। হোটেলের বেয়ারারা ওদের বন্দী করে রেখেছে। ওদের নিঃশ্বাস বন্ধ হচ্ছে, যেমন হচ্ছে ওর।

'আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে।' শাড়ির আঁচল আঙুলে জড়াতে জড়াতে মেয়েটি বললো।

? কি বুঝি?

তোমা কলকাতায় যাবে হবে বিয়ে করি।'

'তোমার যেমন বুদ্ধি'

কেন? বুদ্ধির দোষ কি?

তুমি এখনও মাইনর তোমার বলা মানেলা করবে। আমাকে জেল খাটাবে।'

বেশ হবে। জেলের ঘানি টানবো।' মেয়েটি খিল খিল করে হেসে উঠলো। কিছুক্ষণের জন্য ছেলেটি কথা বলতে পারলো না।

আমি জেলে গেলে তুমি খুশী হবে?

হ্যাঁ হবো, যারা খারাপ হবে। তাদের একটু সাজা হলে এক ওদের মতলবের কথা যারা কাছাকাছি এসেছে আর একটু ভালো ব্যবহার মিশবে।

বেশ তাই হোক' ছেলেটি উঠে দাঁড়ালো।

মেয়েটি ওকে হাত ধরে বসালো, উঠো না; এখনও সন্ধ্যে হয়নি।

ছেলেটি আবার বসে পড়লো। গাঢ় স্বরে ডাকলো, রূপা!

কাকে ওদের ওই ছোট্ট নিরালায় একে একান্তে পাবার মতন।

ছেলেটি আধার নীচু গলায় ডাকলো, রূপা!

মেয়েটি মুখ, হাসলো। ওর হাসি ভরা মুখে ছোট্ট কপালে ঘামের বিন্দু ফুটে উঠেছে। কেতকী গাছের পাতায় পাতায় সন্ধ্যের আঁধার নিবিড় হয়ে এসেছে, উষ্ণতার হাওয়ায় ওর মন ভরে ছিল। মনে হচ্ছিল সেখানে পাহাড় থেকে হঠাৎ তুষার-ঝঞ্ঝা এসে সব কিছু জমিয়ে দেবে।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। মেয়েটি উঠে দাঁড়ালো। ছেলেটি ওর পাশে এসে দাঁড়ালো। ওরা সামনের পাহাড়টার দিকে তাকিয়ে রইলো। কিছুক্ষণ আগেও যে পাহাড়টাকে সন্ধ্যে দেখাচ্ছিল তখনই সে একটা গাঢ় আঁধারের চাদর জড়িয়ে নিতে লাগলো, ওরা আর কথা বলে না। কতক্ষণ যে কাটলো ওরা বুঝতে পারে না।

মেয়েটি মৃদু স্বরে বললো, চলো ফেরা যাক।

ওরা বুঝলো নীচের হোটেলে ফিরে যাবার কথা বলছে।

ছেলেটি হাত ধরে টেনে নিয়ে যেতে লাগলো। ওরা অন্ধকারে এক সময় ও বললো, দাঁড়াও।

ছেলেটি আকাশের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো, তার দিকে তাকিয়েই রইলো।

কি দেখছো? মেয়েটি খিলখিল করে হেসে উঠলো।

চাঁদ!

চাঁদ ওখানে, আকাশে।

ছেলেটি চোখ তুলে দেখলো। সত্যি চাঁদ উঠছে। ধীরে ধীরে নরম আলো ফুটে উঠছে। অফুট স্বরে চাঁদ এখানে!

ওরা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে অপলকে নির্নিমেষভাবে তাকিয়ে রইলো।

ছেলেটি ফিস ফিস করে কথা বলছে না।

মেয়েটি সেই কথার প্রতিধ্বনি আর ভয় করছে না।

ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ আপনার পরিবারের সকলের স্বাস্থ্যের জন্যে একান্ত প্রয়োজনীয়

ওঁরা কি তা যথেষ্ট পরিমাণে পাচ্ছেন?

এটি নিশ্চিত করার জন্যে ওঁদের রোজ ভিমগ্রান খেতে দিন। ভিমগ্রানে দিনভর কার্যক্ষমতার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় ভিটামিন আর খনিজ পদার্থ দুইই আছে।

ভিমগ্রান®

অপরিহার্য: ভিটামিন ও খনিজ পদার্থযুক্ত বড়ি
১৩টি ভিটামিন + ৮টি খনিজ পদার্থ

III SQUIBB
VIMGRAN
MULTIPLE VITAMINS-MINERALS TABLETS
SARABHAI CHEMICALS

III SQUIBB
SARABHAI CHEMICALS LTD.

এ ই আর স্কুইব এণ্ড সন্স ইনকর্পোরেটেডের রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক ব্যবহারকারী সারাভাই কেমিক্যালস লিমিটেড—এর একটি এক

মাত্র একটি ভিমগ্রান আপনাকে সারাদিন কার্যক্ষম রাখবে

Design-SC-2A/75 bm

কলকাতারই একজন ১০,০০০ টাকা জিতেছেন

আমাদের স্মল সেভিংস প্রাইজ ডিপোজিট স্কীমের ৫০০ টাকা সিরিজের

২য় পুরস্কার (জুলাই মাসের ড্র'তে)

কলকাতার ব্যাংক অফ মাদুরা লিমিটেডের গ্রুপ ম্যানেজার শ্রী আর. ভেংকটচলম্ ১০,০০০৲ টাকার চেকটি ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার (নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-১) সাব-ম্যানেজার শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ ও তাঁর কন্যা কুমারী মিতা ঘোষকে দিচ্ছেন।

আপনিও জিতে নিন

আমাদের ৫০০৲ টাকা সিরিজের স্মল সেভিংস প্রাইজ ডিপোজিট স্কীমে

দু'ই লক্ষ টাকা

অথবা ২০৮টি অন্যান্য নগদ পুরস্কারে।

প্রতি মাসে ১২০টি ড্র এবং ২০৯টি পুরস্কার।

এখুনি লগ্নী করুন

ব্যাঙ্ক অফ মাদুরা লিঃ

— আপনার আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক

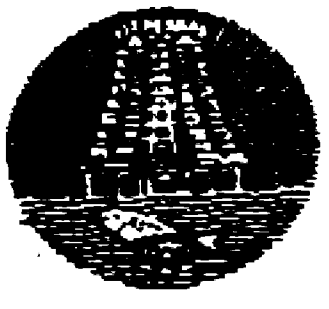

ব্র্যাবোর্ণ রোড শাখা—
সিটি সেন্টার, ১৯ সিনাগগ স্ট্রীট, কলিকাতা১ ফোন : ২২-২৮৫৭

ভবানীপুর শাখা—
৬৭-এ আশুতোষ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৫
ফোন : ৪৭-৭০৮৩, ৪৮-১৩৫৭

IDEAL

CENTRAL LIBRARY

সাহিত্যের স

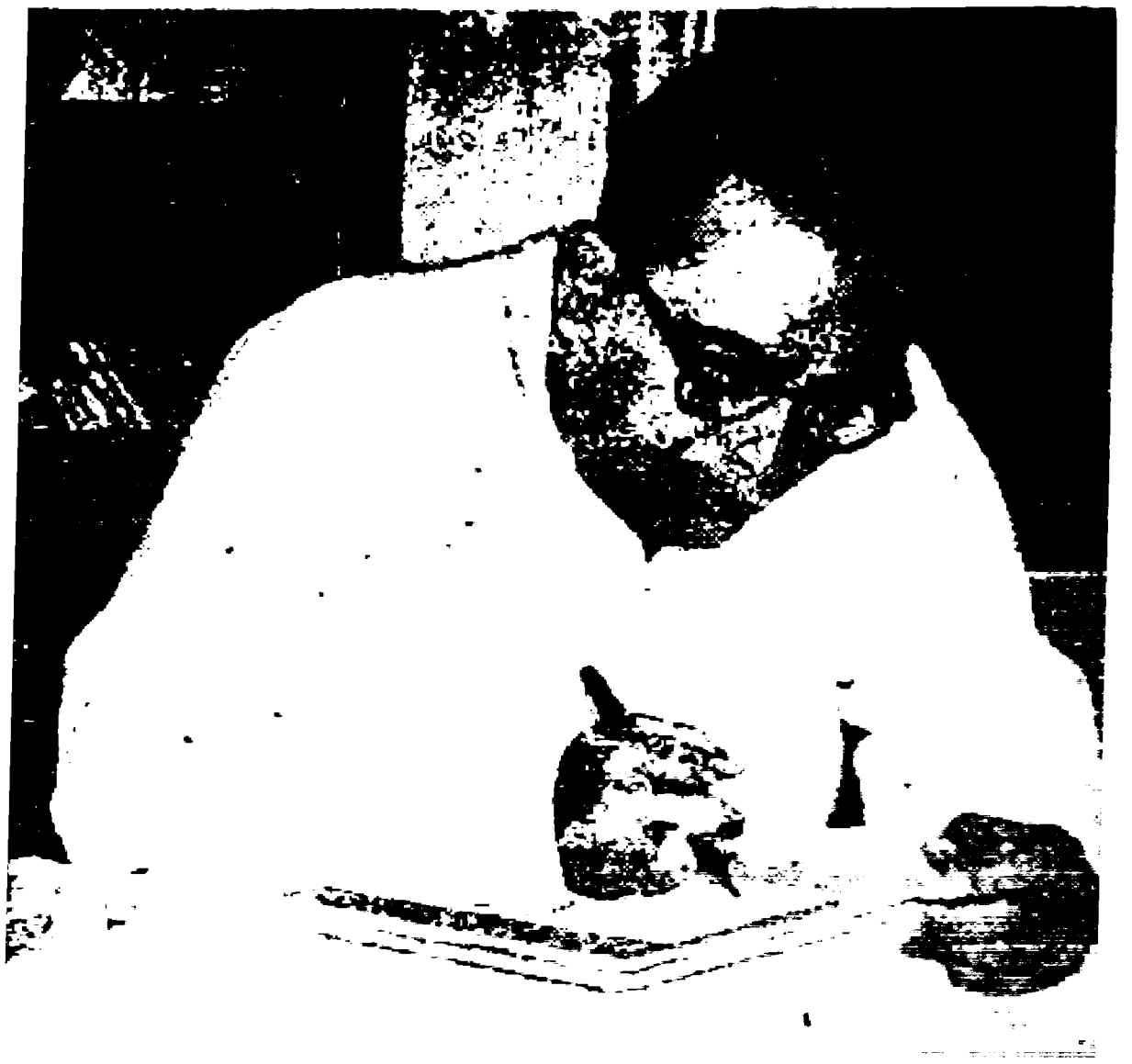

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

...লার যখন কবিতা লিখতেন, তখন ...টেবিলের ডানার পেছনে একটা পটা...ল রাখা থাকতোই। পটা আপেলের ...র গন্ধে তাঁর লেখায় আনতো মেজাজ। ...অভেন? অডেনের ট্রাউজারের পকেট ...কাপ গরম চা না হলে এক লাইনও ...এগুতো না। চা নেই অথচ অডেনের ...চলছে, এটা কল্পনার বাইরে। আর ...চায়? স্পেন্ডার গরম গরম কফির সঙ্গে ...নে সিগারেট। স্পেন্ডার যে সিগ্রেট খেতেন, ...তা নয়, কিন্তু কফির সঙ্গে সিগ্রেট আর স্পেন্ডার কবিতা লিখছেন—এ ...যায় না।

...তেমনি আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের চাই ...ও একটিপ না হলে তিনি লেখা ...পরের কথা, ফটো তোলাতেই যেতে...না। এমনি এক মেজাজী সন্ধ্যায় বেল ...টিপে নিয়ে, আশুবাবু 'প্রসাদ'-এর ...রসের শেষ পর্ব শেষ করার জন্যে ...মাত্র কলম ধরেছেন, সেই সময় ...দরজায় বেজে উঠলো কড়া। খুট করে ...দরজা খুলে একজন এসে বললেন—কাকে ...? — বললুম। — আপনার নাম? — ...শান্তিলতা চতুর্বেদী। — এই বাড়ীতে

বাইরের ঘরের দরজা খুলে ...সোফায় বসে চশমার ...কে দু চোখ নাচিয়ে আশুবাবু বল...ন, গত রোববার আসা হয়নি কেন? — ...বলা হয়েছিল। তাই এখন। ...এখন? পাগল হয়েছ? দশ ...কেন, দু মিনিটও অসম্ভব। ...রোববার সকালে এসো। আমিও বল...অসম্ভব। কালই কপি দিতে হবে। ...মিনিট সময় চাই-ই। ঠিক আছে ...সাতটা পঁয়তাল্লিশ। আটটায় ফোন। ...খুব শর্টে বলো। শর্টেই দুজন ...যখন বেরিয়ে এলুম তখন ঘড়িতে ...খুব শর্টেই ব্যাপারটা সারা হল বা...

পাঠকদের শর্ট হাতটাই আমরা ...বলা যাক।

কোথায় কোন্‌টুকু কবিতা ...উপন্যাস? —আমার বক্তব্য নয়, ...বিশ্লেষণে যেতে চাই না, তাতে ...তো বাড়বে, এটা শর্টে সারতে ...করতে হল। সত্য?—তা কখনো ...যেমন? উপন্যাসের, নিজের ...জানে।

না, না, আর না। খুব ...মিনিটেই

পরিণতি বলতে যা বোঝায়, তখনো ঠিক সার্থকভাবে আসে নি। প্রথমে ৩০ স্লিপ লিখলাম, আর এগোয় না। পরের পুজোয় লিখলাম—আবার ১৫ স্লিপ। তারপর কখন এক সময় এসে গেল বিদ্যুতের মত তার পরিণতি। তখন শেষ করলাম—মাত্র দশ দিনে।

লেখক যদি তার নিজের কাছে তৃপ্ত না হন, শুধু কোনরকমে শেষ করে দেওয়ার মধ্যেই যদি তার দায়িত্ব সীমাবদ্ধ থাকে, তাহলে তিনি লেখকই নন, সেই তৃপ্তি না এলে লেখকের পাণ্ডুলিপি ছিঁড়ে ফেলা উচিত। আসলে কি জানো ব্যাপারটা একটা টেম্পারামেন্টের। লেখক হিসেবে যে একাগ্রতা নিষ্ঠা এবং জানো, যে অনুভূতি বর্ণিত বিষয়-কিম্বা ঘটনাকে পরিণত করে তোলে বাস্তব শরীর। যা অন্যদের অনুপ্রাণিত করে। আর আমার অনুভূতির তরঙ্গ বহুস্তর হয়ে যদি পাঠক হৃদয় আলোড়িত না করল তাহলে তার সার্থকতা কোথায়? লেখক তো এই সমাজের প্রতিনিধি। একই স্বপ্নে, একই বিষাদ, ক্লান্ত সময়, প্রেম, ভালবাসার সঙ্গে সে জড়িয়ে। সমাজকে বাদ দিয়ে লেখক হয় কি করে।

ততক্ষণে ক্যামেরাম্যান সুকুমারবাবু তখন ঝপাঝপ ফ্লাশ লাইটে অস্ত্রপ্রচার তুলে যাচ্ছেন। মুখ বাঁদিক করুন। ডান দিক করুন, ইত্যাদি।

আচ্ছা আশুদা, আপনি প্লট নির্বাচন করেন কি করে, এটা কিন্তু আমার জানতে খুব ইচ্ছে হয়।

—এই একটা কঠিন প্রশ্ন করেছ। প্লট উঠে আসে হঠাৎ। এই যে তোমার সঙ্গে কথা বলছি, হঠাৎ—এখান থেকেই হতে পারে। হতে পারে লাইব্রেরীতে পড়তে পড়তে। হয়ত পাশের কোন গোলমাল তর্কাতর্কি দেখে, রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে কখন যে আইডিয়া এসে যাবে। তা জানি না। আইডিয়া এলে তারপর আশপাশের চরিত্ররা মিলে তার পূর্ণাঙ্গ রূপ দেয়। তবে একটা ব্যাপার জানি, আমার উপন্যাসের মূল উপজীব্য বিষয় হল মানুষ। আমার ১০।৮৫ খানা উপন্যাসে বারবার ঘুরে-ফিরে এসেছে মানুষের হাজার আদল, তার জীবনের অন্তঃস্থলে দুঃখের যে গোপন নদী বয়ে যায় তার ঢেউ, কিম্বা প্রেমের আগুনে কেমন করে পতঙ্গেরা পুড়ে ছাই হয়ে যায়, এইসব কথা। তাদেরই রূপায়ণ আমার উপন্যাস। তাই প্রতিটি চরিত্র আমার দেখা। এই এক দেখা বহু হয়ে ওঠে, বললাম। জান শান্তিলা, তাই মানুষকে ছোট-খাটো ত্রুটি, অপরাধ অন্যায় আমার চোখের পর্দা টেনে দেয় না। আমি মানুষের উত্তরণে বিশ্বাসী। সে বিশ্বাস আজও আছে।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কথা শুনে আমার মনে পড়ল পৃথিবীখ্যাত জোলার কথা। বিশ্বসাহিত্যের জনপ্রিয় এই ঔপন্যাসিক বলেছিলেন—তাঁর সব কাহিনীই প্রায় কোন-না-কোন সূত্রে পরীর সঙ্গে ছুঁয়ে গেছে। বিশেষ করে এ মুহূর্তে আমার মনে পড়ছে তাঁর সবচেয়ে জনপ্রিয় উপন্যাস 'নানা'র কথা। 'নানা' বাস্তবনিষ্ঠা। এবং সে লেখকের কোন কল্পনাপ্রসূত নয়। 'নানা' সত্যিই ছিল ফরাসী শহরের এক নামজাদা পয়সাওলা বেশ্যা। ফুলের তোড় তোড় লোকেরা তার কাছে যেত, তার নাম অবশ্য 'নানা' ছিল না, ছিল না-পেত্তা। পেত্তা বুড়ি হলো। যৌবন গেল ফুরিয়ে। জীবনের প্রান্তে সেই ঘোলাটে চোখে তখন

বুদ্ধদেব গুহ

পেত্তা দেখত ফেলে-আসা জীবন। থাকে সে তখন শহরতলীর এক পাশে। জোলার সঙ্গে এই পেত্তার আলাপ হল। একটু একটু করে জোলাকে শোনাল জীবন কাহিনী। জোলার লেখা হল 'নানা' যা জোলাকে সারা পৃথিবীতে বিখ্যাত করেছে। অজ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের প্লট নির্বাচন আমাকে পুরনো গল্পটা একবার মনে করিয়ে দিল।

প্রসঙ্গ থামিয়ে বললুম—আচ্ছা আশুদা, এরকম ঘটনা আপনার জীবনে ঘটে নি? নিশ্চয়ই। তাহলে শোনো—একবার ভাবলাম উপন্যাস লিখব ঠিক করেছি। প্লট আসছে না। রাত থেকে দিন গড়িয়ে যায়, নাঃ, সে আর আসে না। একদিন সন্ধেবেলায় লেখার টেবিলে বসে আছি। ঝন-ঝনিয়ে ঘরে ফোন বেজে উঠল।

হ্যালো, বলছি।

আমি রামেন্দু। —রামেন্দু সেনমুখী। আমার কবিবন্ধু।—কি করছ?—আর বল কেন, উপন্যাস নিয়ে পড়েছি।

—তোমরা যে কি লিখছো বুঝি না। এই সব নার্সিং হোমের ডাক্তারদের নিয়ে লিখতে পারো না? ওফ, আমি একজন মেডিকেল লাইনের লোক, এত ঘুরলাম, দেখলাম, কিন্তু এই নার্সিং হোম ডাক্তার-দের দেখে আমি অবাক। এরা যে কিভাবে দিনকে রাত, রাতকে দিন করছে। এদের নিয়ে লিখতে পারো না?

—কেন, কি হল অত রাগছো কেন। ব্যাপারটা কি?

—আর ব্যাপার, আমার এক জানাশোনা মেয়েকে নার্সিং হোমে ভর্তি করা হয়েছে। অ্যাপেন্ডিসাইটিস করে এরা বলল ক্যান্সার। ঠিক আছে, তাই সই। শুরু হল তাই অপারেশন। ভুকতো তারপর দেখা গেল কিছুই নয়, ছোট্ট একটা টিউমার যা অপারেশন না হলেও চলত। তাহলে ভাবো ব্যাপারটা।

ব্যাস, ততক্ষণে আমার ভাবনা, ইন-ফ্লুয়েঞ্জার মত এদের সংক্রামিত হয়েছে। পুজোর লেখায় হাত দিলাম।

শুরু হল আমি সে ও সখা।

জানো শান্তিলা, আসল ব্যাপারটাই হল হৃদয়ের অন্বেষণ। বললুম—তাহলে বলতে হয় প্লট হল ঘট। আর ঘটনা হল প্রতিমার ছড়োয়া সাজ।

হ্যাঁ ঠিক তাই। তুই যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ি, যখন জীবনের নানা বিপর্যয়ে হতাশা শুরু হয়, দুঃখে যখন আলোগাছ ক্লান্তির কোলে মাথা রাখি, তখন কে যেন প্রভুজী হয়ে আমার মাথায় বুলিয়ে দেন নরম নিরাপদ, আশীর্বাদ, স্পর্শ, বিশ্বাস করো শান্তিলা কখনো এরা হারায়নি, যেন কি একটা ঘোরে লিখে গেছি। কি লিখেছি জানি না। কিভাবে শেষ হল তাও জানি না। শুধু সেই প্রভুজীর পায়ে রেখে দিয়েছি আমার হৃদয়ের অঞ্জলি। এই তৃতীয় পুরুষই আমার জীবনের প্রেরণা, পাথেয়। আমার প্রতিদিনের ক্লান্ত শরীরে তিনি তাঁর মন্ত্র শুনিয়ে বলেন, সামনে এগিয়ে যেতে।

আজ প্লট মাথায় আসবার আগেই প্রকাশকেরা অ্যাডভান্স করে নিয়ে যান। অথচ যে লেখাটা চিরকাল মনে থাকবে তা হল প্রথম উপন্যাস 'কালচক্রের কথা

CENTRAL LIBRARY

: আমার বয়স আর কত হবে?—২১-
। তখন তো লেখা ছেড়ে চাইতোই না।
! পেলে হয়তো ওসব হতোটোও না। কয়েক-
বন্ধু মিলে টাকা দিয়ে বই বের করল।
ীর উপন্যাস সেই নিজের জমান টাকায়
ছাপা। বইটা বাজারে বার হল। কাটল
। মনে। বয়ানটি চাই না বাপু, আসলটা
ত ছে। এক পয়সাও দিল না পাবলি-
।

রকার নেই উপন্যাসে। আর নিজেদের
ব বের করছি না। তখন এক সত
লদারের কাছে বই চলাচল-এর পাণ্ডু-
নিয়ে তোমার নাম বলবো না। তিনি
পাণ্ডুলিপি নিয়ে না পড়েই ফেরত
ন। অন্ততঃ পড়ুন। হবে ও চলবে না।
প্রকাশক সাহস করে ছাপলো—একটা
করে সাতটা সংস্করণ বেরিয়ে গেল।
ছোট্ট। ছোটমুটি নাম হল। এবার
প্রকাশক এগিয়ে এলেন—আমি কি
ম জানো? আমার সেই চলচলের দিন
তাঁকে দিলাম। প্রকাশক তাতেই
রাজী হলেন: পুরো বয়ানটি সহ
তাকে আমি আমার নতুন কোনো
াস দিই।

একটা কথা আমি সব বুঝেছি। সবসময়
না পাঠকের কাছ থেকে আমি দূরে
যাচ্ছি পাঠক আর আমাকে চাইছে না।
চলে যাব নিঃশব্দে। দীর্ঘ
বছর সম্পাদকের চেয়ার আমাকে
শিক্ষাই দিয়েছে। নিজেকে ওভাবে
য় রাখার কোনো মানে নেই। তাই
কেই নিজে বলি—নতুন প্রাপ্তির জন্যে
আমার পুরনো প্রাপ্তিটাকে সরিয়ে
ব।

ইরেসপন্সীবল থাকেন আমার সামনে
থাকেন পরবর্তে অনেক সাহিত্যিকে
রেখে সামনে আসেন বন্ধুবরেষু।
তোমাকে আমার গোপন কথাটা বলে য
আমার প্রিয় পত্রার নিবন্ধ হল—তাঁ
দাখো—আলমারির সাজানো বইগু
কেবারে লাইন মেরে দেখে পড়েছি। ব
অনুভবে অন্তিত্বে জাগিয়ে তোলেন ব
নাথ। আমার চাহিদা মধুচন্দ্রিমা ব
মধ্যে নিমগ্ন মধুপানের মতো। পিপ
আঁজলা ভরা জল তুলে নিয়ে বলি—দা
আছো তুমি আমার গানে ওপারে'।

•

কি লিখবো না লিখবো, ততক্ষণ
হাতে নিয়ে, কাগজপত্তর পেন বাগে ঢু
কথায় আকথান হঠাৎ নিস্তব্ধ করল
আচ্ছা বুদ্ধদেবদা আপনি কবিতাটবিতা
পড়েন না?

—পড়ি মানে? লিখি। বলবে?
আমার কথার আপেক্ষায় ছিলেন লেখক
আসলে যখনই লেখতাম বড়ো কবি হ
জানো যখন বয়েসকে পাড়ি তখন অ
কবিতা বেশি বেরিয়েছে?—বেশি? কবি
—হাঁ। আরো শুনবে? আমার
কবিতার বই যখন বৃষ্টি নামলো বে
১১৫৬-এ।—একদম জানতুম না শে
হো কয়েকটা। বুদ্ধদেব গুহ হেসে বলবে
ভালো লাগবে আমার কবিতা? ৎ
আধুনিক নয় কিন্তু! মনে রাখা
ডায়রীটা খুলে আমাকে অবাক করে
বুদ্ধদেব গুহ একের পর এক কবিতা
বললেন। মির্জা গালিবের শের-এর
তাঁর নিটোল ছন্দে শব্দের মালা
পরিয়ে, দিলেন গলায়, তখন রাতের
অন্ধকার নেমে এসেছে।

থাক সে কথা পরে বলবো।

ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (মনোবিদ)-এর

পাভলভ পরিচিতি

(প্রথম খণ্ড)

প্রকাশিত হয়েছে

চার খণ্ডে প্রকাশিতব্য পাভলভের পরাবর্তভিত্তিক মনোবিদ্যা সম্পর্কে চারখণ্ডে প্রকাশিতব্য 'পাভলভ-পরিচিতির' প্রথম খণ্ডে আছে সুপ্তি-স্বপ্ন-স্মৃতি-সম্মোহন প্রসঙ্গে পাভলভ হেব্ব ইয়ং ম্যাকডুগাল প্রমুখের মনস্তত্ত্বের সাধারণ পরিচয়। এই খণ্ডটিকে বলা চলে আধুনিক মনোবিদ্যা - প্রবেশিকা।

দাম—১৩·০০, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

এক সঙ্গে চার খণ্ডের গ্রাহক হলে প্রায় ২৫% কমবেশি।

২৫ পয়সার ডাকটিকিট পাঠালে গ্রাহক হবার নিয়মাবলী পাঠানো হবে।

পাভলভ ইনস্টিটিউট

১০২।১এ বিধান সরণি, কলকাতা ৬

দেখুন তো! পুজোর কথা আলোচনা করতে এসে কোথা থেকে কোথায় চলে এসেছি। একটু পুজোর গল্প করুন। পুজোয় একটাই উপন্যাস লিখছি বিজ্ঞাপন তো দেখেছেনই। অবশ্যের পটভূমিতে সেবা যেন বড় একটা নতুন ধরণের কাহিনী লিখেছি আমাতে। তাছাড়া গল্প আছে সেতার জগৎ আনন্দমেলা রঙমশাল এবং খুব শিগগিরই শুরু হচ্ছে আমাতে ধারাবাহিক উপন্যাস। তিনটে ইনস্টলমেন্ট দিয়ে দিয়েছেন।

পটভূমি শেষ কি নিলেন?

সম্প্রতি যে প্রশ্ন গোটা পৃথিবী জুড়ে এলাম নিঃসন্দেহে সেই ছন্দ আমার উপন্যাসের পটভূমি। এ ধরণের উপন্যাস আমি এই প্রথম লিখছি। তবে যা-ই লিখি, একটা কথা না বললে আমার সব কথাই মিথ্যে হয়ে যাবে। সেই মানুষটি যদি প্রেরণা সহযোগিতা ভালোবাসা না করলে হয়তো আমি লেখক হতে পারতুম না তাঁর কথা তো সব সময়েই মনে থাকে। যাকগে শোনো, তুমি তো নিশ্চয়ই বড়োমামাকে চেনো?

—বাঃ সুনির্মল বসুকে চিনবো না? বাংলা শিশু সাহিত্যের তিনি ছিলেন একজন দিকপাল। কে কে না চেনে?

বড়োমামাই আমার লেখা নিয়ে শুরু তারায় দিলেন। কথাসাহিত্যে লেখার পর একদিন মনোজবাবু (বসু) আমাকে একটা চিঠি নিয়ে আনন্দবাজারে যেতে বললেন।

এই হল শুরু। তারপর 'হলদে বসন্ত' বেরুলো লোল সংখ্যায় করেক বছর বাদে। সেই প্রথম চতুর্দিকে থেকে আমার জন্যে অভ্যর্থনা—সম্মান। আজ পর্যন্ত আমি বারোটা উপন্যাস লিখেছি।

ইচ্ছে ছিল কবি হবো। বাবা বললেন—সি-এ পড়ো। মনের গোপন দুঃখ মনে চেপে নিয়ে তাই পড়লাম। ইচ্ছে হোতো না একটুও ইচ্ছে হোতো না আমার অংক কষতে পাতার পর পাতা হিসেব করতে। চোখের জলে খাতার পাতা ভিজে যেতো। মা বুঝতেন মাথায় হাত বুলিয়ে বলতেন খোকা এটা পাশ করে তারপর কবিতা লিখবি এই তো কটা দিন। ভাবলুম—তাই হোক। যখন ধরেছি শেষ করি শুরু করে মাঝে আমার ভালো লাগে না।

—তাহলে এখন আপনাকে দেখেই মনে হচ্ছে সাফল্যের চূড়ায় দাঁড়িয়ে।

মা শান্তিলতা এ যোগ্য ক্রমশই ভারী হচ্ছে। আর কুঁজো হয়ে সেই ভার বয়ে নিয়ে যাচ্ছি। দিনে ৮।১ ঘণ্টা আমাকে হিসেব নিয়ে থাকতে হয়।

—তাহলে লেখেন, পড়েন কখন?

—এটা আমার গোপন ব্যাপার। কারুর আমি বিশ্বাস করি কাজগুলো পরস্পর সাজানো আছে মৌচাকের একেকটা খোপের মতো। যে কোনো মানুষ তার প্রথম নিয়মানুবর্তিতা এবং নিষ্ঠা দিয়ে এই খোপগুলোকে ভরতে পারে। তবে সামাজিক জীবন বলতে আমার কিছু নেই শুধু কাজ আর লেখা। এছাড়া জীবনে কিছু নেই: এই যে ঘর দেখছো এখানেই আমার বিশ্রাম। রাতের পর রাত কতদিন এখানেই কেটে গেছে।

চারদিকে বই, ক্লাসিক থেকে একেবারে হাল আমলের ইংরেজী বাংলা বই ম্যাগাজিন ঘরটা রঙিন করে রেখেছে।

মনে মনে বলি—বড়োমামা লোড শেডিং বুদ্ধিসেবা হয়তো। এরকম একটা ঘর স্বপ্নের মধ্যে পাওয়া যায়। হেমিংওয়ে, টমাস মান শেকসপীয়ার ফ্রস্ট থেকে শুরু করে বঙ্কিম, মানিক, বিভূতি পর্যন্ত। সাজানো। আর পাশের ছোট ছোট সাইড টেবিলে আলগোছে পাতা রয়েছে বুনো জানোয়ারের চামড়া।

'বাড়ি-ঘর'-এ আমি যা বলতে চেয়েছি তা হল একটা প্রতীক। অর্থাৎ লাইফ ইজ লাইক এ রিলে রেস। একজন মশাল নিয়ে ছুটে তুলে দেবে আরেক বন্ধুর হাতে। কোনো জীবনই থেমে যেতে পারে না। থেমে থাকে নতুন প্রস্তুতি নিয়ে চলার জন্যে। আসলে কি জানো? নর-নারী সম্পর্ক বড় জটিল। আমি দেখেছি স্ত্রীর মেয়েদের মতটা বুঝি তত বুঝি না ছেলেদের। তাকে খুঁজতে খুঁজতে এক জীবনও শেষ করা যায় না। আমি এই যে ঘুরে এলুম। দেখলুম—শেষ পর্যন্ত মানুষের গন্তব্য হল প্রকৃতি। প্রকৃতি বাদ দিয়ে চলার আমাদের উপায় নেই। মানুষ যদি মানুষ থাকে প্রকৃতির মধ্যে তাকে আবার ফিরে আসতে হবেই।

আমার উপন্যাস লেখার ব্যাপারটা কি জানো? ঠিক একজন শিল্পী যেমন করে ছবি আঁকে। কোনো নোটবই, কোনো নাম নিয়ে আগে থেকে লেখায় প্রস্তুতি থাকে না। একজন শিল্পী তার ফাঁকা ইজেলের সামনে দাঁড়িয়ে একের পর এক তুলির পোঁচ দেয়। সে জানে না তারপর তারপর কি। যাঁরা ছক কষে লেখেন আমার মনে হয় তাঁরা সেই আনন্দ থেকে বঞ্চিত।

সে আনন্দ পাওয়া যায় কবিতায়। এবং সাহিত্যকে আমি মনে করি গোলাপ জল। আর কবিতা হল আতর। ছুইয়ে দিলে তার সৌরভ দুদণ্ডে সঞ্চারিত হয়। তাই কবিতা লিখি, হয়তো আরো লিখবো। তাই মনে হয়—এই শান্ত দুপুরে/সুখের অবরোধে। থাকবে কি আর থাকবে চিরদিন/এই সবুজ পাতায় আলাবরণী রোদ/নাচবে কি আর নাচবে চিরদিন?

মন-প্রাণে মূলত রোমান্টিক প্রেমিক বলেই ভালবেসেছেন জীবনকে প্রকৃতিকে। আর যত্নের মধ্যে বইয়ে দিয়েছেন সাহিত্যের ঝর্ণা। মহীরুহ তাই এরকম ডালপালা ছড়িয়ে দিচ্ছে আকাশে।

—শান্তিলতা বসুমেধী

বিদেশের কথা

পর্তুগীজ উপনিবেশে গৃহযুদ্ধ

পর্তুগীজ সরকার যেখানে আপন কেশেই টানছে সেখানে সংকট যত দূরে উপনিবেশগুলিতেও তার কর্তৃত্বের কাল যে আলগা হবে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। পর্তুগালের ভিতরে যে কমতার লড়াই চলছে তার প্রতিফলন উপনিবেশগুলিতে হচ্ছে। আঙ্গোলাতে যে গৃহযুদ্ধ চলছে বাইরে থেকে দেখতে গেলে সেই গৃহযুদ্ধের লড়াকুরা অবশ্যই স্থানীয় রাজনৈতিক দল, কিন্তু তলায় তলায় তারা পর্তুগীজ শাসক গোষ্ঠীর কোন না কোন অংশের সাহায্য বা প্রশ্রয় পাচ্ছে এমন সন্দেহ করার কারণ আছে।

প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে ছোট্ট দ্বীপ টিমরে আঙ্গোলার ঐ ইতিহাসেরই যেন পুনরাবৃত্তি ঘটছে। আঙ্গোলার মতো সেখান থেকেও গৃহযুদ্ধের খবর আসছে।

ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ায় পর্তুগাল যখন ইউরোপের প্রথম সাম্রাজ্যবাদী দেশ হিসাবে সারা পৃথিবীতে তাদের উপনিবেশ বিস্তার করতে বেরিয়েছিল সেই সময়ে দুনিয়ার অন্যান্য অনেক অংশের মতো টিমরও সে আংশিক করে নেয়। অস্ট্রেলিয়ার উত্তর-পশ্চিম ও ইন্দোনেশিয়ার দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত এই দ্বীপ ১৫৮৬ সাল থেকেই লিসবনের শাসনাধীনে এসেছে। সাতশ বছরের বিরাট ভাগে, পর্তুগালকে অবশ্য এই দ্বীপের পশ্চিম দিক অর্ধাংশের বেশি ওলন্দাজদের হাতে ছেড়ে দিতে হয়েছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ওলন্দাজরা যখন এশিয়া থেকে তাদের সাম্রাজ্য গুটিয়ে চলে যেতে বাধ্য হল তখন পশ্চিম টিমর স্বাধীন ইন্দোনেশিয়ার অন্তর্ভুক্ত হল। কিন্তু পূর্ব টিমর পর্তুগালের হাতেই থেকে গেল, যদিও চীনের মূল ভূখণ্ডে অবস্থিত হাকাও এখনও পর্তুগীজ উপনিবেশ হিসাবেই রয়ে গেছে।

পূর্ব টিমরের আয়তন প্রায় ১৫ হাজার বর্গ কিলোমিটার অর্থাৎ আমাদের আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের দ্বিগুণের ও শ্রীলঙ্কার প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ। এর জনসংখ্যা ছয় লাখের কিছু বেশি। হাজার দশেক চীনা অধিবাসী এখানকার অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করে। চীনাদের পরেই দ্বীপের বাসিন্দাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল পর্তুগীজ বসতকারীরা ও পর্তুগীজ রক্তসংকরীরা। দ্বীপের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য হচ্ছে কফি ও চন্দন কাঠ।

পূর্ব টিমরের প্রধান তিনটি রাজনৈতিক দলের নাম হল ডেমোক্রাটিক ইউনিয়ন অব টিমর (ইউ ডি টি) রেভল্যুশনারি ফ্রন্ট ফর ইন্ডিপেন্ডেন্ট টিমর ইস্ট (ফ্রেটেলিনা) ও পপুলার ডেমোক্রাটিক অ্যাসোসিয়েশন অব টিমর (আপোডেটি)। ইউ ডি টি দক্ষিণ-পন্থী দল, এই দলের পিছনে স্থানীয় পর্তুগীজ বসতিকারী ও ইউরেশিয়ানরা আছে বলে শোনা যায়। ফ্রেটেলিনা বামপন্থী দল। আর আপোডেটির লক্ষ্য হল ইন্দোনেশিয়ার অংশ হিসাবে পশ্চিম টিমরের সঙ্গে পূর্ব টিমরের সংযুক্তি।

পর্তুগালের নতুন শাসকরা আফ্রিকা থেকে উপনিবেশ গুটিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে তৎপরতা দেখালেও পূর্ব টিমর ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে সে রকম কোন তৎপরতা দেখায় নি। (মাকাও সম্পর্কেও পর্তুগাল ও চীন চুপচাপ রয়েছে।) গত জুন মাসে স্থানীয় রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে এক বৈঠকে স্থির হয় যে, ১৯৭৮ সালের অক্টোবরে পূর্ব টিমরকে স্বাধীনতা দেওয়া হবে এবং তার প্রস্তুতি হিসাবে সেখানে একটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করা হবে।

হঠাৎ খবর এলো যে, ইউ ডি টি-র সমর্থকরা একটি থানায় হানা দিয়ে অস্ত্রশস্ত্র লুঠপাট করেছে এবং সেই অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্যে তার পূর্ব টিমরের রাজধানী দিলি-তে বিমানবন্দর ও বেতারকেন্দ্র সহ গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি ঘাঁটি দখল করে নিয়েছে। তাদের দাবি, অবিলম্বে স্বাধীনতা চাই। তাদের আর একটি দাবি, বামপন্থী ফ্রেটেলিনা দলের নেতাদের গ্রেপ্তার করতে হবে। পর্তুগীজ শাসকরা ঐ দুই দাবিই অগ্রাহ্য করেছেন। ইউ ডি টি ঐ দ্বীপের স্থানীয় পর্তুগীজ সরকারকে উৎখাত করে দিয়েছে, এই সংবাদও লিসবন সরকার অস্বীকার করেছেন।

পূর্ব টিমরের স্বাধীনতার জন্য ইউ ডি টি দলের যে তর সইছে না তার কারণ অবশ্য এই নয় যে, অন্যান্যদের তুলনায় তারা বেশি জাতীয়তাবাদী অথবা বেশি স্বাধীনতাপ্রেমী। আসলে যে ব্যাপারটা নিয়ে তারা বেশি ব্যস্ত তা হল, ক্ষমতা হস্তান্তরিত হলে সেই ক্ষমতা যেন বামপন্থী ফ্রেটেলিনা দলের হাতে না যায়। দক্ষিণপন্থীদের সন্দেহ, অস্থায়ী সরকার গঠনের নাম করে পর্তুগালের বাম-ঘেঁষা প্রধানমন্ত্রী গনসালভেসের সরকার এবং টিমর দ্বীপে ফ্রেটেলিনার ক্ষমতায় আসার পথ তৈরি করে দিতে চাইছেন। এটা ঠেকাবার জন্যই তাড়াহুড়ো ইউ ডি টি পথে নেমে পড়েছে। ইউ ডি টি-র সমর্থকরা বুঝেছেন যে, পর্তুগাল প্রধানমন্ত্রী গনসালভেসের অবস্থা যখন সঙ্গীন ও সেখানকার ফৌজী অফিসাররা যখন বিভক্ত হয়ে পড়েছেন তখনই আঘাত হানার উপযুক্ত সময়। লিসবন প্রেসিডেন্টের দপ্তর থেকে ঘোষণা করা হয়েছে, টিমরে প্রায় প্রতিটি সৈনিকই কোন না কোন গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছে এবং তার ফলে অবস্থা আয়ত্তে আনা কঠিন হচ্ছে।

টিমরের এই গৃহযুদ্ধের সঙ্গে আরও একটি দেশের স্বার্থ ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে আছে। সেটা হল ইন্দোনেশিয়া। পূর্ব টিমরে যাই ঘটুক পশ্চিম টিমরে তার প্রভাব পড়বে। সুতরাং, খুব স্বাভাবিক কারণেই সে পূর্ব টিমরের পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছে। সেখানকার পরিস্থিতি সে একটি স্পেশ্যাল রাপ্তরেও পাঠিয়েছে।

আপোডেটি নামে টিমরের যে রাজনৈতিক দলটি ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে যুক্ত সংবর্ষের চাইছে তারা জাকার্তার প্রস্তাব কতখানি পাচ্ছে তা বোঝা যাচ্ছে না। প্রথম দিকে ইন্দোনেশিয়া বলেছিল, পর্তুগীজ টিমরের উপর তার লোভ নেই। কিন্তু ইদানীং টিমরে আপোডেটির সঙ্গে অন্য দলের সমর্থকদের সংঘর্ষের সংবাদ যেভাবে ইন্দোনেশিয়ার সূত্র থেকে ফলাও করে প্রচার করা হচ্ছে তাতে মনে হয়, জাকার্তা এখন এই গৃহযুদ্ধে নিতান্ত নিরাসক্ত দর্শকমাত্র নয়।

পত্রিকাক

অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের
জন্মশতবার্ষিকীতে আমাদের সশ্রদ্ধ অর্ঘ্য
প্রখ্যাত জীবনীকার অমিত্রাক্ষর বাসচী প্রণীত

শরৎচন্দ্র

১৮

অজানা বহু মূল্যবান তথ্যে সমৃদ্ধ ও অনন্যসাধারণ ভাষায় এই গ্রন্থে আছে শরৎ জীবন ও শরৎ সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ কাহিনী ও বস্তুনিষ্ঠ বিচার বিশ্লেষণ।

মোহন লাইব্রেরী ৩৬এ, সূর্য সেন স্ট্রীট, কলিকাতা—৯
ফোন : ৩৫০৬৩৩

ফাদার দ্যতিয়েন রোজনামচা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

শ্যামল একটু হাসল, তারপর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলল, 'জান কল্পনা, রাজবংশীয় না হলেও আমি রাজদ্রোহী নই। তোমার আত্মীয়স্বজনেরা আমাকে যখন যতটুকু ভালোবাসা দেবে, সেই ভালোবাসা আমি সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করব...সময় লাগবে জানি; আমরা শুধু দেখব, আমাদের দিক থেকে অনাবশ্যক বাধার যাতে সৃষ্টি না হয়। ওদেরই দৃষ্টি ভঙ্গি থেকে ব্যাপারটা দেখে আমরা ওদের দুঃখের মর্মান্তিকতা বুঝতে চেষ্টা করব...' তারপর একটু থেমে সে বলল, 'আমারও বাড়ির লোকেরা এই বিয়েতে যে সানন্দে মত দেবে, তা না-ও হতে পারে...আমার কথা রাখ : বাড়ির জামা-কাপড় ফেলে দিও না।'

শ্যামলের এই অনপেক্ষিত উদারতা দেখে কল্পনা আশ্চর্য ও আনন্দিত হয়ে উঠল। বাবা মাকে—বিশেষভাবে সেই নিরীহ, অকর্মণ্য, স্বপ্নালু বাবাকে—সে আসলে অত্যন্ত ভালোবাসে। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে সে বলল, 'ঠিকই বলেছ, শ্যামল...ওরা ছাড়তে চায়, ছাড়ুক, আমরা কিন্তু সম্পর্ক ছাড়ব না। কাপড়-চোপড় আমি নেব; তবে বলেছি যখন, ফটিক ওর মায়ের জন্য সাড়িটা নিয়ে যাক।'

সবুজ পেড়ে সাড়ি পরিহিতা দীর্ঘতনু কৃশাঙ্গী শুভ্রবদনা কল্পনার নিরুদ্দেশ যাত্রার সংবাদ পেয়ে কুশাপুরের পুলিশ যখন জীপ-এ করে শ্যামলের কোয়ার্টার্সে এল, শঙ্করনা ভদ্রভাবে জানাল : এক, কল্পনা বলুন, মেপি বলুন, মেটু বলুন, এখানে কোনো মেয়ে নেই; দুই, ওয়ারেন্ট না দেখালে পুলিশকে সার্চ করতে দেওয়া হবে না।'

ফটিককে দেওয়া সবুজ-পেড়ে সাড়িটা হাতে ঝুলতে দেখে পুলিশ বুঝল—ভুল বুঝল—মেয়েটি ওখানে এখনও আছে; উপরিওয়ালার আদেশ মতো তারা নন্দকিশোর রাজাকে খবরটা জানাল। ওদের হাতে মেয়ে ধরার কোনো কুওয়ারেন্ট না থাকায় তারা ফিরে গেল।

ঘটনার আকস্মিকতায় নন্দকিশোর রাজা প্রথমে কিছুক্ষণ কোনো কথা বলতে পারলেন না। তারপর ধীরে ধীরে তাঁর মুখ রক্তিম হয়ে উঠল। ক্রোধ সংবরণ করে তিনি ধীরে ধীরে বললেন, 'ওকে ফিরে আসতে বল।'

ফটিক ফিরে এসে জানাল, 'মেয়েটি বলছে, সে ফিরে আসবে না।'

নন্দকিশোর রাজা এবার ক্রোধ সংবরণ করতে পারলেন না। চিৎকার করে বললেন, 'ওকে বল, ওর বাবা-মা ওকে ত্যাগ করেছে, আমি ওকে ত্যাগ করিনি। ওকে ফিরে আসতে বল।'

ফটিক ফিরে এসে জানাল, 'মেয়েটি বলছে, সে ফিরে আসবে না।'

নন্দকিশোর রাজা তাঁর কোনো রাজকীয় রূপেই কল্পনাও করতে পারেন নি, যে, ছেলেটি আসবে। তাই বরওয়ান যখন জানাল, 'একজন ভদ্রলোক এসেছে—শ্যামল সেনগুপ্ত...' সারা বাড়িটা গমগমে হয়ে পড়ল। মর্মর প্রস্তরের গোল টেবিলের উপর পা তুলে নন্দকিশোর রাজা আলবোলার ধোঁয়ার মধ্যে বসে আগন্তুকের আগমনের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

'নমস্কার। আপনি আমাকে ডেকেছেন?'

'না।'

'তাহলে নমস্কার...' বলে শ্যামল প্রস্থানে উদ্যত হল।

কল্পনার মা মাটিতে বসে ছিলেন; এই দুদিনের মধ্যে তিনি বড় রোগা হয়ে পড়েছেন। শ্যামলকে তিনি শান্ত-ক্লান্ত স্বরে সম্বোধন করে বললেন, 'আমিই আপনাকে ডেকেছি, শ্যামলবাবু; বসুন।' শ্যামল যেই বসতে যাচ্ছে, নন্দকিশোর রাজা বললেন, 'জানেন, কল্পনা কোন্ বাড়ির মেয়ে?'

দেখুন : জানাজানির জন্য আমি আসি নি, এসেছি শুধু, ব্যাপারটা যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয়...'

উচ্চারণ না করে অবনীপতিসুলভ ভঙ্গিতে বললেন, 'উহুঁক!'

ইতিমধ্যে ঘটেছে কি? শ্যামল কল্পনাকে টালিগঞ্জ নিবাসী মেসোর বাড়িতে মেয়েটিকে পৌঁছিয়ে দিয়েছে; মেসোমশায় ও'র রাজকীয় শ্যালীপতিকে জানিয়েছেন, 'তোমার মেয়ে আমার ঘরে এসে আশ্রয় নিয়েছে, ছেলেটিও আপাতত আছে; মেয়েটি বাড়ি যেতে চাচ্ছে না।' নন্দকিশোর রাজা ধরণীপালোচিত আদেশ দিলেন : 'বাঁদরটাকে একবার দেখা করতে বল।' কল্পনার খুব ইচ্ছা ছিল না, শ্যামল ওর বাবার সম্মুখীন হয়। বাঁদরটা কিন্তু বিশ্বরাজীপুত্রের সংগে সাক্ষাৎ করার সুযোগ ছাড়ার পাত্র নয়।

নন্দকিশোর রাজা তাঁর কোনো রাজকীয় রূপেই কল্পনাও করতে পারেন নি, যে, ছেলেটি আসবে। তাই বরওয়ান যখন জানাল, 'একজন ভদ্রলোক এসেছে—শ্যামল সেনগুপ্ত...' সারা বাড়িটা গমগমে হয়ে পড়ল। মর্মর প্রস্তরের গোল টেবিলের উপর পা তুলে নন্দকিশোর রাজা আলবোলার ধোঁয়ার মধ্যে বসে আগন্তুকের আগমনের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

'নমস্কার। আপনি আমাকে ডেকেছেন?'

'না।'

'তাহলে নমস্কার...' বলে শ্যামল প্রস্থানে উদ্যত হল।

কল্পনার মা মাটিতে বসে ছিলেন; এই দুদিনের মধ্যে তিনি বড় রোগা হয়ে পড়েছেন। শ্যামলকে তিনি শান্ত-ক্লান্ত স্বরে সম্বোধন করে বললেন, 'আমিই আপনাকে ডেকেছি, শ্যামলবাবু; বসুন।' শ্যামল যেই বসতে যাচ্ছে, নন্দকিশোর রাজা বললেন, 'জানেন, কল্পনা কোন্ বাড়ির মেয়ে?'

দেখুন : জানাজানির জন্য আমি আসি নি, এসেছি শুধু, ব্যাপারটা যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয়...'

বলা বাহুল্য, ব্যাপারটা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হবার ভদ্রলোকের বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই। হিসাব-বায়ে গাত্রোত্থান করে তিনি তাঁর রাজকীয় উপস্থিতি থেকে বঞ্চিত করলেন।

অমলাদেবী বললেন, 'আমার মেয়েকে ছাড়ুন।'

'আমি ওকে ছাড়ব আপনার কি লাভ? আর এদিকে দেখুন, আমার মেয়ের বিয়ে হলে শুধু এক নয়, দুই নয় তিনটি প্রাণীর জীবন দুর্বিষহ করে তুলবেন।'

'তিনটি প্রাণীর?...মানে, তোমরা...'

'আপনি কি ভাবছেন? আমরা রাজবংশীয় নই বলে ভদ্রতা জানি না? তিনজনের কথা বলছিলাম : কল্পনার, আমার—আর যে-ছেলেটিকে ও বিয়ে করতে বাধ্য করবেন, তারও।'

কল্পনার বয়স অল্প, তোমারও বয়স বেশি নয়...তোমরা কি নিজেদের মনকে সঠিকভাবে বুঝতে পেরেছ? আমি বলি কিনিস আছে, কথা দাও, এই ছয়মাস তুমি ওর সংগে কথা বলতে চেষ্টা করবে না।'

ঐ ধরনের প্রস্তাবের জন্য শ্যামল অপ্রস্তুত ছিল না, বলল, 'ছ মাস কেন? এক বছর বলুন। একটা সর্ত কিন্তু আছে : এক বছর পরে সে নিজেই আমাকে এসে বলবে, 'আমি তোমাকে চাই না' তা যদি না বলে, আপনারা তাহলে কিন্তু আমাদের বিয়েতে মত দেবেন।'

'তা তো ও বলবে না...'

'আর আপনারাও মত দেবেন না, আজই তর্কের আর কি প্রয়োজন?'

দেওয়াল-ঘড়িতে চারটে বাজল। অমলা-দেবী বললেন, 'আজকে তাহলে থাক, আর একদিন কথা হবে, মেয়েরা স্কুল থেকে আসবে এখন...তোমরা দেখা যেন না পায়।'

এদিকে নন্দকিশোর রাজা ও'র টালিগঞ্জ-নিবাসী ডাক্তার ভাইয়ের বাড়িতে গিয়ে মেয়ের কাছে কান্নাকাটি করলেন : তুই

ছুঁড়িস না, আমরা তোর খারাপ চাই না... আমার সঙ্গে চল্, বাড়ি ফিরে আয়...'

গেলে মা আবার মারধোর করতে শুরু করবে।'

তোকে কথা দিলাম, আমি যতদিন আছি, আমার বাড়িতে কেউই কোনো দিনই তোর গায়ে আর হাত দেবে না।'

কল্পনাকে স্কুলে আর পাঠানো হল না, কোথাও ওকে আর বেরুতে দেওয়া হল না। এক সর্বনাশদের রাজকুমারের সঙ্গে বাবা-মা ওর সম্বন্ধে ঠিক করলেন। একদিন কল্পনার এক মাসতুতো ভাইয়ের বিয়েতে উক্ত রাজনন্দনের সঙ্গে মেয়েটির দেখা হয়। রাজকুমার নিজে থেকে আলাপ জমাতে চেষ্টা করল, জিগ্যেস করল, তুমি কিছু শোননি? আমাদের বিয়ে?'

'এ-রকম অনেকবার শুনেছি।'

'আপত্তি আছে?'

'অপছন্দের কিছু নয়।'

'তাহলে?'

'অন্য কারণ আছে।'

'হ্যাঁ, শুনেছি, পাড়ার একটি ছেলের সঙ্গে তুমি নাকি কিছুদিন প্রেম করেছিলে, তাতে হয় কি? আধুনিক যুগের ছেলে-মেয়েরা তো ও-রকম করেই থাকে, কিন্তু প্রেম করা আর বিয়ে করা তো এক নয়; জাত, সমাজ, অবস্থা, সব দিক থেকে বিবেচনা করা দরকার।'

'আমি যে ছোটবেলা থেকেই ওকে ভালোবাসি, আমাদের রেজিস্ট্রি বিয়ে হয়েছে!'

'মিথ্যে কথা!'

একটু হেসে কল্পনা বলল, 'বিয়েটাটা মিথ্যে বটে, তবে প্রথমটা সত্য, ঘোর সত্য।'

ডঃ নীহারলাল বসু এম.বি.বি.এস
ডঃ এস. এন. পাণ্ডে এম.বি.বি.এস
যৌবনের রহস্য
প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য • মূল্য ৬৲
যৌনবিজ্ঞানের রঙীন ও বহুচিত্রে চিত্রিত অতি আধুনিক সংস্করণ।
মোহন লাইব্রেরী ৩৫এ স্ট্রাণ্ড রোড কলিকাতা-১
অগ্রিম ৬৲ টাকা পাঠাইলে ডাকমাশুল ফ্রি

রাজকুমার এরপর কল্পনাদের বাড়িতে কত যে অছিলা করে এসেছিলেন, তার ঠিকানা নেই। শেষ পর্যন্ত নিরাশ হয়ে সরে পড়লেন।

তখন ঘটল কল্পনার জীবনমঞ্চে অসীমের প্রবেশ। অসীম কল্পনার সেই পিসতুতো দাদা রঞ্জনের আরেক বন্ধু। না, আজকাল সেই সৌমিত্রের আর পাত্তা নেই; নায়েদের বড় ইচ্ছা সত্ত্বেও ওর সঙ্গে নন্দ-কিশোর রাজা চৈতালির বিয়ে দিতে রাজি হননি; সৌমিত্র যে—ছি-ছি! কল্পনার পিসির জমিদারির দেওয়ানের ছেলে। চৈতালি স্বভাবে ভীতু। এ-যাত্রায়ও সংসাহস দেখাতে পারল না, সৌমিত্রকে সে জলাঞ্জলি দিল পিতৃদেবের আত্মাভিমানের শ্রীচরণে।

এদিকে কল্পনার মা-বাবার মতে অসীম ছেলেটি কল্পনার ঐ অবস্থাতে রাজকুমারের এক অনুমোদনযোগ্য বিকল্প। তাঁদের প্রস্তাবনায় রাজার সঙ্গে অসীমের হঠাৎ ঘনিষ্ঠতা বাড়তে লাগল। ফলে কৌশলে তাঁরা কল্পনাকে ছেলেটির সঙ্গে মেলামেশা করাতে চেষ্টা করলেন; মতলব এই: প্রেমে মেয়েটা যদি পড়তেই হয়, সুযোগ্য পাত্রের সঙ্গে পড়ুক।

একদিন অসীম এসে দেখে, মাথায় এক পাগড়ি বেঁধে কল্পনা ঝুল ঝাড়ছে। 'দাদা নেই' বলে কাজ করে চলল সে।

'তাতে কি? তোমারই সঙ্গে আমার দরকার—'

এতদিন শ্যামলের সঙ্গে সর্বপ্রকার যোগাযোগ বন্ধ; চিঠি পায় না কল্পনা, দিতেও পারে না, চারিদিকে সুতীক্ষ্ণ পাহারা, কাউকে বিশ্বাস করা যায় না, না, আদর-যত্নের অভাব নেই, আদর-যত্ন কিন্তু সংকল্পপ্রণোদিত—কল্পনা যাতে শ্যামলের কথা ভুলে যায়। অসীমের মধ্যে সে যেন—অবশেষে এক নিঃস্বার্থ বন্ধু কিংবা দাদা পেয়েছে। কিন্তু হায়, অসীম আবার ভুল বুঝতে গেল কেন? ছেলের জাত এক অদ্ভুত জাত বটে; কোনো মেয়ের সঙ্গে যেই একটু ভাব হল, বয়স বিয়ের কথা সে ভাবতে শুরু করবে, ওর বাগদত্তকে সরাতে চেষ্টা করবে। অসীমকে অবস্থাটা বোঝাতে গিয়ে কল্পনাকে অনেক বেগ পেতে হল। অসীম একান্ত মর্মাহত হয়ে পড়ল, আর ওকে সে দোষ দিচ্ছে ভেবে কল্পনাও দুঃখ পেল কম নয়। হ্যাঁ, ভুল কিনে নিয়ে আসার ব্যাপারে ওরই সঙ্গে দেখা হলে, ওরই সঙ্গে বোধহয় মেয়েটি প্রেমে পড়ত।

নন্দকিশোর রাজা একদিন স্থির করলেন, ওপরের অর্ধচুম্বিত পাড়াটা শ্যামলের অদৃশ্য উপস্থিতিতে দূষিত। তিনি তাই সপরিবারে টালিগঞ্জে—কল্পনাকে সেই মেসোর বাড়ির পার্শ্ববর্তী এক বাড়িতে—বসবাস করতে শুরু করালেন। নন্দকিশোর রাজা ভাবলেন, বন্দিনী কল্পনার ঠিকানা জেনে নেওয়ার শ্যামলের যো নেই। শ্যামলের কিন্তু নতুন পাড়ায় রজত নামে এক বন্ধু ছিল। রজতের বোন শিবানী কল্পনার সঙ্গে ভাব করতে এসে বলল, 'ভয় নেই, আমি দূতী! কিন্তু ১৫ই আগস্ট দুটোর সময় শ্যামলদা আসবে, ঐ যে বাড়িটি উঠছে ওখানে, ওর ওপরে এসে দাঁড়াবে, বাড়ির ছাদে উঠতে তো মানা নেই তোমার?'

প্রণয়ীকে দেখতে পেয়ে নিজেকে সংবরণ করতে না পেরে কল্পনা লাফ দিল, পড়ে গেল পচা পানার মধ্যে, ভিজে গেল কাদা-মাখা হাঁটু পর্যন্ত। ওর চেহারা দেখে একটু হেসে শ্যামল বলল, 'দেখতে বলছিলাম, দেখা করতে তো বলিনি। এবার কি করব, বল তো?'

'এবার স্বাধীনতা দিবস স্বাধীনভাবে কাটাব!'

রজতের বাবা একজন উকিল। তিনি বললেন, মেয়েটির বয়স যখন সঠিক জানা যায় না, তোমাদের কর্তব্য হল থানায় খবর দেওয়া।'

থানার অফিসার বললেন, 'মেয়েটিকে নিয়ে আসুন ওর বাবাকেও ডাকা যাক! মেয়েটি বাড়ি ফিরতে রাজি না হলে এখানেই রাত কাটাবে।'

নন্দকিশোর রাজার অনুরোধ উপরোধ সত্ত্বেও কল্পনা বাড়ি ফিরতে চায় না, শুধু বলে, 'মা আমাকে মেরে ফেলবে!' শেষ পর্যন্ত অসীম অশ্ব ছুঁড়ে বাবা বললেন, 'ও-সির মুখচোখ দেখেছিস? ওর কাছে এখানে থাকিস না, লোকটা সুবিধের নয়।'

কল্পনাকে রিকশায় তুলে নন্দকিশোর রাজা রজতের বাবাকে বললেন, 'এই ঘটনার পর মেয়েটিকে আমি বাড়িতে আর বেশি দিন রাখতে পারব না। আপনারা দেখবেন, এক সপ্তাহের মধ্যে যাতে বন্দোবস্ত করা হয়।'

২১শে আগস্ট, রজতদের বাড়িতেই অশাস্ত্রের যাবতীয় বিধিব্যবস্থা তথা পশ্চিমবঙ্গের অভিভি নিয়ন্ত্রণের ভাবং নিষেধ মান্য করে শ্যামল ও কল্পনার শুভ পরিণয় শুভক্ষণে সম্পন্ন হয়। রজতের বাবা সম্প্রদান করেন। শ্যামলের দাদারা আসেন, শ্যামলের বাবা-মা গয়না-কাপড় পাঠান।

বৃহত্তম বস্ত্র বিপণি • বেনারসী • ঢোকাড় • সিল্ক • উঁত • নিলবস্ত্র • ছিট্ কাপড় • গেঞ্জি • বেড্ কভার • শাল • আলোয়ান • মেয়েটার
হাওড়া স্টোর্স
৬৷৩, জি, টি, রোড (সাউথ) হাওড়া
ফোন: ৬৭-২৮৭০

CENTRAL LIBRARY

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

: আনোয়ার একস' নামটা জানি কোথায় শুনেছি? ব্রিটিশ ইনটেলিজেন্স অফিসার তার মনের বিস্ময় প্রকাশ করল।

: আনোয়ার একস ইন্ডিপেন্ডেন্ট আর্মির একজন লেফটেনান্ট। জেনারেল আতাউল গণি ওসমানী ঘনিষ্ঠ বন্ধু। হিকমত ফাহাদী জবাব দিল। ব্রিটিশ ইনটেলিজেন্স অফিসার এবার বুঝতে পারল যে এই গভীর রাতে কিসানে আনোয়ার একস কি উদ্দেশ্য নিয়ে এই হুইস বোটে এসেছেন।

না, মদ গিলবার উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি আসেন নি। রাণা বাজারে সবাই জানতো যে আনোয়ার একস মদ খান না। আনোয়ার একস এসেছেন রেডিও মারফত রণাঙ্গনে খবর পাঠাবার জন্যে।

ব্রিটিশ ইনটেলিজেন্স অফিসার তার মনের সন্দেহের কথা ভাষায় এবং ভাবে প্রকাশ করল না। আবার আসর জমিয়ে তুলল।

আনোয়ার একস হঠাৎ হিকমত ফাহাদীকে জিজ্ঞেস করলেন, হাবিবী, রেডিও খুলে দাও। একটু গান শুনি।

হিকমত আপত্তি করল না, আনোয়ার অনেকদিন বাদ আজকের পরিশ্রম আসর জমে উঠেছে। আজ আর রেডিও শুনতে ইচ্ছে করছে না।

: শুধু তাই নয়। রেডিওটা ভালো করে ট্যুনও করছে না। হুসেন পরের হিকমত ফাহাদীর কথার সাথে একটা লেজ জুড়ে দিল।

: তাই না-কি? দেখি রেডিওটা। বলে জনা দুয়েক খেতে খেতে আনোয়ার একস একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ব্রিটিশ ইনটেলি-

CENTRAL LIBRARY

কেনস অফিসারের দিকে তাকালেন। তাঁর চোখের চাউনি দেখে ব্রিটিশ ইনটেলীজেনস অফিসার বুঝতে পারলেন যে আনোয়ার একজন লোককে সন্দেহ করছেন।

অতি বিশ্বস্ত। আনোয়ার একজন, তিনি সহজে তাকে বিশ্বাস করতে চান না। তিনি বুঝতে পেরেছেন যে হুসেন পাশার এবং সার্জেন্ট হুসেন কতটুকে ফাঁকি দিচ্ছে। তারা শুধু সুন্দরী বেদুঈন মেয়ে ফাহামীকে নিয়ে জীবন উপভোগ করতে চায়। গুপ্তচর কাজ করবার কোন উদ্দেশ্যই তাদের নেই।

একটু বাদে আনোয়ার একজন অফিসার থেকে বেরিয়ে এলেন।

: না, তবুও পরীক্ষা করে দেখলুম। চমৎকার, ভালোই কাজ করছে। আনোয়ার একজন সার্জেন্ট আবার মন্তব্য করলেন।

: আনোয়ার, তুমি বড্ড সেন্টিমেন্টাল, কেন আমাদের সময় নষ্ট করছো। একটু ধমকের সুরে হিকমত ফাহমী বলল : বসো।

: না, আমার বসবার সময় নেই। আমার একটু কাজ আছে।

আনোয়ার একজন সৈনিকের স্যালুটের জবাবে স্যালুট দিলেন না। চলে গেলেন।

স্যালুটের ভঙ্গি যখন ভাললো তখন জেরা প্রায় পাঁচটা।

ব্রিটিশ কাউন্টার ইনটেলীজেনস বিভাগ এবার পরেক্ষা করতে লাগল যে, কখন হুসেন পাশার সার্জেন্ট হিকমত ফাহামীকে গ্রেপ্তার করা হয়। আর আনোয়ার একজন? তাকে ধরা সহজ কাজ নয়। কারণ ব্রিটিশ কাউন্টার ইনটেলীজেনস বিভাগ জানত যে আনোয়ার একজন ঘোরতর ইংরেজ বিদ্বেষী এবং সাবধানী মানুষ। তাকে ধরা অতি কঠিন ব্যাপার।

ইতিমধ্যে হুসেন পাশার হিকমত ফাহামীর সঙ্গে ব্রিটিশ ইনটেলীজেনস অফিসারের বন্ধুত্ব বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলো। হুসেন পাশার প্রতিদিন বেশ মোটা টাকার ব্রিটিশ পাউন্ড তার মারফত বদল করতে লাগল।

কিন্তু কখনই হুসেন এবং তার সহ কর্মীদের ধরবার সুযোগ পাওয়া গেল না। ব্রিটিশ কাউন্টার ইনটেলীজেনস আবার তাদের জাল কিভাবে করতে লাগল। কারণ তারা ঠিক করেছিল যখন হুসেন পাশার বেদুঈন মারফত বন্ধুদের নিকটে খবর পাঠাতে থাকবে তখন পুলিশ হঠাৎ হাউস ঘেরাও করে গ্রেপ্তার করা হবে। কিন্তু কখন এই খবর পাঠানো হয়, তা সঠিক জানা গেল না, কারণ প্রতিরাত্রে তারা খবর পাঠাবার সময় পরিবর্তন করছিল।

একদিন খবর পাঠাবার সঠিক সময় জানা গেল।

পুলিশ একদিন একটি সুন্দরী বেদুঈন জানবাজকে গ্রেপ্তার করলো। মেয়েটির নাম নাটালি। মেয়েটি প্রচুর মদ খেয়ে একজন আর্মি অফিসারের সঙ্গে মাতলামি করছিল। পুলিশ মাতলামি করবার অভিযোগে নাটালিকে গ্রেপ্তার করলো।

প্রথমে জানা গেল নাটালি ফরাসী, কিন্তু পরে জানা গেল যে সে ছিল ইহুদী।

নাটালি বলল : আমি ব্রিটিশ ইনটেলীজেনস অফিসারের সঙ্গে কথা বলবো।

: কেন? পুলিশ তাকে প্রশ্ন করলো।

: কারণ আমার কাছে গোপন খবর আছে। সে খবর আমি তোমাদের দিতে পারব।

এবার নাটালিকে ব্রিটিশ কাউন্টার ইনটেলীজেনস বিভাগের বড় কর্মচারীদের কাছে নিয়ে যাওয়া হোল।

: আমি ইহুদী স্পাই, বেলী জানবাজ নই। ইস্রাইলী সিক্রেট সার্ভিসের জন্য কাজ করছি। নাটালি বিশুদ্ধ ফরাসী ভাষায় কথা বলল।

: মিথ্যে কথা। তুমি রাস্তায় মদ খেয়ে মাতলামি করছিলে। ইনটেলীজেনস বিভাগের কর্তারা তার কথায় কান দিলেন না।

: আমাকে বিশ্বাস করুন। বিশ্বাস না হয় তেলআভিভে ইস্রাইলী গোয়েন্দা বিভাগের কর্তাদের কাছে খবর নিন। ওদের জিজ্ঞেস করুন নাটালি কে?

এবার কাউন্টার ইনটেলীজেনস বিভাগের কর্তারা নাটালির কথাটা একেবারে হেসে উড়িয়ে দিতে পারল না। একটু চিন্তা ভাবনা করে জিজ্ঞেস করল : বেশ, তোমার কাছে কি খবর আছে?

: সার্জেন্টকে চেন?

: সার্জেন্ট? হোসেন পাশারের বন্ধু?

: হ্যাঁ, সার্জেন্ট হোল আমার বয় ফ্রেন্ড। ও আসলে জার্মান স্পাই। প্রতি রাত্রে সার্জেন্ট এবং তার বন্ধুরা মিলে রেডিও মারফত জার্মানীতে খবর পাঠায়।

নাটালির আসার স্পষ্ট জবাব মিলল। তার কথা বলার ভঙ্গী, কণ্ঠস্বর শুনে কারুর বুঝতে অসুবিধে হোল না যে নাটালি সত্যি কথা বলছে।

: তুমি সত্যি কথা বলছো তার প্রমাণ কি? আবার কাউন্টার ইনটেলীজেনস বিভাগের কর্তারা নাটালিকে যাচাই করে দেখবার চেষ্টা করল।

: শোন, সার্জেন্টের সঙ্গে আরো তিনজন লোক আছে। এদের দলের সর্দার হোল একজন ইঞ্জিপশিয়ান। এই ইঞ্জিপশিয়ানের নাম আনোয়ার একসা। আর একটি ইঞ্জিপশিয়ান মেয়ে কাজ করছে। এই মেয়েটির নাম হিকমত ফাহামী।

নাটালি তার কথা শেষ করতে পারলো না। ব্রিটিশ কাউন্টার ইনটেলীজেনসের কর্তারা সঙ্গে সঙ্গে হিসেস করলো : অসম্ভব। হিকমত ফাহামী একজন খাঁটি বেদুঈন জানবাজ, আমাদের সৈনিকরা ওকে খুব ভালোবাসে।

: হ্যাঁ, হিকমত ফাহামী নামকরা সুন্দরী বেদুঈন জানবাজ। ঐটে হোল ওর সবচাইতে বড় সম্পদ। তার দেহ সৌন্দর্যে আজকাল ব্রিটিশ সৈনাবাহিনীর বড় বড় জেনারেলরা মুগ্ধ। তাই ওরা সবাই প্রেমে অন্ধ হয়েছেন। ওরা সবাই মন খুলে হিকমত ফাহামীর কাছে গোপনীয় খবর বলে। আর হিকমত ফাহামী সেই সব খবর তার বন্ধুদের দেয়। এটা আমি হলপ করে কথা বলতে পারি। আমি নিজের চোখে সার্জেন্টকে রেডিও মারফত খবর পাঠাতে দেখেছি। আর খবর পাঠাবার সময় সে একটি ইংরেজী বই ব্যবহার করে।

: ইংরেজী বই? উত্তেজিত হয়ে ব্রিটিশ কাউন্টার ইনটেলীজেনস বিভাগের কর্তারা জিজ্ঞেস করলেন। বইটির নাম দেখেছ?

: হ্যাঁ, বইটির নাম হোল রেবেকা।

ব্রিটিশ কাউন্টার ইনটেলীজেনস বিভাগের কর্তারা নাটালির কথা বিশ্বাস করল! নাটালি আরো খবর দিল যে, প্রতিরাতে খবর পাঠানো হয়। কিন্তু কোনদিনই এক সময়ে খবর পাঠানো হয় না। আজ রাত দুটোর সময় খবর পাঠানো হবে। এ খবর আমি জানি। সার্জেন্ট আমাকে রাত দুটোর সময় হাউস ঘেরাও করতে বলেছে।

ব্রিটিশ কাউন্টার ইনটেলীজেনস বিভাগের কর্তারা এবার নাটালির সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করল যে আর দেরী করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। সেই রাত্রে দুটোর খানিক পরে হাউস ঘেরাও করা দিতে হবে।

রাত দুটো দশ মিনিটের সময় ব্রিটিশ আর্মির কাউন্টার ইনটেলীজেনস বিভাগ এবং কায়রো পুলিশ এসে হুসেন পাশারের হাউস ঘেরাও দিয়ে ধরলো।

পরিষ্কার রাত। খানিকটা চাঁদের আলোও আছে। নির্জন প্রান্তর, শুধুমাত্র নীল নদীর কলের শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না। পুলিসের গাড়ীর শব্দ

বিনা অস্ত্রোপচারে
অর্শের
জ্বালা-যন্ত্রনা
থেকে
দ্রুত আরাম
পেতে হলে
হ্যাডেসা
মলম
ব্যবহার করুন!

শুনে হুসেন গফার আর তার সহকর্মীরা সজাগ হয়ে উঠলো।

ঃ কে? হুসেন গফার বেশ কর্কশ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো। তার এই প্রশ্ন ধ্বনিটা ভয়ের বেল ছিল। সবাই বুঝতে পারলো যে বিপদ ঘনিয়ে এসেছে। পুলিশ তাদের হান্টিস পেয়েছে।

পুলিশ হুসেন গফারের প্রশ্নের কোন জবাব দিল না। জোর করে হাউস কোটের ভেতর ঢুকে পড়ল।

সাণ্ডি রেডিওর সামনে বসেছিল। আর আলেয়ার একসে রেডিওর কাঁটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলেন। পুলিশদেরকে দেখে তাঁরা চমকে উঠলেন। মনে হোল যেন সাপ দেখেছেন। একসে যেন এক মুহূর্তের ভেতর সমস্ত ব্যাপারটা আঁচ করে নিতে পারলেন। তিনি ভয়ে কাঁপতে পড়লেন।

সেদিন পুলিশ হুসেন গফার, সাণ্ডি এবং ইকবাল ফাহমীকে মাত্র সন্দেহ করে ধরল। তাদের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ ছিল না। কিন্তু তার পরের দিন রাত্রে আবার কিছু দেখতে পেল প্রহর প্রান্ত থেকে অর্থাৎ রমজের কিনার থেকে কে বা কারা হুসেন গফার ও সাণ্ডিকে ডাকছে ঃ কনডোর কলিং এপলার। কনডোর কলিং এপলার। তোমরা প্রস্তুত হও। টেকাট ফকস (রমজের নাম) শীগগিরই অসম এল হুসেন তীর আক্রমণ করবেন। প্রস্তুত হও। অসম এল

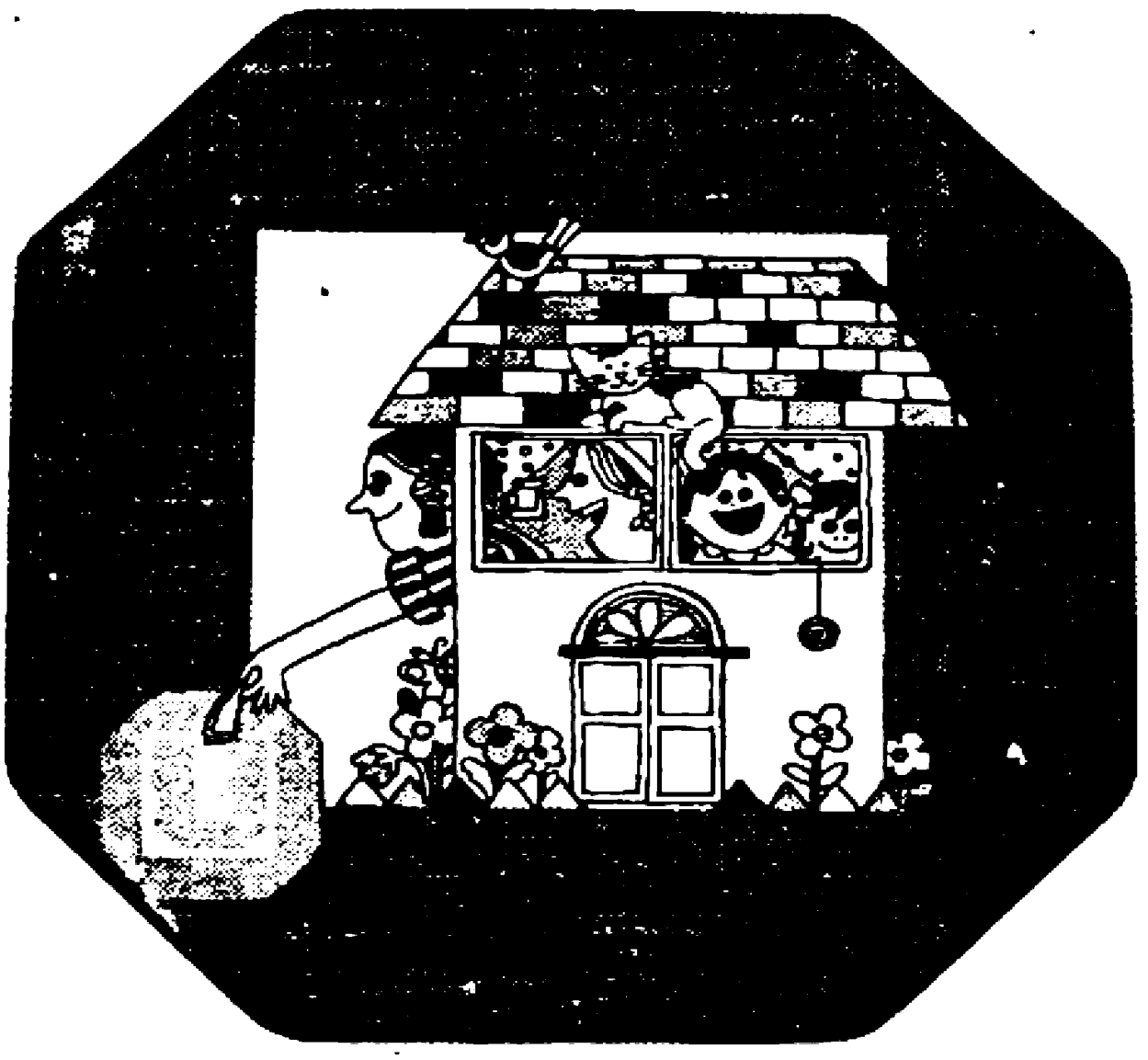

ইউকোব্যাঙ্ক কাছেই আছে,
ইউকোব্যাঙ্কে টাকা জমান

যেখানেই থাকুন কাছাকাছি ইউকোব্যাঙ্কের শাখা নিশ্চয়ই পাবেন। এখানে এলে বুঝতে পারবেন, সঞ্চয় কতো সহজে হতে পারে। সারা দেশ জুড়ে ইউকোব্যাঙ্কের শাখা ছড়ানো, আপনার সঞ্চয় যেখানে বেড়ে ওঠে। ইউকোব্যাঙ্কে আপনার সাদর নিমন্ত্রণ—

বিশদ বিবরণের জন্য যে কোন শাখায় চলে আসুন।

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক

ইউকোব্যাঙ্কের সঞ্চয় পরিকল্পনা ঃ

১. সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট
এই পরিকল্পনায় যত খুশি টাকা রাখুন, সুদ পাবেন বছরে ৫%

২. রিকারিং ডিপোজিট
এই পরিকল্পনায় মাসে সর্বাধিক ১০০০ টাকা জমান, সুদ পাবেন বছরে ৮% থেকে ১০%

৩. ফিক্সড ডিপোজিট
এই পরিকল্পনাতেও আপনি বছরে ১০% পর্যন্ত সুদ পাবেন।

৪. ফিক্সড ডিপোজিটের সুদে রিকারিং ডিপোজিটে সঞ্চয়
এই পরিকল্পনায় ফিক্সড ডিপোজিট থেকে আপনি প্রতি মাসে যে সুদ পাবেন তা সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বদলে রিকারিং ডিপোজিট অ্যাকাউন্টেই জমা পড়বে। ফলে আপনি কার্যকরী সুদ বেশি পাবেন, যেমন ধরুন ৭ বছরে ১৪.৩৫%।

৫. ডিপোজিট সার্টিফিকেট
এই পরিকল্পনায় মাত্র ১০০ টাকাও জমা দিতে পারেন। ১৫ বছরে তা চারগুণ হয়ে ফিরে আসবে।

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

হামলা ব্রীজ পার্লামেন্ট আক্রমণ করা হবে।.....

এই ঘটনার বেশ কিছুদিন পরে পুলিশ আলোয়ার একস-কে গ্রেপ্তার করল।

বিচারে আলোয়ার একস-এর যাবজ্জীবন হোল জেল। শুধু তাই নয়, ইঞ্জিনীয়ারিং আর্মি থেকে তার চাকরীও গেল।

•

বেশ কিছুকালের জন্যে আমি অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম।

আমি যে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছি সেটা স্যাম্পসনের দৃষ্টি এড়াল না।

: কী ভাবছো পালা? স্যাম্পসন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন।

: আলোয়ার একস-এর কথা ভাবছিলুম। লোকটি ইংরেজ বিদ্বেষী।

: আমরা এ-কথা জানি। সে যাক, এই ব্লাডব্রাদারহুডের মধ্যে আমাদের কিছু লোকজন আছে। এর মধ্যে আলী মুহম্মদের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এরা দলের নেতা হাসান বাসরাকে বুঝিয়েছে যে, ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করে কিছু হবে না। বরং দেশের প্রধান এবং বড় শত্রু হোল ফারুক।

ফারুক? আমি বেশ উত্তেজিত হয়ে ফারুকের নাম উচ্চারণ করলুম। মনের বিস্ময়কে চাপতে পারলুম না।

আপনারা ফারুককে সিংহাসন থেকে সরাতে চলেছেন? আমি সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলুম।

: হ্যাঁ, ফারুক ব্রাদারহুডের সৈনাবাহিনীকে এই এলাকা থেকে চলে যেতে বলেছে। না, আমরা এই অঞ্চল থেকে কখনো, কোনদিনও যাবো না। স্যাম্পসন দৃঢ়কণ্ঠে বললেন। একটু থেমে তিনি আবার বললেন, পালা, আমাদের তোমার সাহায্য চাই। তুমি হবে আবেদীন প্যালেসে আমাদের এজেন্ট। কেউ যদি কখনও ফারুকের কাছে মুসলিম ব্রাদারহুডের বিরোধী কোন কথা বলে, তুমি তার প্রতিবাদ করবে। বরং ওকে বোঝাবে যে, মুসলিম ব্রাদারহুড ইংরেজবিরোধী। না, একবার যদি মুসলিম ব্রাদারহুড দেশের ভোটের অধিকারী হয়ে পড়ে, তাহলে আমাদের কোন চিন্তা-ভাবনা করতে হবে না।

আমি বুঝতে পারলুম এই অঞ্চল শুধু আরব-ইস্রাইলী যুদ্ধ নয়, গৃহবিবাদেরও খনিস্থল আসন্ন। আমাকে এর জন্যে প্রস্তুত হতে হবে। তাই আজ অনেক চিন্তা-ভাবনা করে স্যাম্পসনের সঙ্গে যোগাযোগে কাজ করতে রাজী হলুম।

•

হাসান বাসরার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যে স্যাম্পসন একদিন আমাকে মুসলিম ব্রাদারহুডের দপ্তরে নিয়ে গেল। আর এই দপ্তর ছিল মুদ্দিনা আল মৈত অঞ্চলে মোকাত্তম পাহাড়ে।

মুদ্দিনা এল মৈত-এর আর এক নাম হোল ডেড সিটি। এখানে কেউ মারা গেলে তাকে কবর দেয়া হয়। এই মুদ্দিনা এল মৈতের পাশেই হোল মোকাত্তম পাহাড়। নির্জন জায়গা। সাধারণতঃ এখানে লোকজন বড় কেউ আসে না। আমি অবশ্য অনেকবার ফারুকের সঙ্গে এই মোকাত্তম পাহাড়ে এসেছি। কারণ এখানে ফারুকের একটি রাজপ্রাসাদ ছিল। তিনি তাঁর বান্ধবীদের নিয়ে জীবন উপভোগ করতে প্রায়ই আসতেন। কাজেই এই এলাকার পথঘাট আমার বেশ জানা ছিল।

আমাদের ইনফরমার আলী মুহম্মদ এসে খবর দিল যে, আলোয়ার একস প্রতিদিন হাসান বাসরাকে উস্কানি দিচ্ছেন যেন মুসলিম ব্রাদারহুড ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ইংরেজ হোল ইস্রাইলীদের সবচাইতে বড় বন্ধু। অতএব এই এলাকা থেকে ইংরেজদের সরাতে না পারলে দেশে শান্তি হবে না। আর আলোয়ার একস-এর সঙ্গে আছে আর একটি ধুরন্ধর। তার নাম সালা সালেম (পরবর্তীকালে নাসেরের যুগে সালা সালেমের নাম হয়েছিল ডাল্লিস স্পেকর)।

আমি এবং স্যাম্পসন যখন আল আজার বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে এসে পৌঁছলুম, তখন আরো একটি গুরুতর খবর পেলুম। আবার মুহম্মদ আলী এসে স্যাম্পসনকে খবর দিল : বাসরা খবর পাঠিয়েছেন আপনি আর এগোবেন না। আলোয়ার একস এক মিছিল বের করেছেন। ঐ মিছিল গার্ডেন সিটিতে ব্রিটিশ এম্বাসীতে যাবে। তারপর আবেদীন প্যালেসে যাবে। ওরা যদি আপনাকে দেখতে পায়, তাহলে আপনাদের বিপদ হবে।

স্যাম্পসন আমার মুখের দিকে তাকাল। বুঝতে পারলুম যে, সে আমার সাহায্য চাইছে। কারণ কেমন করে হোক আলোয়ার একস-এর এই মিছিল বন্ধ করতেই হবে। নইলে আজ ব্রিটিশ এম্বাসীর সামনে রক্তপাত হবে।

বিদ্যুৎ আমার বুদ্ধি খোলে। আজও চট করে মাথায় একটি বুদ্ধি এল। স্যাম্পসনকে বললুম : আপনি ব্রিটিশ এম্বাসীতে গিয়ে ব্রিটিশ এম্বাসডারকে খবর দিন যে, এম্বাসীর দিকে মুসলিম ব্রাদারহুডের মিছিল যাচ্ছে। গুদের সতর্ক হতে বলুন। আর আমি যাচ্ছি আবেদীন প্যালেসে।

: কেন? স্যাম্পসন যেন আমার কথার মর্ম ঠিক বুঝতে পারেন না। : কী ব্যাপার পালা? তুমি কি করতে চাইছো...

আমি কিন্তু মন দিয়ে স্যাম্পসনের কথা শুনেছিলাম না। আমি ভাবছিলুম অন্য কথা। ভাবছিলুম একবার গিয়ে ফারুককে বলতে হবে: আলোয়ার একস তাঁর দলবল নিয়ে আবেদীন প্যালেসের কাছে এগিয়ে আসছেন। ওঁরা চান ইস্রাইলের সঙ্গে যুদ্ধ এবং ব্রিটিশরা এই এলাকা থেকে সরে যাক। পুলিশকে খবর দিন। যেমন করে হোক এই মিছিল বন্ধ করতে হবে।

স্যাম্পসন আমার মনের কথা বুঝতে পারলেন।

বললেন, তুমি ঠিক কথা বলেছ পালা। আমি এক্ষুনি এম্বাসীতে যাচ্ছি। এম্বাসীর কর্তাদের সতর্ক করতে হবে।

স্যাম্পসন চলে গেলেন। আমি আল বাস্তার থেকে সোজা আবেদীন প্যালেসে চলে এলুম। পুলিশ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার পালা, তোমাকে অত ব্যস্ত দেখাচ্ছে কেন?

: মুসলিম ব্রাদারহুড এক প্রসেসান বের করেছে। ওরা সমস্ত শহর ঘুরে আবেদীন প্যালেসের কাছে এসে চিৎকার হৈ-হুল্লা করবে।

: কেন, ওরা কী চায়? পুলিশ বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন।

আমি জানতুম যে পুলিশ হলেন ইংরেজ বিদ্বেষী। ওর কাছে আলোয়ার একস-এর অভিসন্ধির কথা বললে পুলিশ খুশী হবেন। পুলিশ একসকে সমর্থন করবেন। না, পুলিশের কাছে মনের কথা খুলে বলা যায় না।

আমি পুলিশকে একটা মনগড়া কথা বললুম: ওরা ফারুকের এবং আমার পদত্যাগ চাইছে। ওরা বলছে আমরা দুজনে হলুম ফারুকের শত্রু। আমরা দুজনে ফারুককে কু-পরামর্শ দিচ্ছি, আবেদীন এবং কুব্বা প্যালেসে বাজারের মেয়েদের নিয়ে আসছি। আর একস-এর পেছনে যে আছে জানো: কেনারেল আজিজ আল মাসরী। উনি এখনও ফারুকের ড্রাইভার মহম্মদ হোসেনের কথা ভুলতে পারেন নি।

(ক্রমশঃ)

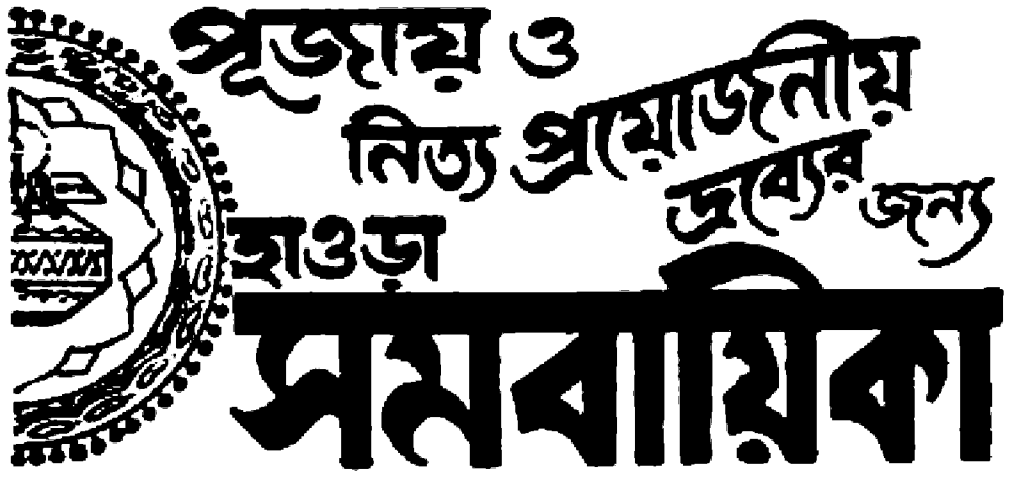

CENTRAL LIBRARY

শারদীয় অমৃত ১৩৮২

অমৃতের শারদীয় সংখ্যা এবার মহালয়ার অনেক আগেই বেরোবে

॥ এ সংখ্যার একটি বিশেষ আকর্ষণ ॥

শরৎচন্দ্রের অপ্রকাশিত
একটি নাটকের পাণ্ডুলিপি

অসম্পূর্ণ এই পাণ্ডুলিপির অজস্র ফ্যাকসিমিলি ব্লকসহ শরৎ-বিশেষজ্ঞ
শ্রীগোপালচন্দ্র রায়ের মূল্যবান টীকা ও পটভূমি বর্ণনা

৫ খানি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস

তার মধ্যে একটি রহস্য উপন্যাস লিখছেন—

আশাপূর্ণা দেবী ।। উত্তর পুরুষ
নিমাই ভট্টাচার্য ।। ইন্‌কিলাব
চাণক্য সেন ।। 'সতীদাস কলকাতায় বেঁচে আছেন
অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় ।। ফুল ফুটছে
অদ্রীশ বর্ধন ।। বনমানুষের হাড়

অরণ্যের পটভূমিতে সুদীর্ঘ কাহিনী

বুদ্ধদেব গুহ ।। রৌদ

বাংলার প্রবীণতম থেকে শুরু করে নবীনতম গল্প লেখকের প্রায় কুড়িটি বাছাই করা গল্প
মূল্যবান সুখপাঠ্য কয়েকটি নিবন্ধ। সুনির্বাচিত কবিতাগুচ্ছ ও অন্যান্য রচনা

দাম—৭·৫০পঃ ডাক মাশুল ১·৫০ পঃ

CENTRAL LIBRARY

গুরুদেবের গানের শক্তি
রয়েছে তাঁর অনন্যপম ব্যক্তিত্বে।
এ গান চলবে সেই জোরেই।

শান্তিদেব ঘোষ

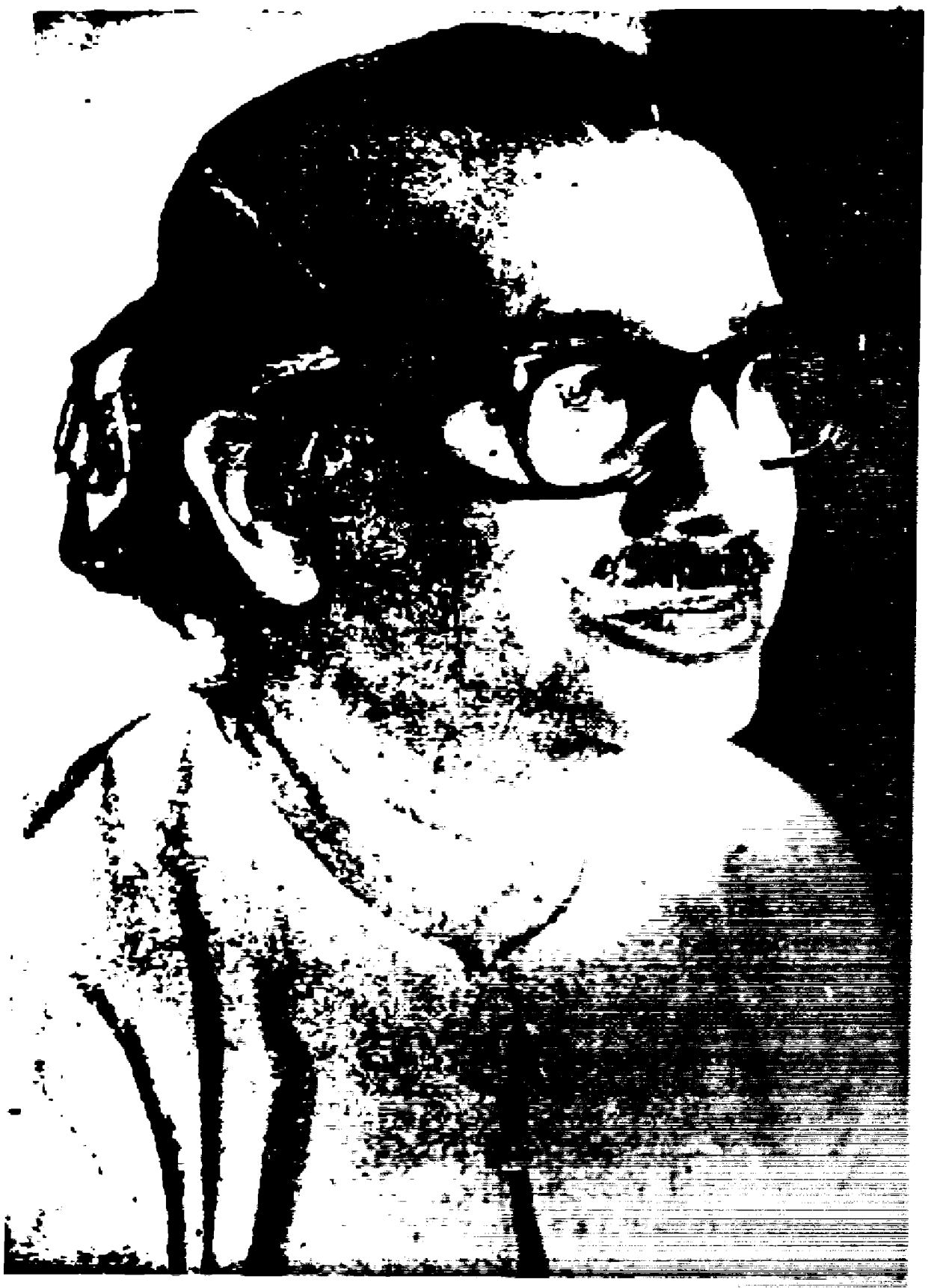

সুরের আগুন

গেছেন। তারপর থেকেই একটানা সেখানেই। শুধু ওঁর জীবনের নয়, শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মুহূর্ত থেকেই উনি সেখানে রয়েছেন। তারপর আজ অর্ধশতাব্দী—শান্তিনিকেতনের কত বিচিত্র অধ্যায়ের পালাবদল—বহুধা অভিজ্ঞতার অভিনব স্বাদের সার্থক হওয়ার চমকপ্রদতা এই নিয়েই গড়ে উঠেছে তাঁর জীবনদর্শনই শুধু নয়,—রবীন্দ্রদর্শনও।

'শান্তিনিকেতনের মোটামুটি তিনটি যুগ বলা চলে। প্রথম যুগ হচ্ছে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের'। বলতে বলতে সেই যুগেই যেন শিল্পীর মন নিবিষ্ট হয়ে গেলো। সে যুগ সত্যিই বড় দারিদ্র্যের,—বড় কষ্টের। আমরা যে কটি পরিবার ছিলাম সে আঁচ আমাদের ওপর দিয়ে গেছে। আমাদের মত করে শান্তিনিকেতনের সপ্তাহশী অধ্যায়ের বেদনাকে কেউ অনুভব করেনি, অথচ রঙ্গা দেখ—একটু হেসে বললেন তখন কষ্টকে কষ্ট বলে মনেই হতো না। সে যেন এক তপস্যার যুগ। এই তপস্যা ও সাধিকাইজেশন প্রেরণা ছিলেন স্বয়ং গুরুদেব। কেউ ভাবত না—ভবিষ্যৎ কি হবে। সবাই যেন একটা আপনহারা আবেগে কাজ করে যেতো। চোখ মেলা দেখার পানে চাইলেই সকল ক্লান্তি ও নৈরাশ্য কোথায় যে পালাতো। কারণ আমরা যে দেখেছি দিনের পর দিন সকল কায়িক ক্লেশকে উপেক্ষা করে গুরুদেব কি কঠোর পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে দিনগুলো কাটাতেন। ওঁর একটিমাত্র চাকর ছিলো। লেখাপড়া, কপি-করা, চিঠিপত্র লেখা,—সমস্ত কাজ নিজের হাতে করতেন। রোদ, ঝড়, বৃষ্টির মধ্যে চারিদিক ছোটাছুটি, অর্থসংগ্রহ, সে যে কি প্রাণান্তকর পরিশ্রম—না দেখলে ধারণা করা যায় না।

এইভাবেই চলছিলো। এই কৃচ্ছ্রসাধনের যুগ শেষ হলো ১৯২১ সালে। কবি নোবেল প্রাইজ পাবার পর অবস্থার একটু উন্নতি হলো। অবস্থার উন্নতি বলতে আমি আর্থিক উন্নতির কথা বলছি। এ যুগের স্বাচ্ছন্দ্যতা হয়তো আগে ছিলো না। তবে তার জন্য আনন্দের প্রবাহে কোনো বাধা ছিলো না। গুরুদেব সবসময়ই চাইতেন ছাত্র ও অধ্যাপকের মধ্যে খুব সহজ, স্বচ্ছন্দ বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠুক। কারণ বাধাহীন বন্ধুত্বের মধ্যেই শিক্ষাগ্রহণ ও দান সহজ হয়ে ওঠে। শেষের দশ বছর খুঁটিনাটি প্রত্যেকটি ব্যাপারে কবি আগের মত জড়িয়ে থাকতে পারেননি। কিন্তু গুরু-শিষ্যের মধুর সম্পর্কে এতটুকুও চিড় পড়েনি। সকল কাজের মধ্যেই কবির অলক্ষ্য প্রভাব যেন ফুলের মত ফুটে উঠতো।

দ্বিতীয় যুগ হলো বিশ্বভারতী সোসাইটি সৃষ্টির পরের যুগ। প্রথম যখন সোসাইটি রেজিস্টার্ড হলো, কবি যেন কিছু চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। ছাত্র-সমাজের এই সহজ, স্বচ্ছন্দ জীবন প্রবাহ যদি নিয়মের নিগড়ে প্রতিহত হয়? এই সময় এণ্ড্রুজ সাহেবকে লেখা চিঠিপত্রে এই আশঙ্কাই প্রকাশ পেয়েছিলো। ভয় জেগেছিলো, আইনটাই বুঝি বড় হয়ে ওঠে। 'অচলায়তন', 'ডাকঘর', 'শারদোৎসব'—ঠিক এর আগের যুগের সৃষ্টি। নিয়ম, প্রথা এসবে কবির বড় আতঙ্ক ছিলো। সহজ প্রাণের উচ্ছল গতি অপ্রতিহত থাক—শান্তিনিকেতনের মূলমন্ত্র ছিলো তাই।'

'আপনাদের সকল কাজের আনন্দ, প্রেরণার উৎস ছিলেন তিনিই। তাঁর অন্তর্ধানের পর মনে হোলো না সব শূন্য নিঃশেষ—আর কিছু করার নেই।

'প্রথমটায় তা তো হবেই। কিন্তু গুরুদেবের দেওয়া কাজের দায়িত্ব যেন আপনা শক্তিতেই সকলকে চালিয়ে নিয়ে গেলো। চোখের সামনে ত দেখছ তাঁর কি উৎকণ্ঠা দুশ্চিন্তা এই শান্তিনিকেতন নিয়ে? তাই মনে হোলো যে, শান্তিনিকেতন শুধু তাঁর প্রাণের নয়, ধ্যানের বস্তু, তাকে ভেঙ্গে যেতে দেওয়া হবে না। এই প্রেরণাই শক্তি জোগালো। সেই শক্তির জোরেই আজও চলেছি।'

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সান্নিধ্যের প্রসঙ্গে বললেন 'পড়াশোনা, গানবাজনা সবই ওঁর তত্ত্বাবধানে ছিলো। ওঁর পড়াবার পদ্ধতও ভারী ইনটারেস্টিং ছিলো। শেলী, কীটসের কবিতা আমরা ছোদ্দ বছর বয়সেই পড়েছিলাম।'

'ছোদ্দ বছর বয়সে শেলী, কীটস? বুঝতে অসুবিধা হোতো না?'

'সেই মজার কথাই ত বলছি। বুঝতে ত পারতামই। আর কেউ এত ভালো করে বা পরিণত বয়েসেও বোঝা মুস্কিল। এর মূলে ছিলো গুরুদেবের শিক্ষাপদ্ধতি। উনি ইনটারেস্ট ক্রিয়েট করতেন কিভাবে জান? প্রথমে শেলী, কীটসের ভালো ভালো কবিতা বেছে বেছে শোনাতেন। বাংলা অনুবাদের পর ইংরিজিতে লিখতে হোতো। এইরকম উল্টেপাল্টে লিখে তারপর ওঁর হাতে দিতাম কারেকশনের জন্য। প্রোজও তাই।

কবির বিশেষ পদ্ধতি ছিলো ছোটদের শিক্ষার জন্য একটু কঠিন বস্তু দেওয়া। যাতে তারা ভাবতে শেখে। 'সাহিত্য' ধরনের কঠিন ও চিন্তাপ্রধান বই ম্যাট্রিকের দু বছর আগেই আমাদের শেষ হয়ে গিয়েছিলো। শিশুরা যতটা বুঝতে পারে—তার চেয়ে একটু উঁচু স্টাণ্ডার্ডে শিক্ষা দিতে চাইতেন বলে লাইব্রেরীতেও সেই ধরনের বই রাখতেন। ওঁর মতে ছোটদের এমন জিনিস দিতে হবে—যা তখনই হয়ত আয়ত্তে মিলোতে করতে পারবে না, কিন্তু অবোধ্য বিষয়কে বোঝবার চেষ্টাতেই চিন্তাশক্তি জাগ্রত হবে, তারপর হঠাৎই একদিন তাদের অনুভবের দরজাটা খুলে যাবে। এই দরজাটা খোলবার জন্যই কঠিনের ধাক্কার প্রয়োজন আছে।

কবি অনেকসময়ই বলেছেন আমি ওদের জন্য এমন সব গান, নাটক রচনা করছি যা ওদের পক্ষে চট করে বোঝাটা হয়ত মুস্কিল হবে। যারা বুঝতে পারলোনা আমি তাদের জোর করিনি, চাপ দেইনি, বড়দের লেখাচ্ছি—হঠাৎ একদিন নিজেরাই এসে বলেছে লিখব। নাটকের ক্ষেত্রেও তাই। বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ছাত্ররা মিলে অভিনয় করবে বলেই নাটক রচনা করতেন,—কিন্তু ঠিক ছোটদের মত করে নাটক লিখতেন না। পীতাঞ্জলি গীতিমালার গানও আমাদের লেখাতেন। সব সময় বুঝতে পেরেই দেন নয়। কিন্তু না বুঝতে পারলেও একটা অনুভূতি ভেতরে ভেতরে কাজ করেছে। নাটক, অভিনয়, নতুনোনাচ গান—সমস্তই তাঁর বিচিত্র আনন্দের অনুভূতির রূপ। এ সবেরই অবতারণা করেছেন শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটা আনন্দের—আবেগ জাগাবার জন্য।

প্রথমদিন সব ভার নেওয়ার পর থেকে কবি তখন থেকেই একটু একটু করে এধার থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছেন। যেটুকু যোগাযোগ রাখতেন,—তা ওপর ওপর।

গান ছোটোবেলা থেকেই দীনুদা কবির দক্ষিণহস্ত ছিলেন। গাইয়ে বলতে ওঁকে ছোটো করা হয়, গানের মধ্য দিয়ে উনি নাটকে একটা পরিবেশ সৃষ্টি করতেন।'

'গান কিভাবে শেখানো হোতো?'

'গুরুদেব আশ্রমে একজন ওস্তাদ বা বক্সী রাখতেন,—আমাদের গলা তৈরী করবার জন্য। ক'দিনের মধ্যে অজস্র গান রচনা করতেন, তারপর দীনুঠাকুর সমেত বিরাট দলকে শেখাতেন।'

'আপনার সঙ্গীতানুষ্ঠান সুরু হোলো কিভাবে?'

'ফাল্গুনী, শারদোৎসব—এসব নাটকে বরাবর থেকেছি, অভিনয় করেছি। ছোটোবেলা থেকেই গানের চর্চা হয়েছে ওঁরই তত্ত্বাবধানে। সকল উৎসবেই আমার ডাক পড়তো। যখন মাঘোৎসব হোলো আমার মাত্র ছ সাত বছর বয়স। আমিই দলের মধ্যে সবচেয়ে ছোটো ছিলাম। আমার মদ্রা দোষ ছিলো—যখন তখন মাথা চুলকানো, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গাইতাম। দীনুদা বারণ করতেন। হঠাৎ মাথা চুলকে ফেলতাম। আর তাই নিয়ে সকলের কত কৌতুক, মজার স্মৃতি। সেসব আনন্দময় পরিবেশের স্মৃতি রোমন্থন সারা জীবনেও ভোলা যাবে না। ১৯২১ সাল থেকে সবসময় সব অনুষ্ঠানেই আমি থাকতাম।

আমার যখন সতেরো আঠারো বছর বয়স গুরুদেব বাবাকে একদিন বললেন একে গানের দিকেই দাও। একজনকে ত ভাবী-কালের জন্য তৈরী করা দরকার?

দীনুবাবুর অবর্তমানে যতগুলি নৃত্যনাট্য রচনা করেছেন, আমায় নিয়েছেন পরিচালনার ভার। 'তাসের দেশ' নৃত্যনাট্যের সময় থেকেই ওঁর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যোগাযোগ ঘটলো। এক একজন চার পাঁচটা করে গান রচনা করেছেন, সঙ্গে সঙ্গে তুলে দিয়েছেন। সে যুগ যেন একটা ভাবের উন্মাদনায় কেটেছে।'

'আপনি ত প্রথমে গানেই আত্মনিয়োগ করেছিলেন? তারপর—নাচের প্রেরণা এলো কবে থেকে?'

'সে এক ভারী মজার কাহিনী। ১৯২৯ সাল থেকেই, হবে বোধহয়। কীরুমে বাউলনাচ, গুরুসদয় দত্তর ব্রতচারী, রাইবেঁশে নাচ দেখে গুরুদেবের কারুর ভালো

লেগে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের শান্তিনিকেতনে আনালেন আর আমায় বললেন—ওঁদের নাচ দেখে এক একটি নাচ তুলতে। সেইসব নাচই 'নবীন' নাটকে জুড়ে দিলেন। আর নাচ শেখার পর আমার মনে হোলো যেন নতুন আনন্দের পাখা গজিয়েছে।

১৯৪০ সাল থেকে শান্তিনিকেতনে পুরোপুরি নাচ এলো।

তার আগের প্রস্তুতিপর্বটা ও হ্যাঁ বলি। ১৯১৮ সালে কবি পূর্ব বাংলায় বেড়াতে গিয়েছিলেন, সেই সময় শিলচরের সমাজ কবিকে মণিপুরী নাচ দেখালো। মণিপুরীর গীতকাব্যধর্মী নাচ কবির খুব মনে ধরে গেলো। তারপর আগরতলার মহারাজও কবির জন্য এক নৃত্যানুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। সে-সময় কবির মনে শান্তিনিকেতনের ছেলেদের নাচ শেখাবার বাসনা জাগলো। এবং তাঁরই অনুরোধে আগরতলার মহারাজ শান্তিনিকেতনে নাচ শেখাবার জন্য একজন মণিপুরী গুরু পাঠালেন। আর কবি নতুন সৃষ্টির প্রেরণায় নানা রকমের গান রচনা করে গানের সঙ্গে নাচের মালা গেঁথে দিলেন।

মেয়েদের হোস্টেল হবার পর থেকে মেয়েদের মধ্যে যে নাচের চল কিছু ছিলো প্রতিমা দেবীর উৎসাহই ছিলো তার প্রধান কারণ। এইসময় শান্তিনিকেতনে এক গুজরাটি মহিলা ছিলেন, তিনি মেয়েদের গুজরাটি ও গরবা নাচ শেখাতেন। কাটিয়ারে গুরুদেব মন্দিরা হাতে একরকমের নাচ দেখে খুব মুগ্ধ হন। এই নাচও শান্তিনিকেতনে আনতে চেয়েছিলেন। ওখানের এক পরিবারকে তিনি কিছুদিন শান্তিনিকেতনে এনে রেখেওছিলেন।

যাই হোক,—যা বলছিলাম। মণিপুরী গুরুদের মধ্যে শান্তিনিকেতনে প্রথম এসেছিলেন আগরতলার বুদ্ধিমন্ত সিং। তিনি ছ-সাত মাস থেকে চলে যাবার পর ১৯২৬ সালে এলেন নবকুমার সিং। এই নবকুমার পর্যন্ত আমরা—ছেলেরা বেশী ঘেঁষতে পারিনি। মেয়েদেরও নাচের দিকে বিশেষ দেখা যেতো না। প্রথম সুপরিকল্পিত নৃত্যনাট্য হোলো ১৯২৬ বা ২৭ সালে, খুব সম্ভব 'নটীর পূজা।'

'ছেলেদের মধ্যে নাচের প্রেরণা এলো কবে থেকে?'

নবকলি

অভিজাত ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা

ফ্ল্যাট জি।৪, এল আই জি হাউজিং এস্টেট

৩৭, বেলগাছিয়া রোড, কলিকাতা-৩৭

সম্পাদক—শ্রীনরগোপাল দত্ত

নতুন স্বাদের জনপ্রিয় এই পত্রিকাটির চতুর্থ বর্ষ চলছে। লাইব্রেরীয় সংখ্যা বহুদিন ক্যালেন্ডারের মহালয়ার আগে বেরুবে। মূল্য তিন টাকা। সাধারণ সংখ্যা ৮০ নয়া। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা (সডাক) ৩ টাকা। পরবর্তী সংখ্যা বিশেষ 'নবীন-সংকলন'। লেখা পাঠান।

একবার মাদ্রাজ থেকে একটি ছেলে শান্তিনিকেতনে শিক্ষার্থী হয়ে এলো। সে নাচ জানতো। সবাই তার নাচ দেখে অবাক হয়ে গেলো। ছেলেদের নাচও এত সুন্দর হয়? তখন থেকেই ছেলেদের নাচের দিকটা সকলের সামনে উদ্ভাসিত হোলো। এরপর যিনি মণিপুর থেকে এলেন, তাঁর কাছেও আমরা নাচ শিখতে আরম্ভ করলাম।

১৯৩১ সালে নাচ শেখাবার জন্য গুরুদেব আমায় দক্ষিণ ভারতে পাঠাতে চাইলেন। এই উদ্দেশ্যে ত্রিবাঙ্কুরে শান্তিনিকেতনের একজন এক্স স্টুডেন্টকে চিঠি লেখা হোলো। উত্তরে তিনি জানালেন এখানে একরকম লোকনৃত্য আছে; মুখোশ পরে নাচে। তাকে 'ডেভিল ডান্স' বলা হয়। এখানে এলে দেখাব। ঐ ১৯৩১ সালের মে মাসে মাদ্রাজ চলে গেলাম।

মাদ্রাজ গিয়ে প্রথমটায় নাচের কোনো হদিশই পাইনা। কিন্তু পৌঁছে গেলাম একেবারে নাচের কেন্দ্রে। সে যোগাযোগও এক মজার অভিজ্ঞতা।

ত্রিবাঙ্কুর যাবার উদ্দেশ্যে ট্রেনে চড়ে বসলাম। কিন্তু ভুল করে ত্রিবাঙ্কুরের গাড়ীতে না উঠে উঠলাম কোচিনের গাড়ীতে। আর এ ব্যাপারটা যখন জানতে পারলাম, তখন জলে পড়লাম। কি উপায়? সহযাত্রীদের মধ্যে একজন পরামর্শ দিলেন আলোকুলাম থেকে ট্রেনে যেতে পার। কিন্তু বড় অনিশ্চিত। তারপর আমার নাচ শেখার উদ্দেশ্যের কথা শুনে এক ভদ্রলোক পরামর্শ দিলেন পরের স্টেশনে নামতে। সেখানে আর্কিওলজিক্যাল ডিপার্টমেন্টের একজন বড় অফিসার থাকেন। তিনি আমার নাচ শেখানোর সকল রকম সুবন্দোবস্ত করে দিতে পারবেন এ ভরসাও পাওয়া গেলো।

তাঁর কথানুযায়ী পরের স্টেশনে নেমে পড়লাম। স্টেশন মাষ্টার একজন কুলি সঙ্গে দিলেন, তার সাহায্যে সেই ভদ্রলোকের বাড়ী পৌঁছলাম। তিনি বাড়ী ছিলেন না। বেরিয়েছিলেন। ফিরে এসে আমায় দেখে খুব অবাক হয়ে গেলেন। আমি শান্তিনিকেতন থেকে গেছি শুনে অত্যন্ত খুশী হলেন। আবার ঘটনাচক্র কেমন অনুকূল দেখ, ও'রই কাছে খবর পেলাম ওখানে বিখ্যাত কবি ভল্লাথল যাঁকে সবাই 'টেগোর অফ কেরালা' বলতেন—তিনি সবে নাচের ক্লাশ খুলেছেন পাশের গ্রামে। তিনি কানে কম শুনতেন বলে মুদ্রার কথা বলতেন।

পরের দিন ঐ নাচের স্কুলের সেক্রেটারী সেই গ্রামে আমায় নিয়ে গেলেন, গুটিকয়েক ছাত্র নিয়ে সবে শুরু হয়েছে সেই প্রতিষ্ঠান। আমি গুরুদেবের কাছ থেকে গেছি শুনে ওঁরা আমায় খুবই সমাদর করলেন। সেই নৃত্য প্রতিষ্ঠানের জন্য কারা জান? গ্রামের চাষী ক্লাস। ওঁরা খাটির করে পাশের গ্রামের জমিদার বাড়ীতে আমার থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু আমার মন এতে সায় দিলো না। ওদের সঙ্গে একসঙ্গে থেকে, ওদেরই মত করে জীবন যাপন করে একেবারে ওদের একজন হয়ে নিজে যদি শিখতে নাই পারলাম তাহলে ওদের নাচের বৈশিষ্ট্যটি আমার মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠতে পারে কেমন করে? তাছাড়া জীবন-বৈচিত্র্যকে আস্বাদ করবারও একটা আনন্দ আছে তো।

তিনমাস এইভাবে কাটালাম। ওদের শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে একটা ধারণাও হোলো। সকালবেলা নাচের একসারসাইজ করার পর সবাই ক্লান্ত হয়ে পড়লে গুরু তিলের তেল মাখিয়ে পা দিয়ে দলে দলে সারা শরীর মাসাজ করে দিতেন। সাধারণ মাথা ধরণ ছিলো, তাতে নাকি শরীর গরম হয়। একরকম পাতার ছাল শুকিয়ে গুঁড়ো করে আমরা সবাই মাখতাম। তাতে হোতো কি স্নান করলে তেলটা উঠে যেতো আর শরীরটাও যেন স্নিগ্ধ হয়ে যেতো।

ওরা বেশীর ভাগই খুব লম্বা এবং ওদের নাচে অভিনয়ের সংযোগও খুব বেশী। তবে কিছুদিনের মধ্যেই বুঝতে পারলাম ওদের মুদ্রার অল্প এক সিরিট পর্ব। মুদ্রায় হাত দিলে ও অধ্যায় অল্প সময়ের মধ্যে শেষ করা যাবে না, একথাও বুঝতে দেরী হোলো না। তাই ও-নাচের ছন্দবৈচিত্র্য আর অভিনয়ের অংশটাই যতদূর সম্ভব আয়ত্ত করবার চেষ্টা করলাম।

তিনমাস বাদে ফিরে এলাম। আমার সবসময় লক্ষ্য ও চেষ্টা থাকতো ঐ সমস্ত বস্তু ভেঙেচুরে কেমন করে গুরুদেবের গানের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া যায়। আমার নৃত্যশিক্ষার উদ্দেশ্যও ছিলো তাই। গুরুদেবের গানের নৃত্যরূপায়ণ।

এরপর কোচিনের মহারাজার মাধ্যমে এক নৃত্যগুরু আনানো হোলো। ১৯৩৭ সালে আমি সাউথ ইন্ডিয়া থেকে কেলু নায়ারকে নিয়ে আসি। ও তখন কথাকলি ছাড়া অন্য নাচ জানতোনা। শান্তিনিকেতনে এসে মণিপুরী শিখলো। অল্পদিনের মধ্যেই অসম্ভব রকমের তৈরী হয়ে গেলো। এই সময় কেরালার কথাকলি গুরুর সঙ্গে একজন করে মণিপুরী গুরুও রাখা হোতো, তবে 'ভারতনাট্যম্' কোনো গুরু রেখে শেখানো হয় নি।

ওদেশে উদয়শঙ্কর খুব নাম করার পর একবার শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন। ও'র নাচ গুরুদেবের খুব ভালো লেগেছিলো। উদয়শঙ্করের প্রতিভার কাছে ও'র শুধু বড় আশাই ছিলো না, মস্ত নির্ভরতাও ছিলো। উনি শান্তিনিকেতন ছেড়ে যাবার আগে গুরুদেব ও'কে এক উচ্ছ্বাস মুখর আশীর্বাণী উপহার দিয়েছিলেন। তার এক জায়গায় ছিলো পৌরুষের দর্পিত যেখানে ঘটে সেখানে নৃত্য অন্তর্ধান করে, কিংবা বিলাস-ব্যবসায়ীদের হাতে পড়ে তেজ হারায়। স্বাস্থ্য হারায় যেমন বাইজীর নাচ। এই পৌরুষদীপ্তি নৃত্যকলাকে তার দুর্বলতা থেকে সমতলতা থেকে উদ্ধার কর।'

নাচে গুরুদেব অভিনয়ের ওপর জোর দেওয়াটাই পছন্দ করতেন। শঙ্করের নাচে এই অংশটি জোরালো ছিলো বলে-এ নাচ তাঁর মনকে এমন করে ছুঁয়েছিলো। এই

অধ্যায়ে কবিকে নৃত্যনাট্য লেখার নেশায় পেয়ে বসেছিলো। তাই শান্তিনিকেতনে নাচ জমে উঠেছিলো পুরোদমে। এই সমস্ত নাটকে প্রতিমাদেবীর অনুপ্রেরণা ছিলো একটা মস্ত বড় অবদান। উনি হয়তো কোনো কাহিনী নিয়ে চিন্তা করছেন কেমন করে সেটা দিয়ে বালে তৈরী করা যায়। সেই ভাবনাকে কবি নতো গানে বেঁধে দিলেন। এইভাবেই চিত্রাংগদা চন্ডালিকা শাপমোচন নৃত্যনাট্যের সৃষ্টি।

সে এক উদ্দীপনার যুগ। গান তৈরী হোলো। এক একদিনে কবি অনেক গান লিখে সুর দিয়ে ফেললেন। গান তোলা হোলো সংগে সংগে নাচও তৈরী হয়ে গেলো। তারপর শেখানোর পালা। খুব খাটতে হোতো সবাইকে। অথচ এতটুকুও ক্লান্ত হতাম না। সবাই তখন সৃষ্টির নেশায় বিভোর।'

"আপনি কোন্ কোন চরিত্র অভিনয় করেছেন ?"

তাসের দেশে রাজপুত্র. শাপমোচনে রাজা. চিত্রাংগদায় অর্জুন। একটু থেমে বললেন প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি ব্যাপার যাতে সুন্দর হয়ে ওঠে তার জন্য সবার কি আপ্রাণ চেষ্টা।

নন্দলাল বসু সকলকে নিজের হাতে সাজাতেন। গুরুদেবের পর এরকম বহুমুখী প্রতিভা আমি আর দেখিনি। মামুলী প্রথায় সাজসজ্জা একদম বদলে দিলেন। গভীর অভিনিবেশ সহকারে তিনি প্রতিটি বিষয় চিন্তা করতেন। আর নাটকের চরিত্রের সংগে কি সাজ খাপ খায় বসে বসে তারই স্কেচ করতেন।

কবির রূপকনাট্যে একটা মজা লক্ষ্য করেছ ?

'পাসোন্যালকে ইম্পারসোন্যাল. ইনডিভিজুয়ালকে ইউনিভার্সালাইজ করার ব্যাপার ?'

'ঠিক ভাই। শারদোৎসব. ডাকঘর. ফাল্গুনী. রাজার রঙ্গ-রবিভিন্ন চরিত্র কোন্ যুগের ? —কোনো বিশেষ যুগের শীলমোহর এদের চিহ্নিত করা যায় কি ? অথচ রাজা মন্ত্রী গ্রামবাসীকে ঠিক তাদের পরিচয়েই চিনতে ভুল হয় না। গুরুদেব একটা চিন্তাকে সামনে রেখে বিভিন্ন যুগের মানুষদের তাঁর নাটকের জন্য বেছে নিতেন। বিশেষ কোনো যুগের উৎস থেকে বেরিয়ে এলেও সর্বকালে ও দেশে তাদের ব্যাপ্তি।

কবির এই চিরায়ত দৃষ্টিকোণকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন নন্দলাল বসু। এই দৃষ্টিভংগির প্রবাহকে অনুসরণ করেই তিনি রং সাজ ও পোষাকের নকসা রচনা করতেন যাতে প্রতিটি চরিত্র হোতো যেমন যুগের তেমনি বিশ্বের চিরন্তন। বাল্মীকি প্রতিভার বাল্মীকি ও রত্নাকর হাত ধরাধরি করে চলেছে। চিন্তার সংগে সংগতি রেখেই এখানে বেশভূষাকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। এ বোধ নন্দলাল বসুর ছিলো বলেই মস্ত পরিকল্পনা চরিত্রের সজ্জা রচনায় তিনি গুরুদেবের ভাবনার দোসর হতে পেরেছিলেন।'

স্বয়ং কবিগুরুর অভিভাবকত্বে নন্দলাল বসুর সজ্জা পরিকল্পনায় প্রতিমা দেবীর চিন্তার প্রেরণায় আপনারা কবির নৃত্যনাট্য রূপায়ণ করেছেন। এতগুলি বৈপ্লবিক প্রতিভার সমন্বয় এ একটা ঐতিহাসিক ঘটনা। এ ঘটনা বারবার ঘটে না। তুলনার-ও প্রশ্নই ওঠে না। শুধু জানতে চাইছি কবিগুরু ও উদয়শংকরের মিলিত নৃত্যচিন্তাকে যদি বলি হিমগিরি— তাহলে কোলকাতায় আজকের উপচে পড়া নৃত্যনাট্য প্রবাহকে শাখা নদী উপনদী যে নামই দেওয়া যাক. তার রূপ সম্বন্ধে আপনার অভিমতটা জানতে ইচ্ছে করে।'

'ওসব আলোচনার মধ্যে যাওয়া কি উচিত হবে ? আবার ভুল বোঝাবুঝি হবে।'

'কেন ভুল বোঝাবুঝি হবে? আপনি ত এদের গুরুতুল্য। তাছাড়া ক বগুরুর পরিচালনা অথবা ভাবকল্পনার সমমানের বলে এঁরা কেউ-ই নিজেদের দাবী করেন না। আপনার মতামত এদের কাজে লাগবে বলেই জিজ্ঞেস করছি।'

'আমি খুব বেশী দেখিনি। যা দু-একটি দেখেছি বড় সৌখিনী বলে মনে হয়েছে। অভিনয়ের দিকে নজর নেই। আংগিকে ত নেই-ই। কোনোরকমে স্বরলিপি অনুসরণ করে গান গেয়ে তার সংগে নৃত্যভংগি জুড়ে দিয়েই নিশ্চিন্ত। অভিনয়ের মাধ্যমে কবির চিন্তা কতখানি ফুটে উঠলো সে চিন্তার ছায়া কই ? আমরাও প্রথমটা সৌখীন হিসেবেই সুরু করেছিলাম। তারপর কবির ক্রমাগত তত্ত্বাবধানে ও সকলের-সমবেত চেষ্টায় অভিনয় গান ও নৃত্যের সংগে টেকনিক এমন করে মিশে গেছে যে আজ আর চেষ্টা করেও আলাদা করা যায় না।'

'এই টেকনিকটা কি ?

'গানের মেজাজটাকে নাচ দিয়ে বাইরে ছড়িয়ে দেওয়া। কোন কথায় ও সুরে কিভাবে অ্যাকসেন্ট দিলে তার অন্তরের রূপ মূর্ত হয়ে উঠতে পারে এই বোধ বা ভাগিদই মণিপুরীর কোমল সুষমা ও কথাকলির নাটারূপের ছায়া আপনা থেকেই নাচে এসে পড়তো. এটাকে ঠিক চেষ্টা করে আনা হোত না। এইটিকেই আমি টেকনিক বলছি।'

এই বোধের অভাবেই গুরুদেবের অমন ভাবসমৃদ্ধ গানও অনেক সময় প্রিয়ংবদ হয়ে পড়ে।

সুন্দর জিনিসকে ভাল লাগার শিক্ষা যাতে শান্তিনিকেতনের শিক্ষার্থীরা পান সেদিকে গুরুদেবের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিলো। সব সময় শ্রেষ্ঠ গুণী সংগীতজ্ঞদের শান্তিনিকেতনে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে আসতেন যাতে ভালো গান কি বস্তু না শুনে ছেলেমেয়েদের মানস প্রকৃতিতে সংস্কারের সৌন্দর্যবোধ জেগে ওঠে।

তাঁরই ইচ্ছায় ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব কিছুদিন শান্তিনিকেতনে ছিলেন। মনে পড়ে একবার বসন্তোৎসব উপলক্ষে উনি খোল পাখোয়াজ বাজিয়ে মেঘমল্লিত বর্ষার কি রূপ ফুটিয়ে তুলেছিলেন ভাবা যায় না। যে কোনো যন্ত্র একবার বাজাতে বসলেই সব ভুলে যেতেন, সংস্কারের সাধকের জাতই আলাদা। খাঁ সাহেবকে দেখে সেই কথাটাই মনে হোতো। পিঠাপুরমের বীণকার সংগমেশ্বর মিশ্রকেও গুরুদেব শান্তিনিকেতনে আনিয়েছিলেন। সেখানে যত গুণীর খবর পেতেন তাঁদের শান্তিনিকেতনে আমন্ত্রণ করে আনতেন ছাত্রছাত্রীদের সংগীতবোধের প্রসারতা বাড়াবার জন্য। আমাদের সবসময় দেখাতেন তাঁদের সুবিধা অসুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখতে। ঠিক প্রাচীন ভারতের আশ্রমবাসীদের মত বিনম্রতা সেবা এসবও শিক্ষার অংগ ছিলো।

গুরুদেবের সংগের শেষ অধ্যায়ের অনেক কথা মনে পড়ে। তিনি তখন রোগশয্যায়। জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে। আমরা কয়েকজন পালা করে রাত জাগতাম। এক রাতের কথা মনে পড়ে। কবির তখন অর্ধ অচেতন অবস্থা। হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন একেবারে অনাবৃত দেহে। ঐ ঘোরের অবস্থাতেই 'বাথরুমে যাব' বলে। দাঁড়িয়েছিলেন মিনিটখানেকেরও কম। কয়েক সেকেন্ড মাত্র। আমি হঠাৎ চমকে গেলাম। মনে হোলো সামনে দাঁড়িয়ে এক জ্যোতির্ময় মূর্তি। মানুষের অবয়ব তাঁর নয়। সারা অংগপ্রত্যংগ যেন আলো দিয়ে গড়া।

যাঁরা মহামানব কোনো না কোনো সময় অজ্ঞাতেই তাঁরা প্রকাশ হয়ে পড়েন। চেষ্টা করেও আপনাকে গোপন রাখতে পারেন না। সেইরকমই একটা দুর্লভ মুহূর্ত যেন হঠাৎ ঝলকে উঠেই মিলিয়ে গেলো। আমার সারা মন কেমন যেন আচ্ছন্ন হয়ে এলো।

গল্প, প্রবন্ধ-আলোচনা ও বিশেষ ধরনের ভিন্নধর্মী সাহিত্য পত্রিকা

মাঠ ময়দান কারখানা

৩৭-৮ শরৎচন্দ্র এ্যাভেনিউ, দুর্গাপুর—৫

নিয়মিত লিখছেন : নন্দ চৌধুরী, দিলীপ দত্ত, ধীরেন দেব, আলি আকবর, অশোক বসু, অরুণ গাঙ্গুলী, অমিয় দেব চক্রবর্তী, নির্মল সরকার, কেষ্ট চট্টোপাধ্যায় শম্ভু মিত্র, প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়, শ্যামসুন্দর শুকুল, তুষার মুখোপাধ্যায়, হরিদাস আচার্য ও আরও অনেকে।

মহালয়ার আগেই শারদ সংকলন বের হচ্ছে

তারপর থেকে আমি ওস্তাদ ওঁর কাছে থাকতে চাইতাম না। ভয় হতো। যদি ছুঁয়ে ফেলি ? তখন মনে হতোছিলো ঐ অপার্থিব সত্তাকে আমার ছোঁবার কোনো অধিকার নেই।

গুরুদেবের অন্তর্ধানের পর আর এক অধ্যায়। তারপরও ওস্তাদ শিক্ষকের হৃদয়ের সম্পর্কের মধ্যে তাঁরই প্রভাব অলক্ষ্যে কাজ করে। হঠাৎ কিসের যেন একটা অভাব মনকে কখনো অকারণে ব্যথিত করে তুলতো। পৌষমেলায়, দোলে, আরো নানান উৎসবে দূর দূরান্তর থেকে কত অতিথি আসেন। শান্তিনিকেতনের কোথাও বাকী আলি থাকে না।—নমাজ প্রার্থনা ও ভাষার মিলন কলরোলে গুরুদেবকে অন্তরে লাভ করি। তিনি তো এইটেই চেয়েছিলেন। যেবার এসব উৎসবে তাঁর কথা হয় আমাদের মন খারাপ হয়ে যায়। কারণ পৌষমেলা আমাদের পূজো উৎসবের মতই।'

'আপনাকে যখনই দেখি মনে হয় আনন্দে ভরপুর। এ প্রফুল্লতা হয়ত কবির সংগ থেকেই পাওয়া। অবশ্য দেখা হয় আর কতটুকু সময়ের জন্যই বা তবু একটা প্রশ্ন মনে জাগে—আপনার মনে কখনও কোনো অভাব বা অপূর্ণতাবোধ জাগেনি ?'

'জ্ঞান হয়ে অবধি কবির সান্নিধ্যে আসবার সৌভাগ্য ঘটেছিলো। শান্তিনিকেতনের সেই কাঁকুরের বুক থেকে সুরু করে প্রচুরের বুক অবধি ওঁর সংগে সংগেই ছিলাম। ওঁকে দেখতাম সকলরকম পার্থিব সুখ উপেক্ষা করে কেমন করে নিজেকে কাজের মধ্যে ঢেলে দিতেন। চোখের সামনে তাঁর সেই জীবন দেখে দেখে অজান্তেই মনটা এমনভাবে গড়ে উঠেছিলো যে কোনো সুখ বা আরামকে বড় করে দেখতে শিখিনি। তাই অভাববোধও জাগে না। মনে আছে শ্যামলীতে মাটির ঘরের চাটাইতে বসে বৈশাখ-জৈষ্ঠের দুপুর রোদের তপ্ত হাওয়া করের মত বয়ে যাচ্ছে, তার মধ্যে বসেই কবি লিখে যাচ্ছেন। সেখানে এক মুহূর্তের জন্য পেখলেও মনে পরম হাওয়ার পরশ অনুভব হয়। কিন্তু কবির নির্বিকার-ভাব দেখে কেউ সে কথা মুখে আনতেও লজ্জা পেতো। আহার করতেন নামমাত্র। এ হেন সকলের সম্মান দেখেছি বলেই আর্তিত্রাণ তোনো কণ্ঠকে কণ্ঠ তাদাত্ম্য পারিনি। এটা তাঁর আত্মবিশ্বাস বলতে পারো কিম্বা সংস্কারের প্রসাদ। এটা যেন হয়ে গিয়েছে কিভাবে হয়েছে বলা মুশকিল। যেমন মন সকালবেলার আলোর মধ্যে নিবিড়-বাধার ভৈরবী—সন্ধ্যাকালের সকালের আলোর মনে নিবিড়-বাধার সুর বাজে এটা বাঙালী হৃদয় যেমন বুঝবে অন্য কোনো প্রদেশের লোকের পক্ষে তেমন করে বোঝা সম্ভব নয়।

'প্রথম কবির গান কোলকাতায় যাপক ভাবে ওঠা তোলা কি তাঁর জয়ন্তী উৎসবে ?'

না, তাঁর ৭০ বছরের জন্মোৎসব পালন করা হয়েছিলো। দীনুদা বিভিন্ন প্রায় ৭০।৭৫ জন শিল্পীকে নিয়ে গুরুদেবের গানের আয়োজন করেন।, বেশীর ভাগই শান্তিনিকেতনের বাইরের—কোলকাতার শিল্পী—বাঁদের গান আমরা কেউ শুনিনি। গুরুদেবও শোনেননি, এদিক দিকে তাঁর মনে এটুকুও কিন্তু ছিলোনা। ইয়ং জেনারেশন তাঁর গান গাইবেন, হুকুমদন, এটা তিনি অন্তর থেকেই চাইতেন।

'গানের সম্বন্ধে তাঁর কোনো বিধি-নিষেধ ছিলো না ?'

'প্রথম দিকে একেবারেই ছিলো না। তখন তাঁর গান যে কেউ-ই নিজের বা মনের সুরে গাইতেন। বার্ক সাহেব তাঁর গান গেয়েছিলেন। উচ্চাঙ্গ সুরে কোনোটিই সংগীত রসিকের মনহরণ করবার মত নয়। কিন্তু কবি বাধা দেন নি। কারণ তিনি চেয়েছিলেন এ-গানের অন্তর্নিহিত বাণী প্রথাই ছড়িয়ে পড়ুক।

১৯২৫ সাল থেকে বিশ্বভারতীর অনুমতি, রয়ালটি ইত্যাদির প্রবর্তন করা হয় প্রথমতঃ শান্তিনিকেতন গড়বার জন্য অর্থের প্রয়োজন ছিলোই, তাছাড়া এ-গানের স্বাতন্ত্র্য বা বৈশিষ্ট্য বজায় রাখার তাগিদটাও কম নয়।

'এই প্রসংগেই জিজ্ঞেস করছি গায়কী সম্বন্ধে তাঁর কি কোনো নির্দিষ্ট রূপ বা নকসার ধারণা ছিলো ?'

'একেবারেই না। বিভিন্ন গাছে নানারং ও গন্ধের ফুল ফুটে ওঠার মতই গায়ক গায়িকার কণ্ঠ, সংগীতসংস্কার ও সৌন্দর্য-বোধ দিয়ে গড়ে ওঠে তাদের গানের একেকপ্রেজন। এখানে কোনো নিয়ম বেঁধে দিলে গানের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগটা নষ্ট হয়ে যায়। —এ সম্বন্ধে গুরুদেবের উদারতা ছিলো আমাদের ধারণার অতীত।

একটি উদাহরণ। সাহানা দেবী ছিলেন এদিক দিয়ে তাঁর সবচেয়ে নেনহের পাত্রী, তাঁর গাওয়া গান সম্বন্ধে গুরুদেবের অভিমত ছিলো তুমি যখন আমার গান করো শুনলে মনে হয় আমার গান রচনা সার্থক হয়েছে।'

'কিন্তু সাহানা দেবী ও গাইতেন দিলীপ রায়ের ঢঙের গান ? ওঁর জন্য তিনি সেই ধরনের সুরের গানই রচনা করতেন। শিল্পীর স্বধর্ম সম্বন্ধে তাঁর ভীষণ স্থায়ী বিশ্বাস ছিলো, তার ওপর চাপ দিয়ে স্বভাব বিরুদ্ধে কিছু করার ওপর তাঁর আস্থা একেবারেই ছিলোনা।'

'তাঁর গানের সংগতে পাশ্চাত্য যন্ত্র বা সঙ্গীত প্রয়োগের সম্বন্ধে প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে—'

'এ বিষয়ে একটা কথাই বলতে পারি। ওদেশের ভাবিলয়ারা অনুপ্রেরণায় গড়ে উঠেছে সংগীতচিন্তা। ওদের গড়ে স্বত প্রয়োগের পদ্ধতি হারমনাইজেসন—সর্বকিছু ওদের সংগীতের একনপ্রশনের সংগে সুরের-তালের বিকাশের সহায়ক হয়ে ওঠে সেখানে ইস্টার্ন বা ওয়েস্টার্ন মিউজিক এরকম কোনো ভাগ বিচার নিরর্থক, আর যদি তাদের অনুকূল না হয় তবে কোনো মিউজিকেরই সার্থকতা নেই।

পাশ্চাত্য সংগীতের প্রেরণা কবিচিত্তকে দুলিয়েছিলো। দুবার মাত্র ঐ সুরের মাতন লেগেছে তাঁর গানে। ব্যস্ তারপর আর না। আর ঐ দুবারই এমন সহজে গানের ভাবের সংগে সুর মিলেছে। যে সাকে আমাদের বলে মেলে নিত্ত কোনো দ্বিধাই জাগেনা। বাল্মীকি প্রতিভার গানে চরিত্রের প্রয়োজনেই তিনি সি বি এস সবরকম স্কেলই ব্যবহার করেছেন—কিন্তু চরিত্রের বক্তব্যের সংগে সুর মিলিয়ে এমন-ভাবে বিভিন্ন স্কেলের অবতারণা করা হয়েছিলো যে সে সুর কান মন কোথাও প্রবেশে কোনো বাধা ঘটেনি। এই স্বতঃস্ফূর্ত প্রবাহ যদি সৃষ্টি করতে কেউ পারে, তাতে আপত্তির কারণ নেই। শুধু দেখতে হবে সৃষ্টির নামে অপসৃষ্টি না হয়।'

বাংলাদেশে (এখনকার বাংলাদেশ অর্থে নয়) রবীন্দ্রসংগীতের ক্ষেত্রে জন-প্রিয়তার প্রসংগে পংকজ মল্লিক, সায়গল, কানন দেবীর ভূমিকা নিশ্চয় স্বীকার্য। কিন্তু সংগে সংগে আরও একটি দিকও চিন্তা করার আছে। কোন সূত্রে ধরে কোন বস্তু কখন কি রূপ নেয় সে কথা কেউ-ই বলতে পারে না। —

গুরুদেবের গান নিজের শক্তিতেই চলবে, ও নিয়ে আমাদের মত মানুষের মাথা ঘামানোর দরকার নেই। তিনি যে বীজ রোপণ করে গেলেন, তারই ফসলের প্রাচুর্য দেখে আজ আমরা দিশেহারা। কিন্তু এ-কথা যেন না ভুলি তাঁর গানের শক্তির উৎস রয়েছে তাঁরই অনন্যপম ব্যক্তিত্বে। জনপ্রিয়তা সৃষ্টির প্রধান অংশীদার কে এ-বিষয় অনেকটা গৌণ ভাবে আমি দেব, পথ ভাবে আমার মতই।

আজ গুরুদেবের গান দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। আরও পড়বে। আমার কেন জানিনা কেবলই মনে হয় এমন একদিন আসবে যেদিন চৈতন্যদেবের গ্রন্থই গুরুদেব গ্রামে গ্রামেও পূজা পাবেন। যারা যারা তাঁর কাব্য দর্শন কিছুই বোঝেনা (চৈতন্যদর্শন সাধারণ মানুষের মধ্যে কজন বোঝেন ?) তাদের কাছেও তিনি আপনার জন হয়ে উঠবেন।

বাউল গানে দাখোনা ? অনেক বেঁকাবাঁকী আছে। এক কথায় অনেক মানে। সেসব গানের মানে বুঝতে হলে আমাদের বই পড়তে হবে। কিন্তু ওরা সহজ আসনে বসে আছে। অমনই মনের প্রাণের প্রবাহে তিনি মিলে থাকবেন।'

বাণী বসু

নতুন বই

প্রেমের চোখে পরাশর বর্মা (উপন্যাস)—প্রেমেন্দ্র মিত্র। আশা প্রকাশনী, ৭৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা—৯। সাত টাকা।

শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র একালের সাহিত্য-জগতে নতুন কোন পরিচিতির অপেক্ষা রাখেন না। তিনি কল্লোল পত্রিকার কাল থেকেই সগৌরবে আপন ব্যক্তিত্ব চিহ্নিত স্বাতন্ত্র্যে বাংলা কথাসাহিত্যে পদচারণা করে এসেছেন। রবীন্দ্রযুগের কালে তাঁর ছোট গল্প এক আশ্চর্য সাহিত্যকর্ম। প্রেমেন্দ্রবাবুর বড় কৃতিত্ব তাঁর বলার ভঙ্গি এবং সেই সঙ্গে বক্তব্য উপযোগী সার্থক ভাষা ব্যবহার। সাহিত্যিকের ব্যক্তিত্ব তাঁর ভাষাতেই সবচেয়ে বড় হয়ে প্রতিফলিত হয়।

এত কথা বলার কারণ, প্রেমেন্দ্রবাবুর সদ্য প্রকাশিত 'প্রেমের চোখে পরাশর বর্মা' পড়ার অব্যবহিত পরে তাঁর সম্পর্কে নতুন কিছু কথা মনে পড়েছে। আলোচ্য গ্রন্থে লেখক 'প্রেমের চোখে পরাশর বর্মা' নাম-গল্পটি ছাড়াও 'বেইমান বাটিকারা' নামে একটি রচনা পাঠকদের উপহার দিয়েছেন। নামগল্পটি অনেকটা নভেলেটের মত। এখানে চরিত্র কাহিনীর উত্তমপুরুষ, পরাশর বর্মা, হারীন রক্ষিত, বারীন দীপিকা মানসী রায়, অধরচন্দ্র বক্সী ইত্যাদি। পরাশর বর্মার গোয়েন্দা-কৃতিত্ব কাহিনীর রহস্যকে ঘনীভূত করেছে। হারীনকে কেন্দ্র করে দীপিকা এবং মানসী রায়ের তৎপরতা, হারীনের মৃত্যু ইত্যাদি ঘটনা ও চরিত্র নিহিত নানা আলোচ্য নভেলেটটিকে বাস্তবিক অর্থে মুখরোচক করে তোলে। এই কৃতিত্ব একমাত্র প্রেমেন্দ্রবাবুর লেখনীতেই সম্ভব। 'বেইমান বাটিকারার' কাহিনীতেও পরাশর বর্মার সেই উদ্ভট কর্মপ্রয়াস ও শেষে রুমা সহায়কে শায়েস্তা করার রোমাঞ্চ-কর কৃতিত্ব বর্ণিত। ধূর্ত, পাষণ্ড রুমা সহায় চরিত্র অংকনে লেখকের কৃতিত্ব মুগ্ধ করে। প্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত 'প্রেমের চোখে পরাশর বর্মা' গ্রন্থটি এক নিশ্বাসে পড়ে গভীর রহস্যময় ভাবনায় নিবিষ্ট করার মত ক্ষমতা রয়েছে।

রান্না, পদ্মা থেকে সিন্ধু ও কাবেরী—পারুল সেনগুপ্ত, প্রকাশক : সৌরীন্দ্র সেনগুপ্ত। দাম : পনেরো টাকা। প্রাপ্তিস্থান : ৮৪ এন বি ব্লক 'ই', নিউ আলিপুর, কলকাতা—৫৩ ডি এম লাইব্রেরী ও নাথ ব্রাদার্স।

'রান্না' নামে একটি শব্দ সৈনন্দিন কর্তব্যের বৈচিত্র্যের পর্যায়ে উন্নীত করে যে সাহিত্যিকের একটি চমৎকার রসসৃষ্টির উৎসে পরিণত করা যায়, উল্লিখিত বইখানিই তার প্রমাণ।

রন্ধনশিল্প জগতে শ্রীমতী পারুল সেনগুপ্ত নামটি আজ হয়তো আর অপরিচিত নয়। লেখিকার অপর রান্নার বই দেশদেশের জলখাবার' কয়েক বছর আগে যখন আমাদের হাতে এসেছিল তখনই তার মৌলিক উপস্থাপনার কায়দাটি আমাদের আকৃষ্ট করে।

জলখাবারের বইখানির পরে অবশ্য বাংলা তথা আসমুদ্র হিমাচল সমগ্র ভারতে পরিবেশিত অন্নব্যঞ্জনের বিচিত্র সংকলন 'রান্না, পদ্মা থেকে সিন্ধু ও কাবেরী' লেখিকার দ্বিতীয় প্রচেষ্টা। এই সংকলন গ্রন্থেও শ্রীমতী সেনগুপ্ত তাঁর উপস্থাপনার মৌলিক ধারাটি অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। উপরন্তু সন্তান দৃষ্টি রেখেছেন এর ব্যবহারিক দিকের প্রতি। রকমারী রান্নার নির্বাচন, সংগৃহীত উপকরণ ও উপকরণের মাপ নির্ধারণ ব্যাপারে নির্দেশ দিতে গিয়ে তিনি আধুনিক অর্থনীতি ও সমাজব্যবস্থার বাস্তব দিকটি সব সময়েই চোখের সামনে রেখেছেন।

বাংলা ভাষায় আজকাল অনেক রান্নার বই প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু পারুল সেনগুপ্তের 'দেশদেশের জলখাবারের মতই 'রান্না, পদ্মা থেকে সিন্ধু ও কাবেরী নিঃসন্দেহে সেই পুস্তকাকারে হারিয়ে যাবার মত জিনিস নয়। এর স্বকীয়তাগুণেই এটি একনিমেষে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নেবে বলেই বিশ্বাস। প্রায় পাঁচশত সুনির্বাচিত রান্নার পাশাপাশি একশত মূল্যবান রান্নার সংকেত এতে একটি বিশিষ্টতা দিয়েছে। এরও উপরে বাড়তি আকর্ষণ এর 'বিকল্প ও অনুকল্প' 'পরিভাষা' এবং 'ওজন ও মাপের কথা' নামীয় পরিচ্ছেদ তিনটি।

আমরা লেখিকাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে তাঁর এই বইখানিরও সাফল্য কামনা করছি এবং সাগ্রহে প্রতীক্ষা করছি, কবে তিনি ভূমিকায় দেওয়া প্রতিশ্রুতিমত তাঁর নূতন পরিকল্পনা অনুযায়ী 'আধঘণ্টার কটিতে রান্না', 'চালের অভাবে গম বা অন্য শস্যের বিচিত্র ব্যবহার, কিম্বা রুমালোর হাজারে সস্তা ও পুষ্টিকর রান্না প্রভৃতি মৌলিক রান্নার প্রণালীগুলি আধুনিকাদের হাতে তুলে দেবেন। বর্তমান খাদ্য ও অর্থ সংকটের দিনে এধরনের মৌলিক নির্দেশের সত্যিই বড় প্রয়োজন।

চুক্ত ধাবমান স্বয়ংবরে : আনন্দ ঘোষ হাজরা, শিঞ্জিনী প্রকাশনী, মালদহ। মূল্য : তিন টাকা।

বেশ কয়েকটি চমক জাগানো কবিতা নিয়ে কবির এই প্রথম কবিতা সংকলন। আধুনিকতার নামে শহুর জীবনে যে দুর্বোধ্যতা, সেই মোহপাশ থেকে কবি অনেক ক্ষেত্রে মুক্ত হতে পারায় বহু কবিতাই তার শেষ পরিচয় রাখতে পারেনি। বিসর্জন, সাপ, আহত-পুরোহিত, নাগমণ্ডলী সুখ-পাঠ্য রচনা। ছন্দ ও শব্দের প্রয়োগে যদিও দুর্বলতা আছে তবুও ভবিষ্যতে কবির হাতে আরো সুন্দর কবিতার জন্ম হবে বিশ্বাস রাখি।

দুর্বলোকে পর্যটন (কবিতা সংকলন) : শ্যামল-কুমার ঘোষ। লোকায়ত প্রকাশনী, ১১।২৩, অশোক এভিনিউ, দুর্গাপুর-৪। তিন টাকা।

শ্রীশ্যামলকুমার ঘোষ একজন তরুণ কবি। তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'প্রথাসিদ্ধ হিংসা উন্মাদ' কবিতা সংকলনে যে ছন্দ, শব্দ, চিত্র-কল্প ও বিষয়ভাবনায় অলীকের রেখা-ছিলেন, আলোচ্য সংকলনে তা থেকে অনেক পরিণত প্রতিশ্রুতির পরিচয় রাখতে সক্ষম হয়েছেন। সংকলনভুক্ত সমস্ত কবিতাই সনেট। সনেট রচনায় কবি যে প্রথাগত না থেকে কিছু অভিনবত্ব অর্জনে পেরেছেন, গ্রন্থভুক্ত নয়ন তদন্ত, বিষয়ের মিলন, অভিমান, সনেট : নিজস্ব প্রতি সিরিজের সাতেরোটি সনেটই তা প্রমাণ করে, নক্ষ চিত্রকল্প প্রয়োগে কবি যথার্থ অর্থে আধুনিক। অত্যন্ত সংযত বুদ্ধিমান অথচ অনুভূতিপ্রবণ এই তরুণ কবি সনেট কবিতায় আমাদের তৃপ্ত করেছেন।

সংস্কৃতি পরিক্রমা। সম্পাদক অমলা চক্রবর্তী। কলকাতা-২৯ থেকে প্রকাশিত। দাম দু টাকা।

চতুর্থ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যায় বিভিন্ন বিষয়ে মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেছেন হিরণ্ময় ঘোষ, ডি ডি কার্ভে, খোন্দকার, নুরুদ্দিন জাহাঙ্গীর, নিরঞ্জন হালদার, শৈলেন বন্দ্যোপাধ্যায়, গল্প লিখেছেন অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কবিতা লিখেছেন আবু ইউসুফ আবাউল রহমান, ডি এ নাটো, মোহিনী-মোহন গাঙ্গুলী ইত্যাদি।

জন্ম নিয়েছে পৃথিবী এবং.....! সমর মজুমদার। প্রকাশক : তরুতীর্থ প্রকাশনী। ১২।২ ছত্র খানসামা লেন। কলকাতা-৯। এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

ছোটদের জন্যে এটি একটি গীতিনাট্য। বিজ্ঞানভিত্তিক এই গীতিনাট্যের মধ্যে দিয়ে কিশোরদের সমাজ ও বিজ্ঞানের ক্রমবিবর্তন সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। গানগুলি সুন্দময় হওয়ায় সহজে এই গীতিনাট্যটি মঞ্চে জমে উঠতে পারে।

শান্তিনিকেতন : সম্পাদনা : রবীন্দ্র ঘোষ। রতন পল্লী। শান্তিনিকেতন। দাম : এক টাকা।

এই সংখ্যায় প্রবন্ধ লিখেছেন : ইন্দ্রজিৎ ডঃ পঞ্চানন মন্ডল, সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়। কবিতা লিখেছেন জ্যোতিষ মুকুরার, রমা-প্রসাদ ঘোষরায় রাজেন্দ্র সিংহ, সঞ্জীব কুন্ডু কবীন্দ্র চৌধুরী, জয় দেবনাথ, জ্ঞানদা চাটার্জি, সুশান্ত মিত্র। গল্প লিখেছেন : সন্ন্যাসী মন্ডল প্রমিতাভ ঘোষাল এবং আরও কয়েকজন।

পঙ্কের কাজ ও টেরাকোটা

গত ২২শে জৈষ্ঠ (ইং ৬ই জুন) অমৃতের চিঠিপত্রে 'পঙ্কের কাজ ও টেরাকোটা' নামে আমার একটি দীর্ঘ আলোচনার প্রতি কয়েকজন সমালোচকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। গত ৪ জুলাই শ্রীঅমলেন্দু চক্রবর্তীর একটি ছোট্ট চিঠি এবং 'অমৃতে'র বর্তমান সংখ্যায় (২২শে শ্রাবণ) প্রত্যাঙ্কিত নীহারেন্দু মাস্নার নাতি-দীর্ঘ পত্রটি পাঠ করে বিষয়টির গুরুত্ব সে কম নয়, তা বেশ বোঝা যায়।

উক্ত সমালোচকদ্বয়ের লেখা পড়ে একটা কথাই মনে হয়েছে, শুধুমাত্র অভিধান গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে আমার পূর্বোক্ত আলোচনার মূল বক্তব্য বিষয়কে চাপা দেবার চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু তা যে সর্বাংশে ব্যর্থ হয়েছে আমার বর্তমান আলোচনা থেকে আশা করি তা পরিস্ফুট হবে, সঙ্গে সঙ্গে কথাটি 'পঙ্ক' না 'পঙ্খ' আর লিপ্ত শব্দের টেরাকোটার প্রকৃত অর্থটিই বা কি তাও অন্যত্র একটুখানি ধরবার চেষ্টা করব।

প্রথমে 'পঙ্ক না পঙ্খ' সৃষ্টি ও প্রমাণের দায়ভার স্থির করা যাক। চিঠিতে 'সর্বজনশ্রদ্ধেয়' শ্রীমান্না আমার হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' গ্রন্থ থেকে একটি উদ্ধৃতি দিয়ে অর্থাৎ 'পঙ্ক' শব্দের চতুর্থ অর্থটি "(লাক্ষায়) অট্টালিকার ভিত্তিতে বা অন্য দেয়ালাদিতে রং-করা কলেই (ইং পাকোঃ) বলে তার পরে আর একটি অংশ যোগ করে দিয়েছেন—শব্দের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে : পঙ্খ অর্থ পঙ্ক (৪) অর্থাৎ পঙ্ক এর অন্য সমার্থক শব্দ।" আমার প্রশ্ন, শ্রীমান্না এই তথ্যের ব্যাখ্যাটি কোথায় পেলেন? এটি কি স্বয়ং হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উক্তি না শ্রীমান্নার স্বকপোলকল্পিত? শ্রীমান্না নিশ্চয়ই জানেন এটি হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উক্তি আদৌ নয় এবং সেই জন্যে এটি তিনি কৌশলে ইনভার্টেডে কমার মধ্যে রাখেন নি: আমরা বড় জোর করতে পারি 'পঙ্ক অর্থ পঙ্খ' এই ধরনের অন্য কোনও শব্দকোষের কোথাও পেলেন না। বরং "....দুই বক্তব্যবিশেষের ঠিক পরেই উদ্ধৃতটি দেওয়া আছে—(দ্রঃ বঙ্গীয় শব্দকোষ ৫৭-৪) "পঙ্কের কাজ। (বঙ্গীয় শব্দকোষ, পৃ ১৭১৪)" এ থেকে [illegible] সহজেই অনুমান করতে পারা যায় যে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কখনও পঙ্খ শব্দের ব্যাখ্যায় পঙ্ক শব্দের উল্লেখ করেন নি। বরং তিনি যে 'পঙ্খ' শব্দের সঙ্গে 'পঙ্ক' শব্দের ভ্রান্তিমূলক সাজুয্যের কথা বলেছেন তা একান্তই অর্থহীন। শ্রীমান্নার জানা উচিত ছিল 'পঙ্খ' ও 'পঙ্কে'র 'সাজুয্যে' থেকে (অবশ্য সাজুয্য বলতে তিনি কি বুঝেছেন, তা আদৌ স্পষ্ট নয়) কৈশবিতাই স্পষ্ট করে ধরা পড়ে, শুধুমাত্র ধ্বনির দিক থেকে নয়, ভাবার দিক থেকেও। কারণ পঙ্খ শব্দটি হোল খাঁটি সংস্কৃত বা তৎসম শব্দ আর 'পঙ্ক' (অবশ্য হাঁর এই শব্দটি জানা থাকে) ঠিক কোন শব্দ থেকে এসেছে তা জানা যায় নি।

টেরাকোটা সম্পর্কে শ্রীমান্না আমার পূর্বপ্রকাশিত আলোচনা থেকে একটি অংশ তুলে দেখিয়েছেন অভিজ্ঞবাবু যে অর্থে তৈজসপত্রের কথা বলেছেন তা আমি বুঝতে পারি নি। আসলে কিন্তু তা নয়। শ্রীমান্না এখানেও আগের মতো আসল কথাটি চাপা দিতে চাইছেন। পাঠকসাধারণের জ্ঞানার্থে অভিজ্ঞবাবুর পূর্বপ্রকাশিত রচনা (১৮।৪।৭৫ তারিখে অমৃতে প্রকাশিত 'পঙ্কের কাজ') থেকে সেই অংশটি আবার তুলে দিচ্ছি—"মন্দির টেরাকোটা কথাটা এখন অনেকের কাছেই খুব পরিচিত শব্দ। কেউ কেউ আবার টেরাকোটা বলতে পোড়ামাটির মন্দির সজ্জাকেই বোঝেন (এবং লেখেন)। তাঁদের অবগতির জন্য বলা প্রয়োজন যে টেরাকোটা এই ইতালীয় শব্দটি ইংরাজী ভাষায় গৃহীত হয়েছে এবং এর অর্থ পোড়ামাটি বা তার তৈরি যে কোন জিনিস তা সে মন্দির অলঙ্করণই হোক বা হাঁড়ি-কুঁড়ি বা অন্য তৈজসপত্র হোক।" শ্রীমান্না এখানে একটি অদ্ভুত প্রশ্ন করেছেন—"অমিয়বাবু কি এখানে ধাতব তৈজসপত্রের কথা বিন্দুমাত্র উল্লেখ করেছেন।" এ প্রশ্নের কি উত্তর দেব জানি না, তবে বলতে হয় শ্রীমান্নার জানা উচিত ছিল 'তৈজসপত্র' শব্দটির অর্থ কি? 'তৈজসপত্র' শব্দটির একমাত্র অর্থ হোল, ধাতুঘটিত পাত্র, মৃন্ময় পাত্র কোন মতেই নয়। কিন্তু উদ্ধৃতিটিতে 'তৈজসপত্র' কথাটি প্রয়োগ করার উদ্দেশ্যই হোল মৃন্ময় পাত্রকে বোঝাবার জন্যে, যা এই প্রসঙ্গে অবশ্যই অর্থহীন। অতএব আমার পূর্ব উক্তি—"তৈজসপত্র যে ভাবে টেরাকোটার অন্তর্ভুক্ত হয় তা বুদ্ধিমান অগম্য" এতে আমার না বোঝার কিছুই নেই বরং এটা স্পষ্ট—লেখক টেরাকোটার মধ্যে তৈজসপত্রকে টেনে এনে এক বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছেন। এটাও ঠিক যে তৈজসপত্র বলতে শুধু ধাতব পাত্রকে বোঝায় এমন কিছু নয়। অতএব ".....তৈজসপত্রাদিকে পটারি এবং পটট্রাডস দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে (শ্রীমান্নার ভাষা)—এই ধরনের প্রয়োগ খুবই বিভ্রান্তিকর।

টেরাকোটার প্রাথমিক অর্থ বেকড আর্থ বা পোড়ামাটি হলেও শ্রীমান্নার ভাষায় "শৈল্পিক দৃষ্টিকোণ" থেকে 'টেরাকোটা' বলতে পোড়ামাটির অলঙ্করণকেই বুঝতে হবে, নচেৎ 'ব্রিক টেম্পল' ও 'টেরাকোটা টেম্পল' প্রয়োগ দুটির অর্থ স্পষ্ট হয় না। এ সম্পর্কে শ্রীমান্না অধ্যাপক সরনীকুমার সরস্বতীর 'এ সার্ভে অব ইণ্ডিয়ান স্কালপচার' বা তৈলা ক্লামবিশের 'ইণ্ডিয়ান স্কালপচার' বই দুটির পাতা ওল্টালে আশা করি বুঝতে পারবেন। মাত্র তিন বছর আগে প্রকাশিত ডেভিড ম্যাকক্যাচনের 'দেউ মিডিয়েভাল টেম্পলস অব বেঙ্গল'ও টেরাকোটাকে বারবার সৌধ ব্যবহৃত পোড়ামাটির অলঙ্করণ বলেই উল্লেখ করা হয়েছে। টেরাকোটা সম্পর্কে অজস্র প্রবন্ধ ইণ্ডিয়ান এ্যান্টিকোরারী, ইণ্ডিয়ান কালচার, এসিয়াটিক সোসাইটির নানা বক্তৃতা জার্নাল জার্নাল অব দি ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট প্রভৃতি বহু উচ্চস্তরের গবেষণাধর্মী পত্রপত্রিকায় ছড়িয়ে আছে।

প্রায় সব প্রবন্ধেই সৌধগাত্রের পোড়ামাটির অলঙ্করণকেই টেরাকোটা নামে অভিহিত করা হয়েছে। কাজেই টেরাকোটা সম্পর্কে বাদানুবাদ এখানেই শেষ হবে আশা করি।

প্রণব রায়
চুঁচুড়া, হুগলী।

স্বপ্ন, ফুলের নাম

গিরিধারী কুন্ডু

ছবিটা কোথায় গেল?

আক্ষেপ হল অয়নের। নিজে নিজের মতো করে এইরকম বলে ফেলল কাকেকবার—

ছবিটা কোথায় গেল? ছবিটা!

খাটের একপাশে অয়ন চুপচাপ বসে। এখন ওর চোখের সামনেকারুনি এঁটে রয়েছে খাড়া অন্ধকার। ছোপ ছোপ অন্ধকার। কেবল সম্প্রতি চুনকাম করা দেয়াল কি করে যেন সাদা ফরসা হয়ে!

এখনো শীত এসে পৌঁছয়নি। না শিরশিরিয়ে ওঠে না হাই। বরং শিরদাঁড়া বরাবর লম্বালম্বি হয়ে বুকের হাড়াগুলো পুরো পর্যন্ত ভিজে চুপসে রয়েছে। মুখের গা থেকে কী ফোঁটা ঘাম ঝরে পড়ে ভীষণ জোরকারে লাল ঘাম নেমে এসে এই শরীর। ঘুমের ভেতর ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে এই বিছানায় অমন চৌদ্দ শরীরের সব দিক মুছে নিয়ে তোয়ালে টেনে।

হঠাৎ এই রাতে ঠ. ঠ. করে রাস্তার এক কাপড়া এগিয়ে আসায় কাকেকারের কানদুটো একসঙ্গে কোঁপে উঠল। অয়ন একবারটির জন্য অন্ধকার ছেয়ে থাকা ছাদের ওপর চোখ তুলে রাখে। আর অনেকক্ষণ ধরে বুক চাবানো ঘুমের মুখে আসা ওই সুন্দর চোখের কাছে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করে।

একটা স্বপ্নের ঘুড়ি নেচেকুদে হয়ে উঠেছিল। বেশ কদিন ধরে মাঝরাতে ঘুমের ভেতর একলা নিজে একে টিকটিকি আঁকা অনেক আগের পাতার ওপর ফেলে দিতে আচমকা ঘুম ভেঙে যায়। আর ধরতে পারে না কিছুতেই। এ-কথা মনে আসতে হাতড়ে বেড়াচ্ছে অয়নের পরীক্ষে।

ওই ছবিটা—হ্যাঁ ঠিক ওই ছবিটা এখন মনে পড়তে চাইছে একে একে। চারধারে মাটির দেওয়া। ইটেরঙা কালচে মাটি। পাশ-ধারে বাঁশের বাঁশ সব পাশ। মুখখানে নীল সাদার কৈশোরে জরুরে ওপর একটুকরো আকাশ। আকাশে ও অসংখ্য লাল রং ছড়ানো। আর ওখানেই হচ্ছে বড়ো কেষ্ট হাসপাতাল—কেষ্ট যেখানে ভর্তি ছিল সেদিন।

স্বপ্নের গা স্পর্শ করে বেশ কিছু বিন্দু সাবানের ফেনার মতো বুজবুজে হয়ে ভাসছে। ওদের বিন্দুরা সমানে ফুলে উঠছে। একটা ফাটা চৌপ্পা আর আরেক ফোঁটার সঙ্গে। তারপর আরও

পাশের অন্য ফোটায়—এমনিভাবে একের পর এক মিলেমিশে বিশাল এক বিন্দু তৈরি হল! আর সে-ফোটায় আড়ালে লুকিয়ে রক্তমাখা মাটি...ভিটেমাটির এক টুকরো দ্বীপ...সমুদ্রের নীল জল...সব কিছু।

ভার সইতে না পেরে বিন্দুটা এক সময় ভেঙে পড়ে নিঃশব্দে। এবার আরো তেজী হয়ে দেখা দিলো পুরনো হওয়া সেদিনের ছবি।

শান্ত পায়ে এগিয়ে এসে কেয়াকে বিবস্ত্র করে রেখে চলে গেল নার্স। দু'পাশে দাঁড়ানো ডাক্তার দুজন সঙ্গে সঙ্গে তিনটে থান চাদর যেমন হয় ওইরকম সাদা কাপড় বিছিয়ে ওর দেহকে ঢেকে ঢুকে দিল। ঠিক তখুনি কেয়ার শরীরের সব দিক অয়নের চোখ টানে নি, আর সে-ও গোটা শরীরকে খুঁটিয়ে দেখেনি, এমন নয়। তবে, কোন ভাবান্তরের বহিঃপ্রকাশ চোখে বা মনে প্রকাশ পেল না। অন্য সময়ে স্বভাবতই যা হয়ে থাকে।

কালো ব্লাউজ জাতীয় জিনিসটা খসখস শব্দে বার করেক জোরে চেপে দিতে কসে কেয়ার চঞ্চল শরীর মিইয়ে গেল। সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলল কেয়া। ওর নিমীলিত চোখে-মুখে তখন রীতিমত কষ্ট এবং যন্ত্রণার অপ্রসন্ন ছাপ। অপারেশনের আগে মনে ভয় ধরে যাওয়ার হয়ত সম্ভবনার এ ছাপ!

অয়নের দিকে তাকিয়ে ডাক্তার পাল বললেন,

অয়ন, এর পালস দ্যাখো ত।

তাড়াতাড়ি গলায় বলে ফেলে অয়ন।

ঠিক আছে সার।

ধমকের সুরে বললেন তিনি।

না দেখেই বলছ ঠিক আছে! ফাঁকি দেবার ইচ্ছে কেন এত?

এই একটু আগে দেখলাম যে সার।

আমার সামনে ত আর দ্যাখনি। অপারেশন টেবিলে রোগী থাকলে বারবার পালস, ব্লাড প্রেসার দেখবে।

কেয়ার শরীরে, হাতে হাত রাখে অয়ন। নাড়ীর স্পন্দন গোনার সময় ওর শরীর ভীষণ ঠান্ডা ঠেকল। কেয়ার নরম মুখখানা অন্য সময়ের চেয়ে একটু বেশি ফ্যাকাশে হয়ে রয়েছে! চুলের ছাড়া বেণী অপারেশন টেবিলের ধার ঘেঁষে ঝুলে। চুলের চকচকে ভাব কমে গেছে যেন এ দু'দিনে, এমনিতে কিন্তু ওর এক মাথা কালো চুল। যা পালসের মতোই নরম, স্বোয়ারেম।

অজ্ঞান করাবার লোকটা তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন—

অকটর পাল, আপনি শুরু করতে পারেন।

দীর্ঘ হাত এগিয়ে দিয়ে সার্জেন পাল ছুরি তুললেন, সেই সঙ্গে ছুরির ধার পরখ করে নিজের চোখের সামনে ধরে রেখে। আর এর পরই ডানপাশের অপারেশন টেবিলে প্রায় ইঞ্চি দেড়েক আচড় বসালেন ওই ছুরি দিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে এক আঁজলা রক্ত উপচে বেরুলো। এক আঁজলা রক্ত টপটপ করে ঝরে পড়তে থাকল কেয়ার কোমরের ধার ঘেঁষে। অয়ন ধারালো চোখের নিচু চাউনি পাশে ঘুরিয়ে নিল অমনি।

এতদিন বাদেও ওই রক্তাক্ত দৃশ্যে—রক্তের কণায় চিকচিকে ভাব! ভেঙে পড়ল চোখে, মুখে আর সারা স্বপ্নের গায়ে। গোটা স্বপ্নে টকটকে লাল রং লাগে মুহূর্তের জন্যে! না—লাল ঠিক নয়, কালোর ওপর লাল প্রলেপ। অগোছালোভাবে জমানো অনেকদিন আগের ছবি লাল লাল দেখতে হয় যেমন, তেমনি!

ফোটা ফোটা রক্তের দাগ মাড়িয়ে অয়নের ক্লান্ত দৃষ্টি এর আগের দিনের সন্ধেয় ফিরে যায় হঠাৎ-ই। কেয়াকে প্রচন্ডরকম মনে করিয়ে দিল, আর কি! অয়ন চিন্তায় খুব গভীরে ডুবে যাচ্ছে এখন...

অয়নের চোখ ছুঁয়ে কেয়ার কমনীয় সরল সুন্দর চাউনি পড়ে। কেয়া বলছে—

এই, তুমি কাল সামনে থাকবে?

একথা বলছ কেন?

কেয়া আগের মতো-ই মিষ্টি করে বলল, কাল যে আমার অপারেশন মশাই, তুমি শোনো নি?

জানি সে-কথা।

এই শোনো, আমার না খুব ভয় করছে! কাল আসবে। তুমি না এলে আমি থাকতে পারি না! তুমি কাছে থাকলে আমার মন কত খুশি হয়, সে-কথা নিজের মুখে কতবার আর বলব?

অত ভয় পাচ্ছ কেনো কেয়া? আপেন-ডিকস অপারেশন কি আমার একটা অপারেশন! এর চেয়ে কত কঠিন কঠিন অপারেশন হাসপাতালে রোজদিন হয়। সবাই বাড়ি চলে যাচ্ছে ভাল হয়ে। সকাল দশটায় অপারেশন হলে, চার-পাঁচ ঘন্টা পরই জ্ঞান ফিরে পাবে।

একটুতে অভিমান কেয়ার। তবু কেমন যেন এক অভিমান মেশানো সুরে গলার স্বরে।

কাছে থাকবে না ত! যাও, আজ থেকে তোমার সঙ্গে আমার সব সম্পর্কের কাটাকুটি।

অয়নও বলে,

তুমি যদি এরকম ভাবো, তা হলে আলাদা কথা।

হঠাৎ মনে হয়, কেয়ার চোখের পাতা ভিজে গিয়ে জল গড়িয়ে পড়বে এই বুঝি।

অয়ন বলল তাই,

এই কেয়া, এসব আবার কি হচ্ছে! কাঁদলে-টাদলে আমি আর তোমাকে দিনে চব্বিশবার করে দেখতে আসব না কিন্তু!

বারবার দেখতে আসার কথা মনে হলে যায় কিশোরী কেয়ার।

আসবে না ত আসবে না। অত বড় মুখ করে দেখতে আসার কথা বারবার মনে করিয়ে দেবার কি আছে?

অয়ন ভাবে, ও বলে দিক, ঠিক আছে আমি চলি। তোমার রাগ নিয়ে তুমি একা থাকো।

এরকম কথা বলা ঠিক নয় এখন। অপারেশন আজকের রাতে। কেয়া দুঃখ পাবে। সামান্য এ আঘাতে ওর স্নায়ু-কোষের গোড়ার পৌঁছে গিয়ে অশান্ত করে তুলবে। তাই স্নায়ুর ওপর চাপ বেড়ে চলবে—কি হয়, কি না হয়। সারারাত চিন্তা করতে থাকবে। ঘুম নেবে আসবে না ওর বড় বড় ফুটকুটে দু-চোখে! শরীর এবং মন দুই-ই ভেঙে পড়বে অপারেশনের আগে। কেয়া আবার একটু নার্ভাস ধরনের। এতসব ভেবে নিয়ে অয়ন চুপ করে থাকে কিছুক্ষণ।

ওয়ার্ডের সবাইকার ধারণা, অয়ন প্রোপুরি ডাক্তার হয়ে গেছে। আসলে কিন্তু এ কলেজ-হাসপাতালে ওর ডাক্তারী পড়ার শেষ বছর এটা।

কেয়া ঘনিষ্ঠতার আসল রহস্য অপ্রকাশ রাখতে ওকে আত্মীয় বলে পরিচয় দিয়েছে সকলের কাছে।

অয়ন আর কেয়া বারান্দায় ঘনভাবে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল। সবেমাত্র সিগারেটে মুখে আগুন ছুঁইয়েছে, এমনি সময় গলায় স্টেথোস্কোপ ঝোলানো এক ডাক্তারের মুখোমুখি হতে হল। অয়নি ও সিগারেট শরীরের পেছনে নিয়ে লুকিয়ে ফেলে।

জানতে চান ডাক্তার ভদ্রলোক।

খবর কি অয়ন! বল?

ঘাড় নেড়ে অয়ন জানায়,

এই-ত দাদা চলে যাচ্ছে।

ডাক্তার এবার এগিয়ে যেতে যেতে বললেন,

তোমার পেশেন্ট ভাল আছে। কি বল?

সায় দিল অয়ন।

হ্যাঁ।

কথা বলতে বলতে সে-ডাক্তারকে ওয়ার্ডের ভেতর পা ফেলতে দেখে কেয়া চঞ্চল হয়ে ওঠে একটু। বলে উঠল তাই।

আমি যাই। সুভাষদা যেতে না দেখতে পেলে বকাবকি করবেন।

কেয়া দুদিন এখানে থেকেই সবার নাম জেনে ফেলেছে। অয়ন বলল,

এখুনি সুভাষদা আমাকে তোমাকে কথা বলতে দেখে গেছে। আবার বকাবকি করবেন কেন? তবে, একটা ভুল করে ফেললাম মনে হচ্ছে।

কেয়ার গলায় অস্বস্তি ফুটে উঠল কেন, জানতে চায়,

কি ভুল।

এখানে সিগারেট খাওয়ার অবজেকশন আছে মনে হয়।

কেয়া। খেতে গেলে কেন তাহলে? নিচে নেবে ধরাতে পারতে দাদাই।

দু আঙুলে টোকা মারার কায়দায় অয়ন বেসিনের দিকে ছুঁড়ে দিল সিগারেটের শেষ অংশটুকু।

কেয়া হট করে জামার ওপরকার পকেটে এক হাত ঢুকিয়ে দিতে প্রশ্ন মুখে অয়ন বলে।

পকেটে আবার হাত ঢোকালে কেন?

দেখছি, কি আছে তোমার পকেটে।

আবার সামান্য হাসি দেখা যায় অয়নের ঠোঁটে।

পকেট দেখতে গিয়ে কেউ বুকের কাছে চিমটি কেটে বসে? উঃ লাগছে! বলছি, হাত বার করে নাও বিনীতদা।

বেশ একটু শক্ত গলায় বলল শেষের কথাগুলো।

পকেট থেকে বাসের একটা টিকিট আর কলম দাশু হাতে আসতে তাই নিয়ে আসে কেয়া। তারপর-ই প্রহরের দিকে পেছন ফিরে দেয়ালের ওপর ওটা রেখে কিছু লিখে ওকে দেখতে দেয়।

ও টিকিটটায় লেখা—কাল থাকবে না কাল?

অয়নও ওর লেখার শেষ পকেট থেকে আরেকখানা বাসের টিকিট তুলে নিল। তাড়াতাড়ি লিখল—

আসব, আসব। তোমাকে না দেখে আমিও কি থাকতে পারি এত দূরে তুমি?

ঠিক এমনি সময় আলো গেল নিভে। ওয়ার্ড থেকে ঈষৎ ভারী গলায় হাসি ভেসে এল।

অপ্রত্যাশিত এই আলো চলে যাবার পেছনে কোন কারণ খুঁজে পেলো না ওরা। আজকাল এখন-তখন আলো চলে যাওয়া মাথা ধরার কারণ নয়, তেমন অসুখের ঘরে কচ্ছপ দাঁড়িয়ে। অন্ধকারের ভেতরই ও অয়নকে চেপ্টা করল ছুঁতে। ধরতে পারে না তবু। অয়ন বলে,

এই, এসব পাগলামী করবে না, কেউ দেখে ফেলবে। সবাই আমার চেনা এখানে।

লজ্জাহীন গলায় কেয়াও অনায়াসে বলে দিল।

বেশ করেছি। আমার যা ইচ্ছে তাই করব। তোমার তাতে কি! অন্ধকার আছে তো-ই তোমাকে স্পর্শ করলাম।

অয়ন এ-কথার পর নিরাপত্তা বোধ করল না। একে এই অন্ধকার, তার ওপর মনের ভেতরে কচি সবুজের বিস্ময় সব চঞ্চল। আজ মনে হচ্ছে অয়নের, সেদিন দুজনার ধরে ফেলাকে নিশ্চয়ই সহজে নিতে পারত না কেয়া।

অপারেশনের পরের দিন ইচ্ছে করে ও সারা সকাল রূপা বা অন্য কারো সঙ্গে। রাত তখন নটা, সবাই ঘুমিয়ে পড়ার অয়নকে দেখা গেল ওয়ার্ডে।

কেয়া শুধু ঘুমোয় পাশেই, এর ওর পাশে আয়া সঙ্গে। চিত হয়ে শুয়ে আছে। ধবধবে পরিষ্কার শাদা বিছানার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পেটের স্ফীতি। আর তেমনি ওপরকার অংশ উঠে আছে, শরীরের বাকী অংশ চাদরে শুধু ঢাকা।

আয়া মোড়ার হাত বুলোয় সিচ্ছিল পিঠের ঘামে। পায়ের শব্দে সামলা সরে গেল কেয়া।

কেয়া অয়নকে দেখে খুশি নয়, কই শরীর উঠে ফ্যান চালাবার কথা অনেক চেষ্টা করেও শুধু পাশে সরিয়ে দিতে পারল না ওকে। তাড়া ছাড়াতে পারছে হয়ত আয়ার ঘন বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে রইল। চোখ সম্পূর্ণ খোলা রাখে নাকের।

অয়নের ওপর ও ভীষণ রাগে, না হোক্কা গেল সহজেই।

পিঠ হাত বাড়ে অয়ন, তবু কেয়া চুপ করে। শুধু অয়ন চোখ তুলে ধরে ভাবে তাকায় ওর দিকে।

এই কি হল তোমার? কথা বলবে না?

কেয়ার সারা মুখ ভিজে উঠেছে। বড় বড় দু-ফোঁটা চোখ আবার জল গড়াচ্ছে সমানে। বাঁধ ভাঙা জলের স্রোত ছুটে আসে যেমন।

অনা সময়ের। হলে খুব আগ্রহ করে উঠতে চাই না। তবু কেয়া বলল,

সারাটা দিন আসনি কেন?

গাঢ় শোনাল অয়নের গলার স্বর।

এ কদিন তোমাকে নিয়ে ভাববার ছুটি ছাড়া ছিল না। আর তাছাড়া আসতে তু পাঁচ ঘন্টা। এখন তুমি কোথায়, আমি কোথায়। কি হলে মায়া বাড়িয়ে মিটি হয়। ওই অয়ন মুহূর্তে তুমি ডাক বাবার তাদের।

এতদিন সম্ভব ঠিকই। তবে কেয়ার প্রথম ভালবাসা আজ অয়নের মনে।

আমাদের পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ততা চলছে। ইউনিভার্সিটি কেন্দ্র ছাড়ছিল বাধ্যতার সময়। সে জানে আর ঘুপচায় আসা হবে না।

আয়া বেরিয়ে যেতে বাইরে চলে গেল উঠে।

অয়ন অবশ্যই ভেবে নিল—কাল। ভবিষ্যতে অবস্থা কি রকম? বাধা রয়েছে বিস্তর। বাবার চাষ আর হয়েছিল, না—হয়নি! বিকেলে যে কে দেখতে এসেছে? অয়নের এক বন্ধু ডাক্তার, যে কেয়ার কাছে হয় সম্পর্কে, সে এসেছিল।

অয়নের চোখের ইশারায় চোখ মুছে ফেলল তাড়াতাড়ি। ভিজে গলায় ওর এত সব প্রশ্নের উত্তর দিল আর বলল,

মা তোমাকে কাল বিকেলে যেতে বলেছে।

কেয়ার মা দেখা করতে বলেছেন? কেন করার কারণ কি হতে পারে ভাবতে চেষ্টা করল ও।

কেয়া সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠল এর পরের দিন। একটু, দেখে তবুও বিকেলে দেখা করতে গেল কেয়ার ঘরে অয়ন। সামান্য হাসি ছাড়া বলেন কিনি।

তুমি অনেক সময় অসময় আমার জানো। তুমি কাছে না থাকলে সব কিছু, এত তাড়াতাড়ি আমাদের পক্ষে ঘরে ফেরা সম্ভব ছিল না। উনি তু সারাদিনই আমাকে পাহারা দিতেন।

তারপর একটু থেমে নিয়ে বললেন,

আমার তু ইচ্ছে তোমাদের বাড়িতে আমার এ অবস্থায় গিয়ে থাকি। অসুখ, অসুখ করে মেয়েটা যা জ্বালায় বেড়ুচ্ছিল!

মেয়ে একটা কেয়ার মা বলে যাচ্ছেন, অয়ন কেয়া এর মা, বাবার পায়ে ছাপের সামান্য ছোঁয়া দিয়ে ওদের সামনে এসে দাঁড়ায়। আজ আবার তারপর আসার মনে পড়ছে সমস্ত ঘটনা দুপুরের।

ডাক্তার-নার্স থেকে ঠিক তিন ঘণ্টা সকাল সকাল অয়ন দেখা করতে এসে বলল মাকে।

বাড়ি চলে যাবে সন্ধ্যে নাগাদ, বলল।

ঘণ্টাখানেক সুখদুঃখের কথার বেলার মধ্যখানে। বলল ও সেই সন্ধ্যে সময় এসে তোমাকে নিয়ে যাবে কি কেউ থাকতে আসবে? দেখা করে যেন?

অয়নও চায় ওর সঙ্গে যাবে কেউ।

তাহলে মন হয় না তুমি একা করতে পারবে।

ধরুক মেয়ে কেয়া,

বড় সব বাজে চিন্তা তোমার! এই তাদের কেন?

আর ওদের সঙ্গে এলেন না। অয়নের পাওনা টাকা দিয়ে মেয়ের মা সন্ধ্যে কেয়াকে নিয়ে চলে গেল সন্ধ্যে সময় বাবার ওর মা অয়নের সঙ্গে করে, আর বাড়ির থেকে ওদের বিদায় দিতে দুরে যেতে কেয়া একা।

যার না মনে মনে ভুল করেও সন্ধ্যে বিদায় মুখটা কেয়ার বাড়ি ফেরার করতার, অন্যের সঙ্গে সঙ্গে ওদের সঙ্গে যাবে সেখানে। ওর ইচ্ছে করছে খুব ভাবে তাকায় ওর দিকে।

ভীষণ তাড়া। দু একটা কথা সংক্ষেপে সেরে ও চলে গেল।

এদিকে অয়ন বাড়ির চৌকাঠে পা রাখে ঠিকই, কিন্তু কেয়া কোথায়? ও কি অয়নকে এড়িয়ে চলতে চাইছে এখন? আসলে তখন যে কেয়া চোখের আড়ালে রইলেও মনের ভেতরে বড় রকমের এক যুদ্ধ চলছিল ওকে পাবার জন্যে!

হাড় জিরজিরে চেয়ারে বসতে দেখে ঝরঝরে গলায় বলে ওঠে কেয়া।

এখানে নয়, এখানে এসে বসো।

তারপরই ভুরু দুটোর ইশারায় বিছানায় এসে বসতে বলছে ওকে অয়ন তা বুঝল।

আলগোছ দৃষ্টিতে কেয়ার দিকে তাকাতে কেয়া ফিসফিসে গলায় বলে,

এই!

কি?

তুমি বলে বলেই—আমার মা-বাবাকে একদিন না একদিন সব চিঠিগুলো দেখিয়ে দেবে, সত্যি তাই করবে? যদি তুমি দেখাতে চাও তাহলে আমাকে পৃথিবী থেকে চলে যেতে দাও। তারপর সব দেখিয়ো দিও।

কেয়ার এসব কথা শুনতে ভাল লাগলও কেনো যেন নাকী নাকী ঠেকল ওর কানে।

কেয়ার মা হেঁকে বললেন ওপিঠের ঘর থেকে।

তোমরা গল্প করো। এক্ষুনি আমি চা আনছি।

কিন্তু পরে অয়নের হাতে চায়ের কাপ তুলে দিয়ে তিনি সহজভাবে জানতে লাগলেন ওর ব্যক্তিগত খোঁজখবর, এমন কি অয়নরা কজাই, ও সবার বড় কিনা—ওর বাবা কি করেন—কতলা বাড়ি—দাদু ঠাকুমা এখনও বর্তমান, না ওরা গত।

অয়ন বেশিক্ষণ রইল না, চলে আসার সময় কেয়া দরজার কোণে এসে দাঁড়িয়ে থেকে বলছে,

এই, একদিন বেড়াতে যাবে?

কোথায়?

যেখানে তুমি নিয়ে যেতে চাইবে, সেখানেই।

তাহলে কালই হোক না বেড়াতে যাবার ব্যাপারটা।

বাধা দিয়ে বলে ওঠে কেয়া,

কাল, ঘা—না কাল নয়, পরশু তুমি ঠিক পৌনে দশটায় ইস্টার্ন সিনেমার কাছে দাঁড়াবে। আমি আসব।

রসিকতা করার জন্যে আবার জ্ঞানতে চায় অয়ন।

কাল নয় কেনো?

রোজ আমাকে যে মাসী স্কুলে দিতে যায়, নিতে আসে, ওকে বলতে হবে আগে। তবে ত যেতে পারব মনাই।

কথা রাখতে কেয়া ঠিক দিন ঠিক সময়ে সিনেমা হলের কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল।

ঝোলা ব্যাগ একটা কেয়ার কাঁধে। ওতেই কেয়ার যাবতীয় বই।

এক শব্দও কথা বলাবলি হল না। দুজনে ট্যাক্সিতে গিয়ে উঠল। গাড়ির ড্রাইভার ওদেরকে আয়না দিয়ে স্বচ্ছন্দে দেখছিল। গন্তব্য স্থান জেনে নিয়ে সে-জায়গায় পৌঁছে দিল সহজেই।

কেয়া আর অয়ন ভিক্টোরিয়ার সুগন্ধি-সোঁদা পেছনে রেখে নরম ঘাসের বুক মাড়িয়ে পা পা এগিয়ে সবুজ ঘাসের বিছানায় বসলো ধুপ করে। সুসোধ এখন সূর্যের গনগনে রোদ পেয়ে রীতিমত উষ্ণ্বল। সারা আকাশ ঝকঝকে তকতকে; একখণ্ড সাদা ছেঁড়া মেঘের অংশ ছাড়া সর্বত্র নীল রং পড়ে!

চমক লাগানো চোখে অয়ন তাকিয়ে। সত্যি সত্যি যেন চমকে ওঠে কেয়ার বুক।

এই, কি দেখছ অমন করে!

তোমাকে।

আহা, বেশি বেশি! আমাকে নতুন করে দেখার কি হল? রোজই ত দেখো।

হালকা স্বর বেজে উঠল অয়নের গলায়।

তুমি এত সুন্দর তা কোনদিন চোখে পড়েনি যে, তাই দেখছি।

জিভ কেটেছিল কেয়া। আলগোছে অয়নের মুখে ঠেলে বলে—

মাথা খারাপ দেখি একটু। ইস কি ভালো দেখাচ্ছে না! কিছু বলো না।

কি আর বলব।

উঠে দাঁড়ায় কেয়া। তারপরই সূর্যমুখী ফুলের বাগানের দিকে খুশি পায়ে দৌড়তে লাগল। অয়ন একবারটির জন্যে ভাবে, কেয়া কি যে না, স্থির হয়ে বসতে পারে না একটু ও। খালি দৌড়োদৌড়ি স্বভাব!

কেয়ার সিল্কের ঘন চুল শাড়ির ফিনফিনে আঁচল বাতাসে সমানে ভাসছে...বারবার মুখের ওপর ঝাপটা মেরে ঢেকে রাখতে চাইছে। এ ফুল—ও ফুলের পাতা গালে ছুঁইয়ে আদর করতে ও ব্যস্ত। অয়ন এ নির্জন মুহূর্তে আবিষ্কার করে, কেয়ার মনে বসন্ত এসে গেছে! ডাকলে কেয়াকে তবু ও ফিরে আসে না। অয়ন তাই এলোমেলো পায়ে হেঁটে যায় ওর কাছাকাছি।

হঠাৎ অবাক হওয়া গলায় কেয়া জিজ্ঞেসবাদ করল,

এই, ফুলের নাম ড্রিম ফ্যাওয়ার হয় না কি গো?

আঁতকে ওঠে অয়ন এ কথায়। হট করে বুঝতে পারে না কেয়ার এ-কথার অর্থ।

অয়ন বলে,

ফুলের নাম যে স্বপ্ন হয় তা ত জানতাম না। তবে—হ্যাঁ, কেউ ফুলকে স্বপ্নে ঠিকই দেখে। এই যেমন আমি তোমাকে রোজ রাতে স্বপ্নের মধ্যে চোখের সামনে ফুলের মতো ফুটে উঠতে দেখি।

বেশি সময় নষ্ট করেন অয়ন-কেয়া।

পরপর আরো কদিন কেয়াদের বাড়ি গেল অয়ন। সেদিন চায়ের কাপ এগিয়ে দিয়ে কিছুক্ষণ ওর দিকে স্থির দৃষ্টে চেয়ে থাকলেন কেয়ার মা। ভয়ে আচ্ছন্ন মনে হল তাঁর চোখের পলক।

অয়ন একটা প্যাকেট ধরিয়ে দেয় কেয়ার মাকে। অমনি তিনি বলে উঠলেন—

তুমি ওষুধের দাম নাও না কেন? আজও অনেক টাকার ওষুধ কিনে এনেছ মনে হচ্ছে।

হাসতে হাসতে অয়নও বলে,

ও, এই কথা। নেবো, পরে নিয়ে নেবো সব একসঙ্গে, আপনার কাছে আপাতত জমা থাক।

আঁতকে উঠলেন কেয়ার মা।

না, এটা ভাল দেখায় না, কেয়ার বাবা শুনতে পেলে রাগারাগি করবেন আমার সঙ্গে।

এই প্রথম কেয়ার মাকে বিমনা দেখল অয়ন। একটু যেন হতাশভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে এল ও।

কেয়ার লেখা ছোট্ট এক চিঠি এসে হাতে পড়ে সাতদিনের মাথায় মাথায়। কেয়ার নাকি বিয়ের কথা চলছে, তাই এ চিঠি।

কেয়ার বয়স বোল শেষ হতে চলেছে। এখনো ও নাবালিকা। স্বেচ্ছায় কেয়া অয়নের কাছে এসে দাঁড়াতে চাইলেও ওর পক্ষে গ্রহণ করাতে অনেক বাধা। আর সোজাসুজি বলতে গিয়ে ওর বাবা মাকে বেঁকে বসতে দেখলে সেটাই লজ্জার ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে।

তবু জয়ন্তকে ইশারায় বোঝাতে চেষ্টা করল অয়ন। জয়ন্ত অবশ্য ঠাণ্ডাগলায় বলে,

দাদা-বৌদির ইচ্ছে অন্য রকম, যদি পাতাল বৌদি দুর্বল মুহূর্তে তোমাকে যা বলেছিল, তা ভুলে যাও। আর, তোমার মতো ছেলে এরচেয়ে কত সুন্দরী মেয়েকে হাতের কাছে পাবে।

একথা বলেই ভীষণ জোরে হেসে উঠেছিল জয়ন্ত। অয়ন সেদিন নিশ্চিত জেনে ফেলে স্বার্থের জন্যে মানুষ মানুষকে

কাজী নজরুল ইসলামের
শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ
১। রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম —— ২০.০০
২। গুল বাগিচা——৩.৫০. ৩। কাব্য আমপারা—৪.০০
৪। পুবের হাওয়া——২.০০. ৫। ঘুমপাড়ানী মাসীপিসি—২.০০
মোহন লাইব্রেরী ৩৫ এ, সূর্যসেন স্ট্রীট
ফোন-৩৫-০৬৩৩ কলিকাতা-৯

ই ত বলে থাকে, তাকে সত্যি নেওয়াটা ঠিক নয়।

থেকে বেরিয়ে আসছিল, ব. কেয়ার বাবার গমগমে গলার এসে থেমে পা থামিয়ে দিল। অয়ন, কি বয়স তোমার। এর ম করতে শিখেছ? নিজের ক করো আগে, তারপর প্রেমের া ঘামাবে। হুঁ—

লতে বলতে ভদ্রলোক অন্ধকার সব গলির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। অয়ন শুধু স্থির মূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল অনেকক্ষণ। তারপর যখন মনের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এল, তখন মধ্য রাত, কলকাতার চোখে ঘুম নেমে আসছে। গাড়ি নেই রাস্তায়। পা পা হেঁটে ফিরে এলো রেনিমাপুকুরের উনষাট নম্বর বাড়ির তিনতলায়।

একটা ব্যথা, একটা গোপন যন্ত্রণা মনের মাটিতে দীর্ঘ ছবছরে ক্রমশ বড় হয়ে লাখা-প্রলাখা আর মোটা শেকড় ছড়িয়ে দিব্যি বেড়ে আছে। মেয়েদের ভালবাসা প্রেম প্রেম খেলা ছাড়া ওর কাছে বিশেষ আর কিছু নয়। তবু এক এক সময় স্মৃতিগুলো সব ছটফট করে পা পাখায়, বন্ধ ফাঁকির ফাঁকি ভিজিয়ে তোলে দু'চোখের পাতা, সারা মুখ। স্বপন শুধু নতুন করে ফিরিয়ে আনে কেয়ার নরম মুখখানা। আর তারপরই অফিসের সাতাশ বসন্তের সুন্দর মনটাকে তছনছ করে রেখে যায়, আর কি!

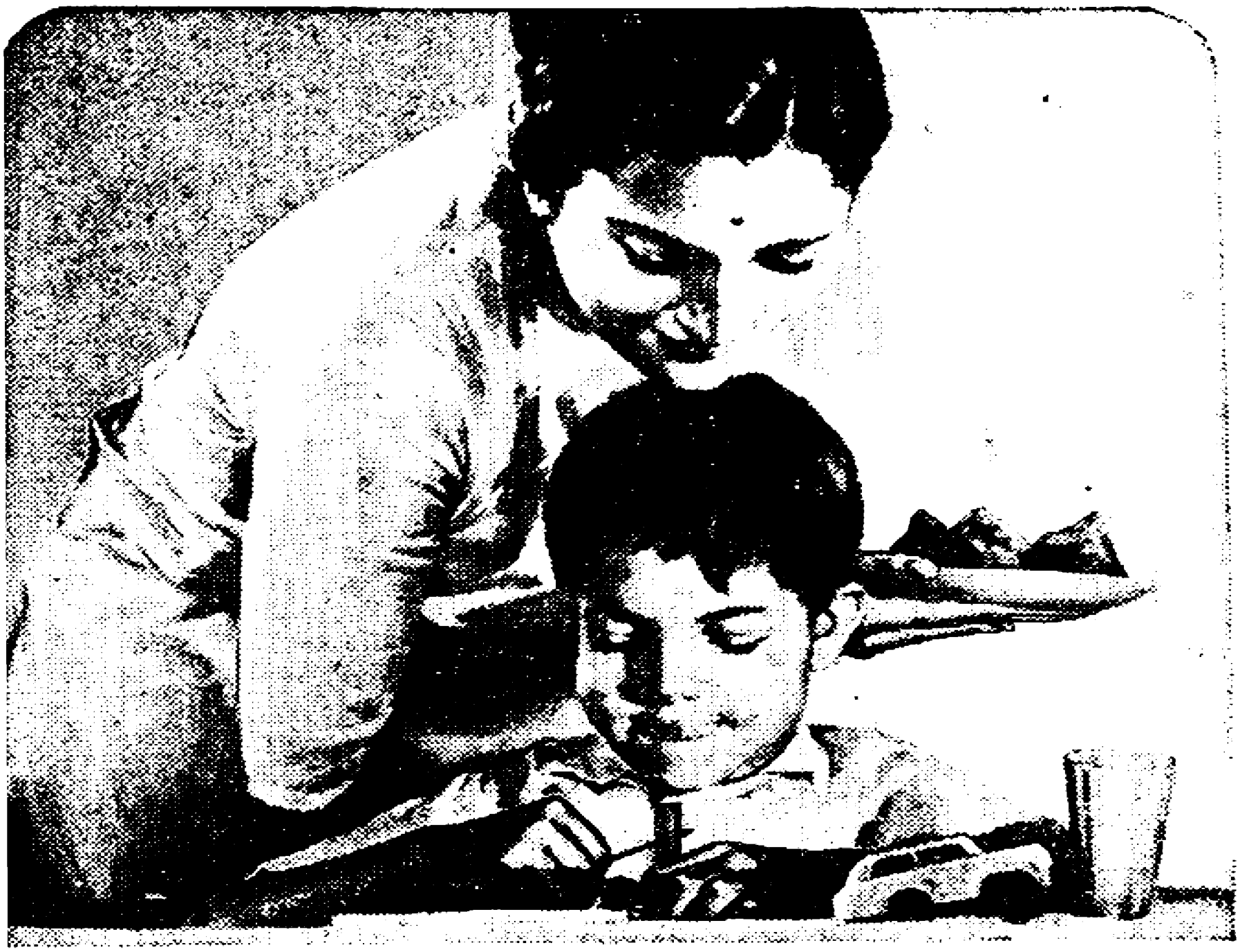

যে মায়েরা বেশী যত্ন নেন তাঁদের চাই ডালডা

বিশুদ্ধ সুস্বাদু আহারের জন্যে

কারণ, সীল করা থাকে ব'লে ডালডা পুরোপুরি বিশুদ্ধ, ধুলোময়লা আর হাতির কবল থেকেও একেবারে নিরাপদ। ডালডার প্যাকিং এতই সুরক্ষিত যে আপনি ছাড়া আর কারুর পক্ষে তা' খোলা সম্ভব নয়। ডালডা ব্যবহার করাও সহজ, তেলের মত এটি গড়িয়ে গিয়ে বা চলকে উঠে নষ্ট হয় না।

ডালডা আপনার রান্নাকে আরো উপাদেয় ক'রে তুলবে, আর আপনি তা গর্বের সঙ্গে পরিবেশন করতে পারবেন। বিশুদ্ধ ডালডা ভিটামিনযুক্ত, তাই পুষ্টিকরও। তাইতো যাঁরা বেশী যত্ন নিতে চান সেই সব মায়েদের এর ওপর এত আস্থা। আপনার নিজের পরিবারের জন্য সবচেয়ে ভিনিষটাই বেছে নিন।

ডালডা—৩০ বছরেরও বেশী কাল ধরে নির্ভরযোগ্য

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

চুলচেরা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি স্থাপিত হইবার প্রথম বৎসরে (১৮১৭) চাঁদা হইতে ১৭,১৮২ টাকা উঠে। তখন কোম্পানীর কাগজের সুদ শতকরা ৫৲ টাকা ছিল। প্রথম বৎসর সংগৃহীত টাকা হইতে সাড়ে দশ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ কেনা হয়। পাঁচ হাজার টাকা খরচ হয়, হাতে রহিল হাজার টাকা মজুদ থাকে। তখন পর্যন্ত সোসাইটীর নিজের ছাপাখানা হয় নাই। প্রায় সমস্ত ছাপার কাজ শ্রীরামপুরের পাদ্রীদের ছাপাখানা হইতেই সম্পন্ন হইত। ৫০০৲ টাকা যে খরচ হয় তাহার ১,৫০০ টাকা আরবি, ফার্সি কেতাব কিনিতে লাগে। পাদ্রী কাজক বিদ্যালঙ্কারের নিমিত্ত ৪০০ টাকা, বাঙ্গালা পুস্তক ছাপাইবার নিমিত্ত ৫০০ শত টাকা ও বাকি অফিসখরচে খরচ হয়।

যে টাকা উঠিল তাহা ইংরেজ, হিন্দু, মুসলমান এই তিন সম্প্রদায়ের ভদ্রলোকগণ দিয়াছিলেন। মুসলমানদাতৃগণের সংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল না। প্রথম দুই এক বৎসর হিন্দুদিগের সংখ্যা অপেক্ষা বরং তাঁহাদের সংখ্যা অধিক হইয়াছিল। প্রথম বৎসরে যে যে হিন্দু ভদ্রলোক চাঁদা দেন তাহাদের নাম জানিতে অনেকেরই মনে কৌতূহল জন্মিবে। নিম্নে তাঁহাদের নাম ও এককালীন প্রদত্ত চাঁদা ও বার্ষিক দেয় সহায়ক তালিকা দিলাম।

নাম	এককালীন প্রদত্ত চাঁদা	বার্ষিক দেয়
কালীকিঙ্কর ঘোষাল	২০০৲	৫০৲
গৌরহরি বসাক	২৫৲	৫৲
গুরুপ্রসাদ সিংহ	১০০৲	৫০৲
গোপীমোহন ঠাকুর	১০৫৲	৫৲
গোলকচন্দ্র বিশ্বাস	১০০৲	...
হরপ্রসাদ (ঢাকা)	৫৲	২৲
হরিনারায়ণ রায় (ঐ)	১০৲	৩.
হরমোহন শর্মা (ঐ)	৫৲	২.
নবকুমার বাসু (ঐ)	৪৲	১৲
নীলাম্বর পণ্ডিত (চট্টগ্রাম)	১০৲	...
পূর্ণচন্দ্র (ঢাকা)	৭৲	২৲
পূর্ব্বরাম দেব (ঐ)	১৫৲	৬৲
পূর্ব্বেরাম দেব (ঐ)	১৫৲	৬৲
রামকমল সেন	০২৲	৮৲
রামকৃষ্ণ দেব (ঢাকা)	১৫৲	৬৲
রামনাথ বাচস্পতি	০২৲	...
রসময় দত্ত	২৫৲	...

১৮১৭ সালে ৬ই মে তারিখে কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটী স্থাপিত হয়। ১৮১৮ সালে কলিকাতায় আর দুইটি শিক্ষা সম্বন্ধে অনুষ্ঠান হয়। সেই বৎসর আগষ্ট মাসে কলিকাতা ডাইওসিজান কমিটি নাম দিয়া একটি সমিতি গঠিত হয়। তখনকার সরকারী খৃষ্টান ধর্ম্মের প্রধান কর্ম্মচারী লার্ড পাদ্রী এ কমিটির সভাপতি হন। প্রধানতঃ পাদ্রীগণ লইয়াই এই কমিটী গঠিত হয়। এতদ্দেশীয় লোকদিগের জন্য স্কুল স্থাপন সম্বন্ধে বিবেচনা করা এই সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। যখন গঠিত হইল তখন স্থির হইল যে, বাঙ্গালা প্রদেশের নিবাসীগণের মধ্যে আবশ্যকীয় জ্ঞান বিস্তারের নিমিত্ত এই কমিটী কর্তৃক স্কুল স্থাপন বাঞ্ছনীয়।

ফলে কোন কাজ হয় নাই। এতদ্দেশীয় খৃষ্টান ও ইউরোপীয় বালকগণের শিক্ষার সুবিধা ইহার প্রধান ও একমাত্র কার্য্য হইল। হিন্দু অথবা মুসলমান বালকদিগের নিমিত্ত এই কমিটি কোন স্কুল স্থাপন করিয়াছিল এরূপ স্কুলের নাম আমাদের জানা নেই।

সেই বৎসর (১৮১৮ সালে) সভয়ে শিক্ষা সম্বন্ধে আর একটি অনুষ্ঠান হয়। কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটীর সদস্যগণের চেষ্টায় ও উদ্যোগে সেই বৎসর ১লা সেপ্টেম্বর কলিকাতা টাউন হলে একটি সভা আহূত হয়। শিক্ষাবিস্তার সম্বন্ধে আলোচনা করা এই সভার উদ্দেশ্য ছিল। সদর দেওয়ানী আদালতের বিচারপতি হ্যারিংটন সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাতে অনেক সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী ও ইংরেজ উপস্থিত ছিলেন। স্থির হইল কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটী নাম দিয়া একটি সমিতি গঠিত হইবে।

কমিটির সভ্যদিগের মধ্যে কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটীর সভাপতি নাম দেখিতে পাওয়া যায়। হ্যারিংটন লার্কিন্স, আর্ডাগুন, গ্রন্থেল, পাদ্রী কেরি, পাদ্রী ইয়েটস, পাদ্রী টাউলিন সভার সভ্য হন। ডেভিড হেয়ার কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটীর সদস্য ছিলেন। এই সভায় তিনি সদস্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন। হিন্দু বাঙ্গালী চারিজন লইবার কথা ছিল। এই বৎসর রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় ও রসময় দত্ত এই দুইজন সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

স্কুল সোসাইটীর কার্য্য করিবার নিমিত্ত চাঁদা সংগৃহ হইল। সোসাইটী গঠনের তিন মাসের মধ্যে ৯,৮৯০৲ টাকা চাঁদা ও ৮০৬০ টাকা বার্ষিক দেয় যাহা আদায় হইল। এ দেশীয় লোকেরা, প্রধানতঃ হিন্দুরা, অনেক টাকা প্রদান করেন।

স্কুল সোসাইটীর তিনটি উদ্দেশ্য ছিল। প্রথম, কতকগুলি স্কুল খোলা হইবে, এইগুলিকে সোসাইটী পরিচালন ও প্রতিপালন করিবে। দ্বিতীয়, দেশী স্কুলগুলিকে (পাঠশালা) সাহায্য দেওয়া হইবে ও সেগুলির সংস্কার করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ, যাহাতে ইংরেজী ও উচ্চশিক্ষা প্রদত্ত হইবে এরূপ স্কুল খোলা হইবে।

প্রথম ট্রেনিং স্কুলের কথা উঠিয়াছিল। ক্যাপ্টেন কুট্রাট নামে এক ব্যক্তি বর্দ্ধমানে কতকগুলি স্কুল খুলিয়াছিলেন। সেই স্থানে উইলার্ড নামে একজন ইংরেজ ও পাঁচজন বাঙ্গালী গুরু মহাশয়ের কাছে শিখিবার নিমিত্ত গমন করেন। তখন চুঁচুড়ার ও তাহার নিকটস্থ স্থানে মে. পিয়ার্সন প্রভৃতি পাদ্রীগণের পরিচালিত অনেকগুলি বাঙ্গালা স্কুল ছিল। এই সকল স্কুলগুলি বাঙ্গালীরা প্রথম (১৮১০ সালের পূর্ব্বে) স্থাপন করেন। এগুলি পাদ্রীগণের হস্তগত হয়। ১৮১৫ সালে গভর্ণমেণ্ট ইহার পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। স্থির হইল বর্দ্ধমান ও চুঁচুড়াতে এই সকল স্কুলে ভাবী গুরুমহাশয়গণ শিক্ষকতা কার্য্য শিখিবেন। আরও স্থির হইল যে ১৮২০ সালের প্রারম্ভে উপরে যে তিন শ্রেণীর স্কুলের কথা লিখিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে প্রথম শ্রেণীর যেগুলির স্কুল খোলা হইবে। এই সকলের কার্য্যে নিয়ম পরিবর্ত্ত হয় নাই। সোসাইটী কলিকাতায় পাঁচটি স্কুল খুলিয়াছিলেন। আরপুলি লেনের স্কুল তন্মধ্যে একটি; সময়ে ইহা ডেভিড হেয়ারকে দেওয়া হয়। কেষ্ট বন্দ্যো (কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়) এই স্কুলে পড়িতেন। এতদ্ব্যতীত সোসাইটী অনেকগুলি কলিকাতায় স্থিত এ-দেশীয়দিগের কর্তৃক স্থাপিত ও পরিচালিত স্কুল পরিদর্শন করিতেন। ১৮২১ সাল ৮৯টি এইরূপ সাহায্যপ্রাপ্ত এবং পরিদর্শিত স্কুল ছিল। স্কুল সোসাইটীর কার্য্য-প্রণালীর কথা পরে লেখা হইবে।

(ক্রমশঃ)

সিলেবল্ কে 'দল' বলি কেন

প্রবোধচন্দ্র সেন

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(৩)

অমূল্যবাবু পত্রোক্ত প্রথমে আমাকে প্রশ্ন করেছেন—'সিলেবল' অর্থে 'দল' শব্দটি ব্যবহারের যাঁহারা পক্ষপাতী, তাঁহারা কি জানেন যে ভারতীয় ছন্দঃশাস্ত্রে 'দল' শব্দটি সম্পূর্ণ ভিন্নঅর্থে প্রয়োগ করা হইয়া থাকে? এরকম পুনরুক্তিদোষদুষ্ট প্রশ্নের উত্তর দেওয়াও অসম্মানজনক। আমি যা জানি তাই বলা আমার কর্তব্য, অন্যে কি জানে না-জানে সে প্রশ্ন তোলার অধিকার কারও নেই। অন্ততঃ ষাট বৎসর পূর্বে ইস্কুলের পণ্ডিত মহাশয়ের কৃপায় সংস্কৃত ছন্দ সম্বন্ধে মনে যথেষ্ট আগ্রহ এবং কিছু জ্ঞানও জন্মেছিল। ফলে একখণ্ড ছন্দোমঞ্জরী কিনে নিয়ে সংস্কৃত টীকা ও বাংলা অনুবাদের সাহায্যে সংস্কৃত ছন্দের আরও পরিচয় লাভের জন্য চেষ্টিত হয়েছিলাম। তখনই দেখেছিলাম পথ্যার্যা ও বিপুলার্যা ছন্দের সংজ্ঞাসূত্রে আছে যথাক্রমে 'দল' ও 'শকল' শব্দ। বুঝতে কোনো কষ্ট হল না যে, এই দুটি শব্দ একই অর্থে, অর্থাৎ 'খণ্ড' অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। টীকাতেও তার সমর্থন পাওয়া গেল। অবশ্য এসব স্থলে খণ্ড বা অংশ বলতে অধিকাংশই বুঝিয়েছে। কিন্তু ছন্দের সংজ্ঞাসূত্রে দল শব্দটি যে একমাত্র অর্ধাংশই বোঝায় তা নয়। যেমন প্রাকৃত 'মন্ডকল' ছন্দে (প্রাকৃত পৈঙ্গলম্ ১।২৭৯) 'দল' শব্দের অর্থ সংশয়াতীত রূপেই চতুর্থাংশ। মন্ডকল ছন্দের মূল সংজ্ঞাসূত্রেই প্রথম পংক্তিতে যাকে বলা হয়েছে 'দল', দ্বিতীয় পংক্তিতে তাকেই বলা হয়েছে 'পদ'। আর, চারটি 'দ্বাত্রিংশন্মাত্রিক' দল (বা পদ) নিয়েই মন্ডকল ছন্দ গঠিত হয়। টীকাকারও 'দল' শব্দের অর্থ করেছেন পদ, পাদ বা চরণ। এরপরে আর লেশমাত্রও সন্দেহ থাকতে পারে না যে, ভারতীয় ছন্দশাস্ত্রেও 'দল' শব্দের অর্থ অংশ বা খণ্ড, সে অংশ অর্ধাংশও হতে পারে, চতুর্থাংশও হতে পারে।

অমূল্যবাবু জানিয়েছেন— 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের একজন প্রবীণ অধ্যাপক বলেন যে মন্ত্রের ছন্দ সম্পর্কে 'দল' শব্দের ব্যবহার আছে। 'দল' শব্দের অর্থ ছন্দোবন্ধের এক-একটি চরণ। বৈদিক গায়ত্রী ছন্দে থাকে তিনটি অষ্টাক্ষর দল।' এই মূল্যবান তথ্যটির জন্য আমি অমূল্যবাবুর কাছে কৃতজ্ঞ। তিনি যদি এই তথ্যের উৎস নির্দেশ করতেন, অর্থাৎ বৈদিক ছন্দ সম্পর্কে কোথায় 'দল' শব্দের প্রয়োগ আছে তা যদি জানাতেন তা হলে আরও উপকৃত হতাম। অধিকাংশ বৈদিক ছন্দে থাকে চার পদ, পাদ বা চরণ (কদাচিৎ পদ বা পাদ শব্দের একটি অর্থই হল চতুর্থাংশ, স্মরণীয় পোয়া বা পাও শব্দের অর্থ), আর গায়ত্রী ছন্দে থাকে তিন পদ। তাতে বোঝা যায় বৈদিক ছান্দসের রচনা ভেঙে দল মানে হয় তৃতীয়াংশ বা চতুর্থাংশ। অর্বাচীন সংস্কৃত ও প্রাকৃত ছন্দশাস্ত্রে যে 'দল' শব্দের দ্বারা রচনা ভেঙে ছন্দোবন্ধের দ্বিতীয়াংশ বা চতুর্থাংশ সূচিত হয়, একথা আগেই বলা হয়েছে।

মনিএর উইলিঅমসের ও ভোলাশংকর ব্যাসের উক্তিকে অভ্রান্ত প্রমাণ বলে ধরে নিয়ে অমূল্যবাবু বলেছেন—ছন্দঃশাস্ত্রে ব্যবহৃত 'দল' শব্দের অর্থ হেমিস্টিক অর্থাৎ হাফ লাইন অফ ভার্স, ভাষান্তরে অর্ধালী অর্থাৎ ছন্দ বা অর্ধভাগ। আমি বিনীতভাবে নিবেদন করছি, এ বিষয়ে উক্ত দুইজনের একজনও সর্বতোভাবে অভ্রান্ত বলে স্বীকার করা যায় না। মহামনীষী মনিএর উইলিঅমসের অগাধ পাণ্ডিত্যের প্রতি আমার সবিস্ময় শ্রদ্ধার অন্ত নেই। তা বলে তাঁর সমস্ত উক্তিকেই নির্বিচারে মেনে নেবার মানসিকতাও আমার নেই। আমি বিশ্বাস করি মহামনস্বীদেরও ভুল হওয়া অসম্ভব নয়। 'দল' বলতে অনেক সময় শ্লোকার্ধ বোঝায় বটে, কিন্তু সব ক্ষেত্রে নয়। বস্তুতঃ দ্বিপাদ শ্লোক অর্থাৎ যুগ্মকের ক্ষেত্রে 'দল' শব্দের দ্বারা স্বভাবতঃই শ্লোকার্ধ বোঝায়, কিন্তু চতুষ্পাদ ছন্দের ক্ষেত্রে 'দল' শব্দের দ্বারা সূচিত হয় শ্লোকের চতুর্থাংশ, যেমন—ঝুল্লণা দ্বিপাদ ছন্দ (কাপলেট ভার্সটিকেল), তাই এ ছন্দের প্রসঙ্গে দল মানে হয় ছন্দোবন্ধের অর্ধাংশ। কুরঙ্গিণীর প্রতি দলে (অর্থাৎ পাদে) থাকে ১০+১০+১৭=৩৭ মাত্রা। পক্ষান্তরে, মন্ডকল চতুষ্পাদ ছন্দ (কোয়াড্রুপ্লেট, টিট্রাসটিক), তাই এই ছন্দের প্রসঙ্গে দল মানে ছন্দোবন্ধের চতুর্থাংশ। মন্ডকল ছন্দের প্রতি দলে (অর্থাৎ পাদে) থাকে ৪×৪+৬=৮×২+২=৩২ মাত্রা।

বৈদিক গায়ত্রী ত্রিপাদ ছন্দ (ট্রিপলেট টাইপটিক), আর অমূল্যবাবু বলেছেন—এ ছন্দে থাকে 'তিনটি অষ্টাক্ষর দল'। তাঁর এই উক্তি অবশ্য-স্বীকার্য। সুতরাং একথাও স্বীকার করতে হবে যে, গায়ত্রী ছন্দের প্রসঙ্গে দল বলতে বোঝায় ছন্দোবন্ধের তৃতীয়াংশ। মোট কথা—দ্বিপাদ, ত্রিপাদ ও চতুষ্পাদ ছন্দ-ভেদে দল মানে হয় যথাক্রমে ছন্দোবন্ধের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অংশ। সুতরাং 'দল' শব্দের অর্থ সব ক্ষেত্রেই ছন্দোবন্ধের অর্ধাংশ বা 'অর্ধালী' এমন অভিমত অভ্রান্ত বলে স্বীকার্য নয়।

মনিএর উইলিঅমসের মতে ছন্দঃশাস্ত্রে ব্যবহৃত 'দল' শব্দের অর্থ হেমিস্টিক এবং অমূল্যবাবু তাই মেনে নিয়েছেন। আমার ইংরেজি ভাষার জ্ঞান অতি সামান্যই। তাই ভাষ্য ভাষা নিবেদন করছি, যেসব ছন্দের ক্ষেত্রে দল মানে হয় ছন্দোবন্ধের অর্ধাংশ, সেসব ক্ষেত্রেও দলকে হেমিস্টিক বলা যায় কি-না সে বিষয়ে আমি সন্দিহান। অমূল্যবাবু হাকলি ও মধুভার ছন্দের নাম উল্লেখ করেছেন। দুটিই দ্বিপাদ ছন্দ। সুতরাং এ দুই ছন্দেই ছন্দোবন্ধের অর্ধাংশকে দল বলতে কোনো বাধা নেই। কিন্তু এ দুই ছন্দের প্রসঙ্গেও দলকে হেমিস্টিক বলা যায় কি? অমূল্যবাবু নিজেই বলেছেন, হেমিস্টিক মানে হাফ লাইন অফ ভার্স। অকসফোর্ড অভিধানেও তাই আছে। আর ওই অভিধানেই আছে ভার্স মানে মেট্রিকাল লাইন অর্থাৎ ছন্দ পংক্তি, পাদ বা চরণ। সুতরাং হেমিস্টিক মানে হয় ছন্দপংক্তির বা চরণের অর্ধাংশ। কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ সংস্কৃত-অধ্যাপক অমূল্যবাবুকে জানিয়েছেন—'দল শব্দের অর্থ ছন্দোবন্ধের এক-একটি চরণ, চরণের অর্ধাংশ নয়। তাই যদি হয় তবে দলকে হেমিস্টিক বলা যায় কি করে? আমি মনে করি এ ক্ষেত্রে উক্ত প্রবীণ সংস্কৃত-অধ্যাপকের অভিমতই স্বীকার্য, মনিএর উইলিঅমসের অভিমত স্বীকারযোগ্য নয়। হাকলি, মধুভার, কুরঙ্গিণী প্রভৃতি দ্বিপাদ

CENTRAL LIBRARY

ছন্দোবন্ধ (হেমিস্টিক) গায়ত্রীর নাম 'ত্রিপাদ ছন্দোবন্ধ (ট্রিসটিক) এবং অনুষ্টুভ প্রভৃতি চতুষ্পাদ ছন্দোবন্ধ (টেট্রাসটিক), সব ক্ষেত্রেই প্রত্যেকটি ছন্দপংক্তি বা চরণকেই বলা যায় দল। অর্থাৎ সবগুলি দল মানে হয় চরণ অর্থাৎ পুরো লাইন অফ ভার্স, হাফ লাইন বা হেমিস্টিক নয়। সুতরাং কোনো ক্ষেত্রেই এবং কোন অর্থেই দলকে হেমিস্টিক বলা যায় না— ভার্স মাত্র চরণ বা ছন্দপংক্তি হলেও না, ভার্স মানে চরণ সমবায় অর্থাৎ ছন্দোবন্ধ বা শ্লোক হলেও না। অমূল্যবাবু বলেছেন, বৈদিক গায়ত্রী ছন্দ যদি তিনটি অক্ষরের দল। আমার জিজ্ঞাসা, গায়ত্রী ছন্দের এই তিনটি দলকে তিনটি হেমিস্টিক বলা যাবে কি?

মনিএর উইলিয়ম্স ব্রাহ্মণিক নন, তাই ছন্দশাস্ত্রোক্ত দল শব্দের অর্থনির্ণয়ে ভুল হওয়া অপ্রত্যাশিত নয়। কিন্তু তিনি যখন 'সমনির্মোক' শব্দের অর্থ লেখেন লিঙ্ক-লেজ, তুরুপচক্র, তখন স্বীকার করতে হবে স্বক্ষেত্রেও তাঁকে সর্বতোভাবে অভ্রান্ত বলে ধরে নেওয়া সমীচীন নয়। তাঁর জানা উচিত ছিল দলনির্মোক শব্দের দল মানে গায়ের পাতা নয়, গাছের ছাল। বস্তুতঃ মহামনস্বীদেরও ভুল হতে পারে, অভ্রান্ত কেউ নয়। সকলের কথাই সশ্রদ্ধ ও নিরাসক্তচিত্তে বিচার করে গ্রহণ বা বর্জন জিজ্ঞাসু পাঠকের কর্তব্য। নির্বিচারে গ্রহণ বা বর্জন সবক্ষেত্রেই অকাঙ্ক্ষনীয়।

ভোলাশংকর-প্রমুখ আধুনিক বাঙালদের উক্তিকেও অভ্রান্ত বলে মেনে নেবার কোনো কারণ নেই, কারণ অধুনিককালীন বাঙালরা যে অনেকে সংস্কৃতে কাঁচা-বাচ্চাদেরই পর্যায়ভুক্ত। পূর্বে বলেছি মনিএর উইলিয়ম্সের মতে অবিশেষজ্ঞের পক্ষে ছন্দশাস্ত্রে প্রযুক্ত দল শব্দের অর্থনির্ণয়ে ভ্রান্তি হওয়া নিন্দ্য নয়। কিন্তু প্রাকৃত পৈঙ্গলম গ্রন্থের সম্পাদক ও ব্যাখ্যাতা ভোলাশংকরের বোঝা উচিত ছিল যে, ছন্দঃশাস্ত্রে দল শব্দের দ্বারা 'অর্ধালী' অর্থাৎ শ্লোকার্ধ বা চরণার্ধ বোঝায় না, বোঝায় পুরো চরণ, পদ বা পাদ। কিন্তু তিনি বারবারই এই ভুল করেছেন। কারণ তিনি লক্ষ করেন নি যে, প্রাকৃত ছন্দশাস্ত্রে দল শব্দটি কোনো বিশেষ পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়নি, ব্যবহৃত হয়েছে পদ বা চরণ শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে, আর ও-শাস্ত্রে এই তিন শব্দে বোঝায় পূর্ণযতি-সংযুক্ত শ্লোকার্ধ অর্থাৎ ছন্দপংক্তি (ভার্স লাইন)। চরণ, পদ ও দল যে সমার্থক শব্দ, মালা ও চূলিআলা ছন্দের সংজ্ঞাসূত্রের ব্যাখ্যায় প্রসঙ্গে ভোলাশংকর নিজেই তা স্বীকার করেছেন। মালা ও চূলিআলা, দুটিই বিষমপাদ ছন্দ। সুতরাং স্বভাবতঃই এ ক্ষেত্রে চরণ, পদ ও দল শব্দের দ্বারা শ্লোকার্ধই সূচিত হয়। পক্ষান্তরে, চতুষ্পাদ অনুষ্টুভ ছন্দের সংজ্ঞাসূত্রে দল ও পদ এই দুটি শব্দই ব্যবহৃত হয়েছে পরস্পরের প্রতিশব্দ হিসাবে। সুতরাং এক্ষেত্রে দল ও পদ শব্দের মানে শ্লোকের চতুর্থাংশ, অর্ধাংশ নয়। ভোলাশংকর এটুকু লক্ষ করেন নি। যেমন, বিষমপাদ চূলিআলা ছন্দের সংজ্ঞাসূত্রে দল নেই, আছে 'পদ'। তাই ভোলাশংকর অনায়াসেই বলতে পেরেছেন—'যহী পদ কা অর্থ দল যা অর্ধালী হৈ'। অনুরূপভাবে চতুষ্পাদ অনুষ্টুভ ছন্দের সংজ্ঞাসূত্রে উক্ত অংশদ্বয়ার্থক দল ও পদ শব্দ সম্পর্কে অনায়াসেই বলা যেত—'যহী দল ঔর পদ কা অর্থ চতুর্থাংশ হৈ।' কিন্তু এস্থলে তিনি নীরব। কারণ তিনি নির্বিচারে মনিএর উইলিয়মসের পদাঙ্ক অনুসরণ করে স্বীকার করে নিয়েছেন দল মানে হেমিস্টিক আর হেমিস্টিক-এর অনুবাদ করেছেন অর্ধালী। কিন্তু হেমিস্টিক শব্দের অর্থ যে চরণার্ধ, শ্লোকার্ধ বা পুরো চরণ নয় তা ভেবে দেখাও নিষ্প্রয়োজন বোধ করেছেন। পাশ্চাত্য পাণ্ডিত্যের প্রতি নির্বিচার শ্রদ্ধার এই পরিণাম।

কিন্তু অমূল্যবাবুর নায় ডাবিং ও কৃতবিদ্য ব্যক্তিও যে, উক্ত দুই পণ্ডিতের ভ্রান্তিটুকুকে সম্বল করে পরের ভ্রান্তি-নিরসনে ব্রতী হলেন, সেটাই বিস্ময়ের বিষয়। তিনি কি হেমিস্টিক, ট্রিসটিক, টেট্রাসটিক প্রভৃতি শব্দের যথার্থ তাৎপর্য কি তাও ভেবে দেখেন নি? আর, প্রবীণ সংস্কৃতজ্ঞ অধ্যাপকের মতে 'দল' শব্দের অর্থ যে 'ছন্দোবন্ধের এক-একটি চরণ একথা জেনে এবং মেনে নিয়েও তিনি কি করে মনিএর উইলিয়ম্স ও ভোলাশংকরের যুগের উঁকুর নাঁচায়ে দলকে হেমিস্টিক অর্থাৎ হাফ লাইন অফ ভার্স (চরণার্ধ) বলে স্বীকার করে নিলেন, সেটা আরও বিস্ময়ের বিষয়।

আমি আবার বলছি, আমার ইংরেজি ভাষার জ্ঞান অতি অকিঞ্চিৎকর। যদি কেউ বর্তমান প্রসঙ্গে আমার কোনো সম্ভাবিত ভুল দেখিয়ে দেন তবে কৃতজ্ঞচিত্তে তা মেনে নেব এবং উল্লিখিত মন্তব্য সানন্দে ও সুস্পষ্ট ভাষায় প্রত্যাহার করে নিতে দ্বিধা করব না।

এখানে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, অমূল্যবাবুর 'নয় মাত্রার ছন্দ' প্রবন্ধের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ 'ছন্দের মাত্রা' নামে যে প্রবন্ধ (উদয়ন ১৩৪১ জ্যৈষ্ঠ) লেখেন তাতে প্রাকৃত করুণা ও দলকলা ছন্দের দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হয়েছিল। করুণা ছন্দের যে সংজ্ঞাসূত্র ও সংস্কৃত টীকা রবীন্দ্রনাথ উদ্ধৃত করেন, সে-দুটিতেই দল শব্দের উল্লেখ আছে। রবীন্দ্রনাথ এই দলকে বলেছেন 'মুখদল'। কিন্তু 'দল' ছন্দের দ্বিতীয় সংস্করণে (১৯৬২) পাদটীকায় আমি স্পষ্ট ভাষায় বলেছি—'দল' মানে ছন্দের বৃহত্তম বিভাগ বা চরণ (পৃ. ১০৯) আর সংজ্ঞা পরিচয়-বিভাগে বলেছি—পূর্ণ-যতির বিভাগ (অর্থাৎ ছন্দ পংক্তি বা চরণ) অর্থে দল শব্দের প্রয়োগ বেশি দেখা যায় না, কারণ এটি পারিভাষিক শব্দ নয় (পৃ. ২৪৫)। তাছাড়া দল শব্দটিকে সিলেবল অর্থে পারিভাষিক শব্দরূপে প্রয়োগ সম্পর্কে আমার মতামতও ওই গ্রন্থের সংজ্ঞাবিভাগে নানা স্থানে প্রকাশ করেছিলাম। অমূল্যবাবু 'ছন্দ' গ্রন্থের আমার কৃত সম্পাদনার যথেষ্ট প্রতিকূল সমালোচনা করেছিলেন। বোধ করি তখন প্রাকৃত ছন্দশাস্ত্রে 'দল' শব্দের প্রয়োগ সম্বন্ধে আমার মতামত ও অর্থনিরূপণ অমূল্যবাবুর দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছিল কিংবা উপেক্ষণীয় বলে বোধ হয়েছিল। নতুবা ছন্দশাস্ত্রোক্ত দল শব্দের অর্থ যে 'চরণ' তার সমর্থনে প্রবীণ সংস্কৃত-অধ্যাপকের অভিমত সংগ্রহে তিনি সচেষ্ট হতেন না এবং 'সিলেবল' অর্থে দল শব্দটি ব্যবহারের যাঁহারা পক্ষপাতী তাঁহারা কি জানেন যে, ভারতীয় ছন্দঃশাস্ত্রে শব্দটি সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করা হইয়া থাকে?'—এ রকম অবাঞ্ছিত উক্তি করতেও সাহসী হতেন না।

৪

মোট কথা, 'দল' শব্দের ধাতুগত আসল অর্থ যে অংশ বা খণ্ড, তা সংস্কৃত, বাংলা বা হিন্দী সব অভিধানেই সুস্পষ্টভাবে স্বীকৃত। অধিকন্তু 'দ্বিদল' শব্দটিও অভিধানে পাওয়া যায়। মনিএর উইলিয়মসের মতে এ শব্দটির অর্থ এসপ্লিট ইন টু অংশের মতে হ্যাভিং টু পার্টস অর্থাৎ হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন 'দ্বিদল' মানে 'ডালযুক্তদ্বয়'। তাই যদি হয় তবে দ্বিদল ত্রিদল, চতুর্দল শব্দ ইত্যাদি রকম প্রয়োগ অসিদ্ধ বা নিষিদ্ধ হতে পারে না।

শৈশবকালে পরম সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালংকারের 'শিশুশিক্ষা' প্রথম ভাগ পড়েই আমার বিদ্যারম্ভ হয়েছিল। আকার-ঈকার শেখার আগেই এই বইএ পড়েছিলাম—'সরস-দল শতদল'। সে কথা আজও মনে আছে। ছন্দ ও মিলের গুণেই এই উক্তিটি (আরও অনেক উক্তির মতোই) আমার শিশুমনে গাঁথা হয়ে গিয়েছিল। বলা বাহুল্য, তখন তার অর্থবোধের প্রয়োজনীয়তাও বোধ করিনি। ইস্কুলের উচ্চতর পর্বে সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে কিঞ্চিৎ পরিচয়লাভের পর সহজেই বুঝতে পেরেছিলাম 'দল' মানে খণ্ড, আর এখানে তার মানে পদ্মফুলের অগণ্য কাঠিলের কোয়া। অথচ কোনো অভিধানে বা সাহিত্যে 'দল' শব্দের এই অর্থ পাওয়া যায়নি। তবু সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতমাত্রই স্বীকার করবেন যে, এখানে 'দল' শব্দটি অতি সুপ্রযুক্ত হয়েছে অর্থাৎ কাঠিলের কোষা অর্থে 'দল' শব্দ ব্যবহার করে মদনমোহন ভাষাবীতি কিছুমাত্র লঙ্ঘন করেননি। এবিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

রাণীমুদ্রা
প্রস্তুত করক:-কাকার প্রডাকস

অমৃত CENTRAL LIBRARY

ক সংস্কৃত-প্রাকৃত ছন্দশাস্ত্রের পারিভাষিক র্থ গ্রহণ না করে তার আভিধানিক অর্থে টানিট অফ মেজার অর্থে) ব্যবহার করে- ন। আমিও তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ম' শব্দটিকে সিলেবল্ অর্থে, মানে শব্দের চারণ বিভাগ অর্থে প্রয়োগ করে থাকি। স্কৃত-প্রাকৃত ছন্দশাস্ত্রে খণ্ড বা শকল- ক 'দল' শব্দটি পদ, পাদ বা চরণের তশব্দ রূপেই ব্যবহৃত হয়, কোনো শষ পারিভাষিক অর্থে নয়। আর 'দল' অর প্রয়োগও অতি বিরল। এটি যদি রিভাষিক শব্দ হত তবে এটির প্রয়োগ ত বিরল হত না। আমি 'দল' শব্দের চুগত খণ্ড-অর্থ বজায় রেখে এবং শব্দের চারণ বিভাগ অর্থে গ্রহণ করে এই র্থটির উপরে পারিভাষিকতা আরোপ রছি। আমি জানি বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক ষ্টসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করবেন তে ভাষাগত বা পরিভাষা রচনার নীতি- গত কোনো অপরাধ হয়নি। তাছাড়া, তা ব্যবহারগত কোনো অসুবিধাও দেখা দেয়। করণ বাংলায় ছন্দের পদ, চরণ বা পংক্তি এমনকি শ্লোকার্ধ বা অর্ধালীকেও কখ 'দল' বলা হয় না। বরং ছন্দের চরণ কিংবা যুগ্মকের (কাপলেটের) অর্থাৎ বাংলার 'দল' নামে চিহ্নিত করতে গে বিভ্রান্তি ঘটবে। পক্ষান্তরে আমি অন্ত পঁচিশ বৎসরের অভিজ্ঞতা থেকে ব পারি—দল, মাত্রাদল ও যুগ্মদল, এই তি শব্দ ব্যবহারের ফলে ছন্দ বোঝা ও বোঝানো অনেক সহজ হয়ে গিয়েছে। ব্যাকরণ আগে যাদের কাছে আতঙ্কের ছিল, এখন তাদের পক্ষেও সহজবোধ্য আগ্রহের বিষয় হয়েছে। কবি-ছাত্রী নীরেন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যায়, এক হি এই তিনটি শব্দ হচ্ছে ছন্দশাস্ত্রের খোল চাবি—(কবিতার ক্লাস ফ্র সংস্করণ, পৃ ২৭)। আশা করি ত

প্রকাশিত হলো

ভয়াবহ ঠাণ্ডায় মৃত্যু-তুষারের ভেতর দিয়ে ভয়ংকর সেই যাত্রার প্রতিটা মুহূর্তের বর্ণনা পড়তে পড়তে উৎকণ্ঠায় নিজেকেও অসাড় হয়ে যেতে হয়। .....অনুবাদ এককথায় অনবদ্য।

অ্যালিস্টেয়ার ম্যাকলীনের

শ্রেষ্ঠ ও অতুলনীয় সুপার-সাসপেন্স-থ্রিলার

তুষারে মৃত্যুর ছোঁয়া

নাইট উইদাউট এণ্ড/ভাষান্তরঃ সন্তোষ চট্টোপাধ্যায় ১৪-০০

আগাথা ক্রিস্টির

বিশ্ববিখ্যাত রহস্য উপন্যাস

অন্ধকার আদিম

ক্রিস্টির যোগ্য ভাষান্তর করেছেন অজিত চৈত্র ১৫-০০

মৌলানা আবুল কালাম আজাদের

খোলাখুলিভাবে নির্ভীক ভাষায় লেখা স্মৃতিকথা

ভারত স্বাধীন হলো

সমরেশ বসুর নিমাই ভট্টাচার্যের

সবুজ বনে আগুন ৬-০০ শেষ পারানির কড়ি ৭-০০

প্রকাশক—পরশপাথর/পরিবেশক—কথা ও কাহিনী, ১০ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট ১২

পিটার প্যান চায়

তনুবল্লরী
হোক সুঠাম সুডৌল
মনোহারী

চোলী ব্রা

খাটো অথচ সুন্দর। আর মানানসই।

এই সুন্দর ব্রা সবচেয়ে খাটো চোলীর আড়ালেও থাকে অদৃশ্য।
চোলী ব্রা মৃদু আবেষ্টনীতে আপনার দেহলতাকে
ক'রে তোলে সুঠাম সুন্দর, হাতের নীচে চমৎকার ইলাস্টিক
স্ফীতির চিহ্ন মাত্র হতে দেয় না।
ব্রার পাশের অংশ ব্রাকে (আর আপনাকেও)
যথাস্থানে ধরে রাখে।
সামনের অংশটা নিচু বুকে আপনার 'লো নেকলাইনের'
সৌন্দর্য থাকে অব্যাহত—
আর ব্রা আপনার ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ ক'রে
নিজে রাখে লুকিয়ে আড়ালে।
পাওয়া যায় পুরোপুরি নাইলনে আর সাদা, কালো,
সোনালী, নীল, লেমন আর 'স্কিন টোনে'; আর প্রিন্ট করা
সুতীর বুননীতে। সেই সঙ্গে মানানসই ব্রীফ।

Peter Pan

নারীর সেরা আভরণ

[illegible] লিমিটেড, বারভস রোড, কুর্লার পাশে, বোম্বাই ৪০০ ০৭০

® রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক

CHATRA-PP-80-BEN

ছন্দোজ্ঞ পাঠকসমাজের কাছে অত্যুক্তি-অপরাধে অভিযুক্ত হব না।

বাংলা ভাষায় বর্তমানে খণ্ডার্থে 'দল' শব্দের প্রয়োগ নেই বলা চলে। কিন্তু এক সময়ে যে ছিল তার প্রমাণস্বরূপ দলা, ডেলা, ঢেলা, ঢিল প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ করা যায়। আভিধানিক ও ভাষাতাত্ত্বিকরা মনে করেন এসব শব্দ খণ্ডার্থক দল শব্দ থেকেই উৎপন্ন। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। শব্দকল্পদ্রুমে আছে : দলনী—লোষ্টম 'ডেলা' ইতিভাষা; দলঃ—লোষ্টম 'দলা' ইতি 'ডেলা' ইতি চ ভাষা। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বঙ্গীয় শব্দকোষে আছে : ডেলা (সং দল)—শুষ্ক মৃত্তিকা 'খণ্ড', ঢিল। সুনীতিকুমারের ও ডি বি এল গ্রন্থে আছে : ঢেলা ঢিল—ক্লড, পিস অফ স্টোন। যোগেশচন্দ্র রায়ের বাংলা শব্দকোষে আছে : ঢিল (সং দলি, দলনী)—মৃৎখণ্ড, পাটি কালভাঙ্গা ইট। আসলে বলা উচিত পাটি-কালের টুকরো। 'ঢিল মারলে পাটকেল খেতে হয়' কথার অর্থ—ঢিল (ইটের টুকরো) মারলে পাটকেল (আস্ত ইট) খেতে হয়। এগুলি ছাড়া ডাল (শাখা), দাইল-ডাইল-ডাল' (পালস্) প্রভৃতি শব্দও খণ্ডার্থক 'দল' থেকে উৎপন্ন। ডাইল (সং দল)—দলিত (খণ্ডিত) মুগ, মসুর ইত্যাদি। ও ডি বি এল-এ আছে ডাল, ডাইল (দাইল, দালি) এসপ্লিট পালস (দালিত)। হিন্দী 'দালিয়া' শব্দের অর্থ খণ্ড খণ্ড করা গম (গমের খুদ), আর 'দলদার' মানে মোটা দল (টুকরো)-ওয়ালা। বাংলায় অনুরূপ শব্দ দলুয়া (দলো চিনি)। যোগেশচন্দ্রের বাঙ্গালা শব্দকোষে আছে : দলুয়া—সং দল (খণ্ড)+উয়া। দলুয়া শব্দের আসল অর্থ মোটা গুঁড়ো-ওয়ালা চিনি।

বোঝা যাচ্ছে, এককালে খণ্ড বা টুকরো অর্থে 'দল' শব্দের প্রয়োগ বিরল ছিল না। কিন্তু বর্তমানে 'দল' নানা তদ্ভব শব্দে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। খণ্ড-অর্থে মূল 'দল' শব্দের প্রয়োগ নেই বললেই হয়। এখন যদি এই খণ্ডার্থক দল শব্দটিকে সিলেবলে-বাচক শব্দাংশ অর্থে প্রচলিত করা যায় তাহলে তা ভাষাগত ঐতিহ্যবিরুদ্ধ হবে না, অধিকন্তু তাতে নূতনত্বের সুফলও পাওয়া যাবে। বর্তমান প্রসঙ্গে শব্দটি সম্পূর্ণ নূতন এবং নূতন বলেই পূর্বসংস্কারজাত ভ্রান্তির কোনো অবকাশ নেই। নূতন পারিভাষিক শব্দের এই একটা বিশেষ গুণ। এই শব্দটির আর একটি বড় গুণ এই যে, এটি স্বার্থতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত, ফলে ছন্দের প্রসঙ্গে এটির কোনো দ্বিতীয় অর্থে গৃহীত হবার আশঙ্কা নেই। পর্ব শব্দটিও সমভাবে এই সমস্ত সুবিধা বা গুণের অধিকারী। 'অক্ষর' সম্বন্ধে তা বলা যায় না। 'অক্ষর' শব্দ অর্থতাম্র নয়, পূর্বাগত বিভিন্ন সংস্কার এ শব্দের পারিভাষিক অর্থগ্রহণে পদে-পদেই ভ্রান্তি ঘটায়। তাই ছন্দের আলোচনায় আমি 'অক্ষর' শব্দ পরিহার করা সর্বতোভাবেই বাঞ্ছনীয় মনে করি।

৫

অমূল্যবাবু বলেছেন, সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর 'ছন্দ-সরস্বতী' প্রবন্ধে সিলেবল্ অর্থে 'শব্দ-পাপড়ি' কথাটা 'একবার' মাত্র ব্যবহার করেছিলেন। আমি তো অন্ততঃ চারবার পেয়েছি—চারবার মানেই বারবার। প্রত্যেক-বারই ইংরেজি সিলেবল্ শব্দটিও দিয়েছেন তার সঙ্গে। তাছাড়া, সিলেবল্ বোঝাবার জন্য 'অক্ষর' বা অন্য কোনো শব্দ ব্যবহার করেন নি। এটা তাঁর সতর্কতারই পরিচায়ক। অমূল্যবাবু অবশ্য বলেছেন—'হয়তো সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের এই 'শব্দ-পাপড়ি' কথাটার দ্বারা প্রভাবিত হইয়া কেহ কেহ সিলেবল্-র প্রতিশব্দ হিসাবে 'দল' শব্দটি ব্যবহার করিতে গেছেন। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ একটা রূপক হিসাবেই 'শব্দ-পাপড়ি' কথাটা ব্যবহার করিয়াছিলেন।' অমূল্যবাবুর এই উক্তিতে আমি কৌতুক বোধ করেছি। অবশ্য 'অশ্বত্থামা হত ইতি গজ'-র মতো স্বল্পশ্রুত ছোট্ট 'হয়ত' শব্দটির জন্য আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। কৌতুক বোধ করেছি কেন বলছি। আমি তো ইস্কুলে পড়ার সময়েই পণ্ডিত মশায়, সংস্কৃত ব্যাকরণ, আপ্তের অভিধান ও ছন্দোমঞ্জরীর কৃপায় 'দল' শব্দের আসল অর্থ যে খণ্ড তা জেনেছিলাম। 'সৈন্যদল' শব্দের ব্যাসবাক্য নিরূপণ করতে গিয়েই বোধ হয় এ বিষয়ে আমার প্রথম চেতনা হয়েছিল। কাজেই আমার ধারণা হয়েছিল সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তির কাছে 'দল' শব্দের ধাতুগত অর্থ অজানা থাকার কথা নয়। কিন্তু বাংলায় 'দল' শব্দের খণ্ডার্থ অধুনা প্রচলিত না থাকায় প্রথম থেকেই এটিকে তার মৌলিক অর্থে চালাতে গেলে বিভ্রান্তি দেখা দিতে পারে এ আশঙ্কা ছিল মনে। তাই কিছুকাল ইতস্ততঃ করে পরে একটু একটু করে চালাতে প্রলুব্ধ হই। প্রথম তিন-চারবার শুধু দ্বিদল ও ত্রিদল শব্দ দুটি চালালাম ইংরেজি প্রতিশব্দসহ। রবীন্দ্রনাথের অনুমোদনও পাওয়া গেল। আর কারও কাছ থেকে কোনো আপত্তি শোনা গেল না। এভাবে প্রায় ষোলো-সতেরো বছর ওই দুটি শব্দই (দ্বিদল-ত্রিদল) চালাই ইংরেজি প্রতিশব্দসহ। মনে রাখা দরকার, দীর্ঘকাল আমি 'দল' শব্দের ধাতুগত অর্থ বজায় রাখার কিংবা কোনো রূপকার্থের আশ্রয় নেবার প্রয়োজন বোধ করিনি। নির্ভর পাঠকের সংস্কৃত ভাষাবোধের উপরেই নির্ভর। আমার ঐকান্তিক বিশ্বাস ও নির্ভর। তার পরে যখন সংস্কৃতজ্ঞ-অসংস্কৃতজ্ঞ-নির্বিশেষে সকলের অভিমত সংগ্রহে প্রবৃত্ত হই (১৩৫৫ সাল) তখন সত্যেন্দ্রনাথের 'শব্দ-পাপড়ি' কথাটার উল্লেখ করি। অসংস্কৃত পাঠকের বোধগম্যতার অনুরোধে, সংস্কৃতজ্ঞদের জন্য নয়। পূর্বেই বলেছি বিশেষজ্ঞ অভিমত-সংগ্রহের এই প্রচেষ্টা আমার পক্ষে আশানুরূপ ফলপ্রদ হয়নি। 'দল' সম্বন্ধে অভিমত পেয়েছিলাম মাত্র দুজনের কাছ থেকে। একজন পরলোকগত অধ্যাপক শ্রীভূষণ দাশগুপ্ত। তিনি ভাল সংস্কৃত জানতেন। তাই তিনি রূপকার্থের আপত্তি করেন নি। তাঁর যেটুকু আপত্তি তা অন্য রকম। তাঁর বক্তব্য এই—বাঙলায় দল শব্দ অংশার্থ অপেক্ষা সমূহার্থেই গ্রহণ বেশি, সুতরাং বাংলায় সাধারণতঃ 'শব্দ

॥ অমর সাহিত্যের বই ॥

বিমল মিত্রের

পরস্ত্রী ২৫৲ **আমি ১৬৲**

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

তিনে একে চার ২০৲

আশাপূর্ণা দেবীর নবতম উপন্যাস

কখনো দিন কখনো রাত ২৫৲

শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে।

নীহাররঞ্জন গুপ্তর

কিরীটী অমনিবাস ১৫৲

সপ্তম খণ্ড প্রকাশিত হল

দ্বিতীয় খণ্ড (২য় মুদ্রণ)—২০৲ তৃতীয় খণ্ড (২য় মুদ্রণ) ২০৲

অমর সাহিত্য প্রকাশন, ৭ টেমার লেন, কলিকাতা-৯

অংশের অংশ বা বুঝাইয়া শব্দের সমূহও বুঝাইতে পারে। অবশ্য পরিভাষিক অর্থে চালু হইয়া গেলে বোধ হয় এই স্বার্থভ্রষ্ট গোলমাল নাও থাকিতে পারে।' তাঁর এই অভিমত সর্বতোভাবে সত্য। আসল কথা এই যে, তিনি 'দল' শব্দের অংশার্থ সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। শুধু ভুল বোঝার অবকাশ কোথায়, সে বিষয়ে তিনি আমাকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। পত্রে আমি তাঁকে বলেছিলাম, যদি 'শব্দদল' না বলে 'শব্দের দল কিংবা প্রয়োজনমত শুধু 'দল' বলি (যেমন—'দ্বিদল শব্দ', কিংবা 'এই শব্দে দল আছে দুটি' ইত্যাদি) তাহলে কি ভুল বোঝার অবকাশ থাকবে? তিনি বলেছিলেন, বিনা দ্বিধায় ওরকম ব্যবহার করা যেতে পারে, তাতে স্বার্থভ্রষ্ট হোনো সম্ভাবনা নেই। তখন (১৯৪১ মার্চ) থেকে 'দল' শব্দটি এইভাবে ব্যবহার করছি। কারও বুঝতে অসুবিধা হয়েছে বলে শুনিনি। এ বিষয়ে অধ্যাপক ভবতোষ দত্তও তাঁর অভিমত জানিয়েছিলেন। 'দল' শব্দের অংশার্থ সম্বন্ধে তিনি নদীবাবুর মতো সচেতন ছিলেন না। তাই তিনি অমূল্যবাবুর মতই এ শব্দটির রূপকার্থতা প্রসঙ্গে তুলে কিছু আপত্তি জানিয়েছিলেন—ব্যবহারোপযোগী (হ্যান্ডি) বলে 'দল' শব্দটি সুন্দর। শব্দটি ছোটো, শুনতেও ভালো। এর সম্বন্ধে আপত্তি শুধু এই হতে পারে: শব্দটি ভক্যাবুলারি নয়। এটির ব্যবহার হচ্ছে রূপকার্থে (ফিগারেটিভ)। এ প্রসঙ্গে তিনিও সত্যেন্দ্রনাথের 'পর্ব' শব্দের উদাহরণ উত্থাপন করেছিলেন। কিন্তু 'পর্ব' শব্দটি অভিধেয়ার্থে মানে যাচ্যার্থে এ ভাইরেক্ট অর্থেই শব্দাংশ বা সিলেবল বোঝাতে পারে। মূলেও (এমন কি শব্দস্কন্ধ ফলেরও) স্বাভাবিক অংশকে যে-কারণে বলা হয় 'দল' ঠিক সেই কারণেই উচ্চারিত শব্দের স্বাভাবিক অংশকেও 'দল' বলা যেতে পারে। তাতে আপত্তির কোনো হেতু থাকতে পারে বলে মনে করি না। অভ্যাস সাদৃশ্যহেতু শব্দের অর্থবিস্তার সব ভাষারই একটা স্বীকৃত নীতি। শুধু যাচ্যার্থ নিয়ে থাকলে ভাষার পাণ্ডুতা ও মানুষের চিন্তার প্রকাশক্ষেত্রের সংকীর্ণতা ঘুচত না। পত্র বা পাতা আজকাল আর শুধু গাছের সম্পত্তি নয়। চিঠিপত্র, কাগজপত্র, তাম্রপট্ট, ভূর্জপত্র (বল্কল), অক্ষিপত্র (চোখের পাতা) পায়ের পাতা, লোহার পাত ইত্যাদি স্মরণ করলেই এ কথার সার্থকতা বোঝা যাবে। এসব পত্র বা পাতা আর রূপকার্থক বলে গণ্য হয় না, যাচ্যার্থক বলেই স্বীকৃত হয়। পরিভাষা-রচনার ক্ষেত্রেও সাদৃশ্যসূচক শব্দ একেবারে অচল নয়। অথচ ইংরেজি, সংস্কৃত ও বাংলা ছন্দশাস্ত্রের ফুট, পদ বা চরণ এবং দ্বিপদী-চৌপদী মূলতঃ সাদৃশ্যসূচক হলেও এখন যাচ্যার্থের অধিকারী হয়েছে। আর মূলতঃ যা ছিল ভেদাপ্রবোধক প্রসঙ্গ ও প্রয়োগভেদে এখন তা-ই তিন ভাষায় তিন অর্থ বোঝায়। অনুরূপভাবে 'দল' শব্দটি বাংলায় সিলেবল অর্থেই রূঢ় হয়েছে। সংস্কৃত-প্রাকৃত তথা 'দল' মানে ফোঁড়াংশে হলেও বাংলায় তাকে শব্দাংশ অর্থেই স্বীকার করে নিয়েছি। 'দল' শব্দ সংস্কৃত-প্রাকৃতে অপরিভাষিক, পদ বা চরণের প্রতিশব্দ মাত্র; বাংলায় 'দল' পারিভাষিক, অন্য কোনো শব্দের প্রতিরূপ নয়। স্মরণীয়, সংস্কৃত-প্রাকৃতে 'পদ' শব্দ ছন্দপংক্তি-জ্ঞাপক আর বাংলা 'পদ' মানে ছন্দপংক্তির বিভাগ, সমগ্র ছন্দপংক্তি নয়। যেমন—ত্রিপদী বা চৌপদী পংক্তি।

উপরে বলেছি শশিভূষণ দাশগুপ্ত আমাকে জানিয়েছিলেন 'বাংলায় দল শব্দটি অংশার্থ অপেক্ষা সমূহার্থেই গ্রহণ করা বেশী।' হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বঙ্গীয় শব্দকোষেও বলা হয়েছে 'বাংলায় দল শব্দের অর্থ সমূহ, সমবায়'। তাতে মনে হয় তাঁর মতে ছন্দদল, দলছাদ প্রভৃতি শব্দ সংস্কৃত প্রয়োগসম্মত নয়। বস্তুতঃ কোনো সংস্কৃত অভিধানে 'দল' শব্দের সমূহার্থের উল্লেখ অবধি সংস্কৃত সাহিত্যেও সমূহার্থক দল শব্দ পাইনি। তাই জানতে ইচ্ছা হয় বঙ্কিম-কথিত বন্দেমাতরম গানের 'সুমধুর-ভাষিণীং' ও 'সুখদাং বরদাং' এবং রবীন্দ্রনাথের 'জাগো অধিবাসী অয়ি দল' প্রভৃতি শব্দকে সংস্কৃত রীতিসম্মত বলে স্বীকার করা যায় কি? হলন্ত অবাচীন সংস্কৃত বা প্রাকৃতে দল শব্দের সমূহার্থক প্রয়োগ দেখা দিয়েছিল। যদি তা-ই হয় তবে কখন থেকে ও কিভাবে দল শব্দের এই অর্থান্তর ঘটল এবং বাংলাতে স্বীকৃত হল তা অনুসন্ধানের বিষয় বলেই মনে করি।

৬

অমূল্যবাবু বলেছেন, তিনি (সত্যেন্দ্রনাথ) সিলেবল অর্থে 'দল' কথাটি কখনও প্রয়োগ করেন নাই। অন্য কোনও ছান্দসিক বা লেখকও পূর্বে করেন নাই। কোনও অভিধানে এই প্রয়োগের সমর্থন পাওয়া যায় না।...অতএব সিলেবল-এর প্রতিশব্দ হিসাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে না।' এই উক্তির প্রথম তাৎপর্য এই যে, আভিধানিক বা অনাবিষ্কৃত পূর্ব প্রয়োগ না পাওয়া গেলে কোনো নতুন পারিভাষিক শব্দ রচনা করা অনধিকারচর্চা। তাই যদি হয় তবে প্রথমেই সুনীতিকুমারের রচিত অনেকগুলি ভাষা-তাত্ত্বিক পরিভাষাকে বাতিল করে দিতে হয়। তা ছাড়া রামমোহন থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত নানা বিষয়ে অসংখ্য নূতন পরিভাষা রচিত হয়েছে সবই অগ্রাহ্য হয়ে যায়। এমন কি সত্যেন্দ্রনাথের 'পর্ব' শব্দটিও বর্জন করতে হয়। তাঁর উক্তির দ্বিতীয় তাৎপর্য এই যে, সত্যেন্দ্রনাথ বা অন্য কোনো ছন্দবিদ (কিংবা লেখক) যদি আমার পূর্বে 'দল' শব্দটি প্রয়োগ করতেন তাহলে অমূল্যবাবুর কোনো আপত্তি থাকত না। অমূল্যবাবু নিজের অভিরুচি অনুসারে কোন রচিত পরিভাষা গ্রহণ করবেন আর কোন পরিভাষা বর্জন করবেন সে বিষয়ে আমার কোনো বক্তব্য থাকতে পারে না। তবে আমার একটা বিনয় আছে যে, নূতন পরিভাষা কাউকে-না-কাউকে বিনা দ্বিধায় প্রথম প্রবর্তন করতে হয়। আমার এ বিশ্বাসটা অমূলক বিনা তাই বিচার জানানোই করুন। 'দল' শব্দটা আমিই প্রথম প্রবর্তন করেছি একথা আমি বলে করেছি। ছন্দোবিদরা নিজের ইচ্ছামতো এ শব্দটা গ্রহণ বা বর্জন করতে পারেন। অন্যের ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণ করার অভিপ্রায় বা ক্ষমতা আমার নেই। 'কাস্যোহয়ং নির্বন্ধঃ'—জাতীয় অভিমানও আমার নেই। অমূল্যবাবু বা অন্য কেউ 'দল' শব্দের চেয়ে সুষ্ঠুতর কোনো পরিভাষা উদ্ভাবন করলে আমি সানন্দে মেনে নিতে রাজী আছি। ছন্দসিকরা দল শব্দটা স্বীকার করে নিলে আমার কীর্তির খাতায় একটা মোটা অঙ্কে জমা পড়বে এমন প্রত্যাশা আমি স্বীকৃত না হলে আমার জমার অঙ্ক শূন্য হয়ে যাবে এমন আশঙ্কা আমি করি না। কিন্তু এই যে-নবীন ও যেসব ক্ষেত্রে শব্দটা সমালোচকের তর্জনী কম্পনে ভীত হয়ে আপন দখল ছেড়ে পালাবে এমন কোনো লক্ষণ এখনও দেখা যাচ্ছে না।

বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে নতুন পরিভাষা রচনার শ্রেষ্ঠ বিদ্যাসের কতকগুলি স্বীকৃত নীতি ও সূত্র আছে। ছন্দশাস্ত্রের পরিভাষা রচনা ও বিন্যাসের ক্ষেত্রে হাত দেবার পূর্বে এই নীতিসূত্রগুলি জানা মনে আয়ত্ত করে নিতে চেষ্টিত হয়েছিলাম। ওই শিক্ষারই অন্যতম ফল ওই খুদে 'দল' শব্দটি। আমার শিক্ষার ফলাফল নির্ভর করছে আমার সমালোচক-পরীক্ষকদের বিচার বিবেচনার উপরে। এ প্রসঙ্গে আমি শুধু জানিয়ে রাখতে পারি যে, পরীক্ষার দায়ভারে আমি বরাবরের মতো এখনও গীতার 'মা ফলেষু' শ্লোকের নীতিতে শঙ্কাশীল। কিন্তু কর্ম আমার যে অধিকার আছে তাকে থেকে কেউ আমাকে বঞ্চিত করতে পারেন না।

'দল' সম্পর্কে আমার সর্বশেষ মতামত ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে 'ছন্দ-জিজ্ঞাসা' গ্রন্থের ৪১৮-১৯, ৪২২-২৬, ৪৭৭ এবং ৪৭৯ পৃষ্ঠায়। এই গ্রন্থের সব বক্তব্য বর্তমান আলোচনায় পুনরাবৃত্ত হয়নি। আগ্রহী পাঠক প্রয়োজন মতো ওই পৃষ্ঠা-গুলি দেখে নিতে পারেন। তারপরেও যদি কোনো পাঠকের মনে এ বিষয়ে কোনো সংশয় বা প্রশ্ন থাকে তবে এই পত্রিকা-যোগে জানালে আমি যথাসাধ্য আমার বক্তব্য স্পষ্টতর করতে চেষ্টিত হব। কিন্তু যিনিই এ প্রসঙ্গ পুনরুত্থাপন করুন তাঁর কাছে আমি 'আন্তর্জাতিকসম্মত ভাষা ও যুক্তি-নিষ্ঠতা' প্রত্যাশা করব। কারণ অসংযত ভাষা প্রয়োগে ও অপর পক্ষের যুক্তি খণ্ডন না করে তাঁর সিদ্ধান্তকে এক-তরফা ভ্রান্ত বলে ঘোষণা করা (যাকে বলে এক কথায় নস্যাৎ করা) সত্য নিরূপণের সদুপায় নয়। তা ছাড়া যেসব ক্ষেত্রে 'তর্ক-যুদ্ধের' উদ্ভব হয়েছে, শেষ যুদ্ধে পালি নীতি অনুসৃত হয়, যেসব স্থান থেকে যুদ্ধে থাকাই আমি সঙ্গত মনে করি।

Interpub/BB/55/75 Ben

CENTRAL LIBRARY

কবিতা

একলা জেগে ॥

জয়ন্তকুমার

ঘরের মধ্যে একলা জেগে প্রহর গুনি।
মাঝে মাঝে টেলিফোনের আওয়াজ আসে,
বহুদূরের আলাপ শুনি—
কতদিন যে দেখা হয় না, জয়ন্ত রে,
এখনও তুই আগের মতই দূরে রইলি?

আশ্চর্য সব দূরের মানুষ টেলিফোনের প্রান্ত ধরে কাছে আসে,
ফিসফিসিয়ে কথা বলে, যেন সহর
ঘুমের মধ্যে জেগে থাকে মধ্যরাতে—
জয়ন্ত রে, এখনও তুই আগের মতই দূরে রইলি?
দূরে থাকার সকল প্রশ্ন বাতিল করে
কাছে আসার চেষ্টা করি।
তখন আবার টেলিফোনের রং নাম্বার,
অলীক মানুষ অলীক কণ্ঠে প্রশ্ন করে—
জয়ন্ত রে, এখনও তুই আগের মতই দূরে রইলি?

মাঝে মাঝে মনে পড়ে, আমন্ত্রণের চিঠি পাইনি
কারো বিয়ের, জন্মদিনের, কিংবা কোনো মহোৎসবের।
মন পড়ে, এসব কথা মনে পড়ে—
জয়ন্ত রে, এখনও তুই আগের মতই দূরে রইলি?

শর্তকে ডিঙিয়ে

গোবিন্দ ভট্টাচার্য

দেখার নিজস্ব কিছু শর্ত থাকে
আমি সেই শর্তকে ডিঙিয়ে
মানবিক হতে যাই
খিঁচি করে হেসে ওঠে রোদ
মসৃণ সবুজ ঠোঁটে খুকে ওঠে
বলশ্বদ টিয়া।

জোৎস্না থেকে রস নিঙড়ে
জ্যোৎস্না-সার
অথবা নিখাদ কান্না
ছুঁকে দিয়ে বলতে পারি—
আমি এইভাবে জীবনকে দেখি।
দেখার নিজস্ব কিছু শর্ত থাকে
কৃমি নয়, ফর্টিফাই মাঠে মাঠে
ফলাধান খুঁজে ফেরে স্বপ্নের শালিখ,
দুঃখের নদীতে
ময়ূরপঙ্খিকে খোঁজে লহনা খুল্লনা
বাতাসে বাহিত হয় সম্মিলিত
গলিত শব ও ছাত্রিফকলের ঘ্রাণ।
আমি এই শর্তকে ডিঙিয়ে
ঝোলানো সিঁড়ির মাথা থেকে
জীবনকে ঠেলে দিই।

নাটকে যা হাততালি পায়
জীবন তা ফিরেও দেখে না।

কুরুক্ষেত্র ছেড়ে ॥

অতীশ বন্দ্যোপাধ্যায়

এইখানে শুইয়ে দিও, জলা দুপুর, সবুজ মাঠ
অসমতল জমির ওপর
বসুন, বিদ্যুৎ চমকে যাওয়া ঠাণ্ডা হাওয়ায়
সান্ত্বনা দুঃখবোধের মতন
অস্বচ্ছ পিছুটান
শ্যাওলা-জমা স্মৃতি-ফলক, বৃষ্টিতে ম্লান স্তব্ধ উলুখড়

এখানেই শুইয়ে দিও, তাহলে বোধহয়
মৃত্যু-মুহূর্তে
আমার তেমন কোনো কষ্ট হবে না

আজ বছরের প্রথম বৃষ্টি এলো, ঋতুহীন
সরলরেখার মত শুদ্ধ
দুকূল কাপসা করে, যেন শুরু হবে অভিনয়
বসের পর্দা সরে গেলে সবুজ পৃথিবী
দাসী থেকে পুনর্বার রাজরাণী হবে

ভেবি, এইখানে রেখে ধনুর্বাণ
বিস্মৃত পৌরুষ ছেড়ে চলে যাবো শমীহীন ঘরে

আমাকে শুইয়ে দিও এখানেই, তাহলে আমার
মৃত্যু-মুহূর্তে
হয়ত তেমন কোনো কষ্ট হবে না।

জোড়া হৃৎপিণ্ড নিয়ে আরো বেশীদিন বাঁচুন

* জোড়া হৃৎপিণ্ড
* মহাকাশ কর্মসূচী
* চুইংগাম

জোড়া হৃৎপিণ্ড শুনে দুটি হৃৎপিণ্ড এর সঙ্গে হৃদ্‌রোগাক্রান্ত বাপ্পিবের কোনো সম্পর্ক নেই। সোভিয়েত বিজ্ঞানী প্রফেসর ভ্লাদিমির দেমিকভ. তি এস সি (জীববিজ্ঞান), এই বিষয়টি নিয়ে বহুকাল গবেষণা করছেন এবং অনেকখানি সফলও হয়েছেন। তাঁর ধারণা, হৃৎপিণ্ড যদি একটি পাম্প করার যন্ত্র হয়ে থাকে তাহলে এই পাম্প একটির জায়গায় দুটি হলে পাম্প করার কাজটি আরো সহজ ও আরো ভালোভাবে সম্পন্ন হতে পারে। রেলগাড়িতে একটি ইঞ্জিনের জায়গায় দুটি ইঞ্জিন লাগালে যে সফল, জীবের শরীরে একটি হৃৎপিণ্ডের জায়গায় দুটি হৃৎপিণ্ড লাগানোও তাই।

প্রফেসর ভ্লাদিমির দেমিকভ হচ্ছেন সোভিয়েত ইউনিয়নের একটি অঙ্গ পুনঃস্থাপন ল্যাবরেটরির প্রধান। দাবি করা হয়, তিনিই প্রথম একটি কুকুরের শরীরে তার নিজস্ব হৃৎপিণ্ডটি সরিয়ে অপর একটি হৃৎপিণ্ড স্থাপন করেন, কুকুরটি পাঁচ ঘন্টা বেঁচেছিল। ১৯৫০ সালে পুনরায় তিনিই প্রথম একটি কুকুরের হৃৎপিণ্ড অপর একটি কুকুরের বক্তবাহী নালীর সঙ্গে যুক্ত করেন। কুকুরের শরীরে দ্বিতীয় আরকটি বাড়তি হৃৎপিণ্ড জোড়ার কাজ তিনি আজ পর্যন্ত কুড়িটিরও বেশি করেছেন। তাঁর লেখা একটি প্রবন্ধ আমাদের হাতে এসেছে, তা থেকে কিছু অংশের বক্তব্য নিচে উপস্থিত করছি।

হৃৎপিণ্ড জোড়াটা এখনো সবচেয়ে জটিল একটি মেডিক্যাল সমস্যা। সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা এক্ষেত্রে অনেক বড়ো বড়ো কাজ করেছেন। হাতে-নাতে পরীক্ষা করে তাঁরা প্রমাণ উপস্থিত করেছেন যে মানুষের শরীরের একটি হৃৎপিণ্ড অচল হয়ে যাবার পরেও তাকে আবার সচল করা যেতে পারে। সেই ১৯০২ সালেই সোভিয়েত বিজ্ঞানী প্রফেসর এ কুলিয়াবকো একটি শিশুর ক্লিনিকাল মৃত্যুর ২০ ঘণ্টা পরে তার হৃৎপিণ্ডটি পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন। পরবর্তীকালে সোভিয়েত বিজ্ঞানী এস আন্দ্রিয়েভ একটি মানুষের শরীর থেকে হৃৎপিণ্ডটি তুলে নিয়ে আসার ১১২ ঘন্টা পরে সেটিকে পুনরুজ্জীবিত করেন।

একটি কুকুরের শরীরে দ্বিতীয় আরেকটি হৃৎপিণ্ড জুড়ে দেওয়া কিংবা তার নিজস্ব হৃৎপিণ্ডটি সরিয়ে দ্বিতীয় আরেকটি হৃৎপিণ্ড স্থাপন করা—কোনোটিই যে অসম্ভব নয় তা পরীক্ষাকার্য থেকে প্রমাণিত হতে থাকে। অসুবিধা ছিল সেই সমস্ত পরীক্ষাকার্য, এ-প্রসঙ্গে প্রফেসর দেমিকভ উল্লেখ করেছেন, পরীক্ষাকার্যগুলো চলার সময়ে ডঃ বিঁকিয়ান বার্নার্ড (হৃৎপিণ্ড পুনঃস্থাপন করে যিনি ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন) ছিলেন তাঁর অতিথি। সমস্ত পরীক্ষাকার্যে তিনি উৎসাহের সঙ্গে যোগ দিতেন এবং প্রফেসর দেমিকভের তখনই মনে হয়েছিল যে ডঃ বার্নার্ড একজন অভীক্ষ সাহসী ও অন্যের প্রাণসম্পন্ন শল্যচিকিৎসক। হৃৎপিণ্ড পুনঃস্থাপনের ঐতিহাসিক অস্ত্রোপচার করার পরে তিনি টেলিফোনে প্রফেসর দেমিকভের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছিলেন।

প্রফেসর দেমিকভ মনে করেন, এমন কি আজ যদি সমস্ত যন্ত্রপাতি নষ্ট হয়ে যায় তবুও যে-কোনো মানুষের মৃত অঙ্গ যে-কোনো মানুষের জীবন্ত শরীরে বসানো যাবে—অঙ্গবিকৃতা বা টিস্যু বিচ্ছেদের সম্ভাবনার কোনো প্রশ্নই উঠবে না। মাত্র দশ বছর আগেও কোনো মানুষের শরীরে কিডনি পুনঃস্থাপন করতে হলে একমাত্র তার সহোদরদের মধ্যে থেকেই সংগ্রহ করা হত। এখন যে কোনো মানুষের কিডনি গ্রহণ করা যেতে পারে। হৃৎপিণ্ড বা অন্য পুনঃস্থাপনের বেলাতেও এই ধরনের ভিত্তি না হবার কোনো কারণ নেই।

জীবের শরীরে দ্বিতীয় আরেকটি হৃৎপিণ্ড জুড়ে দেবার ব্যাপারে আপাতত তোলা হচ্ছে যে দুটি হৃৎপিণ্ডের সংকোচন ও প্রসারণ একতালে সম্পন্ন থাকবে না। প্রফেসর দেমিকভ মনে করেন এই আশঙ্কা অমূলক। দ্বিতীয় হৃৎপিণ্ডটি কাজ করবে বাড়তি একটি পাম্প হিসেবে মাত্র, মূল হৃৎপিণ্ডের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক থাকছে

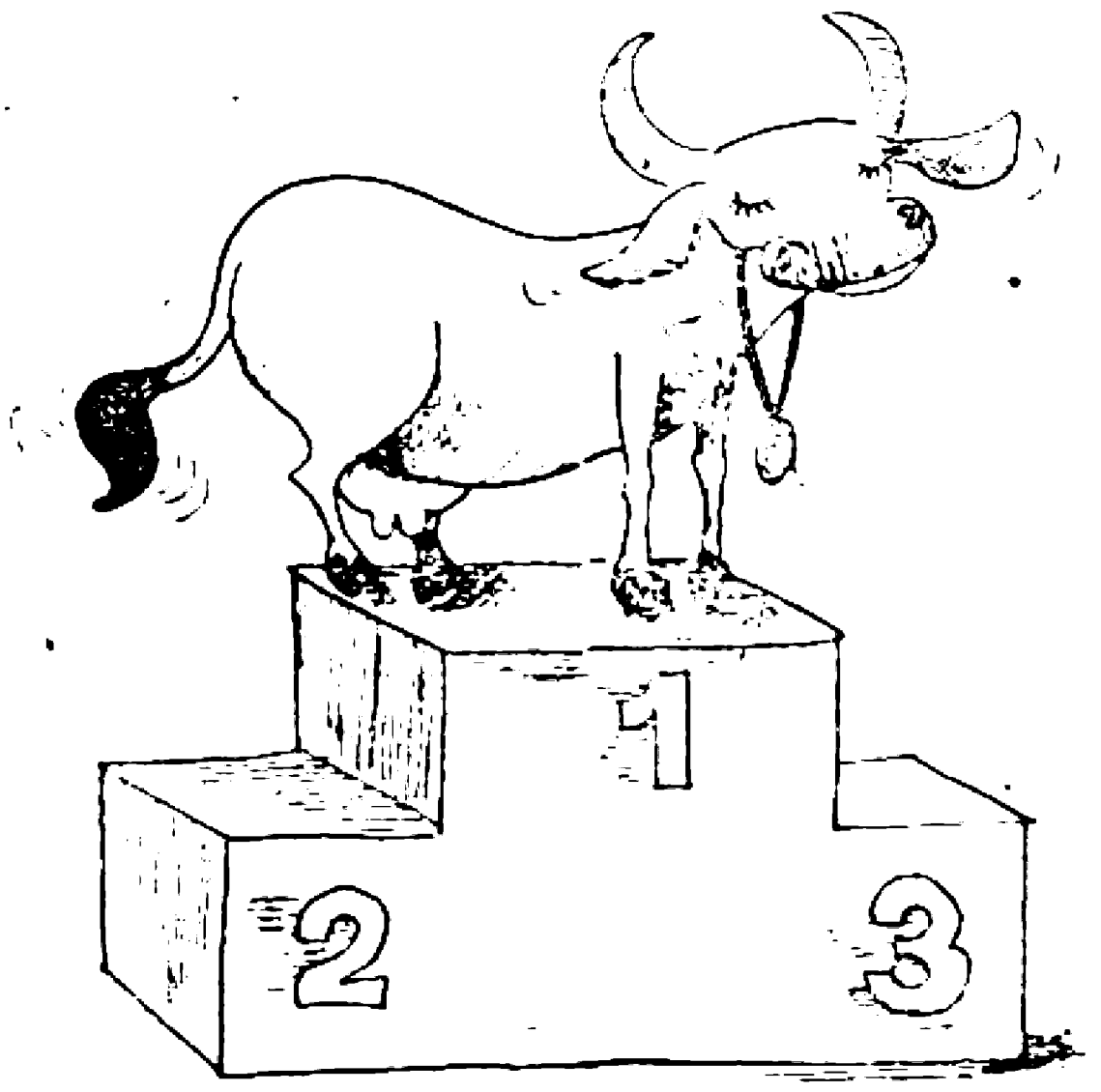

বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান গরু

না। ধরে নেওয়া যাক, দুটি পাম্প একসঙ্গে একটি নলের মধ্যে তরল পদার্থ ঠেলে দিচ্ছে—এক্ষেত্রে একটি অপরটির সহায়ক, পুরো কাজটি হচ্ছে অংশে অংশে ভাগ হয়ে।

জীবের শরীরে নিজস্ব হৃৎপিণ্ডটি সরিয়ে দ্বিতীয় আরেকটি হৃৎপিণ্ড প্রতিস্থাপন করার চেয়ে নিজস্ব হৃৎপিণ্ডটি রেখে দ্বিতীয় আরেকটি হৃৎপিণ্ড জুড়ে দেওয়াটা অনেক কম বিপজ্জনক, কৎ-কৌশলের দিক থেকে অনেক সহজ, কার্য-কারিতার দিক থেকে আরো ফলপ্রদ।

অসুবিধেও আছে—বাড়তি অঙ্গ চাইলেই পাওয়া যায় না। দাতার প্রশ্নটি সব সময়েই বড়ো হয়ে দেখা দেয়। কাজেই এমন যদি সম্ভব হয় যে ভেড়ুকানোয়ারের অঙ্গ মানুষের শরীরে বসানো যাচ্ছে তা-হলে আর কোনো সমস্যাই থাকে না। প্রফেসর চেম্বারলেনের গবেষণায় এই দিকটিও অন্তর্ভুক্ত। তিনি আশা করেন, কিছুকাল পরে মানুষের শরীরে একটি বাড়তি পাম্প হিসেবে কাজ করার জন্য অনায়াসেই ভেড়ার হৃৎপিণ্ড বসানো চলবে। এবং সেই জোড়া হৃৎপিণ্ড নিয়ে মানুষটি আরো অনেক বেশি দিন বাঁচবে।

কর্মসূচীর ভবিষ্যৎ

মহাশূন্যে অ্যাপোলো-সহযোগে সম্মিলন ঘটানোর কাজটি সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন হয়েছে। অতঃপর ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে সু-মনুষ্য মহাকাশ-অভিযানের কোনো পরিকল্পনা নেই। আগামী কয়েকটি বছর ধরে মহাকাশ-গবেষণায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান প্রয়াস নিবদ্ধ থাকবে পৃথিবীর কক্ষপথে স্পেস-স্টেশন স্থাপনে এবং স্পেস-স্টেশন ও ভূ-পৃষ্ঠের মধ্যে শাটল-সার্ভিস চালনায়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল এরো-নটিক্স অ্যান্ড স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (নাসা)-এর প্রশাসক ডঃ জেমস সি ফেলচার সম্প্রতি (২১ জুলাই) মার্কিন কংগ্রেসে মহাকাশ-গবেষণায় ভবিষ্যতের কর্মসূচীর কিছু আভাস দিয়েছেন। তিনি জানান, আশা করা হচ্ছে মার্কিন স্পেস শাটল চলতে সুরু করবে ১৯৮০ সাল থেকে।

নাসা-র সহকারী অধিকর্তা ডঃ ডোনাল্ড পি হার্ড জানাচ্ছেন, মহাকাশ-গবেষণায় আন্তর্জাতিক সহযোগিতার সেরা উপায় হচ্ছে পৃথিবীর কক্ষপথে স্থায়ী একটি স্পেস-স্টেশন এবং চাঁদের মাটিতে বৈজ্ঞানিক গবেষণার একটি ঘাঁটি স্থাপন। দুটি কাজই এই শতকের মধ্যে হওয়া সম্ভব এবং হবেও। তবে চাঁদ ছাড়িয়ে অন্য কোনো গ্রহে মানুষের উপস্থিত হবার সম্ভাবনা এই শতকে নেই, আগামী শতকের জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

মহাকাশ-গবেষণার কর্মসূচী গভীর-ভাবে সম্পর্কিত দেশের ও বিশ্বের সামা-জিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরি-বেশের সঙ্গে। ভবিষ্যতের মহাকাশ-গবে-ষণা অবশ্যই সমগ্র বিশ্বের পক্ষে মঙ্গলকর হবে। বিশেষ করে তিনটি বিষয়ের উল্লেখ করা যেতে পারে।

বিশ্বের জনসংখ্যা প্রতিবছর দুই-শতাংশ হারে বাড়ছে। এমনি বাড়তে বাড়তে আগামী ৫০০ বছরের মধ্যে তিনগুণে হয়ে যাবার সম্ভাবনা। তখন খাদ্যের প্রয়োজন হবে এখনকার চেয়ে আরো ছ'গুণ অধিক। মহাকাশ-গবেষণা এক্ষেত্রে সহায়ক হবে আবহাওয়া ও জল সম্পর্কে নির্ভুল ভবিষ্যদ্বাণী করে।

দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে খনি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী। এই ভবিষ্যদ্বাণীর দ্বারা সারা বিশ্ব উপকৃত হবে।

তৃতীয় বিষয়, গ্রহ উপগ্রহ ও আবহ-মণ্ডলের উদ্ভব কি ভাবে?—এই প্রশ্নের জবাব। আমাদের এই বিশ্বের বয়স ১৫০০ কোটি বছর, আমাদের এই সূর্যের বয়স ৫০০ কোটি বছর—এই দুটি ঘটনার বিবর্তনের হদিশ জানা যাবে মহাকাশ-গবেষণা থেকে। কেননা স্থায়ী স্পেস-স্টেশন স্থাপনের পরে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এই প্রথম পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাইরে গিয়ে পরিষ্কারভাবে বিশ্বকে অব-লোকনের সুযোগ পাবেন। সে-তুলনায়, বায়ুমণ্ডলের ভিতর থেকে এতদিনকার বিশ্ব-অবলোকন ছিল কালো ও লোংরা কাঁচের ভিতর দিয়ে তাকিয়ে দেখার সামিল।

চুইংগাম

গাম চেবানোর অভ্যেস আমাদের দেশেও বাড়ছে—তবে, বলাই বাহুল্য, অপেক্ষাকৃত ধনী পরিবারের ছেলেমেয়েদের মধ্যে। দেশের অধিকাংশ ছেলেমেয়ে 'খাদ' নিয়েই থাকে, তুষ্টি তো বটেই, তাদের পক্ষে চুইং গাম কেনাটাও যেমন বিলাসিতা তেমনি এই স্বাদহীন পুষ্টিহীন খাদ্যবস্তুহীন পদার্থটি ঘনঘন চিবিয়ে চলাটাও নিরর্থক! তবুও, যদি কারও ধারণা থাকে যে গাম চেবানোটা স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী তা হলে ভুল করা দরকার। চিকিৎসকরা পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন, চুইং গাম চেবানোর অভ্যেস একটা বদ অভ্যেস। এ থেকে অজীর্ণতা ও পেটের অন্যান্য গোলমাল দেখা দেয়, মান-সিক দুর্বলতা ঘটতে পারে, এমনকি পাগল হয়ে যাওয়াও অসম্ভব নয়।

সবাই এই মতের সমর্থক নন, ভিন্ন মতাবলম্বীরাও আছেন। তাঁদের ধারণা, চুইং গাম চেবালে মুখের গ্রন্থি থেকে প্রচুর লালা নিঃসরিত হয়, যা হজমের সহায়ক ও স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী। কোনো কোনো মনস্তত্ত্ববিদের বিশ্বাস, চুইং গাম চিবিয়ে চললে পেশীর টান ধরে হয় ও নিঃসঙ্গতা কাটে (কোনো কোনো ধূমপায়ী যেমন সিগারেটকে সাথী মনে করে)। তাঁরা আরও বলেন, চুইং গাম চেবালে নাকি একঘেয়ে কাজ করতেও ক্লান্তি বোধ হয় না।

চুইং গামকে বলা চলে আমেরিকার অবদান। খোদ আমেরিকায় এই পদার্থটি প্রথম প্রবর্তিত হয় ১৮৬০-এর দশকে। তারপরে কিছুদিনের মধ্যেই গোটা দেশে চুইং গাম চেবানোর অভ্যেস প্রায় একটা নেশার মতো হয়ে ওঠে। এখন অবশ্য কমের দিকে, কিন্তু এখনো ও-দেশে বছরে ৩,০০০ কোটি পীস চুইং গাম বিক্রি হয়ে থাকে। তুলনায় আমাদের দেশে চুইং গামের বিক্রি প্রায় নগণ্য। কিন্তু বছরে বছরে এমন হারে বাড়ছে যে বিগত শতকের আমে-রিকাকে ধরে ফেলাও অসম্ভব নয়। তাই আবার বলা দরকার, চুইং গাম চেবানো স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর: চুইং গাম চেবালে অজীর্ণতা ও পেটের গোলমাল হয়, মানসিক দুর্বলতা ঘটতে পারে, এমনকি পাগল হয়ে যাওয়াও অসম্ভব নয়।

একটা কিছু চেবানোর অভ্যেস মানুষের কাছে নতুন নয়। সেই প্রাচীনকালেও মানুষ ঘাস ও পাতা চেবাত। গ্রীকদের অভ্যেস

প্রকাশিত হল দীপঙ্কুমার সরকারের
অন্য একটি রোমাঞ্চকর হিমালয় ভ্রমণ কাহিনী
পিণ্ডারীর পথে ১৪৲
পরিবেশক : দে বুক স্টোর
১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলি—১২

অমৃত

জাল সই ধরার যন্ত্র

ক্যালিফোর্নিয়ার স্ট্যানফোর্ড গবেষণা ইনস্টিটিউটে উদ্ভাবিত ইলেকট্রনিক কলম। উদ্ভাবক হচ্ছেন ডঃ হিউইট ব্রেন। কলমটি যুক্ত রয়েছে একটি কম্পিউটার-ব্যবস্থার সঙ্গে স্বাক্ষরকারীর কলমের গতি, কলমের ওপরে প্রদত্ত চাপ ইত্যাদি এই কম্পিউটার ধরার ব্যবস্থা আছে। অন্যথা হলেই সংকেত ফুটে ওঠে—জাল।

বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ন গরু

পেনসিলভানিয়ার একটি গোরু ১ সালে মোট দুধ দিয়েছে ৫০৭৫১ প বা মোটামুটি ২৩,১৩১ কিলোগ্রাম। ২ দিনের হিসেবে ৬৩ কিলোগ্রামের ঐ গোরুটির নাম কোহিন, সে হল্ ভাতীয়। এ-জাতীয় গোরু বছরে সাধা ১৩,০০০ পাউন্ড দুধ দিয়ে থাকে। কো দিচ্ছে তার প্রায় চারগুণ। এক বছর-বয়স্ক ১,৬০০ পাউন্ড ওজনের কোহিন-কে দেওয়ার ব্যাপারে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন গরু হয়। সম্প্রতি একটি অনুষ্ঠানে তাকে সম্মানিত করা হয়েছে এবং তার জন্য সেখানে প্রচুর ফলমূল হয়। সে ছবিতে কোহিনটি দেখা যাচ্ছে। কোহিনকে বিক্রয়ের কথা হোলস্টাইন কিনা জানা যায়নি, কিন্তু ছবিটি তোলা হয়েছে স্পেনীয় পত্রিকের।

অমৃত

...কদের শুধু চোখে নয়, চেখে ...। হয়েছে নভশ্চরদের জন্য সাধারণের ...ী কী ছিল। এই উদ্দেশ্যে বিদেশী ...দকের যুরি গাগারিন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ...নি করেছিলেন। তাঁদের স্বাগত জানান সোভিয়েত নভশ্চর আলেকসি ...ভ।

...শ্চরদের জন্য খাদ্য তালিকা অনেকটা ...ছিল এই রকম: প্রথম প্রাতঃরাশে ...প্যাটি বোরোদিনস্কি' রুটি, 'প্রুনস' ...কফি ও দুধ। দ্বিতীয় ...ণ কাস্টার্ড ও মধু সহ- ...দই। মধ্যাহ্নভোজে জর্জিয়ার ...সুপ খারচো, মুরগির মাংস, ...চেরুশ্ব ও বাদাম। নৈশভোজে প্যাটি রুটি ও বোরোদিনস্কি' পনীর। ...পোলোর মার্কিন নভশ্চররা সয়ুজের ...ত নভশ্চরদের নিমন্ত্রণে সয়ুজের যে মধ্যাহ্নভোজ খেয়েছেন তার মেনু ...লিখিতরূপ।

যে স্বাদ সকলের মুখে মুখে !

ভার্জিনিয়ার স্বাদ—উইলস নামের মর্যাদা রাখে

সর্বাধিক মূল্য ২ টাকায় ২০টা, ১ টাকায় ১০টা স্থানীয় কর সহ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আবার সেই পুরোনো জায়গাতে আমরা দুজনে পাশাপাশি চলেছি। পূর্বদিকের রুপোলী ঝলমলানো পাহাড়ের মাথায় পাইন গাছের ডালে তেমনি আশ্চর্যভাবে আটকে আছে। বালুর পাশাপাশি চলতে চলতে ভীষণ এক আত্মবিশ্বাসে আমার মন ভরে উঠছে। হয়ত এটা যৌবনেরই ধর্ম। পরিণত বয়সে যাকে বিচার করে আমরা বাতিল করে দিই যৌবনে তাই আমরা ধুলি ঝেড়ে তুলে নিই অনেক সমাদরে।

বালুর কোঠাতে ঢোকার আগে শুধু বললাম কোন গ্লানি মনে রাখতে নেই বালু। মনে রাখা মানেই হাতে পুষে রাখা। মনের পাপ মনই ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে নেবে। মাথা উঁচিয়ে পথ চলবে।

বালু হঠাৎ এক লাফ দিয়ে বসল। আমার সামনে নতজানু হয়ে বসে আমার হাতখানা টেনে নিয়ে ওর কপালে ছুঁইয়ে বলে।

নাগপুর থেকে চিঠির আশা করছিলাম কিন্তু কুলুর স্ট্যাম্প লাগানো চিঠি এল আমার হাতে। অবশ্য চিঠি যে ঝিনুর তা হাতখানার লেখা থেকে বোঝা যাচ্ছিল।

চিঠি পড়ার আগে নিজেকে প্রস্তুত করে নিলাম। আমি জানি না চিঠিতে কি আছে তবু মনে হল একটা অভাবিত কিছু আমার জন্যে অপেক্ষা করে আছে এ চিঠিতে। আমি যেন ভাগ্যের পাশা হাতে তুলে নিয়ে বসে আছি কি দান পড়বে তা একেবারে আমার অজানা। কিন্তু এই শেষ দানটিতেই নির্ভর করছে আমার নিশ্চিত হারজিৎ।

চিঠি খুললাম। তার আগেই মনকে আমি প্রস্তুত করে নিয়েছি।

প্রথম সম্বোধনের ভাষাই ঝিনু পাল্টে দিয়েছে :

প্রত্যুষ জনেষু,

রিপ্ ভান উইঙ্কল্ এর মত দীর্ঘদিন একটা আচ্ছন্ন ঘুমের জগতে কাটিয়ে হঠাৎ জেগে উঠে দেখি আমার চারদিকের সবকিছু পাল্টে গেছে। কতকগুলো অদ্ভুত স্বপ্ন আমি দেখেছিলাম। আর স্বপ্নগুলোকে সত্যি বলে গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে ভেবে বসেছিলাম। ঘুম ভেঙ্গে দেখি তারা কখন নিঃশব্দে সরে গেছে কিন্তু আশ্চর্যভাবে পাল্টে দিয়ে গেছে আমার পুরনো জগতটাকে।

স্বপ্নের স্মৃতিগুলো নিয়ে এই মুহূর্তে আমার কোন কাজ নেই। তবে আমি এতকাল যে জীবনটাকে ভুলেছিলাম তাকে আবার কে আমার কাছে ফিরিয়ে এনে দেবে?

আমার পায়ের তলা আড়ষ্ট হয়ে আসছে যখন ভাবছি আবার কবিন পরে নাগপুরের ঘড়াই ভেঙ্গে আমাকে ওপরে উঠতে হবে। আবার ঢুকতে হবে আমার ঐ কোয়ার্টারে। যেখানে একদিন আমি আমার সব খুইয়েছি, সেখানে জানিনে কোনদিন আর নির্ভয়ে নিশ্চিন্তে থাকতে পারব কিনা। প্রতি রাতে দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে উঠে আমাকে সব হারানোর কান্না কাঁদতে হবে। আমার বিভীষিকার সে রাতগুলো কতদিন আমাকে কাটিয়ে যেতে হবে তা কে বলে দেবে?

আজ কারো ওপর কোন অভিযোগ আমার নেই যদি থাকে সে শুধু নিজের ওপর। জীবনে সরল বিশ্বাসে সবকিছুকে মেনে নিলে যে কোন মুহূর্তে সবস্ব হারানোর সম্ভাবনা থাকে। পরিপূর্ণ সুখী জীবনের স্বপ্ন বোধহয় দেখতে নেই, তাহলে ওটা চিরদিন স্বপ্নই থেকে যায়।

জীবন নিয়ে যে বেপরোয়া জুয়া খেলে যেতে পারে হয়ত কোনদিন তারই জেতার সম্ভাবনা থাকে। অন্তত হারলে তার বুকখানা ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যায় না। কারণ সে জানে সে খেলোয়াড়। ভালবাসার খেলায় এক জায়গায় হারলে অন্য জায়গায় জেতার জন্যে তাকে লড়াই করে যেতে হবে।

নাগপুরের ফরেস্ট গার্ডের ছোট্ট কোঠাতে আমি ইদানীং প্রায়ই পড়ে থাকতাম বেশ বুড়ো গার্ড হেসে বলত আমার তো ছুটির সময় হয়ে এল এবার গার্ডটো তুই নিয়ে নে বেটী তাহলে এ কোঠাও তোর হয়ে যাবে।

এবার ফিরে গিয়ে যখন আর ওপথে পা মাড়াব না, তখন বুড়োই হয়ত মোর আসবে নাঃ। জিজ্ঞেস করবে আমার না আসার কারণ। এর প্রশ্নের জবাব আমি আর কোনদিনও খুঁজে পাব না।

ভাগ্যের সবচেয়ে বড় কৌতুক যখন সব দোর ভেতর থেকে বন্ধ হয়ে যেতে তখন সম্পূর্ণ অজ্ঞ আমি চাকরীর কাছে গৃহপ্রবেশের জন্য আকুল আবেদন নিয়ে উপস্থিত হয়েছি।

শুধু অনুরোধ আমার সঙ্গে তোমার পরিচয়ের স্মৃতিগুলো আর কোনদিন কোনভাবেই আমাকে মনে করিয়ে দিও না। আমাকে আবার দুঃস্বপ্নগুলো আমার মত করেই বইতে দাও।

।। একটি অতি নির্বোধ মেয়ে ।।

চিঠিখানা বিকেলের ডাকে এসেছে। পশ্চিমের জানালা দিয়ে শেষবেলার রোদ এসে পড়েছে বিছানায় চিঠির পাতায়।

কারো বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আমার নেই। বড় ক্লান্ত লাগছে। নির্জনে একদিন

খেলা শুরু হয়েছিল সমস্ত মন নিকিষ্ট হয়ে সে খেলা খেলে চলেছিল কিন্তু হঠাৎ বাঁশি বেজে উঠতেই চমকে উঠলাম। ভুল তো আমি কিছু করিনি। তবে হুইসলটা বাজল কেন? প্রশ্ন নয় অদৃশ্য পরিচালকের ভুল একটা বাঁশির সংকেতে আমি হেরে গেলাম। এবারের মত খেলা আমার শেষ।

বসে আছি উত্তরের জানলার দিকে চোখ পেতে। মোটা স্রোতধারাটি বুক ভরে জল নিয়ে ছুটে চলেছে পাইনের সবুজ পাতা-গুলো হাওয়ায় কাঁপছে থিরথির করে। পাঁয় পাহাড়ের মাথায় সোনালী সূর্যের সোনা গলে ঝরে পড়ছে। কত যুগ ধরে প্রকৃতির বুকে চলেছে এমনি নিরন্তর খেলা। এরা কেউ তো সরে যায় নি খেলার আসর থেকে। আমাকেই শুধু সরে যেতে হল।

যার হৃদয় আছে যার অভিমান আছে সেই শুধু পারে না উঁচু গলায় প্রতিবাদ জানাতে। সে জানে জীবনের এমন ক্ষেত্র আছে যেখানে প্রতিবাদ চলে না। প্রতিবাদ সেখানে শুধু নিজের কাছেই হার মানা।

জীবনের মুখোমুখি যখন আর একটি মানুষ এসে দাঁড়ায়, তখন তাকে মুহূর্তেই চিনে নিতে হয়। সেই প্রথম দেখায় যদি তাকে চেনা না যায় তাহলে সারাজীবন ধরে মোটা মোটা সাইকোলজির বই উল্টে পরীক্ষা চালালেও তাকে আর চেনা যাবে না।

ঝিলি যদি নাগফণির মতশীতল পাহাড়ের কোলে আমার বুকের ছড়ানো উত্তাপ তার বুকের মধ্যে ভরে নিতে না শেখে থাকে তাহলে সূর্যের সমস্ত উত্তাপ ঢেলে দিলেও তাকে হয়ত আর কোনদিন উত্তপ্ত করে তোলা যাবে না। বুকের ভাষা কেউ কাউকে শিখিয়ে দিতে পারে না নিজে-কেই তার পাঠোদ্ধার করে নিতে হয়।

এই মুহূর্তে কেন জানি না আমার মনে হচ্ছে যে ঘরে আমি বসে আছি সেটা আমার ঘরই নয়। আমি এই পাহাড়ী দেশে বেড়াতে এসে উঠেছি এই হোটেলে। এর পাহাড় পর্বত নদী অরণ্য মানুষ সবই দেখা হল এখন সব পাওনা চুকিয়ে দিয়ে বাঁধা-ছাঁদা শেষ করে নিজের ফেলে আসা পুরাতন আশ্রয়ে ফিরে যাওয়া।

অসংলগ্ন ভাবনার ভারে আমার দিন-গুলো যখন এমনি মন্থর আর রাতগুলো বড় ক্লান্ত তখন এক সন্ধ্যায় ঝড়ের মত আমার ঘরে এসে ঢুকলো জুলিয়েন।

আমার সেই মুহূর্তে মনে হল ও যেন বন্ধ ঘরের ভেতর একরাশ প্রাণের হাওয়া বইয়ে দিলে। আমি বিস্ময়ের অন্ধকারে নির্বাক হয়ে তিলে তিলে বাথার প্রহর গুনে-ছিলাম ও যেন এসে সব কটা দরজা জানালা খুলে দিয়ে বলল নাও কত হাওয়া নেবে।

বেশ কিছুক্ষণ দুজনে দুজনের দিকে চেয়ে থাকার পর ও হঠাৎ বলে উঠল অসম্ভব এ কখখনো হতে পারে না মুখার্জী।

ম্লান হেসে বললাম দাঁড়িয়ে রইলে যে বোসো।

ও বসলে আবার বললাম কি হতে পারে না জুলিয়েন?

জুলিয়েন হাত নেড়ে বলল, আমি বাস থেকে নেমেই মদনলালের মুখোমুখি হয়ে-ছিলাম। স্কাউণ্ড্রেলটা সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে জড়িয়ে বালুর সম্বন্ধে একটা কেচ্ছা আমাকে শুনিয়ে দিলে। ওর নাক আমি গুঁড়িয়ে দিলাম। ব্যাটা পালিয়ে গেছে।

বললাম ঠিকই শুনেছ।

জুলিয়েন প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বলল থামো। ডাক্তার মুখার্জীকে চিনতে আমার আর বাকি নেই। তুমি আর নতুন করে আমাকে চেনাতে যেও না।

সেই মুহূর্তে গভীর একটা ব্যথা আমি বুকের ভেতর বোধ করতে লাগলাম। জুলিয়েনের চোখ যে সত্যকে মুহূর্তে চিনে নিল আমার ঝিলির চোখ ঝাপসা হয়ে গেল সেখানে।

বললাম ঝিলিও আমাকে যেখানে অপ-রাধী সাব্যস্ত করল সেখানে তুমি আমাকে বেকসুর মুক্তি দিতে চাও!

জুলিয়েন মুখ নীচু করে রইল কতক ক্ষণ। একসময় বলল তোমার মুখ থেকে সবটুকু ঘটনা আমি জানতে চাই মুখার্জী।

বালু-ঘটিত সমস্ত ঘটনা পর পর সাজিয়ে শোনালাম জুলিয়েনকে। সঙ্গে সঙ্গে বালু সম্বন্ধে আমার ধারণার কথাও জানিয়ে দিলাম। এখনও যে বালুর সঙ্গে আমার যোগাযোগ আছে সেটুকুও মনে কোনরকম দ্বিধা না রেখেই বলে গেলাম।

জুলিয়েন বলল, বালু হঠাৎ একটা ভুল করে ফেলতে পারে, কিন্তু দীর্ঘদিন আমি ওকে দেখেছি আমার বাগানের কাজে। এমন একটা সাচ্চা মেয়ে আমার চোখে খুব কমই পড়েছে মুখার্জী।

বললাম, তোমার ধারণার সঙ্গে আমার সবকিছু আশ্চর্যভাবে মিলে যাচ্ছে জুলিয়েন।

প্রস্তাবটা এল জুলিয়েনের মা মিসেস বেননের কাছ থেকে। সব শুনে আমি স্তম্ভিত। চায়ের নিমন্ত্রণে ডেকে জুলিয়েন আমার সঙ্গে কি রসিকতা শুরু করলে! একটু পরে বসে জুলিয়েন চোখ টিপে টিপে হাসছিল।

মিসেস বেনন প্রথমেই আরম্ভ করলেন, ডাক্তার, আমি খুবই দুঃখিত যে জুলিয়েন না থাকার বালুর ব্যাপারে সব দোষটা তোমার ওপরেই এসে পড়েছে।

আমি ব্যাপারটা ঠিক ঠিক বুঝতে না পেরে চুপ করে রইলাম।

আবার মিসেস বেনন তাঁর কথার জের টেনে বললেন, জুলিয়েন আমাদের বাগানটা যদি আগে জানাত, তাহলে আমরা বালুকে ঐ অবস্থায় ঘরে এনেই রাখতাম। ও টার থেকে ফিরে এলে ব্যবস্থা করতাম বিয়ের। তুমি জানো মুখার্জী, আমার নব্বই বছরের পাশুড়ী এ দেশেরই মেয়ে।

আমার বিস্ময় তখন চরমে উঠেছে। বালুঘটিত সব দোষটাই জুলিয়েন নিজের ঘাড়ে তুলে নিয়েছে কখন। সে ইতিমধ্যে তার পরিবারকে রাজী করিয়েছে। শুধু তাই নয়, আমার মাথার ওপর যে মেঘ জমে অজস্র বর্ষণ আর বিদ্যুৎ আমাকে বিব্রত করে তুলছিল তাকে বিপরীত হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়েছে।

আমি বললাম, বালুকে কি আপনার বেনন পরিবারের একজন করে নিতে চান?

(আগামী বারে শেষ হবে)

সার্থক অভিনয়ের জন্য চাই ভাল নাটক

বাদল সরকারের
বড়ো পিসিমা (হাসির) ৪-০০
বাকি ইতিহাস ৩-২৫

শম্ভু মিত্রের
ঘূর্ণি ৩-০০

শম্ভু মিত্র ও অমিত মৈত্রের
কাঞ্চনরঙ্গ ৩-০০

অমিতা রায়ের
হারানো চিঠি (হাসির) ৩-০০

মণি গঙ্গোপাধ্যায়ের
অমাবস্যার মৃত্যু ৩-৫০
জীবন জিজ্ঞাসা ৩-০০
নায়কের সন্ধানে (একাঙ্ক) ৩-০০

মুর্শিদাবাদ
পালা বদল ২-০০

নীহাররঞ্জন গুপ্তের
দুই রাত্রি ২-৫০

সুশীল মুখোপাধ্যায়ের
আজকের নাটক (হাসির) ৩-০০
গল্প বলুন (ঐ) ৩-৫০
তথাস্তু ৪-৫০
অমিতাক্ষর ৩-৫০
তোমার হলো সুরু ৩-৫০
সোনালী ৪-০০
বাঁধ ৩-০০

গল্পাপদ বসুর
অন্ধকারের বৃত্ত ৩-৫০
অংশীদার ৪-০০

বীরেন্দ্র পাল চৌধুরীর
আজ অভিনয় বন্ধ ২-৫০

গ্রন্থপীঠ, ২০৯বি, বিধান সরণি, কলিকাতা—৬

মাঠথেকে বলছি

দৌড় নায়ক কুট্‌স

পাভো নুরমি, এমিল জাটোপেক ও ভ্যাডিমির কুটস—এই তিন তাঁদের জীবন মধ্যাহ্নে দূরপাল্লার দৌড়ের অমরে অবিসম্বাদী নায়করূপে স্বীকৃত ছিলেন। যুগ ধারক নুরমি ছিলেন প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর কালে এবং জাটোপেক দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে ট্র্যাকের জীবন্ত বিগ্রহ। আর জাটোপেকের পর দূরপাল্লার সুবিস্তৃত ট্র্যাক জুড়ে বসেন বৃদ্ধ আথলিট ভ্যাডিমির কুটস।

শেষ পঞ্চাশের দশকে আন্তর্জাতিক ট্র্যাকের ধারে বিশেষতঃ দূরপাল্লার দৌড় ঘিরে, অনেক প্রতিভাবান ক্রীড়াবিদের আবির্ভাব ঘটেছিল। হথ বস্টনের গভর্ন পিরি, ক্রিস চাতাওয়ে, ডেরেক ইবট্‌সন নরিস হাগোবির স্যান্ডর ইহারোস, লাজলো তাবোরি, জোসেফ কোভাকস অস্ট্রেলিয়ার লরেন্স, টমাস, ডেভ পাওয়ার এবং জার্মানীর চাপোর্ট স্কেড। এঁদের প্রত্যেকেই কোনো না কোনো সময়ে দূরপাল্লার দৌড়ে হয় বিশ্ব-রেকর্ড আর না হয় আন্তর্জাতিক প্রতি-যোগিতার রেকর্ড ভেঙেছেন। তবুও এঁরা সকলেই এতোসব সুবিখ্যাত আথলিটকে পেছনে ফেলে রেখে একেবারে সামনের আসনটি দখল করে নিতে পারি অসীকার হয়নি তাঁরই নাম ভ্যাডিমির কুটস। নিতান্ত বিক্ষিপ্ত লণ্ডনে কুটস চাতাওয়ে গভর্ন পিরি এবং সদ্যপ্রাপ্ত আলেকজান্ডার জান্দ্রিয়েভের কাছে হার মানতে বাধ্য হলেও নিঃসন্দেহে সুচিন্তিত অভিমতে কুটস ছিলেন তাঁর সময়ের একমেবাদ্বিতীয়ম্। জাটোপেকের পর কুটসের মতো দূরপাল্লার দৌড়কে আর কেউই প্রভাবিত করতে পেরেছেন কিনা সন্দেহ।

অবিস্মরণীয় আথলিট এই ভ্যাডিমির কুটস। গত ১৬ আগস্ট তিনি পরলোকগমন করেছেন। সত্তরের প্রান্তসীমা থেকে তাঁকে নিয়েছেন কেড়ে। কিন্তু মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত আথলিটিকস নীড়ে জড়িয়ে থাকার কালই কুটস শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বলাবাহুল্য, মস্কো থেকে প্রচারিত কুটস বিয়োগের খবর বাইরে ছড়িয়ে পড়ার আগেই দুনিয়ার আথলিট মহলে শোকের ছায়া নেমে আসে। সেই শোকচ্ছায়া সরে যাবার আগে পরলোকগত ক্রীড়াপ্রতিভা ভ্যাডিমির কুটসের স্মৃতি আমরা তুলে ধরলাম।

কুটসের সেরা কীর্তির স্বাক্ষরে মেলবোর্ন অলিম্পিকের ইতিহাস সমৃদ্ধ হয়ে আছে। ঐ আসরে তিনি দশ হাজার ও পাঁচ হাজার মিটার, দুরপাল্লার দৌড়ের দুটি বিভাগেই জয় করেছিলেন। এমিল জাটোপেকের সুযোগ্য উত্তরাধিকারী হিসেবে তিনি হেলসিঙ্কিতে জাটোপেক প্রতিষ্ঠিত দুটি বিভাগেই অলিম্পিক রেকর্ড ভেঙে দেন। তাছাড়া, এই দু বিভাগেই তিনি একাধিকবার বিশ্বরেকর্ড ভেঙেছেন ও গড়েছেন। উত্তর-সূরীরা জাটসের রেকর্ড বিশেষতঃ দশ হাজার মিটার দৌড়ের নজীর অতিক্রম করতে সময়ও নিয়েছেন বেশ।

দূরপাল্লার দৌড়ে জাটোপেককে সরিয়ে নিজে রাজাসন দখল করে নিলেও কুটস ভুলেন পক্ষান্তরে জাটোপেকেরই মন্ত্রশিষ্য। জাটোপেকের কাহিনী পড়তে পড়তে, ছবি ও টেলিভিশনে জাটোপেককে দৌড়তে দেখে মনে মনে লাফাতেন, ওঁর মতো দৌড়াতে পারবার। তার আগে দৌড়ের প্রতি কুটসের আদৌ মন ছিল না। স্কুল-কলিজীবনে থাকার কালে বিভিন্ন দিবস উপলক্ষে বার্ষিক তিন হাজার মিটার দৌড়ে বাধ্য হয়েই যোগ দিতেন। তখন ছাড়া সংক্ষেপে, ভেবেচিন্তেও করতেন না। জাটোপেকের ছবিতে চোখ পড়ে কুটস দৌড়ের নিয়মিত অনুশীলনে মন দেন এবং বছর ঘুরতেই। মধ্যেই হেলসিঙ্কিতে সাফল্য ফলাতে শুরু হয়ে যায়।

১৯৫৩ সালে বিশ্ব যুব উৎসব ক্রীড়াভূমিতে কুটস মস্কোস্টের ট্রাক জাটোপেকের মুখোমুখি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার প্রথম সুযোগ পান। তখন একজন নিরুপায় দৌড়বীরের চ্যালেঞ্জের জোগাবিলা করতে হবে বলে কুটস সেদিন মনে মনে নানান অজুহাত খাড়া করেছিলেন। সেই আশঙ্কার বাস্তব রূপায়ণে চোখের সামনে সমস্ত শক্তি সংহত করে দৌড়ের সময় সারা পথটাই এগিয়ে ছিলেন। কিন্তু শেষ একশ মিটার থাকতে জাটোপেক যেন পেছন থেকে উড়ে এসে এগিয়ে গিয়ে সামনের জায়গাটুকু নিজের দখলে এনে ফেলেন।

মনে মনে যাকে গুরু স্বীকার করে নিয়েছিলেন যাকে পূর্ণ সম্মানে তাঁর কাছ ছেড়ে যেতে কুটস কিন্তু দূরত্ব বা ফলাফল বরণ করেন নি। বরং পরাজয়কে এই বোঝাটে তিনি উজ্জীবিত হয়ে ওঠেন। তবে অনুপ্রাণিত চিত্তে সাধনায় ঝাঁপিয়ে পড়েন। আর তারই পরিণামে পরের বছর সুইডেনের নাসিতে ইউরোপীয় এথলেটিকসের দশ হাজার মিটার দৌড়ে জাটোপেক চাতাওয়েকে পেছনে ফেলে হোক এই বিভাগের বিশ্ব রেকর্ডটি ভেঙে দেয় যখন।

দিন দশেক পর লন্ডনের হ্যামাইট সিটি স্টেডিয়ামে লন্ডন বনাম মস্কোর দ্বৈতপ্রতিযোগিতা। আসরে চাতাওয়ে বিশ্বরেকর্ড (১৩ মিঃ ৫১.৬ সেঃ) গড়ে পাঁচ হাজার মিটারে এক সুতোয় বাধানে কুটসকে হারিয়ে দিলেও দুপাল্লার দৌড়ে কুটস চাতাওয়ের হাত থেকে বিশ্বরেকর্ডটি আবার ছিনিয়ে নেন।

নামডাক হবার পর কুটসকে মুখোমুখি সাক্ষাতে হার মানাতে পেরেছিলেন চাতাওয়ে ছাড়া আর যে মাত্র একজন আথলিট তিনি হলেন গভর্ন পিরি। তবে মেলবোর্ন অলিম্পিকে পাঁচ ও দশ হাজার দুরপাল্লার দুটি দৌড়েই কুটস পিরিকে নাভিশ্বাসে বাধ্য করেন। মেলবোর্নে দশ হাজার মিটার দৌড়ের সময় মাঝপথে ট্র্যাক থেকে সরে গিয়ে কুটস পিরিকে এগিয়ে যেতে আহ্বান জানিয়েছিলেন। কিন্তু পিরির পরিকল্পনা ছিল অন্যরকম। তাঁর মতলব ছিল, সারাক্ষণ কুটসের ছায়ায় থেকে শেষ একেবারে শেষপর্বে কুটসকে ডিঙিয়ে যাওয়া। কিন্তু কুটস পিরিকে সে সুযোগ দেন নি। বারেবারে নিজের গতি বাড়িয়ে, পিরিকে

স্ত্রী রাইসার সঙ্গে কুটস এক আনন্দঘন মুহূর্তে

আগেই পিরিকে অনেক জোরে বাধ্য করিয়ে তাঁকে একেবারে নিঃস্ব ন। ফলে পিরিও শেষচক্রের আগেই ভাবে ক্লান্ত হয়ে পড়েন। এমনি সে যে সারাক্ষণ কুটসের পিছু ধাওয়া পিরি শেষপর্যন্ত সাতজনের পর সমাপ্তি রেখায় টেনে নিয়ে যেতে

লবোর্ন অলিম্পিকে জোড়া সোনা পর কুটস অপরাজিত নায়ক হিসেবেই আথলেটিকস থেকে অবসর নেন। অধ্যায়ে তিনি ছিলেন দীর্ঘাঙ্গিক। প্রথমাতেই উজ্জীবিত হন যখন তরুণ

বোলোতনিকভ, যিনি রোম অলম্পিকে দশ হাজার মিটার দৌড়ে স্বর্ণপদক করতে পারেন।

রা যৌবনে কুটস দৌড়তেন ঘড়ির নির্দেশ মেনে। এক এক চক্কর সময়ে দৌড়তে পারলে বাধা সমরের পুরো পথ অতিক্রমে সক্ষম হওয়া এবং সেই পরিকল্পনা অনুসরণে ভালো ও খারাপ সময়ে হয়। এই অ্যাথলিটদের শীক্ষা নিয়েছিলেন নরেম। জ্যাটপেক, কুটস, বোলো-ভ, মাবে হলবার্গ, লাসে ভিরেনরা প্রদর্শিত সেই পথই পরিক্রমণ করে তবুও বলা যায় যে কুটসের দৌড় পনা সুমানা ভিন্নতর।

ল লক্ষ্য ঘড়ির কাঁটার দিকে থাকলেও তঃ তিনি দৌড় আরম্ভেই এগিয়ে এবং সময় সময় আচমকা গতি বাড়িয়ে কন্দীদের উদ্দেশ্যে চমকদার চ্যালেঞ্জ তেন। সেই চ্যালেঞ্জ সাড়া দিতেন যাঁরা ত গতির টানে তাঁদের প্রাণশক্তি ফোটা য়ে। যেমন ঘুরিয়ে দিয়েছিল পিরির সামর্থ্য মেলবোর্ন অলিম্পিক স্টেডিয়ামে। সমাপ্তি রেখায় এসে পৌঁছানোর মুহূর্তে কুটস ডনহাতটি তুলে ধরতেন। শেষ-মুহূর্তে হাত তোলা তাঁর অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। হাত তুলতেন কেন? জয়ের আনন্দ প্রকাশে, না দর্শকদের অভিবাদন জানানোর উদ্দেশ্যে? কে জানে!

যদ্দুর হাত তোলা এবং মেলবোর্নের মতো মাপা পদক্ষেপে কুটস ফিনিশ লাইন স্পর্শ করতে দেখে ডঃ রোজার ব্যানিস্টার একদা বলেছিলেন 'কুটস হলেন নির্ভুল দৌড়-যন্ত্র। দৌড় পরিকল্পনা রচনায় চিন্তাভাবনা করেন না। আসলে তিনি চিন্তাশীল নন। ব্যানিস্টার দৌড় বিশেষজ্ঞ। মাইল দৌড়ে চার মিনিটের বাধা প্রথম ভেঙেছিলেন তিনিই। তাঁর অভিমতে আস্থা রেখে মেলবোর্নের এক সংবাদপত্রের শিরোনামে এই প্রশ্ন রাখা হয়েছিল 'যন্ত্র কি চিন্তাশীল মানুষদের হার মানাতে পারবে?'

মেলবোর্নে দু দুটি প্রতিযোগিতা জয় করে কুটস নিজের অভিধানে মাধ্যমেই উত্থাপিত প্রশ্নের সাফ জবাব দিয়েছিলেন। সেই সঙ্গে পূর্বে অভিমত সংশোধনে বাধ্য করেছিলেন ডাঃ রোজার ব্যানিস্টারকে। ব্যানিস্টার পরে লেখেন 'আমারই ভুল হয়েছিল। কুটস নিষ্প্রাণ মেশিন নন। কুটস চিন্তাশীল। তাঁর মননের অভিব্যক্তি হৃদয়ের নিভৃততে পৌঁছে গেছে। প্রতিযোগিতা শেষ করার পর মুখে হাসি নিয়ে কুটস যখন আর এক পাক দৌড়তে থাকেন তখনই তাঁর মধ্যে মানবিক আবেদনের স্বাভাবিক প্রকাশ দেখে দর্শকেরা উজ্জীবিত হয়ে ওঠেন। দশ হাজার মিটার দৌড়ে বিড়াল আর ইঁদুরে লুকোচুরি খেলা হয়েছে। কুটস বিড়াল আর পিরি মূষিক। ফলে যা অনিবার্য তাই ঘটে গেছে।

হাসকে ঘৃণা করতেন। গতিবেগ বাড়াতে বা ব্যক্তিগত কীর্তিমানের বিসর্জন ঘটাতে কুটস মুখ বুজে পরিশ্রম করতেন। শারীরিক কৃচ্ছ্রতা অবলম্বনেও তিনি কুণ্ঠিত ছিলেন না। সাধনায় ছিলেন ধ্যান-মগ্ন; নিজের জগতেই তিনি বাস করতেন। লক্ষ্য ছিল জয়। আর সেই লক্ষ্যে অবিচল থাকার প্রয়াসে তিনি ইস্পাতকঠিন মনোবল সঞ্চয় করতে পেরেছিলেন।

সংগ্রাম কি বস্তু সে সম্পর্কে তাঁর সম্যোপলব্ধি ঘটেছিল। বেহেতু তাঁর কৈশোর কাটে যুদ্ধের আবহাওয়ায়। বয়স যখন মাত্র চোদ্দ তখন জার্মান হানাদার জন্মভূমির অংশবিশেষ ইউক্রেন দখল করে নেয়। ইউক্রেনের অন্তর্ভুক্ত অ্যালেকসিনো গ্রামে ১৯১৭-এর ১৭ই ফেব্রুয়ারী কুটস ভূমিষ্ঠ হন। যুদ্ধের সময় বার দুয়েক তাঁকে বন্দীশিবিরে ধরে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তাঁর ওপর দৈহিক নির্যাতনও করা হয়। চোখের সামনে নাৎসী অত্যাচারের অনেক ছবি স্পষ্ট হয়ে ছিল। তাই মনটাও কঠিন ধাতে তৈরী হয়ে গিয়েছিল। এই মানসিক কাঠিন্য উত্তরপর্বে প্রতিযোগিতার সময়ে কাজে লাগে।

তবে ওপরে ওপরে যতোই কাঠিন্যের প্রলেপ থাকুক না কেন ভেতরটা ছিল স্বাভাবিক সরল ও আবেগমন্ডিত। স্পোর্টস্ট্রেট পত্রিকার যে তরুণী রিপোর্টার নাম-ডাক হওয়ার পর কুটসের ইন্টারভিউ নিতে তাঁর কাছে গিয়েছিলেন কুটস তাঁরই স্বপ্ন পেশের ফাঁকে জড়িয়ে পড়ে তাঁকেই নিজের ঘরণী করে নেন।

পঞ্জাব
বনদীপ
• বেনারসী
• জোড়
• সিল্ক-তাঁত
• মিল বস্ত্র
• পোষাক
• শাটিং • সুটিং
• ড্রিউ কাপড়
৭৩, জি, টি, রোড (সাউথ) হাওড়া
ফোন: ৬৭-৫৩২৫

কৃষ্ণার সহধর্মিনী শ্রীমতী রেইসা কবির আগে স্মাতচারণ করার সময় বলছিলেন, ভ্যাডিমির হঠাৎ হঠাৎ কেমন যেন নিজেকে গুটিয়ে নিতো। যেন একেবারেই আত্ম-নিমগ্ন। সেবারেও এই ভাবান্তর দেখে জিজ্ঞাসা করি হয়েছে কি? কোনো জবাব পাই না। খবরাখবর নিয়ে শুনি যে পাঁচ হাজার মিটার দৌড়ের বিশ্ব রেকর্ডটি ইতিহাস কেড়ে নিয়েছে। তাই ভ্যাডিমিরের মানসিক সংগ্রাম শুরু হয়ে গেছে।

কদিন ধরে আর কথাবার্তা নেই। শুধু গুম মেরে মৌন চিন্তা। দিন কয়েক পর এক সন্ধ্যায় লালবাগ থিয়েটারে টিচাইকোভস্কির সঙ্গীত শুনতে নিয়ে গেলাম। হঠাৎ ভ্যাডিমির আমার কানে মুখ রেখে বলে উঠলো, দেখো, বিশ্বরেকর্ড আমি আবার ছিনিয়ে নেবোই নেবো। শুনে আমি চমকে উঠলাম। সেই সঙ্গে এতদিনের মৌনতার যথার্থ কারণও খুঁজে পেলাম। সপ্তাহখানেক পরেই ভ্যাডিমির রেলগ্রেডে পাঁচ হাজার মিটার দৌড়ে নতুন বিশ্ব-রেকর্ড গড়ে দিল। হোটেলে বসে খবরটা শোনার সময় আমাকে কেবলই বলল থিয়েটারের সেই সন্ধ্যার কাহিনীর স্মৃতি মনে পড়ছিল। সত্যিই, আমার এমন একাগ্রতা না থাকলে কি আর কেউ বিশ্বরেকর্ডের মর্যাদা নিতে পারে।

মেলবোর্নের পথে বিমান ছাড়ার সময় রটার্সের প্রতিনিধি হাসি মুখে তাঁর রানিং সু-র সঙ্গে নিয়ে ফোটোগ্রাফার। সঙ্গে সঙ্গে বিমান হোস্টেস ছুটে এসে বললো। শ্রীমতী রেইসা বলছিলেন, যাত্রাপথে ফিরে যাওয়া যে অশুভ, তা আমি ভ্যাডিমিরকে মনে করিয়ে দিলাম। কিন্তু সে তার গোঁ ছাড়বে না। স্পাইক আটা নিজের জুতো জোড়া তার চাই। ওতেই যে সে অভ্যস্ত।

শ্রীমতী রেইসার কথায় ভ্যাডিমির পরের দিন মস্কো ত্যাগ করে মেলবোর্নে পৌঁছেই চিঠি লিখে জানালো, কৃতসংকল্পে বিশ্বাস রেখো না। ভ্যাডিমির তার কথা রেখেছিল। একটিতে নয় মেলবোর্নে সে জিতেছিল দুটি প্রতিযোগিতায়। অসাধারণ পুতুল তার আত্মপ্রত্যয়ের অপরাজেয় শক্তিতে সেদিন কতখানি জয় করে সংস্কারের কতটা মন থেকে তাড়াতে তাদেরকে শিক্ষা দিয়ে গেছে। আত্মপ্রত্যয় যাদের নিতান্ত পুঁজিপাটা তারা তাদেরই।

অজয় বসু

হেডিংলের ট্র্যাজেডি

বিশ্ব ক্রিকেটের ইতিহাসে অ-ক্রিকেট-সুলভ আচরণের নজীর হয়ে রইলো লীডসের (ইয়র্কশায়ার) হেডিংলে। রাতের অন্ধকারে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পাঁচ খুঁড়ে (ছ' ইঞ্চি চওড়া, তিন ইঞ্চি গভীর) দিয়ে, তেল ঢেলে একদল বিবেক-হীন মানুষ ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার তৃতীয় টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচটি চতুর্থ দিনেই ভন্ডুল করে দিতে পেরেছে। পঞ্চম তথা শেষদিনের খেলা চালানো ঐ পাঁচে আর সম্ভবই হয়নি। পঞ্চম দিনের প্রভাতে দুই অধি-নায়ক—টনি গ্রেগ ও ইয়ান চ্যাপেল পাঁচের দশা দেখে কপাল চাপড়ালেন। দুই শিবিরের প্রতিযশা কর্মকর্তা আর খেলোয়াড়দের মুখে শুধু একটি কথাই উচ্চারিত হোল—'ক্রিকেটের আজ বড়ো দুর্দিন।'

হেডিংলের পাঁচ খোঁড়ার উদ্দেশ্য কি রাজনৈতিক? অসম্ভব নয়, বরঞ্চ ঘটনা পরম্পরায় সেটাই সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। সাত হাজার সাতশো স্টার্লিং ডাকাতির অভিযোগে কারারুদ্ধ জর্জ ডেভিসের সমর্থকরা পাঁচ খোঁড়ার কথা নিজেরাই স্বীকার করেছেন। ন্যায্য বিচার দাবী করেছেন তাঁরা ডেভিসের।'

দর্শকদের হামলায় পাঁচ নষ্ট করে দেওয়ার নজীর পৃথিবীতে যে নেই তা নয়, তবে সেজন্য ইডিপর্বে খেলা কদাচিৎ পণ্ড হয়েছে। ১৯৫৪ সালে ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ণ টেস্টে পাঁচ নষ্ট করা হয়েছিল কিন্তু খেলা ভন্ডুল হয়নি (১৯৬৯ সালে করাচীতে ইংলান্ড-পাকিস্তানের টেস্ট ম্যাচটি দাঙ্গার জন্য পরিত্যক্ত হয়েছিল)।

বিধ্বস্ত পাঁচ পরীক্ষার পর ইংল্যান্ডের দলনায়ক টনি গ্রেগ দুঃখের সঙ্গে বলেছেন: 'ইয়ান চ্যাপেল এবং আমি পাঁচ দেখে মর্মাহত হয়েছি। এমন ঘটনা অকল্পনীয়, লজ্জাকর তো বটেই। আমাদের জয়ের সম্ভাবনা ছিল খুবই বেশী। ম্যাচটা হাত-ছাড়া হয়ে গেল বলে না—ক্রিকেটের বৃহত্তর স্বার্থেই আমি একথা বলছি।'

চতুর্থ দিন পর্যন্ত খেলার গতিবিধি নিজ নিজ আয়ত্তে আনার জন্য ইংল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে কি লড়াই-ই না হচ্ছিল! দ্বিতীয় ইনিংসে ২৯১ রান করে ইংল্যান্ড এগিয়েছিল ৪৪৪ রানে। রানের ঐ অঙ্কটি বিলক্ষণ স্ফীত হলেও, অস্ট্রেলিয়া কিন্তু বিন্দুমাত্র মুষড়ে পড়েনি, বরঞ্চ কঠিন দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে সসম্মানে সংগ্রাম চালিয়েছে। চতুর্থ দিনের শেষে দ্বিতীয় ইনিংসের তিনটি উইকেটের বিনিময়ে অস্ট্রেলিয়ার ২২০ রান সংগ্রহ ঐ সংগ্রামী আচরণেরই নিদর্শন। বলা বাহুল্য এই খেলার ফলাফল নিয়ে বিশ্ব জুড়ে উৎসাহ-উত্তেজনার অন্ত ছিল না।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, হেডিংলের টেস্ট পরিত্যক্ত হওয়ায় অ্যাসেজ অস্ট্রেলিয়ার হাতেই রয়ে গেল। প্রথম টেস্টে অস্ট্রেলিয়া জিতেছিল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় (পরিত্যক্ত) টেস্ট অমীমাংসিত থাকায় চতুর্থ টেস্টে ইংল্যান্ড জয়ী হলেও অস্ট্রেলিয়ার হাতেই অ্যাসেজ থাকবে।

অভিশপ্ত তৃতীয় টেস্ট ম্যাচের সংক্ষিপ্ত স্কোর: ইংল্যান্ড: প্রথম ইনিংস ২৮৮; অস্ট্রেলিয়া: প্রথম ইনিংস ১৫৫; ইংল্যান্ড: দ্বিতীয় ইনিংস ২৯১ (স্টার্ট ৯২; ম্যালেট ৫০ রানে ৩, গিলমোর ৭২ রানে ৩, লিলি ৬৮ রানে ২); অস্ট্রেলিয়া: দ্বিতীয় ইনিংস: ৩ উইঃ ২২০ (অ্যাড-কমকার ৯৫ অপরাজিত, ওয়াল্টার্স ৬৭ অপরাজিত)।

শেষ টেস্ট ইংল্যান্ড দল

ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার চতুর্থ তথা শেষ টেস্ট ম্যাচ শুরু হচ্ছে আগামী ২৮ আগস্ট, বৃহস্পতিবার থেকে ওভালে। ইংল্যান্ড দলে খেলার জন্য নির্বাচিত হয়েছেন: টনি গ্রেগ (অধিনায়ক), ডেভিড আর্লন্ড, ফিল এডমণ্ডস, জন এডরিচ, এ্যালান নট, ক্রিস ওল্ড, গ্রাহাম রুপ, জন স্নো, ডেভিড সিল, ডেরেক আন্ডারউড, বারী উড ও বব উলমার। বাদ পড়েছেন ফেন্চার ও হাম্পশায়ার।

ঘরোয়া ফুটবল লীগ

কলকাতার সিনিয়ার ডিভিসন ফুটবল লীগে ইস্টবেঙ্গল এবং মহামেডানের অগ্র-গতি অব্যাহত রয়েছে। গত সপ্তাহে ইস্ট-বেঙ্গল টালিগঞ্জ অগ্রগামীকে ৩—১ গোলে (অরুণমে ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে প্রথম গোল) এবং ভবানী সংঘকে ৫-০ গোলে হারিয়েছে। মহামেডান স্পোর্টিং হাওড়া উয়াড়ীকে ৫—০ এবং বি এন আরকে ২—০ গোলে। মোহনবাগান হাওড়া ইউ-নিয়নকে ৪—০ গোলে এবং স্পোর্টিং ইউনিয়ন নার্সিককে ২—০ গোলে পরাজিত করেছে। ১৩টি ম্যাচ খেলে মহামেডানের পয়েন্ট ২৬, ১২টি খেলে ইস্টবেঙ্গলের ১৮। মোহনবাগানেরও ১৩ নম্বর খেলা একটি ম্যাচ বেশী খেলে। [illegible]

CENTRAL LIBRARY

সাতের নায়ক

CENTRAL LIBRARY

চাকা চলার গড়গড়িয়ে। সেদিন বাবা পাল্লা-বোলবাবু মা আর্যাত সেবার মুখে তুঁতের হাসি ফুটবে। সাত ভাইয়ের ফটো হাত এক সঙ্গে চন্দ্র মণ্ডল কোম্পের বাড়ীর আঁধারে ঘোচাবে।

আর পাঁচজন কলকাতার ফুটবল ভক্তের মতই ঐদিনের গোবিন্দের ফুটবলের সঙ্গে তাদেরও প্রাণ ওঠানামাই। আজকের ফুটবল ইতিহাসের এবং সেকালের সঙ্গে কালের অনিবার্য পার্থক্যে গোবিন্দের ঐদিনের ফুটবল আজ চোখে পড়ে। প্রথম পাঁচ পাড়ায় পরবর্তী পুঁজিপতি অর্থশোষণ স্থানে প্রাক্তনদের পদবিকারে কাজে মহা-হেডানোর সমস্যায় ফোরেন ফরোয়ার্ড ফোরেন এসিস্ট্যান্টের সঙ্গীন চাকরির বাঁধন পড়ে ও প্রশোক ফিরিয়ে কাজে। এদের অনিবার্য নয় ধর্ম (সিনিসিজম) মানা (স্যাটায়ার) এবং কারণ নিরপেক্ষ (পেসিমিজম) মনোভাবে গোবিন্দের স্বচ্ছন্দ গতি এবং সংশয়ের সাতটি দিন কিন। গোবিন্দের সবচেয়ে বড়োগুণ এই যে মাঠে নেমে তিনি মুহূর্তের জন্যও আত্মবিস্মৃত হন না। যেটুকু খেলেন তার সবটুকুতেই উৎসর্গ করেন নিজের কারণ স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে। কারণ তিনি জানেন ফুটবল আজ একের চেয়ে বহুগত সংঘটিতের ওপরই বেশী নির্ভরশীল। গোবিন্দের নিজস্ব যে কোনকালে কোনো বর্তমান হলে কারো ভাল কারোর চলতে না। সবচেয়ে আগের মতো একের জন্য। আত্মবাদী ফোরোয়ার্ডকে আজ ঐ ভাঙ্গাই ফিরে করতে হবে বটের বাধ্যতা অবধারণাবী।

স্কুলে খেলার সময় থেকেই গোবিন্দ ঐ ফিরতপারার বিরোধী। রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যা-ভবনে বহন পড়াতেন তখনও যে ধান-ধারণা 'ভুল ফুটবল সম্পর্কে' আজ ১৯৫৫ সালে এরিয়াসের স্টাইলস 'হাসবেও তা অপরি-হার্য'। রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভবন থেকে হায়ার সেকেন্ডারী পাশ করার পর গোবিন্দ চন্দ্রনাথ বিদ্যালয়ের ছেলেদের নাম লেখাল। প্রাইমস পাই ওয়ান পরীক্ষা দিয়েছেন। খেলাধুলোর সঙ্গে লেখাপড়াও চালিয়ে যাবে প্রাণপণ চিন্তা। কারণ বাঁচতে মত বাঁচতে হলে তো — এখন তো শুধু দিন যাপনের প্লানিং।

গোবিন্দ কলকাতার মাঠে প্রথম খেলতে এসেছিলেন ১৯৭১ সালে ঐরাবত ক্লাবের হয়ে স্ট্রাইকার হিসেবে। সেবা ক্লেম ১৯৭১ সালে দলে টানলেন ভারতসেবক কার্যালয় এবং ফরোয়ার্ডস কালজের অর্থনীতির অধ্যাপক চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ওরফে গণনবাবু। ১৯৭৪ সালে মহাসমারোহে ইস্পাতিং গোবিন্দকে হাত করতে তুলে নিল। ১৯৭৫ সালে চলে এলেন এরিয়ানের হয়ে। পরের বছর? এ প্রশ্নের গোবিন্দ কোন উত্তর দেননি কখনও। শুধু বলেছেন: কলকাতার মাঠে সবচেয়ে সুখের সময়টা কাটিয়েছি ওরাই। আমি আর ভাবার কোন নিজস্ব ভাবনা নেই। সবই নিজের চলছে। ইস্টবেঙ্গলের খেলোয়াড়ের বিরুদ্ধে কাজের দাবী তোলে ইস্টবেঙ্গল বোর্ডের সভা গোবিন্দ এক নিঃশ্বাসে সব বলে গেলেন।

একেবারে শুরু কথা। কারণ সেই সময় 'হিরু সেকী' না হলেও পোড় খাওয়া গোবিন্দ আজ এই মুহূর্তে ঈর্ষণীয়ভাবে ভবিষ্যৎ। গোবিন্দ জুনিয়ার বাংলা ফোরোয়ার্ড থেকেছেন ভারতের ফাস্ট গোল প্রথমে এশিয়ার হয়ে ফুটবলও তাই ওঁর কথা ভাবার উপায় নেই। ১৯৭৩ সালে গোবিন্দ কুচবিহারে ফাইনাল জুনিয়ার ফুট-বলের আসরে বাংলার প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৯৭৪ সালে কলকাতার ফাইনাল জুনিয়ার ফুটবলে গোবিন্দ ডিফেন্স সুপিরিয়র ভূমিকায়। ফাইনালে ঐ ফোরোয়ার্ড ফাইনালে। ফাইনালে ফুটবল ১৯৭৪ সালে সারাবছর ভারতের একটি মাত্র ফুটবল প্রতিযোগিতায় যাতে ভারতের সেরা ফুটবলাররা খেলেছিলেন (আজকে ও ইরাং)। ওদের বয়সের একটি মাত্র ফাইনালও সারাবছর দেখার সুযোগ পাননি বিদেশের। সেদিন ফাইনালে ভারত ভারতের ফোরোয়ার্ড গোবিন্দের সঙ্গী ফোরোয়ার্ড খেলেছে আসেন। ফাইনালে ভারতের বিরুদ্ধে ফোরোয়ার্ড গোবিন্দের স্কোর করে ফোরোয়ার্ড ভারত ভারতের ফাইনালে ফাইনালের পর ভারতের ফিরে ৩—২ গোলে। ভারত সবাই ফোরোয়ার্ড ফোরোয়ার্ডের।

বিপুল বন্দ্যোপাধ্যায়

CENTRAL LIBRARY

সিনেমাটিক

—বুলেট চাই, তাজা বুলেট। এমন দু' বুলেট চাই যা অন্যের শরীরটাকে ফোঁড় করে বেরিয়ে যাবে না। থাকবে শুধু একটা ছিদ্র। ছিদ্রটাও যদি না ওরা যায় তো নিদেন পক্ষে টি এই ফুটো—

বলতেই সিকিউরিটী ফোর্সের ক্যাপ্টেন দু মুখ টিপে হাসলেন। তারপর বললেন—বেশি কথা বলতে হবে না। আপনারা নির্ঘাৎ ঠিকই মানে সিনেমার ছেলে হলীলদারকে নিয়ে শুটিং করতে চাইছেন। ঠিক না?

—হ্যাঁ...কি করে বুঝলেন?

ক্যাপ্টেন দাঁত বেরিয়ে হাত রেখে সেখানে ছেলেদের দিকে তাকিয়ে মজার

ঠিকই—আপনারা যখনই অত সাইজ বুলেটের কথা বলাবলি করছিলেন, তখনই বুঝে গেছি। ওই সাবাবুকে ভুলের জন্যই তো তহশীলদার সিংকে ধরা পড়তে হল। না হলে আজ অবস্থায় ওকে কি কেউ ধরতে পারবে! অসম্ভব...

আমার স্মরণ হচ্ছে, সেদিন আমরা ভুখাত সালা লোকেশনে ছবির শুটিং করছি। কমপক্ষে মাইল খানেক জায়গা ঘিরে রেখে আমাদের পাহারা দিচ্ছে মোরেনার ফিপথ্ বাটালিয়ান সিকিউরিটী ফোর্সের জোয়ানরা। ওরা এমনিতেই আমাদের খুব হিপ্ হিপ্ করছে। সুদূর কলকাতা থেকে আমরা কিছু সাগরেদ এসেছি চম্বলের ডিস্টার্বড এরিয়ায় ছবির শুটিং করতে। তাই ওরা

একটা কিছু ঘটে যেতে পারে ডাকাতরা কোথায় যে ওৎ পেতে রয়েছে কে জানে! নইলে সিকিউরিটি ফোর্সের জোয়ানরা-ই বা অমন আমাদের করে হাতিয়ার বাগিয়ে লাঁড়ায় পাহারা দিতে কেন? কথাটা মনোতোষ আমার কানে ফিস্ ফিস্ করে বলে গেল।

তাকিয়ে দেখি আরেব্বাস। সর্বনাশ আ কাকে বলে! একটা উঁচু জায়গায় সিকিউরিটি ফোর্সের মেশিনগানার তার হাতিয়ার বেহাত দিকে তাক করে বসিয়ে মাটিতে উপুড় হয়ে পড়েছে। কি জানি, গুলি চলবে নাকি মেশিনগানার আমাদের দিকে নীরবে তাকিয়ে মুচকি হাসল।

আজ হহশীলদারকে ধরা নিয়ে হচ্ছে নকমার দৃশ্য সেজেছে সেটা। আর বুধ সেজেছে পাংকজ। সঙ্গে একদল ডাকাত শুটিং শুরু হবার আগে আমরা ওদের জা পাল্টে খানিকটা করে ছিঁড়ে বিদায়। তারপ তাতে ঢেলে দেওয়া হলো নকল রক্ত অর্থ হিমোগ্লোবিন। এদিকে পুলিশ এনকাউন্টারের ব্যবস্থা সমস্যাতে না পো ওরা এখন পালাচ্ছে। তার পেছনে ছুটে আসছে পুলিশের লোকেরা। তহশীলদারে ওয়ে বুলেট ইজুরী। সেখান থেকে গ

রে রক্ত বেরিয়ে আসছে। হিমাংশুবিন ভাঁজছিল না বলে নবকুমার হঠাৎ এক কা-ণ্ড রে বসল। পকেট থেকে একটা ছুরি বের রে ডান পায়ের হাঁটুর কাছে খানিকটা য়গা চিরে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে আসল ক্ত বেরিয়ে এল। আমি স্তম্ভিত। —এটা ক করলে?

নবকুমার তখন যেন চরিত্রের মধ্যে কো খানিকটা ঢুকে গেছে। গম্ভীর মুখে বলল— ক বের করে দিলাম। এতে কাজটা ভালই বে মনে হচ্ছে।

আমি আর ওকে ঘাঁটাতে সাহস পেলাম া। তখন মাথার ওপর মধ্যগ্রেশের ফিল্ড র্য যেন দাউ দাউ করে জ্বলছে। নব-মারের দিকে আর তাকানোই যাচ্ছে না। াতে শক্ত মুঠোয় ধরা রাইফেল। ঘামে লোয় বালিতে আর রক্তে সর্বাঙ্গে মাখা-াখি। চুল রুক্ষ। চোখ দুটো জবাফুলের মত াগা। ছেলেটি এমনিতেই বদরাগী। বেছে

একদিন না বলে বাবার টাকা নিয়ে যে কিশোর একখানা ডাঙা ক্যামেরা কিনেছিল ছবি তোলার জন্য, আজ সেই কিশোর তারুণ্যে উপনীত। ছবি তোলার নেশা আজ তার পেশা হয়েছে। ইতিমধ্যে বাংলা ছবির জগতে সেই তরুণ চিত্র-গ্রাহকের খ্যাতিও কম হয়নি। 'নিমন্ত্রণ' এবং 'স্ত্রীর পত্র' ছবিতে কাজের জন্য বি-এফ-জে-এর পুরস্কার পেয়েছেন তিনি দু-দুবার। রাজ্য সরকারও তাঁর কাজকে স্বীকৃতি দিয়েছেন গত বছর।

ফিল্ম লাইনে গেছে জানতে পেরে প্রথমটায় বাবা-মার দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। সব সময়ই ভাবতেন 'ছেলে বুঝি বখে গেল।' কিন্তু না, তা হয়নি। রবীন্দ্র সদনে 'নিমন্ত্রণ' ছবির জন্য যেদিন পুরস্কার পেলাম সেদিনই বাবা-মা বোধহয় বুঝতে পেরেছেন, ছেলে আমার সত্যিই বখে যায়নি।' বললেন শক্তি ব্যানার্জি।

সত্যি কথা বলতে কি, 'নিমন্ত্রণ' ছবি থেকেই আজকের খ্যাতিমান চিত্রগ্রাহক শক্তি ব্যানার্জি প্রকৃত ব্রেক পেয়েছেন। বেছে ওকেই তরুণচিত্রের ক্যামেরাটা দেওয়া হয়েছিল। এখন দেখা যাচ্ছে নির্বাচনটা তখনই ঠিকই হয়েছিল।

তরুণচিত্রের সামান্য খোঁড়াচ্ছে। একটা বুলেট ওর পায়ের খানিকটা চামড়া কেটে নিয়ে বেরিয়ে গেছে। নবকুমার সেই অনুযায়ী খুঁড়িয়ে ছোটার ব্যাপারটা প্র্যাকটিস করে নিয়েছিল। আজ কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল—সেটা সে ভালই রপ্ত করেছে। আর রূপা? সমস্ত ডাকাতদের মধ্যে একমাত্র সেই নাকি ছিল রীতিমত রোমান্টিক। গান বাজনা শুনতে খুব ভালবাসত। কিছু টাকা জমলেই সে চলে যেত বেনারস, লক্ষ্ণৌ, দিল্লী, বোম্বে অথবা কলকাতায় গিয়ে বাইজীদের মাইফেলে কাপ্তেন সেজে বসে যেত। তারপর জমানো টাকা ফুরিয়ে গেলে ফিরে যেত বেহড়ে।

পঙ্কজ সেই রূপার চরিত্র রূপ দিচ্ছিল। প্রথম দিকটায় ও ধরতে পারে নি—চরিত্রগত অভিজ্ঞতার ঝুলি তার ভারী হয়েছে কম ঠিকই, আবার সেই সঙ্গে তিক্ততা দু-এক জায়গায় হয়নি এমন নয়। একবারতো এমন অবস্থা হয়েছিল যে সিনেমা লাইন ছেড়েই দেবেন ভেবে-ছিলেন। স্টিল ফটোগ্রাফারের কাজ করবেন ঠিক করে এনলার্জার টানার কিনেও ফেলেছিলেন।

না, শেষ পর্যন্ত তিনি সে সিদ্ধান্ত বদলালেন। শুরু হোল স্বাধীনভাবে কাজ 'অশ্বিতীয়া' ছবিতে। এক সময় টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওর অ্যাসিসট্যান্ট হিসেবে (আসলে তখন তিনি কামানন্দ

আগেকার ছবিগুলোয় তাঁর (অশ্বিতীয়া, দুরন্ত চড়াই) ক্ষমতার পরিচয় ছিল ঠিকই, কিন্তু 'নিমন্ত্রণ' ছবি তাঁকে ফটোগ্রাফী সম্পর্কে নতুনভাবে চিন্তা করারও সুযোগ এনে দিয়েছে। এজন্য তিনি পরিচালক তরুণ মজুমদারের কাছে কৃতজ্ঞও বটে।

শক্তিবাবু হাতেকলমে কাজ শিখেছেন মুরারী ঘোষের কাছে। কিন্তু টুকটাক কাজ করেছেন আরও অনেক পরিচালক-ক্যামেরাম্যানের সঙ্গে। স্ট্যান্ড-বাই হিসাবে কার-না-কাজ করেছেন তিনি? কানাই দের অনা ছবির স্যুটিং পড়ে গেছে, ডাকো শক্তিকে। দিলীপরঞ্জন মুখার্জি ব্যস্ত এখন, অমনি শক্তির ডাক এসেছে কাজের।

এমনিভাবে পরের হয়ে কাজ করতে করতে অভিজ্ঞতার ঝুলি তাঁর ভারী হয়েছে ক্রমশ ঠিকই, আবার সেই সঙ্গে তিক্ততা দু-এক জায়গায় হয়নি এমন নয়। একবারতো এমন অবস্থা হয়েছিল যে সিনেমা লাইন ছেড়েই দেবেন ভেবে-ছিলেন। স্টিল ফটোগ্রাফারের কাজ করবেন ঠিক করে এনলার্জার টানার কিনেও ফেলেছিলেন।

না, শেষ পর্যন্ত তিনি সে সিদ্ধান্ত বদলালেন। শুরু হোল স্বাধীনভাবে কাজ 'অশ্বিতীয়া' ছবিতে। এক সময় টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওর অ্যাসিসট্যান্ট হিসেবে (আসলে তখন তিনি কামানন্দ বৈরিগীগিরি। পরে যখন সুযোগ এল তখন আর ওকে পায় কে! চমৎকার অভিনয় করতে আরম্ভ করল।

সেদিন রাত্রি বোধহয় দেড়টা। ডাকাতদলের মুখোমুখি সংঘর্ষ দৃশ্য আরম্ভ হয়েছিল আমাদের বিকেলে। পুলিশের ভূমিকায় অভিনয় করছিল আমাদের সঙ্গে সিকিউরিটি ফোর্সের কয়েকজনই। পরি-চালকের ইঙ্গিতে ওরা রাত্রিবেলা ধাওয়া করে বেহড়ে ঢোকা পর্যন্ত আমাদের কাজ আরম্ভ হয়ে গেল।

তরুণচিত্রের আর সাপ্লাই মেয়েরা ডাকাতরা বিনাযুদ্ধে পালাচ্ছে। চারিদিকে গুলি ছুটছে। আর অমনি বেহড়ের তিনটি জায়গায় মজুত বারুদে সলতে ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ধোঁয়ায় ধোঁয়াময় চারিদিক।

অভিনয় করতে করতে আমাদের অভিনেতারা বেহড়ের রুক্ষ কঠিন পাথুরে মাটিতে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। ধোঁয়ায় ধোঁয়াময় চারিদিক। ক্যামেরা ঘুরছে। ক্যামেরার পিছনে শক্তিবাবু। ক্যামেরার পিছনে শক্তিবাবু। ক্যামেরার পিছনে শক্তিবাবু।

শক্তি ব্যানার্জি

তাঁকে হাতেই হবে ধারেকাছেও আজ: সাধনায় তাঁর আন্তরিকতা। ঠিক বলেই আজ শক্তিবাবুর কাজ সকলের কাছে স্বীকৃত সম্মানিত।

ক্যামেরায় তিনি হাত দিলে যে অভাবনীয় কাজ করতে পারেন তার প্রমাণ রয়েছে স্যুটিং-এর পর তাঁর তোলা অসংখ্য ছবিতে। আরও প্রমাণ পাওয়া যাবে অজস্র ধন্যবাদ, তুখোড়, দুষ্টু মিষ্টি, জন্টাহু, 'হেট্ট নায়ক' ছবি-গুলোয়। শেষ ছবিখানার তিনি পরি-চালকও বটে। ভবিষ্যতে আরও ছবি পরিচালনার ইচ্ছে আছে।

কলকাতায় স্টুডিওর বহুপাতির অভাবের কথা তুলতে এই প্রথম একজন কুশলীকে বলতে শুনলাম—'যন্ত্রপাতির অভাব আছে বলেই বোধহয় এত খাটে মন দিয়ে কাজ করতে পারছি। তাছাড়া ভালো ভালো ইকুইপমেন্টস থাকলেই কি ভালো কাজ হয়?'

হয়নাতো নিশ্চয়ই, হলে আরও অনেক শক্তি ব্যানার্জিকে আমরা পেতাম। তাঁর কৃতিত্বের এই সাফল্যের পেছনে যে নামটি তিনি সবসময় করেন সেটি হচ্ছে অজয় কর। গুরুত্বপূর্ণ বহু ব্যাপারে শক্তিবাবু পরামর্শ নেন অজয় করের কাছে। শ্রীকর তাঁর কাছে প্রায় গড ফাদার'এর মত।

নিরীক্ষক

CENTRAL LIBRARY

ঝাঁকর বেকাই মাটিতে ছোঁচট খেয়ে পড়তে আবার সামলে নিয়ে পৌঁছুচ্ছে। অবাক লাগিয়ে পড়ছে। টেনে হিঁচড়ে ছেঁচড়ে এগোতে গিয়ে হাত-পা কেটে-কুটে রক্তারক্তি হচ্ছে। হঠাৎ দেখি স্টেনগান হাতে রূপা একটা টিলা লাফিয়ে পার হচ্ছে। প্র্যাকটিস না থাকলে এক্ষেত্রে যা হয়। মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গেল। আর তাতেই জানোয়ারের কনইটার চামড়া উঠে গেল খানিকটা। ওহশীলদার ঠিক ওর পেছনেই ছিল। চাইমি করে একলাফে ওকে লিংগের টিলাটা অনায়াসে পার হয়ে গেল সে। একটা কুলন্ত বুলেট এসে বিঁধে গেল ওহশীলদারের পায়ে। তৎক্ষণাৎ মর্মান্তিক একটা আর্তনাদ করে উঠে ওহশীলদার যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে মাটিতে আছড়ে পড়ল। —মার মর গিয়া রূপা—

আমাদের ভয় ছাড়ানো তখনকার ওহশীলদারের চীৎকারে পেছন ঘুরে কাকে দেখে সে থমকে দাঁড়াল। অন্যান্য সঙ্গীরা তখন ওকে পাশ কাটিয়ে পালাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে থমকে দাঁড়ানো মানেই স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করা। পুলিশ হন্যে হয়ে ছুটে আসছে। আর আসছে ঝাঁকে ঝাঁকে বুলেট।

রূপা এক লাফে ওহশীলদারের পাশে এসে বসে পড়ল। ওহশীলদার দু হাতে পা চেপে ধরেছে। কিন্তু রক্ত বন্ধ হচ্ছে না। যন্ত্রণায় ওর মুখ বিকৃত। ঠাকুর মান সিংয়ের ছেলে শেষ পর্যন্ত পুলিশের হাতে পড়বে? অসম্ভব। রূপা দেখল, ওহশীলদার যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে ক্রমেই নেতিয়ে পড়ছে। ওর উত্থানশক্তি চলে যাচ্ছে। এক মুহূর্ত রূপা কি যেন ভাবল। তারপর চোখের পলকে ওহশীলদারকে কাঁধে তুলে নিয়ে সেই সংকীর্ণ গিরিপথ ধরে সামনের দিকে প্রাণপণে ছুটতে আরম্ভ করল।

এবার আমাদের পালা।

আমরাও বড়ের মত অনুসরণ করলাম ওদের। ছুটছে আর্টিলারি। ছুটছে ক্যামেরা। ছুটছে সাউন্ড। লাইটের সরঞ্জাম। ফার্স্ট এইডের বাকস। আর আমাদের পিছে রেখে চতুর্দিক থেকে সেই গিরির সংকীর্ণ পথ দিয়ে ছুটে চলেছে সিকিউরিটী ফোর্সের লোকজন। কাঁটা ঝোপের মধ্যে দিয়ে দৌড়তে গিয়ে হাত-পা কেটে-ছড়ে একাকার হচ্ছে সবার। কিন্তু সেদিকে বুঝি ভ্রূক্ষেপই নেই কারো। মনোভাব আর গোর দৌড়াতে সেই সব বোঝা নিয়ে। ছুটতে ছুটতেই একে সবলের হাতে ভেটালে ভেজানো বুলেট এগিয়ে দিচ্ছে। এর-ওর হাতে।

সিকিউরিটী ফোর্সের ওপর কর্ণেল সাহেবের কড়া হুকুম ছিল—শুটিং-এর জন্য একমাত্র পরিচালিকার অনুমতি ছাড়া কেউ তার রাইফেল বা অন্য হাতিয়ারে আসল বুলেট না পাকানো বাইনড কোড করতে পারবে না। এখন শুধু ব্লাঙ্ক ফায়ার চলছে। ফলে আমাদের সঙ্গে যে-সব জোয়ানরা

উত্তমকুমার - আরতি ভট্টাচার্য

আর্টিস্ট হিসাবে ওরা ভাবছিল—তারা যদি তাদের রাইফেলের চেম্বার পরীক্ষা করে নিচ্ছিল। কি জানি মনের ভুলে যদি আসল বুলেট লোড হয়ে যায়! আর এখানে একবার সে ঢুকে পড়লে আর রক্ষে নেই। চারিদিকে যা রেটে গুলি-গোলা চলছে হয়ত সামান্য ভুল-ভ্রান্তি হলেই একেবারে জীবনান্তকর পরিস্থিতি হতে পারে।

আলমগীরের নীহার সিং তার জীবনে বহু এনকাউন্টারে গুলি চালিয়েছে। সবাই বলল নিখুঁত পেশাদারি গুলি চালিয়ে ও নাকি বহু ডাকুর ডেরলীলা খতম করেছে। লোকটির চরিত্র নাকি ভয় ডর বলে কোন কথা নেই। আর ওর মুখ দেখে মনের কথা আঁচ পাওয়া বড় কঠিন কাজ। অথচ এমনিতে কিন্তু বেশ ফূর্তিবাজ লোক। আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকার ডিউটী পেয়ে খুব খুশী। শুটিং-এর ফাঁকে ফাঁকে তাদের অনেক এনকাউন্টারের রোমহর্ষক কাহিনী শুনিয়ে দিল।

কথায় কথায় হঠাৎ বলল—জানেন বাবুজী, চম্বলে একটা প্রবাদ চালু আছে—

—সেটা কি ভাই?

—সেটা হচ্ছে যে মানুষ একবার রাইফেল হাতে বেহড়ে নেমে যায়, সে আর কখনও সভ্যজগতে ফিরে আসেনা। আর অ্যামুনেশান ফ্যাকটরীতে একটা বুলেটের গায়ে তার নাম জর্মন খোদাই হয়ে যায়। তারপর একমাস, দু মাস, দু বছর বড় জোর তিন সাল—বাছাধনকে সেই বুলেট ঘায়েল হয়ে এসে মরতেই হবে একদিন। কোন পরিত্রাণ নেই। কত বড় বড় বাগী দেখলাম। যাদের আতঙ্কে এখানকার মানুষ থর থর করে কেঁপেছে তারাও শেষ পর্যন্ত এই অপঘাত মৃত্যুকে এড়াতে পারল না। ধরুন না, একটা মামুলী এনকাউন্টারে ফেঁসে গিয়ে মরে পড়ে রইল এই বেহড়ের মাটিতে। কপাল আর কাকে বলে! ভাই বলি আজ মোহর সিং (তখনকার সুধর্ষ ডাকাত) কতই বাহাদুরী করুক, ব্যাটাকে মরতেই হবে। কি জানি—হয়ত আমার হাতেই ওর মরণ লেখা আছে। এই যে দেখছেন আমার স্টেনগানটা, এটা আমার বড়ই লাকিব্ল ছেলে। খুব অনুগত। আমি যা বলব, যেমন বলব—তাই শুনবে।

ওদিকে আহত ওহশীলদারকে কাঁধে নিয়ে স্টেনগান হাতে রূপা ছোটছে। অতিরিক্ত পরিশ্রমে ফরসা করে ঘামছে। কনুই কেটে বেরিয়ে আসা বড় বেহড়ের রুক্ষ মাটিতে মিশে যাচ্ছে। তবু থামলে চলবে না। যেভাবেই হোক—সিকিউরিটী ফোর্সের জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে যেতেই হবে। মাথার ওপর দিয়ে শিস্ টেনে পুলিসের বুলেট বেরিয়ে যাচ্ছে। যায় যাক। পালাও পালাও।

তার কাঁধে নিশ্চেতন হয়ে পড়েছে ওহশীলদার সিং। তার ক্ষতস্থান থেকে অনর্গল রক্ত ঝরছে আর সেই রক্তে রূপার খাকী শার্ট ভিজে লাল হয়ে উঠছে। কিছুক্ষণ ছোটেই ওহশীলদার হঠাৎ যেন বুঝতে পেরেছে—এ বৃথা চেষ্টা। পুলিশ তিন দিক থেকে তাদের ঘেরাও ফিরেছে। বেহড়ের রক্তপিপাসু মাটি আজ তাজা রক্ত খুঁজছে। অতএব। তার পালিয়ে যাবার আর কোন উপায় নেই।

—রূপা, আমাকে নামিয়ে দাও—

রূপা অবাক। —কেন?

—এই শুনো যে তোমাকে বাঁচতে হবে। এভাবে চলতে থাকলে আমাদের দুজনকেই মরতে হবে। তার চেয়ে আমাকে ফেলে তুমি পালাও—

—অসম্ভব। দাঁড়ি (ঠাকুর মান সিং) যখন তোমার কথা আমায় গিয়ে বলবে, আমি তাকে কি জবাব দেবো?

তহশীলদারের চোখে জল।—পুলিশকে বলবে—সে পুলিশের সঙ্গে লড়াই করে মরেছে। ইজ্জতের সঙ্গে মরেছে পুলিশ খুশী হবে—

মাথায় ওপর দিয়ে এক ঝাঁক পাখি ডেকে গেল। পুরো তহশীলদারকে নিয়ে সারা মাঠে ছড়িয়ে পড়ল। ওরা দূরে এগিয়ে আসছে। তহশীলদার চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে বলল—রূপা বোকামী করো না। পালাও। আমাকে একটা রাইফেল আর গুলি দিয়ে যাও। আমি একটা গুলিতে একটাকে শেষ করব। তার পর আমাকে ওরা যা খুশী করুক। তুমি ওদের নাগালের বাইরে চলে যেতে পারবে।

কিন্তু রূপা তবুও নড়ল না।

—পালাও ভাই। তোমাকে সঙ্গে নিয়ে পালাব। তোমাদের এভাবে ফেলে রেখে আমি যেতে পারি না তহশীলদার—

তহশীলদার ক্ষিপ্ত হয়ে বলছে—যা আমার কথা শুনি তুমি বলেছ। কাউকে জান দিতে দেব না। তুমি পালাও, পালাও বলছি, এখনও সময় আছে—

শেষে নিরুপায় হয়ে রূপা ওর নেমন্তন্নের একটা মাটির হাতে একটা রাইফেল আর অনেক কার্তুজ বুলেট ধরিয়ে দিয়ে বলল—এই নাও তোমার ইজ্জত রক্ষার সাক্ষী—

রূপার মত দক্ষিণ ভারতের ছেলে জল।

তহশীলদার চীৎকার করে বলল—তুই একটা আওরৎ—চোখের জল ফেলছিস্—জান নিয়ে এখন পালিয়ে যা—

রূপা নেহরুর মত ওকে দেখে নিয়ে দ্রুত চলে গেল। আর চম্বলের সন্ত্রাস শের সিং-এর বড় ছেলে ঢাকু তহশীলদার আহত পংগু দেহে বসে বসে মৃত্যুর অপেক্ষায়।

সিকিউরিটী ফোর্সের কয়েকজন জোয়ান এসব দেখে অভিভূত। আসলে তহশীলদার এনকাউন্টারে তারাও ছিল। তাদেরই একজন বলল—অবিকল এই রকমই ঘটেছিল সেদিন। রূপা মহারাজ তহশীলদারকে বেহুঁশের একটা সদ্য খালির মধ্যে বসিয়ে দিয়ে নিঃশব্দে সরে পড়েছিল। রেখে গিয়েছিল একটা রাইফেল আর কিছু কার্তুজ...বলতে বলতে সেই মৃত সাইলেন্সের বুলেটগুলো এক-একজনের পাশে রাখা হল। মাথার ওপর সূর্যের প্রখর তাপে বাতাস যেন হাঁফিয়ে উঠছে। এখন তহশীলদারের চেহারা আরও ভয়ংকর। চোখ দুটো স্থির অকম্প। হাতে কাইফেল।

নিঃশব্দ বেহুঁশে তিনজনের ঘুরেই গুলি করে আর পুলিশের বুটের শব্দ শুনতে পেল। আর সবার আগে যাকেই হাতে পেল তহশীলদার। রাইফেলের সেন্সারে একটা বুলেট ঢোকাতে চেষ্টা করল সে। কিন্তু

একটা যে আর বুলেট নেই। এ বুলেট তো এই রাইফেলের নয়। সর্বনাশ। একটার পর একটা বুলেট সে রাইফেলের চেম্বারে ঢোকাতে চেষ্টা করল। কিন্তু তার সব চেষ্টাই ব্যর্থ হল। একটাও লাগছে না। লাগছে না, লাগছে না, লাগছে না! হায় ঈশ্বর!

পুলিশের আর্মড্ ফোর্স পাটির নজরে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওরা সিঁড়িয়ে গিয়ে পজিশন নিয়ে নিল। ব্রিগেডিয়ার যম বসে আছে ওপরে ওয়ার্কশপটায়। মেজর সাহেব হেড কোয়ার্টারকে বললেন—একটা বাঘী সামনে রয়েছে। মনে হচ্ছে ইঁদুরোড়। কি করব?

হেড কোয়ার্টার তৎক্ষণাৎ পরামর্শ দিয়েছে—ওকে সারেন্ডার করতে বল। নো প্রোভোকেশন। ও গুলি না চালালে আমাদের কোয়ানরা গুলি চালাবে না। লোকটাকে বাঁচতে হবেই হবে।

মেজর মুখ থেকে চোঙটা তহশীলদারকে বললেন—আর কি, সারেন্ডার কর। তাহলে অন্তত প্রাণে বাঁচবে—

তহশীলদার কোন জবাব দিল না। কট্‌মট করে তাকিয়ে রইল।

আর তার কিছুক্ষণের মধ্যেই পুলিশ টের পেয়ে গেল যে ওর রাইফেলে নিশ্চিত কোন গণ্ডগোল আছে। পুলিশ ও আর চালাতেই পারবে না। ও এখন নির্বিষ ঢোঁড়া সাপ মাত্র।

ব্যস, চোখের পলকে জোয়ানরা ওকে ঘিরে ফেলল। একটা গুলিও করতে হলো না। তারপর যখন জানা গেল যে হতে ডাকাত হচ্ছে স্বয়ং তহশীলদার সিং, পুলিশের মধ্যে যেন উল্লাসের স্রোত বয়ে গেল।

অন্য অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করতে হলো বলে তহশীলদার রাগে দুঃখে ক্ষোভে তখন প্রায় উন্মাদ। চীৎকার করে সে শুধু বলছে—আমাকে তোমরা গুলি করে মারো। নয়া করে গুলি করে মারো। গুলি করে মারো—

তহশীলদারের চীৎকারে পুলিশের লোকেরা আদৌ বিচলিত হয়নি। তহশীলদার মরতে চেয়েছিল ভিন্ন কারণে, চম্বলের ডাকুরা তাকে পুরোপুরি অবিশ্বাস করবে। কোন ডাকাত জীবিত অবস্থায় কখনও পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করে না। সেটা মোটেও সম্মানজনক নয়। অথচ কেউ বিশ্বাস করবে না রূপা তাকে ভুল কার্তুজ দিয়ে গিয়েছিল। ফলে সে না পেরেছে আক্রমণ করতে না পেরেছে আত্মরক্ষা করতে। নামজাদা ডাকুর মত সে পুলিশের কাছে ধরা পড়ে গেছে।

কিছুক্ষণের মধ্যে তহশীলদারকে জীপে-পরেট বেঁধে একটা জীপ সহরের পথে যাত্রা করল। তারপর থেকে তহশীলদার আর বেহুঁশে ফিরতে পারেনি। আজও সে আগ্রার সেন্ট্রাল জেলে বন্দী জীবন কাটাচ্ছে। যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছে তার।

গোয়ালিয়র টাইমসের গোবিন্দ শর্মা আমাকে বলেছিলেন—ফেরার সময় যদি পারেন তো একবার তহশীলদারের সঙ্গে দেখা করে যাবেন। লোকটির মতিগতির কতটা পরিবর্তন হয়েছে স্বচোখে না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত। যে মানুষ একদিন হাসতে হাসতে অন্যের প্রাণ নিয়েছে সে আজ অন্যের প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে জেলের হাসপাতালে স্বেচ্ছাশ্রমের কাজ নিয়েছে। দিন-রাত রোগীর সেবা-শুশ্রূষা নিয়ে আছে...।

রঞ্জন মজুমদার

শব্দের নক্সা

উৎপল দত্ত - শংকী বন্দ্যোপাধ্যায়

সুহাসিনী মুলে

বিশপ লেফ্রয় রোডের সোতলায় ৬ নম্বর ফ্ল্যাটের দরজা খুলে যে তরুণীটি সামনে দাঁড়ালো তাকে ভুবন সোমের পৌরী বলে প্রথমটায় চিনে নিতে একটু অসুবিধে হবার কথা। মুখের আদলে খুব একটা বদল হয়নি বটে, কিন্তু উনসত্তর সালের কিশোরী আজ তরুণীতে পরিণত। চেহারার ও চর্চাচক্যে অনেক আপ-টু-ডেট তিনি এখন। কথায় ইংরেজী বলার ঝোঁক বেশী। বেশ-ভূষায় আধুনিকার ছাপ সুস্পষ্ট।

এই মুহূর্তে তিনি আমার সামনের সোফায় বেশ রিল্যাকসিং ভঙ্গিতে বসে আছেন। পা দুটো মুড়ে পাশের চেয়ারে তুলে দিয়েছেন আধশোয়া হয়ে। পরনে সুতির একটা বেল বটম আর বুক শার্ট। হাতাও গোটানো। চোখে-মুখে কিছুক্ষণ আগে ঘুম থেকে ওঠার ছাপ ছড়ানো। হাতে একখানা বই, বোধহয় পড়ছিলেন।

আসলে আমি গিয়েছিলাম ইন্টারভিউয়ের দিন ঠিক করতে। উনি বললেন—'আমিতো ঘণ্টা দুয়েক বাড়ীতে আছি। অসুবিধে না হলে আমি রাজী।' ছবি তোলার জন্য ফটোগ্রাফারকে ডাকার প্রস্তাব করতে খুব হালকা করে বললেন—'ছেড়ে দিন আজ। মাথার এলো চুলগুলোকে আরও একটু এলোমেলো করে দিলেন। এ অবস্থায় কি ছবি তোলা যায় নাকি!'

সুতরাং ছবি তোলা হোল না তখন। মুলতুবি রইল। শুধু স্মরণ ইন্টারভিউ: সুহাসিনী মুলে জাতে মারাঠী হলে কি হবে ওঁর বাংলা কথা শুনলে বুঝতেই পারবেন না যে ওঁর মাতৃভাষা কি? কাচের মত স্বচ্ছ বাংলা বললেন আমার সঙ্গে। ভাষার প্রতিটি নুয়ান্সগুলোও তাঁর জানা। বললাম—বাংলা এত ভালো শিখলেন কি করে?' গৌরী নয়, সুহাসিনী মারাঠার মত জ্রুপাটি দাঁত ঈষৎ বিস্ফারিত করে জানালেন—কলকাতায় তো ছিলাম প্রায় বছর খানেক। এখানে বাঙালী বন্ধু কম আছে নাকি আমার? তারপর দিল্লী বম্বে যেখানেই পড়াশুনো করেছি সেখানেই বাঙালী মেয়েদের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হোতো খুব। তাদের সঙ্গে থেকে থেকেই শিখেছি।'

তবে এখনও বাংলা পড়ার ব্যাপারে তিনি একবারে কাঁচা। এখনও ইণ্ডিয়া ল্যাবের এডিটিং রুম বা ক্যান্টিনে বসে কাজের ফাঁকে সময় পেলে বসে পড়েন বিদ্যাসাগরের 'বর্ণ পরিচয়'টি নিয়ে। হাতের কাছে যাকে পান তাকেই ডেকে জিজ্ঞেস করেন কোন শব্দটা কি — সত্যজিৎ রায়ের ইউনিটের প্রায় সকলেই এখন ওঁর বাংলার মাস্টার। কথা শুনে মনে হোল বাংলা শেখার প্রচণ্ড ঝোঁক রয়েছে ওঁর।

ভুবন সোম'-এর অপ্রত্যাশিত সাফল্য সুহাসিনীকে ঐ একখানা ছবি দিয়েই প্রায় তাবড়ো পর্দানশীনের কাছাকাছি নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ফিল্ম লাইনের গ্ল্যামার হাতছানিতে তিনি তখন সাড়া দেননি। মার পরামর্শে চলে গিয়েছিলেন কানাডায় মাস কম্যুনিকেশন পড়বার জন্য। পাঁচ বছরের কোর্স। প্রথম দু বছর জেনারেল কোর্স পড়ার পর সুহাসিনী স্পেশালাইজড বিষয় নিলেন—টি-ভি।

মাস্টার্স তিন বছর হাতে-কলমে কাজ করার পর দেশে ফিরেছেন গত বছর ডিসেম্বরে। কি করবেন—কি করবেন না ভাবছেন। এমনি সময় সত্যজিৎ রায়ের কাছ থেকে কাজ করার অফার পেয়ে চলে এলেন কলকাতায়। অবশ্য ইতিপূর্বে গত জানুয়ারীতে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের সময় দিল্লীতে পরিচয় হয়েছিল দু'জনের। জুরী বোর্ডের লিয়াস সেক্রেটারী হিসাবে সুহাসিনী ছিলেন ওঁদের সঙ্গে।

'মানিকদার সঙ্গে কাজ করাটাও তো একটা অভিজ্ঞতা। অনেক কিছু শেখা যায়। গলায় বিনয়ী ছাত্রীর সুর। জানতে চাইলাম —বিশেষ কি শিখলেন, যদি বলেন?

চঞ্চল চোখে কি বলবেন সেই ভাবনা জাগল বুঝি। একটু বিশ্রাম নিয়ে বেশ গম্ভীর সুরে বলে উঠলেন—'ফিল্মে ডিটেলের কাজের যে কতখানি গুরুত্ব তা নিশ্চয়ই আপনার অজানা নয়। মানিকদা এই কাজগুলো খুব যত্নের সঙ্গে করেন।' কথাটা শেষ করে 'জন অরণ্য' ছবির সেটের একটা ঘটনা শোনালেন।

একখানা ঘরে ডেট-ক্যালেন্ডার আছে একটি। তাতে তারিখ দেখাতে হবে ধরুন ১৯৭১ সালের ২১ এপ্রিল। একজন সহকারী সাল-তারিখ হেরে ক্যালেন্ডারে পটাপট বসিয়ে দিলেন। কিন্তু বারটা নিয়ে মুশকিলে পড়া গেল। ঐ সালের ২১ এপ্রিল কি বার ছিল সেটা সঠিক না জেনে সত্যজিৎ রায় যে-কোনো বার করে দিতে রাজী নন। উনি বললেন—ছবি দেখতে বসে দর্শকরা এগুলোও মার্ক করে ভয়ানক। জানেনা তো, ভুল কোনো বার দেখানো হলে দেখবে 'ঠিক চিঠি আসবে!' তখন আর করা কি যায়! অত কষ্ট ঠিক দিনটি বার করে তবে ছাড়। এই ধরনের ডিটেলের কাজ সত্যজিৎ বাবু ছাড়া আর কজনই বা করেন।

সুহাসিনী বললেন—বলুন না, এই শিক্ষাটাই বা কম কিসে?'

—নিশ্চয়ই! ছোটখাট ডিটেলের ওপর ছবির অনেকটা নির্ভর করে তা বটেই।

মৃণাল সেনের সঙ্গে কাজ করার ইচ্ছে আছে কিনা জিজ্ঞেস করতে হেসে বললেন —বাঃ, তা থাকবে না কেন?' মৃণালবাবুর সঙ্গে এই কলকাতায় থাকতে দেখা হয়েছে একাধিকবার। তিনি ওঁকে বলেওছেন—পরের ছবিতে তোমার কাজ হতে পারে, করবে তো?'

সুহাসিনী জানালেন গররাজি হবার কোনো কারণ নেই। ডাকলেই কাজ করবেন। তবে সহকারী পরিচালকের কাজ তিনি মানিকদা'র সঙ্গেই করবেন। 'জন-অরণ্য' শেষ। পরের ছবিতেও করার ইচ্ছে।

মৃণাল সেন সুহাসিনীকে এনেছিলেন পর্দায়। ভুবন সোম থেকে তিনি খ্যাতিও কম পাননি। তাই যখন প্রশ্ন তুললাম 'মৃণাল সেনের সঙ্গে অ্যাসিস্ট্যান্ট থাকলেন না কেন?'

আসন করে বসা পা দুটো নীচে নামিয়ে বাঁ দিকের জানলা দিয়ে মেঘলা আকাশে দৃষ্টি ফেললেন একবার। প্রশ্নটার জবাব দেবেন কিনা বা কি দেবেন এই ফাঁকে ভেবে নিলেন বোধহয়।

আলগা হাসি মুখে ছড়িয়ে বললেন—'জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারীতে তো আমি চুপচাপ বসেই ছিলাম। মানিকদা বললেন কাজ করতে। চলে এলাম। তাছাড়া তখন মৃণালদাও কোনো ছবি করছিলেন না। এখনও শুরু করেননি। ওঁর সঙ্গে কাজ না করার আর কোনো কারণ নেই।'

'জন-অরণ্যে' ছোটখাটো কোনো রোল করছেন কিনা জিজ্ঞেস করলে জানলাম—করেননি। এ-ছবিতে ওঁর করার মত কোনো চরিত্রও অবশ্য নেই। 'দু-একটা সিন হাতে না পা কি বেন দেখিয়েছি পর্দায়, যান!'

অভিনয় নিয়েই যখন ফিল্মে আসা, তখন ঐ লাইনেই তিনি স্টিক করে থাকতে পারতেন। প্রোডিউসাররা এসেছিলেনও বহু অফার নিয়ে, কিন্তু তিনি ডিক্লাইন করেছেন সব প্রোপোজাল। ডিরেকটর হবার বাসনা তাঁর অনেকদিনকার। কানাডায় টিচিং ট্রেনিং নিয়ে আজ তিনি ছবি পরিচালনায় হাত পাকিয়েছেন। তার ওপর সত্যজিৎ

যদি মোবাইল ফেস থাকে আর ফিলিংস ফাইন হয়, তাহলে যে-কোনো লোকের অভিনয় করা মোটেই কঠিন নয়।'

—আপনি কি মনে করেন আপনার এই গুণগুলো আছে? মৃদুকণ্ঠে হাসলেন টা শুনে। বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে করে উত্তর দিলেন—'নিশ্চয়ই আছে।'

গোধূলির আলো তখন সুহাসিনীর মুখ জুড়ে। জানালাগুলো সব খোলা। আলো জ্বালা হয়নি। অন্ধকার ক্রম। বোধহয় আলো-আঁধারির কথাটা ল হয়নি। সামনের রাস্তা দিয়ে হুস-করে গাড়ীর শব্দ আসছে কানে। পাশের বাড়ীতে আলো জ্বলছে।

কাজের লোকটি বাইরে থেকে এসে আলো জ্বালতে মনে হলো 'সত্যিই সন্ধ্যে হয়ে এসেছে।' সুহাসিনীই এক-লজ্জা ঝেড়ে ফেলে বলে উঠলেন—'আলোই লনি, দেখলে তো কি অবস্থা! ভেবে !'

আর একটু বাদে তিনি হয় যাবেন রবি ঘোষের বাড়ী ওখানে আড্ডা বসে রোজ। এখন ক সুহাসিনীর ঐটুকুই বোধহয় একমাত্র জায়গা। সারাদিন সুটিং অ্যাটেন্ড করে শরীর ও মন একটু বিশ্রাম চায়। ত সুহাসিনী এখন উৎকণ্ঠে তরুণী। আড্ডা ইজ দি মাস্ট। আর রবি ডেরায় আড্ডা মানে ইনটেলে জমাট। সেখানে তো যাবেনই।

আসার সময় বললাম—চলেছেন এখন—রবিদার বাড়ী?

মুচকি হাসলেন। ঘাড় গাল ঢেউ তুলে বললেন—'হুঁ।'

নির্মল

ভুল সংশোধন

গত সংখ্যায় ঘোষের সাক্ষাৎকারে ৬০) মাতলা নয় হবে।

আর পড়তে হবে।

CENTRAL LIBRARY

নাটমঞ্চ

নান্দীকার এর বলিষ্ঠ নাটক 'আন্তিগোনে'

'নান্দীকার'-এর সাম্প্রতিক নাটক 'আন্তিগোনে' বাংলার নাটমঞ্চে একটি বিশিষ্ট সংযোজন। এর বিষয়বস্তু বা কাহিনী, বক্তব্য এবং সেই সঙ্গে বলিষ্ঠ অভিনয় নাটকটিকে এক বিশিষ্ট মর্যাদায় পৌঁছে দিয়েছে।

এ নাটকের পটভূমি প্রাচীন গ্রীসের থেবেই নগরে একটি রাজা। সময় রাজা অয়দিপাউসের মৃত্যুর অব্যবহিত পরের একটি দিনের ভোর থেকে সন্ধ্যা ৬টা।

রাজা অয়দিপাউস ভাগ্যাহত মানুষ। মধ্যযৌবনে তিনি একদিন হঠাৎ আবিষ্কার করলেন যে তিনি নিজের অজ্ঞাতসারেই তাঁর পিতাকে হত্যা করেছেন এবং স্বীয় মাতার গর্ভে চারটি সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। যার দুটি পুত্র দুটি কন্যা। এই ভয়াবহ তথ্য জানার পর তাঁর মাতা ও স্ত্রী আত্মহত্যা করেন। লজ্জায় ঘৃণায় ও অনুশোচনায় রাজা অয়দিপাউস স্বর্ণ শলাকা দিয়ে নিজের দুচোখ অন্ধ করে দেন ও রাজ্য থেকে স্বেচ্ছানির্বাসন নেন এবং পরবর্তীকালে সেই অবস্থায়ই মারা যান।

রাজা অয়দিপাউসের মৃত্যুর পর থেবেইয়ের সিংহাসন নিয়ে দুই পুত্র এতিয়োকেস ও পলিনেসেস-এর মধ্যে বিবাদ শুরু হোল। বিবাদ থেকে যুদ্ধ। সেই যুদ্ধের উভয়েরই মৃত্যু হোল পরস্পরের হাতে। সেই সুযোগে রাজা হয়ে বসলেন রাজা অয়দিপাউসের শ্যালক ক্রেয়ন। ক্রেয়ন যুদ্ধে এতিয়োকেসের পক্ষ নিয়েছিলেন। তাই রাজা হয়েই তিনি ঘোষণা করলেন মৃত এতিয়োকেস দেশপ্রেমিক ও শহীদ। রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তার সমাধি হবে। আর পলিনেসেস দেশদ্রোহী, বিশ্বাসঘাতক। অতএব তার মৃতদেহ উন্মুক্ত রাজপথে পড়ে থাকবে—ভবিষ্যতে বিদ্রোহীদের যথোচিত শিক্ষাদানের জন্য। অর্থাৎ তাকে দেখে থেবাইবাসী বুঝবে বিদ্রোহ করার কি মূল্য।

এটা গল্পের পূর্বাভাস। নাটকের শুরু এরপর থেকে।

রাজা অয়দিপাউসের দুই কন্যার প্রথম জন ইসমেনে আবেগতাড়িত, ভীত এবং কিঞ্চিৎ বিলাসী। আন্তিগোনে স্বভাবে কিছুটা বিপরীত। সে সাহসী এবং স্পষ্টবক্তা। তার ইচ্ছে পলিনেসেসের রাজপথে পড়ে থাকা মৃতদেহ কবর দেওয়া হোক। তার প্রথম কারণ সে আন্তিগোনের ভাই এবং রাজপুত্র, দ্বিতীয়তে তাকে সমাধিস্থ না করা হলে তার আত্মা শান্তি ও শান্তি লাভ করবে না।

আন্তিগোনে নাটকে অঁজতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় (ক্রেয়ন) এবং রেয়া চক্রবর্তী (আন্তিগোনে)

কিন্তু রাজার আদেশ অমান্য করার মৃত্যু। তবু সে গোপনে পলিনেসেসের মৃতদেহকে কবর দিতে গেল এবং সকলের হাতে ধরা পড়ল। রাজা ক্রেয়ন শুনে প্রথমটা বিস্মিত এবং চমকিত হলেন। তিনি ক্রুদ্ধ হয়েও ধৈর্যবলত আন্তিগোনেকে না বলে নিরস্ত হতে বললেন। কিন্তু আন্তিগোনে সংকল্প অটল। তাই শেষপর্যন্ত রাজা ক্রেয়ন তার ঔদ্ধত্যের শাস্তিস্বরূপ আন্তিগোনেকে মৃত্যুদণ্ড দিলেন। সে খবর শুনে সারা থেবাইবাসী আড়ালে রাজাকে ধিক্কার দিল।

অন্যদিকে আন্তিগোনের সঙ্গে আর কেউ যে স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করতে সে তার প্রেমিক ও ক্রেয়নের প্রিয়পুত্র হীমন। সে পিতার সামনেই তরবারি দিয়ে আত্মহত্যা করল। সেই খবর শুনে ক্রেয়নের স্ত্রীও ছুরি দিয়ে নিজের গলা কেটে আত্মহত্যা করলেন। এত শোক ক্রেয়ন স্তব্ধ বিস্ময়েই হজম করলেন। কারণ সে রাজা, স্বেচ্ছায় সে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেছে। শোক বা দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দিয়ে সে কর্তব্যচ্যুত হতে পারে না।

এই কাহিনীর অনেকটাই মঞ্চের আড়ালে সংঘটিত হয়েছে। নাটক প্রাধান্য পেয়েছে প্রধানত ক্রেয়নের সঙ্গে আন্তিগোনের যুক্তিতর্ক ভিত্তিক কথোপকথন, আন্তিগোনের সঙ্গে হীমনের প্রেম ও বাক্যালাপ, দুই বোনের প্রতি ধাই-মার সস্নেহ ব্যবহার ইত্যাদি।

এই প্রসঙ্গে নান্দীকারকে ধন্যবাদ তাঁরা দর্শকের মনে আলোড়ন সৃষ্টির জন্য মঞ্চে নিষ্ঠুর মৃত্যুর অবতারণা করেন নি। অথচ সে সুযোগ তাঁদের একাধিক ছিল।

পূজায় মনোরম শাড়ী ও পোষাক
গড়িয়া ফ্রেণ্ডস্ সোসাইটী
৫৪৫, জি. টি. রোড (সাউথ) হাওড়া • ফোন: ৬৭-৪৪৪৭

এ নাটকের মূল চরিত্র রাজা কেয়ন ও অ্যান্টিগোনের চরিত্রে রূপদান করেছেন যথাক্রমে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কেয়া চক্রবর্তী। কেয়ার আলোচিত বাহ্যিক আপাত কাঠিন্য এবং বিরূপ ভাবটুকু অজিতেশবাবুর অভিনয়ে আশ্চর্যভাবে পরিস্ফুট। তাঁকে যেমন মানিয়েছিল তেমনি তিনি তাঁপাটের সঙ্গে অভিনয় করেছেন। কিন্তু দৃশ্যে বা মঞ্চে তাঁর চোখের গভীর অভিব্যক্তি এবং মুভমেণ্টস চুলচাল নয়।

কেয়া চক্রবর্তীর অভিনয়ে কঠিন নির্মীক এবং আত্মসমাহিত আবেগে সঞ্চারিত। তিনি ভাইয়ের প্রতি কর্তব্য বিরোধে স্থিরে রাখা এবং লোভার সঙ্গে যুক্তি বা তর্কযুদ্ধে নির্ভীক অনাদিকে হ্যামনের কাছে প্রেম নিবেদনে আবেগ তাড়িত এবং ভাই-এর মৃতদেহ নিয়ে মনোভাবটি আশ্চর্য আন্তরিকতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। কেয়া চক্রবর্তী যে অভিনয়ের ক্ষেত্রে প্রতিভাময়ী 'ভালো মানুষ'-এর পরে আর একবার প্রমাণ রাখলেন। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে তিনি যেন 'ভালো মানুষ'-এর মায়াকে কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। অ্যান্টিগোনে সেখে তা যেন মনে হোল। হয়তো বা তা তাঁর অভিপ্রেতই।

বীণা মুখোপাধ্যায়ের ইসমেনে সুন্দর। আর আবেগপূর্ণ অভিনয়ে দর্শকদের আপ্লুত করেছেন ধাই-মা রূপী লতিকা বসু।

অরুণ চট্টোপাধ্যায়ের হ্যামন ভাল।

রূপায়ণে চক্রবর্তীর প্রথম প্রচেষ্টা প্রথমাংশে সফল। সেই অনুপাতে অন্য দুই প্রহরীর অভিনয় কিঞ্চিৎ নিষ্প্রভ।

অন্যান্য চরিত্রের অভিনয় বিনাস্ত।

পরিমল মুখোপাধ্যায়ের সুরযোজনা আন্তরিক। বিশেষ করে সহজ ভাষায় অভিব্যক্তিতে কাহিনীটি বলে যাওয়ার মধ্যে মুন্সিয়ানা আছে। তবে একাধিকবার সূত্রধার হিসেবে তাঁর মঞ্চে আগমন নাটককে জুড়ে দেওয়ার পক্ষে হয়তো সহায়ক হয়েছে তবু যেন মনে হয়েছে নাটকের সূচনা এভাবে হওয়ার ক্ষেত্রে দর্শকমনে কিছুটা বিধাতারও সৃষ্টি হয়েছে। ঐ কথাগুলি কি কুশীলবের মুখ দিয়ে সংলাপের মাধ্যমে বলে দেওয়া যেত না? (নাটক : লোকেরেন ও জাঁ ঝাপ্রো। ভাষান্তর : চিত্তরঞ্জন ঘোষ।) কুমার রায়ের মঞ্চ পরিকল্পনায় নাটকে নির্দিষ্ট মুহূর্তের গ্রীক স্থাপত্য ও তার পরিবেশটি চমৎকার ফুটে উঠেছে। কালীপ্রসাদ ঘোষের আলো নাটকের গতিকে তাঁর গতিময় করায় পক্ষে সহায়ক হয়েছে। শান্তি সেনের রূপসজ্জা এবং পোশাক পরিকল্পনা সময় ও চরিত্র অনুযায়ী। হিমাংশু পালের মঞ্চ প্রয়োগ নাটকে গাম্ভীর্য এনে দিয়েছে।

ছবির সূত্রধারে অভিনীত চরিত্রহীন নাটকের একটি দৃশ্যে অসীম দত্ত (সুকুমার), অমিতকুমার সিনহা (নতীশ), স্বরাজ মজুমদার (রাখাল) ও জগদিন্দু ভাণ্ডারী (ঠাকুর)-কে দেখা যাচ্ছে।

এমন একটি মঞ্চের ক্ষেত্রে বাঙালির নাটক উপহার দেবার জন্য নির্দেশক বুদ্ধদেব সেনগুপ্তকে অকুণ্ঠ সাধুবাদ জানিয়েও তাঁ ভাষাতেই বলি, এ মন ভরানোর নাটক ভাববার মত নাটক এবং অনিবার্যভাবেই বিশিষ্ট ও রুচিবান দর্শকদের জন্য এ নাটক। তাই টিকিট ঘরের সার্থকতা না এলেও এমন নাটক পরিবেশন এবং দর্শন করার আলাদা একটা প্রয়োজন আছে। অ্যান্টিগোনে অনিবার্যভাবেই সেই মর্যাদার চিহ্নিত।

অমৃতবাজার পত্রিকা এডিটোরিয়াল স্টাফের 'চরিত্রহীন'

সম্প্রতি একটি অপেশাদার ভাল নাটক দেখার সুযোগ পাওয়া গিয়েছিল। গত ১৫ আগস্ট সকালে অমৃতবাজার পত্রিকার এডিটোরিয়াল স্টাফ স্টার মঞ্চে পরিবেশন করলেন শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন' নাটকটি। এটি তাদের সপ্তম বার্ষিক নাট্যানুষ্ঠান। এই বছরে শরৎচন্দ্রের নাটক অভিনয় করা বা পরিবেশনের আলাদা একটা গুরুত্ব হয়েছে। কারণ এই বছরই সারাদেশব্যাপী শরৎচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকী উৎসব পালিত হচ্ছে। সেই জন্যও এই নাটক পরিবেশনের জন্য উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ প্রাপ্য।

'চরিত্রহীন' নাটক হিসেবে দুরূহ সন্দেহ নেই। এর প্রায় সব চরিত্রই গুরুত্বপূর্ণ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে জটিল। কিন্তু এঁরা দর্শকদের অবাক করে দিয়েছেন সেই সব চরিত্রের মধ্যে প্রাণসঞ্চার করে। অথচ এঁরা প্রায় কেউই নিয়মিত অভিনয় করে থাকেন না। এর জন্য অভিনেতারা ছাড়া আর যাঁর প্রশংসা প্রাপ্য তিনি এ নাটকের নির্দেশক দিলীপ মৌলিক। তাঁর পরিশ্রম সার্থক।

অভিনয়েও টিম ওয়ার্ক লক্ষণীয়। শিল্পীদের মধ্যে একটা সহযোগিতার মনোভাব থাকায় সমগ্র নাটকটি সুন্দর রূপ নেবার পক্ষে সহায়ক হয়েছে।

গোপাল মুখোপাধ্যায়ের বিশ্বপ্রসাদ, প্রকাশ ঘোষের উপেন, নিশীথ বড়ালের দিবাকর, প্রশান্ত বসুর সহায়ী, জগদিন্দু ভাণ্ডারীর ঠাকুর ও অমিত সিনহার সতীশ সার্থক চরিত্র-চিত্রায়ণে চিহ্নিত। শ্যামল সেন জ্যোতিষ, জ্যোতিরূপ গুপ্তের সমাজপতি, অরুণ ঘোষের অনঙ্গ ভট্টাচার্য, দীপনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের বিপিন, বিমল দের মতিলাল, সুতপা বসুর ভূতো সুন্দর।

এছাড়া অবিনাশ দে (মোহিত), স্বরাজ মজুমদার (রাখাল), অসীম দত্ত (সুকুমার) দিলীপ দত্ত (থাকোবাবা) ও কল্যাণীয়েন-এর কালীচরণ দর্শকদের আনন্দ দিয়েছে।

স্ত্রী ভূমিকায় যথাক্রমে শ্রীমতী নমিতা সিংহ, শ্রীমতী অঞ্জনা বড়াল, শ্রীমতী নন্দিতা ঘোষ, শ্রীমতী কল্পনা দে ও শ্রীমতী মঞ্জু বন্দ্যোপাধ্যায় স্ব স্ব চরিত্র সার্থক।

সঙ্গীত নির্দেশনায় পান্না সেন ও আবহ সঙ্গীত পরিচালনায় বিকাশ মুখোপাধ্যায় মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। আলোর কাজ সুন্দর। মঞ্চ ব্যবস্থাপনায় জ্যোতিপ্রসাদ ঘোষ সার্থকভাবে তাঁর দায়িত্ব পালন করেছেন। বেশভূষা কুশলতার রূপসজ্জা চরিত্রানুগ।

এই প্রসঙ্গে আরো কয়েকের নাম অবশ্যই উল্লেখ করতে হয়। অন্তরাল থেকেও যাঁরা নাটকটিকে সাফল্যমণ্ডিত করতে সাহায্য করেছেন। তাঁরা হলেন জ্যোতিশ বসু, দেবদাস ব্যানার্জী ও জয়ন্তক মুখোপাধ্যায়।

মাননীয় শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ মহাশয় নাট্যানুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর উপস্থিতি যেমন কুশীলবদের উৎসাহ জাগিয়েছে তেমনি সমগ্র অনুষ্ঠানটি মর্যাদা লাভ করেছে।

নাট্য সমালোচক

ফ্লোর থেকে বলছি

টালীগঞ্জের দু নম্বর নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওটি এখন পুরোপুরি সুসংগঠিত। কিছুদিন আগের সেই ক্লনিক দৈনাদশা হালফিল কিছুটা যেন কমেছে।

দু নম্বর স্টুডিওতে ছবি তোলার জন্যে এমন গুরুত্বপূর্ণ একটা টেকনিক্যাল সরঞ্জাম আছে, যা আমার বিশ্বাস, ভারতের আর কোথাও নেই। আর সেটি হচ্ছে ছবির ব্যাক প্রোজেকশান সিস্টেম!

গত সপ্তাহে স্টুডিওতে ঢুকে দেখি দুটি স্ক্রীনেই ছবির শুটিং হচ্ছে। যার একটিতে ব্যাক প্রোজেকশান করে নিচ্ছেন ক্যামেরাম্যান-পরিচালক প্রীতম গুপ্ত—তাঁর 'নিশিগন্ধা' ছবির। আর অপরটিতে 'এরই নাম প্রেম' বলে একটা নতুন ছবির শুটিং হচ্ছে।

স্মরণ থাকতে পারে, আমি ইতিপূর্বে এখানে 'নিশিগন্ধা' ছবির সিকোয়েন্স নিয়েছি। অতএব চলুন 'এরই নাম প্রেম' ছবির সেটে।

ছবিটি পরিচালনা করছেন নবাগত পরিচালক বীরেশ্বর। এটিই তাঁর প্রথম ছবি। নিজের কাহিনী এবং চিত্রনাট্য। এই ছবির সহকারী ক্যামেরাম্যান প্রনিল ঘোষ আমার সঙ্গে বীরেশ্বরবাবুর আলাপ করিয়ে দিলেন।

তখন শুটিং হচ্ছিল দিলীপ রায় ও মনিকা মুখার্জিকে নিয়ে। শুনলাম—সেটটা হচ্ছে জলপাইগুড়ির আধুনিক হোটেলের।

'এরই নাম প্রেম' গল্পটা শুনলাম। সিনেমার ভেতর সিনেমার গল্প। কুনালকুমার একজন খ্যাতনামা নায়ক। সে জলপাইগুড়িতে একটা ছবির আউটডোর শুটিং করতে এসেছিল। ছবিতে তার একটা ঘোড়ায় চড়ার দৃশ্য ছিল। আর সেটা চড়তে গিয়ে নায়ক হঠাৎ ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গিয়ে একটা মারাত্মক দুর্ঘটনা বাধিয়ে বসে। নায়কের অ্যাকসিডেন্টের ফলে সে ছবির শুটিং বন্ধ হয়ে গেল। অজ্ঞান অবস্থায় তাকে জলপাইতালে স্থানান্তরিত করা হলো। ডাক্তাররা পরীক্ষা করে মুখ গম্ভীর করলেন। সেই রাত্রেই কুনালের শরীরে একটা অপারেশন করতে হলো। শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর হাত থেকে কুনাল অব্যাহতি পেল। তারপর সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠে জানতে পারল এক অজ্ঞাতনামা মহিলা রক্তদান করার ফলে তার জীবন রক্ষা পেয়েছে। কুনাল তার কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্যে সেই মহিলার অনেক অনুসন্ধান করল। কিন্তু কোথাও তাঁর হদিস পাওয়া গেল না। এমন কি হাসপাতালের স্টাফেরা পর্যন্ত তাঁর সম্পর্কে কোন খবরাখবর দিতে পারল না।

পরিচালক বীরেশ্বরবাবু বললেন—এরপর নায়ক ও পূর্বস্মৃতিচারণের সিকোয়েন্স। মানে আমরা ফিল্মের প্রচলিত ভাষায় যাকে বলি 'ফ্লাশব্যাক প্রথা'।

কুনাল এই জলপাইগুড়িতেই ছেলে। আশৈশব অনাথ হয়ে সে কলকাতায় চলে যায় মামাবাড়িতে। সেখানে এক মেসে দয়ালবাবু নামে কোন মহৃদয় ভদ্রলোক তাকে আশ্রয় দেন। গান-বাজনার প্রতি কুনালের বরাবরই ঝোঁক ছিল। কলকাতায় দয়ালবাবুর নিরাপদ আশ্রয়ে এসে কুনালের গান-বাজনার প্রতি আগ্রহটা বেড়ে গেল। কুনালের গান শুনে সবাই মুগ্ধ হতো।

ইতিমধ্যে এক বড়লোকের মেয়েকে গান শেখাবার চাকরী জোগাড় করে ফেলল কুনাল। তার নাম ভাস্বতী। গানবাজনায় ভাস্বতীও অনেক সিরিয়াস। ফলে দুজনের মনের মিল হতে বেশী দেরী হলো না।

এখন ভাস্বতী যে কলেজে পড়তো সেখানে পঙ্কজ নামে একটি ছেলে ছিল সহপাঠী। মেয়েদের নিয়ে হৈটে করতে বসতে পঙ্কজ। বড়লোকের ছেলে। টাকা-পয়সার কোন অভাব নেই। তার এক পৈতৃক ব্যবসা ছিল ফিল্মের। পঙ্কজ চেয়েছিল ভাস্বতীকে নিয়ে একটু আহ্লাদ আহ্লাদ করবে। কিন্তু ভাস্বতী পঙ্কজকে কখনও তার কাছে ঘেঁষতে দেয়নি। পঙ্কজকে সে বরাবরই এড়িয়ে চলেছে।

এখন ভাস্বতীর জীবনে নতুন নায়কের আবির্ভাব হতে দেখে পঙ্কজ রীতিমত ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়ল। তাই নিয়ে অনেক নাটকীয় পরিস্থিতি সৃষ্টি হলো। শেষ পর্যন্ত কুনালের সঙ্গে ভাস্বতীর বিয়ে হয়ে গেল।

পঙ্কজ তখন এক কুটিল চাল চেলে বসলো। কুনালকে সে ফিল্মে নামবার আমন্ত্রণ জানালো। কুনাল চিরদিনই নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে। পঙ্কজের আহ্বানে সে ফিল্মে নায়ক হিসাবে যোগ দিয়ে বসল। ফলে, পঙ্কজ যেটা চেয়েছিল শেষ পর্যন্ত তাই হলো। অর্থাৎ ভাস্বতীর সংসারে ধীরে অশান্তি দেখা দিল।

তারপর একের পর এক নাটকের ঘনঘটা। কুনাল যোগ দিল অভিনেত্রীর সঙ্গে জড়িয়ে পড়ল। এদিকে সহ্য করতে করতে ভাস্বতী একদিন সকলের অগোচরে গৃহত্যাগ করল।

তারপর থেকে কুনাল ভাস্বতীকে অনেক খুঁজেছে। কিন্তু কোথাও হদিশ পায়নি। কুনাল এখন অনুতপ্ত। সে ভাস্বতীকে ফিরে পেতে চায়। ফিরে পেতে চায় তার হারানো সংসার রঙিন দিনগুলিকে। কিন্তু মানুষ যা চায়, সবসময় তা পায় না, এই হচ্ছে ট্রাজেডি।

কুনাল এসেছিল জলপাইগুড়িতে যত না ছবির টানে তার চাইতে অনেক বেশী প্রাণের টানে। এখানকার মাটিতে বাল্যকাল কেটে মিশে আছে তার বাল্যকালের নিশ্চিন্ত দিনক্ষণগুলি। তারপর ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গিয়ে ঘটিয়ে বসেছে বিরাট একটা অ্যাকসিডেন্ট।

স্টার
শনি রবি ও ছুটির দিন : ৩ ও ৬॥
প্রতি বৃহস্পতি ৬॥
ফোন : ৫৫-১১০১

বঙ্কিমচন্দ্রের
কৃষ্ণকান্তের উইল

প্রযোজনা : সহস্র গুপ্ত
নাট্যরূপ : কুনাল মুখোপাধ্যায়
নির্দেশনা : রঞ্জিত মল্লিক
আবহ-সঙ্গীত : বিশ্বনাথ রায়
গান ও সুর : চন্দ্রনাথ বসু

শ্রীঃ মহেন্দ্র গুপ্ত বঙ্কিম রোহিণী হরিধন নগেন্দ্র দিলীপ রায়চৌধুরী সতীশ সন্ধ্যা ভ্রমর কৃষ্ণকান্ত মনোরমা সুপ্রভা সূর্যমুখী কমলমণি ও শ্রীমতী চট্টোঃ

—বুকিং চলছে—

ভাবছেন কি?
টেলিভিসান?
আজই আসুন, দেখুন
শুনুন ও কিনুন
রেডিও, রেডিওগ্রাম, রেকর্ড প্লেয়ার, ট্রানজিস্টার রেডিও ও রেডিওগ্রাম, টেপ রেকর্ডার, রেকর্ড, পার্টস, রেফ্রিজারেটর ইত্যাদি নগদ ও কিস্তিতে কিনতে পাওয়া যায়।
মোহতেরও সুবন্দোবস্ত আছে।
রেডিও এণ্ড ফটো ষ্টোরস্
১৫, পলে স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩।
ফোন : ২৪-৪১৯০

CENTRAL LIBRARY

নন্দী বিধাতা কণিকা মজুমদার/সোমা দে

ফ্লাশব্যাক শেষ। এখন আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, জলপাইগুড়ির হোটেলের একটি ঘরে বসে ছবির প্রযোজক সুবিমলবাবু আর নায়ক কুনাল কথা বলছে। কম্পোজিট শট। দুজনের হাতে সিগ্রেট জ্বলছে। সুবিমল জানতে চাইছে—কী ব্যাপার মশাই, আবার ভাবতে বসলেন নাকি? না রাতের খাওয়া-দাওয়াটা ভাল হলো না—!

কুনাল বলে—না না, খারাপ হবে কেন?

সুবিমল : আহা তাইতো। আমি তো বেশ জমিয়ে খেলাম মশাই। পাহাড়ী হরিণের মাংস, বুঝলেন কিনা—শুধু, সেই জন্যেই তো পয়সা খরচা বেশী হলও একটা দিন ওখানে পড়ে আছি। ইয়ে, আপনার শরীর খারাপ বোধ করছেন না তো?

কুনাল : না না, আমার শরীর ঠিক আছে। এছাড়া জলপাইগুড়ি আমার নিজের জায়গা। আমার জন্মস্থান। এতদিন পরে সুযোগ যখন পেয়েই গেলাম তখন ঘুরতেই বেরিয়েছিলাম, বহু ঘনোকিরে দেখছি তাই আনন্দ হচ্ছে। ছোটবেলায় এইসব পথ ধরেই তো ঘুরে ঘুরে বেড়াতাম। কত কথা মনে পড়ে যাচ্ছে...

কুনাল অবশ্য তখনও ভাবছিল সেই রহস্যময়ী মহিলার কথা যিনি নিজের শরীরের রক্ত দান করে কুনালকে সাক্ষাৎ মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছেন। কে তিনি? তিনি কেমন দেখতে? কোথায় তিনি থাকেন? এইসব প্রশ্ন মাথার মধ্যে জট পাকাচ্ছিল কুনালের। জানতে তাকে হবেই।

—তারপর? কুনাল দেখা পেল সেই মহিলার? সুমার প্রশ্নের জবাবে মৃদু হাসলেন বীরেশ্বরবাবু। —নিশ্চয়! না হলে নাটক মিলনান্তক হবে কি করে। কুনাল একে একে সবাইকে ফিরে পাবে। দয়ালবাবুকে। ডাক্তারকে। আরো অনেককে।

হঠাৎ দিলীপ রায় উঠে দাঁড়ালেন। দাঁত তাড়াতাড়ি তাঁর দিকে এগিয়ে গেলেন পরিচালক।

দিলীপ বাবু বললেন—বীরেশ্বরবাবু, আমার যাবার সময় হয়ে এলো যে—

সঙ্গে সঙ্গে কব্জি উল্টে ঘড়ি দেখলেন বীরেশ্বরবাবু। —হ্যাঁ। আপনার তো আজ আবার থিয়েটার। ঠিক আছে। তাহলে এটাই আজকের মত লাস্ট শট করা যাক।

সঙ্গে সঙ্গে ফ্লোরে ব্যস্ততা দেখা দিল। ক্যামেরাম্যান তাঁর মিটার ঘরে দ্রুত আলোক সম্পাত করতে লাগলেন। পরিচালক তাঁর সহকারীদের নিয়ে চিনোটোর খাতা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন। ফ্লোর থেকে বেরিয়ে আসছি, বীরেশ্বরবাবু বললেন, স্যার, আজ একটু তাড়া রয়েছে দেখতেই পাচ্ছেন। প্লীজ অন্য একদিন আসবেন...

ঘাড় নেড়ে আমি ফ্লোর থেকে বেরিয়ে এলাম। তখন সূর্য পশ্চিম গগনে হেলে পড়ছে ধীরে ধীরে।

'এই নাম প্রেম' ছবির বিভিন্ন ভূমিকায় রূপায়োপ করছেন মাধবী চক্রবর্তী, দিলীপ রায়, তরুকুমার, সুব্রতা চ্যাটার্জি, মন্মথ মুখার্জি, সস্মিত চক্র, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, গীতা দে প্রমুখ শিল্পী।

চিত্রগ্রহণ, সম্পাদনা, শিল্প-নির্দেশনা এবং সংগীতপরিচালনা করছেন যথাক্রমে সুবোধ বানার্জি, মধু বানার্জি, সস্মিত সেন ও সত্যেন। নেপথ্যে গান গেয়েছেন শ্যামল মিত্র, শিপ্রা চট্টোপাধ্যায় ও আরতি মুখার্জি।

মুসাফির

শতবর্ষে শরণায়

২১ সেপ্টেম্বর, ১৮৮৪। পরমপুরুষ শ্রীশ্রীপরমহংস দেব এক্ষন চৈতন্যলীলা দেখতে। অভিনয় দেখছেন আর ভক্তরা সমাধিস্থ হচ্ছেন।

হরি নাম বল, হরি বিনে নাই,
হরি বল পাপ হবে ক্ষয়,
হরি নামে পাপ ভস্ম হয়,
ভুলো মন এমনে পরলে।

স্নানে গ্রহণ করার পর শচীমাতার কাছে বিদায় নিতে বিনোদিনীর কণ্ঠে যখন ধ্বনিত হয়ে ওঠে—

কৃষ্ণ বলে কাঁদ মা জননী,
কেঁদ না নিমাই বলে,
কৃষ্ণ বলে কাঁদিলে সকল পাবে
কাঁদিলে নিমাই বলে,
নিমাই হারাবে—কৃষ্ণ নাহি পাবে।'

ঠাকুর আনন্দ সমাধিস্থ হন। অভিনয় শেষে অন্যান্য শিল্পীদের সঙ্গে বিনোদিনী যখন ঠাকুরকে প্রণাম করেন, তিনি আশীর্বাদ করে বলেন : মা তোর চৈতন্য হোক।

পণ্ডিতা বিনোদিনী পেলেন মূর্ত ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদে। চৈতন্যলীলা দেখার পর ভক্তবৃন্দ ঠাকুরের মতামত চাইলে বলেন, 'আহা, আসল-নকল এক দেখলাম গো।'

চৈতন্যলীলা দেখে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী 'হরিবোল হরিবোল' বলে আত্মহারা হয়ে ওঠেন। আমার লাকে, বেইজ অ্যান্ড রায়ত সম্পাদক শম্ভুচরণ মুখোপাধ্যায়, মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ, কর্ণেল ওলকট পণ্ডিত মধুরানাথ পদরত্ন, তদানীন্তন কালের বিভিন্ন বিদগ্ধজন ও পত্র-পত্রিকা চৈতন্যলীলার প্রশংসায় মুখর হয়ে ওঠে। অভিভূত অভিমত রেখে যান চৈতন্য চরিত্র নাট্যসম্রাজ্ঞী বিনোদিনীর অলৌকিক অভিনয়ের।

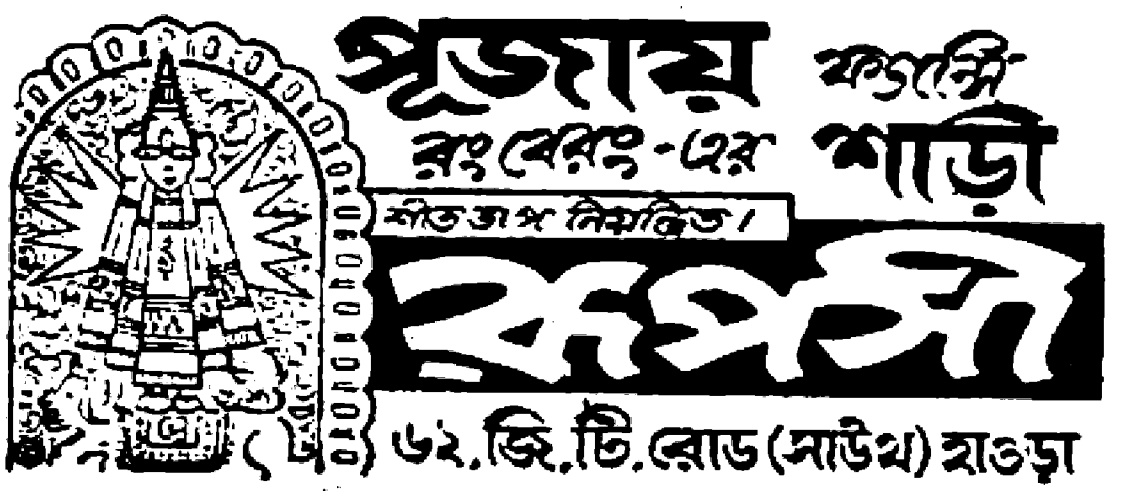

২২ নভেম্বর এলো প্রহ্লাদ চরিত্র। হিরণ্যকশিপু আর প্রহ্লাদ চরিত্রে অভিনয় করেন যথাক্রমে অমৃত মিত্র আর বিনোদিনী। অভিনয় দেখে ঠাকুর বলেন গিরিশচন্দ্রকে : সাবাস, আজকে তিনিই সব হয়েছেন। ১৪ ডিসেম্বর আবার প্রহ্লাদ চরিত্র দেখেন। এক্সট্রা অমৃতলালের নিমাই-বিয়োগও অভিনীত হয়। ঠাকুর কিন্তু বিবাহবিভ্রাটে দেখেন না। বিবাহবিভ্রাটে বিনোদিনী অভিনয় করেন কাননবালা চরিত্রে।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারী নিমাই সন্ন্যাসে বিনোদিনী নিমাই চরিত্রে অভিনয় করেন।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ২৫ ফেব্রুয়ারী বহু বেশ্যা পুনর্যাভিনয়ে ঠাকুর রঙ্গকুলের উপস্থিত থাকেন এবং অভিনয় দেখেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের যে মাসে গিরিশচন্দ্র বিদেশ প্রস্থান করেন। বিনোদিনী অভিনয়ে জানালেন সভাভামা চরিত্র। ১৯ সেপ্টেম্বর এলো বুদ্ধদেব চরিত্র। তাপসরূপে দেখা দিলেন বিনোদিনী। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১২ জুন মঞ্চস্থ হলো বিল্বমঙ্গল। চিন্তামণি চরিত্রে অভিনয় জানালেন বিনোদিনী। বিল্বমঙ্গল চৈতন্যলীলার জন্যই, মাতৃক নয়। কিন্তু এবার পার্বতীর চরিত্রে গলা-মণির কণ্ঠে গীত—

> আমায় নিয়ে বেড়ায় হাত ধরে
> যেখানে যাই, সেখায় পাছে:
> আমার বলতে হয় না জোর করে?

গানখানি সকলের মুখে মুখে শুনতে পাওয়া যেতে লাগলো। গঙ্গামণির প্রথমাভিনয় গিরিশচন্দ্রের প্রীতিই অভিজ্ঞান হলো বিনোদিনীর।

২৫ ডিসেম্বর, ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে বেঙ্গল থিয়েটারে বিনোদিনী অভিনয় করলেন রুক্মিণী চরিত্র।

১৮৭৪ থেকে ১৮৮১ মধ্যে ১২ বছর অভিনয় করে নাট্যসম্রাজ্ঞী বিনোদিনী অলৌকিক অভিনয় প্রতিভার যতখানি স্বাক্ষর রেখেছিলেন, শতবর্ষের ইতিহাসে অন্য কোন অভিনেত্রীর পক্ষেই তা অর্জন করা সম্ভব হয়নি।

গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার থেকে বেঙ্গল থিয়েটার—বেঙ্গল থিয়েটার থেকে পুনরায় গ্রেট ন্যাশনাল মানে ন্যাশনাল থিয়েটার—ন্যাশনাল থেকে স্টার থিয়েটার। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে গ্রেট ন্যাশনাল মঞ্চে যোগদান করে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে স্টার থিয়েটার থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ২৫ ডিসেম্বর বেঙ্গল থিয়েটারে রুক্মিণী চরিত্রে বিনোদিনী অভিনয় করেন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের ১৪ জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারীতে বেঙ্গল থিয়েটারে অন্যান্য নাটকে বিনোদিনীর অংশ গ্রহণ করা স্বাভাবিক। বিশ্বস্ত সূত্রে থিয়েটারের পরবর্তী নাটক রূপ সনাতন বিবাহ, চরিত্রে বিনোদিনীই নির্বাচিত হন এবং মহড়াও চলে। বিনোদিনী থিয়েটার থেকে অবসর গ্রহণ করবেন—একথা জেনেই গিরিশ-চন্দ্র কিরণবালাকে দিয়ে চরিত্র এবং বিনোদিনী অভিনীত অন্যান্য চরিত্র তৈরী করে নেন। রূপসনাতন ২১ জুন ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে মঞ্চস্থ হয়। তাই অনুমান করা যায় ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের মার্চের পূর্বে বিনোদিনী মঞ্চ জগৎ থেকে বিদায় গ্রহণ করেননি।

রূপ ও রঙ্গ পত্রিকায় আমরা অভিনেত্রী জীবন সম্পর্কে যে অসম্পূর্ণ আত্মজীবনী প্রকাশিত হয়—তা লিখেছিলেন অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী। তাই বিনোদিনীর মূল রচনা থেকে রূপ-রঙ্গ পত্রিকার রচনা-শৈলীতে যেমন পার্থক্য আছে, তেমন পার্থক্য আছে তথ্যেও। অমৃতলাল চক্রবর্তী ছিলেন বিনোদিনীর জীবনীকে কেন্দ্র করে তাঁর আত্মজীবনীর মধ্য দিয়ে নাট্যশালার ইতিহাসের একটি দিককে লিপিবদ্ধ করতে। তা সম্ভব হয়নি নানা কারণে। অন্যতম কারণ পরবর্তীকালে রূপ ও রঙ্গের প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। রূপ ও রঙ্গ ছিল সাপ্তাহিক পত্রিকা। আর থিয়েটারের পরি-চালকদের অনেকেই পত্রিকার সম্পাদনার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। যেমন নির্মলচন্দ্র চন্দ্র, অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও অনেকে। প্রকাশক ও মুদ্রাকর ছিলেন জ্ঞানকীনাথ বসু। ১২৪।২।১ মানিকতলা স্ট্রীটস্থিত গঙ্গাধর প্রিন্টিং ওয়ার্কস লিমিটেড থেকে পত্রিকাটি মুদ্রিত হতো।

বর্তমান প্রসঙ্গে আমরা সেসব উদ্ধৃতি ব্যবহার করবো তা 'আমার কথা' গ্রন্থ থেকেই। গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারেই বিনোদিনীর মঞ্চ জীবনের সূত্রপাত। গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী ছিলেন ভুবনমোহন নিয়োগী। ন্যাশনাল থিয়েটারেও ভুবনবাবু অনাদৃত উপেক্ষিত। গঙ্গার ধারে ভুবনবাবুদের বাড়ীতে নীরা সম্পর্কের সময় থেকেই বিহার্সেল বসতো। সদ্য লিখিত কর্ণার্জুন নাটকের অনেক গ্রেট ন্যাশনাল নেয়ে নিয়ে অভিনয় সুরু করেন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে বেঙ্গল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্ব পর্যন্ত পেশাদার রঙ্গমঞ্চে অভিনেত্রী নিয়ে অভিনয় করার রেওয়াজ ছিল না। কিন্তু বহু স্বাধীন সম্প্রদায় যারা যাত্রা পালা বা কীর্তনের দল করতেন—তাঁদের দলে মেয়ে থাকতো। এই সব দল থেকে অনেক থিয়েটারে আসতেন। বেঙ্গল থিয়েটারও অভিনেত্রী নেবার সময় এদের সাহায্য নিয়েছিলেন। গ্রেট ন্যাশনালের কলকেতলার বস্তি ছিলেন একজন নৃত্য শিক্ষক ও অপেরা প্রাক্টার। সতী কি কলঙ্কিনীর সময় তিনি গ্রেট ন্যাশনালে ছিলেন। বিনোদিনীদের বাড়ীতে তখন গঙ্গা বাইজী ভাড়াটে। বয়সের পার্থক্য থাকলেও গঙ্গা বাইজী বা গঙ্গা-মণির সঙ্গে বিনোদিনীর সখ্যতা গড়ে ওঠে এবং ইতিহাসে উভয়কে গোলাপ বলে ডাকতেন। পূর্ণ মুখোপাধ্যায় আর ব্রজনাথ শেঠ একটি সৌখীন সংস্থা থেকে সীতার বিবাহ পালা অভিনয় করতে হাজির হয়েছিলেন আর এই উপলক্ষেই তাদের গঙ্গামণির বাড়ী যাতায়াত। গঙ্গামণির গৃহেও তাদের নৃত্য-গীতের রিহার্সেল বসতো। বিনোদিনী রিহার্সেল শুনতেন। সংগীত বা অভিনয়ে বিনোদিনীর আগ্রহ ও গঙ্গামণির আগ্রহ জেগেই। বিনোদিনীদের আর্থিক দুরবস্থার কথা শুনেই পূর্ণবাবু গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে ১০ টাকা মাইনেতে ভর্তি করিয়ে দেন। বিনোদিনীর স্মরণ তখন এগার বছর। বিনোদিনীর প্রতি সবাই সহানুভূতিশীল ছিলেন। রাজকুমারী ও নিজের পয়সায় জামা কিনে দিয়েছিলেন, রাজকুমারী, কেত্রমণি, অঘোরমণি নাম্নী পুরুষের নাম ধ্যাত ও প্রতিপত্তি দেখে তাদের সমকক্ষ হবার স্বপ্ন বিনোদিনীকে পেয়ে বসে। তাই পরম আগ্রহ ভরে অভিনয় শিক্ষা করতে থাকেন। পূর্ণদাস সুর অবিনাশ কর মহেন্দ্রলাল বসু রাধামোবিন্দ ও রাধামাধব কর অর্ধেন্দু মুস্তাফী অমৃত মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু) এবং অন্য অভি-নেতারা বিনোদিনীকে ভালবাসতেন। প্রয়োজন মত উপদেশ দিতেন।

(ক্রমশঃ)

কালীশ মুখোপাধ্যায়

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুধাংশু সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস ১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

অমৃত

সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

১২ মার্চ ১৯৭৬ ॥ ... অন্তরিক্ষ বিমান

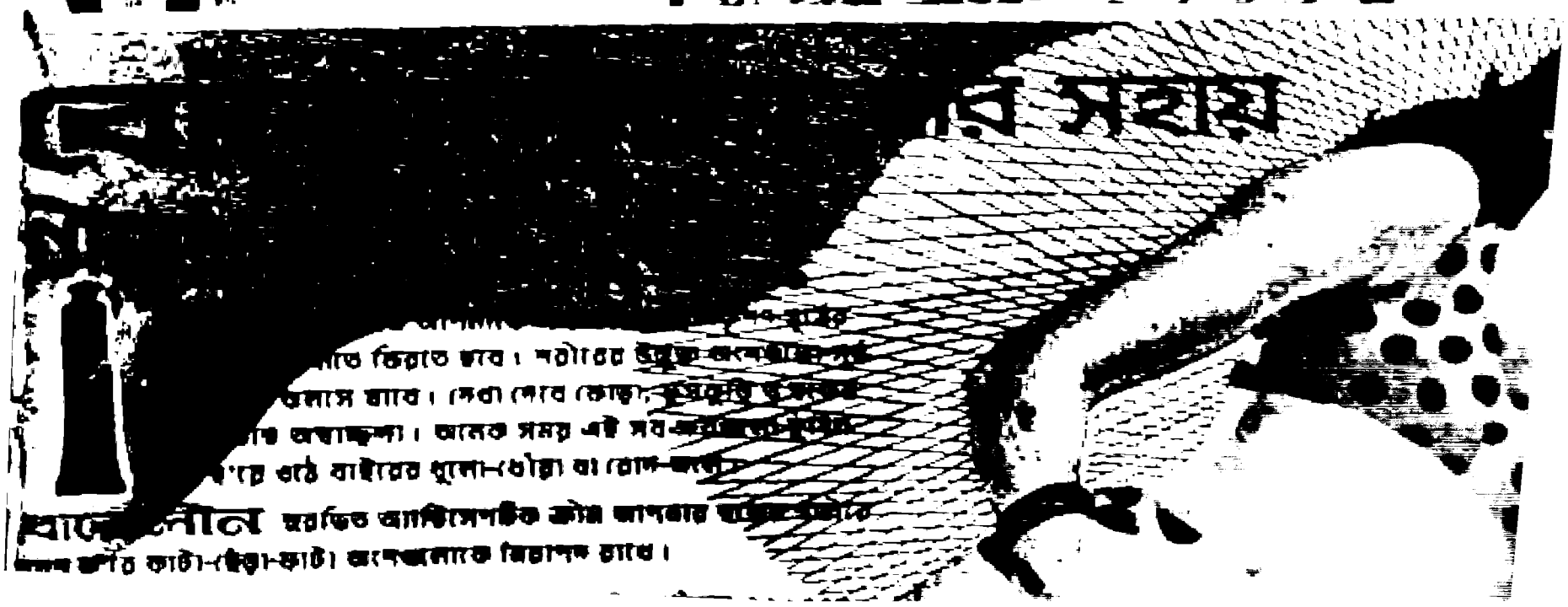

CENTRAL LIBRARY

কেশীর ভাগ হেয়ার ডাই কিকে হয়ে যায় কারণ
তা কেবল চুলের ওপরের স্তরই ডাই করে...

ট্রু-টোন

প্রত্যেক চুলের গভীরে পৌঁছে...
আপনাকে দেয় অনেক দীর্ঘস্থায়ী স্বাভাবিক রূপ!

ট্রু-টোনের বিশেষ ফরমুলা চুলের ওপরের স্তরকে কিউটিকল্ খুলে দিয়ে, ডাইকে চুলের কেন্দ্রভাগের কর্টেক্স-এ পৌঁছে দেয়— যা চট করে ডাই ধরে নেয়।
ট্রু-টোন সৃষ্টি করেছেন হেলীন কার্টিস— কেশ রসায়ন জ্ঞান যাঁদের সবচেয়ে বেশী!

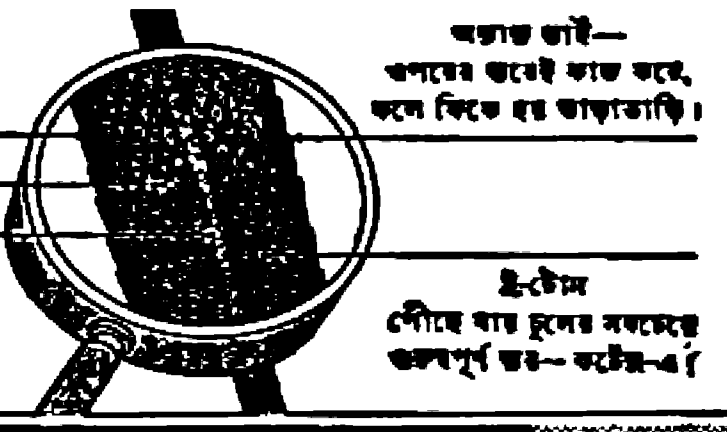

তরল হেয়ারডাই

ট্রু-টোন তরল হেয়ারডাই আর পড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ে না এমন ট্রু-টোন ক্রেম যেটি খুশি বেছে নিন।
দুটিতেই আছে হেয়ার কণ্ডিশনার যা আপনার চুলকে রাখে নরম, উজ্জ্বল আর সুবিন্যস্ত!

এই প্রথম চুল ডাই করার কথা ভাবছেন? বিনামূল্যের পুস্তিকা "হেয়ার ডাই: এক্সপার্ট"-এর জন্যে এখানে লিখুন—
জে. কে. হেলীন কার্টিস লিঃ, জে. কে. বিল্ডিং, বম্বে ৪০০ ০৩৮

ক্রেম হেয়ারডাই

গায়ের কালো আর খয়েরী, গুরুদের জন্যে বিশেষ শ্যাড

এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন:

জি. এথারটন এণ্ড কোঃ প্রাঃ লিঃ, কোলকাতা, পাটনা, গৌহাটি, কটক এবং ভিলাই।

॥ আমাদের নতুন স্বাদের গ্রন্থরাজি ॥

॥ রচনাসম্ভার ॥

প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত

বিদ্যাসাগর রচনাসম্ভার	২০৲
দ্বিজেন্দ্রলাল রচনাসম্ভার	২০৲
দীনবন্ধু রচনাসম্ভার	১২৲
হেমচন্দ্র রচনাসম্ভার	১২৲
রমেশ রচনাসম্ভার	১২৲
ভূদেব রচনাসম্ভার	১২৲

॥ ভ্রমণ ॥

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	—	কাবেরী কাহিনী	৭৲
প্রবোধকুমার সান্যাল	—	উত্তর হিমালয় চরিত	১১৲
লক্ষ্ণ মহারাজ	—	তমসার তীরে তীরে	১৬৲
অবধূত	—	উদ্ধারণপুরের ঘাট	১২৲
কমলা মিত্র	—	কাশ্মীর থেকে কুমারিকা	৭৲
প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়	—	অবধূত ও যোগীসঙ্গ	৯৲
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	—	পশ্চিমের যাত্রী	৫॥

॥ শ্রেষ্ঠ গল্প ॥

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প	১২৲
গজেন্দ্রকুমার মিত্রের শ্রেষ্ঠ গল্প	৮॥
বিমল মিত্রের শ্রেষ্ঠ গল্প	৮৲
জরাসন্ধের শ্রেষ্ঠ গল্প	৮৲

॥ ধর্ম ও জীবনী সাহিত্য ॥

প্রমথনাথ বিশী	মাইকেল মধুসূদন	৮৲
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	কবি শ্রীরামকৃষ্ণ	১০৲
মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়	গগনেন্দ্রনাথ	৬॥
ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ	ধর্মে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য	৬॥

॥ কবিতা ॥

শ্রেষ্ঠ কবিদের কবিতার সংকলন	ঐকতান	২॥
যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত	যতীন্দ্র কাব্যসম্ভার	১২॥
প্রমথনাথ বিশী	হংসমিথুন	২॥
করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়	শতনরী	৫॥

॥ কিশোর গ্রন্থাবলী ॥

সুমথনাথ ঘোষ	১০৲
দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার	৪॥
গজেন্দ্রকুমার মিত্র	৫৲
সুখলতা রাও	১০৲

প্রকাশিত হয়েছে :—

হায়নার দাঁত — গজেন্দ্রকুমার মিত্র ৬৲

বন্ধনে ফেরা — হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ৭॥০

পলাতক সৈনিক — আশাপূর্ণা দেবী ৭॥

পরিবর্তনে অপরিবর্তনীয় — সৈয়দ মুজতবা আলী ৯৲

মনে মনে খেলা — সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ৬॥০

॥ প্রকাশের পথে ॥

সমরেশ বসুর — সূর্যতৃষ্ণা ১০৲

নারায়ণ সান্যালের — নক্ষত্রলোকের দেবতাত্মা ১২৲

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের — রঙিন সাঁকো ৬॥

বাণী রায়ের — জনারণ্যে একমুখ ১৫৲

নতুন মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে :—

সুখলতা রাও-র

নানান দেশের রূপকথা ৬৲

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের

সাত পাকে বাঁধা ১০৲

প্রমথনাথ বিশীর

পূর্ণাবতার ২০৲

প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়ের

তন্ত্রাভিলাষীর সাধু সঙ্গ(১ম) ২০৲

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

গল্পা বেগম ১২৲

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কল-১২ ৩৪-৩৪১২
৮৬।১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কল-৯ ৩৪-৮৭৯১

প্রতি মঙ্গলবার রেডিওতে রাত ৮-৪৫ মিনিটে 'বিবিধ ভারতী' শুনুন—'মুখোমুখি'

১৫ বর্ষ

অমৃত

সংখ্যা ৪১

"ইণ্ডিয়ান অ্যান্ড ফ্রেঞ্চ নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য"

Friday, 12th March, 1976

শুক্রবার ২৮ ফাল্গুন ১৩৮২

পৃষ্ঠা	বিষয়	লেখক
৬	সম্পাদকীয়	
৭	সারারাত (গল্প)	শ্রীতারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়
৭	সাহিত্যের সেপাথ্যে	শ্রীশান্তিলতা চট্টোপাধ্যায়
১০	এই বাংলার ঘরে	শ্রীদেবব্রত
১১	বাঁদরের কথা	শ্রীপাণ্ডবরাজ
১৩	অন্য শেষ রজনী (উপন্যাস)	শ্রীশ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়
৭	নতুন বই	
৯	সূর্যের আগুন	শ্রীসন্ধ্যা সেন
১২	ঘুমন্ত রিসিভার (কবিতা)	শ্রীকৃষ্ণ ধর
১২	প্রাণের কোহলে (কবিতা)	শ্রীগুণ বর্মন
১২	স্বপ্নের দুটি কবিতা (কবিতা)	শ্রীশিশির দত্ত

চতুর্থ মুদ্রণ প্রকাশিত হ'ল

অগ্নিযুগের পটভূমিকায় লিখিত **বিপ্লব বিশ্বাসের** অবিস্মরণীয় গ্রন্থ

বিপ্লবী সূর্য সেন ৫৲

সত্যেন্দ্রনাথ বসু ৪৲ | বীর বিপ্লবী রাঘা যতীন ৬৲
বীর সাভারকর ও ধীংড়া ৪৲ | বিপ্লবী সতীন সেন ৫৲
অনশন শহীদ যতীন দাস ৪৲ | ভক্তকবি দ্বিজেন্দ্রলাল ৪৲
স্বাধীন বাংলা দেশ ও ভারত ৭৲ | বিশ্বয়ে বাঙলা ৬৲

শৈলেশ দে'র স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিকায়

যেন ভুলে না যাই ৮৲

বিনয় - বাদল - দীনেশ ৭৲ | ক্ষমা নেই ৫৲

বিশ্বাস পাবলিশিং হাউস ৫।১এ, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

কলেজ পাঠ্যপুস্তক

দর্শন (Philosophy)

অধ্যাপক প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত প্রণীত

ভারতীয় দর্শন—
১ম খণ্ড—৮ম সংস্করণ 12.00
ভারতীয় দর্শন—
২য় খণ্ড—৩য় সংস্করণ 7.00
ভারতীয় দর্শন—৩য় খণ্ড
(বেদ ও উপনিষদ) 7.00
পাশ্চাত্য দর্শন—১১শ সং 12.00
নীতিবিজ্ঞান—৮ম সংস্করণ 12.00
সমাজদর্শন—৯ম সংস্করণ 12.00
মনোবিদ্যা—৭ম সংস্করণ 22.00
Hand Book of Social Philosophy—2nd ed. 16.00
পাশ্চাত্য দর্শনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—(বেকন-হিউম)
—৩য় সংস্করণ 12.00
পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস (কান্ট) 7.00
ধর্মদর্শন (Philosophy of Religion) 22.00
সমাজ-মনোবিজ্ঞান (Social Psychology) 10.00
অধিবিদ্যার কয়েকটি সমস্যা 6.00

শিক্ষা (Education)

অধ্যাপক অতেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত

শিক্ষাতত্ত্ব—৩য় সংস্করণ 14.00
ভারতের শিক্ষা সমস্যা—
—৩য় সংস্করণ 15.00
অধ্যাপক সেনগুপ্ত ও রায় প্রণীত
শিক্ষা মনোবিজ্ঞান—৬ষ্ঠ সং 22.00
শিক্ষক শিক্ষণ (B.Ed., Basic)
অধ্যাপক গৌরদাস হালদার প্রণীত
শিক্ষণ প্রসঙ্গে পদ্ধতি ও পরিবেশ 16.00
শিক্ষণ প্রসঙ্গে অর্থনীতি ও গৌরবিজ্ঞান 14.00
শিক্ষণ প্রসঙ্গে ইতিহাস 15.00
ভারতের শিক্ষা সমস্যা
(প্রাচীন ও মধ্যযুগ) 4.00
অধ্যাপক হালদার ও রায় প্রণীত
শিক্ষণ প্রসঙ্গে শিক্ষার ইতিহাস 16.00
অধ্যাপক সেনগুপ্ত, রায় ও ঘোষ প্রণীত
শিক্ষণ প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞান
—৩য় সংস্করণ 25.00
অধ্যাপক ঘোষ ও রায় প্রণীত
শিক্ষণ প্রসঙ্গে শিক্ষাতত্ত্ব 16.00

ব্যানার্জী পাবলিশার্স

BP

৫।১এ, কলেজ রো
কলিকাতা-৭০০০০৯
ফোন : ০৪-৭২০৫

গাড়ি চালকদের প্রতি আবেদন

অহেতুক প্রাণহানি ঘটাবেন না

যেসব লেভেল ক্রসিং-এ গেটম্যান নেই, সেখানে

- থামুন
- দেখুন
- তারপর পার হয়ে যান

পৃষ্ঠা	বিষয়	লেখক
৩০	গোধূলিয়া (উপন্যাস)	শ্রীনিমাই ভট্টাচার্য
৩৭	তেলুগু নাটকে সমাজ চিন্তা	শ্রীদিলীপকুমার মিত্র
৪০	বিজ্ঞানের কথা	শ্রীঅয়স্কান্ত
৪২	চিঠিপত্র	
৪৩	শিশু (গল্প)	শ্রীদিলীপ ঘোষ
৪৭	পুনশ্চ	শ্রীক্ষপণক
৪৮	টেলিভিশন, বই প্রকাশ ও বই বিক্রী	শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য
৫০	অঙ্গনা	শ্রীঅঞ্জলি চৌধুরী
৫১	প্রদর্শনী	শ্রীচিত্তরসিক
৫২	মাঠ থেকে বলছি	শ্রীঅজয় বসু
৫৩	খেলাধুলো	শ্রীনর্দক
৫৪	চিত্রসমালোচনা	শ্রীমু
৫৪	সিনেমাটিক টক	শ্রীরঞ্জন মজুমদার
৫৯	কিছুক্ষণ	শ্রীনির্মল ধর
৬০	চিত্রমালোচনা	শ্রীচিত্রদাতে
৬০	স্টুডিও সংবাদ	স্টুডিও সংবাদদাতা
৬১	নেপথ্যে	শ্রীনিরীক্ষক
৬২	বি এফ জে-এর শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতি	
৬২	নাটমঞ্চ	শ্রীনাট্য সমালোচক
৬২	শতবর্ষের স্মরণীয়	শ্রীকালীশ মুখোপাধ্যায়
৬৪	বিবিধ সংবাদ	

প্রচ্ছদ: শ্রীমনোজ বিশ্বাস

ডাঃ প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়
লিখিত

আধুনিক চিকিৎসা

একমাত্র নির্ভরশীল
হোমিও বই

মূল বিক্রয়কেন্দ্র — আমাদের কলিকাতার চিকিৎসা কেন্দ্র-দ্বয় ও হেড অফিস।

চিকিৎসা কেন্দ্রদ্বয় : ১১৪-এ আশুতোষ মুখার্জি রোড কলি-২৫ এবং ৫৩ গ্রে স্ট্রীট, কলি-৬

হেড অফিস: ৩৬বি শ্যামা-প্রসাদ মুখার্জি রোড, কলি-কাতা-২৫

পাইকারী ক্রেতা / বিক্রেতাগণ হেড অফিসে যোগাযোগ করিবেন

বিখ্যাত ডাটা গুঁড়ো মশলার প্রস্তুতকারক কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুকমী) প্রাঃ লিঃ এখন আপনাদের দিচ্ছেন একটি নতুন অতি সুদৃশ্য টিনের কৌটায় সবরকম গুঁড়ো মশলার অপূর্ব সংমিশ্রণ

এক কৌটা ডাটা রেডিমিক্সড কিচেন কুইন পাউডার কিনলে আর কোনকিছু আলাদা এলাচ কি পেঁয়াজ, আদা, রসুন প্রভৃতি আলাদা কার আর দিতে হয় না। ডাটা রেডিমিক্সড কিচেন কুইন পাউডার মাছ, মাংস, ডিম ও সবরকম ঝটপট তরিতরকারি অল্প সময়ে চটপট রান্না করা যায়। আপনার সবরকম রান্নার জন্যই ডাটা রেডিমিক্সড কারি পাউডার (কিচেন কুইন পাউডার) ব্যবহার করুন।

ডাটা রেডিমিক্সড কারি পাউডার
কিচেন কুইন প্যাক

প্রস্তুতকারক: কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুকমী) প্রাঃ লিঃ
২০৭, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭, পোস্ট বক্স নং ৬৭৭৪.
ফোন: ৩৩-১৩৩৭, ৩৩-৩৭৯৮

PAM—KCD-74

CENTRAL LIBRARY

বই মেলা

বই মানুষের কিরকম সঙ্গী ও সান্ত্বনা তার বহু উদাহরণ আছে। প্রথম মহাযুদ্ধে ফ্লান্ডার্সের রণক্ষেত্রে পরিখার মধ্যে ইংরেজ কবি উইলফ্রেড আওয়েনের ট্রেঞ্চেতে পাওয়া গিয়েছিল গীতাঞ্জলির উদ্ধৃতি। অনুমান করা যায় যে, সেই নিদারুণ দুঃসময়ে প্রাচ্য কবির অসামান্য কবিতা তরুণ যোদ্ধাকবিকে সেদিন দিয়েছিল সান্ত্বনা ও আশ্রয়। গত মহাযুদ্ধে সোভিয়েট রণাঙ্গনেও রুশ সৈনিকের কাছে প্রিয় ছিল মায়াকভস্কি ও পুশকিনের কবিতার বই। বইয়ের মধ্যে যেটি প্রিয় তা মানুষের মনের সঙ্গী হয়ে থাকে আজীবন। সভ্যতার প্রধান মাপকাঠি হল এই মুদ্রিত বইয়ের প্রচলন ও জনপ্রিয়তা। সাহিত্য, বিজ্ঞান, চারুকলা যে কোনো বিষয়েই জ্ঞানের প্রসারের মাধ্যম হল বই। বই ছাড়া আমাদের একদিনও চলে না।

কলকাতায় ৫ মার্চ থেকে দিন দশকের জন্য সর্বভারতীয় বই মেলার আয়োজনে বইপ্রেমিকরা নিশ্চয় খুশি হবেন। সম্প্রতি দিল্লীতে একটা আন্তর্জাতিক বইমেলা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। সেই মেলার ফলাফল বেশ উৎসাহব্যঞ্জক অন্তত ভারতীয় প্রকাশকদের পক্ষে। সেখানে প্রতিদিন বিক্রি হয়েছে প্রচুর। বই কেনাবেচাও হয়েছে ভালই। বিদেশী বই প্রকাশক ও বিক্রেতারা ভারতীয় বই লেখে কেনবার ইচ্ছাও প্রকাশ করেছেন। আশা করা যায় এর ফলে বিদেশে ভারতীয় বইয়ের বাজার বাড়বে। আমাদের দেশে বইয়ের বাজার এখনও খুব সীমাবদ্ধ। তার একটা বড় কারণ। এখনও ইংরেজি বইয়ের কাটতি বেশি। জ্ঞানবিজ্ঞানের বই সাধারণত ইংরেজিতেই বেশি লেখা হয় এবং তার কাটতি সারা ভারতে। গল্প উপন্যাসের ক্ষেত্রেও ইয়োরোপের বা আমেরিকার বিশ্ববিখ্যাত লেখকদের বইয়ের জন্য চাহিদা আছে এবং থাকবেও। কেননা, তার বিকল্প এখনও ভারতীয় সাহিত্যে খুবই কম। তা ছাড়া ভারতীয় লেখকরা নিজেদের ভাষায় যা লেখেন তার অনুবাদের ব্যবস্থা না থাকায় অন্য ভাষায় লেখক বা পাঠক সে বইয়ের খোঁজও রাখেন না। তার ফলে নিজের মাতৃভাষার গণ্ডী ছাড়িয়ে যাবার সৌভাগ্য খুব অল্পসংখ্যক লেখকের ভাগ্যেই ঘটে। ভারতীয় লেখক ও প্রকাশকদের এই বাধা অতিক্রমের চেষ্টাও খুব একটা দেখা যায় না।

ভারতবর্ষের মতো বিরাট দেশে শিক্ষিত লোকের হার কম হলেও সব ভাষা মিলিয়ে পাঠকের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। অথচ বই-মেলাতেও দেখা যাবে ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত বইয়ের দিকে যত নজর থাকবে দশকদের নিজেদের মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোনো ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত বইয়ের দিকে তার বিন্দুমাত্রও থাকবে না। তার কারণ সে ভাষা তাদের কাছে সহজবোধ্য নয়, সে লেখকও তাদের কাছে অপরিচিতই বলতে গেলে। কেননা তাঁর কোনো লেখাই হয়তো পড়ার সুযোগ হয়নি তাদের।

এই মেলার উদ্যোক্তা হলেন কলকাতার প্রকাশকরা। সারা ভারতের লেখক ও প্রকাশকদের সঙ্গে সংযোগসেতু তৈরি করার এই হল একটা সুযোগ। স্কুল-কলেজ-য়ুনিভার্সিটির জন্য পাঠ্যবইয়ের চাহিদা অবশ্যই অন্যান্য বইয়ের তুলনায় বেশি। কিন্তু উচ্চমানের পাঠ্য বইয়ের জন্যও বিদেশের দিকে আমাদের চেয়ে থাকতে হয়। কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় উচ্চমানের পাঠ্যবই, কলেজ ও য়ুনিভার্সিটির জন্য, রচনা ও প্রকাশের নির্দেশ দিয়েছেন। তার জন্য অর্থও বরাদ্দ আছে। এদিকেও প্রকাশক ও লেখকদের দৃষ্টি দেওয়া উচিত। কারণ, জ্ঞানবিজ্ঞানের উচ্চমানের বই বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত না হলে আমাদের ভাষার ব্যবহারিক উপযোগিতা থাকবে সীমাবদ্ধ। তার প্রকাশক্ষমতাও বৈচিত্র্যসন্ধানী হবার সুযোগ থেকে হবে বঞ্চিত।

ভাল বই লেখা যেমন লেখকের দক্ষতা ও প্রতিভার পরিচয়, সে বই ভালোভাবে ছাপানোও প্রকাশকদের দক্ষতার স্বাক্ষর বহন করে। বিখ্যাত লেখক ইলিয়া এরেনবুর্গ একবার কলকাতায় বলেছিলেন যে বইয়ের প্রকাশনসৌষ্ঠবে ফরাসি প্রকাশকদের জুড়ি নেই। যেমন ছাপা, তেমনি বাঁধানো। ভারতীয় প্রকাশকদের এমন প্রশংসা কেউ কোনোদিন করেছেন কিনা জানি না। কোনো প্রকাশক তেমন প্রশংসা পেয়ে থাকলে তা নিশ্চয়ই গৌরবের কথা। বইয়ের প্রতি আগ্রহ বাড়াতে হলে তার ভিতরকার বস্তু যেমন খাঁটি হওয়া চাই তেমনি তার মুদ্রণ ও অঙ্গসজ্জাও সুশ্রী ও লোভন হওয়া বাঞ্ছনীয়। এ সমস্তই সম্ভব হবে যদি বইয়ের পাঠকসংখ্যা বাড়ে, গ্রন্থাগারের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ে এবং সাধারণ মানুষে বই কেনা এবং উপহার দেওয়াকে শিক্ষা ও রুচির পরিচয় বলে মনে করেন।

CENTRAL LIBRARY

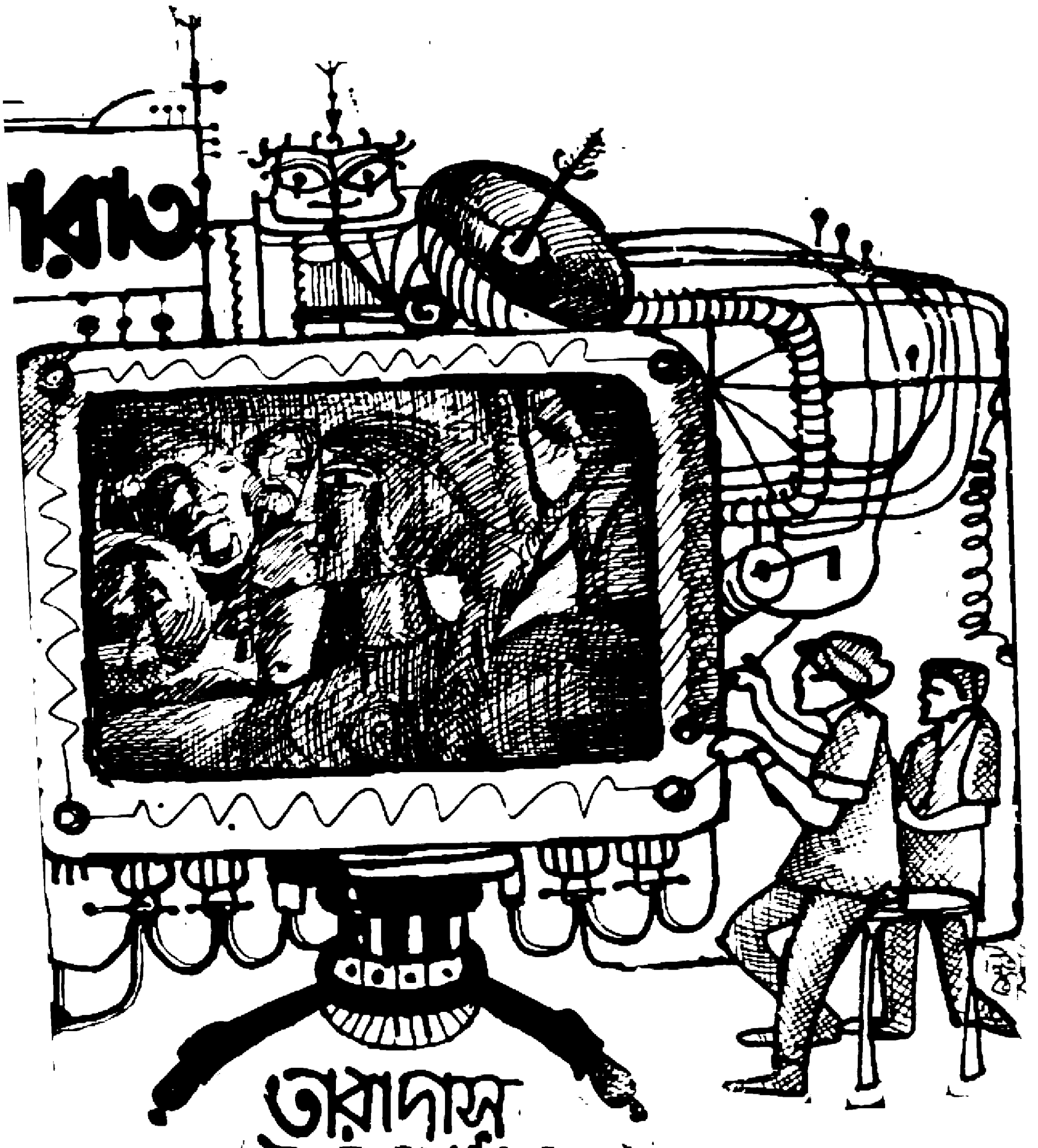

তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

কাজের একটা প্রাথমিক সফলতা এসেছে। বিদেশের কোনো কেনো মনীষী এ নিয়ে ভাবছেন বটে, কিন্তু বন্ধ দরজা প্রথম খুললো আমারই হাতের ছোঁয়ায়। এ চিঠি পড়া হয়ে গেলে টাইমটেবিল খোল প্রথম যে ট্রেন পাবি সেইটেই ধর। আমি নাচতে পারছি না, আমার প্রকৃতিতে নেই। তুই এসে আমার হয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠ। তবে নির্জনতার জন্য তৈরী হয়ে আসিস। এখানে শুধু পাহাড়-প্রান্তর-শাল সেগুনের বন—অনাবিল আকাশ—রৌদ্রের আর আমি।

...ন ওড়ালাম ...য়তে, কিন্তু ...। হয়ে গেল! ...া, বরং বলা ...হল। বড় ...ছি, এ চিঠি ...নে কি ঝড় ...দিনই আমি ...সত হয়ে ...মত কোনো ...গোছালো ...ছি—আমার

চিঠি বন্ধ করে পকেটে পুরলাম। ট্র... সেন যখন তাড়াতাড়ি খেতে বলে, তাড়াতাড়িই যাওয়া উচিত। অকারণে দ... হবার লোক সে নয়। যাবো। আজ রাত্রি ট্রেনেই। কিন্তু একটা জিনিস কেবল মা... ঢুকছে না। কি আবিষ্কার করলো অ... কিসের সাফল্য? রেডিও ফিজিক্সের ... মেলে কোনো একটা শাখায় তাত্ত্বিক ... মেলে কিছু নিয়ে ও গবেষণা করছিল। ... তার কিছুই বুঝি না। কলেজে ইং... কবিতা পড়িয়ে জাগতিক প্রোগ্রেস ক... আমাকে তবে ডাকে কেন?

ডাকে একমাত্র অন্তরঙ্গ বন্ধু, ... মনই জবাব দিল। আর কে আছে ওর

CENTRAL LIBRARY

ওকে বুঝবে? সে সব দিনের কথা কি ভুলে গিয়েছি। যখন কলেজে—ভার্সিটিতে পড়ি, মেসের বিছানার শুয়ে দুজনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়েছি নিভৃত আলাপে? স্বপ্ন দেখেছি ভবিষ্যতের, শুনেছি ওর প্রথম প্রেমের কথা? কেয়ার কথা?

টাইমটেবল বলল ট্রেন রাত দশটায়। একটা ছোট সুটকেশে সামান্য কিছু কাপড়-চোপড় এবং অন্যান্য টুকিটাকি গুছিয়ে নিলাম। তারপর একটা চেয়ার টেনে বসলাম আমার ছোট্ট বারান্দায়। নিচের রাস্তা দিয়ে চলেছে জনস্রোত ট্রাম, বাস ইত্যাদির মিছিল। শহরতলীর লোহার সাঁড়াশি দিয়ে গলা চেপে ধরে বটে, তবু মাঝে মাঝে বেশ লাগে বসে বসে অনেক মানুষের ভিড় দেখতে। বেঁচে আছি বলে মনে হয়। মানুষ অসংখ্য করে মানুষ অনেক ক্ষেত্রে অকৃতজ্ঞ, মানুষ হিংসুকে, পরশ্রীকাতর এবং আরো অনেক কিছু। কিন্তু এইরকম কোনো জায়গা থেকে দূরের জনসংঘটের দিকে তাকালে হঠাৎ বুঝতে পারি মানুষকে কত ভালোবাসি, মানুষ ছাড়া এক মুহূর্তও চলে না। অনেক দোষ থাকা সত্ত্বেও মানুষ মূলতঃ ভালো। তাকে ছাড়া বাঁচা যায় না।

এদিকে তাকিয়েই আমার মনে হল কেয়ার কথা। আর সে কোথাও নেই, কোথাও না। কোনোদিন জনতার ভিড় পথে চলতে তার সঙ্গে আর দেখা হয়ে যাবে না, কলেজের বইখাতা বগলে আর কখনো সে হাসিমুখে এগিয়ে এসে অশ্রুদের খবর জানতে চাইবে না।

মৃত্যু এসে তাকে, তার সুকুমার তনু-দেহকে তার হাসিকে কেড়ে নিয়ে গেছে জীবনের পরপারে কোন এক কুয়াশাভরা আলোআঁধারির রাজ্যে। আর সে আসবে না

কেবল একটি জিনিস মৃত্যু চুরি করে নিতে পারেনি। সে হচ্ছে আমার এবং অশ্রুদের বুকের মধ্যে তার স্মৃতি। অশ্রুদ বেশি করে। সে ভালবাসত কেয়াকে। বেঁচে থাকলে বিয়ে করত।

নিঃশ্বাস ফেলে ভেতরে এলাম। স্টোভে তেল ভরলাম। চাপিয়ে দিলাম ডিম, আলু, চাল। শরীর বড় অবশ। দুঃখ জগতে আছেই বড় প্রকটভাবে আছে। কিন্তু আমাকেও দুমুঠো খেতে হবেই।

অশ্রুদ নিজে স্টেশনে এসেছে আমাকে নিতে। ট্রেনের আওয়াজ মিলিয়ে আসতেই নির্জন পাহাড়ী স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে বাঁশির মত কণ্ঠস্বর বেজে উঠল—আনন্দ!

সুটকেশ হাতে ফিরে তাকালাম। এই কণ্ঠ পৃথিবীতে মাত্র একজনেরই আছে। ওই তো এগিয়ে আসছে অশ্রুদ। সেই একইরকম দেখতে আছে। অবিন্যস্ত চুল, ঈষৎ মুখাবয়ব, হয়ত বা ঈষৎ কর্কশ—কাঠিন্যের সঙ্গে কোমলত্বের আশ্চর্য সংমিশ্রণ। ঠিক ওর চরিত্রের মত। সুটকেশ নামিয়ে দুহাত বাড়িয়ে গিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরলাম। বললাম—তুই এসেছিস! তুই কি করে জানলি আমি আজ আসবো?

অশ্রুদ হাসলো। প্রাণখোলা সেই আলোকের হাসি নয়। কেয়া চলে যাওয়ার পর থেকে যে হাসি ওর হারিয়ে গিয়েছে।

কুয়াশায় ঢাকা দিগন্তে সূর্যোদয়ের মত এ এক ব্যথার আবরণে মোড়া হাসি। ও বলল—গতকালও আমি এসেছিলাম। আজ তুই না এলে আবার আগামীকাল আসতাম। যতদিন না আসতিস ততদিন তোর জন্য রোজ সকালে এসে আমি অপেক্ষা করতাম।

সূর্য ওঠেনি। প্ল্যাটফর্মে হী হী করছে হেমন্তপ্রভাতের হিমেল বাতাস। ইস্, আমাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য না জানি কোন্ ভোরে বেরিয়েছে অশ্রুদ। এতটা পথ গাড়ি চালিয়েও তো আসতে হয়েছে।

বললাম—চল্ অশ্রুদ, যাই।

ও বলল—হ্যাঁ, চল্।

ওর ছোট্ট লালরঙের ফোকসওয়াগনটা দাঁড়িয়ে আছে স্টেশনের বাইরে। পেছনে এঞ্জিন। নাকের ডগার ক্যারিয়ারে খুলে সুটকেশটা রাখলো অশ্রুদ। আমার দিকে তাকিয়ে বলল—দাঁড়িয়ে আছিস কেন হাঁ করে? গাড়িতে ওঠ।

সম্ভবতঃ সূর্য উঠছে পুবের ওই পাহাড়টার ওপারে। সেদিকের আকাশ রোদ্দুরের নরম রঙ মাখছে মুখে। হু হু করে চলছে গাড়ি। বাতাসের ঝাপটায় শুকিয়ে যাচ্ছে উইণ্ডস্ক্রীনের ওপর জমে থাকা হিমের কণা। দামী জার্মান গাড়ি, চললে শব্দ হয় না। তাই যখন অশ্রুদ কথা বলল, গাড়ির সামান্য আওয়াজের ওপরে ওর গলা পরিষ্কার শুনতে পেলাম। ও বলল—আমি কি নিয়ে কাজ করছিলাম তুই কিছু জানিস?

বললাম—কিছুমাত্র না। বুঝতে না পেরে বোকা হবার ভয়ে জিজ্ঞাসাই করিনি।

সামনে চড়াই, গাড়িটা লোয়ার গীয়ারে ফিয়ট্ করে অশ্রুদ বলল—আমি সত্যি কথা বলতে গেলে ঠিক কোনো কিছু নিয়েই গবেষণা করছিলাম না। আমি জানি আমার প্রতিভা আছে—ভালো ছাত্রের দক্ষতা নয়, নতুন কিছু সৃষ্টি করতে গেলে যে শক্তির প্রয়োজন হয়—যা ঈশ্বর জন্মমুহূর্তে জাতককে দান করেন কিন্তু হাজার অনুশীলনেও প্রাপ্তব্য নয় এমনিতে, সেই উদ্ভাবনী চিন্তা আমার মধ্যে আছে। কিন্তু তার সঙ্গে আরও একটা বস্তু রয়েছে, যার নাম খামখেয়ালিপনা। কি বলবো আনন্দ, এই যখন হেমন্তের বিকেল এখানকার মাঠে-প্রান্তরে গাঢ় হয়ে আসে, সূর্য পরাজিত নৃপতির মত মাথা নিচু করে সন্ধ্যার কোলে শুয়ে পড়ে বড়বাসিয়া ব্রেজের ওপাশে—তখন সমস্ত খ্যাতি-যশ-অর্থ এবং অন্যান্য পার্থিব কামনা মন থেকে দূর হয়ে যায়। কি একটা অনির্বচনীয় ব্যাকুলতা যে মনের মধ্যে জেগে ওঠে, সে আমি বোঝাতে পারি না! কত কি মনে আসে, পৃথিবীর ও বিশ্ব-প্রকৃতির কত অজানা রহস্য যেন একটুখানি ঘোমটা তুলে আবার মুখ ঢাকে। অন্য সব তার কাছে তুচ্ছ হয়ে যায়। এরই মধ্যে টুকটুক করে কাজ করে চলেছি। যখন যা মনে আসে তাই নিয়ে কাজ করি। ফলে কোনোটাই বেশি দূর এগোয় না। কিন্তু আসার সময় বড় খারাপ কাটে।

চিঠিতে যে বিষয়ের কথা লিখেছিস সেটা কি?

অশ্রুদ প্রথমে কোনো জবাব দিল না। চড়াই শেষ হয়ে রাস্তা সমান হয়ে এসেছে। দুদিকে উচ্চাবচ লাল মাটির ডাঙ্গা। কাছে দূরে অনেক পাহাড় আকাশে গলা বাড়িয়ে উঁকি দিচ্ছে। এই উদার মুক্ত প্রাকৃতিক দৃশ্যের সঙ্গে অশ্রুদের নীরবতা মিশে কেমন একটা রহস্যময় পরিবেশ ঘনিয়ে তুলল।

আবার বললাম—সেটা কি রে অশ্রুদ?

অশ্রুদ বলল—কেয়া মারা যাওয়ার পর থেকে একটা ভাবনা আমাকে কুরে কুরে খেত। প্রিয়জন চলে গেলে সবাই যা ভাবে। কি ভাবতাম জানিস? কবির ভাষায় বলতে গেলে তাহার শরীর থেকে শ্বাস ঝরে গেছে বলে তাকে ভুলে গেছে নক্ষত্রের অসীম আকাশ? ভাবতাম কেয়া যে বেঁচে ছিল, বেঁচে থাকার আঠাসোটি যুগের চারদিকে ছড়িয়ে দিয়েছিল জীবনের সৌরভ। তার হাসি, তার গান—এ সব কি চিরতরে লুপ্ত হয়ে গেল পৃথিবী থেকে? এ কি হয়? জীবনীশক্তিও তো একটা শক্তি। আমরা বিজ্ঞানের ছাত্র, বিজ্ঞানের অতি-প্রাথমিক একটি সত্য হচ্ছে এই যে শক্তি রূপান্তরিত হয় মাত্র—ক্ষয়িত হয় না। তাহলে জীবনী-শক্তি কোথায় যায়? সে যে হেসেছিল, কথা বলেছিল, গোলাপফুল তুলেছিল শীতের বাগান থেকে—এইসব শক্তি কোথায় মিলিয়ে গেল? অথবা আদৌ মিলিয়ে গেল কি? নাকি কোথাও রয়ে গেল আকাশ-বাতাসের ভেতর রূপান্তরিত অস্তিত্ব নিয়ে? বোধহয় এটাই সত্য। সমুদ্রগামী জাহাজের নাবিকেরা কখনো কখনো মাঝসমুদ্রে ভাসতে দেখেছে অষ্টাদশ শতকের প্রাচীন পালতোলা অদ্ভুত জাহাজ, যেমনটি এখন আর ব্যবহার হয় না। দূরবীণ দিয়ে স্পষ্ট দেখতে পেয়েছে সে জাহাজের লোকজন। তাদের গায়ে পুরণো দিনের বিচিত্র পোশাক। এরা সেমাফোর সিগনাল করে জানতে চেয়েছে তাদের পরিচয়, চিৎকার করে উঠছে নাবিকী ভাষায়—স্কুনার হো। তারা সাড়া দেয় নি। তারপর একসময় মিলিয়ে গিয়েছে ভেজবাজির মত। এমন অনেক ঘটনা জলে ডাঙ্গায় ঘটেছে। খুঁজে খুঁজে বের করে সেগুলো পড়লাম। যাঁরা বলছেন, তাঁরা কেউই বাজে লোক নন। কেউ জাহাজের কাপ্তেন, কেউ বা সামরিক বাহিনীর উচ্চ-পদস্থ কর্মচারী, কেউ নামকরা বৈজ্ঞানিক। কেন, তুই তো জানিস আনন্দ, পারমাণবিক বোমাবিধ্বস্ত হিরোশিমা—নাগাসাকিতে নানা রকম আশ্চর্য দৃশ্য দেখা যেত। এখনো মাঝে মাঝে দেখা যায়। যারা বোমা পড়ে মরে গেছে, তারা আবার মূর্ত হয়ে ওঠে সেখানে। দেখা যায় ছোট নদীর ওপর ছোট্ট একটা সেতু—তার ওপর দিয়ে জনস্রোত চলেছে, বাচ্চা ছেলেমেয়েরা চলেছে ইস্কুলে। বায়োস্কোপের পর্দায় ফুটে ওঠা ছবির মতই তারা অতি বাস্তব বলে ভ্রম হয়। যদিও তারা মারা গিয়েছে কত বছর আগেই। কিছুক্ষণ বাদেই এরা মিলিয়ে যায়। এসব

পড়ে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল যে কোন দৃশ্যই আবহমণ্ডল থেকে চিরকালের জন্য লুপ্ত হয়ে যায় না। বিশেষ বিশেষ অবস্থায় তা আবার ফুলমান হয়ে উঠতে পারে। ভাবলাম—এমন কোনো যন্ত্র আবিষ্কার করা যায় না কি, যার ভেতরে ওই বিশেষ অবস্থার সৃষ্টি করে অতীতকে আবার ফুটিয়ে তোলা যায়? অবশ্য তা বাস্তব হবে না, শুধুই ছায়া ও ধ্বনি—ধরাছোঁয়ার বাইরে। তবু দেখাই যাক না একবার চেষ্টা করে। না হয় শুধু ছায়াবাজিই হল।

অশ্রুপ থামল। আমি অবাক হয়ে শুনছিলাম আর কথার সঙ্গে সঙ্গে ওর মুখের ওপর দিয়ে ভেসে যাওয়া বিভিন্ন ভাবের প্রতিফলন দেখছিলাম। ও থামতে আমি বললাম—কি হল? থামলি কেন?

—আমরা এসে গেছি। এই আমার আস্তানা। বাকিটা ভেতরে গিয়ে বলব।

তাকিয়ে দেখলাম একটু উঁচুমত জমি, তার ওপরে রিফ্রেক্ট গ্রে রংয়ের ছোট বাড়ি। জানলা দরজা গাঢ় সবুজ রংয়ে পেন্ট করা। ছাদের ওপরে একটা বড় এ্যানটেনা বসানো। গাড়ি থেকে নামতে নামতে বললাম—তোর টেলিভিশনও আছে নাকি? কিন্তু এখানে তো কোথাও টেলিকাস্টিং সেন্টার নেই। তবে?

হাসতে হাসতে অশ্রুপ বলল—আমি যন্ত্রটা আবিষ্কার করে ফেলেছি আনন্দ। ওটা সেই যন্ত্রেরই এ্যানটেনা।

আমার মুখেও খুশির হাসি ছড়িয়ে পড়ল। বুঝতে পারলাম আমি ওকে কত ভালোবাসি। এবার অশ্রুপ সারা পৃথিবীতে বিখ্যাত হয়ে যাবে—এমন একটা আবিষ্কার: আর আমি সেই এ'দো কলেজে যাচ্ছেতাই মাইনেতে সারাজীবন কতকগুলো মাথা-মোটা ছাত্রকে শেলীর মিথ-মেকিং পাওয়ার বোঝাবার ব্যর্থ চেষ্টা করব। কিন্তু তার জন্য আমার অশ্রুপকে একটুও হিংসে করতে ইচ্ছে করল না। বরং এত খুশি হয়ে উঠল মনটা, যেন জিনিসটা আমিই আবিষ্কার করেছি।

সারাদিন আর কিছু বলল না অশ্রুপ। আমি অধীর উত্তেজনায় ছটফট করতে লাগলাম। কিন্তু ও বলল—পরে পরে। দুপুরে ঘুমিয়ে নে। আজ রাত্তির জাগতে হতে পারে। বিকেলে চা খেতে খেতে বাকিটা বলব।

সরু চালের ভাত এবং মিরচি ঝোল খেয়ে ভরাপেটে নরম অশ্রুপে একটুও দেরি হল না। ঘুমিয়ে যখন উঠলাম তখন চারদিকের প্রকৃতি বড় মায়াময় হয়ে উঠেছে। কি নির্জন রিক্ত ভূমিশ্রী! মাঠে মাঠে মাত্র যাচ্ছে শেষ হেমন্তবেলার রোদ্দুর, এখানে সেখানে চমকে উঠছে অভ্রের কুচি। লোকালয়ের চিহ্ন নেই কোনোদিকে, কেবল অনেক দূরে দিগন্তের গায়ে আঁকা রয়েছে একটি বনরেখা। এর মধ্যে কয়েকটি পাহাড় ছাড়া আর কিছু নেই। তাও নাড়া পাহাড়। অশ্রুপদের বাড়ির বারান্দায় বসলে চারদিকের এই ভূমিপ্রকৃতি সত্তর মিলিমিটার পর্দায় দেখা সিনেমার মত দৃশ্যকে যেন একেবারে গ্রাস করে ফেলে। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর স্পষ্ট একটু একটু করে বুকের ভেতর ঢুকে পড়তে থাকে। এই উঁচু বারান্দায় বসে আমরা চা খাচ্ছিলাম।

বললাম—তুই এখানে পাওয়ার পাস কোথা থেকে? চারদিকের মাঠে কোথাও তো ইলেকট্রিকের তার-টার কিছু আসতে দেখছি না কোনোদিক থেকে।

—আমি পাওয়ার নিজে তৈরী করে নিই। মাটির নিচে একটা ছোট্ট ঘরে জেনারেটর বসানো আছে। চব্বিশ ঘণ্টাই ওয়াট টোটাল আউটপুট। স্পেস্ট্রে চালাই। এখন থেকে তিন মাইল দূরে বিরহা বলে একটা জায়গা আছে। সেখানকার এক টিম্বার মার্চেন্ট ভদ্রলোক আমাকে স্পেস্ট্রে এনে দেন।

চায়ের পেয়ালা নামিয়ে রেখে অশ্রুপ বলল—একটা এমন ব্যাপার ঘটেছে আনন্দ শুনলে তুই অবাক হয়ে যাবি। শহরে এ কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। বলবে নেশা করে তোরাব দেখেছ। কিন্তু এখানে এই প্রান্তর পাহাড় নির্জনতার মধ্যে সে জিনিস কেন খাপ খেয়ে যায়। আদৌ অবাস্তব বলে মনে হয় না।

বললাম—ভূত দেখেছিস নাকি?

ঠাট্টা করিস না। ভূত দেখা নিয়ে আর আমি বাঙ্গ রসিকতার কখনো যোগ দেব না। অতীতের ঘটনার যদি অবস্থা-বিশেষে পুনরাভিনয় ঘটে, তাহলে আমরা ভূত দেখার একটা সহজ ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পেয়ে যাচ্ছি না কি? ওইরকম কিছু দেখলেই অজ্ঞ লোকে আতঙ্কে চেঁচিয়ে অজ্ঞান হয়ে যায়। তারা বোঝে না যে কি দুর্লভ একটা প্রাকৃতিক কাণ্ড তাদের সামনে সংঘটিত হল।

যাক সে। তুই আসল ব্যাপারটা বল—

স্বপ্নাদ্য মাদুলির বিজ্ঞাপন পড়েছিস তো? ছোটবেলার পাঁজিতে পড়তাম। আমার এটা বলতে পারিস তেমনি স্বপ্নাদ্য যন্ত্র। সেই পরিকল্পনাটা মাথায় এল যে, এমন একটা যন্ত্র তৈরি করা যেতে পারে, অমনি আমি তা নিয়ে ভাবতে শুরু করলাম। আমার খাওয়া-শোয়া মাথায় উঠে

বিনয় ঘোষের সদ্যপ্রকাশিত অবিস্মরণীয় গ্রন্থ

কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত

এই বই সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে প্রবীণ সাংবাদিক ও সাহিত্যিক শচীন্দ্রনাথ বসু যুগান্তর পত্রিকার মাধ্যমে বলেন: "কলকাতা শহরের ইতিবৃত্তকে বাঙালীর আত্মসমীক্ষার কাজ হিসাবে ধরে নিয়ে তার পটভূমিকায় এই আলোচনার উপসংহার টানতে গিয়ে ভাবছিলাম, এই কলকাতাকে হাতের মুঠো থেকে ছেড়ে দিয়ে বোধায় গিয়ে এখন দাঁড়াবে বাঙালী আত্মরক্ষার জন্য? কলকাতার জন্মবিকাশ অধ্যায়টি পড়তে পড়তে এই মহানগরী স্থাপনে ও তার বিস্তার সাধনে বাঙালীর মনের কথা বেশ অভিভূত হতে হয়।..." দাম: ৪৩-০০

শংকর-এর

মানচিত্র ১০-০০ এক যে ছিল ৩য় মুদ্রণ ৮-০০

রজতজয়ন্তী সংস্করণ এক যে ছিল শেষ নামে চলচ্চিত্রায়িত হচ্ছে।

রূপতাপস এক দুই তিন পাত্রপাত্রী সার্থক জনম

১২শ মুদ্রণ ৬-০০ ১৮শ মুদ্রণ ৬-০০ ১৬শ মুদ্রণ ৫-০০ ৭ম মুদ্রণ ৮-০০

বনফুলের নিমাই ভট্টাচার্যের

প্রথম গরল ৮-০০ পার্লামেণ্ট স্ট্রীট ৪র্থ মুদ্রণ ৮-৫০

স্মৃতির শেষ পাতায় ১০·০০ ॥ শ্রীদিলীপকুমার রায়

অপ্রকাশিত রচনাবলী ৮·৫০ ॥ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ভবঘুরে ও অন্যান্য ৬·৫০ ॥ সৈয়দ মুজতবা আলী

অতুলপ্রসাদ সেন ১০·০০ ॥ সুরেশচন্দ্র চক্রঃ সম্পাদিত

মস্কো থেকে দেখা ৬·০০ ॥ কৃষ্ণ ধর

রাজর্ষি রামমোহন ৬·০০ ॥ যমুনা নাগ

চাণক্য সেনের ননীমাধব চৌধুরী

তারারা শোনে না শুধু কথা শেষ অধ্যায়

(নাটিকা) ৩-০০ ২য় মুদ্রণ ৩-৫০ দাম: ১৬-০০

বুক-সাহিত্য প্রাইভেট লিমিটেড: ৩৩, কলেজ রো, কলকাতা-৯

গেল। সমস্তদিন শুধু বসে কল্প ওই একই চিন্তা করি। যে ঘটনা ঘটে গিয়েছে বহুদিন, এমনকি বহু কোটি বছর আগে, আর যে প্রতিরূপ অন্যের তরঙ্গ হিসেবে থেকে যাচ্ছে, সেই অতি ক্ষীণ আলোকতরঙ্গকে কি উপায়ে তন্ত্রস্থ করে তোলা যায়? শুধু তা করলেই হবে না, বহু ঘটনার ছবি যুগে যুগে অন্তরীক্ষমণ্ডলে সঞ্চিত হচ্ছে। এমন একটি টিউনার তৈরি করতে হবে যা দিয়ে টিউনিং করে আমি বিশেষ কোনো যুগের বিশেষ কোনো ঘটনাকে যন্ত্রের পর্দায় ফুটিয়ে তুলতে পারব। বিরাট কাজ, প্রায় অসম্ভব কাজ। কিন্তু আমি হাল ছাড়লাম না। যত ভালিয়ে চিন্তা করি, তত অসম্ভব বলে মনে হয়, আর যতই আমার জেদ বেড়ে যায়। শেষে একদিন আমার মনে হল এই বিশ্বতাপুরুষের একটা চ্যালেঞ্জ। যতই অসম্ভব হোক, আমাকে এই চ্যালেঞ্জ হাসিল করতেই হবে। আমি বাড়ি থেকে বেরুনো ছেড়ে দিলাম। পড়ার ঘরের টেবিল ছেড়ে পরতপক্ষে নড়ি না। রাত জাগবার জন্য কালো কফি খেতে শুরু করলাম। কিন্তু কিছুতেই আর যন্ত্রের পুরো গঠনটা মাথায় আসে না। তাছাড়া আর একটা বিশাল বাধা সামনে এসে উপস্থিত হল। এ-ধরনের যন্ত্র খুব উচ্চশক্তিসম্পন্ন একটা ট্রান্সমিটার বা ক্রিস্টাল দরকার হবে। বাজারের সাধারণ রেডিও বা টেলিভিশনে যেগুলো লাগে, তাতে আমার কোনো কাজই হবে না, আরো অনেক, অনেক উঁচুদরের ক্রিস্টাল চাই, যা কোটি বর্ষ আগের অবলুপ্তপ্রায় তরঙ্গকে দৃশ্যমান করে তুলতে পারবে। সেটা কাজ নয়। কি করে তেমনটি আমি পাই? কি করে যন্ত্রের নকশা? কোনদিক থেকে ধরব কাজটা, তাই যে বুঝতে পারছি না। সূর্য ওঠে, ডুবে যায়। রাত আসে, জ্যোৎস্নার খই ফোটে বাইরের মাঠে। আমি অবোধ শিশুর মত সেইদিকে তাকিয়ে থাকি। মনে মনে বলি—হে পরমাপ্রকৃতি! বলে দাও কি করে পাবো? কি করে হবে? পাগলের মত হয়ে উঠলাম। একদিন মনে হল—নাঃ, আজকের দিনটা বিশ্রাম নেওয়া উচিত। এত পরিশ্রম অসুখে পড়লে কাজ যে পিছিয়ে যাবে! সেদিন রাত্তিরে খেয়েদেয়ে আরাম করে দানিকেনের একটা বই হাতে বিছানায় শুয়ে পড়লাম রাত নটা নাগাদ। দানিকেন বলছেন পৃথিবীতে সুরপাটীত কাল থেকে বহুবার বহির্বিশ্ব থেকে বুদ্ধিমান প্রাণী এসে নেমেছে মহাকাশযানে করে। তাদের আগমনের চিহ্নও তারা ছড়িয়ে রেখে গিয়েছে অনেক জায়গায়। মধ্যপ্রাচ্যে পাওয়া গিয়েছে একটা ব্রঞ্জযুগের প্রাগৈতিহাসিক ব্যাটারি—ব্যাটির তলায়। এরোপ্লেনের মডেল, সমুদ্রের তলায় পাওয়া গিয়েছে এ্যাস্ট্রোলের জাতীয় বস্তু। মধ্যে লিয়ায় কয়েকটি পাওয়া গিয়েছে ডাইনোসরের একটা অস্থীভূত মাথার খুলি, খুলির ঠিক মাঝখানে একটা বুলেটের গর্ত! ডাইনোসরের পৃথিবীতে বিচরণ করত সাত-আট কোটি বছর আগে। তখন মানুষ তো দূরের কথা, স্তন্যপায়ী প্রাণীরই উদ্ভব হয়নি। তা হলে বন্দুক দিয়ে ডাইনোসোর মারল কারা? গ্রহান্তরের প্রাণীরাই নিশ্চয়। মানুষের কাজে আসতে পারে, এই ভেবে তারা পৃথিবীর অনেক জায়গায় অনেক জিনিস লুকিয়ে রেখে গিয়েছিল। কিছু পাওয়া গিয়েছে—কত যে আরো রয়েছে কে জানে!

পড়তে পড়তে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি তা জানি না। ঘুমের মধ্যে সে-রাতে এক আশ্চর্য স্বপ্ন দেখলাম। কোথায় যেন একটা বিরাট ল্যাবোরেটরির মধ্যে একা দাঁড়িয়ে আছি। কি বিশাল সেই গবেষণাগার। এদিক-ওদিক দেখা যায় না। কত অদ্ভুত অদ্ভুত কলকব্জা বিচিত্র ছন্দে স্পন্দিত হচ্ছে। কত ঘড়ি, কত ডায়াল, কত চকা। আর আমার ঠিক সামনে একটা রেডিওগ্রামের মত বড় যন্ত্র। তার পেছনের ডালাটা খোলা। আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি, হঠাৎ কানের কাছে গমগম করে উঠল একটা গলা—দেখে নাও সব। তোমার সামনে রয়েছে সেই যন্ত্র, যা তুমি আবিষ্কার করবার চেষ্টা করছ। ভাল করে দেখ, মুখস্থ করে নাও। ভুল যেন না হয়। দেখ—দেখ—দেখ—দেখ—

আমার সামনে কত অজস্র সার্কিট, কত তার, অসংখ্য ভাল্‌ভ। বিচিত্র বর্ণাংশের বিভ্রান্তিকর জটিলতা। যে-কোনো মানুষ বুদ্ধি হারিয়ে ফেলবে অত জটিল ইলেকট্রনিক গাজেটের সামনে। কিন্তু হঠাৎ যেন আমার মনের ক্ষমতা ও স্মৃতিশক্তি হাজারগুণ বেড়ে গেল। আমি যেন হাজারটা চোখ, হাজারটা মন দিয়ে বুঝে নিতে লাগলাম সমস্তটা। সবগুলো সার্কিট আমার মুখস্থ হয়ে গেল, সব খুঁটিনাটি বুঝে নিলাম। সব যেন চুম্বকের মত বসে গেল মনে। বুঝতে পারলাম এ আর আমি কখনো ভুলবো না। আর একটা কি দেখলাম জানিস?

—কি?

—দেখলাম ওই বিরাট যন্ত্রের মধ্যে এক জায়গায় বসানো রয়েছে একটা বড় ক্রিস্টাল। অদ্ভুত আকৃতির। আমি সেরকম কখনো দেখিনি। যাই হোক, সবটা যখন দেখা হয়ে গেল, তখন আমি স্বপ্নের মধ্যেই বললাম—দেখা হয়েছে। আর আমি ভুলব না। অমনি সেই কণ্ঠস্বর ফের গমগম করে উঠল—বাইরে চল। এবার তোমাকে সেটা দেখিয়ে দিই।

'সেটা' যে কি, তা আমি বুঝলাম না। কে যে কিভাবে আমাকে আদেশ করছিল তাও বুঝতে পারলাম না। কিন্তু স্বপ্নের মধ্যেই কেমন করে যেন পথ চিনে বাইরে এলাম। এসে দেখি আমার বাড়ির সামনের এই মাঠটা, যেটা দুই সমানে দেখতে পাচ্ছিস। বিরহার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি স্বপ্নের ঘোরে। একটু গিয়েই ডাইনে পড়ল ওই টিলাটা। তাকিয়ে দেখ, এখান থেকে দেখা যাচ্ছে। ওর নিচে থামলাম। টিলার একেবারে নিচের দিকে একটা বড় পাথর খাঁজমত হয়ে বেরিয়ে রয়েছে। সোজা তাকিয়ে আছি, আবার সেই কণ্ঠ যেন উঠল মেঘবারের মত—ঠিক ওইখানে। মনে রেখ, ঠিক এইখানে।

ঘুম ভাঙলো যখন রাত তিনটে। তক্ষুনি বাথরুমে গিয়ে মুখে-চোখে জল দিয়ে পড়ার টেবিলে গিয়ে বসলাম। হুইং-বোর্ডে একটা বড় শীট আটকালাম বোর্ডপিন দিয়ে, তারপর স্বপ্নে দেখা যন্ত্রের নকশা আঁকতে শুরু করলাম। দেখলাম জেগে গিয়েও আর কিছুই ভুলিনি। সমস্ত কলকব্জা চোখের সামনে জ্বলজ্বল করছে। পরের দিন দুপুর পর্যন্ত একটানা খেটে কাজ শেষ করে ফেললাম।

বিকেলের দিকে শরীর ভারি খারাপ লাগছিল। কতদিন মুক্ত হাওয়ায় বেড়াতে বেরুইনি। আজ একটু বেরুলে মন্দ হয় না। যখন রোদ একেবারে পড়ে এল, একটা চটি গলিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

মাঠের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে একটা ভারি অদ্ভুত অনুভূতি হল। গতকাল রাত্তিরের সেই স্বপ্নটা যেন মনের ভেতর অটো-সাজেশানের মত কাজ করছিল। দেখলাম কি এক অদৃশ্য শক্তি আমাকে আমারই অজ্ঞাতে সেই স্বপ্নে দেখা পাথরটার কাছে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। চুম্বকের মত টানছে। আপনমনে বেড়াতে বেড়াতে আবিষ্কার করলাম কখন সেই টিলাটার সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। তখন সূর্য চলে গেছে দিগন্তের নিচে। আকাশে সূর্যও নেই, চাঁদও নেই। হিন্দুশাস্ত্রে এই সময়কে বলে রাক্ষসী মুহূর্ত। এই সময়েই নাকি যত অসম্ভব অলৌকিক কান্ড সংঘটিত হয়। কি রকম যেন গা ছমছম করছিল। জানা কিছু নয়, এই বিরাট মাঠ, পাথুরে টিলা, বিশাল অনাদ্যন্ত মুক্ত আকাশ—এইসব বস্তুর পটভূমিতে নিজেকে বড় অসহায় ও ক্ষুদ্র বলে মনে হচ্ছিল। ঠিক সেই সময় জিনিসটা লক্ষ করলাম।

অম্লান একটু থামল। আমি বললাম—কি রে? কি দেখতে পেলি?

অম্লান বলল—দেখলাম স্বপ্নে দেখা পাথরটা মিথ্যে নয়, কিন্তু সেটা স্বপ্নে যেখানে দেখেছিলাম, সেখানে আর নেই। এখানে ঘষা বড় প্রবল হয়। বর্ষায় মাটি আলগা হয়ে পাথরটা গড়িয়ে মাটিতে পড়ে গিয়েছে, সে জায়গায় মস্ত একটা গর্ত টিলার গায়ে। আর সেই গর্তের ভেতর অর্ধপ্রোথিত অবস্থায় দেখা যাচ্ছে একটা ধাতুর আধার। এালুমিনিয়মের মত চকচকে কোনো ধাতু, কিন্তু এালুমিনিয়ম নয়। ভারি অবাক লাগল। যাতে আমি এই কৌটোটা পাই, সেজন্য স্বপ্নে আমাকে এখানে নিয়ে আসা হয়েছিল। স্বপ্নটা হুবহু আক্ষরিক নয়, কেউ কোনো উপায়ে ওই স্বপ্ন আমাকে দেখতে বাধ্য করেছে। অন্ধকার নেমে আসছিল, আর দেরি না করে আমি হাত দিয়ে চারপাশের মাটি আলগা করে কৌটোটা বের করলাম। বেশি বড় নয়, একটা মাঝারী রকমের বালির টিনের মত আকার। ভারি নয় আদৌ। এমন কি মনে হচ্ছিল ভেতরে কিছু নেই। অনেক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখেও কি ধাতু দিয়ে যে ওটা তৈরি বুঝতে পারলাম না। সবচেয়ে ভাল, এই যে, কৌটোটার কোনো ঢাকনি

১৩৮১ সালের মৌচাক পত্রিকা কর্ত্তৃক
সুধীরচন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত
শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ রচিত
ছোট বড় সকলের মনের মত
বাংলা সাহিত্যের দু'খানি আশ্চর্য বই

বিচিত্র কাহিনী

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

মূল্যঃ—চার টাকা

(সপ্তম সংস্করণ চলছে)

ছোটদের উপযোগী সরস রচনা বাংলা সাহিত্যে খুব বেশী লেখা হয় নি। বিশেষ করে নানাবিষয়ে সত্য ঘটনা অবলম্বন করে ছোটদের মনের মত বিচিত্র রোমাঞ্চকর লেখা খুব সহজ নয়। 'বিচিত্র কাহিনী'তে লেখক সত্য ঘটনাগুলিকে নিজের সরস তুলিয়ানা দিয়ে এমন জীবন্ত আর আকর্ষণ করে তুলেছেন যে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি রচনাই অনবদ্য রস ও রোমাঞ্চে টইটম্বুর। মোট পনেরোটি কাহিনী ভিন্ন ভিন্ন রসের ফল্গুধারায় সিক্ত, বর্ণনায় মনোমুগ্ধকর।

'আরও বিচিত্র কাহিনী' বইটি কিশোর ও বয়স্কদের জন্য সমভাবে রচিত। লেখক শুধু ছোটদের জন্যই রস পরিবেশন করেননি, বড়রাও এই অমৃত আস্বাদন করে পুলকিত হবেন। অনবদ্য রস রচনাশৈলী এবং প্রতিটি কাহিনীর ভিন্ন ভিন্ন ও কর্ষণ চুম্বকের মত পাঠককে টেনে নিয়ে যাবে। এ বইটিতে ছ দশটি বিভিন্ন রসের কাহিনী রয়েছে এ ং লেখক তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কাহিনীগুলি এ ন সুন্দরভাবে রসসৃষ্ট করে উপস্থিত করেছেন যে পাঠককে বিমুগ্ধ করবে।

আরও বিচিত্র কাহিনী

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

মূল্যঃ—চার টাকা

(চতুর্থ সংস্করণ চলছে)

এ ি সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ ঃফোন ৩৪-১৭৮২

নেই। ভেতরে যাই থাকুক না কেন, না খুলতে পারলে তা দেখব কি করে? সমস্তটাই অখণ্ড ধাতুর চাদরে মোড়া।

বাড়ি এসে রাত্তিরে এ্যাসিটিলিন টর্চ দিয়ে কেটে ফেললাম কৌটোখানা। ভেতর থেকে বেরুলো এক আশ্চর্য জিনিস। প্রথমে দেখতে পেলাম গোল করে পাকিয়ে রাখা সার্জিক্যাল কটনের মত জিনিসের একটা বান্ডিল। ব্লো-টর্চের তাপে তার কিছুমাত্র ক্ষতি হয়নি। কি পদার্থ কে জানে! অনেক ল্যাবোরেটরী টেস্ট করেও, তার কেমিক্যাল নেচার বের করতে পারিনি। সেই পাকানো বান্ডিলটা আস্তে আস্তে খুলতেই বেরিয়ে পড়ল বিচিত্রদর্শন এক ক্রিস্টাল! অবিকল আমার স্বপ্নে দেখা সেই ক্রিস্টাল। অবাক হতে হতে অবাক হওয়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিলাম। কি করে ওটা ওখানে এল সে চিন্তা না করে কাজ শুরু করে দিলাম পুরোদমে: কিন্তু এখন আমার মনের মধ্যে একটা থিয়োরী একটু একটু করে গড়ে উঠছে।

বললাম—শুনতে শুনতে আমিও একটা থিয়োরী তৈরি করেছি। বলবো?

—নিশ্চয়, একশোবার!

—ক্রিস্টালটা একস্ট্রা-টেরেস্ট্রিয়াল অরিজিনের। আমার ধারণা ওটা এসেছে পৃথিবীর বাইরে থেকে। কিভাবে এল-এ বিষয়ে কি ধারণা করেছ আচ কর তো?

অংশদ আমার দিকে তাকাল। বলল—দানিকেন তত্ত্ব?

—রাইট! দানিকেন তত্ত্ব, বাকিটা তুই বল।

—আর বিশেষ বলার কিছু নেই। আমি মনে করি দানিকেন ঠিকই আন্দাজ করেছেন। মহাবিশ্বের সুদূরে কোনো নক্ষত্রের গ্রহজগৎ থেকে আজ থেকে কোটি কোটি বছর আগে মানুষের চেয়েও বুদ্ধিমান প্রাণী এসে নেমেছিল পৃথিবীতে। তারও আগে বা পরে হয়ত আরও অভিযান হয়েছে পৃথিবীর বুকে, কিন্তু আমি শুধু এইটের কথা বলছি। তারা নেমেছিল যে সময়ে তখন পৃথিবীতে জুরাসিক এজ চলছে। মানুষ নেই—শুধু মানুষ কেন, স্তন্যপায়ী প্রাণীই নেই। ধনুকবার মধ্যে বিশাল বিশাল প্রাগৈতিহাসিক বৃক্ষের অরণ্য বড় বড় বাষ্পগুহা জলাভূমি—তাতে চরে বেড়াচ্ছে পর্বতাকার সব কুৎসিতদর্শন সরীসৃপ। ভিনগ্রহের আগন্তুকরা একটু হতাশ হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু তারা দূরদৃষ্টি দিয়ে একটু আঁচ করতে পেরেছিল যে পৃথিবীর বুকে বিবর্তনের ফলশ্রুতি একদিন বুদ্ধিমান প্রাণীর উদ্ভব হবেই। তাদের কি করে জানানো যায় যে দূর অতীতে মহাবিশ্ব থেকে একদল অভিযাত্রী এসেছিল? একমাত্র উপায় হল—যদি তারা কখনো অতীতকে নতুন করে দৃশ্যমান করে তোলবার যন্ত্র গড়তে পারে। সে রকম যন্ত্র আমাদের সেই ভিনগ্রহের প্রাণীদের অজানা ছিল না নিশ্চয়ই এবং তারা এ-ও জানতো যে মানুষ জন্মগতির সঙ্গে সঙ্গে একদিন এমন যন্ত্রের কথা ভাববেই। এই কারণেই তিনিপলে জন্ম-মাসী [illegible] মানস সন্তানকে শক্তি এবং ভাষায় করে এই যন্ত্রের নকশা ও ওই ক্রিস্টালের অবস্থান সম্পর্কে একটি অতি উচ্চশক্তি চিন্তাতরঙ্গ তৈরী করে রেখে গেল। বহু কোটি বছর পরেও যদি কোনো প্রতিভাসম্পন্ন বিজ্ঞানী এমন যন্ত্র আবিষ্কার করা নিয়ে চিন্তা করে তাহলে সে ওই স্বপ্নটি দেখবেই। তারা দেখেছিল পৃথিবীতে অমন ক্রিস্টাল পাওয়া যায় না। তাই একখানা ক্রিস্টাল টাইম-ক্যাপসুলে ভরে লুকিয়ে রেখেছিল। স্বপ্নে তার অবস্থান দেখাবার ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। স্বপ্নটা আসলে প্রি-কন্ডিশনড। আট কোটি বছর আগেই নির্ধারিত হয়েছে এ স্বপ্ন আমি দেখব। আমি বোস্ট করছি না আনন্দ, তবে এ কথা বলবই—তাদের চিন্তাশক্তি যেমন অকল্পনীয় উচ্চস্তরের, তেমনই উঁচুদরের গ্রাহকযন্ত্র আমার মস্তিষ্ক। নইলে আট কোটি বছর আগের থট ওয়েভ ধরতে পারতাম কি?

হেসে বললাম—গবেষই মারা গেলি!

হেসে উঠতে গিয়ে অংশদ গম্ভীর হয়ে গেল। বলল—নট ইয়েট। যেদিন মানুষকে অমর করে দিতে পারব, সেদিন রোগে, দুর্ঘটনায় আর মানুষ মারা যাবে না—সেদিন গর্ব করবো। আজ নয়।

বললাম—অমর হওয়া কি ভাল? তাতে অনেক সমস্যা দেখা দেবে।

অংশদ বলল—সে সব বিজ্ঞানীর মাথা-ব্যথা নয়। সে সাধনা করে তার ফল তুলে দেয় সমাজের হাতে। কিভাবে তা ব্যবহৃত হবে সেটা সম্পূর্ণরূপে ব্যবহারকারীর ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে।

রাত ঝিমঝিম করছে। খাওয়া-দাওয়া শেষ করে আমরা ঢুকলাম ল্যাবরেটরীতে। খুব বড় না হলেও যথেষ্ট গোছানো। যন্ত্রপাতির বিশেষ বাহুল্য নেই, বোঝা যায় চিন্তার স্থানটাই এখানে বড়। ঘরের একেবারে ও-প্রান্তে টেলিভিশনের মত একটা কি যন্ত্র রয়েছে। চারটে মোটা মোটা পায়ার ওপর দাঁড় করানো। অংশদ সেদিকে দেখিয়ে বলল—ওইটে সেই যন্ত্র। আজ রাত্তিরে ওর কর্মদক্ষতা পরীক্ষা করে দেখব।

—আগে করিস নি?

—কিছু কিছু। তৈরি করবার প্রত্যেক পর্যায়ে টেস্ট করতে হয়েছে তো। তাতে টুকরো টুকরো কিছু দৃশ্য দেখেছি। আমি এর এফিসিয়েন্সি সম্বন্ধে নিঃশঙ্ক। তবে কোন ভাল জিনিসই একা উপভোগ করতে ইচ্ছে করে না। তাই তোকে ডাকা। তুই ছাড়া আমার কে আছে? আনন্দ, এ যন্ত্রটার একটা ভাল নাম দে তো—

বললাম—ইংরিজি, না বাংলা?

—বাংলাই দে—

কপালে দুটো টোকা মারলাম, তারপর বললাম—'পুরোবীক্ষণ' কেমন নাম?

অংশদ ভারী খুশি হল। —বাঃ! বেশ বলেছে। 'পুরোবীক্ষণ'! ভাল নাম। এই নামই জিনিসটার পেটেন্ট নেবো। যা ঐ দুটো চেয়ার এখানে টেনে নিয়ে আয়। এখানে বসে আজ সারারাত আমরা অতীতকে দেখব।

ভয়ে ভয়ে বললাম—ভাই অংশদ, যন্ত্রটা যদি না চলে?

[illegible] হাসি। বলল—একটা হাত বাড়িয়ে তোকে ছুঁতে পারি—এ বিষয়ে যেমন আমার কোনো সন্দেহ নেই, তেমনি এই মেশিনটা যে চলবে তাতেও আমার সামান্যই সন্দেহ আছে। বন্ধু, অধিক বাকাবায় বৃথা—এস উদাহরণ দ্বারা বক্তব্য সমর্থনের চেষ্টা পাই।

একখানা চেয়ারে আমি বসলাম। অংশদ এগিয়ে গেল ঘরের কোণে। পুরোবীক্ষণের পেছন থেকে একটা লম্বা তারওয়ালা প্লাগ তুলে নিয়ে মেঝের কাছাকাছি দেয়ালের একটা সকেটে ঢুকিয়ে দিল। আমার দিকে তাকিয়ে বলল—দারুণ রোমাঞ্চ হচ্ছে কিন্তু, না?

আমার হৃৎপিণ্ড গলার কাছে এসে ধুকধুক করছিল। চেষ্টা করে সেটাকে গিলে ফেলে বললাম—হুঁ, দারুণ!

সুইচ টিপে ঘরের বড় আলোটা নিভিয়ে দিল অংশদ। অন্ধকার! সেই নিবিড় অন্ধকারের ভেতরে শব্দ শুনলাম—খট্। বুঝতে পারলাম অংশদের পুরোবীক্ষণ চালু হল। প্রথমে কিছুই হল না। তারপর আস্তে আস্তে ঘরটা ভরে উঠল মৃদু নীলাভ আলোয়। পুরোবীক্ষণের কাঁচের পর্দা থেকে আসছে সেই আলো। এখনও কিছু দেখা যাচ্ছে না, কেবল মাঝে মাঝে যন্ত্রের পর্দায় অনুভূমিক কতকগুলো কাঁপাকাঁপা রেখা ফুটে উঠছে। বেশিক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থাকা যায় না, চোখে লাগে। একটা নব ঘুরিয়ে কি এ্যাডজাস্ট করলো অংশদ, তারপর এসে আমার পাশের চেয়ারে বসে বলল—ভাল্ভগুলো গরম হতে একটু সময় নেবে, তারপর ফুটে উঠবে ছবি। একটা অক্টোকান্টাল চালু করে দিয়ে এলাম বুঝলি? প্রথমে পুরোবীক্ষণ ফুল ক্যাপাসিটিতে চালু হবে। অর্থাৎ যত পুরনো যুগের দৃশ্য ওর পক্ষে দেখানো সম্ভব সেইখান থেকে শো শুরু হবে। দশ-পনেরো মিনিট বাদে বাদে একটা বিল্ট-ইন সার্কিট দৃশ্যপট বদলে বদলে ঘটনাকে ক্রমশঃ আধুনিক যুগের দিকে নিয়ে আসবে। তার জন্যে আমাদের আর কিছু করতে হবে না। একেবারে সিনেমার মতো ব্যাপার। এক এক লাফে কয়েক কোটি বছর পেরিয়ে যাবে।

আমি কি যেন বলতে যাচ্ছিলাম, তার আগেই মুখ দিয়ে বিস্ময়সূচক শব্দ করে সামনে ঝুঁকে পড়ল অংশদ, আমার হাত চেপে ধরে বলল—দেখ্!

জানি না কি করে সেই মুহূর্তের বর্ণনা দেব। জীবনের সে এক পরম অবিস্মরণীয় মুহূর্ত! উত্তেজনায় আমরা দুজন দুজনের হাত জড়িয়ে ধরেছি আর সামনে তাকিয়ে দেখছি পুরোবীক্ষণের পর্দায় আস্তে আস্তে ফুটে উঠছে এক আশ্চর্য অরণ্যের ছবি। পরিষ্কার—ঝকঝকে তীক্ষ্ণ। কোনো অস্পষ্টতা নেই, চারদিকে ঘন গাছপালা, আজকের অরণ্যের সঙ্গে তার কোন মিল নেই সম্পূর্ণ অন্য ধরনের বনস্পতি। মোটা মোটা বনস্পতি সোজা উঠে গিয়েছে আকাশের দিকে তাদের গায়ে শক্ত ছাল নেই। কলাগাছের মত নরম বলে মনে হয় দেখলে। ঝোপঝাড় কম, কেবল টাইগার ফার্নের মত কি পাতা হয়ে রয়েছে গাছের নিচে নিচে। খুব চেনা, এ যেন আমি কোথায় দেখেছি! কোথায়? কোথায়? পরক্ষণেই মনে পড়ল আমার। ঠিক! মিউ-

জিয়লের জিওলজিক্যাল গ্যালারীতে কয়লার চাঙড়ে এর ফসিল দেখেছি বটে! রুদ্ধস্বরে বললাম—অঙ্গদ। বুঝতে পেরেছিস? কার্বনিফেরাস যুগের জঙ্গল! যখন পৃথিবীর নিচে কয়লা তৈরি হচ্ছিল। কি কান্ড!

অঙ্গদ বলল—আমি জিওলজির ছাত্র নই ঠিক বলতে পারব না। তবে মনে হচ্ছে কার্বনিফেরাস যুগই বটে। এর আগে গিয়েছে ডেভোনিয়ান যুগ। ভূবিজ্ঞানীরা এভাবেই পৃথিবীর প্রাচীন ইতিহাসকে নানা ভাগে ভাগ করেছেন। একে অনেকে অঙ্গার যুগও বলেন, কারণ এ সময়েই মাটির নিচে কয়লার ভান্ডার তৈরি হতে শুরু করেছিল। বড় আশ্চর্য সময়, বুঝলি? দক্ষিণ গোলার্ধে এ সময় আবহাওয়া ছিল শুষ্ক এবং পরিবর্তনহীন। কয়লাও দক্ষিণ গোলার্ধে বিশেষ পাওয়া যায় না। যা হবার তা হচ্ছিল উত্তর গোলার্ধে। সেখানে উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ুতে গড়ে উঠেছিল বিস্তৃত উষ্ণমন্ডলীয় অরণ্য। দৈত্যাকৃতি বৃক্ষের সংখ্যাই ছিল বেশি। সব গাছই একশো কি দেড়শো ফিট উঁচু হত। আর ছিল অনেক জলাভূমি, যেমন তুই এখানেও দেখতে পাচ্ছিস।

এতক্ষণ অতটা খেয়াল করিনি, এবার তাকিয়ে দেখলাম সত্যিই তো— একটা বিরাট জলাভূমির ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে পুরো জঙ্গলটা। কাদা কাদা কেমন অস্বাচ্ছন্দ্যকর জায়গা, সূর্যের তাপে তার থেকে বাষ্প উঠছে। ইংরেজিতে যাকে বলে সেটমিং স্যোরস্প—ঠিক তেমনি। সূর্যের আলো বৃক্ষপত্রের আবরণ ফুটো করে মাটিতে পৌঁছয়নি। নেমন্তন্ন বাড়ির ছাদে টাঙ্গালে তার নিচে দিনের বেলাতেও যেমন একটা ছায়া ছায়া ভাব হয়, তেমন দেখাচ্ছে।

আমরা মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে আছি, কেউ আর কথা বলছি না। প্রাণভরে দেখে নিচ্ছি পৃথিবীর ফেলে আসা তরুণী বয়েসকে। প্রায় পঁয়ত্রিশ কোটি বছর আগের অঙ্গার যুগকে দেখছি চোখের সামনে। ওই অরণ্য ভূমিকম্প বা অন্য কোনো কারণে মাটিচাপা পড়ে গিয়ে বহু কোটি বছর ধরে ভূগর্ভের চাপে ও তাপে পরিবর্তিত হয়েছে কয়লায়।

তাকিয়ে থাকতে থাকতেই দৃশ্য পল্টে গেল। যেন কার যাদুকাঠির স্পর্শে মিলিয়ে গেল অরণ্য—কিন্তু জলাটা ঠিক আছে। প্রখর সূর্যের আলো যেন পুড়িয়ে দিচ্ছে দিকবিদিক। আর—আর ওগুলো কি?

জলাভূমির মধ্যে মহিষের মত গা ভাসিয়ে চরে বেড়াচ্ছে কতকগুলো অদ্ভুত জন্তু: তারা না জলচর না স্থলচর সরীসৃপের মত দেহগঠন। শরীর বিরাট, কিন্তু হাত-পা বিশেষ কিছু নেই তার জায়গায় কয়েকটা দুর্বল মাছের পাখনার মত জিনিস। সেগুলো নেড়ে নেড়ে জলপথগতিতে তারা চলাফেরা করছে, তাদের তীক্ষ্ণ দাঁত চক্‌চক্ করে উঠছে প্রখর সূর্যালোকে। সম্ভবতঃ রোদ্দুরের প্রখরতার জন্যই তারা জলে বেশিক্ষণ থাকে। বললাম—অঙ্গদ, জঙ্গল কোথায় গেল?

অঙ্গদ বলল—এটা খুব সম্ভব পার্মিয়ান যুগের শেষ দিক। মানে আজ থেকে বাইশ কোটি বছর আগের যুগ। আবহাওয়ার দ্রুত পরিবর্তনের ফলে চিরহরিৎ গাছের স্বরণ্য এ সময় ক্রমশঃ কমে আসছে, তার স্থান নিচ্ছে বিভিন্ন পর্ণমোচী বৃক্ষ—যারা তীব্র শীত ও শুষ্কতাকে উপেক্ষা করে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারে। দিনে গরম ও রাত্রে প্রচন্ড ঠান্ডা এ যুগে। এর আগে অর্থাৎ জলচর প্রাণীদেরই রমরমা ছিল বেশি, ডাঙায় প্রাণীর সংখ্যা কিছুই ছিল না বললে হয়। কিন্তু এখন পৃথিবী চলে যাচ্ছে স্থলচরদের হাতে। ঐ যারা জলভূমিতে ভেসে বেড়াচ্ছে, ওরাই এর পরযুগের দানবাকৃতি সরীসৃপদের পূর্বপুরুষ উভচর প্রাণী।

সবিস্ময়ে তাকিয়ে আছি দেখছি মহাকালের ঘূর্ণিপাকে হারিয়ে যাওয়া দূর অতীতের এক পর্বকে। চারদিকে ধূ ধূ করছে এক জলময় মরু। মানুষ নেই—মানুষের উদ্ভব হয়নি এখনও: কোনো বুদ্ধিমান প্রাণী নেই। কেবল মধ্য দিনের রৌদ্রতপ্ত প্রহরে দিগ্বলয়ে কাঁপছে তাপ-তরঙ্গ। কর্দমাক্ত জলাভূমিতে জান্তব সন্তুষ্টিতে আহার সন্ধান করছে প্রাগৈতিহাসিক কুদর্শন প্রাণীরা। কোন শব্দ নেই কোথাও কারণ শব্দ ফোটানোর যন্ত্র অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তৈরি করেনি। এর সমস্তটাই নির্বাক চলচ্চিত্রের মত। সেই স্তব্ধতা পরিবেশকে প্রেতায়িত করে তুলেছে। আশ্চর্য লাগছে বটে, আবার একঘেয়েও লাগছে। অনুভব করতে পারছি মানুষকে কত ভালবাসি। মানুষ ছাড়া পৃথিবীকে মানায় না। এতক্ষণ হয়ে গেল, কিন্তু ওই দিগন্তপ্রসারী জলাভূমির তীরে এসে আবির্ভূত হচ্ছে না কোনো মানুষের অবয়ব। জলচর আদিম প্রাণীটির বেমানান বিসদৃশ অঙ্গ সঞ্চালনকে ম্লান করে দেবার জন্য কোন মানব তার সুঠাম দেহছন্দ নিয়ে এসে দাঁড়াচ্ছে না। প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে যেন।

পার্মিয়ান যুগ এইভাবেই কেটে গেল। দৃশ্য-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমরা চমকে উঠলাম! কোমরসমান উঁচু এরকম অগাছার জঙ্গলের মধ্যে যুদ্ধ হচ্ছে নাকি আদিম মানবের: কি আকৃতি তাদের: যুযুধান দুই পক্ষের পায়ের চাপে পিষ্ট হচ্ছে তৃণলতা, তীক্ষ্ণ দাঁতের আঘাতে নিজেদের গা ক্ষতবিক্ষত করছে তারা। হিংস্র কুকুরের মত গাঁয়ের শক্তি প্রকট করে তারা গর্জন করে উঠছে—বাতাস সে গর্জন আমরা কেউ শুনতে পাচ্ছি না। এক-একটা জন্তু প্রায় পঞ্চাশ ফিট লম্বা আর অন্তত পঁচিশ ফিট উঁচু। পেছনের পা দুটো অসম্ভব বলিষ্ঠ ক্যাঙ্গারুর মত বড় বড় নখ তাতে। সামনের দুই পা পাখীর পায়ের মত ছোট অতবড় শরীরের তুলনায় হাস্যকর। ফলে মুখ-মারটা পেছনের পা দিয়েই হচ্ছে। সে এক বিচিত্র দৃশ্য! ওই পাহাড়ের মত শরীর নিয়ে অত ক্ষিপ্রগতিতে পরস্পরকে আচড় দিয়ে আঘাত করে যে পিছনে আসছে তা ভাবা যায় না। অঙ্গদের দিকে তাকিয়ে বললাম—ডাইনোসোর!

অঙ্গদ বলল—আরে ডাইনোসোর তো সবই। একটা কোনো বিশেষ প্রাণীকে ডাইনোসোর বলে না। এই ধরণের সরীসৃপ বংশের পুরো টার নাম ডাইনোসর গ্রুপ—তাতে দেড় ফুট লম্বা গোসাপ জাতীয় প্রাণী ইউপারকেরিয়া থেকে শুরু করে পঞ্চাশ ফিট লম্বা সামনের ওই জন্তুর মত প্রাণী সবই পড়ে।

। —ওটা কি তাহলে ব্রন্টোসোর?

—তোর মুন্ডু। কতকগুলো নাম মুখস্থ করেছিস খালি। এটা জুরাস্সিক যুগের সবচেয়ে ভয়াবহ ও নৃশংস প্রাণী টিরানোসোরাস রেক্স। অন্য প্রাণীরা ভয়ে এর কাছে ঘেঁষতো না কেউ।

মারামারি করতে করতেই তারা আবার বাইশ কোটি বছর অতীতে পিছিয়ে পড়ল। আমরা চলে এলাম দৃশ্যান্তরে, এরপর ঘন্টাখানেক বিভিন্ন প্রাণীর যুগ বয়ে গেল চোখের সামনে দিয়ে। কে যেন সমস্ত পৃথিবীর জন্ম পরবর্তী ইতিহাসকে একটা ফেড-ইন্জ বানিয়ে আমাদের এনে দিয়েছে। এক রাতে আমরা পঞ্চাশ কোটি বছর কাটিয়ে দিলাম।

মানুষ নেই? মানুষ! মানুষ! জল পাখি না ডাকে যেন চাপ লাগছে। পরাজীবীকুলের পরাশ্রয়ী শ্রান্ত অন্ধ প্রবৃত্তিচালিত কতগুলো কুদর্শন প্রাণীর মরীচিকা নয়তো প্রতিগতি নিজনতার মধ্যে পৃথিবী জন্মোজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন বুকে নিয়ে—এই দৃশ্য!

একসময় সেনোজোয়িক যুগ শেষ হয়ে কেনোজোয়িক যুগে এসে পড়ল। অর্থাৎ আধুনিক যুগে। তারপরেই আমাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে সেই দৃশ্য এলো। প্রায় মানুষের মত দেখতে গায়ে বড় বড় লোম-ওয়ালা এক উন্নত দীর্ঘাকৃতি জীব শক্তি-শালী চওড়া কাঁধ কমজোরি কি একটা ফল খাচ্ছে গাছের নিচে দাঁড়িয়ে।

আতঙ্কী দৃষ্টিতে তাকিয়ে
বল্কলাকৃতি শিশু। বয়স্ক
কিটা ফল খেয়ে বাকিটা
দিয়ে সন্দেহে তাকিয়ে রইল।
অসভ্য মানুষ কিন্তু কি সেই
ই! এই মানসিকতাই মানুষকে
অন্য জীবের থেকে তাকে
দান।

ল-স্যাক্সন শ্রেণি এল হেক্স
ান্থ্রপোস ইরেক্টাস। অর্থাৎ

এই বাঁদরদের মধ্যে প্রথম দু পায়ে
দাঁড়াতে শিখে মনুষ্যপদবাচ্য হয়েছিল।

প্রস্তর যুগের একটা দৃশ্য দেখলাম—
কি মজা লাগল দেখে। বরফ পড়ে চারদিক
ঢেকে গিয়েছে। গুহার মধ্যে বসে নিবু নিবু
আগুনের কুণ্ডে শুকনো পাতা গাছের
ফুঁ দিচ্ছে মা বাবা আর তাদের দুই
ছেলেমেয়ে কিন্তু আগুন বুঝি কমই
আরো কম আসছে কিছুতেই আর ধরছে
না। শেষে হতাশ হয়ে প্রপিতামহ

হুঁ দিচ্ছে সমস্ত পরিবার।
তাদের কি আতঙ্ক ও ব্যাকুলতা
একবার নিভে গেলে এই শীতে
হবে। এরা বোধহয় এখনও
আগুন জ্বালাতে শেখেনি। অন্য
জ্বললে তার আগুন সংগ্রহ
গুহায় রেখে দেয়। শুকনো
দিয়ে ভাইতে রাখে মাংসের
একবার নিবলেই সর্বনাশ। পরি
পোড়ে থাকে গুহার কোণে

শুকনো পাতা এনে আগুনে ফেলে অবয়ব দমভোর ফুঁ দিচ্ছে। আমরা আজ কি বুঝবো লক্ষ বছর আগে এই পরিবারের সেদিন কি বিপদ গিয়েছে! ফুঁ দিতে দিতে হঠাৎ ধপ করে জ্বলে উঠল আগুন। অমনি তাদের ফুর্তি দেখে কে? বাপ গুহার মেঝেয় আনন্দে গড়াগড়ি দিতে লাগল।

পুরাবীক্ষণের অটো-কন্ট্রোল যেভাবে চালু করাছিল তাতে এবার আধুনিক যুগ এসে যাওয়াতে দুই দৃশ্যের মধ্যে লাফের পরিমাণ কমতে লাগল। কোটি থেকে লক্ষ, লক্ষ থেকে হাজার বছর। এখন এক এক লাফে কয়েক হাজার বছর পেরুচ্ছি। এই হারও কমতে কমতে শেষে এক এক লাফে মাত্র এক বছর পেরুল এভাবেই কন্ট্রোল ফিকস করেছে অপদল।

একবার দেখলাম লোমশ ম্যামথের তাড়া খেয়ে পালাচ্ছে দুজন নিঃসঙ্গ মানুষ। একজনের হাতে মাত্র একটা মোটা গাছের ডাল। ম্যামথের সমান গাছের ডাল দিয়ে কি হবে। তাই তারা প্রাণভয়ে দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পালাচ্ছে। হায় রে! ওরা জানেও না একদিন ওদেরই বংশধর হবে পৃথিবীর রাজা! আজ তারা বুনো হাতির তাড়ায় প্রাণপণে ছুটছে। গাছের ডাল ছাড়া তাদের অস্ত্র নেই। কালবৈশাখীর মত লোমঝাড় ভেঙে ছুটেছে ম্যামথ মানুষ দুজন দৌড়ে পারছে না। দূরে একটা পাহাড়ের গায়ে সারি সারি কয়েকখানা গুহা দেখা যাচ্ছে। সেখানে কোনরকমে পৌঁছতে পারলে এরা বেঁচে যেতে পারে। অতটুকু গুহার ভেতরে ম্যামথ তার বিশাল দেহ নিয়ে ঢুকতে পারবে না। ওদের দৌড়ের বাজি দেখতে দেখতে হঠাৎ আবিষ্কার করলাম আমরা কি ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে উঠেছি। ওদের ভাগ্যে যা হবার তা তো লক্ষ বছর আগেই হয়ে গিয়েছে—আমরা যা দেখছি তা অতীতের ছায়াবাজি মাত্র তবু ভেতর থেকে উত্তেজনার ঢেউ আসছে। মানুষ দুজন জিতে গেলে আমরা খুশী হই। ওরা বোধহয় জিতে যাবেও প্রায় পৌঁছে গিয়েছে।

এই সময় এক ঘটনা ঘটল। একজন মানুষ হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল মাটিতে আর উঠতে পারল না। তার পায়ে বোধহয় খুব লেগেছে। একবার ওঠার ব্যর্থ চেষ্টা করেও আবার বসে পড়ল। এদিকে ম্যামথটা প্রায় ঘাড়ের ওপর এসে পড়েছে। মনে মনে ভাবলাম—যাক একজন অন্তত রক্ষা পেল। কিন্তু ব্যাপার ঠিক সে রকম ঘটল না। অপর লোকটি যেতে যেতে ফিরে দেখল তার বন্ধু পড়ে গিয়েছে—সে পালিয়ে না গিয়ে আবার ফিরে এল সঙ্গীর কাছে—মৃত্যুকে তুচ্ছ করে। তারপর অসীম শক্তিশালী বাহুর এক ঝটকায় আহত বন্ধুকে তুলে নিল কাঁধে। এবার দেখলাম তার শক্তির পরিচয়। দেহের সমস্ত ক্ষমতাকে একত্র করে মানুষটি দৌড় দিল গুহার দিকে। কি তার মনের জোর! কাঁধে এত বোঝা নিয়েও সে কেন আগের চেয়ে জোরে দৌড়েচ্ছে! ম্যামথটা তাদের ধরতে পারল না—যুদ্ধের লেহোমুখে সেবারের মত তারা একটু চমকে উঠেই মিলিয়ে গেল। আমরা নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচলাম।

এর আগে প্রায় এই দৃশ্যই দেখেছি আমরা। পাঁচ-ছটা স্টেগোসোরাসকে আক্রমণ করেছিল একটা টিরানোসোরাস রেক্স। সবগুলো দৌড়ে পালাল, কেবল একটা স্টেগোসোরাসের পেট ফুটো হয়ে গিয়েছিল যুদ্ধে। সে রক্তাক্ত শরীরে ঘোলাটে চোখে চিৎ হয়ে শুয়ে রইল প্রান্তরে পেটের ফুটো দিয়ে বেরিয়ে পড়ছে একরাশ অন্ত্র। বাকি জানোয়ারগুলো একবার ফিরেও তাকাল না, সবাই নিজের প্রাণ বাঁচাতে ব্যস্ত। মানুষ এই কারণেই বড় হয়েছে—এইজন্যেই সে মানুষ।

কত ছবি দেখলাম। কত ছবি। দীপ্ত ছুরির মত নীল আকাশের নিচে শস্য প্রান্তর, জনমানবের চিহ্ন নেই কোথাও। একটা ছোট এ্যাসফল্টের হ্রদ সামান্য সূর্যের তাপে পিচ গলে থকথকে হয়ে আছে—বড় বড় গামলার মত বুদবুদ ফুটছে এখানে ওখানে। এত আশ্চর্যরা সে দৃশ্য যে এই রাত্তিরে বসে সে ছবি দেখতে দেখতে গায়ে যেন গরম হাওয়ার তাপ এসে লাগছে। সেই গলন্ত পিচের হ্রদে কোনোভাবে পা ফসকে পড়ে গেছে একটা ম্যামথ। পেছনের পা দুখানাই ডুবে গিয়েছে পিচে, সামনের পা দুটো দিয়ে উঠে আসবার কি ব্যাকুল, প্রচেষ্টাই না করছে হাতীটা. ফল হচ্ছে না কিছু, বরং আরো ডুবে যাচ্ছে: টগবগ করে ফুটছে পিচ। মাটির নিচে পাথরে বোধহয় কোনো চোরা ফাটল আছে উষ্ণ প্রস্রবণের মত, তা দিয়েই এ্যাসফল্ট উঠছে। হ্রদের পাড়ে চক্রাকারে পায়চারী করছে একটা অসদন্ত বাঘ—সেবারটুথেড টাইগার। প্রাচীন বাঘেদের চোয়ালের দু দিক দিয়ে দুটো তলোয়ারের মত দাঁত ছিল। ম্যামথটা তো মরেইছে—এখন বাঘটা ঠিক বুঝে পাচ্ছে না কি উপায়ে এই সুস্বাদু মাংস হস্তগত করা যায়। তার অভিজ্ঞতা বলে সে বুঝতে পেরেছে ওই ম্যামথ আর কখনো উঠে আসতে পারবে না। মাটিতে চলন্ত ছায়া ফেলে আকাশে উড়ছে কয়েকটা শকুন। তাদের ডানার ছায়া ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে হাতীটাকে। সে-ও বুঝেছে সে শেষ হয়ে গেছে। বড় করুণ তার মৃত্যুমুখী চাউনি।

হঠাৎ অপূর্ব বলে উঠল— মনে পড়েছে। লা ব্রিয়া! লা ব্রিয়া!

বললাম—লা ব্রিয়া কি?

—ক্যালিফোর্নিয়ার লা ব্রিয়াতে এই ঘটনা ঘটেছিল পনেরো প্রস্তরযুগেরও বহু আগে। এই ঘটনাটা কি করে যেন পরে এসে গেছে। এই ম্যামথের কঙ্কাল পরে লা ব্রিয়ার এ্যাসফল্ট হ্রদ থেকে উদ্ধার করা হয়।

বাঘটা অপেক্ষা করতে করতে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। এবার সে পিছিয়ে গিয়ে গাঁড়ি মেরে দাঁড়াল। তারপর দৌড় এসে দিল এক লাফ। ইচ্ছে ছিল ম্যামথটার পিঠের ওপর পড়ে খাওয়া শেষ করে আবার লাফিয়ে পাড়ে চলে যাবে। কার্যত হল অন্য রকম। ঠিকমত লাফ না হওয়ার দরুণ বাঘটা পড়ল ম্যামথের ল্যাজের দিকে এবং তৎক্ষণাৎ হড়কে গিয়ে তারও পেছনের দুই পা আটকে গেল পিচে। বিপদ বুঝে কত কটপট শুরু করল বাঘটা। কিন্তু হাতী যা পারে নি বাঘ পারবে কি করে? অবশেষে বাঘটা বুঝল নিজের হঠকারিতায় সে হাতীর সঙ্গে নিজের ভাগ্যকে জড়িয়েছে। তারও এই শেষ। মরতেই যখন হবে, তখন জীবনে শেষবারের মত ভাল খাবার খেয়ে নিই। এই ভেবে সে ওই অবস্থায় কোমর পর্যন্ত গলন্ত পিচে ডুবে থেকে জীবন্ত ম্যামথটার পেছন দিক থেকে মাংস ছিঁড়ে খেতে শুরু করল। শুরু হল মরণান্তিক যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল বেচারী প্রাণী। কিন্তু তার অন্তিম সে চিৎকার আমরা কেউ শুনতে পেলাম না। বাঘটা খেয়ে চলল আর অসহ্য যন্ত্রণায় ম্যামথটার দেহ ঝোঁড়াতে লাগল বারবার। একটা শকুন ছোঁ মেরে নেমে এল ম্যামথটার মাথায়। সেখানে বসে ঠুকরে তুলে নিল তার একটা চোখ। ব্যথায় ও ক্রোধে অন্ধ হয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে উঠল ম্যামথ। পড় পড় হয়েও ওড়বার জন্য ডানা ঝাড়ালো শকুনটা—কিন্তু হায়! ততক্ষণে তারও একটা ডানা আটকে গিয়েছে পিচে। প্রাণপণ ডানা ঝাপটাতে লাগল শকুনটা। তার ঠোঁটে তখনও ম্যামথের সদ্য তুলে নেওয়া চোখ। রক্ত পড়ছে তার থেকে। খাদ্য ও খাদকেরা পাশাপাশি লেগে রইল প্রাচীন সেই পিচ-হ্রদে।

রাত ফুরিয়ে আসছে আর এদিকে লাফের পর লাফে আমাদের বর্তমান যুগের কাছাকাছি নিয়ে আসছে পুরাবীক্ষণ। আমাদের চোখের সামনে গড়ে উঠল জনপদ, নগর—নৃপতির বিলাসবহুল প্রাসাদ। পৃথিবীর সম্ভাবনাপূর্ণ গর্ভে ঘুমিয়ে ছিল যে সব ধাতুর আকর, আমাদেরই নিমীলজাগরণক্লান্ত চোখের সামনে মানুষ খনিগর্ভ তা তুলে এনে সভ্যতাকে এগিয়ে দিল আরও সামনে। জীবন্ত ম্যামথের শরীর থেকে মাংস ছিঁড়ে খাচ্ছে ক্ষুধার্ত বাঘ—এইনৃশংস দৃশ্যের পরে এমন পরম দয়ার ছবিও দেখলাম, যাতে মন শান্তিতে বিনম্র হয়ে এল। বুঝলাম প্রকৃতির এই নিয়ম—নৃশংসতা ও দয়াকে পাশাপাশি রাখা আছে চিরদিন, যাতে দয়ার মহিমা আরও বিকশিত হয়ে ওঠে।

পুরাবীক্ষণে দেখছি এক সুপ্রাচীন জনপদ। জাদ্বিয়া করেকার এ শহর, চিনি না এর স্থাপত্যরীতি। রাজপথে বসে ভিক্ষা করছে একজন কুষ্ঠরোগী। ভিক্ষার চেয়ে লাঞ্ছনা মিলছে বেশী। সুবেশধারী পথিকেরা সন্ত্রস্ত হয়ে স্পর্শ বাঁচিয়ে যাচ্ছে। কেউ অবহেলা ও উপেক্ষার মুখ বাঁকিয়ে চলেছে। কতকগুলো পাষণ্ডের মত দেখতে কর্মহীন বালক তাকে পাথরের টুকরো ছুঁড়ে মারছে। বসে বসে কাঁদছে ভিখারিটা।

কি করবে সে? এর বিরুদ্ধে কোন নালিশ নেই। রোগগ্রস্ত হয়ে সে তো এমনিতেই অপরাধ করে ফেলেছে। হঠাৎ পরোবীক্ষণের পর্দা আড়াল করে, তার চন্দনপর মূর্তি আড়াল করে কে এসে দাঁড়াল। আমরাও তাকে দেখতে পাচ্ছি না, কারণ আগন্তুক এদিকে পেছন ফিরে রয়েছে। তার পরণে সাদা আলখাল্লা, কোমরের কাছে এক টুকরো দড়ি দিয়ে বাঁধা। খুব ধীরপায়ে সে এগিয়ে গেল কুষ্ঠরোগীটির দিকে, তার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। কিন্তু তবুও তার মুখ আমরা দেখতে পেলাম না, আমাদের দিকে তার পিঠ। লম্বা সোনালী চুল মানুষটির মাথায়, মহিমান্বিত চলাফেরা। সে ঘৃণা করল না, অবজ্ঞায় ওষ্ঠ বঙ্কিম করল না, স্পর্শ বাঁচিয়ে পালিয়েও গেল না। বরং ঝুঁকে পড়ে পিতা যেমন শিশুকে আদর করেন, তেমনভাবে সস্নেহে দুই হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন ভিক্ষুকটির মাথায়, মাথায়, সর্বশরীরে। এবং কি আশ্চর্য! ও কি। তাঁর হাতের ছোঁয়ায় সেরে যাচ্ছে লোকটির অসুখ, গলিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আবার স্বরূপে ফিরে যাচ্ছে। আবার সুস্থ মানুষ হয়ে উঠছে সে। পেছন থেকে নিক্ষিপ্ত কয়েকটা পাথর এসে আগন্তুকের পিঠে আঘাত করল, তিনি ভ্রূক্ষেপও করলেন না। ভিখিরিটা হাত জোড় করে কাঁদছে। কেন কাঁদছে ও? ওর তো অসুখ সেরে গেল, তবে ও কেন কাঁদে?

এবার তিনি সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছেন এদিকে ফিরছেন। এবার আমি তাঁর মুখ দেখব। ওই ফিরছেন—ফিরছেন যাঃ! ঘুট করে একটু শব্দের সঙ্গে সঙ্গে পরোবীক্ষণ হাজার যোজন পেরিয়ে গেল। তাঁকে আর দেখা হল না।

আশ্চর্য! আমারও চোখে জল। অঙ্গদের হাত আমার কাঁধে। কান্নাধরা গলায় ওর দিকে তাকিয়ে বললাম—অঙ্গদ, যীশু খ্রীষ্টকে।

উত্তরে আমার কাঁধে অঙ্গদের হাতের চাপ বাড়লো শুধু। নিজেকে শিশুর মত লাগছিল। হাতের উল্টোদিক দিয়ে চোখ মুছে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ স্বরে বললাম—আমি ভারী সেন্টিমেন্টাল। দেখ দিকিনি কথায় কথায় চোখে জল এসে যায়।

ওদিক থেকে কান্নার উত্তর এলো—আমারও।

চুপ করে রইলাম কিছু বললাম না। কিন্তু মন ভরে গেল অঙ্গদের উত্তরে। আজ বড় ভাল দিন। ছোটবেলা থেকে ছুটির দুপুরে বাড়ীর ছাদে ঘুড়ির সুতোর মাঞ্জা দিতে দিতে বইয়ে পড়া যে সব জিনিসের কথা ভেবে অন্যমনস্ক হয়ে যেতাম, মাঞ্জা দেওয়া তুলে তালগাছের মাথার ওপর দিকে ভাসিয়ে গুরুভার করে আকাশে, যেখানে সবুজ রঙের পুতুল হয়ে যাচ্ছে কখনো হাতী কখনো ঘোড়া কখনো নাম-না-জানা বিকট একটা কিছু—সেই সব দিনের স্বপ্ন আজ এতদিন পরে বাস্তব মূর্তিতে চোখের ওপর দিয়ে খেলে গেল সারা রাত ধরে। এমন একটি রাত্রির জন্যই তা মানুষ সারাজীবন সাধনা করে কেউ পায় না। আমি কিছুই করি নি কিন্তু পূর্ণপাত্রকে সাজিয়ে এনেছে আমার সামনে। আমি মথুর করে নিয়েছি আজকের রাত।

আমরা বসে বসে দেখলাম কি করে মহাকালের চক্র ঘুরছে। প্রহর বয়ে গেল বর্তমানকে অতিক্রম করে ছাড়া পাওয়া পাখির মতন। যখন পুব আকাশ লাল হয়েছে, ব্রাহ্মমুহূর্তে ঘুম ভাঙা পৃথিবী ভিতমত চোখে তাকিয়ে আছে সদ্যোজাত শিশুর মত, তখনই পরোবীক্ষণ আমাদের নিয়ে এল বর্তমানে, আমাদের সময়সময়ে। বোধহয় আগে থেকেই টিউন করা ছিল, আমার চোখের ওপর ভেসে উঠল একটি পরিচিত কমনীয় মুখ। অনেক দিন তাকে দেখি না—তবু যাকে ভুলি নি।

আমি চিৎকার করে উঠলাম—ওই তো ওই যে কেয়া! অঙ্গদ, ওই কেয়া এসেছে।

ধন্য অঙ্গদ! এমন ভালবাসা কে বেসেছে? কে হারিয়ে যাওয়া প্রেয়সীকে আবার মূর্ত করে তুলতে পেরেছে এমন করে?

কলকাতার রাস্তার ভিড়ের মধ্যে দিয়ে একা হেঁটে চলেছে কেয়া। হাতে তার কয়েকখানা বই। সেই পরিচিত ভঙ্গিতে পা ফেলছে সে। কাঁধের কাছে শাড়িতে ব্লেচ লাগান দূর থেকে দেখেও সেটা চিনতে পারলাম। অঙ্গদই ওর জন্মদিনে ওকে দিয়েছিল। কি ছেলেমানুষ আর নিষ্পাপ দেখাচ্ছে কেয়াকে! সেই আশ্চর্য বড় বড় দুই চোখ, ঠোঁটের কৈশোরসুলভ ভঙ্গী। আহারে একেবারে দুধের মেয়ে! এমন এক ধরনের মেয়ে আছে না, যাদের অবয়বে প্রেমিকার চেয়ে মায়ের আবেদন বেশী? লালসার চেয়ে আশ্রয় অনেক বেশী প্রকট? কেয়া সেই ধরনের মেয়ে ছিল, পৃথিবীর সহস্র কণ্ঠের কথা যাদের কাছে এলে ভুল হয়ে যায়। সেই কেয়া ওই পরোবীক্ষণের পর্দার মধ্যে এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে। বুকটার ভেতরে কোথায় যেন কষ্ট হচ্ছে! মৃত্যু কেন আমাদের আবৃত করে রেখেছে? আমাদের হাসি-কান্না-উন্নতি-অবনতি-পাপ-পুণ্য সবই মৃত্যুর সর্বব্যাপী আচ্ছাদনের নীচে একদিন শেষ আশ্রয় লাভ করে। সম্রাট ও ভিক্ষুক—উভয়েই একদিন মহাকালের শীতল করস্পর্শে ঝরাশ্রমী ফুলের মত জীবনের বৃন্ত থেকে ঝরে পড়ে যায়।

পরোবীক্ষণের পর্দায় আমাদের একেবারে মুখোমুখি এসে থেমেছে কেয়া। কোন কারণে সে এমনি থেমেছিল সেদিন। অন্য মনে ব্রোচটা ঠিক করল, তারপর পূর্ণদৃষ্টি তুলে আমাদের দিকে তাকাল। সেদিনও কি কারুর কেমন তাকিয়েছিল।

ওই যে দাঁড়িয়ে রয়েছে কেয়া। হাত বাড়ালে অঙ্গদ ছুঁতে পারে। অথচ আর তো কোথাও সে নেই। অঙ্গদ আছে, অঙ্গদের দুঃখ আছে—কিন্তু অঙ্গদের আশ্রয় নেই। অসহ্য নিরাশার দিনে হাহাকার করে তার নাম ধরে ডেকে উঠলেও তার সাড়া আর ভেসে আসবে না। নদীর ধারে না, ফুলের বাগানে না, পরিচিত কোথাও না—তার অস্তাচলপরবর্তী কোন অচেনা ঘাসে ছাওয়া মাঠে তার পালকের মত শরীর পড়ন্ত হেমন্তসূর্যে মেলে দিয়ে সে বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে। সেইখানে গেলে অঙ্গদের সঙ্গে তার দেখা হয়ে যাবে।

অঙ্গদের দিকে তাকালাম। দুই করতলের ওপর মুখ রেখে সে নির্নিমেষে তাকিয়ে রয়েছে কেয়ার প্রতিচ্ছবির দিকে। এমন করেও মানুষ দেখতে পারে! দৃষ্টির পথ বেয়ে তার আত্মা যেন এগিয়ে গিয়ে কেয়াকে স্পর্শ করছে। টপটপ করে ফোঁটা ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ছে তার চোখ দিয়ে। দুই হাত ভিজে যাচ্ছে। কিন্তু তার দেহ একটুও নড়ছে না কান্নার বেগে ফুলে ফুলে উঠছে না। পেছন থেকে দেখলে কেউ বলতে পারবে না যে তার মনে কোন ভাবান্তর উপস্থিত হয়েছে।

আমি তার কাঁধে হাত রাখতে সে চমকে উঠে পকেট থেকে রুমাল বের করে চোখ মুছে ফেলল। তারপর সোজা হেপ্টে গিয়ে সুসচ অফ করে পরোবীক্ষণ থামিয়ে দিল। আমার দিকে তাকিয়ে বলল—আনন্দ, তোর ডানদিকে টেবিলের ওপর একটা স্ক্রু-ড্রাইভার আছে ওটা নিয়ে আয় তো—

দিলাম। দ্রুত হাতের কয়েকটা মোচড় ও পরোবীক্ষণের পেছন দিকের ডালাটা খুলে ফেলল। ভেতরে হাত দিয়ে বের করে আনল জলপাইয়ের মত আকারের একটা ক্রিস্টাল, টেবিলের কাছে এসে নামিয়ে রাখল সেটা। আমার দিকে তাকিয়ে বলল—আনন্দ যদি পরোবীক্ষণের থিয়োরী সত্য হয়, তাহলে হয়ত পরলোক বলে কিছু আছেই। সেখানে কেয়া নিশ্চয় আমার জন্য অপেক্ষা করে থাকবে। কিন্তু পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছি এই বাতাসে নিঃশ্বাস নিয়েছি এ মাটির অন্ন দিয়ে শরীর পুষ্ট করেছি, মানুষের সান্নিধ্য পেয়েছি। এদের প্রতি আমার কিছু কর্তব্য আছে। পৃথিবীতে এখন বড় দুর্দিন। অন্ন-বস্ত্র-জনসংখ্যা দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি—অনেক কিছু। এসব কিছু কিছু আমি দূর করতে পারব না? নিশ্চয় পারবো। কিন্তু এই যন্ত্র থাকতে নয়। এই যন্ত্র থাকলে আমি রোজ বসে বসে শুধু কেয়াকে দেখব সারাদিন ধরে, আর আমার চারদিকে ভীত, ক্ষুধার্ত, হতাশ মানবাত্মা ক্রন্দন করবে। আমি তা সহ্য করতে পারব না। কেয়া তো আমার আছেই। প্রলোভনটা নষ্ট করে ফেলি আগে। বিখ্যাত হবার মত আবিষ্কার আমি আরও একশোটা করব।

একটুও হাত কাঁপল না অঙ্গদের। আমি সামান্যতম বাধা দেবার আগেই টেবিলের তলা থেকে একটা পাটসেরী হাতুড়ী তুলে সজোরে আঘাত করল টেবিলে রাখা ক্রিস্টালটার ওপরে—যা পৃথিবীতে মাত্র একটাই আছে। বিনাশে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল সেটা।

সাহিত্যের নেপথ্যে

মিত্র ঘোষ

বইপাড়াকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিন, দৈনিক সাপ্তাহিকেরা। নানা চাপে বইপাড়ার আজ বড় দুর্দিন।

গত সংখ্যায় বলেছিলুম দেকোনের গল্প। এবার গল্পের দেকানের কথা বলি, যেখানে জীবনটাই একটা গল্প হয়ে উঠেছে। গোড়লে শুরু করতে হয় অনেক দূরে থেকে। সেই ১৯২৫ সালের কলকাতার জগবন্ধু স্কুলের উঠোন থেকে।

দুজন ছেলে পড়ার ফাঁকে ফাঁকে হাতে লেখা একটা মাসিক পত্র বের করতো। পত্রিকার নাম দেওয়া হল বিজয়, অর্থাৎ বিজয়ী। অজয়ের মতো অমরা জয় করবো। একজনের গল্প লেখার অভ্যাস, আরেকজনের আঁকার, মাঝে মাঝে কবিতা। স্কুল থেকে দু' কদম পালটান করে একজন গিয়ে হোলো সেন্ট জেভিয়ার্সে আর একজন প্রেসিডেন্সিতে।

তখন হেমেন্দ্রকুমার রায়ের নাচঘর জোর চলছে, দাম ১ পয়সা। ওরকম একটা কাগজ বের করলে কেমন হয়? যেমন ভাবা তেমনি কাজ শুরু হয়ে গেল। টিউশানির টাকা জমিয়ে কাগজ বের হোলো, সম্পাদক হলেন ওই দুজন—একজনের নাম গজেন্দ্রনাথ মিত্র, আরেকজন সমরনাথ ঘোষ।

তখন রসচক্রের আড্ডা দারুণ জমে উঠেছে। নিয়মিতভাবে আড্ডায় যান কালিদাস রায়, মাঝে মাঝে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। এঁরা দুজনও ঢুকে পড়লেন। বললে পত্রিকায় লেখা দিতে কোনো অসুবিধে হোলো না। টাকা দেবে না, পয়সা দেবে না, এই কাগজে লিখবে কে? তবু এঁদের দুজনকে কেউ ফেরাতে পারতেন না। এমনকি নজরুলও না। নজরুল লিখলেন—"আমি ভাই খাপা বাউল। আমায় দেউল। আমার এ আপন দেহ। তখনকার দিনে কাগজ ছাপা হোতো এক হাজার। কিন্তু হলে হবে কি, বিজ্ঞাপনের টাকা পাওয়া যায় না, হাঁটতে হাঁটতে দুজনের চটির শুকতলা ক্ষয়ে গেল। ফলে কাগজ আর টেকানো গেল না। দুজনের প্রচণ্ড দেশভ্রমণের নেশা। টাকা জোগাড় করতে হবে, একবার ৪০ টাকা ধার করে দুজন দিল্লী বেড়াতে যাবেন ঠিক হোলো। টিকিট এর খরচাই তো ৩২। হাতে রইলো ৮। ঐ ৮ টাকা সম্বল করে দিল্লী, আগ্রা, বেনারস চষে এলেন।

তখন কালিকা প্রেসের মালিক মনোরঞ্জন চক্রবর্তী মশাই। সুন্দর সেট-আপ দিয়ে ছেলেদের বই বের করতেন। স্বামীজীর জীবনী, কালিদাস রায়ের 'শ্রীগৌরাঙ্গ' নগেন চট্টোপাধ্যায়ের 'মহীয়সী নারী', 'দেশবন্ধু' 'মতিলাল'-এর জীবনী। দাম এক টাকা, দেড় টাকা, দুটাকা। ভাল সিল্কনে এইসব বই প্রেসে ছাপা হোতো। খুব একটা বিক্রি হোতো না। ডাঁই হয়ে পড়ে থাকতো এক কোণে। এদের বইয়ের বিজ্ঞাপন দেওয়া হোতো না। ওঁরা ঠিক করলেন এই বইগুলো কমিশনে বিক্রি করলে কেমন হয়? দেখা গেল কলকাতার স্কুল বইগুলো প্রায় লুফে নিল। তখন দুজনে দুটো সুটকেস বোঝাই করে একজন দক্ষিণে আরেকজন উত্তরের কলকাতার স্কুলে স্কুলে হেড-মাস্টারমশাই মাস্টার-মশায়দের কাছে নিয়ে হাজির করতেন। বিক্রি হতো, কমিশনের অনেক টাকা তখন হাতে। তখনকার দিনে একটা গ্রাজুয়েট ছেলে ২৫।৩০ টাকা মাইনে পেলে তার বাড়িতে খটক দৌড়াদৌড়ি করতো। সেই সময় এ-টাকা হাতে আসা মানে স্বর্গের দ্বার খুলে যাওয়া। এঁদিকে মাস্টারমশাইদের রোগে বেশ দহরম-মহরম হয়ে গেছে। ওই বই ছাড়া স্টেটসম্যান দেখে সাহেবদের পুরনো বই সস্তায় কিনে আবার সেটা প্রায় পুরো দামে ওদের কাছে বিক্রি করা। তখন বাংলা বই বাংলাদেশের বাইরে খুব একটা বিক্রি হোতো না। ওদের মাথায় একটা বুদ্ধি এলো—আচ্ছা, এইসব বই বাইরে নিয়ে গেলে কেমন হয়! ঠিক। তখন শিলির পার্কলাশং হাউসের 'পৃথিবীর ইতিহাস' বাহান্ন ভলামে বেরিয়েছে। মূল্য মোট বত্রিশ টাকা। একসে লইলে ৩০ টাকা। কিন্তু লইবে কে, পড়িয়াই থাকে। ওঁরা গিয়ে বললেন কমিশনে বিক্রির কথা, ২৫ পারসেন্ট কমিশন। সঙ্গে সঙ্গে বই এক-সেট করে নিয়ে গেলেন। অশিনয়বাবুকে গিয়ে বললেন—দেখুন আমরা পাটনা যাচ্ছি, বই যদি আরো দরকার হয় সঙ্গে সঙ্গে পাঠিয়ে দেবেন; রাজি হলেন শিশিরবাবু। পাটনায় দারুণ বিক্রি হয়ে আরো চাহিদা বাড়ল। যা বিক্রি হয়েছিল, ২৫ ভাগ ছেপে পুরো টাকা টি এম ও করে পাঠানো হোলো। সঙ্গে সঙ্গে কলকাতা থেকে বইও এসে পড়লো। পাটনা থেকে ভাগলপুর। তখন সুরেন ভট্টাচার্য-মশাই ছিলেন ওখানকার হেডমাস্টার। যা নিয়ে যাচ্ছি তাই বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। এমন সুন্দর কভার, এরকম বই তো এর আগে ওদের হাতে এসে পৌঁছোয় নি।—মফস্বলে কি বিরাট বাজার কলকাতার বাইরে পড়ে আছে। সুতরাং এ সুযোগ ছাড়া উচিত নয়। তিন-চার মাস বাদে আবার ছোট্ট পোর্টফলি বেনারস। বেনারসে আবার একবারে গণেশ

সমরনাথ ঘোষ

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

যাব্ ছিলেন কিছুদিন। ফলে ও'র অনেকগুলি লাইব্রেরী, লোকজন বেশ কিছু চেনা।

এর আগে আবার একটা ঘটনা ঘটে গেল। প্রেসিডেন্সী কলেজের ধার দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ চোখে পড়লো—স্কুল নতুন বই। উল্টে দেখা গেল প্রভাত মুখোপাধ্যায় এবং দিনেশ-কুমার রায়ের বই। আরো কিছু মূল্যবান বই। দোকানীকে জিজ্ঞেস করলুম তোমার কাছে বই আছে সব বই কিনে নেবো। একটা রসিদ এনো। দু-তিন কপি করে সব বই পেলাম। দিনেন্দ্রবাবুর পেলাম প্রায় ৪০।৫০ খানা সব বইগুলো আবার একটা শক্ত কাগজ দিয়ে বাঁধানো যেমন এখনো থাকে। সেনারসে আমরা আশার অতীত লাভ করলাম। প্রবাসী বাঙালীরাও এসব বই পেয়ে খুশি হল। ৫।৬ মাস পরে আবার বেরোলাম—এলাহাবাদ।

এবার আমাদের মাথায় বই প্রকাশ করার মতলবটা এলো। তবে আমরা একটা কথা ভেবেছিলাম বই করি তা যেন শিক্ষা বা সাহিত্যের সঙ্গে যুক্ত থাকে। কিন্তু এখন কি বই করা যায়? টেকসট বই তো পুরো রিস্ক-এর ব্যাপার। না লাগলে ভরাডুবি। কি করা যায় ভাবতে ভাবতে মাথায় একটা নতুন প্ল্যান এলো। তখন কবি কালিদাস রায়মশাই দেওঘরে শিক্ষক। দু হাতে নানা রকমের পাঠ্যপুস্তক লিখে যাচ্ছেন। ইংরেজী ভাষার ওপর কবিশেখরের অসাধারণ দখল। ঠিক মতো উচ্চারণ জানতে অনেক তাবড় তাবড় মানুষ ও'র কাছে যেতেন। তখন ঠিক উচ্চারণ সব সময় হোতো না। কালিদাসবাবু সাহেবদের কাছে পড়েছেন তাছাড়া তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি। ভাবলাম—ঠিক মতো বাংলার উচ্চারণ লিখে ইংলিশ টু বেঙ্গলী একটা পকেট ডিকসেনারী করলে কেমন হয়। ধরলুম কবিশেখরকে। আমাদের প্ল্যানটা ও'র ভালো লাগলো। কিন্তু ছাপাবার অত টাকা পাই কোথায়? কালিকা প্রেসের সঙ্গে তখন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। প্রেসটা ম্যানেজ হয়ে গেল। আর কাগজের দাম দিলেন গজেনবাবুর দাদার এক ডাক্তার বন্ধু। তখন দু রিম কাগজ কুলি-ভাড়া সব মিলিয়ে দশ টাকায় হয়ে যেতো। বইতো ছাপা হলো। কিন্তু প্রকাশকের নাম কি দেওয়া যায়। ভাবতে ভাবতে প্রথম ওই বইয়ের ওপর প্রকাশনীর নাম পড়লো—মিত্র ঘোষ। শ্রীগুরু লাইব্রেরীকে আমরা এজেন্ট ঠিক করলুম। বাজারে দারুণ বিক্রি হোলো পকেট ডিকসেনারী। পাঠ্য-পুস্তকের তালিকায় শেষে এ বইয়ের নাম উঠলো। মাস্টারমশাইরা নিজেদের সংগ্রহে রাখলেন।

এবার? এবার কি বের করা যায়। তখন তো আমরা 'রসচক্রে'র মেম্বার একদিন সুরেন দাশগুপ্ত রসচক্রের সদস্যদের বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানালেন। কারণ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বলাকা'র ওপরে উনি একটা প্রবন্ধ লিখেছেন সেটা পড়ে শোনাবেন। আমরাও গেলুম। শুনলুম। পরবর্তী প্রকাশনার ব্যাপারটা সঙ্গে সঙ্গে ঠিক হয়ে গেল। সুরেনবাবুর বাড়ি গিয়ে বললুম—আপনার প্রবন্ধটা যদি ছাপি, আমাদের দেবেন?

—দূর, প্রবন্ধের বই কি ছাপবে। আমার বাপু টাকা-পয়সা নেই।

—না না, টাকা দিতে হবে না, আমরাই জোগাড় করবো।

—কেন বাপু তোমরা রিস্ক-এ যাচ্ছো?

দিলেন সুরেনবাবু আরো কয়েকটি প্রবন্ধ যোগ করে 'রবি দীপিকা'। মিত্র ঘোষের দ্বিতীয় বই বেরুলো। তখন 'গুরুদাস' ছাড়া কেউ বই বের করে, তার বিজ্ঞাপন দেবার কথা খুব একটা ভাবতো না। আমরা প্রবাসী, ভারতবর্ষ, মডার্ণ রিভিউ সব কাগজে পুরো একপাতা জুড়ে সুন্দর লে-আউট করে বিজ্ঞাপন দিতে বাজারে যেন হৈ-চৈ পড়ে গেল। বিক্রি বিক্রি এবং বিক্রি। তার মধ্যেও সজনীকান্ত দাস তাঁর শনিবারের চিঠিতে ঢুকতে ছাড়লেন না। তিনি আলোচনার আগে নাম দিলেন—'রবি দি পিতা'। শ্রীগুরু লাইব্রেরী মানেই তখন পাইকারী বাজার বোঝাতো। ইতিমধ্যে গ্রীণরুম ভুবনবাবুর সঙ্গে আমাদের আলাপ হয়েছে। রবি দীপিকা পড়ে রবীন্দ্রনাথ সুরেনবাবুকে একটা চিঠি দিলেন—'ইতিপূর্বে কোনো কোনো গ্রন্থে আমার কাব্যের আলোচনা দেখেছি, সে যেন শাড়ির তক্মাযুক্ত দেহের বিশ্লেষণ। তাতে মর্মগত প্রাণের আভাস পাইনি, তুমি তা নতুন ভাবে উদ্ঘাটিত করলে।' আমরা তো গল্পটাকে আরও ফলাও করে পুরো পাতা জুড়ে বিজ্ঞাপন দিতেই শ্রীগুরুর টনক নড়লো বিক্রির বহর দেখে।

মনোরঞ্জনবাবু এবার বললেন—কালিদাস আর ঘরে ঘুরে বেড়াবেন। এ পাড়ায় একটা দোকান নিন।

দোকান? অত টাকা পাবো কোথায়? মনোরঞ্জনবাবু তদ্দিনে আমাদের চিনে নিয়েছেন। উনি ব্যবস্থা করবেন বললেন। কারণ ও'র বইও তো বিক্রি হবে। তখন কলেজ স্ট্রীট পাড়ায় অঢেল ঘর ছিল। বাড়িওলারা সব 'টু লেট' বোর্ড ঝুলিয়ে বসে থাকতো। —খুঁজতে খুঁজতে ১২ নম্বর কলেজ স্কোয়ারে একটা বড় ঘর পেলাম। ৩০ টাকা ভাড়ায় এই প্রথম 'মিত্র ঘোষ'-এর দোকান হল। ৮ টাকায় দুটো আলমারী। ১২ টাকায় সেক্রেটারীয়েট টেবিলে ডেস্ক-অলা কাউন্টার। ভুবনবাবুর ঘরে আধ-ভাঙা হয়ে একটা আলমারী পড়েছিল, সেটাও দিয়ে দিলেন। ১৯৩৬ সালের ১ মাঘ উদ্বোধন হলো দোকান। 'রসচক্র' সিরিজের এজেন্ট আমরা। মাঝখানে 'রসচক্র' সিরিজের এজেন্ট হিসেবে পোস্টার পড়ে গেল কলকাতায়। উদ্বোধনের দিন সব সাহিত্যিক প্রকাশকদের নিমন্ত্রণ করলাম। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের হরিদাসবাবু নিজে এলেন। আনন্দবাজারে হাফ পাতার বিজ্ঞাপন বেরুলো। এলেন কালিদাস রায়, হেমেন রায়, সুরেনবাবু। চা মিষ্টি দিয়ে আপ্যায়ন হলো। প্রথম সেলস কাউন্টারে বসলেন মন্টুবাবু। মাসিক মাইনে আট আনা। আমরা তখনো শূন্যের আছি।

এরপরে আমরা বের করলাম—'সমসাময়িক কবির চোখে রবীন্দ্রনাথ'। রবীন্দ্রনাথকে তার পরবর্তী কবিরা যেমন ভাবে দেখেছেন, তার অন্তরঙ্গ চিত্র। যতীন বাগচী থেকে তরুণ কবি বুদ্ধদেবকে দিয়ে শেষ। এই বইটাও জনপ্রিয়তা পেলো। পাটনা ইউনি-ভার্সিটির পঠিতও হয়েছিল। ইতিমধ্যে 'রবি দীপিকা' খরচ-খরচা বাদ দিয়ে প্রায় ৪৫০ টাকা আমরা সুরেনবাবুর হাতে তুলে দিলাম। তখনকার দিনে ৪৫০ টাকা মানে ভাবা যায় না। অভিভূত হলেন সুরেনবাবু। তারাশঙ্করের বই তখন কাত্যায়নী থেকে বেরুতো। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় নতুন উপন্যাস দিতে রাজী হলেন না।—ঠিক আছে, আমরা আপনার ছোটগল্পের বই ছাপবো। তখনও ছোটগল্পের বিক্রি ছিল না।

তবু গজেনবাবু বললেন—প্রকাশনীর প্রেস্টিজের জন্যে ভালো ভালো লেখকের বই করা দরকার। তখন তরুণ লেখকদের মধ্যে প্রবোধ সান্যালের খুব ভালো বাজার। ইতি-মধ্যে আমরা ভারতবর্ষে, সচিত্র শিশিরে লিখছি। গজেনের তো বহু গল্প 'ভারত-বর্ষে' বেরিয়েছে। ফলে লেখকদের সঙ্গে সমযোগীর হিসেবে কথা বলার সাহসটুকুও অর্জন করেছি।

ইতিমধ্যে আমরা সুরেনবাবুর আরেকটি বই করলাম—দার্শনিক—দর্শনের ওপর প্রথম বাংলা বই। এবার ধরলুম প্রবোধ-বাবুকে। তখন প্রবোধবাবুর 'মহাপ্রস্থানের পথে'র ২য় মুদ্রণ শেষ হয়েছে। ৩য় মুদ্রণের জন্যে ও'কে অনুরোধ করলাম। যুবকদের

অফিস এবং ইনজিনীয়ারিং-এর নিখুঁত সরঞ্জাম এখানে এসে কিনে নিয়ে যান

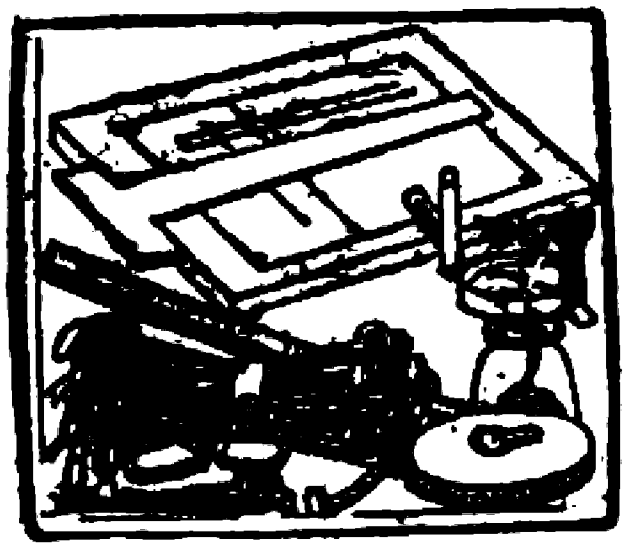

সার্ভে, ড্রইং, নানা রকম কাগজ খাতা, লেজার, ক্যাশবই, কালি ও উৎকৃষ্ট ছাপার জন্য অন্যতম প্রতিষ্ঠান,

কুইক ষ্টেশনারী ষ্টোর্স

৩ই, রাধাবাজার ষ্ট্রীট কলিঃ-১

ফোন ঃ ২২-৮৫৮৮, ৬৭-৪৬৬৬

গ্রাম ঃ ফ্লোরাপিন, পোর্ট বক্স—০৮ হাওড়া

পরিবেশক ঃ ক্যালকেম প্রডাক্টস (ষ্টেশনারী বিভাগ)

কাছে তখন প্রবোধবাবুর জনপ্রিয়তা ছিল। জানতুম কেটে যাবে। ইতিমধ্যে একটা ঘটনা ঘটে গেছে। ৩য় মুদ্রণ ছাপবার আগে প্রবোধবাবু দেড়শোর বদলে একশো পঁচাত্তর টাকা চেয়েছিলেন। 'গুরুদাস' বললেন দেড়-শোর এক পয়সাও বেশী দিতে পারবো না। ইতিমধ্যে আমরাও দরেছি। প্রবোধবাবুর কেমন যেন একটা জেদ চেপে গেল। কিন্তু আমরা তো এখন টাকা দিতে পারবো না: বই বিক্রি হবার পর লাভের 'ফিফটি ফিফটি'। প্রবোধবাবু একটু ভেবে বললেন— আপ-নারাই ছাপুন। ছেপে বিক্রি করে প্রায় ৭০০ টাকা প্রবোধবাবুর হাতে তুলে দিতে উনি প্রায় বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। এবার তারাশঙ্করের কাছে এই ঘটনাটাকে ফাঁদ কষিয়ে উপন্যাস চাইলাম। এবার আর আমাদের উনি ফেরাতে পারলেন না। উনিও পেমেন্ট দেখে অবাক হয়ে গেলেন।

—আপনাদের চুক্তিনামায় কোনো লেখার বাধ্যবাধকতা কিংবা চুক্তি হয়নি?

না, আজো শুধু বিশ্বাস, বন্ধুত্ব এবং কথার ওপর আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি। বাঙালী যা, অন্ততঃ এই বাজারে কেউ কোনো দিন তা পারেনি। আজও আমরা প্রায়ই একসঙ্গে বাইরে ভ্রমণে যাই। আমরা দুজনেই নেরাঁতে 'বয়ে করেছি। কারণ নিজের পায়ে না দাঁড়িয়ে বিয়ে করবো না, এই ছিল আমাদের প্রতিজ্ঞা। আজ আমাদের কর্মচারীর সংখ্যা প্রায় ৩০ জন, বইয়ের সংখ্যা প্রায় চারশো। এখনো আদি অকৃত্রিম সেই মন্টুবাবু আছেন। এসেছেন ভানুবাবু। একটা গল্প বলি—বছর পাঁচেক আগেকার গল্প। একদিন আমরা দুজনে শ্রীগুরু লাইব্রেরী থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে শ্রীমানী বাজারের কাছে এসেছি, হঠাৎ একটা মটরগাড়ি প্রায় গায়ে এসে কাঁচ করে থেমে গেল।—কি রে বাবা, গায়ে এসে পড়বে নাকি! ততক্ষণে খট করে দরজা খুলে গিলে-করা পাঞ্জাবী ধুতি পড়ে এক ভদ্রলোক নেমে দু হাত জোর করে বললেন—নমস্কার, চিনতে পারছেন?

ঃ না ঠিক মনে পড়ছে না। মানে...

—আমি আপনাদের চিনি। ১৯৩০-এ আপনাদের একসঙ্গে দেখেছিলাম এক জায়গায়। ১৯৪০-এ দুজনকে দেখেছিলাম অন্যেক জায়গায়। ১৯৫০-এ আবার সেই দুজনকে চোখে পড়েছিল আরেক জায়গায়। ১৯৬৯-এ আবার সেই দুজন? বাঙালী এতদিন আজ একসঙ্গে থাকতে পারে? এই-বার ভদ্রলোককে চিনলুম, চেহারা অনেক পালটেছে। তখন ওঁর নরেন দেবের মতো একটা গোঁপ ছিল, সেটা নেই। ওঁর সঙ্গে একটা হোটেলে আলাপ হয়েছিল।

ভারত ফটোটাইপের অজিতবাবুর বাবা ললিত গুপ্ত আমাদের খুব স্নেহ করতেন। জীবনে বন্ধুদের মার খুব খেয়েছেন। বন্ধুর কাছ থেকে আঘাতে তার বুক ভেঙে গিয়ে-ছিল। তাঁর মৃত্যুশয্যায় শেষ কথা ছেলেকে বলেছিলেন—গজেন সমুখ এখনো একসঙ্গে আছে? গজেনবাবুর ছেলেপুলে নেই। পরে দোকানটা বন্ধে নষ্ট না হয় তাই বছর দুয়েক আগে এটাকে লিমিটেড কোম্পানি করা হয়েছে। শ্রদ্ধেয় সুবীর সরকার মশাই একটা কথা বলতেন—লাখো, প্রকাশকদের টাকা সবই বইয়ের মধ্যেই থাকে। গোছা গোছা টাকা নিতে নেই। তবে অভাব হবে না, চলে যাবে।

তবে মানুষ দেখেছিলাম বিভূতিভূষণকে। ওরকম মানুষ হয় না। জানো তো বই-বাজারে লেখকের কান ভাঙানির অন্ত নেই। বিভূতিবাবুকে বোধহয় কেউ 'বঙ্কু' বলে থাকবে। একদিন উনি হন্তদন্ত হয়ে এসে বললেন—আমার বইয়ের টাকার হিসেব দাও। দিলাম। আমার টাকার দরকার - কতো? চারশো পঁচিশো। সন্ধ্যায় আসবো। মোটা-মুটি করে টাকা গুছিয়ে রেখে দিলাম। সন্ধ্যে-বেলা এসে উনি দেখলেন, টাকা জোড় করেছি। এবার টাকাগুলো সরিয়ে মন্টুকে বললেন—মন্টু, ৯০টা টাকা দাও। ও-টাকার দরকার নেই। বিভূতিবাবুকে আমরাই জোর করে এ্যাকাউন্ট করে দিয়েছিলাম বেঙ্গল সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কে। একবার এই ব্যাঙ্ক ফেল পড়বার সম্ভাবনা হয়েছিলো। ব্যাঙ্ক রান করছে। হুড়হুড় করে সব লোক টাকা তুলে নিচ্ছে। সর্বোনাশ, বিভূতিবাবুকে জোর করে আমরাই ওই ব্যাঙ্কে এ্যাকাউন্ট খুলে দিয়েছি, একটাও চেক আজ পর্যন্ত কাটেন নি। ভীষণ অপরাধী মনে হলো নিজেদের। সঙ্গে সঙ্গে তার করলুম, শীগ্গির কল-কাতায় আসুন। কলকাতায় আসতেই বললুম —দাদা, যা টাকা আছে সব তুলে নিন। ব্যাঙ্কের অবস্থা ভালো নয়, সবাই যে যার টাকা তুলে নিচ্ছে।

উনি বললেন, লজ্জা করছে, কি বলবো বল তো? কি আবার, বলবেন ভাগনির বিয়ে। ম্যানেজারের কাছে গিয়ে তাই বলা হলো। ম্যানেজার বললেন আপনিও ওই হুজুগে পড়ে টাকা তুলবেন? তবে ভাগনির বিয়ে বলছেন, নিশ্চয়ই টাকা তুলবেন। আপনি চেক দিন আমি এখন থেকে ভাঙিয়ে দিচ্ছি। সিগ্রেটটা ঠোঁটে চেপে এক মিনিট ভাবলেন বিভূতিবাবু। তারপর বল-লেন—থাক টাকার দরকার নেই। তখনো দেখা যাচ্ছে টাকা তোলার ভিড়। এ সময় এই মানসিকতা বড় বড় শিল্পপতিদেরও বোধ হয় থাকত না।

আজ বইয়ের খরচা ৭।৮ গুণ বেড়ে গেছে। আগে ছিল এ ব্যবসা বিশ্বাসের উপর দাঁড়িয়ে। বিজ্ঞাপন দৈনিক সাপ্তাহিকে ধার দিত। আজ আগে থেকে টাকা জমা দিতে হয়। দস্তরীর জায়গা নেই, সঙ্গে সঙ্গে বই নিয়ে যেতে হবে। প্রেসের জায়গা নেই, ফর্মা উঠিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আজ বইপাড়ার দুর্দিন: আমরা টিকে আছি, কিন্তু ছোট প্রকাশকেরা নাভিশ্বাস ফেলতে পারছেন না। এই সময় আপনাদের মতো কাগজের তরফ থেকে যদি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন, তবে এ ব্যবসা আবার জমজমাট হয়ে উঠতে পারবে, নইলে নয়। তা না হলে এখন বা প্রেজাকসন কস্ট এবং সীমিত বাজার, তাতে অসংখ্য যে বই-পাড়ার দুর্দিন ঘনিয়ে আসবে এটা নিশ্চয়ই বলা যায়।

তবু আজও নববর্ষের দিন আমরা সবাইকে ডাকি। কিছু টাকা দিই। কারও পাওনা না থাকলেও দিই। আমরাই প্রথম বের করি 'শ্রেষ্ঠ গল্প' সিরিজ, 'ফুলবাগান' সিরিজ, 'পেপার ব্যাক' পকেট বই।

আজও দুজনে পাশাপাশি বসি।

এই হল পঞ্চাশোর্ধ গজেন্দ্রনাথ মিত্র এবং সুমথনাথ ঘোষ আর মিত্র ঘোষের গল্পের জীবন। আজও ঠিক সেইভাবে চলেছে। শুধু বয়ে গেছে সময়।

শান্তিলতা চট্টোপাধ্যায়

স্বাগত প্রধানমন্ত্রী

বাংলায় স্বাক্ষর

ত নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত বিশ্বভারতী গ্রন্থমেলা প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ন্দী পরিদর্শন করেন। প্রদর্শনীর নমন্ত্রীর জীবনী নিয়ে লেখা এক লা বইয়ে বাংলায় স্বাক্ষর দেন। লকাতার এক সাংবাদিকের কন্যা। ন্দিরা প্রদর্শনী।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বুদ্ধি- সভায়। সেখানে তাঁর মন্তব্য : ন জার বাহুপন্থা নিয়ে তর্কবিতর্কে লক্ষেপ না করে পরিবেশের পানে ছিলেন। যার কোনো নীতির ফলে মানুষের কল্যাণ হয়, অথচ সেই ীয়েরও কিছু উপকার হয় তবে তার নিন্দা করা ঠিক নয়। জরুরী ফলে সাংবাদিকতার কাজ করা হচ্ছে মনে করা ভুল। আজকে দের সামনে গঠনমূলক সাংবাদিক- র সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। বিশ্ব- র সভার পর সঞ্জয় সরকারি কর্ম- এক সভায় ভাষণ দেন এবং সন্তোষী

ইনডাব স্টেডিয়াম পরিদর্শন করেন।

সেদিনের কর্মসূচীর মধ্যে সবচে ইত্রবহোস ছিল শহীদ মিনার ময়দা ৰব সমাবেশে সঞ্জয়ের ভাষণ। অগণি মানুষের এই সমাবেশেও সঞ্জয় অ বলেন, দক্ষিণ-বামের বিবাদ ভুলে এ সাধারণ মানুষের কল্যাণের জন্যে ক করতে হবে। কথা কম, কাজ বেশি—এ হচ্ছে স্লোগান। যুব কংগ্রেস কর্মী ভেদাভেদ ভুলে কাজে নামতে ডাক দি তিনি বলেন, এই ধরনের ভেদাভেদ সৃষ্টি মূলে বিরোধী দলের। কমুনিস্টদের স পরিহার করতে পরামর্শ দেন সঞ্জ বৃটিশ আমলে কংগ্রেস কর্মীরা স্বাধীনতার জন্যে লড়ছিলেন, তখন কমুনিস্টরা হাত মিলিয়েছিল ইংরেজে সঙ্গে। এই বাংলা ভারতের সমৃদ্ধ রাজ্য বলেই ইংরেজরা এখানে এসে বা শুরু করেছিল। তখনকার স্থানীয় শাসক দুর্বলতা ও অনৈক্যের সুযোগ নি ইংরেজরা অন্যের সাম্রাজ্যের পত্তন ক আজ বিরোধীরাও এই ধরনের সুযো নেওয়ার জন্য তৈরী হচ্ছে, কলকাতা ছা আগে সঞ্জয় শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের সঞ্জয় ভাষণ দেন। সভাপতিত্ব ক তুষারকান্তি ঘোষ।

২৭-২-৭৬

সেবা

CENTRAL LIBRARY

বিদেশের কথা

আরেকটি আমেরিকান কেলেঙ্কারি

আমেরিকায় কেলেঙ্কারি ফাঁস করে দেওয়ার যেন ধুম পড়ে গেছে। ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারি, সি আই এ কেলেঙ্কারি, বিদেশে মার্কিন বাদশাহী রপ্তানি সংক্রান্ত কেলেঙ্কারি—মার্কিন কেচ্ছাকাহিনীর যেন আর শেষ নেই। সর্বশেষ যে কেলেঙ্কারি নিয়ে বিশ্বজোড়া হৈ-চৈ পড়ে গেছে সেটি হল, বড় বড় আমেরিকান কোম্পানি বিদেশে নিজেদের পণ্য বিক্রির জন্য পৃথিবীর ছোট বড় অনেক দেশে কোটি কোটি ডলার ঘুষ বিলিয়ে ঐসব দেশের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের হাত করছে। এই মার্কিন কেলেঙ্কারির ধাক্কায় বিভিন্ন দেশের রাজনীতিতে যে নাড়া পড়েছে এমন আর আগে হয় নি।

এই ঘুষ দেওয়ার ব্যাপারে যাদের নাম উঠেছে তাদের একটি হল লকহিড এয়ারক্রাফট কর্পোরেশন। এই কোম্পানি সামরিক বিমান সহ নানা ধরনের বিমান তৈরি করে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বিভাগেরও একটি বড় যোগানদার তারা।

এই লকহিড কোম্পানির টাকা ফাঁসের পকেটে গেছে বলে খবর ফাঁস হয়েছে তাঁদের একজন হলেন হল্যান্ডের প্রিন্স বার্নহার্ড। পুরো নাম হিজ রয়াল হাইনেস বার্নহার্ড লিওপোল্ড ক্রেডারিক এভারহার্ড জুলিয়াস কুর্ট কারেল গুস্তিভ সিয়েটার। বয়স ৬৪ বছর। সামাজিক পরিচয়—হল্যান্ডের রাণী জুলিয়ানার স্বামী। রাণীর স্বামী হলেও বার্নহার্ড নেহাৎ নিষ্কর্মা প্রিন্স নন। তিনি নিজের দেশের সামরিক বাহিনীর ইনস্পেকটর জেনারেল, প্রায় তিনশত ব্যবসায় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের বোর্ড বা কমিটির সদস্য। লুপ্তপ্রায় পশুপাখীদের সংরক্ষণের আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত এবং এই উদ্দেশ্যে তিনি 'ওয়াইল্ড লাইফ ফান্ড' নামে একটি বিশেষ তহবিল পরিচালনা করেন। সবচেয়ে বড় কথা, তিনি হল্যান্ডে তৈরি পণ্যের বাজার খোঁজার জন্য সারা পৃথিবীতে ঘুরে বেড়ান এবং এ ব্যাপারে তিনি বেশ কিছুটা সফলও দেখিয়েছেন।

প্রিন্স বার্নহার্ড যদিও জন্মসূত্রে জার্মান তাহলেও গত যুদ্ধের সময় নাৎসী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে হল্যান্ডের লড়াইয়ে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিয়ে তিনি ওলন্দাজদের মন জয় করেছেন। ওলন্দাজদের মধ্যে রাজপরিবার সম্পর্কে যে গভীর সম্ভ্রমবোধ রয়েছে তাতেও প্রিন্স বার্নহার্ডের অবদান রয়েছে। কিন্তু এহেন ভাবমূর্তি রাজপুরুষও একটি গভীর কেলেঙ্কারির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ায় হল্যান্ডে দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে, যার আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া সুদূরপ্রসারী হতে পারে। মার্কিন সিনেটের একটি সাব-কমিটি লকহিডের বেনামে সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে গিয়ে যে সাক্ষ্য পেয়েছেন তাতে বলা হয়েছে, হল্যান্ডকে ১০০টি স্টার ফাইটার জেট বিমান বিক্রি করতে গিয়ে লকহিড কোম্পানি প্রিন্স বার্নহার্ডকে ঘুষ দেওয়ার জন্য ষাটের দশকে ও সত্তরের দশকের গোড়ার দিকে ১১ লক্ষ ডলার খরচ করেছিল। এই টাকা সরাসরি প্রিন্স বার্নহার্ডের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল, এমন কোন সাক্ষ্য প্রমাণ অবশ্য নেই। তবে লকহিডের প্রতিনিধিরা বলেছেন, সুইজারল্যান্ডে অবস্থিত একজন মধ্যস্থের মারফৎ এই বার্নহার্ডকে দেওয়া হয়েছে আর টাকাটা যে শেষ পর্যন্ত প্রিন্সের কাছে পৌঁছেছে সে বিষয়ে তাঁদের মনে কখনও কোন সন্দেহ ওঠে নি।

প্রিন্স বার্নহার্ড নিজে এই অভিযোগ স্বীকার করেননি, সুস্পষ্টভাবে অস্বীকারও করেন নি। ব্যাপারটি সম্পর্কে অনুসন্ধান করে দেখার জন্য ওলন্দাজ সরকার একটি কমিটি গঠন করেছেন। কমিটির অনুসন্ধানে প্রিন্স বার্নহার্ড যদি সম্পূর্ণ নির্দোষ প্রমাণিত হন তাহলে ভাল, কিন্তু সামান্যতম সন্দেহের ছায়াও যদি থেকে যায় তাহলে পর্যবেক্ষকদের ধারণা, হল্যান্ডের রাজনীতিতে তার সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। এমনকি এই কেলেঙ্কারির জের হিসাবে রাণী জুলিয়ানাকে হয়তো সিংহাসনও ত্যাগ করতে হতে পারে। যদি তাই হয় তাহলে হল্যান্ডে রাজতন্ত্র উচ্ছেদ করে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবি প্রবল হয়ে উঠতে পারে।

লকহিড কেলেঙ্কারির ধাক্কা অন্য কোন দেশে, রাজনৈতিক আঘাত দিয়েছে সেগুলির মধ্যে একটি হল জাপান। মার্কিন সিনেট সাব-কমিটির চেয়ারম্যান ফ্রাঙ্ক চার্চের খবর হচ্ছে, জাপানের প্রতিরক্ষা বিভাগকে ও সেদেশের বিমান সংস্থা অল নিপ্পন এয়ারওয়েজকে নিজেদের বিমান বিক্রি করার জন্য লকহিড জাপানের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের ১ কোটি ২০ লক্ষ ডলার ঘুষ দিয়েছে। এই প্রসঙ্গে ইয়োশিও কোডামা নামে, একজন কোটিপতি জাপানীর নাম উঠেছে। ঘোরতর দক্ষিণপন্থী ও কট্টর জাতীয়তাবাদী এই কোডামা জাপানে লকহিডের প্রধান এজেন্ট। কয়েক বছর আগে এই কোডামা তাঁর একটি বইয়ে এই বলে বাহাদুরি নিয়েছিলেন যে, ১৯৫১ সালে তাঁর উদ্যোগেই লকহিড কর্পোরেশন জাপানের প্রতিরক্ষা বিভাগকে ২০ কোটি ডলার মূল্যের ১২০টি এফ-১০৪ স্টার ফাইটার বিমান বিক্রির ফরমায়েশ পেয়েছিল। কোডামা সৌকিওর সরকারি মহলে কার উপর কিভাবে প্রভাব খাটিয়েছিলেন সিনেটর চার্চ অথবা লকহিডের মুখপাত্র সেকথা প্রকাশ করেন নি। কিন্তু জাপানের মানুষের সন্দেহ গিয়ে পড়ছে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী কাকুই তানাকার উপর। নানাবিধ অভিযোগে তানাকাকে ১৯৭৪ সালে প্রধানমন্ত্রীর আসন থেকে সরে যেতে হয়েছিল। তিনি একটু একটু করে ক্ষমতায় ফিরে আসার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু এখন লকহিড কেলেঙ্কারি অবাধ সব কিছু অনিশ্চিত করে তুলল। আগামী ডিসেম্বর মাসের মধ্যে জাপানে যে নির্বাচন হওয়ার কথা আছে এই কেলেঙ্কারির প্রতিক্রিয়াটি একটি বড় ইস্যু হবে সন্দেহ নেই। ক্ষমতাসীন লিবারেল ডেমোক্রাটিক পার্টি এই ধাক্কা কিভাবে সামলাবে সেটা দেখার বিষয়।

লকহিড কেলেঙ্কারির বাণিজ্য অন্যান্য অনেক দেশের রাজনীতিকের ভবিষ্যতের উপর ছায়া বিস্তার করেছে তাঁদের মধ্যে আছেন পশ্চিম জার্মানীর প্রাক্তন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ফ্রানৎস জোসেফ স্ট্রাউস ও ইতালির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লুইসি গুই।

যেসব তথ্য ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পাচ্ছে তাতে দেখা যাচ্ছে, এই কোটির অনেক আন্তর্জাতিক ঘুষের কারবারে জড়িত রয়েছে আরও অনেক বড় বড় মার্কিন কোম্পানি ও আরও অনেক দেশ। অতিসম্প্রতি উদাহরণ:—

ফ্রান্সিস্কো—সানফ্রান্সিসকোর ইতালীয়ান ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম বাতিল করবার জন্য বিমানবাহিনীর সুপ্রিম কমান্ডার ৯ লক্ষ ডলার ঘুষ নিয়েছিলেন।

স্টকহোম—সুইডেনের অয়েল কোম্পানি প্রেসিডেন্ট অয়লস্ট বার্নার্ড কেলেঙ্গা ও সেদেশের দুজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে ২ লক্ষ ডলার ঘুষ দিয়েছে।

হন্ডুরাস—ইউনাইটেড ব্রান্ডস কোম্পানি সেদেশের সরকারি অফিসারদের কয়েক লক্ষ ডলার ঘুষ দিয়েছে। হন্ডুরাসে এই কোম্পানির বিস্তীর্ণ কলাবাগান রয়েছে।

বেনারসী সিল্ক • তাঁত শাড়ির শাল • আলোয়ান
মেঃ রামকৃষ্ণ ভাণ্ডার
৫৪৫/১জি.টি.রোড (সাউথ) হাওড়া

: উপর শুল্ক কমাবার ব্যাপারে
রের উপর প্রভাব ফেলার
ঘুষের টাকা খেয়েছিল
ন সঙ্গে সাওয়ার অবৈধভাবে
টিশ ব্রাডফোর্ড কোম্পানির চুক্তি
ক নিউইয়র্কের একটি ব্যাঙ্কে
কে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা

...

ক দুবের প্রথমে ইরান ক
টমোটো আমদানি নিষিদ্ধ

তার স্থগিত বাবদ ঐ কিংসের নির্মাতা প্রুডেন্সিয়াল এরোনিক্যাফট কর্পোরেশন নিউইয়র্কের দুজন ইরানীকে ২ কোটি ৮০ লক্ষ ডলার দিয়েছে।

দক্ষিণ কোরিয়া—গালফ অয়েল কোম্পানি শাসক দল ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিকান পার্টির একজন নেতাকে ৪০ লক্ষ থেকে ১ কোটি ডলার দিয়েছে।

সৌদি আরব—সৌদি সরকারের কাছে এফ-৫ বিমান বিক্রি করে আদনান খাসোগি নামে একজন কোটিপতি আরব ব্যক্তি এয়ারক্রাফট কোম্পানির কাছ থেকে ১৩ কোটি ৬০ লক্ষ ডলার দালালি পেয়েছেন। সৌদি বিমান বাহিনীর দুজন জেনারেলকে দেওয়ার জন্য এই খাসোগিনের মারফৎ নগদ সাড়ে চার লক্ষ ডলার ঘুষ দিয়েছিল।

২৫-২-৭৬ পপুলার

দাঁতের ডাক্তাররা বলেন

নিয়মিত দাঁত ব্রাশ করলে

আর মাড়ি মালিশ করলে

মাড়ির গোলযোগ ও দাঁতের

ক্ষয় রোধ করা যায়

নিয়মিত ফরহান্স টুথপেষ্ট ব্যবহার করেন এমন অনেকে অযাচিত প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে লিখেছেন:

"আমার মাড়ির গোলযোগ ছিল···একে একে আয়ুর্বেদিক, হোমিওপ্যাথিক আর অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ সামরিক আরাম পেয়েছি। শেষ পর্যন্ত, এক দাঁতের ডাক্তারের কথামত ফরহান্স টুথপেষ্ট ব্যবহার করতে শুরু করলাম, আর আশ্চর্য! ···এখন আমার দাঁত আর মাড়ি অনেক ভালো আর শক্ত হয়েছে···আমি বিশ্বিত।"

(মিঃ) গোপাল সিং
কোটা

"···আমার স্ত্রী দাঁতের গোলযোগে ভুগছিলেন···টুথপেষ্ট বদলে ফরহান্স ব্যবহার করতে শুরু করলেন···এমন সুফল পেলেন, যে এখন অন্য কারো মাড়ির গোলযোগ হলেই উনি তাঁকে ফরহান্স ব্যবহার করতে জোর করেন। আমার ভাই যিনি ইংল্যান্ডে, তিনিও তাঁরতে তৈরী ফরহান্সের ৩টি টিউব পাঠানোর জন্যে পীড়াপীড়ি করে লিখেছেন।"

(মিঃ) টি. জি. এম. ডিসিলভা
বম্বে

"রাজযুদ্ধির এক ডেন্টিই···দাঁত আর মাড়ির জন্যে আমাকে ফরহান্স টুথপেষ্ট ব্যবহার করতে বললেন। আমি অবিলম্বে ওঁর উপদেশ পালন করলাম, আর অল্প সময়ের মধ্যেই আমার নিশ্বাস আর মাড়ি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলো। সেই থেকে, আমি ফরহান্স ছাড়া আর কিছু জানি না। আমার সারা পরিবার (আমরা ৯ জন!) ফরহান্স ব্যবহার করি, আর আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই অভ্যাস আর বিশ্বাস আমাদের পরিবারে পুরুষানুক্রমে চলবে।"

(মিঃ) পি. কে. নায়ার
চিরালা, অন্ধ্র প্রদেশ

(এই প্রশংসাপত্রের প্রতিলিপি (ফটোস্ট্যাট) কেবি অন্যান্য এক কোঃ পিস-এর জোরালো অফিসে দেখতে পারেন।)

ভালোভাবে দাঁতের যত্ন নিতে হলে রোজ রাতে আর সকালে ফরহান্স টুথপেষ্ট ও ফরহান্স ডবল অ্যাকশন টুথব্রাশ ব্যবহার করুন···আর নিয়মিত আপনার দাঁতের ডাক্তারের পরামর্শ নিন।

ফ্রি নমুনা! কথাপূর্ণ সচিত্র পুস্তিকা "আপনার দাঁত ও মাড়ির যত্ন"। এই পুস্তিকা পেতে হলে অনুগ্রহ করে এই কুপনের সঙ্গে ৬ পয়সার ডাকটিকিট পাঠান, এই ঠিকানায়: ম্যানার্স ফেন্টাল অ্যাডভাইসরী ব্যুরো, পোষ্ট বক্স নং ১০০৩১, বম্বে ৪০০০০১।

নাম _____ বয়েস _____

ঠিকানা _____

•অনুগ্রহ করে যে ভাষায় চান তার বাঁচে দাগ কেটে দিন—ইংরিজী, হিন্দী, মারাঠী, গুজরাটি, উর্দু, পাঞ্জাবী, বাংলা, অসমীয়া, তামিল, তেলেগু, মালয়ালম, কানাড়ী।

ফরহান্স টুথপেষ্ট এক দাঁতের ডাক্তারের তৈরী

139 F-203 BN

উপন্যাস

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

আদ্য শেষ রজনী

।। দুই ।।

মর্নিং স্কুল। আট ধরিয়ে ভোরের চা খেয়ে সন্ধ্যা। আজ নিজে উঠে চা করল লীলা। শুধু নিজের জন্যে। এক কাপ। অমিয়র ঘুম ভাঙাবে না। মুখে হাসির মত কি একটা জিনিস মাখিয়ে ঘুমোচ্ছে। বিছানা থেকে উঠবার সময় জানলা দরজা ভাল করে ভেজিয়ে ঘরটা অন্ধকার করে দিয়ে এসেছে। পাছে অমিয়র চোখে আলো পড়ে ঘুম ভাঙিয়ে দেয়।

অনু আর বিল্টু সাঁতারে গেছে। ওরা ফিরলে বাবার সঙ্গে জলখাবার খাবে। অনুই দিতে পারবে। বড় মেয়ে এখন বড় হচ্ছে। ছোটোদের ঘুম ভাঙবে সবার পরে। তখন ছুটকির বায়না সামলাবে দুজনে। তার বাবা আর তোলা কাজের লোক সন্ধ্যা।

লীলা আজ একটু আগেই পৌঁছালো স্কুলে। ইনস্টলমেন্টে যে ছেলেটি দিদিমণিদের শাড়ি দিয়ে যায়—সে আজ খুব ভোর ভোর আসবে। বোর্ডের ডি-এর টাকা আজ পাওয়ার কথা। পেলে সেও একখানা শাড়ি নেবে। তুরে। কালো আর লাল ডোরা। ইনস্টলমেন্টে নেবে। অনুর জন্যে। অনুর একদম নিজের কোন শাড়ি নেই। চান্স পেলেই তার শাড়ি পরে আয়নার সামনে দাঁড়ায়।

শাড়িওয়ালা ছেলেটি বেশ বলে কিন্তু। আপনার মিল্টাবের আর্কাটিং আমি দেখেছি। ছেলেমানুষ। একদম বয়স না হোকরার। চব্বিশ-পঁচিশ হবে। বিশ-বাইশখানা শাড়ি নিয়ে হাজির হয় এক একদিন স্কুলে। ছোট পোর্টলা। টিচার্স রুমের মেঝেতে যখন মোট খুলে বসে—একদম পাকা দোকানী যেন।

তার কাছ থেকে কোনদিন কেনা হয়নি লীলার। এমনভাবে লীলার দিকে তাকিয়ে ফি-বার শুকনো মুখে ফিরে যায়। আজ কিনবেই সে। যা হয় হোক। ভাল কথা। ভেতলার দাশদাকে রেশনের টাকাটা তো দিতে হবে।

অমিয়র ঘুম ভাঙালো অনু। সুইমিং কস্টুম তারে টাঙিয়ে দিয়েছে। নিজেরটা আর বিল্টুরটা।

অমিয় তখনো শুনতে পাচ্ছিলো, 'দুই ফুলের মতি হোস।'

কি আশ্চর্য, ছিমিমা সেই আগের মতই আছে। একটুও পালটায়নি। স্বপ্নে মানুষ একরকমই থাকে। টসকায় না।

অমিয় জানলা খুলে দিয়ে রোদ নিয়ে এল ঘরে। রোজ সকালটা তার কাছে একটি করে নতুন দিনের সুরু। বড় ভাল লাগে এই সময়টা। সন্ধ্যে হলে মনে হয়—একটি দিন ফুরিয়ে গেল। খরচের খাতায় উঠে গেল।

ছুটকির সঙ্গে জলখাবারের বাটি নিয়ে বসে অমিয় ডাই-না-না করে নিজে মুটি খেল। মেয়েকে খাওয়ালো। এই মেয়েটি তার মুখ পেয়েছে একদম। চুপ করে থাকলে বিষাদ এসে ওর সারা মুখে পাতা দিয়ে বসে। তখন ওর চোখ মেলে তাকানো একদম বয়স্ক লোকের মত।

—বাবা। আজ সকালে তুমি নাটক লিখবে না?'

—লিখব মা-মণি। তুমি কি করবে এখন?'

—ছবি আঁকব। স্কুলের দিদিমণির ছবি। মায়াদির ছবি—'

—মায়া মিসকে তোমার বুঝি খুব ভাল লাগে?'

—আমায় খুব ভালবাসে বাবা। তেমার 'ফেরিওয়ালার মতো' দেখেছে।' ছুটকি নিজেও দেখেছে। মায়ের সঙ্গে বসে। ফার্স্ট নাইট। নতুন নাটক নামলে লীলা দেখতে যায় পরলা নাইটে। বিকু দত্ত যায়। বিকুর বউও যাবে।

ছুটকি বক্তৃতা থামিয়ে বাবার কোলে বসল। অনু আর বিল্টু এতক্ষণে পাশের ঘরে পড়ার টেবিলে বসেছে। ওরা কি পড়ছে—তা আর দেখতে হয় না। এই একটা সুবিধা অমিয়দের। নে পড়। পড়তে বস। বলে সারাদিন পেছনে লেগে থাকতে হয় না।

খানিকক্ষণ ড্রইংপেন দিয়ে কাটাকুটি আঁকতে আঁকতে অমিয় দরকার মত জায়গায় তার পছন্দসই ডায়লগ পেয়ে গেল।

'আমি সবসময় ভুলতে চাই—আমি কে?'

নতুন নাটকে সেই খারাপ মেয়ের মুখে লাইনটা বসালো অমিয়। লাস্ট সিন। ডাইনিং টেবিল। এ সব জায়গায় সে নিজেকে নাটকের কুশীলবের একজন ভেবে নেয়। নাহলে তার কথার দিকে হয়ত ভালোভাবে মন দেয় না। জীবনের ঝোল সে নিজেকে ভেবেই লিখে চলেছে। স্টাডির ধুলো মাখা মন্থর নাটক লেখা হয় না। কোথায় লাইট জ্বালাবে। কোথায় মিউজিক হ্যান্ড গান বা সংলাপ সুর মেলাবে, এর একটা অভ্যাস থাকা চাই।

আজকের নাটক শুধু আজকেরই নাটক। শুধু এগোলে আর এস্কেপ নিলেই হয় না। প্রথম দিন রাত সংলাপ বলতে বলতে ওয়ার্ডিং পাল্টে যায়। স্টেজকে অমিয় এই দিনে দুভাগে ভাগ করেছে। আজকাল আর মোশন মাস্টারদের দিন নেই।

ফুর্তিবাজ গ্রামের বড়লোকের মধ্যে ছেলে জীবন স্টেজের ডানদিকটায় উঁচুমত বারান্দায় দাঁড়িয়ে। পাশেই শোবার ঘরের পর্দা—ভ্রালনার জমকপড় দেখতে পাবে অডিয়ান্স। সুটকেস গুছিয়ে চলে যাবার মুখে ঘুরে দাঁড়াবে। বলবে—

'আমি সবসময় ভুলতে চাই—আমি কে? আর তুমি সবসময় আমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছো—আমি কি?'

লাইনটা পরো করে অমিয় নিজেই মনে মনে বিড় বিড় করে নিল। মানে আউড়ে নিল। খারাপ মেয়ে—মানে ঠিক কাজেই যার বদনাম—এমন মেয়ে বিদায়ের মুহূর্তে সুটকেস হাতে ঝুলিয়ে এই সংলাপ বলবে। জোর পড়বে দু জায়গায়। 'আমি কে?' আর 'আমি কি?'—এই দু জায়গায়। এই 'কে' এবং 'কি' যেন অডিয়ান্সের বুকে গিয়ে বিঁধে যায়—তবেই না সাকসেস, নইলে মাঠে মারা যাবে। কিন্তু এ ডায়লগ বলবে মত মেয়ে কোথায়। কোথায় পাওয়া যাবে? লীলা ঠিকই বলেছে। এই রোলের ওপর নাটক দাঁড়াবে। এই রোল ফুলে গেলে নাটক ফুলে যাবে।

'কেন যে অত বাড়াবাড়ি রকমের খণ্ড খণ্ড সাজতে গেলে! নাহলে তো কোন অসুবিধেই ছিল না।'

কেউ শুনতে না পায় এমনভাবে ডায়ালগটা বলল। মুখ তখন থাকবে অডিয়েন্সের দিকে। সুজাতা চোখের জল চেপে বারান্দার দিকে দাঁড়ানো। ভোরের ট্রেনে কলকাতায় ট্রেন ধরবে। তখন সে জীবনকে বলবে 'কেউ খোঁজ করলে বলবে—সুজাতা মরে গেছে।'

আর এগোতে পারল না অমিয়। গ্রুপের [illegible] এখন এই সময়টায়

সবাই আসে। বিলেত কবে যাচ্ছিস সেও থাকে। ছোটখাটো আলাপ-আলোচনা যা থাকে—তা সকালেই ওদের সঙ্গে সেরে রাখে অমিয়।

সন্ধ্যে সওয়া ছটা। ফ্ল্যাটবাড়ি। ঘরে ঘরে পড়াশুনো। রাস্তাঘাট। দাশদা বাজার নিয়ে ফিরলো। দুহাতে দুটি ব্যাগ। একটি অমিয়দের দরজায় নামিয়ে দিয়ে যাবার সময় বলে গেল সন্ধ্যা বাজার নামিয়ে রেখো।' অমিয় ঘরে বসেই সব দেখল। দাশদাকে ডেকে থামাতে পারত। থামালো না। লোকটা বাজার করে দিচ্ছে। বেশন আনিয়ে দিচ্ছে। একবার অমিয়কে বললো না। অমিয় জানে কতখানি অসহায়—তা জেনে গেছে।

শংকর এসে হাজির। শংকর দত্ত। পশুমুখের কর্মসচিব। গ্রুপের ইংরাজি পাতায় লেখা আছে : একজিকিউটিভ সেক্রেটারি। পরনে পাজামা পরে। ওপরের পানজাবি ওর ভুঁড়ি ঢাকতে পারেনি।

অমিয়র চেয়ে শংকর বছর দশেকের ছোট। স্টেজে অসম্ভব মোবাইল। অমিয় ওর জন্যে নতুন নাটকে একটা বড় রোল ভেবে রেখেছে। ওর গলায় গান আছে পায়ে নাচ আছে। কোরাস সিনে গ্রুপ পড়ার মুখে শংকর লম্বা টানের একটা গান ধরবে। সেই টানের সঙ্গে গ্রুপ পড়বে—আর অন্ধকার অডিটোরিয়ামে আলো জ্বলে উঠবে।

—'তোমার কথামতো দৌড়োচ্ছি কিন্তু বড়দা।'

—'কিরকম?'

—'আজ সকালে বরানগর থেকে প্রায় ছুটতে ছুটতে তোমার কাছে। কিছুই খেতে। টিফিনের ইউনিট ছেড়ে দিলাম।'

—'অত খাস?'

—'মুখে একবার। দুপুরে। একদোগ্রাসও হবে না। সে না থাকলে বেলেঘাটার মোড়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। যদি স্লিম হতাম!'

—'কি হত?'

—'অনেক কিছুই হত।'

—'হুঁ। এই বেশ আছিস। আরেকটু ভালো অবশ্য ভাল। তোমার নাচ গান রসিকতার চেয়েও অডিয়েন্স খুব নেয় শংকর। একটা চরিত্রের ছাপ পড়ে ওদের মনে। ছিমছাম হলে সেটা হত কিনা সন্দেহ। তুই কি চাস? গলায় হেমন্তর গান! উত্তমের চেহারা! বড়ুয়ার ডেলিভারি। দুর্গাদাসের ঘুরে দাঁড়ানো? সে রকম রেওয়াজ কোথায় শংকর? স্টেজ বড় ঝুঁকির জায়গা। বই লিখলে একদিন না একদিন কেউ লাইব্রেরিতে পাতা উল্টে দেখবে। ছবি আঁকলে দেয়ালে টাঙানো যায়। ছবিতে নামলে অন্তত রিলের ভেতর নেগেটিভে বেঁচে থাকা যায়—প্রিন্ট করিয়ে প্রোজেকটরে লাগিয়ে যেকোনো আবার বেঁচে ওঠা যায় পর্দায়। কিন্তু নাটকে?'

—'দাদা তুমি কি বলছো?'

—'ঠিক বলছি রে। স্টেজে ভাল করলে তো ভাল। দর্শকের মনে জায়গা পেলি। সেই দর্শক একদিন বুড়ো হয়ে মরে গেলে তোর অভিনয়ের কথা বলার মত কেউ থাকল না। তুই মানে মানে তখন হারিয়ে গেলি। বড়বাবুর অবস্থাই ভাব না! চল্লিশ বছর অভিনয়ের পর তিনি তো প্রায় বিস্মৃত। তাঁর দর্শকরা মরে হেজে যাচ্ছে। তাঁর কথা বলার লোক কমে যাচ্ছে রোজ। নাটক হল গিয়ে—দেহপট সনে নট সকল হারায়—।'

—'তা তো হল। আজ তো 'ফেরিওয়ালা'র মতো' ত্রয়োদশ রজনীতে পড়বে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আর কত মার খাবে? লোকে নিচ্ছে কি?'

—'সে ভাবনা আমার শংকর। পুরো একটা ম্যাস দেখব। সামনে বর্ষা। তখন এমনিই সেল পড়ে আসে সবার। তখন তুলে দিলে গ্রুপের নামে কেউ কালি দিতে পারবে না।'

—'কিন্তু হুন্ডিওয়ালা কি ছাড়বে? তার কিস্তি তো এসে গেল। সবার হাতই ফর্সা এখন। কি হবে বলতে পার।'

তৎক্ষনি কোন উত্তর খুঁজে না পেয়ে অমিয় বলল, থার্ড সিনে শংকর তুই সামান্য গেরস্থর মেধাবী ছেলে হিসেবে যখন স্টেজে এন্ট্রান্স নিস—তখন আরেকটু বিনয়ী—আরেকটু উজ্জ্বল সতেজ ভাব দেখাস পারিস। রোল অনুযায়ী কেমন হয় আরেকটু।'

—'কেমন করব দেখাও তো।'

অমিয় উঠে দাঁড়াল। পাজামা, পাঞ্জাবির বুকে খেলা। পলকে অমিয়র মুখমণ্ডলী বদলে গেল। এইমাত্র সে হয়ে গেল সামান্য গৃহস্থ। কষ্ট করে ছেলেকে পড়িয়ে শুনিয়ে ভাল উকিল করেছে। অমিয়র ঘরে ঢোকা, কথা বলা—সবই পালটে গেল।

ছোটোন ছবি আঁকা থামিয়ে অমিয়কে বলল, 'নাটক করছো বাবা?'

শংকর তাকে কোলে তুলে নিল,. 'হ্যাঁ মা-মণি। ইনি তোমার পিতা।' বেশ রসিয়ে রসিয়ে বলতে লাগল শংকর. অমাদের অধিপতি, কাবুল কন্দাহারের লোকজনের কাছে জটিল অঙ্কজালে জড়িত। পিতার একটিই স্বপ্ন : তিনি কলকাতার এক কোটি লোককে হাসিয়ে একটি নাটক দেখতে চান। একসঙ্গে এক কোটি অডিয়েন্সের ক্ল্যাপ শুনে বধির হয়ে যেতে চান। উপস্থিত দুলো অডিয়েন্সও পাচ্ছেন না!'

অমিয় মোশান নিয়ে শুরু করছিল। শংকরের দীর্ঘ রসিকতায় আটকে গিয়ে থেমে বসে পড়ল।

—'আজ কিন্তু হল ভড়া রিয়ার করতেই হবে।'

—'দেখি।'

—'না দিতে পারলে শো করতে দেব না। যা কখনো টিকিট বিক্রি হচ্ছে, সে টাকাও না রিফান্ড করতে হয় শেষে।'

—'তুই যা। আমি দেখছি শংকর।'

শেডিংসেট এগিয়ে দিল ছোটোন। বড় পাতা জুড়ে নীল রঙের ওপর কালো গম্ভীর একখানা নৌকো ভাসিয়েছে। বেলা দশটায় রোদে এত তাপ থাকে? শেডিং সাবানের ফেনা লেগে মুখখানা আয়নায় এখন একদম সাহেবের মতো। মাথায় টুপী থাকলেই খাপ খেয়ে যেত। ফেনা মুখানা মুখের ভেতর থেকে হাসলো অমিয়। কুটকেটে সন্ধ্যা কিসব রান্না চাপিয়েছে। কড়াই থেকে ছ্যাকছ্যাক শব্দও আসছিল।

চান করে আয়নায় মাথা আচড়ানোর সময় সন্ধ্যা অমিয়কে ধরল। ভাত বেড়েছি। না খেয়ে বেরোলে বৌদি স্কুল থেকে ফিরে আমায় আস্ত রাখবে না।

—'বলে দিস খেয়ে বেরিয়েছি।'

—'মিথ্যে বলতে পারব না।'

—'খেতে ইচ্ছে নেই রে এখন। এইতো জলখাবার খেলুম।' বলতে বলতে সাড়ে গলিয়ে বেরিয়ে পড়ল অমিয়। প্রথমে যাবে রাজাবাজারের গদিতে। আবার হুন্ডি কাটবে। অন্তত তিনটে দিনের হল ভাড়া তো আজ সন্ধ্যের আগে দিতে হবেই।

ফুটপথ জুড়ে ভিড়। দোকানপাটের ঝাঁপের নিচ পর্যন্ত ক্যাম্বিশ টানিয়ে রোদ আটকানো হয়েছে। পুরোবাসে ওঠা অসম্ভব। পকেটে অত কটা পয়সাই বা আছে। এখন হেঁটে হেঁটে দুর্গাদাসের গদিতে যেতে হবে।

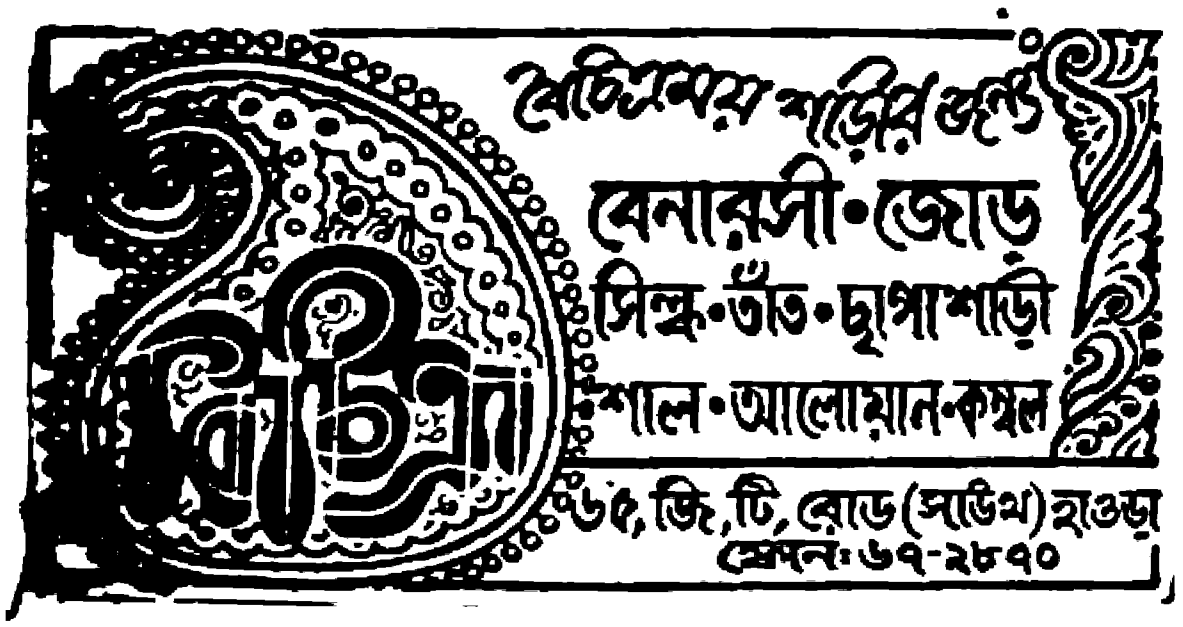

সেই দিনের চেহারার কথা মনে করে দেখুন-
যেদিন সে প্রথম প্রেমে পড়ল!

এ রকম মুহূর্ত জীবনে একবারই আসে। আইসোলি-I দিয়ে তার ছবি তুলে রাখুন—এটি হ'ল সখের ফোটোগ্রাফারদের জন্য পেশাদারদের উপযোগী ক্যামেরা।

• অ্যাক্রোম্যাট এফ ৮ লেন্স • ডবল-এক্সপোজার লক • ৩টি শাটারস্পীড সেটিং • ফ্ল্যাশ গানের জন্য এক্সেসারী শু কন্ট্যাক্ট এবং ইউনিভার্সাল ফ্ল্যাশ কন্ট্যাক্ট পিন।

আরও বিশদ বিবরণের জন্য আগ্‌ফা গেভার্ট ডীলারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। বিনামূল্যে, তিনি আপনাকে সানন্দে দেখিয়ে দেবেন—কি ভাবে নতুন আইসোলি-I ক্যামেরা ব্যবহার করতে হয়।

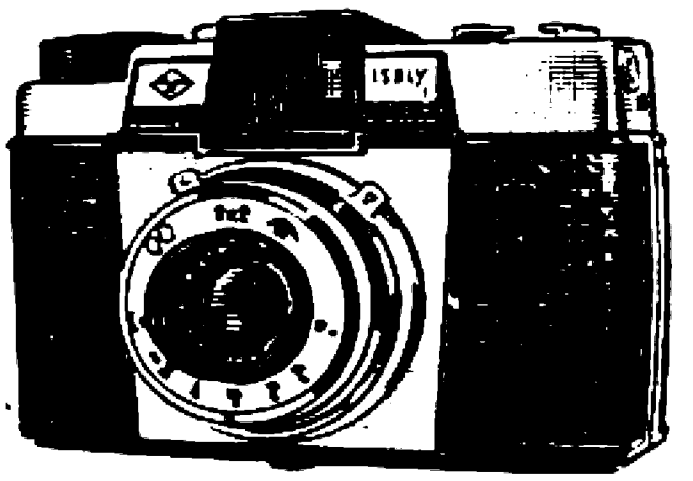

agfa

আগ্‌ফা আইসোলি-I মনে রাখে।

এখন ইউনিভার্সাল ফ্ল্যাশ কন্ট্যাক্ট পিন সমেত পাওয়া যায়

বিতরক:

AGI

আগ্‌ফা-গেভার্ট ইণ্ডিয়া লিমিটেড

মার্কেট ডেভার্স, ৯১ নিউ মেরীন লাইন্স, বোম্বাই ৪০০ ০২০

শাখা: বোম্বাই • নিউ দিল্লী • কলকাতা • মাদ্রাজ

® ফোটোগ্রাফ সম্বন্ধীয় ভারতীয় উৎপাদনের প্রস্তুতকর্তা আগ্‌ফা-গেভার্ট, আমস্টারডাম/লিভারকুসেন এর ট্রেডমার্ক।

আনুমানিক খুচরা দাম ১৬৯ টাকা এক্সাইজ ডিউটি সামান্য কমবেশী হতে পারে

প্রস্তুতকর্তা: বিউ ইণ্ডিয়া ইলেক্ট্রিক লিঃ, বরোদা • বোম্বাই।

SIMOES/AG/22/75 BN

দুর্গালাল একবার বলেছিল, অমিয়বাবু, অসুন হামরা একঠো বড়া পার্টি করি। লোগ খুব জমবে। বস্তিমান্দরের রোহিণীকে বাইজী বনায়ে দিন। হামলোগকে তাহলে অর হুন্ডি কাটতে হোবে না। হামি রুপেয়া লাগাবো।

দুর্গালালেরা এখন বলে ঘরে ঢুকে পড়েছে। ছবিতে তো আছেই।

গদিতে পৌঁছতে পৌঁছতেই এগারোটা বেজে গেল। দুর্গালাল তখনো আসেনি। গদির ছেলেটা বলল, 'আসতে কুছ দেরি হবে। বসুন না।'

সেখানে যারা বসে—তার ভেতর অমিয়র চেনা বেরোলো। নীরেন বেশ ও টাকার জোগা বসে আছে। নতুন বই করেছে ওরা। হল পায়নি বলে গোয়বাগানে স্টেজ বেঁধেছে। বড় প্যান্ডেল। ডেকরেটরের ভাড়া রোজ কম করেও পঁচিশো।

কবে নাগাদ থিয়েটার হবে—তাই নিয়ে দুজনে বসে বসে অনেকক্ষণ ধরে কথা বলল। তাতে ক্ষোভ ছিল। ক্লান্তি ছিল। দুর্গালালের দেখা নেই। ক্ষিদে পাচ্ছিল অমিয়র। খেয়ে না বেরোনো ভুল হয়েছে। এখানে যখন টাকা হল না—তখন অন্য কোথাও যা মরতে হোতেই হবে। শো সেই সন্ধ্যে সাতটায়। আজ ত্রয়োদশ রজনী। আজ হাউস ফুল হবে না? অবশ্য তেরো সংখ্যাটাই বড় ট্রোবাস।

—উঠি ভাই নীরেন।'

—'অমিয়র তো যাবার উপায় নেই। টাকা নিয়ে তবে গোয়বাগানে যেতে হবে।

বিনা অস্ত্রোপচারে
অর্শের
জ্বালা-যন্ত্রণা
থেকে
দ্রুত আরাম
পেতে হলে
হ্যামেসা
মলম
ব্যবহার করুন!

অমিয় মুখে কিছু বলল না। মনে মনে বলল, আমারও তো তাই— শেষে খেলা খুলি বলল, 'দরদা রোডে কার্বালিদের ওখানে গিয়ে দেখি একবার—'

নীরেন ওকে পেছন থেকে থামালো। 'একখানা কার্ড আছে। নিয়ে যা ভাই। আজ বিকেলে হিন্দি হাইস্কুল অডিটোরিয়ামে 'কবিয়াল' স্পেশাল শো। চিফ মিনিস্টার আসছেন দেখতে।'

—'নাটক দেখতে মুখ্যমন্ত্রী আসছেন?'

'কবিয়াল নাটকের কথা শুনেছেন। তাই এক ফাঁকে দেখবেন। বেলা দুটোয়।'

—'দে। কার্ডখানা ভাজ করে পকেটে রাখলো অমিয়। অভিনেতা হিসেবে তারও একখানা ইনভিটেশন কার্ড পাওয়া উচিত ছিল। অভিমান হওয়া উচিত নয়। কার ওপর অভিমান করবে! যাদের ওপর নেমন্তন্নর ভার—তারা হয়ত অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায় নামটা বলের জন্মেও শোনেনি। অভিনয় দেখা দূরের কথা। তবে আমি তো কর্মদিন স্টেজে নামছি না। সন্দেশ। নীলরঙের ঘোড়া। অথ মালতী বৃত্তান্ত কথা। নীলরঙের ঘোড়া সম্ভব নাইট চলেছিল। জায়গা জুটলো না বলে আর চলতে পেল না। নইলে দর্শক তো হচ্ছিল। এখনো অমিয় ভাবে—নতুন নাটক নামবার আগে মুখে পালটাতে হপ্তা-খানেক ধরে 'নীলরঙের ঘোড়া' বলিয়ে নেবে।

অভিনয়ের জন্যে তো কত করল আছে। গ্রুপ থিয়েটার হিসেবে আজও তাদের 'পঞ্চমুখ' তো রবীন্দ্রভারতীর অ্যাফিলিয়েশনই পেল না। পেলে অ্যাডমিডজমেন্ট টাকসের রেহাই পেতে প্রতিবার ওকে কলেকটরের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হত না।

বেশ ছিল জীবনটা আগে। সন্তার দিনে পনেরোশো টাকা মস মাইনে। ডকতর বাবুদের চেম্বারে গিয়ে লিটারেচর যেলে ধরা। সাপ্লেল ফাইল গছানো। ঘুমন্ত অন্তর অফিসের কনফারেন্স—কাফ ব্রেক লনচ, টি, কত কি! তখন লীলা ছাড়া ভাবির গয়না বানিয়ে ফেলেছিল। বাজারে কেন দেনা ছিল না। যত গণ্ডগোলের গোড়া —সরস্বতী পুজোর সময় মুকুট নাটকে পাওয়া সেই মেডেলটা। আচ্ছা দিদিভাই— তুমি সত্যি সত্যি যদি অমন মেডেলটা দিয়ে তোমার গলার হারের লকেট বানাতে—তাহলে বাদ রাগ করতো না?

উল্টো দিকের বসে ভিড় কিছু কম বলে অমিয় দরগা রোডের মোড় অবধি পৌঁছে গেল একঘণ্টার ভেতর। রেসুরে পর্ক সার্কাস ময়দান চনচন করছিল। তার পাশের ফুটপাথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে অমিয়র মনে পড়ল, আজকের বে-থিয়েটার মুখ্যমন্ত্রী দেখবেন—তা প্রায় বিশ বছর আগে ছবি হয়েছিল একবার। তারশঙ্করের গল্প। ডিরেকটর দেবকী বসু। ঠাকুরঝি সেজেছিল অনুভা। তিনজনের কেউ আজ বেঁচে নেই। তখন অমিয়রা কলেজের ছেলে। চরবার লাইন দিয়ে দেখেছিল। রাজন। বসন। এসব রোল তোলা যায়! রাজন করেছিলেন নীতিশ মুখোপাধ্যায়। তিনিও নেই।

হাঁটতে হাঁটতে কর্বালিসের অন্তর পৌঁছে দেখল—ভোঁ ভাঁ। কেথায় কে! কলাহারের ভজন প্রতাপালীন 'রোমে' বেরিয়েছেন। এখনো ফেরার সময় হয়নি। ছবিটা পরিষ্কার দেখতে পেল অমিয়। অফিস গেট, কারখানা ফটক, মরদান, ডক—সর্বত্র কলহারী ঘরেরা দাঁড়িয়ে আছেন। দোষের মধ্যে রেটটা একটু বেশি। তাই বা বিপদের দিনে কে দেয়।

আবার হাঁটো।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে দুটো ভুট্টা পোড়া খেয়ে ফেলল।

এখন আর কোথায় পাওয়া যায়।

অডিটোরিয়ামে চওড়া কারিডরও এয়ার-কন্ডিশন করা। ভেতরে দাঁড়িয়ে গা ঠাণ্ডা করে নিল অমিয়। হাঁটতে হাঁটতে পাঞ্জাবি ঘামে ভিজে গেছে। সুন্দর কাউন্টার অজকের অভিনয়ের সুভেনির। আজকের টিকিটের টাকা প্রধানমন্ত্রীর রিলিফ ফান্ডে যাবে। সুভেনিরের মলাটে কবি আর ঠাকুরঝির ছবি। কবিয়ালের রোলে যে—তাকে অমিয় চেনে। অনেকবার ওর অভিনয় দেখেছে। প্রায় সমবয়সী তারা। একবার সুবীরের সঙ্গে কম্বিনেশন নাইটে কলা-মন্দিরে অমিয় অভিনয় করেছে। সুন্দর গায়। নাচেও ভাল।

ঠাকুরঝির রোলে রজনী দেবী। কত ফেমস। ওর মায়ের অভিনয় অমিয় ছেলে-বেলায় দেখেছে। দশ বছর আগেও দেখেছে। ফিল্মে। থিয়েটারেও। প্রায় তিরিশ বছর ধরে যশটে অভিনয় করেছিলেন রজনীর মা—নীহার। তিনি দেবী চৌধুরি লিখতেন না। থিয়েটারের কাগজে পড়েছে অমিয়—ছবি-ঘরের সঙ্গে থবে ভাব ছিল নীহারের। দুজন দুজনকে বন্ধু বলে ডাকতেন। দুই বন্ধু আজ আর নেই।

রজনীর অভিনয় সবাই জানে। কিন্তু অমিয় কোনদিন দেখেনি। ছবিতে কোঁড়ে মাথায় অনুভার সেই লাইট রেলের পাটি ধরে হেঁটে আসা—সে-ছবি অমিয়র মাথার ভেতর আজও ঝকঝক করছে। রজনীর কি সাধা সে স্মৃতি মোছে।

মুখ্যমন্ত্রী ঢুকলেন। সবাই উঠে দাঁড়াল। তিনি বসলেন। অডিটোরিয়ামে আলো নিভলো। ততক্ষণে ড্রপ উঠে গিয়ে স্টেজ আলোয় আলোময়।

অমিয় সোজা হয়ে বসল। দুধের কোঁড়ে মাথায় ঠাকুরঝি। রজনীর পায়ের আঙুল-গুলো ফুটলাইটের ছটায় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। সুন্দর সাজানো আঙুল। মাথায় ঘোমটা। ভরা কাজলটানা চোখ।

(ক্রমশঃ)

নতুন বই

Vidyasagar the traditional modernizer : Amales Tripathi, Orient Longman. 1974 Price: Rs. 8.00.

বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর অর্ধ-শতাব্দিক স্মরণোৎসব উপলক্ষে রচিত কিঞ্চিদধিক একশো পৃষ্ঠার এই ছোট ইংরেজী বইটি সাম্প্রতিককালের বিদ্যাসাগর বিচার বিষয়ক অন্যতম শ্রেষ্ঠ বই। ঐতিহাসিকের লেখা এই বইটি যে কোনো সাহিত্যিক লেখকেরও ঈর্ষার যোগ্য বলে মনে করি। ঐতিহাসিক ব্যক্তিকে কত সুন্দর করে সামাজিক প্রেক্ষাপটে ফেলে তাঁর ঐতিহ্য আধুনিকতা জন্ম-কৈশোর-যৌবন শিক্ষাদীক্ষা প্রশাসন ক্ষমতা শিক্ষাবিস্তার ও সমাজ সংস্কার, সাহিত্যচর্চা ও সাহিত্যের স্বশ্রেষ্ঠত্বকে ধরা যায় তার প্রমাণ এই বইটি। ইন্দ্রমিত্রের করুণাসাগর বিদ্যাসাগর পড়ে যেমন অধ্যাত্মপ্রসঙ্গের তৃপ্তি পাওয়া যায় তেমনি এই বইটি প্রথাগত হয়েও এতে যুগপ্রবর্তক বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিত্ব বিচারে সামাজিক ও সাহিত্যিক জ্ঞানের নৈবেদ্য আস্বাদ পাওয়া যায়।

বিদ্যাসাগরের পূর্বোক্ত সামাজিক প্রেক্ষাপট ও সাহিত্যিক অবদানের চমৎকার বিশ্লেষণ করে লেখক বিদ্যাসাগরের জীবনবৃত্তান্তটি সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। প্রচুর অস্পষ্ট প্রশ্নের উত্তরও পাঠক খুঁজে পাবেন এই অধ্যায়ে। বিদ্যাসাগরের প্রথম বই বাসুদেব চরিত কেন বেরোয়নি কীভাবে তিনি কোর্ট উইলিয়াম কলেজে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল পড়াবেন (অশ্লীল শ্লোক পড়াতে সংকুচিত হলে কীভাবে ছাত্ররা রেপ অব লুক্রিস এবং পোপ-এর জানুয়ারি অ্যান্ড মের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাঁকে ধাতস্থ করেছিল) কিংবা কীভাবে রসময় দত্তের ঔদাসীন্যে সংস্কৃত কলেজ ছেড়ে কোর্ট উইলিয়মের হেড রাইটার ও ট্রেজারার হয়ে বসলেন ইত্যাদি সব কৌতূহলজনক প্রশ্নের উত্তর পাবেন দ্য টীচার অ্যান্ড দ্য আর্ডাবিনিস্ট্রেটর নামক তৃতীয় অধ্যায়ে। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে (বিদ্যাসাগর অ্যান্ড পপুলার এডুকেশন বিদ্যাসাগর অ্যান্ড ফিমেল এডুকেশন দ্য সোশ্যাল রিফর্মার বিদ্যাসাগর অ্যান্ড বেঙ্গলি লিটারেচর ইত্যাদি) উদ্দীপ্ত সংহত তথ্যের প্রয়োজনীয় তথ্যগুলিকে সাজিয়ে যাওয়া হয়েছে। [illegible]

শৈলজানন্দ ও অচিন্ত্যকুমারের স্মরণসভা

কল্লোল যুগের দুই শক্তিমান কথাশিল্পী শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় এবং অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত স্মরণে সাংস্কৃতিক উদ্যোগে সম্প্রতি দক্ষিণ কোলকাতার লেক রোড এক্সটেনশনে এক স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্র। দুই প্রয়াত সাহিত্যিকের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, মনোজ বসু, সতীকান্ত গুহ, আশাপূর্ণা দেবী, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, প্রমথনাথ বিশী, এবং অমিয়কুমার মজুমদার, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যাতে দুই কথাশিল্পী স্মরণে সাহিত্য পুরস্কার এবং বক্তৃতামালার আয়োজন করেন তার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অনুরোধ জানানোর প্রস্তাব সভায় গৃহীত হয়।

বিভিন্নবঙ্গ কবি সম্মেলন

২২ ফেব্রুয়ারী বারুইপুরে মধ্যদিগন্ত সাহিত্য পত্রিকার উদ্যোগে কবিতা বিষয়ক আলোচনা এবং কবিতা পাঠের একটি উপভোগ্য অনুষ্ঠান হয়ে গেল। একটি কবিতার ওপর শীর্ষক আলোচনায় অংশ নেন অরুণ মিত্র শঙ্খ ঘোষ জগন্নাথ চক্রবর্তী এবং নরেশ গুহ। শঙ্খ ঘোষের আলোচনা এবং

সাহিত্যের খবর

শ্রোতাদের কবিতা বিষয়ক প্রশ্নের উত্তর খুবই উপভোগ্য হয়েছিল। আলোচনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অরুণ মিত্র। ঐ দিনের অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় অধিবেশন ছিল কবিতাপাঠের। প্রায় পঞ্চাশজন প্রতিষ্ঠিত এবং তরুণ কবি স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন অরুণ মিত্র, বিনয় দাশ, মণীন্দ্র রায়, নরেশ গুহ, শঙ্খ ঘোষ জগন্নাথ চক্রবর্তী, রবীন সুর, সামসুল হক, গোলাম কুদ্দুস, হাসেমের হাকিম বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায় ও আরও অনেকে। কবি সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন মণীন্দ্র রায়। অনুষ্ঠানের আর একটি বিশেষ আকর্ষণ ছিল আধুনিক কবিতার গীতিরূপ পরিবেশন। আধুনিক কবিতার সুরকার ঋত্বিক মিত্র এদিন বেশ কিছু আধুনিক কবিতার সার্থক গীতিরূপ শ্রোতাদের উপহার দেন। চার্বাক

[illegible] রেনেসাঁস তত্ত্বকে প্রচ্ছন্ন রেখে টমাস কুহনের বিশ্লেষণ ভঙ্গির প্রতি একটু বিশেষ নজর দিয়েছেন তবু বিচারের ক্ষেত্রে প্রায়শঃই বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তুলনায় রেনেসাঁস হিউম্যানিস্টদের কথাই এসে পড়েছে। বোধহয় রামমোহন বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমের মতো ব্যক্তি বিচারে রেনেসাঁস ব্যক্তিত্বই অনিবার্যভাবে তুলনীয় হয়ে পড়ে। আসলে বুদ্ধদেবের রেনেসাঁস তত্ত্ব মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি কিংবা কুহনহলিংগরের বিশ্লেষণ পদ্ধতি কোনোটিই আমাদের উনিশ শতকের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে হুবহু আরোপ করা যায় না। অধ্যাপক ত্রিপাঠী ফরমুলামুক্ত দৃষ্টিতে উনিশ শতকের দুই সাংস্কৃতিক সংঘর্ষের পটভূমিকায় বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিত্ব ও কৃতিত্বকে বিচার করেছেন। যা লোনালি প্রমিথিয়ুস অধ্যায়টি এই রকম মুক্ত উদ্দীপ্ত ও সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গিতে লেখা। এই শেষ অধ্যায়টি সুখপাঠ্য হলেও একটু বেশি উচ্ছ্বাসিত। বোধহয় বিদ্যাসাগর জীবন তাঁর জীবনীকারের অন্তর্নিহিত শিল্পবোধকে অনিবার্যভাবেই টেনেছে বলেই এমন হয়েছে। সব মিলিয়ে জীবনের ব্যাখ্যা ও কৃতিত্ব বিচারে সামান্য দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও এমন উজ্জ্বল সংহতভাষ্য দুর্লভ বলেই মনে হয়।

—উজ্জ্বল মজুমদার

[illegible] তাঁকে সম্মানিত করা হত। সারা জীবনব্যাপী তাঁর স্বপ্ন ছিল ভারতের স্বাধীনতা। মাদাম কামার সময়ে নারীশিক্ষার খুব বেশী প্রচলন হয় নি এবং বাইরের জগতে কাজের সুযোগও ছিল কম। মাদাম কামা তখন বিদেশে স্বেচ্ছানির্বাসন কালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন। বিদেশে নানা স্থানে ভারতীয় বিপ্লবীদের সঙ্গে গড়ে উঠেছিল তাঁর যোগাযোগ। রুশ সমাজতন্ত্রীদের সঙ্গেও তাঁর সংযোগ ছিল। প্রায় ত্রিশবছর প্যারিসে বাস করার পর ১৯০৫ খৃঃ ৭৪ বছর বয়সে তিনি স্বদেশে ফিরে যাবার অনুমতি পান, এবং তার এক বছর বাদেই বোম্বাই-এ মারা যান।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এই মহিলার গৌরবময় ভূমিকা নিয়ে খুব বেশী আলোচনা হয় নি। ডঃ সাহা এই গ্রন্থে মাদাম কামা সম্পর্কে অনেক তথ্য জানিয়েছেন, যা এর আগে জানা যায় নি। অনেক ছবি ও চিঠিপত্র বইটির মূল্য বাড়িয়েছে।

কাজলরেখা। বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। সাহিত্যানন্দ প্রকাশনী। ৩৪।১-জি কালীনাথ দত্ত রোড, কলকাতা—৩৬। চার টাকা।

কাজলরেখা গ্রন্থে লেখক বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য পুরানো মৈমনসিংহ গীতিকার অন্তর্গত একই নামের রূপকথাটিকেই ছোটদের উপযোগী করে উপস্থিত করেছেন। শিল্পী নিতাই ঘোষের আঁকা প্রচ্ছদ ও পাতায় পাতায় ছড়ানো তাঁর আঁকা রঙীন ছবি এ গ্রন্থের প্রধান সম্পদ হয়ে উঠেছে। [illegible] রূপকথাকে একেবারে একালের

বিজ্ঞান কাহিনী পড়া শিশুদের কাছে সেই মারা-মোরা-রোমান্স-রোমাঞ্চিকতা দিয়ে ঘেরা চেষ্টা শিশুদের উপভোগ্য হবে। সেই ধনেশ্বর সদাগর তার মেয়ে কাজলরেখা, ছেলে রত্নেশ্বর, সেই অদ্ভুত সন্ন্যাসী—যে আংটি আর শঙ্খপাখি দেয় সদাগরকে, শুক-পাখির মজার সব ঘটনা ঘটানো, কাঞ্চন বাসী-হুঁসরাজা প্রসঙ্গ, সোনাধর-কাজল-রেখার কাহিনী— এই সমস্তই লেখক শিশু মনস্তত্ত্বের উপযোগী করে আলোচ্য গ্রন্থে পরিবেশন করেছেন। কাজলরেখার মূল কাঠামো ঠিক রেখে লেখক যে কিছু রং চড়িয়েছেন, তা আধুনিক শিশু সাহিত্যের পক্ষে একান্ত জরুরী। সুখের বিষয় লেখকের সেই রং চড়ানো বিষয়টি যথাযথ মাত্রার ঘটেছে বলেই সর্বকালের শিশু-কিশোর-কিশোরীরা শুধু নয়—সমস্ত শিশু সাহিত্য লেখক ও পাঠক এখানে অভিনব রসবোধে তৃপ্ত হবেন।

ধীরেন্দ্র দত্ত

রঙ্গালয়ের রঙ্গকথা। সমর চট্টোপাধ্যায়। শিশুরংমহল। অবনমহল। কলকাতা—১১। আট টাকা।

শিশুদের নাটক নির্বাচন এবং উপস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে শিশুদের মনের উপযোগী বই বিদেশে রয়েছে কিন্তু এদেশে এমন বই চোখে পড়ে না। দীর্ঘকাল ধরেই এর অভাব ছিল। সম্প্রতি এই ধরনের একটি বই হাতে এল।

সমর চট্টোপাধ্যায় তাঁর রঙ্গালয়ের রঙ্গ কথা বইখানিতে শিশুদের নাটক এবং অভিনয় কলা সম্পর্কে কিছু বিজ্ঞানসম্মত বক্তব্য রাখতে চেয়েছেন। শিশুদের নাটক কিভাবে নির্বাচন করা দরকার কোন বয়সের শিশুদের কেমন নাটক দরকার এবং তার প্রয়োগরীতি বা অভিনয় ধারাই বা কেমন পদ্ধতি অনুসরণ করবে সে সম্পর্কেও মূল্যবান বক্তব্য আছে। নাট্যকার প্রযোজক পরিচালক নৃত্য ও সঙ্গীত পরিচালক শিল্প নির্দেশক রূপসজ্জাশিল্পী ইত্যাদি নানার সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে যে আকর্ষণীয় এবং সরল আলোচনা লেখক করেছেন তা বইখানিকে প্রয়োজনীয় করে তুলেছে। ছাপা এবং প্রচ্ছদ উন্নত মানের এবং শিশুমনের উপযোগীও বটে।

রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতা। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়। ভারতী প্রকাশনী, ১০, কলেজ রো, কলকাতা-৯। মূল্য ৫ টাকা।

রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা' একটি বহুবিতর্কিত উপন্যাস। এই উপন্যাসটি সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পাঠ্য হিসাবে নির্বাচিত হওয়ায় কিছু আলোচনা গ্রন্থ ছাত্র-ছাত্রীদের দিকে লক্ষ্য রেখে প্রকাশিত হয়েছে। অধ্যাপক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় রচিত 'রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতা' সমাজের পক্ষেই হক আর জাতীয় গ্রন্থটিও হয়েছে তাই। সম্পর্কিত ছাত্রছাত্রীদের দিকে লক্ষ্য রেখেই আলোচনাগুলি রচিত হয়েছে। উপন্যাসের সংজ্ঞা, বাংলা উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস সহ রবীন্দ্রউপন্যাসের শুধু আলোচনাই এতে নেই, সেই সঙ্গে রবীন্দ্রমননের উপযোগী সমাজ পরিবেশটি লেখক বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। ছাত্র-ছাত্রদের প্রশ্নপত্রে যে ধরনের প্রশ্ন থাকে, সেগুলির বিস্তৃত উত্তরের মত অংশ এতে আছে। আলোচনা-গুলি ভাল এবং সময়োপযোগী।

সত্যজিৎ, হেমিংওয়ে, পঞ্চার এবং জানকীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ইণ্ডিয়া ইণ্টারন্যাশনাল। ২৮ বিপ্লবী অরুণকুমার চন্দ্র স্ট্রীট। কলকাতা—৭২। দাম ৮-৫০।

চলচ্চিত্রের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে আকিরা কুরোশওয়া, আলফ্রেড হিচকক, ইঙ্গমার বার্গম্যান, এলেন রেণে, জনকে র্দ্যা লুক গদার্দ, ডালাস সর্ক, ফেডেরিকো ফেলিনি ভিসেভোলোদ পুদভকিন, মাইকেল এ্যাঞ্জেলো এানটোনিওনি, লুপিনে ভিস-কণ্টি, সত্যজিৎ রায়, সার্গেই আইজেন-স্টাইনের নাম স্মরণযোগ্য। বর্তমান গ্রন্থে এঁদের অবদানের ইতিহাসকে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

মুখনগরী হংকং । শংকরপ্রসাদ রায় । ইলোরা প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স। ২৮ ডোভার লেন। কলকাতা—১৯। মূল্য আট টাকা।

মুখনগরী হংকং নিছক ভ্রমণকাহিনী নয় আবার ভ্রমণবৃত্তান্ত আশ্রিত কাল্পনিক রোমান্টিক উপন্যাস ঘেঁসা রচনাও নয়।

রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা

সম্পাদক
রমেন্দ্রনাথ মল্লিক

ত্রয়োদশ বর্ষের সূচীপত্র। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (চিঠিপত্র), হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় (উপনিষদ ও রবীন্দ্রনাথ), বরদাপ্রসাদ মিত্র (শ্রীঅরবিন্দের কবিতা ও সাহিত্য-চিন্তা), রমা চৌধুরী (ঝিরুংবাজীর শব্দাদ্বৈতবাদ), শিবেন্দ্রলাল নাথ (টলস্টয়ের জীবন ও সাহিত্য), অমিয়রঞ্জন রায়চৌধুরী (কালিদাস রায়ের কাব্য-পরিচয়), ভরত মুনি (নাট্যশাস্ত্র), পুলিন দাস (ইয়ং বেঙ্গল ও বাংলা নাটক), শোভন সোম (শিল্পী দেবীপ্রসাদ), বিমলকুমার মুখোপাধ্যায় ও রমেন্দ্রনাথ মল্লিক (গ্রন্থসমালোচনা)।

দাম । প্রতি সংখ্যা ৯৫ টাকা

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় । দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন কলিকাতা ৭
পরিবেশক 'জিজ্ঞাসা' ১এ কলেজ রো কলিকাতা ৯

রমাভল্লীতে লেখা বাণিজ্য নগরী হংকং এবং সেই সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অর্থনীতিক সামাজিক কিছু ছবি তুলে ধরার প্রয়াস রয়েছে এই গ্রন্থে। বিশেষ করে হংকংয়ের ব্যবসাবাণিজ্য—সেই প্রসঙ্গে সেখানকার হোটেল ব্যবসার বিবরণও আছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং ভিয়েত-নামের জনযুদ্ধ প্রসঙ্গে লেখক সঠিক বিশ্লেষণ তুলে ধরতে পারেন নি, তিনি লিখেছেন জেনারেল গিয়াপ ধীরে ধীরে সংহত করেন তাঁর সেনাবাহিনীকে। চেগুয়েভারার নীতি গ্রহণ করেন, ইতিহাসের কালানুক্রমহীন এরকম উক্তি উদ্ভট বিভ্রান্তিকর। ইতিহাস ইতিহাসই, তাকে নিয়ে রম্যরচনা লেখার প্রয়াসে তথ্যের বিকৃতি ঘটানো অমার্জনীয়-জনক।

দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ। সম্পাদক, খোন্দকার সিরাজুল হক । ইণ্ডিয়া ইণ্টারন্যাশনাল। ২৮ বিপ্লবী অরুণকুমার চন্দ্র স্ট্রীট কলকাতা—৭২। আট টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

নীলদর্পণ নাটক বর্তমানে বিশ্ব-বিদ্যালয় কর্তৃক ছাত্র পাঠ্য হিসাবে নির্দিষ্ট করার পর বহু সম্পাদিত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। আলোচ্য সম্পাদনার প্রয়াস সেই ছাত্র-ছাত্রীর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই—, সম্পাদক একথা তাঁর নিবেদন অংশে জানিয়েছেন। সম্পাদক খোন্দকার সিরাজুল হক মহাশয় গবেষকের দৃষ্টি নিয়েই গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন। দীনবন্ধু মিত্রের বাল্যকাল ও শিক্ষাজীবন এবং নীলদর্পণ নাটকে বাস্তবতা সংক্রান্ত আলোচনাটি কেবল ছাত্র নয়, সর্বস্তরের পাঠকদের রসপিপাসা তৃপ্ত করবে। আলোচ্য গ্রন্থের মোট তিনটি পর্যায়ের মধ্যে মূলগ্রন্থ সংযোজন করার পর যে শব্দার্থ, টীকা ও তথ্য নির্দেশ লিপি-বদ্ধ করেছেন তা ছাত্র-ছাত্রীদের এবং দীন-বন্ধু মিত্রের গবেষকদের কাজে লাগবে।

সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

বররুচি। (বিশেষ নারীবর্ষ সংখ্যা) সম্পাদনা রেখা বৈতালিক। আবাসবাড়ি। তমলুক। মেদিনীপুর। দাম এক টাকা।

আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ উপলক্ষে প্রকাশিত বররুচির সাম্প্রতিক সংখ্যাটি হাতে এলো। সেকালের সুপরিচিত মহিলা কবি কুসুমকুমারী দাসের দুটি অপ্রকাশিত কবিতা রয়েছে এই সংখ্যাটিতে—সঙ্গে কবি-কন্যা সুচরিতা দাসের লেখা কবির সংক্ষিপ্ত জীবনী, এছাড়াও জীবনানন্দের ছেলেবেলা সম্পর্কেও শ্রীমতী দাসের লেখাটি উল্লেখ-যোগ্য। জীবনানন্দের কবিতা আশা নিরাশার রূপ ও চিত্রকল্প সুলেখা চক্রবর্তীর সংক্ষিপ্ত নিবন্ধটিও ভালো লাগল। প্রখ্যাত কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর ঘরোয়া জীবনের অন্তরঙ্গ ছবি ফুটিয়েছেন কবি-কন্যা গীতা চৌধুরী। নারীবর্ষ সংখ্যার বররুচির সজ্জা এবং উন্নত মানের।

খুলে দিয়েছিল। আর ছোটবেলা
ও'র গান সব সময় শান্তিদায়ক বলে
র ক্ষেত্রে সৃষ্টির স্বচ্ছতা এসেছিল
াবিকভাবেই। সব গানেই রসসৃষ্টি করা
র যদি সে গানকে ভালবাসতে পারা

াইবার গান গাওয়া শুরু, গান অব-
রই উৎসাহ। উনিই আমার সাথে
গন্ধর্বদাদুর আসরে নিয়ে গিয়েছিলেন
বছর বয়সে। সেই যে গাইতে শুরু
ও আজও থামি নি। ভালমন্দ যেমনই
থেকে সমিত্রা হেসে বলে 'আমার
গাওয়ার কখনও ইতি পড়ে নি—
পথ-চলাতেই আনন্দ।'

নিয়মিতভাবে গান শেখা শুরু হয়

বাণী 'বিতান'থেকে। মেজকাকাই ওঁর
আমার ভর্তি করে দিয়েছিলেন। শেখা
কিন্তু গ্রুপ ক্লাশের পরীক্ষা দেওয়া হ
বেন বলে ক্ষিতীশচন্দ্র ঘোষের কা
আলাদা করে শেখা শুরু করলাম। ভজ
রবীন্দ্র সঙ্গীত, রাগসঙ্গীত — সব ধর
গানই তিনি খুব যত্ন করে শেখাতে
আমাদের পাড়াতেই থাকতেন বলে যাত
আমারও সুবিধে ছিল। রেডিওতে অডি
দেবার সময় অতুলপ্রসাদ, রবীন্দ্র সঙ্গী
নজরুল গীতি, ভজন সবেরই অডিশন দি
পাশ করেছি, কারণ আমি সব রকম গান
ভালবাসি এবং কোন বিশেষ ধরনের গা
নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখতে চাই নি। —ত
রবীন্দ্র সঙ্গীতের প্রতি এতটা বিশেষ ধরনে
আকর্ষণ বোধ করার কারণ হোলো
সংচিত্রাদি।

দশ বছর বয়স থেকে আমি সংচিত্রাদি
কাছে রবীন্দ্র সঙ্গীত শেখা শুরু করেছি
চিত্রাপ্রসাদই ওঁর বাড়ীতে আমার প্রথম
নিয়ে গেলেন। প্রথম দিনেই সংচিত্রাদি
উনি'র আহ্বান আমি কোন দিন ভুলব না
'হেমন্তের ভাইঝি, আমারও ভাইঝি। তু
রোজ আমার কাছে এসে গান শিখবি।'

'তারপর অনেক দিন ধরে সংচিত্রাদি
কাছে শিখেছিলাম এবং এখনও শিখছি।

আজকের সফল শিল্পীজীবনের স্মরণীয় এবং উল্লেখযোগ্য ঘটনা এইটেই। সুচিত্রাদি আমায় বিনা পারিশ্রমিকে শেখাতেন। এখনও মনে আছে সর্বপ্রথম কোন গানটি শিখেছিলাম 'আমার নয়ন-ভুলানো এলো'। শেখার সময় মনটা যেন কানায় কানায় ভরে উঠেছিল। তারপর বর্ষা রাতের শেষে 'এল হে শীতের বেলা' এমনই বিভিন্ন ঋতুর গান শিখিয়ে উনি যেন প্রকৃতির সাজঘরের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনের রঙবদলের পালা সম্বন্ধে সচেতন করে দিতে চাইতেন।

'শল্পীর দিব্য-দৃষ্টি নিয়েই বোধহয় ব্রহ্মা ছিলেন রূপ-সৌন্দর্য দিয়েই আগে ছোট্ট মেয়েটির মন টানতে হবে। গানের অন্তরে প্রবেশের তাগিদ আসবে তার থেকেই।

সন্দীপ, আপনি ঠিক-ই বলেছেন— অনেক পরে শ্যামসঙ্গীতের গান শেখাতে শেখাতে সুচিত্রাদি বলেছিলেন, 'এখন বুঝতে পারছিস ত কেন তোকে আগে ঋতু উৎসবের সুরে টেনেছি?'

'১৯৬৬ সালে রবিতীর্থে ডিপ্লোমা পাশ করলাম। রবিতীর্থ প্রথমে ছিল দ্বিজেনদার (চৌধুরী)। সুচিত্রাদি যোগ দিলেন পরে। আর যেদিন থেকে সুচিত্রাদি যোগ দিলেন সেদিন থেকে আমিও আছি। পাশ করার পর সেপশাল ক্লাস শুরু করলাম। ১৯৬১তে জেনারেল অডিশনে পাশ করেছিলাম। তখন থেকেই দ্বিজেনদার কাছে সব রকম গানই শিখতাম। কিন্তু রবীন্দ্র সঙ্গীতের শিক্ষার ক্ষেত্রে সুচিত্রাদিই গুরু। এ সুযোগ পাওয়াটা আমি বিশেষ সৌভাগ্য বলেই মনে করি।

সুচিত্রাদির কোন গানের আবেদন আমার মনকে অভিভূত করেছে? ওঁর সব গানই আমার অসম্ভব ভাল লাগলেও সুচিত্রাদিকে পাওয়া যায় যেন বাউল অঙ্গের গানেই। খোলা আওয়াজ, উচ্চারণ স্বরের স্পষ্টতা সব মিলিয়ে উনি যেন এক অনন্য ব্যক্তিত্ব।'

সুমিত্রা রায়ের প্রথম রেকর্ড হয়েছিল রবীন্দ্র শতবার্ষিকী বর্ষে।

মেজকাকার চিঠি নিয়ে পি কে সেনের সঙ্গে দেখা করলাম। উনি গান শুনে খুশী হলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে রেকর্ডিং-এরও ডেট দিয়ে দিলেন। প্রথম রেকর্ডের গানটি হল দিন শেষের রাঙা মুকুল এবং লুকালে বলে খুঁজে বাহির করা।'

'এ রেকর্ডের সেল ভালই হয়েছিল তবে তারচেয়ে ভাল সেল হয়েছে দ্বিতীয় রেকর্ডটির (১৯৬৩ সালে) 'আর পথকেরে' এবং মনে রয়ে গেল'। তারপর একে একে যে সব গানগুলির রেকর্ড বেরুল সেগুলি হল: 'শ্যামল সুন্দর' 'মনে হল যেন' 'ও কে ধরিলে ত ধরা দেবে না কেন ধরে রাখা' 'দিয়ে গেনু বসন্তের এই' গানখানি 'ওগো ডেক না' 'মনে রবে কি না রবে' 'তোমায় গান শোনাব'।

'মেজকাকার সঙ্গে দুটি ডুয়েট গানও রেকর্ড হয়েছিল', 'আগুনের পরশমণি' 'আমারে বাঁধবে যদি'। কিন্তু নজরুল গীতি গাইতেও কিন্তু খুব ভাল লাগে। প্রথমে মেজকাকার বন্ধু সমরেশ রায় পরে পূরবী-দির (দত্ত) কাছে শিখেছি।'

সুমিত্রার গানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল সপ্রতিভ একসপ্রেশন—ওর মেজকাকারই মত ম্যানারিজমবর্জিত। রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইবার ভঙ্গিতেও সেই সতর্ক সচেতনতা। অর্থাৎ খুব ফ্রি। তার কারণ ছোটবেলার নার্শারী থেকে শুরু করে কলেজ জীবন অবধি ও হরদম গেয়েছে নেচেছে এবং অভিনয় করেছে বিভিন্ন প্রতি-যোগিতায়। বাইরে যাবার সুযোগও মিলেছে অজান্তেভাবে দমকা হাওয়ার হঠাৎ ছন্দের মতই। ১৯৫৮তে দিল্লীতে গান করতে গিয়েছে আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎসবে।

আর একবার কি মজা হয়েছিল জানেন? রুশ স্টোডিয়ামে যুব-উৎসবে গেয়েছিলাম। হঠাৎ একদিন ওয়ারল্ড ইয়ুথ ফেস্টিভ্যালে গাওয়ার আমন্ত্রণ পেলাম। দাদুর তখন অসুখ। আমি যাব কি যাব না ঠিক করতে পারছি না। কিন্তু দাদুর আগ্রহেই যেতে হল। রাশিয়া বুলগেরিয়া নানা জায়গায় গেয়েছি। আনন্দের সেই দিনগুলো এখনও যেন চোখের সামনে ভাসে।

ওখানে রবীন্দ্র সঙ্গীত নজরুল গীতি সব রকম গানই গেয়েছিলাম। কি ধরনের গান পছন্দ করেছিল? সব রকম গানই ওরা উৎসাহভরে শোনে এবং বোঝার চেষ্টা করে। তবে গানের কথা ত বুঝতে পারে না হয়ত সেই জন্যই ছন্দপ্রধান গানের দিকেই ওদের ঝোঁক বেশী। মেজকাকার গলায় 'তোরা যে যা বলিস ভাই' এই ধরনের গান গাইতে না গাইতেই ঝড়ের মত ওদের হাততালির উচ্ছ্বাসে আমাদের মনেও যেন খুশীর জোয়ার বয়ে যেত। ওখানে শেখা বুলগেরিয়া এবং রাশিয়ার গান আমি এখানে এসে সংবাদ বিচিত্রার জন্য গেয়েছি!

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর ২১ ফেব্রুয়ারী শহীদ দিবসে যে দলটি কল-কাতা থেকে গিয়েছিল তার মধ্যে আমিও ছিলাম। ভাবতে রীতিমত থ্রিলিং লাগে। কারণ সে দলের মধ্যে ছিলেন সত্যজিৎ রায় সুচিত্রাদি শ্যামল মিত্র। এ উৎসবে যেসব গানই গেয়েছিলাম নজরুলের দেশাত্মবোধক গান।

সেই বছরই ডিসেম্বরে আবার বাংলা-দেশ গিয়েছিলাম মেজকাকার সঙ্গে। আমি রাণু অমলকাকা। বলতে গেলে এটা ফ্যামিলি ট্রিপ। ভি বালসারাজীও ছিলেন। রবীন্দ্র সঙ্গীত এবং নজরুল গীতি মিশিয়ে গেয়ে-ছিলাম সেখানে। ওরা ফিল্মের গান নিয়ে খুব হৈ-চৈ করে শুনতে চায়। কিন্তু সেই অডিয়েন্সই রবীন্দ্র সঙ্গীতের অনুষ্ঠান স্তব্ধ হয়ে শুনেছে। একটা মানুষের মধ্যেই কতগুলো মন যে বাস করে সেটা বোঝা যায় স্টেজে বসে গাওয়ার সময়।

দিল্লী আমেদাবাদেও গেছি সুচিত্রাদির সঙ্গে। দিল্লীর সাহু হাউসের কাংশনে বিভিন্ন ভাষায় রবীন্দ্র সঙ্গীত শুনেছি বিভিন্ন প্রদেশের মানুষের কাছে। যেমন 'বাবল বাউল' উড়িষ্যার শিল্পীর গলায় মণিপুরী ললাজনঘায়া দক্ষিণ ভারতীয় শিল্পীর কাছে, ঐ দেশেরই ভাষায়। সে যে কি ইন্টা-রেস্টিং। এই সব অনুষ্ঠানেই উপলব্ধি করেছি সকল দেশের মানুষেরই হৃদয়ের কত গভীরে রবীন্দ্রনাথের আসন পাতা। এই সব গান গাওয়ার সময় দেখতাম সকলের মুখ চোখের ভাব কেমন যেন সিরিয়াস হয়ে উঠত। মানুষ যেমন খুব সন্তর্পণে বাইরে চটি খুলে রেখে মন্দিরের ভেতরে যায় অনেকটা সেই রকম।

সোভিয়েত ল্যান্ড নেহেরু পুরস্কার বিজয়ী

হরপ্রসাদ মিত্র সম্পাদিত **শরৎ চর্চা**

সর্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকের ব্যক্তিজীবন· রাজনৈতিক চিন্তা, ভাষা-শিল্প, চরিত্র সৃষ্টির বৈচিত্র্য, নদীর মূল্য ও মহিমা, বস্তুদৃষ্টি ও অবাস্তবতা, উত্তরবর্তী লেখকদের রচনায় তাঁর প্রভাব ও প্রতিধ্বনি; শরৎ-স্বীকৃতি ও শরৎ-বিরোধিতা ইত্যাদি বিভিন্ন দিকের পূর্ণাঙ্গ ও অপরিহার্য মূল্যায়ন সম্বলিত যাঁরা লিখেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন—অন্নদাশঙ্কর রায়, দেবীপদ ভট্টাচার্য, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, আশা দাস, ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তুষার চৌধুরী, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় অনিলকুমার ভট্টাচার্য, হরপ্রসাদ মিত্র· কিরণশঙ্কর ভট্টাচার্য· মহেন্দ্র বৈরাগী, গায়ত্রী ভট্টাচার্য, শ্রীমতী সেন· শ্যামাপদ সরদার· শঙ্খ ঘোষ, অরুণকুমার সিকদার পুলিন দাস, শিবনাথ চট্টোপাধ্যায়।

প্রাচীন ভারতের গণিত চর্চা (১ম)

প্রদীপকুমার মজুমদার

প্রতিটি গ্রন্থের গ্রাহকমূল্য ১৬৲ টাকা: একত্রে ৩০৲ টাকা প্রতিটি গ্রন্থের জন্য দশ টাকা দিয়ে আজই গ্রাহক হোন—গ্রাহক কেন্দ্র : অন্তরা, কথা ও কাহিনী: সরোজিনী পুস্তকালয়, ওরিয়েন্ট বুক ডিস্ট্রিবিউটর্স।

অন্তরা, C/0 প্রাণিন বিল্ডার্স, ৫ ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রীট, কলিকাতা—১

আগেই বলেছি সুমিত্রা সবরকম গানই গায়। উপস্থিত ও উচ্চাংগ সংগীত শিখছে এ টি কাননের কাছে। তবু রবীন্দ্রনাথের গানই ওর সবচেয়ে অন্তরংগ মনে হয়। কারণ এ গানের মধ্যে এমন একটা সোল্ডাইটি আছে যা অন্য গানে নেই। সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনা এমন কি হাসির কথার মধ্যে এমন একটা গভীরের ছোঁওয়া আছে যা মুহূর্তের জন্যও মনকে অন্য একটা সৌন্দর্যের জগতে নিয়ে যায়। যারা এ গান জানেন তাঁদের ত কথাই নেই—যাঁরা জানেন না তাঁরাও অনুভব করেন এ গানে কি যেন একটা আছে যা অন্য গানের চেয়ে আলাদা। এই কারণেই রবীন্দ্রসংগীত অমর এত প্রিয়। রবীন্দ্রসংগীতে সব অংগের গান থাকলেও আমার বেশী ভাল লাগে বাউল অংগের গান কারণ এ গান প্রাণখোলা

বর্তমান রবীন্দ্রসংগীতের ধারার প্রসংগে সুমিত্রার মত ছোলো শিক্ষার প্রসারের সংগে সংগে রবীন্দ্রসংগীতের ভাবগম্ভীর্য ও এস্থেটিকসকে সবাই বুঝতে শিখছে তাই শিক্ষিত মহলে এ গানের জনপ্রিয়তা বাড়ছে। ওঃ বলতে ভুলেছি সুমিত্রা দর্শনশাস্ত্রে এম-এ পড়ছে তাই কি হাসি খুশীতে উচ্ছল হলেও ওর মনটা জীবন রহস্যের গভীরের দিকেই। কলেজে পড়ার সময়ই অরুপরতনে এবং তপতীতে সুরংগমা ও বিপাশার ভূমিকায় অভিনয় করেছে। সুরংগমার অনেক গানের মানে তখন বুঝতাম না অথচ সেইজন্যই মনটা যে কি উতলা হয়ে উঠত কি বলব। বিপাশার রংগ-রহস্যের মধ্যেও কিন্তু ওর বেদনাবোধকে বুঝতাম।

চিরকুমার সভায় সুমিত্রার নীরবালার অভিনয় ও গান আমি দেখেছি। সত্যই ও ভারী স্টেজ-ফ্রী। রবিতীর্থের অনুষ্ঠানেই ও প্রকৃতির ভূমিকায় নেচেছে সুচিত্রাদির গানের সংগে। আর বাল্মিকী প্রতিভায় ওর একাধারে নাচ-গান দুই-ই দেখা গেছে লক্ষ্মীর ভূমিকায়। অমেরাবাদে সুমিত্রা বর্ষামংগলের অনুষ্ঠানে নৃত্যে অংশ গ্রহণ করায় জানাই গিয়েছিলো। গান গাইতে বরং মঞ্চে মঞ্চে নার্ভাস লাগে কিন্তু নাচে আমি অনেক ফ্রি।

তবু সুমিত্রা হয়েছে গায়িকা। গত বছর সুচিত্রাদির সংগে আমেরিকা গিয়েছিলাম। কতুরংগে তাদের নেশ দেখে ওরা বিমোহিত। অবশ্য বেশীর ভাগই বাঙ্গালী দর্শক। কিন্তু অবাঙ্গালী যাঁরা ছিলেন তাঁরাও অভিভূত হয়েছেন। গুরু-গম্ভীর দার্শনিক তত্ত্বকে এমন আনন্দের ছন্দে পরিবেশনা এ জিনিস ওরা কল্পনা করতেও পারে না: গভীর-বোধের মূল্য সব মানুষই দিয়ে থাকে। এটুকুই এই অভিজ্ঞতাটাই হয়েছে সবচেয়ে আনন্দের।

উচুমানের শিল্পীর সংখ্যা রবীন্দ্র-সংগীতের মত আর কোনো গান এতবেশী নেই। কারো গানই অশ্রদ্ধা করে শোনবার নয়। তবু বড়দের গান মন দিয়ে শুনলে বোঝা যায় কেন তাঁরা এত বড়। রবীন্দ্র-সদনে এবার প্রথম যখন রাজেশ্বরীদি গাইলেন সুরুতেই 'আঁধার সকল দেখি'—শুনেই মনটা যেন থমকে দাঁড়িয়েছিলো। সুর কেমন যেন স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিলো ভাবের সংগে সংগতি রেখে সুচিত্রাদির বাউল অংগের গানে মনটা যেন হঠাৎ খুশীতে নেচে ওঠে। মোহরদির সাথি আঁধারে একেলা ঘরে' যতবার শুনে মনে হয় যেন প্রথম শুনছি। এঁদের কাছে এইগুলিই ত শেখবার।

'সন্ধ্যাদি, আমেদাবাদের মানুষ রবীন্দ্র-সংগীত যে কি দারুণ ভালোবাসে ভাবা যায় না। ওখানে পংকজ মল্লিক এখনও অসম্ভব পপুলার।

'গায়কী বলতে কানে দুটি ধারাই বাজে মোহরদি ও সুচিত্রাদি। সুরের শুদ্ধতা ক্লাসিকাল এপ্রোচ সব মিলিয়ে রাজেশ্বরীদির একটা নিজস্ব ফর্ম আছে। আর এই একসপ্রেশনকে শ্রদ্ধা না করে উপায় নেই। কিন্তু এখনকার যে কোন মহিলাশিল্পী গাইতে গেলে অজান্তেই তার গানে হয় সুচিত্রাদি নয় মোহরদি দুজনের একজনের ছায়া এসে পড়ে। হতে পারে ওঁদের গানই বেশী শোনার সুযোগ পাওয়া যায়, কিন্তু প্রভাব আসে। যেমন ইয়ং ছেলেদের মধ্যে এমন কি মেজকাকার প্রায় সমসাময়িক ইয়ংদের মধ্যেও ওঁর গাইবার ঢংটা অজানতেই এসে পড়ে।' একটু থেমে দুষ্টু হাসির সংগতে সুমিত্রা বলে 'এমন কি—ওঁর হাত গুটিয়ে সার্ট ও ধুতির সজও ওঁদের কাছে প্রায় সমান আদরের।

'বাই দি বাই সেদিন রেডিওতে ছায়াছবির গানের রেকর্ডে তোমার গলাতেই বোধহয় 'তবু মনে রেখো' গানটি শুনছিলাম। কোন ছবির গান?

'আলিবাবা। অন্যদিকে আছে মেজো-কাকার গলায় পুরনো সেই দিনের কথা।'

সুচিত্রাদি তোমার হিরোইন। কিন্তু তোমার গানে সুচিত্রাদির ছাপ তত প্রবল নয়।'

'তার কারণ আমি সবরকম গানই গাই। ও সন্ধ্যাদি শোকবাসরে কিন্তু অমার প্রতুল-প্রসাদের গান গাইতেই বেশী ভালো লাগে যেমন আমারে ভেংগে ভেংগে' কিংবা 'কে যেন আমারে'। আমাদের পরের জেনারেশনের গান সম্বন্ধে এইটুকুই বলার আছে যে প্রতিভা ও সুকণ্ঠের অভাব নেই কিন্তু নিষ্ঠার অভাব মনকে পীড়া দেয়। রেডিওতে অনেক সময় শুনি ভুল সুরের গান। এত অস্বস্তি লাগে। যা তার গানে নেই তিনি ইচ্ছে করেননি বলেই তা নেই। এক্ষেত্রে জোর করে কোনো কিছু আরোপ করতে যাওয়া অন্যায়।

সন্ধ্যা সেন

অপরূপা অজন্তা
নারায়ণ সান্যাল ১৫-০০

বঙ্কিম অভিধান
অশোক কুন্ডু ২০-০০

বঙ্গীয় কুলশাস্ত্র
ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার ৮-০০

শ্রীচৈতন্যোত্তর প্রথম চারিটি সহজীয়া পুঁথি
পরিতোষ বসু ১০-০০

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন কবিদের পরিচয় ও সময়
সুখময় মুখোপাধ্যায় ১০-০০

বাসু ঘোষের পদাবলী
সন্তোষকুমার কুন্ডু ৬-০০

পরমারাধ্যা শ্রীমা
মৃণালকান্তি দাশগুপ্ত ৫-০০

মানব-সমাজ
রাহুল সাংকৃত্যায়ন ১০-০০

পাগল হরনাথ
ডঃ কার্তিকচন্দ্র রায় ১৬-০০

রাজা রামমোহন
ঋষি দাস ১২-০০

রবীন্দ্রনাথ (কবি ও দার্শনিক)
মনোরঞ্জন জানা ১৬-০০

কাশ্মীর-অমরনাথ
মন্মথ রায় ৭-৫০

আমি ঃ তুমি ঃ অন্যান্য
নন্দগোপাল সেনগুপ্ত ৮-০০

অশোক পুস্তকালয়
৬৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৯

ঘুমন্ত রিসিভার ॥ কৃষ্ণ ধর

খাতের কাছেই পড়ে আছে রিসিভারটা
তাকে তুলে নিলে পাঁচশো কিলোমিটার দূরে
পৌঁছুনো যাবে অনায়াসে
শুধু ডায়াল করার অপেক্ষায়।

পাতা ঝরছে শহরের বিবর্ণ অরণ্যে
ফুটপাথে চলতে গেলে পায়ের তলায়
বেজে ওঠে শুকনো পাতার চাপা কান্না।
নিঃসঙ্গ গাছগুলো লাম্পপোস্টের মতো দাঁড়িয়ে থাকে
শুরুতে বসন্তের হাওয়া এসে ঘুমন্ত রিসিভারটার মতো
তাকেও তুলে নিয়ে ডায়াল করবে এই আশায়।
তখন সে প্রেমিকের গলায় ডেকে উঠবে:
কোথায় তুমি? কোথায় তুমি? কোথায় তুমি?

তার নিজস্ব কোনো কথা নেই
তার নিজস্ব কোনো হৃদয় নেই
তবু শতসহস্রের জটিলতায়
আশ্চর্য সব সংলাপ নিরপেক্ষভাবে
নিজের বুকের ভিতর দিয়ে বয়ে নিয়ে যায়
একটুও বিচলিত হয় না।
রাত রাতে কখনো বা ভুল ঘরে ভুল দরজায় কড়া নেড়ে বলে ওঠে:
কোথায় তুমি? কোথায় তুমি? কোথায় তুমি?

পাঁচশো কিলোমিটার দূরের অরণ্যে এতক্ষণ সে ডেকে ডেকে
ক্লান্ত কোকিলের মতো হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে।
তার বুকের ভিতর বেজে চলেছে অবিরাম সেই ডায়াল টোন:
কোথায় তুমি? কোথায় তুমি? কোথায় তুমি?

স্বপ্নে দুটি কবিতা ॥

শিশির দত্ত

আমি বড় বেশী কিছুটা সংশয়ে ছিলাম. যদি মানুষ
ভেবে ভুল হয়. ভালবেসে হয়ে উঠি একা। তাই—
আমি আমার স্বজন হয়ে কখনও কখনও দাঁড়াই. আশ্বাস খুঁজি
এতই অর্থহীনতা পরিণত বয়সের সাথে হয়েছে জড়ো
আরও কিছু নতুন. আমি হই হয়ে উঠি
স্বপ্নের ভেতর স্বপ্ন তোমার মুখোমুখি।

তুমি এখন আকাশ খোঁজ. সহজেই শুনে ফেল
বৃক্ষ থেকে নক্ষত্র সবকিছু.
ভেসে যাও যুবাদের উৎসব থেকে.
স্বপ্ন নেই তবুও অবিশ্বাস্য স্বপ্নভূমি
তোমার করতল কেটেছে তুমি নেই এই ভেবে বহুবার.
মাঝে মাঝে চড়াস্ত হই. হয়ে উঠি তুমি নেই.
পি. জি হাসপাতালের জানালা
অন্য রকম বানিয়েছে. সাদা পোশাকের
সেবিকা. সব বুঝি আমার মতো চড়াস্ত হয়ে উঠে

আমরা এখন সব কিছুতেই অবহেলা. উপেক্ষা.
তোমাকে হারানোর সাথে
শিল্পের কুসুমের সাথে নিঃসঙ্গতার কাঁপি

প্রাণের কোহলে॥

দুর্গা বর্মণ

গ্রীষ্মের ভরা দুপুরে.
কোকাকোলার বোতল ছুঁয়ে
মনে হয়েছিল.
সত্যিই মনে হয়েছিল—
এতো কার যেন অদৃশ্য হাতের স্পর্শ
ঠোঁটের সুগন্ধ যার অদৃশ্য-অজ্ঞান।

বোতলটি ফিরে যাবে কারখানায়.
এমনি কোন ঝিম ধরা দুপুরে.
কার হাতের ছোঁওয়া লাগবে এর বুকে—
হয়তো সে জানবে না.
সত্যিই জানবে না—
আমি তাতে মুখ দিয়েছিলাম:
ক্লান্ত-রিক্ত-নিঃস্ব উত্তপ্ত-চুম্বনে।

হয়তো কোনদিন;
সত্যিই কোনদিন—
বাসের পাদানিতে. কিংবা ট্রেনের কামরায়.
কিংবা ময়দানের ঝাঁ ঝাঁ দুপুরে.
অফিসের বারান্দায়.
অথবা ফুটপাতের কানায় দাঁড়িয়ে
তুমি মুখ দিয়েছিলে এর মুখে.

হয়তো জুড়িয়েছিল;
সত্যিই জুড়িয়েছিল—
অতৃপ্ত-অশান্ত-উত্তপ্ত কামনা তোমার
তোমার হৃদয়.
অদৃশ্য এক প্রাণের কোহলে।

উপন্যাস

গোধূলিয়া

নিমাই ভট্টাচার্য

(নয়)

ভোরের দিকে ঘুম পাতলা হয়ে এলেও আমি যথারীতি চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকি। বুঝতে পারি ভোর হয়েছে, দিদি উঠেছেন। হয়ত বা দেবীও। আবার একটু ঘুমিয়ে পড়ি। এ বাড়ীতে কি হচ্ছে না হচ্ছে তা আর জানতে পারি না।

চা এনেছি। এবার উঠুন। অনেক বেলা হয়েছে।

দেবীর গলা শুনে চাদর সরিয়ে মুখ বের করি। একটু হেসে বলি চা এনেছ বুঝি?

এনেছি মানে? বোধহয় ঠান্ডা জল হয়ে গেছে।

কেন?

চা এনেছি কি এখন? কতক্ষণ ডাকাডাকি করছি তা জানেন?

অনেকক্ষণ?

চা খেতে খেতে কথা বলুন।

আমি একটু কাত হয়ে চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলি বেশ ত গরম আছে।

তা ত বটই।

তুমি কি অনেকক্ষণ ধরে ডাকছ?

বোধহয়।

কেন অযথা কষ্ট কর? তাছাড়া বেশ সকালে এমন ডাকাডাকি করতে নিশ্চয়ই তোমার ভাল লাগে না।

কিন্তু না করে ত উপায় নেই।

চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে জিজ্ঞাসা করি কেন?

দিদি এসে যদি শোনেন আপনাকে চা দিইনি তাহলে ত আমাকে বকুনি খেয়ে মরতে হবে।

কথাটা শুনেই আমার খারাপ লাগে। বলি—সকালে ঘুম থেকে উঠেই চা খাবার অভ্যাস আমার নেই। তুমি দাও বলেই খাই। আমায় যখন অভ্যাস নেই তখন কাল থেকে আর চা এনো না।

দেবযানী শুধু বললো—আচ্ছা।

ওর জবাব শুনে আরো দুঃখ পেলাম। ভেবেছিলাম আমার অভিমানের কথা ও বুঝবে। এই সকালবেলায় বিছানায় শুয়ে শুয়েই ঠিক করলাম ওকে আর কষ্ট দেব না। কেন দেব? ওর উপর আমার কি অধিকার?

সারাদিনই নিজেকে একটু গুটিয়ে রাখলাম। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর দিদির বাড়ীতে গিয়ে লম্বা টান ঘুম দিয়ে চা খেয়ে বলাৎকারেশ্বরঘাট আর গোধূলিয়ার মোড় ঘুরতে গিয়েছিলাম।

রাত্রে দিদি এ বাড়ীতে সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত কাজ করে সন্ধ্যা লাগতে না লাগতেই নিজের বাড়ী চলে যান। যাবে বলেই দেবযানী আমাকে খেতে দেয়। দিদি দুধের বাটিটা এগিয়ে দিয়ে বললেন—ঐ গোধূলিয়ার মোড় থেকে একটু এগিয়ে গেলেই হরসুন্দরী ধর্মশালা। একবার ঘুরে এসিস।

হরসুন্দরী ধর্মশালা গোধূলিয়ার মোড়ের কাছেই নাকি?

হ্যাঁ খুব কাছে। বোধহয় এক মিনিটেরও পথ নয়। মোতলস্ত্রাইয়ের টাকি সস্তা ও ওরই পাশে...

খেয়াল করিনি ত।

দেবযানী খেতে খেতে দিদিকে জিজ্ঞাসা করল ধর্মশালায় কি দেখতে যাবেন?

দিদি উত্তর দেবার আগেই আমি বললাম—ঐ ধর্মশালাতেই আমার মা মরা যান।

তাই নাকি?

আমি আর কোন কথা বললাম না।

খাওয়া-দাওয়া মিটে যাবার পর ওরা দুজনে ওদের নিজের নিজের ঘরে চলে গেলেন। আমিও আমার ঘরে চলে এলাম।

গোধূলিয়ার মোড় থেকে ফেরার সময় বিশ্বনাথপুর পুলিশ ইস্টেশনের উল্টোদিকের একটা দোকান থেকে কলকাতার একটা কাগজ কিনেছিলাম। বিছানার উপর বসে বসে সেই কাগজখানাই পড়ছিলাম। মাঝে মাঝে কাগজ পড়া বন্ধ রেখে চুপ করে বসে ভাবছিলাম। একবার মনে হলো কালই কলকাতা ফিরে যাই। এইসব মন-অভিমানের কারবার আমার কি দরকার? কেউ নিঃসঙ্গ জীবন কাটাচ্ছলাম তেমনই কাটাব। দিন দু বাস থাকব না। সকাল চলে যাবে। দিদি আর দিদির ছেলেমেয়ে দুটিকে ভালবাসা পেয়েছি তাতেই আমি কৃতার্থ। আর দরকার নেই। বিজয়া-নববর্ষ উপলক্ষে পোস্টকার্ডে ওদের প্রণাম জানাব আশীর্বাদ প্রার্থনা করব। তাছাড়া দেবীর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা না হওয়াই সব দিক থেকে ভাল। এ ঘনিষ্ঠতা কখনই দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। হবার প্রয়োজনও নেই। বরং ঘনিষ্ঠতা হলে দুজনেরই পক্ষে খারাপ।

আমার কেন রিস্ট-ওয়াচ নেই। এ ঘরেও কোন ঘড়ি নেই। বুঝতে পারছি না কটা বাজে। নিশ্চয়ই অনেক রাত হয়েছে কিন্তু কিছুতেই ঘুম পাচ্ছে না। দিনের বেলা অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছি। তার উপর এই সব চিন্তা। ঘুম কি কখনও আসে? তবু আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম। শুয়ে শুয়েই ভাবছিলাম এ সংসারে স্নেহ বা সমবেদনা পাওয়া হয়ত বা সহজ কিন্তু ভালবাসা পাওয়া অতি দুষ্কর। মনে মনে বললাম—যা বিশ্বনাথ স্বামি আর এ হত্যা থাকছি না। কাল সকালে উঠেই দিদিকে বলব ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষা এগিয়ে আসছে। আমি আজ কলকাতা যাচ্ছি। যদি সম্ভব হয় তাহলে ওদের পরীক্ষা শেষ হলেই আবার কদিনের জন্য ঘুরে যাব। স্থির করলাম দিদি অনুরোধ করলেও থাকব না। একটু অসভ্যতা হলেও চলে যাব। আমি আর এখানে থাকব না অসম্ভব না। না কিছুতেই না। যেখানে কারো ওরা যত্ন না সেখানে সহানুভূতি আর সহবেদনা অনুকম্পার সমান। আমি নিজেকে আর ছোট হতে দেব না।

তখনও ঘুম আসেনি কিন্তু ঘুমের আমেজ এসে গেছে। মনে হলো আমার ঘরের দরজায় কারা যেন টোকা দিচ্ছে। প্রথমে আগের মতই চাদর মুড়ি দিয়ে পড়ে রইলাম। ভাবলাম নিশ্চয়ই বিড়াল এসেছে। একটু পরেই মনে হলো কে যেন আমার বিছানায় এসে বসল। মুহূর্তের মধ্যে

আমার ঘুমের আমেজ উড়ে গেল। চমকে উঠে বসতেই—

চিৎকার করবেন না। আমি দেবী।

তুমি?

হ্যাঁ আমি।

এত রাত্রে এভাবে?

নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে।

এত রাত্রে আমার কাছে তোমার কোন প্রয়োজন থাকতে পারে না।

দেবী আমার মুখের উপর আলতো করে হাত রেখে বললো—অস্তে। এখন কটা বাজে জানেন?

আমার ঘড়ি নেই।

ঘড়ি নেই ত কাজকর্ম করেন কিভাবে?

অনেক কিছু না থাকলেও গরীবদের চলে যায়।

মনে হলো দেবী একটু হাসল। বললো—সত্যিই তাহলে রেগেছেন।

তুমি এখন এ ঘর থেকে যাও।

মোটে ত দুটো বাজে। এখনই চলে যাবো?

এক্ষুনি।

একটু পরেই চলে যাবো।

না তুমি এক্ষুনি যাও।

এত ভয় পাচ্ছেন কেন? আমি ত একটু পরেই চলে যাবো।

ভয় পাব না? যদি কিন্তু...

ভোর পাঁচটার আগে কিন্তির ঘুম কিছুতেই ভাঙবে না। তাছাড়া আমাদের কথাবার্তা দিদির ঘরে পৌঁছবে না।

আমি গায় চাদর জড়িয়ে বিছানায় বসে আছি। দেবীও আমার মুখোমুখি বিছানাতেই বসে আছে কিন্তু অন্ধকারের মধ্যে ওকে ঠিক দেখতে পাচ্ছি না। জিজ্ঞাসা করলাম, আমার কাছে যদি তোমার এতই প্রয়োজন তাহলে আগে এলে না কেন?

অনেকক্ষণ ধরেই আসব আসব ভাবছিলাম কিন্তু লজ্জায় দ্বিধায় আসতে পারিনি।

এখন এলে কি ভাবে?

আপনার ঘরের আলো নিভে যেতেই মনে হলো, এবার ত আপনি ঘুমিয়ে পড়বেন। তাই ভরি দেরী না করে চলে এলাম।

লজ্জায়, দ্বিধায় এর আগে আসতে পারলে না ত এই অন্ধকার ঘরে এলে কি করে?

মনে হলো আর দেরী করলে ত আপনি ঘুমিয়ে পড়বেন। আপনার সঙ্গে কথা বলা হবে না। তাই...

কিন্তু আমার মত একজন ছেলের ঘরে এত রাত্রে আসতে তোমার কোন সংকোচ হলো না?

না।

কেন?

আমার নিজের উপর আস্থা আছে। তাছাড়া জানি আপনি আমার কোন ক্ষতি করবেন না।

কি করে জানলে? আমার চরিত্র বা স্বভাব সম্পর্কে তুমি কতটুকু জান?

শুধু প্রবৃত্তি থাকলেই কোন মেয়ের কাছে যাওয়া যায় না। কখনও সাহসেরও দরকার হয়।

আমার বুঝি সে সাহস নেই?

বিন্দুমাত্রও না।

অনেকক্ষণ প্রশ্নের পর প্রশ্ন করেছি। এবার আর সঙ্গে সঙ্গে কোন প্রশ্ন করতে পারলাম না। থমকে দাঁড়ালাম। চুপ করে রইলাম।

একটু পরে দেবী প্রশ্ন করল, আপনি কি কাল চলে যাবেন?

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কি করে জানলে?

যদি এটুকু না জানতে পারি তাহলে এত রাত্রে আপনার ঘরে আসার সাহস পেলাম কোথা থেকে?

কি বলছ?

যা বলেছি তা এই অন্ধকার ঘরেও দিনের আলোর মত স্পষ্ট করে দেখার বা বোঝার বয়স ও বুদ্ধি দুইই আপনার আছে।

কিন্তু.....

আমার কোন ব্যাপারেই কোন কিন্তু নেই। দেবী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, আপনি কালই চলে যান কিন্তু একটা অনুরোধ... ...

কি?

আমার উপর অন্যায়ভাবে রাগ করে থেকে যাবেন না।

অন্যায়?

একশবার, হাজার বার অন্যায় করে রাগ করেছেন। সামান্য চা খাবার ব্যাপারে একটু মজা করলাম আর তাতেই এত রাগ?

কিন্তু.....

আবার কিন্তু? সারাটা দিন আমার কিভাবে কেটেছে সে খবর রাখেন? এতক্ষণ বিছানায় শুয়ে কিভাবে ছটফট করেছি, তা জানেন?

দুঃখে, অভিমানে দেবী আর কথা বলতে পারল না কিন্তু আমি স্থবিরের মত আর চুপ করে ওর মুখোমুখি বসে থাকতে পারলাম না। পাশের থেকে চাদর সরিয়ে একটু এগিয়ে ওর দুটো হাত চেপে ধরে বললাম, দেবী, আমি বুঝতে পারিনি। তুমি আমাকে ভুল বুঝো না।

সব পুরুষরাই মেয়েদের ভুল বোঝে। ভেবেছিলাম, আপনি নিশ্চয়ই আমাকে ভুল বুঝবেন না কিন্তু.....

না, না, দেবী, আমি আর তোমাকে ভুল বুঝব না।

কেন?

যে মেয়ে সমস্ত লজ্জা, ভয়, সংকোচ অগ্রাহ্য করে এত রাত্রে আমার কাছে ছুটে আসতে পারে, তাকে কি ভুল বোঝা যায়?

কিন্তু একথা কতকাল মনে থাকবে?

চিরকাল।

চিরকাল?

হ্যাঁ, চিরকাল।

আমাকে ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করছেন?

হ্যাঁ, তোমাকে ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করছি।

হঠাৎ দুজনেই চুপ করে গেলাম। কারুর মুখেই কোন কথা এলো না। একটু পরে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার ঘুম পাচ্ছে না?

না।

রাত ত অনেক হলো।

হোক। আপনার ঘুম পাচ্ছে বুঝি?

না। আমি ত দিনে অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছি।

তাহলে একটু বসি।

বসো।

কাল আপনার ঘড়ি কিনব।

কালই?

হ্যাঁ।

কিন্তু ঘড়ি কিনতে ত অনেক টাকা লাগবে?

ভয় নেই, দিদির কাছে হাত পাতব না। আমার নিজের টাকা দিয়েই কিনে দেব।

তোমার বুঝি অনেক টাকা আছে?

অনেক মানে বিশ-বাইশ হাজার।

বিশ-বাইশ হাজার?

বাবুর সম্পত্তি বিক্রীর সব টাকাই আমি পেয়েছি।

আমি একটু হেসে বললাম, তাহলে ত তুমি বড়লোক!

দেবী হাসতে হাসতে বললো, এ ছাড়াও আমার দুটো বাড়ী আছে। একটা কলকাতার কালীঘাটে আর একটা এই কাশীতেই।

তাহলে ত তুমি মহারানী।

দুটো বাড়ী থাকলেও বিশেষ ভাড়া পাই না।

কেন?

কালীঘাটের বাড়ী থেকে পঞ্চাশ টাকা পাই আর এখানকার বাড়ী থেকে সত্তর টাকা পাবার কথা কিন্তু অধিকাংশ মাসেই পাই না।

কেন?

দু জায়গাতেই অনেক পুরনো ভাড়াটে। আর এখানকার বাড়ীতে ত সব নিঃসম্বল বিধবারা থাকেন। এদের ত কোর্ট-কাছারিতে টানাটানি করতে পারি না।

তা ত বটেই।

আপনার টাকার দরকার হলে আমাকে বলবেন। আর কারুর কাছে চাইবেন না।

আমি টাকা দিয়ে কি করব? আমার ত বেশ চলে যাচ্ছে।

আমি ত বলিনি আপনার চলছে না। বলেছি, যদি দরকার হয় চাইবেন। আমার টাকা আপনার কাজে লাগলে...

ওকে কথাটা শেষ করতে না দিয়ে বললাম, সাথী হবে, তাইত?

হ্যাঁ।

একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?

নিশ্চয়ই।

আজ এই রাত্রে তুমি কেন এভাবে নিজেকে বিলিয়ে দিতে এসেছ বলবে?

নিজেকে ত বিলিয়ে দিতে আসিনি। তা আর সম্ভব নয় কিন্তু যেটুকু পারব শুধু তাই দিতে এসেছি।

ওর কথাটা একটু হেঁয়ালি মনে হলো। বললাম, আর কিভাবে নিজেকে বিলিয়ে দেবে?

কি বিশ্রিরে তোরা বলে? যদি পারতাম তাহলে এভাবে মরতে হতো না।

এ কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি

কি নিয়েই নিজেকে খুশি যে আমাকে বুঝবেন? কি অসম্ভব স্বপ্ন নিয়ে যে আমি বিন আপনি কল্পনাও করতে পর-

আমি কি সে জ্বালা স্বল্প দূর করতে পারি না?

চেষ্টা করলে হয়ত জ্বালা দূর করতে পারবেন কিন্তু স্বপ্ন কিছুতেই যাবে না।

কিন্তু কেন?

আমার অদৃষ্ট! বোধ হয় আপনারও অদৃষ্ট!

একটু চুপ করে থাকার পর সকলের যাত বোধহয় শেষ হয়ে এলো। এবার একটু শুতে যাও।

বেশী হাসতে হবে বলার শেষ হতে চললো তখন আর কিসে কি করব? আপনার পড়ি?

হঠাৎ যদি কাহারী হয়ে প্রশ্ন তবে খুশিতে কিন্তু আমার এলাকা, তুমি তা করতে পারো।

চলবে!

কি?

আদি বিশুদ্ধতাই
ডালডা
মার্কা বনস্পতির
বিশেষত্ব

সকল জিনিষে কাজ চলে। তবে একমাত্র আসল জিনিষেই আসল তৃপ্তি। যেমন ডালডা মার্কা বনস্পতি। ডালডার আদি বিশুদ্ধতার দেখাদেখি বাজারে আরও বনস্পতি এসে হাজির হয়েছে। তবে ডালডা-ই সবার আগে। তার কারণ ডালডা হ'বার রিফাইন-করা। তাই ডালডায় রান্না-করা আপনার সবচেয়ে খাবারেই যে আসল স্বাদ বজায় থাকে এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই!

মনে রাখবেন: ডালডা কখনও খোলা টিনে কিনবেন না

যে জায়গায় বেশী মাল সেখানে ভেজাল বিশুদ্ধ ডালডা নাই
বাজারের আসল বনস্পতি ডালডা

বিজ্ঞাপন-DLDA-140 BG

হিন্দুস্থান লিভারের এক উৎকৃষ্ট নিবেদন

না কিছু না।

দেবী একটু হাসতে হাসতে বললো, কাল ত আবার কলকাতা যাবে। এবার শুয়ে পড়ো।

তুমিও ত আমার সঙ্গে যাবে।

তুমি যদি আমাকে নিয়ে যেতে পারো তাহলে আমিও যেতে পারি।

তা জানি।

কাল আবার সারাদিন পিসীর বাড়ী আর গোধূলিয়ার মোড়ে কাটাবে নাকি?

প্রবৃত্তি বা ইচ্ছা থাকলেও সাহসে কি কুলাবে?

দেবী সঙ্গে সঙ্গে বিছানা থেকে নেমে বললো, যাই।

যাও কিন্তু আজ কি ঘুম আসবে?

বোধহয় না কিন্তু ঘুম এলেও ত ঘুমতে পারব না।

কেন?

স্বপ্ন এসে জ্বালাতন করবে।

আমি শুধু একটু হাসলাম। দেখলাম, ধীর পদক্ষেপে দেবী আস্তে আস্তে আমার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ভেবেছিলাম ঘুম আসবে না। শুয়ে শুয়ে দেবীর কথাই ভাবছিলাম। একবার মনে হলো, আলো জেলে ছোট্ট আয়নায় নিজের চেহারাটা দেখি। পরীক্ষা করি এই চেহারায় কি এমন যাদু আছে যা দেবীকে এই গভীর অন্ধকার রাত্রে আমার কাছে টেনে আনল। এত রাত্রে এসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা উচিত। নয় মনে করেই আলো জেলে আয়নার সামনে দাঁড়ালাম না। কিন্তু কেন দেবী এমন দুঃসাহসিক কাজ করল? ও আমাকে এতই ভালবাসে যে আমার সামান্য অসুস্থতাকে সহ্য করতে না পেরে এমন করে ছুটে এলো? হঠাৎ কোন কারণে দিদির ঘরে ভাংগড়ো? যদি দেখতেন দেবীর ঘর শূন্য? যদি বুঝতে পারতেন নিশুতি রাতে আমার অন্ধকার ঘরে সে রয়েছে? তাহলে দেবী কি জবাব দিত? আমি কি বলতাম?

এসব ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি, তা আমি নিজেও টের পাইনি। ঘুম ভাংলো দেবীর ডাকাডাকিতেই। আজ আর ঘটনের উপর চায়ের কাপ রেখে শুনছেন? অনেক বেলা হয়েছে। চা খেয়ে নিন নয়। আমার মুখের উপর দিকে চাদর সরিয়ে আমাকে একটু ঝাঁকুনি দিয়ে ডাকল, চা এনেছি। উঠবে না?

চোখ না মেললেও কথাগুলো আমার কানে এলো কিন্তু ঠিক বিশ্বাস করতে পারলাম না। ঘুমের ঘোরে রাতের কথা মনে পড়েনি।

কি হলো? চা খাবে না?

চোখ মেলে তাকিয়ে দেখি দেবী আমার দিকে তাকিয়ে মিট মিট করে হাসছে। আমি স্তব্ধ বিস্ময়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম।

অমন করে কি দেখছ? চা খেয়ে নাও।

এবার এতক্ষণে গত রাত্রের সব কথা আমার মনে পড়ল। জিজ্ঞাসা করলাম, দিদি কোথায়?

সকালে সেখানে যান।

বামুন দিদি কোথায়?

রান্নাঘরে কাজ করছেন।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললাম, কাল রাত্রে কী দুঃসাহসিক কান্ডটাই তুমি করলে!

ও হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করল, খুব দুঃসাহসিক কাজ করেছি?

তোমার কি মনে হয় খুব সাধারণ স্বাভাবিক কাজ করেছ?

না, তা না।

আমি আবার চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কাল রাত্রে হঠাৎ তুমি এমন কাজ করলে কেন?

আমি প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গে দেবীর মুখের চেহারা বদলে গেল। হঠাৎ ম্লান হয়ে গেল ওর চোখের দীপ্তি। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললো কি অবস্থায় যে মেয়েরা এমন দুঃসাহসিক কাজ করতে পারে তা তোমরা বুঝবে না।

চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কী হয়েছে তোমার?

সে কথা আজ তোমাকে বলতে পারব না।

আমি আগের মতই শুয়ে রইলাম। আমার সামনেই মুখ নীচু করে দেবী দাঁড়িয়ে। ওকে দেখে মনে হলো, কি যেন একটা অব্যক্ত ব্যথায় ও জর্জরিত কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে পারলাম না।

একটু পরে দেবী ম্লান হাসি হেসে জিজ্ঞাসা করল, কাল রাত্রের ঘটনার জন্য তুমি নিশ্চয়ই আমাকে নির্লজ্জ মেয়েছা ভাবছ?

আমি শুধু মাথা নেড়ে বললাম, না।

কেন?

সব কাজের পিছনেই একটা কারণ থাকে। সেই কারণটা না জানা পর্যন্ত কোন মানুষের কোন কাজকেই নিন্দা করা উচিত নয়।

দেবী দু পা এগিয়ে আমার বিছানার এক পাশে বসে হাসতে হাসতে বললো, তোমার এই বোধশক্তি আছে বলেই কাল রাত্রে তোমার কাছে এসেছিলাম।

আমি হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলাম, তাই নাকি?

হ্যাঁ। আমি জানতাম আমি ভুল করতে পারি না।

কী ভুল।

এই বয়সে এই মেয়েটাকে নিয়ে কাশীর মত তীর্থস্থানে অনেক ভুলই করা যায়।

কথাটার মধ্যে যে ব্যথা ও করুণ আছে তা বুঝতে পেরে মনের মধ্যে একটা বিস্বাদ অনুভব করলাম। বললাম, কী আজে-বাজে কথা বলছ?

পিসী আর দিদিকে দেখেই কি ভাবছ কাশীতে শুধু ওদের মত বৃদ্ধ মানুষই থাকেন? বাবা বিশ্বনাথের এ রাজত্বের ঘরে ঘরে সেকেলে বাঘ লুকিয়ে আছে।

আমি কাশীর কতটুকুই বা জানি। এই দু-তিনটি বাড়ীর কয়েকজন ছাড়া অন্যদের সঙ্গে একটু ভাল করে আলাপ পরিচয় হয়নি। দু'চারবার দশাশ্বমেধ ঘাট অথবা গোধূলিয়ার মোড়ে যাতায়াত করায় দু-একজনের সঙ্গে সামান্য কথাবার্তা হলেও এখনো ভাল করে পরিচয় হয় নি। সুতরাং দেবীর কথার প্রতিবাদ করার কোন রসদ হাতের কাছে পেলাম না। চুপ করে রইলাম।

দেবী বললো, বিশ্বাস কর যদি সম্ভব হতো তাহলে এক মুহূর্ত এই কাশীতে থাকতাম না কিন্তু এমনই অদৃষ্ট যে সারাটা জীবন এই সাংগলীটোলার অন্ধকার গলিতেই পড়ে থাকতে হবে।

এবার আমি হেসে ফেললাম। বললাম, তুমি কী ভাবছ এইভাবেই তোমার জীবন কাটবে? দুদিন পরেই ত লাল বেনারসী পরে এই কাশীধাম ছেড়ে চলে যাবে।

তাই নাকি?

নিশ্চয়ই।

কে আমাকে বিয়ে করবে? তুমি?

ওর প্রশ্ন শুনে আমি কি করব, কি বলব, কিছুই ভেবে পেলাম না।

কি হলো? আমাকে বিয়ে করবে না? আমাকে তোমার পছন্দ হয় না? নাকি তোমার পাশে আমাকে মানাবে না?

আঃ। কি আজে-বাজে বকছ?

দেবী হাসতে হাসতে বললো, আমি জানি তোমার প্রদীপের আলো কোনদিনই আমার অন্ধকার জীবনে ঢুকতে পারে না।

আমি প্রদীপ হলেও আমার শিখাটি নিভে গেছে। তোমাকে আলো দেব কেমন করে?

দেবী হঠাৎ আমাদের আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে দিল, থাকগে। ওসব কথা বাদ দাও। আগে বল কাল রাত্রের ঘটনার জন্য তুমি আমার উপর রাগ করেছ কিনা।

রাগ করব কেন?

রাগ কর নি?

না।

সত্যি?

দেবী আমার হাত ধরে একটু টান দিয়ে বললো, এবার উঠে পড়ো। তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নাও।

কেন? বেশ ত লাগছে।

ঘড়ি কিনতে যেতে হবে।

তুমি সত্যি আমাকে ঘড়ি দেবে?

সম্ভব হলে সব কিছুই তোমাকে বিলিয়ে দিতাম কিন্তু তা আর এ জন্মে সম্ভব না।

তোমার সব কথার শেষেই একটু বেসুরো কথা শুনেছি। কি ব্যাপার বল ত।

বলব না।

কেন?

তাহলে এই আনন্দটুকুও উপভোগ করতে পারব না।

কিন্তু.....

দেবী আমার মুখের পর হাত রেখে বললো, কোন কিন্তু নয়। উঠে পড়ো।

আমি সত্যি সত্যি উঠে পড়লাম।

(ক্রমশঃ)

তেলুগু নাটকে সমাজ চিন্তা

দিলীপকুমার মিত্র

নাটক নিশ্চিতভাবেই জীবনের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী, রসাস্বাদনের রসনিষ্পন্ন প্রতিরূপ, সন্তোষ আত্মস্বরূপ দর্পণ। নাট্যচেতনার অনিবার্য তাগিদে সুদূর অতীত কাল থেকেই তেলুগু নাটকে সমাজভাবনার গভীর ও নিবিড় ছায়াসম্পাত ঘটেছে। তেলুগুর প্রাচীনতম নাট্যশিল্প 'যক্ষগান'-এ সঙ্গীত-নৃত্যের মধ্য থেকেই সাধারণ মানুষের জীবনের কথা উচ্চারিত হত। 'বুরুরা কথা'য় হাস্যপরিহাসের ভেতর থাকত লোকচেতনা। 'হরিকথা'র ঈশ্বরতত্ত্ব আলোচনার প্রসঙ্গে লোকজীবনের কথা বারবার আসত। 'তোল্ বোম্মালু' বা ছায়ানাটকেও সাধারণ সামাজিক হয়েছে আপনরূপে। অতিখ্যাত 'বীথিনাটকম'-ও (বীথিনাটক বা পথ নাটক) তার বিভিন্নরূপে অভিনব রসপ্রস্তরে লক্ষ্যভেদে হলেও দেশকালের কথা সমকালীন জীবনের কথা সার্থক বিম্বিত করেছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগে ব্যাপ্ত তেলুগু নাটক লোকজীবনের সন্দের রূপচ্ছবি; এবং স্মাণ্ড বোধের এই আদর্শ উত্তরকালীন নাটকে পূর্ণতর মহিমায় পরিব্যাপ্ত হয়েছে।

আধুনিক অর্থে প্রথম তেলুগু সামাজিক নাটক ভি রাঘবেন্দ্র শাস্ত্রী রচিত 'মঞ্জরী রাঘবম্' (১৩৮০)—এতে অতিশয় সাহসের সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়ের দুই গোষ্ঠী বৈদিকী ও নিয়োগীদের চিরকালীন দ্বন্দ্ব-সংঘাতকে রূপ দেওয়া হয়েছে। এই যুগের সমাজ-সংস্কারক ও লেখক কানড়-কুরি কৌতুক-ব্যঙ্গের ধারাল বাণে সমাজের অন্যায় কুনীতিকে আঘাত হেনেছেন। তাঁর সিদ্ধিহস্ত নাটক 'রাজশেখর বিলাসম্' বিধবা-বিবাহ বা কন্যা বিক্রয়ের মত অসামাজিক অন্যায় আচারগুলির বিরুদ্ধে লেখা। ১৮৮৫ থেকে ১৮৮৬ পর্যন্ত তেলুগু সামাজিক নাটকের সূচনা পর্ব। এর পরের যুগকে (১৮৮৬—১৯০০) তেলুগু নাটকের উন্নয়নের যুগ বলা যায় যে উন্নতির চরম বিকাশ গুড়-জাদা আপ্পারাও-এর নাটক।

অন্যের যুগ-পুরুষ আধুনিক তেলুগু নাটকের জনক গুড়জাদা ভেঙ্কট আপ্পারাও তাঁর 'কন্যাশুল্কম' (১৮৮৭) নাটকে সমকালীন সমাজ সমস্যাকে অপূর্ব রূপায়িত করেছেন। তখন নবজাগরণের কাল। ইংরেজ সাম্রাজ্যের আলোকধারায় স্নাত হয়ে রাজ্যের সমাজ-সংস্কারের উদ্যমে প্রদীপ্ত পূর্বাঞ্চল তথা ভারতবর্ষের প্রাচীন স্থবির মূল্যবোধের ভিত্তিমূলে প্রকম্পিত করে দিয়েছে মহান অগ্রদূতেরা ও সংস্কারক কে বীরেশলিঙ্গম সেই আদর্শকে জন জীবনে সার্থক প্রয়োগ করতে চাইলেন। বিধবাবিবাহ প্রচলন, পতিতাবৃত্তি নিরোধ, জাতি প্রথা বিলোপ, নারীমুক্তি, শিশুবিবাহ রোধ, কন্যাকে পণ্যরূপে বিবাহবাজারে বিক্রয় করার তীব্র বিরোধিতা প্রভৃতি সমাজ-কল্যাণের মহৎ ভাবনাগুলি অন্ধ্রের সমাজ-জীবনকে নতুন প্রাণের সত্যে প্রতিবিম্বিত করতে চাইল। গুড়েজাদা আপ্পারাও এই বিষয়গুলি অবলম্বন করেই সাহিত্য রচনায় ব্রতী হন এবং তাঁর অসামান্য 'কন্যাশুল্কম' যুগের প্রদীপ্ত তিলক ললাটে ধারণ করে চিরভাস্বর হয়ে আছে। এই নাটক জীবনের চিত্র নয়, জীবনটাই নাটক হয়ে গেছে; নাটক জীবনের মত বিরাট বিচিত্র। গোটা সমাজকেই লেখক নাটকের ক্যানভাসে যথাযথ তুলে ধরেছেন। Here is God's plenty বহুবিধবাবাদী স্বার্থপর ভণ্ড চরিত্রহীন অথচ লোকসমাজে মাথা উঁচু করে চলা 'গরিলস', বুদ্ধিমতী মানবিক গুণসম্পন্না বিচিত্র স্বভাবের পতিতা মধুর-বাণী, নির্দোষ গোঁড়া প্রাচীন অন্ধ বর্বর পন্থীদের উগ্র সমর্থক ব্রাহ্মণ অগ্নিহোত্র-ধবনলু, বখে যাওয়া ছেলে ভেঙ্কটেশম, সদাস্বার্থান্বেষী উকিল ভীমারাও ও নাইডু, শিক্ষিত হীনচরিত্র অর্থলোভী যুবক রামাপ্পানটুলু, আদর্শবাদী আইনবিদ সৌজন্যরাও—পুরো সমাজটাই নাটক হয়ে গেছে, সব মানুষ হয়েছে কুশীলব, পাঠকও এই নাটকের অর্থাৎ সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে যায়।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই তেলুগু সামাজিক নাটকের আর এক পর্ব শুরু হল মোটামুটিভাবে একে প্রথানুবর্তন কাল বলা যায়। পূর্বকালীন যুগের সমস্যাসমূহই এখানে প্রাধান্য পায়। গুড়েজাদা উত্তরকালীন নাট্যকারদের কাছে প্রেরণা। কাল্লাকুরি নারায়ণ রাও-এর নাটক পতিতা সমস্যা মদ্যপানের কুফল প্রভৃতি বিষয় প্রাধান্য লাভ করে। সৎ সমাজব্রতীর দৃষ্টি নিয়ে তিনি লিখেছেন 'চিলকাপাটি পাপিচেল্লি', মদ্যসেবা প্রভৃতি নাটক। আবার স্বাধীনতা আন্দোলনের, বন্দে-মাতরম প্রভৃতি, বন্দের সুরে বন্দেমাতরম (তেলুগুতে বন্দেমাতরম বন্দেমাতরাম) মন্ত্রোচ্চারণ নাট্যকারদের প্রভাবিত করেছে এবং মূলতঃ ঐতিহাসিক নাটক রচনায় মধ্য দিয়ে তাঁরা তাঁদের স্বদেশচেতনাকে প্রবল আবেগে মুক্তি দিয়েছেন। এই দেশপ্রেমিক নাট্যকারদের মধ্যে স্মরণীয় পানুগেলাটি, কে লীলিনিবাস রাও, যজ্ঞনারায়ণ, এস কে মূর্তি-শাস্ত্রী, উমর আলি শাহ প্রমুখ নাম।

বিশ্বচেতনার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে যুগ ও জীবনের ধারা নিয়ে তেলুগু নাটকে নতুন অধ্যায়ের (১৯২০—৪৪) সূচনা ইবসেনের প্রচণ্ড শক্তিমত্তা নিয়ে আবির্ভূত মাদরাজ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি পি ভি রাজমান্নার সামাজিক নাটকের অভিনব দিগন্ত উন্মোচিত করেছেন। সমসাময়িক সমাজজীবন থেকে তাঁর কাহিনী ও চরিত্র (এবং সমস্যাসমূহ) আহৃত হয়েছে, বিচারকের তীক্ষ্ণ তাঁর বিশ্লেষণী দৃষ্টি নিয়ে তাদের তিনি বিচার করেছেন এবং সুপরিকল্পিতরূপে প্রকাশ করেছেন। বঞ্চিত সমাজ-পরিত্যক্ত নারীরাই তাঁর নাটকে ভীড় করে এসেছে—তিনি এদের অন্তরের সৎ-সূত্র রূপকে উদ্ভাসিত করেছেন, এদের মুখে বিদ্রোহের ভাষা দিয়েছেন এবং ভণ্ড কাপুরুষ ক্লীব পুরুষ শাসিত সমাজের বিরুদ্ধে এদের অট্টহাসি ধ্বনিত হয়েছে। রাজমান্নারের নাটকের মধ্যে স্মরণীয় 'এবি মগভাল্লু' (কোথায় পুরুষ মানুষ) পেশাদার নর্তকীর গৃহবধূ হওয়ার সমস্যা, 'নিমকলম' —তথাকথিত সতী নারীর মহৎ সত্তার পরিচয় 'সংকল্প পর্যবসনম্'—প্রেমের ও মানুষের জয় ঘোষণা, 'মাতৃপ্রেম'—জটিল মনস্তাত্ত্বিকতা যাতে মা তার অন্ধ পুত্রকে হত্যা করে অসতী স্ত্রীর হাত থেকে তাকে মুক্ত করবার জন্য, 'বিমুক্তি'—সমাজে বিধবা যুবতীদের অসহায় অকথ্য, 'তাপেস-বারিকি' (কার দোষ?)—ওনীলের চক্ষে যৌবনমত্ত ও প্রচলিত সমাজের অবরুদ্ধে বিদ্রোহের কথা, 'দেয়ুলা লঙ্কা' (শয়তানের দ্বীপ)—শয়তান সমকীর্ণ সমাজে বিধবা নারীর যন্ত্রণাক্লিষ্ট জীবন, 'পরকীয়া'—

কামারপুকুরের এই গৃহেই ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বাস করতেন।
ফটো: কমলাকান্ত দে

...শ্রীমতি-মহিলাদের সমস্যাভিত্তিক প্রকৃত পরিচয়।

...ধারাতেই লিখেছেন কমলা কিন্নি... প্রয়জীবনের পটভূমিকায় সমাজের ...সমস্যাকে তুলে ধরেছেন, যেমন ...পাওয়া'-র (নতুন দৃশ্য)। চলমান-এর ...ভাষ জানানো গেছে। তাঁর 'পাওয়া'-এ ...স্বামীর মানবিকতায় অসহায় এক ...কে তাঁর বাঙ্ময়। 'ঈর্ষা'-তে নারী-...কথা। মুদ্দরকৃষ্ণর 'টি কাপ্পলু-...' (চায়ের কাপে তুফান) বেদনার ছোঁয়া-...কমেডি নাটক—এতে সামাজিক ...ব্যক্তিক সমস্যার প্রতিপাদন।

...জীবনের নতুন মহা সংযোজন ...ইলেন বুচ্চিবাবু। তিনি জীবনের ...লাঞ্ছনার কারণ খুঁজলেন শুধু ...নয়, মানুষের মনেও—যেমন 'আব-...'। 'দোদ্দু' (শৃঙ্খল নাটকের বক্তব্য ...দোদ্দু—মনুশিউলা সারিহাদ্দু—...উলা সেয়রেশনিক সারিহাদ্দু। আ...দু তোপেট্টি আ সোয়েলম আনে ...দুলু দাটিতেপনি মনুশিউলু বাগু...দু, অর্থাৎ এই শৃঙ্খল মানুষের মধ্যে ...সৃষ্টি করে ষড়যন্ত্রে পৃথক করে। ...একে না ভাঙলে মুক্তি পাবে না। ...নিদ্রা আদ্রা কালাদু' (একটি নিদ্রা ...স্বপ্ন) নাটকে সামাজিক ও মানসিক ...দ্বন্দ্ব ভারতবর্ষের পূর্ণ চিত্র প্রতিবিম্বিত। ...শান্তী গার্হস্থ্য জীবনের পটভূমিকায় ...দ্বন্দ্ব ও মিলনাত্মক নাটক লিখে বন্দিত ...লন।

...ত নিয়ে এগিয়ে এলেন নাটকাররা। ১৯৪৪ থেকে তেলুগু সামাজিক নাট...কের নতুন বাঁক নেয়া। গণনাট্য ...[illegible] ...সমাজ নির্মাণের

এই আন্দোলনের প্রথম পর্বের অর্জ...আত্রেয়া। শোষিত নিষ্পীড়িত লা...মানুষের আবির্ভাব তাঁর নাটকে প্রথম ...ও তাদের মুখে ধ্বনিত হল প্রবল প্র...বাদের ভাষা। তাঁর 'এবরু ভেংগা' ...চায়?) সমষ্টি-আকাঙ্খার যথার্থ স্বরূপে নি...করেছে, এন জি ও অবক্ষয়ক্লিষ্ট সমাজ...মানুষের নিখাঁত চিত্র, 'প্রগতি'-তে ভা...মানবিধ্বংসী যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণকারী বৈ...নিকের হত্যা সেখান হয়েছে। এই আন্দো...লনের শ্রেষ্ঠ শিল্পী সুংকর ও ভাস্কর ...ভাম্রি বেঙ্কট—তাঁদের লেখা মুক্তিকাম...যুক্ত গণ-আন্দোলনের নাটক 'মা ...—শোষিত সর্বহারা মানুষের যন্ত্রণার ...স্বর 'বিদ্রোহের স্বরলিপি'। এঁদের 'য...দ্ধ' ও 'প্রতিদান' প্রভৃতি নাটকও গণনাট্য ...ধারাকে প্রবল প্রাণচেতনায় সঞ্জী...করেছে। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বি...শান্তির জয় ঘোষিত হয়েছে পাণ্ডাল...রাও এর 'সন্দেশম', কোডালি গোপাল...এর 'শান্তি সন্দেশম, অনিসেট্টি সুব্বা...এর 'শান্তি' প্রভৃতি নাটকে। কোপ...সুব্বারাও থিয়েটার মুভমেন্টের নায়ক ...তেলুগু লিটল থিয়েটারের স্রষ্টা। সমাজসচেতন জীবননিষ্ঠ নাটক...নেটিনাটিড, চৌমনাপাপয়, আন্নিমাট্টী অ...দের সার্থকতার সঙ্গে অভিনীত হ...প্রিন্টসের 'এ্যান ইনস্পেকটর কলস' ...লন্ডনে সুব্বারাও রচিত ও নির্দেশিত 'ই...টেরাল্লু' সারা অন্ধ্রে এক আদর্শ ...বিদ্যমান।

সৌন্দর্য ভাবনার লাবণ্যময়তায় ...বহুল কৌতুকে সমাজের বিচিত্র রূপ...নির্মাণ করেছেন অন্ধ্রের নাটক...পিন্নমনেটি (আওদি-নারী), [illegible] ...কুমি অবক্ষয় নিয়েছেন অন্ধ্রের

অতিদরিদ্র ও তাদের মত করে সুখী ছেলে পরিবারের একজন একটা সিনিক পয়েন্ট করে; নিজ নিজ সুখ সম্পর্কে বিস্মৃত হয়ে প্রবল কলহে মত্ত হয়ে ওঠে, কিন্তু পরে দেখা যায় ওটা অচল। 'আগন্ডি কোনচেম আলোচিনচ'নডি' (একটু অপেক্ষা করুন ও ভাবুন) নাটকে ক্রীতদাস প্রথার ভয়াবহ রূপ দেখান হয়েছে। কোন সময়ে মালিক টাকা ধার দিয়ে কিনেছিল দাসকে, পুরুষানুক্রমেও তা শোধ হচ্ছে না, শেষ পর্যন্ত জাগ্রত চেতন দাস বিদ্রোহ করল, কিন্তু মালিক চক্রান্ত করে তাকে ফেলে দেয়, একটা পরিবার ধ্বংস হয়। লেখক এই অবস্থার পরিবর্তন চান। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাকে আমূল উৎপাটিত করতে চান এবং এই আদর্শ সংবেদনশীল বিচারবুদ্ধি পাঠক তথা দর্শকের চেতনায় সঞ্চার করে দেন। গণেশ পাত্রর 'অসুর সন্ধ্যা' নাটকেও সমাজের সর্বস্তরে ব্যাপ্ত দুর্নীতি পরিবর্তনশীলতার পরিচয় আছে। গ্রামের দুই প্রধান পরস্পরের সঙ্গে যেন প্রতিযোগিতা করে কে গরীবদের বেশী ঠকাবে পীড়ন করবে ও আইনকে নিজেদের স্বার্থে লাগাবে। তারা শহরে আসে বিলিতী আইনজীবীর কাছে যে আবার এদের দুজনকে প্রতারিত করে। সেই আইনজীবী আবার তার পুত্র ও অন্যদের দ্বারা প্রতারিত হয়। এইভাবে প্রতারণা ও উৎপীড়নের চক্র ঘুরতেই থাকে।

সুদূর অতীত ও বর্তমানকে এক সূত্রে গ্রথিত করে, ইতিহাসের শিক্ষা নিয়ে বর্তমান সভ্যতাকে বাঁচাতে চেয়েছেন পোকা রাজু নন্দী তাঁর মারো মহেঞ্জোদারো (অন্য এক মহেঞ্জোদারো) নাটকে। নাট্যকার সভ্যতার আদর্শ মহেঞ্জোদারোর পতন ও তার কারণ দেখিয়েছেন। নাটকের প্রধান চরিত্র এক বৈজ্ঞানিক : সে বর্তমান কালের আটজন মানুষকে প্রশ্ন করছে জেনেছে তাদের স্বরূপ, ও অতীত তাদের সামনে উদ্ঘাটিত হয়েছে। বর্তমানের এই মানুষ গুলোও—ধনপতি, তার দুষ্কর্মে সহায়ক কারীরা, ডাক্তার, উকিল মধ্যবিত্ত কেরাণী, বিদ্রোহী, নারী—সুন্দর সম্বন্ধে লিপ্ত। পুঁজিপতি গোষ্ঠী নির্মম শোষণ অত্যাচার চালাচ্ছে স্বার্থান্বেষী লোভী মানুষরা তৎপর, সাধারণ মানুষ অত্যাচারে জর্জরিত শেষ পর্যন্ত শোষকের পরাজয় ঘটে কিন্তু সেও সবকিছু ধ্বংস করতে চায় : আর এক সভ্যতার সমাপ্তি আসন্ন হয়ে ওঠে। লেখক এই অত্যাচারের প্রতিবিধান ঘটিয়ে ধ্বংসের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করতে চেয়েছেন। অপর নাটক 'বন বেলোসিন্দি (বৃষ্টি থেমে গেছে) নাটকেও জীবনের সুর বেজেছে সুন্দরভাবে।

এস কাশী বিশ্বনাথম-এর নাটকে ক্রীতদাস জমিদার মহাজনদের বর্বর পাশব নৃশংসতার চিত্র ফুটেছে। সমাজের ন্যায়-নীতি ধর্ম মানবিকতাকে অবহেলা অগ্রাহ্য করে এরা মানব পীড়নের নিষ্ঠুর খেলায় মেতে ওঠে—কৃষক, সামন্ততন্ত্রের শেষ ও ভয়ানক সময়ের অতন্দ্র প্রহরী হয়ে এরা ইতিহাসের অনিবার্য গতি রুদ্ধ করতে চেয়েছে। কাশী বিশ্বনাথমের গরীবী হটাও নাটকে এদের রূপ বিধৃত। জমির সীমা বেঁধে দেওয়ার জনকল্যাণমূলক আইন হবার কথা শুনে জমিদার তার বিশাল জমির কিছুটা বিক্রী করে; শুধু জমি রাখবার জন্য কাগজে কলমে স্ত্রীকে ডাইভোর্স করে তাকে জমির ভাগ দেয়—যদিও স্ত্রী কেবল জমির জন্য তার সতীত্ব নারীত্বকে এভাবে অপমানিত করতে একেবারেই চায় না; অন্য নিকট পরিজনদেরও এভাবে কৌশল করে জমির ভাগ দেওয়া হয়; কিন্তু তার অধীনস্থ এক কর্মচারী—যাকে এই জমিদার পীড়ন করেছে কর্মচ্যুত করেছে সর্বান্বিত করেছে—এই কর্মের প্রতিবাদ করে পুলিশকে খবর দেয় এবং এই অত্যাচারী রক্তশোষক নারী পীড়নকারী মহাজনের স্বরূপ সে প্রকাশ করতে চায়। কিন্তু তার বিশ্বস্তহীন কণ্ঠ স্তব্ধ হয় তাকে জমিদার ও তার লোকেরা মেরে ফেলে—বলে গ্রাম থেকে গরীবী হটেছে। কৃষিজীবী ভারতবর্ষ সামন্ততান্ত্রিক বর্বরতার ভয়াল রূপচিত্র এই নাটকে অঙ্কিত হয়েছে। কাশী বিশ্বনাথমের অপর নাটক 'ওকা নীপম তেলিগিন্দ' (একটা আলো জ্বলল) নাটকও সমাজের অপরূপ বিশ্লেষণ।

সামাজিক ভাবভাবনার প্রেক্ষাপটকার বিভিন্ন স্বাদের বিচিত্র রূপের নাটক লিখছেন আজকের শিল্পীরা। টি লেহচলপতির নাটকে মনস্তত্ত্ব প্রাধান্য পেয়েছে। তাঁর 'রুগ্ন বাসনা' নাটকে দেখা যায় অধ্যাপক মনোহরের উপন্যাস 'সাগর সংগ্রাম' সর্বত্র প্রশংসিত অভিনন্দিত ও পুরস্কৃত হয়েছে। অধ্যাপক মনোহর শান্ত প্রসন্ন সৎ মানুষ কিন্তু তাঁর উপন্যাসের চরিত্র ক্রূর সেন পাশবিকতায় ভয়াল আচরণে ভয়ঙ্কর মানস ও কর্মে পাঠক চিত্তকে শিহরিত করে—লেখকের অনুরাগীরা এই সৃষ্টির স্বরূপের কথা তাঁর কাছ থেকে জানতে চায়। একদিন অকস্মাৎ ক্রূর সেন অধ্যাপক মনোহরের কাছে উপস্থিত হল। সে জানতে চায় কেন লেখক তাকে এভাবে সৃষ্টি করল। সে বলে আসলে সে লেখকের অবদমিত রুদ্ধ বাসনারই সৃষ্টি—অধ্যাপক মনোহরের হিংস্র বর্বর আদিম মন সমাজের অনুশাসনে চাপা পড়েছে বাইরে নিজেকে প্রকাশ করে নি: এইভাবে তা ক্রূর সেনের ভয়ঙ্কর ভয়াল পাশবিকরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। ক্রূর সেন আজ প্রতিশোধপরায়ণ সে পৃথিবী ধ্বংস করবে। ভীত ত্রস্ত মনোহর আতঙ্কে জেগে ওঠেন—ক্রূর সেন মনোহরের নিদ্রাজাগর তন্দ্রাচ্ছন্ন রূপের মধ্যে এসেছে—বাস্তবে নয়। মনোবিকার কথা মনোবিকলনের এক আশ্চর্য রূপ নাটকে প্রকাশিত।

গোল্ডেন মারুতি রাও 'কাল্লু' (চোখ) সমাজ ভাবনায় নূতন মাত্রা সংযোজন করেছেন। নাটকের কুশীলব ভাঙ্গা বাড়ির বাসিন্দারা পাঁচজন অন্ধ ও নিঃস্ব ভিক্ষুক। তাদের মধ্যে একজনের অন্ধত্ব মোচনের প্রতিশ্রুতি পেলে হয়। সর্বকনিষ্ঠকে মেরে নেয় ও সে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পায়। কিন্তু সে তখন অপরদের শোষণ করে নিজের স্বার্থসিদ্ধি করতে চায়, তাদের ভিক্ষালব্ধ থেকে বঞ্চিত করতে চায়। এমন কি সে তাদের মধ্যের একটি মেয়েকে পর্যন্ত প্রলুব্ধ করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আপন কৃতকর্ম লজ্জিত ও ধিক্কৃত হয়ে সে দেবতার সামনে আপনাকে অন্ধ করে নেয়। এই নাটকের তাৎপর্য কি। হয়ত এটা এই সমাজের যথাযথ চিত্র। অথবা পিছিয়ে পড়া অনুন্নত সমাজের দুর্বলতাই অন্ধ ও নির্বাচিত নেতার হাতে সব ক্ষমতা অর্পণ করলেও তাদের প্রতারণা ও বেদনা ছাড়া আর কিছুই থাকে না। বৃহত্তর সমাজ জীবনকে বাদ দিয়ে একক মানুষের মুক্তি বাসনা ও উন্নয়ন প্রয়াস ব্যর্থ হয় তা ব্যষ্টি অথবা সমষ্টি কারুরই কোন কল্যাণ সাধন করে না—এই ব্যাপক সামাজিক সত্যের দিকেও লেখক অঙ্গুলি সংকেত করতে পারেন এই নাটকে। আজ তেলুগু সামাজিক নাটক জীবনের সুদৃঢ় প্রত্যয়কে রূপ রসের বন্ধনে স্পন্দিত করে শিল্পময়তায় আশ্চর্য জ্যোতিতে হয়ে উঠছে। জীবনের বিচিত্র ব্যঞ্জনার বিচিত্র সুর এতে বেজেছে কিন্তু তা সংহত সংযত এক মহান সামাজিক তাৎপর্য ব্যঞ্জিত করে। রক্তকন্যা কিম্বা স্ত্রীধনাটকম্-এর সহজ অগভীর জীবন কথা দিয়ে তেলুগু সামাজিক নাট্য সাহিত্যের সুরু; কিন্তু তা বহু যুগ ও কাল পেরিয়ে অনন্ত পথ পরিক্রমা শুরু গভীর জীবন চর্যায় নিবিড় হয়ে বস্তুসত্যের আশ্রয়ে হয়ে সমাজ চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে অথবা তীব্র রাজনৈতিক ভাবনায় উজ্জীবিত হয়ে এক অপরূপ হিরণ্যপ্রভ উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাসিত হয়ে উঠেছে। আজ ভারতীয় নাট্য সাহিত্য বিশ্ব নাটকের প্রতিস্পর্ধী হয়ে উঠেছে এবং তাতে তেলুগু নাটকের গৌরবময় ভূমিকার বিস্মরণ অসম্ভব।

বঙ্গশ্রী
হাওড়া
৪১/১, জি, টি, রোড, হাওড়া
• বেনারসী
• জড়ি • সিল্ক
• তাঁত • মিল
• পোষাক
• সাটিং • সুটিং
ও চিট কাপড়

বিজ্ঞানের কথা

* অমরতার দিকে
* মৃতজনে প্রাণদান

জীবন এক রহস্যময় ও দুর্জ্ঞেয় প্রক্রিয়া জীবনের রহস্য বিজ্ঞান এখনো পুরোপুরি জানতে পারে নি। তবে জীবনের উদ্ভব ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে গবেষণা ও অনুসন্ধান চলছে। জীবনের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে কোনো কোনো বিজ্ঞানী এখন বলছেন, জীবন হচ্ছে বস্তুর বিবর্তনে একটি প্রক্রিয়া মাত্র। অর্থাৎ জীবন হচ্ছে বস্তুর নিজস্ব এক লক্ষণ। এই তত্ত্ব গ্রাহ্য হলে এমনটি হওয়াই স্বাভাবিক যে জীবনের অস্তিত্ব থাকতে পারে শুধু এই পৃথিবীতেই নয়, বিশ্বের অন্য যে কোনো স্থানে। জীবনকে যদি আমরা দার্শনিক ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করি তাহলে এমন সব সমস্যার মুখোমুখি হতে হয় যা এখনো আমাদের ধারণাতীত। যেমন বস্তু ও শক্তির উদ্ভব এবং বিশ্বের আকার, উদ্ভব ও শেষ। আমাদের স্বীকার করতেই হয় যে মানুষের জ্ঞান এখনো এই সমস্ত মূল সমস্যার জবাব দিতে পারে নি। জীবনের উদ্ভব ও বিশ্বের উদ্ভব সম্পর্কিত সমস্ত তত্ত্বই এখনো পর্যন্ত জ্ঞানিভর অনুমান মাত্র। অতএব এসব সমস্যার মধ্যে না গিয়ে বরং দেখা যাক জীবন সম্পর্কে আমরা কতটুকু জানি।

জীবন হচ্ছে একটি প্রক্রিয়া, বস্তু নয়। জীবনের একটি সংজ্ঞা এই হতে পারে যে জীবন কতকগুলো এনজাইমের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এক অব্যাহত ও স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়া। ফোয়েনবিদ্যা বা পদার্থবিদ্যার দিক থেকে জীবনের অনেক লক্ষণই হয়তো ব্যাখ্যা করা যায়। তবুও মনে রাখা দরকার যে জীবন ও প্রাণ এক নয়, প্রাণের চেয়ে জীবন আরো রহস্যময়।

পৃথিবীর সমস্ত প্রাণ কোষ দিয়ে গঠিত। কোটি কোটি বছর আগে এই পৃথিবীতে প্রাণ উদ্ভূত এবং আজো পর্যন্ত অব্যাহত ধারায় প্রবাহিত। এই ধারা পুরুষানুক্রমিক তাকে বহন করছে পৃথক পৃথকভাবে একক প্রাণ। জীবনের ধারা বহনকারী এই একক প্রাণের তিনটি লক্ষণ : জন্ম, বৃদ্ধি ও মৃত্যু। একটি বিশেষ বয়সের পরে বহুকোষী জীবের শরীরে নতুন কোষের জন্ম বন্ধ হয়ে যায়। ফলে কোষের কাজ অক্ষুণ্ণ থাকতে পারে না এবং জীবটির মৃত্যু ঘটে। এমনিভাবে এমন কি মানুষেরও বয়স বছর আশি হবার পরে তার আয়ু শেষ।

কিন্তু সেই প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ ভেবে এসেছে মৃত্যুর জন্য না করে হাজার হাজার বছর বেঁচে থাকতে। মিশরের ফারাওরা পিরামিড তৈরি করেছিল, আর পিরামিডের ভেতরে ঠেসে রেখে দিয়েছিল জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের সমস্ত উপকরণ—এই আশায় যে দীর্ঘ ঘুমের পরে যখন জেগে উঠবে তখন যেন কোনো কিছুর অভাবে কষ্ট পেতে না হয়। ফারাওরা সত্যিকার অমরতার কথা ভাবত। ভারতের প্রাচীন পুরাণে আছে দেবতরা অমর হয়ে ছিলেন অমৃত পান করে। পুরাণে নিশ্চয় [illegible] কিন্তু এমন কি সম্ভব যে, বুদ্ধি মতো মরা যায় আবার

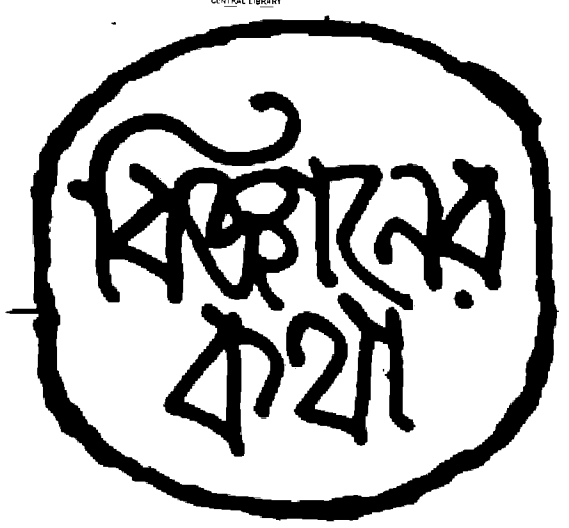

খুশি মতো বেঁচে ওঠা যায়? বিজ্ঞান কিন্তু এখন এমন একটি ব্যাপারকে একেবারে অসম্ভব মনে করছে না। বিজ্ঞান বলছে 'পুনর্জীবনায়ন' বা ইংরেজিতে 'রিঅ্যানিমেশন'। আমরা জানি কোনো প্রাণীর পক্ষেই মৃত্যুকে এড়িয়ে থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু এমন কি সম্ভব যে মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রাখা গেল? বেশ অনেক কাল পর্যন্ত? তা যদি হয়, অমনি ব্যাপারটা যেন হয়ে ওঠে জীবনকে স্থগিত করে রাখা।

স্থগিত প্রাণের ধারণা প্রথম পাওয়া যায় সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের একটি বিবরণ থেকে। বছর কয়েক আগে সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা বলেছিলেন, একটি স্যালামান্ডার (উভচর জীব) নাকি দশ লক্ষ বছর নিষ্ক্রিয় ও ঘুমন্ত অবস্থায় (হাইবারনেশন) ছিল, কিন্তু তারপরে তাকে জলের মধ্যে ছেড়ে দিতেই জীবন ফিরে পেয়েছে। পরিবেশ যদি প্রতিকূল হয় তাহলে অনেক জীবই (যেমন গিরগিটি জাতীয় সরীসৃপ কেমো, শামুক ভালুক ও কাঠবেড়ালী জাতীয় কোনো কোনো প্রাণী নিষ্ক্রিয় ও ঘুমন্ত অবস্থা প্রাপ্ত হতে পারে। নিষ্ক্রিয় ও ঘুমন্ত অবস্থাটি ঘটতে পারে, কি ঠান্ডা কি গরম, উভয় জলবায়ু থেকে বাঁচবার জন্য। ঠান্ডা থেকে বাঁচবার অবস্থাকে বলা হয় 'হাইবারনেশন' গরম থেকে বাঁচবার অবস্থাকে ইস্টিভেশন। এমন খবরও পাওয়া গিয়েছে যে মেরু অঞ্চলে গভীর বরফের মধ্যে আটকে পড়া বন্য হাঙর হাজার হাজার বছর পরে আবার সূর্যের আলোয় ও উত্তাপে এসে আবার চরা গুঞ্জরেছে এবং বহুকাল আগে লুপ্ত হয়ে যাওয়া উদ্ভিদের জন্ম দিয়েছে। বছর কয়েক আগে চীনা বিজ্ঞানীরা জানিয়েছিলেন, কয়েক শত বছরের প্রাচীন পদ্মবীজ থেকে অঙ্কুরোদ্গম হয়েছে। কিছুকাল আগে আর্জেন্টিনার লা প্লাটা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঁচশত বছরের প্রাচীন এক ফুলগাছের বীজ থেকে চারা গজিয়েছে। জাপানেও এমনি একজাতীয় বীজ পাওয়া গিয়েছে যা হাজার বছরেরও অধিক প্রাচীন। কানাডায় পাওয়া গিয়েছে অনুরূপ দশ হাজার বছরের প্রাচীন বীজ। এসব ঘটনা থেকে প্রমাণ হয়, জীবন সহজে নষ্ট হয় না, এবং জীবনের ছোঁয়া থাকে অনন্তকাল বেঁচে থাকার।

এই যে বীজগুলো পাওয়া গেল এ থেকেই হয়তো চিরকাল বেঁচে থাকার রহস্যের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। তা এই যে জীবনকে স্থগিত রাখা সম্ভব এবং পরে [illegible] আবার ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলে সঞ্জীবিত করা সম্ভব।

এ থেকেই ভাবনা এসেছে মানুষকেও হিমাচ্ছন্ন করে রাখা যায় কিনা এবং পরবর্তী কালে আবার পুনর্জীবিত করা যায় কিনা। কিন্তু এক্ষেত্রে কিছু অসুবিধে আছে। সবচেয়ে বড়ো হয়ে দেখা দেয় নৈতিক প্রশ্ন। তাছাড়া স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হয়ে কেউ চায় না যে তাকে হিমাচ্ছন্ন করে রাখা হোক, কেননা আবার বেঁচে ওঠা যাবে কিনা সেটা সন্দেহের বিষয়—অন্ততপক্ষে অনিশ্চিত তো বটেই। বাস্তবে এই সমস্ত পরীক্ষাকার্য আপাতত মৃতদেহের ওপরেই চালানো হচ্ছে। এর ফলে একটা মূলগত পার্থক্য এসে যায়। জীবজগতে প্রাণ স্থগিত থাকার ঘটনা ঘটে এমন সমস্ত জীবদেহ নিয়ে যেগুলো জীবিত ও পরোপুরি সুস্থ। কিন্তু যে মানুষটি মারা গিয়েছে, কোনো একটি রোগে ভুগেই তার মৃত্যু—অতএব ধরে নিতে হয় মৃত্যুর পরে তার শরীরটি আর স্বাভাবিক অবস্থায় নেই। তবুও বিজ্ঞানীরা আশা করছেন জীবন ফিরিয়ে আনার আগে যদি মৃত্যুর কারণ দূর করা যায় তাহলে মৃতদেহ নিয়েও এই পরীক্ষাকার্য চলতে পারে। সেজন্য একমাত্র শর্ত এই যে মৃত্যু ঘটার কয়েক মিনিটের মধ্যে প্রয়োজনীয় ক্রিয়াকলাপ সেরে নিতে হবে এবং তারপরে মৃতদেহটিকে হিমাচ্ছন্ন করতে হবে।

নিম্ন তাপমাত্রায় জীবনের লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য অনুশীলন করার জন্য বিজ্ঞানের একটি শাখা জন্ম নিচ্ছে। এখনো পর্যন্ত তার সাফল্য তেমন উল্লেখযোগ্য নয়, এমনকি একটি পশুকেও ঠিকভাবে দীর্ঘকাল হিমাচ্ছন্ন অবস্থায় রাখা যায়নি। তবুও অনেক মানুষই চাইছে মৃত্যুর পরে তাদের শরীরকে হিমাচ্ছন্ন করে রাখা হোক। তাদের আশা, ভবিষ্যতে চিকিৎসাবিজ্ঞান আরো উন্নত হয়ে উঠবে এবং তারা আবার জীবিতের জগতে ফিরে আসতে পারবে। মৃত্যুর পরে হিমাচ্ছন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি সমিতি পর্যন্ত গড়ে উঠেছে। সমিতির নেতা একজন অধ্যাপক যিনি অমরত্ব লাভ করার সম্ভাবনা সম্পর্কে একটি বই পর্যন্ত লিখে ফেলেছেন। এবং দেখা যাচ্ছে, আরো বেশি বেশি মানুষ অমরত্ব লাভ করার আগ্রহী হয়ে উঠেছে। অতীতের অনুরূপ উদ্দেশ্য নিয়ে একটি ব্রিটিশ সমিতি তৈরী হতেও দেরী হয়নি।

হিমাচ্ছন্ন অবস্থায় প্রথম যে মৃতদেহটি রাখা হয়েছে সেটি একজন আমেরিকানের—ডঃ জেমস এইচ বেডফোর্ড, বয়স ৭০: ক্যান্সার রোগে তিনি মারা যান। মৃত্যু ঘটার সঙ্গে সঙ্গে (চার-পাঁচ মিনিটের মধ্যে) তাঁর শরীরে একটি বিশেষ ইনজেকশন দেওয়া হয় যাতে তাঁর শরীরের রক্ত জমাট না বাঁধে। সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাস চালু করার প্রক্রিয়া এবং হৃৎপিণ্ডের ওপরে বাইরে থেকে অঙ্গমর্দন। ফলে মৃত শরীরের মধ্যেও অক্সিজেন-যুক্ত রক্তের প্রবাহ চলতেই থাকে। আর তারই মধ্যে শরীরকে হিমাচ্ছন্ন করা হয়। এখন জেমস বেডফোর্ড নামধারী এই মানুষটি রয়েছে থার্মোস্ট্যাটিক ধরনের একটি অধারের মধ্যে। শূন্যডিগ্রীর ১৯৬ ডিগ্রী নিচের তাপমাত্রায়। আশা করা হচ্ছে, ভবিষ্যতে কখন

চিকিৎসাবিজ্ঞানের কল্যাণে ক্যানসার আরোগ্য করা সম্ভব তখন এই মানুষটিকে আবার বাঁচিয়ে তোলা যাবে। মৃতদেহটিকে হিমাঙ্কের নীচে রাখার জন্য যে-সব ক্রিয়াকলাপ চালাতে হয়েছে তার খরচ নাকি তিন লক্ষ টাকা।

এমনিভাবে একজন মানুষকে হিমাঙ্কের নীচে রেখে ভবিষ্যতে আবার বাঁচিয়ে তুলতে নানারকমের সমস্যা অবশ্যই দেখা দেবে। কিন্তু তবুও একথা ঠিক, ব্যাপারটি যদি সম্ভাব্যতার পর্যায়ে আসে তাহলে অনেক মানুষই চাইবে এমনিভাবে অমর হতে। কেননা সব মানুষই অমর হতে চায়।

ওপরের লেখাটি নেওয়া হয়েছে গোয়ার ইনস্টিটিউট অফ ওসীনোগ্রাফির বিজ্ঞানী পিটার জাকবের একটি লেখা থেকে। বিষয়টি নিয়ে আগেও আমরা বিজ্ঞানের কথায় আলোচনা করেছি। প্রাণকে হিমাঙ্কের অবস্থায় রেখে বহুকাল যে জীইয়ে রাখা সম্ভব এ-বিষয়ে বিজ্ঞানীরা এখন নিশ্চিত। এমনকি মহাকাশ-বিজ্ঞানীরা পর্যন্ত এখন ভাবছেন, দূর নক্ষত্রলোকের দিকে যদি স-মনুষ্য অভিযান চালাতে হয় (যে অভিযানে এমনকি নিকটতম নক্ষত্রলোকে পৌঁছতে হলেও হাজার হাজার বছর সময় লাগার কথা) তাহলে মহাকাশের যাত্রীকে হিমাঙ্কের অবস্থায় নিষ্ক্রিয় ও ঘুমন্ত রাখা দরকার। পরে গন্তব্যস্থলে পৌঁছবার পরে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার সাহায্যে মানুষটিকে আবার জাগিয়ে তোলা হবে: অর্থাৎ মানুষটি যে বয়স ও যে শরীর নিয়ে পৃথিবী থেকে যাত্রা করেছিল, হাজার হাজার বছর পরেও জেগে উঠবে সেই বয়স ও সেই শরীর নিয়ে।

হাজার হাজার বছর ধরে মানুষকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা এক কথা, কিন্তু প্রশ্ন উঠতে পারে—এই মুহূর্তে কোনো একটি দুর্ঘটনায় তাজা ও জীবন্ত যে-মানুষটির মৃত্যু হল তাকে বাঁচিয়ে তোলার উপায় নিয়ে বিজ্ঞানীরা কি ভাবছেন? তাও ভাবছেন, এ-বিষয়ে একজন সোভিয়েত বিজ্ঞানীর একটি লেখা আমরা নিচে উপস্থিত করছি। এই লেখা থেকে জানা যাবে, মস্কো শহরে ইতিমধ্যেই মৃতজনকে প্রাণ দেবার বিরাট এক আয়োজন গড়ে তোলা হয়েছে।

মৃতজনে প্রাণদান

(সুভেংলানা ভিনাকুরোভা-র লেখা একটি প্রবন্ধ থেকে)

"আমি যুদ্ধ দেখেছিলাম ও যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলাম। তারপরেও বেঁচে ছিলাম। আমি মরা গিয়েছি এখানে, মস্কোর কেন্দ্রে, বৈদ্যুতিক গবেষণা ইনস্টিটিউটে আমার আপিসে। মরবার আগে আমি শেষ শুনতে পাই ডাক্তারের সহকারীর কথা। তিনি বলছিলেন বুকের চাপ শুনো। তারপরেও কিছুক্ষণ আমার চারপাশে জনকয়েক মানুষকে দেখতে পেয়েছিলাম। তারপর সব অন্ধকার।

বেঁচে উঠি সেই একই ঘরে। শুনতে পাই কে যেন বলছে আমাকে যেন অ্যাম্বুলেন্সে নিয়ে যাওয়া হয়। বেঁচে ওঠার পরে এই ছিল প্রথম কথা যা আমার কানে আসে। আমাকে বাঁচিয়ে তুলছে একটি 'বিশেষ টীম'। (এই কথাগুলো নেওয়া হয়েছে একজন মানুষের রেকর্ড-করা কথা থেকে, যে-মানুষটির মতো আরো শত শত মানুষ মৃত্যুর পরেও পুনর্জীবিত।)

এই 'বিশেষ টীম' আছেন একজন পুনর্জীবনায়ন-বিশারদ ও চৈতন্যলোপ-বিশারদ এবং ডাক্তারের একজন সহকারী। তাঁরা যাতায়াত করেন বিশেষ অ্যাম্বুলেন্সে। অ্যাম্বুলেন্সে আছে প্রয়োজনীয় সমস্ত সাজসরঞ্জাম যাতে সঙ্গে সঙ্গে পুনর্জীবনায়নের প্রক্রিয়া শুরু করা যায়। আছে একটি কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাসের যন্ত্র, একটি ইলেকট্রোকার্ডিওস্কোপ, একটি ডিফাইব্রিলেটর একটি কার্ডিওস্টিমুলেটর ও আরো অনেক কিছু। অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা রাখতে হয়েছে এই কারণে যে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে সদর্পর রাস্তার ওপরেই—হাসপাতাল থেকে বা নিজের বাড়ি থেকে অনেক দূরে। এবং পুনর্জীবনায়ন-বিশারদদের কাজ করতে হয় অ্যাম্বুলেন্সের মধ্যেই বা দুর্ঘটনার যারা সাক্ষী সেই মানুষদের ভিড়ের মধ্যেই দাঁড়িয়েই।

প্রায়ই এমন হয় যে একজন মানুষের জীবন নির্ভর করছে অ্যাম্বুলেন্স ঠিক সময়ে পৌঁছতে পারছে কিনা তার ওপরে। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন ও শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হয়ে গেলে ডাক্তারের হাতে সময় থাকে মাত্র পাঁচ-ছয় মিনিট। এই সময়টুকু অত্যন্ত মূল্যবান, কেননা এই সময়টুকু পার হয়ে গেলেই পুনর্জীবনায়নের আর কোনো অর্থই থাকে না। এই সময় পার হবার পরে পুনর্জীবনায়ন ঘটলে সে বেঁচে ওঠে সে আর মানুষ থাকে না।

সোভিয়েত ইউনিয়নে চৈতন্যলোপ ও পুনর্জীবনায়নের গোটা ব্যবস্থাটির কাজকর্ম জনস্বাস্থ্য মন্ত্রকের দ্বারা পরিচালিত। এজন্য প্রচুর রাষ্ট্রীয় বরাদ্দ থাকে এবং পুনর্জীবনায়নের জন্য সমস্ত রকমের যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করা হয়। তাছাড়া, সবচেয়ে যোগ্যতাসম্পন্ন চিকিৎসকদের এই কাজে লাগানো হয়ে থাকে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রত্যেকটি বড়ো হাসপাতালের নিজস্ব চৈতন্যলোপ ও পুনর্জীবনায়নের বিভাগ আছে। অন্যান্য হাসপাতালের জন্য আছে ভ্রাম্যমাণ পুনর্জীবনায়ন কেন্দ্র।

মস্কো শহরের জন্য দিনে-রাতে তিনটি করে টীম সর্বক্ষণ ডিউটিতে থাকে। তিনজনকে নিয়ে এক-একটি টীম—একজন চৈতন্যলোপ-পুনর্জীবনায়ন বিশারদ, একজন পুনর্জীবনায়ন-ধাত্রীবিদ্যা বিশারদ ও একজন ডাক্তারের সহকারী। ডাক পাওয়া মাত্রই তারা হাজির হতে পারে। শতকরা ৫০টি ক্ষেত্রে মেডিকেল সাহায্য পাবার পরে রোগীর অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। তবে ক্লিনিকাল মৃত্যু ঘটার পরে যদি জটিলতা সৃষ্টি হয়—যথা, শ্বাসপ্রশ্বাস না ঘটা, মূত্রাশয়ের কাজ বন্ধ হওয়া—তাহলে বিশেষ রকমের সজ্জিত অ্যাম্বুলেন্সে রোগীকে বহন করা হয় এবং অ্যাম্বুলেন্সে যেতে যেতেও চিকিৎসা চলতে থাকে। রোগীকে অতঃপর নিয়ে যাওয়া হয় বিশেষ ক্লিনিকে যেখানে আছে কৃত্রিম কিডনির ব্যবস্থা উচ্চচাপযুক্ত অক্সিজেন প্রদানের ব্যবস্থা ইত্যাদি।

কয়েক দশক আগে যদি সমস্যাটা তোলা হত যে মৃত্যুর চিকিৎসা কিভাবে করতে হবে তাহলে ব্যাপারটাকে অবিশ্বাস্য মনে হওয়া স্বাভাবিক ছিল। এখনো মনে করা হয় ক্লিনিকাল মৃত্যু ঘটার পাঁচ মিনিট পরে কোনো মনুষ্যদেহকে পুনর্জীবিত করা অর্থহীন। তবে এমন কথাও শোনা যাচ্ছে, অক্সিজেনের ঘাটতি হওয়াটাই সব সময়ে সাফল্যমণ্ডিত পুনর্জীবনায়নের পথে বাধা নয়। মূল যে কারণের জন্য মৃত্যু হয়েছে সেটাই বড়ো কথা। সেই একটি কারণ অনেকগুলো কারণ তৈরি করে বসে। ফলে অনেক সময়ে পুনর্জীবিত করার পরেও আবার মৃত্যু হয়। এখন তাই একথা স্পষ্ট হয়েছে যে মৃত্যুর চিকিৎসা করতে হলে আগে দরকার পুনর্জীবিত অঙ্গার পীড়ার চিকিৎসা। আর তাই তত্ত্বগত বিচারে একথা বলা চলে

সজনীকান্ত দাস ও ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত

সমসাময়িক দৃষ্টিতে

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস

বহু-প্রতীক্ষিত দ্বিতীয় সংস্করণ ॥ পাঁচ টাকা

ডকটর বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য এম-এ, পি-এইচ-ডি রচিত

কলিতীর্থ কামারপুকুর ১০-০০

স্বামী নিত্যানন্দ রচিত

শ্রীম-দর্শন

॥ কথামৃতকর কর্তৃক কথামৃতের ভাষ্য ॥

পনেরটি খণ্ডে সম্পূর্ণ। ১ম ৪র্থ ও ১৪শ খণ্ড ॥ প্রতি খণ্ড ১২-০০

পঞ্চদশ খণ্ড—১৫-০০ ॥ অবশিষ্ট প্রতি খণ্ড—৮-০০ ॥

[জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড প্রকাশিত ও পরিবেশিত]

॥ জেনারেল বুকস ॥ এ-৬৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট কলিকাতা ৭৩০০০৮।

যে ক্লিনিকাল মৃত্যুর পরে পাঁচ মিনিট অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়াটাই শেষ কথা নয়।

তার মানে, মৃত্যু অপরিহার্য এমন কথা মনে করার কোনো কারণ নেই। বিজ্ঞানীরা অনবরত পরীক্ষাকার্য চালিয়ে যাচ্ছেন মৃত জীবকে বারে বারে পুনর্জীবিত করা হচ্ছে। পাঁচ মিনিট পরেও যে কিছু করার আছে, করা যায়—তার খোঁজ পাবার জন্য প্রবল অনুসন্ধান চলছে।

বিজ্ঞানবার্তা

মানুষ কোন সময়ে ধাতু তৈরি করতে শিখেছে

প্রত্নতত্ত্বের পাঠ্যপুস্তকে সাধারণত লেখা হয় যে মাত্র ৫,৫০০ বছর আগে মানুষ ধাতু তৈরি করতে শিখেছে। কথাটা ঠিক নয়। মানুষ ধাতু তৈরি করতে শিখেছে তার অনেক আগেই। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞান আকাদেমির প্রত্নতত্ত্ব ইনস্টিটিউটের সদস্যরা ইরাক থেকে যেসব নিদর্শন সংগ্রহ করেছেন তা থেকে এই সাক্ষ্য পাওয়া যাচ্ছে। ইতিহাস-বিজ্ঞানের ডক্টর রাউফ মুনচায়েভের নেতৃত্বে ইনস্টিটিউটের একটি অভিযাত্রী-দল সম্প্রতি ইরাক থেকে প্রত্যাবর্তন করেছেন।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে ইরাকের বাণিজ্যিক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক গড়ে উঠছে। সোভিয়েত প্রত্নতত্ত্ববিদরা গত সাত বছর ধরে ইরাকে খননকার্য চালাচ্ছেন। এ-বিষয়ে ইরাকের সঙ্গে একটি সহযোগিতামূলক চুক্তি আছে। এ-বছর অভিযাত্রী-দল টেল সোটোর নিম্নতম সাংস্কৃতিক স্তরে অনুসন্ধান চালিয়েছেন। টেল সোটো হচ্ছে খ্রস্টপূর্ব সাত হাজার বছর আগেকার একটি প্রাচীন স্তম্ভ।

এখানে আবিষ্কৃত হয়েছে তামার তৈরী শিল্পের প্রাচীনতম একটি নমুনা। একটি সমাধিস্থান খনন করে প্রচুর তথ্য পাওয়া গিয়েছে। প্রাপ্ত নিদর্শনের মধ্যে আছে একটি পাত্র, তার মধ্যে একটি শিশুর অবশেষ, শিশুর পায়ের কাছে খাদ্য সহ মাটির একটি গামলা আর সেই গামলার তলায় নলাকৃতি একটি হাড়, শিশুর গলায় শঙ্খহার, তার সঙ্গে আটকানো দুটি তামার গুটি। উত্তর মেসোপটেমিয়ার আজ পর্যন্ত তামার বস্তু যা কিছু পাওয়া গিয়েছে তার মধ্যে এই দুটি তামার গুটি প্রাচীনতম।

এই সমস্ত নিদর্শন থেকে বিজ্ঞানীরা মেসোপটেমিয়ার অধিবাসীদের সম্পর্কে অনেকের অনেক ধারণা বদলাতে বাধ্য হয়েছেন। এই মেসোপটেমিয়ার অধিবাসীরা হচ্ছে আমাদের এই গ্রহের প্রথম কৃষক ও প্রাচীন জগতের প্রথম ধাতুবিদ। একটি সিদ্ধান্ত এই যে, এতদিন পর্যন্ত যে-তারিখটি ভাবা হয়েছিল তার চেয়েও অন্তত হাজার বছর আগে আমাদের এই পৃথিবীতে ধাতুবিদ্যার সূত্রপাত।

অরুণকান্ত

'শিল্পী রবীন্দ্রনাথের মডেল চিন্তা' প্রসঙ্গে

লেখকের বক্তব্য

২০ ফেব্রুয়ারীর 'অমৃত' সংখ্যায় শ্রীঅনিলকুমার ভৌমিকের চিঠি প্রকাশিত হয়েছে। তারপর টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সম্পাদক শ্রীসৌমেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের চিঠিও (২৪-২-৭৬) আমরা পেয়েছি। এঁরা দুজনেই প্রবন্ধটি ভাল করে পড়েন নি। বস্তুত দুজনের চিঠিই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

রবীন্দ্রনাথকে কোনো কাঁচের পেয়ালার মতন টুনকো জিনিস ভাবাটা কি ঠিক হবে? রবীন্দ্রনাথকে আমরা জানি মহাসাগরের মতন। যার গভীরতা মাপার ক্ষমতা আমাদের অনেকের নেই। এই শতাব্দীর বিশ দশকে যখন রবীন্দ্রনাথ ছবি আঁকতে শুরু করেন তখন বহু রবীন্দ্রভক্ত আড়ালে-আবডালে নানান রকমের কথা বলেছিলেন। আমার প্রবন্ধে চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথের কথাই বলা হয়েছে। তাঁকে খাটো করা হয় নি। বিশ দশকে বাংলাদেশে চিত্রশিল্পীদের জন্যে কোনো মডেলের ব্যবস্থা ছিল না। এখন যা অতি সুলভ। এবং যা অন্য সব দেশের চিত্রশিল্প শিক্ষালয়ে থাকে। শ্রীভবানীচরণ লাহা অর্ধ শতাব্দী ধরে এই দেশের চিত্রশিল্পীদের জন্যে অর্থ ও শ্রমদান করেছেন। তাঁরই বদান্যে 'শোভা' বইটি প্রকাশিত হয়। এই বইতে রবীন্দ্রনাথের কবিতাগুলি প্রতিটি মডেলের ছবির সঙ্গে ছাপা হয়। রবীন্দ্রনাথ মডেল সম্পর্কে কিছু লিখেননি বটে কিন্তু ওই বইটি পড়ে মনে হয় তিনি তৎকালীন চিত্রশিল্পীদের জন্যে ভাবতেন। তাই নিয়ে প্রবন্ধটির অবতারণা।

'শোভা' বইটি সম্বন্ধে সন্দেহ ও ভুল সংবাদ লিখছেন শ্রীঅনিল ভৌমিক। সেই কারণে বইয়ের টাইটেল পেজের ছবি এই সঙ্গে ছাপা হচ্ছে। আমার প্রবন্ধে যা লেখা হয়েছে তা আবার লিখতে বাধ্য হচ্ছি এই কারণে যে চিঠি দুটি অন্য ধারণা প্রশ্রয় দেয়। রবীন্দ্রনাথ মডেলের ছবি ছাপেন নি। ওই বইয়ের কবিতা 'ক্যাপশান' দেবার অনুমতি দেন বিশ্বভারতী।

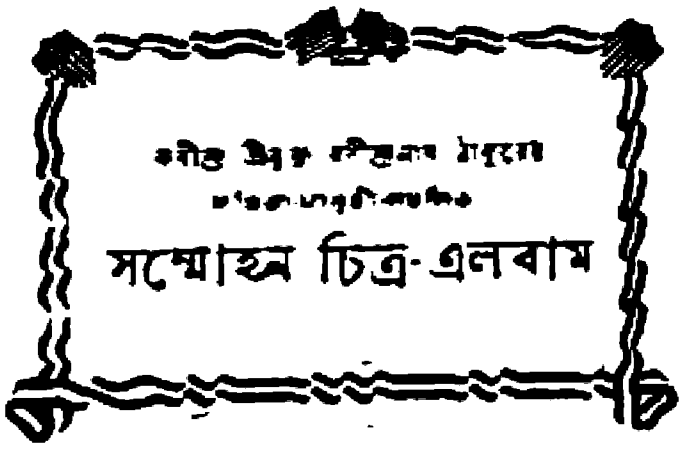

'শোভা' বইটি আমার কাছে আছে। এই বই সম্বন্ধে আমি যা লিখেছি তা আবার লিখছি, সে যুগের চিত্রশিল্পীদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন লাহা পরিবারের শ্রীভবানীচরণ লাহা। আর্টিস্টদের কাজের সুবিধার জন্য শ্রীভবানীচরণ লাহা মডেলদের নিয়ে একটি আলবাম প্রকাশ করেন ১৯২৬ সালে। বইটি প্রকাশিত হয় বসুমতী সাহিত্য মন্দির থেকে। এই বইটির নাম 'শোভা' সবশুদ্ধ এগারো চারটি মডেলের ছবি আছে। প্রতিটি ছবির নিচে রবীন্দ্রনাথের কবিতার কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে। এবং বইটির প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপা আছে কবীন্দ্র শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা মাধুরী সম্বলিত সম্মোহন চিত্র এলবাম।' শ্রীভবানীচরণ লাহা দ্বারা সংকলিত ও সুসজ্জিত হয় বইটি। বইটির নিবেদনে শ্রীভবানীচরণ লাহা লিখেছেন, চারুচিত্রকলার সেবায় অবসর বিনোদনের জন্য বিভিন্ন মডেলের বিভিন্ন ভঙ্গীর কতকগুলি ফটো তুলেছিলাম। তখন কল্পনা ছিল অবসর মত এগুলির সাহায্যে চিত্র অঙ্কিত করিব। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় একদিন সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া ফটোচিত্রের এলবামখানি দেখেন এবং ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশের জন্য উৎসাহিত করেন। তাঁহারই আগ্রহে, তাঁহারই প্রদত্ত 'শোভা' নামে তাঁহারই পরামর্শ মত বিশ্বভারতী হইতে অনুমতি লইয়া বিশ্বকবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কবিতা পারিজাত-মাধুরী সমাবেশে ইহা সুশোভিত করিয়াছি।.....'

অমৃত পূজা সংখ্যায় আমার প্রবন্ধে কিছু ছাপার ভুল আছে। তার জন্য আমি দায়ি নই। অনিবার্যকারণবশত ছবিগুলির ক্যাপশন বা কবিতাগুলি ছাপা হয়নি।

ইতি—
দিলীপ মালাকার

(এই বিষয়ে আর কোনো চিঠি ছাপা হবে না। অ স.)

CENTRAL LIBRARY

শিউলি

দিলীপ যোষ

চলন্ত গাড়ির দোলানীতে বোধহয় একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল অনিন্দ্য। ঝাঁকানী খেয়ে গাড়িটা থামতেই ওর ঘুম ভাঙলো। বড় বড় একরাশ চুল উড়ে এসে পড়েছিল চোখের ওপর। বাঁ হাত দিয়ে চুলগুলো সরিয়ে চেয়ে দেখল পানাগড়ে গাড়ি থেমে। প্ল্যাটফর্মে দোকানগুলি অল্প টিমটিম করে আলো জ্বলছে।

ডানপাশে জানালার ধারে কাপড়ের কাঁধ-ঝোলাটা ছিল ওর। সেটা ঠিক আছে কিনা ডান হাত দিয়ে দেখে নিয়ে বাঁ হাতটা ঢোকালো বাঁ পকেটে। সেখান থেকে সিগারেট-দেশলাই বার করে একটা সিগারেট ধরানোর পর হঠাৎ খেয়াল হল, হাওড়ায় সিগারেট নিতে ভুলে গেছে। পকেটে মাত্র ছটি সিগারেট। রানীগঞ্জে নেমে আবার যদি ভুলে যায়?

গাড়ি তখনও থেমে। বাঁ পাশের এক ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করল এখানে সিগারেট-দিশলাই পাওয়া যায়?

ভদ্রলোকটি অনিন্দ্যর দিকে এমন-ভাবে তাকালেন যেন জীবনে এই প্রথম তিনি সিগারেট শব্দটি শুনলেন। অনিন্দ্য মুখ ঘুরিয়ে নিল বিরক্তিতে। ভাবলো—একটা না একটা বেরসিক বদ লোক সারা জীবন তার আশপাশে থাকবেই।

জানালা দিয়ে বাইরের দিকে উঁকি মারতেই গাড়িটা চলতে শুরু করল। ভদ্রলোকটা ওর হঠাৎই সঙ্গী হয়ে গেল। ইচ্ছে হোল কাঁধ-ঝোলাটা নিয়ে একবার বাথরুমে থেকে ঘুরে আসে। কিন্তু আসন্ন রাতের কথা ভেবে সে ইচ্ছে দমন করে আর একটা সিগারেট ধরিয়ে গাড়ির ভেতরে নজর ফেরালো। সামনের দিকে তাকাতেই মেজাজটা হঠাৎই আবার নরম হয়ে এল তার। অত্যন্ত খুশী হোল অনিন্দ্য মজুমদার।

এক যুবতী মহিলার কোলে বসে বছর তিন-চারেকের এক বাচ্চা একটা কাঠের পুতুল নিয়ে অসাবধানে খেলা করছে। মহিলাটি জানালার বাইরে চোখ রেখে মনটি তার ফেলে রেখেছেন সন্তানের ওপর। অনিন্দ্যর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই বাচ্চাটা খুশী হয়ে দুহাত তুলতেই খেলনাটা পড়ে গেল মহিলার কোলের ওপর। বাইরের দিকে চোখ রেখেই মহিলা তুলে ধরলেন সেই খেলনাটি বাচ্চার দিকে, কিন্তু অসাবধানতে বাচ্চাটির হাত দুটি নিজের হাতের নাগালের মধ্যে না পেয়ে চোখ ফিরিয়ে দেখেন তার খিলখিলিয়ে অনিন্দ্যর দিকে তাকিয়ে দুষ্টুমি করে হাসছে। তরুণীটি মুখ তুললেন। অনিন্দ্যর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই আবার মুখ ঘোরালেন বাইরের দিকে।

অনিন্দ্য কখনও তার গালদুটি ফোলায় বেলুনের মত আবার কখনও একগাল্লকের পাশ চুপসে অন্য গালটি ফোলায়। কখনও মুখটা বিকৃত করে কখনও বা চোখদুটো ছোট করে পিটপিট করে। প্রায় বাচ্চাটা একদৃষ্টে ওর দিকে তাকিয়ে মজা লোটে। ফিক ফিক করে হাসে নাল পড়ার মুখ থেকে। পুরোটা খেলানাটি পড়ে থাকে মায়ের কোলে। ভদ্রমহিলা মাঝেমধ্যে ঘাড় ফিরিয়ে দেখে নেন বাচ্চাটিকে।

কয়েকদিন ধরে তার মন-মেজাজ ভীষণ তেতো হয়ে আছে। কোনও কিছু ভালো লাগছে না, মাথায় আসছে না কিছু। তার ওপর পয়সাকড়ি হাতে নেই ফলে চলাফেরা হচ্ছে না। চার পাঁচ মাস পড়া হলে গেল স্কুল থেকে মাইনে পাওয়া বন্ধ হয়ে। বেবাক পাল্টে গেল পরিবেশের ছবিটা। চারদিন বাকি ফল ধরতে। আবার বাবা-টানার একঘেয়েমি শুরু হওয়ার আগে অনিন্দ্য বেরিয়েছে মনমেজাজটা একটু সাফা করতে। পরিমল ওর বন্ধু থাকে রানীগঞ্জে। সহপাঠীর কাছ থেকে কয়েকশো টাকা ধার নিয়ে সে আজ ট্রেনে চেপেছে। মতলব আছে আর একটা—আসার সময় পরিমলকে টুসি পাঠিয়ে দু পাঁচটা যদি কড়া যায় কলেজের জন্য।

বাচ্চাটার সঙ্গে ছেলেমানুষির খেলা খেলতে খেলতে মনটা ওর একসময় ভারপুর হয়ে উঠলো। তখন মনে মনে পাশের বেরসিক বয় লোকটিকে ক্ষমা করে ও আবার সিগারেট ধরালো। বাচ্চাটি হাত বাড়ালো অনিন্দার দিকে। ও দেশলাইটা এগিয়ে দিয়েও হাতটা ফিরিয়ে আনলো বাচ্চাটির কথা ভেবে। এবার অনিন্দা সিগারেটের প্যাকেটটা এগিয়ে দিল। বাচ্চাটি হাতে পেয়েই প্যাকেটটা মুখে পুরে লাল-কোল আধিয়ে দুম করে ছুড়ে দিল সেটা জানালার বাইরে। দোলকীপারের মত হাত বাড়িয়েছিল অনিন্দা কিন্তু শেষরক্ষা করতে পারলো না। পাঁচ পাঁচটা সিগারেট হাতছাড়া হয়ে গেল ওর।

ভদ্রমহিলা মুখ ফেরালেন। একটু যেন বিরক্তি ভাব ভরা চোখেমুখে। অনিন্দা এই প্রথম দেখল বিদেশ যাত্রীর একজন মহিলার মুখে চোখে। তিনি একহাতে দিয়ে বাচ্চাটির হাত শক্ত করে ধরে আবার বাইরের অন্ধকারে মুখ ঘোরালেন। একটু যেন অপ্রস্তুতে পড়ল অনিন্দা। বলবে কি বলবে না করে শেষে বলেই ফেলল ছেড়ে দিন ওকে। কখনোই সিগারেট খাওয়া নেই আজ।

তবুও কথা বললেন না ভদ্রমহিলা তাকালেনও না অনিন্দার দিকে শুধু আলতো করে বাচ্চাটির হাতদুটি ছেড়ে দিলেন। মুক্তি পাওয়া হাতদুটি নিয়ে বাচ্চাটি আবার দাপাদাপি শুরু করে দিল অনিন্দার দিকে তাকিয়ে।

এইভাবে কখন সময় চলে গেছে বুঝতে পারেনি। একটা স্টেশন থেকে গাড়িটা ছাড়তেই ও বাঁ পাশে তাকিয়ে দেখল সেই বেরসিক বয় লোকটি কখন যেন নেমে গেছেন। সেখানে আর একজন বসে। তাকে জিজ্ঞেস করল, রাদীনস্ক কি এর পর? দুনিয়ার বেরসিক লোকের স্বভাব শুনো থাকে না। এও সেই জাতের। অনেকক্ষণ অনিন্দার দিকে তাকিয়ে গলার স্বরটা যথা উঁচু পর্দায় তুলে ডিরেক্টরী বই-এ সে বলল—আপনি কি এ লাইনে নেবধয়? রাদীনস্ক চলে গেছে দু ইস্টেশান আগে।

চকিতে ভদ্রমহিলা একবার অনিন্দার দিকে তাকালেন। চোখাচোখি হতেই উনি আবার বাইরে দৃষ্টি ফেরালেন। বাচ্চাটি তখনও অনিন্দার দিকে ভয়-চোখে তাকিয়ে হাসছে। অসহায় অনিন্দা এবার আশপাশের যে কোন একজনকে জিজ্ঞেস করল এর পরের স্টেশন কি? রিহার্সাল না দিয়ে বললে যেমন শোনায়, অনিন্দা তেমনি শুনল—আরও আধ ঘন্টা তফাতে একটি নাম—সাঁতারানপুর।

রাদীনস্ক পরিমলের কাছে এর আগে দুবার এসেছে অনিন্দা। দুশিয়ার থাকলে এভাবে অপ্রস্তুত হতে হতো না। তবু কিছু ওর মেজাজ বিগড়ালো না। একটা বাচ্চা সঙ্গে থেকা করতে করতে নির্দিষ্ট স্টেশন পেরিয়ে এসেছে—নিজের এই ছেলে-মানুষিতে ও মনে মনে খুশীই হোল মনে মনে।

তন্দ্রা এসেছিল বাচ্চাটির। ঘুম চোখে হাত পা নাড়তে নাড়তে ও মায়ের দিকে হাত বাড়িয়ে বুকের কাপড় টানতে লাগলো। ভদ্রমহিলা আরও আটোসাটো করে গায়ের কাপড়টা জড়িয়ে বাচ্চাটিকে কোলে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর অনিন্দাকে পেছনে রেখে ঝুঁকলেন সামনের দিকে। বেঞ্চের তলা থেকে টেনে বার করলেন খাকি কাপড়ে ঢাকা দেওয়া একটি সুটকেস। অনিন্দা এতক্ষণ দেখতে পায়নি প্লাস্টিকের বালতি ব্যাগ এ ট্রেনেও দিব্যি উনি বসে-ছিলেন। বালতি ব্যাগের ওপর সুদৃশ্য একটি জানিটি ব্যাগ। সুটকেসটা টেনে বালতি ব্যাগটা পায়ের কাছে রেখে উনি আবার বসলেন। তারপর হাতঘড়ি দেখ-লেন:

কাঁধে ব্যাগটি সন্তর্পণে ঝুলিয়ে সেই বয় লোকটিকে ইচ্ছে করে একটা ধাক্কা মেরে অনিন্দা এগিয়ে গেল অন্য দরজার দিকে।

স্টেশনে নেমে একটি রিকসাওয়ালা পেয়ে গেলেন উনি। তার হাতে সুটকেস আর বালতি ব্যাগটি দিয়ে এগুলেন বাইরের দিকে। গেটের কাছে গিয়ে শুনলেন গেট-কীপারের গলা—না, রাদীনস্কের কোন ট্রেন নেই. আর আজ রাত্রে। কাল সকাল আটটা নাগাদ একটা আছে।

ততক্ষণে উনি পৌঁছে গেছেন গেটে। অনিন্দা পথ করে দিয়ে সরে দাঁড়ালো। একবার দুজনের চোখাচোখি হোল। বাচ্চাটিকে কোলে ফিরিয়ে জানিটি ব্যাগ খুলে উনি টিকিট বার করে গেটকীপারের হাতে দিয়ে বেরিয়ে যাবার মুখে শুনলেন অনিন্দা গেটকীপারকে জিজ্ঞেস করছে—ওয়েটিংরুমটা কোন দিকে?

ভদ্রমহিলা ঘুরে দাঁড়ালেন। গেটকীপার হাত উঁচিয়ে দেখিয়ে দিলেন ওয়েটিং-রুমটা। অনিন্দা দেখল তো তা স্টেশন। জিজ্ঞেস করল কোনও ফ্লামটিন-টামটিন—

গেটকীপার ভদ্রলোক পাশ কাটিয়ে চলে যেতে যেতে বললেন ভেতরে কিছু পাবেন না। বাইরে গিয়ে দেখুন যদি কিছু পান।

অনিন্দা গেট পেরিয়ে বাইরে গিয়ে দেখল ভদ্রমহিলা একটা সাইকেল রিকসায় বসে। তিনি রিকসাওয়ালাকে দাঁড়াতে বলে অনিন্দাকে ডাকলেন।—শুনছেন?

অনিন্দা ওর পেছনে ছিল। ঘুরেই বলল আমাকে কিছু বলছেন?

ভদ্রমহিলা সামান্যমুখে স্নিগ্ধ লাস্যভঙ্গিটুকু রেখে স্থির তাকিয়ে বললেন—আপনার যদি খুব অসুবিধে হয় তাহলে আমার সঙ্গে আসতে পারেন।

অনিন্দা মনে মনে ভাবলো—সেই যদি ভদ্রতাটুকু করবেন তাহলে একটু আগে কথাটা বললে অযথা টেনশানে পড়তে হোত না। কিন্তু মুখে ভদ্রতা করল—আপনাকে আবার ঝামেলায় ফেলা!

একবার কোন জবাব না দিয়ে ভদ্র-মহিলা রিকসাওয়ালাটিকে বললেন আর একটা রিকসা ডাকতে। যদিও এক রিকসাতেই যাওয়া যেত। অনিন্দা নিজের মনে বলল—বাঃ সুন্দর। কে বলে নারী বুদ্ধিহীনা।

ওরা রিকসাটা ছাড়তেই ভদ্রমহিলা বললেন—সিগারেটের দোকান খোলা আছে। কিনে নিন।

আগুপিছু রিকসা গিয়ে থামলো কোয়ার্টার-মত একটা বাড়ির সামনে। রিকসাভাড়া মিটিয়ে নিজের হাতে সদর দরজার তালা খুললেন তিনি। রিকসাওয়ালা সুটকেস বালতি ব্যাগ নিয়ে ভেতরে ঢুকলো। উনি রুকে উঠে আলো জ্বাললেন। রকের ওপর সুটকেস আর বালতি ব্যাগ রেখে রিকসাওয়ালা চলে গেল। অনিন্দা নিজে থেকে সদর দরজাটা বন্ধ করে এসে রকে দাঁড়ালো। উনি একটা ভালাবন্ধ ঘরের দরজা খুললেন। অত্যন্ত যত্নে বাচ্চাটিকে শুইয়ে দিলেন খাটে। তারপর হাতের চাপড় দিয়ে বিছানাটির ভাঙা-ঘুমটা জমিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এসে সুটকেস আর বালতি ব্যাগটি ঘরে নিয়ে গেলেন। বেরিয়ে এসে রান্নাঘরের দরজা খুললেন। স্টোভটা ধরালেন। খুব গরম করে কিচিন বটল-এ ঢেলে আবার শোবার ঘরে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করলেন। অপ্রস্তুত অনিন্দা ঠায় যেমন দাঁড়িয়েছিল তেমনি দাঁড়িয়ে থেকে একসময় একটা সিগারেট ধরালো। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখল তারাগুলো আকাশে অল্প অল্প মেঘ জমছে। সিগারেটটা শেষ হওয়ার মুখেই মহিলা হাট করে দরজাটা খুলে দিলেন। অনিন্দা দেখল—তিনি চোখের জায়গাকাপড় পালটে একটা হাল্কা তুঁতে রঙের শাড়ি পরেছেন। গায়ের জামা কাপড় ঢাকা। পাশের একটি ঘরের দরজা খুলে আলো জ্বেলে জানালাগুলো পাট পাট করে দিয়ে ডাকলেন আপনি এখানে একটু বসুন। কফির ব্যবস্থা করি।

অনিন্দা ঘরে ঢুকে সন্তর্পণে ব্যাগটি কাঁধ থেকে নামিয়ে চৌকির ওপর রাখলো। ঘরে একটা ভ্যাপসা গন্ধ। ও আর একটা সিগারেট ধরালো। মিনিট পাঁচেকও হয়নি উনি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বললেন হাতমুখ ধুয়ে নিন। দেশলাই জ্বালিয়ে যাবেন যান। আলোটা ফিউজ হয়ে গেছে দেখছি।

হাতমুখ ধোবার কোনও দরকার ছিল না, শুধু কাঁঠ জানালিয়ে অনিন্দ্য বাথরুমে গেল। ফিরে এসে দেখে ঘরের ভেতরে একটা টেবিলের ওপর কাঁচের প্লেটে অনেকগুলো লুচি আলুর তরকারি। আর একটা ছোট প্লেটে মুঠোখানেক চিনি। পাশে কাঁচের গ্লাসে জল। ভদ্রমহিলা দরজার গোড়ায় এসে বললেন, নিন খেয়ে নিন।

—আপনার?

—আমার আছে, আপনি খান।

—বাপস্ত রাগ করে এই সকাল বেলা টিফিন কৌটোর এর বেশী লুচি তরকারি খওয়া তো কথা নয়। আর হালুয়া—

এই প্রথম হাসিমুখ দেখল অনিন্দ্য। হাসতে হাসতে উনি বললেন, মা আসার সময় সঙ্গে দিয়েছিলেন।

—নিয়ে আসুন একটা প্লেট, ভাগ করে খাই।

অনিন্দ্য প্লেটটা নিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে আসতেই উনি বললেন, দাঁড়ান আসছি।

একটু পরেই একটা প্লেট হাতে করে এনে বললেন, এই দেখুন, মা অনেকগুলো দিয়ে দিলেন। তারপর দরজা থেকে সরে গিয়ে বললেন, নিন, খেয়ে নিন।

খাওয়া হয়ে যাবার পর এ-ঘরে এসে অনিন্দ্যর খাওয়া-প্লেটটা তুলতে তুলতে উনি জিজ্ঞেস করলেন, রাত্রে কি আপনার জল লাগে?

একটু ভেবে অনিন্দ্য বলল, হ্যাঁ, একটু লাগে।

এক গেলাস জল এনে টেবিলে রেখে উনি বললেন, কাল সাতটায় ডেকে দেব। চা খেয়ে সাড়ে সাতটায় বেরিয়ে পড়লে এ্যাট ইজ আটটা দশ ধরতে পারবেন।

'এ্যাট ইজ' কথাটা অনিন্দ্যর কানে পরিষ্কার হয়ে বাজলো। স্পষ্ট মার্জিত উচ্চারণ—'এ্যাট ইজ'।

চলে যেতে যেতে বললেন, নিন, দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে শুয়ে পড়ুন।

দরজা বন্ধ করে ভেতর দিকের জানালাটা বন্ধ করতে গিয়ে সে দেখল ছিটকিনি নেই। অগত্যা সেটা শক্ত করে ভেজিয়ে দিয়ে কাপড়ের কোলাব্যাগের ভেতরে সাবধানে হাত ঢোকালো অনিন্দ্য।

মধ্যরাত্রে ভদ্রমহিলার ঘুম ভেঙে গেল, শীত শীত করছিল। উঠে আসা জেনে দেখেন মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। ছাট আসছে জানালা দিয়ে। হাত বাড়িয়ে জানালাটা বন্ধ করলেন। বাচ্চার কাঁথা বদলে গায়ে ঢাকা দিলেন। জানুয়ের বোতামগুলো এঁটে, কাপড়টা আটোসাটো করে গায়ে জড়িয়ে বাইরে এসে দেখেন পাশের ঘরে আলো জ্বলছে। ভেতরের দিকের জানালাটা খোলা। বাথরুমের দিকে কান পাততেই কোন শব্দ পেলেন না। এগিয়ে গেলেন জানালার কাছে। দেখলেন—অনিন্দ্য বিশ্রীভাবে কুঁকড়ে-মুকড়ে শুয়ে আছে। পরনে ট্রেনের সেই পাজামা পাঞ্জাবি। মাথার বালিশটা নীচে পড়ে আছে। লম্বা হয়ে বা হাতখানা বেরিয়ে গেছে চৌকী পেরিয়ে, তার ওপর ওর মাথা। এ জানলা দিয়ে ওর মুখ দেখা যাচ্ছে না। বাঁ হাতের এক পাশে খোলা একটা ডায়েরী। খোলা কলমের নিবের কালির চোপসানো দাগ বিছানার চাদরে। পশ্চিমের জানালা দিয়ে ছাট আসছে। হাত ভিজছে চাদর ভিজছে। উত্তরের জানালা দিয়ে জল ঢুকে গড়িয়ে যাচ্ছে মেঝেতে। দু ঘরের মাঝখানের দরজার কাছের টেবিলটার ওপর সেই ব্রীফ-কেস কাপড়ের ব্যাগটা দলা করা। তার পাশে খোলা মাঝারি সাইজের একটি বোতল গায়ে তার ইংরিজী হরফে লেখা লেবেল। সে কটা অক্ষর পড়া গেল তা থেকে উনি নামটা পড়তে পারলেন। কলেজজীবনে ছেলে-বন্ধুদের মুখে হামেশাই এসব নাম শুনেছেন উনি। বোতলের পাশে সেই জলের গেলাসটা কাত হয়ে পড়ে আছে। বোতলটা না থাকলে গেলাসটা গড়িয়ে পড়ে ভাসাতো। টেবিলের ওপর ইতস্তত ছড়ানো তিনটে সিগারেটের প্যাকেট, একটি দেশলাই। বেশ কিছু খাওয়া সিগারেটের টুকরো ঐশ্বের ওপর বৃষ্টির ফড়ানো জলে ভাসছে। পুরো দৃশ্যটি দেখে নিয়ে উনি দরজার কাছে এসে ঠেলে দেখলেন দরজা বন্ধ। তারপর নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করতে গিয়েও খোলা রেখে দু ঘরের মাঝখানের দরজার ছিটকিনি সাবধানে খুলে সন্তর্পণে এ ঘরে ঢুকলেন। দরজার খুব কাছে দাঁড়িয়ে পেছনের দিকে ডান হাত বাড়িয়ে শক্ত করে দরজাটা ধরে বাঁ হাত দিয়ে নিঃশব্দে মদের বোতলটা তুলে পিছিয়ে গিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে নিঃশব্দে দরজা বন্ধ করে দিলেন। একটু হিসেব করে নিয়ে টেবিলের ওপর নিজের হাতঘড়িটার পাশে সেটা রাখলেন। তারপর ওদিকের ভেতরের দরজাটা বন্ধ করে পাখাটা কমিয়ে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লেন এক সময়।

সকালে ঘুম যখন ভাঙল অনিন্দ্যর তখন বেশ রোদ চড়েছে বাইরে। প্রথমেই ওর খেয়াল হল—টেবিলে বোতলটি নেই। তারপর বুঝলো আটটা দশের ট্রেনে এখন গুংগার হাওয়া লাগছে। ভেজা মাথার বালিশটা তুলে জানালার গায়ে কাত করে রেখে একটা সিগারেট ধরালো। দুটো দরজা চেপে দেখল বন্ধ। বোতলটি উদ্ধার রহস্যের পর্দাটি গোয়েন্দার মত আবিষ্কার করার চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে আর একটা সিগারেট ধরালো সে। ঠিক সেই সময়ে ভেতরের সেই ছিটকিনিবিহীন জানালা থেকে একটি অপরিচিত কণ্ঠস্বর শুনতে পেল।

—আপনার চা খেয়ে?

মুখ তুলে একটি কমবয়সী মেয়ের মুখ দেখতে পেল অনিন্দ্য।

—ওঁর এখনই তো বেরোবার কথা।

এমন করে কথাটা বলার মানে কি এ-বাড়িতে অনেক দিন ধরে আছে। মেয়েটি সরে যেতেই ও দরজা খুলে বাথরুমে গেল। বাথরুম থেকে বেরিয়ে সোজাসুজি দেখতে পেল রান্না ঘরে মেয়েটি চা করছে। জিজ্ঞেস করল—উনি কোথায়?

—আজ তো ইস্কুল খুললো, তাই জলটল দেওয়া করিয়ে পাঠান

—স্কুল এখান থেকে কতদূর?

—এই তো এখান থেকে দেখা যায়।

—বাচ্চাটা কোথায়?

—নিয়ে গেছে, কাঁদছিল বড্ড।

—বাচ্চাটার নাম কি?

চায়ের কাপ নিয়ে এসে মেয়েটি বলল—খুকু।

চা নিয়ে উঠোনের ধারে রকের ওপর বসল অনিন্দ্য। চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, ব্যাগ থেকে সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাইটা আন তো।

প্যাকেট দেশলাই হাতে নিয়ে অনিন্দ্য জিজ্ঞেস করল, তুমি এ বাড়িতে কাজ কর?

—হ্যাঁ। আপনাকে মা খেয়ে যেতে বলেছেন। রান্না হয়ে গেছে।

একথার কোন জবাব দিল না অনিন্দ্য। দু-তিনটে গুরুন মাথায় এসেছিল তার। কিন্তু জিজ্ঞেস করতেও ইচ্ছে করল না। নিজেকেই নিজে বলল—কি হবে সোনা! স্কুল থেকে ফেরার আগে মানে মানে কেটে পড়। নাটা-কষ্টটা খেতে আর ভাল লাগে না। পরিমলকে টুপি পরানোর এনকাউন্টার স্টোর করা দরকার, নইলে সমূহ সর্বনাশ। পরশু স্কুল খুলবে। পরশুদিনই হেডস্যারকে আড়াইশ টাকা ধার শোধ করতে হবে, পাকা কথা দেওয়া আছে।

অনিন্দ্য উঠে পড়ল। ঘরে এসে ডায়েরীর পাতা ছিঁড়ে কপাল ঠুকে লিখল—

সম্রাটেষু,

আপনার নাম জানি না। জানা হল না অনেক কিছুই। ভাত খাবার অনুরোধ রাখা সম্ভব হল না বলে অনুতপ্ত। নিষ্কর্মাকে বাঁচিয়ে রাখতে ঈশ্বর কিছু অকাজ রাখেন তার জন্য। টাকা ধার করতে এক বন্ধুকে পাওয়া করতে হচ্ছে বলে অপেক্ষা করা গেল না। যদি কখনও পরাবস্তু হয়ে নিয়ন্ত্রণ করার সাহস রাখেন, তাহলে নিশ্চয়ই তা রক্ষা করব। ইচ্ছেটা এই রকম—আমল বাটি পরিবর্তে একটি রুপোর থালে ভাত। পাশে রুপোর গেলাসে জল। হাতে তৈরী পশমী আসন পাতা সামনে। আর অনতিদূরে লালপেড়ে সাদা শাড়ি পরিহিতা একজন সুন্দরী মহিলার মুখ ঘোমটায় ঢাকা। হাতে তাঁর তালপাতার পাখা, ওতে হলদে পাড়ের কালর বসানো। মুখে গ্লাস তোলার সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে তাঁর হাতে বীজনটি আন্দোলিত হতে হবে।

CENTRAL LIBRARY

বুবুনকে বড় দেখতে ইচ্ছে করছে যাবার সময়; যদি কোনও অন্যায় ঘটে থাকে তাহলে সে অন্যায় আপনার সন্তানের। ও কেন জানে না অমন সরল দৃষ্টিতে মানুষ ভোলাতে নেই।

একমাত্র বোতলটি ছাড়া এখানে আমার কিছুই রইল না। তাই ঠিকানাটা রেখে গেলুম। আর ইচ্ছে রইল সুযোগ পেলে আপনাকে আমার পারসোনালিটি দেখিয়ে যাব। আপনার মত অত বেশী এবং সুন্দর না হলেও মানসিকতায় আমারও একটা পারসোনালিটি আছে। আপনি যদি আমার প্রথম নাও হন, নজসা তো বটই। ধন্যবাদান্তে— অনিন্দকুমার মজুমদার। ১৭।সি অক্ষয় মুখার্জি লেন কোলকাতা।

চিঠিটা সেক্রেটারির হাতে দিয়ে ব্যাগটি বগলদাবা করে অনিন্দ্য দ্রুত বেরিয়ে এল এক সময় কোয়ার্টার থেকে।

মাস তিনেক বাদে ওর ঠিকানায় একটা চিঠি এল।

গলকন্ড হয়েই নিমন্ত্রণ করছি। আসছে মঙ্গলবার (১৪-৯-৫২) আমার এখানে এসে খেলে খুশী হব। সকালের ট্রেনে আসবেন, হাতে রয়ে কিরে যেতে পারেন। শুভেচ্ছান্তে দীপা তালুকদার। সীতারামপুরে মাল্টি-পারপাস গার্লস স্কুল, বর্ধমান।

একটা মজা করার লোভ পেয়ে বসল অনিন্দ্যকে। সেই মঙ্গলবার সকালে কয়েকটি জিনিস কিনে খাওয়া-দাওয়া সেরে ইচ্ছে করে আস-দুপুরের একটা ট্রেন ধরল সে যাতে ফেরার গাড়ি ধরার সম্ভাবনা আদৌ না থাকে।

সীতারামপুরে ট্রেন পৌঁছালো সন্ধ্যে ছটা নাগাদ। খবর নিল ফেরার ট্রেন একটিই আছে রাত সাতটা আটাশয়। তাই নিশ্চিন্তে সে কোয়ার্টারের দরজায় কড়া নাড়ল।

দরজা খুলে দীপা তাকাল অনিন্দ্যর দিকে। দেখে মনে হোল না তিনি খুশী হয়েছেন। এমন অসময়ে আসার জন্য।

কিন্তু মজা করতে এসেছে অনিন্দ্য। সেই মজার সুরেই বলল, আপনার কথা মত সকালে আসতে পারলুম না। কি করব, পয়সা জোগাড় করে এগুলো কিনতে কিনতে বেলা হয়ে গেল। দেখুন না সারাদিন খাওয়াই হয়নি। তবে আপনি ভাববেন না, নেমন্তন্নর খেয়ে আমি প্ল্যাটফর্মে গিয়ে খাব। ওখানে একটা ইন্ট পেতে এসেছি।

এই নিন, এগুলো ধরুন—

দীপা দেখলেন অনিন্দ্যর কাঁধে সেই ব্যাগটা। তার ভেতর কয়েকটা প্যাকেট। ব্যাগটা এগিয়ে দিল অনিন্দ্য দীপা সেটা না ধরে একটু যেন বিরক্ত হয়েই বলল, কি ওতে?

অনিন্দ্য বাড়িতে ঢুকেই বুঝতে পেরেছে সকাল ছোটখাটো একটা অনুষ্ঠান হয়ে গেছে, আর সেই অনুষ্ঠানের আনুষঙ্গিক চিহ্ন ছড়িয়ে আছে চারদিকে।

উঠানে পা ঝুলিয়ে রকের ওপর বসে একটা প্যাকেট বার করতে করতে অনিন্দ্য বলল, কল্পনা-বলে বুঝতে পেরেছি আজ কারুর না কারুর জন্মদিন। যদি আপনার হয়, তাহলে এই নিন আপনার উপহার। শাড়ির প্যাকেটটা দীপার হাতে দিয়ে আর একটি প্যাকেট টেনে অনিন্দ্য বলল—আর যদি বুবুনের বাবার জন্মদিন হয়, তাহলে তার জন্য এই ভাতের ধুতি।

অসহায়ের মত দাঁড়িয়েছিলেন দীপা। তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও দ্বিতীয় প্যাকেটটি দীপার দু হাতের ওপর ফেলে অনিন্দ্য আবার ব্যাগের ভেতরে হাত ঢোকালো।

—আর আজ যদি বুবুনের জন্মদিন হয়, তাহলে ওর জন্যে এই সুট!

দীপা যেমন দাঁড়িয়েছিলেন, তেমনি স্থির দাঁড়িয়ে রইলেন। এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতির জন্য তিনি নিজেই দায়ী। বোধ হয় ভাবছিলেন চিঠিটা না লিখলেই ভাল হোত।

তৃতীয় প্যাকেটটি দীপার হাতে দিয়ে আর একটি মোড়ক বার করে বলল—এটা বুবুনের বাড়তি উপহার। খুলে দেখো সেই কাঁধঝোলা ব্যাগটি কেড়ে নিয়ে বলল, এই দেখুন, এতে আর কিছু নেই।

দীপা কথার জবাব না দিয়ে উঠোন থেকে রকে উঠে ঘরের দিকে পা বাড়ালো। ইতিমধ্যে মোড়ক খুলে দম-দেওয়া একটা খেলনা ট্রেন বার করে তাতে দম দিয়ে রকে ছেড়ে দিয়েছে অনিন্দ্য। কয়েক পাক ঘুরে রকের ওপর একটা টেবিলের পায়াতে ট্রেনটা আটকে গেল। অনিন্দ্য মুখ তুলে দেখল, টেবিলের ওপর সেই প্যাকেটগুলো পড়ে রয়েছে, দীপা নেই। জোর গলায় ডাকল মিসেস তালুকদার, বুবুন কোথায়?

চারদিকে কোন সাড়াশব্দ নেই, চুপচাপ। কোনও প্রাণীর উপস্থিতি উপলব্ধি করতে পারল না। একটু পরে অনিন্দ্যর পাশে এসে প্লেট মিষ্টি রেখে অত্যন্ত ক্লান্ত সুরে দীপা বললেন, আজ বুবুনের জন্মদিন।

—ও কোথায়?

—ঘ্যান ঘ্যান করছিল বড্ড, বাবা একটু বাইরে নিয়ে গেছেন।

একটা মিষ্টি মুখে পুরে ঘাড় ঘুরিয়ে অনিন্দ্য দেখল প্যাকেটগুলোর ওপর হাত রেখে টেবিলের কাছে দীপা দাঁড়িয়ে আছেন। হাল্কা করেই অনিন্দ্য বলল, ওগুলো পছন্দ হয়েছে তো? ধার করে কিনিনি কিন্তু।

চোখের জল দীপা তালুকদারের মানায় না। কোন কথা বলতে ইচ্ছে করছিল না। অথচ পরিস্থিতিটাও সহ্য করতে পারছিলেন না। তাই যেন কথা বলতে হোল। বলতে গিয়ে ওঁর গলার স্বর কেঁপে গেল। বললেন বুবুনেরটা থাক। বাকি দুটো আপনি নিয়ে যান। বুবুন যখন সাত মাস পেটে তখন ওর বাবা ধুবড়িতে একটা কার অ্যাকসিডেন্টে মারা যান।

অনিন্দ্যর মত ছেলেও কথাটা শুনে চমকে গেল। পরিবেশটাকে লঘু করার আর কোন পথ খুঁজে না পেয়ে তাই সে বললো, বেশ তো, রেখে দিন ও দুটো। বুবুন বড় হয়ে ধুতিটা পরবে, আর ওর বৌ এলে পরিয়ে দেবেন শাড়িটা। মিটে গেল ল্যামেলা—

একটু পরে একজন শক্তপোক্ত বুদ্ধের কোলে বুবুন এল। অনিন্দ্য কোল পাতলো কিন্তুতেই এল না ওর কোলে। দীপা কত বললেন — যাও না, মামা হয় — যাও।

অনিন্দ্যর মাথায় হঠাৎ বুদ্ধি খেলে গেল। সেই ট্রেনটার দম দিয়ে ছেড়ে দিল রকে। ট্রেনটা চলার সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করে বলতে লাগল — এই হাওড়া থেকে ছাড়ল গাড়ি....., তারপর এই বর্ধমান..... এই এসে গেল রানীগঞ্জ, নামতে ভুলে গেলাম ....., তারপর, ট্রেনটার দম ফুরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বলল, এই এসে গেল সীতারামপুর।

অনিন্দ্য মুখ তুলে দেখল বুবুন হাত দিকে হাত বাড়িয়েছে ট্রেনটা নেবার জন্যে, দীপার বাবা না-হাসি না-কাঁদা মুখ করে দাঁড়িয়ে আছেন, আর দীপা হাসবেন না ভেবেও হঠাৎ হেসে ফেলেছেন।

এই ঘটনা ষোল বছর আগেকার। বর্তমানে অনিন্দ্য মজুমদার পঞ্চমা নম্বরের লেখক। নামী সব পত্রপত্রিকাওয়ালারা ওৎ পেতে বসে থাকেন ও'র উপন্যাসের জন্য মদ্যপানেও ও'র সুনাম হয়েছে বহুদিন। আর ও'র স্ত্রী দীপা মজুমদার বর্তমানে কলকাতার একটি নামী মেয়ে-কলেজের অধ্যাপিকা। সম্প্রতি ও'রা কলকাতার এক অভিজাত এলাকায় এগারো তলা উঁচুতে তিন ঘরের একটি আধুনিক ফ্ল্যাটের মালিক হয়েছেন। যারা চেনে জানে, পাশ দিয়ে গেলে হাত উঁচিয়ে দেখায়—ওই অনিন্দ্য মজুমদারের বাড়ি। টেলিফোন গাইড, হায়ার পরামর্শে তাঁর টেলিফোন নম্বর ছাপা হয় না, ফ্যানেরা বড় জ্বালায় টেলিফোনে। আর সেই বুবুন এখন আদিত্য তালুকদার। এ বছর দার্জিলিংএর একটি ইংরেজী স্কুল থেকে স্কলারশিপ নিয়ে অত্যন্ত ভাল নম্বর পেয়ে পাশ করেছে সিনিয়র কেম্ব্রিজ পরীক্ষা। কথা হচ্ছে লন্ডনের এক ইউনিভার্সিটিতে ইকনমিক্স নিয়ে পড়বে। চোস্ত ইংরিজী বলে। একটু এ্যালকহলিক হ্যাবিট হয়েছে। ড্রিংক না করলে পড়াশুনোয় কনসেনট্রেট করতে পারে না। এবং কথাপ্রসঙ্গে বন্ধুদের সামনে বুক ফুলিয়ে বলে—অনিন্দ্য মজুমদার একটা হাফ ইনটেলেকচুয়াল ডীবচ্, ওর পেটে আমি একদিন একটা লাথি মারব। আর আমার মা দীপা মজুমদার ক্লাস ওয়ান হাইব্রো এন্ড টু সম এক্সটেন্ট পারভার্টেড। আমি লন্ডনে সেটল করব।

পুনশ্চ

আগেকার দিনে সাময়িক পত্রিকাগুলির মধ্যে প্রায়ই কিছু কিছু রঙ্গ-কৌতুক প্রকাশিত হত। নানাবিধ গল্প উপন্যাস ও গুরুগম্ভীর প্রবন্ধাদির মধ্যে এই হাল্কা ধরনের রচনাগুলি পাঠক-পাঠিকাদের যে প্রভূত আনন্দদান করত তাতে আর সন্দেহ নেই। এগুলি কিন্তু গদ্যের পরিবর্তে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে পদ্যের মাধ্যমেই প্রকাশিত হত এবং এই ছন্দবদ্ধ কবিতাগুলি গদ্য অপেক্ষা অধিকতর পরিমাণে সরসতা পরিবেষণ করত।

এখানে আমরা উপস্থিত উক্ত ধরনের দুটি রচনা উদ্ধৃত করছি 'মালঞ্চ' পত্রিকা থেকে। এদের মধ্যে একটি প্রাচীন বৈষ্ণব কবিতা এবং অপরটি একটি সঙ্গীত। বৈষ্ণব কবিতাটির নাম হল 'নূপুর-চূড়ার দ্বন্দ্ব'। আসলে এটি গোবিন্দ দাসের পদ কিন্তু প্রকাশিত হয় 'মালঞ্চ' পত্রিকায় ১৩২২ সনের ভাদ্র সংখ্যায়। প্রকাশ করেন উপেন্দ্র লাল সরকার।

তিনি এই কবিতার পরিচয় সম্পর্কে ভণিতা করে লেখেন—শ্রীরাধিকার মহামান কালে যখন শ্রীকৃষ্ণ মস্তক অবনত করিয়া শ্রীমতীর পদযুগল ধারণ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন সেই সময় শ্রীকৃষ্ণের শিখিপুচ্ছ-শোভিত চূড়া শ্রীমতীর পাদস্পর্শ করায়—এই 'নূপুর-চূড়ার দ্বন্দ্ব' উপস্থিত হয়।' কবিতাটি হল—

নূপুর বলে মোহন চূড়া কেন নারীর পদে!
চূড়া বলে প্রণয়ের শ্যাম পড়েছেন বিপদে
—আমি তাই ত পদে।।

নূপুর বলে মানের হলে করিতাম মান্য।
চূড়া বলে সামান্যে কি জানে মানীর-মান্য
—তুমি বংশানান্য।।

নূপুর বলে রাইপদ শ্যাম ধরেন যুগল করে।
চূড়া বলে কর বিনে কে কর আদায় করে
—তাতে লাজ কে করে।।

নূপুর বলে জগতের তুচ্ছ ময়ূর পুচ্ছে।
চূড়া বলে তোমা হতে আছি অনেক উচ্চ
—ক্ষতি কি ময়ূরপুচ্ছে।।

নূপুর বলে কমলিনী ধরেন কত মধু।
চূড়া বলে কোন কমলে কাঁদায় আপন বঁধু
—হরেন জ্যৈষ্ঠ মধু।।

নূপুর বলে রাধা আমার হন পরম সতী।
চূড়া বলে সতী কি হয় পতির দুর্গতি
—উনি কেমন সতী।।

নূপুর বলে আমার রাধা সাধ্য আদা শক্তি।
চূড়া বলে সাধ্য কি সয় অসাধ্য কত
—উনি কেমন শক্তি।।

নূপুর বলে আমার রাধা জগতের রাজা।
চূড়া বলে রাজা হলে ত্যাগ করে কি প্রজা
—উনি কেমন রাজা।।

নূপুরে বলে রাধার চন্দ্র উদয় আছে।
চূড়া বলে চাঁদের গৌরব না হয় মেঘের কাছে
—চন্দ্র ঢাকা আছে।।

নূপুর বলে নারীর কাছে কৃষ্ণ সদা নত।
চূড়া বলে সময়কালে কেবা কোথায় নত
—উভয় উভয়ানত।।

নূপুরে বলে আমার রাধা ধরে শিব মন্ত্র।
চূড়া বলে বেদ-বেদান্তে হরি মহামন্ত্র
—শিব লয়েছেন হরির মন্ত্র।।

নূপুরে বলে আমার রাধার জীবন কৃষ্ণচন্দ্র।
চূড়া বলে রাই বিনা কি বাঁচে শ্যামচন্দ্র
—ইথে কিবা সন্দ।।

এত শুনি রাধা গোবিন্দের পূরে মন সাধ।
এত দিলে নূপুর-চূড়ার ঘুচিল বিবাদ।।
ধন্য লতা ধন্য পাতা ধন্য বৃন্দাবন।
ধন্য ধন্য রাধা-কৃষ্ণের যুগল মিলন।।
গোবিন্দ দাসে গায় গোবিন্দ মঙ্গল
শ্রীহরি গোবিন্দ জয় হরি হর বল।।

অতঃপর 'আমরা উক্ত 'মালঞ্চ' পত্রিকারই ১৩২১ সনের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা থেকে বিবিধ হাস্য-কৌতুক পর্যায়ের 'কত ভালবাসে!' নামক গানটি এখানে তুলে দিচ্ছি। গানটির সুর কীর্তন—

কত ভালবাসে—আমারে সে।
আমার ফিরতে ঘরে দেরি হলে
ভাত নিয়ে সে থাকে বসে।
এসে যখন খেতে বসি—
বলব কি আর প্রাণপ্রেয়সী;

ঠাণ্ডা নিয়ে বেড়াল তাড়ায়
পাতের মাছটা পাছে যা এসে।
যদি গরমে ঘর্ম ঝরে
অমনি পাখা নিয়ে বাতাস করে

আবার আঁচলে গা মেছে পুঁছিয়ে
আদর করে কাছে বসে।
রেতের মাঝে ঘুম ভাঙ্গিলে
চলে না মোর, তোমাকে নইলে—

ও তাই শোবার ঘরে মালসা ভরে
আগুন রাখে যতনে সে।
সকালে ঘুম ভাঙ্গালে মোর
প্রেয়সী মোর হয় কত কি—

হাতের কলকেতে ফুঁ দিতে দিতে
মুখের পানে চেয়ে হাসে
মুখ ধুয়ে না আসতে ফিরে
দাওয়ায় মাদুর রাখে পেতে—

হাতের গাড়ু থাকতে হাতেই
চায় পেয়ালা হাজির করে।
কত সে মোর বদখ বোঝে—
কিসে দুটি পয়সা বাঁচে—

ও সে কাঠ কুয়োলে কুটোর রাঁধে
ধোঁয়ায় চোখের জলে ভাসে।
যদি পায়ের সাড়াটি পায়
আকুল হয়ে অমনি ডাকায়

সেদিন মাছ কুটিতে কাটল আঙ্গুল
তবু ফিরে চাইল না সে।
যখন ঘুরি-ফিরি ঘর উঠোনে
তার আঁখি ফেরে আমার সনে—

আবার আঁখিতে আঁখ পড়েই লাজে
মুখটি ফেরায় মুচকি হেসে।
আহা সে যে আমার বলব কেমন—
মাকের মিঠে বোলটি যেমন—

যেমন দারুণ খরায় গাছি জুড়ায়
জলের ধারায় জ্যৈষ্ঠ মাসে।
আহা সে আমার বেশ যে বেশ!
গুণের যে নেইক শেষ
ওগো নারকেলটি আর কাঁঠাল যেমন
অকেজো নয় কিছুতেই সে!

—রূপক

ডাঃ স্নেহলতা বসু এম.বি.ডি.জি.ও
ডাঃ এস এন পাণ্ডে এম.বি.বি.এস
যৌবনের রহস্য
প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য • মূল্য-৮৲
যৌনবিজ্ঞানের রঙীন ও বহুচিত্রে চিত্রিত অতি আধুনিক সংস্করণ।
মোহন লাইব্রেরী
অগ্রিম ৮৲ টাকার পাঠাইলে অকমাশুল ফ্রি

হাওড়া
ফ্রেণ্ডস্ সোসাইটী
বেনারসী-সিল্ক-ঔঠ
সিলবস্ত্র-খোয়াক
৫৫৫, জি, টি, রোড (সাউথ) হাওড়া
ফোনঃ ৬৭-৪৪৮৭

টেলিভিশন, বই প্রকাশ ও বই বিক্রী

সম্প্রতি বাংলা বইয়ের জগতে একটা গরেতের ঘণ্টাসমর নাকি ঘনিয়ে আসছে। এতকাল ছাপানো বইই মানুষের মনোরাজ্যের চাহিদা মেটাচ্ছিল কিন্তু এখন শহরে টেলিভিশন অর্থাৎ দূরদর্শন এসে যাওয়ায় বাংলা বইয়ের প্রকাশকরা নাকি আশঙ্কা করছেন যে এই টেলিভিশন বইয়ের বিকল্প এবং প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে ক্রমেই প্রবল হয়ে উঠবে।

চিন্তাবিদ এবং বুদ্ধিজীবীরা বলে থাকেন এতকাল বইপত্র ঘিরে জ্ঞানলাভের যে রীতিটা জনপ্রিয় ছিল, হয়তো আগামী দিনে দেখা যাবে সে পদ্ধতি প্রায় অপ্রচলিত হয়ে পড়েছে। এরপর জনশিক্ষা ও ব্যক্তিগত প্রয়োজনের জন্য রেডিও টেলিভিশনই যথেষ্ট বলে বিবেচিত হবে। কোই একটা টেপরেকর্ডার পকেট লাইব্রেরী হবে। ইলেকট্রনিকস-এর এই অপ্রতিহত গতি হয়তো মানুষের সজীব গ্রন্থকেন্দ্রিক চেতনাকে নিষ্প্রাণ যান্ত্রিকতায় আসাড় করে তুলবে। তাই কেউ কেউ শঙ্কিত হয়ে ভাবছেন, এবার পাঠক সমাজে ছাপানো বইয়ের চাহিদা বহুলাংশে হ্রাস পেয়ে যাবে। নিকট ভবিষ্যতে বই পড়ার প্রতি পাঠক সমাজের অনীহা প্রকাশ পাবে।

দেখা ও শোনার সাহায্যেই মানুষ মনের খোরাক পেয়ে যাবে এবং জ্ঞানবিজ্ঞান আয়ত্ত করতে পারবে। ফলে ছাপানো বই পড়ার প্রয়োজন হয়ত ক্রমেই হ্রাস পাবে। এ আশঙ্কা অবশ্য লেখক ও প্রকাশক উভয়কেই চিন্তান্বিত করে তুলেছে।

কিন্তু মানুষের ইতিহাস ও মনোজগতের কিছু পরিচয় নিলে দেখা যাবে লেখক ও প্রকাশকের এ আশঙ্কা অমূলক। কেননা মানুষের শিক্ষা মূলত মানসিক অর্থাৎ ইনটেলেকচুয়াল। শিক্ষক অধ্যাপক থাকলেও ছাত্রকেই জ্ঞানার্জন করতে হয় ব্যক্তিগতভাবে। শিক্ষা ব্যক্তিকেন্দ্রিক বলে মানবচেতনার ব্যক্তিকবোধটা যতদিন থাকবে বইয়ের প্রয়োজনও ততদিন অনড়িত হবে। মানুষ যতই সব কিছুকে যন্ত্রের ভেতর দিয়ে জানুক, বই পড়ার ভেতর দিয়েই আসল সে জানার বিষয়টাকে আপনার করে পায়। বই পড়া হচ্ছে তার নিজস্ব ব্যাপার একেবারেই নিজস্ব। ইউরোপ, আমেরিকার টেলিভিশন প্রত্যেক অ্যাপার্টমেন্টে। সেখানে তো বইয়ের ব্যবসা একেবারে বন্ধ হয়ে যাওয়া উচিত। অথচ সেখানে প্রতিদিন হাজার হাজার বই প্রকাশ পাচ্ছে এবং ক্রেতাও জুটে যাচ্ছে। পাশ্চাত্যদেশে বই প্রকাশ ও বিক্রীর যে হিসেব পাওয়া যাচ্ছে তাতেই আতঙ্কিত হবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে।

যতদিন মানুষ ব্যক্তি হিসেবে বাঁচবে ততদিন সে ব্যক্তিগত জগত এবং জীবনকে বইয়ের ভেতরই খুঁজে নেবার চেষ্টা করবে।

বই আমাদের অতীত চেতনার সাক্ষী, ভবিষ্যতের যাত্রাসঙ্গী।

আসলে আশঙ্কার কারণ এটা নয়। বর্তমানে বই প্রকাশ ও বিক্রীর যা হারটা হল এখনকার মূল আশঙ্কার কারণ। সুতরাং অযথা টেলিভিশনের ওপর দোষ দেওয়ার কোন যুক্তি নেই।

দিল্লী ছাড়া অন্যান্য স্থানে টেলিভিশন চালু হওয়ার আগে ১৯৬৪-৬৫ সালে সারা ভারতবর্ষে প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ছিল একুশ হাজারের কিছু বেশি তাতে পশ্চিমবঙ্গের বইয়ের সংখ্যা ছিল আড়াই হাজারের মতো। বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে বই প্রকাশে পশ্চিমবঙ্গের স্থান ছিল চতুর্থ। ভারতবর্ষের মোট একুশ হাজার বইয়ের মধ্যে সমাজবিজ্ঞান-এর সংখ্যা প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজারের মত। সাহিত্যগ্রন্থের সংখ্যা প্রায় চার হাজার এবং দর্শন ও বিজ্ঞান গ্রন্থের সংখ্যা এর তুলনায় অনেক কম। সমাজ বিজ্ঞানের পরে ভারতবর্ষে সর্বাধিক প্রকাশিত বই হল সাহিত্য বিষয়ক অর্থাৎ গল্প, উপন্যাস নাটক, কবিতা। এক্ষেত্রে কিন্তু ভারতবর্ষ ক্ষুদ্র প্রতিচ্ছবি পশ্চিমবঙ্গ।

শৈলেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য

টেলিভিশন চালু হওয়ার পর বর্তমানে ভারতে বছরে ২৪ হাজারের মতো বই প্রকাশিত হচ্ছে (১৯৭৩-৭৪)। অর্থাৎ ভারতের ২৫ হাজার লোকপ্রতি একখানা বই। জাপানে চার হাজার লোকপ্রতি একখানা বই প্রকাশিত হয়। পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে গড়ে বছরে মতো বই প্রকাশিত হচ্ছে প্রতি-বছরে। অর্থাৎ নয় বছর আগে যা প্রকাশিত হতো এখন তার অর্ধেক প্রকাশিত হচ্ছে। এ ঘটনা কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে টেলিভিশন চালু হওয়ার আগের। পশ্চিমবঙ্গে প্রকাশিত বইয়ের শতকরা ৪৫ ভাগ গল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতা এবং বাকি ১৫ ভাগ জ্ঞান সাহিত্যের বই। পশ্চিমবঙ্গে এবং তার বাইরে মোট বাংলা ভাষাভাষী লোক যা আছে, তাদের মধ্যে প্রতি ২৩ হাজার লোকের জন্য গড়ে একখানা বই বর্তমানে প্রকাশিত হয়।

এই যদি ভারতের এবং পশ্চিমবঙ্গের বই প্রকাশের গতি হয় তাহলে তার ভবিষ্যৎ যে উজ্জ্বল, একথা কেউ বলবেন না এবং একথাও কেউ বলবেন না যে বই প্রকাশের এ রকম গতির মূলে কারণ টেলিভিশন। তবে এটা বলা যায় টেলিভিশনে নিয়মিত চলচ্চিত্র প্রদর্শন সুরু হওয়ার ব্যবস্থা হলে সিনেমাগুলোর ভিড় কম হতে পারে। কারণ কলকাতা টেলিভিশন সেন্টার এখন মূলতঃ আনন্দ দানের অর্থাৎ এন্টারটেনমেন্ট-এর মাধ্যম হিসেবে গড়ে উঠছে। যদিও আমাদের লক্ষ্য টেলিভিশনকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে চালু করা, টেলিভিশনের মাধ্যমে এই শিক্ষাকে গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে দেওয়া, জাতিকে প্রগতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, তবুও এটা করতে আরো কত বছর অপেক্ষা করতে হবে তা সঠিকভাবে বলা সম্ভব নয়। এখন কলকাতা টেলিভিশন থেকে দুটি সপ্তাহের শনি ও রবিবার বাংলা এবং হিন্দী ছায়াছবি দেখানো হচ্ছে।

নিজের ঘরের মধ্যে টেলিভিশন সেটের সামনে বসে ধূমায়িত চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে যে কোনো জনপ্রিয় চলচ্চিত্র দেখার মধ্যে যে আনন্দ এবং থ্রিল আছে তা ঐ সিনেমা হাউসে বসে ছবি দেখার মধ্যে একদমই পাওয়া যায় না।

বর্তমানে ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটাররা জনপ্রিয় পুরনো ছবি প্রদর্শনের চেষ্টায় টি ভি সেন্টারের চলচ্চিত্র বিভাগে ঘোরাঘুরি করছেন, কার ছবি কত শীঘ্র প্রদর্শিত হবে এই চেষ্টায়। কিন্তু কলকাতায় টি ভি চালু হবার আগে থেকেই এনারা হাউসের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন এবং তাঁদের পুরনো ছবির ব্যবসা এই হাউসগুলোর মাধ্যমেই করতেন এবং এখনও করছেন। পুরনো ছবি যে সমস্ত হাউস প্রদর্শন করে এখন থেকে তারা একটু অসুবিধায় পড়বেন। আজকের টি ভি সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে না পড়ার ফলে জনসাধারণের মধ্যে এ নিয়ে এখন একটা হৈ-চৈ নেই ঠিক কিন্তু বছর পরে এই টি ভি যখন রেডিওর মতো সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে আসবে তখন টি ভি আরো উন্নত হয়ে হয়তো সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত ছবিই দেখাবে। আর তখন থেকেই কি টেলিভিশন সেটের মালিকরা স্বেচ্ছায় পয়সা খরচা করে ঐ ভিড়, আর কোলাহলের মধ্যে বসে সিনেমা দেখতে চাইবেন? আমার তো মনে হয় মোটেই চাইবেন না। কারণ তিনি তো ঐ ছবি ঘরে বসে এক পবিত্র পরিবেশের মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন।

কলকাতা টি ভি সেন্টার থেকে আনন্দমূলক অনুষ্ঠান ছাড়াও অন্যান্য অনুষ্ঠানও প্রচার করা হয় কিন্তু সুদূর শান্তিপুর, রাণাঘাট, কল্যাণী চুঁচুড়া থেকে ট্রাঙ্ককল করে শুধুমাত্র জানতে চাওয়া হয় শনি এবং রবিবার কি সিনেমা দেখানো হবে। আর কলকাতার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে টি ভি সেন্টারের ডিউটি রুমে যে সমস্ত ফোন আসে তার প্রায় সমস্তই হল ঐ সিনেমার খবর জানার জন্য। তাই একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় টেলিভিশনের প্রতিদ্বন্দ্বী বই নয় সিনেমা।

আর কলকাতায় টেলিভিশন চালু হওয়ার পর বাংলা বইয়ের প্রকাশ ও বিক্রী ক্রমে যাচ্ছে যা যবে এ ধারণাও যে ভ্রান্ত সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ।

অতি ময়লা জামাকাপড়

পলকে ধবধবে

জান লড়িয়ে খেলতে হলে জলকাদা কোন বাধাই নয়। মোহনও সব বাধা তুচ্ছ করে একমাত্র জয়সূচক গোলটি দিয়ে বীরের মত বাড়ি ফিরল। জামাপ্যাণ্ট তার কাদায় মাখামাখি। কিন্তু এর জন্য মায়ের কোন চিন্তা নেই। কারণ মিগ রয়েছে। মা পরের দিন ইস্কুলের জন্য মোহনের জামা কাপড় মিগ দিয়ে ধবধবে পরিষ্কার করে ধুয়ে রাখতে পারবেন।

কাজে উত্তম, দামেও কম

এই হল মিগ এর জাদু

ডিটারজেণ্ট বার

হুগ্ধ প্রোডাক্টস লিমিটেড, কলিকাতা-১

CENTRAL LIBRARY

বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতক মহিলা সমিতি

অঙ্গনা

কলকাতা স্নাতক মহিলা সমিতির উদ্যোগে নারী সেবাসংঘ হলে গত ১৩ ফেব্রুয়ারী এক আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। নারী সেবাসংঘ কলকাতার এক প্রধান নারী কল্যাণ সংস্থা। সংস্থার সভানেত্রী শ্রীমতী সীতা চৌধুরী এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। সভার উদ্বোধন করেন স্নাতক মহিলা সমিতির সভানেত্রী শ্রীমতী চিত্রা ঘোষ। এই সভায় প্রধান বক্তাদের মধ্যে ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের শিক্ষা অধিকর্তা ডাঃ নিলীথরঞ্জন কর রাজ্য সমাজ কল্যাণ উপদেষ্টা পর্ষদের শ্রীজে সি মৈত্র উইমেন পলিটেকনিকের অধ্যক্ষা শ্রীমতী ইলা ঘোষ। মহিলাদের মধ্যে বৃত্তিমূলক শিক্ষাগ্রহণ ও প্রসারের উদ্দেশ্যে এই সেমিনারের আয়োজন। শুরুতেই শ্রীমতী ঘোষ বৃত্তিমূলক শিক্ষার বিষয়টি কেন আলোচনার বিষয়বস্তু হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে সেকথা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা অধিকর্তা বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসারে সরকারী প্রচেষ্টার কথা বিশেষভাবে আলোচনা করেন। তিনি সকল নতুন পাঠ্যসূচীর বিষয় উল্লেখ করে বলেন যে এর ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বৃত্তিমূলক শিক্ষার আগ্রহ বেড়ে উঠবে। নতুন কোর্সে কর্মশিক্ষার গুরুত্বের ওপরে তিনি বিশেষ জোর দেন। এই সভায় শ্রীজে সি মৈত্র সমাজকল্যাণ বোর্ডের বৃত্তিমূলক শিক্ষার নীতি ও পরিকল্পনা রূপায়িত করার আন্তরিক কথা উল্লেখ করেন। উইমেন পলিটেকনিকের অধ্যক্ষা শ্রীমতী ইলা ঘোষ বৃত্তিমূলক শিক্ষার নানারূপ সমস্যার কথা সকলের সামনে তুলে ধরেন। তাঁর মতে এই সমস্যাগুলিকে কাটিয়ে উঠতে গেলে সরকারের আরো বেশী মনোযোগ ও সহযোগিতা প্রয়োজন। তিনি সকল নারী সংস্থাগুলিকে এই শিক্ষার দিকে এগিয়ে আসবার জন্য আহ্বান জানান। সমাজ নারীসমাজকে এই মানসিকতার জন্য প্রস্তুত থাকতে অনুরোধ করেন। তাঁর মতে রেডিও ও ফ্যাক্টরিতে ইলেকট্রনিকের কাজ মহিলারা ভালভাবেই করতে পারেন। পলিটেকনিকে প্রতি বছর দশো ছাত্রীর ভর্তি হওয়ার ব্যবস্থা আছে। কারিগরি শিক্ষা শেষ হওয়ার পর তাদের মধ্যে অধিকাংশই চাকুরী জোগাড় করতে পারেন। কারিগরি কাজে মেয়েদের দক্ষতার কোন অভাব নেই। শ্রীমতী ঘোষ ভারতের প্রথম মহিলা মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার।

নারী সেবাসংঘ অল বেঙ্গল উইমেনস ইউনিয়ন হোম এবং সরোজ নলিনী দত্ত মেমোরিয়াল অ্যাসোসিয়েশনের তৈরী নানা কারিগরি জিনিসপত্র একটা ছোট প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে উপস্থিত সকলকে দেখানো হয়েছে। বোনার কাজ সুতো কাটা বুক প্রিন্টিং এমব্রয়ডারী খোলাই কাজ পটারী পেন্টিং প্রভৃতি কাজে মেয়েরা যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দেয়। এই সংস্থার সভ্য ও অতিথিদের যোধপুর পার্ক মহিলা পলিটেকনিকে নিয়ে যাওয়া হয়। এখানে তাদের দেখানো হয় কিভাবে ছাত্রীরা ইলেকট্রনিক্সে দক্ষ হয়ে রেডিও তৈরি করছে। ছোট ছোট যন্ত্রপাতি ও ড্রাফটস-ম্যানশিপের কাজ সকলের কৌতূহলী দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ওয়ার্কশপে ঘুরে ঘুরে তাঁরা নানা জিনিস প্রত্যক্ষ করেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক মহিলা সমিতি কলকাতা ও শহরতলীতে অতি শীঘ্র একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে তার প্রচারের চেষ্টা করবে। এজন্য গঠন করা হয়েছে একটি কার্যকরী সমিতি। এই পুস্তিকাটির খসড়া বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠানো সুরু হয়েছে।

সমাজকল্যাণ দপ্তর থেকে রেসিডেনসিয়াল নন-রেসিডেনসিয়াল এবং উভয়ের সম্মিলিত শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য যথাক্রমে বিশ হাজার বারো হাজার ও সতেরো হাজার টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এরফলে প্রতি বছর পনেরোটি ছাত্রী এই শিক্ষার বিশেষ উপকৃত হবে। অন্যান্য সংস্থাও এই শিক্ষাতে সহযোগিতা করবেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক মহিলা সমিতি ১৯২১ সালে স্নাতক মহিলাদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল। সংস্থাটি ভারতীয় মহিলাদের সবচেয়ে প্রাচীন সংগঠন। ১৯৫৪ সালে এই সংস্থার সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি হতে আরম্ভ করে। ১৯৫৬ সালে সংস্থাটি ইন্ডিয়ান ফেডারেশন অব ইউনিভার্সিটি উইমেন-এর শাখারূপে কাজ করতে থাকে। একমাত্র স্নাতক মহিলারাই এই সংস্থার সভ্য হতে পারেন।

সংস্থার প্রধান কাজ শিক্ষিত মহিলাদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান করানো পরস্পর পরস্পরের সমস্যাগুলি জানা ও আলোচনা করা। মহিলাদের মধ্যে শিক্ষার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা ও মেধাবী ছাত্রীদের গবেষণার সুযোগদানও এর অন্যতম কাজ। সংস্থার একটি ফান্ড আছে যার দ্বারা দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রীদের শিক্ষায় সাহায্য করা হয়। ইন্ডিয়ান ফেডারেশনের বৈদেশিক স্কলারশিপ ফান্ডও সংস্থা দান করে থাকে। দিল্লীতে ভারতীয় ফেডারেশনের প্রধান কার্যালয়। গত বছর ভারতীয় ফেডারেশনের তাপনে এক মহা-সম্মেলন হয়েছিল। আন্তর্জাতিক মহিলা সংস্থার একবার সভানেত্রী হয়েছিলেন ডাঃ বীণা রায়। সুইজারল্যান্ডের জেনেভা শহরে বর্তমানে আন্তর্জাতিক মহিলা ফেডারেশনের প্রধান কার্যালয়।

স্নাতক মহিলা সমিতির গত সভা এক সুন্দর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভ্যদের মধ্য থেকে এক কার্যনির্বাহক কমিটির নির্বাচন হয়। এই কমিটি দু বছর পর্যন্ত বহাল থাকবে। এই সমিতির অনুকরণে ভারতবর্ষের কুলুর বাঙ্গালোর বিবান্দ্রম নাগপুর কোচিন হায়দ্রাবাদ পুনা ও কোয়াম্বাটুর প্রভৃতি স্থানে মহিলা সমিতি গঠিত হয়েছে। আমাদের আশা ভারতের অন্যান্য স্থানেও এই মহিলা সমিতির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে শীঘ্রিই আরো সমিতি গড়ে উঠবে যাদের চেষ্টায় ফলে মহিলারা বৃত্তিমূলক শিক্ষায় অগ্রগতিতে এক বিরাট সাফল্য লাভ করবে।

অঞ্জলি চৌধুরী

পরলোকে শ্রীযুক্তা হিরণবালা ঘোষ

মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষের প্রতিষ্ঠিত এবং স্বর্গত নীহারকান্তি ঘোষের পত্নী হিরণবালা ঘোষ গত মঙ্গলবার ২৫ ফেব্রুয়ারী '৭৬ ভোর সাড়ে ৪ ঘটিকায় সজ্ঞানে ৮০ বৎসর বয়সে পত্রিকা ভবনে পরলোকগমন করেছেন। তিনি অত্যন্ত দানশীলা ধর্ম-পরায়ণা মহিলা ছিলেন। তাঁর মধুর স্বভাবের জন্য তিনি সকলের মন জয় করে নিতে সমর্থ হয়েছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি তিন পুত্র, দুই কন্যা, নাতী-নাতনী ও বহু আত্মীয়স্বজন রেখে গেছেন।

গোপাল সুবেদারের চিত্রকলা
বোম্বের তরুণ শিল্পী

সম্প্রতিকালে এক রাজ্যের শিল্পীর অন্য রাজ্যে গিয়ে প্রদর্শনীর হেওয়াজ যেন ক্রমশ বেড়েই চলেছে। লক্ষণটি অবশ্যই ভাল। কেননা এতে একদিকে যেমন শিল্পের আদান-প্রদান ও ভাব বিনিময় হয় অন্যদিকে তেমনি শিল্পীদের মধ্যে ব্যক্তিগত পরিচয় ও সৌহার্দ গড়ে ওঠে।

কিছুদিন পূর্বে বোম্বের তরুণ শিল্পী গোপাল সুবেদার আকাদমি অফ ফাইন আর্টস গ্যালারীতে এক প্রদর্শনী উপহার দিয়ে গেলেন কলকাতার চিত্ররসিকদের। সাধারণতঃ গোপাল সুবেদারের চিত্রকল্প গড়ে ওঠে উপজাতীয়দের জীবনকে কেন্দ্র করে। বাস্তবানুগ রীতিতে রচিত এই চিত্রকলার শিল্পী মধ্য প্রদেশের শহর থেকে দূরে কোন এক অজ্ঞাত গ্রামে উপজাতিদের সামাজিক প্রথা গ্রাম্য রীতিনীতি ও ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের কথাকে ঐকান্তিক নিষ্ঠায় চিত্রিত করেছেন। শিল্পী স্বয়ং ঐ গ্রামে গিয়ে দিনের পর দিন অতিবাহিত করে খুব কাছ থেকে নিরীক্ষণ করেছেন ওদের সমাজ ও জীবনকে। সঙ্গে সঙ্গে স্কেচ করেছেন। পরে বোম্বে ফিরে এসে ঐ স্কেচকে রঙে, রসে, রেখায়, বর্ণে, অঙ্কিত করেছেন ২৬টি চিত্রে।

পদপতি চিত্রটি অপূর্ব। দি লর্ড অফ ব্রেসিংরংসের বাহারে রসমধুরে। ধনু ও রঙিন্না চিত্রে অলংকরণের কাজ লক্ষ্য করার মত। তাছাড়া বার্ড সেলার, পামঘাট, বাঁড় কামালু, গোপী প্রভৃতি চিত্ররসিকদের আনন্দ দেবে।

এর আগে শিল্পী গোপাল সুবেদার ভারতের কয়েকটি রাজ্যে প্রদর্শনী করে ইনাম কিনেছেন। তিনি রেলওয়ের কর্মী। ছবি আঁকা পেশা নয়। নেশা। খুব দ্রুত কাজ করতে পারেন। এই প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত ২৬টি চিত্রকর্ম শেষ করতে তাঁর সময় লেগেছে মাত্র তিন দিন। কাজও বেশ ভাল। তাই গোপাল সুবেদারের কাছ আমাদের আশা অনেক।

রবীন্দ্রভারতী সংগ্রহশালায় দুষ্প্রাপ্য ছবির প্রদর্শনী

কিছুদিন আগে রবীন্দ্রভারতী প্রদর্শনশালায় দুষ্প্রাপ্য ছবির এক মনোজ্ঞ প্রদর্শনী হয়ে গেল। গত কয়েকবছর ধরেই রবীন্দ্রভারতীর প্রদর্শনশালায় সংগ্রহ শ্রেণী বিন্যাস করে, বিশেষভাবে প্রদর্শনের ব্যবস্থা হয়েছে। তবে এবারকার প্রদর্শনীর উদ্যোক্তারা ঠিক হল উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর সংস্কৃতিক ইতিহাসের কিছু প্রামাণ্য দলিল পত্রাদি ও চিত্রকলা জনসমক্ষে উপস্থাপিত করা।

এই প্রদর্শনীতে একদিকে যেমন ছিল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চিঠিপত্র বিষয়ক রোজনামচা, দ্বারকানাথ ঠাকুরের ডায়েরী, দলিলমোহর, প্রথম ছিন্নমেলার আলোকচিত্র তেমনি ছিল বিদেশী পর্যটকদের

ভারতীয় শিল্পীদের করা প্রাচীন সব ছবির প্রতিলিপি থেকে আরম্ভ করে অবনীন্দ্র শৈলীর চিত্রমালা পর্যন্ত।

এই প্রদর্শনী কক্ষে এসে মনে হয় যেন ফিরে গেছি সেই উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের স্বর্ণযুগে। সে সময়টা ভারতীয় সাহিত্য, সঙ্গীত ও চিত্রকলার চালচিত্রে এক নতুন যুগের সূচনা করেছিল। সূত্রপাত ঘটিয়েছিল এক নতুন সাংস্কৃতিক ইতিহাসের। এই নব ধারার ধারক ও বাহকের অনেকেরই শিল্প নিদর্শন, সাহিত্যকীর্তি, ব্যক্তিগত দলিলাদি কিছু স্মৃতিচিহ্ন ও প্রতিলিপি এই প্রদর্শনীর সবচেয়ে আকর্ষণীয় ও মূল্যবান বিষয়।

পুস্তকের মধ্যে ১৮৩২ সালে প্রকাশিত ড্রইংস অফ ইমেজেস ১৮১২ সালে প্রকাশিত কর্মশিয়াল অ্যালবাম অফ ওরিয়েন্টাল সিনারি উল্লেখযোগ্য। বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিগত ডায়েরী, হিসেব নিকেশ ও কতিপয় চিঠিপত্র দেখার মত। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কাজের স্বীকৃতি হিসেবে সৃতকীর্তি অবনীন্দ্রনাথ সমস্ত জীবনব্যাপী যে অজস্র পদক ও প্রশংসাপত্র পেয়েছেন তার কতিপয় সংযোজন এই প্রদর্শনীর অন্যতম উল্লেখ বিষয়। এছাড়া রয়েছে ঠাকুর পরিবারের নানান ব্যক্তির সঙ্গে সংযুক্ত নানান স্মৃতি। রবীন্দ্রনাথের লেখা বিভিন্ন বিষয়ের ওপর কয়েকটি চাঞ্চল্যকর ও কৌতূহলোদ্দীপক চিঠি ও ১৯০৬ সালে বৃক্ষরোপণ উৎসবের ছিন্ন, কিংবা ১৯০০ সালে কবিগুরুর প্রথম হাওয়াই জাহাজে যাত্রা সম্পর্কে তোলা মূর্তি চিত্রমালা প্রদর্শনীটির আকর্ষণ বাড়িয়েছে অনেকখানি।

এছাড়া চিত্রকলা, গ্রাফিক ও অলঙ্করণের ৫২টি নিদর্শন কোন অংশেই কম মূল্যবান নয়। বিংশ ও উনবিংশ শতাব্দীর খ্যাতিমান শিল্পীদের অনেকেরই শিল্প নিদর্শন সংগ্রহ বেশিত হয়েছে। যেমন অবনীন্দ্রনাথ গগনেন্দ্রনাথ রথীন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আলোকেন্দ্রনাথ রথীন্দ্রনাথ প্রভৃতি ঠাকুর পরিবারের শিল্পীদের নিজ নিজ শৈলীতে আঁকা চিত্রাবলী এবং অন্যদিকে অসিত হালদার নন্দলাল বোস, সুরেন কর, মুকুল দে ডি নাগ জে পি গাঙ্গুলী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

স্বল্প পরিসরে এঁদের কাজের পৃথক পৃথক নাম উল্লেখ করলাম না। সংগ্রহশালার নিজস্ব তৈরী পাঞ্চালীর ত্রিমিক প্রতিকটি শিল্পকর্মের সমৃদ্ধ। রামকিঙ্কর সৃষ্ট সন্তালদের তৈরী অবনীন্দ্রনাথের মুখের ভাস্কর্যে শিল্পীর নিজস্ব শৈলীর মূর্তিমান্না যথার্থ ফুটে উঠেছে। শশী সেন-এর অঙ্কিত রামমোহনের তৈলচিত্রটি অসাধারণ। তবে চিত্রের এক জায়গায় ক্যানভাস জীর্ণ হওয়ায় এঁকে সত্বর সংরক্ষণ করা দরকার।

পাঁচ শিল্পীর প্রদর্শনী

সম্প্রতি বিকল্প আকাদমিতে পাঁচ তরুণ শিল্পীর এক চিত্র প্রদর্শনী হয়ে গেল। এঁদের প্রত্যেকেরই শিল্পীজীবনে এই প্রথম প্রদর্শনী। এর আগে অবশ্য এঁরা ছাত্র থাকাকালীন অবস্থায় কলেজ প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণ করেছেন। পাঁচজনের মধ্যে অশোক ভৌমিক, তিলক মণ্ডল ও প্রশান্ত নিয়োগী ১৯৭৫ সালে সরকারী চারু ও কারু মহাবিদ্যালয় থেকে পাশ করে বেরিয়েছেন। তার মধ্যে অশোক কলেজের প্রদর্শনীতে তাঁর কম্পোজিশন নম্বর—৩-এর জন্য রাজ্যপালের রৌপ্যপদক লাভ করেছেন। তরুণ ব্যানার্জি পাশ করে বেরিয়েছেন ১৯৭২ সালে। আর রেবন্ত গোস্বামী এখনও ঐ কলেজের ছাত্র।

সুতরাং কলেজের গন্ডী অতিক্রম করে বাইরের বাস্তবে শিল্প আঙ্গিনায় এই প্রথম এঁরা এঁদের শিল্পকর্মের নিদর্শন তুলে ধরলেন সর্বজনসমক্ষে। তবু পাঁচ তরুণের মনের রঙে রাঙানো প্রদর্শনীটির প্রথম প্রয়াস অবশ্যই সফল হয়েছে বলা যায় নিঃসন্দেহে।

অশোক ভৌমিকের ১৪টি কাজে একটা নিজস্ব স্টাইল গড়ে ওঠার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। বেশ বড় আকারের ভৈলচিত্রে সাধারণতঃ কাল, সাদা ও ঈষৎ বাদামী রঙের সমাহারে, প্রতীকের আশ্রয়ে মনের উচ্ছ্বাসকে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন। অশোকের চিত্রকলায় কোন কোন অংশ ভাস্কর্যময় হয়ে উঠেছে। সোলার সিস্টেম ও আধুনিক মূল্যবোধ তাঁর ছবির মূল বক্তব্য। তাঁর এরেটিক আইরিশ ফ্লাইং কক্স বেশ ভাল লাগে।

তিলক মণ্ডলের চিত্রময় বর্ণনায় নতুনত্ব আছে। রূপবিশ্ব মৃন্ময়ের জীবনের ভারী ভারী বোধগুলোকে তিনি হাসারসাত্মক, হাল্কা অথচ তির্যক ভঙ্গীতে বেশ কায়দা করে বলতে সচেষ্ট হয়েছেন। কিছুটা সংহতবাদের পদ্ধতিতে চরিত্র এঁকেছেন। রেক্তি গারলাণ্ড, দি কিস এবং ইউনিক তৈলচিত্র তিনটিতে শিল্পী-জীবনের গভীর মনের গোপন কথাকে কিছুটা উজ্জ্বল রঙের প্রয়োগে বেশ সহজ করে প্রকাশ করেছেন।

প্রশান্ত নিয়োগীর ১০টি তৈলচিত্রের প্রকাশ প্রণালী একেবারে সাদামাটা নয়। তিনি স্ট্রোক-এর মাধ্যমে অনুভূতিকে রূপময় করে তুলতে চান চিত্রতলকে। খুব কাছ থেকে দেখলে কতকগুলো অবিন্যস্ত রং-এর আঁচড় চোখে পড়ে। কিন্তু কিছু দূরে থেকে [illegible] রং সম্পর্কে ঘোটামুটি সচেতন। তাঁর ম্যান

লং বার্ডস, এ লেগহর্ণ লুক, দাই থ্রী তিনটি রসিককে কাছে টানবে।

রতন বাণীজি কতকগুলো ইয়েজের মধ্যে অন্তরের কথাকে 'ইয়েজারী' নামক চিত্র তৈলাচিত্রের মাধ্যমে বলেছেন। অনুলো চিত্রকে কিছুটা লিরিকধর্মী তুলেছে।

বন্ত সোম্বামীর গ্রাফিকের কাজগুলিকে ন্ড মিডিয়া ওয়ার্ক বলে চিহ্নিত করা। কারণ গ্রাফিক চিত্র রচনায় তিনি মৈত কারিগরীক কলাকৌশলের আশ্রয় নিয়েছেন। শীতল এবং উষ্ণ রংয়ের সমাবেশে কাজ-গুলো মন্দ নয়। বলবো কিছুটা আঙ্গি-কৈন্দ্রিকতা রয়েছে। যা এ্যান্ড সী, ই গত এ্যান্ড সী, প্রভৃতি মন্দ নয়। রেবন্ত এখনও ছাত্র। সেই হিসেবে নিজেকে প্রস্তুত করার এখনও অনেক সময় আছে।

এক কথায় বলা যায় প্রথম প্রচেষ্টা হিসেবে প্রদর্শনীটি সার্থক ও সুন্দর হয়েছে। এঁরা সবাই বেকার শিল্পী। তাই এই প্রদর্শনীর আয়োজন করতে রীতিম হিমশিম খেতে হয়েছে। স্বচেয়ে আনন্দে কথা তিলক, প্রশান্ত ও অলক ওয়াল টি টি প্রতিযোগিতার প্রাক্কালে ইনডে স্টেডিয়ামে কিছু মূল্যবান করে সংগৃহী সব অর্থ দিয়ে এই প্রদর্শনীর আয়োজ করেছেন। এই একটি দৃষ্টান্ত থেকে বো যায় যে আজকের তরুণ শিল্পীরা জীব সংগ্রামেও পেছিয়ে নেই।

চিত্ররসিক

ডঃ শান্তিকুমার দাশগুপ্ত ও হরিপদ মুখটী সম্পাদিত :

কবি নবীনচন্দ্র সেনের

নবীনচন্দ্র রচনাবলী — ১ম খণ্ড — তিনখণ্ডে একত্রে ৩০-০০
নবীনচন্দ্র রচনাবলী — ২য় খণ্ড — ৩০-০০
নবীনচন্দ্র রচনাবলী — ৩য় খণ্ড — ২৫-০০
নবীনচন্দ্র রচনাবলী — ৪র্থ খণ্ড — ২৫-০০

কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের

রঙ্গলাল রচনাবলী — এক খণ্ডে সম্পূর্ণ — ৩০-০০

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের

ঈশ্বরগুপ্ত রচনাবলী — ১ম খণ্ড — ২০-০০
ঈশ্বরগুপ্ত রচনাবলী — ২য় খণ্ড — ২৫-০০
ঈশ্বরগুপ্ত রচনাবলী — ৩য় খণ্ড — ২৫-০০

কবি সুনির্মল বসুর

সুনির্মল রচনা-সম্ভার — ১ম খণ্ড (২য় সং) — ২৫-০০
সুনির্মল রচনা-সম্ভার — ২য় খণ্ড — ২২-৫০
সুনির্মল রচনা-সম্ভার — ৩য় খণ্ড — ২২-৫০

প্রবীণ শিশুসাহিত্যিক খগেন্দ্রনাথ মিত্রের

খগেন্দ্র মিত্র রচনাবলী — ১ম খণ্ড — ২২-৫০

স্বামী বিদ্যারণ্য প্রণীত

(ডঃ বিভূতিভূষণ দত্ত, এম এস-সি; পি আর এস; ডি এস-সি)

ভাগবৎ ধর্মের প্রাচীন ইতিহাস

পুলকেশ দে সরকারের — চার খণ্ডে সম্পূর্ণ। মূল্য ৭০-০০

শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক ভাবনা — ১৫-০০

সুধীরকুমার মিত্রের

গৌর পদরজে দাক্ষিণাত্যের মন্দির — ১২-০০

অধ্যাপক মনোমোহন দত্তের

কুমার সম্ভব-কাব্য ও কবি — ২০-০০

আশাপূর্ণা রচনা-সম্ভার

সমগ্র কিশোর-সাহিত্য একত্রে সম্পূর্ণ — ২৫-০০

সুনির্মল বসুর

মহামানবের জীবন কথা ১০·০০
কিশোর উপন্যাস ৮·০০
শ্রেষ্ঠ গল্প সংগ্রহ ৬·০০
কবিতা শেখার গোপন কথা ৫·০০

খগেন্দ্রনাথ মিত্রের

গল্প সংগ্রহ ৫·০০
সুমন্ত (২য় সং) ৫·০০
ওরা ছাত্র ৪·০০

শ্রীপান্থের

এরা তিনজন ৫·০০

শ্রীনরেন চক্রবর্তীর অনুবাদ গ্রন্থ

সুভাষ বোস ৩৯-৪০ ১০·০০

নীলকণ্ঠের

ট্যাক্সির মিটার উঠছে ৮·০০

নিমাই পণ্ডিতের

মীনাক্ষী (২য় সং) ৭·০০

শশীবিন্দু বেরার

মুছলো যারা
মায়ের চোখের জল ৪·০০
লজ্জা নেই ৪·০০

শ্যামাপদ ঘোষালের

আমার বাংলা মাগো ৩·০০

অধ্যাপক জীবন মুখোপাধ্যায়ের

যুগনায়ক অরবিন্দ ১০·০০

ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের

নাগিনীর অভিশাপ ৫·০০
টোকিওর রহস্য ৫·০০

আশাপূর্ণা দেবীর

রাঙাই গল্প (উপন্যাস) ৫·০০

দত্ত চৌধুরী অ্যান্ড সন্স

পরিবেশক ৫ ৭ এক

এম ডি ৭২এ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট

কলিকাতা-৭০০০০৭

CENTRAL LIBRARY

পার্ক থেকে বলছি

খেলার নাম মজা !

খেলার অন্য নাম মজা। খেলতে খেলতে মজা পাওয়া ও আশপাশের মানুষদের মজায় মাতিয়ে দেওয়া। এমন অফুরন্ত মজার খনি বলেই স্বভাবের টানে মানুষ মাঠের দিকে অহরহ ছুটছে। কেউ গলেছে খেলতে। কেউ বা দেখতে। দশাতঃ দু-পক্ষের উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র। কিন্তু প্রাপ্তিযোগ অভিন্ন। দু-পক্ষই মাঠে মাঠে মজা লুটতে।

বড় থেকে ছোট, সব খেলার আসরেরই মূল উপকরণ ওই মজা। ব্যাপারটা জানাই ছিল। তবু উপলব্ধি নতুন মাত্রা পেল সেদিন দক্ষিণ কলকাতার সুভাষ উদ্যানে উপস্থিত থাকার সুযোগে।

এলগিন রোডের দক্ষিণে সমান্তরালভাবে যে রাস্তাটি পূব-পশ্চিমে চলে গেছে তার নাম লাস্টিস চন্দ্রমাধব রোড। পশ্চিম-মুখে কয়েক পা গেলেই অনেকগাছের ফাঁক, বড় বড় অট্টালিকায় ঘেরা একটি মাঝারি বাগান নজরে পড়বে। ট্রাম লাইন পাতা পশ্চিমের রাজপথ থেকে এই বাগানের ঠাওর পাওয়া যায় না। কিন্তু কাছে গেলেই বোঝা যায় যে অনেক যত্নে মেহনতে ও স্নেহভরে এই বাগানটিকে সাজিয়ে রাখা হয়েছে।

বাগান অর্থে পরেসডার পার্ক। তবে কলকাতার আরও পাঁচটা পারোদ্যানের সঙ্গে এই পার্কের তফাৎ আছে। অনেক অনেক পার্কই নামে পারোদ্যান, সে সব উদ্যানে সত্যিকার বাগানবাড়ির ছিটেফোঁটাও নেই। আলো-পাশে ন্যাড়া ন্যাড়া চার। ক্রমি ফাঁকে ইট-খোয়ার টুকরোগুলি যেন মাথা উঁচিয়ে রয়েছে। এখানে কিন্তু সবুজের সমারোহ। সারা মাঠ জুড়ে ঈষৎ ঘাসের গালচে পাতা। বেঞ্চিগুলোর পাশ দিয়ে পাতা-বাহারি গাছ আর কটন্ত ফুলের ঝোপ। আগে নাম ছিল নর্দার্নপার্ক। নব নামকরণ হয়েছে সুভাষ উদ্যান। উদ্যানকে আরও চিত্তাকর্ষক করে সেই সজ্জায় হাজার হাজার বৈদ্যুতিক বাতির রোশনাই ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল চারপাশে। অপর্যাপ্ত আলোর ঝলকানি। যেন সবুজ কার্পেট আর নীলাভ রশ্মির মধ্যে লুকোচুরি খেলা চলছিল।

রীতিমতো রঙিন পরিবেশ। সেই পরিবেশে তাড়া হয়েছিল একপাল শিশু। বয়স দু থেকে বারো বছরের মধ্যে। সারাটা সন্ধে ছুটোছুটি, লাফালাফি করে প্রাণের আনন্দে ওরা মেতে থাকে। নামে শিশু ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। কিন্তু আসলে বোধহয় সত্তর কটি শিশুর পুতুল পুতুল খেলা। ফ্রেমে-আঁটা সরল নিষ্পাপ এক ছবি। সে ছবির সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্য ফুলবাহারের মতোই অকৃত্রিম।

এই ক্রীড়ানুষ্ঠানে নয় নয় করে সাড়ে আটশ ছেলেমেয়ে যোগ দিয়েছিল। বয়স অনুসারে তাদের চারটে বিভাগে বিভক্ত করে পার্কের চত্বরটিতে চারটি স্বতন্ত্র ক্রীড়াভূমি রচনা করা হয়েছিল। টুকরো টুকরো চারটি মাঠেই একসঙ্গে খেলাধুলো চলছিল। তবে ভীড় যেন উপচে পড়েছিল পার্কের পশ্চিম ধারে যেখানে নিজেদের জগতে নিজেদের খেয়াল গা ভাসিয়ে দিয়েছিল দু থেকে চার বছরের মধ্যে যাদের বয়স বাঁধা সেই শিশুরা। পরিভাষায় টাইনি গ্রুপ বলতে যাদের সহজেই চিনে নিতে পারা যায়, তারাই।

টাইনি গ্রুপের ছেলেমেয়েদের কাণ্ড-কারখানাই আলাদা। প্রতিযোগিতা ব্যাপারটি যে কি সে সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা তাদের অনেকেরই নেই। কি করতে হবে, ছুটে ছুটে কোথায় গিয়ে যে থামতে হবে, এসব কথা তারা জানে না। একটি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা ছিল এইরকম : দৌড় সুরু এক জায়গায়। তারপর মাঝখানে থেমে খেলনা ফুল কুড়িয়ে আবার সামনের দিকে ছুটে যাওয়া। কিন্তু খেলনা পেয়ে অনেকেই খুসী। খেলনাটি বাগিয়ে ধরে মাঝপথেই তারা থেমে পড়লো। জনা দুয়েক তো মাঝমাঠ থেকে খেলনা-ফুল কুড়িয়ে দাঁড়িয়ে রইল ধারে। সেই না মাকে দেখতে পেলো অমনি পাশ ফিরে ছুটে গিয়ে মায়ের কোলে পড়লো ঝাঁপিয়ে। প্রতিযোগিতার নিয়ম তাদের কাছে তুচ্ছাতিতুচ্ছ। প্রকৃতির নিয়মের টানটাই বড়। কাণ্ডকারখানা দেখে বড়রা হেসে উঠছিলেন। আর আমি ভাবছিলাম খেলা যে কতোবড় মজা, এর চেয়ে তার বড় প্রমাণ আর কিই বা হতে পারে!

এমন মজাদার অনুষ্ঠানের বহুল প্রচলন হওয়াই বাঞ্ছনীয়। সুভাষ উদ্যানের কর্মযজ্ঞের ধারা যদি সারা কলকাতায়, সারা দেশেই ছড়িয়ে দেওয়া যায় তাহলে হয় আরও জল। বড়দের দিকে নজর দেওয়ার জন্যে বড়পক্ষের যে দৃষ্টি সজাগ রয়েছে সেই দৃষ্টির কিছুটা অংশ যদি ছোটদের প্রতি গিয়ে পড়ে তাহলে বোধহয় আখেরে বড় কাজই করা হবে। খাস কলকাতাতে আরও অনেক পুরোদ্যান রয়েছে। সেগুলির বেশিরভাগই বড়রা ভোগ-দখল করছে। সময় সময় সেগুলিকে অন্যু-

অদ্বিতীয় ফরমুলা...অপারেশন ছাড়াই অর্শের সঙ্কোচন করে

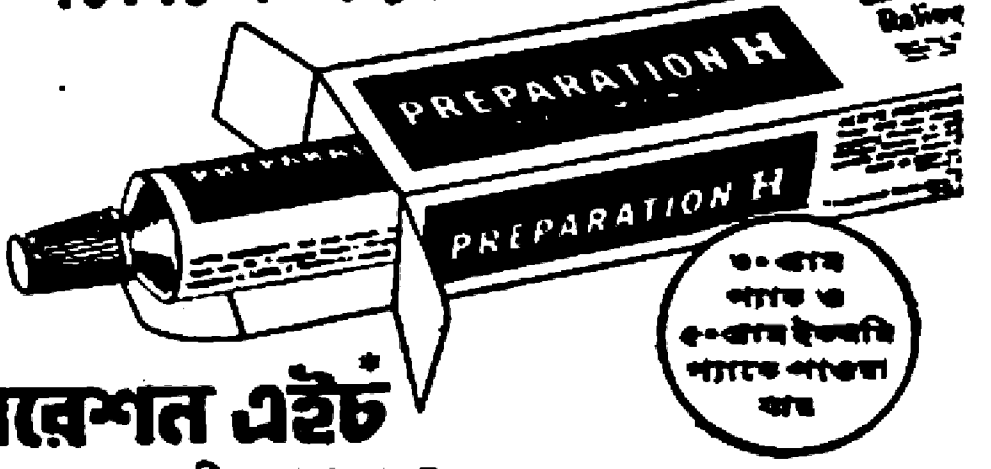

প্রেপারেশন এইচ

আমেরিকান ডাক্তারদের পরীক্ষা করে দেখা

- কয়েক মিনিটেই চুলকানি বন্ধ করে
- সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণার উপশম হয়
- খুব বাড়াবাড়ি না হলে, অপারেশন ছাড়াই অর্শের সঙ্কোচন করে
- পিচ্ছিল ক'রে মলত্যাগের কষ্ট কমিয়ে দেয়

বিনামূল্যে [illegible] পুস্তিকার জন্য [illegible] লিখুন [illegible]

Regd. User of TM : Geoffrey Manners & Co. Ltd.

হাত ছোটদের জন্যে উন্মুক্ত করে দিলে একটি সামাজিক দায়িত্ব পালন করা হয়। তবে খিদিরপুরের অনুষ্ঠানকেন্দ্র টেনে নিয়ে আসার জন্যে মাঠগুলির সংস্কার ঘটানো একান্ত প্রয়োজন। দরকার সুচিন্তিত পরিবেশ রচনার। যেহেতু পরিবেশের প্রভাব শিশুমনে প্রভাবিত হয় সবচেয়ে বেশি। জায়গাটি জনেজনে হলে তবেই খেলার আসর তাদের ভাল লাগে। আর ভাল লাগা থেকেই তো ভালবাসা জন্ম নেয়।

ছোটদের যা ভাল লাগে তার ব্যবস্থা করার দায়িত্ব নেওয়ার ঘাড় পেতে নিয়েছে নর্দার্ন পার্কস্থ সংস্থা বালক সংঘ। এই সংস্থার কাজকর্ম যে শুধু বালকদের নিয়ে তা নয়। ছেলে বুড়ো যুবা বয়স্ক, সব স্তরের প্রতিনিধিই আছেন বালক সংঘের ছত্রছায়ায় তলে। ছেলেরা ছেলেমানুষী করে। বড়রা তাদের নিয়ন্ত্রিত করেন। সঠিক পথে চলার নির্দেশ দেন। বালক সংঘের সদস্যদের এমন অনেকে আছেন যাঁদের পরিবারের কেউ কেউ কয়েক পুরুষ ধরেই এই সংস্থার সঙ্গে জড়িত। একদা তাঁরাই ছিলেন কাঁচাবয়সী সদস্য। আজ কাঁচাবয়সীদের অভিভাবকদের মতো। এক কথায় বলা যায় যে, সাধারণ সদস্যদের স্বাগত জানাতে বালক সংঘের দরজা অবারিত থাকলেও এটি যেন এক পারিবারিক সংস্থা। নর্দার্ন পার্ক বা সুভাষ উদ্যানের চৌহদ্দির পাশে যেসব বাড়ী রয়েছে সেই বাড়ীর ছেলেমেয়েদের নিয়েই এক বিরাট যৌথ পরিবার। এই পরিবার বাঙ্গালী, গুজরাতি, পাঞ্জাবী, সব জাতিরই মিলন ঘটেছে।

বালক সংঘ গত সাত বছর ধরে শিশু ক্রীড়া মেলার আয়োজন ঘটাচ্ছে। এবারের আয়োজন অপেক্ষাকৃত ব্যাপক। কারণ এই অনুষ্ঠান ক্রমশঃই হচ্ছে জনপ্রিয়। বালক সংঘের কর্মপরিধিও দিনে দিনে প্রসারিত হচ্ছে। এই সংঘের নিজস্ব জিমনাসিয়াম আছে, আছে পাঠাগার। তাছাড়া সুবিস্তৃত সুভাষ উদ্যানটি তো রয়েছে তাদেরই প্রত্যক্ষ রক্ষণাবেক্ষণে। রক্ষণাবেক্ষণের রীতি যে প্রায় ত্রুটিহীন, সুভাষ উদ্যানে সবুজের ব্যাপকতা দেখেই তা স্পষ্ট বোঝা যায়। নর্দার্ন পার্ক পুরোদান। কাজেই পুরসভার মাইনে-করা মালী আছে। কিন্তু মালীর মূল কাজ নিজেদের হাতেই সেরে ফেলেন বালক সংঘের সদস্যরা। পাড়ার ছেলে বা স্থানীয় অধিবাসীদের সহযোগিতা, সহায়তা ছাড়া আজকাল কোনো পার্কেই খেলার মাঠ ও পুরোদান সুষ্ঠুভাবে পরিচ্ছন্ন রাখা কঠিন। তাই মালীরাও স্থানীয় সহযোগিতায় সম্পূর্ণ পরিবর্তিত।

প্রায় বাহান্ন বছরের প্রাচীন সংস্থা এই বালক সংঘ। চুক্তিমতে পুরসভার কাছ থেকে নর্দার্ন পার্কে খেলাধূলো করার অধিকার প্রথম পেয়েছিল সেই বিশের দশকে। এই চুক্তির কথা ১৯২৭ সালে মিউনিসিপাল গেজেটের একটি সংখ্যায় প্রকাশিতও হয়েছিল। সেই থেকেই বালক সংঘ পুরসভা মঞ্জুরীকৃত অধিকারকে সমাজ কল্যাণে সদ্ব্যবহার করে চলেছে। একটানা বাহান্ন বছর ধরে নিজের কর্মকাণ্ডে অবিচল থাকতে পারাটা এক কীর্তি বটে। এই সাফল্যের চাবিকাঠি কি? প্রশ্নটি রাখতেই সংঘের সম্পাদক নির্দ্বিধায় জানিয়েছিলেন : আমাদের সংঘে রাজনীতির ছোঁয়া লাগেনি কোনোদিন। সংঘের দশকের গোড়ার পর্বে রাজনীতির উত্তাল তরঙ্গে যখন বাংলাদেশ গা ভাসিয়ে দিয়েছিল তখনও কিন্তু আমরা ছিলাম সেই রাজনীতিক ঝড়-কাপটার বাইরে। সেদিনের ঝোড়ো হাওয়া এড়াতে পেরেছি বলেই আজও পার্কের নীচকার ভূমি শক্ত হয়ে আছে।

তবে রাজনীতি থেকে দূরে থাকলেও বালক সংঘকে রাজনীতিক নেতাদের স্নেহ, আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত থাকতে হয়নি। জাস্টিস চন্দ্রমাধব রোডের অদূরে এলগিন রোডে থাকতেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র। তাঁর সান্নিধ্য ও স্নেহ ছিল সংঘের কর্মীদের কাছে পরম প্রেরণার উৎস। নব বাংলার রূপকার ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়েরও দৃষ্টি ছিল এই সংস্থার ওপর। এক সন্ধ্যায় নর্দার্ন পার্কে এসে আলোক স্বল্পতা অনুভব করায় তিনিই তো সারা পার্কে আলো ছড়াবার ব্যবস্থা করে দেন। আশপাশের আরও অনেক বিশিষ্ট, বিচক্ষণ ও চিন্তাশীল ব্যক্তির সক্রিয় সাহায্যও বালক সংঘের চলার পথে পাথেয় যুগিয়েছে। বহুজনের বহুবিধ সাহায্যের সূত্রে বছর তেরো-চোদ্দ আগে নর্দার্ন পার্কে বালক সংঘের নিজস্ব পাকা প্যাভেলিয়নও গড়ে উঠেছে।

বালক সংঘের সদস্যদের মধ্যে কালে কালান্তরে কেউ কেউ সারা বাংলার একেবারে সঙ্ঘনের সারির খেলোয়াড় মহলে নিজেদের জায়গা করে নিতে পেরেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ ক্রিকেটার শ্যামসুন্দর মিত্র, দিলীপ সেনী, ফেল ভ্রাতৃদ্বয়, সৌরভ বসু, ফুটবলার মোহন সিং ভলিবল খেলোয়াড় পার্বতী বসু, বিজয় দত্ত, সরোজ রায়, নীরেন সরকার, এস ঘোষ রঞ্জিত ও নির্মল বসু, আথলিট মৃণি ও রবি ঘোষ, অনন্ত ও পাচু সরকার, শীলা সিউপুরি, সাইক্লিস্ট, পরেশ সেন প্রমুখের নামোল্লেখ করা যায়।

এবারের শিশু ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল প্রতিবারের মতোই বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা। তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতায় সাফল্যের মূল্যায়নে দলগত বিভাগে ক্রমপর্যায় অনুসারে বালক বিভাগে প্রথম হয় জুলিয়েন ডে স্কুল, দ্বিতীয় সাউথ পয়েন্ট, তৃতীয় দক্ষিণেশ্বর হাইস্কুল। আর বালিকা বিভাগে প্রথম হয় ইউনাইটেড মিশনারি স্কুল, দ্বিতীয় বেলতলা গার্লস ও তৃতীয় দক্ষিণেশ্বর হাইস্কুল। সমবেত কুচকাওয়াজে সর্বোত্তমের স্বীকৃতি পায় খালসা হাইস্কুল। সব মিলিয়ে শতাধিক বিদ্যায়তনের ছাত্রছাত্রীদের মেলা বসেছিল এই উপলক্ষে।

শিশুমেলা সাঙ্গ হলেই এক অইডিয়ার লক্ষ্য সামাজিক কল্যাণ। প্রার্থনা করি অইডিয়াটি জয়যুক্ত হোক এবং সুভাষ উদ্যানে পরিচ্ছন্ন চিন্তার যে দীপশিখাটি জ্বালানো হয়েছে তার আলো ঘরে-দুয়োরেও ছড়িয়ে পড়ুক।

শরৎ অমরত্ব বার্ষিকীতে বহু তথ্যসমৃদ্ধ শ্রদ্ধার্ঘ্য—
শরৎচন্দ্র—মণি বাগচি—১৮৲
রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম • কাজি নজরুল ইসলাম • ২০৲
দেশবন্ধু • মণি বাগচি • ২০৲
মহাজীবন—অমলেন্দুসার ঘোষ-১৫৲ মহাজীবন—অমলেন্দুসার ঘোষ-২০৲
মোহন লাইব্রেরি : ৩৫ এ, সূর্যসেন স্ট্রীট • কলিকাতা ৯ ফোন: ৩৫ ৩৬৩৩

খেলাধুলা

দর্শক

জাতীয় হকি প্রতিযোগিতা

কটকের বরবটী স্টেডিয়ামে আয়োজিত ৪০তম জাতীয় হকি প্রতিযোগিতার ফাইনালে রেলওয়ে ১—০ গোলে সার্ভিসেস দলকে হারিয়ে বলদ্বামী কাপ জয়ী হয়েছে। প্রথমার্ধের খেলার ১৬ মিনিটে পেনাল্টি স্ট্রোক থেকে ডি জি ফিলিপস জয়সূচক গোলটি দেন।

এই নিয়ে রেলওয়ে ১৭ বার প্রতিযোগিতার ফাইনালে খেলে মোট ১৪ বার জয়ী হল—এর মধ্যে যুগ্মবিজয়ী ৩ বার। এখানে উল্লেখ্য, জাতীয় হকি প্রতিযোগিতার ফাইনালে সর্বাধিকবার জয়ের রেকর্ড রেলওয়ে দলের—মোট ১৪ বার—এবিষয়ে আগের রেকর্ড ছিল পাঞ্জাবের—মোট ১৩ বার। রেলওয়ে দল উপর্যুপরি ৩ বার করে চ্যাম্পিয়ান হয়েছে দুবার—১৯৫৭-৫৯ এবং ১৯৭৪-৭৬। রেলওয়ে দলের এটাও একটা রেকর্ড। রেলওয়ে দল সবসমেত চ্যাম্পিয়ান হয়েছে ১১ বার (১৯৩০, ১৯৫৭-৫৯, ১৯৬১, ১৯৬৩, ১৯৬৪, ১৯৬৮, ১৯৭৪ এবং ১৯৭৬) এবং যুগ্মবিজয়ী হয়েছে ৩ বার—১৯৬৬ সালে সার্ভিসেস, ১৯৬৭ সালে মাদ্রাজ এবং ১৯৭০ সালে পাঞ্জাবের সঙ্গে। অপরদিকে সার্ভিসেস মোট ১২ বার ফাইনালে খেলে ৬ বার জয়ী হয়েছে—এর মধ্যে যুগ্মবিজয়ী ২ বার। সার্ভিসেস ফাইনালে শেষ জয়ী হয়েছে ১৯৭২ সালে রেল দলের বিপক্ষে।

সদ্যসমাপ্ত ১৯৭৬ সালের জাতীয় হকি প্রতিযোগিতায় ২১টি দল অংশ গ্রহণ করেছিল। গোয়া নাম দিয়ে শেষ পর্যন্ত যোগদান করেনি। যোগদানকারী ২১টি দল চারটি গ্রুপে ভাগ হয়ে প্রথমে লীগ প্রথায় খেলেছিল এবং প্রতি গ্রুপের চ্যাম্পিয়ান এবং রানার্স-আপ দল কোয়ার্টার ফাইনালে খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছিল। এই কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে নক-আউট প্রথায় খেলা হয়।

প্রাথমিক লীগের খেলায় অপরাজিত ছিল এই ৬টি দল : এ গ্রুপে ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্স (চ্যাম্পিয়ান) এবং রেলওয়ে (রানার্স-আপ), বি গ্রুপে পাঞ্জাব (চ্যাম্পিয়ান), সি গ্রুপে সার্ভিসেস (চ্যাম্পিয়ান) এবং ডি গ্রুপে তামিলনাড়ু এবং কর্নাটক (রানার্স-আপ)। লীগের খেলায় এ গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান সার্ভিসেস একটি অসাধারণ নজির সৃষ্টি করেছিল—তারা কোন খেলায় হারেনি এবং কোন গোল খায়নি।

এ গ্রুপে ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্স এবং রেলওয়ে সমান ১৩টা করে পয়েন্ট সংগ্রহ করে লীগ তালিকায় যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছিল। এয়ারলাইন্স দলের গোল এভারেজ ভাল ছিল। এয়ারলাইন্স ২৯টা গোল দিয়ে ৩টে গোল খেয়েছিল। অপরদিকে রেলওয়ে ৩৮টা গোল দিয়ে ৫টা গোল খেয়েছিল।

বি গ্রুপের লীগ তালিকায় প্রথম স্থান পেয়েছিল পাঞ্জাব এবং দ্বিতীয় স্থান বোম্বাই। দু দলই ১৯টা করে পয়েন্ট পেয়েছিল। পাঞ্জাব ১১টা গোল দিয়ে ৩টে গোল খেয়েছিল। অপরদিকে বোম্বাই ৪টে গোল খেয়ে ১২টা গোল দিয়েছিল।

সি গ্রুপের লীগ তালিকায় প্রথম স্থান পেয়েছিল সার্ভিসেস (পয়েন্ট ১১) এবং দ্বিতীয় স্থান বাংলা (১০ পয়েন্ট)। সার্ভিসেস ২২টা গোল দিয়ে একটাও গোল খায়নি। আর বাংলা ১৯টা গোল দিয়ে ৩টে গোল খেয়েছিল।

ডি গ্রুপের লীগ তালিকায় গোলের এভারেজে প্রথম স্থান পেয়েছিল তামিলনাড়ু এবং দ্বিতীয় স্থান কর্নাটক। দু দলই ১১ পয়েন্ট করে সংগ্রহ করেছিল। তামিলনাড়ুর পক্ষে ছিল ২৮টা গোল এবং বিপক্ষে ২টো। অপরদিকে কর্নাটক ২৭টা গোল দিয়ে ৫টা গোল খেয়েছিল।

কোয়ার্টার ফাইনাল

(১) ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্স ২—০ গোলে বোম্বাইকে পরাজিত করে

(২) রেলওয়ে ২—১ গোলে পাঞ্জাবকে পরাজিত করে

(৩) সার্ভিসেস ৫—২ গোলে কর্নাটককে পরাজিত করে

(৪) তামিলনাড়ু ৩—০ গোলে বাংলাকে পরাজিত করে।

সেমি-ফাইনাল

রেলওয়ে দু গোলে পিছিয়ে থেকেও শেষ পর্যন্ত ৪—২ গোলে ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্সকে পরাজিত করে।

সার্ভিসেস ১—০ গোলে গত বছরের রানার্স-আপ তামিলনাড়ুকে পরাজিত করে।

ভারত বনাম নিউজিল্যান্ড

অমীমাংসিত তৃতীয় টেস্ট ক্রিকেট

ব্যাঙ্গালোরে ভারত বনাম নিউজিল্যান্ডের শেষ পঞ্চম মহিলা টেস্ট ক্রিকেট খেলায় নিউজিলাণ্ড ৯ উইকেটে ভারতকে হারিয়ে ১—০ খেলায় রাবার জয়ী হয়েছে। আগের চারটি টেস্ট খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়।

প্রথম দিনে নিউজিলাণ্ড আক্রমণাত্মক ভঙ্গীতে খেলে প্রথম ইনিংসের ২৯১ রানের মাথায় (৬ উইকেটে) খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। ক্যাপ্টেন হেনসিলউড দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ৬৬ রান করে অসুস্থতার কারণে খেলা থেকে অবসর গ্রহণ করেন। চতুর্থ উইকেটের জুটিতে হেনসিলউড (৬৬ রান) এবং র‍্যাটরে (৬২ রান) দলের মূল্যবান ১১৬ রান সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন। এইদিন ভারত প্রথম ইনিংসের তিনটে উইকেট খুইয়ে মাত্র ৬২ রান তুলেছিল। ভারতের মাত্র ৩৩ রানের মাথায় ৩য় উইকেট পড়ে যায়।

দ্বিতীয় দিনে লাঞ্চের আধঘণ্টা পরে

ভারতের প্রথম ইনিংস ১৪২ রানের মাথায় শেষ হলে নিউজিলাণ্ড ১৫৭ রানে এগিয়ে যায়। ফলে ভারতকে ফলো-অন করতে হয়। দ্বিতীয় ইনিংসের তিনটে উইকেট খুইয়ে ভারত ১০৩ রান সংগ্রহ করেছিল। ভারতের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলার সূচনাও ভাল হয়নি—মাত্র ৩৮ রানের মাথায় ৩য় উইকেট পড়ে যায়।

শেষ তৃতীয় দিনে লাঞ্চের ৪৬ মিনিট পর ভারতের দ্বিতীয় ইনিংস ২৫৪ রানের মাথায় শেষ হলে খেলার জয়লাভের জন্যে ১৮ রান তুলতে নিউজিলাণ্ড দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামে এবং এক উইকেট খুইয়ে জয়লাভের প্রয়োজনীয় রান তুলে দেয়। ফলে নিউজিলাণ্ড খেলায় ৯ উইকেটে জয়ী হয়। ভারতের দ্বিতীয় ইনিংসে অধিনায়ক শান্তা রঙ্গস্বামী ১৮৪ মিনিট খেলে তাঁর ৬৬ রানে তিনটে বাউণ্ডারী করেছিলেন। দ্বিতীয় ইনিংসের ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে উজ্জ্বল নিকম (৫৪ রান) এবং শান্তা রঙ্গস্বামী দলের ৫১ রান তুলে দিয়েছিলেন।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

নিউজিলাণ্ড : ২৯১ রান (৬ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড)। বারবারা বিউজ ৫২, র‍্যাটরে ৬২, হেনসিলউড (নট আউট) ৬৬ এবং ব্যাডেইম নটজাউট ৫২ রান। সুসান ইস্টউড্স ৬১ রানে ৩ উইকেট)

● ১৮ রান (১ উইকেটে। বিভেজ নটআউট ৫৮ এবং ম্যাকগ্রগর ৩৫ রান)

ভারত : ১৬২ রান (কল্পনা পারোপাকারী ৩১ রান। মৌরিন ডানলপ ৬৭ রানে ৩ এবং প্যাট ক্যারিক ৩৪ রানে ৪ উইকেট)

● ২৫৪ রান (শান্তা রঙ্গস্বামী ৬৬, উংক্রলা নিকম ৫৪, সভাকর ৩৭ এবং ভাবনা এডুলজি ৩৪ রান। প্যাট ক্যারিক ১১২ রানে ৪ এবং র‍্যাটরে ৭৬ রানে ৪ উইকেট)

ব্যাটিং এবং বোলিংয়ের গড়

সদ্য সমাপ্ত ভারত বনাম নিউজিল্যান্ডের মহিলা টেস্ট ক্রিকেট সিরিজে উভয় দলের পক্ষে ব্যাটিংয়ের গড় তালিকায় শীর্ষস্থান লাভ করেছেন ভারতের অধিনায়ক শান্তা রঙ্গস্বামী—খেলা ৫ ইনিংসে ১ নট আউট ১ বার মোট রান ৪২৭ এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ১১৯ এবং গড় ৫৪-৩৭। নিউজিলান্ডের পক্ষে ব্যাটিংয়ে শীর্ষস্থান পেয়েছেন ইলিন ব্যাডহাম—খেলা ৫ ইনিংসে ১০ নট-আউট ৪ বার মোট রান ২৪০ এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ৭০ এবং গড় ৪০-০০। টেস্ট সিরিজে মোট ২০০ বা তার বেশী রান করেছেন এই পাঁচজন খেলোয়াড় : নিউজিলান্ডের পক্ষে চারজন—বারবারা ভিভেজ (২৭৫ রান) ইলিন ব্যাডহাম (২৪০ রান) চার্লি হেনমিলটড (২১৪ রান) ও মুই র‍্যাটরে (২০০ রান) এবং ভারতের পক্ষে মাত্র একজন—শান্তা রঙ্গস্বামী (৪২৭ রান)। উভয় দলের পক্ষে সিরিজে নেট সর্বাধিক রান এবং এক ইনিংসে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান করেছেন ভারতের অধিনায়ক শান্তা রঙ্গস্বামী—তাঁর সিরিজে মোট রান ৪২৭ এবং এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ১১৯।

বোলিংয়ে ১০ বা তার বেশী উইকেট পেয়েছেন এই চারজন বোলার—নিউজিল্যান্ডের পক্ষে প্যাট ক্যারিক (২৭টি) মুই র‍্যাটরে (২১টি) ও মৌরিন ডানলপ (১৪টি) এবং ভারতের পক্ষে ভাবনা এডুলজি (২৫টি)।

ঘড়ি

গ্যারান্টিসহ ঘড় মেরামত

রায় কাজিন এন্ড কোং

জুয়েলার্স এন্ড ওয়াচ মেকার্স

৪ বি, বি ডি, বাস, কলিঃ—১

ওমেগা ও টিসট ঘড়ির

অথরাইজড এজেন্টস

জয়ন্ত বসু স্মৃতি ট্রফি

সাংবাদিকদের সর্বভারতীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতার উদ্বোধন বছরে পশ্চিমবাংলার সাংবাদিক দল জয়ন্ত বসু স্মৃতি ট্রফি জয়ী হয়েছে। অধুনালুপ্ত 'পি টি আই' সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের জনপ্রিয় সাংবাদিক জয়ন্ত বসুর স্মৃতিরক্ষার জন্য পশ্চিমবাংলার ক্রীড়া-সাংবাদিক সঙ্ঘ সাংবাদিকদের এই সর্বভারতীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেছে। উদ্বোধন বছরের আসর বসেছিল কলকাতার রঞ্জি স্টেডিয়ামে। প্রথম বছরের অনুষ্ঠানে যোগদান করেছিল এই তিনটি দল—পশ্চিমবাংলা, দিল্লী এবং বোম্বাই। এই তিনটি দলকে নিয়ে যে লীগ প্রথায় খেলা হয়েছিল তাতে পশ্চিমবাংলা ক্রীড়া সাংবাদিক দল অপরাজিত অবস্থায় চ্যাম্পিয়ান হয়। লীগের খেলায় পশ্চিমবাংলা দল ৪ উইকেটে দিল্লী এবং ৩ উইকেটে বোম্বাইকে পরাজিত করেছিল। বোম্বাই বনাম দিল্লীর খেলায় বোম্বাই ৭৪ রানে দিল্লীর কাছে হেরেছিল। ফলে প্রতিযোগিতার রানার্স-আপ হয়েছিল দিল্লী।

ভারত বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ

বিশেষ সিং বেদীর নেতৃত্বে ভারতীয় ক্রিকেট দলের ১৯৭৬ সালের ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট সফর শুরু হয়ে গেছে। ভারত বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজের টেস্ট ক্রিকেট সিরিজ শুরু হয়েছে ১৯৪৮-৪৯ সাল থেকে। এ পর্যন্ত এই দুই দেশের মধ্যে যে সাতটি টেস্ট ক্রিকেট সিরিজ খেলা হয়েছে, তার ফলাফল দাঁড়িয়েছে : ওয়েস্ট ইণ্ডিজের 'রাবার' জয় ৬ বার এবং ভারতের 'রাবার' জয় মাত্র ১ বার (১৯৭১ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরে)। এই সাতটি টেস্ট ক্রিকেট সিরিজের ৩৩টি টেস্ট খেলার ফলাফল : ওয়েস্ট ইণ্ডিজের জয় ১৫, ভারতের জয় ৩ এবং খেলা ড্র ১৫। ১৯৬২ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরের মাটিতে ভারতকে শোচনীয়ভাবে ৫—০ খেলায় হারিয়ে টেস্টে 'রাবার' জয়ী হয়েছিল।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের 'রাবার' জয় : ১৯৪৮-৪৯ সালে ১—০ খেলায়, ১৯৫৩ সালে ১—০ খেলায়, ১৯৫৮ সালে ৫—০ খেলায়, ১৯৬২ সালে ৫—০ খেলায়, ১৯৬৬-৬৭ সালে ২—০ খেলায় এবং ১৯৭৪-৭৫ সালে ৩—২ খেলায়।

ভারত ১৯৭১ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মাটিতে ১—০ খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে হারিয়ে রাবার জয়ী হয়েছিল। ১৯৬৬-৬৭ সালের টেস্ট সিরিজে মাত্র তিনটে টেস্ট খেলা ছিল। অপরদিকে বাকি ৬টা টেস্ট সিরিজে ছিল পাঁচটা করে টেস্ট খেলা।

বিবিধ টেস্ট রেকর্ড

এক ইনিংসে দলগত সর্বোচ্চ রান

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : ৬৬৮ (৮ উইকেটে ডিক্লেঃ) দিল্লী ১৯৭৮।

ভারত : ৫০৯, দিল্লী, ১৯৪৮।

এক ইনিংসে দলগত সর্বনিম্ন রান
(পুরো ইনিংসের খেলায়)

ভারত : ৯৮ পোর্ট অব স্পেন ১৯৬২

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : ২১৪, পোর্ট অব স্পেন, ১৯৭১

এক সিরিজে ব্যক্তিগত সর্বাধিক রান

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : ৭৭৯ রান (গড় ১১১-২৮)—ই ডি উইকস ১৯৪৮-৪৯

ভারত : ৭৭৪ রান (গড় ১৫৪-৮০)—সুনীল গাভাস্কার ১৯৭১

এক সিরিজে সর্বাধিক উইকেট

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : ৩০টি—অ্যান্ডি রবার্টস ১৯৭৪—৭৫

ভারত : ২৭টি—সুভাষ গুপ্তে ১৯৫৩

একটি খেলায় সর্বাধিক উইকেট

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : ১২টি—অ্যান্ডি রবার্টস মাদ্রাজ ১৯৭৪—৭৫

ভারত : ১১টি—বি এস চন্দ্রশেখর বোম্বাই ১৯৬৬

এক ইনিংসে সর্বাধিক উইকেট

ভারত : ৯টি—এস পি গুপ্তে কানপুর ১৯৫৮

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : ১টি—জে নোরীগা পোর্ট অব স্পেন ১৯৭১

টেস্ট সেঞ্চুরী

মোট সেঞ্চুরী ৭৫টি—ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ৫০ এবং ভারত ২৫

এক ইনিংসে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : ২৫৬—রোহন কানহাই, কলকাতা, ১৯৫৮-৫৯

ভারত : ২২০—সুনীল গাভাস্কার, ত্রিনিদাদ, ১৯৭০-৭১

ডাবল সেঞ্চুরী

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ (৪টি) :

২৫৬ রোহন কানহাই, কলকাতা, ১৯৫৮-৫৯

২৪২ * ক্লাইভ লয়েড বোম্বাই, ১৯৭৪-৭৫

২০৭ ফ্রাঙ্ক ওরেল, জামাইকা, ১৯৫৩

২০৭ ই ডি উইকস, ত্রিনিদাদ, ১৯৫৩

ভারত (২টি) :

২২০ সুনীল গাভাস্কার, ত্রিনিদাদ, ১৯৭০-৭১

২১২ দিলীপ সরদেশাই, কিংস্টন, ১৯৭০-৭১

সর্বাধিক সেঞ্চুরী

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ :

৮টি—গারফিল্ড সোবার্স

৭টি—ই ডি উইকস

ভারত :

৪টি—সুনীল গাভাস্কার

৩টি—দিলীপ সরদেশাই

৩টি—পলি উমরীগড়

৩টি—চাঁদু বোরদে

খেলার উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী

১৬২ ও ১০১—ই ডি উইকস, কলকাতা ১৯৪৮-৪৯

১২৪ ও ২২০—সুনীল গাভাস্কার, ত্রিনিদাদ, ১৯৭০-৭১

জনঅরণ্য

চিত্রনাট্য, সঙ্গীত ও পরিচালনা সত্যজিৎ রায়

একদিকে অপসরমান জীবনের আদর্শ ও মূল্যবোধ, অন্যদিকে বর্তমান নিষ্ঠুর উদাসীন এবং খানিকটা অমানবিক সময় ও সমাজ, এর মধ্যে নতুন প্রজন্মের শিক্ষিত বেকারের ক্রম-আত্মসম্পর্কিত—এই ত্রিভুজ টানাপোড়েনের অপরূপ আলেখ্য জনঅরণ্য। ভাল ছবি প্রতিটি সত্যজিৎ রায় যতবারই আমাদের উপহার দিয়েছেন, তাঁর মহৎ সৃষ্টিও একাধিক। কিন্তু জনঅরণ্যে তাঁর সৃষ্টি-কুশলীর পরিবর্তনশীল পরিচালকের নতুন ভাবনা ও ভাষাকে যেভাবে চিহ্নায়িত করেছে তা একেবারেই নতুন। এখানে প্রথম থেকে শেষ অবধি প্রতিটি নাটকের নেরেটিসের মত একটি অখণ্ড ছায়া-দৃশ্য সময়ের সংখ্যা, এবং তার পরিণামে নায়ক সোমনাথের তথাকথিত সাফল্যও চরম অবক্ষয়ের যন্ত্রণাকে প্রতিফলিত করে।

এ ছবির প্রথম থেকে শেষ অবধি কোথাও থামবার অবকাশ নেই। বহু সংবিশিষ্ট অর্কেস্ট্রার মত কিংবা বিশাল ও বেগবতী এক নদীর মত ভাল মন্দ সব কিছু নিয়ে প্রবল বেগে ধাবিত হয়েছে শেষের মোহনার দিকে। জনারণ্য কথাটা অমর ব্যবহার করি ভীড়ের আবহ সৃষ্টি করতে। কিন্তু সেই লক্ষ্যে যখন রেজিষ্ট হয়ে জন-অরণ্য হয় তখন বুঝতে কষ্ট হয় না এ অরণ্যের অধিবাসীরা হয় জন্তু অথবা জন্তুর সঙ্গে সংগ্রামের নিকার আহত মানুষ। ভাল ছেলে হয়েও পরীক্ষকের গাফিলতিতে সাধারণভাবে যে এ পাশ করে আরও লক্ষ লক্ষ ছেলের মত ক্রমাগত চাকরীর দরখাস্ত করে চলেছে, বিদেশ হবার পর সোমনাথ যখন তার পূর্ব পরিচিত বিলাসের উৎসাহ ও সাহায্যে অর্থার সংগ্রহ করার ব্যবসায়ে নামে, এখন কি সে জানত সে হতে খোলা থেকে জ্বলন্ত আগুনে লাফিয়ে পড়ল মাত্র। অর্থাৎ সেখানে ঈশ্বর মানেই বিলাস। বিদ্যমান মূল্যবোধের প্রতীক সোমনাথের বাবা স্বৈপ্রসন্ন নিজের দুই ছেলেকে বুঝতে না পেরে যে সংকটে পড়েন, তাকে জেনারেশন গ্যাপ বলা চলে, কিন্তু শেষ দৃশ্যে সোমনাথের অন্ধ অবলোপের বিনিময়ে পাওয়া সাফল্যে তিনি যখন খুশী হয়ে অশ্রুমোচন করেন, তখন তার চেয়ে অমর্মান্তিক কল্পনা করা যায় না। ঠিক এই ঘটনাটিতে একদিকে তপন, নিম্ন কিন্তু সফল সোমনাথের প্রায় লুকিয়ে বাড়ি ফেরা, মাকে পিতার অশ্রুমোচন এবং শটের ফিল্মীয় বিদ্যুতে বৌদির বিষণ্ণ স্থির দৃষ্টি ছবিটির সমৃদ্ধ বক্তব্যকে নিঃশব্দে উদ্ঘাটিত করেছে।

অভিনয় এ ছবিতে সকলেই ভাল করেছেন। নবাগত প্রদীপ মুখার্জি, নবাগতা সুদেষ্ণা দাশ, এঁদের অভিনয় খুবই উল্লেখযোগ্য। তা ছাড়া উৎপল দত্ত, রবি ঘোষ, এবং একটি ছোট ভূমিকায় অপর্ণা সেনের অভিনয়ও বইয়ের মলাটকে যথেষ্টভাবে এগিয়ে দিয়েছে। সবার শেষে উল্লেখ করলেও সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের অভিনয় সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ভাবে নতুন প্রতিষ্ঠা পেয়ে এ কথা বলা যায়।

ছবিটির কাহিনী এখানে বিশ্লেষণের আলোচনা করা হল না। তবে মূল কাহিনী লেখক শংকরের রচনা চলচ্চিত্রের নিজস্ব মাধ্যমের দাবীতে এবং বিশেষ ফ্রিল্ড-ভঙ্গীর প্রয়োজনে শ্রীরায় যে মূলধনে ঢেলে সেজেছেন তা বলাই বাহুল্য।

ছবির আলোকচিত্র এবং আবহসঙ্গীত খুবই উঁচুদরের।

এক কথায় বলা চলে সত্যজিৎ রায়ের জনঅরণ্য আমাদের অভ্যস্ত আরামের নিরাপদ আশ্রয় দেয় না, বিপন্নভাবে বিচলিত করে এবং অনুসন্ধানে ব্রতী করে। এ ছবির আসল মহত্ত্ব এইখানেই।

ম.

শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বিলাসবহুল প্রেক্ষাগৃহে বসে ছবি দেখতে দেখতে দর্শকের অনেক সময় বুঝতেই পারেন যে ছবি তুলতে কলাকুশলী এবং শিল্পীদের অনেক সময় প্রাণের কুঁকি পর্যন্ত নিতে হয়। একটি বিপজ্জনক দৃশ্য দেখে আজকাল দর্শকরা মন্তব্য করেন—ওটা ক্যামেরাম্যান কারসাজি: কিন্তু সবসময় তো কারসাজি বলা যায় না। সত্যিকারের শট নিতেই হয়। অনাথায় দৃশ্যের বাস্তব চেহারা কখনো ফোটানো যায় না।

বহুদিন আগে টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওতে স্বর্গত ছবি বিশ্বাসের মুখে একটা ঘটনা শুনেছিলাম। তখন উনি 'দাদঠাকুর' ছবির শুটিং করছেন। ছবিদাকে আমার খুব ভাল লাগত বলে অবসর পেলেই আমি ওঁর কাছে চলে যেতাম। আমার বয়স তখন অল্প। উনিও আমাকে বেশ স্নেহের দৃষ্টিতে দেখতেন। একটু অবসর পেলে নানান মজার গল্প শোনাতেন। জীবনের নানান অভিজ্ঞতার কথা বলতেন। আর শ্রোতারূপ বিপুল আগ্রহের সঙ্গে তা শুনতেন। এখন মনে দুঃখ হয়: যদি সেই সময় রাখতাম তো আজ চমৎকার একটা বই তৈরী হয়ে যেত। পাঠকেরা বুঝতে পারতেন—ছবি বিশ্বাসের কি অসাধারণ লেখার হাত ছিল। জীবন সম্পর্কে ওঁর দৃষ্টিভঙ্গী খুব স্বচ্ছ ছিল। মানুষের প্রতি বিশ্বাস ছিল অগাধ। দিনের এক বিশেষ সময় ছাড়া উনি ছিলেন বিশিষ্ট ভদ্রলোক। অমায়িক। বন্ধুবৎসল, অভিনেতা।

লাঞ্চ ব্রেকের পর উনি মেকআপ রুমের বিছানায় আধশোয়া অবস্থায় রুস অভিজ্ঞতা এমন সময় আমি গিয়ে উপস্থিত। আমায় দেখে মুচকি হেসে বললেন—কী খবর?

—এমনি এলাম দাদা।...হ্যাঁরে, বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটালাম না তো?

ছবিদা হাসলেন—বসো বসো। বিশ্রাম কোথায়? এখুনি হয়ত সুধীর (প্রযোজক পরিচালক সুধীর মুখার্জি) ডেকে পাঠাবে।

আমি থাকতে থাকতে আরও দু-একজন এসে আসরে যোগ দিলেন। গল্প জমে উঠল। একফাঁকে সুধীরদা এসে ওঁকে নিয়ে গেলেন: সুধীরদা স্বল্পভাষী মানুষ। ঝক্কিঝামেলা ওঁরও জুড়ি পাওয়া ভার। আমরা জমিয়ে গল্প হচ্ছে দেখে সুধীরদা মুচকি হেসে বললেন—দাদা আপনি চালিয়ে যান আমি ঠিক সময় আপনাকে ডেকে নেবোখন। স্ক্রিপ্ট এখন লাইট হচ্ছে—

বলে সুধীরদা হাসতে হাসতে চলে গেলেন।

হঠাৎ একজন আড্ডাধারীর আমার ওপর দৃষ্টি পড়ল। অমনি ভ্রু কুঁচকে উনি বলে উঠলেন—তুমি ছোকরা এখানে এই অসময়ে কি করছ? আমরা এখানে সব খেলাধুলি ইয়ে করছি মানে—

—থাক থাক—ছবিদা যেন আমাকেই আশ্বস্ত করে সহাস্যে বললেন—ছোকরা আমার গল্প শুনতে বড় ভালবাসে।

। ছবি বিশ্বাসের কাছে যেতবার
নই। তখন গিয়ে ধরলাম আমাদের
কারী প্রদীপ দাশগুপ্তকে।—দাদা
আমাকে বাঁচান। ছবিদা ড্রেস
টী সব উল্টোপাল্টা করে বসে

? প্রদীপ দাশগুপ্ত দারুণ অবাক
হবারই কথা। কারণ ইন্ডাস্ট্রিতে
লে—ছবি বিশ্বাসের কস্টিউমটা
তমত টনটনে। যে কারও ভুল হতে
স্তু ছবি বিশ্বাসের কখনো এই
না।
প দাশগুপ্ত মাথা চুলকে বললেন—
ত ফ্যাসাদ বাঁধালে দেখছি। তুমি
বলেছ?
..মানে বলতে ভরসা হচ্ছে না।
ী মানুষ উনি.....
প দাশগুপ্ত সামান্য চিন্তা করে
আচ্ছা তোমার খাতার লেখা ঠিক
া?
ওর?
। আমি লোকেশানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে
স্টিনিউটী লিখে রেখেছিলাম।
াতিক আমার সঙ্গে ছিল। আমার
ল হয়—কাতিকের হবার কথা নয়।
ুম!
া আপনি গিয়ে একবার বুঝিয়ে
ট ঠৌকিং হয়ে গেলে আর কিন্তু
করবে না। তখন সব দোষটা আমার
কাঁধে এসে পড়বে।

প্রদীপ দাশগুপ্ত সামান্য ইতস্তত ক
ছবি বিশ্বাসের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন
তারপর নীচু গলায় ব্যাপারটা খুলে বললেন
ছবিদা হঠাৎ এমনভাবে ওঁর দিকে তাকাতে
যেন সদ্য সদ্য তিনি আকাশ থেকে পড়ছেন
আমি অদূরে বোকার মত দাঁড়িয়ে। শুনতে
পেলাম উনি বলছেন—তোমাদের কি মাথা
খারাপ? আমি জেনেশুনে ভুল কস্টা
পরব? এটা তোমায় বললে কে?
—রঞ্জন।
—কে রঞ্জন?
—আজ্ঞে আমাদের সঙ্গে কাজ করে
থার্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট। ড্রেস-কন্টিনিউটী
রাখছে।
—কই সে ছোকরা? দেখি?

প্রদীপ দাশগুপ্ত আমার দিকে ফি
ইশারা করতেই সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে আ
তো সরা।

মরেছে! অপরাধীর মত মাথা নি
সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। ছবি বিশ্ব
চকুটী করে আমাকে একবার আপা
মস্তক দেখলেন। তারপর গম্ভীরকণ্ঠে
জানতে চাইলেন—তুমি বলছ আমি ভু
কস্টুমে পরেছি?

প্রথমে কিছুক্ষণ কথা বলতে পারল
না।

(ক্রমশঃ

রঞ্জন মজুমদা

CENTRAL LIBRARY

...লদা
...তো
...তাই

...নিই
...ঠিকই
...ছবি

...কাজ
...সোহে
...। হয়ে

...ছরের
...রিয়ে
...খনও

সামনের জানলা ছাড়িয়ে দূরের কোনো বাড়ীর ছাদে দৃষ্টি আটকে রাখছিলেন।

নৃত্যশিল্পী মমতা শংকরকে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেবার প্রয়োজন নেই। কিন্তু অভিনেত্রী মমতা শংকর? এখনও পর্যন্ত কোনো ছবির মুক্তি পায়নি তার! মুক্তি পাবেই বা কি করে? ছবির শুটিং-ই শেষ হয়নি।

উদয় শংকর ইণ্ডিয়া কালচারাল সেন্টারের যে-কোনো অনুষ্ঠান যিনি দেখেছেন মমতা তাঁর কাছে অচেনা মুখ নন। কথাকলি—ভারত নাট্যমের মুদ্রা আর ছন্দে তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হিল্লোলিত। বাকসমুলার-ভবনে যে কোন রোববার গেলে ওঁকে সেখানে দেখা যাবে শিক্ষয়িত্রীর ভূমিকায়। মাকে সাহায্য করছেন।

নাচ অবশ্য এখনও মমতার ফার্স্ট লাভ।

সিনেমা না করলেও অভিনয় সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ নতুন নয়। কবে থেকে জানতে চাইলে সারা মুখে হাসি ফুটিয়ে বললেন—ছোটবেলা থেকেই বলতে পারেন। পাশের বাড়ীর বন্ধু আর বাড়ীর দারোয়ানের ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে ঘরোয়া ন করতুম। বেশ মজা লাগত।

এখন আর সে বয়স নেই। মমতা এ গোখেল কলেজের ছাত্রী. নাচ আর নিয়েই ব্যস্ততা এখন বেশী। মাসের অ দিন এদিক-ওদিক প্রোগ্রাম লেগেই আ

—পড়াশুনোর ব্যাপারে অসুবিধে হ না?

: হচ্ছে একটু-আধটু। কি আর বলুন? ম্যানেজ করে নিতেই হবে।

তার এখন আবার সিনেমায় অভি শুরু হলো. ব্যস্ততা আরও বাড়বে।

: মৃণালদার এই ছবি রিলিজ হওয়া পর্যন্ত আমি আর কোনো নিচ্ছি না। মমতার কথার সঙ্গে বিশ্বাস আতঙ্ক। 'এই ছবিতে আমার পার্ট

নিশ্চয়ই নেয় আগে দেখি, তারপর অন্য ছবি।'

তবে একথা নিশ্চিত মমতা মৃণাল-বাবুর এই ছবিতে কাজের জন্য যেভাবে নিজেকে প্রিপেয়ার করেছেন, যে নিষ্ঠা আর আন্তরিকতা নিয়ে 'কড়রিং' চরিত্র তিনি আত্মনিকেন করছেন তা কেবলে যাবার নয়।

যে গায়ের রং ছিল কেশ ফরসা যে ভুরু প্লাক করতেন প্রায় প্রতিদিন —আজ সেখানে গায়ের রং হয়েছে বাদামী, চোখের ওপর রয়েছে ঘন কালো ভুরু।

—কেন এমন হলো?

হাসতে হাসতে জবাব দিলেন মমতা সংকর। মৃণালবাবু বললেন ওঁর ছবির চরিত্রটা এক আদিবাসী সাঁওতালীর। গায়ের রং তাই কালো না হয়ে উপায় নেই। উনি বলে ছিলেন মেক-আপ করে চালিয়ে নেবেন। কিন্তু আমি রাজী হইনি। বললাম গায়ের রং পাল্টে নেব।

শুরু করলেন জগিং, সিগারেট আর সন্ধের ছোল ছেড়ে বাড়ীর ছাওড়া বারান্দায় রোদ লাগিয়েছেন গায়ে দিনের পর দিন। ফরসা রং বদলে গেছে বাদামীতে। ভুরুর শখ মুলতুবি রেখেছেন। শুধু মনে মনে নয়, শারীরিক দিক থেকেও ভুরুর হবার এই চেষ্টা সফল হবে কি?

ম্যাসানজোরের অডিটরিয়ামে গত বছরের শেষ আর জানুয়ারীর শুরুতে শুরু হয়েছিল ছবির কাজ। প্রথম সুটিং-এর শার্ভাসনেস কাটতে বেশী সময় লাগেনি। আসলে ছবির কাজ আর কাজুয়াল কথাবার্তার মধ্যে কোনো তফাৎই করেননি মৃণালবাবু। সাইট-কাইট করে হঠাৎ আমায় এসে বললেন মম এই সিনটা করতো। নো প্রিপারেশন—নট কিছু। তবে ক্যাজুয়ালিটি ঘটে গেল কাজলমেঘা। সুটিং করছি মনে হয়নি।'

কিন্তু নাচের কোনো প্রোগ্রামের আগে মমতার এই স্বাভাবিকতা থাকে না। বেশ লজ্জা মেশানো সুরে তিনি বললেন—প্রোগ্রামের আগে বড় টেনসন হয় আমার। খেতে পারিনা, টেম্পারেচার উঠে যায়। ভয়ানক নার্ভাস ফিল করি।

—তাহলে প্রোগ্রাম করেন কি করে?

স্টেজে উঠলে আর ওসব কিছু থাকে না। একবারে ফ্রি হয়ে যাই।

আসলে নাচইতো তাঁর প্রথম প্রেম। স্টেজে তাই তিনি ফ্রি-ফ্র্যাঙ্ক-ফিয়ারলেস।

•

ঘরে ঢোকবার সময় দেখেছিলাম কাজ করা পাঞ্জাবী আর বেল-বটম-এর সাদামাটা পোষাকে বোধহয় কোথাও বেরোবার জন্য তৈরী। আমি এসে পড়ায় বৌদিকে পাঠিয়ে দিলেন সেখানে।

ইতিমধ্যে ফটোগ্রাফার সুকুমারবাবুর নির্দেশে দু-দুবার পোষাক বদল করতে হয়েছে মমতাকে। প্যান্ট-পাঞ্জাবীতে একুশ বছরের তরুণী বুটিদার-ছাপা শাড়ী জড়িয়ে আত্মরক্ষা যেন রূপ পাল্টে ফেললেন। পতুগেজের মত সরল মুখশ্রী—গলায় সুরেলা লবঙ্গ

ধরম করম

প্রযোজনা : আর কে ফিল্মস

এক প্রতিপক্ষের স্মাগলিং-এর টাকা আত্মসাৎ করে গুণ্ডাদলের সর্দার শঙ্করকে নিজের ও পরিবারের বিপদ ডেকে এনেছিল. অপর পক্ষের দলনেতা প্রতিশোধ নিতে চাইল শঙ্করের নবজাত পুত্রকে অপহরণ করে। ভয় পেয়ে তখন শঙ্কর নিজের পুত্রের সঙ্গে বিশিষ্ট শিল্পী অশোকবাবুর নবজাত সন্তানকে বদল করতে বাধ্য হলো। আসল ছিল শঙ্করের ছেলে শিল্পীর ঘরে প্রতিপালিত হয়ে শিল্পী হবে। আসলে নেয়া গেল তার ঘরে প্রতিপালিত 'ধরমই' কলঙ্কমে বিশিষ্ট শিল্পী হিসাবে পরিচিত হোল এবং শঙ্করের নিজের ছেলে বড় হয়ে একজন বদমাস ও স্মাগলার দলের প্রধান হয়ে উঠলো।। শঙ্কর অনেকদিন জেল খেটে বাড়ী ফিরে এসে প্রতিবেশীর কাছে সব কিছুই জানতে পারলো। এবং অশোকবাবুর ছেলেকে (ধরম) শিল্পী হিসেবে দেখে ছেলে গিয়ে তাকে গুণ্ডাদলের সর্দার বানাবার এবং নিজের ছেলেকে গুণ্ডা থেকে সৎ করবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু তার নিজের ছেলেকে সৎপথে আনতে না পেরে তাকেই সে এক সময় রেগে গিয়ে পুলিশ দিয়ে গ্রেপ্তার করালো এবং জজ সাহেবের কাছে জানিয়ে দিল 'ধরম' কোন অন্যায় করেনি, আসল অপরাধী তার নিজের ছেলে। 'ধরম' মুক্তি পেলো এবং জানতে পারল তার আসল পিতার পরিচয় আর তখন তার পক্ষে বলা প্রণয়ীকে নিয়ে নীড় বাঁধতে বাধা কোথায়?

প্রয়াগ রাজ রচিত ছকে বাঁধা কাহিনী ও চিত্রনাট্যে, আর কে ফিল্মসের এ ছবি পূর্বের কোন ছবির মতো নতুন পথনির্দেশ করেনি। এই ছবিতে রাজকাপুরের আওয়ারা ছবির প্রভাব এসে পড়েছে। রণধীর কাপুরের পরিচালনাও কিছুটা নিষ্প্রভ, দুর্বল কাহিনী ও চিত্রনাট্যের জন্যে। তবে পরিচালক ছবির একেলনকে নানাভাবে কাজে লাগিয়েছেন। অভিনয়ে : রাজকাপুর (অশোকবাবু), রণধীর কাপুর (ধরম), প্রেমনাথ (শঙ্কর), শঙ্করের আসল ছেলের ভূমিকায় নরেন্দ্রনাথ এবং প্রতিবেশীর ভূমিকা উর্মিলা ভাটের অভিনয় সাবলীল। তবু ছবির আলোকচিত্র গ্রহণ এবং অন্যান্য কলাকৌশলের কাজ উচ্চাঙ্গের। আর শঙ্কর জয়কিষণের সুর বেশ আকর্ষণীয়। —চিত্রলেখা

আর আলগোছে খোঁপা করা ঘন কালো চুলে মমতা তখন রীতিমত সুন্দরী।

খোঁপাটা ছাড়িয়ে দিতে আমরা অবাক। এতবড়ো চুল—হবে একটা দেখা যায় না! মমতা জানালেন—তাওতো অনেকটা কেটে ফেলেছি। বাড়ীতে বলছিল মেয়েদের হাঁটুর নীচে চুল আলো না—তাই।'

সুতরাং এই চেহারা নিয়ে সাঁওতালী ভুরি সাজতে কোনো অসুবিধেই হচ্ছে না মমতার।

বললাম—ভাষার কোনো ডিফিকালটি?

: না-না। একটু দেহাতী টানের হিন্দী এই যা, অসুবিধে কিছু নেই।

অবশ্য তাঁকে এই ব্যাপারে ইইনিটের সবাই-ই খুব সাহায্য করেছেন। মৃণালবাবু থেকে শুরু করে অরুণ কাউল কে-ই নয়াজন জানেশ মুখার্জী সাধু মেহের হিরো মিঠুন চক্রবর্তী মেক-আপম্যান বেবীদা সবাই।

সুতরাং উদয়-অমলা কন্যা নৃত্যশিল্পী মমতা শংকর অভিনেত্রী হবার পথে কিন্তু অভিনেত্রী। সাফল্যের চাবিকাঠিগুলো তাঁর হাতে থাকলেও —ছবি করার ব্যাপারে সিলেকটিভ হতেই হবে। বাজে ছবিতে কাজ করে বদনাম করতে যাব কেন? করবই না। তার চাইতে কম ছবি করব।

এই সিদ্ধান্তে অচল এবং চরিত্র নির্বাচন সঠিক হলে মমতার এগিয়ে যাওয়া কে আটকাবে?

নির্মল ধর

সম্প্রতি শিমলেজলা থেকে দীর্ঘ তের দিনের একটানা আউটডোর শুটিং করে কলকাতায় ফিরেছেন পরিচালক নির্মল মিত্র—ছবির নাম 'পরিচয়'। এই আউটডোর শুটিং-এ অংশ নিয়েছিলেন যে-সব শিল্পী তাঁরা হচ্ছেন যথাক্রমে অনিল চট্টোপাধ্যায় আরতি ভট্টাচার্য সুমিত্রা মুখোপাধ্যায় মহুয়া রায়চৌধুরী বীণা মিত্র রুমা গুহঠাকুরতা শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় দীপঙ্কর দে সন্তু মুখার্জি ও বসন্ত চৌধুরী। পরিচয় ছবির চিত্রগ্রহণ করছেন ধ্রুবজ্যোতি বসু।

পরিচালক অজয় কর এখন মেদিনীপুরের মহিষাদলে (খবর লেখার সময় পর্যন্ত) নতুন ছবির আউটডোর শুটিং করছেন। এই বহিদৃশ্যে অংশ নিচ্ছেন সুচিত্রা সেন, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়

শৈলেন মুখোপাধ্যায় মাষ্টার জমিদার সমিত ভঞ্জ উৎপল দত্ত ও দিলীপ বসু। এ ছবির চিত্রগ্রহণ শেষ। সঙ্গীত রচালনা করছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। চিত্রগ্রহন করছেন বিমু চক্রবর্তী।

সম্প্রতি নিউ থিয়েটার্স স্টুডিও রতন ফিল্ম কর্পোরেশনের ব্যানারে জয় সন্তোষ কাহিনীতে 'ধনরাজ তামাং' নামে একটি ছবির শুভ মহরৎ অনুষ্ঠিত হয়েছে। সুপরিচিত চিত্রনাট্যকার ছবিটি পরিচালনা করবেন পীযূষ বসু। ছবির প্রধান দুটি চরিত্রে অভিনয় করবেন উত্তমকুমার ও মালা সিনহা। চিত্রগ্রহণ করছেন গোপাল বসু।

পরিচালক অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় মার্চ মাসে গোড়ায় শংকরের কাহিনীতে মন্ত্রমুগ্ধ ছবিটি নির্মাণের কাজ আরম্ভ করবেন বলে শুটিং ডেট নিয়েছেন। এবার কাহিনীর চিত্রনাট্য করেছেন অরুণ মুখোপাধ্যায়। অভিনয় করবেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় রঞ্জিৎ মল্লিক উৎপল দত্ত শেফালী সেন রবি ঘোষ। মন্ত্রমুগ্ধর সঙ্গীত পরিচালনা করবেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

পরিচালক মৃণাল চক্রবর্তী নিজে স্পাই নামে একটি ছবির শুটিং আরম্ভ করতে চলেছেন উত্তমকুমারকে প্রধান ভূমিকায় রেখে। সম্প্রতি জানা গেল তিনি 'স্পিস্টার' নামে একটি ছবি প্রযোজনাও করবেন। 'স্পিস্টার' ছবির প্রধান চরিত্রে অভিনয় করবেন উত্তমকুমার, উৎপল দত্ত, সুপ্রিয়া দেবী। সঙ্গীত পরিচালনা করবেন সলিল চৌধুরী। 'স্পিস্টার' পরিচালনা করবেন পীযূষ বসু।

টেকনিশিয়ান্স স্টুডিওতে সম্প্রতি বিমল মিত্রের কাহিনীতে হাতে রইল তিন' নামে একটি নতুন ছবির শুটিং আরম্ভ হয়েছে। ছবিটি পরিচালনা করছেন তরুণ পরিচালক সরিৎ ব্যানার্জি। চিত্রনাট্য লিখেছেন সলিল সেন। এতে নায়ক ও নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করছেন রঞ্জিৎ মল্লিক এবং সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়। অন্যান্য চরিত্রে আছেন দিলীপ রায়, কমল গাঙ্গুলী, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, গীতা দে, জহর রায়, তপেন চ্যাটার্জি প্রভৃতি শিল্পী। সঙ্গীত পরিচালনা করছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। চিত্রগ্রহণ করছেন দীপক দাস।

রঞ্জন মজুমদারের পরিচালনায় সম্প্রতি সোনায় সোহাগা' ছবির শুটিং আরম্ভ হয়েছে। এতে অভিনয় করছেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, তরুণকুমার, রবি ঘোষ, গীতা দে, পূর্ণিমা দেবী, তপন দত্ত, মানা দে, নবাগত নায়ক-নায়িকা চিরঞ্জীৎ এবং তন্দ্রিমা বিশ্বাস, বৈদ্যনাথ ব্যানার্জি, অনু দত্ত, সুশীল চক্রবর্তী, সুশীল দাস এবং অন্যান্যরা। এ-মাসের শেষাশেষি এই ছবির পরবর্তী শুটিং আরম্ভ হবে। তাতে কলকাতার প্রভূত নামজাদা শিল্পী অভিনয় করবেন বলে জানা গেছে। সোনায় সোহাগায় সঙ্গীত পরিচালনা করছেন অজয় দাস। চিত্রগ্রহণ করছেন ধনজ্যোতি বসু।

মনোজিৎ

পরিচয়

শংকর, ভারতী, শংকর, সুমিত্রা মহুয়া, সন্তু ও অনিল চ্যাটার্জি

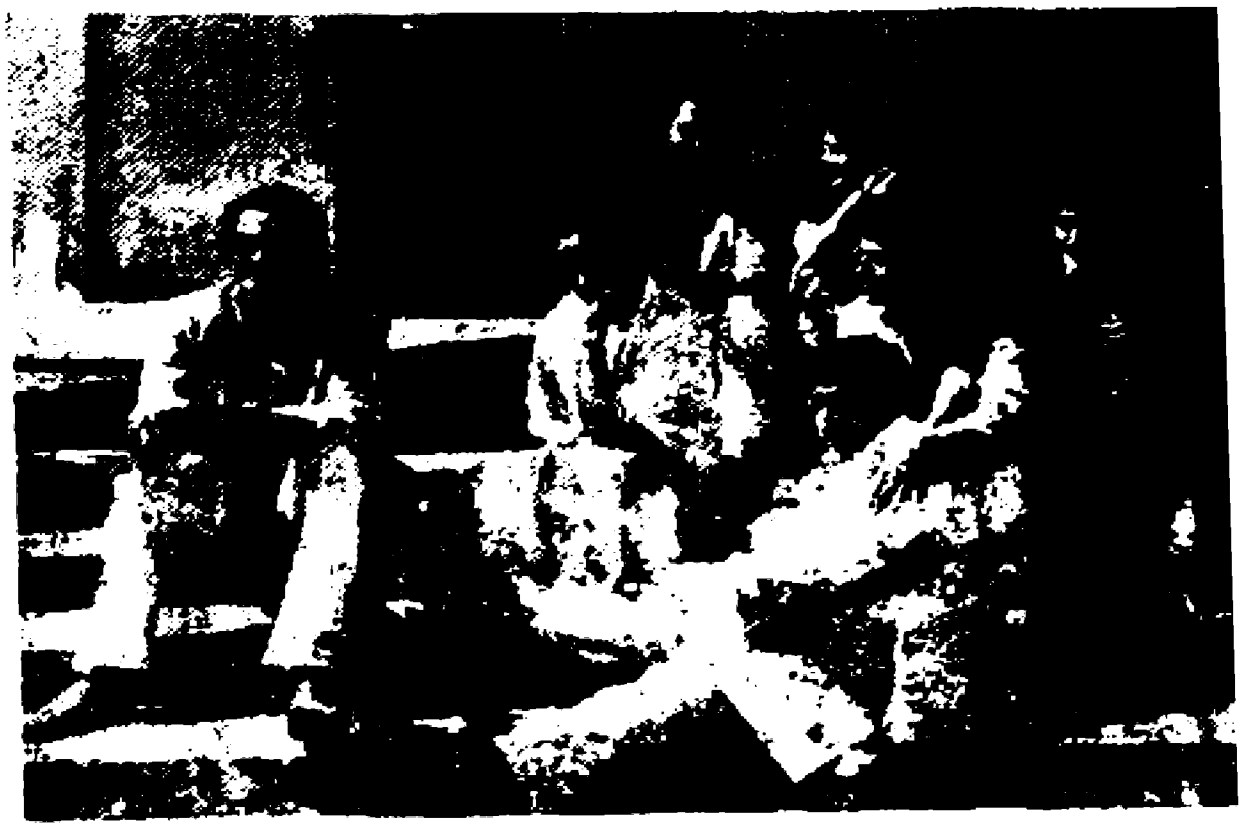

গঙ্গাধর নস্কর

মৃণাল সেনের ছবির সম্পাদক হিসাবেই খ্যাতি পেয়েছেন মধ্যবয়স্ক গঙ্গাধর নস্কর। ছবির জগতে তাঁর আসা নিতান্তই জীবিকার প্রয়োজনে। সম্মান-প্রাপ্তি তাঁর উপরি পাওনা বলা যায়। দুবেলা খাবার জোগাড়ের জন্য এখনও সংগ্রাম করতে হচ্ছে তাঁকে।

এই সংগ্রাম শুরু হয়েছিল আট-চল্লিশ সালে, যখন তিনি নিউ থিয়েটার্সের কর্মচারী হয়ে পঁয়ত্রিশ টাকা মাইনের ঢুকেছিলেন। কয়েক বছর পরে নিউ থিয়েটার্স বন্ধ হয়ে গেল আবার বেরোতে হোল পথে। অবশ্য ইতিমধ্যে কাঁচকাঁচ (সুবোধ মিত্র), হরিদাস মহলনবীশ, সুবোধ রায়ের সঙ্গে কাজ করে অভিজ্ঞ হয়েছেন সম্পাদনার কাজে।

কেমন অভিজ্ঞ তাঁর একটা কথাতেই বোঝা গেল। সম্পাদনার সঙ্গে চলচ্চিত্র নির্মাণের সম্পর্ক কিরকম জানতে চাইলে তিনি বললেন—'একটা সুন্দর মূর্তি তৈরীতে 'ফিনিশিং টাচ্' যেরকম প্রায় একই ধরনের কাজ সম্পাদনার। ক্যামেরা-ম্যান পরিচালকের নির্দেশমত টুকরো টুকরো অনেক দৃশ্য গ্রহণ করে ফেলে দেন সম্পাদকের সামনে। সেগুলোকে সুন্দরভাবে সাজানোই কাজ। অবশ্য এই কাজে পরিচালকের নির্দেশ মানতেই হয় তাঁকে।

জীবন আর জীবিকার ইতিহাস বলতে বলতে গঙ্গাধরবাবুর মুখ থেকে অনেক কথা শোনা হল, বোঝা গেল ফিল্ম লাইনের পলিটিকস, গ্রুপ পুলিং ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত মর্মাহত।

তখন সুবোধ রায়ের সঙ্গে গঙ্গাধর-বাবু কাজ করছেন। মৃণাল সেনের কাছ থেকে ডাক পেলেন তাঁর সঙ্গে স্বাধীনভাবে কাজ করার। সুবোধ রায়ের কাছে যে পাড়তে তিনি নাকি ওঁকে বলেছিলেন 'নো রিস্ক, নো গেন—সময়ে পড়।'

সেই থেকেই আছেন মৃণালের ইউনিটে। 'পুনশ্চ' থেকে পরবর্তী ছবিরই সম্পাদক তিনি। সেরা কা জন্য বি-এফ-জে-এর পুরস্কার পেয়ে তিন-তিনবার। ভুবন সোম, কলকাতা কে বলে। রাজ্য সরকারী পুর পেয়েছেন একবার 'পদাতিক' ছবির জ

প্রশংসা আর সম্মানের ব মাথায় নিয়ে আজ তিনি উদ্বিগ্ন অনাত্ম খাতনামা চিত্র-সম্পাদক। দুঃখের খবর— কাজ তেমন পাচ্ছেন কারণটা জানতে চাইলে বললেন—স পেয়েই মুশকিল হয়েছে আমার। প্রাক্তারি প্রোডিউসাররা ভাবেন আ রেট বোধহয় খুব বেশী, আসেন না অনেকে। কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়। প্রোডিউসারদের কাজ করব না এমন প্রতিজ্ঞা নেই আমার।'

এবং সেই কারণেই আটচল্লিশ পঞ্চান্নটি টাকা মাইনে পেয়ে সা যেভাবে চালিয়েছেন এখন রোজগার হলেও চার ছেলেমেয়ের পড়ার চালিয়ে ছজনের সংসার টানা কষ্ট দাঁড়িয়েছে। ভাগ্যিস, পশ্চিম পুটিয়ার মাথার ওপর একটু ছাদ তুলতে পেরে নইলে.....।

নিরী

নাটমঞ্চ

বি এফ জে-এর শ্রেষ্ঠ স্বীকৃতি

বি-এফ-জে-এর বাসন্তী ভেষ্টে শ্যাম বেনেগলের 'নিশান্ত' ১৯৭৫ সালের শ্রেষ্ঠ ছবি বলে চিহ্নিত হয়েছে। ভারতীয় অন্যান্য শ্রেষ্ঠ চারটি চলচ্চিত্র হচ্ছে : সংসার সীমান্তে, পালঙ্ক, অভিজ্ঞান এবং মিলি। বিদেশী শ্রেষ্ঠ ছবি হল সইজেনের দি টাচ। বাংলা ছবির শ্রেষ্ঠ পরিচালক তপন মজুমদার (সংসার সীমান্তে)। হিন্দী ছবি শ্রেষ্ঠ পরিচালক শ্যাম বেনেগল (নিশান্ত) বিদেশী ছবির শ্রেষ্ঠ পরিচালক ইঙ্গমার বার্জম্যান (দি টাচ) বাংলা ছবির শ্রেষ্ঠ অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় (সংসার সীমান্তে) হিন্দী ছবির শ্রেষ্ঠ অভিনেতা অমিতাভ বচ্চন (মিলি) বাংলা ছবির শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী সন্ধ্যা রায় (সংসার সীমান্তে) হিন্দী ছবির শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী সুচিত্রা সেন (আঁধি) বাংলা ছবিতে শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেতা অনিল চট্টোপাধ্যায় (রঙ্গা) হিন্দী ছবির শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেতা অমজাদ খাঁ (শোলে) বাংলা ছবির শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেত্রী অর্চনা ভট্টাচার্য (আমি সে ও সখা) হিন্দী ছবির শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেত্রী নাজিরা (জুলি) বাংলা ও হিন্দী ছবির শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত পরিচালক সুধীন দাশগুপ্ত (পালঙ্ক) হিন্দী ছবির রাজেশ রোশন (জুলি) বাংলা ও হিন্দী ছবির শ্রেষ্ঠ গীতিকার যথাক্রমে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার (সন্ন্যাসী রাজা) এবং আনন্দ বকসী (জুলি) বাংলা ও হিন্দী ছবির শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রকার যথাক্রমে রাজেন তরফদার (সংসার সীমান্তে) এবং কিরণ ভগুলকর (নিশান্ত) বাংলা ছবির শ্রেষ্ঠ আলোকচিত্র শিল্পী (সাদা কালো) এ সি বাজা (সংসার সীমান্তে) শ্রেষ্ঠ রঙীন ছবি হিন্দীতে ধারোকা দিভোচার (শোলে)। শ্রেষ্ঠ নেপথ্য সঙ্গীতে বাংলা ছবিতে হেমন্ত মুখার্জী (প্রিয় বান্ধবী) অরিজিত মুখার্জি (ছুটির কাটে) হিন্দীতে লতা মঙ্গেশকর (অর সন্তোষী মা) ও উষা মঙ্গেশকর (অর সন্তোষী মা) বিশেষ পুরস্কার লক্ষ্মী (জুলি)।

রয়েডের দুটি সফল প্রযোজনা : দুটি ভিন্ন স্বাদের একাঙ্কিকা সম্প্রতি মুক্তঙ্গন মঞ্চে পরিবেশন করে মুক্তাঙ্গনের শিল্পীরা নাট্যানুরাগীদের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেছেন। শ্রীঅচিন্ত্য রচিত এ দুটি একাঙ্কিকার নাম হোল 'বিদেহীর শপথ' ও এরপর'।

'বিদেহীর শপথ' নাটকটি বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার ওপর ভিত্তি করে লেখা। ধূর্ত লোভী সুবিধাভোগী নেতা ধনঞ্জয় নিজের স্বার্থের জন্য নিরীহ মানুষগুলোকে খুন করিয়ে লাস ঘরে জমা করে। তার সুবোধ রায় তার এই জঘন্য হত্যা-ষড়যন্ত্রের প্রধান সাহায্যকারী। বিদেহীদের প্রতিনিধি মৃত্যুঞ্জয় এই অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। সেই প্রতিবাদের সুর প্রতিধ্বনিত হয় জনে জনে। নাটকটির বক্তব্য বলিষ্ঠ। নাটকে চিন্তার গভীরতা আছে।

জগৎ চরিত্রে নির্মাল্য কাঞ্জিলাল ও প্রকৃষ্ণা চরিত্রে শিবাজী দাশগুপ্তর অভিনয় উচ্চমানের। রামু গৌতম ঘোষ ও মৃত্যুঞ্জয় চন্দন ঘোষ মন্দ নয়। সুবোধ রায় চরিত্রে নির্দেশক স্বপন ঘোষের অভিনয় খুবই দুর্বল। অভিনয় করতে করতে তাকে কয়েক জায়গায় হাসতে দেখা গেছে। অভিনয়ে যথেষ্ট জড়তা আছে। কিন্তু নির্দেশনার ক্ষেত্রে তাঁর সুচিন্তিত মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে।

ধনঞ্জয়ের ইশ্বর হয়ে যাওয়ার জায়গায় ফর্ম এবং কম্পোজিশন মনে রাখার মত। শেষ কম্পোজিশন সুন্দর।

কমল দত্ত ও জয় সেনের আলো সুন্দর। মঞ্চশিল্প সুধীরঞ্জন ও শৈলেন সাহা সার্থকতার দাবী রাখে। মানস করের মিউজিক আরো ভালো হওয়া উচিত ছিল।

'এরপর' নাটকটি পরীক্ষামূলক। নাটকের বক্তব্য বলিষ্ঠ। নতুন ফর্মে লেখা। নাটক রচনায় নাট্যকারের যথেষ্ট মুন্সীয়ানা আছে।

একটি গোষ্ঠী জার্মানীর পটভূমিকায় একটি নাটক মঞ্চস্থ করতে আসে। কিন্তু নাটকটি আর শেষপর্যন্ত মঞ্চস্থ হয় না। নাট্য শিল্পীদের ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখ-বেদনার চিত্র বারবার ফুটে ওঠে। ইতিহাসের কিছু অংশ অভিনয়ের পরেই আসে বাস্তবের ঘটনা। এইভাবে কিছুক্ষণ চলতে চলতে আসে প্রম্পটার শ্যামলের ছোট ছেলের মৃত্যুর খবর। আলোক শিল্পী ঘন্টুর চিন্তা থেকে জন্ম নেয় একটি নতুন নাটকের। সেখানে ইতিহাসকে টেনে এনে বাস্তবের সঙ্গে তুলনামূলক বিচার করে দেখান হয়। রেখাটিনাল ফর্ম নাটকে মাঝে মাঝেই ব্যবহার করা হয়েছে। ব্যবহারের প্রয়োগ সুন্দর। অ্যালিনিয়েশনের কায়দা সত্যিই প্রশংসনীয়। প্লেয়ারিং ও আর্থারকে দিয়ে যে মুহূর্তটি সৃষ্টি করা হয়েছিল সেটি অবশ্যই মনে রাখার মত। শেষ দৃশ্যের কম্পোজিশন যে কোন প্রথম শ্রেণীর নির্দেশনার দাবী রাখে। এই নাটকের টিমওয়ার্ক খুবই উচ্চমানের। কম্পোজিশন এবং উপস্থাপনার গুণে নাটকটি সুন্দর করতে সাহায্য করেছে।

গোয়ারিং চরিত্রে মানস কর, মাতৃ আর্থার চরিত্রে বাবু দাশগুপ্ত শ্যামল চরিত্রে রবীন্দ্রনাথ কুন্ডু, বিশু চরিত্রে শিবাজী দাশগুপ্ত ও মনোজ চরিত্রে গৌতম ঘোষের অভিনয় উচ্চমানের। মানিক চরিত্রে কৃষ্ণেন্দু ভট্টাচার্য ভাল। মিঃ খান চরিত্র কল্যাণ দাস, মিঃ বোস চরিত্রে নির্মাল্য কাঞ্জিলাল এবং রবি চরিত্রে চন্দন ঘোষ মন্দ নয়। ঘন্টু চরিত্রে সোমেন সুরের অভিনয় আরো ভাল হওয়া উচিত ছিল। রতন (সৈনিক) চরিত্রে গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয় মন্দ নয়। হাঁটা-চলা আরো স্মার্ট হলে অভিনয়ের মান আরো ভাল হতে পারত। লালু চরিত্রে দেবব্রত মজুমদারকে এদের অভিনয়ের সামনে অনেক দুর্বল মনে হয়েছে।

নির্দেশনার দায়িত্বে অচিন্ত্য সার্থকতার দাবী রাখে। তার কম্পোজিশন সেন্স সত্যিই সুন্দর।

নাট্যসমালোচক

শতবর্ষের শরণায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এই মনোমোহন থিয়েটারেই ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে সাজাহান আর প্রফুল্ল নাটকের সম্মিলিত অভিনয়ে শিশিরকুমার আর দানীবাবুর মধ্যে অভিনয়ের দ্বন্দ্ব দিয়ে সে কাহিনী শুরু হয়—বাংলার নাট্যজগতে তা বিশেষভাবে আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং শেষ পর্যন্ত শিশিরকুমারের সঙ্গে পুরাতন স্বত্বাধিকারীদের বিরাট ব্যবধানের সৃষ্টি হয়। ৩রা ও ৫ই আগষ্ট, ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে যথাক্রমে সাজাহান আর প্রফুল্ল নাটকের অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়।

সাজাহান নাটকের একটি দৃশ্যে সাজাহানরূপী শিশিরকুমার আওরেঙ্গজেবরূপী দানীবাবুকে বলেন, বাছা বড় রোগা

অভিনেতৃ সংঘের গৃহদাহ স্মিতা সেন, শতীন্দ্র ভট্টাচার্য ও দিলীপ রায়। পরিচালনা। শ্যামল সেন। অমৃত ফটো।

হয়ে গেছো। এই সংলাপ নাটক-বহির্ভূত ছিল এই দানীবাবুকে আঘাত করার জন্যই শিশিরকুমার এই সংলাপ বলেন। দানীবাবুর অনুগত শিষ্য নির্মলেন্দু লাহিড়ী অভিনয় করেন দিলদার চরিত্রে। তিনি এই অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ সন্ধানে রইলেন প্রফুল্ল নাটকের অভিনয়ের সময়। দানীবাবু নিজেও এবিষয়ে সতর্ক হয়ে রইলেন। প্রফুল্ল নাটকের অভিনয়ে একটি দৃশ্যে রমেশকে (শিশিরকুমার) উদ্দেশ্য করে দানীবাবু (যোগেশ) বলবেন, ভালমোর ভাইরে চাঁদরে! কিন্তু তাঁকে তা বলার কোন সুযোগ না দিয়ে রমেশরূপী শিশিরকুমার যোগেশকে দেখে বলেন, কি! এখানে আবার কি মাতলামো করতে এসেছো?' দানীবাবু প্রস্তুত ছিলেন। নিজেকে সামলে নিয়ে শিশিরকুমারের চিবুক ধরে আস্তে আস্তে বলেন 'বাঃ উকিল কী চীজ।' তারপর একটু বাঁজ চীৎকার করে বলেন 'যেদো, ধর ধর তোর কাকাবাবুকে ধর।' দর্শকসমাজ দানীবাবুর প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে উল্লসিত হয়ে উঠলেন। এই নাটকেই আর একটি দৃশ্যে নির্মলেন্দু লাহিড়ীকে লক্ষ্য করে শিশিরকুমার বলেন 'বাঃ ছোকরা! মাস্তারটা খেয়ে বেশ গোলগাল চেহারাটি হয়েছে তো!" নির্মলেন্দু ভবদহরির চরিত্রে অভিনয় করেন। নির্মলেন্দু উত্তর দিলেন, 'এই দু টাকার মদ আর আড়াই টাকার পাঁটা খেয়ে এমন গোলগাল হয়েছি।' শিশিরকুমার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেন, 'ওহে ছোকরা দু' টাকায় এখন আর মদ পাওয়া যায় না।' নির্মলেন্দু প্রত্যুত্তরে বলেন, 'মদের কথা দাদা তুমি যেমনটি জানবে, এমন আর কে জানবে বল?"

সমগ্র নাট্যগৃহ করতালি ধ্বনিতে ফেটে পড়ে। নাট্যকার ও কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ছিলেন নির্মলেন্দুর মামা। দ্বিজেন্দ্রলালের 'সীতা' নাটক নিয়ে শিশিরকুমার কলকাতা ইডেন গার্ডেন প্রদর্শনীতে অভিনয় করে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। দ্বিজেন্দ্রলালের 'সীতা' নিয়ে মনমোহন আত্মপ্রকাশের ইচ্ছা ছিল। কিন্তু সে ইচ্ছা ফলবতী না হওয়াতেই তিনি যোগেশ চৌধুরীকে দিয়ে সীতা নাটক লিখিয়ে মনমোহনে মঞ্চস্থ করেন। তাই এবিষয়ে দ্বিজেন্দ্রলালের ভাগ্নীদের ওপর ক্ষোভও ছিল। আর একটি দৃশ্যে রমেশ বেশী শিশিরকুমার নির্মলেন্দুকে দু' টাকার লোভ দেখিয়ে মন্ত্রকেচাঁদ ধুন্ধুরিয়া সাজতে বললে নির্মলেন্দু বলেন, 'দু টাকায় শিশির অদুড়ী সাজা যায়—মন্ত্রকেচাঁদ ধুন্ধুরিয়া সাজা যায় না।" এই ঘটনার পর শিশিরকুমার আর দানীবাবুকে ঘিরে পৃথকভাবে দুটি দল গড়ে ওঠে।

১৯২৯ খৃষ্টাব্দের ২৫ ডিসেম্বর মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের জাহাঙ্গীর নাটকের নাম-ভূমিকায় দানীবাবু অভিনয় করেন। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ২৪ ডিসেম্বর মন্মথ হলো মন্মথ রায়ের কারাগার। বসুদেব চরিত্রে অভিনয় করলেন দানীবাবু। ২৬ রজনী অভিনীত হবার পর তদানীন্তন বিদেশীয় সরকার কারাগারের অভিনয় বন্ধ করে দেন।

ইতিমধ্যে মনমোহন থিয়েটারকে ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট কর্তৃক ধূলিসাৎ করা হয়। মনমোহন থিয়েটারের স্থানেই ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বিনোদিনীর আগে নূতন স্টার থিয়েটার—৩৭ বছর বাদে সেই থিয়েটার চিত্তরঞ্জন এভেনিউর গর্ভে বিলীন হয়ে যায়।

মনমোহনের প্রযোজক রূপে শেষ পর্যন্ত প্রবোধচন্দ্র গুহ ঠাকুরতা ছিলেন। অবশ্য প্রকাশ্যে তাঁর পুত্র সুধীর গুহের নামই বিজ্ঞাপিত হতো।

প্রবোধচন্দ্র গুহঠাকুরতার প্রচেষ্টায় (বর্তমান বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চের স্থানে) গড়ে উঠলো বাংলার আর একটি নতুন নাট্য দেউল নাট্যনিকেতন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দের ১৬ই মার্চ নাট্যনিকেতনের উদ্বোধন করা হয়। ১৬ মার্চ অনুষ্ঠিত ঐ বক্তৃতা ও আবৃত্তি। দানীবাবু জগৎশেঠ ও গদাধর চরিত্র থেকে আবৃত্তি করেন। ২৫ মার্চ প্রবোধবাবু নতুন নাটক মঞ্চস্থ হয়। দানীবাবুরও অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করার কথা। কিন্তু তিনি মনমোহনের চুক্তি বাতিল করে নতুন চুক্তি সম্পাদনের প্রস্তাব দিলেন। প্রবোধবাবু তাতে স্বীকৃত হলেন না। প্রবোধবাবুর কাছে দানীবাবুর বহু টাকা পাওনা ছিল। তাই শেষ পর্যন্ত নাট্য-নিকেতনের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করলেন তিনি। কিছুদিন দানীবাবু বাড়ীতেই বসে থাকেন। পুরাতন শিষ্যরা দানীবাবুকে অধি-নায়ক পদে বরণ করে একটি নতুন সম্প্রদায় গঠনের প্রস্তাব করেন। সাংবাদিক অমর রায় অরূপসুন্দরী, কেষ্টবাবু, নুনীবাবু প্রভৃতি অনেক বহুজন এই দলে ছিলেন। শেষ পর্যন্ত এমনি কেন দল গঠিত হয় না। তবে সম্মিলিত অভিনয়ে শিশিরকুমার আমেরিকা থেকে প্রত্যাবর্তন করলে নাট্যনিকেতনে দানীবাবু কয়েকটি অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন। এই সময় শিশির সম্প্রদায়ের সাহায্যার্থেই তিন রাত্রি চন্দ্রগুপ্ত, প্রফুল্ল ও সাজাহান নাটক অভিনীত হয়। শিশির-কুমারের অসুস্থতাবশতঃ চতুর্থ রজনীতে নির্ধারিত বলিদান নাটকের অভিনয় বাতিল হয়ে যায়। তবে ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ২০ জুলাই প্রবোধ গুহ মশায়ের উদ্যোগে বলিদান অভিনীত হয়। দানীবাবু করুণাময় চরিত্র অভিনয় করেন। সম্মিলিত অভিনয়ে বৃদ্ধ বয়সেও দানীবাবু নতুন করে সাড়া জাগান। শেষ নির্বাণের পূর্বে যেন প্রজ্বলিত হয়ে ওঠা। অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আর্ট

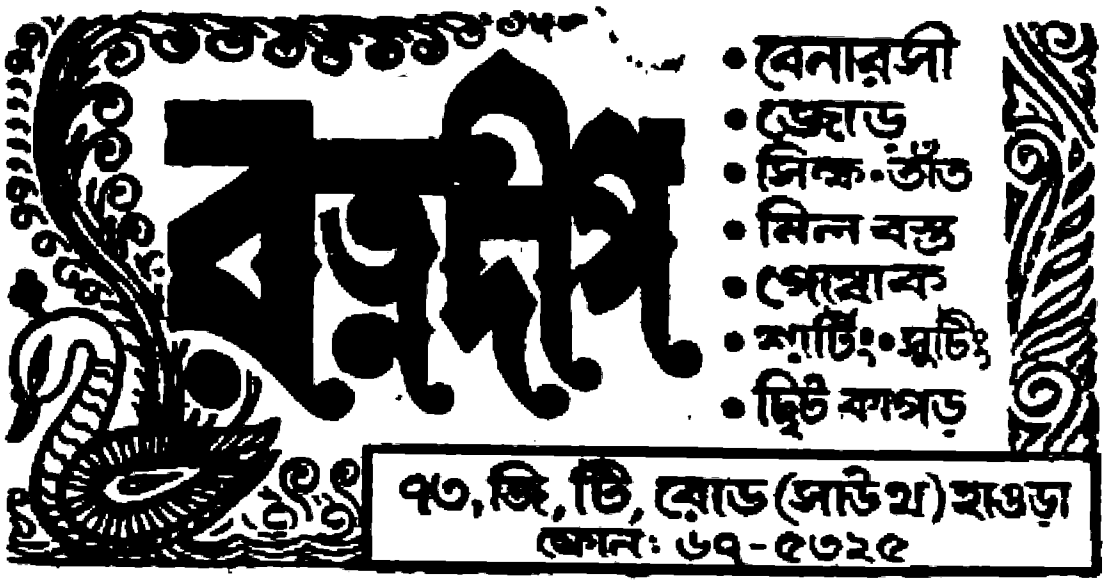

থিয়েটারে। (স্টার) নিয়ে এলেন দানীবাবুকে। এখানে মন্দোক্তিতে মধুরা চরিত্রে প্রথম অভিনয় করেন। মূল অভিনেতা ছিলেন তেনকড়ি চক্রবর্তী। দানীবাবু সম্পূর্ণ নতুন-ভাবে চরিত্রটিকে রূপায়িত করে তোলেন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দের ১৮ সেপ্টেম্বর স্টারে শ্রীগৌরাঙ্গ নাটকে চাপাল-গোপাল চরিত্রে দানীবাবুর অভিনয় উল্লেখযোগ্য নাটকীয় হিসেবে অভিনন্দিত হয়। রায় রামানন্দ চরিত্রও দানীবাবু অভিনয় করেন।

১৯০২ খৃষ্টাব্দের ১২ মার্চ অনরেবল সেবীর পোষাপুত্র নাটকে শ্যামাকান্ত চরিত্রে দানীবাবুর অভিনয় নবীন নাট্যামোদীদেরও বিস্মিত করে। যে নাচঘর শিশিরকুমারের আবির্ভাবের পর দানীবাবুকে নানান বিরূপভাবে সমালোচনা করতো সেই নাচঘর পত্রিকাও শ্যামাকান্তের চরিত্র দানীবাবুর অভিনয়-প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। অমৃতলাল পত্রিকা মন্তব্য করেন যে, দানীবাবু যেন তাঁর যৌবনের দিনগুলিতে ফিরে এসেছেন। সত্যিকার অভিনয় প্রতিভা বয়সের সীমারেখার মধ্যে গণ্ডিবদ্ধ নয়। দানীবাবুর বর্তমান অভিনয় তাঁর পিতার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। (ক্রমশঃ)

কালীশ মুখোপাধ্যায়

বিবিধ সংবাদ

ঝিনুরী পুরস্কার

পশ্চিমবঙ্গ ড্রামা আর্টিস্টস এ্যাসোসিয়েশন ঝিনারীর বিচারে পেশাদার অ-পেশাদার, যাত্রা ও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ক্ষেত্রে ১৯৭৫ সালে যে সব নাট্যকার, নাট্যকার, শিল্পী ও কলাকুশলী পুরস্কার লাভ করেছেন তাঁদের নাম নীচে দেওয়া হোল।

ঝিনারীর উদ্যোগে এটি ৮ম বার্ষিক পুরস্কার-ঘোষণা।

পেশাদার : শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা : কৃষ্ণকান্তের উইল (স্টার), নাট্যকার : সমর মুখোপাধ্যায় (বিবর), পরিচালক : জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় (না), সঙ্গীত পরিচালক : চণ্ডীদাস বসু (কৃষ্ণকান্তের উইল), আলোকচিত্রী : কার্তিক সেন (বিবর), শিল্প নির্দেশক : সন্তোষ সরকার (কৃষ্ণকান্তের উইল), অভিনেতা : তারু ভট্টাচার্য (ছোটা মরজা), পার্শ্ব অভিনেতা : জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় (না), কৌতুকাভিনেতা : চিন্ময় রায় (বিবর), অভিনেত্রী : মাধবী চক্রবর্তী (না), পার্শ্ব অভিনেত্রী : অলকা গাঙ্গুলী (না)।

যাত্রা : শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা : যোগ বিয়োগ (মোহন অপেরা), পালাকার : রজেন্দ্রকুমার দে (কাজীর বিচার), পরিচালক : শৈলেশ গুহনিয়োগী (এক দিন রাত্রে), সঙ্গীত পরিচালক : শ্যামল মিত্র (বিবি আনন্দময়ী), আলোকচিত্রী : বাদল চক্রবর্তী (মায়ামৃগ), অভিনেতা : পান্না চক্রবর্তী (আমি মা হতে চাই) এবং জহর রায় (পবিত্র পাপী), চরিত্রাভিনেতা : দিলীপ চট্টোপাধ্যায় (পঞ্চপাল), পার্শ্ব অভিনেতা : অসীমকুমার (বিবি আনন্দময়ী), অভিনেত্রী : বেলালী ব্যানার্জী (সীমান্ত) এবং স্বপ্নাকুমারী (স্ত্রী), চরিত্রাভিনেত্রী : ছবি রায় (সতী করুণাময়ী), পার্শ্ব চরিত্রাভিনেত্রী : বীণা ঘোষ (মায়ামৃগ), খল নায়ক : শিবদাস মুখোর্জী (সীমান্ত), গায়ক অভিনেতা : শ্যামাপ্রসাদ ব্যানার্জী (যোগ বিয়োগ)।

অ-পেশাদার : শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা : আন্তিগোনে (নান্দীকার), নাট্যকার : চিত্তরঞ্জন ঘোষ (আন্তিগোনে)। একাঙ্ক নাটকের নাট্যকার : বিমল ব্যানার্জী (একটি ব্যক্তিগত গল্প), পরিচালক : বিশু চট্টোর্জী (শরৎচন্দ্র), সঙ্গীত পরিচালক : প্রশান্ত ভট্টাচার্য (স্বদেশী নকসা), শিল্প পরিচালক : প্রদীপ ভট্টাচার্য (লৌকনিক), আলোকচিত্রী : কাশীনাথ পাল (শরৎচন্দ্র) অভিনেতা : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় (আন্তিগোনে), পার্শ্ব চরিত্র : শিবশঙ্কর ঘোষ (রামযাত্রা) অভিনেত্রী : কেয়া চক্রবর্তী (আন্তিগোনে), পার্শ্ব চরিত্রাভিনেত্রী : রাণু রায় (শরৎচন্দ্র)।

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত : শ্রেষ্ঠ কণ্ঠ সঙ্গীত : কানাইদাস বৈরাগী এবং শ্রীমতী গৌরী ভট্টাচার্য, সেতার : কাশীনাথ মুখার্জী, সরোদ : বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, বাঁশী : অলোকনাথ দে, তবলা : শ্যামল বসু, সারেঙ্গী : রমেশ মিশ্র, কত্থক নৃত্য : মায়া চট্টোর্জী এবং ভারতনাট্যম : ছায়া হালদার।

সন্ন্যাসী রাজার সুবর্ণ জয়ন্তী : গত ১৫ ফেব্রুয়ারী ইণ্ডিয়া ফিল্ম লাবরেটরীতে অনুষ্ঠিত এক মনোজ্ঞ প্রভাতী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে 'সন্ন্যাসী রাজা'র সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব পালিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীমতী কানন দেবী। এই উপলক্ষে ছবির বিভিন্ন শিল্পী ও কলাকুশলীদের পুরস্কৃত করা হয়।

আর্ট সেন্টার-এর পুনরাবর্তন উৎসব : রবীন্দ্র গৃহঠাকুরতার প্রযোজনায় ১৮ জানুয়ারী ৭৬ মহাজাতি সদনে আর্ট সেন্টার অফ দি ওয়ারফ্রন্ট-এর ৩৭শ বার্ষিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে খেয়াল গানসহ রবীন্দ্র নজরুল ও অতুলপ্রসাদের বিভিন্ন গানের সঙ্গে সমবেত নৃত্যে ৬০ জন ছাত্রীর দ্বারা সমবেত গীতনৃত্য ও বাদন ও বাঁশির টপায়ে (ব্যালে) সহ সাজিয়ে ঘুড়ি নাচ। গত জীবনের একদিন (পঞ্চপাল-মমতাজ) নৃত্যগুলি খুবই উপভোগ্য হয়েছিল এবং নতুনত্বের সন্ধান দিয়েছে।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান : বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের বেঙ্গলী অ্যাসোসিয়েশন এ বছর সরস্বতী পূজা উপলক্ষে ডঃ এ কে সান্যালের সভাপতিত্বে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। ছাত্রদের এই অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করেন দেবাশীষ দত্ত এবং আবৃত্তি শোনান শঙ্খপ্রসাদ দত্ত। তারপর মারীচ সংবাদ নাটকটি শ্রীগৌতম দাশগুপ্ত এবং অধ্যাপক পি ঘাটকগাঁয়ের পরিচালনায় মঞ্চস্থ হয়। অভিনয়ে যারা উৎকর্ষ দেখান তারা হলেন সর্বশ্রী অপর্ণ ঘাটকগাঁয় অনির্বাণ বসু, এ চক্রবর্তী, বি দত্ত, পি সেন আশীষ দাস, এ পাঠক এবং পি মুখার্জি।

একটি সংশোধন

মঞ্চাভিনয় মঞ্চে নিয়মিত অভিনীত 'বি টি রোডের ধারে' নাটকে কুলকামিনীর মুখে মাতাল হয়ে গাওয়া গানটির গায়িকা শ্রীমতী অনিতা মজুমদার।

মুদ্রণ প্রমাদবশতঃ ৩৬ সংখ্যার অমৃতের সুরের আগুনে সন্তোষ সেনগুপ্তের নিবন্ধে কটি কথা ছাড় হয়ে গেছে। এজন্য আমরা দুঃখিত।

(১) ১৯৫১ সালে ইণ্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেসের অধিবেশনে শ্যামা মঞ্চস্থ হয় আমারই পরিচালনায়। এর আগে রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পর মাত্র দু-চারবার শ্যামা মঞ্চস্থ হয়েছিলো এবং সেবা মিত্রর অভিনয় ছিলো তার প্রধান আকর্ষণ।

পণ্ডিত নেহরু চারবার আমাদের শ্যামা দেখেছেন। প্রথমবার মার্শাল টিটোর সঙ্গে কোলকাতা রাজভবনে ১লা জানুয়ারী ১৯৫৫ সালে এবং বলেছিলেন যতবার শ্যামা দেখবার সুযোগ পান আই উইল লাভ টু সি ইট। রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও ডঃ রাধাকৃষ্ণান প্রাক্তনকালীন রাষ্ট্রপতি ভবনে তাঁদের সামনে রবীন্দ্র নৃত্যনাট্যও পরিবেশন করি।

(২) আর একটা জিনিষ উল্লেখ করা হয়নি রবীন্দ্র সংগীত প্রচারের ক্ষেত্রে আর একটি নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য —গুরু গৃহঠাকুরতা। তিনিই প্রথম গীতবিতান এবং পরে দক্ষিণী (রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষায়তন) স্থাপন করে কোলকাতায় রবীন্দ্রসংগীতের প্রচারকে দ্রুত অগ্রগতির পথে এগিয়ে দিয়েছেন।

(৩) ২১ পাতার প্রথম কলামে ফটোফটে সুন্দর ছেলেটি চিন্ময় চ্যাটার্জি।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস ১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

CENTRAL LIBRARY

সাধনা বিউটি ক্রীম

তাঁর মনোহারিণী সৌন্দর্য!

প্রতিদিনের রূপচর্চায়
সাধনা বিউটি ক্রীম তাঁকে
এনে দিয়েছে
যৌবনসুলভ কমনীয়তা
আর অপরূপ লাবণ্য

একটি অতি আধুনিক
অনন্য অঙ্গরাগ
প্রতিদিনের রূপ-সাধনায়
অপরিহার্য

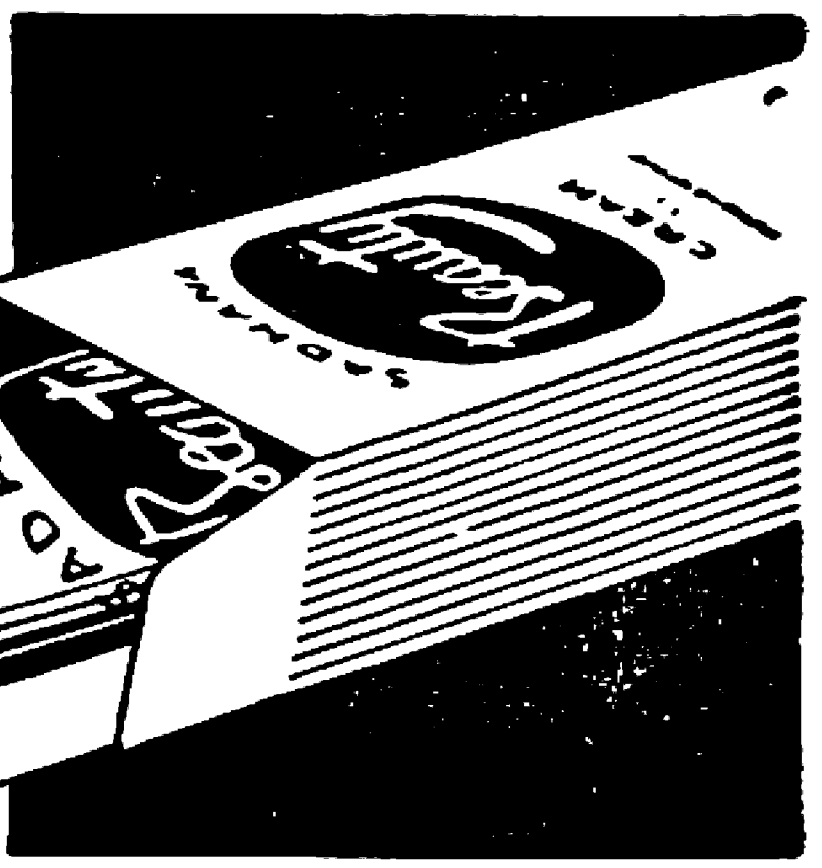

সাধনা
ঔষধালয়
ঢাকা
কলিকাতা-৪৮

সারা ভারতের সর্বত্র

SEC. 5/71

AMRITA

১২৭ বছরের অভিজ্ঞতায়

কুকমী গুঁড়ো মশলা

জনপ্রিয়তার সর্বোচ্চ শিখরে

আমাদের এন্য কোন ব্র্যান্ড ও আছে নেই

কুকমী

গুঁড়ো মশলা

প্রস্তুতকারক :

কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাঃ লিঃ

(স্পাইস পাউডার ডিভিশন)

২৩৫, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা- ৭০০০৭০

পোষ্ট বক্স নং :- বড়বাজার ৬৮৮৫

188/CCB 178

CENTRAL LIBRARY

অমৃত

সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ /

১৯ মার্চ ১৯৭৬ ॥

CENTRAL LIBRARY

প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর

নেস্‌কাফে®

স্বাদে গন্ধে অতুলনীয়

NSC-1/79 BEN

নেস্‌কাফে®

শতকরা ১০০ ভাগ খাঁটি কফি থেকে তৈরী
একমাত্র ইনস্টান্ট কফি

বিশ্বের সর্বাধিক বিক্রীত কফি

একাল চিরকাল

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের সর্বাধুনিক উপন্যাস। একক আর চিরকালের জীবন-সংগ্রামের সর্বোৎকৃষ্ট কাহিনীটির নাম। দাম দশ টাকা।

চিরঞ্জীবের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রয়াস। বিশ্বকাপ ফুটবলের যাবতীয় বিবরণ। দাম পঁচিশ টাকা।

বিশ্বকাপ ফুটবল

থানার মাটি নোনা

নটরাজন-এর শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ। থানার পটভূমিকায় অপরাধ ও অপরাধীর বিচিত্র জীবনযাত্রা। দাম ষোল টাকা।

শক্তিপদ রাজগুরুর অপূর্ব উপন্যাস। আরণ্যক পরিবেশে মানুষের জীবন-যুদ্ধের সংগ্রাম। দাম পঞ্চাশ টাকা।

অভয়ারণ্য

থৈ থৈ হাহাকার

কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস। দাম আঠারো টাকা।

শৈলেশ দে'র স্মরণীয় রচনা।
তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ; প্রতি খণ্ড কুড়ি টাকা।

আমি সুভাষ বলছি

প্রেম ঘৃণা দাহ

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের সর্বাধুনিক উপন্যাস।
প্রেম-ঘৃণা-দাহ— এর কবুণ মধুর কাহিনী। দাম আট টাকা।

বরেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস। বর্তমানের বিভ্রান্ত যুব-মানসের অস্থির দিন যাপনের বিললিপি।
দাম আট টাকা।

ভালোবেসেছিলাম

মধু-বৃন্দাবনে

শঙ্কু মহারাজ-এর সর্বাধুনিক ভ্রমণ-কাহিনী। তিন পর্ব সম্পূর্ণ দাম—ব্রজপর্ব ১০ • বনপর্ব ১০ • মধুবনপর্ব ১২

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের সাহিত্যিক-জীবনের শ্রেষ্ঠতম রচনা। দাম বারো টাকা।

নীলাঙ্গুরীয়

স্বর্ণভ্রমর

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ-প্রবাসী প্রবীণ সাহিত্যিক **ব্রজমাধব ভট্টাচার্যের** নতুন উপন্যাস। দাম চৌদ্দ টাকা।

আবদুল জব্বারের শ্রেষ্ঠতম রচনা। গ্রামবাংলা ও বাঙালির কথা ও কাহিনী। দাম ষোল টাকা।

পল্লীর পদাবলী

ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়ের শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি। ২য় সংস্করণ। দাম পঁচিশ টাকা।

ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব

নারায়ণ সান্যালের নতুন উপন্যাস।
মানুষের আকাশ-ভ্রমণের ইতিকথা। দাম দশ টাকা।

বিহঙ্গ বাসনা

সজনে নির্জনে

নিখিলচন্দ্র সরকারের নতুন উপন্যাস।
দাম বারো টাকা।

সম্পূর্ণ গ্রন্থ-তালিকার জন্য লিখুন:

রবীন্দ্র লাইব্রেরী ১৫।২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০১২
ফোন : ৩৪-৮০৫৬

বাংলাদেশ একটি দর্শক

দুর্বলতর গোষ্ঠীগুলির জন্য এই সব সুবিধা

- প্রান্তিক কৃষক উন্নয়ন সংস্থা (এম. এফ. ডি. এ) এবং ক্ষুদ্র কৃষক ও কৃষি শ্রমিক সংস্থার (এস. এফ. এ. এস) মত সংস্থার মাধ্যমে কৃষি-খামারে নিযুক্ত সাহায্যপ্রার্থী ব্যক্তিদের সুবিধাদান
- মুচলেকা মজুরী ও বেগার খাটার মত বর্বর প্রথার বিলুপ্তি
- পল্লী ঋণ আদায় স্থগিত

- গ্রামাঞ্চলের কারুশিল্পীদের সাহায্যার্থে পল্লী ব্যাঙ্ক
- গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থানের ব্যাপক কার্যক্রম
- হস্তচালিত তাঁত শিল্পীদের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা
- আদিবাসীদের জমি এবং ভূমিহীন ও কৃষি শ্রমিকদের বসতজমি সুরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা
- তপশীলী জাতিদের জন্য সংরক্ষিত পদের সংখ্যা 12½ শতাংশ থেকে 15 শতাংশ পর্যন্ত বর্ধিত
- সংসদ ও রাজ্য বিধানমণ্ডলীগুলিতে আসন সংরক্ষণের মেয়াদ 1970 থেকে আরও দশ বছরের জন্য সম্প্রসারিত

এবং বিস্মৃত উপেক্ষিত মানুষগুলির জীবন আরও একটু সুখী করার জন্য অন্যান্য বহু ব্যবস্থা

CENTRAL LIBRARY

১৫ বর্ষ

অমৃত

সংখ্যা ৪২

"ইন্ডিয়ান এ্যান্ড ইস্টার্ন নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য"

Friday, 19th March, 1976 শুক্রবার ৫ চৈত্র ১৩৮২

পৃষ্ঠা	বিষয়	লেখক
৬	সম্পাদকীয়	
৭	হৃদয়ের কথা	শ্রীতারাজ্যোতি (গল্প) মুখোপাধ্যায়
১২	সাহিত্যের নেপথ্যে	শ্রীশান্তিলতা চট্টোপাধ্যায়
১৫	এই বাংলার খবর	শ্রীদেবদত্ত
১৭	বিদেশের কথা	
১৮	সোল : বসন্ত উৎসব	শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য
১৯	অদ্য শেষ রজনী	(উপন্যাস) শ্রীশ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়
২৩	সাহিত্যের খবর	শ্রীশশধর দাস
২৪	নতুন বই	
২৫	বিচিত্র জনপদ মহীপুর	শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়
২৮	সুরের আগুন	শ্রীসন্ধ্যা সেন

চতুর্থ মুদ্রণ প্রকাশিত হ'ল

আগস্ট যুগের পটভূমিকায় লিখিত বিপ্লব বিশ্বাসের অবিস্মরণীয় গ্রন্থ

বিপ্লবী সূর্য সেন ৫.

সত্যেন্দ্রনাথ বসু ৪. বীর বিপ্লবী বাঘা যতীন ৬.
বীর সাভারকর ও ধীংড়া ৫. বিপ্লবী সতীন সেন ৫.
অনশন শহীদ যতীন দাস ৪. ভস্মকবি দ্বিজেন্দ্রলাল ৪.
স্বাধীন বাংলাদেশ ও ভারত ৭. বিক্ষুব্ধ বাঙলা ৬.

শৈলেশ দে'র স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিকায়

যেন ভুলে না যাই ৮.

বিনয় - বাদল - দীনেশ ৭. ক্ষমা নেই ৫.

বিশ্বাস পাবলিশিং হাউস ৫।১এ, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

কলকাতার জয়ঢাক!

বাজলে, আমরা খুশী, আপনারা?

২'র বাসে প্রণয় চৌধুরী (২) তাঁর বসার জায়গাটি ছেড়ে দিলেন এক মহিলাকে... তাঁর দেখাদেখি নাম-না-জানা অনেকজন আঁট বৃদ্ধ এক বৃদ্ধাকে বসতে দিলেন ..... কলকাতার পুলক ছড়ালো।

কলকাতা অনেকটা ভাল হচ্ছে কারণ কবের ভরসায় বাসস্টপীয় পাঁচটা বাস লাইনে দাঁড়িয়ে পুরো ভাড়া দিয়ে টিকিট কিনে বসে উঠছেন। অভিনন্দন সি-এস-টি-সিকে এবং সেইসব বাসযাত্রীদের যাঁরা কলকাতাকে একটু ভালর দিকে নিয়ে যেতে.....

কলকাতা অনেকটা ভাল কারণ মাদার টেরেসা এবং বহু স্বেচ্ছাসেবী ও প্রতিষ্ঠান অনাথ, অস্থ, দুঃস্থ আর বস্তীবাসীদের পাশে দাঁড়াচ্ছেন। তাঁদের অভিনন্দন.....

শিয়ালদহ স্টেশনের রূপান্তর হয়েছে পূর্ব রেলের স্পর্শে;

নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়াম দেখবার মত জিনিষ, বানিয়েছেন পূর্ব রেলওয়ে। উল্টোডাঙ্গায় শিশু উদ্যান দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়, বানিয়েছেন বিধানচন্দ্র রায় মেমোরিয়াল কমিটি তাঁদের অভিনন্দন.....

আর অভিনন্দন জানাই কলকাতা কর্পোরেশন এবং রাস্তার ধারের দোকানদারদের যাঁরা সহযোগিতা করে কলকাতাবাসীর চলার পথ একটু কম দুঃসহ করলেন... ডায়মণ্ডহারবার রোড বেহালা মহীশূর সহযোগিতায় আজ প্রকল্প সি-এম-ডি-এ প্রকল্প সি-আই-টি, মাদার টেরেসা বৃদ্ধের কাজ প্রায় শেষ করে এনেছেন, এইচ, আই, টি বাইপাস যেতে হাত করিয়েছেন। রবীন্দ্র রোডে উড়াল পুলের কাজও শেষ পর্যায়ে..... পাতাল রেল আর মেট্রোর ছুঁচলো মুখ হবে না বলে যাঁরা এখনও মনে করেন তাঁরা অবিলম্বে নাম লেখান। কবের বছর পরে, তাঁদের মুখেই শুনতে চাই "আমরা তো আগেই বলেছিলাম যে....."

এই বিজ্ঞাপনের মানে কি? এটা সি-এম-ডি-এ যাঁর চেয়ারম্যান শ্রীতারাপদ নাথ সেনের চাকা পেটানো বিজ্ঞাপন, তা নয়, এটা জয়ঢাক, কলকাতার জয়ঢাক। যাঁরা কলকাতার ভালো কিছু করছেন, তাঁদের জয় হোক।

কলকাতার উন্নতি হচ্ছে, আমরা খুশী, আপনারা?

মহাত্মাশিশিরকুমারঘোষ কর্তৃক গ্রন্থিত

শ্রীঅমিয়নিমাই চরিত (১ম—৬ষ্ঠ খণ্ড)

প্রতি সেট—মূল্য ২৪-০০

শ্রীকালাচাঁদ গীতা প্রতি কপি—মূল্য ৩-০০

Lord Gouranga (vol. 2) Per Vol. Rs. 6.00

Life of Sisir Kumar Ghosh Per Copy Rs. 6.50

প্রাপ্তিস্থান : পত্রিকা হাউস (হিসাব বিভাগ)

১৪ আনন্দ চাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩

নামকরা শিশুসাহিত্যিকদের গল্প-উপন্যাস-নাটক সংগ্রহ

কিশোর গ্রন্থাবলী

লেখক :

অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়
মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
নরেন্দ্র দেব
সরোজ রায়চৌধুরী
মৃত্যুঞ্জয় রথ সেনগুপ্ত
খগেন্দ্রনাথ মিত্র
ইন্দিরা দেবী
আশা দেবী
রবীন্দ্রলাল রায়
ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য
লীলা মজুমদার
ধীরেন্দ্রলাল ধর
বিশু মুখোপাধ্যায়
মণীন্দ্র দত্ত

প্রত্যেকখানি গ্রন্থাবলী ৪-০০

দীনেন্দ্রকুমার রায়ের

রবার্ট ব্লেক সিরিজের দুরন্ত কাহিনী

প্রবল কাঁদ	...	২-৫০	কালো বিড়াল	...	৩-০০
গুপ্তঘাতক	...	২-৫০	দুষ্ট গ্রহ	...	৩-০০
মৃত্যু সঙ্কট	...	৩-৫০	দ্বীপান্তরের আসামী		৩-০০
চাঁদের চক্র	...	৪-৫০	কালির কাঁসের ডাক	...	৪-০০
দুর্দান্ত দস্যু	...	৮-৫০	পেতনীদহের হাঁরা	...	৫-৫০
			দস্যু গোয়েন্দা	...	৮-৫০
			ডাকুর মতিরা	...	৯-৫০

চিন্তাশীল পাঠক-পাঠিকার জন্য

রবীন্দ্রসাহিত্যের তত্ত্বমূলক বিশ্লেষণ

রবীন্দ্র পরিচয় ৪০-০০

রবীন্দ্রনাথের ধর্ম্ম ১০-০০

ডাঃ মনোরঞ্জন জানা

কালকাটা পাবলিশার্স

১৪ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
৩৪	তুমিও ক্ষমার যোগ্য নও	(কবিতা)	সমসুল হক
৩৪	প্রার্থনার সময়	(কবিতা)	শ্রীপরেশ মণ্ডল
৩৪	ভেন্ত্রাকটা	(কবিতা)	শ্রীসাধনা মুখোপাধ্যায়
৩৫	গোধূলিলগ্ন	(উপন্যাস)	শ্রীনিমাই ভট্টাচার্য
৩৯	ভোজন বিলাস		শ্রীউমাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়
৪০	পুনশ্চ		শ্রীরূপদর্শক
৪১	গান্ধ	(গল্প)	শ্রীতারিণী সরকার
৪৭	মঠ থেকে বলছি		শ্রীঅজয় বসু
৪৭	মঠের নায়ক		শ্রীবিমল বন্দ্যোপাধ্যায়
৪৯	খেলাধূলা		শ্রীরূপক
৫১	সিনেমাটিক টক		শ্রীঅরুণ মজুমদার
৫২	স্টার থেকে বলছি		শ্রীমনোবিদ
৫৪	চিত্রসমালোচনা		শ্রীচিত্রলেখা
১৫	কিছুক্ষণ		শ্রীনির্মল ধর
৫৬	বেপথো		ইন্দ্রজিৎ
৫৮	বিদেশী ছবি		শ্রীজন, র. চ
৫৮	নাটমঞ্চ		নাট্যসমালোচক
৫৯	শতবর্ষের স্মরণীয়		শ্রীঅনীশ মুখোপাধ্যায়
৬১	শিল্পী সম্বর্ধনা		
৬১	বিবিধ		
৬২	চিত্রসমালোচনা		শ্রীচিত্রলেখা
৬৩	জলসা		শ্রীচিত্রোপল

প্রচ্ছদ : শ্রীঅমলেন্দু মুখোপাধ্যায়

অফিস এবং ইনজিনীয়ারি
নিখুঁত সরঞ্জাম
এখানে এসে কিনে নিয়ে

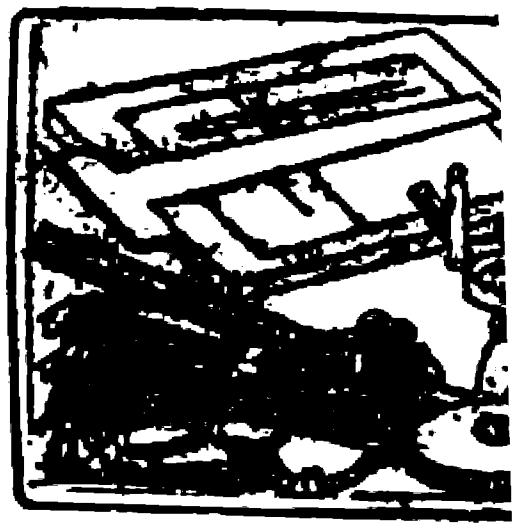

সার্ভে, ড্রইং, নানা রকম
খাতা, লেজার, ক্যাশবই, কা
উৎকৃষ্ট ছাপার জন্য
অন্যতম প্রতিষ্ঠান

কুইক স্টেশনারী স্টোস
৬৩ই, রাধাবাজার স্ট্রীট কা
ফোন : ২২-৮৫৮৮, ৬৭-৪৬
গ্রাম : অন্নপূর্ণা, পোস্ট বক্স—৩৮
পরিবেশক : কার্শিলন প্রডক্টস
(স্টেশনারী বিভাগ)

CENTRAL LIBRARY

সার্থক সফর

স্বল্প সময়ের জন্য হলেও মার্চের প্রথম সপ্তাহে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর পশ্চিমবঙ্গ সফর একটি স্মরণীয় ঘটনা। তিন-দিন মাত্র ছিলেন তিনি। এই সময়ের মধ্যে তিনি পরিদর্শন করেছেন বেলুড় মঠ, কলকাতার ডিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ড ভাষণ দিয়েছেন এক বিশাল জনসভায়, শিল্পী-সাহিত্যিকদের সঙ্গে মিশেছেন, বলপুর জাই এই টি ও বিশ্বভারতীর সমাবর্তনে মিলিত হয়েছেন স্নাতকদের সঙ্গে, দুর্গাপুরে ভাষণ দিয়েছেন অপর একটি জনসভায়। ব্যস্ত কর্মসূচী সত্ত্বেও শ্রীমতী গান্ধীর প্রতিটি অনুষ্ঠান ছিল প্রাণচঞ্চল। প্রতিবারেই তিনি জনতার সমর্থন এসে দাঁড়িয়েছেন আত্ম-বিশ্বাসের দীপ্তি নিয়ে। ব্যবহারে তিনি নম্র, কিন্তু সংকল্পে তিনি স্থিরবুদ্ধি। দেশকে কীভাবে সার্থক উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিতে হবে এ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য স্পষ্ট কর্ম-সূচী সুপরিজ্ঞাত। কোনো দ্বিধা নেই, সংশয় নেই। দুর্বলের জন্য, দরিদ্রের জন্য সমাজকে ঢেলে সাজাবার সংকল্পের কথাই শোনা গেছে তাঁর মুখে। ভারতবর্ষের মানুষকে স্বনির্ভরশীল হবার আবেদন জানিয়েছেন তিনি, আশ্বাস তাঁর অফুরান। বিদেশ কোথা কোনো মহলে ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে চলছে কুৎসা। ভারতবর্ষের গণ-তন্ত্রের জন্য ওই মহলের মায়াকান্নার অন্ত নেই। পরিষ্কার জবাব দিয়েছেন তাদের প্রধানমন্ত্রী। ভারতবর্ষে অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা দমনের জন্য যে-ব্যবস্থা সরকার নিয়েছেন তার কোনো কৈফিয়ত তিনি দুনিয়ার কাউকে দেবেন না, শুধু দেবেন ভারতের জনগণের কাছে। এ জন্যই তিনি সারা চৈত্রময় ঘুরে লক্ষ-কোটি ভারতবাসীর কাছে গিয়ে নতুন ভারতবর্ষের বাণী প্রচার করছেন। দেশবাসীর সমর্থন তাঁকে দিচ্ছে নতুন শক্তি ও প্রেরণা।

বিদেশী শক্তি ভারতবর্ষকে দীর্ঘদিন শোষণ করেছে। কিন্তু ভারতবর্ষের মানুষ তাদের পদানতির কাছে কোনোদিন আত্মসমর্পণ করেনি। সে সংগ্রাম করেছে, প্রাণ দিয়েছে যার পরিণামে একদিন সে হারানো স্বাধীনতা ফিরে পেয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলে-ছেন এমন একদিন আসবে যেদিন ভারত-বর্ষ শতাব্দীব্যাপী অন্যায়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করবে। কিন্তু সে প্রতিশোধ অপরের ওপর অন্যায় করে নয়। নিজে শক্তি অর্জন করে সর্বত্র সকল রকম অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে। বিদেশী শক্তিসমূহ ভারতবর্ষের এই সম্ভাবনাময় অভ্যুদয় মুখ দেখতে চায় না। তারা চায় দারিদ্র্যপীড়িত এক দুর্বল ভারত যে নাকি সব সময় বড়লোক দেশগুলোর কাছে হাত পেতে থাকবে। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পর কোন সামরিক জোটে যোগ দেয় নি বলে তাদের রাগ হয়েছিল। সেই রাগের কাল মেটাতে পাকিস্তানকে অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে ভারতবর্ষকে কাবু করার কম চেষ্টা করেনি। বাংলা

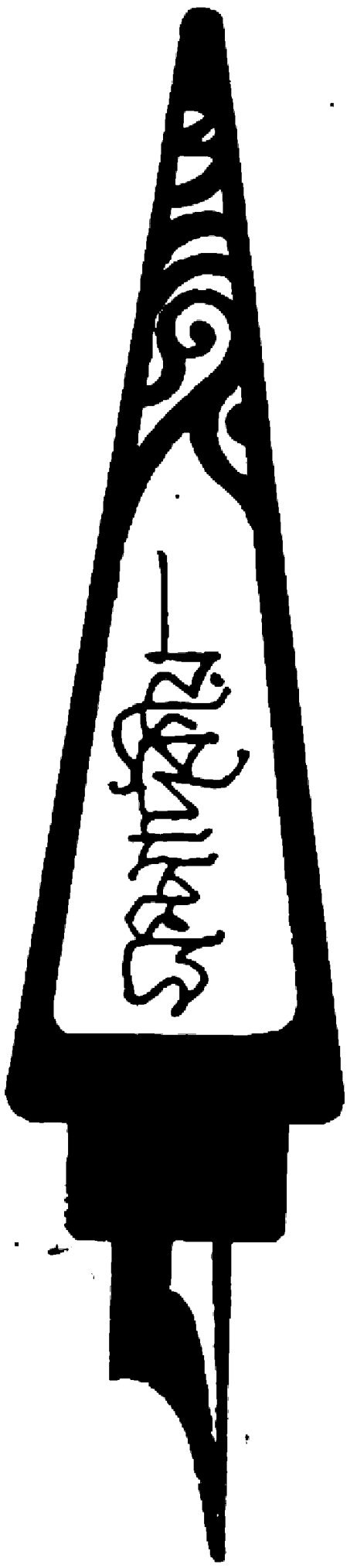

দেশের অভ্যুত্থানের সময় এরাই সপ্তম নৌবহর পাঠাতে চেয়েছিল ভারতকে হুমকী দেবার জন্যই। ভারতবর্ষের মানুষ গণ-তান্ত্রিক সংবিধান যখন রচনা করেছিল তখন এই সব পশ্চিমী শক্তিই বলেছিল, নিরক্ষর দেশে কি গণতন্ত্র চলে। এখন গণতন্ত্রের সুযোগে যারা যা ইচ্ছা তাই করতে যাচ্ছিল তাদের নির্যাতিত করতে এই শক্তিসমূহই বলতে শুরু করেছে, গেল গেল ভারতবর্ষে গণতন্ত্র গেল। ভারতবর্ষ সামাজিক উন্নয়নের জন্য পরিকল্পিত অর্থনীতি গ্রহণ করলে এরাই তার তীব্র সমালোচনা করে-ছিল। ভারতবর্ষ শিল্পায়নে সমৃদ্ধ হয়ে উঠুক এটা এরা কোনদিন চায় নি। ভারত-বর্ষকে তারা কাঁচামালের বাজার হিসেবেই রাখতে চেয়েছিল। কিন্তু জওহরলাল নেহরুর দূরদর্শিতায় ভারতবর্ষ পঞ্চবার্ষিক যোজনা গ্রহণ করেছে। শ্রীমতী গান্ধী তাঁর উত্তরাধি-কারী হিসেবে সেই পথ অনুসরণ করে আজ ভারতকে পৃথিবীর অন্যতম শিল্প-সমৃদ্ধ দেশের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে-ছেন।

আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে ভারত-বর্ষের নীতি যথার্থ প্রমাণিত হয়েছে। এ কারণেই তার ওপর এত গোসা। দেশের এক শ্রেণীর মানুষও ভ্রান্ত পথে পরি-চালিত হয়ে ভারতের অগ্রগতির দিনগুলোর প্রতি আঙুল দেখাচ্ছিল। দুর্নীতিহীন সমাজ কোন দেশেই বা আছে? ভারতবর্ষের সমাজের কোথায় দুর্বলতা, কোথায় ত্রুটি এ প্রধানমন্ত্রী ভালভাবেই জানেন। এবং জানেন বলেই তা সংশোধন করার জন্য কঠোর ব্যবস্থা নিতেও তিনি পিছপা নন। পশ্চিম বাংলার মানুষকে তিনি স্মরণ করিয়ে গেছেন বাংলার মহান অতীতের কথা। নবজাগরণের সূত্রপাত হয় এখান থেকে। এ হল ক্রান্তিকারী ভাবনা—চিন্তায়, কর্মে এবং সংকল্পে। আধ্যাত্মিক চেতনায় শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, সমাজ চেতনায় রামমোহন-বিদ্যাসাগর, শিল্প সাহিত্য চেতনায় বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের অবি-স্মরণীয় অবদানের কথা সারা ভারতবর্ষ কখনো বিস্মৃত হতে পারে না। তাঁদের পুরোগামী চিন্তা দেশবাসীকে জাগ্রত করে-ছিল। তাঁদের কর্মপন্থা অনুসরণ করেই নতুন ভারতের সিদ্ধিলাভ। ভারতবর্ষ এক এবং অভিন্ন, ভারতীয়ত্বই প্রত্যেকের স্বধর্ম, এই প্রত্যয়ে চেতনা সঞ্চা-রিত হয়েছিল বাংলার মহাপুরুষদের চিন্তাধারা থেকেই। আজ ভারতীয়তা-বোধের ওপরই সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব আরোপ করার সময় এসেছে। আমরা কেউ আলাদা নই, বিচ্ছিন্ন নই। সকলে মিলে আমরা এক এবং অবিচ্ছিন্ন। দেশকে নতুন পথে চালাবার দায়িত্ব শিল্পী ও সাহিত্যিক-দেরও। প্রধানমন্ত্রী তাঁর নিশ্ছিদ্র সময়-সূচীর মধ্যেও পশ্চিম বাংলার তরুণ শিল্পী ও সাহিত্যিকদের সঙ্গে কথা বলা ও চিন্তা বিনিময়ের সুযোগ করে নিয়েছিলেন। সাহিত্য শুধু জীবনের নিরাশার চিত্রই ফোটাবে না, তাকে আলো ফেলতে হবে সে দিকেও যেখানে অপরাজিত মানুষের মিছিল চলেছে পূর্ণতর জীবনের সন্ধানে। রাজনীতির শিখরে যাঁরা থাকেন তাঁরা এত সব সূক্ষ্ম চিন্তার সময় সব সময় পান না। কিন্তু শ্রীমতী গান্ধীর সজাগ মন, সূক্ষ্ম দৃষ্টি জীবনের কোন সমস্যাকেই এড়িয়ে চলে না। তাই এবারের সফরে সেই সর্বত্র-গামী চিন্তা ও ব্যক্তিত্বের পরিচয় পেয়েছে পশ্চিম বাংলার মানুষ। তাঁর সান্নিধ্য পেয়ে পশ্চিম বাংলা আনন্দিত এবং উপকৃত।

CENTRAL LIBRARY

হৃদয়ের কথা

তারাজ্যোতি মুখোপাধ্যায়

শ্যামলকে পেয়ে বন্ধুরা উচ্ছ্বাসে লাফিয়ে উঠল। বললে, তুইও চল আমাদের সঙ্গে।

শ্যামল জিজ্ঞাসা করল, কোথায়?

ওরা বললে চলই না। কোথায় সেটা তো গেলেই দেখতে পাবি।

শ্যামল এসেছিল অন্য একটা কাজে। এই কাছেই। ভাবল ফেরার পথে মনীষের বাড়িটা একবার ঘুরে যাবে। আজকাল তো আসাই হয় না। কিন্তু এদিকে এরা যে মনীষের জন্যে মেয়ে দেখতে যাচ্ছে তা জানবে কী করে। তাই ব্যাপারটা যখন ভেঙে বলল ওরা তখন শ্যামল বললে, না তোরাই যা। আমি একেবারে বিয়ের দিন দেখব।

রঞ্জন সঙ্গে সঙ্গে বললে, শালার কথা শোন। মেয়ে দেখলেই তার সঙ্গে যেন বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। না তুই এখনও সেই হাঁদাই হয়ে গেলি শ্যামল।

বন্ধুদের কাছ থেকে এ ধরনের টিপ্পনি শোনা শ্যামলের অভ্যাস আছে। বন্ধুরা বলে তুই লেখাপড়াই শিখেছিস শ্যামল কিন্তু তোর জ্ঞানবুদ্ধি হলো না।

ততক্ষণে ট্যাক্সি এসে গেছে। ওরা জোর করে শ্যামলকে ঠেলে তুলে দিল ট্যাক্সিতে। তারপর ড্রাইভারকে বললে শিয়ালদা স্টেশন।

শ্যামল এর আগে কারুর জন্যে মেয়ে দেখতে যায় নি তাই মনে মনে অস্বস্তি অনুভব করছে। কিন্তু মুখে সে কথা প্রকাশ করতে পারছে না। কিছু বললেই তো এখুনি অমনি চেপে ধরবে বন্ধুরা। তাই চুপচাপ ওদের কথা শুনতে থাকল।

ওদের আলোচনা তখন মেয়ের রূপ গুণের কথা নিয়ে। ছবি দেখে তো সুন্দরীই মনে হচ্ছে। যেমন স্বাস্থ্য তেমনি ফিগার। গুণটা বললে বীরেন।

রঞ্জন বললে, মেয়েটি খুব নম্র অমন বিনয়ী। মা সমর তো, খুব পছন্দ হয়েছে শুনলাম।

মাসিমা অর্থাৎ মনীষের মা। মনীষের বাবা মা মেয়ে দেখে আগেই পছন্দ করে এসেছেন। এখন ছেলে আর তার বন্ধুদের পছন্দ হলেই বিয়ের কথাবার্তা শুরু হবে।

সোদপুর স্টেশনে নেমেই শ্যামল আবার গোলমাল শুরু করল। ওরা তখন সাইকেল রিকশায় চড়তে যাচ্ছে এমন সময় শ্যামল বললে, ওই যাঃ, বড্ড ভুল হয়ে গেছে। পরের ট্রেনেই আমাকে কলকাতায় ফিরতে হবে। —বলেই কেমন যেন ছটফট করতে লাগল শ্যামল।

বন্ধুরা উদ্বিগ্নকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, কেন রে, হঠাৎ হোলোটা কী তোর?

শ্যামল জিভ কেটে বললে, একদম ভুলে গিয়েছিলুম রে। ইংরিজী অনার্সের একটা ছাত্রকে আজ পড়াতে যাবার তারিখ। সে বেচারা আমার জন্যে বসে থাকবে।

যখন হাত তুলে মারতে যাবার ভঙ্গী করে বললে, তুই শালা আর পেঁয়াজি করার সময় পেলি না। চড় শালা রিকশাতে।

শ্যামলের তখন নিজের ওপরই রাগ হচ্ছে। আগে মনে পড়লে ও কিছুতেই এদের সঙ্গে আসতো না। এরকম ছোটো-খাটো ভুল আজকাল বড্ড বেশি হচ্ছে শ্যামলের। সময় সময় স্মরণশক্তি বেশ বিশ্বাসঘাতকতা করছে।

কিন্তু এখন যে মেয়েটা শ্যামলের সামনে বসে আছে তাকে তো চিনতে ভুল হচ্ছে না। অবশ্য মেয়ের বড়ভাইকে শ্যামল চেনে না। শ্যামলরা এসে দাঁড়াতে মেয়ের বড়ভাই খুব খাতির করে ঘরে নিয়ে এসে বসালেন। হাতজোড় করে জিজ্ঞাসা করলেন, কোন অসুবিধে হয়নি তো বাড়ি খুঁজতে।

উত্তরে বীরেন বললে, না না একদম নয়। সাইকেল রিকশাওলাকে বুঝিয়ে দিতেই সে জা নিয়ে এলো এখানে।

বড়ভাই বিনীতভাবে বললেন, বছর দুয়েক হলো নতুন বাড়ি করে এখানে এসেছি। এখন অবশ্য অনেকেই চিনে গেছে।

ইংরিজীর অধ্যাপক ডাঃ শ্যামল মুখার্জী এতক্ষণে ভালভাবে চিনতে পেরেছে মেয়েটাকে। ততক্ষণে চা মিষ্টি খাওয়া হয়ে গেছে। তারপর মেয়ের বড়ভাই এসে বসেছে মেয়েটাকে। মেয়ের বাবা নেই। বছরখানেক হলো মারা গেছেন। মা আছেন। আর এই বড়ভাই-ই অভিভাবক: বীরেন আর রঞ্জন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করছে মেয়েটাকে।

আর শ্যামল তখন বছর তিনেক আগের সেই বিশেষ দিনটিতে ফিরে গেছে। মনে হচ্ছে যেন নিউ মার্কেটে হৃদয়ের ফলের দোকানের লাগোয়া অফিস-ঘরটাতে বসে আছে। আর তার সামনে বসে আছে এই মেয়েটা। যার নাম কেয়া।

সেদিন নিউ মার্কেটে ঢুকেছিল শ্যামল একটা ফল কিনতে। বড় মাসিমা হাসপাতালে আছেন। তাঁকে একবার দেখতে যেতে হবে। সেই ফল কিনতে এসেই দেখা হয়ে গেল হৃদয়ের সঙ্গে। হৃদয় তো শ্যামলকে দেখে জড়িয়ে ধরল আরে শ্যামলা তুই। —উচ্ছ্বাসে আনন্দে যেন ফেটে পড়ল হৃদয়।

শ্যামলও হৃদয়কে দেখে অবাক। বললে, এই ফলের দোকান তোমার?

হৃদয় সঙ্গে সঙ্গে শ্যামলের মাথায় আলতো একটা চাঁটি মেরে বললে, তুমি কী রে শালা। না হয় বড় বড় জিনিস আছে তোর। তাবলে আমায় সঙ্গে ভদ্রতা দেখাতে হবে?

শ্যামল এবার হেসে বললে, না তুই দেখছি সেই আগের মতোই আছিস।

হৃদয় সঙ্গে সঙ্গে বললে, আমরা একই রকম থাকি। তোরাই বদলে যাস।

বলেই শ্যামলের কাঁধের ওপর হাতটা রেখে বললে, তোরা বলতে তোকে বলছি না-এইসব ভদ্রলোকদের কথা বলছি। তুই কিছু মনে করিস নি শ্যামল। তুই হলি আমার বন্ধু।

শ্যামল কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই হৃদয় ওর হাত ধরে বললে, এখানে দাঁড়িয়ে কথা নয়। চল আমার অফিস-ঘরে।

শ্যামল বললে, ফলের দোকানের আবার অফিস-ঘরও আছে নাকি?

হৃদয় বুক চিতিয়ে বললে, তবে ফলের দোকানে তো খুচরো বিক্রী। তাছাড়া পাইকিরী ব্যবসা আছে না। আরে বাবা এই ফলের কারবার করেই তো যত আমার লপচপানি। তোদের মতো তো পরীক্ষা দিয়ে ফলের আশা করবার দুরোদ নেই। তাই হাতে হাতে ফল পাবার জন্যে এই ফলের ব্যবসা ফেঁদে বসেছি মাইরি। —বলেই হাসতে হাসতে শ্যামলকে অফিস-ঘরের দিকে নিয়ে যেতে যেতে বললে, খুব ভাল দিনে এসেছিস। চল তোকে একটা জিনিস দেখাব।

হৃদয়ের অফিস-ঘরে ঢুকেই সেদিন দেখেছিল কেয়াকে। কেয়ার হাতে চায়ের কাপ। ঢুকেই হৃদয় বললে, এ কে জানিস শ্যামল। আমার বউ।

শ্যামল কেয়ার সিঁথির ওপর একনজর বুলিয়ে বললে, তোর বউ তো মাথায় সিঁদুর নেই কেন?

হৃদয় গলার আওয়াজটাকে একটু খাটো করে বললে, সবে তো রেজিস্ট্রী করেছি। লোক দেখানো বিয়েটা হবে পরে।

হৃদয়ের সেদিনের সেই খুশিখুশি মুখটা চোখের সামনে ভাসছে যেন। অনেকদিন পর শ্যামলকে কাছে পেয়ে ওকে নিয়ে কী করবে যেন ভেবে পাচ্ছে না হৃদয়। আনন্দে লাফালাফি শুরু করে দিয়েছে। এক সময় হৃদয় বললে, কী রে কেমন দেখছিস আমার বউকে?

শ্যামল বললে, ভাল।

উত্তরে হৃদয় বললে, ভাল করে দেখ। ছুঁয়ে দেখ। —বলেই আলতো ধাক্কা মেরে কেয়ার দিকে ঠেলে দিল শ্যামলকে।

শ্যামল নিজেকে সামলে নিয়ে বললে, কী যে করিস না!

কেয়া আদুরেগলায় বললে, তুমি ভারি অসভ্য হৃদয়দা।

হৃদয় এ-কথায় হেঁচি কেটে বললে, ওরে আমার সতীরে। পাড়ার দাদাদের সঙ্গে ঢলাঢলির কথা বলব নাকি।

তারপরই শ্যামলকে শুনিয়ে বললে, এই হৃদয়শর্মা না থাকলে এতদিনে একে খুবলে খেয়ে নিতো পাড়ার দাদারা। সব জানা আছে।

কথাটা শুনে কেয়ার মুখটা চুপসে গেল। ভেতর ভেতর রাগও হচ্ছে কিন্তু প্রকাশ করতে পারছে না। জমটি মেজাজটা যেন নিইয়ে গেল সকলের।

কিন্তু হৃদয় সামলে নিল ব্যাপারটাকে। কেয়ার পিঠের ওপর হাত রেখে বললে, এই যে শ্যামলকে দেখছ এ সেজা ছেলে নয়। একেবারে হিরো টুকো। গরুর ওপর ঠেলে দিয়েছি বলে রাগ করলে। ওরে বাবা এর পায়ের ধুলো নাও, এক চান্সে বি-এ পাস করে যাবে।

কেয়ার মাথায় হাত বুলিয়ে একটু আদর করল হৃদয়। তারপর ওর থুতনিটা ধরে নাড়া দিয়ে বললে তুমি তো জানো সোনা তোমার হৃদয়ের সফসাফ কথা। ভদ্রলোকদের মতো রেখেঢেকে বলতে শিখি নি। রাগ কোরো না লক্ষ্মীটি মাইরি।

বলেই আবার আনন্দে গদগদ হয়ে উঠল হৃদয়। শ্যামলের একটা হাত নিজের মুঠোয় নিয়ে বললে, জানিস শ্যামল আমি তো শালা ফলওলা। কিন্তু তোর জন্যে লোকের কাছে বুক চিতিয়ে বলি আমি হায়ার সেকেণ্ডারী পাস। মনে মনে তো জানি পাস না শালা কচু। তোর খাতা টুকে পাস করে বেরিয়ে গেলাম। —বলেই গলা ফাটিয়ে হেসে উঠল হৃদয়।

তারপরই কিন্তু স্বরটা করুণ হয়ে গেল হৃদয়ের। বললে, শ্যামলা টুকতে গিয়ে তোর যে কী ক্ষতি করেছিলাম তার জন্যে এখনও দুঃখ হয়। তখন তো অত বুঝি নি। তোর পাশে আমার সিট পড়ল। আমি তোকে বললাম, তোর খাতা দেখে টুকব। ঠিকমত দেখাস।

তুই একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলি আমার কথা শুনে। কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারিস নি। এগজামিনের দিন আমার মনে আছে তুই যেন ঠিক কলির পাঁঠার মতো হয়ে গিয়েছিলি। আমি যা বলেছি তাই করেছিস।

একটু সময় নিয়ে হৃদয় বললে, তুই তো ভেরতম করে লিখে যাচ্ছিস। কিন্তু পাতা শেষ করে বসে থাকতে দেখে আমার ভয়ে

হাওড়া
ফ্রেণ্ডস্ সোসাইটী
বেনারসী-সিল্ক-তাঁত
বিলাসবস্ত্র-পোষাক
৫৩৫, জি, টি, রোড (সাউথ) হাওড়া
ফোনঃ ৬৭-৪৩৪৭

নতুন বই উপহার দেবার মত নতুন বই

চাণক্য সেন-এর

চাঞ্চল্যকর নতুন উপন্যাস

রেপ ১০·০০

২য় মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে

সমরেশ বসু-র

হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা ৬·০০

চিরঞ্জীব সেন-এর

নতুন থ্রিলার

বুলেট প্রুফ ১০·০০

বিমল কর-এর

কৌতুক রচনা

প্রেমশশী ৮·০০

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়-এর

নতুন স্বাদের উপন্যাস

মায়াকাননের ফুল ৬·০০

ভ্রমর-এর

অবৈধ কাহিনী

জনক ৬·০০

বিমল মিত্র-র

নতুন স্বাদের গ্রন্থ

আমি বিশ্বাস করি ১৪·০০

বিশ্ববাণী প্রকাশনী ॥ ৭৯/১বি, মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলিকাতা-৯

হৃদয় সঙ্গে সঙ্গে বলল, করব না মানে? আজ তোকে নিয়ে একটা উৎসব করব।

তারপরই কেয়ার দিকে ফিরে হৃদয় একরকম ধমকে বলল, তুমি তো আচ্ছা মেয়ে। এসব শুনেও বসে আছ। যাও যাও পড়ার ঘুলো নাও।

কেয়াকে একরকম টানতে টানতে শ্যামলের সামনে দাঁড় করাল হৃদয়। কেয়া শ্যামলকে প্রণাম করতে যাচ্ছিল কিন্তু শ্যামল বাধা দিয়ে বলল, আপনিও ওর কথায় কেপে উঠলেন। আরে ও একটা পাগল।

হৃদয় সঙ্গে সঙ্গে রুখে দাঁড়াল, কী বললি আমি পাগল তুই হলুম একনম্বর ফলওয়ালা। কতো টাকার ধান্দায় ঘুরছিস পাগলা, টাকার কী বোঝে তুই। আসলে পাগল হলি তোরা। মুখে বাজে, মাত জেগে দিনের জাহাজ হলি; আর তোদের মাথার চাঁটি মেরে ধান্দাবাজরা টাকার জাহাজ বানিয়ে ফেলল।

বলেই গলা ফাটিয়ে হাসতে লাগল হৃদয়। সে হাসি আর থামতে চায় না।

শ্যামল বিরক্ত হয়ে বলল, কীরে তোর হাসি থামবি।

তখনও মুখথুবড়ে হাসছে হৃদয়। সেই অবস্থাতেই বলল আর বাবা হাসির কী আর কিছু আছে যে হাসলেই থেমে যাবে। এই হাসি আর থামার কোন ব্রেকের ব্যবস্থা নেই। এই দুই শালা নিজের খুশিমতো চল।

তারপরই হঠাৎ চিৎকার করে উঠল, এই তোপরও শালা হাঁস কা বাচ্চা।

হৃদয়ের কাণ্ড দেখে এবার শ্যামল আর কেয়া হা হা করে হাসতে লাগল। আর হৃদয় তখন গম্ভীর হয়ে বলল, কীরে শ্যামলা এবার কেমন বুঝছিস। আমার হাসিটা কেমন তোদের গলায় চালান করে দিলাম। এবার হাসি থামা তোরা।

ততক্ষণে কেয়া আর শ্যামল হাসিটাকে অনেকটা সামলে নিয়েছে। হৃদয়ের চোখে মুখে হাসির ছিটেফোঁটা নেই, মুখ দেখে মনে হচ্ছে কী যেন ভয়ংকর হয়েছে। কিন্তু ওর ভয়ংকরটা যে আসলে কেয়া তা বোঝা গেল একটু পরেই। হৃদয় শ্যামলের হাতটা খপ করে ধরে কেয়ার মাথার ওপর চাপিয়ে দিয়ে বলল, এই শ্যামল, আমার বউকে তুই মনেপ্রাণে আশীর্বাদ কর।

শ্যামল এবার হাসতে হাসতে বলল আরে বাবা আশীর্বাদ করছি। বছর না ঘুরতেই ওর কোলে যেন একটা টুকটুকে.....।

বাকি কথাটা আর শেষ করতে দিল না হৃদয়। তার আগেই শ্যামলের থুতনিটা ধরে নাড়া দিতে দিতে বলল, তুইও শালা পেঁয়াজি শুরু করলি। আরে শালা বিয়েটাই এখনও জানাজানি হয় নি এখন ছেলে হবে কী করে। একটু সবুর কর। কেয়ার বি. এ. পরীক্ষাটা হয়ে যাক। তখন শালা ঘটা করে বিয়ে করতে হবে। আর তুই থাকবি আমার পাশে। তোর পরিচয় পেয়ে বিয়েবাড়ি শুদ্ধু লোক টাঁরা হয়ে যাবে।

এবার অনেকের ভঙ্গীতে হৃদয় বলল শ্যামল তুই ওকে আশীর্বাদ কর ও যেন এক-চান্সে বি. এ. পাস করতে পারে।

সেদিন কেয়ার সঙ্গে ওর পড়াশোনা নিয়ে দু চারটে কথাও হয়েছিল। ইংরাজীতে অনার্স নিয়ে পড়ছে কেয়া। দু একটা প্রশ্নও করেছিল কেয়াকে শ্যামল।

এরই ফাঁকে হৃদয় আবার জিজ্ঞাসা করেছিল, কীরে শ্যামল, ও পাস করতে পারবে তো?

শ্যামল উত্তর খুব সহজগলাই বলেছিল, হ্যাঁ হ্যাঁ পারবে। আর মেয়েরা ইচ্ছে করলে কী না পারে।

একথা শুনে হৃদয় একগাল হেসে বলেছিল শ্যামলকে, হাত মেলাও দোস্তর। একেবারে খাঁটি কথা বলেছ। নইলে শালা আমার মতো হৃদয়কে কব্জা করে ফেলে। মেয়েরা মাইরি সত্যি এমন কাজ নেই যে পারে না।

তারপরই হৃদয় খবর করে শুনিয়েছিল কেয়ার সংসারের কথা। বড় অভাবের সংসার। অভাবটা বোল করে শুরু হলো বাবার চাকরি যাওয়ার পর। কঠিন অসুখে পড়লেন ভদ্রলোক। নাগাড়ে ভোগার জন্যে বাধ্য হয়ে অফিস থেকে অবসর নিতে হলো। তখন পুঁজি ভেঙে খাওয়া। সে আর কটা টাকা। বড়ভাইটা সবে বি এ পাস করে বসে আছে। চাকরি পাচ্ছে না। সরকারী হাসপাতালে বাবার চিকিৎসা হচ্ছে, কিন্তু পথ্য যোগাবে কে। ডাক্তাররা বাবাকে ফল খেতে বলেছে।

এই ফল কিনতে এসেই আলাপ হচ্ছিল কেয়ার সঙ্গে হৃদয়ের। কেয়া বলছিল, বড্ড দাম। এত দাম দিয়ে কি ফল কেনা যায়।

হৃদয় সেদিন ঠাট্টা করে বলেছিল, অত দাম দিয়ে ফল কেনবার দরকার কী। এসব তো বড়লোকদের জন্যে। বড়লোকেরা আপেল খেয়ে ওষুধের খরচ বাঁচাচ্ছে। আর আমরা ফল না খেয়ে বিনাপয়সায় সরকারী হাসপাতালে চিকিৎসা করাচ্ছি। সরকার তো গরিবদের আপেল খাইয়ে সরকারী হাসপাতালগুলো তুলে দিতে পারে না। তাহলে ডাক্তার নার্সরা খাবে কী।

হৃদয়ের কথা শুনে অত দুঃখেও কেয়া খিক করে হেসে ফেলেছিল। আর এমন সুন্দর মুখের হাসি দেখে সেদিন হৃদয়ের হৃদয়টা ধড়মড়িয়ে উঠে একাকার।

সেদিন থেকেই পরিচয়ের শুরু। কেয়াদের অভাবের সংসারের কথা আর অজানা থাকে নি হৃদয়ের কাছে। তারপর থেকে ফল যোগিয়েছে, ভালভাবে চিকিৎসা করিয়েছে। এমনকি কিছুদিন আগে এরজন মানুষকে ধরে বড়চাকরিও করে দিয়েছে হৃদয়।

সব কথা শুনিয়ে হৃদয় বলেছিল এখন এই কেয়ারানী হৃদয়ের হৃদয় জুড়ে বসে আছে।

শ্যামলের ঠিকানা টুকে নিয়ে হৃদয় সেদিন বলেছিল, আমার বিয়েতে কিন্তু আসা চাই। নইলে মাইরি একচোট হাতাহাতি হয়ে যাবে তোর সঙ্গে। তারপর কেয়াকে শুনিয়ে বলেছিল, শ্যামল-যখন যাবি তোমাদের বাড়িতে তখন কিন্তু একে টপ খাতির করতে হবে, নইলে বয়ের পিঁড়ি ছেড়ে উঠে আসব।

সেদিনের সব কথা এখনও যেন ছবির মতো ভাসছে শ্যামলের চোখের সামনে। আজও সেই কেয়া বসে আছে তার সামনে। কিন্তু এ কেয়া তো আজ হৃদয়ের কেয়া নয়। মনীষের বউ হতে চলেছে।

রঞ্জন, বীরেন আর মনীষের অনেক প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়েছে কেয়াকে। অনেক আলাপ আলোচনাও হয়েছে ওদের সঙ্গে। ওরা এতক্ষণ মশগুল ছিল কেয়াকে নিয়ে। একে সুন্দরী তার ওপর মিষ্টি কথা। তাই শ্যামলের ধ্যানস্থ ভাবটা কারুর নজরেই পড়েনি। এতক্ষণে খেয়াল হতে রঞ্জন বলল, এ্যাই শ্যামল, তুই চুপচাপ বসে কী ভাবছিলি এতক্ষণ। সেই অনার্সের ছাত্র কথাটা তো। তারপরই এরা কেয়ার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল শ্যামলের। বলল ডঃ শ্যামল মুখার্জী। ইংরিজীর ডক্টরেট, ইউনিভার্সিটির লিডার।

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে কেয়া আসন ছেড়ে উঠে এসে শ্যামলকে প্রণাম করে বসল। প্রণাম করার সময় কেয়ার তর্জনির চাপ শ্যামলের বহুড়া আঙুলের ওপর বেশ জোরেই পড়ল। অর্থ পরিষ্কার। শ্যামলের কাছে কেয়ার করুণ মিনতি। যা জানো বোলো না প্লিজ। তার মানে হৃদয়ের কথা ছলে বলতে বলছে কেয়া।

শরৎ জন্মশত বার্ষিকীতে বহু তথ্যসমৃদ্ধ সংস্করণ এখন-
শরৎচন্দ্র — মণি বাগচি — ১৫৲
রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম • কাজী নজরুল ইসলাম • ২০৲
দেশবন্ধু • মণি বাগচি • ২০৲
মহানায়ক মুজিবুর-অভ্যুদয় পর্ব-১৫৲ মহাসংগ্রাম-অভ্যুদয় পর্ব-২০৲
মোহন লাইব্রেরী : ৩৫ এ, সুরেন্দ্র স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

পাশের দোকানদারটি বললে, "এখনি শোনোনি। ওঁর ফাঁসি হয়েছে।

—ফাঁসি হয়েছে? কেন ফাঁসি হলো? শ্যামলের কণ্ঠে একরাশ উদ্বেগ।

দোকানদারটি তখন সব বললে। একজন স গুণ্ডা লোক এসে আমাদের কে বড্ড দিক করত। টাকাকড়ি য় নিয়ে যেত। বলত পাকিস্থান আমাদে টা। আমরা ভয়ে ভয়ে সব সহ্য ম। কিন্তু হৃদয়বাবু তো অন্যায় সহ্য পারতেন না। তাই একদিন ওর সঙ্গে ড় লড়তে গিয়েন ছোরা মেরে। লোকটা সঙ্গে মারা গেল। আর হৃদয়বাবু অবশ্যই থানায় গিয়ে সব কবুল করে ন। আমরা ওঁর হাত-পা পাকড়ে ড় চেয়েছিলাম। কিন্তু উনি আমাদের শুনলেন না। বললেন, আমি তো ন কিছু করিনি। আমি থানায় সব করে ন্যায় বিচার চাইব। কিন্তু

আদালতে মামলা টিকল না। ফাঁ হুকুম হয়ে গেল হৃদয়বাবুর। —ব শেষে ধুতির খুঁট দিয়ে চোখের জল ম দোকানদারটি।

আর ঠিক তখনই নিরীহ গোবেচা শ্যামল হঠাৎ যেন ক্ষেপে উঠল। হৃদ দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে গালাগালি ক করল, শালা শয়োরের বাচ্চা, তুমি ন যুধিষ্ঠিরের বাচ্চা বলতে গেলে। শয়োর, তোর বাবা শয়োর, তার গু গুষ্টি শয়োর, শালা তোর ফাঁসি হবে তো কার ফাঁসি হবে।

ততক্ষণে সব দোকানদাররা এসেছে। মারতে শুরু করে দি শ্যামলকে। হৃদয়বাবুকেও গালি দে মারো শালেকো। হৃদয়বাবু মানুষ ছিল দেওতা ছিল। তুম ভদ্দরলোক আদমি স সানমেশা।

মার খেয়ে তখন বেশ ভাল লা শ্যামলের। তার যেন প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে। সুযোগ হৃদয়ের জন্য একটু কেঁ নিচ্ছে শ্যামল।

বিমল মিত্রের
সুখানি প্রেম উপন্যাস

আমি ১৬৲ **পরস্ত্রী** ২৫৲

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের | আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের

কাজলের রঙ ৫৲ **সাঝের মল্লিকা** ৫৲

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

রাত্রি নিশীথে ৭॥ **সূর্য তপস্যা** ১০৲

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের | বিমল করের

লগ্ন ৪৲ **যাদুকর** ৩॥

ভৃগুজাতকের

হাত দেখতে শিখুন ৭৲ **ভাগ্যলিপি** ৯৲

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের | গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

অরণ্য মর্মর ৭॥ **বজ্রে বাজে বাঁশী** ৪৲

আশাপূর্ণা দেবীর
সুবৃহৎ উপন্যাস

কখনো দিনে কখনো রাতে ৩০৲

অমর সাহিত্য প্রকাশন, ৭ টেমার লেন, কলিকাতা-৯

সাহিত্যের নৈপথ্যে

এম সি সরকার

গত ৮ সংখ্যায় বলেছি একটা দোকান গড়ে ওঠার ইতিহাস।

এবার বলি একটা ইতিহাসের জোকাম। বংশপরম্পরায় একটা ঐতিহ্যের বাহক-বাহিকের প্রকাশনী। পিতামহের সেই গল্প আজকের সুপ্রিয় সরকার কতটুকুই বা বলতে পারেন। আর আমরাই বা সেই অজানা গল্পের কতটুকুই বা জানলাম। তাহলে আজকের ট্রাম-বাস, মিছিল 'মনি গার্ডার হে-চৈ'র কলকাতা থেকে অনেক অ-নে-ক দূরে পেছিয়ে যেতে হয় যখন কলকাতায় পঙ্কী চলতো, গাঙ্গুন চৈত্রের জ্বালা বসন্তে হ্যারিকেন টিমটিমের কুপড়ি শহরে বইপাড়া বলে কিছুই ছিল না।

সেই তখন।

সেই তখন পিতামহ রহিমচন্দ্র সরকার ৬৩ ছিলেন, অবসর সময়ে লিখতেন না এডুকেশনের বই। দাদুর বই ছাপতো অন্য প্রকাশন সংস্থা। ৪।৫টা বই হয়ে যাবার পর উনি ভাবলেন নিজে একটা প্রকাশনী করে বইগুলো ছাপলে কেমন হয়। যে কথা সেই কাজ। প্রকাশনী হোলো এম সি সরকার।

পিতামহের পর বাবা সুধীরচন্দ্র সরকার গ্রাম ছিলেন বি-এ পাশ করে। শক্ত হাতে হাল ধরলেন সংস্থার। ...বাবা নিজে লিখতেন, সাহিত্য পরিবেশ বাড়িতে গড়ে উঠছিল ঠিক তখন থেকেই। মনোজ তখন শরৎচন্দ্রের উপন্যাস রোজ হচ্ছে। মনোজ বসু বাবার বন্ধু। বসু বাবাকে আলাপ করিয়ে দিলেন শরৎচন্দ্রের সঙ্গে। প্রায় দুখানা বই ছাপলাম আমরা। যেমন বড়দিদি পরিণীতা চরিত্রহীন নারীর মূল্য এই সব। এই সময় বাবার ইচ্ছে হোলো একটা ছোটদের কাগজ বের করার। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত নাম দিয়ে দিলেন 'খোকা'। 'খোকা' সরগরম হয়ে উঠলো। এম সি সরকার দোকানের আড্ডায় এলেন তাবড় তাবড় লেখক। হেমন রায়, সৌরেন মুখোপাধ্যায়। হেমন রায়ের 'সখের ধন' ধারাবাহিক বেরুলো। আডভেঞ্চার-এর বই বাংলার সেই প্রথম।

বাবার সঙ্গে এসে যোগ দিলাম—ঊনিশ শো উনচল্লিশ। রাজশেখরবাবু থেকে বনফুল বসু পর্যন্ত তখন এই প্রকাশনীর গ্রন্থকার: একটা ব্যাপারে বাবা স্থির সিদ্ধান্ত ছিলেন—সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশনকে তাল মিলিয়ে চলতে হয়। একটা প্রতিষ্ঠানকে টাকে উন্নতি বাঁচিয়েই হয়। যেমন তখন ছাপছিলেন আচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের বইয়ে। বাবার চিন্তাধারার সঙ্গে সমন্বয় করার একটা অকাঙ্ক্ষা ছিল।

সুপ্রিয় সরকার

"তখন বোধ হয় ১৯৫১। বাবা একদিন বললেন—বৈশাখে একটা ফাংশন করি। লেখকরা থাকবেন বেশ খাওয়া-দাওয়া গল্প-গুজব হবে। প্রথমে তিন-চারবার ঘনশ্যাম সরকার রাজশেখর বসু, অতুল গুপ্ত মহাশয় এরকম অনেকে এলেন। প্রতিষ্ঠান অনুষ্ঠান রাজশেখরবাবু একটা করে প্রবন্ধ পড়তেন বন্ধন সেরে ছিলেন তখন। শেষের দিকে পড়তে পারতেন না, নরেন্দ্র দেব মশাই পাঠ করতেন। এমন একটা অনুষ্ঠানে তারাশঙ্কর রায় বললেন—সাহিত্যিকদের পুরস্কার দেওয়া হলে কেমন হয়? বিদেশে তো এরকম ব্যাপার আছে। আমরাও এরকম করতে পারি। তুষারকান্তি ঘোষ অশোককুমার সরকার মহাশয় রাজি হয়ে গেলেন। আমরা খোকা থেকে বিমলে মিশ্রসোহিত্যে

আছে।

জন্যে পাঁচশো টাকার পুরস্কার। সেই প্রথম প্রকাশন সংস্থা থেকে পুরস্কার।

"প্রকাশন হিসেবে শুধু কর্তব্য? ঐ চার-পাঁচটি হিট লেখকের পেছনে বসে কোনরকম ছাপা বাঁধাই করে বাজার ছাড়া? মানুষের রুচিটাকে একটু পাল্টে দেওয়ারও তো সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্ব থাকে। আমরা বের করলুম—'পৌরাণিক অভিধান'। ১৫।১৬ বছর আগে বিক্রি হয়েছে, এখনো হচ্ছে। একটা ব্যাপার ফিকশন-এর থেকে নন-ফিকশন কেন বিক্রি হয় জানেন? ধরুন একটা উপন্যাস বের হল। প্রথম বছর যা বিক্রি হবে, ২য় বছর তার চেয়ে কম, তৃতীয় বছর আরো কম। কিন্তু নন-ফিকশন-এর চাহিদা কখনো পড়ে যায় না। ধরুন আধুনিক বাংলা কবিতা', 'পৌরাণিক অভিধান' 'রামায়ণ' 'বুদ্ধদেব বসুর 'মহা-

ডাক্তারের কথা'। বুদ্ধদেববাবুর একটা গল্প বলি—

"একবার দেখলুম—বুদ্ধদেববাবু কিছু কিছু রেফারেন্স বই খুঁজছেন। জিজ্ঞেস করলুম—এত মহাভারত প্রসঙ্গ নিয়ে বই খুঁজছেন যে? উনি বললেন—আসলে কি জানো সুপ্রিয়, পৃথিবীর অন্যান্য কাব্যের সঙ্গে মহাভারতের একটা তুলনামূলক আলোচনা করে একটা বই করার ইচ্ছে আছে। সঙ্গে সঙ্গে আমি বললুম—আমরা ছাপবো। ঐটুকুই যা কথা হবার, তখনই ব্যাপারটা শেষ হয়ে গেল। বছর দুয়েক বাদে 'দেশে' যখন ধারাবাহিক বেরুতে শুরু করলো, তখন বুঝলুম ওটা ওঁরাই ছাপবেন, কারণ এটাই স্বাভাবিক। আমাদের একটা ব্যাপার ছিল। লেখকদের তাগাদা দেওয়া, কিংবা ঘোরাঘুরি আমরা আগেও করতুম না, এখনো করি না। লেখকদের সঙ্গে কথাবার্তা যা হবার ছোতো, তাঁরা সময়মতো বইটি পাঠিয়ে দিতেন এবং এখনো দেন। সুতরাং বুদ্ধদেববাবুর সঙ্গে ২/৩ বছর আগে কি কথা হয়েছিল তার জের ধরে এখন বলতে গেলে উত্তরটা যা পাবো, সেই 'না'এর মুখোমুখি হতে ইচ্ছে করলো না। এদিকে তো ধারাবাহিক ছাপা হয়ে যাচ্ছে। শেষ কিস্তি হবার আগে হপ্তায় আগামীবার সমাপ্য' লেখা হোলো সেই সপ্তাহে টেলিফোন বেজে উঠলো। বুদ্ধদেববাবু বলছেন——কি ব্যাপার তোমার সুপ্রিয়, আমি কপিটপি সব তৈরী করে রেখেছি আর তোমার কোনো খবরই নেই? ইতিমধ্যে 'মহাভারতের কথা' ছাপবার জন্যে আমাদের থেকে অনেক বেশী টাকা থোক দেবার জন্যে অন্য প্রকাশকেরা তখন বুদ্ধদেববাবুকে অনেক করে ধরেছিলেন।

রাজশেখরবাবুর ব্যাপারটা ছিল একেবারে আশ্চর্য। মন্ত্রের মতো পুরো বইটা হাতে লিখে ছাপবার জন্যে যতো পাতা হিসেবে আসতো তা থেকে কক্ষনো কম-বেশী হোতো না।

—দেখবেন? দাঁড়ান, ওঁর কিছু কপি এখানে আছে। পাশের ঘর থেকে রাজশেখরবাবুর লেখা বইয়ের কপি এনে সামনে রেখে সুপ্রিয়বাবু দেখালেন। অবাক হয়ে গেলুম। পুরো সূচীপত্র থেকে পৃষ্ঠা নম্বর পর্যন্ত মন্ত্রের মতো সমান মাপের হাতের লেখায় এখনো ঝকঝক করছে। ব্লক করে ছাপলে পাঠক বুঝতে পারতেন কত সুন্দর করে একেজন লেখক কপি তৈরি করতে পারেন। আমি তো জীবনে এরকম কপি কারো দেখিনি। মুগ্ধভাবে উল্টে যাচ্ছিলুম—হিতোপদেশের গল্প, পাঞ্চালীক রামায়ণ। ৮৭৪ পৃষ্ঠা ওভাবে হাতে কপি-করা বই-এর লে-আউট করে প্রকাশককে লেখক নির্দেশ দিয়েছেন—'এইরকম করিবেন, উপরে একটা রুল দিলে দেখিতে ভাল হইবে।'

ভাবা যায়?

একটা গল্প বলি শুনুন—

রাজশেখরবাবু যে একটা নিজস্ব ভিন্ন যেমন উনি বুঝতে পারতেন কখন বই হবে। সে তো সব লেখকই বুঝতে পারে। কিন্তু রাজশেখরবাবুর বোঝাটা ছিল অন্য রকমের। ধরুন—উনি সারা বছর ধরে লিখতেন, পুজোর সময় ছাপাতেন। তিন বছর পর ওঁর বই বেরুবে ১টা এবং যে-বার বই বেরুবে উনি কপি স্রেফ করে দিতেন ঠিক কালীপুজোর পরে।...সুপ্রিয়বাবু বললেন—অন্তত আমি তো এরকম টাইপটা কখনো দেখিনি।

এই যে বইটা দেখছেন, এটা হল রাজশেখরবাবুর গীতার পাণ্ডুলিপি। আচ্ছা বইটার প্রথম পাতাটা উল্টে দেখুন।' উল্টে দেখলুম—প্রথম পাতায় লেখা আছে—এই বই ছাপা হইবে না।'

বললুম, কিন্তু রাজশেখরবাবুর গীতা তো ছাপা হয়েছে।

হ্যাঁ, সে অনেক পরে। তাহলে আপনাকে আরেকটা গল্প শোনাতে হয়।—আপনি নিশ্চয়ই রাজশেখরবাবুর দাদার নাম জানেন?

—হ্যাঁ, গিরীন্দ্রশেখর বসু।

: তিনি একটা গীতা লিখেছিলেন। রাজশেখরবাবুর আলাদা লেখা ছিল। তাঁর টীকা, অনুবাদ নিঃসন্দেহে সম্পূর্ণ আলাদা হওয়া সত্ত্বেও, ভাইয়ের বেহেতু বইটা বেরিয়েছে, তখন পুরো লেখা হওয়া সত্ত্বেও উনি কিছুতেই এটা বই হিসেবে বের করলেন না। তারপর অনেক সময় পেরিয়ে গেল। গিরীনবাবু মারা গেলেন। রাজশেখরবাবু মারা যাবার অনেকদিন পর আমরা বইটা ছাপালুম।

স্যার যদুনাথ আর একজন মহৎ এবং সৎ মানুষ। উনি ওঁর বই বের করতেন নিজের টাকায়। আমরা ওঁর প্রেসফ্রেস ছাপা, বাঁধাই মলাট সবকিছু দেখতুম, খালি কাগজ থেকে বই পরিবেশনার প্রায় সবকিছুই আমরা অর্গানাইজ করতুম। একবার হয়েছে কি, 'শিবাজী অ্যান্ড দ্যা টাইম' বইটার ১ম মুদ্রণ প্রায় শেষ হবার মুখে। বইটার দাম এবং কাটতি খুব ভালো ছিল, ১ম মুদ্রণ ছাপবার তাড়াতাড়ি প্রয়োজন হয়ে পড়লো। খুব তাড়াতাড়িই ২য় মুদ্রণও ছাপা হয়ে বেরুল। কিন্তু তখন ঘরে ১ম মুদ্রণের প্রায় দুশো-আড়াইশো বই আছে। আমরা একটু অপেক্ষা করতে চাইলুম। কারণ ও কপিগুলো গেলে তবে এই সংস্করণটা বাজারে ছাড়বো। কথাটা স্যারকে গিয়ে বলতেই উনি বললেন—কেন? জানো, ২য় মুদ্রণে কত পরিবর্ধন পরিমার্জনা হয়েছে। ওটা একদম বাজারে যাওয়া দরকার।

—কিন্তু দুশো আড়াইশো বই.....

: ছিঁড়ে ফেল।

এবং ছিঁড়েই ফেলতে হোলো। টাকা ওঁর নিজের। অত টাকার বই উনি শুধু মতামত খাতিরে নষ্ট করে ফেললেন।

এই ছিলেন গল্পেতে আমার একটা কথাই বলার আছে যে, মানুষের মধ্যে আরেকটা মানুষ থাকে, যে কখনো কখনো আমাদের সামনে বড় মাপে এসে হাজির হয়। আজ আমারও বয়স হয়েছে। প্রকাশন এবং লেখক এবং নতুন নতুন বই আসছে। কিন্তু আজো বারবার ওই একটা কথা এখনো বদ্ধমূল হয়ে আছে—বুকের সঙ্গে নিজেদের গাঁটছড়া বেঁধে চলা। আজ আমাদের চালু বইয়ের সংখ্যা প্রায় শতাধিক। সেখানে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুভাষচন্দ্রের পত্রাবলী, রাজশেখর বসু থেকে অচিন্ত্য সেনগুপ্তের ঈশ্বরের বিবেকানন্দ, অন্নদাশঙ্করের পথে প্রবাসে, প্রেমেন্দ্র মিত্রের মন্ত্র আদশ। বুদ্ধদেববাবুর মধুমন্ত্র থেকে রাত ভর বৃষ্টি। আমরা নতুন কিছু পরিকল্পনা নিয়েছি, যার সবটা আপনাকে ব্যবসায়িক কারণে এক্ষুনি বলা সম্ভব হচ্ছে না। তবে একটা কথা বলি—আমরা প্রেমেন্দ্রবাবুর একটা ছোটগল্পের সংকলন করছি। সব গল্প নয়, কিন্তু প্রথম গল্প থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাবার জন্যে বিশেষ বিশেষ চিহ্নিত গল্প। যাতে লেখকের পুরো দিকটা উন্মোচিত হতে পারে।

—আচ্ছা, সুপ্রিয়বাবু, আপনারা বিক্রির দিকটা কেমনভাবে অর্গানাইজ করেন? এটা বলার একমাত্র কারণ হোলো, আর দশটা পাবলিশার যেমন বই বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞাপন দিয়ে বই আর পাঠকের মাঝখানে একটা সেতু গড়ে তোলে। আপনার ক্ষেত্রে কিন্তু ঠিক সেভাবে ব্যাপারটা ঘটে না বলে আমার ধারণা। তাহলে বিক্রির ব্যাপারটা কি করে চলে?

দেখুন, এটা তো ঠিক, এখনো আমাদের মধ্যে, বিশেষ করে বাঙ্গালীদের মধ্যে ডাল তেল নুন এমনকি সিনেমা দেখার মতো বই কেনার রেওয়াজ হয়ে ওঠেনি। তাছাড়া প্রোডাকশন কস্ট বাড়তে বাড়তে আজ এমন এক জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে যেখানে বেশী বই কেনা সম্ভবও নয়। সাপ্তাহিক বা ধরুন দৈনিকগুলোয় বিজ্ঞাপনে আমরা চোখ রাখি। রবিবার একটা নতুন বই বেরুলো। কিন্তু ধরুন, আপনার ইচ্ছে হোলো আপনি একটা বই নিয়ে বলবেন, কিংবা উপহারের জন্যে দেবেন। কিংবা উপহারের কথা ছেড়ে দেওয়া যাক, কারণ সেটা যে কোনো বই হলেই চলে। কিন্তু আপনি ব্যক্তিগতভাবে এমন একজন লেখকের বই পড়তে ইচ্ছে করলেন, যে-বই আপনার বাড়ির কাছাকাছি কোন বুক স্টলে নেই। অথচ ধরুন, কালকেই আপনার বইটা দরকার। ধরুন বাইরে যাচ্ছেন ট্রেনে কিংবা রাত জাগছেন কোনো রুগীর পাশে। কিংবা ধরুন দোল, এই তো এসে গেল। আপনি রং খেলেন না, ঘরে বসে একজন সেদিন নীরব নিশ্চিন্তে ঘরে বসে বই পড়ে কাটাবেন। এ-মুহূর্তে আপনার বইটা দরকার, অথচ পেলেন না। আপনি আদৌ কিনলেনই না, কি দরকার পরে আপনার সে বইটার। কিন্তু এক-মুহূর্তের ব্যাপার নেই। ওখানে প্রকাশক এবং

পরিষেবক এক হওয়ার কথা কল্পনা করা যায় না। সেখানে বইয়ের দোকানে হাজারটা বই সাজানো আছে। আপনি দেখতে দেখতে একটা পছন্দ করে নিয়ে এলেন।

অথচ ভেবে দেখুন ঠিকমতো ডিসপ্লে করা বিক্রির দোকান এখনো কলকাতায় নেই। একমাত্র অক্সফোর্ড বুক হাউস ছাড়া। আমাদের হল-সেলাররা মুখ চেয়েই থাকেন। তারা পাঠকের অর্ডার অনুযায়ী আমাদের বই সংগ্রহ করেন।

এক্ষেত্রে আমার বিশ্বাস, ভালো সিনেমা বা নাটক যেমন মুখে মুখে 'ভালো' বলে প্রচারিত হয়ে দর্শক টানে, বইয়ের ক্ষেত্রেও খানিকটা তাই। তাবলে কি বিজ্ঞাপন দেওয়ার দরকার নেই? না তা নয়। বিজ্ঞাপন আমরাও দিই, তবে ঠিক ঠিক সময় অনুযায়ী। সেটা দিতেই হয়। তবে কি জানেন, পাঠকের সংখ্যা আরো বাড়ানো দরকার। আমরা বিজ্ঞাপন দেবার সঙ্গে সঙ্গে যে সিস্টেমে চলি—তা হল ক্যাটলিগিং করে প্রতিটি লাইব্রেরী ও পুস্তক বিক্রেতার চোখের সামনে রাখি। পাঠক বাছতে পারেন। অর্ডার সরাসরি আসে। ভালো বই হুশ করে কেটে যায়। শুধু বিজ্ঞাপন দিয়ে কি লেখক হওয়া যায় মশাই? তাহলে তো ধরুন আমার বিজ্ঞাপন দেওয়ার ক্ষমতা আছে, আমি একটা বই বের করে ঢালাও বিজ্ঞাপন দিতে থাকলুম, তাহলেই তো সকলে আমায় লেখক বলে মেনে নিতো। কিন্তু তাই কি আর হয়? এভাবে হয় না। ভালো জিনিস হলে চলে যায়। হ্যাঁ, যা বলছিলাম, পাঠক তৈরীর ব্যাপার। আমরা সম্প্রতি পার্বলিশার্স কিট করেছি, 'জিজ্ঞাসা' দাশগুপ্ত, নিয়ে প্রায় জনা চল্লিশ এই গিল্ডের এখন সদস্য। দিল্লীতে সর্ব-ভারতীয় একটা 'বই মেলা' হল। তাতে সব ভাষার বই এসেছিল। পাঠকরা এসেছেন, দেখেছেন, ঘেঁটেছেন এবং কিনেছেন। একটা কথা বিশ্বাস করবেন? এই বুক-ফেয়ার-এ ফিকশন এর চেয়ে নন-ফিকশন বইয়ের চাহিদা বেশী ছিল। আমাদের স্টলটা প্রথম পুরস্কার পেয়েছিল। আমরা ৫ই মার্চ থেকে ১৪ই মার্চ পর্যন্ত বিড়লা একাডেমিতে একটা 'কলকাতা বই মেলা'-র আয়োজন করেছি। শুধু পাঠককে ঠিক বইয়ের সামনে এসে হাজির করা, তাঁদের পছন্দ করতে সুযোগ দেওয়া। এভাবে বিভিন্ন জায়গায় বই মেলা করে বইয়ের বিক্রি নিঃসন্দেহে বাড়ানো যায় বলে আমাদের বিশ্বাস।

বিশ্বাসের ওপর আস্থা রেখে, এক ঐতিহাসিক সোপানের উপর দাঁড়িয়ে এম সি সরকারের কর্ণধার সুপ্রিয় সরকারের এই হল অতীত বর্তমান পরিক্রমা। ধীরে ধীরে হয়ে ওঠারই ইতিহাস। আজকের এম সি সরকার ঠিক একটা দোকানের ইতিহাস নয়, সে নিজেই কখন একটা ইতিহাস হয়ে গেছে।

শাণ্ডিল্য চতুর্বেদী

ভুল স্বীকার

'সাহিত্যের নেপথ্যে' রবীন্দ্র লাইব্রেরী প্রসঙ্গে আলোচনায় শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাসের নাম ভুল করে ছাপা হয়েছে ধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস।

পরিবারের সকলকে সবল ও সুস্থ রাখতে ২টি ফসকোমিন টনিক

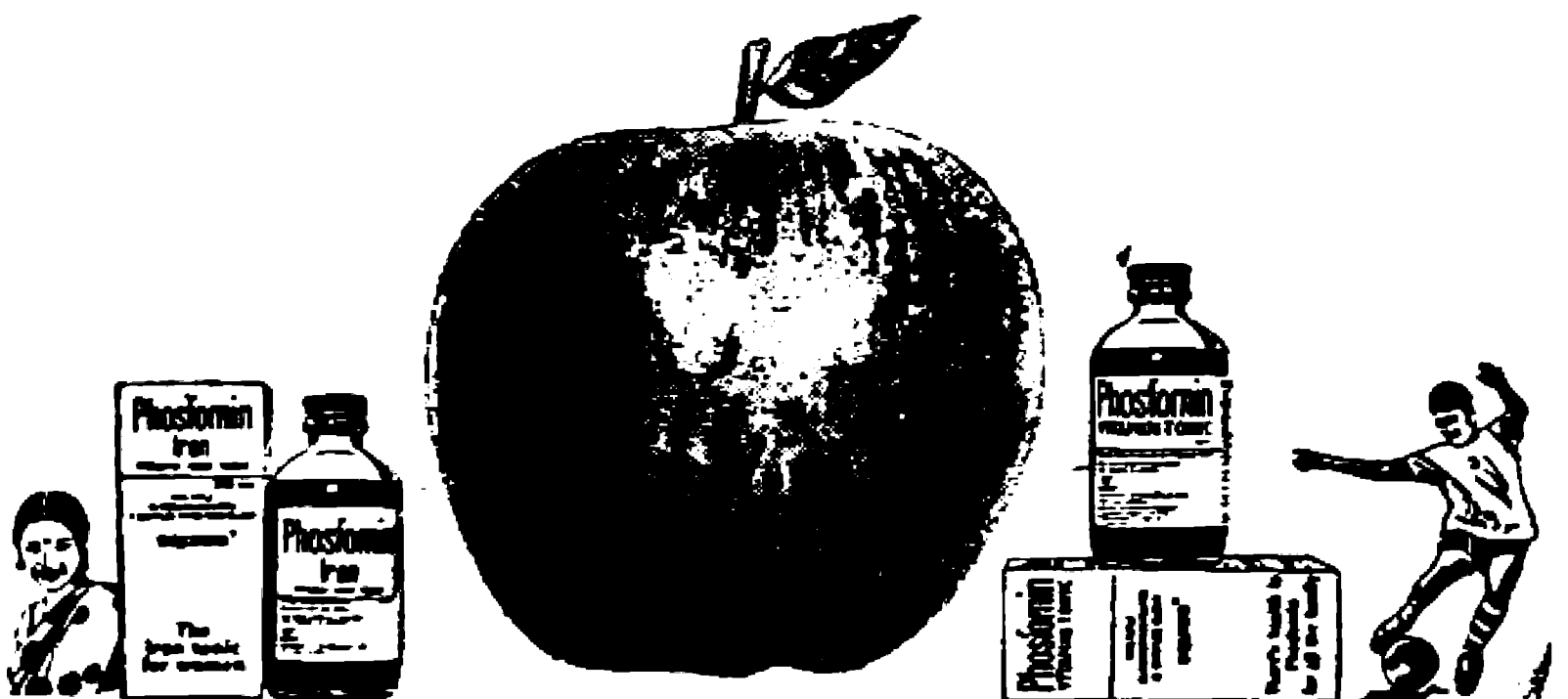

ফসকোমিন আয়রন

মেয়েদের জন্য আয়রন টনিক

ফসকোমিন আয়রন টনিক শরীরের অতি প্রয়োজনীয় আয়রন বাড়াবার এক অভিনিক উপায়, আয়রন খুব তাড়াতাড়ি তৈরী করে এবং শরীরের আয়রনের ভারসাম্য রক্ষা করে। আরো এতে বি-কমপ্লেক্স ভিটামিনস এবং বহুবিধ ফ্রিসারোফসফেটস আছে যা শরীরের ক্লান্তি দূর করে সতেজ এবং প্রফুল্ল রাখে। মেয়েদের জন্য বিশেষ ভাবে তৈরী প্রথম টনিক—ফসকোমিন আয়রন।

ফসকোমিন ভিটামিন

পরিবারের সকলের জন্য ভিটামিন টনিক

কলের থাকে ভরা টনিক। বাচ্চাদের জন্য এক পরিপূরক আহার। এতে অতি প্রয়োজনীয় বি-কমপ্লেক্স ভিটামিন এবং বহুবিধ ফ্রিসারোফসফেটস আছে যা আপনার পরিবার কে কর্মঠ এবং সুস্থ রাখে। পরিবারের সকলের পক্ষে একমাত্র টনিক—ফসকোমিন ভিটামিন।

ফসকোমিন টনিক খিদে বাড়ায়, উৎসাহ বাড়ায়, রোগ প্রতিরোধ করে।

SARABHAI CHEMICALS LTD.

CENTRAL LIBRARY

বাংলার খবর

উদ্বৃত্ত বাজেট

পশ্চিমবঙ্গের বাজেটে অবশ্য উদ্বৃত্ত—এই নিয়ে পর পর দু বছর। এই রাজ্যের বাজেটে সেই যে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ১৯৬২—৬৩ সালে সাড়ে একুশ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত দেখাতে পেরেছিলেন তারপর থেকে চলছিল ক্রমাগত ঘাটতির পালা। ১৯৬৯—৭০ সালে এই ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৫০ কোটি টাকা। ১৯৭২—৭৩ সালের গোড়ায় যেকোনো ঘাটতির বহর ছিল ৩৪ কোটি টাকা। সেই অবস্থার প্রথম বদল ঘটলো ১৯৭৫—৭৬ সালের বাজেটে। অর্থমন্ত্রী দেখালেন ঐ বছরে ২৭ লাখ টাকা উদ্বৃত্ত হবে। সেই অনুমান ভুল হয়নি। বরং সংশোধিত হিসেবে দেখা যাচ্ছে ঐ বছরে উদ্বৃত্তের পরিমাণ শেষ পর্যন্ত ৬৯ লাখ টাকা দাঁড়াতে পারে। যদিও যোজনা খাতে বরাদ্দ প্রায় ২৮ কোটি টাকা বেড়েছে, তবু উদ্বৃত্তের পরিমাণ নাক্ষমে বেড়ে গেছে। ১৯৭৬—৭৭ সালের যে বাজেট অর্থমন্ত্রী ১ মার্চ বিধানসভায় পেশ করলেন তাতে উদ্বৃত্তের অনুমিত অঙ্ক ২ কোটি ১২ লাখ টাকা। উল্লেখযোগ্য যে এটা শুধু কোনো বিশেষ আর্থিক বছরের জমা খরচের পর দেখানো উদ্বৃত্ত নয় অতীতের সব ঘাটতির দায় মেটাবার পরেও এই উদ্বৃত্ত দেখানো সম্ভব হয়েছে।

উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ যখন ক্রমশ বেড়ে চলেছে তখন বাজেটে উদ্বৃত্ত দেখানো সম্ভব হলো কী করে? অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতা থেকে তার বিভিন্ন কারণ জানা যায়। প্রথমত চলতি কর বাবদ আদায় বেড়েছে। যেমন বিক্রয় কর বাবদ আদায় ১৯৭১-৭২ সালে ছিল ৭৪ কোটি টাকা; ১৯৭৫-৭৬ সালের শেষে ঐ অঙ্ক পৌঁছবে ১৫৫ কোটি টাকায়। স্বাভাবিক স্বল্প সঞ্চয় অভিযানে ক্রমবর্ধমান সাফল্য (এই সঞ্চয়ের অধিকাংশই রাজ্য সরকার পান ঋণ হিসেবে)। ১৯৭১-৭২ সালে যেখানে এই অভিযানে সংগৃহীত হয়েছিল ৩৪ কোটি টাকা ১৯৭৪-৭৫ সালে সেখানে সংগ্রহের পরিমাণ ৮০ কোটি টাকা। কৃতীয়ত প্রয়োজন মতো নতুন কর বসিয়েও রাজ্য সরকার কিছু বাড়তি রাজস্বের বন্দোবস্ত করতে পেরেছেন। ১৯৭৫-৭৬ সালের বাজেটে রাজস্ব খাতে অনুমিত আয়ের অঙ্ক ছিল ৪৮৮ কোটি ২২ লাখ টাকা। শেষ পর্যন্ত আয় ৫৫৭ কোটি ৬৪ লাখ টাকা হবে বলে সংশোধিত হিসেবে দেখা যাচ্ছে। ব্যয়ও অবশ্য বাজেটের অনুমিত অঙ্কের (৪৯৩ কোটি ৫৮ লাখ টাকা) চেয়ে বেশি হবে (৫৪১ কোটি ১৪ লাখ টাকা)। ১৯৭৬-৭৮ সালের বাজেটে রাজস্ব খাতে আয় দেখানো হয়েছে ৫৯৬ কোটি ২৩ লাখ টাকা। আর ব্যয় দেখানো হয়েছে ৫৬৯ কোটি ৮৬ লাখ টাকা। এছাড়া আছে মূলধনী ও ঋণ খাতে আয় ও ব্যয়। সব মিলিয়ে বছরের শেষে উদ্বৃত্তের পরিমাণ ২ কোটি ৯২ লাখ টাকা দাঁড়াবে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

নতুন কর

১৯৭৬-৭৭ সালের বাজেটে নতুন কর বসিয়ে ১১ কোটি টাকার মতো বাড়তি আয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অর্থমন্ত্রী বলেছেন অর্থ সংগতি ছাড়া উন্নয়নের কাজ হতে পারে না। তাই নতুন কর বসানো প্রয়োজন। তবে এমনভাবে কর বসানো হবে যাতে সাধারণ মানুষের ওপর কোনো বোঝা না চাপে। অপেক্ষাকৃত সচ্ছল শ্রেণীর কাছ থেকে কর আদায় করে সেই টাকা উৎপাদনমুখী কর্মসূচীতে নিয়োগ করাই কর নীতির লক্ষ্য। নতুন যে-সব কর আদায়ের প্রস্তাব করা হয়েছে তার মধ্যে আছে ভূমি রাজস্বের ওপর সারচার্জ এবং গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থান সেস্। এই দুটি বাবদ যা আদায় হবে তা গ্রামাঞ্চলে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কাজের সুযোগ সৃষ্টির কাজে খরচ হবে। মোটর ভিহিকলস্ ট্যাক্সের ওপর একটা সারচার্জ আদায় করে তা সড়ক উন্নয়নের কাজে লাগানো হবে। কিন্তু যাত্রীবাহী বাস ট্যাক্সি এবং ব্যক্তিগত মোটরগাড়ির মালিকদের এই সারচার্জের আওতা থেকে বাদ দেওয়া হবে। এ-ছাড়া জমি বিক্রি সংক্রান্ত স্ট্যাম্প ডিউটির হার বাড়ানো হবে তবে দশ হাজার টাকা পর্যন্ত লেনদেনের ক্ষেত্রে এই হার বাড়বে না। কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী শহরাঞ্চলে খালি জমি ও যে-সব জমির ওপর বাড়িঘর তৈরি হয়েছে তার ওপর কর বসানো হবে। প্রেক্ষাগৃহে বিজ্ঞাপনের যে-সব স্লাইড দেখানো হয় তার ওপরও কর বসছে মহারাষ্ট্র প্রভৃতি রাজ্যের মতন। নতুন কর বসানোর সঙ্গে সঙ্গে অর্থমন্ত্রী অবশ্য বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে কর রেহাই দেওয়ার কথাও ঘোষণা করেছেন। ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্পের প্রসারে উৎসাহ দেওয়ার জন্যে বিক্রয় করের ব্যাপারে অন্য সুবিধে দেওয়া হবে। চলচ্চিত্র প্রদর্শনী বা ব্যবসায়ে নাচ ছাড়া অন্যান্য যাবতীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং কীর্তনানুষ্ঠানকে প্রমোদ করের হাত থেকে রেহাই দেওয়া হবে। প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণে উৎসাহ দেওয়ার জন্যে নতুন প্রেক্ষাগৃহের মালিকদের প্রথম তিন বছর প্রমোদকরের ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধে দেওয়া হবে।

জন্মশাসনে

এই রাজ্যের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যায় উদ্বিগ্ন হয়ে রাজ্য সরকার এখন একটা কড়া ব্যবস্থা গ্রহণের কথা ভাবছেন। তিনটি সন্তান হয়ে যাওয়ার পর দম্পতিদের মধ্যে একজনকে অবশ্যই হয় নির্বীজকরণ (পুরুষের ক্ষেত্রে) অথবা বন্ধ্যাত্বকরণ (স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে) করতেই হবে—এই মর্মে একটি আইন তৈরির চেষ্টা চলেছে। এ-বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর বিস্তর আলোচনা হয়েছে। মহারাষ্ট্র সরকার আগেই এ-বিষয়ে উদ্যোগী হয়েছেন। তাই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একজন প্রতিনিধি আলাপ-আলোচনা করার জন্যে বোম্বাই গিয়েছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য গোটা দেশে যে-হারে লোকসংখ্যা বাড়ছে এই রাজ্যে বাড়ছে তার চেয়ে দ্রুত হারে। ১৯৬১ সালে রাজ্যের জনসংখ্যা ছিল ৩ কোটি ৪৯ লাখ দশ বছর পরে তা বেড়ে দাঁড়ায় চার কোটি ৪৩ লাখ। ঐ দশ বছরে গোটা দেশে লোকসংখ্যা বেড়েছে শতকরা প্রায় ২৫ ভাগ অথচ পশ্চিম বাংলায় বেড়েছে শতকরা প্রায় ২৭ ভাগ। এমনিতে পশ্চিম বাংলায় পরিবার পরিকল্পনা অভিযান আগের তুলনায় জোরদার হয়েছে। নির্বীজকরণ আর বন্ধ্যাত্বকরণ দুইয়ের সংখ্যাই বেড়েছে। গত বছর এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর এই সময়ের মধ্যে আগের বছরের তুলনায় নির্বীজকরণের সংখ্যা বেড়েছে চার গুণ আর বন্ধ্যাত্বকরণের দু গুণ। পরিবার পরিকল্পনার আওতায় আরো বেশি দম্পতিকে আনার জন্যে চেষ্টাও চলছে। তবু রাজ্য সরকার সন্তুষ্ট নন। তাই একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক সন্তানের পর জন্মশাসন আবশ্যিক করার উদ্যোগ চলছে। নির্বীজকরণ বা বন্ধ্যাত্বকরণের জন্যে নারী-পুরুষকে

CENTRAL LIBRARY

হাসপাতালে নিয়ে আসার জন্যে কর্মহীন যুবক-যুবতীদের ভাতা দেওয়াও হবেছে। প্রতিটি কেসে নিয়ে আসার জন্যে প্রোমোটার বাবদ হিসেবে পাঁচ টাকা করে দেওয়া হবে। তাছাড়া অস্ত্রোপচারের পর সুস্থ বা শল্যচিকিৎসককেও বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

অগ্রগতির ছবি

পশ্চিমবাংলা বিধানসভার বাজেট অধিবেশন শুরু হলো ২০ ফেব্রুয়ারী। প্রথা অনুযায়ী বছরের প্রথম অধিবেশনের সূচনা হলো রাজ্যপালের ভাষণের মধ্য দিয়ে। রাজ্যপাল এ এল ডায়াস তাঁর ভাষণে রাজ্য সরকারের কীর্তির খতিয়ান পেশ করলেন। গোড়াতেই তিনি সদস্যদের মনে করিয়ে দিলেন যে, এই বছরটিই তাঁদের শেষ বছর হতে পারে, কারণ সাধারণ রীতি অনুসারে আগামী বছরের গোড়াতেই বিধানসভার নির্বাচন হওয়ার কথা। রাজ্যপাল যে-সব ক্ষেত্রে এই বাংলার অগ্রগতির কথা বলেছেন তার মধ্যে আছে আইন-শৃংখলা, সরকারের আর্থিক অবস্থা, খাদ্যশস্যের ফলন, বিদ্যুৎ উৎপাদন ইত্যাদি। তাঁর ভাষায়, এখন ভারতের যে-সব রাজ্যে আইন-শৃংখলার অবস্থা সবচেয়ে খারাপ তাদের মধ্যে রীতিমতো ওপরের দিকে। রাজ্যের প্রায় সব এলাকায় অপরাধের সংখ্যা কমে গেছে। সরকারের আর্থিক অবস্থার উন্নতির প্রমাণ, দীর্ঘ ১৪ বছর পরে উদ্বৃত্ত বাজেট। সেলস ট্যাক্স (১৩০ কোটি টাকা) মিটিয়ে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে নেওয়া অগ্রিম টাকা (৩০ কোটি) ফিরিয়ে, আগেকার ঘাটতি বাজেটের ধারা বজায় রেখে এই উদ্বৃত্ত বাজেট পেশ করা সম্ভব হয়েছে। এদিকে উন্নয়নের খাতে খরচ বেড়েছে। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী যোজনার প্রথম তিন বছরে লগ্নীর পরিমাণ ৫৫০ কোটি টাকা। প্রথম তিনটি পঞ্চবার্ষিকী যোজনার পুরো বছরে মোট যে টাকা লগ্নী করা হয়েছে, এই অঙ্ক তার চেয়েও ৩২ কোটি টাকা বেশি। বিদ্যুতের বাবদ অর্থ বেড়েছে, বেড়েছে স্বল্প সঞ্চয় বাবদ সংগ্রহ। সঞ্চয় সংগ্রহের ব্যাপারে এই বাংলার স্থান এখনও সব রাজ্যের শীর্ষে।

প্রধানমন্ত্রীর বিশ দফা অর্থনৈতিক কর্মসূচী কিভাবে এই রাজ্যে রূপায়িত হচ্ছে, তার বিবরণও পাওয়া যায় রাজ্যপালের ভাষণ থেকে। জাতীয় লক্ষ্যের কথা মনে রেখে চাষের উন্নয়নের দিকেই দেওয়া হয়েছে বেশি নজর। ক্রমশ আরো বেশি এলাকা জুড়ে একই জমিতে একাধিক ফসল বোনা হচ্ছে। আগের তুলনায় অনেক বেশি জমিতে গম চাষ হচ্ছে। বিশ দফা কর্মসূচী অনুযায়ী দ্রুত খাদ্যশস্য ফলনের একটি বিশেষ কর্মসূচী হাতে নেওয়া হয়েছে, যার জন্যে খরচ হবে সাত কোটি টাকা। চলতি বছরে আমন ধানের ফলনের যে-লক্ষ্য (৫২ লাখ টন) নির্ধারিত হয়েছিল, তা পূর্ণ হয়েছে। জরুরি অবস্থা ঘোষণার পর ভূমিহীন ও প্রান্তিক চাষীদের মধ্যে ১৭ হাজার একরেরও বেশি পরিমাণ চাষের জমি বিলি করা হয়েছে। গ্রামের মানুষকে মহাজনী ঋণের হাত থেকে রেহাই দেওয়ার ব্যবস্থার কথাও উল্লেখ করেন রাজ্যপাল। শিল্পের ক্ষেত্রে শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের রীতিমতো উন্নতি হয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনও যথেষ্ট বেড়েছে। তবে রাজ্যপাল স্মরণ করিয়ে দেন, বিশ দফা কর্মসূচী রূপায়ণে প্রাথমিক সাফল্য সত্ত্বেও এখনও অনেক কাজ করার রয়েছে। এই কাজ শেষ করার জন্যে চাই সকলের সহযোগিতা।

উত্তর বাংলার উন্নয়ন

এই বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় উত্তর বাংলা যে অনেক ব্যাপারে কিছুটা পিছিয়ে আছে এটা কোনো নতুন কথা নয়। নতুন কথা হলো ঐ এলাকার উন্নয়নের দিকে এখন সরকারের নজর পড়েছে। দার্জিলিংয়ে ফেব্রুয়ারীর দশ তারিখে দার্জিলিং পার্বত্য এলাকা উন্নয়ন উপদেষ্টা কমিটির নবম বৈঠক হয়ে গেল। ঐ বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করলেন দার্জিলিং পার্বত্য এলাকা উন্নয়ন পরিষদ গঠনের জন্যে রাজ্য সরকার কিছু দিনের মধ্যেই বিধানসভায় বিল আনছেন। এই ধরনের একটি পরিষদ গঠনের দাবি অনেক দিন ধরেই জানিয়ে আসছে উত্তর বাংলার মানুষ। এখন যে উপদেষ্টা কমিটি কাজ করছে তার হাতে নির্দিষ্ট ক্ষমতা নেই। রাজ্য সরকার আগেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে উপদেষ্টা কমিটির কাজ ঠিকমতো চললে যথাসময়ে উন্নয়ন পরিষদ গঠন করবেন। উন্নয়ন ও পরিকল্পনা দপ্তরের পার্বত্য এলাকা দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী হবেন পরিষদের সভাপতি। পার্বত্য এলাকার উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরী ও রূপায়ণে রাজ্য সরকার এই উন্নয়ন পরিষদের সঙ্গে পরামর্শ করবেন। এদিকে উন্নয়ন ও পরিকল্পনা দপ্তরের পার্বত্য এলাকা শাখা দার্জিলিং পার্বত্য এলাকার জন্যে ১৯৭৬-৭৭ সালের কর্মসূচীর একটি খসড়া প্রস্তাব তৈরি করেছে। ঐ খসড়ায় পার্বত্য এলাকার জন্যে আট কোটি ৬২ লাখ টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে। এর মধ্যে চার কোটি ২৪ লাখ টাকা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে সহায্য হিসেবে চাওয়া হয়েছে। যোজনা কমিশন ১৯৭৪-৭৫ সাল থেকে দার্জিলিং পার্বত্য এলাকার উন্নয়নের জন্যে বিশেষ সাহায্য দিচ্ছেন। এ পর্যন্ত দুটি আর্থিক বছরে আড়াই কোটি টাকা করে সহায্য পাওয়া গেছে। আগামী আর্থিক বছরের পরিকল্পনায় আগের মতোই চাষবাস ও পর্যটনের প্রসারের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। চাষের জন্যে প্রায় ৮০ লাখ টাকা এবং পর্যটনের জন্যে ৭৭ লাখ টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে। অন্যান্য যে-সব খাতে মোটা টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে তার মধ্যে আছে ভূমি সংরক্ষণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, রাস্তা তৈরি, জলসরবরাহ ইত্যাদি।

উত্তর বাংলার পাঁচটি পিছিয়ে-পড়া জেলায় (দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, মালদহ ও পশ্চিম দিনাজপুর) চাষের প্রসারের জন্যে রাজ্য সরকারের কৃষি দপ্তর ইতিমধ্যেই কাজ সুরু করেছেন। এই কর্মসূচি অনুযায়ী প্রথমেই অগভীর নলকূপের ব্যবস্থা করার দিকে নজর দেওয়া হচ্ছে। দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি মহকুমায় ১০০টি, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারে ৩০০টি করে এবং মালদহ ও পশ্চিম দিনাজপুরে ৩৫০টি করে অগভীর নলকূপ বসানো হবে। পরে এইসব নলকূপ বিদ্যুৎচালিত করার ব্যবস্থাও হবে। এদিকে দার্জিলিংয়ে পর্যটক আকর্ষণের জন্যেও নানা ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। পর্যটকদের বাসস্থানের অসুবিধে দূর করার জন্যে রাজ্য সরকারের পর্যটন দপ্তর দার্জিলিং শহরের একটি সুপরিচিত হোটেল অধিগ্রহণ করছেন। এই হোটেলটিকে নতুন করে সাজানোর জন্যে কেন্দ্রীয় যোজনা কমিশন ছ' লাখ টাকা মঞ্জুর করেছেন। পর্যটন দপ্তর এর আগে কালিম্পং ও কার্শিয়াংয়ে দুটি টুরিস্ট লজ অধিগ্রহণ করেছেন। এদিকে ফেব্রুয়ারীর ১ তারিখে শিলিগুড়ির কাছে সেবকে মুখ্যমন্ত্রী যে মেডিকাল কলেজ ও হাসপাতালের উদ্বোধন করলেন তাতে উত্তর বাংলার মানুষের একটা দীর্ঘ দিনের দাবি পূরণ হলো। এখন ঐ হাসপাতালের শয্যা-সংখ্যা ২৫০। আরো ২৫০ শয্যার ব্যবস্থা করা হবে।

সেবক

৫-৩-৭৬

রশ্মী
হাওড়া
৪১/১, জি, টি, রোড, হাওড়া
• বেনারসী
• জেড • সিল্ক
• তাঁত • মিল
• গোমাক
• সাটিং • সুটিং
• ছিট কাপড়

CENTRAL LIBRARY

বিদেশের কথা

মার্কিন গমের ছলনা

নিউইয়র্ক থেকে পাঠান সমাচার'এর একটি সংবাদে প্রকাশ যে আমেরিকার খাদ্য-শস্য রপ্তানীকারীরা গত পাঁচ বছর ধরে আমদানীকারী দেশগুলিকে প্রতি বছর ১২ কোটি ডলার (প্রায় ১০৮ কোটি টাকা) ঠকিয়ে যাচ্ছে। এই প্রতারণার ফলে সবচেয়ে বেশী বঞ্চিত হচ্ছে এশিয়া ও আফ্রিকার সেই সব গরীব দেশ যারা মার্কিন পি-এল ৪৮০ খাতে পাঠান খাদ্যশস্যের উপর নির্ভরশীল। এই খবর দেওয়া হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একজন প্রতিনিধির উদ্ধৃতি উদ্ধৃত করে ফ্রান্সের সেন্ট লাউডে আন্তর্জাতিক পালিশ সংস্থা ইন্টারপল'-এর একটি বৈঠকে যোগ দিয়ে ঐ প্রতিনিধি জানিয়েছেন, নানাভাবে এই প্রতারণা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ওজন কম দিয়ে, নিকৃষ্ট জাতের খাদ্যশস্যকে উৎকৃষ্ট জাতের বলে চালিয়ে দিয়ে অথবা কুখ্যাত ভেজাল মিশ্র এবং জাহাজে বোঝাই করার সময় দেড় থেকে দুই শতাংশ দামী চুরি করে সরিয়ে রেখে এই ঠকানোর কারবার চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। গম, সয়াবীন, তুলা প্রভৃতি বিভিন্ন শস্যের বেলায়ই এই প্রতারণা চলছে।

যদিও কোন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে প্রসঙ্গটি এই প্রথম এল তাহলেও আমেরিকার ভিতরে ব্যাপারটা এখন আর গোপন নেই। প্রকৃতপক্ষে, উইলিয়াম রবিনসন নামে নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকার একজন রিপোর্টার গত কয়েক মাস ধরেই ব্যাপারটার পিছনে লেগে আছেন এবং তাঁর নিরলস অনুসন্ধানের ফলে এ ব্যাপারে অনেক কিছু খবর জানা গেছে। আমেরিকার সরকারী মহল ও ব্যবসায়ী মহলকে জড়িয়ে একটার পর একটা যেসব কেলেঙ্কারীর খবর ফাঁস হচ্ছে সেগুলির মধ্যে এখন খাদ্যশস্য রপ্তানী সংক্রান্ত এই কেলেঙ্কারীও স্থান পেতে চলেছে বলে মনে হয়।

গত নভেম্বর মাসে প্রকাশিত 'নিউইয়র্ক টাইমস'-এর একটি রিপোর্টে দেখা যায় যে, বাঙ্গো কর্পোরেশন নামে আমেরিকার একটি খাদ্যশস্য রপ্তানীকারী সংস্থার এক-জন কর্মচারী পত্রিকার রিপোর্টারকে বলে-ছেন যে, পি-এল ৪৮০ কর্মসূচীতে যে খাদ্যশস্য পাঠান হয়েছে তার ব্যাপারে ব্যাপক অনাচার সম্পর্কে তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা রয়েছে। তিনি বলেছেন, ভারত-বর্ষে যে সব খাদ্যের জাহাজ পাঠান হত সেগুলিতে নিয়মিতভাবে ওজনে কম দেওয়া হত। কোন কোন ক্ষেত্রে দশ হাজার বুশেল (প্রায় ২৭২ টন) কম ওজন দেওয়া হয়েছে। বাঙ্গো কর্পোরেশনের এই কর্মচারী একটি দৃষ্টান্তের কথা জানেন যেখানে ভারতে পাঠান একটি মার্কিন গমের জাহাজে ২৮ হাজার বুশেল (প্রায় ৭৬২ টন) কম ওজন দেওয়া হয়েছিল। এই সংবাদের সঙ্গে নিজস্ব একটি মন্তব্য যোগ করে নিউইয়র্ক

সব যে খাদ্যশস্য পৌঁছচ্ছে তা ঠিকমত ওজন করে নেওয়ার ব্যবস্থা অনেক গরীব দেশেরই নেই।

নিউইয়র্ক টাইমসের ঐ সংবাদে যে ভাঙ্গো কর্পোরেশনের কথা লেখা হয়েছে সেটি হচ্ছে আমেরিকার তৃতীয় বৃহত্তম খাদ্যশস্য রপ্তানীকারী প্রতিষ্ঠান। সাম্প্রতিক একটি সংবাদে প্রকাশ যে, আমেরিকার কেন্দ্রীয় সরকার খাদ্যশস্য রপ্তানীর ব্যবসা সম্পর্কে যে অনুসন্ধান চালাচ্ছেন তাতে এই ভাঙ্গো কর্পোরেশনসহ মোট ৬৪টি প্রতি-ষ্ঠান খাদ্যশস্য রপ্তানীতে চুরি-জুয়াচুরির অভিযোগ স্বীকার করেছে।

নিউইয়র্ক টাইমস ব্যাপারটা নিয়ে খোঁচাখুঁচি করার ফলে এখন এমন অনেক খবর বেরিয়ে পড়ছে যেগুলি এতদিন চাপা ছিল। যেমন, ভাঙ্গো কর্পোরেশনের কর্মচারী বলেছেন নীরস শস্যকে সরস বলে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। রপ্তানীর আগে শস্যের গুণাগুণ ও ওজন পরীক্ষা করে সার্টি-ফিকেট দেওয়ার দায়িত্ব মার্কিন কৃষি বিভাগের যে ইন্সপেকটরদের উপর ন্যস্ত তাঁদের ঘুষ খাইয়ে এটা করিয়ে নেওয়া হয়েছে। পোকায় ধরা শস্য চালিয়ে দেওয়ার দরুন ভাঙ্গো কর্পোরেশনের ঐ কর্মচারী একবার ইন্সপেকটরদের এক হাজার ডলার ঘুষ দিয়েছিলেন।

আরও জানা যাচ্ছে যে, ১৯৭০ সালে মার্কিন কৃষি বিভাগের একজন অফিসার এই মর্মে রিপোর্ট দিয়েছিলেন যে, যে শস্য পাঠান হচ্ছে তার নমুনাগুলি সার্টিফিকেটের সঙ্গে মিলছে না। ঐ রিপোর্টে একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করে বলা হয়েছিল, একটি সংস্থা খাদ্যশস্যের সঙ্গে মেশাবার জন্য এক গাড়ী ধূলো তুষ কিনেছিল। ১৯৭০ সালের এই রিপোর্টের সূত্র ধরে অনু-সন্ধান চালাবার জন্য মার্কিন কৃষি বিভাগের অফিসার অনুরোধ জানিয়ে-ছিলেন, কিন্তু এই রিপোর্ট সে সময়ে সম্পূর্ণ চেপে দেওয়া হয়েছিল।

১৯৭০ সালের আর একটি রিপোর্টে বলা হয়েছিল, খাদ্যশস্যের মধ্যে পারদ-যুক্ত বীজধান ও ছাতাধরা দানা, ইঁদুরের নাদি, পোকায়-কাটা দানা ইত্যাদি অনেক ক্ষতিকর জিনিসের ভেজাল ধরা পড়া সত্ত্বেও মার্কিন কৃষি বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নিয়ম অনুযায়ী ব্যাপারটা মার্কিন সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের নজরে আনেন নি।

পুরান নথিপত্র থেকে আরও দেখা যাচ্ছে, ১৯৬৯ সালে ইউরোপের খাদ্যশস্য ব্যবসায়ীরা এই মর্মে অভিযোগ করে-ছিলেন যে, আমেরিকার রপ্তানীর আগে খাদ্যশস্য পরীক্ষার যে ব্যবস্থা আছে তাতে ঘুষ ও জালিয়াতীর কারবার চলে। গত জুন মাসে নিউইয়র্ক টাইমস-এর একটি রিপোর্টে বলা হয়েছিল মার্চিলের মার্কিন কনসুলেট স্পানিশ সরকারের তরফ থেকে এই মর্মে একটি নালিশ এসেছে যে, আমে-রিকার নিউ অরলিয়ান্স থেকে খাদ্যশস্যের যে সব জাহাজ এসেছে সেগুলিতে ওজনে ফাঁকি দেওয়া হচ্ছে। একটি ক্ষেত্রে এই ফাঁকির পরিমাণ ছিল ০.৭১ শতাংশ।

সংবাদপত্রে ব্যাপারটা নিয়ে নাড়াচাড়া হওয়ায় মার্কিন সরকারেরও টনক নড়েছে। খাদ্যশস্য রপ্তানীতে এই চুরি-জুয়াচুরির ফল শুধু যে আমদানীকারী দেশগুলিই প্রতারিত হচ্ছে তা নয়, মার্কিন সরকারও প্রতারিত হচ্ছেন। কারণ, পি-এল-৪৮০ কর্মসূচী অনুযায়ী যে খাদ্যশস্য বিদেশে পাঠান হচ্ছে তার দামটা রপ্তানীকারীরা উসুল করে নিচ্ছেন মার্কিন সরকারের কাছ থেকে। কম দামের জিনিস পাঠিয়ে রপ্তানীকারীরা সরকারের কাছ থেকে বেশী টাকা আদায় করে নিচ্ছেন। এখন হিসাব মেলাতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে, অনেক রপ্তানীকারীরই হাতে যে পরিমাণ খাদ্যশস্য মজুত থাকার কথা তার চেয়ে বেশী পরিমাণ মজুত রয়ে গেছে। মার্কিন সরকার এখন সে দেশের বড় বড় খাদ্যশস্য রপ্তানীকারী কোম্পানীগুলির কার্যকলাপ সম্পর্কে অনুসন্ধান করে দেখছেন এবং ভবিষ্যতে আমেরিকা থেকে রপ্তানী করা খাদ্যশস্যের গুণাগুণের উপর আরও কড়া নজর রাখার আশ্বাস দিচ্ছেন।

১৯৫৪ সালে আমেরিকার পি-এল-৪৮০ কর্মসূচী চালু হওয়ার পর থেকে এযাবৎ ২৫০০ কোটি ডলার (২০ হাজার কোটি টাকা) মূল্যের ১০ কোটি টন খাদ্য-শস্য আমেরিকা থেকে বিদেশে পাঠান হয়েছে।

২-৩-৭৬ **পুণ্ডরীক**

সর্বধর্ম উৎসবঃ 'এক'

দেশে-দেশে মানবে-মানবে ধর্মীয় প্রীতি রক্ষার্থে মহামনীষীরা বলে এসেছেন : মানবজাতির, কী প্রাচীন—কী অধুনিক সর্ব-ধর্মই উৎসবঃ "এক"। কিন্তু কেন, তার কোন বৈজ্ঞানিক তথ্য ঐতিহাসিক প্রমাণ তাঁরা আজো দিতে পারেন নি। স্বগোবিষ্কারক কলপতরু তাঁর ইঙ্গিতে সে-সত্যের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন।

ইঙ্গিত /১৫.০০/ মাত্র

বিশ্বমন্দির প্রকাশনী, কলি-২৮

দোল বসন্ত উৎসব

তারাপ্রসন্ন ব্রহ্মচারী

বাসন্তী পূর্ণিমায় শ্রীকৃষ্ণ-শ্রীমতীর রঙের খেলায় মিলনকথা পৃথিবীর চির-কালের দোলউৎসবের কাহিনী। বৈদিক যুগেও বসন্ত ঋতুতে বসন্ত উৎসবের রঙ্গে এই নিদর্শন পাওয়া যায়। সেখানে বসন্ত উৎসবে অনুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ যজ্ঞ। যজ্ঞের বেদীর নাম দক্ষতনা, যজ্ঞের অগ্নি মহাদেব। মহাদেব অগ্নি সূর্য। আর দক্ষতনা— পৃথিবী প্রকৃতি। এখানেও সেই পৃথিবী আর সূর্যের মিলন। এই গ্রীক যুগের অনেক আগের ব্যাপার।

পৌরাণিকযুগে বসন্ত উৎসব মদন উৎসবে পরিণত হল। কালিকা পুরাণে দেখা যায় হর-পার্বতী মিলনের মধুমাসের ত্রয়োদশী তিথিতে মদনের জন্ম। মদন বসন্ত ঋতুর প্রতীক। নতুন জীবনের সূচনা।

মদন উৎসবের সঙ্গে গ্রীসের ডায়ানো-সিয়া উৎসবের সাদৃশ্য রয়েছে পরিষ্কার-ভাবে। দেবতা জিউস— সূর্য-বিকল্প প্রতিরূপ তিনি। দেবী ডেমে পৃথিবীর প্রতিমূর্তি। এই সূর্য-প্রকৃতির মিলন— জিউস ও ডেমের মিলনে ডায়োনিসাসের জন্ম। ডায়োনিসাস মদনের প্রতিরূপ, মদনের প্রকৃতি।

শ্রীমতী ফুলে ফুলে দেখেছিলেন শ্রীকৃষ্ণের মুখের হাসি। সে হাসি এককালে ফুটে উঠেছিল শ্রীকৃষ্ণের ফুলদোলে বৈশাখী পূর্ণিমায় অতীতের নববর্ষের দিনে। দেবতার অঙ্গে ফুল ছুঁইয়ে সেই প্রসাদী ফুল নিয়ে ফুলদোলের খেলা শুরু হত। সিংহাসন থেকে দেবতা যেন নেমে আসতেন মাটির বুকে মাটির মানুষের কাছে, দোল-খেলার জন্যে। ফুলের পরশে ছোট-বড় ধনী-গরীব নির্বিশেষে সকলে একাত্মা হয়ে উঠত। সকলে যেন দেবতাময় হয়ে উঠত: পুরুষোত্তম বলেছেন, দোল দেবতা ধরাতলে নেমে এসে সকলের সঙ্গে লীলাখেলা করেন। প্রেম-প্রীতির আলিঙ্গন বিলিয়ে দেন হৃদয়। হৃদয় থেকে হৃদয়ে। ফুল ফুলে দোল খেলা পৃথিবীর অনেক জায়গায় প্রচলিত ছিল একসময়। রোম-নীস-কেনস ও ভীলগ্রামেতে ফুল ছোঁড়া ছুঁড়ির খেলায় মেতে ওঠে মানুষ। নানা ফুলের নানা রঙে রাঙিয়ে নেয় নিজেদের মন-প্রাণ।

মদন উৎসবে মদনের প্রতীক হিসেবে অশোক গাছকে পুজো করত মেয়েরা। কুসুম ফুল রঙের শাড়ি পরে মদন পর স্বামীকে পুজো করত তারা স্বামীকে শিব আর নিজেকে প্রকৃতি আরাধনা। শিব-দুর্গার মিলন ব্যাপারটাও এসেছে এবার এই মধ্যে।

হোলির আগুনের জন্ম নিয়ে উৎসব শুরু করে রাজস্থানের মেয়েরা দুর্গার মূর্তি গড়ে তাঁদের বিবা পালন করে।

আদিবাসী ওঁরাওদের খাদ্যি ফুল উৎসবের কথা মনে করিয়ে শালফুল ফোটা শুরু হলেই বে মাদল, শুরু হয় পুজো। সূর্যদেব ধরতী মাঈর মিলন উৎসব। সা বলেছেন:

> The rite is celebrated month of may.... mystic rince of Sungod (Bhagwa the goddess earth (Dhartir induce them to be fruit give good crops.

বসন্ত ঋতুর কিরণকরা রং রঙ্গিন হয়ে ওঠে। রঙ্গিন হ দেবতার পরশের উপচার। নানা রঙের নানা ফুল। নির্যাসের রং মিশে যায় আবি রঙের খেলায় দেবতার পরশ ছ মানুষের অন্তর পবিত্র প্রেমময় হ আশীর্বাদ বিলিয়ে দিয়ে।

মানুষ হয়ে ওঠে সেই আমি শ্রীরাধা। দিব্যদৃষ্টিতে দেখে সেই যার আকর্ষণে বিশ্ব সংসার অন্ধো বাঁধা—সেই বিশ্ব নিয়ন্তা, আকর্ষ শ্রীকৃষ্ণকে প্রতিটি বস্তুর মধ্যে।

উপন্যাস

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

আদ্য শেষ রজনী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

।। তিন ।।

মুখ্যমন্ত্রী খানিকক্ষণ দেখবেন বলে এসেছিলেন। কাজের চাপ। কিন্তু উঠতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত বসে দেখলেন। জলদের পর সুদীপ আর রজনী ওর সামনে এসে দাঁড়ালো। রজনী একটু ঝুঁকে নমস্কার করল। সুদীপও তাই। মুখ্যমন্ত্রী হাসলেন। হাসিমুখে রজনীর হাত একটু ধরলেন। কী যেন বললেন। অমিয় প্রায় ছুটে বেরিয়ে যেতে যেতে তার কিছুই শুনতে পেল না।

তিনি বেরিয়ে যেতেই হল ফাঁকা।

ঠান্ডা অডিটোরিয়ামে অমিয় একা বসে। সামনেই বিরাট মঞ্চ জুড়ে দামি কাপড়ের স্তূপ। এখনো পাঁচটা বাজতে দশ। আর এক ঘন্টার ভেতর অন্তত তিন দিনের হল ভাড়া জোগাড় করে ওপেন এয়ার থিয়েটার পৌঁছতে হবে। নয়ত শো বন্ধ। টাকা রিফান্ড। সুন্দর টাইম যাচ্ছে!

অমিয়র বোধহয় কি মনে হল—বাকি স্টেজের দরজায় এসে দাঁড়াল। অনুভার ঠাকুরবি আর রজনীর ঠাকুরঝি—দুটো দু রকমের জিনিস। একদম আলাদা। বড় ইচ্ছে হচ্ছিল—একবার রজনীর হাত দুখানি ধরে বলে—এমন আর হব না। এর চেয়ে বেশি আর কি বলা যায়। মন্দ বলার ভাষা অনেক। ভালো বলার ভাষা ভীষণ কম। যা বলা যায়—তা হল—ভালো। আর কি বলবে! যার অভিনয় দেখতে দেখতে রাত মুখ্যমন্ত্রী পরের প্রোগ্রাম ভুলে যান—অভিনয়ের শেষে হাত ধরে বলেন—ভালো—তাকে সে কি বলবে।

অমিয়র চোখের সামনেই সাজঘর থেকে রজনী বেরিয়ে এল। নীহারের মেয়ে। শুধু নীহার বললেই বাঙালী মাত্রেই চেনে। রজনীর ঠোঁটে নাকে মায়ের আদল আছে। নীহারের ছবি অমিয় সেই কোন ছেলেবেলায় মায়ের কোলে বসে দেখেছে।

সরু কবিতার পথ করে দিতে অমিয় পথে দাঁড়াল। রজনী ধুপ্পা এগিয়ে ঘুরে দাঁড়াল 'আপনি? কাকে চান?'

—'কাউকে না।' বলেও অমিয় নার্ভাস ভাবটা কাটিয়ে উঠতে পারল না। 'আপনি বড় সুন্দর করেছেন!' তারপর ফস করে বলে ফেলল, 'আমি কেউ না। আপনার ফ্যানমাত্র!'

দাঁড়ান দাঁড়ান। কোথায় দেখেছি আপনাকে। হ্যাঁ—কালই তো দেখলাম।'

অমিয় ভাবাচেকা খেয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

'ওপেন এয়ার থিয়েটারে কালই তো দেখলাম আপনাকে, স্ফোবরালার মতো। তাই না—'

—আপনি দেখেছেন? কি ভাগ্য আমাদের' অমিয় বলে যাচ্ছিল।

—আপনিই তো অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায়?

—হ্যাঁ।' এক্ষণে অমিয় পায়ের নিচে মাটি পেল।

—চলুন। মেক-আপ তোলা হয়নি। একটা টাকসি নিতে হবে। আপনার অভিনয় আমি আগেও দেখেছি। অপূর্ব মালতী এক কথায়। তাই না?'

—হ্যাঁ। আপনাকে স্টেজে এই প্রথম দেখলাম।'

—আগে একবারও দেখেননি?'

—না। আন্টনিতে দেখবার ইচ্ছে ছিল। ফুটফুলে বলে দুদিন ফিরে গেছি।'

—ওমা! তাই নাকি! একবার তো বললেন ভেতরে এসে। আপনারা দেখতে এলে কত মন দিয়ে অভিনয় করি দেখতেন—'

অমিয় জানে—কথাটা সত্যি। কেউ বলে দেখতে এলে সবটা অভিনয় তাকেই যেন নিবেদন করে তার চোখের সামনে স্টেজ তুলে ধরা হয়। তখন গা ঢালা সবটুকু দিতে ইচ্ছে করে।

রাস্তাটা নির্জন। হেঁটে গিয়ে চৌরঙ্গীতে পড়লে টাকসি ধরা যাবে। প্রায় সাতে পাঁচটা। টাকাটা এখনো জোগাড় হয়নি।

—'সেলসম্যানের রোল কিন্তু বেশ করছেন আপনি।'

—'আপনিও তো ঠাকুরঝি করলেন। অনুভার কথা ভুলে গেলাম।'

—'ওভাবে বলবেন না।' বলতে বলতে রজনী দাঁড়িয়ে পড়ল। 'অনুভা কত বড় ছিলেন। আমায় যে কি ভালবাসতেন।' তারপর কী ভেবে রজনী বলল—'আসুন না আমার সঙ্গে টাকসিতে।'

—না। আরেকদিন। আপনার অভিনয় দেখতে গিয়ে কাজ মাথায় উঠে বসে আছে। আজই এখুনি গিয়ে হলভাড়া ক্লিয়ার না করলে সন্ধের শোয় টাকা রিফান্ড করে পাততাড়ি গোটাতে হবে—' একরকম ছুটে পালাবার মতই বলে গেল অমিয়।

অমিয়র দিকে মুখ রজনীর। হঠাৎ আটমেটিক যন্ত্রের মত বাঁ হাত তুলে একটা ট্যাকসিকে হাত করে থামালো। একদম দাঁড় না করে দরজা খুলে পেছনের জানলার সিটে বসে পড়ল। ট্যাকসি স্টার্ট নিচ্ছিল। হাতের ইসারায় থামতে বলে রজনী কোলের ব্যাগটার মুখ খুলে ফেলল।

প্রায় সন্ধে ছটার কলকাতা। ট্রাফিকের ইঞ্জিনটা গজরাচ্ছিল। পেছনের জানলার পাশে অমিয় দাঁড়িয়ে।

রজনী সিটে বসেই জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলল—'শুনছ?'

—'কিসের?'

—'হলভাড়া?'

—'মানে?'

—'আহা! দেরি করাচ্ছেন কেন? বলেতো কত?'

—'অন্তত তিনদিনের। সে তো অনেক—পাঁচশোর কাছাকাছি—'

ভাঁজকরা কখানা নোট অমিয়র হাতে রজনী তুলে দিতেই ট্যাকসি স্টার্ট নিল। রজনী জানলায় মুখ বাড়িয়ে বলল—'বাকিটা জোগাড় করে নিন।'

যাকে বলে ফ্যাল ফ্যাল অবস্থায় অমিয় নোট গুনে দেখলো চারখানা একশো টাকার নোট। মনে মনেই বলল—বাকিটা জোগাড় হয়ে যাবেই। টিকিটের সেলও তো আছে। কিন্তু টাকাটা ফিরিয়ে দেবার চান্সও দিল না মেয়েটা।

গেট খোলা দাঁড়িয়ে। অমিয় দূর থেকেই দেখতে পেল—শংকর কী রকম অস্থির হয়ে পড়েছে। এক জায়গায় দাঁড়িয়েই প্রায় পা নাচাচ্ছে। অমিয়কে দেখে বলে উঠল 'কোথায় ছিলে বলতো? বাড়িতে পাইনি। পুপাদের পাইনি। আর আধঘন্টাও বাকি নেই শোয়ের—'

অমিয় কোন কথার জবাব না দিয়ে খুব আস্তে বলল—'সেল কী রকম?'

'এক টাকা তিন টাকার সিট ফুল। আজ তোমার বিক্রি বন্ধ গিয়ে একদম গুল্ট মেরে বসে আছে। একদম তৈরি হয়ে এসেছে।'

—'টিকিট কাটতে দিসনি তো।'

—আগেভাগে লোক পাঠিয়ে টিকিট কেটেছে। পাছে আমরা টিকিট কাটতে না পাই—'

—'ভালো। ভেতরে দুটো টোস্ট, একটা ডিম দিতে বলিস। দুধ দিয়ে কফি।'

—'এখুনি পাঠাচ্ছি। টাকার ব্যবস্থা হোল?'

—'হুঁ।'

—'আজ হাউসফুল যাবে দেখা যাবে। আসলাকি থাটিন আমাদের লাকি থার্টিন।'

অমিয় কোন কথা না বলে মেকআপের আয়নার সামনে গিয়ে বসল। তারপর ড্রেসারকে দিয়ে চারখানা একশো টাকার নোট পাঠিয়ে দিয়ে তাকে বলতে বলল—সেলের টাকা থেকে বাকি টাকা শোয়ের পর দিয়ে দেওয়া হবে—

ড্রপ উঠতেই কিছু নতুন ইংগল-নাশা সামরিক মাথা ফেরিওয়ালা স্টেজ থেকে দেখতে পেল একটা টেন্স ভাব নিয়ে বিকু দত্ত বসে আছে। লোকটা পয়া। নির্বিকার দৃষ্টি সারিয়ে নিয়ে অমিয় পুরোপুরি সেলসম্যান হয়ে গেল। বার্থ ফেরিওয়ালা। আজ তাকে দেখতে হাউস যোগাড় ফুল হয়েছে। কালো কালো মুণ্ডু শুধু। ফুটের স্যুটে দশ টাকার তিনটে নোট ফেল।

বিকুর জন্যে সবটুকু ঢেলে দিয়ে অভিনয় করে গেল অমিয়। একবার নজরে পড়ল অডিয়েন্সের সঙ্গে বিকু দত্তও ক্ল্যাপ দিচ্ছে। থামতে চাইছে না। যে-সিনে শংকর শ্যামলা গৃহস্থের সন্তান মেধাবী উকিল ছেলে হিসেবে এন্ট্রান্স নিল—সেখানে অমিয় শংকরের দাপটের অভিনয় মুদ্রা কথার আভাসে ইংগিতে তুচ্ছ করে দিতে লাগল। তখন আর বিকুকে বোঝা যায় না। বিকু দত্ত বসে বসেই উঠে দাঁড়াচ্ছিল।

অভিনয়ের ভেতরেও অমিয় আজ কিছু অনমনস্ক হয়ে পড়ছিল। কি যেন ফেলে এসেছে। কোন ভায়ালগটা বুঝি বলা চলে গেল। কোথ সিনের ব্লাপের পর অন্ধকার স্টেজে মুখ তুলে কথা বলতে বলতে তার সন্দেহ হল—ফোকাসের বাইরে চলে যাচ্ছে।

কিন্তু শোয়ের শেষে পাবলিক একদম স্টেজের সামনে এগিয়ে এল। এটা ভাল-বাসার ব্যাপার। ড্রপ আবার উঠল। সবাইকে একসঙ্গে স্টেজে এসে গ্রুপ ফটো তোলার জন্যে দাঁড়াতে হল। সেখান থেকে দাঁড়িয়ে অমিয় ভ্রু তুলে পাবলিকের ভেতর থেকে এগিয়ে আসা বিকু দত্তকে লক্ষ্য করল। মনে মনে। উহু, ওখান থেকে স্টেজে উঠতে হবে না। বোকেও বিকু দত্ত। থেমে গেল। নরহ দেওয়াল টপকানোর মত অডিটোরিয়াম থেকেই সবার সামনে স্টেজে উঠে আসছিল।

আবার ড্রপ পড়ল।

এবার আর অমিয় দাঁড়াতে পারছিল না। স্টেজেরই কোণে লাস্ট সিনের চেয়ারটা পড়ে ছিল। হাতে পেয়ে পড়ল। সারাদিন খাওয়াই হয় নি এক রকম। আজকে ভীষণ [illegible]

বেরু? আশ্চর্য! কোনদিন যে কী হয়ে যায়।

—'এই যে! আজ কিসে ভর করেছিল? আজ একদম অন্যরকম অমিয়।

'—কী রকম?' বলে অমিয় পাশের চেয়ার থেকে পা তুলে নিল।

সেখানে বিকু দত্ত বসে পড়ল, 'একদম অন্যরকম। যারা দুবার দেখেছে—তারাই বলাবলি।'

—দুবারের অডিয়েন্সও আছে নাকি?'

—'আছে অমিয়। তোমার জন্যে অডিয়েন্স ওয়েট করে আছে। তুমি নিজেকে আরও খুলে ফেল।'

ইদানীং অমিয়ও বিকুকে তুমি বলে ডাকে। পয়সা হলে একদিন লোকটাকে পেট ভরে রাম খাওয়াবে। রাম খেতে বড় ভালবাসে বিকু। ফাইভ ইয়ার্স; খরে একটা রাম নয়। বিকুকে একদিন ট্যাকসি থামিয়ে কিনতে দেখেছিল অমিয়। সেই ট্যাকসিতেই পেছনের সিটে বসে ছিল অমিয়। ট্যাকসির বুটে তিন বস্তা বীজধান ছিল। বিকু কিছু জায়গা চাষ করে। কলকাতায় কাছেই; তখন ধর্মতলা। আধ ঘন্টার রাস্তা মাত্র; অমিয়কে নিয়ে বিকু তার গাঁয়ের বাড়িতে গিয়েছিল। তখনই বিকু গাড়ি থামিয়ে কিনেছিল পথে। তাই নামটা জানে অমিয়, নয়ত তার জানবার কথা নয়। ওসব ধার না অমিয়। সেদিন বিকু চলন্ত ট্যাকসিতে বসে নীট খাচ্ছিল— আধ বীজধানের অঙ্কুর কি করে বেরোয়—চারা কি করে তৈরি হয়—তাই শোনাতে শোনাতে অমিয়কে দেশের বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছিল। পথে লোকাল ট্রেনের লোডশেডিংয়ে পড়েছিল একবার বিকু নয়না দিকে স্বাদ পায়।

অমিয় কি বলতে যাচ্ছিল বিকুকে। মেয়েদের ড্রেসার এসে বলল, 'দাদা আপনার ফোন।'

বিকু বলল, 'এখন আবার কে ডাকে?'

'দেখি'—বলে উঠে যাবার সময়ও অমিয় ভাবতে পারে নি—কার ফোন।

ওপাশ থেকে ভেসে এল—হাউস তো ফুল গেল আজ।

—কে বলছেন আপনি?

—আহা! ফোন করে টিকিট চেয়ে ছিলাম। বললে—হাউস ফুল।'

—আপনি! আপনি দেখবেন জানলে গেটে কেউ থাকত আমাদের।

—তা বলছি নে; একবার দেখেছি। দেখব তো আবার জন্মদাই। কিন্তু মেক-আপ তোলার পর—কী খেয়াল হল—তাই ওপেন এয়ার থিয়েটারের অফিসে ফোন করলাম। টিকিট চাইতেই ওপাশ থেকে বলল।—হাউসফুল। শুনে কি যে আনন্দ [illegible]

অমিয় গম্ভীর গলায় বলল, এ নাটকের আজই লাস্ট নাইট গেল।

—ও মা! তা কেন? আজই ফুল দিলেন?

—স্টেজে অভিনয় করতে করতে আজই ঠিক করলাম। এখনো কেউ জানে না। আপনাকেই প্রথম বললাম।

—তাই বুঝি। তা কেন?

—আপনাকে গিয়ে বলব। ফোন নামিয়ে রাখল অমিয়। তখনো রজনী ফোন ছাড়েনি।

ফাঁকা মঞ্চে বসে বিকু দত্ত পকেট থেকে ডিমসেদ্ধ বের করে খাচ্ছিল। বিকুর এ স্বভাব অমিয় জানে। কোথাও যেতে হলে বিকু পথের ধারের ডিম সেদ্ধওয়ালার কাছ থেকে খোসাসুদ্ধ সেদ্ধ ডিম কিনে নেয় পাঁচ-ছটা। এখন টুলের গায়ে ঠুকে ঠুকে খোসা ছেলে নিচ্ছিল।

—চল বিকু, এক জায়গা থেকে ঘুরে আসি।

—কোথায়? বলে উঠে দাঁড়াল বিকু। কটা সেদ্ধ ডিম কিনে নি তাহলে। বাইরে ফুটপাথে তো এখনো বিক্রি হচ্ছে—

—না। সেখানে তোমাকে দেখলে অনেক ভাল-মন্দ খাওয়াবে। চল।'

'—মেকআপ তুলবে না?'

—সে-একেবারে বাড়ি গিয়ে হবে। যাবে তো ট্যাকসিতে—

বেরোতে বেরোতে অমিয় শংকরকে সব বলে দিয়ে বিকুকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। শংকর তখন সাদা ধুপের ড্রেস, সেট, টেপ সামলাচ্ছিল।

সেন্ট্রাল অ্যাভেন্যুতে ট্যাকসি পড়তেই বিকু আর থাকতে পারল না। কোথায় চলেছি আমরা?

—নীহারের ওখানে।

—কোন নীহার?

—নীহার একজনই হয়। যাঁর বিশ্বাস যাকে বন্ধু বলে ডাকতেন।

—তিনি তো নেই।

—তাঁর বাড়িতে যাচ্ছি। রজনীর কাছে।

—গিরীশ পার্কের ওখানে? সেই বাড়িতে? মায়ের বাড়িতেই থাকে রজনী?'

—তাই তো জানতাম। কলেজে পড়বার সময় দেখেছি—সকাল ন'টা নাগাদ নীহারের জন্যে স্টুডিওর গাড়ি এসে দাঁড়িয়ে থাকত।

দোতলায় উঠে কলিংবেল টিপবার আগে অমিয় বলল, এই যাঃ। মেকআপ মুখে এসেছি যে।

—কী আসে যায়!

অমিয় দেখল বিকু দত্ত পকেটের শেষ ডিমসেদ্ধটা রজনীর নাম উচ্চারণ করে নিল।

'রূপা'র বই

॥ সমালোচনা ও জীবনকথা ॥

কালীপদ সরকার
মুখবন্ধ : শ্রীইন্দ্রপুরীর চক্রবর্তী
কৃষ্ণকথা চিরন্তনী ১২.০০

ডঃ সুকুমার সেন
সৎ চিৎ আনন্দময় :
শ্রীঅরবিন্দ ভাষ্য ৫.০০

ডঃ সুকুমার বসু ও সুহৃদগোপাল দত্ত
মনস্পতি শ্রীঅরবিন্দ ১২.০০

সুনীলকুমার ঘোষ সম্পাদিত
ভূপেন্দ্রনাথ : রচনাবলী
ও জীবনী ৮.০০

মেজো. হেস্‌/দীপক চৌধুরী
প্রেসিডেন্ট নিক্সন ৩.৫০

॥ চরিত্র-চিত্রণ ॥

অনু বন্দ্যোপাধ্যায়
বহুরূপী গান্ধী ৬.০০

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
নারী রহস্যময়ী ৫.০০

॥ কবিতা সঙ্কলন ॥

সুশীল জানা
সহস্র বর্ষের প্রেম ৬.০০

জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়
অগ্নিষ্টুপ ২.০০
একটি ধানের শীষের উপরে
জাপানী কবিতাগুচ্ছ : ২.৫০

সুমিত্রানন্দন পন্ত
[জ্ঞানপীঠ পুরস্কার প্রাপ্ত]
চিদম্বরা সঞ্চয়ন ৭.০০

॥ কাব্য নাটিকা ॥

চিত্তরঞ্জন মাইতি
বসন্ত-বিলাপ ৪.০০

॥ ভক্তি-গীতি ॥

কল্যাণকুমার মুখোপাধ্যায়
মায়ের গান ৩.০০

॥ অভিযান কাহিনী ॥

পরিমল গোস্বামী
বনপথের পাঁচালী ৬.০০

॥ রম্য রচনা ॥

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়
চলমান জীবন (২য় পর্ব) ৭.০০

পরিমল গোস্বামী
ইতঃশ্চেত ৬.০০

॥ গল্প-সঙ্কলন ॥

পরিমল গোস্বামী
পুরুষের ভাগ্য ১২.০০

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
বরবর্ণিনী ৩.০০
প্রাচ্য পাকড়াশী
বসন্ত বৌরী ৩.৫০

চিত্তরঞ্জন মাইতি
অনেক বসন্ত দৃষ্টি মন ৩.৫০

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও
অমিতভূষণ ঠাকুর
চীনা মাটি (চীনা গল্প) ৬.০০

বারট্রান্ড রাসেল/অজিতকৃষ্ণ বসু
শহরতলির শয়তান ৪.৫০

মপাসাঁ/অরুণকুমার চক্রবর্তী ও
গীতা গুহ রায়
মপাসাঁর প্রেমের গল্প ৬.০০

তুফান ফ্রাঙ্কাইল/দীপক চৌধুরী
গল্প-সংগ্রহ (১ম খণ্ড) ৫.০০

তারাপদ রাহা
আরব্য রজনী :
১ম ও ২য় খণ্ড—প্রতি খণ্ড ৬.০০
৩য়—৮ম খণ্ড—প্রতি খণ্ড ৫.০০
১০ম খণ্ড ৮.০০

॥ বিশেষ সাহিত্য ॥

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়
বাবুইয়ের অ্যাডভেঞ্চার
উপন্যাস/৪.৫০

জিলিয়াকোস/পবিত্রপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়
ডাকের কথা ৪.০০

Rupa Publications :

Benedetto Croce
Translated from the Italian by Douglas Ainslie
AESTHETIC : Rs. 45/-

Bholanath Bhattacharya
KRISHNA : in the traditional painting of Bengal : Rs. 35/-

Sudhir Ghosh
GANDHI'S EMISSARY . Rs. 30/-

Jarishankar Prasad
Translated from the Hindi by Jaikishandas Sadani
KAMAYANI : Rs. 25/-

W. J. Wilkins
HINDU MYTHOLOGY Rs. 18/-
MODERN HINDUISM Rs. 16/-

H. J. C. Grierson edited
Shakespeare's MACBET
HARDBACK Rs. 18/-
PAPERBACK Rs. 12/-

Tuhin Das
SWAN-SONG OF THE CROW AND OTHER POEMS Rs. 12.50

Premila Lal
INDIAN RECIPES Rs. 12/-

Durga Das
Introduction by Dr. Zakir Husain
INDIA : FROM CURZON TO NEHRU AND AFTER Rs. 12/-

Ivan Illich and Others
Edited by Peter Buckman
EDUCATION WITHOUT SCHOOL : Rs. 10/-

Ivan Illich
ENERGY AND EQUTY Rs. 6/-

LIST ON APPLICATION

১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট : কলকাতা ৭০০০১২

Rupa & Co. 15 Bankim Chatterjee Street, Calcutta 700 012.

CENTRAL LIBRARY

খোঁপা খুলে ফেলেছে। চাপা ঘামের গন্ধ। মাথায় পাট করে আঁচড়ানো ঠাসা চুল: বোধহয় কিকেলে চান করেছে। সিঁথি কেটে একদম পালিশ করে চিরুনি টেনেছে যেন। অমিয় জানে, বিকু এ ভাবে মাথা আঁচড়ে সুখ পায়। ভারি ঘাড়, ভারি গাল। সাপ্তাহিক গন্ধর্ব কাগজের ব্রামাটিক নতুন নাটক ধরলে রিহার্সেলের সময় থেকে হাজিরা দেবে। খুব অল্পবয়স থেকে থিয়েটার দেখা অভ্যেস। বড়বাবু, দুর্গাদাস ছবিবাবু, তারা ভাদুড়ি, ছুমেন রায় নীহার প্রভা, রাজলক্ষ্মী মহর্ষি—কার অভিনয় দেখেনি বিকু।

বিকু নিজেই বেলটা টিপে দিয়ে অমিয়কে বলল, ফ্ল্যাট যে দোতলার—তা বুঝলে কি করে?

অমিয় জবাব দেওয়ার সময় পেল না। দরজা খুলে গেল। স্বয়ং রজনী। বিকুর তখন একগ্লাস জল খাওয়ার দরকার ছিল। বিকেল থেকে তিনসেন্দ খেয়ে যাচ্ছে। জল খাওয়া হয়নি একবারও। এবার যেন গলা আটকে যাচ্ছে। রজনী কি বলল তা শুনতে পেল না। আন্দাজে হাত তুলে নমস্কার করল বিকু।

এত রাতে বিকুকে দেখে কিছু অবাকই হয়েছিল রজনী। বিকুর পেছন থেকে অমিয় বেরিয়ে আসতে রজনী পরিষ্কার গলায় বলল, তবে যা শুনি তা ঠিকই!

—কি শোনেন?

ভেতরে আসুন। বসুন। তারপর বলছি।

ওরা দুটিতে গুটি গুটি ভেতরে গিয়ে বসল। মেরুন রঙের সোফা। পায়ের নিচে কার্পেট। দেওয়ালের গায়ে লাল স্টানিস্লোন। তার ওপরে উঁচুতে নীহারের ছবি।

বসেই অমিয় বলল, আমি একটু মুখটা ধুয়ে আসতে পারি?

—নিশ্চয়ই। সোজা চলে যান। বাঁ হাতেই বাথরুম। নারকেল তেল রয়েছে—বড় কালো শিশিতে দেখবেন।

বাথরুম ঘরে মুখ মাথা মুছে বসতে আরামই লাগছিল। উঠতে পেরে অমিয়র ভালোই লাগল। খানিক পরে মুখ মুছে ঘরে ফিরে এসে বসল। তখন দেখল বিকু ঘরের কোণে একজন বেশ বয়স্ক ভদ্রলোককে ঘরের পোশাকে কথা বোঝাচ্ছে। শ্বেত প্রজাপতি। যার কিনা বা পাখনায় কালো একটি ফুটকি থাকে। সে আসলে কোটি কোটি পোকার জন্মদাতী মা-প্রজাপতি। যিনি শুনেছিলেন—তার নবীনত্ব এপরের ফিকটার রেনিয়ান মত—নিচের দিকে নীল পাজামা। ঘরের আলো খুব উজ্জ্বল। ফ্লুরেসেন্ট টিউব। বিকুর কথার মাঝে তাকে জানিয়ে নিয়ে ভদ্রলোক বললেন, আমার বিয়ে তিনেক জায়গা আছে। পৈতৃক, সেখানে—

বিকু তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, পিচ রাস্তার গায়ে? মাটির কত নিচে জল?

ভদ্রলোক বললেন—'চাপাডেলার?'

—মানে কোন লেয়ারে জল আছে? বালির দাগ দেখে বুঝে নেওয়া যায়।'

—'আমি যদি ঢেঁড়স দিই।'

—তা কেন? ঢেঁড়স খুব তাড়াতাড়ি বুড়ো হয়ে যায়। ঘর পওয়া যায় না। তার চেয়ে কাঁচা লঙ্কা ভিন। বিঘে পিছু চোদ্দশো গাছ বসাবেন। গাছ পিছু সারা সিজিন জুড়ে অন্তত দু কোজি করে লঙ্কা পেলেও—

—'বিঘের চোদ্দশো গাছ? বলেন কি?'

—'হ্যাঁ। আর শুকনো লঙ্কা করে বাঁধ বিক্রি করেন তবে তো কথাই নেই। টাকা রাখবার জায়গা থাকবে না দেখবেন—

অমিয়কে ডেকে বিকু বলল—ইনিই মিষ্টার দত্ত।

হাত তুলে নমস্কার করল। টান টান চেহারা। বয়স হয়ত পঁয়তাল্লিশ। কিন্তু বাড়ন্ত কথা বলা—সবই খুব টটকা। তাহলে রজনীর পুরো নাম রজনী দত্ত।

অমিয়র পরিচয় দিল রজনী। তারপর কিছুক্ষণের মধ্যে দেখা গেল—মিষ্টার দত্ত ভেতরের ঘরে চলে গেছেন। ধান কাঁচা লঙ্কা মাটির নিচের জলের লেয়ারের আলোচনার ভেতর থেকে এই মাত্র বেরিয়ে এসে বিকু থমকে চুপ করে আছে। ঠিক তখনই অমিয় বলল—'আমি টাকা ফেরৎ দিতে আসিনি। দেবার মত টাকা এক সন্ধেতে হয় না আপনি জানেন—

রজনী মুখ না তুলে বলল—'কি বলছিলেন বলুন—'

'আপনাকে আমার একটা ডিসিসন জানিতে এসেছি।'

'তা আমাকেই বা কেন? কিছু খাবেন?

—না এখন নয়। আপনাকে জানাবার কারণ—আপনাকে আমাদের দরকার।' বলেও অমিয় খুব শিওর বোধ করল না। রজনী বিখ্যাত মায়ের বিখ্যাত মেয়ে। তার স্বামী নীল পাজামার ওপর রেনিয়ান পরে থাকে ঘরে। বেশ ডিকোরেন্স। অমিয় ফিরে আবার বলল—'আমাদের নতুন নাটকে আপনাকে চাই। আপনি না হলে হবে না।

বিকু বলল—'এর ভেতর নতুন নাটক লিখেছো? কবে লিখলে?'

ঘোড়ল কাটলা রজনী 'এই যে শুনি আপনারা খুজন মানিকজোড়। আপনিই জানেন না?'

—'ভুল শুনেছেন। ও আকটর। আমি দর্শক মাত্র!'

অমিয় সে কথায় না গিয়ে বলল—'ফেরিওয়ালার মতো আজই লাস্ট নাইট গেল। আর এখন করব না।'

—'তা কেন অমিয়? পাবলিক সবে নিতে শুরু করেছে—'

—'ও আমার আসল নাটক নয়।'

—'কোনটা আসল?'

—'লিখছি। এখনো শেষ হয়নি। মেইন রোল সুজাতার। রজনী আপনাকে রাজি হতেই হবে। এ নাটক আপনার। আপনি না হলে সুজাতাকে পাবলিক মেনে নেবে না।'

অমিয়র কথায় কি ছিল। অনামনস্ক চোখ ঈগল নাক। মাথার ঈষৎ প্রাচীন ধরণের ঢল।

রজনী আবহাওয়া ঠাণ্ডা করতে হেসে বলল—'সে কথা কি ফোনে বলা যেত না।'

—'সরি! রাত হয়ে গেল।'

—না। বসুন না। কিছু খাবেন?

অমিয় মনে মনে বলল—কিছু খেলে হত। সেই কোন সকালে কি খেয়েছে মনেও নেই। তবু বলতে পারল না। বলল বিকু। বিকু দত্ত। খুব আলতো গলায় বলল—'আপনাদের বাড়ি বাঘ আছে?'

রজনী হেসে বলল—তা হয়ত থাকতে পারে দেখি।'

বিকু সাহস পেয়ে বলল—আপনার কর্তাকেও ডাকুন না।

রজনী জিনিসপত্র এনে টেবিলে সাজিয়ে দিল। বড় পেট মোটা বোতলটা হাতে করে রজনীর স্বামী এসে বসল। বসেই বলল—'আমাদের জামাই এসে বসে। নইলে বসা হয় না। আর অনেকদিন পরে এই হচ্ছে।'

রজনী বলল—'আমাদের বড় মেয়ে এলে বাড়িতে খুব আনন্দ হয়।'

তখন রজনীর স্বামী বলছিলেন—'আচ্ছা লঙ্কা শুকোতে কতদিন লাগে ঠিক?

বিকু শুরু করতে গিয়ে বাধা পেল। রজনী খাবার দোহাই! এখন কিছুক্ষণ ঢেঁড়স লঙ্কা ধান বন্ধ থাকুক।'

(ক্রমশ)

সাহিত্যের খবর

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী

তরুণ শিল্পী সাহিত্যিক সমাবেশ

রাজভবনের উত্তর গেটে দাঁড়িয়েছিলেন প্রতিনিধি হিসেবে—সাহিত্যিক শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আগন্তুকদের দেখিয়ে দিচ্ছিলেন। হলের সামনে মুখ্যমন্ত্রীর সচিব শ্রীভট্টাচার্য কাউকে কাউকে চিনতে পেরেই অত্যন্ত আন্তরিকতায় হলের ভেতরে নিয়ে যাচ্ছিলেন। আমি নিজেকে অত্যন্ত সম্মানিত বোধ করছিলুম। এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর।

প্রধানমন্ত্রীর কিছুক্ষণ আগে ঢুকলেন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়। এটা যে আর দশটা সভা বা আলোচনার মতো অনুষ্ঠান নয়, বোঝা গেল তাঁর মধুর ব্যবহারে। এটাওটা প্রশ্নের উত্তরে তিনি এমন সব রসিকতার লঙ্কা ছুঁড়ে দিচ্ছিলেন যা চায়ের আসর হাসির রেশ ছড়িয়ে দিচ্ছিলো। তিনি বললেন—এতদিন যাত্রা নাটক সিনেমা স্যার সঙ্গেই আমরা বসেছি এবার এই প্রথম কবি-কথাশিল্পী, শিল্পী এঁদের সঙ্গে বসছি, এরকম আমরা আরো বসব। বললেন—এবার আপনারা যত খুশি কবি সম্মেলন করুন ট্যাক্স উঠিয়ে দিয়েছি।

প্রধানমন্ত্রী এলেন। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা ব্যক্তিত্বে অতুলনীয়। উপস্থিত সবাই অনুভব করলেন। সবাই এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলেন, ফলে প্রথম পর্যায়ে সবার সঙ্গে পরিচয় ঠিক সম্ভব হোলো না। প্রধানমন্ত্রী বললেন—ঠিক আছে চায়ের আসরের পর আলোচনা সভায় আমরা নিজেরাই ভালোভাবে পরিচয় করে নেবো।

ডাকা হয়েছে চল্লিশের নীচের কবি, সাহিত্যিকদের। এক নজরে আমার চোখে পড়লো—সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল বরণ, তরুণ সান্যাল, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, পূর্ণেন্দু পত্রী, প্রতিমা সেনগুপ্ত, নবনীতা দেবসেন, সাধনা মুখোপাধ্যায়, রীতা ভিমানী, তারাপদ রায়, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পলাশ মিত্র আবদুল আজিজ আল আমান, ঈশ্বরীপ্রসাদ তেওয়ারী, সুচেতা মিত্র, বিজয়া মুখোপাধ্যায়, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত এবং শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন গণেশ পাইন, বিকাশ চৌধুরী, বিকাশ ভট্টাচার্য, শ্যামল দত্তরায় প্রমুখ।

প্রধানমন্ত্রী যেন এ মুহূর্তে এ রাষ্ট্রের নেত্রী নন, যেন একান্ত ঘরোয়া সভায় গৃহকর্ত্রী। এপাশ ওপাশ গিয়ে সবাইয়ের সঙ্গে আলাপ করছেন, খাবারের ডিস এগিয়ে দিচ্ছেন। বলা হল—একটা সন্দেশ নিন না! —না মিষ্টি আমি খাইনা। ঠিক আছে, এই একটা নোনতা খাবার নিলাম।

আলোচনা সভাও সেরকম পোশাকী ছিল না। আমাদের দুহাত দূরে অর্ধবৃত্তাকার সোফায় বসেছিলেন—বাঁ দিক থেকে মায়া রায়, রাজ্যপাল অয়াস, প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, তারপর আমাদের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী অয়াস এবং শ্রীমতী পূরবী মুখোপাধ্যায়।

আলোচনা শুরু করলেন শিল্পীরা। বললেন—তাঁদের জন্যে নির্দিষ্ট কোনো আর্ট গ্যালারী নেই, যাতে তাঁরা ছবির নিয়মিত প্রদর্শনী করতে পারেন। ফলে দিল্লী বোম্বে ছাড়া কলকাতায় ছবি বিক্রির হার খুব কম। কলকাতায় আমরা একটা স্থায়ী গ্যালারী চাই।

প্রধানমন্ত্রী কথাগুলো মন দিয়ে শুনেছিলেন। উত্তর দিলেন মুখ্যমন্ত্রী—আচ্ছা ঠিক আছে, আমরা ব্যাপারটাকে ভেবে দেখছি, কি করা যায়।

শ্রীমতী গান্ধী সাহিত্যিকদের পক্ষ থেকে নানা প্রশ্নের উত্তরে বললেন—দেশের এই পরিস্থিতিতে আমরা এমন কিছু বলবো না, যা জাতির স্বার্থের বিপক্ষে যায়। শুনলে অবাক হবেন আমার বক্তৃতা পর্যন্ত সেন্সার হয়েছিল। আসলে নানাকারণে এরকম হয়। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে আমরা অনেক ভালো কাজ করেছি, কিন্তু খুঁজে খুঁজে যদি কেউ নেতিবাচক দিকটা শুধু তুলে ধরেন তা কি উদ্দেশ্য-প্রণোদিত বলে মনে হবে না?

কথায় কথায় মুখ্যমন্ত্রী শিল্পী-সাহিত্যিকদের নাভিশ্বাসের কথা বললেন, সেই অসুবিধের কথা যখন কোনো শিল্প বা সাহিত্য আমাদের কাছে কোনো স্থির ছবিকে তুলে ধরে না। দৃষ্টান্ত হিসেবে তিনি বললেন—কিছুদিন আগে একটি ছবি দেখতে গিয়েছিলাম সাগ্নিক ছিলেন শ্রীযুক্ত বরুয়া। ছবিটি সুন্দর হয়েছে, কিন্তু ছবি দেখার পর সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যহীন পথে চলমান নায়ক সমস্ত তরুণ সমাজের কাছে কি ভূমিকা রাখলো ভেবে পেলাম না। বক্তব্যটি সমর্থন করলেন—শ্রীমতী পূরবী মুখোপাধ্যায়।

সবশেষে উপস্থিত লেখকদের পক্ষ থেকে বলা হল—সরকার সবার জন্যে কিছু না কিছু করেছেন। এই বাংলার এবার সাহিত্যিক, কবিদের জন্যে এমন একটা স্থায়ী আবাস তৈরি করে দিন যেখানে তরুণ সাহিত্যিক কবিরা নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করতে পারেন। বাংলার বাইরে থেকে অন্য ভাষার সাহিত্যিকরা এসে যেখানে উঠতে পারেন। এরকম একটা আলোচনা গৃহে সাহিত্যিক কবিরা মাঝে মধ্যেই জমায়েত হতে পারেন। একটা লাইব্রেরীও সেখানে থাকুক।

গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়টি শ্রীমতী গান্ধী শুনলেন। মুখ্যমন্ত্রী বক্তব্যটি লিখে রাখলেন। সবার এত কথা বলার ছিল, কিন্তু বলা হোলো না। অথচ কী করে যেন প্রায় দুঘণ্টা সময় পার হয়ে গেল, এত ভালো লেগেছিল।

মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় বললেন—ঠিক এক মাসের মধ্যেই আবার বসবো এবং আলোচনার মাধ্যমে আমরা অনেক গঠনমূলক কাজ সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে আসতে পারবো।

প্রধানমন্ত্রীকে কবি সাহিত্যিক, শিল্পী-দের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানানো হোলো। মুখ্যমন্ত্রীর ঘড়ির তালে চোখ রেখে দেখলুম—রাত প্রায় আটটা বাড়ি।

পাশের হলে তখন আরেকটা রাজনৈতিক সভার সময় হয়ে গেছে। সেখানে দ্রুত পায়ে চলে গেলেন প্রধানমন্ত্রী। আমরাও অনেক আশা-ভরসা বুকে নিয়ে বেরিয়ে এলাম একে একে।

শান্তনু দাস

বইয়ের কথা

বাস্তবতা ও বাংলা উপন্যাস : কার্তিক লাহিড়ী : সাহিত্য লাইব্রেরী, ২০৬ বিধান সরণী কলকাতা-৬। দাম দশ টাকা।

উপন্যাসের তত্ত্বালোচনার ক্ষেত্রে বাঙ্গালী সমালোচকের দৃষ্টি যে গভীর প্রসারিত হয়েছে শ্রীলাহিড়ীর এই বইটি পড়ে তা নিঃসন্দেহে প্রমাণ হয়। সামগ্রিক বাস্তবতার সূত্রে উপন্যাসের সঙ্গে সাহিত্যের অন্যান্য শাখার পার্থক্য বিচার করে লেখক একদিকে যেমন বাস্তবতার বৈজ্ঞানিক ধারণাগুলিকে স্পষ্ট করেছেন অন্য দিকে তেমনি ঔপন্যাসিকের নিজস্ব জগৎ (যাকে লেখক 'তত্ত্ববিশ্ব' বলেছেন) বস্তু-জ্ঞান-আহরণে কোন পদ্ধতি নেয় তার কথাও সুন্দরভাবে বুঝিয়েছেন।

'বাস্তবতা ও উপন্যাস' অধ্যায়ে বাস্তবতার ধারণা-বিশ্লেষণ করে লেখক তারাশঙ্কর বিভূতিভূষণ মানিক ও সতীনাথ—এই চারজন প্রধান ঔপন্যাসিকের জগৎকে ওই ধারণার সূত্রেই বিশ্লেষণ করেছেন। প্রথম অধ্যায়ের তত্ত্বালোচনার পরিচ্ছন্ন উদাহরণের অভাব বোধ করা গিয়েছিল, পরবর্তী চারটি অধ্যায়ে চারজন ঔপন্যাসিকের সৃষ্টির আলোচনায় সে অভাব অবশ্যই পূরণ হয়েছে। তারাশঙ্কর বিভূতিভূষণ মানিক সতীনাথ—প্রত্যেকেরই আবর্তকের সমাজিক পরিপ্রেক্ষিতে ধারণা বিচার করে অভিজ্ঞতার স্বরূপ-বিশ্লেষণ করে তাঁদের প্রত্যেকেরই সার্থকতা ও ব্যর্থতার রূপটিকে বুঝতে চেষ্টা করেছেন। সামাজিক বাস্তবতার ভিত্তিতে এমন সংহত সূক্ষ্ম শিল্প জ্ঞান-সম্পন্ন সমালোচনা বাংলায় খুব বেশি চোখে পড়ে না।

কিন্তু উপন্যাসে আত্মমুখীনতার এক দিক আছে, যে আত্মমুখীনতা সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতের সঙ্গে বিশ্লেষভাবেই জড়িত। লেখক যদি আত্মমুখীনতাকে শিল্পসম্মত-ভাবে সামাজিক বাস্তবতার সঙ্গে যুক্ত করতে পারেন তবে তা অবশ্যই ত্রুটি নয়। আর জন্মন্ত মানুষের ছবি ফোটাতে গিয়ে সব সময়ে যে সহজ-সরলভাবে তাদের জীবনে প্রবেশ করতে হবে এমন কোনো কথা নেই। এনা পারিপার্শ্বিকের চাপে জন্মন্ত মানুষের জীবনও সরলা হারিয়ে ফেলে এবং মধ্যবিত্ত মন নিয়েই সেই জটিলতার জট ছাড়াতে হয়। ঢোঁড়াই-এর অন্বেষণশীলতা তারই নিজস্ব সামাজিক অবস্থানেরই ফল তার আত্মসমর্পণও তাই। ওই উপন্যাসে সতীনাথের দুটি অনাস্থা—তাঁর উপস্থাপনা পদ্ধতি অনেক সময়েই 'বেনাল' এবং অন্তর্নাটকহীন। যাইহোক বাস্তবতা ও উপন্যাস উজ্জীবিত আলোচনার খোরাক জোগাবে নিশ্চয়।

উজ্জ্বল মজুমদার

জ্বলন্ত রুমাল : শক্তি চট্টোপাধ্যায়, অরুণা। কলকাতা-১। দাম : পাঁচ টাকা।

আবার একবার শক্তি চট্টোপাধ্যায় শব্দ নিয়ে হৈ হৈ খেলায় মেতে উঠেছেন জ্বলন্ত রুমাল কাব্যগ্রন্থে। হঠাৎই আকাশ গঙ্গে ওঠার মত মুহূর্তের স্পষ্ট ঘাত-প্রতিঘাতকে তুমুল ছন্দে প্রতিষ্ঠিত করার সাধনায় ব্রতী হয়েছেন। বিচ্ছিন্ন সব ভাবনা কবিতা-শরীরের শাখায় শাখায় ছড়িয়ে আছে; তাই কবিতা নিয়ে ঘর করা তাঁর পক্ষেই সম্ভব!

যেখানেই থাকুন না কেন বিশ্লিষ্ট বছরের নিশ্চিন্ত এই যোগী কবি ঘাড় ঘন্টা মিলিয়ে, শাক-সবজি না বিলিয়ে কবিতায় প্রাচীন পাঁচিল ভেঙ্গে দিয়ে দুশ্চাত এলো-মেলো পায়ে প্রিয়তম স্মৃতিকে নির্ভর করে এসে দাঁড়িয়েছেন। বিচ্ছিন্ন শব্দের একত্ব রূপই যেন মুখোমুখি এক-একটা বিরাট প্রতিষ্ঠান। খেলাচ্ছলে তাকে বলতে শোনা যায়.....মানুষের কষ্ট ক্ষুধা প্রেম আর পরিতাপ থেকে/ দূরে, এক, ছোটখাটো রাজা গড়ে একাকীই আছে/নিতান্ত না গেলে নয়, তাই যায়,/প্রতাক মানুষ'.....(পৃঃ ৩৮) 'বাতাসে বারুদ, ছাই/ভালোবাসা ফিরি করে, ভালবাসা চাই' (পৃঃ ৫০)।

জ্বলন্ত রুমালে প্রকাশিত ৪৭টি কবিতার কোমল অথচ তীব্র বিন্দুগুলো মনকে নাড়া দিয়ে যায়।

জলজন্তু—রাণী গুহ। লেখিকা কর্তৃক নলসিংপাড়া টি প জলপাইগুড়ি থেকে প্রকাশিত। আট টাকা।

উপন্যাসটির কাহিনীটি আকর্ষণীয়, লেখার হাতেও মশলিয়ানা আছে। তবু কোন কোন অংশে নীরস পাঠককে টানতে পারে না। এর অন্য কারণ কোন কোন চরিত্রের কোন কোন ক্রিয়াকলাপের অবাস্তবতা। তবে মোটামুটিভাবে উপন্যাসটি পড়া যায়।

রাজর্ষি ভাগাচন্দ্র— লেখক শ্রীসীতারাম মুখোপাধ্যায়। মুখার্জী বুক সাপ্লাই অবিনাশপুর বীরভূম, মূল্য আট টাকা।

এই ছোট বইয়ে মণিপুর রাজবংশের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। তার সঙ্গে রয়েছে মণিপুরে কিভাবে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রসার ও প্রচার লাভ করে। বৈষ্ণবধর্ম প্রচারে মণিপুর রাজপরিবারের কতখানি অবদান তারও ইতিহাস ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

নীল রাত অশান্ত সাগর—শ্রীমতী। প্রকাশক — মহম্মদ আলী, নওয়াপাড়া মহেশতলা ২৪ পরগণা। সাত টাকা।

এই কবির কবিতার সব থেকে বড়গুণ হল সরলতা। ভাব ও তা প্রকাশের সরলতা পাঠককে টানতে পারে।

সংকলন ও পত্রপত্রিকা

সাহিত্য প্রয়াসী পত্রিকা : সম্পাদক : শৈলেন শেঠ। ৫৫ যাদব দাস লেন। হাওড়া-২।

নবম শতবার্ষিকী উপলক্ষে 'সাহিত্য প্রয়াসী' পত্রিকার বিশেষ সংখ্যাটি নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। এলোমেলো কিছু রচনা একত্রে পরিবেশন না করে সম্পাদক শৈলেন শেঠ একটি পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়েছেন। তাতে এমন কতকগুলি বিষয় স্থান পেয়েছে যা বিতর্কমূলক এবং নতুন চিন্তার খোরাক যোগায়। যেমন 'শরৎ সাহিত্যে বাস্তি পরিবার ও সমাজ; শরৎচন্দ্র পরবর্তীকাল; শরৎচন্দ্রের উপন্যাস : আঙ্গিক বিষয়, শরৎচন্দ্র ও ব্রাহ্মসমাজ; সাহিত্যচিন্তা : শরৎচন্দ্র। যাঁরা লিখেছেন তাঁরা হলেন ক্ষেত্র গুপ্ত অজিতকুমার ঘোষ উজ্জ্বল মজুমদার নারায়ণ চৌধুরী এবং আরও অনেকে। এরই পাশাপাশি সম্পাদক কিছু প্রকাশিত রচনা পুনর্মুদ্রিত করেছেন কোথাও বা অনুবাদও করেছেন যেমন ধূর্জটি মুখোপাধ্যায়ের ইংরেজী রচনা 'শরৎচন্দ্র'. ইংরেজীতেই ডঃ কাটজুর 'শরৎচন্দ্র অ্যান্ড দি ইউনিটি অব ইণ্ডিয়া' কিংবা সোভিয়েত লেখিকা এ শ্লিয়েভস্কাইয়ার অনুদিত রচনা 'কেন আমি শরৎচন্দ্রের রচনার গুণমুগ্ধ'। আর একটি সাক্ষাৎকারের আয়োজনের বিষয়-বস্তু ছিল 'কালের দর্পণে শরৎচন্দ্র' তাতে অংশগ্রহণ করেছেন জগদ্ধাত্রী দেবী বিমল কর সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। শরৎ পরবর্তী যুগের একজন শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শরৎ প্রণাম' রচনাটির পুনরুদ্ধার সম্পাদকের খুবই শুভবুদ্ধির পরিচায়ক। সম্পাদন নানা দিক থেকে আলো ফেলার জন্যে একটি রচনায় স্থান দিয়েছেন যাতে রয়েছে শরৎ বিদ্বেষতার নানা চিত্রিত। সবার শেষে বললেও সংকলনের উল্লেখযোগ্য শরৎচন্দ্রের অপ্রকাশিত চিঠি।

গোমতী : সম্পাদনা : স্বপন সেনগুপ্ত। ত্রিপুরা জনসংযোগ ও পর্যটন অধিকার কর্তৃক প্রকাশিত।

ত্রিপুরার কতকগুলি প্রবাদ প্রবচন: ত্রিপুরার শিল্প চর্চার পটভূমি ও শিল্পী বীরেন্দ্রকিশোর: শিল্পীকের পুরাকীর্তি— গোমতীর জানুয়ারী সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ। এছাড়াও নাটক, খেলাধূলা শিল্প সংস্কৃতি বিষয়ক খবরাখবরও আছে অন্যান্য সংখ্যার মতই। নিঃসঙ্কোচে বলা যায় পরিচ্ছন্ন রুচির এই পত্রিকাটি ত্রিপুরার সাহিত্য এবং শিল্প-সংস্কৃতির একটি পরিপূর্ণ ছবি তুলে ধরেছে।

CENTRAL LIBRARY

বিচিত্র জনপদ মীরপুর

তারাশিস্ মুখোপাধ্যায়

মীরপুর গ্রামটি মেদিনীপুর জেলার মহিষাদল থানার অন্তর্গত বেতকুণ্ডু ও সংখলালপুর মৌজার অন্তর্গত। এখানে বসবাসকারী পর্তুগীজ খৃষ্টানদের আচার আচরণ ও ধর্মজীবনের প্রতীক নিদর্শনগুলি—হিন্দু-পর্তুগীজ সংস্কৃতির মেলবন্ধনের একটি সুন্দর উদাহরণ। পত্র-পত্রিকা ও সরকারি তথ্যে মীরপুরের পর্তুগীজ - খৃষ্টানদের সম্পর্কে কিছু কিছু বিক্ষিপ্ত আলোচনা স্থান পেলেও স্থানীয় হিন্দুসংস্কৃতির সংস্পর্শে এঁদের জীবননাট্যে যে ধারাবাহিক পট-পরিবর্তন ঘটে চলেছে ইতিহাস ও নৃতত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে তার মূল্যায়ন আজও অসম্পূর্ণ বললেই চলে।

ইতিহাসের পাতায় চোখে পড়ে—পর্তুগীজদের বাণিজ্য তরী ভারতের মালাবার উপকূলবর্তী কালিকট বন্দরে প্রথম নোঙর করে ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দের ২০ মে। এই অভিযানে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো-ডা-গামা। তাঁদের এই অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল ভারতের সঙ্গে পর্তুগালের সামুদ্রিক বাণিজ্য স্থাপন। তখন এই অঞ্চলগুলি কিন্তু আরব ব্যবসায়ীদেরই দখলে। ফলে, আরবদের সঙ্গে প্রাথমিক সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী হলেও কালিকটের হিন্দু রাজার সহায়তায় মালাবার উপকূলবর্তী এই অঞ্চলগুলির সঙ্গে বৈদেশিক বাণিজ্য স্থাপনে পর্তুগীজদের বিশেষ কোন অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়নি। কালিকটের রাজার সঙ্গে পর্তুগীজদের বাণিজ্য সম্পর্কের মূলে সর্তটি হল—এদেশ থেকে পর্তুগাল পাবে—সুগন্ধি মসলা, দারুচিনি, লবঙ্গ, গোলমরিচ, আদা ও মূল্যবান রত্নাদি। বিনিময়ে, পর্তুগাল পাঠাবে সোনা, রুপো, প্রবাল ও শৌখিন লাল কাপড়ের দামী পোষাক-পরিচ্ছদ। পরবর্তীকালে আমরা দেখি যে, আনুমানিক ১৫০০—১৬৪০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ভারতবর্ষে বাণিজ্যের প্রসারই নয়, সাম্রাজ্য বিস্তারের নেশাও ওঁদের মনে রং লাগায়।

বাংলাদেশে পর্তুগীজদের আনাগোনা শুরু হয় ষোড়শ শতাব্দীতে। কালক্রমে এদেশী প্রভাবশালী ভূস্বামীদের আনুগত্য পর্তুগীজদের ছোটখাট উপনিবেশ গড়ে ওঠে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের সপ্তগ্রাম ও বাংলাদেশের ঢাকা, নোয়াখালী, বাকরগঞ্জ ও চট্টগ্রামে। অবশ্য চট্টগ্রামেই তখন ওঁদের প্রধান উপনিবেশ। পরে, মোগল সম্রাট আকবরের অনুমতিতে হুগলীতে পর্তুগীজদের একটি বড় ঘাঁটি গড়ে ওঠে ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে। বাস্তবে এই সুযোগের যে ওঁরা সদ্ব্যবহার করেছিলেন, তার প্রমাণ মেলে—একটি প্রসিদ্ধ বন্দর হিসেবে হুগলীর পরিচয়ে ও প্রাচীন বন্দর সপ্তগ্রামের অবলুপ্তিতে। অবশ্য অনেকের মতে, সপ্তগ্রামের পতনের মূলে সরস্বতী নদীর বুকে দ্রুত পলি জমে ওঠার ঘটনা অগ্রাহ্য করা চলে না।

প্রসঙ্গতঃ, ইতিহাসের কুটিল চক্রে হুগলী বন্দরকে কেন্দ্র করে অবিভক্ত বাংলাদেশের নানাস্থানে পর্তুগীজদের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার হলেও—জলপথে ইতস্ততঃ লুঠতরাজ ও গ্রামাঞ্চলের ঘরে ঘরে জনসাধারণের নানান দুর্ভাগ্যের জন্য সম্রাট শাহজাহান সরাসরি বণিক পর্তুগীজদেরই অভিযুক্ত করেন। এই ঘটনারই ফলশ্রুতি—১৬৩১ খৃষ্টাব্দে মোগল সুবেদার কাশেম খাঁর সশস্ত্র আক্রমণে হুগলীতে পর্তুগীজদের শোচনীয় পরাজয়। মূলতঃ এই ভাগ্য-বিপর্যয় বাংলাদেশের মাটিতে পর্তুগীজদের আশা-আকাঙ্ক্ষার কুঠারাঘাত করে। এই যুদ্ধে পর্তুগীজদের সুরক্ষিত ঐতিহাসিক ব্যাণ্ডেল গীর্জাটি ছাড়া একাধিক কুঠি ও বন্দোবস্তাদি ধ্বংস হয়। শুধু তাই নয়, তার এক হাজার পর্তুগীজ নিহত ও চার হাজার যুদ্ধবন্দী মোগল সৈন্যদের সতর্ক পাহারায় হুগলী থেকে আগ্রার স্থানান্তরিত হয়েছিল। সম্রাট ওদের ইসলাম ধর্মগ্রহণে বাধ্য করেন। যুদ্ধের স্মরণের স্থান হয় নবাবের হারেমে। অপরপক্ষে, এই যুদ্ধে যে সকল পর্তুগীজ আত্মগোপন করে প্রাণ বাঁচিয়েছিল, তাদের পরিচয় ইতিহাসের পাতায় না থাকলেও, মোটামুটিভাবে ১৬৭০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তাদের অনেকেই যে বাংলাদেশের নদীপথে লুঠন ও দস্যুবৃত্তির মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করত, সে সম্পর্কে নানান কিংবদন্তী আজও বেঁচে আছে। প্রসঙ্গতঃ, হুগলীতে পর্তুগীজদের চরম পরাজয়ের পশ্চাৎপট হিসেবে ওদের প্রতিযোগী দিনেমার ও ইংরেজ বণিকদের পক্ষ থেকে মোগল সম্রাট শাহজাহানকে প্রভাবিত করবার সম্ভাবনা হয়ত অমূলক নয়। এই সন্দেহের যৌক্তিকতা ধরা পড়ে ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে বৃটিশ সাম্রাজ্যের পত্তনে।

মীরপুরে বসবাসকারী পর্তুগীজ খৃষ্টানদের আদি নিবাস সম্পর্কে কোন সঠিক তথ্য এখনও আমাদের জানা নেই। শোনা যায়, ১৭৭০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে স্থলপথে অত্যাচারী মারাঠা বর্গী ও জলপথে মগ দস্যুদের লুঠতরাজ থেকে অসহায় প্রজাদের রক্ষার জন্য মহিষাদল এস্টেটের রাণী জানকী দেবী কয়েকটি পর্তুগীজ পরিবারকে গোওয়ালি পক্ষের অঞ্চলে বসবাসের জন্য ঘাটি গ্রাম দান করেন। সেই ঘাটি গ্রাম নিয়ে বর্তমান মীরপুর। এখানকার অধিবাসীদের মতে, ওদের পূর্বপুরুষ হুগলী জেলার ব্যাণ্ডেল থেকে এসেছিলেন। বর্তমানে আমরা যাদের মীরপুরে পাই, স্থানীয় হিন্দুরা তাদের ফিরিঙ্গী, খৃষ্টান, পর্তুগীজ খৃষ্টান প্রভৃতি নামে চিহ্নিত করেন। এদের অনেকেরই পদবীগুলি বিদেশী যেমন—রোজারিও, নরনহ, আইজাক ডেসরা, লবু ডিকরুস রডা ও পেরেরা। তবে পর্বতপুর বাসিন্দাদের মধ্যে কারনান্ডো ও পোলিয়ান পদবীধারী কোন পরিবারই এখন আর মীরপুরে নেই। আবার এদের পাড়ায় যে সকল ধর্মান্তরিত বাঙ্গালী খৃষ্টানদের বসতি গড়ে উঠেছে, তাদের মধ্যে— মিত্র, মল্লিক, মুখার্জি বিশ্বাস ও ঘোড়ই পদবীর ব্যবহার এখনও চলে আসছে। এই উভয় গোষ্ঠীর মধ্যে দেশী অথবা বিদেশী নাম ব্যবহারের প্রচলন লক্ষণীয়। মীরপুরের অধিবাসীদের ব্যবহৃত বিদেশী নামগুলি হল—লুইস, আর্থার, দানিয়েল, রুবেন, গাব্রিয়েল ইগনাস সিমন জহন লুকাস ফ্রান্সিস ফিলিপ নরেন্দ্র মাইকেল ইসাহাক সোলমোন ইমানুয়েল জিসাই আন্দ্রো এডওয়ার্ড বেনজামিন বেনাডিক ও টমাস। তুলনামূলকভাবে ওদের হিন্দু ঘেঁষা নামগুলি হল—বিজয় বসন্ত নিখি-

কান্ত বাদল অজিত প্রশান্ত তরঙ্গিণী নয়নবালা ইত্যাদি। বিশেষভাবে বহিরাগত পর্তুগীজ বংশোদ্ভবদের মধ্যে হিন্দুদেবা নামের সঙ্গে বিদেশী পদবীর মেলবন্ধনের ঘটনা—বাস্তবে সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের একটি বিশিষ্ট উদাহরণ।

একটি সাম্প্রতিক হিসেবে—মীরপুরের ৫৬টি পরিবারের মধ্যে ৩৫টি রোমান ক্যাথলিক ও ২১টি প্রটেস্টাণ্ট মতাবলম্বী। এই দুটি সম্প্রদায়েরই নিজ-নিজ গীর্জা আছে। তবে নিকটবর্তী সমাধি-ক্ষেত্র কোন ভেদাভেদ নেই। ধর্মজীবনে এরা হিন্দুদের থেকে বিচ্ছিন্ন হলেও দীর্ঘ-কাল স্থানীয় হিন্দুদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে লালিত হওয়ার ফলে, এমনকি বিবাহের মাধ্যমে রক্তের লেনদেন ঘটায়—পরদেশী পর্তুগীজ বংশোদ্ভব অধিকাংশ লোকের দৈহিক গঠনে আজ আর বিশেষ কোন পার্থক্যই ধরা পড়ে না। এদের মাতৃভাষাও বাংলা। কালক্রমে জীবিকার প্রশ্নে এদের অনেকেই এখন কৃষিজীবী। এছাড়া—জাহাজের কর্মী, ছাপাখানার কারিগর অথবা কারখানার শ্রমিক হিসেবেও কয়েকজন নিযুক্ত আছে। মীরপুরের অধিবাসীদের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে জেনেছি যে নিকটবর্তী স্কুল-কলেজে উচ্চশিক্ষার সুযোগ থাকলেও আর পাঁচটা পার্শ্ববর্তী গ্রামের মত কেবলমাত্র অর্থনৈতিক কারণেই অধি-কাংশ ছেলে-মেয়ের লেখাপড়ায় ছেদ পড়ে। শুধু তাই নয় যে কোন একটা চাকরির মুখো পর্তুগীজ পাড়ার ছেলেরা উচ্চশিক্ষা গুরুজনদের স্নেহ এমন কি গ্রামের মায়া কাটিয়ে দূরে যেতে সঙ্কোচ করে না। প্রচ্ছন্নভাবে গুরুজনদেরও যে তাতে সমর্থন থাকে—তা ওদের কাছেই জেনেছি। অবশ্য স্থানীয় হিন্দু ছেলেদের সমস্যাটি কিন্তু স্বতন্ত্র। বাস্তবে, গ্রামকেন্দ্রী জীবনযাত্রার প্রতি অল্পশিক্ষিত বা নিরক্ষর ছেলেদের যে একটা মোহাচ্ছন্ন আবেগ ধরা পড়ে—সে প্রভাব থেকে কিন্তু পর্তুগীজ বংশোদ্ভবেরা অনেকটাই মুক্ত। এই ঘটনা থেকে যে প্রশ্নটি আমাদের মনে জাগে তা হল—একই গ্রামীণ পরিবেশে লালিত হলেও, জীবনবোধ ও কালধর্মী দৃষ্টিভঙ্গীর মানদণ্ডে এই যে পার্থক্য, তা কি পর্তুগীজদের জাতীয় বৈশিষ্ট্যের গুণেই সম্ভব? তাকতে অবাক লাগে, স্থানীয় হিন্দুসংস্কৃতির সঙ্গে মেল-বন্ধনের প্রশ্নে এরাই আবার যথেষ্ট উদার ও সহনশীল। এই অন্তর্নিহিত সত্যটিরই পরিচয় পাওয়া যায়, ওদের কয়েকটি সামা-জিক ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে।

মীরপুরের খৃষ্টানদের মধ্যে প্রচলিত একটি সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান হল বাপ্তিস্ম। এই অনুষ্ঠান ক্যাথলিক ও প্রটেস্টাণ্টদের মধ্যে কিছু-কিছু পার্থক্য চোখে পড়ে। যেমন—প্রটেস্টাণ্টদের মধ্যে নব-জাতকের বয়স এক মাস পূর্ণ হওয়ার আগেই ওদের গীর্জার ধর্মযাজক বা ফাদারের উপস্থিতিতে বাপ্তিস্ম অনু-ষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়। কিন্তু ক্যাথলিকদের মধ্যে এরূপ কোন বাধ্যবাধকতা নেই। অবশ্য এই অনুষ্ঠানে নবজাতকের পক্ষ থেকে ধর্মপিতা ও ধর্মমাতা গ্রহণের যে নিয়ম আছে, তা উভয় গোষ্ঠীর লোকেরাই কিন্তু মেনে চলেন। এদের মতে—আত্মীয় সম্পর্কের মধ্যে যারা পড়েন না, কেবল তারাই ধর্ম পিতা-মাতা হতে পারেন। এমন ১৮ ১৬—১৮ বছরের অবিবাহিত ছেলে-মেয়েরাও ধর্ম পিতা-মাতা হতে পারেন। তবে যারা ধর্ম পিতা-মাতা হওয়ার সম্মতি প্রকাশ করেন, তাদের তিনটি সত্য পালনের শপথ নিতে হয়। মীরপুর গ্রামের গীর্জার ধর্মযাজক এই শপথ পাঠ করান। শপথের মূল বক্তব্য হল এইরূপ—এই ছেলে-মেয়েকে আমরা সৎপথে পরিচালিত করব; সৎশিক্ষা দান করব, এবং যথাসময়ে কলকাতার গীর্জার প্রধান বিশপের কাছে উপস্থিত করব। স্থানীয়ভাবে এখানেই অনুষ্ঠানের শেষ। পরে বিশপের কাছে পিতা-মাতা যাদের ধর্মসন্তানকে নিয়ে উপস্থিত হলে বিশপ তাঁর নিজের অথবা ধর্ম পিতা-মাতার পছন্দমত একটি নামে সন্তানকে অভিহিত করেন। এই নামকরণ উপলক্ষে বিশপের স্নেহ আশীর্বাদও সন্তানের কামা। প্রসঙ্গতঃ মীরপুরের খৃষ্টানদের বাপ্তিস্ম অনুষ্ঠানের সঙ্গে হিন্দুদের নাম-করণ সংস্কারের কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই। তবে এখানকার স্থানীয় হিন্দুদের মধ্যেও ধর্ম পিতা-মাতা ভাই-বোন স্বশুর-জন্যই ছেলে-মেয়ে ছাড়াও মেয়েদের মধ্যে লক্ষ্মীমণি বকুল টগর গোলাপ ইত্যাদি একাধিক নামে সই সম্পর্ক স্থাপনের দৃষ্টান্ত—জাতিভেদের বেড়াজাল অতিক্রম করতেই সহায়ক হয়।

মীরপুরের পর্তুগীজ খৃষ্টানদের মধ্যেও অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠানটির চলন আছে। ছেলেদের অন্নপ্রাশন হয় ৬ মাসে ও মেয়েদের ৭ মাসে। অবশ্য হিন্দুদের মত নির্দিষ্ট মাস হিসেব করে অথবা পঞ্জিকা দেখে ওরা দিনস্থির করে না। অন্নপ্রাশনের দিন ছেলে অথবা মেয়ের মুখে মিষ্টিজাতীয় খাওয়ানোর যে সামাজিক নিয়ম আছে, সেই অনুষ্ঠানে প্রধান ভূমিকা নিয়ে থাকেন—মামা, মায়ের দাদা (আজামশাই) ঠাকুর্দা ঠাকুমা কিম্বা অন্য কোন গুরুজন। ফলে এই অনুষ্ঠানে সন্তানের পিতা-মাতার বিশেষ কোন ভূমিকা থাকে না। অন্নপ্রাশনের দিন ছেলে অথবা মেয়ের কোমরে লাল ঘুংসী পরান হয়। ক্যাথলিক ও প্রটেস্টাণ্টদের ক্ষেত্রে এই একই নিয়ম। তবে প্রটেস্টাণ্ট সমাজে আনুষ্ঠানিক প্রার্থনার পরে সামান্য পায়স হাতার টাকার সাহায্যে ছেলের মুখে দিতে হয়। এই অনুষ্ঠানে যারা নিমন্ত্রিত হয়, তারা তাদের অবস্থা অনুসারে নতুন পোশাক এমন কি অলঙ্কারও উপহার দিয়ে থাকেন।

যদিও আলাপ-আলোচনায় ক্যাথলিক ও প্রটেস্টাণ্টরা বলেন যে, আমরা সকলেই খৃষ্টধর্মাবলম্বী সুতরাং আপনজন—তথাপি বিয়ের ক্ষেত্রে হিন্দু সমাজের অনুকরণে ওরাও পাত্র-পাত্রীর ধর্মমত, বংশ মর্যাদা, আর্থিক অবস্থা ও লেখাপড়ার ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। শুধু তাই নয়, হিন্দু সমাজের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে লালিত হওয়ার—ক্যাথলিক ও প্রটেস্টাণ্ট ধর্মা-বলম্বীদের মধ্যে বিয়ের সম্ভাবনা অনেকটা হিন্দু সমাজে অসবর্ণ বিয়ের কথাই মনে করিয়ে দেয়। অবশ্য অঘটন আজও ঘটে। বিশেষভাবে এই সকল ক্ষেত্রে পাত্রকেই তার পূর্বতন ধর্মমত ত্যাগ করতে হয়। মজার কথা অধিকাংশে ধর্মত্যাগী পাত্রের ঠাঁই জোটে তার প্রিয়তমার নিবাসেই। এই সকল কারণে খৃষ্টধর্মাবলম্বী হলেও উভয় ধর্মগোষ্ঠীর মধ্যে সম্ভাব্য বিয়ের গণ্ডীটি যথেষ্ট সীমিত বলা চলে। একটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী মীরপুরের অধিবাসীরা শ্রেণিনীপুর জেলার একান্তই সংখ্যালঘু হওয়ায় তাদের বিয়ের গণ্ডীটিও অনিবার্য কারণে বহু দূরে বিস্তৃত। এদের বৈবাহিক সম্পর্কের বিস্তৃতি রয়েছে প্রধানত মেদিনী-পুর জেলার তমলুক পাঁশকুড়া ও কাঁথিতে ২৪ পরগণার বেহালা ডায়মণ্ডহারবার ও নলপুরে, নদীয়ার রাণাঘাট ও কৃষ্ণনগরে—এছাড়া হাওড়া ও হুগলী জেলার কোন-কোন স্থানে।

সচরাচর মীরপুরের মেয়েদের ১৭ থেকে ২২ ও ছেলেদের ২১ থেকে ৩০ বছরের মধ্যেই বিয়ে হয়। বিয়ের যোগাযোগ করেন 'ঘটক' অথবা আত্মীয় বন্ধু-বান্ধব। প্রাথ-মিক যোগাযোগের পরে পাত্র পক্ষ 'ঘটকে'র সঙ্গে পাত্রী-পছন্দের জন্য যাত্রা করেন। এই সময়ে পরিমাণ মত বাতাসা সঙ্গে নিতে হয়। পাত্রী-পছন্দ ও দেনা-পাওনা স্থির হলে, ঐ বাতাসা আলোচনায় উপস্থিত

ডাঃ স্নেহলতা বসু এম.বি.ডি.জি.ও
ডাঃ এস এন পাণ্ডে এম.বি.বি.এস
যৌবনের রহস্য
প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য • মূল্য ৮৲
যৌনবিজ্ঞানের রঙীন ও বর্ণচিত্রে চিত্রিত অতি আধুনিক সংস্করণ।
মোহন লাইব্রেরী
অগ্রিম ৮৲ টাকা পাঠালে ডাকমাশুল ফ্রি

সকলের মধ্যে বিতরণ করে দেওয়া হয়। এই বিশেষ নিয়মটিকে বলা হয় 'পান-পাত্র'। প্রসঙ্গতঃ বিয়েতে 'বর পণ' ছাড়াও, পাত্র নতুন পোষাক ও একটি আংটি যৌতুক পেয়ে থাকেন। অপর পক্ষে, পাত্র পক্ষের লোকেরা পাত্রীকে একটি আংটি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। এছাড়া, এই বিয়েতে যিনি ঘটকালি করেন, তিনিও নতুন কাপড় পেয়ে থাকেন।

মীরপুরের পর্তুগীজ খৃষ্টানদের বিয়েতে গীর্জার প্রভাবকে অস্বীকার করা চলে না। 'পান-পাত্র' অনুষ্ঠানের পরে বিয়ের অন্ততঃ তিন সপ্তাহ আগে, পাত্র ও পাত্রী পক্ষের লোকেরা যে গীর্জার সদস্য, সেখানের ধর্মযাজক বা সরকারকে সম্ভাব্য বিয়ের খবর জানানো হয়। এই খবর পাওয়ার পর সরকার পর-পর তিনটি রবিবার গীর্জায় উপস্থিত সকলের কাছে পাত্র বা পাত্রীর চরিত্র সম্পর্কে গোপন খবর সংগ্রহ করেন। এই প্রথাটিকে বলা হয় 'বানডাকা'। বাস্তবে বানডাকার মাধ্যমে পাত্র-পাত্রীর চরিত্র সম্পর্কে উভয় পক্ষ নিশ্চিন্ত না হলে, যাকদান বা বিয়ের চূড়ান্ত সম্মতি জানানোর জন্য পাত্র-পাত্রী ও তাঁদের গুরুজনেরা কলকাতার গীর্জার প্রধান ধর্মযাজকের কাছে যেতে পারেন না। ওখানে প্রধান ধর্মযাজকের পক্ষ থেকে প্রার্থনা ও পাত্র-পাত্রীকে আশীর্বাদ করা হলে, বিবাহের দিনস্থির হয়। তবে, হিন্দুদের মত বিবাহের দিনস্থির করতে পঞ্জিকার প্রয়োজন হয় না।

বিয়ের তিন অথবা পাঁচদিন আগে, কোন এক রোববার লগেন, গায়হলুদ হয়। এই উপলক্ষে স্থানীয় গীর্জায় একটি প্রার্থনা সভার ব্যবস্থা হয়। কিন্তু ওখানে গায়হলুদ দেওয়া চলে না। মীরপুরের খৃষ্টানদের প্রথানুযায়ী—গায়হলুদ অনুষ্ঠানটি প্রথমে হয় পাত্রের বাড়ীতে। পাত্রের গায়হলুদের উপকরণগুলি হল—নতুন কাপড়, হলুদ ও সরিষার তেল এবং পাত্রীর—নতুন কাপড়, হলুদ ও নারকেল তেল। গায়হলুদ অনুষ্ঠানে পাত্র বা পাত্রীর গুরুজন সম্পর্কীয় কেহই প্রত্যক্ষ ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারেন না। ফলে, পাত্রের গায়হলুদ অনুষ্ঠানে পাত্রের ছোট ভাই অথবা ভাই সম্পর্কিত কোন একজনের ভূমিকাই সর্বাধিক। একই ভাবে, পাত্রীর ছোট বোন অথবা বোন সম্পর্কিত কোন একজনেরই অধিকার থাকে এই অনুষ্ঠানে। এই শুভ দিনে পাত্র ও পাত্রীর নিজ-নিজ বাড়ীতে আইবড়ো ভাত খাওয়ানো হয়। এই উপলক্ষে একটি প্রীতিভোজেরও ব্যবস্থা হয়। নিমন্ত্রিত সকলেই তাঁদের সাধ্যমত উপহার ছাড়াও পাত্র-পাত্রীর সুখী বিবাহিত জীবন কামনা করেন।

বিয়ের দিন বরযাত্রীদের সঙ্গে গ্রামান্তরে যাওয়ার আগে, পাত্র মীরপুরের গীর্জায় প্রণাম করে যান। এদের মহিলারাও বরযাত্রী যেতে পারেন। পাত্রীর গ্রামে পৌঁছানোর পরে পাত্র ও বরযাত্রীদের প্রথমে ওখানের গীর্জায় উপস্থিত হতে হয়। পাত্রী ও তাঁর পরিজনেরাও ওখানে উপস্থিত থাকেন। এই উপলক্ষে গীর্জায় একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে ধর্মযাজক বাইবেল পাঠ করেন। ওঁর আদেশ মত পাত্র-পাত্রীকেও কিছু কিছু অংশ (সু-সমাচার) আবৃত্তি করতে হয়। অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে ধর্মযাজক পাত্রের পক্ষ থেকে পাত্রীকে উপহার দেওয়া আংটিতে সিঁদুর লাগিয়ে পাত্রীর কপালে ফোঁটা দেন। কিন্তু সিঁথিতে সিঁদুর দেওয়া হয় না। অবশ্য পাত্রীর অভিরুচি হলে তিনি বিয়ের পরে সিঁথিতে সিঁদুর পরতে পারেন। বাস্তবে বিবাহিতা মহিলাদের হাতে শাঁখা দেখা কাঁচ চুড়ি পরে আলতা ও মাথায় ঘোমটা দেওয়ার দৃষ্টান্ত মীরপুরে বিরল নয়। এই প্রথাগুলি অনুসরণের আগ্রহ থেকে আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি যে স্থানীয় হিন্দুয়ানীর প্রভাব ওদের সমাজজীবনে কতদূরে বিস্তৃত। প্রসঙ্গত গীর্জায় সিঁদুর দানের পরে উভয় পক্ষের সাক্ষীর উপস্থিতে পাত্র-পাত্রী বিয়ের স্বীকৃতি স্বাক্ষর করেন। এখানেই আনুষ্ঠানিক বিয়ের শেষ। বিয়ের খরচা হিসেবে ধর্মযাজককে ১৫ টাকা দেওয়া হয়। এর পর পাত্র নববধূকে সঙ্গে শ্বশুরবাড়ীতে আসেন। মীরপুরের অধিবাসীরা জানালেন যে নববধূকে নিয়ে মীরপুরে ফিরে এসে পাত্রকে প্রথমেই স্থানীয় গীর্জায় প্রণাম করে ১৫ টাকা দিতে হয়।

মীরপুরের খৃষ্টানদের অন্তর্বিবাহে ক্যাথলিক ও প্রটেস্টান্টদের মধ্যে কোন উল্লেখযোগ্য প্রভেদ নেই। এদের নিয়ম—মৃত্যুর পরে শবদেহটি মৃতের ধর্মমত আশ্রিত গীর্জায় আনতে হবে। ওখানে সাবান মাখিয়ে স্নানের পরে শবদেহটিকে কালো কাপড় পরিয়ে কাঠের শবাধারে শোয়ানো হয়। শবাধারে ধূপ, অগরু, সেন্ট ইত্যাদি গন্ধদ্রব্য দেওয়া হয়। এর পর মৃতের আত্মার শান্তি কামনায় গীর্জায় ধর্মযাজক বাইবেল পাঠ করেন। এই প্রার্থনা অনুষ্ঠানটিকে ওঁরা বলেন মিশা-করা। মিশাকরা শেষ হলে শবাধারটি অপর একটি কালো কাপড়ে ঢাকা মীরপুরে গ্রামের সমাধিক্ষেত্রে স্থানান্তরিত করা হয়। শবাধারটি নিয়ে অনুগমনের সময়ে কোন বাজনা থাকে না। কারণ এই দুঃখের সময়ে আনন্দের কোন অভিব্যক্তি থাকা অনুচিত বলেই ওদের মত অভিমত। ইতিপূর্বে সমাধি দেওয়ার জন্য পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা একটি গর্ত খোঁড়া হয়। এই গর্তে শবাধারটি স্থাপনের আগে যার উপরিভাগ একটি তাকের দিয়ে বন্ধ করা হয়। সমাধিক্ষেত্রে শায়িত শবের মাথা থাকে পশ্চিমে ও পদযুগল পূর্বে। এবার সমাধিটি মাটি চাপা দেওয়া হয়। প্রসঙ্গতঃ যদিও একই সমাধিক্ষেত্রে ব্যবহারের কোন ধর্মীয় বাধা নেই তথাপি একটি বিশেষ ধর্মমতে বিশ্বাসী লোকেরা অপর গোষ্ঠীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় উপস্থিত থাকেন না। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পরে মৃত্যুশোচ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যে হিন্দুদের অনুকরণে মীরপুরের খৃষ্টান পরিবারেও দেখা-নাপিতের ডাক পড়ে।

লোকবিশ্বাস ও সংস্কারের বেড়াজালে আবদ্ধ মীরপুরের খৃষ্টানদের মধ্যেও ঈশ্বরানুগ্রহ লাভের অভিলাষে নানান তুকতাক মানত ও মাদুলি ধারণের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যেতে পারে। বিশেষ ভাবে মানত বা মানসিক সফল হওয়ার কারণে ওরা এখনও হুগলী জেলার ব্যাণ্ডেল গীর্জার প্রতি অধিক শ্রদ্ধা প্রকাশ করে থাকেন। ব্যাণ্ডেল গীর্জার প্রতি ওদের এই আনুগত্য পরোক্ষে বর্তমান মীরপুরের খৃষ্টানদের পূর্বতন ঠিকানা সম্পর্কেই যেন ইঙ্গিত করে। পরিশেষে সামুদ্রিক বাণিজ্যের সূত্র ধরে ভারতবর্ষে এসে কালক্রমে মীরপুরের পর্তুগীজ বংশোদ্ভবদের কৃষিজীবী হওয়াই নয়, স্থানীয় হিন্দুদের সামাজিক ধ্যান-ধারণার সঙ্গে ওদের পরিচয় ও একাত্মীকরণের ঘটনা একটি ঐতিহাসিক সত্যও বটে।

CENTRAL LIBRARY

...ই। এতক চাঁদুকে ঠিক কোলাদান ...ন্ত্র এলাকা ছাড়ি কৃতি যথার্থ সম্মান ...া হবে ঠিক বলতে পারছি না। তাই ...র নিয়ত গিয়েও ফেরে গেছি। আর ...ুই শনি দিনে এই কঠিন কাজে ব্রতী ...। কারণ, মহাদেবের মতই 'তিন আখ ...' অর্থাৎ ত্রয়ী ওঁকে সবাই প্রতীক্ষা ...। কাছে আপন করা তাঁরই সম্প্রীতি ...বাহার দেখলে। এটা ভাল কি মন্দ ...কি অন্যায় জানি না। তবু তাঁর এই ...মকে প্রশ্রয় না করে উপায় নেই। কারণ

...ছোকরাই গরুর গাড়ির গাড়োয়ান ...থেকেই এর জন্য—অধিকারীমশায়ের ...কায় নয়।

...সে যুগে গায়কে ছেলে সাজানো ...রূপে দেখতে না। সমাজের ...ছেলেদের নিপথে নিয়ে যাবার ...দূতরূপে। কত্তা অঞ্জাকের বাবা ...ন্তর ছিলেন চক্রবর্তী। মুলাকাত ...অধিকারী বৈলোক্যতারককে তিনি ...বাগান একটা ঐতিহাসিক গাইবে ...নারাজ। তবু সেদিনের শেষের দিকে ...অনুরোধে ঢুকতে বাধ্য হয়েছিল ...ভাবকের অভিনয় এবং নিজের ...

সুরের আগুন

যাওয়ার মাঝখানে তাঁরই সঙ্গে জোড়াসাঁকোর বাবার সুযোগ ঘটেছে। তখনই সাহানা দেবীর গান শুনে এক অনির্দেশ্য আবেগে মন দুলে উঠেছিলো। এমন গানও হয়?

১৯২১ সালে কবিগুরুর সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ যখন শান্তিনিকেতনের একটি দল জোড়াসাঁকোয় এসেছিলেন বর্ষামঙ্গল উৎসবে। নাটোরের মহারাজ শচীশচন্দ্রকে বাজিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে 'হৃদয় আমার নাচের আজিকে' কবিতায় আবৃত্তির সঙ্গে। রবীন্দ্রসঙ্গীতের সঙ্গে পূর্বরাগের শুরু তখন থেকেই।

ম্যাট্রিক পাশ করে ১৯১৮ সালে কোলকাতায় এসে তিনি ভর্তি হলেন বিদ্যাসাগর কলেজে। থাকতেন তাঁরই আত্মীয় প্রধান সারদারঞ্জনের বাড়ীতে, ক্রিকেট ফুটবলের আলোচনা ও সমালোচনায় সে-বাড়ী সরগরম। কিন্তু এই গড্ডালিকা-প্রবাহ গানপাগলা শৈলজারঞ্জনকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারেনি। তাঁর মনটা ঘুরতো স্বনামধন্য লেখক নীরদ চৌধুরীর বাড়ীর আনাচে কানাচে। এ-বাড়ীর সঙ্গে তাঁর একটা আত্মীয়তার সূত্রও ছিলো। অনেকটা ব্রাহ্ম ভাবাপন্ন প্রগতিশীল এই বাড়ী। এখানেই তিনি প্রথম শুনলেন 'রবিবাবুর গান'। সে গান শোনার বৈপ্লবিক অভিজ্ঞতার কাছে এতদিনের চেনা গানের জগৎ যেন নিষ্প্রভ হয়ে গেলো।

তখন সবে 'গীতপঞ্চাশিকা' বেরিয়েছে। নীরদ চৌধুরীর দাদা চারুবাবু স্বরলিপি দেখে অর্গানে সেইসব গান তুলতেন আর বাড়ীশুদ্ধ সবাই দলবেঁধে সেখার ঘুরে পড়ে সেগুলো। তাঁদের সঙ্গে শৈলজারঞ্জনও গলা মেলাতেন। নির্ভুল প্রাণ খুলে যে-গান তিনি প্রথম গাইতে পারলেন, সেই গানটি হলো রবীন্দ্রনাথের গান। মুক্তির মনের বন্ধনমোক্ষণ ঘটলো এই গানে। আবার মনটা বাঁধা পড়লো যে-গানের গাঁটছড়ায় সে-গানও তাঁরই।

এই গান শেখার তাগিদেই তিনি পৌঁছলেন সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে। তাঁর দলের সঙ্গেই তিনি জোড়াসাঁকো পাগলাঝোরা অনুষ্ঠানে গান গেয়েছিলেন। এবং এই উপলক্ষেই রবীন্দ্রনাথের কাছে তাঁর গান শেখবার সুযোগ ঘটেছিলো। ১৯২২ সাল সেটা। ইচ্ছা তো জাগলো। কিন্তু ইচ্ছার শান্তি পাওয়া যায় কোথায়? শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র শিবদাস রায় ও অনাদিকুমার দস্তিদারের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁদের কাছ থেকে কিছু গান সংগ্রহীত হলো গানভিখারীর ঝুলিতে।

এই সময়েই রাজা রাজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর উদার সহযোগিতায় শীতল মুখোপাধ্যায়ের কাছে এস্রাজ শিক্ষা করবার সুযোগও এলো। পরবর্তী সংগীতজীবনের অধ্যায়ে তাঁর এ-বিদ্যা একটি বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে। এখনও অনেক গানের আসরে তাঁর শিষ্যাদের সঙ্গে (রাজেশ্বরী দত্ত, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, গীতা সেন, নীলিমা সেন) শৈলজাকে এস্রাজ বাজাতে দেখা যায়।

সবার অলক্ষে সবচেয়ে নিষ্ঠুরই তাঁর জীবন-বিধাতা যেন তাঁকে রবীন্দ্রসংগীতের গুরু হবার জন্য গড়ে নিচ্ছিলেন।

ঘটনাচক্রে বাধ্য রমণীকিশোর মজুমদারের ইচ্ছের আইন পাশ করে নেহরুকোণার লাইব্রেরীতে নাম লিখিয়েছিলেন। এ-ও হয়তো তাঁর সৃষ্টিকর্তার এক অভিনব কৌতুক। মনটা যার সুরের আকাশে পাখা মেলতে চায় তাকেই বন্দী থাকতে হোলো আইনের বেড়াজালে। নির্বাসন-দণ্ডের ছয় ও বাকি ছয়কের এ-বন্ধ। এরই মধ্যে একবার বন্ধুবর প্রভাতচন্দ্র গুপ্তের আমন্ত্রণে সাত দিনের জন্য শান্তিনিকেতনে যাওয়ার আমন্ত্রণ জুটে গেলো। শান্তিনিকেতনের এই সাতটা দিন যেন একরাশ মুক্ত হাওয়ার মধ্যে মনের দরজা-জানলাগুলো খুলে দিলো। এইখানেই প্রভাতবাবুর সৌজন্যে রবীন্দ্রনাথ ও দীনেন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয় ঘটলো। ভাবতে এখনও রোমাঞ্চ জাগে গুরুদেবের আমায় দেখেই চিনতে পেরেছিলেন। তুমিই ত জোড়াসাঁকোর উৎসবে গান গেয়েছিলে গো—। এই সাতদিনেই দিনদার কাছে চারটি গান শিখেছিলাম। তখন সংগীত ভবন ছিলো না। দিনদার বাড়ী সুরপুরীতে ছিলো আমার একক গানের ক্লাস। দিনদার কাছে গান শিখতে চাইতেই তিনি মহাখুশী। সঙ্গে সঙ্গে সকাল নটায় তাঁর নিয়মিত ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের সেই ক্লাসের জন্য ছুটি দিয়ে দিলেন। গান শেখা বন্ধ হওয়ার জন্য তাঁরা ক্ষুণ্ণ হলেও এক গানপাগলা ভদ্রলোক নেহরুকোণা থেকে শান্তিনিকেতনে গান শিখতে এসেছে এটা তাদের কাছে কৌতূহলের এবং সেই সঙ্গে আনন্দেরও খবর হয়ে উঠেছিলো। এই প্রসঙ্গেই একটা কথা বলি। দীনেন্দ্রনাথের নামকরণ করেছিলেন গুরুদেব স্বয়ং। দিনের যিনি ইন্দ্র—দিনেন্দ্র। দীন—মানে দরিদ্র নয়। এই বানানটি অনেকেই ভুল করে থাকেন।

শান্তিনিকেতন থেকে চলে এলাম। কিন্তু ঐ সাতদিনের অভিজ্ঞতা আমার এতদিনের অভ্যস্ত জীবনধারাকে যেন ওলটপালট করে দিলো। নেহরুকোণার জীবনকে মনটা আর মেনে নিতে চাইলো না।

ঠিক এই সময়েই বন্ধুবর প্রভাতচন্দ্রকে টেলিগ্রাম পেলাম—শান্তিনিকেতনে হেমন্তের অধ্যাপক পদ খালি। শীগ্গির চলে এসো। আমরা তোমার জন্য অপেক্ষা করছি।' মনে হলো স্বয়ং ভগবান যেন ভক্তের গভীর প্রার্থনার সামনে এসে দাঁড়ালেন।

বাবাকে অসন্তুষ্ট করেই এ-পদ গ্রহণ করে শান্তিনিকেতনে যাত্রা করলাম। তখন মনের অবস্থা বেপরোয়া। কোনোদিকে লাবণ্যর মত মনের অবস্থা সেই।

শৈলজাবাবু শান্তিনিকেতনে যোগ দেবার কিছুদিন বাদে তাঁর ভাইও সেখানে পড়তে আসেন। এই প্রসঙ্গে শৈলজাবাবু বন্ধু ও সতীর্থ প্রভাতচন্দ্র গুপ্তের নিবন্ধের একটি অংশ উপভোগ্য। শান্তিনিকেতনে যাবার আগে তাঁর হাতে তিনশো টাকা দিয়ে বাবা বলেছিলেন শুনেছি ঠাকুরের ওখানে হাতছাড়া পয়সা, টাকা-পয়সা ঠিকমত দিতে পারে না। সেটা টাকার অভাবে উপোষ না থাকতে হয়।

শান্তিনিকেতনে এসে রসায়ন অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে শৈলজারঞ্জনের গান শেখাও চলতে লাগলো তাঁর দিনদার কাছে। একদিন কলাভবনে বর্ষামঙ্গলের রিহার্সাল চলছিলো, দিনেন্দ্রনাথ সেখানে যাবার আগে হঠাৎই শৈলজাবাবুর দিকে পড়লেন তাঁর বন্ধু প্রভাত গুপ্তের সঙ্গে। দিনঠাকুর তাঁকে পাড়ীতে জোর করে তুলে নিলেন। পাশে বসিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—শৈলজা, তুমি গান গাইবে, না এস্রাজ বাজাবে?' শৈলজা নিরুত্তর। তাঁর শান্তিনিকেতনে আসার পর সেই প্রথম অনুষ্ঠান। বোধহয় সেইজন্যেই গাওয়া দিতে সংকোচবোধ করছিলেন। যোগ দেননিও, শুধু নিয়মমাফিক রিহার্সালে যেতেন গান শিখতে আর দিনদা-র অননুকরণীয় লেখাপড়ার কায়দা দেখতে। এ-দেখা তাঁর উত্তরজীবনে কাজে লেগেছে।

প্রথম গাইলেন কবে? বর্ষামঙ্গল অনুষ্ঠানের পর নটুদি (বৃদ্ধা কন্যা) বর্ষা-সংগীতের আয়োজন করেছিলেন উদয়নে কোনো এক মঙ্গলবার। কারণ, মঙ্গলবার সন্ধ্যাতেই আশ্রমে সাহিত্যসভা, নাটগান, পাঠচক্র আলোচনা—এইসবের যোগাযোগ ছিলো। সে-আসর বসেছিলো গুরুদেবের সামনে। আমি দিনদার কাছে শিখে গগনে গগনে আপনার মনে' গানটি গেয়েছিলাম। পরদিন নটুদি হেসে বললেন আপনি ত মন্ত্র দিয়েছেন? আমি অবাক হয়ে গেলাম, কেন বলুন ত?

গুরুদেব আপনার গান খুব পছন্দ করেছেন।

শৈলজাদার মুখখানাতে আনন্দের উদ্ভাস। ১৯০২ সালের দিনগুলি যেন চোখের সামনে দেখছেন। এরপর আশ্রমের নাটকেও তাঁকে নামতে হয়েছিলো। তিনি অভিনয় করেছিলেন 'কালের যাত্রা' ও বৈকুণ্ঠের খাতা—দিনঠাকুরের পরিচালনায়। প্রথমের দিকে তিনি শেখাতেন। ফাইনালিং টাচ দিতেন রবীন্দ্রনাথ। অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারে সে এক অমূল্য সঞ্চয়। বৃন্দাবনের সেই লীলা অভিনয়ের আগে কত কথা তাঁর স্মরণে আসে। শৈলজাবাবুর কাছে শুনের পর দিন গিয়ে বসলেও বোধহয় সে-সব কাহিনী শোনা শেষ হবে না। গৌরিকের দীপা বারান্দায় বসতে আমাদের আড্ডা। দিনদাও ছিলেন সে-আসরের এক মস্তবড় পাণ্ডা। একবার নতুন কিছু করবার উদ্দেশ্যে আমরা মাঝরাতে এক বৈতালিক দল তৈরী করে সারা আশ্রম পরিক্রমা করে গান গেয়ে সবাইকে চমকে দিয়েছিলাম। দিনদা আমার এই বৈতালিকের জন্য শিখিয়েছিলেন 'চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে।' এই দলে আমার সঙ্গে ছিলেন শচীন মুখোপাধ্যায়, প্রভাত গুপ্ত ছিলেন। মেয়েরাও যোগ দিয়েছিলেন।

শৈলজার সঙ্গে অল্পদিনের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের একটা অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। এ-সম্পর্কেও তাঁর শান্তিনিকেতনের সঙ্গী প্রভাত-

যাবার অভিমানভরা সহজ মন্তব্য অরুণীর গুরুদেবের সঙ্গে শৈলজাবাবুর সহজেই ঘনিষ্ঠ ও গভীর আলাপ-পরিচয় হয়ে গিয়েছিল। সুযোগ পেলেই আমরা যেতাম তাঁর কাছে, দিনান্তের অবসরে তিনিও পরিচিতদের নিয়ে গল্পগুজব আলোচনা করতে ভালবাসতেন .....শৈলজাবাবু সঙ্গে থাকলে সাধারণতঃ গান নিয়েই নানা কথা ও আলোচনা উঠত, অন্য প্রসঙ্গ এবং অন্যরা থাকত একটু অবহেলিত। তাতে মনে মনে আমরা যে একটু ক্ষুণ্ণ বোধ করতাম এমন নয়। কিন্তু বুঝতে পারতাম, নিজের গান ও অনুরাগীদের সম্বন্ধে গুরুদেবের এক ধরনের দুর্বলতা ছিল, এই সূক্ষ্ম সেতুর যোগে শৈলজাবাবুর সঙ্গে গুরুদেবের কাছাকাছি যাবার এবং সে দলে শৈলজাবাবুও ছিলেন।

তারপর আস্তে আস্তে শান্তিনিকেতনের বাইরেও এখানের দলের উৎসবে যোগ দেওয়া সুরু হোলো। ১৯৩০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে লক্ষ্ণৌর এক সঙ্গীত সম্মেলন থেকে শান্তিনিকেতনের আমন্ত্রণ এলো। রবীন্দ্রনাথ তখন সেখানে ছিলেন না। প্রতিমা দেবীর পরিচালনায় শাপমোচন ও নবীন—এ উৎসবে মঞ্চস্থ হয়। বাংলার বাইরে সেই প্রথম শান্তিনিকেতনের নৃত্যাভিনয় এবং সে দলে শৈলজাবাবুও ছিলেন।

সেই বছরই সঙ্গীতভবনের প্রতিষ্ঠা হোলো এবং নিয়মিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে শিক্ষার সুরু তখন থেকেই। মহুত কাল কি ভেসে শৈলজাদা বললেন ক্লাস সুরু না হলেও গান কিন্তু থেমে থাকেনি। মুক্ত আকাশের নীচে প্রকৃতির সাজঘরের সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে গান ..... ও পাওয়া চলতো। —গানই ছিল শান্তিনিকেতনে প্রাণ—নিকেতনপ্রাঙ্গণের প্রাণ। অন্য দিকে গুরুদেব কখনও কোনো ক্লাস নিতেন না। কখন শেখানোর দায়িত্ব ছিল পুরোপুরি দিনুদার ওপর। উনি মাঝে মাঝে দেখতেন। প্রতি প্রহরে গান চলতো আপন নিয়মে। তবে বর্ষামঙ্গল শারদোৎসবে ছিল বিশেষ অনুষ্ঠান। প্রতি বুধবারের উপাসনা-সভায় ছাত্রছাত্রী অধ্যাপক মিলিত হতেন। ছাত্র সংখ্যা ছিল প্রায় তিনশো। রবীন্দ্রনাথ এই উপাসনার সারা সপ্তাহের কর্মসূচী নির্ধারণ করতেন। পরিকল্পনার আদর্শ ও উদ্দেশ্য সকলকে বুঝিয়েও দিতেন।

সঙ্গীতভবনের সৃষ্টি হলো শান্তিনিকেতনের কর্মবিকাশের অধ্যায় হয়ে। সঙ্গীতভবনের প্রথম অধ্যক্ষ শাস্ত্রীয় সঙ্গীতজ্ঞ হেমেন্দ্রলাল রায়।

সঙ্গীত ভবন প্রতিষ্ঠার পর রবীন্দ্রনাথ শান্তিদেব ঘোষ শৈলজারঞ্জন মজুমদার সকলেই শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের তালিম নিতে বসলেন। শাস্ত্রীয় রাগরাগিনীর ধারণা সুস্পষ্ট এবং কণ্ঠের ভিত তৈরী না হলে কোনো গানই ভালো করে গাওয়া সম্ভব নয়। প্রথম উচ্ছ্বাসের ঝোঁকে ভর্তি হলেন অনেকেই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত টিকে রইলেন শান্তিদেব ঘোষ ও শৈলজারঞ্জন মজুমদার।

বোম্বাই-এ রবীন্দ্রসপ্তাহের অনুষ্ঠান হোলো এর পরের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এ উৎসবের প্রধান আকর্ষণ ছিল রবীন্দ্রনাথের ভাষণ এবং শান্তিনিকেতনের 'শাপমোচন' ও 'তাসের দেশ' পালা দুটির নৃত্যনাট্য রূপায়ন। ১৯০৪ সালে রবীন্দ্রনাথ বয়স এবং স্বাস্থ্যের বাধা অগ্রাহ্য করেও 'শাপমোচন' ও 'গীতোৎসব'-এর দল নিয়ে সিংহলের বিভিন্ন জায়গায় তাঁর অনুপম নৃত্য ও সঙ্গীতরূপের প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। দিনেন্দ্রনাথের ওপর ছিল পরিচালনার ভার। এইসব দলে রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্নেহের শৈলজাকে নিতে ভোলেন নি।

হয়ত গান ও নৃত্যনাট্যের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় কাজ শিক্ষা দিয়ে তৈরী করে তোলার উদ্দেশ্যেই রবীন্দ্রনাথ শৈলজারঞ্জনের ওপর এত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছিলেন।

.....১৯০৬ সালে দিনেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর শৈলজাবাবুর সঙ্গীতশিক্ষার ভার নিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ—বলেছিলেন: আমি ত জানি " গানই তোমার আশ্রমে টেনে এনেছে। গান শেখলে চলবে কেন?

রবীন্দ্রনাথ যতদিন আশ্রমে থাকতেন এ-শিক্ষার ছেদ পড়েনি একদিনও। বছরের পর বছর চলেছিল শিক্ষাদান ও গ্রহণের পালা। গুরু-শিষ্য দুজনেই ক্লান্তিহীন একনিষ্ঠ। রবীন্দ্রনাথের জীবন এ ধরনের শিক্ষা দানের নজির আর আছে বলে আমাদের জানা নেই—এই প্রসঙ্গে পুনরায় উল্লেখ করছি প্রভাতবাবুর উক্তি: কেবল যদি কখনো গুরুদেবের এই গান শেখাবার সময়ে গিয়েছি তাঁর কাছে তবে তিনি যেন কতকটা অন্যমনস্কের মত হয়ে যা করে গেছেন আর শৈলজারঞ্জনকে দূরে দেখতে পেলেই বলে উঠতেন এবার আমার চাকরী সুরু হবে, ঐ আসছে। গীতাম্বুধি—ঐ নামে অনেক সময় তিনি অভিহিত করতেন শৈলজারঞ্জনকে। বুঝে নাও, এখন মানে মানে সরে পড়তে হবে, এবার আসর বসবে সুরোয়ারীর (গানের)। মানুষের জীবনে সকল প্রাপ্তি সম্ভব নয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ শৈলজারঞ্জনের পারিবারিক জীবন সুখের হয়নি বলেই বোধহয় সারা মনপ্রাণ তিনি গানেই ঢেলে দিতে পেরেছেন। খুব সম্ভব ১৯০৫ সালেই আশ্রমে তখন রবীন্দ্রনাথের গান শেখানো ও অনুষ্ঠানের সকল দায়িত্ব ছিল শান্তিদেব ঘোষের ওপর—রবীন্দ্রনাথের ঘন ঘন তাগিদে শৈলজাবাবু ছোটদের একটা গানের ক্লাশ নিতে সুরু করলেন। শিক্ষকতার সুরু হোলো এইভাবেই। এটাও হয়ত রবীন্দ্রপরিকল্পনার অন্তর্ভুক্তই।

গ্রন্থাগারের সত্যচরণ মুখোপাধ্যায়ের ছোট্ট মেয়ে মোহর গায় পাখীর মত সহজ আনন্দে। তার ভার পড়লো শৈলজারঞ্জনের ওপর। তাকে কখন কি গান শেখানো হবে সে নির্দেশ দিতেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। আবার নানা জায়গা থেকে রবীন্দ্রনাথের জন্য আলা সাধন কেন্দ্রের থেকে মোহরের জন্য সরিয়ে রাখা কিছু ভাল পাঠানো হোতো শৈলজারঞ্জনের হাত দিয়েই। এই মোহরই এখনকার রবীন্দ্রসংগীতের জনপ্রিয় শিল্পীদের অন্যতমা, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনিই শৈলজাবাবুর প্রথম ছাত্রী। এই পর্বের আর দুজন কৃতী ছাত্রী হলেন নীলিমা সেন ও অরুন্ধতী দেবী (গৃহঠাকুরতা)।

শিক্ষকতার সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ শৈলজাবাবুকে স্বরলিপিকার রূপে গড়ে তুলতে উদ্যোগী হলেন। দিনেন্দ্রনাথ আশ্রম ছাড়ার পর কবি নতুন কোনো গান রচনা করলে সে গান শেখবার জন্য ডাক পড়তো অমিতা ঠাকুর, শান্তিদেব ঘোষ, শৈলজারঞ্জন এবং অন্যান্য যাঁদের হাতের কাছে পেতেন। এই সময়েই শৈলজাবাবু স্বরলিপি লেখার কাজ আরও ভাল করে নেন এবং স্বরলিপি দিয়ে গান সংরক্ষণের ব্যাপারে কবি ক্রমে তাঁর ওপরই নির্ভরশীল হয়ে উঠতে লাগলেন। এবিষয়ে তাঁর কখনও কোনো আলস্য বা শৈথিল্য ছিলো না। রবীন্দ্রনাথের কাছে শেখা পুরোনো গান এবং তাঁর কাছে সদ্য পাওয়া নতুন গান এ দুই প্রাপ্তির সুযোগে তাঁর ভাণ্ডার পূর্ণ হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের শেষজীবনের গানের তিনিই অদ্বিতীয় ভাণ্ডারী। এত গান আর কারো কাছেই নেই। আর নতুন পুরোনো সব গানই একেবারে স্রষ্টার কাছ থেকে প্রত্যক্ষভাবে আহরিত। এই পরিপ্রেক্ষিতে শৈলজারঞ্জনকে দিনেন্দ্রনাথের পরবর্তী যুগের লিপিকার ও সংরক্ষকও বলা যায়।

শৈলজাবাবু প্রথমে "নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা" ও "নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকার স্বরলিপি করেন এবং নৃত্যনাট্য শ্যামার স্বরলিপি সম্পাদনা করেছিলেন। ক্রমে কণ্ঠের শিল্পীর গাওয়া রবীন্দ্রসঙ্গীতের রেকর্ড যখন কবির কাছে অনুমোদনের জন্য আসতো—সে সব গান শোনার সময় তিনি শৈলজাবাবুকেও সঙ্গে নিতেন এবং রায় দেবার আগে তাঁর মতামতটাও জেনে নিতেন। পরে এ দায়িত্ব তিনি অনেক সময় একা শৈলজাবাবুর ওপরই ছেড়ে দিতেন।

সকল দিক দিয়ে তাঁর যোগ্যতাকে পূর্ণতর পরিণতির পথে এগিয়ে নিয়ে কবি যেন তাঁর কাজের যথার্থ সহকর্মীরূপে শৈলজাবাবুকে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তীক্ষ্ণ নয়নের দিবাদৃষ্টি দিয়ে তিনি চিনেছিলেন তাঁর সুরের রসিককে। ১৯০৪ সালের সেপ্টেম্বর অকটোবরে আশ্রমের কাজ পুরোদমে চলছিলো। কবি মাদ্রাজ ও ওয়ালটেয়ার গেলেন 'শাপমোচন' নৃত্যনাট্যের দলবল নিয়ে। সঙ্গে ছিলেন শৈলজাবাবু। আশ্রমে তাঁর নাট্যাভিনয়ে শেষ অংশগ্রহণ পরের বছর শারদোৎসবের পঞ্চমীনাথের সন্ন্যাসীর ভূমিকায় এবং সাধারণ রঙ্গমঞ্চে তাঁর সর্বশেষ অবতরণ ডিসেম্বর মাসে প্রথমে আশ্রমে ও পরে কলকাতায় "অরূপ-রতন" নাটকে ঠাকুর্দা ও অন্তরালে থেকে রাজার ভূমিকায়। এইসব নাটকের সঙ্গেও শৈলজাবাবু, প্রভাতবাবু এঁরা যুক্ত ছিলেন।

১৯০৫ সাল সম্পর্কে [illegible]

পরিকল্পনা ও দায়িত্বে একটি অনুষ্ঠান উপহার দিয়ে শৈলজাবাবু আপন যোগ্যতা প্রমাণ করলেন। এ উৎসব হোলো রবীন্দ্র-পরিচয়-সভার সাংগীতোৎসব শরৎপর্ব। এর সম্পাদক ও পরিচালক ছিলেন প্রভাত গুপ্ত এবং উৎসবের দায়িত্ব পরিচালনার ভার ছিলো শৈলজাবাবুর ওপর। এ-অনুষ্ঠান ছিলো উদ্যোক্তাদের একটা চ্যালেঞ্জ সেই সময়কার ছকে-বাঁধা উৎসবের মধ্যে—এ উৎসব আনতে চেয়েছিল একটা বৈচিত্র্যের স্বাদ। বলা বাহুল্য এ চ্যালেঞ্জ সার্থক হয়েছিলো। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এই অনুষ্ঠানে সহযোগিতা করেছিলেন। সে মেয়েটি "সাধারণ মেয়ে" আবৃত্তি করেছিলো—কবি তাকে দিনের পর দিন শিখিয়েছিলেন। সে আবৃত্তি সবাইকে মুগ্ধ করেছিল। "তোমার গীতি, জাগালো স্মৃতি" গানটি স্বৈত-কণ্ঠে পরিবেশন করেছিলেন শৈলজাবাবু গুরুপল্লীর মেয়ে সুরেখুনির সঙ্গে।

মূল আকর্ষণ ছিলো রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠের আবৃত্তি 'সমস্যা' কবিতা আর তার সঙ্গে রাণী চন্দর মূক নৃত্যাভিনয়। সে উৎসবে শৈলজাবাবুর আব্দারে গরদের ধুতি চাদর পরে কবি অংশগ্রহণ করেছিলেন। সব দিক দিয়েই এ উৎসবের নূতনত্ব সকলকে অবাক করে দিয়েছিলো। এরপরও প্রতি বছর শান্তিনিকেতনের দল কোলকাতায় এসেছে নৃত্যনাট্য 'চিত্রাঙ্গদা', 'পরিশোধ', 'বর্ষা-মঙ্গল', 'চণ্ডালিকা' ও 'শ্যামা' অভিনয় করতে। পাটনা এলাহাবাদ লাহোর দিল্লী ও মীরাটে গেছে 'চিত্রাঙ্গদা' নিয়ে। এসবের সঙ্গে যুক্ত থেকে রবীন্দ্রপ্রয়োজনার নাচগান। অভিনয়, সাজপোশাক, আলো—সমস্ত দিকগুলিই শৈলজাবাবুর নখদর্পণে এসে গিয়েছিলো।

হেমেন্দ্রলাল কাজে ইস্তফা দিয়ে চলে যাবার পর সঙ্গীতভবন পরিচালনার কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। প্রতিমা দেবীকে অধ্যক্ষ পদে বসিয়ে কাজ চালিয়ে নেওয়া হচ্ছিলো। এবার রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছা ও আদেশে শৈলজাবাবুকে এই ভার নিতে হোলো। তাঁর দিক থেকে সকল দ্বিধা ও সংকোচকে কোনো আমল না দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলছিলেন "তোমার হাতে রেখে যাব আমার গান আর নাটক? তুমি যদি ভার নাও আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি। আমি জানি, তুমি পারবে।'

গান ছিলো কবির সবচেয়ে আপন। যতদিন বিনেন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর ওপর গান সংরক্ষণের ও প্রচারের জন্য কবি নির্ভরশীল ছিলেন। কিন্তু দিনু ঠাকুর ছিলেন আপনভোলা উদাসী প্রকৃতির মানুষ। কোনো বাঁধা নিয়মের মধ্যে থেকে প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ধাতু তাঁর ছিলো না। এবিষয়ে অনাদিকুমার দস্তিদারের ওপরও তাঁর দৃষ্টি ছিলো—কিন্তু পারিবারিক কারণে অনাদি-বাবুকে কোলকাতাতেই থাকতে হোতো। শেষ অবধি কাছে রইলেন বলে শৈলজা-বাবুর হাতেই তিনি তুলে দিলেন এই বিপুল দায়িত্ব।

কবির গানের সংরক্ষণ, প্রচার, শিক্ষাদান, নতুন গানের স্বরলিপি-রচনা এবং স্বরলিপি বইএর সম্পাদনা—সব কিছু দায়িত্ব তাঁরই ইচ্ছের হাতে নিলেও রসায়নের অধ্যাপকের কাজটাও বজায় রইলো শৈলজা-বাবুর নিজের ইচ্ছেয়। গ্রামোফোন রেকর্ড এবং সিনেমায় গাওয়া গানে অনুমোদনের কাজেও তাঁর ডাক পড়তো। কুণ্ঠাসত্ত্বেও শৈলজাবাবু এসব দায়িত্ব নিয়েছিলেন এই ভেবেই মাথার ওপর গুরুজন ত রইলেনই। প্রয়োজন হলে এবিষয় তাঁর নির্দেশ পাওয়া যাবে।

একনিষ্ঠ সঙ্গীতসেবার পুরস্কার কবির এই স্নেহের দান শৈলজারঞ্জনের জীবনকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছে। তাঁকে ভাগ্যবান বলে চিনেছিলেন বলেই রবীন্দ্রনাথ প্রতি পদক্ষেপে তাঁর প্রতি লক্ষ্য রেখে—নানারকম দায়দায়িত্ব তাঁর ওপর চাপিয়ে দিয়ে ধাপে ধাপে তাঁকে এগিয়ে দিয়েছেন। সঙ্গীত-সাধককে ওকালতির গণ্ডীতে বেঁধে রাখা হয়েছিলো। এ বিড়ম্বনার হাত থেকে কবিই তাঁকে মুক্তি দিলেন। এই প্রসঙ্গেই স্মরণীয় শৈলজাবাবুর এক জন্মদিনে তাঁর আশীর্বাণী :

"জন্মদিন এল তব আজি
ভরি লয়ে সঙ্গীতের সাজি।
বিজ্ঞানের বস্তুঘন রাগরাগিণীর রসায়নে
পূর্ণ ছিলো তোমার জীবনে।

কর্মের ধারার তব রসের প্রবাহ
যেথায় মেলে
সেইখানে ভারতীর আশীর্বাদ
অদ্ভুত ফলবে।'

যতদিন কবি বেঁচেছিলেন শৈলজাবাবু সঙ্গীতভবনের অধ্যক্ষ ছিলেন এবং তাঁর ওপর সকল দায়িত্ব অর্পণ করে তিনি পরম শান্তি পেয়েছিলেন।

কিন্তু তাঁর অন্তর্ধানের পর গান সম্বন্ধে তাঁর নিজের প্রবর্তিত নিয়মগুলি অক্ষুণ্ণ থাকেনি। বিশ্বভারতী এক সময় কেন্দ্রীয় সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হোলো। ফলে দায়িত্বের ক্ষেত্রে এলো স্বৈতশাসন। নতুন কর্তৃপক্ষের বিধানে শৈলজাবাবু নামেমাত্র অধ্যক্ষপদে বহাল রইলেন। তাঁর দায়িত্ব সীমিত করা হোলো। সঙ্গীতভবনে বিভাগীয় দপ্তর সংক্রান্ত কাজকর্মের অধ্যক্ষতায়। উল্লেখ হোলো স্বর-লিপি সমিতির। স্বরলিপি সম্পাদনার কাজ এক হাতে না থেকে ভাগাভাগি হয়ে গেলো।

কবির অন্তর্ধানের পর ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী শান্তিনিকেতনে এলেন এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এখানেই ছিলেন। ইন্দিরা দেবীকে সঙ্গীতভবনের প্র-ভোস্টপদে বহাল করা হোলো। দুঃখের দিনে এইটুকুই ছিলো শৈলজাবাবুর সান্ত্বনা। রবীন্দ্রনাথের অনেক পুরানো গান ইন্দিরা দেবী জানতেন। সেইসব গানের এবং কিছু কিছু পূর্ব-প্রকাশিত গানের স্বরলিপি—ইন্দিরা দেবীরই ভাষায় যেন 'পুলিশ পাহারায়' দাঁড়িয়ে থেকে শৈলজাবাবু ইন্দিরা দেবীর কাছ থেকে আদায় করে গিয়েছিলেন।

বহু আগে শৈলজাবাবুর সঙ্গে ইন্দিরা দেবীর পরিচয় করিয়ে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ রহস্যচ্ছলে বলেছিলেন "বীরু তোর পিছনে একটি বাজ লেলিয়ে দিলাম আজ, টের পাবি পরে।'

সেই টের পাবার দিন এলো এতদিনে।

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু বিশ্ব-ভারতীতে উপাচার্যের পদে যোগ দেওয়ার পর স্বৈত শাসনজনিত বিশৃঙ্খলা দেখে রবীন্দ্রনাথের বাক্যকে গ্রহণ করে শৈলজাবাবুকে আগের অধিকারেই প্রতিষ্ঠিত করলেন। ১৯৫৯ সালে অবসর গ্রহণের পর তাঁকে পুনর্নিয়োগ করা হোলো।

কিন্তু নানা কারণে পরিবর্তিত আশ্রম পরিবেশে হৃদ্যতার অভাব তাঁর মনে পীড়িত বোধ করছিলো। তাই ১৯৬০ সালের অক্টোবর মাসে সেখানকার কাজে ইস্তফা দিয়ে তিনি সঙ্গীতের সাধনপীঠ শান্তিনিকেতন ছেড়ে চলে এলেন কলকাতায় (প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত)।

কলকাতায় আসার পর আস্তে আস্তে তাঁর নতুন কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি হোলো—তার বিস্তারও ঘটতে লাগলো দিনে দিনে। শান্তিনিকেতনে থাকাকালীনই তিনি ১৯৪১ সালে শুভ গুহঠাকুরতা ও সুজিতরঞ্জন রায়ের গীতবিতান প্রতিষ্ঠার প্রেরণা হয়েছিলেন। রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্ষেত্রে এটা একটা চিহ্নিত অধ্যায়। এর আগে শান্তি-নিকেতনের বাইরে রবীন্দ্রসঙ্গীতের কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিলো না। তার অনেক আগে অবশ্য গীতালি সংস্থার সৃষ্টি হয়েছিলো ঐ একই উদ্দেশ্য নিয়ে। কিন্তু সেটা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়েছিলো।

এই গীতবিতানকে গড়ে তোলার কাজে শৈলজাবাবুর একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। দক্ষিণীর সৃজনা, সংগঠন ও পরিচালনার ক্ষেত্রেও শৈলজাবাবুর অবদান আছে। দক্ষিণ কলিকাতার সুরশ্রীমা (১৯৫৭ সালে স্থাপিত) তাঁরই পরিকল্পিত প্রতিষ্ঠান এবং তাঁর ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানেই হয়েছে।

এছাড়া কোলকাতা এবং তার আশে-পাশে এমন কোনো রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রতিষ্ঠান নেই যার সঙ্গে তিনি যুক্ত নন। এখন অবশ্য সুরশ্রীমার মধ্যেই তিনি বেশী কেন্দ্রীভূত।

১৯৫৪ সালে রেঙ্গুনের টেগোর সোসাইটির আমন্ত্রণে শান্তিনিকেতনের দল নিয়ে শৈলজাবাবু সেখানে গিয়ে-ছিলেন। প্রায় দুমাস সেখানে ছিলেন। সেখানে বর্মী ছাত্রছাত্রীদের রবীন্দ্রসঙ্গীত শেখাতেন নিয়মিত ক্লাশ নিয়ে। এবং শান্তিনিকেতনের ধারার ভারা নাচও অভ্যাস করতো নৃত্যশিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে। শান্তিনিকেতন রেঙ্গুনের সম্মিলিত দল নিয়ে তিনি রেঙ্গুনে নৃত্যনাট্যও মঞ্চস্থ করেছেন। ১৯৫৪ থেকে ১৯৬০ অবধি তিনি (১৯৫৭ সাল বাদ) একাজ করেছিলেন। প্রতিদানে শান্তি-

নিকেতনের দল রবীন্দ্রের কাছে গেয়ে নাচ শিখতো।

দুই দেশের এই সাংস্কৃতিক বিনিময় ঘটাচ্ছিলো শৈলজাবাবুরই চেষ্টায়।

রবীন্দ্রসংস্কৃতির সংযোগ্য ধারকরূপে শৈলজারঞ্জন কাশ্মীরের যুবরাজ করণ সিংএর আমন্ত্রণে সেখানে গিয়েছিলেন ছিতেনদা ও ভানু সিংহের পদাবলীর নৃত্যানুষ্ঠান দেখাতে, শান্তিনিকেতনের দল নিয়ে।

রবীন্দ্রসঙ্গীত ও সঙ্গীতের উপদেষ্টা ও পরীক্ষক হিসাবে তিনি বিশ্বভারতী, রবীন্দ্রভারতী, হাঁচি ও ভাগলপুর বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত আছেন। পাটনা ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গেও তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন অনুরূপভাবেই।

বেতার প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও আছে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। মোটকথা, শৈলজাবাবুকে রবীন্দ্রসঙ্গীত, নৃত্যনাট্য তথা রবীন্দ্রকলার জীবন্ত অভিধান বললেও অত্যুক্তি হয় না। এখনও বয়সের বাধা, স্বাস্থ্যকে উপেক্ষা করে ভারতের নানা প্রান্তে ছুটে বেড়ান এ সঙ্গীতের প্রচারের কাজে। এবিষয়ে যেকোন অনুরোধই তাঁর কাছে শ্যামের বাঁশির মতই দুর্নিবার্য।

রবীন্দ্রসঙ্গীত শান্তিদেবাবু শৈলজা-বাবু ছাড়াও আরো হয়ত অনেকে আছেন এবং ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে শৈলজারঞ্জন মজুমদারের তফাৎটা কোথায়?

এই প্রসঙ্গে প্রথমেই স্মরণে আসে দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ইন্দিরা দেবী চৌধুরীরাণীর কথা। কিন্তু এঁরা দুজন ঠাকুর পরিবারের অন্তর্ভুক্ত রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জন্ম থেকেই ছিলো এঁদের নাড়ীর যোগ। এবং তাঁরা হয়েছিলেন কবির অন্তরঙ্গ স্নেহভাজন। অতএব রবীন্দ্র-চিন্তা এঁদের কাছে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সম্পত্তির মতই।

বাকী দুজন, মানে অনাদিকুমার দস্তিদার ও শান্তিদেব ঘোষ ছোটবেলা থেকেই শান্তিনিকেতনে থাকার এবং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত হবার দরুন রবীন্দ্রসংস্কৃতি এঁদের মধ্যে বর্তেছিলো। স্বাভাবিক নিয়মে যেমন মাটি ফুঁড়ে বেরোয় বৃক্ষলতা।

কিন্তু শৈলজারঞ্জন, এ দুটি সুযোগের কোনোটারই অধিকারী ছিলেন না। তিনি শান্তিনিকেতনে বিদেশী, রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্ষেত্রে আগন্তুক। তাঁর জীবনে সঙ্গীতের প্রবেশ ছিলো নিষিদ্ধ। কিন্তু ফাকটস আর স্টেজার দ্যান ফিকশন। তাই রসায়নের অধ্যাপক এবং কুড-বি ল-ইয়ার পরিণত হলেন রবীন্দ্রসঙ্গীত-গুরুতে। ভালবাসার পরশমণিতেই এ অসম্ভব সম্ভব হয়েছে। কিংবা বলা যায় জন্মান্তরের সংস্কার।

গুরু শৈলজারঞ্জন প্রতিদিনের জীবনে কিন্তু মোটেই গুরুগম্ভীর নন। স্নেহ-প্রবণ, সেবাপরায়ণ এবং সবার-বন্ধু শৈলজাবাবুর সঙ্গে এই ত জানুয়ারীতেই একসঙ্গে গেছি জামসেদপুরে। উনি শুধু হাসিখুশীই নন। বেশ গিন্নীবান্নীও। ট্রেনে তাঁর ঝুলি থেকে খেজুরে-গুড়ের সন্দেশ বার করে বিতরণ করলেন জরুদা, মালতী ঘোষাল, বাণী, বনানী নীহার-বিন্দু সেন সবাইকে। আমি আর গ্রাজেশ্বরীকে মিষ্টি খেতে নারাজ বলে একটি প্লাস্টিকের গ্লাস থেকে কুচো নিমকী বার করে দিলেন।

শৈলজাবাবুর বাড়ীতে যেদিন ইন্টারভ্যু করতে গেছি কাঁচের দেওয়াল আলমারী থেকে একশিশি নারকোল নাড়ু বার করে আমার হাতে এক মুঠো ঢেলে দিয়ে বললেন খেয়ে দেখ—আমার এক ছাত্রী নিয়ে গেছে। ভারী সরল আর অন্তরঙ্গ মানুষ।

কবিসম্রাট রোদুরের তাঁর অন্তরে কৌতূহলের বর্ণনা করেছে। রবীন্দ্রনাথকে উনি একবার রেগে প্রশ্ন করেছিলেন 'তবু মনে রেখো' ও 'আমার আঁধার ভালো' এসব এ্যাডভান্স রবিংএর গান লেখেন কেন? এসব গান আমি দুচোখে দেখতে পারি না—

উনি কি বললেন?

—কি আবার বলবেন? কাঁচুমাচু মুখ করে বললেন, এসব আমার আগের গান—এই কাঁচুমাচু মুখখানির কথা মনে করেই বোধহয় প্রাণখোলা হাসিতে শৈলজাদা ঘর ভরিয়ে দিলেন।

আর একবার ঠিক ঐভাবেই বলে-ছিলাম এত লেখোটিভের বকমারি কেন: 'গ্রামের নাম-বলা সাপী' স্বাধীন এসে গেলে ফিরে 'দুজনে দেখা হোলো কোনো কথা কহিল না'। তখনও দেখেছিলাম সেই অপ্রস্তুত হওয়া শিশুর মত লাজুক হাসি, ভেতরটা ও'র চিরদিন শিশুর মতই নরম ছিলো।

ফুটবল ম্যাচের সময় সবাই মাঠে ছুটতো খেলা দেখার জন্য। সেই সময় গুরুদেবকে একলা পাওয়া যাবে বলে তাঁর কাছে বসে থাকতাম। এইরকম একদিন তাঁর কাছে বসে আছি। সামনে দিয়ে গ্রামের মেয়েরা বকবক করতে করতে যাচ্ছে। কমলারং-এর জোববা-পরা গুরু-দেবের সেই মূর্তি দেখে ওদের কি মনে হোলো—সার বেঁধে সামনে দাঁড়িয়ে বকবকানি থামিয়ে যেন স্তম্ভিত হয়ে গুরুদেবকে দেখতে লাগলো। কতক্ষণ পরে তাদেরই কার কোলের একটি খুকু কেঁদে উঠতে ওরা চলে গেলো।

কি হোলোরে ব্যাপারটা? গুরুদেব প্রশ্ন করলেন।

বললাম এইটেই ত স্বাভাবিক। হাঁ করে তাকিয়ে দেখার জিনিস দেখে চলে গেলো।

ও'র মাথায় ঢোকে নাথা হোতো—আমি পছন্দ করলে তবে।.....

কৌমিশ্টির ক্লাশ, সঙ্গীতভবনের কাজ এসবের চাপে অনেক সময় আমার নাওয়া-খাওয়ার অনিয়ম হয়ে যেতো। একদিন আমায় ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করলেন তুমি ভেবেছ কি? যা খুশী তাই করবে?

আপনারই আজ্ঞায় গানের মাষ্টার হয়ে কুলে কালি দিয়েছি। আপনি যা বলবেন তাই-ই করব। শুধু পারব কিনা সেটা আপনিই বুঝবেন।

গুরুদেব পরীক্ষায় বিশ্বাস করতেন না। ম্যাট্রিক পরীক্ষায় মিউজিকে অরুন্ধতী ফার্স্ট হয়েছিলো। মোহর সেকেণ্ড। উনি শুনে চোখ বড় বড় করে বলেছিলেন বাবারা সব পণ্ডিত হয়ে গেল। আমরা যাব কোথায়?

ইন্দিরা দেবী পরীক্ষা নিতেন। বিশ্ব-ভারতীর দু-রকম কোর্স ছিলো—একটা কালকাটা ইউনিভার্সিটির কোর্স অন্যটা বিশ্বভারতীর। বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট থেকে বিশ্বভারতীতে শেখবার জন্য ছটি স্কলার-শিপের ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। রাজেশ্বরী ওয়াজ ওয়ান অফ দেম। শ্রীনিকেতনে রাজেশ্বরী ছিলো। সেখান গুরুদেব আসবেন বলে অভ্যর্থনার আয়োজন চলছে। একক, কোরাস সবরকম গানের ব্যবস্থাই ছিলো। রাজেশ্বরীকে বললাম ওর পছন্দমত একটা গান গাইতে। তখন শ্যামা রিহার্সালে শিখেছিলো বলে কিনা জানি না ওর কি মনে হোলো গাইল, 'সুকে সে ফোট যায়' পদ্মফুলের মত ফুটফুটে মেয়েটির মধুর কণ্ঠ ও আবেগ গুরুদেবের অন্তর স্পর্শ করেছিলো। তখন স্বাস্থ্য ভেঙেছে। ওকে হাতে করে তৈরী করতে পারলেন না বলে খুব আফশোষ করতেন। একবার বর্ষামঙ্গল উৎসবে বিশেষ করে ওরই কণ্ঠের উপ-যোগী করে 'তোমায় আবার চাই শুনাবারে' গানটির সুর করে আমায় বললেন ওকে শেখাতে। রাজেশ্বরী সোলো গেয়েছিলো। ও কুচী ছাত্রীও ছিলো। অনার্স নিয়ে বি-এ পাশ করে শান্তিনিকেতনে এসে-ছিলো। তখন ওখানে পোষ্ট গ্রাজুয়েট ক্লাস ছিলো না বলে ও চলে যেতে চেয়ে-ছিলো। কিন্তু ওকে ধরে রাখার জন্যই গুরুদেব প্রথম পোষ্ট-গ্রাজুয়েট ক্লাশ খুললেন। সংস্কৃতি নিয়ে দুটি মেয়ে সেখানে ক্লাশ সুরু করল রাজেশ্বরী দত্ত আর একটি মেয়ের নাম জয়ন্তী কি যেন। টাইটেলটা ঠিক মনে নেই। রাজেশ্বরী আমাদের সকলেরই অত্যন্ত স্নেহের পাত্রী ছিলো। ওর স্বভাবটি ভারী সুন্দর, তাছাড়া অবশ্যালী হয়েও গুরুদেবের গানকে ও নিজের গান বলে গ্রহণ করেছে।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের গুরু হিসাবে শিক্ষার ক্ষেত্রে আপনি কোন কোন বিষয়ের ওপর জোর দেন?

সুর, লয়, সাহিত্য ও ভাব এই সব কটি বস্তু মিলে গুরুদেবের গানের একটি যে বিশেষ ভঙ্গির সৃষ্টি হয়—সারা মন-প্রাণ দিয়ে আমার ছাত্রছাত্রীদের সেইটিই চিনিয়ে দিতে চেয়েছি। কারণ গুরুদেবকে সবচেয়ে বেশী পাওয়া যায় তাঁর ঐ অনন্য সঙ্গীতরূপের মধ্যেই।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের গায়কী? এ সম্বন্ধেও আপনার মতটা জানতে ইচ্ছে করে?

'যা শুনলেই রবীন্দ্রসঙ্গীত বলে চেনা যায়। সূর্যের আলোয় যেমন সব রং মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে—রবীন্দ্রনাথের গানেও তাই। ভারতের অন্তর্হীন সঙ্গীতধারার এ গানের অন্তর গহনে প্রবাহিত। এই কথাটি মনে রাখলে গায়কী আপনিই তৈরী হয়ে যায়।

এই প্রসঙ্গেই মনে পড়ে হেমন্তবালা দেবীকে তিনি একবার লিখেছিলেন 'আমার মধ্যে যৌবনকে তুমি খোঁজো। সে পালায় নি। কিন্তু তার সঙ্গেই আছেন শিব,—ভিখারী এবং সন্ন্যাসী। রসরাজের বাঁশীও বাজে, নটরাজের নৃত্যও হয়। যমুনায় নৌকা ভাসান, শেষকালে পড়ে গিয়ে সেই গঙ্গায়—যেখানে গৈরিক পরে চলেছেন সন্ন্যাসী।' অফুরন্ত যৌবনের উজ্জ্বল প্রাণরস ও সংযত বৈরাগ্য এই দুই-এর সমন্বয়ই তাঁর গানে একটা ভারসাম্য সৃষ্টি করেছে।

নিজের গান সম্বন্ধেই বোধহয় ওঁর সবচেয়ে দুর্বলতা ছিলো। সব সময় বলতেন—আমার সব যাবে, কিন্তু সবচেয়ে স্থায়ী হবে আমার গান।

১৯৪০ সালে ইন্দিরা দেবী, অরুন্ধতী দেবী যখন গীতালী খুললেন কোলকাতায় রবীন্দ্রনাথের গান প্রচারের উদ্দেশ্যে। তারই প্রতিষ্ঠা উৎসবে কবি বলেছিলেন 'আমার গান যাতে আমার গান বলে মনে হয় এইটি তোমরা কোরো।.....বুলাবাবু তোমার কাছে সানুনয় অনুরোধ এ'দের একটু দরদ দিয়ে, একটু রস দিয়ে গান শিখিও—এটাই আমার গানের বৈশিষ্ট্য। এর ওপর যদি তোমরা স্টীম রোলার চালিয়ে দাও আমার গান পিষ্ট হয়ে যাবে। আমার গানে যাতে একটু রস থাকে, তান থাকে দরদ থাকে ও মীড় থাকে তার চেষ্টা তোমরা কোরো।'

সকলের জন্য তাঁর চিন্তা ও দরদে এই রসবোধই উদ্বেলিত। অমিতা তখন নবীনা। উনি আমায় বললেন 'ওকুর আশা নেই। একটা চকলেট কিনে ওকে বাইরে এস।'

শৈলজাদা ওঁর গান ভারতের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত অবধি পৌঁছে দিয়েছেন এজন্য কবির কত যে আশীর্বাদ পেয়েছেন। তাঁকে লেখা রবীন্দ্রনাথের নানা চিঠি থেকে কিছু অংশ তুলে দিচ্ছি—

'তোমার চিঠিখানি.....পড়ে..... বেশ বুঝতে পারছি তোমরা বেশ রীতিমত জমিয়েছিলে। যেটা আমার কাছে বিশেষ আনন্দের বিষয় মনে হয় সেটা হচ্ছে এই যে গানগুলি তোমরা ছড়িয়ে দিচ্ছ—শুধু গান নয় শান্তিনিকেতনে যে রূপের প্রেরণা আছে সেও বাংলাদেশের অন্তরে গিয়ে পৌঁচচ্ছে।

আর একটি চিঠিতে—

'তোমাদের নেত্রকোণায় তোমার জন্মদিনের উৎসব যেমন পরিপূর্ণ মাধুর্যে সম্পন্ন হয়েছে এমন আর কোথাও হয়নি। পুরীতে আমাকে প্রত্যক্ষ সামনে নিয়ে সম্মান করা হয়েছিলো। কিন্তু নেত্রকোণায় আমার সৃষ্টির মধ্যে অপ্রত্যক্ষ আনন্দকে রূপ দিয়ে আমার স্মৃতির যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে তাঁর পক্ষে সেই অভিনন্দন আরো অনেক বেশী সত্য। তুমি না থাকলে এত উপকরণ সংগ্রহ করত কে?'

কেতকীর গান কবিকে খুশী করতে পারেনি। এই প্রসঙ্গে বলেছিলেন নন্দনবনে যে অপ্সরার যোগাস্থান ছিলো সুন্দরবনে তার মান বাঁচানো সহজ নয়।.....যথার্থের প্রতিষ্ঠা হতে সময় লাগে। নিরাশ হবার কিছু নেই।' কবির ইচ্ছায় নন্দলাল বসু সারেঙ্গী আনিয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন 'তুমি আমার সঙ্গে বাজাবে।—মোহরের 'ক্ষণে ক্ষণে মনে মনের সঙ্গে আমি বাজিয়েছিলাম। পরে বাঙ্কম মিশ্র এসেছিলেন।

তাঁর কাছে শোনা 'সমুখে শান্তি পারাবার'-এর কাহিনীর সঙ্গে এই নিবন্ধ সমাপ্ত করতে চাই।

গুরুদেব অসুস্থ। কোলকাতায় চলে আসবেন। আসার দিন ভোরে উঠে উনি বৈতালিকের দোতলায় জানালার ধারে বসে। নীচে আমরা বৈতালিকরা 'এ দিন আজি কোন্ ঘরে গো খুলে দিল দ্বার' গেয়ে আমাদের মনের বেদনা ও অভিমান তাঁকে জানালাম।.....যাবার আগে বসে উঠে বললেন। সঙ্গে যাচ্ছিলো নন্দিতা : ব্যাম বাসের দুধারে আশ্রমের ছেলেমেয়েদের নিয়ে 'আমাদের শান্তিনিকেতন' গাইতে গাইতে চললাম।

অসুস্থতার জন্য অনেকদিন বেরোতে পারেননি। রান্নাঘরগুলির সামনে বসানো নতুন লাইট পোস্টগুলি সেই প্রথম দেখে হেসে বললেন—'তোদের পরানো আলো চলল। নতুন আলো আসছে পুবে'—শৈলজাদার গলার স্বর রুদ্ধ হয়ে যায়। পারাবারীর হাতার চোখ মুছে আবার যেন নিজের মনেই বলে চললেন—'ডাকঘরের জন্য উনি লিখলেন 'সমুখে শান্তি পারাবার'। সেই প্রথম আনইউজুয়াল একটা গান দেখলাম। আমায় শিখিয়ে দিয়ে বললেন 'এই গানটি প্রত্যক্ষ দেখতে পেলাম। তাই লিখে রেখে তোমায় শিখিয়ে গেলাম। অন্যান্য গানের মত এ গানটি কাউকে শিখিও না। আমার যখন 'হয়ে-বসা' যাবে তখন এই গানটি করিও। কিন্তু তখন তুমি আমাকে কাছে পাবে না।'

তাই হয়েছিলো।

নলিনীর বিয়েতে তিনটি গান বসন্ত করেছিলেন। বড়মা (হেমলতা ঠাকুর) মাঘোৎসবের জন্য তাঁর সঞ্চয় থেকে কিছু গান চাইলেন।

—আমি কোর্সিস্টার প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস নিচ্ছি। হঠাৎ বেয়ারা এসে একটি স্লিপ দিয়ে গেলো। তিনটি গান গুরুদেব কোন-সাতার পাঠাতে বলেছেন—স্বরলিপি করে ১। সমুখে শান্তি-পারাবার ২। দুজনের মিলনের কারণায় প্রেমের মিলন ৩। তোমাদের স্ব কর্ম।

আমি পোস্ট করে দিয়ে ওঁকে জানাতে হঠাৎ যেন ক্ষেপে উঠলেন 'তোমাকে বারে-বারে বলেছি না সমুখে শান্তি পারাবার এখন কাউকে না দিতে?'

'আপনিই ত বলেছেন—'

'শীগ্গির চিঠি লিখে বারণ করে দাও—ও গান যেন ব্যবহার না করে।' সেদিন থেকে গানটি সযত্নে তালার ভেতর লুকিয়ে রেখে দিয়েছিলাম।

অবশেষে কোলকাতা থেকে টেলিগ্রাম এলো সেই চরম সংবাদ নিয়ে। 'পিস টু রিস্টিং।'

আমি পাগলের মত ছুটছি স্টেশনের দিকে। পথে ক্ষিতিশবাবুর সঙ্গে দেখা হোলো। বললেন 'কোথায় চলেছ? গানটার কি ব্যবস্থা করলে? যাচ্ছই বা কেন? জনকার ভেতে-এ নিশ্চয়ই হয়ে যাবে। তাঁর কাছে কি পৌঁছতে পারবে?'

সত্যিই ত গানটার দায়িত্ব ত আমারই ওপর? আমি ঘুরে গেলাম। কণিকা ইন্দুলেখা অমলা সরকার—ওদের গানটা শেখালাম। ওদিকে কোলকাতায় গুরুদেবের অন্ত্যেষ্টি জনতাবেষ্টিত হয়ে নিমতলা মহাশ্মশানের দিকে অনন্তের পথে যাত্রা করছেন—শান্তিনিকেতনের মন্দিরে আমরা কজন মিলে তখন গাইছি 'সমুখে শান্তি-পারাবার'—মেয়েগুলো ত কেঁদে সারা। গাইবে কি?' শৈলজাদাও ছেলেমানুষের মত কেঁদে উঠলেন, আমার কাপড় চোখের সামনে।

পরে সমুখে শান্তি-পারাবার তিনজন শিল্পী তিনটি বিভিন্ন কোম্পানীতে রেকর্ড করেছেন। অমিয়া ঠাকুর হিজ মাস্টার্স ভয়েস-এ অনাদিকুমার দস্তিদারের পরিচালনায় শৈলজাদার এস্রাজ সঙ্গতে। পাওনিয়ারে এ গান রেকর্ড করেন ইন্দুলেখা দেবী।

সন্ধ্যা সেন

তুমিও ক্ষমার যোগ্য নও ॥

সামসুল হক

গাই
তুমিও ক্ষমার যোগ্য নও
কেননা তোমার মনে
স্পষ্টই করেনি
বুদ্ধের পূর্ণিমা

পাখি
তুমিও ক্ষমার যোগ্য নও
তানার রৌদ্রের গন্ধ
ছড়াতে পারোনি
জন্মের চিৎকার কিংবা
মৃত্যুর বিবাহ

নদী
তুমিও ক্ষমার যোগ্য নও
তোমার সর্বোপ্তে
এখনো সুখেই বাউলের
আর আমার মা
রান্নাঘরে কাঁচা ভিজে কাঠের ধোঁয়ায়
একাকার

ঈশ্বর
তুমিও ক্ষমার যোগ্য নও
কেননা তোমার বুকে
মানুষের দুঃখ ও পাপের ক্লরোগ
পালন করোনি

প্রার্থনার সময় ॥

পরেশ মণ্ডল

সত্যি বলতে কি
এখন আমি আয়নায় আমার মুখ দেখতে পাচ্ছি না
তার বদলে
কুয়াশায় ঝোরা নদী
ফিউজড বাল্ব
জং-ধরা রেলিং

আকাশের নিচে এই সন্ধ্যায়
দূর থেকে হুটার শব্দ ভেসে আসছে
এক...দুই...তিন

এখন আমাকে নতজানু হতে দাও
এই তো সময়
প্রার্থনার সময়

ডোরাকাটা ॥

সাধনা মুখোপাধ্যায়

যে সকল মুখগুলো পরিচিত
এবং ভীষণ চেনা চেনা
অথচ সাক্ষাৎ হলে
নাম মনে পড়ে কি পড়ে না
বিস্তৃত দুঃখ এক বয়ে নিয়ে
চলে যায় দীন
অথচ বোঝে না কেউ
এটা নয় স্বেচ্ছাকৃত দাম্ভিকতা
স্মৃতি নয় আমার অধীন
স্মৃতি বড় অন্যমনস্ক আর
খেয়ালীপনার ভরা
অবিমৃষ্যকারী
যা কিছু সময়োচিত
তাকে যেন ভোলাতেই
লেপে মুছে রেখে দেয়
যে কথা যখন দরকারী
যখন অন্য কিছু স্মরণীয়
তখনই তাকে সে টেনে
নিয়ে আসে চেতন আলোয়
অর্ধেক ভুলে যাওয়া
অর্ধেক মনে পড়া
স্মৃতি যেন ডোরাকাটা কম্বল
কোথাও উজ্জ্বল রঙ
কোথাও বা অন্ধকার
হলদে কালোয়

CENTRAL LIBRARY

উপন্যাস

গোধূলিয়া

নিমাই ভট্টাচার্য

— দশ —

বাথরুম থেকে বেরোতেই দিদি বললেন, তোর হলে বাইরের ঘরে আয়। ওখানেই জলখাবার দিচ্ছি।

আমি ঘর থেকে তৈরী হয়ে বসবার ঘরে যেতেই দেখি দিদি বসে আছেন। জিজ্ঞাসা করলেন, আজ বাঁকি বেলা করে উঠেছিস?

হ্যাঁ একটু দেরী করেই উঠেছি।

কেন, রাত্রে ভাল করে ঘুম হয় নি?

ঘুম ভালই হয়েছে তবে মাঝ রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল।

কেন?

কোন কারণ নেই। এমনিই ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল।

আজ তাহলে দুপুরে একটু ঘুমিয়ে নিস। তা না হলে শরীর.....

দিদি কথাটা শেষ করার আগেই জলখাবারের থালা হাতে নিয়ে আসতে আসতে দেবী বলল, দিদি ইনি তোমার নাতি হলেও কাঁচ ছেলে না। এত আদর.

চুপ কর হতভাগী।

এবার আমি বললাম, দিদি এই মেয়েটাকে আদর দিয়ে দিয়ে মাথায় চড়িয়েছ।

দিদি সঙ্গে সঙ্গে সমর্থন জানালেন, ঠিক বলেছিস।

দেবী আমার সামনের টেবিলে খাবারের থালা রেখে আমাকে বললো শুধু দিদিকে তেল দিয়ে কোন লাভ নেই।

দিদি আমাকে বললেন, কথার কি ছিরি দেখেছিস?

আমি হাসতে হাসতে বললাম, কিছুদিন আমার হাতে ছেড়ে দাও না! সব ঠাণ্ডা করে দিব।

দেবী ঠোঁট উল্টে বললো ওরে আমার গুরুদেব রে!

ওর কথায় আমরা দুজনেই হাসি।

জলখাবার খেতে খেতে দেবী বললো, দিদি, তোমার এই আদরের নাতিকে আমি কি বলে ডাকব? ঐ শুনছেন শুনছেন করে আর পারি না।

দিদি হাসলেন। আমি বললাম, শুনছেন শুনছেন বল কে তোমাকে ডাকতে বলেছে?

তবে কি বলে ডাকব?

নাম ধরে ডাকলেও আমার আপত্তি নেই।

দিদি সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করলেন, না না তুমি ওর কি ডাকবে?

দেবী একটু ভেবেই বললো, তাহলে কি লাভ করে ডাকব?

আবার আমরা হাসি। আমি বলি, কালকে এসেছি বলেই আমি হনুমান না। তুমি বরং আমাকে প্রদীপদা বলেই ডেকো।

মন্দ নয় তবে আপনার কোন ডাক নাম নেই?

শুনেছি আমার মা আমাকে দীপু বলে ডাকতেন।

চমৎকার। আমিও আপনাকে দীপু বলেই.

দিদি বললেন সেকি রে?

দেবী গম্ভীর হয়ে দিদিকে বললো, দীপু বলে ডাকলে কি ওর অপমান করা হবে? বরং মায়ের দেওয়া নামটা চালিয়ে যাবে না।

দিদি বললেন, তা ঠিক।

দেবী সঙ্গে সঙ্গে বললো আর আপনি-টাপনিও বলছ না।

দিদি বললেন, লোকে শুনলে কি ভাববে বল ত?

আমি কি গোধূলিয়ার মোড় পাড়ি দিয়ে তোমার নাতির সঙ্গে ভাব দেখাতে যাচ্ছি? লোকের কথা বাদ দাও। তুমি কিছু ভাববে কিনা তাই বল।

দিদি বললেন, এইসব নোংরামী কোনদিন আমার মধ্যে দেখেছিস?

দেবী বাঁ হাত দিয়ে দিদির গলাটা জড়িয়ে ধরে বললো, সেই জন্যই ত তোমাকে এত ভালবাসি।

দিদি বললেন, আমাকে আর আদর করতে হবে না। শেষকালে এটো হাত পায় লাগিয়ে দিবি।

ওদের কান্ড দেখে আমি হাসি।

দিদি বললেন, হতভাগীর মাথায় যা চাপবে তা ত করবেই।

আমি মনে মনে বললাম, কাল রাত্রেই তা আমি টের পেয়েছি।

জলখাবার খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। দেবী প্লেট দুটো হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েই বললো, দীপু উঠে পড়ো। বাড়ি কিনতে যাবে ত?

দিদি জিজ্ঞাসা করলেন, কার বাড়ি?

দেবী বললো তোমার নাতির কোন বাড়ি নেই। তাই ও একটা বাড়ি কিনবে।

দিদি অবাক হয়ে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কলকাতা থেকে না কিনে এখান থেকে কিনবে কেন?

বললাম, কলকাতায় ত বে বাড়ি পাব এখানেও সেই বাড়ি পাবো।

কিন্তু দাম কি এক হবে?

দেবী বললো তার নেই তোমার নাতিকে কেউ ঠকাবে না। তাছাড়া আমি ত আছি।

তোরা এখনই যাবি?

দেবী বললো, হ্যাঁ।

বেলা করিস না।

আমি বললাম না, না, বেলা করব না।

দিদি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, যা ওকে নিয়ে যা।

বাড়ী থেকে বেরিয়ে গলিতে পা দিয়েই বললাম, কি কাণ্ডটা করলে বলো ত।

কি করলাম?

তুমি সত্যি সত্যিই এভাবে আমাকে দীপু বলে ডাকতে পারবে তা আমি কল্পনা করতে পারি নি।

ও হাসতে হাসতে বললো মনের এসব ইচ্ছা বেশী চাপা রাখতে গেলেই বিপদে পড়তে হয়।

কিন্তু দিদি কি ভাবলেন?

কি আবার ভাববেন - কিছুই ভাবেন নি। দিদির মনে সেরকম কোন নোংরামী নেই। তা না হলে আমি তার সঙ্গে ঐভাবে মিশতে পারতাম?

তা ঠিক।

গলি পেরিয়ে কালীবাড়ী পাশে রেখে বড় রাস্তায় এসেই আমরা রিকসায় উঠলাম। দেবী রিকসাওয়ালাকে বললো চল চাঁদপুর।

রিকসা চলতে শুরু করতেই আমি জিজ্ঞেস করলাম তুমি কি সত্যিই আমাকে ঘড়ি কিনে দেবে?

একথা আবার জিজ্ঞাসা করছ কেন? আমার দেওয়া ঘড়ি তুমি পরবে না?

যে আমাকে দীপু বলে ডাকতে পারে তার অনুরোধ কি আমি অগ্রাহ্য করতে পারি?

তুমি বিশ্বাস করবে কিনা জানি না কিন্তু সত্যি বলছি তোমাকে দীপু বলে ডাকব বলেই মনে মনে ঠিক করেছিলাম।

তাই নাকি?

হ্যাঁ কিন্তু তখন ত আমি জানতাম না তোমার মা তোমাকে দীপ বলে ডাকতেন।

আমি একটু হাসলাম। বললাম, কোনদিন ভাবিনি কেউ আমাকে দীপ বলে ডাকবে।

দীপ বলে ডাকার অধিকার ত সবার হতে পারে না।

তা ত বটেই।

তোমার মা বেঁচে থাকলে যেমন তাঁর কথা শুনতে তেমনি আমারও সব কথা শুনবে।

সব কথা?

কেন, আর কেউ কি প্রায় রাতে তোমার ঘরে আসে?

আমি হাসতে হাসতে বললাম, তোমার ঈর্ষা করার কোন কারণ নেই।

তাই না আমার সব কথা শুনবে না কেন?

শুনব।

সাইকেল রিকসা গোপালিয়ার মোড়ে পৌঁছতেই আমি বললাম, গোধূলিয়া নামটা ভারী চমৎকার, তাই না?

একটু কাব্যিক।

তাছাড়া বেশ অর্থপূর্ণ।

কেন?

অধিকাংশ হিন্দুই স্বপ্ন দেখে জীবনের গোধূলি বেলায় এখানে আসবে।

ও। ঠিক তবে গোধূলিয়া নামকরণের পিছনে এ অর্থ নেই।

গোধূলিয়ার আর কি অর্থ হতে পারে?

যে দশাশ্বমেধ রোড দিয়ে আমরা এলাম, সেখানে আগে একটা খাল ছিল।..

তাই নাকি?

হ্যাঁ।

কতকাল আগে?

বোধহয় একশ'-দেড়শ' বছর আগেও ছিল এবং সে খালের নাম ছিল গোদাবরী।

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, খালের নাম গোদাবরী?

দেবী হাসতে হাসতে বললো, হ্যাঁ। কাশীর গৌরব বাড়াবার জন্য পণ্ডিতরা নানারকম কাহিনী তৈরী করেছেন। যেমন বলা হয় কাশীর সব পবিত্র নদী এসে মিশেছে কিন্তু আসলে তা ত হয় নি বা হতে পারে না।

তা ত বটেই।

তাই সেকালের পণ্ডিতরা এই খালের নাম দিয়েছিলেন গোদাবরী আর অশিক্ষিত মানুষরাও বিশ্বাস করতো এই খালের সঙ্গে গোদাবরীর ধরাত কোন না কোন যোগাযোগ ছিল।

আশ্চর্য ব্যাপার!

সেই গোদাবরী হলো গোধাবরী। তারপর হলো গোধৌলিয়া আর গোধূলিয়া।

আমি আর মন্তব্য করার প্রয়োজন মনে করি না শুধু হাসি।

দেবী বললো, হাসবেন না। এখানকার বহু ব্যাপারেই এই রকম অবিশ্বাস্য কাহিনী জড়িয়ে আছে। দশাশ্বমেধ ঘাটে দাঁড়িয়ে দেখবেন মণিকর্ণিকা ঘাটের দিকে পাথরের একটা সুন্দর মন্দির কাত হয়ে পড়ে আছে?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেখেছি। শুনেছিলাম, যিনি মন্দির তৈরী করান তিনি মন্দির তৈরী হবার পর পরই যেই বললেন মাতৃ-ঋণ শোধ করলাম.....

আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে দেবী বললো, অমনি সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরটা কাত হয়ে পড়ে গেল, তাই তো?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই শুনেছি।

ওসব বাজে কথা। কোন গুণী জ্ঞানী লোকের কাছেই এ-কাহিনীর সমর্থন পাবে না। তাঁরা মনে করেন, কলার জন্যই মন্দিরটি এভাবে কাত হয়ে গেছে।

এটাই বিশ্বাসযোগ্য কথা।

এক কালে বহু গুণী-জ্ঞানী-তপস্বী এখানে থাকলেও, সাধারণ মানুষের মধ্যে কুসংস্কার আর অন্ধ ধর্মান্ধতাই বড় কথা। এদের কাছে যুক্তি বা বিশ্বাসযোগ্য কথার কোন দাম নেই।

ভাবলেও অবাক লাগে।

আমার ত ঘেন্না লাগে।

হঠাৎ রিকসার ব্রেক করেই রিকসা ওয়ালা বললো, চক!

আমি পকেটে হাত দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম: ওকে কত দেব?

তুমি না-ও। আমি দিচ্ছি।

কেন? আমার কাছ ত খুচরো আছে।

থাক।

দেবী ব্যাগ থেকে একটা আধুলি বের করে রিকসাওয়ালাকে দিয়ে আমাকে ডাকল, এসো।

আমি ওর পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে বললাম, তুমি ত ঘড়ি কিনে দিচ্ছ। আমি যদি রিকসাভাড়াটা দিতাম, তাহলে কি ক্ষতি হতো?

আমার দেওয়া আর তোমার দেওয়া একই ব্যাপার।

যার মনে সংশয় আছে তার সঙ্গে তর্ক করা যায়। যুক্তি দিয়ে হয়ত তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা যায়। কিন্তু যার মনে সংশয় নেই? তার সঙ্গে যুক্তি-তর্ক করে কি লাভ? সে ত সিদ্ধান্ত বদলাবে না।

কাল রাত থেকে দেবীর আচরণ আমার কাছে বড়ই অস্বাভাবিক বা অবাস্তব মনে হোক না কেন, ওর মনে কোন দ্বিধা নেই। সংশয় নেই। মেয়েদের মনে সব সময়ই দ্বিধা, সংশয় বেশী। ঈষৎ চাঞ্চল্যে পুরুষ প্রেমে পড়ে, হঠাৎ আবেগে সংসার ত্যাগ করে, সাময়িক উত্তেজনায় আত্মহত্যা করে বা অন্যকে খুন করে। মেয়েরা নৈব নৈব চ। সাময়িক চাঞ্চল্যে, আবেগে বা উত্তেজনায় তারা ভেসে যায় না কিন্তু ওরা যখন দ্বিধা সংশয় কাটিয়ে কোন সিদ্ধান্ত নেয় তখন তারা কোন কারণেই সে সিদ্ধান্তের পরিবর্তন করে না। ইতিহাসের পাতায় পাতায় এর নজীর রয়েছে। পুরুষ যুদ্ধ করতে গিয়ে চুক্তি করেছে, আত্মসমর্পণ করতে কিন্তু মেয়েরা যখন হাতে অস্ত্র নিয়েছে তখন সে জয়লাভ করতে না পারলে যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রাণ দিয়েছে।

কাল রাত থেকেই দেবীর কথা ভাবছি। ঐ গভীর রাত্রে ও আমার ঘর থেকে চলে যাবার পর অনেকক্ষণ ভেবেছি। আজ সকাল থেকে যখনই সুযোগ পেয়েছি তখনই ওর কথা ভেবেছি। না ভেবে পারিনি। নারী চরিত্র সম্পর্কে আমার বিশেষ কোন অভিজ্ঞতা নেই। তবু প্রথমে মনে হয়েছিল, দেবী বোধহয় আমাকে ভালবেসেছে। প্রেম পড়েছে। পরে মনে হয়েছে এ ত শুধু ভালবাসা বা প্রেম নয়। আরো কিছু। এত ভেবেও এই আরো কিছুর কারণ বুঝতে পারলাম না। তবে এ-বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ যে কোন রাগ, শোক, দুঃখ বা অভিমান না থাকলে ও এভাবে হঠাৎ মারা যেতে আমার অস্তিত্বকে ঘরে আসত না। এমন নিঃসঙ্কোচে, দ্বিধা-হীন হয়ে আমার সঙ্গে মিলতেও পারত না।

ও রিকসা ভাড়া দিলেও আমি প্রতিবাদ বা জোর করে দেবার চেষ্টা করলাম না। কোন কথা না বলে ওকে অনুসরণ করে ঘড়ির দোকানে গেলাম। একবার পছন্দ করার কথা বলতেই আমি শুধু বললাম, তোমার পছন্দ, আমার পছন্দ একই ব্যাপার। ও একটু হেসে একটা ঘড়ি পছন্দ করে আমার হাতে পরিয়ে দিল। দোকানদার ভদ্রলোক হাসতে হাসতে আমাকে বললেন, যাই বলুন, আপনার স্ত্রীর পছন্দ.....

আমি কথাটা শুনেই চমকে উঠলাম কিন্তু দেবী অত্যন্ত সহজ সরলভাবে নিজেকে দেখিয়ে বললো কেন আমার স্বামীর পছন্দ বুঝি খারাপ?

দোকানদার ভদ্রলোক দু হাত জোড় করে বললেন, কিছু নেহি, কিছু নেহি।

দোকান থেকে বেরিয়ে রাস্তায় পা দিতেই আমি দেবীকে জিজ্ঞাসা করলাম, এটা কি হলো?

কোনটা?

দোকানদার ভদ্রলোক না হয় বুঝতে পারেননি কিন্তু তুমি কিভাবে...

ও এই কথা!

হ্যাঁ, এই কথা।

দেবী হঠাৎ গম্ভীর হয়ে মুহূর্তের জন্য কোথায় যেন তলিয়ে গেল। তারপর বললো, এই স্বীকৃতি ত জীবনে কোনদিন কারোর কাছে পাব না, তাই আনন্দে, আবেগে ঐ কথা বলে ফেলেছি। এবার আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কি খুব রাগ করেছ?

আমি বললাম, রাগ করাই উচিত ছিল কিন্তু পারলাম না।

কেন?

যে দু হাত ছেড়ে ঝাঁপ দিয়েছে তাকে ঝাঁপ দিও না বলে কি লাভ?

ও হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করল, আমি বুঝি দু হাত তুলে ঝাঁপ দিয়েছি?

কাল রাত থেকে তোমার কথাবার্তা কাণ্ডকারখানা দেখে ত আমার তাই মনে হচ্ছে।

দু হাত তুলেই যদি ঝাঁপ দিতে পারতাম, তাহলে কি কাল রাত্রে তোমার কোন ক্ষতি না করেই ফিরে আসতাম?

তার মানে?

চলন্ত রাস্তায় অনেক মানুষের ভিড়। তার উপর গাড়ী-ঘোড়া-সাইকেল রিকসার স্রোত। তারই মধ্যে দেবী আমার একটা হাত এক মুহূর্তের জন্য ধরে বললো, দু হাত তুলে ঝাঁপ দিলেও অনেক বন্ধন আমাকে টেনে ধরে আছে।

তোমার আবার কিসের বন্ধন? বেশ ত মুক্ত বিহঙ্গের মত স্বাধীনভাবেই দিন কাটাচ্ছ।

তুমি বুঝবে না।

আমি বুঝব না?

না।

কেন?

তুমি যে পুরুষ মানুষ।

তাতে কি দোষ করলাম।

আমি ত বলিনি দোষ করেছ।

কিন্তু আমি পুরুষ বলে.....

হ্যাঁ, পুরুষ বলে আমার দুঃখ বা বন্ধন তুমি বুঝবে না।

না বললে বুঝব কেমন করে?

একটা খালি রিকসা পাশ দিয়ে যেতেই দেবী থামিয়ে আমাকে বললো, ওঠ।

উঠলাম। তারপর ও উঠেই বললো, গোধূলিয়া।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এখন বাড়ী ফিরবে না?

এক্ষুনি বাড়ী গিয়ে কি করব? চল, জলযোগের মিষ্টি খাই।

কাশীতে জলযোগ?

এখানে কলকাতার গোলযোগ-জলযোগ সবই পাবে।

তাই নাকি?

দুজনেই হাসি।

একটু পরে আমি বললাম, যাই বল, ঘড়ির দোকানদার ভদ্রলোক আমাকে একটা অপদার্থ ভাবলেন।

কেন?

আমার চেহারা দেখেই উনি বুঝেছেন, হয় আমি বৈদ্যবাটি শ্রীরামপুর স্টেশনের বুকিং ক্লার্ক অথবা প্রাইমারী স্কুলের অঙ্কের মাস্টার। আর তোমাকে দেখলেই মনে হয় কোন জমিদারের আদুরে নাতনী।

তাই নাকি?

একশ' বার।

আর কিছু মনে হয় না?

হয় বৈকি।

শুনি।

মনে হয়—মানে ঐ দোকানদার ভদ্রলোক ভাবলেন আমার অর্থ নেই, বুদ্ধি নেই, ব্যক্তিত্ব নেই।

বাস? আর কিছু ভাবেননি ত?

ভাবতে পারেন।

যদি বলি উনি ঠিক উল্টো কথাগুলোই ভেবেছেন?

তুমি বললেই ত উনি ভাবতে পারেন না।

আমি বলছি উনি ভাবলেন, তুমি কত সুখী, কত নিশ্চিন্ত।

কেন?

উনি ত দেখলেনই তোমাকে তোমার কথা ভাবতে হয় না, আমিই তোমার সব ভাবনা-চিন্তার ভার নিয়েছি।

সত্যিই যদি সব ভাবনা-চিন্তার ভার নিতে, তাহলে ত আমি বেঁচে যেতাম।

আমি কি বলেছি তোমার ভাবনা-চিন্তার ভার নেব না?

তুমি বললেই ত আমি সব ভার তোমাকে দিতে পারি না।

কেন?

তুমি কেন এসব আলতু-ফালতু কাজের সহ্য করবে?

যদি বলি আমার ভাল লাগে।

ভাল লাগা হচ্ছে মানুষের মনের একটা সাময়িক অবস্থা। তার উপর নির্ভর করে.....

তুমি কি করে জানলে এটা আমার মনের সাময়িক অবস্থা?

তোমার মনের এই অবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হলেও আমি তোমাকে.....

কেন?

তোমার উপর আমার কি অধিকার?

যে অধিকারে কাল মাঝ রাত্রে আমি তোমার ঘরে গিয়েছিলাম?

সেটা অধিকার নয়, আবেগ, উত্তেজনা বা...

দেবী আমার একটা হাতের উপর নিজের হাত রেখে বললো, বিশ্বাস কর, আমি হঠাৎ কোন আবেগ বা উত্তেজনার ঘোরে কাল তোমার কাছে যাইনি। নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে একটু শান্তি পাব বলে তোমার কাছে গিয়েছিলাম।

ওর গলার স্বরে কেমন যেন আত্ম-সমর্পণের ইঙ্গিত। আমি আর তর্ক করলাম না। শুধু জিজ্ঞাসা করলাম, সত্যি?

বিশ্বনাথের মূর্তি স্পর্শ করে বলতে পারি, আমি তোমাকে মিথ্যে কথা বলিনি।

না, না, বিশ্বনাথকে আর টানাটানি করতে হবে না।

জলযোগের সামনে রিকসা থামাতেই আমি বললাম, এই ত একটু আগে জল-খাবার খেলাম, এখন আর কিছু খাব না। বরং রিকসায় করে আসব।

তাহলে চল, তোমাকে হরসুন্দরী ধর্মশালা দেখিয়ে আনি।

চল।

এক মিনিটেরও পথ না। এই রাস্তার উপরেই দোতলা বাড়ী। সামনে গেট। গেটের পাশে হিন্দী আর বাংলায় লেখা—হরসুন্দরী ধর্মশালা। রাস্তার উপরে দাঁড়িয়েই কিছুক্ষণ বাড়ীটার দিকে চেয়ে রইলাম। বিশেষ লোকজন চোখে পড়ল না। একতলার বারান্দায় দু-একজন বৃদ্ধ বসে আছেন। বোধহয় অতীত দিনের স্মৃতি রোমন্থন করছেন। দোতলার বারান্দায় দুটো-একটা ধুতি-শাড়ী শুকোচ্ছে। সব মিলিয়ে কেমন যেন বিবর্ণ, বিষণ্ণ চেহারা। অনেকটা বাঙ্গালীর লুপ্ত-বিলুপ্ত ঐতিহ্যের মত অবস্থা।

দোতলার বারান্দায় মুহূর্তের জন্য একজন প্রবীণা মহিলাকে দেখেই মনে হলো, মা নাকি? বোধহয় আমাকেই দেখলেন।

হঠাৎ মনটা একটু উতলা হয়ে উঠল। মনে পড়ল এইখানেই ত আমার মা জীবনের শেষ কটা দিন কাটিয়েছেন, এই বাড়ীরই কোন এক ঘরে আমি মায়ের স্নেহ উপভোগ করার পর থেকেই ত আমি জীবনের মরুপ্রান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কত কি ভাবছি। ভাবতে আমি হঠাৎ ছোট্ট শিশু হয়ে গেছি। আমি আপন মনে মাতালের মত হাঁটছি। এ-ঘর থেকে ও-ঘর যাচ্ছি, বারান্দার রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে এক্সাইটমেন্ট দেখছি। মা ডাকছেন, দীপু, কোথায় গেলি বাবা? এদিকে আয়।

দীপু, ভিতরে যাবে না?

পাশে দাঁড়িয়ে দেবী আমাকে দীপু বলে ডাকতেই আমি চমকে উঠলাম। কোনমতে নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, চল।

আমি যেন কেমন স্বপ্নাতুর হয়েই ওর পিছন পিছন হরসুন্দরী ধর্মশালায় ঢুকলাম। দেবী সামনের বারান্দার বৃদ্ধ ভদ্রলোককে কি যেন বললো। বোধহয় ভিতরে যাবার অনুমতি নিল। তারপর আমাকে বললো, এসো।

আমি ওর পিছন পিছন একতলা-দোতলার প্রত্যেকটা ঘর ঘুরলাম, রান্নার ভারপ্রাপ্তদেরও উপদেশ দিলাম, উঠানে দাঁড়ালাম। না, সব শূন্য। কোন স্মৃতি, কোন চিহ্ন নেই। নীচে নেমে এসে বৃদ্ধ ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলাম, বিশ-বাইশ বছর আগের পুরানো রেজিস্টার দেখতে পারি?

উমি ঠোঁট উল্টে বললেন, না, সেসব শেষ হয়ে গেছে।

দেবী জিজ্ঞাসা করল, এবার যাবে?

কি একটু ভেবে বললাম, চল, আরেক বার ভিতরটা ঘুরে আসি।

চল।

আমি ভিতর দিকের কোণার ঘরে গিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। আস্তে আস্তে মেঝের উপর বসলাম। আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর ঐ বিগ্রহবিহীন শূন্য মন্দিরের মেঝেয় প্রণাম করলাম। মনে মনে মাকে কত কথা বললাম, কত কথা শুনলাম। গলা জড়িয়ে মাকে আদর করলাম, মা আমাকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বললেন, তুই কি চিরকালই ছোট থাকবি? কোনদিনই বড় হবি না?

সবাই যে বলে আমি অনেক বড় হয়েছি।

বড় হলে মার কোলের মধ্যে এসে এভাবে কেউ কাঁদে? তুই আর বড় হবি না।

হঠাৎ মাথার উপর একটা হাতের ছোঁয়া লাগতেই কাপসা চোখে তাকিয়ে দেখি দেবী কাঁদছে। আমি আর নিজেকে সংযত রাখতে পারলাম না। ছোট্ট শিশুর মত কাঁদতে কাঁদতে ওর দুটো হাত জড়িয়ে ধরে বললাম, দেবী, একবার আমাকে দীপ বলে ডাকবে?

ও কাঁদতে কাঁদতে দু হাত দিয়ে আমার মুখখানা ধরে কোনমতে বললো, দীপ!

(ক্রমশঃ)

আর্থে আর্থে প্রতি আর্থে খাবার বিস্কুট

ব্রিটানিয়া থিন অ্যারারুট

যেমন হাল্কা তেমনি সহজপাচ্য

থিন শুধু কথন বেশ মচমচে আর হাল্কা ব্রিটানিয়া থিন অ্যারারুট বিস্কুট দিয়ে। বাচ্চেরা এই বিস্কুট যেমন হাল্কা, তেমনি হজম করাও সহজ। সাত থেকে সাতি—বাড়ীর সবার জন্যে। সকালে, কাজের অবসরে চায়ের সঙ্গে—যে কোনো সময়েই ব্রিটানিয়া থিন অ্যারারুট খেতে ভাল।

ব্রিটানিয়ার
সেরা ভাল বিস্কুট—
৫০ রকমের বিস্কুট

ব্রিটানিয়া বিস্কুট খাওয়ার সেরা।

বিজ্ঞাপন-BBCAL.3-140 BG

ভোজন বিলাসী

উষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

একদা বিচক্ষণ ফ্রাঙ্কলিন মন্তব্য করেছিলেন : ওয়ান সুড ইট টু লিভ, নট লিভ টু ইট। তবু যুগে যুগে ভোজন-বিলাসী মানুষের অভাব হয়নি। আর ঐ সব মানুষের মধ্যে ছিলেন সক্রেটিস, পেট্রোনিয়াস, শেকসপীয়ার, বেন জনসন, চার্চিল, ঈশ্বর গুপ্ত, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মতো রসস্রষ্টা ও মনীষী! এ ছাড়া গোষ্ঠী বা পংক্তি ভোজনে বসে পৃথিবীর সভ্য বা অর্ধসভ্য মানুষেরা যেসব শিষ্টাচার মেনে চলেন সেগুলিও কম বিচিত্র নয়। পাশ্চাত্যের ভদ্রজনেরা তো খাবার টেবিলের নিয়ম রীতি বা এটিকেট মেনে চলার ব্যাপারে সবচেয়ে সচেতন। সেখানে যে-কোন ভোজসভার টেবিলে কিভাবে তৈজস সাজানো হবে, কে কোন চেয়ারে বসবেন, কোন আহার্যের পর কি বিশেষ আহার্য পরিবেশিত হবে তা সবকিছুই থাকে পূর্বে নির্দিষ্ট। আহার শুরু করা থেকে শেষ করা পর্যন্ত সেখানে মেনে চলতে হয় নানা সূক্ষ্ম এটিকেট। এমনকি ইউরোপের প্রায় সর্বত্রই সান্ধ্যভোজের ক্ষেত্রে স্ত্রী-পুরুষের জন্যে থাকে বিশেষ পরিচ্ছদের ব্যবস্থা।

ভারতীয় কাব্য বা শাস্ত্রেও ভোজ্য ও ভোজন সম্পর্কে নানা বিধি-নিষেধের দীর্ঘ তালিকা দেখা যায়। আফ্রিকা, নিউগিনি, আন্দামান, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশের যে সমস্ত আদিবাসী এখনও ভোজনপাত্রের ব্যবহার পর্যন্ত শেখেনি তারাও নাকি আহার কালে নানা রীতিনীতি মেনে চলে। নিছক গ্রাসাচ্ছাদনের প্রয়োজনে তারা আর পাঁচটি মনুষ্যেতর জীবের মত হেন-তেন-প্রকারেন উদর পূর্তি করে না। তাদের কাছেও আহারপর্ব তাই ভোজন বিলাস। যেমন, আফ্রিকার হটেনটন উপজাতীয়েরা গভীর অরণ্যের মধ্যে যখন আহারের আয়োজন করে তখন প্রথমে চারিদিকে তাকিয়ে তিন-বার উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করে নেয় সম্ভাব্য অতিথিকে, সেই অতিথির জন্যে আলাদা করে খাবারও রেখে দেয় তারা। ভারতের জারোয়া, ওঙ্গে, গণ্ড, লেপচা প্রভৃতি আদি-বাসীরাও বিভিন্ন উৎসবে পংক্তি বা গোষ্ঠী ভোজনে বসে নানা আদব-কায়দা মেনে চলে। সাঁওতাল স্বীপে অতিথিকে বিশেষ কায়দায় আপ্যায়ন করা হয় কাভা নামের পানীয় দিয়ে। ঐ কাভা পান করারও নাকি বিশেষ কৌশল আছে। জাপানের চা-পান-পর্ব তো রীতিমত উৎসব। তাই তার নাম টি সেরিমনী!

প্রাচীন ভারতে বিভিন্ন বর্ণের ও জীবিকার মানুষেরা আহারকালে যে সব রীতি নিয়ম মেনে চলতেন সেগুলিও বিচিত্র। সেকালে স্ত্রী পুরুষ, এমনকি স্বামী স্ত্রীর একত্র আহার ছিল শাস্ত্রমতে নিষিদ্ধ, ঐ প্রথা এখনও বিশ্বের নানা আদিবাসী সমাজে প্রচলিত। মহাভারতের শান্তি ও অনুশাসন-পর্বে ভোজনের নানা রীতিনীতি সম্পর্কে সুবিস্তৃত আলোচনা আছে। যেমন—'অতিথি-স্বজন ও ভৃত্যদের সঙ্গে সমানভাবে ভোজন করাই প্রশংসনীয়। ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্ট জননীর হৃদয়ের ন্যায় অমৃততুল্য।... স্ত্রীলোকদের সঙ্গে একত্র ভোজন করবে না।' (শান্তি পর্ব, মোক্ষধর্মপর্বাধ্যায়)

অনুশাসন পর্বে দেখি—'সলজ্জে ভোজন করবে না...শিষ্টাচার পায়স দেবতাকে নিবেদন না করে খাবে না। ভোজনের পর কিঞ্চিৎ খাদ্য অবশিষ্ট রাখবে। আর্দ্র চরণে ভোজন করবে। উচ্ছিষ্ট হয়ে বা এঁটো হাতে অধ্যয়ন বা অধ্যাপনা করবে না। নিমন্ত্রিত না হয়ে কোথাও যাবে না।' এছাড়া মাংসাহার সম্পর্কে, ভক্ষ্য অভক্ষ্য সম্পর্কে আরও নানা বিধি নিষেধ দেখা যায় ঋক বেদের ৭ম মণ্ডলের ১৫-১৬ সূক্তে। মনু স্মৃতিতে দেখি—উচ্ছিষ্ট কাউকে খেতে দেবে না। আহারের পর হাত পা না ধুয়ে অন্যত্র গমন করবে না। অবশ্য শিষ্য ও জায়া যথাক্রমে গুরু ও পতির উচ্ছিষ্ট খেতে পারবে। তাতে কোন দোষ হবে না। (২।৫৬)

স্ত্রী পুরুষের একত্র আহার সম্পর্কে যে নিষেধাজ্ঞা না থাকে, প্রাচীন ভারতে প্রচলিত ছিল তেমন প্রথা আমেরিকার আদিবাসী রেড ইণ্ডিয়ান সমাজে এখনও বিদ্যমান। সে সমাজে স্ত্রী ও পুরুষ একসঙ্গে আহার করে না। এমন কি স্ত্রীরা স্বামীর বাবহার্য কোন তৈজসে হাত পর্যন্ত দিতে পারে না। কানাডাবাসী এসকিমোরা পুরুষের আহার-কালে স্ত্রীলোকদের পিছন ফিরে বসতে বলে! আমেরিকার আর এক রেড ইণ্ডিয়ান

গোষ্ঠী কোন মানুষকে আহারের আমন্ত্রণ জানালে অতিথিকে ভোজনান্তে একটা ব্যঞ্জনপূর্ণ বাটি উপহার দেয়। অনেকটা আমাদের দেশের ছাঁদা বাঁধার মত ব্যাপার আর কি। বলিভিয়ার আদিবাসীরা কোন নিমন্ত্রণ সভায় আহার শুরু করার আগে অনেকটা টুথ ব্রাসের মত দেখতে একটি তুলি মধুপূর্ণ পাত্রে ডুবিয়ে সেটি একে একে সবাই চেটে নেয়! উগাণ্ডার এক উপজাতি গোষ্ঠী খাওয়ার আগে ও পরে সাড়ম্বরে, দলবেঁধে একটি গামলার হস্ত প্রক্ষালন করে থাকে। ঐ সমাজে অন্যের আহার্য স্পর্শ করাও শিষ্টাচার বিরুদ্ধ। যে যার নিজের খাবার তুলে নেয়, অনেকটা পাশ্চাত্যের বুফে ডিনারের মত ব্যবস্থা আর কি!

মধ্যযুগের ইউরোপে, এমন কি সুসভ্য রোমেও কিন্তু আহারের সময় তেমন কঠোর বিধি নিয়ম মেনে চলা হত না। সম্রাট নেরোর বন্ধু পেট্রোনিয়াসের লেখা বাঙ্গ দীপ্ত সাতীরিকন বইটিতে প্রাচীন রোমের এক প্রাণবন্ত, প্রাচুর্যময় ভোজসভার চমৎকার বিবরণ আছে। হঠাৎ বড়লোক, নবোধ ত্রিমালচিও-র বাড়ি খেতে এসেছেন বহু বিশিষ্ট অতিথি। তাঁরা ঘরের মেঝেতে যথেচ্ছ ছড়িয়ে ফেলছেন ভুক্তাবশিষ্ট, কেউ বা খেতে খেতেই গা এলিয়ে দিচ্ছেন শয্যায়, চিৎকার, গান, মাতলামিতে ঐ ভোজসভা সরগরম। আসলে সেকালে অতিথিরা ইচ্ছে করেই ঘরের মেঝে নোংরা করতেন। কারণ তাকে নাকি পরোক্ষভাবে প্রমাণিত হয় গৃহ-স্বামীর স্বচ্ছলতা ও সদাশয়তা! তাই যে ঘরদোর সাফ করার মত যথেষ্ট ক্রীতদাস আছে এটা গৃহস্বামী উঁচু গলাতেই জাহির করতেন। ঐ বিষয়ে রোমের জাদুঘরে মিশরী হরাক্লাইটোসের একটি সুপ্রাচীন মোজেইক চিত্রও রাখা আছে। তার নাম—ভোজনের পর অপরিষ্কৃত মেঝে। ঐ ছবিতে দেখা যায় ধনীর ঘরে অতিথিরা আহার শেষ করে চলে গেছেন আর মেঝের ওপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে নানা খাদ্যদ্রব্য ও আবর্জনা। আসলে মধ্যযুগেও খাওয়ার সময় নাক সাঁক করা, থুথু ফেলা, উদ্গার তোলা নিন্দনীয় ছিল না। রুমাল, কাঁটা, চামচ, তোয়ালে প্রভৃতির ব্যবহার শুরু হয়েছে মাত্র ষোড়শ শতকে। রেনাসাঁসের কালেই উদরপূর্তির ব্যাপারটা হয়ে ওঠে ভোজন-বিলাস। লিওনার্দো দা ভিঞ্চি, পাওলো ভেরোনেজে, জ্যাফোপো টিনটোরেত্তো প্রমুখ শিল্পী খৃষ্টের শেষ ভোজন, সানার বিবাহকালীন ভোজ বা লেভীর বাড়িতে ভোজসভার যে সব বর্ণাঢ্য চিত্র এঁকে রেখে গেছেন সবগুলিই ভোজন বিলাসের চাক্ষুষ প্রমাণ।

CENTRAL LIBRARY

পুনশ্চ

বসন্ত সমাগমে প্রকৃতি এক নবরূপ ধারণ করে। শীতে শীর্ণ বৃক্ষরাজিসমূহ নবপল্লবিত হয়ে ওঠে, আম্র মুকুলের গন্ধে ভ্রমরকুলগুঞ্জনে মুখর হয়ে ওঠে দিগ্‌বলয়। মানুষের মনেও জাগে পুলক-চঞ্চলতা। এর প্রকাশ আমরা পাই নানাভাবে কাব্যে-সাহিত্যে। অসংখ্য কবি বসন্তকে অভিনন্দন জানিয়েছেন বিচিত্র ভঙ্গীতে তাঁর সমাগমের রূপ বর্ণনায় উচ্ছলিত হয়ে উঠেছেন; অভিভূত হয়ে ছন্দ-বন্ধনে প্রকাশ করেছেন তাঁদের প্রাণের আকুতি।

ঋতুরঙ্গমালায় বসন্ত-উৎসবের প্রারম্ভেই কবিগুরু গেয়েছেন—

'ছিনু পথ চেয়ে বহু দুখ সয়ে,
আজ দেখি একি দশা—
শীর্ণ তোমার সুন্দর হয়ে
জিনিল কঠিন বিশ্ব।
তবু পুষ্পিত তনু
জয় করি নিল মনু—
মুক চিত্তের জাগাইলে গান
কবি হল তব শিষ্য।
এ কি লীলা, হে বসন্ত।
যা ছিল শ্রীহীন দীপ্তিবিহীন
করিল প্রফুল্লন্ত।'

অনেক গান অনেক কবিতা রচিত হয়েছে বসন্তকে ঘিরে ফাল্গুন স্মরণে। তার কয়েক উদ্ধৃতি—'বাসন্তী হে ভুবন-মোহিনী' 'বসন্তে বসন্তে তোমার কবিরে ডাক' 'ফাগুন তোমার হাওয়ায় হাওয়ায় ফাগুনের নবীন আনন্দ' প্রভৃতি অসংখ্য কবির স্মৃতি-মাধুরী পূর্ণ পঙক্তি।

আজ এখানে আমরা সেই ফাল্গুনের স্বপ্নতোষিণী চরণ করব 'ফাগুন মাসের কথা' নামক একটি নিবন্ধের মাধ্যমে। নিবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল 'অবনী' পত্রিকায় (৪র্থ বর্ষের ১ম সংখ্যা) ১৩১৮ সালের ফাল্গুন সংখ্যায়। রচনাকারের নাম ঈশ্বরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। অকালে নিবন্ধটি লুপ্ত হওয়ায় এখানে তার অংশবিশেষ মাত্র প্রকাশিত হল।

ফাল্গুনে প্রকৃতির কথা

শীতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত হইতে চলন বৃক্ষের সুফল লইয়া আসি বলিয়া আমাকে আমার বড়ভাই বা বসন্ত নাম অভিহিত করা হয়। উহার ফাল্গুনী নবকলেবর দিবার ভোমাদের জন্য গ্রহণ করিয়া থাকিব সেই নিমিত্ত সকলে আমাকে ফাল্গুনে বলিয়া সম্বোধন করে।

পুষ্পরথে আরোহণ করিয়া বৎসরান্তে বঙ্গালয় বসন্ত আনি। বসন্তের নামে আজকাল তোমরা শিহরিয়া উঠ সত্য, কিন্তু সেটা অশঙ্কায়। বসন্ত বাতাসের মৃদু-মধুর স্পর্শে নয়।

তোমরা সে আর তেমন নাই। হৃতসর্বস্ব হৃতগৌরব। নানারূপ অনাচারে যে প্রকার কলঙ্কিত হইয়াছ তাহাতে আমার আগমনকে তো তেমন করিয়া বরণ করিয়া লইতে পার না। দেখাইবার মত শত সাজসজ্জা করিয়া আসিলেও তোমরা চক্ষু মিলিয়া দেখ না।

বলিতে গেলে আমার বয়স হইয়াছে তেমন সেজন্য নাই সৌন্দর্যের নাই সে মধুর কলহাস্য নাই সে বিরহ ব্যাকুলতা নাই কিন্তু সত্য কি তাই? না সেটা তোমাদের দেখিবার ভ্রম? বিরোধ আমার মধ্যে নাই তোমাদের অন্তর্ভূতির মধ্যেই তাহা অঙ্কুরিত হইয়াছে। তোমরা যে এখন অত্যাধুনিক সভ্যতার মোহাই দিয়া সবই কৃত্রিমতার সহায়ে সজ্জিতে চাও।

এখন কই সে বসন্তোৎসব বা বসন্ত অভ্যর্থন? আমি আসিলেও তোমরা চাহিয়া দেখ না। অতিথি-অভ্যাগতের অভ্যর্থনা পর্যন্ত বিস্মৃত হইয়াছ। ইহা কি কম দুঃখের কথা! আমি যে প্রতি বৎসর আসি কিন্তু কখন আসি তাহার সন্ধান পর্যন্ত রাখ না।

•

আমি যখন আসি তখন একা যা দরিদ্রের মত আসি না। তোমাদের জন্য প্রকৃতি দেবীর ভাণ্ডার লুটে করিয়া তাঁহার ঐশ্বর্য সেবা সম্পদ ভোগ বিলাস বিরহ মিলন সব সম্পদ লইয়া আসি।

নিস্তব্ধীন নীরবতার মধ্যে শুষ্ক তরুলতার ভিতর নিষ্পন্দ জীবনের মধ্যে এক অপূর্ব চেতনালহরির সঞ্চার করিয়া সকলকে জাগরণ মন্ত্রে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলি। বড় দুঃখে আজ অনেক কথা নিজ মুখে বলিতে হইল। অথচ এমন দিন ছিল যখন তোমরাই বলিয়াছ—

'কুটিল বকুল ফুল কেন বল। দোকুলে আজি
কহ তা সজনী?
আইল কি ঋতুরাজ, ধরিল কি মৃদুলসাজ
বিলাসে ধরণী?
... ...
আইল বসন্ত আজি আসিবে মাধব।'

এখন তোমাদের হিসাবে তোমাদের বাঙ্গালায় 'বসন্তই আসে না মাধব আর কেমন করিয়া আসিবে?

'যে কালে ফুটে লো ফুল
কোকিল কুহরে সেই কুসুম কাননে,
মুকুলয়ে তরুবলী গন্ধবহ সুখে অলি
প্রেমানন্দ মনে।'

তখন যে মাধব আসিত তাহাতে কি আর সন্দেহ থাকিতে পারে! তখন যে তাহারই পূজায় প্রকৃতি শত সাজে সজ্জিত হইয়া তাহার জন্য বসিয়া জাগিয়া, মালা গাঁথিয়া বসিয়া থাকিত তাহা কি আর নূতন করিয়া স্মরণ করাইতে হইবে?

এখনও তেমনই বসন্ত আসে—কুহকী কোকিল তেমনই গান গায়—পল্লীপথে পাটলির গন্ধ ভাগ্যবেড়ায় শুষ্ক বাঁশের উপর অধীর সমীর স্পর্শে শ্যামল ফলতাদল মাথা তুলিয়া তেমনই দেখা দেয় ফুল ফোটে গন্ধ বিলায় অকূল হাওয়া হুহু করিয়া বহিয়া যায়—যুবতীর অঞ্চল চঞ্চল করিয়া পুষ্করিণীর কাল জলে কচী দিয়া ছুটিয়া বেড়ায়—জ্যোৎস্নাপুলকিত-যামিনীতে, শুভ্র বেলা-মল্লিকা-মালতীর সহিত অকলঙ্ক হাসি হাসিয়া বসন্ত-বাতাস প্রাঙ্গণে পুলক লুটাইয়া বেড়ায়। এত সম্পদে, মাধব যে আসে না, তাহা বলিতে পারি না—মাধব আসে—কিন্তু কে তার খোঁজ রাখে। তোমরা তাহার খোঁজ না রাখিলেও প্রকৃতি দেবী এমনই দিনে তাহার আহ্বান করিয়া থাকে। ঐ দেখ জীর্ণ-শীর্ণ তরুশাখাগুলি আবার নবপত্রোদ্গমে শ্যামল সৌন্দর্যে নবীনতা লভ করিয়া মাধবের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে—আমি ফাল্গুন বসন্ত তাহার অগ্রদূত হইয়া দক্ষিণ হইতে আনন্দ-সংবাদ বহন করিয়া আনিয়াছি।

•

তারপর বসন্তের নবীন উষা যখন আনন্দ-আবেগ সঞ্চার করিয়া আনন্দ-উৎসাহে মাধবের দোল-উৎসবে আবিরগুঁড়ি ছড়াইয়া নিখিল লোকে লাল করিয়া দেয়—যখন আলোকের প্রতি পরমাণুতে পরতে পরতে দোল লীলার রঙ্গ জাগিয়া উঠে শিমুলে পলাশে সর্বত্র একই রঙ্গ ফুটিয়া ওঠে—তখন আমি এই বাঙ্গালার পল্লীপথে লতাবিতানে ঘুরিয়া বেড়াই।

ফাল্গুন

ডাকাত সর্দার

বাড়ীর নামার বিশাল চক। পাট কাটা হয়ে গেলে সমুদ্রের মত ঢেউ। পাল টাঙিয়ে দিলেই হয় তরতর করে পবেনবাতাসে উড়ে যাবে নাও। আর যেদিকটা একটু টান সেখানে ধানক্ষেত। ধানক্ষেতেও বাতাসের সোঁ সোঁ শব্দ। একটু দূরে ইছামতী খাল। কেন যে ইছামতী নাম রাখা হয়েছে পরাণ তা জানে না। ছোটবেলা থেকেই শুনে আসছে। ইছামতী খাল ধলেশ্বরী গাং থেকে নেমে পড়েছে। গাঙের মোহনায় জেলে পেতেছে পরাণ। গাং থেকে সব মাছ খিলে নামছে। জেসাল জালে মাছ ধরার এই সময়। বাঁশ দিয়ে দাঁড় করানো তিকুজের মত বিরাট জাল। একটা বাঁশের সঙ্গে মস্ত মাঝারি খাঁচা অর্থাৎ নাও বাঁধা। নাও-এর মধ্যে ছোট্ট ছই। ছই-এর মধ্যে ছেঁড়া কাঁথা। তেলচিটচিটে বালিশ। অগুনের পাতিল। হুক্কা কল্কে। তোলা উনুন। চাল-ডাল তেল মরিচ লবণ সব কিছুই রাখা আছে। কেননা রাত দিন এইখানেই থাকতে হয়। ঘর ছেড়ে ছেলেপুলে ছেড়ে মাছ ধরার নেশায় চলে এসেছে। নৌকার পাটাতনের নীচে রামদা, লাঠিও রাখা আছে। কখন যে কি হয় কে জানে। সাবধানের মার নেই।

তিন কোণায় তিনটি বাঁশ খোলটায় লোহার পেরেক দিয়ে লাগানো হয়েছে। আটা দিয়ে আটকে দিলে জালের মাথা জলের নীচে যায়। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে পরাণ মাথার আটা খুলে তিনকোণা মাথায় পা রেখে নীচের দিকে নেমে যায় জাল জলের মাথা উপর দিকে উঠতে থাকে। জল যতই কমতে থাকে মাছ ছড় ছড় করে লাফিয়ে ওঠে। দুই একটা মাছ লাফিয়ে পড়ে। জাল ঝেড়ে মাছগুলি নৌকার মধ্যে ফেলে হরিপদ সেগুলি ধরে মাছের ঝুড়ির মধ্যে রাখে। হরিপদ হচ্ছে পরাণের সাকরেদ। ওরা যেখানেই যায় একসঙ্গে যায়। বাতাস এখন একটু কম। মাছ বেশী নামছে না পরাণ জলের মধ্যে আটকাত আটকাত বললে —এক ছিলুম তামাক ভর। গাটা গরম বইয়া লই। হরিপদ নাও-এর মধ্যে এল। অগুনের পাতিলটা নিয়ে হাতদুটো ছেঁকে কাঁকটা নিয়ে তামুক ভরল। তারপর নিজেই হুক্কোতে টান দিল। ধরপর করে

টানছে হরিপদ আর দেখছে মাছের খাঁচা ভরতে অনেক দেরী। নিকারী তো একটু পরে আসবেই ওরাই তো মহাজন। ভেসাল থেকে মাছ সংগ্রহ করে ঢাকায় নিয়ে যায়। এত খেটেও পেটে ভাত দিতে পারে না। কোনরকমে আধপেটা খেয়ে থাকতে হয়। পরাণ আবার হাঁক দিল। কি রে কতক্ষণ লাগে। শরীরটা তো ঠাণ্ডা হইয়া গেল।

হরিপদ উঠে জালের মুচরা টানল। পরাণ নেমে এল। হুকোটা নিয়ে টানতে লাগল। শরীরটা আর বইছে না। কেমন যেন লাগছে। জ্বর আসবে নাকি। এই সময় জ্বর হলে আর রক্ষা নেই। বাড়ীঘর-দোর সব ভেসে যাবে। পোলাপানের মুখে ভাত দেবে কি করে। কানুর মা গালমন্দ করে কিছু রাখবে না। এমনিতেই কানুর মা দেখতে পারে না. সব সময় গালাগাল করছে। কিছু উপায় করতে পারে না বলে রাতদিন ঝগড়া করছে। একদিনও ভালভাবে কথা বলে না। পরাণ হরিপদকে বলল—টান দে। আমি যাইলাম। একটু পরে আসিস।

—কি কইলা।

—শরীরডা ভাল লাগছে না—জ্বর আইয়া লই। বুঝলি নি।

নাও-এর মধ্যে জল লাগছে ছলছল। ভেলাটার্চাটে বালিশটায় মাথাটা রেখে একটু হাত হল। পাটাতনের নীচে জলা মাছগুলি ছটফট করছে। পরাণের চোখ বুজলেও ঘুম আসছে না। ওপরে নীল আকাশ, কোথাও চিল উড়ছে। পরাণের কইলজার দুখ পখী কান্দে। চোখে টলমল জল। এ ভরা যৌবনেও জুকনো বাতাস বয়ে যায়।

মন্দ ভাগ্যকে নিয়ে কিছু করলেও কষ্ট হয় না। কানুর মার ভাগ্য ভাগ্যের চাইতেও মন্দে কিসের ঘুমের আড়ো বুঝতে পারলো না পরাণ। ওর শরীরের চাকচিক্য পরাণের জিহ্বায় জলো গড়ায়।

—পরাইনরে বড় বড় মাছ। বড় মাছ: হরিপদ ভেসালের জাল ধরে চেঁচাল। ভেসালের মাথা আকাশের দিকে আর হুমড়ি খেয়ে জলের কাছে। পরাণ লাফ দিয়ে উঠল। একটু যে জিরোবে তার আর উপায় নেই। ভেসালের কাছে আসতে না আসতেই মাছটা লাফ দিয়ে জালের মধ্যে পড়ে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে পরাণও ঝাঁপ দিল। জলের মাছ জলে পালিয়ে গেল। পরাণ মাছটাকে ধরতে পারল না। খপাকা এই বিকালবেলা গামছাটা হেলায়ে। ওসব পরনে গামছার নেংটি হাড়া পরবার পয়সা নেই। কানুর মাকে একটা পাছাপেড়ে কাপড় দিতে পারেনি। সেইজন্য পরাণের দুখ কম নয়। হরিপদ বলল—বোকার মত লাফ দিলা কেন।

—পরাণ বড় বুই আছিল।

—যা কয়—বড়ই যায়।

—হেইয়ার লাইগা তুই এই অবেলা ডিঙ্গাবা, তুমি না কইলা শরীরডা ভাল নয়। তোমার কি ভীমরতি হইছে। জ্বর হইলে কি করবা। সব তো না খাইয়া থাকবো।

পরাণ বুঝতে পারল কাজটা ভাল করল না। শরীরটা কয়দিন থেকেই ভাল লাগছে না। আজকে যেন আরো খারাপ লাগছে এই অবেলা জলে নামা উচিত হয়নি আর তখন কি খেয়াল থাকে মাছের নেশা বড় নেশা। ছেড়া গামছাটা দিয়ে গা মুছল। লুঙ্গিটা বের করে পরল। হরিপদ আবার বলল—মাথাটা ভাল করে মুছো। ঠাণ্ডা লাগলে দুখবানি ঠাণ্ডা পায়ে মাথায় একটু তেল লাগাও। পরাণ তাই করল। হাত-পা ভাঙ্গানের পাতিল ছেঁকে মুখে লাগাল। একটু তামাকও সাজল তারপর নিজের মনেই টানতে লাগল। মাছটা দেখে খুব লোভ হয়েছিল। ধরতে পারলে কানুর মাকে দেখতে পারতো। পরাণ অনেকবার দেখেছে যে সময় ভাল লাগে কানুর মাকে সে সময় ধরতে পারে না—পিছলিয়ে যায়। এই মাছটার সময়ও তাই হল। হাত দিয়েছিল কিন্তু রাখতে পারল না পিছলিয়ে চলে গেল। বুকের মধ্যে সেই ব্যাথাটা আরম্ভ হল।

কিসের যে দুখ গুমরে গুমরে উঠে পরাণ তা নিজেই জানে না। অনেক দিন জানবার চেষ্টা করেছে কিন্তু কোনদিন পারে নি।

কানুর মাকে দেখেই বিয়ে করেছিল পরাণ। তখন পরাণ জোয়ান মরদ। গায়ে-গতরে সুঠাম দেহ। মাথায় এক ঝাঁকড়া চুল। মেলা বাইচে যেত। বইচে জিতে ফেরার সময় ঢোকরা বাজাতো আর গান গাইতো ঢিকন সুরে। গেরামের যুবতীরা চুপিচুপি গাছের আড়ালে সেই গান শুনতো। পরাণদের অবস্থা এরকম ছিল না। কিছু জমি ছিল। জমিতে যা ধান হত তা কোনরকমে বছর চলে যেতো কোন অসুবিধা হত না। কানুর মা তখন কানুর মা হয়নি—গেরামের সুন্দরী। এই সুন্দরীকে বিয়ে করতে অনেকেই চেয়েছিল। পরাণের সাকরেদ হরিপদও চেষ্টা করেছিল কিন্তু শেষমেষ পরাণের জিত হয়েছিল অর্থাৎ সুন্দরীর বাবা পরাণকেই পছন্দ করল। সকলেই সুন্দরীকে ভুলে গেলেও হরিপদ ভুলল না। পরাণের বাড়ী যেন ওর বাড়ীঘর। পরাণের বাড়ী ছাড়ে না। হরিপদ বিয়েও করলো না কেনজানি। পরাণের সঙ্গেই মিলেমিশে আছে। যেখানে মাছ ধরতে যায় হরিপদকে নিয়ে যায়। সুন্দরীকে ঠিকমত রাখবার জন্য পরাণ আস্তে আস্তে জমি বিক্রী করতে আরম্ভ করল। তার মধ্যে অন্যায় পরপর দুনা হয় আরো গরীব করে দিল। জলেও মাছ পড়েনি তেমনভাবে, সবেমাত্র নতুন বিয়ে করেছে।

একটু ভোলমন না দেখালে বৌ বলবে কি? এত করেও পরাণ সুন্দরীর মন পায় না। কোন কথা হলেই ঝগড়া করে। ভালভাবে কথা বলে না দিনরাত রাগারাগি কাটাকাটি লেগেই থাকে। এই অশান্তি থেকে জলের মধ্যে থাকা অনেক ভাল। চারপাশে টলমল জল। উপরে আকাশ। সাদা মেঘের নাও ভাসছে। কোন দেশে যাচ্ছে যেন নিমন্ত্রণ খেতে। আর মাছেদের সঙ্গে খেলা। মাছ ধরার নেশায় বুদ হয়ে থাকে পরাণ। কি করে মাছ ধরবে কি করে নৌকো ভর্তি মাছ টলমল দেবে ঢাকায় সেই চিন্তায় মগ্ন হয়ে থাকে সব সময়। অনেক মাছ পেলে অনেক টাকা, অনেক টাকা ঘরে নিয়ে যেতে পারলেই কানুর মা খুশী হবে এই কথা মনে এলেই পরাণ আর মানুষের মধ্যে থাকে না: খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে রাতদিন শুধু মাছ ধরতে চায়। ধরতেও পারে ওতে কোন কষ্ট হয় না· কিন্তু তাতেও কানুর মার মন পায় না পরাণ। কেমন যেন খটখটে হয়ে গেছে স্বভাব। অথচ হরিপদর সঙ্গে ভালভাবেই কথা বলে রঙ্গরসের কথা বলে হেসে লুটিপুটি খায়।

হরিপদর সংসারে কেউ নেই। বিয়েও করলো না এই ঝামেলা না করার জন্য লোকে সব কথা বলে না। পরাণ ওসব কথায় কান দেয় না। হরিপদকে বিশ্বাস করে। শুধু সাকরেদ বলে নয়। সমবয়সী বলে নয়। সম্পদে বিপদে সুখে-দুখে হরিপদর সঙ্গে মিলেমিশে বড় হয়েছে পরাণ। সেই সম্পর্ক নষ্ট করতে চায় না তাছাড়া হরিপদর বাড়ী ওদের বাড়ীর সঙ্গেই। ঘরের লগে ঘর। আসলে ওদের এই ঘনিষ্ঠতা অনেকেই পছন্দ করে না হিংসা করে। অনেকেই কুৎসা রটায়। পরাণ ইদানিং কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে সুন্দরীর ব্যবহারে। মিতার সঙ্গে ওতো চলাচলি কিসের। পরিত্যক্ত মানুষ নাকি। ধোয়া ছাড়তে ছাড়তে হরিপদর দিকে তাকাল পরাণ। একমনে হরিপদ জলের দিকে তাকিয়ে আছে যেন মনে হচ্ছে সুন্দরীকে দেখছে। সুন্দরীকে এই ভাবেই তাকিয়ে দেখে। ওর যেন দেখেই সুখ। পরাণের কলজেয় আগুন খেলে ও আরো জোরে হুক্কা টানতে লাগল। মনে মনে ভাবল..... ফেলে নাকি জলের মধ্যে ফেলে। মাছটা কেমন পালিয়ে গেছে সেইভাবেই পালিয়ে গেলেই তো হয় তাহলে আর কোন কথাই থাকে না।

হরিপদ ডাকল—উনুন ধরাও। রাইতে খাইতে হইবো না।

পরাণ কোন কথা বলল না একমনে হুক্কা টানতে লাগল। হরিপদ আবার বলল—হুক্কাটা দাও তো টান দেই।

—খাড়। কথা কইলে মাছ আইবো। ভেসালের দিকে চোখ রাখ। যকন ঘড়ন করলে মাছ পড়ে।

হরিপদ আর কোন কথা বলল না। ভেসালের মাথায় পা রাখল। ভেসাল আস্তে আস্তে উপর উঠতে থাকে আর জলের মাছ লাফায়। এবার এক ঝাঁক এসেছে। হরিপদর চোখেমুখে হাসি। পরাণকে উদ্দেশ্য করে বলল—দেহ, দেহ—জাল ভইরা গেছে।

—তাড়াইয় নাও ভাল কইয়া টান দে। বলা সত্ত্বেও কাতলা কলাই মাছে ভর্তি।

পাটাতনের মধ্যে পড়তেই লাফালাফি হুটোপুটি আরম্ভ করল।

এত মাছ দেখে পরাণের বুকে জল এল। লুত হলেও হরিপদের মাছের আইস আছে। মাছেরাও হরিপদকে পছন্দ করে। কানুর মা করবে তাতে দোষটা কি। দেখতে তো পেঁচার মত কিন্তু গুণে ভরা। পরাণ আবার হাঁক দিল।—ভেসালে তুই আর পদা, এইবার মাছ আইবো, নে তামাকটা টান দিয়া ল।

হরিপদ পরাণের মুখের দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসে। কি বলবে যে কোন কথাই আসে না। শুধু বললে—নিকারির পোলা আইজ কি আইবা না, গয়নার নও কি চইলা গেল।

পরাণ দূরের ধলেশ্বরী গাঙের দিকে তাকাল। বিরাট বিরাট নাও। রং-বেরং-এর পাল তুলে যাচ্ছে আসছে। এখন এইখান দিয়া লঞ্চ যায়। গাবরপাড়া মাইলকাদা, কুচিয়ামোড়ায় অনেকক্ষণ থামে। পরাণ হরিপদকে উদ্দেশ্য করে বলল—একবার উহায় গেলে কোন হুয়রে যাবি নাহি।

—আমাগো লাগান মাইনসের গিয়া কি হইবো। অতবড় শহরে কেডা চেনে।

টাকা-টোকা হইলে একখান ভাল শাড়ী কিনুম, কানুর মারে লিগা—কি কস।

হরিপদ আর কোন কথা বলে না। ভেসালের দিকে তাকিয়ে থাকে।

পরাণ একটা ডিঙ্গি নাও-এর দিকে তাকিয়ে বললে—রাইতের লাইগা ভাত বসাস্ নাহি। একটা মাছ কাটি কি কস।

—না, না, খিচুড়ী বহাও। নিকারীগো দিয়ু কি?

—তাইলে খিচুড়ী বসাইয়া দেই। বলেই পরাণ মাটির হাঁড়ি বের করে জল তুলল। ডোলা উনানে পাটশোলা দিয়ে আগুন ধরিয়ে চালডাল মিশিয়ে বসিয়ে দিল। হাত পাটা ধুয়ে ছইয়ের মধ্যে বিছানাটা পেতে বালিশটা নিয়ে পাটা ছেড়ে দিল। হরিপদর দিকে তাকিয়ে বললে—এখন আর ভেসাল বাইস না, নাইমা আয়, আমি যাই। তমকে খাইয়া ল।

পরাণ আর এক হুলুম তামাক ভরে দুই এক টান দিয়ে হরিপদের দিকে হাতটা বাড়িয়ে দেয়। হরিপদ নেমে আসে। পরাণ ভেসালে উঠে ভাবল—অনেকক্ষণ ভেসালে আছে হরিপদ। হরিপদ পারেও। ক্লান্তি নেই। পরাণ যা বলে তাই করে। হরিপদর সবকিছুই ভাল। অবশ্যি কানুর মার সঙ্গে ওর ফুর্তি-নষ্টি ভাল লাগে না। মেয়েমানুষের সঙ্গে অত ঢলাঢলি কিসের। মানুষে কি বলে। হরিপদকে কিছু বলতেও পারে না। আপদে-বিপদে সব সময় হরিপদ। সেবারে ঝড়ে ঘর পড়ে গেছিল হরিপদই ঘর তৈরী করে দিয়েছিল এক পয়সা নেয়নি। হরিপদ না থাকলে পোলাপান নিয়ে ভেসে যেতে হত ধলেশ্বরীর গাঙে। হরিপদকে নিয়ে অনেক ভেবেছে এই ভাবনার কূলকিনারা পায়নি পরাণ। ধলেশ্বরী গাঙের জলের দিকে তাকিয়ে রইল। ঢেউএর জন্য কোন মাছ আছে কিনা তা জানা যায় না। এই জন্যেই পাট ছিল কে বলবে মনে হয় গহীন গাঙ। এই গাঙের তল খুঁজে পাওয়া ভার। কানুর মার মন পেল না পরাণ। কেমন যেনো ডুব দিয়ে লুকিয়ে থাকে। কোন পূজা পার্বনে ভালমন্দ কিছু করলেই হল—হরিপদকে নিমন্ত্রণ করবে। ওকে বাদ দিয়ে কানুর মার কিছু হয় না। পোলাপান-গুলিও ঐ রকম বাপের কাছে আদর না পেলেও ক্ষতি নেই। হরিকা আছে। হরিকা বলতে অজ্ঞান।

কি যে মধু খাইয়েছে কে জানে। আশ গেরামের লোক তো রাত দিন যা নয় তাই বলছে। শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে গেল। একবার ইচ্ছা করে পরাণের এই বাড়ী থেকে অন্য কোথাও চলে যায় যেখানে কানুর মা নেই। হরিপদ নেই। রেগেমেগে যে হরিপদকে কিছু বলবে তার কোন উপায় নেই। কানুর মা তাহলে বাড়ি ফাটিয়ে ফেলবে। পরাণ যে বুঝে না তা নয় কিন্তু পরাণভার মানে না কেবলি বুকের মধ্যে আকুলি বিকুলি করে। মনে হয় নাও নিয়ে ধলেশ্বরী গাঙে চিরদিনের মত ভেসে যায়। কি হবে এই সংসার করে। কি হবে এই ঘর গেরস্থালী। কানুর মা একশিশি রাঙ্গা-জবা আলতা কিনে দিতে বলেছিল তাই পারেনি। সেই জন্য কানুর মা যা মনে লয় তাই বললে—তোমার মুত মরদের গালে ডুব দিয়ে মরণ ভাল। খাওন দেওনের মরদ নাই। বিয়া করনের সময় মনে ছিল না। পরাণ এই গালিগালাজ সহ্য করতে পারে না—কানে আঙ্গুল দিয়ে বেরিয়ে আসে। পরাণ জানে আলতার শিশি ঘরে আসবে। এই কথা মনে হতেই শরীরটা কেপে মাথাটা ঝিনঝিন করে উঠল। মাথাটা যেনো ঘুরছে পরাণ নিজেকে সামলাতে পারল না। পা পিছলিয়ে পড়ে গেল।—

ধপাস করে শব্দ হতেই হরিপদ ফিরে তাকিয়েই চীৎকার করে উঠল। পরাণ ভেসালের বাঁশ থেকে খাঁচার বাঁশে পড়ে গিয়ে চেঁচাচ্ছে। কাঁধের পাশ দিয়ে বাঁশের আগাটা বিঁধে গিয়েছে।

সর্বনাশ পরাণ কাৎরাচ্ছে। রক্ত ছিটকে বের হয়ে জলের মধ্যে তলের মত পড়ছে। খাঁচার মুখটা খুলে গিয়ে মাছগুলি জলের মধ্যে লাফিয়ে পড়ছে। হরিপদ এখন কি করবে। কিভাবে মাছগুলি ধরে রাখবে। কি ভাবেই বা পরাণকে বাঁচাবে কিছুই ভেবে পেল না। ভেসাল জলের মধ্যে পড়ে রয়েছে। হরিপদ চেঁচাচ্ছে বাঁচাও—বাঁচাও। পরাণকে নিয়ে যেতে পারলে হয় কিভাবে নাও ঘাটে ভিড়াবে কিভাবে মুখ দেখাবে। কানুর মা বলবে কি? হরিপদ তাড়াতাড়ি নৌকাটা পরাণের কাছে নিয়ে ওকে ধরে হেঁচকা টান দিল। রক্তে গা ভরে গেল। তাড়া তাড়া বক্ত হরিপদর গায়। পরাণের মুখে দিয়ে নালা বেরুচ্ছে। চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। হরিপদ ডুকরে ডুকরে কেঁদে উঠল—কি সর্বনাশ হইল গো।

হরিপদর কান্না গাঙের ঢেউ-এর মধ্যে মিশে গেরামে পৌঁছে যাচ্ছে। পরাণের মাথাটা বালিশটায় রেখে যেখানে বাঁশটা ঢুকেছে সেখানে গামছা দিয়ে ভাল করে বেঁধে দিল। হরিপদ হাঁপাচ্ছে। মুখে কাসরঘণ্টা বাজছে। কারো কারো বাড়ীতে সাঁঝবাতিও লাগিয়েছে। নৌকার বাঁধন খুলে বৈঠা ধরল। নাওএর গলুই গ্রামের দিকে ঘোরাল।

পরাণ পাটাতনের ওপর কাৎরাচ্ছে। মাঝদের খাঁচা ফাঁকা। ভেসাল উল্টে পড়ে আছে। কি করে পড়ল পরাণ। নিশ্চয়ই পা পিছলে গেছে। ভালয় ভালয় এখন পরাণকে বাড়ী নিয়ে যেতে পারলে হয় হরিপদর চোখ পরাণের দিকে। ওর চোখে জল এসে গেল। সাংঘাতিক অবস্থার পকে আছে পরাণ। নিজের জীবন দিয়েও ওকে বাঁচাতে হবে। এই কথাগুলি মনে আসতেই শক্ত মুঠোয় বৈঠা ধরল হরিপদ।

ঘাটে নাও ভিড়তেই হরিপদ চীৎকার করে উঠল। হিজল গাছের সংগে কোনমতে দড়ি দিয়ে নাও বাঁধল। হরিপদের চীৎকার শোনে কানুর মা এবং আশেপাশের লোক-জন ঘাটে এল। কানুর মা চীৎকার করে কাঁদতে লাগল—হায় হায় আমার কি হইলো গো, আমার কি সর্বনাশ হইল।

হরিপদ পরাণকে কাঁধে করে নাও থেকে নামাল। কানুর মা তাড়াতাড়ি একটা কুপি নিয়ে এল। অন্ধকারে কারোর মুখ দেখা যাচ্ছে না। কানুর মা আর হরিপদ দুজনে মিলে পরাণকে ঘরে শোয়াল। পাশের বাড়ীর শম্ভু চলে গেল ডাক্তারকে খবর দিতে। বাড়ীতে একটা হৈচৈ পড়ে গেল। পোলা-পানেরা চুপ হয়ে গেছে। পরাণের শরীর ভাল করে পরিষ্কার করে দিল কানুর মা। লুঙ্গিটা পালটিয়ে দিল। হরিপদ কারোকেই কিছু বলছে না। সকলের মুখেই এক কথা কি করে হল। কেমন করে হল হরিপদ বলছে—ভেসাল থেকে পড়ে গেছে। এইটা কেউ বিশ্বাস করতে পারছে না। অনেকে আবার অনেক কিছু ভাবছে অথচ মুখে কিছু বলতে সাহস পাচ্ছে না। ডাক্তারবাবু তাড়াতাড়ি চলে এল—দেখেশুনে কাণ্ডজ্ঞ করে দিল। যাবার সময় বলে কোন চিন্তা নেই—ওষুধ দিয়েছি। ভাল হয়ে যাবে।

ডাক্তারের পায়ে পড়ে গেল হরিপদ। চোখের জল মুহূর্তে মুহূর্তে বললে—পরাইনেরে বাঁচান ডাক্তারবাবু। চিরকাল আপনার গোলাম হইয়া থাকুম।

—কইলাম তো ভয় নাই। চল ডিস-পেনসারীতে ওষুধ নিয়া আসবি।

হরিপদ ডাক্তারের ব্যাগটা নিয়ে পিছনে পিছনে ছুটল। পৃথিবীতে অন্ধকার যেন ভেঙ্গে পড়েছে। এখন নিশ্চয়ই অমাবস্যা। ঘোর অন্ধকার। ফুলকীজলার

সাপে জোনাকিরা জ্বলছে আর নিভছে। কোথাও একটা ভুতুম পেচা ডাকছে। হরিপদ ওষুধ নিয়ে এসে নিজের হাতেই খাইয়ে দিল। হরিপদ কানুর মার দিকে তাকাতে পারছে না নিজেকে অপরাধী বলে মনে হচ্ছে। যদিও নিজে দোষী নয়। এখনো পর্যন্ত কোন কথা বলেনি বলার সময় পেলে কোথায়? কানুর মাকে ডেকে বললে—আমি থাকতে কোন চিন্তা নাই।

কানুর মা কোন কথা বললে না। মুখটা বেশ থমথমে। কেমন যেনো বোবা হয়ে গেছে। হরিপদ পরাণের পাশেই শুয়ে পড়ল।

কখন যে ঘুম ভেঙেছে পরিপদ জানে না। চোখ মেলে তাকিয়ে দেখে পরাণ ঘুমিয়ে আছে। কানুর মা উঠোন ঝাড় দিচ্ছে। হরিপদ আস্তে আস্তে বাইরে এল। কানুর মার কাছে গিয়ে বললে—চাল আছে তো?

কানুর মা মাথা নেড়ে জানাল নেই। হরিপদ বেরিয়ে গেল।

পরাণ চোখ মেলে তাকাল। কানুর মাকে দেখতে পেল কাজ করছে। ভোম্বল, টগরিকে দেখছে না। বোধহয় ফাল তুলতে গেছে। কানুর মা ফিরতেই পরাণকে দেখল। পরাণ হাত ইশারা করে কাছে ডাকল। কানুর মা কাটা ফেলে দিয়ে কাছে গেল। কপালে হাত দিয়ে জ্বর এসেছে কি না মাথাটা হাত দিয়ে বুলিয়ে দিতে দিতে বললে—চুপ কইরা চোখ বইজা থাক। ভাল হইয়া যাইবা। চিন্তা কইরো না। এমন কিছু হয় নাই। খপ করে হাতটা ধরল পরাণ। ঠোঁট দুটো নড়ে উঠল কিন্তু কোন কথা বলতে পারল না ফ্যাল ফ্যাল করে অসহায়ভাবে তাকিয়ে রইল। দুফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। কানুর মা নিজেকে আর সামলাতে পারল না পরাণের হাতটা সরিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এল।

বেশ কয়েকদিন হয়ে গেছে পরাণ শুয়ে আছে বিছানায়। জ্বর অল্প অল্প উঠতে পারে। ভাল করে হাঁটতে পারে না। এই কয়দিন কিভাবে গেল যে নিজেই জানে না। কিভাবে ঘটনা ঘটল আস্তে আস্তে মনে করতে চেষ্টা করল, শরীরটা ভাল লাগছিল না গায়ে জ্বর জ্বর ছিল। হরিপদ ভাবছিল আবার কি মনে করে নিজেই ভেসালে উঠেছিল। হঠাৎ পা পিছলায় এই সর্বনাশ। হরিপদ কথা শুনলেই ভাল হত। এই কয়দিন হরিপদই দেখেছে সংসার। হরিপদ বাড়ীতেই থেকেছে মাছ ধরতে যায়নি। পরাণকে ফেলে কি করে যায়। অথচ জলের মানুষ এইভাবে কি ডাঙ্গায় বসে থাকতে পারে। কিন্তু না থেকেও উপায় নেই। এই অলস সময়টা কি করে কাটায়। এই সময় সংসারের কাজকর্ম একটু বেশী করতে হয়েছে বইকি। পরাণ বিছানায় বসে তামাক টানে। উঠানের দিকে গাঙ্গের দিকে চেয়ে থাকে। কানুর মা সকালবেলা মুড়ি দিয়ে যায় আর দুপুরবেলা ভাত নিয়ে আসে তারপর আর দেখা নেই। এখন অবশ্য চাও আসে না। কারের হাত দিয়ে পাঠিয়ে দেয়। কেননা এখন আগের চেয়ে অনেকটা ভাল। বিপদ সামলিয়ে উঠছে পরাণ।

পরাণের চোখ জলে ভেসে যায়। বাড়ীতে থেকেও নেই। বাইরের লোক যেনো বসে আছে। হরিপদ তামাক সাজতে সাজতে বলে—আর কয়টা দিন, তারপরই হাঁটতে পারবা.

—ভালো হইয়া কি হইবো। এর চেয়ে মরণ ভাল। পরাণ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে কোন রকম উত্তর দিল।

—ঐ কথা কও কান। আমার ভাল লাগে না। অলক্ষণে কথা।

—ঘর বইয়া থাকলে খাওন দিবো।

—ঐ সব চিন্তা কইরো না তো? আমি আছি কি করতে। সংসারের কথা ভাইবো না।

পরাণ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে কোন কথা বলে না। বুকের মধ্যে কে যেনো টানে ধরিয়ে দেয়। মনে হয় ধলেশ্বরীর সব জল ঢেলে দিলেও নিভবে না। গেরামের লোকেরা আসে ফাঁক পেলেই হরিপদর কথা বলে। কানুর মার কথা বলে।

ঐসব কথা শুনে যা শুনে আরো বাড়ে। পরাণের চোখেও পড়েছে। বাড়ীতে একটা অসুস্থ লোক পড়ে আছে সেদিকে খেয়াল নেই। বেশ আনন্দে ভাত রাঁধছে খাচ্ছে। হরিপদর সঙ্গে রঙ্গরসের কথা বলছে অথচ পরাণের সংগে কোন কথাই বলছে না কানুর মা। প্রথম প্রথম ডাকলো পরাণ এখন আর ডাকে না। ডাঙ্গার চেয়ে জল অনেক ভাল। জলকে বিশ্বাস করা যায় কিন্তু ডাঙ্গার মানুষকে বিশ্বাস করা যায় না। পরাণ দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে মুখ দিয়ে কোন কথা বের হচ্ছে না কতক্ষণ ঘরে বসে থাকে। হঠাৎ কানে এল কানুর মা হরিপদকে বলছে—মুড়ি খাও, নাইরকেল দিচ্ছি।

হরিপদ বলছে—না, না আমি খামু না —তুমি না খেলে আমিও খামু না। এই নিয়ে অনেক কথা চলছে। পরাণের বুকটা হাঁ হাঁ করে উঠল। বুকের মধ্যে একটা যন্ত্রণা পাকিয়ে গলার উঠছে অথচ কোন কিছু করতে পারছে না।

আর সহ্য করা যাচ্ছে না নিজের জীবনটা জলের মধ্যে ফেলে দিতে ইচ্ছা করে। নয় তো কলসি গলায় বেঁধে ডুবে মরবে। হু হু করে চোখে জল আসে পরাণের, এর চেয়ে মরা অনেক ভাল ছিল। গেরামের লোক এত দিন যা বলেছে সব কি তাহলে সত্যি? আজ নয় আরো অনেক দিন দেখেছে। হরিপদর সংগে কানুর মা নাইতে গেছে। ফিরেছে অনেক বেলাতে। এই ঘরে কে, কানুর মা আসেই না যাতেও থাকে না। এখন পরাণ একটু একটু হাঁটতে পারে। সাঁজ বাতি জ্বেলেছে ঘরে। কাঁসর ঘণ্টা বাজছে। পরাণ আস্তে আস্তে গাঙ দেখার জন্য বাইরে এল কতদিন গাঙ্গ দেখে না। বিশাল গাঙ না দেখলে কি মন ভাল থাকে। আহারে। কি সুন্দর ধলেশ্বরী গাঙ্গ। পরাণ যেই ভেতর বাড়ীর উঠান দোরেই দেখে ঘরের মধ্যে কানুর মা হরিপদকে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে রয়েছে। ঐ দেখেই পরাণের মাথা গরম হয়ে গেল। সমস্ত শরীর অসাড় হয়ে আসছে বাড়ীঘর দোর দুলছে। এক্ষুণি ভেংগেচুরে ধূলিসাৎ হয়ে যাবে সব।

পিঠের সেই ব্যথাটা আবার বেড়ে গেল। মাথার রগটা দপদপ করছে। বুকের মধ্যে সেই আগুনটা ধপ করে জ্বলে উঠল। পরাণ তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিল। আস্তে আস্তে পা ফেলে ঘাটে এল। ওরা কেউ টের পেল না। ঘাটে নাও বাঁধা রয়েছে। নাও-এর মধ্যে উঠল। দড়িটা খুলে বৈঠা নিল হাতে ছপছপ করে জোরে জোরে বৈঠা ফেলে গাঙের মাঝখানে এল পরাণ।

চারপাশে বিশাল গাঙ। ঢেউ-এর পর ঢেউ উঠছে। প্রচণ্ড গর্জন। পরাণ পাগলের মত বৈঠা চালাচ্ছে। হাতের রগ বুঝি ছিঁড়ে যাবে। ঢেউয়ের মধ্যে পরাণের নাও ভেসে চলল বিশাল গাঙে।

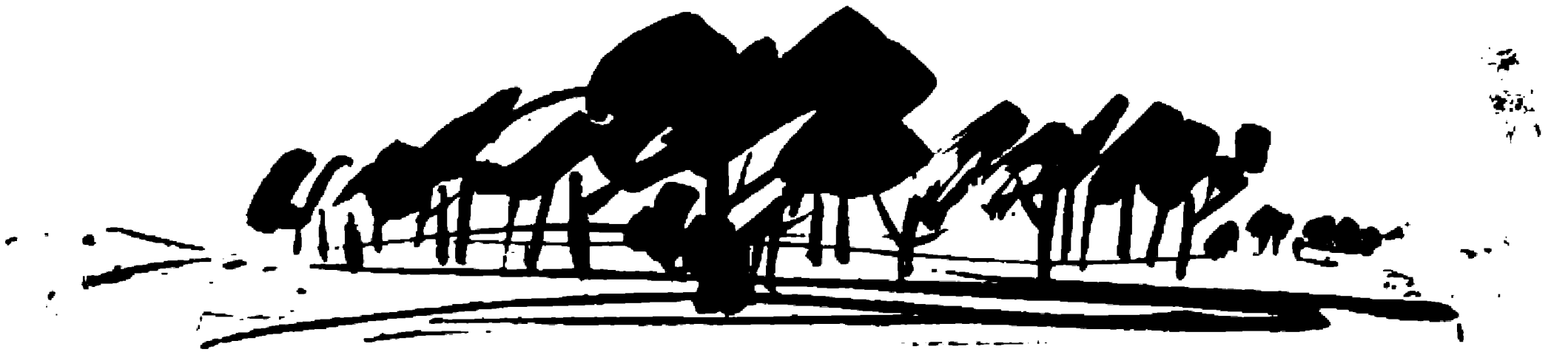

CENTRAL LIBRARY

সাক্ষাৎকার থেকে বলছি

লান্স গিবস— বোলিংয়ে বিশ্ব রেকর্ড

টেস্ট ক্রিকেটে তিনশ সাতজনকে আউট করে দিয়ে ডেনিস লিলি যখন বিশ্ব রেকর্ড গড়েছিলেন সেদিন অনেকেরই ধারণা হয়েছিল যে এই রেকর্ড বুঝি অনাদের নাগালের বাইরেই রয়ে যাবে। ভিক্টোরিয়া মওয়া তো দূরের কথা আর কেউ এই রেকর্ড স্পর্শ করতে পারবেন কিনা সন্দেহ! কারণ সে সন্দেহ নিরসনে লান্স গিবস নিজের হাতে যে রীতিমত গড়ে দিলেন তা আন্তর্জাতিক মহলে উপেক্ষণীয় ব্যাপার যে কোনদিনে ঘটবে, আজকের জিজ্ঞাসা শুধু তাই।

নিজের কুড়িতে তিনশ নটি উইকেট পুরো লান্স গিবস ডেনিস লিলির বিশ্ব রেকর্ডটি ছিনিয়ে নিয়েছেন। এবং এখানেই তিনি থমকে দাঁড়াবেন না। যেহেতু বয়স যাত্রাই হোক না কেন, গিবস আরও এক আধ বছর খেলবেন ও সেই অবসরে বাকপটু সংবাদিকদের প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে তুলবেনই।

উইকেট সংখ্যায় বিশ্ব রেকর্ড করার পর ডেনিস লিলিকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল 'আপনার কি ধারণা, কেউ কি এই রেকর্ড ভাঙতে পারবে?' উত্তরে লিলি বলেছিলেন 'তা বলতে পারি না। শুধু এইটুকু জানি যে অন্য কোনও বোলারকে ভাঙতে হলে, পরিশ্রমের তাকে নুয়ে পড়তে হবে।' গিবস লিলির রেকর্ড লেখোছেন। কিন্তু পরিশ্রমের চাপে তিনি কি সত্যই নুয়ে পড়েছেন? মনে তো হয় না।

তিনশ নটি উইকেট পাওয়া মুখের কথা নয়। খাটতে হয়েছে অপরিমিত। বয়স একচল্লিশের কথা। এই বয়সে এমন মেহনত সকলের সয় না। কিন্তু গিবস হাসিমুখেই তা নিজের ধাতে সইয়ে নিতে পেরেছেন। তাঁর টেস্ট ক্রিকেট কেরিয়ার শুরু হয়েছিল ১৯৬১ সালে। মাঠে নেমে প্রতিটি মুহূর্তেই তিনি উপভোগ করেন। কাছ থেকে দেখলে লান্স গিবসের অফুরান প্রাণশক্তি সম্পর্কে মুগ্ধ নিঃসন্দেহই হওয়া যায় না। সেই সঙ্গে অবাকও হতে হয়। একচল্লিশে পা দেবার পরেই তো অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে কতদিন আগে তিনি শুধু টেস্ট ক্রিকেটের আসরেই ১৮৬০'টি বল করেছেন—যা স্বদলের আর কেউই করেন নি বা কাউকে করতে হয়নি।

গত উনিশ বছর ধরে লান্স গিবস মাঠে মাঠে ছুটোছুটি করে একনাগাড়ে হাত ঘুরিয়ে চলেছেন। তবুও তাঁর ক্লান্তি নেই। ব্যাটসম্যানকে কিভাবে ঝুলিয়ে এখন হাত-পা ছড়িয়ে জিরিয়ে নেওয়ার কথা। কিন্তু কই গিবস তো অবসর নেওয়ার সংকল্প ঘোষণা করেন নি! তাঁর সঙ্কল্প চাতুর্য অনস্বীকার্য। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য তাঁর অপরাজেয় মানসিকতা ও অপরিমেয় প্রাণশক্তি!

অফ ব্রেক বল করে যিনি বিশ্ব রেকর্ড গড়েছেন সেই গিবসকে সর্বকালের সেরা অফ স্পিনার বলতে হয়তো কারুর কুণ্ঠা জাগবে। কিন্তু গত পনেরো বছরে সারা দুনিয়ায় তাঁর সমকক্ষ অফ স্পিন বোলার যে ছিলেন না একথা বোধহয় সর্বসম্মত। স্পিন বোলিং ক্রিকেটে সূক্ষ্ম শিল্পকলার সমিল। কিন্তু নানা চিন্তার তাগিদে অনেক চেষ্টা করেই অনুনা এই শিল্পকে ধুরন্ধরের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। লম্বা পান বাঁধানো উইকেটের ওপর ভয়াবহ রেলার টনটনি করে স্পিন বোলিংয়ের প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি করা হচ্ছে। এই পরিবেশে লম্বা পিচে পেস বোলিংয়েই যতো বাড়াবাড়ি। ভারত এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ ছাড়া অন্যদলের স্পিন বোলাররা টেস্ট ম্যাচে হাত ঘোরাতে বড় একটা [illegible] দেখা গিয়েছে কিন্তুই

পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি। জন্মের আঁতুরঘরের মুখে দাঁড়িয়ে তাই তিনি বলেছেন যে স্পিন বোলিংয়ের মাহাত্ম্য অস্বীকার করায় আজ যে আয়োজন ঘটেছে ক্রিকেটের পক্ষে তা কল্যাণকর নয়। স্পিন বোলিং এক ধরনের আর্ট। বাহুবলের আস্ফালনে এই সূক্ষ্মানুভূতি লুপ্ত, শিল্পের যদি নাভিশ্বাস ওঠে তাহলে ক্রিকেট একদিন নিঃস্ব হয়ে পড়বে। তার চেয়ে এমন ব্যবস্থা করা হোক না যাতে পেস ও স্পিন, দু ধরনের বোলিংই আপন বৈশিষ্ট্যে উদ্ভাসিত হতে পারে। স্পিন বোলিং করতে হলে মাথা খাটাতে হয়। অথচ মস্তিষ্ককে ছেঁটে ফেলতে আজ যেন সর্বব্যাপী এক চেষ্টা চলেছে।

গিবসের সাফল্য তাই অর্থবহ। ভাববার কথা। সত্যিই তো ব্যাটিং ফিল্ডিং এবং পেস-স্পিন বোলিং সব মিলিয়েই না ক্রিকেট সর্বাঙ্গসুন্দর। হঠাৎ অঙ্গহানি ঘটে গেলে ক্রিকেটের মূল প্রকৃতিতে সৌন্দর্যের ঘাটতি ঘটতে পারে। কিন্তু এসব কথা ভাবছেই বা কে? উপাদানের না থাকায় ভারত ভাবতে পারে। কিন্তু অস্ট্রেলিয়া বা ইংলন্ড, ক্রিকেটের যত শরিক যারা তাদের এসব ভাবনা নেই। গিবস অবসর নিলে তাঁর নিজের দেশ ওয়েস্ট ইন্ডিজই কি এইসব ভাবনায় মাথা ভারী করে তুলতে চাইবে? কে জানে!

থাকগে সে ভাবনার কথা। আপাততঃ গিবসের কথাই সোচ্চার হয়ে থাক।

লান্স গিবস খেলা আরম্ভ করেছিলেন যে সময়ে সেই সময়ে সুখাদ্য রসগোল্লা ও ভালেন্টাইনের লীলা ছাড়া মাঠে ময়দানে প্রসারিত। ১৯৫৯ সালে এম সি সির বিরুদ্ধে ব্রিটল গায়নার পক্ষে যেদিন তিনি খেলতে নামেন সেদিন রসগোল্লা-ভালেন্টাইনকে ছেড়ে গিবসের দিকে নজর ফেরাতে কেউ আগ্রহ দেখান নি। কিন্তু উইকেটের সমকালীন হলে বটেই, সেই [illegible] কালান্তরের কৃতবিদ্য খেলোয়াড়দের

ছবিকে ছিনিয়ে গিবস নিজের পরিচয়কে আরও উজ্জ্বল করে তুলে ধরেন। ধাপে ধাপে তিনি এগিয়ে এসেছেন। এগিয়ে গিয়ে বিশ্ব রেকর্ড করার সুবাদে ক্রিকেট ইতিহাসের একটি পাতায় নিজের ঠাঁই পাকা করে নিয়েছেন।

সুদীর্ঘ খেলোয়াড় জীবনে গিবস একমাত্র কাঁচকলা ছাড়া প্রায় সব দেশীয় ফলের সঙ্গে মুখোমুখি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ সাফল্যের সূত্রে সুনাম কিনেছেন। টেস্ট খেলতে গিয়ে হাজির হয়েছেন ভারত পাকিস্তান সিংহল ইংলন্ড অস্ট্রেলিয়ার মাঠে। ইংলন্ডের কাউন্টি সব ওয়ারউইকশায়ার এবং ল্যাঙ্কাশায়ার ও ডারহাম লীগ বার্নসল ও হাইটবান ক্লাবের পক্ষে এবং অস্ট্রেলিয়ার শেফিল্ড শীল্ডে একসময় তিনি নিয়মিত খেলেছেন। ইংলন্ডে ওয়ারউইকশায়ারের পক্ষে এক এক মরশুমে শতাধিক উইকেট পাওয়ার তার পক্ষে ছিল সহজ ব্যাপার।

বাড়তি বয়সের কথা ভেবে গিবস অনেকবারই ক্রিকেট থেকে ছুটি নিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সে ছুটি মেলে নি। ওয়ারউইকশায়ারের সঙ্গে তাঁর চুক্তি ১৯৭১-এ ফুরিয়ে যায়। কিন্তু সাবিতিন বছর বয়সে এই খেলোয়াড় ১৯৭১-এ কাউন্টি লীগে সবার আগে একশ উইকেট পেয়ে বসায় ওয়ারউইক কর্তৃপক্ষ অনুরোধ নতুন করে তাঁকে দিয়ে দলের পক্ষে খেলার জন্যে চুক্তিপত্রে সই করিয়ে নেন। টেস্ট খেলার ব্যাপারে ঠিক এইরকমটি ঘটেছিল। বছর তিনেক আগে গিবস টেস্ট ক্রিকেট থেকে নিজেকে প্রায় সরিয়েই নিয়েছিলেন। কিন্তু ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বোর্ডের অনুরোধ উপরোধে আবার জাতীয় দলে ফিরে তাঁকে ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার মোকাবিলা করতে হয়। অবশ্য বিদেশ পরিবেশের এই অযাচিত সুযোগে গিবস লাভবানই হতে পেরেছেন। তারই প্রমাণ তাঁর এই বিশ্ব রেকর্ড। আগে অবসর নিলে এই সম্পদ তাঁর নাগালের বাইরেই থেকে যেতো।

লম্বা গিবস মূলতঃ অফ স্পিন বোলার। আঙুলের চাপে বল পাক খাইয়ে তিনি ব্যাটসম্যানদের চ্যালেঞ্জ জানান। ক্রিকেটের দীর্ঘ ইতিহাসে আর কোনো অফ স্পিনারই তিনশতাধিক টেস্ট উইকেটও সংগ্রহ করতে পারেন নি। সুবিখ্যাত ডিক লেকারের সংগ্রহ ১৯৩, হিউ টেফিল্ডের ১৭০, সন রামাধিনের ১৫৮। লেগ স্পিনারদের মধ্যে অবশ্য কেউ কেউ দুশ গন্ডী অতিক্রম করতে পেরেছেন। যথা অস্ট্রেলিয়ার রিচি বেনো (২৪৮) গ্রেগ ম্যাথিউ (২১৬)। তবে মজার কথা এই যে অফ স্পিন বল করেই তিনি সম্প্রতি বিশ্ব রেকর্ড গড়ে দলেন সেই গিবস কিন্তু কেরিয়ার যৌবনের সিংহভাগ লেগ স্পিন বলই করতেন। তাঁর নিজের কথায় 'আমি তখন লেগ স্পিন বলই করতাম। হামাং ব্যাটসম্যানদের ভুল বোঝাতে চেষ্টা করতাম এক আধটা অফ স্পিন মেশাতে।' কিন্তু প্রতিকূলতে উল্টো পথচলতে বল করার পরিণামে লোপ ধরে বল ফেলা কঠিন হয়ে দাঁড়ালো বলেই গিবস লেগ স্পিন ছেড়ে অফ স্পিনে মনোনিবেশ করেন। এবং তাতেই ধারাবাহিক নিজের ছোপ রেখে যান।

আঙুলের পাঁচ ছড়ায় লাইন মতো ঘুরিয়ে বলটি ছেড়ে দিয়ে কতোজনকে যে তিনি ঠকিয়েছেন তার ঠিক ঠিকানা নেই। তবে আঙুলের পাঁচের সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কের যে পূর্ণ সমাবেশ ছিল তা আজ হাতেও কোনো সন্দেহ নেই। বোলিংয়ে প্রতিপক্ষের ঘটাতে কতোভাবে যে তিনি চেষ্টা করেন তা প্রত্যক্ষদর্শী মাত্রেই জানেন। কখনো বল ছেড়ে দেন শূন্যে আলটপকা। কখনো নীচু করে। একবার এ পাশ আনাবার ওপাশ ঘেঁষে আবার কখনো ক্রিজের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বল ছাড়েন। এক কথায় ব্যাটসম্যানদের ভুলের ফাঁদে জড়াতে ক্রিজটাকে তিনি প্রতিনিয়তই ব্যবহার করেন। রকমারি ভঙ্গি দেখেই উপলব্ধি করা যায় যে বল করার সময় গিবস অহরহ চিন্তা করে চলেন। তাঁর কাছে হাতের কৌশলের চেয়ে মস্তিষ্কের তাগিদের মূল্য কিছু কম নয়।

টেস্ট ক্রিকেটের এক ইনিংসে গিবস পাঁচটি করে উইকেট পেয়েছেন অনুন পনেরো বার। ভারতের বিরুদ্ধে একটি টেস্টের এক ইনিংসে ৩৮ রানে আটটি উইকেট পেয়েও (১৯৬১-৬২-তে রিজ-টাউনে) তাঁর অসুবিধা হয় নি। একটি ম্যাচের দু ইনিংসে দশটি করে উইকেট পেয়েছেন তিনবার। তবে সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর বোলিং করেছিলেন বোধহয় ১৯৬০-৬১ মরশুমে অস্ট্রেলিয়া সফরকালে। তখনও গিবসের তেমন নামডাক হয়নি। প্রথম ন্যুটি টেস্টে দল থেকে বাদই পড়ে যান। তারপর সিডনীতে তৃতীয় টেস্টে খেলতে এসেই তিনি বল হাতে তনজন অস্ট্রেলীয়কে আউট করে দেন। পরের টেস্ট এডিলেডে গিবস তাঁর নিজের কীর্তিকে ম্লান করে দিয়ে পর পর চার বলে তিনজনকে প্যাভিলিয়নে ফিরিয়ে হ্যাট-ট্রিকই করে বসেন। সেই থেকেই লান্স গিবস ওয়েস্ট ইণ্ডিজের জাতীয় দলে স্থায়ী সদস্য হয়ে আছেন। ব্যাটিং-চ্যালেঞ্জাইনের ধার অতিক্রম করে প্রান্তর্জাতিক ক্রিকেটে তিনি নিজের যুগ প্রবর্তন করে দিয়েছেন। এইকালে গিবসই অবিসম্বাদী বিশ্ব শ্রেষ্ঠ স্পিন বোলার।

পরিভাষায় যাকে বলে 'টিম ম্যান' আক্ষরিক অর্থে গিবস হচ্ছেন তাই। দলের জন্যে খেলাই তাঁর লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে পৌঁছতে সর্বস্ব বিলিয়ে দিতেও তিনি রাজী। আর দল বলতে তিনি শুধু ওয়েস্ট ইণ্ডিজকেই বোঝেন না। বোঝেন ওয়ারউইকশায়ার বিশ্বের বাকিই একাদশ গায়না। এমন কি স্বদেশের অপ্রধান সংস্থা জমাইকার ক্রিকেট ক্লাব। অর্থাৎ যখন যে পক্ষে খেলেন সেই পক্ষের প্রয়োজনে হাসি মুখে পরিশ্রম করে যান। শারীরিক আঘাত অসুস্থতা কোনো কিছুই গ্রাহ্যের মধ্যে আনার দরকার বোধ করেন না।

১৯৭১ সালে মরশুম সুরুতে হাঁটুর চোটে বাধা উঠেছিল। মাত্র পাঁচ ডান হাতের অনামিকার চামড়া যায় ছিঁড়ে। এবং সেবাধে বাঁ-হাতের বুড়ো আঙুলের একটি ছোট হাড়ও সরে যায়। এতো অসুবিধে তবু অঘাতের কথা বেমালুম চেপে গিয়ে সারা মরশুম ওয়ারউইকের পক্ষে হাত ঘুরিয়ে যান। তা প্রায় হাজারখানের ওভার বল করে গিবস সেবার সবার আগে শতাধিক উইকেট সংগ্রহ করেছিলেন। এবং যেদিন মরশুমী খেলা শেষ হয় সেইদিনই সন্ধ্যায় হাসপাতালে ভর্তি হয়ে বুড়ো আঙুলে অস্ত্রোপচার করিয়ে নেন।

সাধে কি আর অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক বব সিম্পসন সোচ্চারে বলেছেন যে লান্স গিবস হচ্ছেন 'মিঃ একারডিসেন্স—অফুরান প্রাণ শক্তির আতিবাহিতে স্বতঃই উচ্ছ্বসিত। বাদবাদের মতো প্রকাশমান।

সত্যিই লান্স গিবস ক্রিকেটের এক অবিস্মরণীয় চরিত্র।

অজয় বসু

তিন অক্ষরের এই শব্দটিকে কেন্দ্র করে
লছে। ইংল্যান্ড থেকে নিউজিল্যান্ড,
থেকে শ্রীলংকার আকাশে বাতাসে
কিকেট আজ ঠেবকখানা থেকে বাড়ীর
সেল ঘর পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। বংগ
প্রতিষ্ঠা পেয়েছে অনেকদিন থেকেই।
ই আজ ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা। কিন্তু
ত্তাপে ফুলে ফেঁপে উঠলেও ক্রিকেটের
মবংগে তেমন কিছু ঘটেছে এমন কথা
বোধহয় নেই। তবু এরই মধ্যে ইত-
ভাবে কিছু কিছু প্রতিশ্রুতির সন্ধান
নৈরাশ্যের মধ্যেও স্বস্তির দু-একটি
াড়ে।

ঘরে এই স্বস্তি, এই প্রত্যাশা তারাই
। 'মাঠের নায়ক'।

নিয়ে বেশ জমিয়ে বসে আমার কথায় জবাব দিচ্ছিলেন। ছোটখাটো শরীর বয়স অল্প কিন্তু চোখ দুটিতে কি গভীর প্রত্যয়, বড়ো হওয়ার স্বপ্ন মাখানো।

সম্বরণ মোহনবাগান তথা বাঙলার উই কটরক্ষক। আচরণে অসাধারণ সপ্রতিভ, নিজ দায়িত্বে দারুণ সতর্ক। ব্যাটসম্যানের মুহূর্তের ভুলের ফসল তুলবার জন্য দস্তানা পরা দুহাত দুটি সদাই প্রস্তুত। চোখের পলক ডাইনে বাঁয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে শিকার ধরতে সম্বরণের ভুল হয় কদাচিৎ। ভুলই যদি আচ্ছার হোত তা হলে কি রণজি ট্রফির আসরে অতো অল্প সময়ে ক্যাচ বিহাইন্ডের রেকর্ড সম্ভব হত। সাতটি ম্যাচে সাতাশটি উইকেট লিকদরের রেকর্ড ছিল দিল্লীর উইকেটরক্ষক ইন্দ্রজিৎ সিংজীর। সম্বরণের রেকর্ড হোল পাঁচটি ম্যাচে পঁচিশটি শিকার।

সম্বরণ ক্রিকেটে নিজেজাল ব্যাটসম্যান হতেই এসেছিলেন। উইকেটের পেছনে দাঁড়ানোর বিন্দুমাত্র বাসনা তাঁর ছিল না। অনেক দেখেশুনে ঐ তিনকাঠির পেছনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন 'ক্রিকেট গরু' কার্তিক বসু। ইডেনে গ্রীষ্মকালীন স্কুল ক্রিকেটে খেলা দেখে। আজ একথা বলাই বাহুল্য যে, শ্রীবসু সম্বরণকে চিনতে বিন্দুমাত্র ভুল করেন নি। কিন্তু তা বলে ব্যাটিংয়েও তিনি কিছু কম যান না। পরিস্থিতির প্রয়োজনে শক্ত হাতে ব্যাট ধরে বহুবার তিনি নিজের দলকে লক্ষ্যে পৌঁছে দিয়েছেন। এই তো সেদিন ইডেনে রণজি ট্রফির সেমিফাইনালে প্রথম ইনিংসে ৩৮ এবং দ্বিতীয় ইনিংসে অপরাজিতভাবে ৫৮ রান করলেন। কার্তিকবরের আগে কলীঘাট ক্লাবের প্রদ্যোৎ ঘোষের সহযোগিতাও মিলেছে প্রশিক্ষণে দিনের পর দিন। সম্বরণের প্রথম স্বীকৃতি মিললো ১৯৬৭ সালে। কোচবিহার ট্রফিতে বাঙলা স্কুল দলের উইকেটরক্ষক হিসেবে মনোনীত হলেন তিনি। '৭০ সাল পর্যন্ত একটানা বাঙলা স্কুল দলে খেলার অনন্য সৌভাগ্য হয়েছে তাঁর। '৬৯-৭০ সালে হয়েছিলেন বাঙলার অধিনায়ক। '৬৯-৭০ সালে নির্বাচিত হলেন পূর্বাঞ্চল স্কুল দলে। সেবার কটক আয়োজিত ঐ আসরে সেরা খেলোয়াড়রূপেও চিহ্নিত হলেন সম্বরণ। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে পশ্চিমবঙ্গ থেকে আজ পর্যন্ত মাত্র দুজন খেলোয়াড় সর্ব-ভারতীয় স্কুল ক্রিকেটের অঙ্গনে সেরা খেলোয়াড়রূপে চিহ্নিত হয়েছেন। একজন সম্বরণ নিজে, অন্যজন দীপঙ্কর সরকার।

'আমি কঠ বাঙাল। বড়লের গোঁ জানেন তো? লড়াই খতম না হওয়া পর্যন্ত এক পা সরে আসবো না। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দিনরাত পরিশ্রম করে, কোন কিছুতে ফাঁক না দিয়ে, ক্রিকেটে অবিচল নিষ্ঠা রেখে আমার স্বপ্ন সার্থক করবো। পদ্মপারের কাদুলের রক্ত আমার শিরায় শিরায়। আত্ম সহজে সরে আসবো না, ভড়কাবো তবু মুষড়াবো না; এটুকু বলতে পারি।

কথা বলতে বলতে সম্বরণের একটা যেন চাপা দীর্ঘশ্বাস পড়লো। কিন্তু মুহূর্তে প্রসন্ন হয়ে বললেন : স্কুলের আসরে সেরা ক্রিকেটারের পুরস্কার পেয়েছেন একনাথ সোলকার, অশোক মানকাদ, সান্দিপ অমরনাথ এবং রাজেশ পাটেল। ওঁরা সবাই এখন টেস্ট খেলোয়াড়। আর আমি '৬৯-৭০ সালে বোম্বাইয়ে শ্রীলঙ্কা স্কুলের বিরুদ্ধে খেলা ছাড়া (৩১ ও ৪৭ রান, ৬টি কট বিহাইন্ড) জাতীয় দলের প্রতিনিধিত্ব করার আর কোন সুযোগই মেলে নি আজ পর্যন্ত। ভবিষ্যতে মিলবে কিনা ঈশ্বরই জানেন।

চাকুরিজীবী ছাত্র বলে সম্বরণ অন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট খেলার সুযোগ পান নি। ১৯৭১ সালে রণজি ট্রফিতে ছিলেন বাঙলার খেলোয়াড়। '৭৩-৭৬ সালে প্রথম খেললেন রণজি ট্রফি ইডেনে আসামের বিরুদ্ধে (৫টি কট বিহাইন্ড)। তারপর থেকে বাঙলা দলে আসন পাকাই হয়ে গেছে। দলীপ ট্রফিতে সম্বরণ প্রথম খেলেছেন ১৯৭৫-৭৬ সালে ইডেনে। আগের বছর ছিলেন পূর্বাঞ্চলের রিজার্ভ।

আদি বাড়ী ওপারে বাঙলার ফরিদপুরে হলেও সম্বরণের জন্ম ১৯৫৩ সালের পয়লা নভেম্বর করিমগঞ্জে। সম্বরণের বাবা ওখানে ঠিকাদারী করতেন। বাবা যতীন্দ্রমোহনের মাতুলকুল সম্বরণের বয়স তখন মোটে আড়াই বছর। বাবার অনুপস্থিতিতে মা শ্রীযুক্তা ননীবালা ব্যানার্জি নাবালক ছেলে-মেয়েদের (৬ ভাই, ১ বোন সম্বরণ কনিষ্ঠ-তম) বুকে আগলে মানুষ করে তোলেন। বর্তমান ঠিকানা যাদবপুর সেন্ট্রাল রোড। বড় দুভাই দীপ্তেন ব্যানার্জি এবং মানবেন্দ্র ব্যানার্জি যথাক্রমে বর্ধমান ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। সম্বরণ স্কুলে পড়েছেন যাদবপুরে। হায়ার সেকেণ্ডারী পাস করেন ১৯৭০ সালে। সুরেন্দ্রনাথ কলেজ থেকে বি-কম পাস করেছেন ১৯৭৩-এ। বর্তমানে লায়ার ছাত্র। চাকুরি করেন ইণ্ডিয়ান টিউব প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্টে। মোহনবাগানে খেলছেন ১৯৭১ সাল থেকে। এবছর সম্বরণ দলনায়ক, মাঠের নায়কও বটে।

বিপুল বন্দ্যোপাধ্যায়

খেলাধুলা

দর্শক

এভার্টন উইকস (ওয়েস্ট ইণ্ডিজ)
এক সিরিজে ৭১৬ রাণ (১৯৫২—৫৩)

ভারত বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ

ভারতীয় ক্রিকেট দল তাদের ১৯৭৬ দলের ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফর গত ফেব্রুয়ারীর ২৬ তারিখ থেকে শুরু করেছে। এই সফরটা হল ভারতীয় ক্রিকেট দলের চতুর্থবারের ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফর। এর আগে ভারতীয় ক্রিকেট দল ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরে গেছে বিজয় হাজারের নেতৃত্বে ১৯৫২-৫৩ সালে, নরি কন্ট্রাকটরের নেতৃত্বে ১৯৬১-৬২ সালে এবং অজিত ওয়াদেকারের নেতৃত্বে ১৯৭০-৭১ সালে। আগের তিনটি ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরে ভারত বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজের টেস্ট ক্রিকেট সিরিজের ফলাফল : ওয়েস্ট ইণ্ডিজের রাবার জয় ২বার (১৯৫২-৫৩ ও ১৯৬১-৬২ সালে) এবং ভারতের রাবার জয় ১ বার (১৯৭০—৭১ সালে) ওয়েস্ট ইণ্ডিজ রাবার জয় করে ১৯৫২—৫৩ সালে ১—০ খেলায় (ড্র ৪) এবং ১৯৬১—৬২ সালে ৫—০ খেলায়। ভারতের রাবার জয় ১৯৭০-৭১ সালে ১—০ খেলায় (ড্র ৪)। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরে আগের তিনটি টেস্ট সিরিজে যে ১৫টি টেস্ট খেলা হয় তার ফলাফল : ওয়েস্ট ইণ্ডিজের জয় ৬, ভারতের জয় ১ এবং খেলা ড্র ৮।

সুনীল গাভাস্কার (ভারত)
এক সিরিজে ৭৭৪ রান (১৯৭০-৭১)

বিবিধ টেস্ট রেকর্ড

ওয়েস্ট ইণ্ডিজে প্রতিষ্ঠিত ভারত বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজের টেস্ট ক্রিকেট খেলার বিবিধ উল্লেখযোগ্য রেকর্ড :

এক ইনিংসে দলগত সর্বোচ্চ রান

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : ৬০১ (৮ উইকেটে ডিক্লে:), কিংস্টন ১৯৬১-৬২

ভারত : ৪৪৪, কিংস্টন ১৯৫২-৫৩

এক ইনিংসে দলগত সর্বনিম্ন রান
(পুরো ইনিংসের খেলায়)

ভারত : ৯৮, পোর্ট অব স্পেন ১৯৬১-৬২

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : ২১৪, পোর্ট অব স্পেন ১৯৭০-৭১

এক সিরিজে ব্যক্তিগত সর্বাধিক রান

ভারত : ৭৭৪ রান (গড় ১৫৪-৪০)—সুনীল গাভাস্কার, ১৯৭০-৭১

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : ৭১৬ রান (গড় ১০২-২৮)—এভার্টন উইকস, ১৯৫২-৫৩

ফ্রাঙ্ক ওরেল (ওয়েস্ট ইণ্ডিজ)
২০৭ রাণ, কিংস্টন (১৯৫২—৫৩)

টেস্ট সেঞ্চুরী

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : ১৯টি (কিংস্টনে ৮, পোর্ট অব স্পেনে ৭, জর্জটাউনে ৩ এবং ব্রিজটাউনে ১)

ভারত : ১৪টি (পোর্ট অব স্পেনে ৭, কিংস্টনে ৪, ব্রিজটাউনে ২ এবং জর্জটাউনে ১)

ডাবল সেঞ্চুরী

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ (২টি) : ২০৭ ফ্রাঙ্ক ওরেল, কিংস্টন ১৯৫২-৫৩

২০৯ এভার্টন উইকস পোর্ট অব স্পেন (১ম টেস্ট) ১৯৫২-৫৩

ভারত (২টি) :

২২০ সুনীল গাভাস্কার, ৫ম টেস্ট (পোর্ট অব স্পেন) ১৯৭০-৭১

২১২ দিলীপ সারদেশাই, কিংস্টন, ১৯৭০-৭১

সর্বাধিক সেঞ্চুরী

ভারত : ৯টি—সুনীল গাভাস্কার (জর্জটাউনে ১১১, ব্রিজটাউনে নটআউট ১১৭

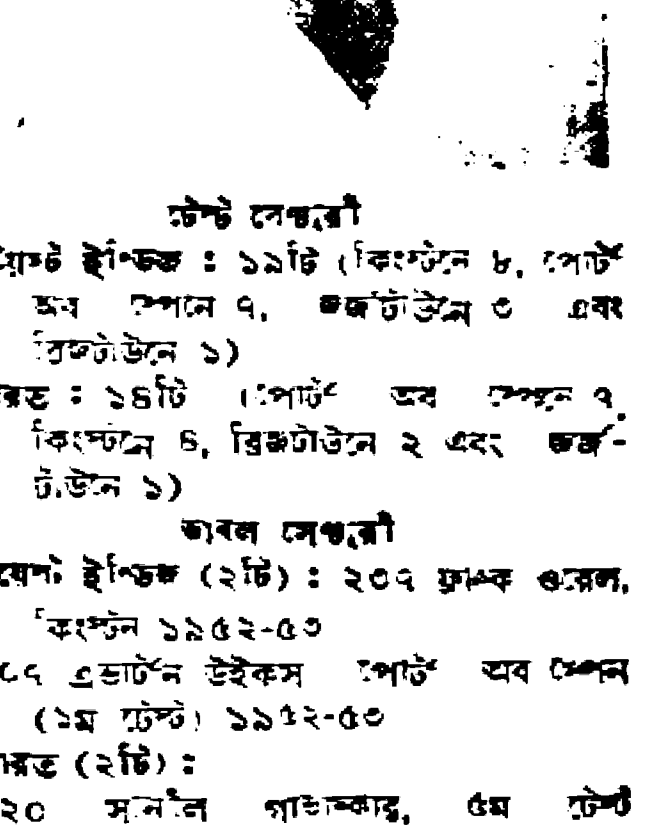

দিলীপ সারদেশাই (ভারত)
২১২ রাণ, কিংস্টন (১৯৭০—৭১)

এবং পোর্ট অব স্পেনের ৫ম টেস্টে ১২৪ ও ২২০ রান), ১৯৭০-৭১

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : ৫টি—গারফিল্ড সোবার্স (১৯৬১-৬২ সালে কিংস্টনের ২য় টেস্টে ১৫০ ও কিংস্টনের ৫ম টেস্টে ১০৪ রান। ১৯৭০-৭১ সালে জর্জটাউন নট-আউট ১০৮, ব্রিজটাউনে নটআউট ১৭৮ এবং পোর্ট অব স্পেনের ৫ম টেস্টে ১০২ রান)

টেস্টের উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী

ভারত : ১২৪ ও ২২০—সুনীল গাভাস্কার, ৫ম টেস্ট (পোর্ট অব স্পেন), ১৯৭০-৭১

দ্রষ্টব্য : ওয়েস্ট ইণ্ডিজে অনুষ্ঠিত ভারত বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজের টেস্ট খেলার আসরে একটি টেস্ট খেলার উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী করার গৌরব লাভ করেছেন একমাত্র ভারতের সুনীল গাভাস্কার।

এক ইনিংসে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : ২০৭ ফ্রাঙ্ক ওরেল, কিংস্টন ১৯৫২-৫৩

ভারত : ২২০ সুনীল গাভাস্কার ৫ম টেস্ট (পোর্ট অব স্পেন), ১৯৭০-৭১

এক সিরিজে সর্বাধিক উইকেট

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : ২৮টি (গড় ২২-৫৭)—এ এল ভ্যালেনটাইন, ১৯৫২-৫৩

ভারত : ২৭টি (গড় ২১-২২)—সুভাষ গুপ্তে, ১৯৫২-৫৩

একটি খেলায় সর্বাধিক উইকেট

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : ১১টি (১২৮ রানে)—ওয়েসলী হল, কিংস্টন (২য় টেস্ট), ১৯৬২-৬৩

এক ইনিংসে সর্বাধিক উইকেট

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : ৯টি (৯৫ রানে)—জে নোরিগা, ২য় টেস্ট (পোর্ট অব স্পেন), ১৯৭০-৭১

ভারত : ৭টি (১৬২ রানে)—সুভাষ গুপ্তে, ১ম টেস্ট (পোর্ট অব স্পেন), ১৯৫২-৫৩

একটি খেলায় সর্বাধিক সেঞ্চুরী
(দুই দলের সেঞ্চুরী সমষ্টি)

৩টি : ভারত ৩ (১ম ও ২য় ইনিংসে) এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ০ (১ম ইনিংসে) কিংস্টন, ১৯৫২-৫৩

ভারতের পক্ষে সেঞ্চুরী : ১১৭ পলি উমরীগড় (১ম ইনিংস), ১৫৩ পঙ্কজ রায় এবং ১১৮ বিজয় মঞ্জরেকার (২য় ইনিংস)। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে সেঞ্চুরী : ২০৭ ফ্রাঙ্ক ওরেল, ১০৯ এভার্টন উইকস এবং ১১৮ ক্লাইভ ওয়ালকট (১ম ইনিংসে)।

এক ইনিংসে সর্বাধিক সেঞ্চুরী
(এক দলের পক্ষে)

৩টি : ওয়েস্ট ইণ্ডিজ—২০৭ ফ্রাঙ্ক ওরেল, ১০৯ এভার্টন উইকস এবং ১১৮ ক্লাইভ ওয়ালকট (কিংস্টনের ৫ম টেস্টের ১ম ইনিংসে, ১৯৫২-৫৩)

: ওয়েস্ট ইণ্ডিজ—১২৫ ই মনকর্মারস, ১০৮ মোহন কানহাই এবং ১৫৩ গারফিল্ড সোবার্স (কিংস্টনের ২য় টেস্টের ১ম ইনিংসে, ১৯৬১-৬২)

সুভাষ গুপ্তে (ভারত)
এক সিরিজে ২৭টি উইকেট (১৯৫২-৫৩)

একটি টেস্টে সেঞ্চুরী এবং ৫ উইকেট

পলি উমরীগড় : ১৭২ নটআউট (২য় ইনিংসে) এবং ১০৭ রান ৫ উইকেট (১ম ইনিংসে) পোর্ট অব স্পেনের ৪র্থ টেস্ট, ১৯৬১-৬২

গারফিল্ড সোবার্স : ১০৪ রান (১ম ইনিংসে) এবং ৬৩ রানে ৫ উইকেট (২য় ইনিংসে), কিংস্টনের ৫ম টেস্ট, ১৯৬১-৬২

একটি খেলায় শতাধিক রান
(দুই দলের সম্মিলিতগত রান)

১৯৭৮ রান (৩৮ উইকেটে) : ভারত ৩৫০ ও ৪২৭ এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ৫২৬ ও ১৬৫ (৮ উইকেটে) পোর্ট অব স্পেনের ৫ম টেস্ট, ১৯৭০-৭১

একটি টেস্ট খেলায়
সেঞ্চুরী এবং দামল সেঞ্চুরী

১২৪ ও ২২০—সুনীল গাভাস্কার (পোর্ট অব স্পেন, ৫ম টেস্ট), ১৯৭০-৭১

দ্রষ্টব্য : আন্তর্জাতিক টেস্ট খেলায় এবিষয়ে আর এই একটি নজির আছে : কে ডি ওয়ালটার্স (অস্ট্রেলিয়া)—২৬২ ও ১০০ রান বিপক্ষে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, সিডনি, ১৯৬৮-৬৯

এক ইনিংসে
৪০০ বা তার বেশী রান

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ :

৬০১ (৮ উইঃ ডিক্লে), কিংস্টন, ১৯৬১-৬২

৫৭৬ কিংস্টন, ১৯৫২-৫৩

৫২৬ পোর্ট অব স্পেন, ১৯৭০-৭১

৫০১ (৫ উইঃ ডিক্লে), ব্রিজটাউন, ১৯৭০-৭১

৪৭৫ ব্রিজটাউন, ১৯৬১-৬২

৪৪৪ পোর্ট অব স্পেন, ১৯৬১-৬২

৪০৮ পোর্ট অব স্পেন, ১৯৫২-৫৩

ভারত :

৪৪৪ কিংস্টন, ১৯৫২-৫৩

৪২৭ পোর্ট অব স্পেন, ১৯৭০-৭১

৪২২ পোর্ট অব স্পেন, ১৯৬১-৬২

৪১৭ পোর্ট অব স্পেন, ১৯৫২-৫৩

দুই দলের অধিনায়ক

১৯৫২-৫৩ :
ভারত : বিজয় হাজারে
ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : জে বি স্টলমেয়ার

১৯৬১-৬২ :
ভারত : নরী কণ্ট্রাকটর
নবাব পতৌদি
ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : ফ্র্যাঙ্ক ওরেল

১৯৭০-৭১ :
ভারত : অজিত ওয়াদেকার
ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : জি এস সোবার্স

ভারত বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ
১৯৭৬ সালের টেস্ট খেলার তারিখ

১ম টেস্ট (ব্রিজটাউন) : মার্চ ১০—১৫
২য় " (পোর্ট অব স্পেন) : মার্চ ২৪—২৯
৩য় " (জর্জটাউন) : এপ্রিল ৭—১২
৪র্থ " (কিংস্টন) : এপ্রিল ২১—২৬
টেস্ট খেলার বিরতি : মার্চ ১২, মার্চ ২৬, এপ্রিল ৯ এবং এপ্রিল ২০

ভারতীয় ক্রিকেট দল

ভারতীয় ক্রিকেট দল তাদের ১৯৭৬ সালের ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরের প্রথম ও দ্বিতীয় খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ করে (উইন্ড ওয়ার্ড এবং লিওয়ার্ড দ্বীপপুঞ্জের বিপক্ষে)।

সফরের তৃতীয় খেলায় বার্বাডোজ দলের কাছে ভারতীয় দল শোচনীয়ভাবে ১০ উইকেটে হেরে গেছে। তৃতীয় দিনের চা-পানের দশ মিনিট আগে জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়ে যায়। খেলাটি কিন্তু চার দিনের ছিল। এখানে উল্লেখ্য, ভারতীয় দলের বিপক্ষে বার্বাডোজের এটা তৃতীয় জয়। এর আগে ১৯৬১-৬২ ও ১৯৭০-৭১ সালের সফরে ভারতীয় দলের বিপক্ষে বার্বাডোজ জিতেছিল।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ভারতীয় দল : ২১০ রান (৯ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড)। গাভাস্কার ৬২ রান। প্যাডমোর ৪২ রানে ৫ উইকেট)।

ও ১৫০ রান (এস আমরনাথ ৩৬ এবং এম অমরনাথ ৩৯ রান। ডোনিহোল ২৪ রানে ৪ উইকেট ৩২ রানে ২ এবং প্যাডমোর ১৩ রানে ২ উইকেট)।

বার্বাডোজ : ৩২০ রান (৯ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড)। জোসেফ নিউটন নিউটন ৮৪ এবং গিটম্যান ৬৩ রান। চন্দ্রশেখর ৯৪ রানে ৩ মদনলাল ৪৪ রানে ২ এবং ভেঙ্কটরাঘবন ২৯ রানে ২ উইকেট)।

ও ৩৮ রান (বিনা উইকেটে)।

CENTRAL LIBRARY

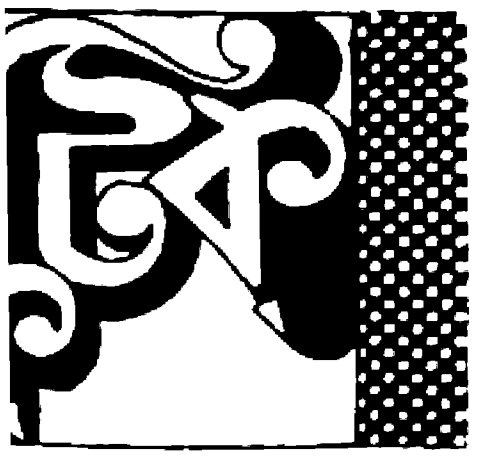

এল। আমায় দেখে বলল—যাদু
ক ডাকছেন। অর্থাৎ ছবি বিশ্বাস।
কে মধ্যে ধড়াস করে উঠল—অবার
?

ারিয়াতি যান। উনি না খেয়ে নাকি
আপনাকে খুঁজতে পাঠিয়ে দিতে
।

ামি ভয় ভয়।—ডাক; আমাই
ন।

। বিশ্বাসের মুখে তখন প্রসন্ন হাসি
দৃষ্টি।—এসো। আমার সঙ্গে তুমি
রে।

আমি নীরবে দাঁড়িয়ে—এ আবার
ডাকলেন।

ছবিদা সকলকে ডেকে দিলে
তুমি আজ কাজের কাজ করেছ। আমি স
তোমার প্রশংসা করছি। তুমিই সাবাসে ও
এসব দায়িত্বপূর্ণ কাজে মানব জোর যে
হয়তোই একজন না একজন নিশ্চয় ই
যাবে। বাপারটা কি জানো? আজ
ইচ্ছে করেই ওই ভুল কথাটুকু সবোজ
অসীম তোমাকে আর পরীক্ষা করছিল
দেখছিলাম কতটা তোমার মনের জো
গভীর, ভিতর গভীর। আমি সাতিসত্যিই
এতক্ষণ সবাইকে তাই বলছিলাম—

আমার একটু চোখে তায় জল
গেছে। যা দেখে ভাগ্যে মিটমিটে হা
হাসতে সকলেই আমার পিঠে হাত বু
দিলেন।

• • •

সে ছবির নাম নষ্টনীড়। ছবি কি
সেই ছবির প্রধান চরিত্রে বরাবর অ
করেছিলেন। অভিনয় সম্রাট ইন্দু
স্টুডিওতে শুরু এই ছবি শেষ
করেছিলেন আমার গুরুস্থানীয় পরি
নিরোপি নাগ।

অনিল গাঙ্গুলী পরিচালিত [illegible]

ছোট্ট সি রাস্ত
অশোককুমার, বিদ্যা সিনহা, অমল পালেকর

ফের থেকে বলছি

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সুধীন দেখতে পেয়েছিল আনন্দকে। হাসিমুখে আহ্বান করল ওকে। তারপর বলল—জীবনে দাঁড়াবার পথ খুঁজছেন বুঝি?

আনন্দ তখন কথা খুঁজে ফিরছে।

সহাস্যে সুধীন বলল—আসুন আমার সঙ্গে।

যেখানে আনন্দকে নিয়ে গেল সুধীন, সেখানে জুয়ো—ক্র্যাপ খেলা হচ্ছে। হাজার হাজার টাকার ছড়াছড়ি চারিদিকে। এখানে মদের আর সুন্দরী মেয়েদের বেশ জোয়ার দেখলাম।—আনন্দ বুঝল—এরা সবাই অ্যান্টিসোসাল। আর এই জায়গাটাই হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে সেই আড্ডার ওয়ার্ল্ড। যেখানে নীতি, বিবেক বা আদর্শের কোন বালাই নেই। নেই কোন মনঃসংযোগ।

অভাবের তাড়নায় ক্রমে সেই জগতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়ল আনন্দ। সুধীন ওকে বলল—বড় বড় পার্টিতে মেয়ে-মানুষ সাপ্লাই করতে পারলে তোমাকে মোটা টাকার কমিশন দেওয়া হবে আনন্দ। এতে অন্যায় কিছু নেই আনন্দ। আমরা সবাই বাঁচতে চাই। যা করছি—সব পেটের দায়েই করছি মনে করো, তাহলে বিবেক-টিবেকে আর আটকাবে না।

সেদিনের সেই মেয়েটির নাম কুন্তি। সে এখন নরীর ভাড়া খাটিয়ে রোজ-গারের পথ বেছে নিয়েছে, নিতান্ত নিরুপায় হয়েই। তারও অভাবের সংসার। বিধবা মা আর বোনের মুখে যে অন্ন তুলে দিতে হয় তাকে।

ক্রমে ক্রমে এই জগতের সঙ্গে আনন্দ অভ্যস্ত হয়ে পড়ল। ইংরিজীতে যাকে বলা হয় demi-monde অর্থাৎ মেয়েমানুষের দালাল—আনন্দ অনায়াসে তাই হয়ে উঠল ক্রমে। ভাঁটা চলতে লাগল, ওঠতে লাগল একের পর এক প্রাপ্তিযোগ। বাড়িতে বলল সে

মধ্যের হাসে ঘুপসে। ঘটনাচক্রে ঘুপসেটি ছিল অভিশপ্ত। তাই নীহাররঞ্জন গুপ্তের ওই কাহিনীটি সে-সময় পাঠক-মহলে যথেষ্ট সাড়া জাগিয়েছিল। গল্পটি পড়ে লিলীপদা সঙ্গে সঙ্গে কাহিনীর চিত্র-রূপ দেয়ার কথা বলেন তাঁর প্রযোজককে ঘিরে। তারপর নির্ধারিত সময়ে চিত্রগ্রহণ আরম্ভ হলো।

যে নর্তকী ওই ঘুপসের পারে ঘিরে পার্বতীর ঘিরেটারে নাচে—তার অপঘাতে মৃত্যু ঘটে। স্বয়ং আঙ্গি জয়ন্তী সেন এই ছবির এই নর্তকীর চরিত্রে রূপায়োপ করে-ছিলেন। ছবিতে তাকে শোচনীয়ভাবে মৃত্যু-বরণ করতে হয়—দেখানো হয়েছিল। এর পর এলেন পরের ভিকটিম—অন্য একজন সুন্দরী নর্তকী—ভরতনাট্যম, কথাকলি—সব রকম ক্লাসিকাল নাচে সে পারদর্শিনী। এই চরিত্র রূপায়িত করেছিলেন সাবিত্রী চট্টো-পাধ্যায়। আর এই ছবির নায়কের ভূমিকায় রূপ দিয়েছিলেন অশোককুমার।

এই গল্পটি জমিদারের চরিত্রে অভি-নয় করেছিলেন ছবি বিশ্বাস। এই জমিদার নাচ-গান বাজনার বড় বেশী আসক্ত। সুন্দরী রমণীর প্রতিও তার দুর্দমনীয় লোভ। একবার কাউকে ভাল লাগলেই হলো। বাস, জলে বলে বা কৌশলে তাকে সে সম্ভোগ করবেই। টাকার অভাব নেই। অভাব নেই লোকবলেরও।

জমিদার নবাগতা নর্তকীর নাচ দেখতে যেতো থিয়েটারে।

ঘেরা থাকে বক্স রাতিমতো ঘুপসে। সঙ্গে সঙ্গে ঘটে কাহিনীর আগমন যেন সাউ সাউ করে জলে উঠল। যেমনভাবে হোক—ওই রমণীকে চাই।

জমিদারের ইচ্ছানুযায়ী তার লোকজন একদিন স্টেজ থেকেই মেয়েটিকে রাতি-মতো জোর জবরদস্তি কিডন্যাপ করে নিয়ে গিয়ে হাজির করল জমিদারের বাগান-বাড়িতে। এটা তার ফুর্তির জায়গা। মদ, মেয়েমানুষ আর নাচ-গানের মাইফেল আসর বসলে হুঁস থাকে কিনা সময়ের কোন হিসাব থাকে না।

মতো কী বিষয়ে, ভয়ার্ত।

জমিদার তাকে ছাড়বে না।

শুরু হয় টানা-হ্যাচড়া। মেয়েটি ভয়ের চোটে আর্তনাদ করে ওঠে। চেঁচাও—চেঁচাও বাঁচাও।

জমিদার তখন করে কুটিল হেসে জানান দেয়—চেঁচিয়ে কোন ফল হবে না। বাইরে কেউ শুনতে পাবে না।

মেয়েটি অনুভব করে আজ আর তার কোন উপায় নেই। তবুও সে আশা ছাড়ে না। ছুটে ছুটে পালাতে থাকে। এ-ঘর থেকে সে-ঘর। বাইরে যাবার পথ বন্ধ। জমিদার হা হা করে হাসে।

মেয়েটি ছাদে ওঠবার সিঁড়ির সন্ধান খোলা পেয়ে উর্ধ্বশ্বাসে সিঁড়ি ভেঙে ছাদে উঠতে থাকে। মত্ত জমিদার টলতে টলতে তাকে অনুসরণ করে।

খোলা ছাদের মাথার ওপর তারাভরা গভীর আকাশ।

মেয়েটি ছটফট করতে থাকে। উত্তেজনায় সে হাঁফাচ্ছে।

সহসা সন্তর্পণে সে একেবারে ছাদের আলসে ঘেঁষে দাঁড়ায়।

জমিদার তখন ভয়ঙ্কর চেহারায় বুকে বাঁপিয়ে তাকে ধরবে বলে এগোচ্ছে।

মেয়েটির কণ্ঠে কাতর আকুতি—আপনার দুটি পায় পড়ি—আমায় ছেড়ে দিন—আমায় ছেড়ে দিন—দয়া করুন। অমনে—

—না, না, ছাড়ব বলে তোমায় এতকাণ্ড করে আমার বাগানবাড়িতে আনিনি সুন্দরী..

—না না—আমায় আপনি স্পর্শ করবেন না, খবরদার বলছি—

জমিদার অট্টহাসি হেসে ওঠে—আজ পর্যন্ত কেউ পার পায়নি আমার কাছ থেকে—আর তুমি তো সামান্য এক নর্তকী—

হাত বাড়ায় জমিদার। আর সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি এক পা পিছিয়ে যাবার চেষ্টা করে। একটা মর্মান্তিক চীৎকার—তিনতলার ছাদ থেকে মেয়েটি সোজা পা ফসকে নীচের বাগানে এসে সশব্দে আছড়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে সব শেষ।

(চলবে)

রঞ্জন মজুমদার

এখন একটা চাকরী পেয়েছে। রাতের দিকেই বেশী কাজ। কখনও বাড়ি ফিরতে দেরী হলে মা যেন আবার দুশ্চিন্তা না করেন।

সুধীন প্ল্যান দিল শুধু কুন্তি, শীলা আর মিস পারেলালের দিয়ে এই সাবজেক্ট লাইন বাঁচিয়ে রাখা যাবে না, আরও নতুন ফেস্ আনতে হবে। চোখ ঝলসানো রূপসী, উচ্চ সোসাইটি, মধ্যবিত্ত ঘরের শান্তশিষ্ট, ঘরোয়া—এ সবই একে একে সাপ্লাই লাইনে এনে ফেলতে হবে। নানারকম ফন্দির। তাদের ভিন্ন ভিন্ন রুটী। কোপ বুঝে কোপ মারতে পারলে মোটা টাকা কমিশন আসবে।

কালীঘাটের এক দাদুন অভাবের সংসারের মেয়ে জয়ন্তী। যৌবন দেহে এসে রূপান্বিত করে গেছে, কিন্তু স্বপ্ন-সাধ সবই থাক অপূর্ণ। ছেঁড়া শাড়ি আর ব্লাউজ পরে কাটে তার দিন। পেটভরে দুবেলা হয়ত খাওয়াও জোটে না। বাবা হরিপদ একটি ছোট সওদাগরী অফিসের অল্প মাইনের কর্মচারী। দারিদ্রের হাত থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যেই হয়ত হরিপদবাবু প্রায়ই রেসের মাঠে যায়—ভাগ্য পরীক্ষা করার জন্যে। কিন্তু প্রতিবারই হাতিমুখে করে ফিরতে হয় তাকে—কপর্দকশূন্য অবস্থায়।

সেই জয়ন্তী বিকেলে দারিদ্রের সংসার থেকে একরকম পালিয়ে গিয়ে রাস্তায় রাস্তায় বেড়াত। দোকানের শো-কেসে নতুন নতুন ডিজাইনের শাড়ী আর রঙীন কাপড়জামা দেখে বেড়াত। দেখতে ঐশ্বর্য উথলে পড়া সাবেশা মানুষের শৌখিন দামী দামী গাড়ী, দোকানে দোকানে খাবার, ভোগের নানা উপাচার। দু চোখ ধাঁধিয়ে যেত যেন জয়ন্তীর। বুকভাঙ্গা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলত সে গোপনে।

ঘটনাচক্রে সেই জয়ন্তীর সঙ্গে আনন্দর হঠাৎ যোগাযোগ ঘটে গেল।

আনন্দর সন্ধানী চোখ তখন এইরকম বয়সের সুন্দরী মেয়ে খুঁজে ফিরছিল। সুধীন বলেছিল—ইন্টিমেট হও। একটা শিকার ডাঙ্গায় তুলতে হলে তার চল ঢিল স্টোপ দিতে হয়। টাকা যা প্রয়োজন আমি সব যোগান দিয়ে যাব, সময়মত তুমি প্রেজেন্ট হাজির করলেই তোমার ন্যায্য পারিশ্রমিক পেয়ে যাবে।

আনন্দর ব্যবহারে জয়ন্তী মুগ্ধ। গাড়ীটাকে সে আসল সোনা বলে ধরে নিয়েছে। কোথও এতটুকু সন্দেহের অবকাশ রাখেনি আনন্দ। প্রেমিকের ভূমিকায় সে সহজে ভদ্রলোক ধীরে ধীরে জয়ন্তীর কাছে এগিয়ে গেছে। একজন নিপুণ অভিনেতারই মত। জয়ন্তীর বাড়িতে আনন্দ নিজেকে ধনী জমিদারের ছেলে হিসাবে কৌশলে প্রতিষ্ঠা করেছে; জয়ন্তীর মায়ের শ্রদ্ধা অর্জন করেছে। মা ভেবেছেন ঈশ্বর বুঝি এবার সত্যিই মুখ তুলে চাইলেন এমন ছেলেকে জামাই হিসাবে তিনি যেন কল্পনাও করতে পারেন না। দেশের বাড়ি দেখবার জন্যে জয়ন্তীকে আনন্দ নিয়ে গেছে এমন একটা ব্যবস্থাও করেছে যেখানে আনন্দও আগে কখনও যায়নি। সবটাই ঘটেছে সুধীনের পরিকল্পনায়। আর এই কলকাতার বাইরে যাওয়াটাই শেষ পর্যন্ত কাল হয়ে দাঁড়াল ঘটনাচক্রে। জয়ন্তীর সরল প্রেমের অভিব্যক্তিতে আনন্দ হঠাৎ নিজেকে হারিয়ে বসল। নিজের মধ্যে এই প্রথম সে সুতীব্র দংশন অনুভব করল। এবং সঙ্গে সে আবিষ্কার করল যে সত্যিই সে জয়ন্তীকে ভালবেসে ফেলেছে

উপায়?

ওরা কলকাতায় ফিরল।

সুধীন এবার তার পাওনা বুঝে নেয়। মিঃ সেনাই নামে একজন এসেছে অমুক হোটেলে। সে যে আন্তর্জাতিক বিনিময়ে আনাকোণ্ডা খুঁজছে। তুমি আজই রাতে ওর ঘরে ঢুকিয়ে দাও।

আনন্দর মাথায় যেন বাজ ভেঙে পড়ে। সময় চেয়ে নেয়।

আনন্দ পাগলের মত কুন্তির পরামর্শের জন্যে ছুটে যায়। সুধীন তার আসল সম্পর্কের কথা বলে। আনন্দ এখন চায়—বদলী কুন্তি অপারগ। তার স্ত্রীর অসুখ

জয়ন্তীর বাবা ওদিকে এক কাণ্ড বসে আছে। অফিসের ক্যাশ রেস খেলতে গিয়ে সে এখন ভীষণ মেয়েকে এসে বলে—তুই আনন্দর থেকে টাকা এনে আমাকে অন্ততঃ হাজত থেকে বাঁচা। কাল সকালেই যদি অফিসের ক্যাশের টাকা জমা না পড়ি তো ওরা আমায় পুলিশে দে

আনন্দর মা বলেছেন—ডাক্তার গোছে ওঁকে বাঁচাতে হলে অনেক ও কিনতে হবে—ভাল ভাল ফুড খ হবে। এর জন্যে অনেক টাকা চাই।

শুভমুক্তি ঃ ১৯শে মার্চ ঃ শুক্রবার

নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতে ভরা আজকের জীবন-জিজ্ঞাসা?...

রাধা ঃ পূর্ণ ঃ প্রাচী পদ্মশ্রী - পার্বতী - মণিপুরী - জয়শ্রী - কল্যাণী - বৃন্দাবনী - মানসী ও অন্যান্য

বাবাকে বাঁচাতে জয়ন্তী গিয়েছিল আনন্দর খোঁজে—সেই হোটেলে। গিয়ে জানলো পড়ল সুধীনের খপ্পরে।

ওদিকে জয়ন্তীকে বাঁচানোর জন্যে আনন্দ তখন হন্যে হয়ে বদলী মেয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

এদিকে বলিদান সমাপ্ত। মিঃ সেনাইয়ের ঘর থেকে বমিরতা জয়ন্তী টলতে টলতে বাইরে এসে দাঁড়াল. তার হাতে তখন সুধীন গুঁজে দিয়েছে এক হাজার টাকা। হঠাৎ যে কি হয়ে গেল জয়ন্তী তখনও যেন ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। বাড়ি ফিরে যাবার হাতে টাকাগুলো ফেলে দিয়ে জয়ন্তী নিজের ঘরে ঢুকে বালিশে মুখ রেখে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল—আজ এ তার কি হয়ে গেল।

হোটেলে ফিরে যখন সুধীনের মুখে শুনল যে জয়ন্তী এখানে এসেছিল. মিঃ সেনাইকে যথারীতি সঙ্গ দিয়ে সে হাজার টাকা নিয়ে বাড়ি ফিরে গেছে—তখন চীৎকার করে উঠল আনন্দ। বুঝতেই পারল যে সে ধূর্ত সুধীনের কূট চালের কাছে নিদারুণ ভাবে হেরে গেছে। সুধীন মিটি মিটি হেসে ওকে বোঝাল—প্রেম-ট্রেম সব বোগাস আনন্দ, আসল ওসব সোল্ট-মেন্টের অনেক উর্ধ্বে—পৃথিবীতে টাকাই সব—টাকা ছাড়া বাঁচার কোন পথ খোলা নেই—

সেদিন রাত্রেই পুলিশ হানা দিল জয়ন্তীর বাড়িতে। তার মিঃ সেনাইয়ের খোঁজে এসেছে। জয়ন্তী মিথ্যে করে বলল. সেনাই নয়. সে হোটেলে আনন্দর সঙ্গে ছিল, ৩৫ নম্বর রুমে—

পুলিশ তৎক্ষণাৎ হোটেলে হানা দিল। মত্তাবস্থায় আনন্দকে ধরেই পাওয়া গেল। আর ঘর সার্চ করে পাওয়া গেল অনেক সোনার বিস্কুট। কিন্তু আসল আসামী মিঃ সেনাই ততক্ষণে পুলিশের নাগালের বাইরে সরে পড়েছে। পুলিশ দেখে গেছে আনন্দর ঘরে—আনন্দর জন্যেই। পুলিশ তখন আনন্দকেই গ্রেপ্তার করল বে-আইনী সোনা স্মাগলিং করার অপরাধের অভিযোগে। আনন্দ নিজেকে কিছুতেই নির্দোষ প্রমাণ করতে পারল না। ফলে তার কারাদণ্ড হয়ে গেল।

জেল থেকে যখন সে জেল খেটে বেরিয়ে এলো দেখল পৃথিবী তার নিজের নিয়মেই এগিয়ে চলেছে. সব কিছুই অটুট রয়েছে. বদলে গেছে শুধু জয়ন্তী। জয়ন্তী এখন লাইনের মক্কেলদের মেয়ে। সংসার বাঁচাতে তাকে পাপের পথেই শেষ পর্যন্ত পা বাড়াতে হয়েছে—সুধীনেরই সুচারু ব্যবস্থাপনায়।

আনন্দ ওকে ফেরাবার চেষ্টা করল. কিন্তু তখন সব দেরী হয়ে গেছে। ফেরার পথ [illegible] জল নিয়ে [illegible] নেই. [illegible] অমরও কোন দোষ নেই. কিন্তু ভাগ্য চক্রে আমরা আজ বিচ্ছিন্ন। তুমি আর আমার পবে না এই কলুষিত দেহ-মন নিয়ে আমি আর তোমার স্ত্রী হতে পারি না। তুমি আমার ভুল বুঝো না—সেদিনের সেই পবিত্র ভালবাসাই বেঁচে থাকুক. চলার পথে ওইটুকুই হবে আমার জীবনের একমাত্র সম্বল.....

হতাশায় ভেঙ্গে পড়া আনন্দ চেষ্টা করল আত্মহত্যা করতে। কিন্তু পারল না। ওকে বাঁচাল সেই কমল। টেনে নিয়ে গেল নিজের কাছে। জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করল সে আনন্দকে।

আর জয়ন্তী?

পরিচালক সত্যেন ব্যানার্জি বললেন—ঈশ্বর মানুষকে সব দিয়েছেন। দেন নি শুধু তিনটি জিনিস। জন্ম বিবাহ এবং মৃত্যু। এই তিনে রইল তিন। ঈশ্বরই শেষ পর্যন্ত জয়ন্তীকে পৌঁছে দিলেন আনন্দের সান্নিধ্যে। মুসাফির—আমার এই গল্প বিয়োগান্ত নয়. মিলনান্তক। হ্যাঁ, শেষ পর্যন্ত আনন্দর সঙ্গে জয়ন্তীর মিলন দৃশ্যের মধ্যেই আমার ছবির সমাপ্তি।

ছবিতে অভিনয় করছেন রঞ্জিত মল্লিক সুমিত্রা মুখার্জি দিলীপ রায় জ্ঞানেশ মুখার্জী গীতা দে সন্ধ্যা রায়চৌধুরী পার্থ, মুখার্জী কুমার শঙ্খলেী জহর রায় প্রভৃতি। সঙ্গীত চিত্রগ্রহণ সম্পাদনা ও শিল্প নির্দেশনা করছেন যথক্রমে হেমন্ত মুখার্জী শৈলজ দাস বৈদ্যনাথ চ্যাটার্জী এবং সুব্রত চ্যাটার্জী।

মুসাফির

বিশ্বাসঘাত

প্রযোজনা : জনি বকসী ও

মহেশ ভট্ট

এক স্মাগলার কিং দিনের পর দিন প্রতিপক্ষকে ঠকিয়ে, নিজেদের প্রতাপ ও প্রতিপত্তি বাড়িয়ে চলছিল। কিন্তু এই স্মাগলার কিং-এর প্রধান বাধা হিসেবে উপস্থিত হোল, বিদেশ থেকে ডিগ্রী নিয়ে আসা নিজের ছেলে। তাও বেশ কিছুদিন অন্ধকারে ছিল, তাঁর পিতার গোপন অর্থ ব্যয়ের হিসাবের ব্যাপারে। প্রতিপক্ষ যখন কোন উপায়ে কিং-এর দলকে পরাজিত করতে পারলো না, তখন বিদেশ থেকে তাঁর ছেলেকে ডেকে পাঠালো। সে ফিরে এসে বুঝলো কিং-কে জব্দ করতে হলে, তাঁর একমাত্র পুত্রকে পিতার অবৈধ কার্যাবলী সম্পর্কে অবহিত করতে হবে। ছেলে সব কিছু জানতে পেরে পিতার সংসর্গ ত্যাগ করে, মনের মানুষ সীমাকে নিয়ে পৃথকভাবে ঘর বাঁধলো।

কিং এবার পুত্রের মন থেকে ভুল বোঝা-বুঝি চিরতরে দূর করবার জন্যে প্রতিপক্ষের সঙ্গে সন্ধি করতে গিয়ে নিহত হলো। কুচক্রীরা তখন মা. ছেলে ও তাঁর সন্তান সম্ভবা স্ত্রীকে হত্যা করার জন্যে ওদের আক্রমণ করে। জীবন দিয়ে যুদ্ধ করে কুচক্রীকে নিহত এবং তার ছেলেকে আহত করলো কিং-এর সুযোগ্য পুত্র।

কাহিনীকার ও পরিচালক মহেশ ভট্ট আগের ছবির মতো (মঙ্গলাল আওর হি হ্যায়) এ ছবির মূল কাহিনীর অনুপ্রেরণা পেয়েছেন পশ্চিম ইউরোপের ও ব্রিটিশ ছবি থেকে। পশ্চিমী ও ভারতীয় স্থান কাল ও পাত্র যে ভিন্ন ভিন্ন, সেটা বুঝলে আবার নতুন উদ্যমে গতানুগতিক কাহিনীকে প্রাধান্য দিতেন না। তবুও কাহিনীর দুর্বলতা, কষ্টবানুগ পরিচালনা ও অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করেছেন। অভিনয়ে পিতা ও পুত্রের দ্বৈত ভূমিকায় অবিস্মরণীয় অভিনয় করেছেন সঞ্জীবকুমার। (সীমা)র ভূমিকায় শাবানা আজমী. (সহযোগী) সতীন কাপুর. (কুচক্রী) মদন পুরী এবং (কুচক্রীর ছেলে) কবীর বেদীর অভিনয় মন্দ নয়। সঙ্গীত পরিচালনায় আর ডি বর্মণ তাঁর সুনাম অক্ষুণ্ন রাখার চেষ্টা করেছেন। ফটো-গ্রাফীর কাজ বেশ উন্নত।

চিত্রদূত

লখনৌ-এ চাঁদের কাছাকাছি ছবির সুটিং

বাদল পিকচার্সের নতুন ছবি চাঁদের কাছাকাছি-র দশ দিনের সুটিং হয়ে গেল সম্প্রতি লখনৌ-এ। সুটিং-এ অংশ গ্রহণ করেছিলেন উত্তমকুমার ও মিঠু মুখার্জী। ছবির অন্যান্য ভূমিকায় আছেন সত্য বানার্জী, অনুপকুমার, তরুণকুমার, চিন্ময় রায়, সন্তু মুখার্জী, শিপ্রা মৈত্র, কণিকা মজুমদার, ও গীতা দে।

রবীন চ্যাটার্জীর সুরে কণ্ঠদান করেছেন আরতি মুখার্জী। গীতিকার গৌরী প্রসন্ন মজুমদার।

চাঁদের কাছাকাছি আগামী আগষ্ট মাসে শ্রীমা চিত্র পরিবেশক-এর পরিবেশনায় মুক্তিলাভ করবে বলে স্থির আছে।

দীঘায় দিন আমাদের ছবির সুটিং

শঙ্কর চট্টোপাধ্যায় রচিত ও অগ্রদূত পরিচালিত দিন আমাদের ছবির সম্প্রতি সুটিং হয়ে গেল দীঘায়। ছবির চিত্রনাট্য লিখেছেন অমর ভট্টাচার্য এবং গান লিখেছেন সুনীলবরণ। আউটডোর সুটিং-এ অংশ গ্রহণ করেছিলেন রঞ্জিত মল্লিক, রীতা ভাদুড়ী, কল্যাণ চ্যাটার্জী, মিস জেমিকো প্রমুখ শিল্পীরা। এছাড়া এ ছবিতে অভিনয় করেছেন কমল মিত্র, তরুণ কুমার, গীতা দে, জহর রায়, কানু অভয় বানার্জী।

হেমন্ত মুখার্জীর সুরে গান গেয়েছেন হেমন্তবাবু স্বয়ং ও হৈমন্তী শুক্লা।

ছবিটির পরিবেশক দাক্ষায়ণী পিকচার্স।

CENTRAL LIBRARY

দিলীপ রায়

কিছুক্ষণ

কথা হচ্ছিল তৃপেন হাজারিকার সঙ্গে রবীন্দ্র সদনের সাজঘরে। বিষয় দিলীপ রায়।

—দিলীপ তো আমার পুরান দোস্ত। সতী বেহুলার আমরা দুই লখিন্দর! হেসে ফেলেছিলেন কথাগুলো বলে।

আজ আর কজনের সতী বেহুলা' ছবির কথা মনে আছে জানি না, কিন্তু সেই লখিন্দর আজ দিলীপ রায় হয়ে পরিচিত।

ফিল্ম জগৎ ছাড়েন নি, অভিনয় তো নয়ই। মাইথোলজিক্যাল ছবির নায়ক আজ মহৎ ওস্তাদ কয়েছেন সোস্যাল ছবিতে।

'আকির্ড'ব' ছবির আউটডোর সুটিংয়ে দেখা হতে দিলীপ রায় বলেছিলেন—কি ব্যাপার...

কথোপকথন একটু দূরে এগোবার আগেই শট দেবার জন্য ডাক পড়েছিল তাঁর। সুব্রতা ছিলেন দিলীপবাবুর কো-আর্টিস্ট. একটা রোমান্টিক প্রেমের দৃশ্য। বেহুলা-লখিন্দর নয় আজকের টপরগে তাজা দুই তরুণ-তরুণীর হালকা মনের গভীর প্রেমালাপ।

কদিন বাদে এক শীতের সকালে বাড়ীতে হাজির হতে সহাস্য অভ্যর্থনায় বললেন—

—কিছুক্ষণ কাটাতে বুঝি!

লুচি আর পাঁপরভাজিতে আলসেমির ছোঁয়া, চোখে চেহারায় আগের রাতের ক্লান্তি কেননা অভিনেতৃ সংঘের নাটক ছিল। উপরন্তু, সংঘের গ্র্যান্ড সেক্রেটারী হিসাবে সদ্যসমাপ্ত নাট্যোৎসবের কাজে তাঁর ওপর দিয়ে ধকল কম যায় নি। ক্লান্তি আর আলসেমি তাই যমজ ভাই-এর মতো দিলীপ রায়ের দেহে ভর করছিল সেদিন।

বসবার ঘরখানায় বিভিন্ন রূপে দিলীপ-কে দেখে মোদ্দা কথা প্রতিনেপিস পেয়েছে 'চোরাবালীর শংকর'। আর সরকারী মানপত্র-খানি রয়েছে দেরাজের একবারে মাঝখানে। ('ভাগ্নি সিরাজের বেগম' ছবিতে শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেতার পুরস্কার পেয়েছিলেন তিনি)।

সরকারী খেতাব পাবার পর দিলীপ-বাবুকে চাহিদা যতখানি বাড়া উচিত ছিল অবশ্য তা হয়নি। মিনার্ভার 'প্রজাপতি'তে সুবেদারের জন্যও তিনি পুরস্কৃত হয়েছেন. কিন্তু এখনও পরিবেশকদের কাছে দিলীপ রায়ের নাম তেমন লোভনীয় বলা যাবে না।

একটা সময় গেছে যখন তিনি তপন সিংহের ছবিতে একাদিক্রমে কাজ করে গেছেন। বিশেষ করে 'হাঁসুলী বাঁকের উপ-কথায়' করালী চরিত্রে দিলীপবাবুর চরিত্র চিত্রণ এখনও বোধ হয় অনেকের মনে আছে।

: এখন আর তপন সিংহের ছবিতে কাজ করেন না কেন?

অভিযোগের উত্তর নয়, হাসিমাখা মুখে বললেন—উনি ডাকলে তো ছবি করব। বলছেন না তাই করছি না।' এই সরল উত্তরের মধ্যে কোনো অভিমান লুকিয়েছিল কিনা বুঝতে পারিনি। তবে থাকাটা কিন্তু অস্বাভাবিক নয়।

জীবনের উত্থান-পতন সব কিছুকেই স্পোর্টিংলি নেবার অসাধারণ ক্ষমতা আছে দিলীপ রায়ের। কোনো অবস্থাতেই ভেঙ্গে পড়েন না। মাঝখানে এমন একটা সময় গেছে যখন তাঁর হাতে ছবি ছিল খুবই কম। তখন নিজের দল নিয়ে নাটক করেছেন শহর শহরতলীতে, গঞ্জে-গাঁয়ে। এত ঘোরা অভিনয়ের কারণ অবশ্যই একমাত্র অভিনয়-প্রীতি নয়, খেয়ে পরে বেঁচে থাকার চিন্তাও ছিল।

অবশ্য এখন আর সেদিন নেই। ছবির সংখ্যা তাঁর দিনকে দিন বাড়ছে বই কমছে না।

পরিবেশক মহলে দিলীপ রায়ের নাম এখন লোভনীয় নয় বটে কিন্তু কোনো ছবির শিল্পী তালিকায় তাঁর নামটি এখন আর একবারে ফেলনা নয়।

বললাম—এতদিন অভিনয় করছেন, 'হিরো হবার সুযোগ প্রায় পেলেনই না। কোনো দুঃখ নেই সেজন্য?'

জ্বলন্ত সিগারেটটি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে কি উত্তর দেবেন বোধ হয় ভাবলেন একটু। চোখের ওপর ঝুঁকে পড়া চুলগুলোকে আরেক হাতে সরিয়ে দিয়ে স্পোর্টিং স্পিরিটের হাসিটা ছড়িয়ে দিলেন মুখে।

—দর্শকের অ্যাপ্রিসিয়েশন পাচ্ছি, আর কি চাই? হিরো না করলে ক্ষতি কি?

বুঝলাম এ ক্ষেত্রেও চাপা অভিমান আছে। হিরো হবার বাসনা প্রবল। আর তা হবে নাই বা কেন?

: কেন কোন নেই বলছেন তাহলে? —আমার পাল্টা প্রশ্ন।

এবারে হাসির মধ্যে সেই চাপা অভিমানের ছাপ স্পষ্ট। কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বললেন না।

শুধু এটুকু জানালেন—আশা এখনও ছাড়িনি।'

সঙ্গীতের প্রসঙ্গেই আলোচনা করতে গিয়ে স্বদেশ সরকারের 'নন্দিতা' ছবির কথা এল। এই ছবিতে দিলীপবাবুর রোলটাকে এককথায় আন্টি হিরো বলা যায়। এক ভদ্রলোক মুসলমান চরিত্র। নাম নুরুদ্দিন। ভালবাসত একটা হিন্দু মেয়েকে (সুব্রতা) কিন্তু ওদের বিয়ে হলো না। ব্যর্থ প্রেমিকের এই চরিত্রের মধ্য দিয়ে পরিচালক নাকি গ্রামের একটা ছবি তুলে ধরেছেন পর্দায়।

দিলীপ রায় নিজেও এই চরিত্রটি সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত। এতদিন বাদে মনের মত একটা রোল পেয়ে তিনি কাজও করছেন নাকি দারুণ। বললেন—নুরুদ্দিনকে আমার জীবনের একটা উল্লেখযোগ্য চরিত্র বলতে পারো।'

অবশ্য সেই সঙ্গে অসাধারণ ছবির প্রমজিস্টেন্ট চরিত্রটি সম্পর্কেও তিনি খুশী।

ইতিমধ্যে দেখি দিলীপবাবুর ভাইপো কখন একখানা ছোট্ট টেপ-রেকর্ডার রেখে গেছেন সামনের টেবিলে।

—কি ব্যাপার? আপনার গান আছে নাকি এতে?

সিগারেটটা নিভিয়ে টেপের সুইচটা অন করে মুচকি হাসলেন। টেপ থেকে যেন ছেলেমানুষী গলায় গান ভেসে এলো। বেসনাতুর সুর, কথাও তেমনি। 'কেন এমনি করে আছ আমারই মন ভরে..' ওটা শেষ হতে আরেকটা গান একটু চটুল লয়ে, হালকা মেজাজে—'তাহলে দেখটা কোথায় আমার, যদি কহে আসি একে অপরকে ভালবাসি।...' গলা কিন্তু একই জনের।

গান বন্ধ হতে তিনি বললেন—'নন্দিতা ছবির গান, ছবিতে অমিই গেয়েছি।'

: আর এই টেপ?

—হেমন্ত মুখার্জী, সুর মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

ছবির হিরো নন দিলীপবাবু। আন্টি হিরো। তার আবার দু-দুখানা গান। সুতরাং হারানো লখিন্দর—দিলীপ রায়, নুরুদ্দিন হয়ে আসর জমাবেন এটা প্রায় স্বতঃসিদ্ধ। মজার ব্যাপার হিরো সৌমিত্রবাবুর মুখে বোধ হয় কোনো গান নেই। (কিন্তু শম্ভু ভট্টাচার্যের সঙ্গে বেসুর মারপাঁচ আছে।) সুতরাং দিলীপ রায় নন্দিতাতে ক্যান্টর করবেনই।

এখন মনে হচ্ছে—হিরো না করলেও এমন সুন্দর চরিত্র যদি পাওয়া যায় তাহলে আর দিলীপবাবু নায়ক সাজবেন কেন? নায়ক হওয়া মানেই তো অনেক বাড়তি ঝক্কি ঘাড়ে নেওয়া। দিলীপবাবুর প্রয়োজন কি হিরো সেজে, ভালো চরিত্র বেছে নিলে তাহলেই খুশী সবাই।

কিন্তু সে উপায় কি আছে? ফিল্ম লাইনের নানা পলিটিক্স এখন আর্টিস্টদেরও জড়িয়েছে। বেঁচে-বর্তে থাকার জন্য অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাই অনেক ভাজে-বাজে চরিত্রও নিতে হয় অনেককে। দিলীপ রায় তাঁর থেকে একবারে ভিন্ন চরিত্রের সে-কথা বলা যায় না কিন্তু এঁদের মধ্যেও তিনি এটুকু বাছতে পারেন যে চরিত্রটিতে তিনি কতখানি সুট করবেন সেটা ভেবে নেন।

তাই বাংলা ছবির হাজার ভিড়ে ভক্তবলি-হাতে রইল তিন—সানাই—আগুনের ফুলকি — পরস্ত্রী—আবির্ভাব ইত্যাদি কয়েকখানা ছবিতে এখন তিনি কাজ করছেন।

: আর নাটক?

—মিনার্ভা তো বন্ধ। বিনা দ্বিধাতেই বললেন—'প্রজাপতির সেলও বেশ পড়ে গিয়েছিল তাই বন্ধ করতে হোল।'

তবে প্রেমাংশু-কালী-বাসবী-অজিত প্রমুখদের নিয়ে গড়া নিজেদের দল নদরত্ন নিয়ে বাইরে বেরোচ্ছেন মাঝে মাঝে। অভিনয় চলছে।

বাসবীর কথা উঠতেই বললাম—'কোন কোন কাগজে খবর বেরিয়েছিল আপনি নাকি বাসবীকে বিয়ে করেছেন— আবার নাকি ডিভোর্সও হয়েছে। ব্যাপারটা কি?'

উচ্চকিত হাসিতে ঘরখানা ভরে উঠল। বিস্রস্ত চুলগুলো দু হাতে সরিয়ে দিলীপ রায় কিছুক্ষণ হাসলেন। তারপর প্যাকেট থেকে সিগারেট বার করে বললেন—'এরা সব পারেও বটে!' আবার সেই সশব্দ হাসি। তাঁর এই হাসিই বলে দিল—'গুজব ছড়ায় যারা, গুজবে কান দেবেন না, গুজব ভয়ঙ্কর।'

নির্মল ধর

হরেন গাঙ্গুলী

বয়স ষাট। চামড়া কোঁচকাতে শুরু করেছে এবং বয়সের ভারে একটু নুব্জ দেহ। কিন্তু কর্মক্ষমতায় এখনও জোয়ানের ধাড়া। ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওর চীফ ইলেকট্রিশিয়ান হরেন গাঙ্গুলী নইলে সেই ১৯৪৬ সাল থেকে এতদিন ঐ একই পদে থাকতে পারতেন কি?

যে কোনো সেটের আলো দেখলেই বোঝা যায় এটা হরেনদার কাজ। স্টুডিও মহলে অন্যতম প্রবীণ কুশলী হিসাবে তাই তিনি এখন প্রায় সকলেরই শ্রদ্ধার মানুষ।

বড়ুয়া সাহেব যখন দেবদাস (১৯৩৩-৩৪) তুলছেন তখন তিনি ঢুকেছিলেন নিউ থিয়েটার্স পানু সিংহের অ্যাসিস্ট্যান্ট হয়ে। বাটা কোম্পানীতে একশ চব্বিশ টাকা মাইনের চাকরী ছেড়ে মাস মাইনে পঞ্চাশ টাকার কাজ নিয়েছিলেন ফিল্ম লাইনের আকর্ষণে নয়। ঢাকুরিয়া থেকে শ্রীরামপুরের বাটার কারখানায় যাওয়াটাই তখন ছিল প্রধান সমস্যা। স্টুডিওর কাজ করার পরও বাইরের কাজটাজ করে বাড়তি কিছু পয়সা রোজগারও হতো তখন।

বছর আষ্টেক ছিলেন ওখানে। বড়ুয়া—নীতিন বসু—প্রমাঙ্কুর জাতথী—কণী মজুমদার—দেবকী বসু প্রমুখ বিখ্যাত পরিচালকদের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে হরেনদার। তখনকার মানুষগুলো সম্পর্কে তিনি প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

—বলব কি ভাই তখনকার মানুষগুলোই ছিল আলাদারকমের। কোনো শট টেক হবার পর আমাদের মতামত চাইতেন অনেক সময়। এখনকার ডিরেকটররা তো আমাদের বোধহয় সেই চোখে দেখেনই না। —একটু ক্ষুব্ধ যেন।

বিয়াল্লিশ সাল নাগাদ কর্মচারীদের এক দাবীদাওয়ার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতবিরোধ হওয়ায় ছেড়ে দিলেন স্টুডিও। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মোশন পিকে কাজ পেতে দেরী হয়নি। ভাইস-চ্যান্সেলার নিজের তত্ত্বাবধানে তাঁকে কাজ দিয়েছিলেন।

কাটল বছর চার। তারপর তারই এক সতীর্থ কালকাটা মুভিটোন স্টুডিও যখন তৈরী করলেন ডাক পড়ল হরেনবাবুর। এবার আর অ্যাসিস্ট্যান্ট নয়, সরাসরি চীফ ইলেকট্রিশিয়ান। সেই থেকে এখনও আছেন।

পঞ্চাশ টাকা মাইনে এখন দাঁড়িয়েছে সাকুল্যে তিনশ পঁচিশ টাকায়। চার ছেলে (একমাত্র মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন) আর ঘড়োঘড়ীর সংসারে হরেনবাবুর এই আয় খুবই সামান্য।

: বাইরের কাজ করেন না?

—খুব কম। কয়েকটা জায়গায় বাঁধা কাজ আছে তাতেই চলে। এই শরীরে আর পেরে উঠি না।

ভাগ্যিস ঢাকুরিয়ায় মাথা গোঁজবার ছোট্ট এটা ঠাঁই আছে নইলে আজ এই আকার দিনে কি হতো তা ভেবে তিনি নিজেও শঙ্কিত। তবে দু ছেলেকে কাজে ঢুকিয়ে দিয়েছেন — এটাই একমাত্র ভবিষ্যৎ সান্ত্বনা।

নিরীক্ষিৎ

বাচ্চাদের বড়সড় করে গড়ে তুলুন ইনক্রিমিন* দিয়ে

এদের দুজনের বাচ্চার বাড়বৃদ্ধি টিকমত হওয়া একান্ত দরকার। এই সময়ে তাকে ইনক্রিমিন ড্রপস দিচ্ছেন দেখছেন। তারপর দেখছেন ওর খাওয়ার আগ্রহ! খাওয়া নিয়ে আলাদা তো দুশ্চিন্তা কথা, খিদে বেড়ে গিয়ে যেমন খুশি হয়ে যাবে তেমনি চেহারা বেড়ে উঠবে। ইনক্রিমিন উপকারী ভিটামিনে ভরপুর তো বটেই, তার চেয়ে বড়কথা— এতে যে বিশেষ অ্যামিনো অ্যাসিড, লাইসিন আছে—তা আপনার বাচ্চাকে খাবারের পুরো পুষ্টি গ্রহণ করতে সাহায্য করে।

ইনক্রিমিন টনিক ড্রপস্—২ মাস থেকে ২ বছরের বাচ্চাদের জন্যে
সিরাপ—১৪ বছর পর্যন্ত বয়সের বাচ্চাদের জন্যে

বাড়তি আহারকে বাড়তি বৃদ্ধিতে পরিণত করে

ডাক্তারদের কাছে নির্ভরযোগ্য নাম—সায়নামিড ইণ্ডিয়া লিমিটেডের একটি বিভাগ

আমেরিকার সায়নামিড কোম্পানীর রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক।

Sista's-INC-264(-2000.0)

বাঙ্গালী ছবি

কয়েকটি ক্লাসিক আমেরিকান ছবি

কলকাতায় এখন আর তেমন উত্তেজনা বা স্মরণীয় বিদেশী ছবি দেখা যায় না বলে অনেক দর্শক খেদ করে থাকেন। কথাটা আদৌ মিথ্যে নয়। এক দশক আগেও এখানে বহু স্মরণীয় ছবি দেখানো হোত। কিন্তু এখন হয় না। তার একটা বড় কারণ বিদেশী ছবি আমদানীর ব্যাপারে সরকারী কড়াকড়ি। এছাড়া বোধ হয় ছবি তৈরীর চিন্তার ধর্মও পাল্টে যাচ্ছে দ্রুত। যার জন্য ক্লাসিক সাহিত্য ভিত্তিক ছবি তৈরীর সংখ্যাও কমে আসছে।

পৃথিবীর সর্বত্রই এখন ক্ষয়েকী নব্য চিন্তার ঢেউ। এছাড়া সেক্স, ক্রাইম, প্যাশন, রাবারি, হরর, বস্তু জাতীয় বই এবং সর্বোপরি হিংস্র (যার সঙ্গে অনিবার্যভাবে লড়া সুরের সেক্স থাকবেই) জাতের ছবি তোলা হচ্ছে। অর্থাৎ যার মাধ্যমে ব্যবসা করছে বৃহৎ এক শ্রেণীর চিত্ত-ব্যবসায়ী। এর মধ্যে অনেক ছবিকে আবার একসপেরিমেন্টাল ও আর্ট ফিল্ম বলেও বিজ্ঞাপিত করা হয়ে থাকে।

এর কিছু ব্যতিক্রম দেখা গেছে সম্প্রতি প্রদর্শিত রাশিয়ান ছবিতে। সেখানে যে কোন ভাবেই হোক ক্লাসিক সাহিত্যের প্রতি নিষ্ঠা ও সততা দেখা গেছে। এবং ছবিও পরিচ্ছন্ন।

এছাড়া প্রায় নিয়মিতই এখানে কিছু কিছু বস্তাপচা সং ক্লাসিক ছবি দেখান ইউসিস কর্তৃপক্ষ। সে-সব ছবি নির্দিষ্ট সংস্থক দর্শকদের জন্য হলেও প্রচেষ্টা অবশ্যই সৎ এবং অভিনন্দনযোগ্য।

ইতিমধ্যেই এঁরা চার্লি চ্যাপলিন এবং পল মুনির অনেকখানি সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ছবি দেখিয়েছেন। তাছাড়া সম্প্রতি এমন অনেকখানি ছবি দেখিয়েছেন যার গুরুত্বও কম নয়। এর মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় বিশ্ববিখ্যাত নিগ্রো অভিনেতা সিডনী পয়টার অভিনীত 'ইন দি হীট অফ দি নাইট' ছবি এবং ক্লিফ রবার্টসন ও ক্লেয়ার ব্লুম অভিনীত এবং রবিশঙ্কর সুর্যারোপিত 'চালি' ছবিটির। এই ছবি দুটি যেন কোন দিনই পুরনো হবার নয়। প্রথম ছবিটি নিগ্রো সমাজকে আমেরিকার স্বীকৃতি দেবার প্রচেষ্টা এবং পরের ছবিটি জড়বুদ্ধি সম্পন্ন এবং মানসিকভাবে বিকৃত থেকে খাটো চার্লি নামক এক বুবা পুরুষকে শিক্ষিত ও সুস্থ করে তোলার ওপর ভিত্তি করে তৈরী হয়েছে। শেষোক্ত ছবিতে রবিশঙ্করের সঙ্গীত পরিচালনা শোনা এক বিরল এবং স্মরণীয় অভিজ্ঞতা। সমস্ত ছবিটি যেন প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল রবিশঙ্করের বাজনা এবং সঙ্গীত পরিচালনায়। সিডনী পয়টার অভিনীত ছবিটির পরিচালক নরম্যান জিউইসন এবং চার্লির পরিচালক র‍্যালফ নেলসন।

এছাড়া মার্টিন রীট পরিচালিত সাকসেসার ছবিটিও নানা কারণে উত্তেজনা। গরীব চাষী এক কালা আদমী অভাবে পড়ে একটি শুয়োর চুরি করতে গিয়ে লঘু পাপে গুরুদণ্ড অর্থাৎ দীর্ঘ দিনের জন্য সশ্রম কঠিন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলে তার পরিবার কষ্টের মধ্যে দিন কাটায়। তার বড় ছেলের মধ্যে প্রতিভা লক্ষ্য করে এক কালা আদমী শিক্ষক সৎ হবার জন্য তার মধ্যে মানবিকতাবোধ ও ন্যায় অন্যায় বোধ জাগিয়ে তোলে। ফলে সেই ছেলের মনে বাপের মত (সামান্য হলেও) অন্যায় করা না করার মনোবৃত্তি জেগে ওঠে। এই সততায় উৎসাহ দেয় তার মা এবং তারই মনের জোরে সংসারটা আবার নতুন করে বাঁচতে শেখে। প্রচার মূলক হলেও গল্পটি এবং এর চরিত্রচিত্রণ মনকে স্পর্শ করবেই।

এই সঙ্গে আরো একটি ভিন্ন স্বাদের ছবিও সম্প্রতি দেখানো হয়। ছবিটি মূলত ক্রাইম ধর্মী হলেও এর বক্তব্য মনকে স্পর্শ করে। ছবিটির নাম 'অ্যান্ড দেন দেয়ার ওয়ান নান'। আগাথা ক্রিস্টির বেস্ট সেলার উপন্যাস থেকে নেওয়া গল্পটি।

সেই হারাধনের দশটি ছেলের মত (একটা চমৎকার গানও আছে এই প্রসঙ্গে। একটি করে লোক খুন হয়েছে আর গানটিও ছোপো ছোপো গাওয়া হয়েছে ছবিতে। পাঠকের সেই বিখ্যাত বাংলা ছড়াটির কথা যা শুনে অনিবার্য ভাবেই মনে পড়ে যাবে।) বিদেশের নামকরা রাজা উজীর যেমনী বড় লোক বুদ্ধ বুদ্ধার একটি দল এক নির্জন দ্বীপে অবস্থিত তাদেরই জন্য নির্মিত একটি হোটেলে উইক এণ্ডে বেড়াতে গিয়ে কি করে রহস্যজনকভাবে এক এক করে কয়েকজন খুন হোল এবং শেষ পর্যন্ত কি করে খুনী ধরা পড়ল, তাই নিয়েই ছবির গল্প। আগাথা ক্রিস্টির কাহিনী অতএব বোঝাই যাচ্ছে কি ধরনের জমাটি রহস্য ছবিটিকে সমৃদ্ধ করেছে। ছবিটির পরিচালক রেন ক্লেয়ার।

এমনি মাঝে মাঝে পুরনো অথচ মূল্যবান ছবি দেখার ব্যবস্থা করার জন্য ইউসিস কর্তৃপক্ষ অবশ্যই ধন্যবাদের যোগ্য। তবে এর মধ্যে অন্তত কিছু ছবিও যদি সর্ব সাধারণে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা যেত, তাহলে এই প্রচেষ্টা আরও সর্বাঙ্গীন হোত।

'গোল্ডেন টাচ সয়ার'

মার্ক টোয়েনের সেই অবিস্মরণীয় আনন্দের খনি 'টম সয়ার' এখন গোল্ডেন সিনেমার আকর্ষণ। যে লেখা পড়ে ছেলে বুড়ো সবাই এখনও মন্ত্রমুগ্ধ সেই কাহিনী পর্দায় দেখে যে তারা সবাই পুলকিত হবেন, তা বলাই বাহুল্য। ছবিটি দেখতে দেখতে যেন স্বপ্নের দেশে চলে যেতে হয়। এই সঙ্গীতবহুল ছবিটি পরিচালনা করেছেন ডন কার্টিস এবং নামভূমিকায় অপূর্ব অভিনয় করেছেন জনি হুইটকার।

শা. র চ

নাটমঞ্চ

রঙ্গনা ও নান্দীকার

গভীর দুঃখের সঙ্গে জানতে পারলাম যে পাঁচ বছরের ওপর রঙ্গনা মঞ্চে নিয়মিত অভিনয়ের পর নান্দীকার এই মঞ্চ থেকে বিতাড়িত হয়েছেন। নান্দীকার একটি কৃতীয় মর্যাদাসম্পন্ন নাট্যদল। সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে এবং সরকারী কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিরোধ মেটান। মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যস্থতায় যে স্থিতাবস্থার সিদ্ধান্ত হয়েছিল সেই স্থিতাবস্থা ফিরিয়ে আনুন এবং নান্দীকারের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করুন।

স্বাক্ষরকারী :

বিজন ভ., শম্ভু মিত্র, সন্তোষকুমার ঘোষ, বিজন ভট্টাচার্য, উৎপল দত্ত, তৃপ্তি মিত্র, অমলাশঙ্কর, শোভা সেন, তাপস সেন জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন বসু, চিত্তরঞ্জন ঘোষ, মণীন্দ্র রায় এবং আরো কয়েকজন।

[তথ্য ও জনসংযোগ মন্ত্রী শ্রীসুব্রত মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন যে, রঙ্গনা মঞ্চ নিয়ে বিরোধের মীমাংসা হয়ে গেছে। নান্দীকার গোষ্ঠীকে রবীন্দ্রভারতী সোসাইটির মঞ্চ ব্যবহারের ব্যবস্থা মুখ্যমন্ত্রী করে দেবেন বলে তথ্যমন্ত্রী জানান।]

বোড়শীর অভিনয় : মানবদরদী শরৎচন্দ্রের অপরূপ এক সৃষ্টি 'বোড়শী'। বাস্তব

জীবনের ত্রুটিলতা ও ভালবাসার অফুরন্ত মাধুর্য সংলাপে আর সঙ্গীতে মূর্ত হয়েছে এই নাটকে। অনন্দের কথা সম্প্রতি কলা-মন্দিরে নাটকটির একটি পরিচ্ছন্ন মৈত্রিপক রূপ পরিবেশিত হল। প্রযোজনা করেছেন দক্ষিণপূর্ব রেলওয়ের ই-পি-এম রিক্রিয়েশন ক্লাবের শিল্পীরা এবং পরিচালনা করেছেন প্রীন্দ্রু বন্দ্যোপাধ্যায়।

একটি নাটককে দর্শকদের মনের অতলে পৌঁছে দিতে গেলে যেসব বৈশিষ্ট্য মঞ্চে দীপ্ত হয়ে ওঠা উচিত, তার সবটাই বোধহয় সেদিনকার প্রযোজনায় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। শরৎচন্দ্রের নাটকের চরিত্রগুলো ফুটিয়ে তুলতে গেলে শিল্পীদের যে বিশেষ দৃষ্টি-কোণে প্রয়োজন তারও অভাব দেখিনি ছিল না। চরিত্রের রূপকাররা এদিক থেকে নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য। প্রবীরানন্দ চৌধুরীর বাস্তব ও অন্তর্দেশন নির্মল ঘোষের অভি-নয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছে। পাঁচু নাগের ষোড়শীও নাট্য মর্মস্পর্শী। পরেশ চাটার্জির একগুঁয়ে নন্দীও প্রাণবন্ত হয়েছে। অমল সরকার (নগেন সর্দার) প্রভাত দে (ডাঃ বল্লভ) মমতা চাটার্জি (হৈমবতীর) চরিত্র চিত্রণও প্রশংসার দাবী রাখে।

অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন কৈলাস ভট্টাচার্য শৈলেন মিত্র, পরিতোষ চক্রবর্তী, সুনীল সেন-গুপ্ত, রুমী ঘোষ, অমল সরকার, সমর সিকদার, প্রশান্ত চাটার্জি, সুশান্ত মুখার্জি প্রভাত দে, সত্যপ্রিয় দাশগুপ্ত, শিল্পির সহা ও অন্যান্য সকলে।

এই মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানটির উদ্বোধন করেন শ্রীভাস্কর চৌধুরী। প্রধান অতিথি ছিলেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র।

সাধক রামপ্রসাদ :

ন্যাশনাল স্পোর্টিং ক্লাবের সাংস্কৃতিক শাখার উদ্যোগে মুরারিমোহন স্ট্রীটের মিত্র বাড়ীর প্রাঙ্গণে সাধক রামপ্রসাদ নাটকটি যথা আঙ্গিকে উপস্থাপিত করা হোল। মূলনাটক নন্দগোপাল রায়চৌধুরীর। অতিরিক্ত সংলাপ প্রয়োগ সম্পাদনা এবং নির্দেশনার দায়িত্ব কৃতিত্বের সঙ্গে পালন করেছেন তাঁরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। অভিনয় প্রথমেই নাম করতে হয় নরহরি ঠাকুরের ভূমিকায় শ্যামল চৌধুরীর। তাঁর মর্মস্পর্শী অভিনয় যেন এক ভিন্ন পরিবেশ সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছিল। বিশেষভাবে তাঁর প্রথমার্ধের অভিনয় এবং দ্বিতীয়ার্ধের অভিনয়ে চরিত্রগত পার্থক্যটি তিনি অসাধারণ মুন্সীয়ানার তুলে ধরেন। কণ্ঠরোগগ্রস্ত নরহরির অভিনয় কোন সময়েই অভিনয় মনে হয় নি—শিল্পী এখানেই সার্থ-কতার উত্তীর্ণ। আশু গোঁসাইয়ের ভূমিকায় অরবিন্দ ভট্টাচার্যের অভিনয়ও দর্শকদের মনে দাগ কেটেছে। তাঁর অবশ্য নিখুঁত অভিনয় লক্ষ্মণ অত্যন্ত স্বাভাবিক মনে হয়েছে। এছাড়া আশীষ ভট্টাচার্য, অজিত মিত্র, বৈদ্য-নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয় ভালো লেগেছে। এমন একটি সুন্দর ধাত্রী উপস্থাপনার জন্য তারেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নির্দেশনার কৃতিত্ব আবার স্বীকার করছি। সুর রচনা এবং আবহ সঙ্গীতে গোপীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নলিনী করণের কাজ ভালো।

শিল্পী পরিষদের ভ্রমর : ঋষি বঙ্কিম-চন্দ্রের উইল অবলম্বনে 'ভ্রমর' (নাট্যরূপ অর্ধেন্দু দত্ত) নাটকটি সম্প্রতি মিনার্ভা মঞ্চে পরিবেশন করলেন শিল্পী পরিষদ।

এ নাটকের কাহিনী যেমন কারুর অজানা নয়, তেমনি এর আবেদন বা আকর্ষণ আজও দর্শকদের কাছে দুর্বার। তার প্রমাণ সেদিনও প্রেক্ষাগৃহে দর্শকদের উচ্ছ্বাসে পাওয়া গেল।

'ভ্রমর' নাটকে একটা ব্যাপার ভাল লাগল। সেটা হোল অনেক জায়গায় বঙ্কিম-চন্দ্রের মূল সংলাপ ব্যবহার। এতে যেমন নাটকের রস নষ্ট হয়নি তেমনি বঙ্কিম-চন্দ্রের সাহিত্য সৃষ্টি সম্পর্কে সাধারণ দর্শকদের একটা সুস্পষ্ট ধারণা সৃষ্টির সহায়ক হয়েছে।

তবে নাটকে একটা ঢিলেঢালা ভাব থেকেই গেছে। এ সম্পর্কে একটু সচেতন হবার অব-কাশ ছিল। এ ছাড়া কোন কোন চরিত্রের ক্ষেত্রে অতি-অভিনয়ও ঘটেছে। সেকালের নাটক হলেও এটুকু না থাকাই বাঞ্ছনীয় ছিল।

অভিনয়ে ছিলেন রমেশ পাঠক রঞ্জিত ব্যানার্জি অরুণ দাস নিশীথ দাশ সুনীল চক্রবর্তী দিলীপ দেব জানকী দাস নিশীথ ঘোষ ভবতারণ মুখার্জি জহরলাল ঘোষ সত্যেন মুখার্জি শক্তিরাম মুখার্জি ফণী-ভূষণ দে শ্রীমতী মালা দাস শ্রীমতী আশারে ঘোষ ও শ্রীমতী কল্পনা মুখার্জি।

নাটকটি পরিচালনা করেন শ্রীরমেশ পাঠক এবং নাট্য উপদেষ্টা ভূমিকায় শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত।

সুবোধ মল্লিকের সঙ্গীত পরিচালনা মোটামুটি।

নাট্যসমালোচক

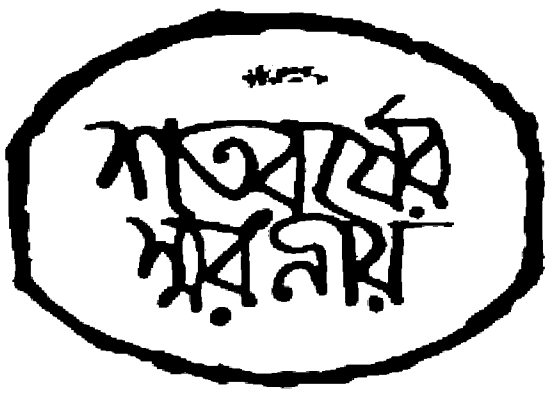

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

দানীবাবুর অভিনয়-প্রতিভার চরম বিকাশের সাক্ষ্য নিয়ে পেশাদার রঙ্গমঞ্চ অভিনেতাকে নতুন গরিমায় ভূষিত করলো। কিন্তু ২৭ রজনীর অভিনয়ের পর দানীবাবু নানান ব্যাধিতে অসমর্থ হয়ে পড়লেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের চরিত্র অভিনয় করে নাট্যমোদীদের খুশী করতে পারলেন না। দানীবাবু অসুস্থ অবস্থায় গৃহে অবস্থান করতে লাগলেন। দানীবাবুর অনুপস্থিতে অনেকে মনে করলেন স্টার রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ ঘটেছে। নাট্যনিকেতনের পক্ষ থেকে মনীষী গৃহেঠাকুরতা দানীবাবুর বকেয়া টাকার কিছু অংশ নিয়ে সাক্ষাৎ করে তাঁকে নাট্যনিকেতনে যোগদানের অনুরোধ জানান। দানীবাবু পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেন যে স্বাস্থ্যের জন্য তাঁকে বায়ু পরিবর্তনের জন্য বাইরে যেতে হবে—যদি সুস্থ হয়ে ফিরে আসেন তবে স্টার থিয়েটারেই যোগদান করবেন—অন্যত্র নয়। সোনাপুরের ৫০ রজনীর অভিনয়োৎসবে অসুস্থাবস্থাতেই দানীবাবুকে নিয়ে এলেন অপরেশচন্দ্র। ক্ষীণ কণ্ঠে—জনমণ্ডলীকে সম্বোধন করে দানীবাবু বলেন, আমি অন্যত্র যোগদান করবো বলে যে কথা উঠেছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। যদি সুস্থ হয়ে ফিরে আসি তবে এখানেই যোগদান করবো।"

রঙ্গমঞ্চে দানীবাবুর এই ছিল শেষ অভিনন্দন-জ্ঞাপন।

এরপর স্বর্গতঃ কুঞ্জকুমার মিত্রের গিরিডির বাড়ীতে স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য গমন করেন। কিন্তু বেশী দিন সেখানে অবস্থান করা সম্ভব হয় না। কলকাতায় প্রত্যাবর্তনের জন্য অস্থির হয়ে ওঠেন। কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করার পর ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ২৮ নভেম্বর ৬৫ বৎসর বয়সে দানীবাবু

অন করেন। ভাগিনেয় দুর্গাপ্রসন্ন ং পত্রে পূর্ণচন্দ্র তার মুখাগ্নি পূর্ণেন্দুই পরম নিষ্ঠায় পিতৃর ক কাজ সম্পন্ন করেন। চর্লচ্চত্রে সে ভ্রান্তি শান্তি কি শান্তি লা এই তিনখানা চিত্রই দানীবাবু করেন বলে জানা যায়। সব্যসাচীর টকের নির্বাচিত দৃশ্যে (একটা ও না) দানীবাবু অভিনয় করেন। র মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে একটি যুগের অবসান হয়। বলতে গেলে পরবর্তী যুগই শিশির যুগ রূপে পরিচিতি লাভ করে, যদিও শিশিরকুমারের আবির্ভাব দশ বৎসরাধিক পূর্বে। গিরিশচন্দ্র প্রবর্তিত অভিনয়-রীতির সরাসরি সংযোগেরও দানীবাবুর মৃত্যুর সঙ্গেই ছিন্ন হয়। অবশ্য এই নাট্যরীতি দানীবাবুর উত্তরসাধকেরা পরবর্তীকালে পরোক্ষভাবে অব্যাহত রাখেন। গিরিশচন্দ্র প্রবর্তিত নাট্যরীতি শিশির-কুমারের মধ্য দিয়ে নতুনরূপে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে যার প্রভাবই আজ নাট্যজগৎ আজকের অভিনয়শৈলী শিশির অতিক্রম করে নতুন রূপ নিয়ে রূপ উঠতে পারেনি। অর্থাৎ গিরিশচন্দ্র সে অভিনয়শৈলীর প্রবর্তন করেন যুগে বিভিন্ন প্রতিভার আবে যুগোপযোগী রূপ নিয়ে প্রবাহি মূল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে নি।

কালীশ মুখো

আপনি যা বিশ্বাস করুন বিশ্বাস
আপনার চেয়ে বেশী আর কে বুঝতে পারে...

নতুন পপ্‌পু ফীডার সেই যত্ন
আর একটি নতুন প্রতীক-

নির্ভরযোগ্যতার প্রতীকের সঙ্গে পাওয়া যাচ্ছে।

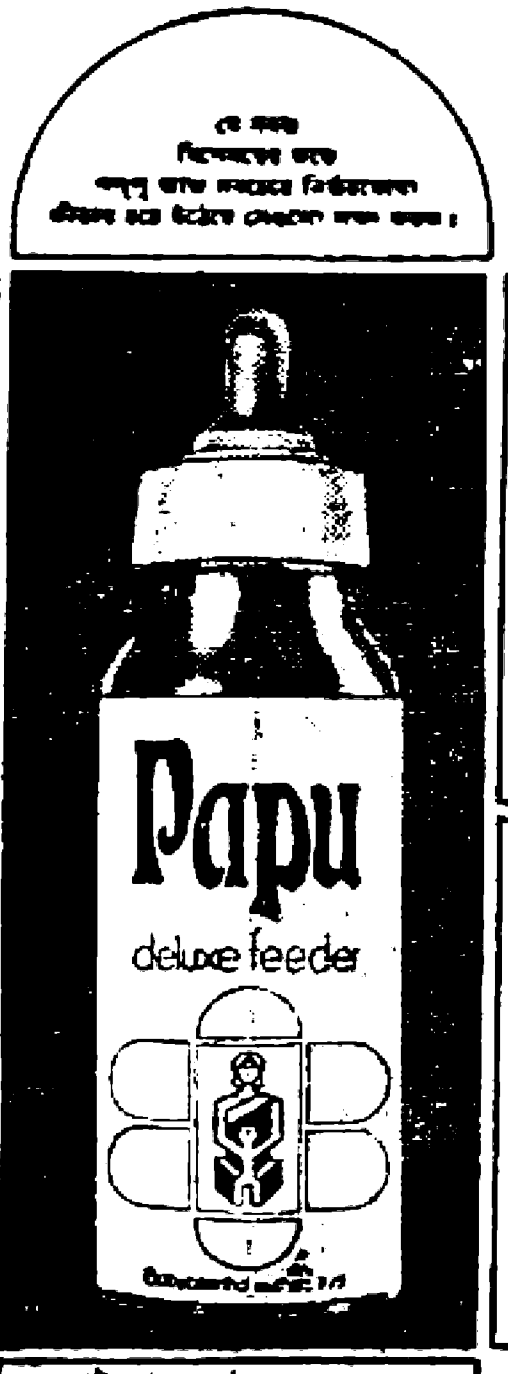

এর মোড়ক উচ্চ তাপে
জলজ্বল ক'রে তৈরী বলে কিনে
আনবামাত্র। সেই জন্য সুরক্ষার
দিক থেকে নিরাপদ।

এর অভিনব 'বিশ্বস্ত কব্জার'
বিশেষত্ব সম্পূর্ণ ঢেকে রাখে।
তাই রাখার পর খুব অল্প রাকলেও
নিপল ও দুধ একদম ফস্ কা। সেই জন্য
পরিচ্ছন্নতার ও নিরাপত্তার দিক
থেকেও নির্ভরযোগ্য।

বিশেষ আকারের নিপলের জন্য
শিশু তাড়াতাড়ি দুধ খেতে
পারে আর তার পেট ভরা হওয়া
বুঝতে পারে। এই বিশেষ ছক ও আকৃতি
এই দুই প্রকারের জন্য দরুণ জলে
বারবার ধুলেও বিকৃত হয় না। সেই
জন্য ব্যবহারের দিক থেকে নির্ভরযোগ্য।

এর চাকনা বহু পদার্থ দিয়ে তৈরী
আর মোড়কের মুখ অত্যন্তাম্ল টাই
থাকে বলে। ফ্রীজে রাখার বা ফোটে রাখার
কোন ভয় নাই। জার কোটায়েও
এর আকৃতি বদলে যায় না। সেই জন্য
সুবিধার দিক থেকে নির্ভরযোগ্য।

দুই সাইজে। পাউডার ও বিনি
পপ্‌পু
পীতল এবং নিরাপদ

এতদিন আপনি পীতল কিনেছেন তখন
নতুন আর নিরাপদ তখন 'পপ্‌পু' কিনে
দেখুন। নিজে আর আপনার পুরিবারে তার
পীতল পাবেন।

U.P.P. 1-BN

পাওয়া যায় এমন দোকান

CENTRAL LIBRARY

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চলচ্চিত্র পুরস্কার বিজয়ী সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও সন্ধ্যা রায়কে সম্বর্ধনা জানাল অভিনেতৃ সংঘ। অমৃত ফাইল

বিবিধ সংবাদ

ভারতীয় মাতৃ পরিষদের বাৎসরিক সম্মেলন

ভারতীয় মাতৃ পরিষদের (ভারতীয় নৃত্য ভবনের মহিলা শাখা) সম্মেলন আগামী মাসের দ্বিতীয়ার্ধে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হইবে। সম্মেলনের সার্থক রূপায়ণের জন্য শ্রীমতী সুভদ্রা হালদার সভানেত্রী করে এবং পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন মহিলাদেরকে নিয়ে শক্তিশালী কার্যকরী সমিতি গঠিত হয়েছে।

সম্মেলনে সর্বভারতীয় মহিলা প্রতিনিধিরা যোগদান করবেন। পরিষদের রজত জয়ন্তী উপলক্ষ্যে শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, স্বদেশ ও সমাজ সেবার ক্ষেত্রে বিশিষ্ট মহিলাদের এক সম্বর্ধনা জানানো হবে এবং একটি স্মারক পুস্তিকা প্রকাশিত হবে।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য পরিষদের কার্যালয় (২এ, কলেজ রো, ফোন নং ৩৪-৭২১১) যুগ্ম সম্পাদিকার সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

অভিনয় পুরস্কার বিতরণ ও গুণীজন সম্বর্ধনা : ২৬ জানুয়ারী মুক্ত অঙ্গন অভিনয় পুরস্কার (১৯৭৫) বিতরণ ও গুণীজন সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন কানু বন্দ্যোপাধ্যায়। কক্ষ মন্ত্রী পশুপতি চট্টোপাধ্যায় বিশিষ্ট অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন। এইদিন সম্বর্ধনা জানান হয় পালাসম্রাট ব্রজেন্দ্রকুমার দে নাট্য গবেষক হরীন্দ্রনাথ দত্ত, শ ভট্টাচার্য ও শিশির বসুকে।

অপেশাদার মঞ্চে উল্লেখযোগ্য অ জনার জন্য এই অনুষ্ঠান আ

আক্রমণ

প্রযোজনা : ফিল্মকুঞ্জ প্রাঃ লিঃ

দিল্লী থেকে শ্রীনগরের পথে অজয় সুনীলের সঙ্গে হঠাৎই সাক্ষাৎ হোল তরুণী শীতলের। তারপর থেকে একাধিকবার কাশ্মীরের বিভিন্ন টুরিস্ট স্পট ওদের দেখা সাক্ষাৎ হতে লাগলো। ফলে একসময় ওরা গভীরভাবে একে অপরের প্রতি প্রেমে আসক্ত হয়ে পড়ল। শীতল কিন্তু সুনীলকে জানিয়ে দিল প্রেমের গভীরে না যেতে। কারণ সে জেনেছে অজয়ের ব্যাকুলতা এদিকে অজয়ও আসাম থেকে কাশ্মীরে বদলী হোল। শীতল অনেক চেষ্টা করেও সুনীলের ভালবাসাকে অস্বীকার করে ওর মন থেকে নিজেকে মুছে ফেলতে পারছে না। ওরা দুজনে মন্দিরে গিয়ে বিয়ে করবে স্থির করলো কিন্তু এক দুর্ঘটনা ঘটায় শীতল সুস্থ হয়ে মন্দিরে উপস্থিত হতে পারলো না। তাই সুনীল বাধ্য হয়ে ফিরে গেল।

এই সময় সীমান্তে বিদেশী শত্রু অনুপ্রবেশ করায় সুনীল ও অজয়কে সীমান্তে চলে যেতে হোল। যুদ্ধে ভীষণ আহত হয়ে সুনীল কাশ্মীরের এক হাসপাতালে ভর্তি হোল। অজয় বীর-বিক্রমে যুদ্ধ করে শত্রু-পক্ষকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করে দেশের সুনাম রক্ষা করলো। কিন্তু সে যুদ্ধে নিহত হোল। শীতলকে নিয়ে ওর আর ঘর সংসার করা হোল না।

হিন্দী ছায়াচিত্রে যুদ্ধের কাহিনী নিয়ে 'উসনে কাহা থা' এবং 'হাকীকৎ'-এর মতো ছবি তৈরী হয়েছে। কিন্তু শচীন ভৌমিকের কাহিনী ও রমেশ পন্থের চিত্রনাট্য নতুন কোন দিকদর্শনের বাণী শুনাতে হয়নি এই যুদ্ধ চিত্রে। তবু পরিচালক জে ওমপ্রকাশ তাঁর সৃজনশীল শক্তি দিয়ে একটি সর্বাঙ্গ সুন্দর ছবি তৈরী করার চেষ্টা করেছেন। অভিনয়ে সঞ্জীবকুমার (অজয়), রাকেশ রোশন (সুনীল) এবং শীতলের চরিত্রে রেখা বেশ সুন্দর অভিনয় করেছেন। অন্যান্য চরিত্রে অশোককুমার, সঞ্জিতকুমার, ধারজন খান্না ও ফরিয়াল-এর অভিনয় সাবলীল, কলাকৌশলের কাজ উচ্চাঙ্গের, সম্পাদনার কাজ আরো উন্নত হতে পারতো। লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলালের সঙ্গীতাংশ উপভোগ্য।

চিত্রদূত

পুরস্কার লাভ করেন : শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা : চেতনার রামযাত্রা। **পরিচালক :** পঙ্কজ মুন্সী (শিবের অসাধ্য/টি. এল. জি.) **অভিনেতা :** নরেন্দ্র গুপ্ত (পতু লাহা/থিয়েটার ইউনিট)। **অভিনেত্রী :** বেলা সরকার (পরশমণি/সুন্দরম)। **নাট্যকার :** কৌশিক সান্যাল (গরু ও গণেশ, কলিকাতা নাটমঞ্চ)। **মফঃস্বল বাংলার শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা :** বিষ্ণু মধাহ্ন (স্বাগ্নিদক/হাওড়া)। **পরিচালক :** মনোরঞ্জন ঘড়া (হে রাজবিদ্রোহী লৌকিক, ধর্মকোলঘর) এবং নাট্যকার দীপক সেন (রামলীলা/আমরা)। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও নির্মল সাহা। অনুষ্ঠান সমাপ্তিতে স্বাগ্নিদক পরিবেশন করে বিষ্ণু মধাহ্ন।

রবীন্দ্র গীতায়নের সমাবর্তন উৎসব : সংস্কার সরোবরের ভারত বাংলাদেশ মৈত্রী কেন্দ্র রবীন্দ্র গীতায়নের সমাবর্তন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র সভার পৌরোহিত্য করেন। শ্রীভদ্র তাঁর ভাষণে পূর্বে কলিকাতায় রবীন্দ্রসংগীত প্রচার ও প্রসারকল্পে রবীন্দ্র গীতায়নের ভূমিকার বিষয় উল্লেখপূর্বক শিক্ষায়তনের ব্যাপকতর প্রসার কামনা করেন।

শিক্ষায়তনের সম্পাদক অজিতকুমার বসুর পরিচালনায় শিক্ষার্থীদের একটি মনোজ্ঞ সংগীতানুষ্ঠান এবং শ্রীমতী সাধী বসু ও সুমেধা সেন পরিচালনায় প্রাথমিক শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী কর্তৃক রবীন্দ্রনাথের হাস্যকৌতুক নাটিকা পেতে ও পাঠ পরিবেশিত হয়।

বিশ্বাহরা নাট্য সংস্থার কাছে মহল সম্প্রতি রবীন্দ্রসদনে তাদের বার্ষিক বিশ্বরূপ নাট্য সংস্থা পরিবেশন করলেন দুই মহল নাটকটি।

অভিনয়ে প্রথমেই নাম করতে হয় পরমা নন্দ ভট্টাচার্য, অমরেন্দ্রনাথ শর্মা ও মনোরঞ্জন মিত্রর (পরিচালক)। এছাড়া মধুসূদন বকসীর অভিনয়ও সুন্দর।

অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন গুরুদাস নন্দী স্বপনকুমার রায়, দিলীপকুমার ঘোষ, লক্ষ্মণ চন্দ্র ঘোষ মোহনলাল দত্ত শ্যামচন্দ্র ঘোষ বিজয়কুমার দত্ত প্রণবকুমার চন্দ অনন্ত মণ্ডল, মিলনকুমার পাল, হরেন সরকার নিতারঞ্জন সমদার রাসেদ আলি ডলি সাহা ও জয়ন্তী।

প্রবীণ সাংবাদিক স্মরণে

কুমারটুলী নাগরিক কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে নির্যাতীত দেশনেতা নির্ভীক সাংবাদিক কিশোরীলাল ঘোষের ৪০তম মৃত্যু-বার্ষিকী উদযাপিত হয়। কিশোরী বাবুর ৪০।১ বনমালী সরকার স্ট্রীটস্থ বাসভবনে ১৬ ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত এই স্মৃতি বাসরে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও সাংবাদিক দক্ষিণারঞ্জন বসু। শ্রী বসু বলেন : এটা লজ্জার বিষয়, এই আত্মত্যাগী পুরুষের কোন প্রামাণ্য জীবনী গ্রন্থ নেই। এমন কি কোন অভিধানে তাঁর কথা লেখা হয় নি।

রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্লকান্তি ঘোষ কিশোরীবাবুর দেশপ্রেমের উল্লেখ করে এক বাণীতে তাঁর জীবনী রচনার জন্য গ্রন্থ প্রকাশক সংস্থাসমূহকে আহ্বান জানান। সংবোধ দাস তাঁর বক্তব্যে জানান, কিশোরীবাবুর পুত্র হরিদাস ঘোষ প্রবীণ সাংবাদিক অমলেন্দুনারায়ণ রায় মহাশয়কে দিয়ে কিশোরীবাবুর একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনা করান, কিন্তু তা আজও প্রকাশিত হয় নি।

প্রেস ফটোগ্রাফার্স অ্যাসোসিয়েশনের অনুষ্ঠান : গত শুক্রবার কলকাতা তথ্য কেন্দ্রে প্রেস ফটোগ্রাফার্স অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয় সর্বশ্রী বিশ্বরঞ্জন রক্ষিত, মোনা চৌধুরী, অলক মিত্র, তারাপদ ব্যানার্জী ও সুনীল দত্তকে। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের তথ্য ও জনসংযোগ মন্ত্রী শ্রীসুব্রত মুখোপাধ্যায়। সভাপতিত্ব করেন শ্রীপান্না সেন। পরে এক সঙ্গীত অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন সর্বশ্রী ভূপেন হাজারিকা তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ইলা বসু, সাগর সেন, পাপিয়া লাহিড়ী ও তপন মুখোপাধ্যায়। হাস্যকৌতুক পরিবেশন করেন সুশীল দাস। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সম্পাদক অশোক বসু।

ত্রিপুরায় নাট্য প্রতিযোগিতা :

ত্রিপুরার নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে ত্রিপুরার অন্তঃ অফিস ক্রীড়া বিনোদন সংস্থার একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। প্রতি বছরের মতো এবারও তারা আগরতলার রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী ভবনে সপ্তম আন্তঃ অফিস পূর্ণাঙ্গ নাট্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন। অনুষ্ঠান শুরু হয় ৭-১-৭৬ এবং শেষ হয় ১৭-১-৭৬। বিভিন্ন নাট্যগোষ্ঠী এতে অংশ গ্রহণ করেন। প্রতিযোগিতার বিচারকরা ছিলেন যথাক্রমে কলিকাতার কৃষ্ণ কুন্ডু, শচীন ভট্টাচার্য ও আকাশবাণী আগরতলার স্টেশন ডাইরেকটর এস কে মিশ্র। বিচারকদের বিচারে প্রযোজনার জন্যে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান পান যথাক্রমে এবং ইন্দ্রজিৎ (পূর্ত বিভাগ বিনোদন সংস্থা) সীতা হরণ (শিক্ষা প্রধিকার বিনোদন সংস্থা) ও পুষ্পক মধু (কো-অপারেটিভ ডিপার্টমেন্ট রিক্রিয়েশন ক্লাব)। নির্দেশনা, সঙ্গীত, মঞ্চ, আলো ও রূপসজ্জায় শ্রেষ্ঠ নির্বাচিত হন : সুবোধ দে রঞ্জিত ঘোষ সলিল দেববর্মণ 'ফেরা' নাটকের আলোকসম্পাতকারী ও নরেশ পোদ্দার। শ্রেষ্ঠ অভিনেতা সুবোধ দে নলিনাক্ষ মুখার্জি (২য়) শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী রেখা ভট্টাচার্য, দীপ্তি চৌধুরী (২য়) শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেতা আবদুস সালাম মলিক কমল রায় (২য়)। সহ-অভিনেত্রী লীনা বন্দ্যোপাধ্যায় কল্যাণী ভট্টাচার্য (২য়)। ত্রিপুরার আন্তঃ অফিস ক্রীড় বিনোদন সংস্থার কর্মীরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে এই নাট্য প্রতিযোগিতার উৎসবকে সাফল্যমন্ডিত করেন এবং সুধীমন্ডলীর অকুন্ঠ প্রশংসা অর্জন করেন।

মৃণাল সেনের মৃগয়া

পরিচালক মৃণাল সেন এখন যে নতুন ছবির কাজ করছেন, এতদিন তার নাম করা হয়নি। কারণ আগে শ্রী সেন জানতেন ছবিটির নাম রাখা হয়েছে মৃগয়া। ভুবনডাঙ্গা পার্বত্যাঞ্চলের একটি ছোটগল্প (ওড়িয়া নাম—শিকার) অবলম্বনে চিত্রনাট্য লিখেছেন মৃণাল সেন ও প্রাহিত চট্টোপাধ্যায়। ছবির প্রধান দুই চরিত্রে আছেন মিথুন চক্রবর্তী ও মমতাশংকর। সংগীত আনন্দশংকরের।

CENTRAL LIBRARY

তিন পুরুষ : রবীন্দ্রনাথ, পুত্র রথীন্দ্রনাথ এবং পৌত্র নীতীন্দ্রনাথ

মার্বেল-প্যালেসে একটি রাত্রি

, বহুযুগী সংস্কৃতি ও কলালোকের রোমান্টিক আবহাওয়া ক বহন করেই যেন দাঁড়িয়ে আছে উত্তর কলকাতায় মার্বেল প্যালেস। একদিকার অস্থির জীবনের কর্ম-কান্তি লাভলাবণ্যের মধ্যও এ প্রাসাদের অন্তরে উর্ণনাভ রচেছে স্বপ্নের বলা আর সেইজন্যই এ রূপ আপন স্বরূপে আপনি ধন্য।

জিওগ্রি মুবেহাউসের ভাষায় মার্বেল প্যালেস হচ্ছে : রিচেস্ট কোয়েনটেসট.... দি মোস্ট ফ্যাশহাজার্ড অ্যান্ড দি মোস্ট রিডিকিউলিয়াস, দি মোস্ট এ্যাসটাউন্ডিং অ্যান্ড দি মোস্ট লাভেবল এ্যান্ড অলমোস্ট দি মাস্টেস্ট রোলিক অফ দি সিটি অফ প্যালেসেস।

এই মার্বেল প্যালেসের মর্মর সমস্ত দেহে বুকে হাত কাঁপছে বিগত কালের আনন্দ বেদনা. অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে হাত-ধরাধরি করে চলেছে পরিতৃপ্ত লালসালীলার বিলাস-শিল্প। বিরাট ঘর্মোর প্রতিটি কারুশিল্প বিস্মিত করে। বালারুণ্য আলোবাহী পরীদেহের গভীর রাতের অন্ধকারে ঢাকা আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে আছে কি ভাবের ভারসাম্য রচনা করতে? এমনই এক প্রাসাদে জলসাঘরের পক্ষ হতে রথীন পাল বহুদিন বাদে রবি-লক্ষ্মের সারারাতব্যাপী এক অনুষ্ঠান উপহার দিলেন—ভুলে যাওয়া ইতিহাসের একটি রঙীন অধ্যায়কে মনে করিয়ে দিতে।

হরেন সংগঠনের সবল সার্থক। মর্মর-বেষ্টিত ফোয়ারা পেরিয়ে লাল কার্পেট বিছানো পথে হাঁটতে হাঁটতে ধবধবে সেতারের সুরে পুলকিতদেহের মন মেতে ওঠে। এক-পা এক-পা করে এগোতে এগোতে পৌঁছলুম ঠাকুরদালানে। সেখানে বসে আমাদের অপেক্ষায় ছিলো রঙে রসে উজ্জ্বল এক কলরাজ্য। বৈদ্যুতিক আলো নেভানো। তার কায়গা নিয়েছে কাড়লণ্ঠন জ্বালানো সতর মোমবাতি। কক্ষ আলো তবে পেতলের ঝাড়ে সবুজ লতাপাতার ঘেরা ইন্দনভের মত মনে। তারই মাঝখানে বসে পণ্ডিত রবি-শঙ্কর ও কিশন মহারাজ। একজনের হাতে সেতার। অন্যজনের হাতে তবলা। একজনের ললাটে বন্দনা-উৎসবের কিশোরীর হাতে পরানো চন্দনটীপ উপরে কপালে সদ্যকার লাল টকটকে সিন্দুরবিন্দু। নগ্নদেহের পরনে চওড়া-পাড় ধুতি ও গরদের পাঞ্জাবি। অঙ্গসজ্জা তাঁর নিজ হাতে করা আজকের দিনটির জন্যে। পরনে ও রূপে সুরচিত পরিবেশে ভারতীয় শিল্পীর ঐতিহ্যটিই জানান দিচ্ছে।

রবিশঙ্করের বাজনার আগে হেসে বললেন—ইতিহাস তৈরিতে উৎসাহী বিদেশি শ্রোতাদের আমি ভারতের ঐতিহ্যের বিশ্বাসী।

'রাগটি তাঁর সারারাত্রিব্যাপী অনুষ্ঠানে শুরু করেন কল্যাণ—প্রথমাংশের সঙ্গে রাগ হেমন্তমালতীর প্রকাশ মিলে—তবে তাঁদের মনে এলো বলে ওঠেনি।

সন্ধ্যা থেকে সকাল হয়ে যাবার ও ভারতীয় রাগরাগিণীর মধ্যে ইতিহাস রচনার মধ্যে ওস্তাদের রবিশঙ্করের সাধনালব্ধ প্রতিটি টোকায় যা পাওয়ার হিসেবটানি অনুভূতিতে অনুভবে—এক কথায় [illegible] আনন্দ উদ্ভাসনকে তিনি যেন [illegible]

শিল্পীর শ্রোতাদের মনে। আলাপচারীর স্তব্ধ আবেশ পরিবেশকে স্তব্ধ-নম্র করে রাখে।

এরপর রূপক তালের ছন্দে বেহাগ রাগের গতে ছন্দের দোলার মধ্যেও ছিলো সংযত বেদনার মৃদু গুঞ্জরণ। সুসজ্জিতা নায়িকা প্রায় সারারাত প্রতীক্ষিতা। তবু সে এলো না। মর্মাহতার প্রকাশবিমুখ মুখ্যভাবনা আছড়ে পড়ে শ্যামাগমা গায়কীতে। বেহাগের এই মর্মভাবটি যেন সুরের রেখায় ছবি হয়ে উঠেছিলো।

সারারাতের প্রতিটি প্রহর শিল্পী নানাভাবের সুরে ভরে দিয়েছেন কিন্তু মূল সুর জুড়ে দ্রুপদী ঐতিহ্যের মর্যাদাগম্ভীর গহনচারী গাম্ভীর্যের মত যেন অলক্ষ্যে অনুরেখিত হয়েছে।

ছেয়বেহাগ ও বেহাগ শ্রোতাদের মধ্যে যদি আত্মবিস্মৃতি এনে থাকে—দরবারী-কানাড়া সৃষ্টি করেছে একটা আত্মলীন বেদনার করুণ গাম্ভীর্য। বিষাদকে গোপন রাখবার অভিজাত স্বাতন্ত্র্যবোধ। আন্দোলিত গান্ধার ও বৈবতের তীব্রতা ও ধানিয়ের কোমল অনুরণনে মধুর হয়ে আসার রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা? সে স্মৃতি বোধহয় সেদিনের শ্রোতারা কোনোদিনও ভুলতে পারবেন না। জোড়ের স্বরসঙ্গমের রকমারী নকসা কখনও খরস্রোত অভিমন্দ্র সিংহনাদী পৌরুষে গর্জন—আবার মন্দ্র-সপ্তকের স্বরবিন্যাসে ললিত লাবণ্যের জোয়ার। আর এই দুই-এর মিলন যেন তুলনাবিহীন কেনোমিনন।

এরপর সাহানা-য় যেন শুভ্র নবশঙ্খের প্রসন্ন পবিত্র ধ্বনি. শিল্পীর স্বরচিত রাগ কৌশিকী-তোড়িতে ভোরের চরণ ধ্বনি শোনা গেলো। তারপরই সিন্ধু ভৈরবী প্রেম ভক্তি আবেগ ও অশ্রুজলের সিন্ধু হয়ে ওঠে।

টেলিভিশন মানেই
"টেলিকিং"
অর্থাৎ
টি. ভির রাজা।
আজই আসুন, দেখুন, শুনুন ও কিনে খুসী হোন।
এ-ছাড়া আমাদের রয়েছে রকমারি রেডিও, রেকর্ড প্লেয়ার, রেকর্ড, ট্রানজিস্টার রেডিও, টেপ্ রেকর্ডার, ট্রানজিওগ্রাম ইত্যাদি ইত্যাদি।
সরঞ্জামের সুবন্দোবস্ত তো আছেই।
রেডিও এণ্ড ফটো স্টোরস্
৬৫নং গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিঃ-১৩
ফোন : ২৮-৪৭১৩

কিষণ মহারাজের তবলাসঙ্গত প্রথমে কুণ্ঠিত। তারপর ধীরে ধীরে সাধু-সঙ্গত ও সওয়ালে জবাবের পর্যায়ে আসতেই দুই সাথী-শিল্পী যেন হাতধরাধরি করে ভেসে চললেন ঢেউ-এর দোলায় দুলতে দুলতে সাগরসঙ্গমের পানে। অনেক আগে এঁদের শিল্পী-জীবনের প্রারম্ভে একমিলন দেখার অভিজ্ঞতা এ আসরের পুরোনো শ্রোতাদের আছে। কিন্তু হালআমলের শ্রোতাদের কাছে নিঃসন্দেহে এটা একটা বিস্ময়কর ঘটনা।

চিত্রাঙ্গদা

হংসধ্বনির চিত্রাঙ্গদা :

গত পঁচিশে ডিসেম্বর অর্থাৎ বড়-দিনের সন্ধ্যায় রবীন্দ্রসদনে রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যের অভিনয় করেন হংস-ধ্বনি. আগের অনেক অনুষ্ঠানের মতোই এই নৃত্যনাট্যটিও সুপ্রযোজনা। সংগীত ও নৃত্যের সার্থক সমন্বয়ে অনুষ্ঠানটি সাফল্যমণ্ডিত হয়। সংগীতে অর্জুনের ভূমিকায় চিন্ময় চট্টোপাধ্যায় নতুন স্বাদ দিলেন। বনানী ঘোষ কুরূপা ও মনোশ্রী লাহিড়ী সুরূপার ভূমিকায় খুবই ভাল গেয়েছেন। নরেশকুমারের অর্জুন ও সুমিত্রা মিত্রের চিত্রাঙ্গদা নৃত্যাভিনয়ে জীবন্ত হয়ে ওঠে. সমবেত সংগীতে মাঝে মাঝে বোকা-পড়ার কিঞ্চিৎ অভাব ঘটলেও স্টেটের উপর সুগীত বলা চলে। সংলাপ অংশে রূপদান করেন মনোশ্রী লাহিড়ী জয়শ্রী নাথ ও পার্থ-কুমার লাহিড়ী—নির্দেশনার দায়িত্ব ছিল শেষোক্ত জনের উপর। রূপসজ্জা বিষয়ে একটু বক্তব্য আছে—অতিআধুনিক রূপ-সজ্জায় নাটকের কাল সম্পর্কে বিভ্রান্তি ঘটায়।

শ্রাবণীর শ্যামা

গত ৩০শে জানুয়ারী রামমোহন মঞ্চে 'শ্রুতিনী' সংগীত শিক্ষায়তনের উদ্যোগে 'শ্যামা' নৃত্যনাট্য অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্কুসেনের ভূমিকায় বেবী রায়ের অভিনয় ও নৃত্য-কুশলতা দর্শকদের মনে রেখাপাত করে। এরপরই উল্লেখযোগ্য নামভূমিকায় কেয়া দত্তের অভিনয়। তিনি তাঁর নৃত্যাভিনয়ে একটি কঠিন চরিত্রকে সহজ করে তুলেছিলেন। অভিনয়ে কোনরূপ আতিশয্য ছিল না। উত্তীয়ের ভূমিকায় রমা ঘোষালের অভিনয় সংযত ও সাবলীল। এছাড়া আর যাঁরা নৃত্যে অংশ গ্রহণ করে অনুষ্ঠানটিকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলেছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কুমারী ভারতী দেব, পিয়ালী ঘোষাল রত্না সেন, রুবণ ব্যানার্জি সুপ্রিয়া ব্যানার্জি চয়নিকা দাস ও বন্ধুরূপী সুপর্ণা সরকার। শ্রীমতী মঞ্জুশ্রী রায় শ্যামার ভূমিকায় কণ্ঠদান করেন। তাঁর কণ্ঠমাধুর্য গানগুলিকে শ্রুতিমধুর করে তুলেছিল। বঙ্কুসেনের গানগুলি বিদ্যুৎবরণ মৌলিকের দ্বারা গীত হয়। বন্ধুর গান শ্রীঅশোক রায় ও উত্তীয়ের গান শ্রীকান্তি মুখার্জি এবং কোটালের কণ্ঠে নব দত্তের গান সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া সংগীতে অংশ গ্রহণ করেন সোনালী সেন উষা আচার্য অপর্ণা আচার্য, ঝর্ণা আচার্য ও নীরা ঘোষ ইত্যাদি। যন্ত্রসংগীতে পরেশ আচার্য ও বাসুদেব বসু। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন শ্রীমতী মঞ্জুশ্রী রায়।

শিশু সংগীত সম্মেলন

গত ২৯শে ও ৩০শে ডিসেম্বর শিশু সংগীত সম্মেলনের একাদশ বার্ষিক অধিবেশন অভূতপূর্ব সাফল্যের সঙ্গে সুসম্পন্ন হয়েছে। সর্বজন প্রিয় প্রখ্যাত সংগীতশিল্পী শ্রীমতী বিজন ঘোষদস্তিদার সম্মেলনের উদ্বোধন করেন একাদশটি প্রদীপ জ্বালিয়ে। শিশুশিল্পীদের প্রাণভরে আশীর্বাদ করেন সম্মেলনের স্থায়ী সভাপতি স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজ।

দুইদিনব্যাপী সম্মেলনের অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রসংগীত, অতুলপ্রসাদ, নজরুলগীতি, শ্যামাসংগীত, লোকসংগীত, খেয়াল, রাগ-প্রধান ভজন, সেতার গীটার, তবলা ও খোল লহরা, লোকনৃত্য কথক কথাকলি ভরতনাট্যম প্রভৃতিতে যেসব শিশুশিল্পীরা অংশগ্রহণ করলেন—তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম করা যায়—খেয়াল : মিতা চ্যাটার্জি নিবেদিতা দত্ত, চন্দ্রাণী চ্যাটার্জি, শাশ্বতী দে। ভজনে : প্রদীপ্তা গুপ্ত রত্না রায় (বিহার)। নজরুল : সস্মিতা চক্রবর্তী (রাজারহাট) বাউলে : ভবতারণ মুখার্জি (বীরভূম)। অতুলপ্রসাদে : মীরা রায় মিত্র। পল্লী-গীতিতে : মীরা দাস (মেদিনীপুর) ও অসীমা দত্ত। রবীন্দ্রসংগীতে : পৌষালী চ্যাটার্জি, তুহিনা বোস। তবলা এবং খোল লহরায় : যথাক্রমে চন্দন পাত্র স্বপন অধিকারী এবং গোপাল বর্মন। নৃত্যে : মধুমিতা সাহা, অনিমা দাস, শাশ্বতী সেন। কথাকলী নৃত্যে : সোমা ব্যানার্জি। কথক নৃত্যে : চন্দ্রাণী সেনগুপ্ত, চুকা চৌধুরী, স্বৈত জারিয়েন্টাল নৃত্যে : সুমনা রায় ও সোমা ঘোষ। রবীন্দ্র নৃত্যে : শাশ্বতী বসু মজুমদার ও পম্পা মিত্র। ভারতনাট্যম নৃত্যে : শম্পা ভট্টাচার্য এবং সমবেতে—শর্মিষ্ঠা ঘোষ, মনীষা হালদার, নন্দিতা দত্ত শাশ্বতী গুপ্ত ও ঈশানী সেন।

শ্রীসুপ্রিয় পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস ২৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।

CENTRAL LIBRARY

লক্ষ লক্ষ লোক আজ ব্যবহার করেন

সাধনা টুথপেস্ট

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা

কলিকাতা-৩৮

ডাঃ যোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ,
আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রী, এফ.সি.এস. (লন্ডন)
এল.সি.এস. (আমেরিকা) অধ্যক্ষ
কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

Regd. No. WB NC-13
...am AMRITA Calcutta-700003

CENTRAL LIBRARY

AMRITA

Friday 19th March, 1
Phone 55-5211 (14 lines)

১২৭ বছরের অভিজ্ঞতায়
কুকমী গুঁড়ো মশলা
জনপ্রিয়তার সর্বোচ্চ শিখরে

13 MAR 1978

কুকমী

গুঁড়ো মশলা

আমাদের এন্ (এন) কোন ব্র্যাঞ্চ ও এজেন্ট নেই

GENERAL LIBRARY

প্রস্তুতকারক :
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত [illegible]
(স্পাইস পাউডার [illegible]
২৬৫, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা- ৭০০০৭০
পোষ্ট বক্স নং :—বড়বাজার ৬৮৮৫

অমৃত

সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ /

২৬ মার্চ ১৯৭৬ ॥

CENTRAL LIBRARY

প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর

নেসকাফে স্বাদে গন্ধে অতুলনীয়

প্রকাশিত হল! প্রকাশিত হল। প্রকাশিত হল।

জ্যোতিষাচার্য ভৃগুজাতকের

১৩৮৩ কেমন যাবে ও বর্ষফল পঞ্জিকা

কোন জ্যোতিষীই হলপ করে বলতে পারবেন না তাঁর গণনা সম্পূর্ণ নির্ভুল। কিন্তু যতদূর সম্ভব অভ্রান্ত গণনার কয়েকটী ব্যতিক্রম প্রমাণিত হয়েছে ভৃগুজাতকের ইদানীং প্রকাশিত বিভিন্ন বইতে। ইতিপূর্বে প্রকাশিত তাঁর ১৯৭৬ কেমন যাবে ও জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় বইগুলি জ্যোতিষজগতে এবং সাধারণের মধ্যে যথেষ্ট আলোড়ন তুলেছে। একথা অনস্বীকার্য জ্যোতিষের সম্পূর্ণ প্রকাশিত বাংলা নতুন বছরের ব্যক্তিগত ভাগ্য গণনার এই বইটি সাধারণের কাছে খুবই মূল্যবান ও অপরিহার্য। দাম — মাত্র চার টাকা।

আমাদের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বই:—

প্রমথনাথ বিশীর
রবীন্দ্র কাব্য প্রবাহ ১৭.
রবীন্দ্র সরণী ১৫.
মাইকেল মধুসূদন ৮.

ডঃ ভবতোষ মুখোপাধ্যায়ের
আধুনিক কাব্য বাংলা ১০.
শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন ৬.

ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের
বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগীতি ৪॥

ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের
ধর্মে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য ৬.

। প্রকাশিত হয়েছে ।

সৈয়দ মুজতবা আলীর
পরিবর্তনে অপরিবর্তনীয় ৯.

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের
মনে মনে খেলা ৬॥

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
হায়নার দাঁত ৬.

আশাপূর্ণা দেবীর
পলাতকসৈনিক ৭॥

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের
বন্ধনে ফেরা ৭॥

সমরেশ বসুর
সূর্যতৃষ্ণা ৯.

বাংলা পেপার ব্যাক :—

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
পথের পাচালী ৬.
ইছামতী ৮.

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
কলকাতার কাছেই (যন্ত্রস্থ)
উপকণ্ঠে ১০.

বনফুলের
স্থাবর ৬.

প্রমথনাথ বিশীর
কেরী সাহেবের মুন্সী ৬.

প্রবোধকুমার সান্যালের
মহাপ্রস্থানের পথে ৩॥

অন্নদাশঙ্কর রায়ের
পথে প্রবাসে ৩.

বিমল মিত্রের নূতনতম উপন্যাস

যে অঙ্ক মেলেনি

নববর্ষে প্রকাশিত হতে চলেছে

। প্রকাশের পথে ।

নারায়ণ সান্যালের
নক্ষত্রলোকের দেবতাত্মা ১২.

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের
রঙিন সাঁকো ৬.

বাণী রায়ের
জনারণ্যে একখমু ১৫.

কিশোর সাহিত্য

সুবিনয় রায়ের
কিশোর গ্রন্থাবলী ১০.
নানান দেশের রূপকথা ৬.
গল্প আর গল্প ১০.

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ,
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-১২
৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯

आपल्या कुटुंबास आणि स्नेहीमित्रांस हि॰:
अक्षय, धनधान्य भवन, लोणार, अहिल्यानगर-१०००००

आपल्या घरातून
चोरलेल्या घोड्याचा
शोध लावा.
घोडा—लाईट, सावलीसारखा,
पळे सावलीसारखा, जिवाजीवलग,
धनिकाचा.
आपल्या घोड्याचा
शोध लावा.
अ हिरवी निव—
—धोपाड्या गच्चीवरून दाखवे निळा।
स्पर्शातून—विरणारी धातूची
लाजीरवाणी चाहूलदायक धमाल।

inj/afc-761

২৫ বর্ষ

অমৃত

সংখ্যা ৫৩

ইণ্ডিয়ান এ্যান্ড ইষ্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য

Friday, 26th March, 1976

শুক্রবার ১২ চৈত্র, ১৩৮২

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
৬	সম্পাদকীয়		
৭	[illegible]	(রোপা)	শ্রীপ্রমথনাথ বিশী
১০	সাহিত্যের খোপায়		শ্রীশান্তিলতা চট্টোপাধ্যায়
১৩	৬৫ বাংলার ঘরে		শ্রীদেবদত্ত
১৭	বিদেশের কথা		শ্রীপুষ্করাক্ষ
১৮	স্মৃতির সমুদ্রে	(কবিতা)	শ্রীঅমিত দাস
১৬	প্রেম : ২	(কবিতা)	শ্রীঅজয় সেন
১৮	শরৎচন্দ্রের বাড়ি	(কবিতা)	শ্রীবিষ্ণব মাজী
১৯	অন্য শেষ রজনী	(উপন্যাস)	শ্রীশ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়
২৩	অমৃতবাজারের চিঠিপত্র		

প্রতি মঙ্গলবার রাত ৮-৫৯ মিনিটে
রেডিও বিবিধ ভারতী শুনুন

প্রকাশিত হলো—আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ চিরঞ্জীবের নবপ্রেম প্রয়াস

খেলার মাঠে মেয়েরা ৬.

সম্প্রতিকালের ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের ভ্রমণ রসোত্তীর্ণ উপন্যাস

হিমালয়ের তিন সঙ্গী ১৫.

শক্তিমান লেখক নটরাজনের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ

ওরা সেই পুলিশ ১৫.

অন্নদাশঙ্কর রায়ের নতুন স্বাদের প্রামাণিক দলিল

মার্কসবাদই শেষ কথা নয় ৬.

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের সর্বাধুনিক উপন্যাস

আসা যাওয়ার পথের ধারে ৫.

ফণিভূষণ আচার্যের চাঞ্চল্যকর উপন্যাস

জ্যোৎসনায় বাঘবন্দী খেলা ৫.

বাসুদেব বসুর নতুন আঙ্গিকের উপন্যাস

কাঁদিছে মৃত্তিকা ৫. রাজগৃহে রাজা নেই ৪.

নিখিলচন্দ্র সরকারের আধুনিক উপন্যাস

স্বপ্নের ধ্বনি ৮.

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস

এই জীবন ৫.

শৈলেন ঘের রহস্যঘন বিপুল কাহিনী

শপথ নিলাম ৫.

দৃষ্টিহীনের মনমাতানো উপন্যাস

মধু গন্ধে ভরা ৪.

নিশাচরের রোমাঞ্চকর কাহিনী

তিনতাসের খেলা ৫.

রক্ত ঝরা সন্ধ্যায় ৫.

সুশীলকুমার বসুর সর্বাধুনিক উপন্যাস

দ্রৌপদী প্রেম ৭.

সুবোধ ঘোষের অসামান্য উপন্যাস

পুনর্নবা ৪.

শ্রেষ্ঠ গুহঠাকুরতার নবতম উপন্যাস

জল শুধু জল ৮.

পূর্ণ প্রকাশন

[illegible] কলিকাতা-৯ ফোন ৩৪-১৩১২

আপনি যা শিশুর যাস্থ্যের পুরুষ্কার বিষয়ে
আপনার চেয়ে বেশী আর কে বুঝতে পারে...

নতুন পপু ফীডার সেই যত্ন আর একটি নতুন প্রতীক-

নির্ভরযোগ্যতার প্রতীকের সঙ্গে পাওয়া যাচ্ছে।

যে সময়
বিশ্বাসের সঙ্গে
শক্ত আর ধারালো নিউরোমাস
টীনের কৌটা চোখের সামনে খোলা হচ্ছে।

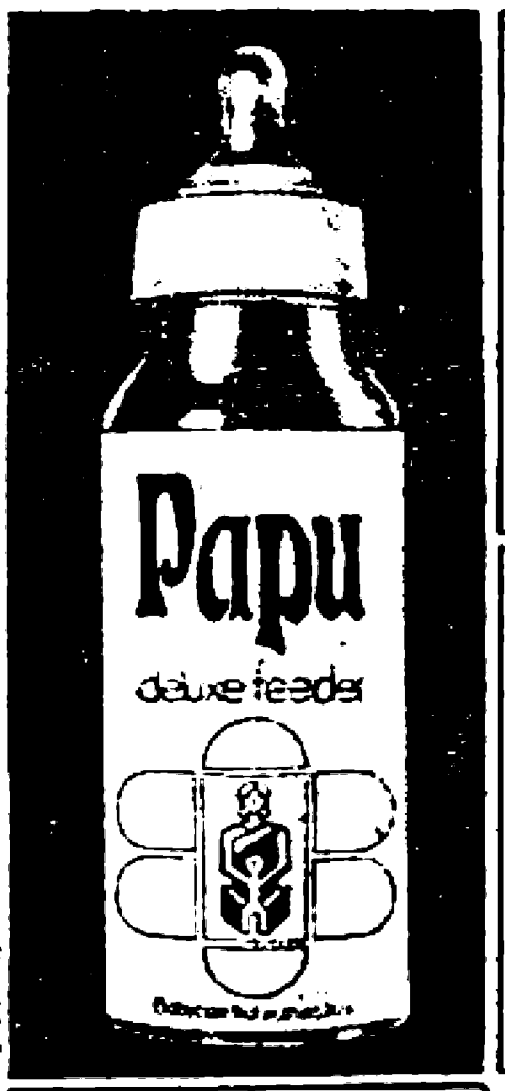

এর ছোটদের উচ্চ ডালপ
মজবুত ক'রে তৈরী কাচ দিয়ে
বানানো। সেই জন্য খুবতাড়া
কিছু ছোক নিরাপদ।

এর আহিটীয় পিলস্ক করার
পিলসকে সম্পূর্ণ ঢেকে রাখে।
হাই রাখার পর মুখ পাড় আবলেও
পিলস্ক ও মুখ নোংরা হয় না। সেই জন্যে
পরিচ্ছন্নতা ও নিরাপত্তার দিক
থাকেও নির্ভরযোগ্য।

বিশ্বের আকারের বিপদের কথা
বিশু ছোটবেলা থেকে জানে
শুধু আর তার পেট কখন চাওয়া
চুকতে পারে। এই বিশেষ ছক্ক ও ধারক
এই দুই প্রকারের, আর কখন আর
বারবার ধুলোয় খারাপ হয় না। সেই
জন্যে ছাড়াও দিক থেকে নির্ভরযোগ্য।

এর ঢাকনা বহু পদার্থ দিয়ে তৈরী
যার ঢোকানোর মুখ অনায়াসে এঁটে
বন্ধ করা। সীল করার এ ফেটে যাবার
ভোগ হয় নেই। জন্যে ঢোকানোর
এর আকৃতি নষ্ট হয় না। সেই জন্যে
সুবিধার দিক থেকে নির্ভরযোগ্য।

দু'টি সাইজে : ঔষধার ও বিশি

পপু

ফীডার এক পিলস্ক

এবার যখন আপনি ফীডার কিনতে যাবেন
তখন আর পিলসের কথা 'পপু' নাম মেনে
নেবেন। শিশুর স্বাস্থ্য আপনার পুরিবার জন্য
এটা আবশ্যক।

ঘরের জন্য বড় শিশুর জন্য

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
	উৎসবের ইতিহাস		শ্রীসুশান্তকুমার মিত্র
২৭	কলকাতার হটেলো		শ্রীরেবা বড়ুয়া
২৯	সাহিত্যের খবর		শ্রীচার্বাক
২৯	নতুন বই		
৩১	সাবের আলুন		শ্রীসন্ধ্যা সেন
৩৭	গোধূলিয়া	(উপন্যাস)	শ্রীনিমাই ভট্টাচার্য
৪৩	বিজ্ঞানের কথা		শ্রীঅরুণকুমার
৪৫	পুনশ্চ		শ্রীকৃপলক
৪৭	স্বপ্নের	(কবিতা)	শ্রীতরুণ সান্যাল
৪৮	চাঁদমালা		শ্রীঅরুণাভ চৌধুরী
৫০	চিঠিপত্র		
৫২	মঠ থেকে মেলাই		শ্রীপ্রফুল্ল বসু
৫৪	খেলাধুলো		শ্রীসর্বজিৎ
৫৬	সিনেমাটিক টুক		শ্রীরঞ্জন মজুমদার
৬০	স্ক্রীন থেকে দূরদর্শন		শ্রীমুকুলদেব
৬২	বিচিত্রজন		শ্রীনির্মল ধর
৬৪	নাটমঞ্চ		শ্রীনান্দীকর
৬৪	শব্দজালের পালস্কাপ		

প্রচ্ছদ : শ্রীতমালকান্তি মুখোপাধ্যায়

অফিস এবং ইনডিনীয়ারিং
নিখুঁত সরঞ্জাম
এখানে এসে কিনে নিয়ে য

সার্ভে, ড্রইং, নানা রকম ক
খাতা, লেজার, ক্যাশবই কা
উৎকৃষ্ট ছাপার জন্য
অন্যতম প্রতিষ্ঠান
কুইক স্টেশনারী স্টোর্স
৬৩ই, রাধাবাজার স্ট্রীট কলি
ফোন : ২২-৮৫৮৮, ৬৭-৪৪
গ্রাম : সহবর্ধন, কোর্ট বন্ধ—৩৮
পরিবেশক : কার্মাইন প্রডাক্টস
(স্টেশনারী বিভাগ)

বিখ্যাত ডাটা
গুঁড়ো মশলার
প্রস্তুতকারক
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত
(কুকমী) প্রাঃ লিঃ
এখন আপনাদের দিচ্ছেন
একটি নতুন অতি
সুদৃশ্য টিনের কৌটায়
সবরকম গুঁড়ো মশলার
অপূর্ব সংমিশ্রণ

এক কৌটো ডাটা রেডিমিক্সড কিচেন
কুইন প্যাক কিনলে আর কোনরকম
মশলা এমন কি নেবার, আদা, রসুন
প্রভৃতি আলাদা ভাবে ব্যবহার দিতে হয় না.
ডাটা রেডিমিক্সড কিচেন কুইন প্যাকের
মাছ, মাংস, ডিম ও সবরকম খাদ্যদ্রব্যের
তরিতরকারি অল্প সময়ে চটপট রান্না
করা যায়। আপনার সবরকম রান্নায়
আজই ডাটা রেডিমিক্সড কারি পাউডার
(কিচেন কুইন প্যাক) ব্যবহার করুন।

ডাটা রেডিমিক্সড কারি
পাউডার
কিচেন কুইন প্যাক

প্রস্তুতকারক : কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুকমী) প্রাঃ লিঃ
২০৭, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭, পোষ্ট বক্স নং ৬৭৭৪.
ফোন : ৩৩-১৩০৭, ৩৩-৩৭০৮

PAN—KCD-74

শিক্ষা ও জীবন

সম্প্রতি পশ্চিমবাংলার কয়েকটি বিশ্ব বিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতি বছর এই উৎসবে প্রধান অতিথিকে দীক্ষান্ত উপদেশ দেবারই রীতি। এবারেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। তবে যতই দিন যাচ্ছে শিক্ষানিয়ামক এবং শিক্ষার্থীরাও উপলব্ধি করতে পারছেন যে, গতানুগতিক উপদেশ ক্রমশই বাস্তব জীবনে অনুপযোগী হয়ে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী সম্প্রতি এক ভাষণে বেশ পরিষ্কারভাবেই বলেছেন যে, বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা ঢেলে সাজানো দরকার। কেননা, সমাজের পরিবর্তন আনতে হলে শিক্ষাকে কর্মমুখী এবং জীবনমুখী করে তুলতে হবে। শুধুমাত্র তত্ত্বাবধী বিদ্যা আজ আর যথেষ্ট নয়। তার সঙ্গে কর্ম ও জীবনকে সংযুক্ত করে দেওয়া চাই।

প্রসঙ্গটা তুলেছিলেন রাজ্যপাল ডাঃ এম. বর্ধমান ও কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন ভাষণে। বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয় যদি তার আঞ্চলিক সমাজের আশা ও আকাঙ্ক্ষা পূরণে এগিয়ে না আসতে পারে, তাহলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি অনুকৃতি বা প্রোডেৌটাইপ নির্মাণ করে কোন উদ্দেশ্য সাধিত হবে? অক্সফোর্ড হার্ভার্ড প্রিন্সটন থেকে নালন্দা বিশ্ব-বিদ্যালয় সম্পূর্ণ আলাদা, কিন্তু ওদের দেশে আরও যে-সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় আছে, তারা এই বিশ্ববিখ্যাতদের অনুকরণ করে না। প্রত্যেকেরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে এবং বিশেষ ধরনের শিক্ষায়তন হিসেবেই তাদের মর্যাদা। উল্লেখ করা যেতে পারে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা। এটি যখন স্থাপিত হয় তখন কৃষিবিজ্ঞান চর্চাই তার মূল লক্ষ্য ছিল। কিন্তু শেষে দেখা গেল সাহিত্য, বিজ্ঞানের সাধারণ ডিগ্রি ডাসিটি হয়ে উঠেছে এই। কোথায় গেল কৃষিচর্চা? শেষ পর্যন্ত বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়কে ভালোবাসা করে তুলতে হল। অনুরূপ ঘটনা ঘটে বিশ্বভারতীর ক্ষেত্রে। বিশ্বভারতীকে যখন কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা হয় তখন সম্পর্কভাবে এটা উল্লেখ করা ছিল যে এটি ভারতের আর পাঁচটা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো হবে না। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শ আজকের দিনে বিশ্বভারতী এবং তাতেই এর পরিপূর্ণ সার্থকতা। কেন্দ্রীয় সরকার বিশ্বভারতীর অর্থচিন্তা দূর করলেন, কিন্তু তার শিক্ষা ভাবনা তো সরকার করে দিতে পারেন না। আমরা দেখলাম বিশ্বভারতীর সম্প্রসারণের নতুন নতুন ফ্যাকাল্টি তৈরি হল, কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতন হার চালু হল।

তাদের অর্থকষ্ট ঘুচল। অথচ শেষবয়সেও রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর জন্য দেশবাসীর কাছ থেকে অর্থসংগ্রহ করতেন তাঁর সঙ্গীত ও নাট্যাভিনয় পরিবেশন করে। নিজের সমস্ত সম্পত্তি দিলেন তাঁর শান্তিনিকেতনকে বাঁচাবার জন্য। আদর্শের জন্যই তিনি তা করেছিলেন, বাঁধাধরা মাটিতে আলাদা একটি স্বাদ হিসেবে রাখতে চাননি তিনি বিশ্বভারতীকে, গড়ে তুলতেন শ্রীনিকেতন। পল্লী শিক্ষা সংসদ আশেপাশের পল্লী-জীবনের সামগ্রিক প্রাণবান করে আনল কৃষির ক্ষেত্রে। তিনি চান কালই ছিলেন গতানুগতিকতার বিরোধী।

শিক্ষাকে জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলাই ছিল প্রধান শিক্ষক রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য।

বিশ্বভারতীর ব্যর্থতা কোনো একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। রাসমে কমিটির রিপোর্টে এই গতানুগতিকতার বিরুদ্ধেই মত প্রকাশ করা হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে অপচয়ের বেদনা আমরা অনুভব করছি প্রায় সমস্তই বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেই। তবে বিশ্ব-ভারতীর সঙ্গে একজন মহান স্রষ্টার স্বপ্ন জড়িত বলেই তার ভালো-মন্দ, সার্থকতা ও ব্যর্থতা এত বেশি করে ভাবিয়ে তোলে আমাদের। বিশ্বভারতীকে তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে ফিরিয়ে আনা হোক, এ আকাঙ্ক্ষা সকলেরই। যে মহান স্রষ্টার নিজের হাতে তৈরি এই বিশ্ববিদ্যালয়, তাঁর চিন্তাভাবনা, সৃষ্টি ও স্বপ্নের প্রতি শিক্ষক ও শিক্ষার্থী-দের সম্যক পরিচয় থাকা অত্যন্ত বাঞ্ছনীয়। নয়তো শুধুমাত্র আম্রকুঞ্জে সম্যবর্তন, স্নাতকদের সপ্তপর্ণী অর্পণ, উপাসনা ইত্যাদি নিতান্তই নিষ্প্রাণ আচারে পরিণত হবে। নতুন উপাচার্য উৎসাহ ও উদ্যম নিয়ে কাজে যোগ দিয়েছেন। তিনি বিশ্ব-ভারতীকে একটি আদর্শ শিক্ষায়তনে পরিণত করতে পারবেন এই আশা আমরা করি।

এদিক গ্রাম-জীবনের সঙ্গে একাত্ম হবার জন্য কৃষি-বিজ্ঞানের স্নাতকদের আহ্বান জানিয়েছেন রাজ্যপাল, কৃষিকর্মই ভারতবর্ষের মানুষের প্রধান উপজীবিকা। গ্রাম-ভিত্তিক আমাদের সমাজ। গ্রামকে উপেক্ষা করে, তাকে বঞ্চিত রেখে আমাদের দেশের সার্বিক উন্নতি কখনই সম্ভব নয়। কৃষি-বিজ্ঞানের ডিগ্রীধারীরা সহরে বসে কাগজপত্রে কাজ করার চেয়ে গ্রামে গিয়ে চাষীদের পাশে দাঁড়ালে আমাদের কৃষি-ব্যবস্থার সত্যিকারের সহায়তা হবে। হরিয়ানা, পাঞ্জাব ও উত্তরপ্রদেশের কৃষি-বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ইতিমধ্যেই এ-ব্যাপারে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছে। পশ্চিমবাংলার কৃষি-বিশ্ববিদ্যালয় . বিধানচন্দ্র রায়ের নামাঙ্কিত, স্বর্গত ডাঃ রায় ভাঙা বাংলাকে নতুন করে গড়ার কাজে হাত দিয়েছিলেন। বস্তুতপক্ষে পশ্চিমবাংলার একটা অন্যতম ভূমিকা আছে। অথনো চাষের ফলনেও পশ্চিমবাংলার কৃষক আশ্চর্য কৃতিত্ব দেখিয়েছে। আমাদের কৃষিবিজ্ঞানী তরুণ স্নাতক ও শিক্ষার্থীরা তাঁদের শিক্ষাকে বাস্তবে প্রয়োগ করে ডাঃ রায়ের স্বপ্নকে সার্থক করে তুলবেন এ আশাই করে দেশ-বাসী। তাহলেই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা লাভ করতে পারবে প্রকৃত সার্থকতা। শিক্ষা হবে জীবনের সহযাত্রী। তা শুধুমাত্র পাঁথিপত্র আবদ্ধ থাকার জন্য নয়।

CENTRAL LIBRARY

সম্পর্ক

প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

হাফপ্যান্ট পরা সাহেবটার ধবধবে সাদা ঠ্যাং-দুটো দিয়ে হাঁ করে তাকিয়ে ছিল ফটু। বিরাট চেহারা সেকটার। লম্বা চওড়া। ছোট্ট প্যান্টের ভেতর লাল একটা গেঞ্জী গোঁজা। চুলগুলো এলোমেলো—রং প্রায় গা হাত পায়ের মত

শালের মেমটার চেহারাটা কিন্তু জাঁদরেল টাইপের কাছে. শাড়ীর তালি-দেওয়া ঢোল ফুলপ্যান্ট পরনে গায়ের শার্টটা কোন এক কালে বোধ হয় সাদা ছিল। এখন রং কল্পনা করতে হয়। শার্টটার ভেতরে কিছু নেই। না কোন জামা। না কিছু।

বাল্টাদের সেন্টারটার পাশে দাইড্রাশটে ফটুদের চান করছিল। বেলার আলোক এখন প্রায় শেষ। লাল দীঘর রেলিংএর ধারে হিমেট ইট ঠিক মত দাঁড় করালো। ফুটু একবার তাকিয়ে দেখে নিল। একটু পরে মা ওখানে আসুন জানাবে। টেলিফোন বুথের ঘেরা বাগানটার পাশ থেকে লুকিয়ে কিছু দাদের ছিবড়ে আর বা-চারটে জলপালা কুড়িয়ে জড়ো করে রেখেছে। দু-বেলা খাওয়ার পাট নেই।

কখন আজ অনেকগুলো চল জোগাড় করেছে কোথেকে কে জানে। সন্ধ্যে

মোড়ের রাস্তার ধারে যেখানে বাজার বসে সেখানে ঘুরে ঘুরে ফটু আর ওর মা কাঁপর পাতা, পচা আলু সেদ্ধ জোগাড় করছিল সকালে। ছোট কাঁপ একটা পেয়ে গেল। টি-এল একটা হাঁড়ি মুখ বাড়িয়ে তুলে নিয়েছিল বস্তুরা থেকে। ভেঙে ছিল ওর। কড়েটা লাঠি নিয়ে বেরিয়ে এল। ছুট...ছুট...। নিজের চাকা চাকা ভাঙা হাতাকার হয়ে গেল একটা বাঁক নিয়ে পেয়ারা একটা অফিস বাড়ির গ্যারেজের ভেতর ঢুকে গেল বাঁড়টা। ফুটু মাঝ পথে গা ঠেকে সমস্ত ব্যাপারটা দেখল ভুরু কুঁচকে। নিজের মনেই হি হি করে হাসল একবার। ঠিক ফুটের না। ভিজের ইবানীং হাসিকান্নার ভেতর ঘুরে গেছে। কিছু কাঁপর পাতা সযত্নে ধরে লোভ দেখিয়ে মাথা কাঁপটা কেড়ে আনল। কাঁপও হল। পাতাও রইল। আনন্দে ফুটুর বুকের ভেতর তখন সাঁতাই ঢাকের বাদ্যি বেজেছে।

সাহেবটার দিকে আর একবার তাকাবার আগে ফুটু একটু দূরে কাঠের বাক্সের ওপর ট্রামের অফিসটা দেখল। বিকেলে ওই পাদটাতেই সার সার ড্রিনিবাস দাঁড়িয়ে থাকে। জলপিওলা ঘাড় অবধি চুল বাবরি লাইন দিয়ে ভবাসন্ন হয়ে একে একে গাড়িতে ওঠে। এই শীতেও ড্রিনিবাসিদের গায়ের জামা কাঁধের পরাই শেষ হয়ে যায়। ফুটু ভেবে পায় না ওর একটুকু মাথায় কত উকুন। অথচ ড্রিনিবাসিদের মাথায় যেন ছোট ছোট পাহাড় হয়ে উঁচু হয়ে থাকে। ঘন সহজে।

এসব কথা বিকেলের। এখন ফুটু ওসব ভাবতে পেল না। ভীষণ দুষ্টিতে সে কাঁধে পেপের বান্ধিলোর দিকে নজর রাখছিল। এখন ওপাশটায় লোকজনের চলাচল কম। ইট বাঁধানো চত্বরটায় ছাইরঙা ঘুড়ি ঘুড়ি পেপের দানা লুকোতে দিয়েছে মা। দূরের আশপাশের ঝকঝকে অফিসগুলোর ওপর বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁচি গুজে পেপে মুখে তোলে। ফুটু জানে ওটা দিয়ে দু-তিনদিন দুপুরী যাবে—অফিস-বাবুরা যেমন টিফিনের সময় খায়। তা আর হল না।

ফুটপাথে নাকি জন্ম হয়েছিল ওর। তাই শুনেছে মা-র কাছ থেকে। এখন ও আরো অনেক কিছু জানতে চায়। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মাকে জিজ্ঞেস করে—ওর বাবা কই। কোথা থেকে এল ওরা। ভজাদা তুলসী খুড়ো বা চাঁদা মাসীরই বা কে কে আছে। মা ওসব কথার কোন উত্তরই দেয় না। চুপচাপ রুক্ষ মুখে দু-আঙুলের নেখ দিয়ে পটাপট উকুন মারে। কিংবা কুড়িয়ে আনা মজা তার দিয়ে ভিজের সাঁজ তৈরী করে। হরেক সাইজের সাইজের। ট্রাম কোম্পানীর যে লোকটা লোহার রড দিয়ে লাইন এদিক ওদিক করে সে মাঝে মাঝে মাঝ সন্ধে হেসে গল্প করে। পয়সা দিয়ে ফুটু চা এনে দেয় বস্তির ওপাশের দোকানটা থেকে। একটু আধটু পাউরুটি কোন সময় সেই সুযোগে সাপ-বং জোগাড় করতে পারে মা। তুলসী খুড়ো বসে বসে সেই রং সব্জিগুলোয় লাগিয়ে দেয়। যেন মাস্তিক ভাজে তুলসী খুড়ো। ফুটু অবাক চোখে সব্জিগুলোর বাহার দেখে। তারপর সেইসব সব্জি নিয়ে হাওড়া ব্রীজের ওপর বেচতে যায়।

ট্রামের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে দুটো বুড়ো লোক মাকে দেখছিল। হঠাৎ ফুটুর নজর পড়ে গেল। ভাল শাড়ী মা-র একটাই। ভাল মানে অনেকটা পোটা। বাকি আর একটা একেবারে ধুলিধূলি। ভিজে কাপড়টা ছেড়ে মা ধুলিধূলিটা কোনরকমে গায়ে জড়াচ্ছিল। মাকে দেখতে দেখতে আর একবার হাসি এল ফুটুর। আগে ও ভাবত মা-র যদি ওর মত হাঁটু অবধি বড় জামা থাকত বেশ হত। তা হয় না। এখন ও জানে ভেবে—ওরও জামা কাপড় হলে বদ্দ ভাল হয়। আশপাশের দশা-বলা, সিনেমার বই আর কাজু-বলা যা বহুনা মাসীর কাছে যে লোকগুলো পান খেতে এসে হাটুমুড়ে বসে গল্প করে তারা এখন ওর দিকে ঝুলে ঝুলে কয়ে তাকায়। অবশ্যমত যমুনামাসী ওকে হাতে ডেড় ডাকে। পানের সাপ্লেকেটার পাশে বসিয়ে সুপুরি তুলে দেয় হাতে। নানান রকম গল্প করে। ভজাদা ওদের কে জানতে চায়। আগে ফুটুর ওসব ভাল লাগত। এখন কেন কি রকম লাগে। যমুনামাসী আসলে যে কী বলতে চায় ও ঠিক বোঝে না।

মাটির পুরনো মালসাটায় ভাত চাপিয়ে ফুটুকে ডাকল ওর মা—উঠে! ইদিক আয়।

ফুটু হাত দিয়ে জামার পিঠের ছেঁড়া দিকটা ঢাকা। সামলাল একবার। তারপর একটা হাঁচ চলে যাবার পর ধীরে ধীরে বস্তা খেড়োল। আরো কিছু কাঠ-পাতা কুড়িয়ে আনতে হল এদিক ওদিক থেকে। সেইগুলো নিয়ে মালসাটায় সামান করে জ্বাল দিতে লাগাল ফুটু। চারদিকে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে লক্ষ রাখছিল ও। যা দিন কাল। ভাত কটা পেটে না যাওয়া পর্যন্ত শান্তি নেই।

ফুটুর মা তখন কুড়িয়ে আনা কাঁপ দাগি অল্প পেয়ারা কাঁপ আর কাঁপর পাতা টুকরো করছিল একটা টিন-কাটা পাত দিয়ে। সব একসঙ্গে মিশিয়ে বেশ ভাল একটা তরকারী করে মা। মুরগীখানার বস্তাকাড়া ছক্কাল থেকে হলুদ লংকার টুকরোটাকরাও কুড়িয়ে আনে। ফুটু দেখতে না পেলে মোয়াদ হয় না তরকারীতে। অবশ্য সবদিন জোটে না। যা জোটে সেদ্ধ নিয়ে হয় চেটপাটে।

মা তাই ফুটপাতেরই আশে নোড়া ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কটা মশলা বাটতে বসল।

ফুটু একটু অন্যমনস্ক ছিল। এই ফাঁকে ফ্যান উথলে পড়ছিল মালসাটার গা বেয়ে। নাকে পোড়া গন্ধ যেতেই জ্বালানি সরিয়ে নিল ফুটু। চোখে ধোঁয়া লাগছিল। বাঁ হাতে মুছে একবার চোখদুটো রগড়ে নিল ও। ধোঁয়ায় চোখ বড় জ্বলে।

ভাত আর তরকারী হতে হতে বেলা বাড়ল। একটু পরে অফিস ছুটি হলে ট্রামে বাসে রাস্তায় গিজ গিজ করবে মানুষের ভীড়। ফুটুদের এলাকার আশেপাশেও ভীড় বাড়বে। ড্রিনিবাসিদের সঙ্গে গল্প করতে করতে ফিরবে কে যাবু।

খানিক পরে মা বলল—ডাক দিকিন।

কাকে ডাকতে হবে বলল না মা। তবু ফুটু জানে বিশেষ করে মা ভজাদাকে বোঝাল। অবশ্য তুলসী খুড়ো আর চাঁদা মাসীকেও ডাকতে হবে। এই নিয়ম। ওদিকের বাগানটার ধারে খোলা জমিতে ঘাসে বসে ওরা তাস খেলে। মাও খেলে মাঝে মাঝে। খেলাটা ফুটু ঠিক ধরতে পারে না এখনও। ভজাদা একদিন ওকে তাসটা দিখিয়ে দেবে বলেছে।

জ্ঞান হবার পর থেকে ফুটু দেখেছে ভজাদাকে মা সবসময় কিছু বলে ডাকে না। 'এই' অথবা বলছিলুম কি' এই ধরনের সম্বোধনই করে। প্রথমে ভজাদা কাছাকাছি না থাকলে [illegible]

ভজাদাও ঘুরিয়ে কথা বলে। যেন একটা অর্ধবৃত্তের মধ্যে পড়ে সম্বোধনটা এড়িয়ে যায়। কিছু না বলে ডাকলেও কথা বলা অটকায় না।

বিনা অস্ত্রোপচারে
অর্শের
জ্বালা-যন্ত্রনা
থেকে
দ্রুত আরাম
পেতে হলে
হ্যাডেনসা
মলম
ব্যবহার করুন!

টু জানে না কবে থেকে ভজাদাকে লে ডাকা সুরু করেছে ও। এমনিতে মন্দ না চেহারাটা জোয়ান জোয়ান। র্দির ভোগে পড়েনি এখনও। ঘির পাড় এই এলাকার ভজাদা বলতে অজ্ঞান।

খুড়ো চাঁদা মাসী মা ছাড়া পাশাপাশি আরো পাঁচজনের অভিভাবক। ঘরে যে কোন কাজে সমানে। আপদবিপদে, অসুখ-বিসুখে বা এমনি যে কোন সময়ে ভজাদার পরামর্শের দাম আছে। লোকটা জানেও কম না। কল কাতার রাস্তাঘাটে কত কী যে দেখে অফিস সন্ধের পর খেয়ে দেয়ে উঠে বিড়ি টানতে টানতে গল্প করে। নিজের মতবা বা মতামতও দেয় ভজাদা। ফটু শুধু শুনে যায়, কাশির দমকে খিক খিক করে তুলসী খুড়ো। মা তখন কাঁথা পেতে, ছেঁড়া কম্বল বিছিয়ে গ্যাসের শেলটারটার নীচে বিছানা পাতে।

মা আর চাঁদামাসীর মাঝখানটিতে কুণ্ডলী পাকিয়ে শোয়। একটু তফাতে তুলসীখুড়ো আর ভজাদা। বৃষ্টি-বা কনকনে শীতের রাতে ওরা উঠে বসে থাকে। কতদিন মাঝরাতে তেপো উঠে ফটুকে দেখেছে—ওরা ভিজে একশা। তবু মা চাঁদামাসী ফটুর মাথে ঠিক ঠিক ঘুম হয়, না জাগে—সোহাগে কড়া নজর রা নানারকম কষ্টও ওদের গায়ে

করদাতাগণ
আপনারা আয়কর, সম্পদকর বা দানকর দেবার জন্যে ডিমান্ড নোটীস পেয়েছেন কি?

পেয়ে থাকলে, নোটীসে উল্লিখিত তারিখের মধ্যে যাতে আপনি প্রদেয় কর অবশ্যই জমা দিতে পারেন তার ব্যবস্থা করুন।

কোনও অনিবার্য কারণবশতঃ নোটীস অনুযায়ী টাকা জমা দেওয়া যদি আপনার পক্ষে কিছুতেই সম্ভবপর না হয় তাহলে নির্দিষ্ট তারিখের আগে আপনার আয়কর নিরূপক আধিকারিকের কাছে তারিখ পিছিয়ে দেবার জন্যে বা কিস্তিতে টাকা দেওয়া মঞ্জুর করার জন্যে আবেদন করুন।

প্রদেয় কর বা তার কোনও কিস্তি আপনি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জমা না দিলে কী হতে পারে?

সে ক্ষেত্রে আপনি করের পুরো টাকা জমা দিতে ব্যর্থ হয়েছেন বলে গণ্য করা হবে এবং তার জন্যে :—

(ক) আপনাকে সুদ দিতে হবে;

(খ) আপনার অর্থদণ্ড হবে; এবং

(গ) কর পুনরুদ্ধার সার্টিফিকেটের অধীনে আপনার বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হতে পারে যার ফলে আপনার স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক বা বিক্রীসহ অন্যান্য শাস্তিমূলকব্যবস্থা গ্রহণ করা হতে পারে।

মনে রাখবেন

জ্ঞাতসারে কর, অর্থদণ্ড বা সুদ না দেওয়ার পরিণাম সশ্রম কারাদণ্ড, যার মেয়াদ

(ক) সংশ্লিষ্ট অর্থের পরিমাণ এক লক্ষ টাকার বেশি হলে ন্যূনতম ছমাস থেকে নিয়ে সর্বাধিক সাত বছর পর্যন্ত

(খ) অন্যান্য ক্ষেত্রে খেলাপের দরুণ কমপক্ষে তিন মাস থেকে সর্বাধিক তিন বছর পর্যন্ত

• আয়ের হিসাবে স্পষ্টতঃ কিছু ভুল থাকার জন্যে যদি দাবীকৃত করের পরিমাণ সংশোধন করার প্রয়োজন ঘটে তাহলে করের হিসাব সংশোধন করার জন্যে আপনার আয়কর নিরূপক আধিকারিকের কাছে আবেদন করুন। কিন্তু সুদের টাকা যাতে ধরে না দিতে হয় তার জন্যে নোটীস উল্লিখিত তারিখের মধ্যে দাবীকৃত করের টাকা জমা করে দেওয়াটা সমীচীন।

• যে হিসাবের ভিত্তিতে কর দাবী করা হয়েছে তার বিরুদ্ধে কোনও আপীল গ্রাহ্য হবে না যদি—

(ক) আপনার আয়ের বিবরণ অনুযায়ী আয়কর বা সম্পদ কর না দেওয়া হয়ে থাকে

অথবা

(খ) প্রদেয় অগ্রিম কর জমা দিয়ে দেওয়া হলেও আয়ের বিবরণ পেশ না করা হয়ে থাকে।

নিজের স্বার্থে ও দেশের কল্যাণে কর বিধি পালন করুন

ডিরেক্টর অফ ইন্সপেকশান
(পাবলিসিটি অ্যান্ড পাবলিক রিলেশানস)
ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্ট
নিউদিল্লী।

আঁচ লাগতে দেয় না। বসে বসে অনায়াসে বিড়ি টানে। কিংবা তুলসীখুড়োর হাত থেকে কলকে নিয়ে নেশায় দম দেয়।

রাত্তিরে মাঝে মাঝে ফুটুর গায়ের সঙ্গে গা সিঁটিয়ে শুয়ে থাকে আর একজন। সে ও এলাকার সকলের চেনা-জানা কুকুর বাঘা। ফুটুর পিছু পিছু সবসময় ঘুর-ঘুর করে। সন্ধ্যের ওরা যখন ভাত খায় বাঘা গাছতলায় বসে ল্যাজ নাড়ে। দুপুরে রোদে চুল এলিয়ে ফুটুরা যখন পরস্পর উকুন বাছে তখন বাঘাও একমনে নিজের গা চাটে। ফুটু কোলে টেনে নিয়ে গা থেকে এঁটুলি তুলে দেয় একটা একটা করে। বাঘা ল্যাজ নাড়ে। ঘাড় এদিক ওদিক করে মুখে আহ্লাদের সুর ফোটায়। লালদীঘির পাড়ের চান করতে গিয়ে বাঘাকেও জলে ঠেলে ফুটু।

এক্কবার মাঝরাতে ঘুম ভেঙে উঠে পড়েছিল ফুটু। পেটের ভেতর ভুট-ভাট করছিল খাওয়া-দাওয়ার টুকরাগুলো। চেপেচুপে অনেকক্ষণ শুয়ে ফুটু এপাশ ওপাশ করল। শেষে আর পারল না। অস্বস্তিতে উঠে পড়তেই হল।

আবার জায়গায় ফিরে কিরকম যেন খটকা লাগল ফুটুর। তাড়াহুড়োতে ঘুমন্ত চোখে ঠিক খেয়াল করেনি। এখন যেন মনে হল ওর বাঁপাশে কেউ নেই। ছেঁড়া মাদুরটা অবশ্য ঠিকই বিছানো আছে। হাতির ওদিকটায় শুয়েছিল মা। আর এপাশে চাঁদামাসী। গরমকাল। কাজেই ভজাদা একটু এগিয়ে বাঁদিকের চত্বরটায় শুয়েছিল—ছেঁড়া বস্তা পেতে। ওদিকে হাওয়া বেশী। গরমে ঘুমটা ভালই হয়।

চাঁদামাসী নড়েচড়ে পাশ ফিরে শুল। ফুটু নীচু হয়ে বসে দেখতে চেষ্টা করল। পেল না। রাত গভীর। ফুটু বুঝে উঠতে পারল না মা কোথায় যেতে পারে। তেমন কিছু হলে ওর সঙ্গে দেখা হয়ে যাবার কথা। অথচ রেলিংয়ের ধারে বা হাইড্রান্টের জলের কাছটায় মাকে দেখতে পায়নি ও। আশপাশে চোখ বুলিয়ে একটিও জন-মনিষ্যি দেখতে পেল না। মাথার ওপর গাছগুলোর ভেতর কটা রাতজাগা পাখী শুধু জানা কাপটাচ্ছিল। রাস্তার আলো-গুলো জ্বলছিল বড় একা একা।

আর কিছুটা এগিয়ে মাকে একবার খুঁজতে চেষ্টা করল ফুটু। জন্মে এই প্রথম এত রাতে ও একা নির্জন জায়-গাটায় ঘুরে ঘুরে মাকে খুঁজছিল। একবার ভাবল ভজাদাকে ব্যাপারটা বলা উচিত। নাহলে পরের দিন হয়তো ওকেই দুষবে সকলে। বলতে গেলে ভজাদাই ওদের মাতব্বর। সব খবর ঠিক সময়ে তার জানা দরকার।

অথচ আশ্চর্য! ভজাদা যে জায়গাটায় শুয়েছিল সেখানে গিয়েও ফুটু কাউকে দেখতে পেল না। সঙ্গে সঙ্গে খুব ভয় পেয়ে গেল ও। চোখদুটো জলে ভরে উঠল নিমেষে। একে গভীর নির্জন রাত, তার ওপর মা এবং ভজাদা কাউকেই দেখতে না পেয়ে ফুটুর বুক ঠেলে কান্না বেরিয়ে আসতে চাইল।

তবু কোনরকমে কান্না রোধ করে ধীর পায়ে নিজের বিছানায় ফিরে গেল ও। চাঁদামাসীকে ঘন ঘন ধাক্কা দিয়ে ডাকারও চেষ্টা করল কবার। চাঁদামাসীর গা-হাত-পায়ে সামান্য মাংসও নেই। জীর্ণশীর্ণ শরীর। ফুটুরা সবাই জানে—ওর বুকটা কাঁঝরা হয়ে গেছে। আর বাঁচবে না চাঁদা-মাসী। কাজেই কোন ব্যাপারে মাসী থাকে না। তবু এমন অবস্থায় খুব ভয় পেয়ে ফুটু চাঁদামাসীকে ডাকতে লাগল। এপাশ ওপাশ করে বার-দুই উঁ আঁ শব্দ করল চাঁদামাসী। তারপর হাত-পা দুমড়ে-মুচড়ে গভীর ঘুমে ডুবে গেল।

আর নিশ্চিন্তে ঘুমুতে পারে নি ফুটু। অস্বস্তি আর কান্না বুকের মধ্যে চেপে রেখে সারারাত ছটফট করেছিল। ভয় ছিল ওর মনে। বুকটা হা হা করছিল।

পরের দিন ঘুম ভাঙল অন্য দিনের চেয়ে বেলা করে। চোখ খুলেই ফুটু গত-রাতের দুশ্চিন্তা আর অস্বস্তি ফিরে পেল। ধরিতে বিছানা ছেড়ে উঠে ও ভজাদা আর মাকে দেখতে চাইল। ফুটু দেখল ওর মা তখন বিছানাপত্র গুটিয়ে অতি ব্যস্তে রোদ দিচ্ছে গাছের নীচে বাঁধানো ইটের তলাটায়। আর ভজাদা কি একটা ভাল ভেঙে দাঁত ঘষছে।

নিজেকে তৈরী করে ফুটু চার-পাঁচবার মার কাছে জানতে গিয়েছিল ব্যাপারটা। কী হয়েছিল মার? কোথায় ছিল মা? কৌতূহল আর চেপে রাখতে পারছিল না ও। তবু এগিয়ে পিছিয়ে, ভজাদার মুখের চেহারায়, কী ছিল কে জানে পড়ে নিয়ে ফুটু ওসব কিছুই জিগ্যেস করতে পারেনি মাকে। সেই যে কৌতূহল চেপে রাখল বুকের মধ্যে, একটা কষ্ট দুঃখ পুষে রাখল—তারপর থেকে অনেক কিছুই আপনাআপনি জানা হয়ে যায়। কাউকেই আর জিগ্যেস করতে হয় না। যমুনা-মাসী বা ষ্টীম কোম্পানীর লোকটা কী বলতে চায় যেন একটু একটু বুঝতে পারে ও। সেই দিনের পর থেকে ফুটু যেন চড় চড় করে বড় হয়ে উঠছে।

খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকতে সন্ধ্যের পর একটা ছেঁড়া টায়ার জ্বালালো ভজাদা। তুলসীখুড়ো চাঁদামাসী ফুটুর মা ফুটু আর ভজাদা গোল হয়ে বসল আগুনটার চার-পাশে। সবে সন্ধ্যে হল। এর মধ্যেই রাস্তাঘাট ফাঁকা হতে সুরু করেছে। আজ-কের শীতটা বেশ কড়া। ফুটু সারা শরীরে আগুনের তাপ নিতে নিতে ভেবে দেখল।

একসময় ভজাদা বললে—তোর জন্যে একটা জিনিস আছে ফুটু।

ফুটু চোখ তুলে দেখল। কিছু বলল না। ইদানীং ভজাদা ওকে এটা ওটা দেয়। ফুটু হাত পেতে নেয়। খাবার জিনিস পায়ই না ওরা। পেলে ঠেলতে পারে না তাই। অথচ ভজাদাকে যেন বড় বেশী রহস্যময় মনে হয় ফুটুর। তবু উপায় নেই—যার তার আপদে বিপদে ভজাদা আছেই। গত বছর রাস্তার ওপারে একটা বুড়ী মারা গেল—হিক্কা তুলতে তুলতে। ওর ছোট ছেলেটা এসে ভজাদাকে ধরল। আরো কজনকে ডেকে নিয়ে জি-পি-ও-র ধারে গামছা পেতে দাঁড়িয়ে চাঁদা তোলা থেকে সুরু করে বুড়ীকে পোড়ানো পর্যন্ত সমস্ত কাজকর্ম করল ভজাদা। অবশ্য ফুটু জানে ঐ পয়সা থেকে বেশ কিছুটা ভজাদা সরিয়েছিল। সরিয়ো পরের দিন ভাত-মাংস হল। বেশ তৃপ্তি করে খেয়েছিল ওরা।

—কি রে? ভজাদা উঠে এসে ফুটুর পাশে বসতে বসতে বলল—নিবি না?

—কই দাও। ফুটু হাতটা সামনে মেলে ধরল। কাছাকাছি তেমন কিছু দেখতে না পেয়ে ভাবল—নিশ্চয়ই ভজাদার পকেটে কিছু আছে। টুকটাক কিছু খাবার বা এক চিলতে লাল ফিতে।

খানিক চুপ করে থেকে ভজাদা দুগালে সরু হাসি ছড়িয়ে বললে—কী দিবি বল্ আমাকে?

ফুটু কিছুতেই কিছু বুঝল না। বোকা বোকা চাহনিতে ভজাদাকে দেখতে লাগল শুধু।

ইদানীং ভজাদাকে ঠিক বুঝে উঠতে পারে না ফুটু। যেন কিরকম নতুন লোক মনে হয়। আগে কত সহজ ছিল ভজাদা। অন্তত ফুটুর সঙ্গে তার ব্যবহার ছিল অতি সরল। এখন কিন্তু ক্রমশই ভজাদা যেন দুর্বোধ্য হয়ে উঠছে। প্রায়ই ওর দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকায় বা কথা বলে যে ফুটু অন্য কিছু ভাবে। ভজাদার ঐ গালের দু-পাশে ছড়ানো হাসির অর্থ ফুটু ঠিক ধরতে পারে না। তবু মনে হয় যেন কোন ইঙ্গিত থাকে তার কথাবার্তায়, হাসি বা চাহনিতে। বড় অস্বস্তি লাগে।

ধোপদুরস্ত জামা-কাপড় পরা একবাবু আজকাল এদিকটায় প্রায়ই ঘোরাফেরা করে। লোকটা হেসে হেসে কথা বলে ভজাদার সঙ্গে। যেন জিগরী দোস্ত। প্যাকেট বের করে সিগরেট দেয় ভজাদাকে। দুএকটা বিড়ি বা পোড়া সিগরেটের টুকরা ছাড়া ভজাদার অন্য কিছু জোটে না। বা মাঝে-মধ্যে তুলসীখুড়োর কাছে চেয়ে নেয় এক ছিলিম গাঁজা। কাজেই যেন হাতের মধ্যে চাঁদ পেয়ে ভজাদা চোখ বুঁজে সিগরেট টানে।

ফুটু আজ তিন-চার দিন লোকটাকে দেখছে। লোকটা এলে ভজাদা তাস ফেলে উঠে পড়ে। দৌড়ে বাবুটির কাছে গিয়ে হাত কচলিয়ে এমনভাবে দাঁড়ায় যেন সে অন্য লোক। ফুটু তাকে ঠিক চেনে না। কিন্তু মাথা নেড়ে অনর্গল ভঙ্গীতে গল্প

লাইব্রেরীতে রাখার মত কিছু

শংকর
- সম্রাট ও সুন্দরী ১২-০০
- জনঅরণ্য ১২-০০
- আশা আকাঙ্ক্ষা ১০-০০
- সেখানে যেমন ১০-০০

সৈয়দ মুজতবা আলী
- চতুরঙ্গ ১২-০০
- মুসাফির ৯-০০
- দত্ত না অদত্ত জল ১৪-০০
- দরবেশ ১০-০০
- অবিশ্বাস্য ৬-৫০
- হিটলার ১০-০০
- রূপছায়া ৮-০০
- স্বপ্ন মধুর ৬-০০
- শহর-ইয়ার ১৪-০০

চাণক্য সেন
- রেশ ১০-০০
- আশোক উল্লিখিত গ্রাম ১০-০০
- আজ এখানে ৭-০০
- সবে শুরু ৬-০০

গৌড়ানন্দ কবি
- হিং টিং ছট্ ১০-০০

সমরেশ বসু
- [illegible] ৬-০০
- নাটের গুরু ৬-০০
- প্রজাপতি ৬-০০
- মুহানদনি ৬-০০
- রূপায়ণ ৫-০০
- প্রকৃতিদিদি ৮-০০
- [illegible] ৫-০০
- অন্যান্য সংবাদ ৫-০০
- [illegible] ৮-০০
- [illegible] ৪-০০
- [illegible] ৬-০০
- [illegible] ৪-০০

বিমল কর
- প্রেমশশী ৮-০০
- অসময় ভ্রমণ ১-০০
- ঘুমা ৬-০০
- নির্ভর ৬-০০

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
- ভুল সত্য ৬-০০
- পূর্ণের উদ্যান ৬-০০

বিশ্ববাণীর বই

শচীন ভৌমিক
- বেত সাইড শচীন [illegible] ১৫-০০
- শেষ শাহরী ৬-০০

অবন্তী সান্যাল মজুমদার
- হাজার বছরের প্রেমের কবিতা ১৫-০০

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
- পাথরের চাকুরে স্পর্শ ৬-০০

নিমাই ভট্টাচার্য
- [illegible] ৬-০০
- [illegible] ৮-০০
- [illegible] ৪-০০
- [illegible] ১২-০০
- [illegible] ৮-০০
- [illegible] ৮-০০
- [illegible] ৮-০০
- [illegible] ৭-০০

কালকূট
- [illegible] ৮-০০
- [illegible] ৭-০০
- [illegible] ৮-০০

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
- [illegible] ৬-০০
- [illegible] ৬-০০
- [illegible] ৭-০০
- [illegible] ৫-০০
- [illegible] ৬-০০
- [illegible] ৬-০০
- [illegible] ৫-০০
- [illegible] ৫-৫০
- [illegible] ৬-০০
- [illegible] ৮-০০
- [illegible] ৫-০০
- [illegible] ১৫-০০

[illegible]
- [illegible] ৬-০০

[illegible]
- [illegible] ৬-০০
- [illegible] ৮-০০

[illegible]
- [illegible] ৭-০০

[illegible]
- [illegible] ১৫-০০

ফুটু ভজাদার দিকে অবাক চোখে চেয়ে রইল। তারপর কিছু না বুঝে অসহায় দৃষ্টিতে মার দিকে তাকাল। সন্তানোচিত বিস্ময় বা জিজ্ঞাসা প্রকাশ করল না মা। কাজেই বড় অস্বস্তি হল ফুটুর। যা কিছু অতি সহজে ওদের পক্ষে কথা নয় ঠিক ঠিক তা জুটে গেলে অস্বস্তি হবেই। ফুটু জানতে পারল না যে বাবুদের বাড়ীর মেয়েদের মত ও এখন কেন শীতের রোদে বেড়াতে চলল। এবং ব্যাপারটা ওর কাছে যত আশ্চর্যকরই হোক —মা বা ভজাদা প্রতি সহজ। মাথার মধ্যে এতসব ভাবনা নেই ফুটুর। মেয়েটা যেন বড় একা নিঃসঙ্গ বোধ করল। বাস্তবিক বড় বিপদে পড়ে গেল ও।

নানারকম ওজর আপত্তি তুলে ফুটু ভজাকে বেরোতে চাইল না। চাইবার আগেই ছাড়-ওরকারী ভাল শাড়ী আর লাল ফিতে পেয়ে ওর মনটা হাল নেই। এই এক ভজাদা ফুটুর। ওর ভেতরটুকু যে ইদানীং কত কৌতূহল, দুঃখ, কষ্ট অদ্ভুত ধরনের নতুন নতুন বোধ কাজ করছে—কিছুতেই বোঝাতে পারে না ও। বলা বলি করবও ঠিক জিনিসটা বোঝানোর মত ভাষা ওর নেই।

তবু বেরোতেই হল। কালকের শাড়ীটা কুঁচিয়ে পরে গায়ে দিল মা-র জামাটা। মাপ ওটা সমানই ছিল। শুধু কোন রকমে চালিয়ে নেওয়া যাবে।

শাড়ী জামা পরার পর মা বলল—বোস। কি ছিরি চুলের! বলে দাঁড়-ভাঙ্গা বড় চিরুনীটা দিয়ে জট ছাড়াতে লাগল। ওদের আবার চুল! তার আবার ছিরি! কি যে নতুন নতুন কথা বলে মা। ফুটু ভেবে পেল না।

অনেকক্ষণ এ রাস্তা ও-রাস্তা ঘুরে ভজাদা স্ট্র্যান্ড রোড ধরে এগিয়ে ডানদিকে বড়বাজারের দিকে ঢুকে পড়ল। এদিকটা ফুটুর একটু একটু চেনা। মাঝে মধ্যে মা আর ও এদিকে চলে আসে। ফুটপাথে অনেকজায়গা পাওয়া যায়। তাছাড়া মাসের দ্বিতীয় মঙ্গলবার এক ভুঁড়িওলা মাড়োয়ারীর গদি থেকে প্রত্যেককে ফুটো কলা পয়সা দেওয়া হয়। ফুটু আর ওর মা লাইনে দাঁড়ায় অনেকবার। একদিন ফুটু ঘুরে এসে আর একবার লাইনে দাঁড়িয়েছিল—আমরা দুটো

ডাঃ স্নেহময় বসু এম.বি.বি.এস.
ডাঃ এস এন পাণ্ডে এম.বি.বি.এস
যৌবনের রহস্য
প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য • মূল্য ৮৲
যৌন বিজ্ঞানের প্রবীণ ও অভিজ্ঞ
চিত্রিত অতি আধুনিক সংস্করণ।
মোহন লাইব্রেরী
আজই ৮৲ টাকা পাঠিয়ে অর্ডার করুন

পরসার জন্যে। যে বাড়ীতে আজকাল মানে মাসের বাড়ি থেকে খুচরো তুলে তুলে হাতে দেয়—ঠিক ধরে ফেলল ওকে। বকেঝকে গলায় বলল—এগো ছোটা লাইকা। ওকে চিনতে পারল বোধ হয় ফুটু সেদিন সত্যিই আশ্চর্য হয়েছিল।

ফুটু বললে—এদিকে কোথায় যাচ্ছো? এই ভীড়, ছিল্লী।

—আয় না। ভজাকে সহজে কথা ভাঙ্গল না। এগিয়ে এগিয়ে বিজের মত হাটতে লাগল সে।

একটু পরে বড় একটা মশলাপাতির দোকানের সামনে উঁকিঝুঁকি মারতে লাগল ভজাদা। ফুটু আশ্চর্যস্বরে শুধালো —কি গো? কী এখানে?

কিশোর উত্তর দিল না ভজাদা একবার শুধু বললে—তুই বড় অধৈর্য। একটু দাঁড়া না।

অল্প পরেই দোকানটার পাশের সরু রাস্তার গায়ের দরজা দিয়ে একটা লোক বেরিয়ে এল ওদের দিকে। বলল—আরে আরে, এসো ভজাভাই।

ভাল করে তাকিয়ে লোকটাকে চিনতে পারল। এই লোকটিই গত দু-তিন দিন ওদের আস্তানার কাছে ঘুর ঘুর করছিল। এর সঙ্গেই ভজাদার যত বন্ধুত্ব।

ভজাদা 'আয় ফুটু' বলে এগোতে শুরু করল লোকটার পেছন পেছন। ফুটু কিছু বলার সুযোগই পেল না। ওর একেবারেই ইচ্ছে করছিল না ভেতরে যেতে। তবু উপায় নেই। লোকটার পিছু পিছু ভজাদার সঙ্গে ও দোকানঘরের পেছনের ঘরটায় ঢুকে পড়ল—কৌতূহল আর ভয় নিয়ে।

ভেতরে আরো ক-টি মেয়েকে দেখতে পেল ফুটু। কি একটা মেশিন ঘর ঘর আওয়াজ করছিল। মেয়েগুলো প্লাস্টিকের প্যাকেটে হলুদ আর লঙ্কার গুঁড়ো ভরছিল মেপে মেপে। ফুটু চার দিকটা দেখে নিয়ে বুঝল—এটা গুঁড়ো মশলার একটা কারখানা। যাইয়ে তাহলে গুঁড়ো মশলারই দোকান ওটা।

ফুটু কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই ভজাদা স্বভাববিরুদ্ধ ভঙ্গীতে দু-গালে লম্বা করে হাসি ছড়াল। বললে—কি রে পারবি না ফুটু?

অস্ফুটে ফুটু বললে—কী? ও মেয়েগুলোর কাজ দেখছিল। অবাক চোখে মেশিনটার কাজকর্ম যেন বুঝতে চাইছিল। মেয়েগুলোও ওকে লক্ষ্য করছিল কৌতূহলে চোখে।

ভজাদা নীচু গলায় বললে—চাকরীটা হয়ে গেল তোর। বুঝলি।

ফুটু কি বুঝল ও-ই জানে। মুখে কিছু বলল না। ইদানীং ভজাদার সমস্ত কাণ্ডকারখানায় ও শুধু অবাক হয়।

লোকটি বললে—খুব পারবে। কি বল ফুটু? বলে গাল টিপে আদর করল। ফুটু বুঝল—লোকটা ওর নামও জানে।

—আজ তুমি কাজ দেখ শুধু। শিখে নাও। বলে লোকটা ভজাদাকে নিয়ে ভেতরের ঘরে চলে গেল।

এই প্রথম ফুটু দেখল পেছনের দিকে আরো একটা দরজা আছে। নিশ্চয়ই ভেতরের ঘরে যাবার রাস্তা ওটা।

সন্ধ্যের আগেই মেয়েগুলো কাজ ছেড়ে উঠে পড়ল। লোকটা তখন প্যাকেটগুলো গুনে গুনে তুলছিল। ফুটু ভজাদাকে আর দেখতে পেল না। দেখে নিজে থেকেই বললে—আজ আমি চলি।

—যাবে যাবে। কাজে ব্যস্ত থেকে লোকটি বললে—দাঁড়াও। ওরা সব যাক। তোমার সঙ্গে কথা আছে। সব বুঝিয়ে দেব তোমাকে। তবে তো কাল থেকে ঠিক কাজ করতে পারবে। কি বল? বলে হা হা করে হাসল লোকটা।

ফুটুর গায়ে যেন জ্বালা ধরে গেল। দিনদুপুরে ভজাদার কাণ্ড। সন্ধ্যে হয়ে গেল। যে কটি মেয়ে আর একটু আগে কাজ করছিল এখানে—তারাও চলে গেছে। ওকে একলা রেখে না বলে-কয়ে কখন যে ভজাদা কেটে পড়ল—জানে না ফুটু। কদিন ধরেই লোকটার চলাফেরা ফুটুর ভাল লাগছিল না। আর এখন সত্যি সত্যিই ওর ভয় করছিল। গুঁড়ো মশলার এই কারখানায় ওর চাকরীটা হয়ে গেল। তবু যে ফুটুর ভয় কীসের কে জানে!

একটা ছোট ছেলেকে দিয়ে কিছু খাবার দাবার আনিয়ে লোকটা ওকে ছুটি দিয়ে দিল। ফুটু বললে—আমি এবার যাই। ওর গলাটা বসা বসা। কথাটা ঠিক ফুটল না।

—তাই কি হয়! লোকটা আবার হা হা করে হাসল। এসো ভেতরে এসো। একটু খাও আগে। সেই কখন খেয়েছ তুমি!

সত্যিই খিদে পেয়েছিল ফুটুর। তবু ভয় ভয়ে বলল—না। সন্ধ্যে হয়ে গেল। মা ভাববে।

—কিছু ভাববে না। চিরকাল কেউ কারুর জন্যে ভাবে না। চলো ঘরে চলো। বলে ফুটুর কাছাকাছি এগিয়ে এসে প্রায় গায়ের পাশে দাঁড়াল লোকটা। নিঃশ্বাস বন্ধ করে ফুটু জায়গা ছেড়ে সরে দাঁড়াচ্ছিল। ওর পা হাত পালাবার বল বলতে যেন কিছু নেই।

খাবারের চাঙ্গাড়িটা ওর পায়ের কাছে লোকটা ঠায় দাঁড়িয়ে ওকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল। ওর দাঁড়ানোর ভঙ্গী চোখমুখের চাহনি, হা হা হাসি সব দিয়ে যেন ফুটুকে ছিন্নভিন্ন করছিল।

আর মতের মত কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে ফুটু মনে মনে খাবারগুলোর জন্যে আফসোস করছিল। কেননা ওর শরীরে নেশা ধরানো যৌবন এসে গেছে বুঝতে পেরেও শয়তানটাকে শায়েস্তা করার মত শক্তি হাত দুটোয় এসেছে কিনা—ঠিক করে যে ঠিক ঠিক পরখ করে দেখা যায় —সেই চিন্তাতেই ফুটু তখন ব্যস্ত।

CENTRAL LIBRARY

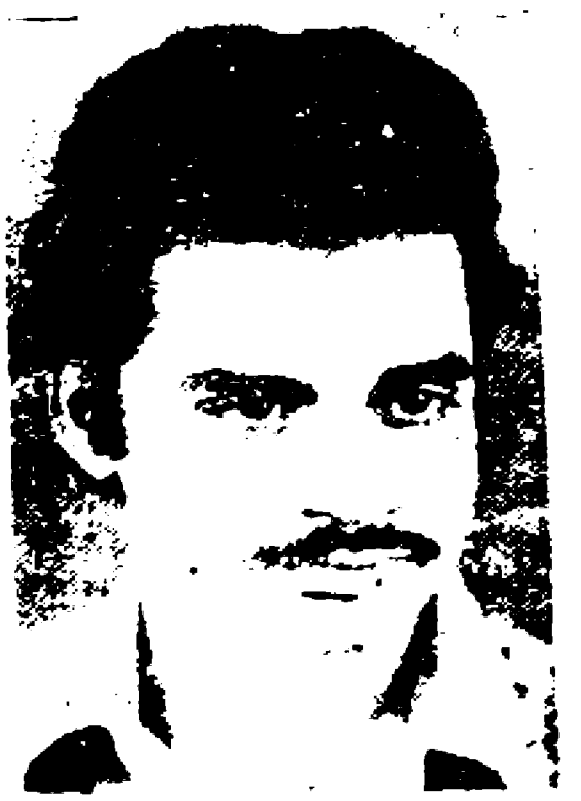

দে'জ পাবলিশিং

এখনো ছেলেরা মাসান্তে দেশের বাড়িতে যান। বাবার কাছে গিয়ে বসেন, নতুন ব্যবসা কেমন চলছে খবর নেন, কোন বই ছাপা বাঁধাইয়ের পর কি দাম ধরা যায়, আলোচনা করেন। ছেলের পরামর্শ নিয়ে চলে আসেন। হয়তো কোনদিন এমন হয়েছে হুট করে কোদালিপুরের বাসভবনে থেকে কলকাতায় এসে ভগবানবাবু বলা নেই কওয়া নেই দোকানের ফাইলপত্তর ঘেঁটে দেখলেন কারো টাকা বাকী আছে কি না। সব সময় ছেলেদের একটা কথা মনে করিয়ে দেন—দেখো বাবা কারো টাকা যেন বাকী পড়ে না থাকে। হিসেবপত্তর কাঁচা আগে পাওনাগণ্ডা চুকিয়ে দাও। দেখো, যেন টাকার জন্যে পাবলিশার লেখক হেনস্থায় না ঘোরে।

ভগবানচন্দ্র যে জীবন-ধর্ম কারবারিলেন ঠিক এই ভাবে, এই সততার উপর। ব্যবসা সংসারে লাভ ক্ষতির হিসেবটা ছোটবেলা থেকেই তাঁর কাছে অঙ্কের মতো সোজা ছিল। কোনো ঘোরপ্যাঁচ নেই, ডাবল এন্ট্রি ফাস্ট বুক ট্রায়াল ব্যালান্স ও প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্টের মতো সোজা।

তাহলে একটু পিছিয়ে যাই।

যখন ভগবানবাবু প্রথম কলকাতায় এলেন। একটা কিছু করতে হবে। অন্তত সংসার চালাবার জন্য একটা কিছু। বাবার হাত থেকে চলে এলেন কলকাতায়। কি করবেন কিছু ঠিক নেই অথচ কোনো কিছু করতে হবেই। একটা কাজ পেলেন স্কুলে সর্বসাকুল্যে ৫০ টাকা মাইনে। তখনকার দিনে এই টাকায় ভাত একটা সংসার অচ্ছন্দে চলে যেতো। কয়েক মাস স্কুলের চাকরীর পর একটা প্রুফরীডিং এর কাজ জুটিয়ে নিলেন। অনিমেষ কলেজের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আবার যোগাযোগ করে আবার স্কুলের চাকরিতে ফিরে আসা। এইভাবেই দিন চলছিলো।

ঠিক এই সময় ব্যাপারটা একটু মোড় নিল। যে স্কুলে ভগবানবাবু কাজ করতেন সেই স্কুলের হেডমাস্টার মাঝে মধ্যে বই লিখতেন। বাজারে দু-একটা বইও বেরিয়েছে। কিন্তু বই বেরুলেই তো হোলো না তাকে ঠিকমতো দোকানে দোকানে পৌঁছে দেওয়া, বিক্রি হোলো কিনা খোঁজখবর নেওয়া, টাকার ব্যাপারটা তাগাদা দেওয়া, সে এক ঝুঁকি। ফলে হেডমাস্টারের বই বাজারে চলছিলো না। ভগবানবাবুকে নানা ব্যাপারে পড়াতে হয়, মাস্টারমশাই একদিন ডেকে বললেন—তুমি তো বাইরে ঘোরো আমার বইগুলো সঙ্গে নিয়ে গিয়ে একটা ব্যবস্থা করো তাহলে আমাকে আর বার বার তাগাদা করতে হবে না। ভগবানবাবু বইগুলো সঙ্গে নিয়ে চেষ্টা করা। কলকাতার বাইরে বই বাজারে দিতে পারলে বিক্রি বাড়বে। এইভাবে দিন যায়। হঠাৎ একদিন আপনা থেকেই মনে হোলো বই বিক্রির সঙ্গে সঙ্গে বই ছাপার ব্যবস্থা করলে কেমন হয়। কথাটা বন্ধুদের কাছে বলা। বন্ধুরা উৎসাহ দিলেন। কিন্তু টাকা কোথায়? মাত্র একশো টাকা সম্বল করে ব্যবসা শুরু করা

অনেকের। ভগবানবাবু যা বই চান সঙ্গে সঙ্গে পার্বলিশাররা দিয়ে দেন, জানেন টাকা মারা যাবার কোনো ভয় নেই।

বইয়ের বোঝা ভারী হয়ে উঠলো।

একমাস বাদে দেখজনন নিয়মিত বই বিক্রি করে দিয়ে ঘুরে কমিশন বাবদ মাসে প্রায় ৬শো টাকা আসছে। সেই বাজারে।

সেদিন ছিল শনিবার। হাপ ডে। তখন কলেজ স্ট্রীট পাড়া শনিবারে বিকেল হাতে না হতেই কাঁপ সব। কেনা কিছুই বই বিক্রি হচ্ছিল, এদিকে বাক্সর খালি। ভগবান বসু চাদর পেতে ফুটপাতে বিছিয়ে দিলেন বই। অফিস ফেরতা মানুষেরা বই কিনলেন সব। বাড়ি যাবেন না, পরের দিন রবিবার ফুটপাত-বই বিছিয়ে বসলেন। বেশিরভাগ বই বিক্রি হয়ে গেল। একদিনে হাতে এলো প্রায় ছশো টাকা। চাট্টিখানি কথা নয়।

স্কুল ছেড়ে কিছিন ভগবানবাবু। তখন সুবোধ লাইব্রেরী দেখাতেন বীরেন বিশ্বাস। পরে বীরেনবাবু নিজে তৈরী করেন বিশ্বাস পাবলিশিং হাউস। তখন বীরেনবাবুর কাছেই থাকতেন ভগবানবাবু। রোজ বিক্রির কমিশনের টাকা বীরেনবাবু গুনে রেখে দেন, এক পয়সাও এদিক ওদিক হয় না। এইভাবেই চলে একেবারে নিয়মিত ছুটির মতো। বই বিক্রি করে পাবলিশারের পাওনা মিটিয়ে দেওয়া কিন্তু চাট্টিখানি আর চলছে না, এবার একটা দোকান নিলেন ভগবানবাবু।

বড় ছেলে হিমাংশুশেখর হে তর্কাবিদ্যা বেশ হয়ে উঠছেন। ব্যবসাটাকে নতুন করে গড়ে তুললেন। বড় ঘর নেওয়া হোলো শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। নাম হোলো—দে বুক স্টোর। ভগবানবাবু তখন দেশের একটি লোককে স্কুলের কাজে লাগিয়ে দিয়ে-ছিলেন। হিমাংশুবাবুর সেখানে মন বসে গেছিল তাই হোলো। সালটা তখন কতো হবে? —১৯৬৫-৬৬। তখন হোলসেলিং-এ চলবার মতো ছিল—শ্রীগুরু লাইব্রেরীর। অবশ্য ভাল বই তখন ওদের একচেটিয়ায়। 'ভ-এস লাইব্রেরীও অবশ্য বেশ কিছু' লাই-ব্রেরী অফিসে বই সাপ্লাই করতেন। শ্রীগুরুতে ব্যবার গাইডউইল ছিল। স্ব স্বার ভগভগাট ছিড় দেখে যারা স্বপ্ন দেখতেন এরকম একটা ব্যবসার। ছেলে হিমাংশু সেট জানতেন বাবার স্বপ্নকে সার্থক রূপায়ণ তিনিও ঠিক বাবার মতো দিন-রাত পরিশ্রম করতে লাগলেন। সঙ্গে রইলো মেজোভাই পরেশচন্দ্র দে। ঠাকুমা মারা যেতে বাবা এবার দেশে চলে গেলেন। দে বুক স্টোর তখন পুরোদমে চলছে।

এই সময়ে দুটো বই খুব ভালো ব্যবসা দিল। একটা 'মহাতীর্থ হিংলাজ অর 'ভুলি নাই'।—তখনতো বাজারে এত বই ছিল না, ছোট লাগতো স্টল হুড়হুড় করে বেরিয়ে যেতো। —এই সময় বারানসী স্টল থেকে এলেন ব্রজকিশোর মণ্ডল। 'বিশ্ববাণী' ছিল ঐ ঠিকানায়।—ওখন বই বিক্রির একমাত্র পরিবেশক ছিলাম আমরা। ব্রজর বাবা শ্রীনিবাস-এর কয়েকটা বই বেরিয়েছে। নিয়মিতভাবে বিশ্ববাণী বই বের করতে শুরু করলেন। একদিন নিমাই ভট্টাচার্য দোকানে বই কিনতে এসেছেন তাঁকে অনু-রোধ করলুমে বই দেবার জন্য। মেমসাহেব বেরুলো। ইতিদিনে হোলসেলার হিসেবে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে নাম ছড়িয়ে পড়েছে—চটে মড়ে লট যাচ্ছে কানপুর জব্বলপুর দিল্লী এলাহাবাদ কোথাও বাদ নয়।

সেজোভাই সুধাংশুশেখর যে এসে গদাধরের সঙ্গে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিলেন যে বুক স্টোর এবার নিজস্বাই বই প্রকাশ করবেন। নাম হোল দে'জ পাবলিশিং সালটা সোজাসুজি ১৯৭০।

এবার বিশ্ববাণী ঐ ঠিকানা থেকে সরে গেলেন।

সুধাংশু এবার পায়ে পায়ে বাজারে নামলেন। তিনজনে তিনদিকের দায়িত্ব নিলেন—বড়দা—হিসেব, মেজদা—সেলস, সুধাংশু—পাবলিশিং। কিন্তু কাজ করেন সবাই একসঙ্গে, কাউন্টারে। ১৯৭০-এ লেনিন শতবার্ষিকীতে দে'জের প্রথম বই বেরুলো—রেমইনের মহানায়ক লেনিন' ছাপা হল সাইক্লোতে। বিক্রি হয়ে গেল। দ্বিতীয় বই হিসেবে প্রতিভা বসুর 'সমুদ্র হৃদয় পুনঃ-মন্থনের ভার নিল দে'জ। লেখকেরা তখন সেভাকে খুব একটা কেয়ার করছেন। এক-জন নামী লেখক মুখ ফসকে বলেই ফেললেন —বাপু হে, বেশ তো হোলসেলার ছিলে, খামোকা আবার এ লাইনে এলে কেন? শুধু কি লেখক? পাবলিশাররাও শোনাতে ছাড়লো না।

কেন? সেটাতো পরের কথা' কিন্তু সেই সময়ে এ কথাগুলো বুকে এসে বিঁধেছিল। কিন্তু অবিচল ধৈর্য তারপরে বের করলেন—কালকূটের আরব সাগরের জল নোনা।' আশাপূর্ণা দেবীর মনের মূর্খ। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের—কুমার-সম্ভবের কবি শৈল ভবন' সতীনাথ ভাদুড়ীর চোখের বালি নমস্কার' আর সৈয়দ আইয়ুবের —'আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ'। শেষের বই দুটো একাডেমী রবীন্দ্র পুরস্কার নিয়ে এসেছে। বন্ধুর সম্ভব সহযোগিতা করে-ছেন প্রায় সবই। সমরেশ বসুর লগটা বই বেরিয়েছে। একটি আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, প্রফুল্ল রায় সনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের। এছাড়া দু-একটি করে প্রায় সব লেখকেরই বেরি-য়েছে—প্রেমেন্দ্র মিত্র সুশোভন বসু গৌর-কিশোর ঘোষ বিমল কর সুভাষ মুখোপা-ধ্যায়। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় তারাপ্রসন্ন বহুচোরী অনেক নাম আর বলবো। ৬ বছরে বেড়শো বই বেরুনো একটা মনে রাখার মতো ঘটনা।

বাগুড়বাগান থেকে আজ মহাত্মা গান্ধী রোডে কিনতলা বাড়ি কিনেছেন বাবা মা শ্রীমতী কমলিনী দে থেকেই থাকেন ছোট ভাই কাস্ট টাইম পড়ে।—ও এলে আমরা স্কুল বইয়ের লাখা বলবো।

দোকানের অনেক কর্মীকে দেখলাম সাজিয়ে। এখনেই থাকেন। সাজসরঞ্জাম কিছু নেই। গ্রামের মাটির সন্ধা যোগা ছেলে দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় বেরিয়েছেন তিল তিল।

—আমরা কি মনে করি জানেন? আমাদের লাভটা কম থাকুক কিন্তু বই বেরুক, কাজ চলুক। অনেক প্রকা-শকের দেখছি, তাঁরা ফিফটি ফিফটি লাভ রাখতে চান। আসলে ওঁরা পুরনো বাজারটাকে আঁকড়ে থাকতে চাইছেন। কিন্তু এখন তো আর সে বাজার নেই এখন বইয়ে এত লাভ থাকে না। কিন্তু বই ফেলে রাখে দিলেই মার। সমস্ত কলই হোক বিজ্ঞাপন কাটলগিং প্রুফ করে বইটাকে শেষ করতে হবে। সেখানে লাভটা একটু কমই হয়। দাদা বলছেন দুর্দিন আমরা ওঁদের সঙ্গে ঠিক একমত নই। বইয়ের টাকা তো আর একসঙ্গে তুলে নেওয়া যায় না। সেটা রোজ লভ্যে বইয়ে। তাই আমাদের একটা সিস্টার সবিধে হোলো। ফলতঃ আমরাই হোল তাদের সুতরাং নিজের বই না হলেও অন্য বইয়ে দোকান চলে। এবং নিজেদের বইয়ের সেলিং ডিসকাউন্টটা ওখানেই থেকে যায়।

—আচ্ছা আপনাদের প্রকাশনী সম্বন্ধে নতুন কি ভাবছেন?—ভাবনা পরিকল্পনা অনেক কিছু আছে। সম্প্রতি উপন্যাস প্রবন্ধের সঙ্গে কবিতা বইয়ের কথা বিশেষ ভাবে ভাবছি। আমরা কখনো কবিতার নামবো, ভাবিনি। এ পরিকল্পনা মাথায় এসে দিয়েছেন শান্তনু দাস। নিশ্চয়ই চেনেন? —বলতে হ্যাঁ। উনিই কবিতার লাইনে আমাদের নামবার প্রেরণা দেন।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ, এ ব্যাপারে ওঁর সঙ্গে আমাদের দাদা পরামর্শ হয়। আমাদের প্রথম কবিতার বই দিনেশ দাসের 'অসমাপ্ত, কালকের দ্বিতীয় মানুষ। বেরুবে সত্যব্রত মুখো-পাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা। ছাপা চলছে—শরদিন্দু দাসের কথা সরিৎ'। সঙ্গে তিনটি [illegible]

শরৎ অন্নদাশঙ্কর বার্ষিকীতে বহু তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থের আর্ঘ্য—
শরৎচন্দ্র—মণি বাগচি—১৮৲
রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম • কাজী নজরুল ইসলাম • ২০৲
দেশবন্ধু • মণি বাগচি • ২০৲
মহানায়ক মুজিবুর-অবেক্ষকুমার দাস-১৫৲ মহাজীবন-অবেক্ষকুমার দাস-২০৲
মোহন লাইব্রেরী : ৩৫ এ, সূর্যসেন স্ট্রীট • কলিকাতা-৯
ফোন: ৩৫-৩৩৩৩

স্মৃতির পাতা উল্টে অনেক
থাকেন সেই দিনের দিকে যখন
বড়বাজার হয়ে ওঠেনি। ছেলে-
আজো একটা কথা মনে করিয়ে
বার—মনে রাখবে সততা বিশ্বাস
ভালোবাসা এবং পবিত্রতা এ বন্ধন থাকবে
তাহলে লক্ষ্মী থাকবে অচলা।
এই মূলমন্ত্র দেওয়া চলছে।

শান্তিলা চট্টোপাধ্যায়

বিক্রী শুরু হয়েছে

রাষ্ট্রীয় পঞ্জিকা

১৮৯৮ শকাব্দ (১৯৭৬-৭৭)

ভারত সরকার কর্তৃক বারটি ভাষায় প্রকাশিত

(বাংলা গুজরাতী মারাঠী সংস্কৃত হিন্দী ইংরাজী ওড়িয়া তামিল তেলেগু মালয়ালম কন্নাড়া ও উর্দু)

শকাব্দের আধারে ভারতের জাতীয় ক্যালেন্ডারের ভিত্তিতে এই রাষ্ট্রীয় পঞ্জিকা রচিত। জ্যোতির্বিজ্ঞানের সর্বাধুনিক সূত্রের আধারে সূর্য ও চন্দ্রের অবস্থানের ভিত্তিতে তিথি নক্ষত্র যোগ প্রভৃতি এমনভাবে গণনা করা হয়েছে যে এর প্রত্যেকটির স্থিতিকাল ও প্রবেশকালের গণনায় এক মিনিটেরও তারতম্য নেই। এই রাষ্ট্রীয় পঞ্জিকায় জ্যোতির্বেত্তা পঞ্জিকা প্রণেতা তথা জনসাধারণের প্রতিদিন কাজে লাগার মত সব প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে।

নগদ মূল্যে ক্রয় করা যাবে ঃ

ক) বিভাব মহল ভারত সরকার স্টেট এক্সপেরিয়া বিল্ডিং সি ব্লক ইউনিট নং ২১ বাবা খড়গ সিং মার্গ নিউদিল্লী-১।

খ) গভর্ণমেন্ট অফ ইন্ডিয়া বুক ডিপো ৪-এ এস ব্রহ্ম রোড কলকাতা-১।

গ) গভর্ণমেন্ট অফ ইন্ডিয়া বুক ডিপো নিউ সি জি ও বিল্ডিং। নিউ মেরীন লাইন্স বোম্বাই-২০।

ঘ) দি ডিরেকটর রিজিওনাল মেটিয়রলজিক্যাল সেন্টর নটিক্যাল আলমনাক-ইউনিট অফিসার্স কলকাতা-২৭।

ঙ) দি ডিরেকটর জেনারেল অফ অবজারভেটরীজ কোণী রোড নিউদিল্লী-৩।

চ) পুনে (পুনা) বোম্বাই মাদ্রাস ও নাগপুরস্থিত আবহ দপ্তরগুলিতে।

ছ) বড় বড় শহরে ভারত সরকারের প্রকাশিত পুস্তক প্রকাশনীর সকল অনুমোদিত বিক্রেতার কাছে।

লিখিতভাবে ডাকযোগে ঃ

কন্ট্রোলার অফ পাবলিকেশান

সিভিল-লাইনস দিল্লী-৫৪।

• দ্রষ্টব্য ঃ

• ভারতে পাঁচ টাকার কম মূল্যের কিনতে হলে মূল দামের শতকরা কুড়ি ভাগ হিসেবে অতিরিক্ত ডাক মাশুল লাগবে। দাম

• ডাকযোগে দু টাকার কম দামের কিনতে গেলে আলাদা করে রেজিস্ট্রী খরচ দিতে হবে।

আজই একটি কপি
কিনে রাখুন

দাম
এক টাকা

ডি এ ভিপি ৫।৬২ বিইএন ৮-৩-৭৬

CENTRAL LIBRARY

এই বাংলার খবর

গমচাষীর ভাবনা

আমন ধানের ফলনে নতুন রেকর্ড (৫২ লাখ টন) হওয়ার পর বোরো ধান আর গমের ফলনও যে রীতিমতো ভালো হবে তার আভাস কিছু দিন আগে থেকেই মিলছিল। মাঝে যে বৃষ্টি হয়ে গেল তাতে বোরো ধানের কিছুটা ক্ষতির আশংকা দেখা দিলেও গমের ফলন এবার এই বাংলায় অঢেল।, সরকারি অনুমান, মোট ফলন হবে বারো লাখ টনের মতো। গত কয়েক বছরের সংখ্যা তুলনা করলে বোঝা যাবে গমের ফলন এই রাজ্যে কতো তাড়াতাড়ি বেড়ে চলেছে। ১৯৭০-৭৪ সালেও গম ফলেছিল চলতি বছরের ফলনের অর্ধেক মতো (৬ লাখ ৩০ হাজার টন)। ১৯৭৪-৭৫ সালে ঐ পরিমাণ দাঁড়ালো ৮ লাখ ৩৭ হাজার টন। রাজ্যে গম চাষের এলাকা কীভাবে বেড়ে চলেছে তার হিসেবও কম আকর্ষণীয় নয়। এ-বছর গম চাষ হয়েছে প্রায় ছ' লাখ হেক্টর জমিতে, গত বছর হয়েছিল চার লাখ হেক্টরে, তার আগের বছরে সোয়া তিন লাখ হেক্টরে। আর এই বাংলায় শুধু যে গম চাষের এলাকা বা গমের ফলন ক্রমশ বাড়ছে তাই নয়, একর প্রতি উৎপাদনের হিসেবেও পশ্চিম বাংলা এখন পাঞ্জাব-হরিয়ানার মতো জবরদস্ত গম-উৎপাদনকারী রাজ্যের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে।

কিন্তু কথায় বলে, কারো পৌষ মাস কারো সর্বনাশ। গমের ফলন বাড়বে, রাজ্য ক্রমশই খাদ্যাসনের ব্যাপারে স্বনির্ভর হয়ে উঠছে—এ সবই পৌষ মাসের লক্ষণ। কিন্তু সর্বনাশ না হোক, বেশ কিছুটা ক্ষতির আশংকা দেখা দিয়েছে গমচাষীর। সব গম এখনও কাটা হয় নি, এর মধ্যেই গমের দর বেশ পড়তে শুরু করেছে। তাই চাষীর চিন্তা, আরো গম যখন বাজারে আসবে তখন গম বেচে পড়তা খরচ উঠবে তো? এখনই গমের দর নদীয়ার মতো জেলায় এক শ' টাকার (প্রতি কুইন্টাল) বেশ নিচে নেমে গেছে। নদীয়ার মতো মুর্শিদাবাদ, মালদহ, কোচবিহার ও জলপাইগুড়িতে প্রচুর গম ফলেছে। পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক নরেন ইসলাম জানিয়েছেন, কোথাও কোথাও গমের দর পড়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ৬০ টাকা। সরকার ঘোষিত গমের ন্যূনতম দাম ১০৫ টাকার বেঁধে দেন সেজন্যে দাবি জানানো হয়েছে প্রদেশ কংগ্রেসের তরফ থেকে। মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশংকর রায় অবশ্য ঘোষণা করেছেন, গমচাষীদের ভাবনার কিছু নেই। পরিপোষক মূল্য দিয়ে রাজ্য সরকার ধান কিনে নেবেন। চাষী যদি গম বেচে পড়তা খরচ তুলতে না-পারেন তবে শুধু যে তাঁদেরই ক্ষতি হবে তাই নয়, গম চাষের ব্যাপারে এ-রাজ্যে যে নতুন উৎসাহ দেখা দিয়েছে তাতেও ভাটা পড়বে। আলুর ফলন বেশি হওয়ায় আলুর দরও পড়ে যাচ্ছে বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে।

শিল্পের প্রসার

১৯৭২ সাল থেকে এই রাজ্যে কীভাবে কল-কারখানার প্রসার ঘটছে তার একটা ছবি পাওয়া গেল বিধানসভায় শিল্প মন্ত্রী তরুণকান্তি ঘোষের বিবৃতি থেকে। ১৯৭১ সাল পর্যন্ত এই রাজ্যে শিল্পের ক্ষেত্রে যে অচলাবস্থা দেখা দিয়েছিল তা এখন দূর হয়েছে। '৭২ সালের এপ্রিল থেকে গত বছর ডিসেম্বর পর্যন্ত ২০৪০টি কোম্পানি এই রাজ্যে রেজিস্টার্ড হয়েছে। এই সব কোম্পানির অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ৬৭৫ কোটি টাকার বেশি। তার আগের পাঁচ বছরে মাত্র ১২১৫টি নতুন কোম্পানি রেজিস্টার্ড হয়েছিল। অনুমোদিত শিল্প প্রকল্পগুলি রূপায়ণের কাজও ভালোভাবে এগোচ্ছে। '৭২ সালের মার্চের পর ৩১৭টি প্রকল্পের ক্ষেত্রে কাজ অনেকটাই এগিয়ে গেছে। এই সব প্রকল্পে মোট লগ্নীর পরিমাণ প্রায় ৫৫০ কোটি টাকা। এর মধ্যে ১৮০টি প্রকল্প চালু হয়ে গেছে। আরো ২০০টি প্রকল্প রূপায়ণের কাজও শুরু হয়েছে। কল-কারখানার এই প্রসারের ফলে রাজ্যে কর্মসংস্থানে নতুন রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে। '৭২ এপ্রিল থেকে ৭৫ মার্চ পর্যন্ত এ-রাজ্যে সংগঠিত শিল্পে এক লাখ ১৭ হাজার লোকের কাজের সংস্থান হয়েছে। দেশের আর কোনো রাজ্যেই ঐ সময়ের মধ্যে সংগঠিত শিল্পে এত বেশি লোকের কর্মসংস্থান করা সম্ভব হয় নি (মহারাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এই সংখ্যা এক লাখ ৬১ হাজার)। বেসরকারি শিল্প ছাড়া সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন সিন্ডিয়া প্রকল্পেও পালাবদল সুরু হয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী অতীশ সিংহ জানান যে, দুর্গাপুরের কোকওভেনকে এক সময় 'রুগ্ন সন্তান' বলে গণ্য করা হতো। এখন তার দিন ফিরেছে বলা চলে। স্যাকসবি ফার্মের লোকসানের পালা কাটিয়ে উঠে এখন নিজের পায়ে দাঁড়াতে চলেছে। কল্যাণী স্পিনিং মিলেও উৎপাদন বেড়েছে। তবে তরুণবাবু এই বলে সতর্ক করে দেন যে, শিল্পের প্রসার সম্পর্কে আত্মসন্তুষ্ট হওয়ার সময় এখনও আসে নি। এই রাজ্যের চটকল, কাপড়ের কল, ওয়াগন কারখানা এবং মোটর গাড়ির কারখানার সংকটের দিকে তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

তিস্তার ব্যারেজ

উত্তর বাংলার তিস্তা নদীর ওপর একটি বড় আকারের ব্যারেজ তৈরির কাজে হাত দেওয়া হচ্ছে। এর প্রধান উদ্দেশ্য উত্তর বাংলার পাঁচটি জেলা—দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, মালদহ, কোচবিহার ও পশ্চিম দিনাজপুরে সেচের প্রসার। এই প্রকল্প অনুযায়ী করোনেশন ব্রিজের দক্ষিণে তিস্তার ওপর একটি বড় ব্যারেজ তৈরি হবে। তারপর একটি খাল দিয়ে তিস্তার জল চালান করা হবে মহানন্দায়। মহানন্দার ওপরও একটি ব্যারেজ তৈরি হবে। উত্তর বাংলা ছাড়া এই প্রকল্প থেকে বিহারের পূর্ণিয়া জেলায়ও সেচের জল যোগানো যাবে। প্রকল্পটি বিরাট। সব কাজ শেষ করতে ৪০০ কোটি টাকার মতো খরচ পড়ে যাবে। শুধু প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষ করতেই এখনকার হিসেব অনুযায়ী ৭৫ কোটি টাকা লাগবে। রাজ্য সরকার এই বছরে এই কাজের জন্যে বরাদ্দ করেছেন দুই কোটি টাকা। আগামী কয়েক বছরও বড় জোর চার-পাঁচ কোটি টাকা করে বরাদ্দ করা যাবে। কিন্তু এই হারে টাকা বরাদ্দ হলে শুধু প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষ হতেই তো লেগে যাবে বেশ কয়েক বছর। তবে গোটা প্রকল্পের কাজ শেষ হতে কতো দিন লাগবে? এই কথা ভেবে রাজ্য সরকার স্থির করেছেন, এই প্রকল্প রূপায়ণের জন্যে বিশ্ব ব্যাঙ্কের কাছ থেকে সাহায্য চাইবেন। এই রাজ্যে চাষবাসের প্রসারের জন্যে বিশ্ব ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ইতিমধ্যে সাহায্য পাওয়া গেছে। সুতরাং এই বৃহৎ প্রকল্পটির জন্যেও (যেটি রূপায়িত হলে কয়েক লাখ একর এলাকা সেচসেবিত হবে) বিশ্ব ব্যাঙ্ক সাহায্যের হাত প্রসারিত করবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই প্রকল্পটির একটি বিশেষত্ব এই হবে যে দামোদর কংসাবতী বা ময়ূরাক্ষী প্রকল্পের মতো এখানে কোন বড় জলাধার তৈরি করতে হবে না। তা যদি হতো তবে খরচ আরো বেশি পড়ে যেত।

১২-০-৭৬

—সুব্রত

বিদেশের কথা

প্রেসিডেন্ট নেটো

আঙ্গোলায় এম পি এল এ বাহিনীর সম্প্রতি জয় দেশে প্রেসিডেন্ট অগাস্টিনো নেটোর সরকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। ইতিমধ্যে, পৃথিবীর অনেক দেশই লুয়ান্ডার এই সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে। যেসব দেশ এফ এন এল এ বা ইউনিটাকে এতদিন ধরে সমর্থন করে আসছিল ও তাদের সাহায্য যুগিয়ে আসছিল তারাও এখন অনিবার্যকে মেনে নিয়ে প্রেসিডেন্ট নেটোর সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

অগাস্টিনো নেটো, যিনি ১৬ বছর আগে স্বাধীন মুক্ত আঙ্গোলায় ফিরবার স্বপ্ন দেখে কবিতা লিখেছিলেন, তাঁর পক্ষে এটা একটা প্রচণ্ড সাফল্য ও সার্থকতার ক্ষণ। মুক্ত আঙ্গোলার নেতা হিসাবে কবি, দেশপ্রেমিক ও চিকিৎসক অগাস্টিনো নেটো আফ্রিকার নতুন কালের বরণীয় দেশনায়কদের মধ্যে স্থান গ্রহণ করলেন।

লুয়ান্ডা থেকে ২৫ মাইল দূরে কাটিকানে নামক একটি গ্রামে ১৯২২ সালে নেটোর জন্ম হয়েছিল। তাঁর বাবা ছিলেন একজন প্রোটেস্টান্ট ধর্মযাজক আর মা ছিলেন শিক্ষিকা।

লুয়ান্ডার যে স্কুল থেকে নেটো শিক্ষা লাভ করেন তার ছাত্রদের অধিকাংশই ছিল শ্বেতাঙ্গ পরিবারের সন্তান। এই শ্বেতাঙ্গ ছেলেদের পিছনে ফেলে পরীক্ষায় প্রথম হয়ে পাশ করে নেটো নিজের মেধার পরিচয় দেন। নেটোর গ্রামের লোকরা তাঁকে পর্তুগালে মেডিক্যাল শিক্ষালাভের জন্য পাঠিয়ে দেন। ইউরোপে তিনি মার্কসবাদীদের ও আফ্রিকান জাতীয়তাবাদীদের সংস্পর্শে আসেন। পর্তুগালে যেসব রাজনৈতিক গোষ্ঠী সালাজারের একনায়কত্বের বিরুদ্ধে লড়াই করছিলেন তাঁদের সঙ্গেও নেটোর যোগ হয়। তাঁর রাজনীতির জন্য ১৯৫৫ থেকে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত অধিকাংশ সময়ই তাঁকে সালাজারের জেলে বন্দী অবস্থায় অথবা স্বগৃহে অন্তরিত হয়ে কাটাতে হয়।

১৯৫৯ সালে নেটোকে স্বাদেশে ফেরার অনুমতি দেওয়া হয়। কিন্তু তাঁর দেশে ফেরার কিছু পরেই ১৯৫৯ সালের জুলাই মাসে, পর্তুগীজ শাসকরা দেশপ্রেমিকদের ব্যাপক ধরপাকড় শুরু করে দেয়। যাঁরা ধরা পড়েন তাঁদের মধ্যে অগাস্টিনো নেটোও ছিলেন। তাঁর স্বগ্রামবাসীরা নেটোর গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে এলে ১৯৬০ সালের ৮ জুলাই পর্তুগীজ সৈন্যরা বিক্ষোভকারীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। সৈন্যবাহিনীর গুলিতে সেদিন ৩০ জন আঙ্গোলান মারা গিয়েছিলেন। ঐ ঘটনার উল্লেখ করে পরে নেটো বলেছেন, 'ঐ মুহূর্ত থেকে শেষ পর্যন্ত আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা।' এরপর নেটোকে পর্তুগালে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে অন্তরিত করে রাখা হয়। কিন্তু সেখান থেকে তিনি পালিয়ে আসেন।

ইতিমধ্যে আঙ্গোলায় একটি নতুন শক্তিশালী জাতীয় আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। মুভমেন্ট ফর দি ন্যাশনাল ইন্ডিপেন্ডেন্স অব আঙ্গোলা (মনা) এবং পার্টি ফর দি ইউনাইটেড স্ট্রাগল অব দি আঙ্গোলান আফ্রিকানস (পি এল ইউ এ) নামে দুটি সংগঠন একত্রিত হয়ে গঠন করেছিল মুভমেন্ট ফর দি লিবারেশন অব দি আঙ্গোলান পিপল (এম পি এল এ)। পর্তুগাল থেকে আঙ্গোলায় ফিরে এসে ১৯৬২ সালে নেটো এই এম পি এল এ-র প্রেসিডেন্টের পদ গ্রহণ করলেন। সেই থেকেই তিনি এম পি এল এ দলের অবিসম্বাদিত নেতা।

১৯৬০ সালে পর্তুগীজ শাসকদের সঙ্গে আঙ্গোলার জাতীয়তাবাদী নেতাদের একটি বৈঠক আহ্বান করে আঙ্গোলা থেকে ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান করার দাবি জানাল এম পি এল এ। এই দাবি অগ্রাহ্য হওয়ায় শুরু হল আঙ্গোলার দীর্ঘ ও রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধ। ১৯৬১ সালের ৪ ও ৫ ফেব্রুয়ারি সশস্ত্র আফ্রিকানরা রাজধানী লুয়ান্ডায় অভিযান চালাতে গিয়ে পর্তুগীজ বাহিনীর সঙ্গে যে সংঘর্ষে লিপ্ত হল তাতে ৪৪ জন আফ্রিকান নিহত হলেন ও কয়েক শ' আফ্রিকান গুরুতরভাবে আহত হলেন। সেই থেকেই শুরু হল ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে আঙ্গোলার মানুষের গণ-অভ্যুত্থান। যে গেরিলা যুদ্ধের মধ্য দিয়ে মুক্তিসংগ্রামীরা পরবর্তী কয়েক বছরে আঙ্গোলার বৃহৎ অংশ মুক্ত করতে সমর্থ হল সেই লড়াইয়ে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন এম পি এল এ দল ও তার নেতা ডাঃ অগাস্টিনো নেটো।

১৯৭২ সালের ডিসেম্বর মাসে আঙ্গোলার জাতীয়তাবাদী নেতারা কিনশাসায় একটি বৈঠক করে এম পি এল এ ও এফ এল এন এ-র একটি যুক্তফ্রন্ট গঠনের জন্য চুক্তি করেন। এই যুক্তফ্রন্টের সুপ্রিম কাউন্সিলের চেয়ারম্যান হন হোলডেন রবার্টো আর ভাইস চেয়ারম্যান হন অগাস্টিনো নেটো।

এই যুক্তফ্রন্ট অবশ্য স্থায়ী হয়নি। ১৯৭৫ সালের নভেম্বর মাসে পর্তুগাল আঙ্গোলা ছেড়ে চলে যাওয়ার অল্প কিছু আগে থেকে আঙ্গোলার তিন প্রতিদ্বন্দ্বী দলের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যায়। ঐ দ্বন্দ্বে সুনিশ্চিতভাবে জয়ী হয়েছে ডঃ নেটোর দল।

পশ্চিমের যেসব দেশ এতদিন আঙ্গোলার অন্য দুই দলকে মদত যুগিয়ে বোকা বনেছে তারা এখন বুঝে দেখার চেষ্টা করছে এই ডঃ নেটো কেমন মানুষ, তাঁর রাজনৈতিক মতামত কি।

ডাঃ নেটো সম্পর্কে যেসব খবর জানা আছে সেগুলি হল, তিনি আফ্রিকান জাতীয়তাবাদী ও কৃষ্ণাঙ্গ নেতা হলেও শ্বেতাঙ্গ-বিদ্বেষী নন। তিনি নিজে একজন পর্তুগীজ মেয়েকে বিয়ে করেছেন। সাধীনতাপ্রাপ্তির পর তিনি লিসবনের হাসপাতালে তিনি শ্বেতাঙ্গ রমণীদের সাহায্য করেছেন তাঁর সাক্ষ্য দেওয়ার লোক অনেক পাওয়া যাবে।

পর্তুগালে শিক্ষাপ্রাপ্ত ডঃ নেটো জাতীয়তাবাদী নেতা হলেও ইউরোপীয়ান জীবনযাত্রার সঙ্গে পরিচিত এবং ইউরোপীয়ান বা আমেরিকানদের সঙ্গে ওঠা-বসা করতে তিনি কোন রকম অসুবিধা বোধ করেন না।

ডাঃ নেটো একজন মার্কসবাদী হিসাবে পরিচিত। কিন্তু যাঁরা তাঁকে জানেন তাঁরা বিশ্বাস করেন যে মূলত তিনি একজন জাতীয়তাবাদী এবং কোন দেশের এমনকি সোভিয়েট রাশিয়ারও তাঁবেদার হয়ে থাকার মানুষ ডঃ নেটো নন।

ইতিহাসের একটি বাস্তব ঘটনা হল এই যে, আঙ্গোলার মুক্তিযুদ্ধের জন্য সাহায্য চাইতে ডাঃ নেটো প্রথমে আমেরিকাতেই অবতীর্ণ হয়েছিলেন। যাটের দশকের গোড়ার দিকে তিনি এই উদ্দেশ্যে আমেরিকায় গিয়েছিলেন। কিন্তু সেসময়ে আমেরিকা তার ন্যাটোর সাঙ্গোপাঙ্গকে চটিয়ে একজন কমুনিস্ট-এর সঙ্গে হাত মেলাতে চায়নি।

আমেরিকা থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফেরার পর ১৯৬৪ সালের মার্চ মাসে ডঃ নেটো মস্কোতে গিয়ে সাহায্য চান —এবং পান।

ডাঃ নেটো অনেক বাধাকে জয় করে সাফল্যের চূড়ায় উঠেছেন। দু-দুবার তাঁকে তাঁর নিজের দলেরই চরমপন্থীরা নাস্তি খুন করার চেষ্টা করেছিল। তিনি যে সোভিয়েট রাশিয়ার সাহায্য নিয়েছেন নেটো জাম্বিয়ার ডাঃ কেনেথ কাউন্ডার মতো সম্মানিত আফ্রিকান নেতারও মনঃপূত হয়নি। কিন্তু আজ একটি সফল সংগ্রামের শেষে ডঃ অগাস্টিনো নেটোর নাম কংগোর পাট্রিস লুমুম্বা ও কিউবার ফিদেল কাস্ত্রোর মতোই একটি সংগ্রামী ইতিহাসের অঙ্গ নাম হিসাবে চিহ্নিত হয়ে গেছে।

১১-৩-৭৬

CENTRAL LIBRARY

স্মৃতির সমীপে ॥ আরতি দাস

স্মৃতি, তোর আরতি বিষম,

যেখানে সাঁঝের ঘুম কুড়ায় কাঞ্চন
পাপড়ি কোমলস্পর্শ, সেখানে স্বপ্নের
বাসর সাজানো গাই, হৃদয়ের সুবাস
আঙিনা মেশায় চোখ তাকেই ফেরাতে, ফিরে
সে আর আসে না, বড় বিচিত্র এ রীতি।

আমি তোর নির্ঘুম রাতের
নিঃসঙ্গ শঙ্কার ফিরি
বনের নির্জনে, তুল পাহাড় চূড়ায়
তোর মুঠি হতে খসা ধূলির মুখে
হে নিষাদী, কী অর্থ আমার হৃদয়।

দুই এক উচ্ছ্বাস নিশীথ রাত্রির
সযত্নে লুকোনো ছবি প্রচ্ছন্ন হাসির
আড়ালে নিপুণ হিংসা, বিদ্রূপ কঠিন
মনোনীত শব্দ কটি কখন হঠাৎ
আমূল বিঁধিয়ে, পরমুহূর্তে উধাও
সম্মুখের অশ্রুমতী নদীর গভীরে
তার তল খুঁজেও মেলে না।

আবার একাকী দেখি, মনোকন্যা
মধ্যরাতে একা
জলমগ্ন কটিতটে উজলতা পূর্ণিমারাত্রির
সিক্তস্নেহে বিকিমিকি রক্তত ঘটির
হঠাৎ তরল তুলে, বাসনে ভরিয়ে, স্মৃতি
কথা শোনে, মিনতি আমার

আজ তবে একা নয়,
বিস্মৃতিকে সাথে নিয়ে আসন্ন সন্ধ্যাটি।

প্রেম : ২ ॥ অজয় সেন

গত বছরের মত এ-বছরটাও গুটিসুটি ঢুকে এলো
ভেড়ার মত কলকাতার
পেটের নিচে এই মধ্যরাতে—আর—
এভাবে আরো একটা নির্লিপ্ত মস্করা করা সময় শুরু হলো
কেউ জানালো না শুভেচ্ছা, প্রায় কেউই পাঠালো না বই কিংবা চিঠি;
আমাদের জীবনে আছে কানাইদার হোটেল আর কলেজ স্ট্রীটের
জনো হাড়হিম মোহ,
যা কিছু ঘটেছে আমাকে নিয়ে,
সবেরই জন্যে দায়ী এই কিম্ভূত কলকাতা
ছিটগ্রস্তের মত সান্ধনা খুঁজে, এ পথে সুনেত্রা কলেজ যায় নিয়মিত।
বিগত দশকে প্রেমের হাতাতেপনায় উদাসীন ছিলো মধ্যরাতের
এই রুক্ষ যুবক—যে রোজই প্রমাণ করেছে
এ্যালকোহল ও হেমন্তকালের বাবধান—
যে প্রতিটি সন্ধ্যায় সাজানো বসন্তবাটীর দিকে ছিটিয়েছে থুতু—আর
প্রতিবাদে লাথি ছুঁড়েছে আকাশের দিকে।
আজ ঐ রাগী যুবক শান্ত হয়েছে, আত্মবাতি কেনেল সে পড়ে
অরুণাচল ও মানবসভ্যতার ইতিহাস—
কুহক সে উদাসীন হয় এই কিম্ভূত কলকাতার প্রতি;
কলকাতাই প্রতি উপহারে ফেরাতো তাচ্ছিল্যের মদহাসি—
যেহেতু—শীতকাল ও প্রেম তাকে করেছে
প্রেমিক ও মজুরে ইদানীং।।

নাগা নৃত্যের রাত্রি ॥

বিপ্লব মাজী

ফেব্রুয়ারীতে,
হ্যাঁ, আমার মনে পড়ে
নাগানৃত্যের সেই গভীর রাত্রি

মঞ্চে দাঁপয়ে বেড়াচ্ছো তুমি,
দোলাচ্ছ শরীর আচাড়ের পাকে পাকে
আর আমার অস্তিত্বের অণুপরমাণুতে
উঠছে তুলকালাম বিস্ময়ের ঝড়

হ্যাঁ, ফেব্রুয়ারীতে
যখন মঞ্চে থেমে গেছে গান, সঙ্গীতলহরী
খাঁ খাঁ নাচঘরে নেই চিৎকার, হুটোপুটি
ঘুঙুরের আওয়াজ
দর্শকেরা একে একে ফিরে গেছে ঘরে

আমি তোমার চুম্বনের গভীর অন্ধকার
তলিয়ে যেতে যেতে পুনরাবিষ্কার করলাম
আমার এ শতাব্দীর অন্ধকার যে আলোর অনুভবেরা
ঘুরে চলেছে অনির্দিষ্ট মহাকালে, নির্জন

আমি আবিষ্কার করলাম,
অচেনা অজানা এক রহস্যময় জগতের দ্বার
যেখানে প্রবেশের সহজপথ, ফেরবার
একটিও নেই।

উপন্যাস

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

আদ্য শেষ রজনী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

। চার ।

বিস্কুটে নদিয়ে চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে রাত হল। সেই অন্ধকার বাড়ি। ঘুমন্ত পাড়া। কাল সকালে যখন প্রথম 'রঙ্গসৌলের জনো চালতন' হয়ে বেরুবে—তখন পাড়ার ছেলেরা বলবে—খুব টেনেছে রে। কাল খুব নাইন মেরেছে!

একেবারে উডস্ট কথা দুজনের কানে এসে ছুঁয়েছে অমিয়র। ফিরে অনেক পাবে। মেয়েরা ছোবে। টাকার ঝনঝনা। যশের ঝন্ঝা। 'রঙ্গসৌলের' ঘরে থাকলে হয়তো সব সময়ের এসব কথা পাড়ার ছেলেদের মতো আর ডেকে ডেকে বলতে পারে না। ওদের কাছে অমিয় অনেক আগেই লম্পট! সুখীবর!' এইসব টাইটেল পেয়ে এসে আছে। খুব অপশোস হয় তার। এতদিন মাঝে মাঝে দিন ছেলেগুলো তার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতো—দুপালালের বাড়ি এসে এমন কালোজিৎ রেডের রিহার্সেল রুমে—তাহলে একটা অন্দাজ পেত।

মানুষ দূরে চলে গেলে লোকে ভুল করে। গিরীনবাবু, বড়বাবু—এরা যতদিন কাছাকাছি থাকতেন—লোকে আড়ালে অবডালে খারাপ বলে সুখ পেত। ওঁরা মরে যেতেই তাড়ঘড় তাঁরাই ওদের মহৎ করে দিল। দেওয়ালে অয়েল পেন্টিং ঝোলালে।

'সকালে খেয়ে বেরোওনি কেন?'

অন্ধকার থেকে গলা শুনে বুঝলো—লীলা। কোন জবাব দিল না অমিয়।

সুইচ টিপে ঘর আলো করে দিয়ে লীলা এবার বলল, 'আজ হাউস ফুল ছিল।'

—হুঁ। তোকে জ্বালাল?

—শংকর এসেছিল তোমার খোঁজে। খানিকক্ষণ বসে থেকে চলে গেল। একটা চেয়ার দিতে হয়েছে দশখানা। গুড নিউজ! আজ তো হাসিমুখ দেখবো ভেবেছিলাম।'

—এতকাল তো ফাঁকা থিয়েটারের সামনে দাঁড়িয়ে অভিনয় করে এলাম। এবার হাসি ফুটবে। সেই একই নিঃশ্বাসে অমিয় বলল 'তাড়াতাড়ি খেতে দাও। খুব খিদে পেয়েছে। তারপর লিখতে বসব।'

—বসেই তো গড়িয়ে পড়বে।

এতক্ষণে অমিয়র চোখে পড়ল। নতুন শাড়ি পরেছে লীলা। লাল জমির ওপর সাদা বুটি। সাদা জমির ওপর লাল বুটি। লীলা যে তার কথা বুঝতে পারেনি—তা তার মুখ দেখেই বুঝলো অমিয়। হেসে বলল, 'নতুন নাটকের কথা ভুলে গেলে! তুমি তো পড়ছো বলছিলে।'

—হুঁ। কিন্তু এমন তৈরি নটক ছেড়ে—'

—তাতে কি?

—আবার তো নতুন সেট তৈরি করতে হবে। পার্টিশন, রিহার্সেল আছে।'

—সব পুষিয়ে যাবে লীলা। রজনী হচ্ছে হয়েছে।'

—রজনী?

—রজনী দেবী। নীহারের মেয়ে—'

—তিনি রাজি হয়েছেন? খুব ভালো! কিন্তু—'

—তুমি আর কিন্তু রেখো না মন। হাউসফুল হবার পর বন্ধ করবো। লোকে আর কিছু বলার চান্স পাবে না। শুধু বিকার একটা শর্ট রিভিউ রেখে যাবে। তাতে থাকবে নতুন নাটকের কথা থাকবে।'

—নাম ঠিক করেছো?

—না। কি নাম হয় বল তো?

—কেন? সুজাতা রায়।'

—চলবে?

—ঠিক চলবে—

অমিয় সিগারেট ধরাতেই লীলা সরে গেল। সে জানে, অমিয় এখন আপন জগতে একা হবে। নতুন নাটকের কারেকটারগুলো এখন একে একে অমিয়র সামনে মুখ করতে আসবে। এবারে অমিয় তাদের সঙ্গে মিশে যাবে। কথা বলবে। বলতে বলতে লাইন পাবে। সঙ্গে সঙ্গে লিখে ফেলবে। কোন লাইন খুব তাড়াতাড়ি লিখতে হয়। নতুন ভুলে যাওয়ার ভয় আছে। একবার হারিয়ে গেলে আর মনে আসে না।

তাড়াতাড়ি লেখা লাইনগুলো পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে অমিয় উদ্ধার করে। বদলানো হয়ে যায় বা। গ হয়ে যায় ঘ। পড়ে পড়ে নতুন করে সে সব লাইন আবার লিখে নেয় অমিয়।

সুজাতা নাটকে জীবন আর সুজাতা পুরনো চরিত্র। সুজাতার বোল এক নম্বর। মানে দিবেই নটক। ফাউল দিয়ে জীবন নিজে। একে বোকা। লম্পট। স্বার্থপর, নীচেই সেজে সেজে সুজাতার চরিত্রকে আরও মেজে ধরতে হবে। সুজাতাকে

অভিনয়ের পথ খুলে নিতে হবে। পাবলিক জীবনের ওপর যত বিরূপ হবে—নাটক তত জমবে—পাবলিক তত নেবে।

আজ তিনদিন ধরেই গানটা তার মাথার ভেতর গুন গুন করছে। একটা গান। পুরনো কালের গান। সুজাতাকে গাইতে হবে। লাস্ট রো থেকে শুনতে পাওয়া চাই। অথচ একটু অন্য বিটের গান। কিছুটা নিচুতে ধরতে হবে। গানের সবটা তার মনে নেই। মুখটুকু শুধু মনে পড়ে। তাই সই। লিখে ভো গাবল। তারপর খুঁজে নেবে।

"আমি চাই না তোমার এই
গুজন করা ভালবাসা—"

'চাই না' কথাটি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গাইবে রজনী। রজনীর গলায় খুলবে খুব। ভৈরবীর ওপর গাথা। গলাটা স্বরটি পরিষ্কার। কোথাও কোন দাগ নেই। এবং মনে হয়—এইমাত্র ফুটে ওঠা ফুলটির মত তাজা। অমিয়র অবাক লাগছিল আজ ওর ঠাকুরঝির অভিনয় দেখে। তা রজনীর চান্স হয়েছে নিশ্চয়। মেয়ের বিয়ে দিয়েছে। জামাই হয়েছে। নাতি-নাতনী আছে কিনা জানে না। অথচ হাসি, গলা, সঠিক উচ্চারণের খুঁত- একদম অটুট—তাই বা কেন? একদম পুরুতই বলা যায়। গানের সময় গলার কাজ কত সুন্দর।

গানের আভাসটুকু খাতায় লিখে অমিয়র মনে পড়ল—এ গানখানি নিয়ে কত কালের বিতর্ক। কেউ বলে বিনোদিনীর। কেউ বা বলে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের হরত গানখানির আসল বয়স একশোর ওপর। আজও সমান তাজা। এই গান জন্মানোর পর বাঙ্গালীর জীবনে কত কি ঘটে গেল। ঘটনাগুলো ঘটে পুরনো বাসি হয়ে হারিয়ে গেল। গানখানি হারায়নি।

রজনীর গলায় দারুণ খুলবে।

লিখতে লিখতে অমিয় পুরো সিনটা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছিল। জীবনের রোলে সে নিজে সরু পাজামার ওপর ফিনফিনে আদ্দি চাড়িয়ে কাবলা কাতিকের মত পার্লকের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। রজনী সুজাতা হয়ে গাইছে। একটি সিটও খালি নেই। হাউসফুল। একস্ট্রা চেয়ার দিতে হয়েছে। সত্তরখানা। সব সাড়ে দশ টাকার সিট।

ঘুমে চোখ ভেঙে আসছিল। খোলা কাগজগুলো ফাইল-বন্দী করে মাদুরেই শুয়ে পড়ল অমিয়। শরীরে যে কেন এত শক্ত ঘুম—কেন যে ঘুম পায়—পড়ে থাকা কাজের পাহাড়টা রোজ একটু একটু করে উঁচু হয়ে যাচ্ছে। নিরুপায় অমিয় প্রাচীন ঘুমের আক্রমণে পরাস্ত হয়ে ঢলে পড়ল।

তার স্বামীর ঘুম আসার সময়টার একটা আলাদা গ্রাফ লীলার। সময় মত বিছানা থেকে উঠে এসে আলো নিভিয়ে দিল। ফাইল বন্ধ রাখল তাকে। সে জানে—এক একখানা নাটক দাঁড় করানো মানে এক একটা নতুন বাড়ি তোলার চেয়েও কঠিন। কঠিনে ঐই মজাটার স্বাদ বড়।

অমিয়র সিঙ্গেল মশারি টাঙিয়ে দিয়ে লীলা বন্দ্যোপাধ্যায় অন্ধকার খুলে বারান্দায় এসে দাঁড়াল।

ঠিক তখন গিরীশ পার্কের এখানে ট্রামলাইন ঝলমলাচ্ছে এসে রজনী দাঁড়িয়েছে। খানিক আগে একটা ট্যাকসি বিকু আর অমিয়কে নিয়ে এই পথ দিয়ে আরও উত্তরে চলে গেছে। কলকাতার এখন ঘুমানোর সময়। পাকে পাথরের গিরীশ-বাবু আসন করে বসে।

নীলদর্পণের গানখানি আজ সন্ধ্যে থেকেই রজনীর গলায় ঘুরে ফিরে আসছিল। এখন আর কোন কাজ নেই। গুন গুন করে গলায় নিয়ে এল রজনী।

'মন মন্দিরে মম বিরহ তুমি নিরঞ্জনে
রাখি তাই—'

বিহারীকে একখানি সুন্দর কাজ রজনীকে ফুনিয়ে দিচ্ছিল। ঘর বার তাই এক জায়গাতে এসে একটু থেমেই আবার—"নিরঞ্জনে রাখি তাই"-এ চলে যাচ্ছিল।

অনেকদিন পরে গানের বই খুলেছে রজনী। কবিরাজ এখন স্কুল। তার ঠাকুর-ঝির রোল দেখতে এখন লোয়ালদা থেকে ডেলি প্যাসেঞ্জাররাও আসে। তবে দলের কেন এত দেনা?

কাকে জিজ্ঞাসা করবে সে কথা? তাকে? কোন লাভ নেই। ছেলেমেয়েদের বাবাকে? কোন লাভ নেই।

নিরঞ্জনে রাখি তাই—
শ্যাম সুন্দর শ্যাম
মন মন্দিরে মম বিরহ তুমি
নিরঞ্জনে রাখি তাই—'

বেশ গাইতে লাগছে গানটা। কথা ছিল মুখ্যমন্ত্রী দেখবেন দশ মিনিট। প্রায় দুঘন্টা ধরে বসে থেকে শেষ অব্দি দেখলেন। এ রকম প্রাইজ অনেকদিন পায়নি রজনী।

আজকাল কতরকম পুরস্কার দেওয়া হয়। শ্রেষ্ঠ অভিনেতা—শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী। সহ-অভিনেতা। সহ-অভিনেত্রী। কত কি। ফক্কি। রাস্তার দিকে তাকিয়ে রজনী আপন মনেই হাসল। আমার ভাগ্যটা বড় ভাল। না হতে পারলাম পুরনো দিনের অভিনেত্রী! না পারলাম নতুন দিনেরও হতে। সেই কবে থেকে সাজঘর ঘুরছি।

এই কলেবারান্দা থেকে রজনী শ্রীরঙ্গমের সাজঘর দেখতে পেল পরিষ্কার। তারই পেছনে ওরা থাকত তখন। "বিন্দুর ছেলে"তে অমলা করে। বছর সাতেক বয়স তখন রজনীর। শ্রীরঙ্গমের পেছনে বড়বাবু, মাঝা ওরা বসে গল্প করছেন। অনেকে এসেছে। রজনী তখন মালকোঁচা মেরে ইজেরের ওপর ধুতি পরে স্টেজ নামত। মাথায় ঝোড়া বেণী। নাড়া ছাড়ে দাঁড়িয়ে কাটা ঘুড়ি লোটার চেষ্টা করছিল। মায়ের তাড়া খেয়ে শ্রীরঙ্গমের সিনের গুদামে গিয়ে লুকিয়ে ছিল।

গানের রোল সেই কোন ছোটবেলা থেকে করে আসছে রজনী। অমিয়র নতুন বইতে নতুন রোলেও নিশ্চয় গান আছে। নইলে অত আগ্রহ কেন আমাকে নেবার। মিনার্ভায় সেই 'কিন্নরী' 'আরশীনগর'-এর সময় থেকে সে গাইছে।

পরে ছবি বিশ্বাস যখন কামাল আতাতুর্ক—নীহার বালাকে বা—রজনী তখন কামালের ছেলে। কৃষ্ণচন্দ্র গাইছেন—ওয়াহেন! ওয়াহেন!

রজনীর অনেকদিন পর্যন্ত ধারণা ছিল—কৃষ্ণচন্দ্রের চোখে এমনি কোন দোষ আছে। উনি যে অন্ধ, রজনী তা জানত না। একদিন স্টেজে ঢুকতে গিয়ে বিষম খেয়েছিলেন। সেদিনই রজনীকে বলেছিলেন—মা, আমার একটু ধরিস। আমি দু'চোখেই দেখতে পাইনে—'

'চন্দ্রগুপ্তে' কৃষ্ণচন্দ্র ভিক্ষুক। রজনী অম্বেয়ী। কৃষ্ণচন্দ্র গাইছেন। এখনো শুনতে পায় রজনী। 'ঘন তমসাবৃত অম্বর ধরণী—'

—'শোবে এস।'

কথাটা একদম চাবির গোছার মত ঝনাৎ করে রজনীর মাথার ভেতরকার মেঝেতে এসে পড়ল।

আবার শুনলো : 'রাত হল অনেক। শোবে এস। কিছু খেয়ে নাও।'

—'খিদে নেই। আজ কিছু খাব না। তুমি খেয়েছো?'

—'আমি তো সেই কোন সন্ধ্যেয় খেয়ে থাকি।'

—'খিদে পেলে আবেকবার খাও।' বলেই রজনী কোনদিকে না তাকিয়ে ঘরের ভেতরে চলে এল।

শশাঙ্ক দত্ত অন্ধকার ঘরে আলো জ্বালিয়ে দিয়ে বলল, 'হাজার হোক আমি তো তোমার স্বামী।'

—'আমিও তো তাই জানি। তাই জেনেই তো তোমার হাত দিয়ে গয়নাগুলো বন্ধক দিতে দিয়েছিলাম। সুদ—তাও সুদ সমেত সব টাকা তোমার হাতে তুলে দিলাম—তাও আমার গয়না ফিরল না।'

—'আস্তে বল। ছেলেমেয়েরা জেগে উঠবে।'

—'ওরা সব জানে। ছ-সাত বছর বয়স থেকে থিয়েটার করে আসছি। যেখানে যা টাকা পেতাম মা তুলে রাখতেন। তাই দিয়ে মা আমার সব সময় ভার গয়না করে দিয়েছেন। সেগুলো নিজের সংসার করতে নেমে তোমার হাত দিয়ে কবেকে পাঠালাম—তা আর ফিরল না।'

—'পুরনো কথা তুলছো কেন? জানো তো আমি চাকরি-বাকরি করতে পারিনি। পারিনা একদম।'

—'সে তো জানি। কেন পার না তা কিন্তু জানি না। ঘুম থেকে উঠে পান খেলে, চা খেলে, কাগজ পড়লে, শুয়ে থাকলে, গান করলে, ভাত খেলে, ঘুমোলে—এই তো চলছে।'

শশাঙ্ক বলল, 'শুটে খেয়ে নাও। সারা দিন খুব খাটুনি গেল।'

—'তাহলে নতুন কথা তুলি। এই যে নতুন দল করে 'কবিরাজ' করছি আমরা—এত টিকিট বিক্রি হচ্ছে, নাম হচ্ছে—কিন্তু টাকাগুলো কোথায় যাচ্ছে? দেনা বাড়ছে কেন?'

—'তা আমি কি করে বলব।'

—'তুমিই তো বলবে। তুমি আমার স্বামী। তোমার মত নিজের লোক নিয়ে দল করলাম—যাতে সব কিছু কন্ট্রোলে থাকে, কিন্তু তোমার মত নিজের লোক

নিশ্চয়ই তো কোনো সম্পর্ক নেই। মনে আসে, মনে হয়। স্বামী বলে কথা। সব কথা খুলে বলাও যায় না। নয়তো তোমারই তো সব লক্ষ্য রাখা উচিত ছিল।'

—আমি পারিনি রজনী। আমি অপদার্থ।'

—'ও-কথা বললে আমি আগের দিন চলে তোমায় ছেড়ে দিতাম। দিয়েছিও অনেকবার—এখন তো তোমায় আমি ছাড়ব না। তুমি আমার স্বামী। আমি তোমার বউ। তোমার ছেলেমেয়েরও মা। তুমি কীভাবে এসব নষ্ট করতে পারো—

টেলিফোনটা তোমার হাতে তুলে দিয়ে আমি আড়ালে চলে গেলাম। ওর আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুদের কাছে তোমার—

—এসব কথার দাম নেই। আমি তো তার প্রেমে হাবুডুবু খাই। সে পাগল হলে বলে আমি পাগল হব কেন? আমি বলেছি—লাখো ভিড়ে আমি তোমায় একা দেখি। তুমি সেই চোখে দেখতে শেখো। আমার। আমার তা বলতে আটকায়নি।'

'আমি এরকম ভাবে কখনো যাইনি রজনী।'

—এর ভেতর যা পাস সেসব তোমার।'

কথাগুলো বড় করে ধরল টালিগঞ্জ নিভৃতে। সে সামনের সোফায় বসে পড়ল। বাইরের আলো তার মাথা ও মুখে পড়েছে। ঘরের বাকি সব কিছু অন্ধকারে।

—আমি তোমায় ভালবাসি রজনী।'

—বিয়ের চব্বিশ বছর পরে এ কথা আমি আর ভুলাইনে—'

—তোমাকে ভোলাতে চাই না প্রদীপ। আমি যা আমি চাই।

—সে পথেই তো তোমায় চলতে বলেছিলাম। কোনদিন ফিরতে চেয়েছো—কোথাকার টাকা গ্রাসে চাল ভাসে। বাড়ি ভাড়া গ্রাসে কোম্পানির টাকা ভাঙতে চাওনি। দিনের পর দিন সমুদ্র নেই অসংখ্য নেই ফোন তুলে ইশ্বরবাবু, ভগবান করে চলেছ। কোথায়! তুমি তো কোনদিন ফোনটা ধরে বলনি—আমার স্ত্রীকে খারাপ খারাপ কথা বলবেন না।'

'আমি এ সব কাজ পারি না রজনী।'

—টাকা ফেরৎ দিলেও বন্ধকের গয়না ফেরৎ আনতে পার না। চাকরি করে নিলেও রাখতে পার না। সেই অল্প বয়সে কেন যে ভুলেছিলাম! তুমি চাকরি ছাড়িয়ে ফিরে এলে—কাঁদলে। আমি বলেছিলাম—আমি তো অভিনয় ভুলে যাইনি। কোন চিন্তা কোরো না। সংসার ঠিক চলবে। কেন যে বলেছিলাম! আজ প্রায়শ্চিত্ত করতে ইচ্ছে করছে লক্ষ্মীকে।'

—কতদিন পরে আমার নাম ধরে ডাকলে। আমাদের বিয়ের সেই আগের দিনগুলোতে—তুমি নাম ধরে ডাকতে আমাকে—'

সে কথায় গেল না রজনী। অন্য জায়গা নিয়ে বসে বলল। তুমি তো জল খাবে পারতে। তোমাদের কলেজবেলার বান্ধবী

পাঁচতারার ছিল। তুমি তো কোন সময়ে যাও। তাছাড়া সারাদিন বাড়ি একলা একলা ভাল লাগলে না কেন? তোমার তো সারাদিন একা একা কষ্ট হতে পারত। ভালো বাপের নাম সব সময় ভাল। তুমি সারাদিন শুয়ে থাকবে। আর আমি সারাদিন টো টো করে আর করব। বড় ক্লান্ত লাগছে। ঘুমোতে দাও।

আর বলতে পারল না রজনী। মনে হল বুকের ভেতর কী একটা ফেটে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ ঠকুরঝি কথা আজ বড় বেশি। এত বেশী বছরই রজনী ভালোবাসে প্রদীপবাবু, রজনীকে তার চাই-ই বজনীকে বিয়ে না করলে ওঁবনীই যেত। যে যা বলে, আমি তোমায় ঠিক করেছি—রজনীকেই। কিন্তু ঠিক প্রমাণ করতে পারে না। পারা গেল, কবে হলে কোথাও যে আগে এমন একটা কথা নেই। ছোটবেলায় লেখাপড়ায় ভাল হলে পড়ার সময় একবার ঘাড় বেঁকে থাকে। বাবা পড়ালে টাকা বিকেলে ফিরে আসছে। তাদের পড়ার বাড়ি কিনা ছিলো এক কাঠ চোখ ভরে ভালবাসা

ওদের বাড়িতে পড়তে যাওয়া হয়নি। বাবা ছাড়াও ছিলেন ঠাকুমা, মা, দুই কাকা ও কাকিমা। বাবা ছিলেন সবার বড়। এখনই তাদের ভাগ হয়ে গেছে, তিন কাকাই বাবা মেনেন। বাবা মাকে খুব ভালবাসতেন।

কী করে সংসার চলে এই লোকটা একবারও ভেবেও নিয়ে না। কলেজে চাকরি করতে কী কারণে একদিন একটা নষ্টামি থাকবে বেড়াবার ঘোরে, ঘরে থাকতেন নিয়ম ধরে সে তো অনেকেই করে থাকে। ছাত্রীরা ভীষণ ভালবাসত। অনেকে ভালবাসত। বাবা মাকে খুব ভালবাসতেন।

ঠাকুমা ওদের মানুষ করেছেন। তাঁর মৃত্যুর পরে ছোটো খোকা দুলালের ছোটকাকা বাবার ভাগের টাকা মা ও ওদের ভাগ্যের বিধাতা। ছোট কাকার কথা বাবার কথাও বেশি কম ছিল।

বাবার চাকরি ছাড়া ছাড়া বেতনের ছিল। যখন। যেখানেই থাকে একবার ছাড়া করেছিলেন বাবা মৃত্যুশোকে। ছোট মাইগ্রেনজনিত। আর কে দেখতে ছিলেন বাবা। বাবার আদর আদরের বিষয় ছিল। বড়দা কে কাছের ভাইবোনও টানার সবার সমান। একা কেউ তার নয়, সবাই সবার।

নীহারেরও আর একটা পক্ষ ছিল। তাদের সবার ছোটবেলা নীহারের আপন পক্ষের এক ছেলে বড়দার বড়দা, মেজদা, সেজদা ছোটো ছোট ছোট্ট নয়। অনেক ছোটবেলায় একজন বড়ো মত সেক্ষ এসেছিল তাদের বাড়িতে বড় হবে বড়দা নীহারকে বলেছিল মা—সেই লোকটা এক ছিলেন।

মনে করে করে সেই কথাটা ধরতে নীহার বলেছিল, আমার বাবা। তোমার দাদু।

বড়বাবুর সঙ্গে নীহার আত্মীয়তার ঘনিষ্ঠতা করতে থাকে। সেখানে কর্তাবাবুর ভাইদের সঙ্গে নীহারের ভাব ও ঘনিষ্ঠতা। তিনিই বড়দার বাবা। এখানে খুব সম্পর্ক

বেনারসী শাড়ী
খ্রিস্থান
সিল্ক হাউস
কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা

হু হুম থেকে প্রায় প্রায় থাকতো
যায়। গালাগালি মারামারি
যায় বার বার পুলিস ফোন
ত আসত রজনীর কাছে
সব লাভভণ্ড করে দিতেন

প্রস্পটার ছিলেন খইশিবাবু
হ্যামিওপ্যাথি করতেন। এক-
বারেও যখন বলে দিতেন না
দিয়ে বাবাকে ডেকে আনাত

সহশিল্পীকে পাঠিয়েছিল। রজনী সহশিল্পীর
ভার বকাকে দেন চাকর।

প্রলয়ংকর রাগে বাবা বিভা থেকে
নামলেন। প্রায় সহশিল্পীকে নিয়ে সিঁড়ি
ভেঙে ওপরে এসে উঠলেন। তাকে 'বদমাস
মাইয়া দিয়ে নীহারকে ডাকালেন—যাতে
নিজে ডাকতে পাঠিয়েছিল—এই হল গিয়ে
সে। একেবারে সেন্সলেস, একটুতেই—'

অন্ধকারের ভেতরেও দৃষ্টি পেয়ে গেল
রজনীর। তার বাবা, কাকা প্রায় বড়বাবু

—ইনকাম ট্যাক্স নাকি একবার ব্রাদের
দোকান করেছিলেন ইনকামে নিজেরাই
খেয়ে খেয়ে দোকান তুলে দিলেন।

রজনী কখনো মদ খাননি। শুধু এক-
বার খেয়েছিল। খেতে হয়েছিল। না হলে
সে পারত না। কিছুতেই পারত না। সেই
সময়টায় নিজেই একটা নাম দিয়েছে
রজনী বিসর্জন।

(ক্রমশ)

সুস্বাদু, পুষ্টিকর
ব্রিটানিয়া গ্লাক্সো বিস্কুট

ব্রিটানিয়া
বাড়ন্ত বাচ্চার
সুস্বাদু সাথী

বিস্কুট সবচেয়ে সেরা

ব্রিটানিয়া গ্লাক্সো বিস্কুট এত ভাল লাগে যে [illegible]। বাচ্চারা ভালবাসে খুব আর পুষ্টির গুণে ভরপুর। ব্রিটানিয়া গ্লাক্সো বিস্কুট মানেই বাড়ন্ত বাচ্চাদের সুস্বাদু খাবার।

অমৃতবাজার পত্রিকা

উদ্ভবের ইতিহাস

সুশান্তকুমার মিত্র

আজ থেকে ১০৮ বছর আগে ১৮৬৮ সালে অমৃতবাজার পত্রিকার জন্ম হয়। "কিন্তু জন্ম কখনো আকস্মিক ঘটে না, জন্মেরও একটা ইতিহাস থাকে। সেই ইতিহাস মূল ইতিহাসের পটভূমিকা ও অবিচ্ছেদ্য হলেও অনেকক্ষেত্রে তা অবান্তরই থেকে যায়। অথচ সেই অবান্তর ইতিহাসই জন্ম দেয় বা প্রেরণা দেয় এমন ঘটনাকে, যে ঘটনা ইতিহাস রচনা করে। রবীন্দ্রনাথের অনুসরণে বলতে পারি—আরম্ভেরও আরম্ভ আছে, যেমন প্রদীপ জ্বালাবার আগে সলতে পাকানো রঙ্গমঞ্চে প্রবেশের পূর্বে নেপথ্যবিধান।

'অমৃতবাজার পত্রিকা' আজ ঊনিশ-বিশ শতকের ভারত ইতিহাসের সাক্ষ্য নিয়ে জীবন্ত প্রাণবন্ত। পত্রিকা জাতীয় ইতিহাস রচনা করেনি, নিজেই জাতীয় ইতিহাস হয়ে উঠছে। কিন্তু কি সেই ঘটনা, কি সেই অনুপ্রেরণা যা বঙ্গদেশের এক অখ্যাত গ্রামে এমন সংবাদপত্রের জন্ম দিয়েছিল? তিল তিল করে গড়ে তুলেছিল ভারতীয় সাংবাদিকতার অন্যতম আদি পথপ্রদর্শকদের?

কালের বিচারে ইতিহাস স্থায়ী হয়, অনুপ্রেরণার কথা কেউ মনে রাখে না। ইতিহাসের চাইতে অনুপ্রেরণার বাস্তব মূল্য হয়তো কিছু কম—কিন্তু শক্তি অনেক বেশি। প্রেরণা ইচ্ছাশক্তি জাগিয়ে তোলে, ইচ্ছাশক্তি জন্ম দেয় ইতিহাসকে। বস্তুতঃ প্রেরণা ও তার স্বরূপ দেখে চেনা যায় মানুষকে, একটা যুগ ও জাতিকে—তার শিক্ষা, সংস্কৃতি, মানসিক গঠন ও তার প্রকৃতিকে।

কোন ব্যবসায়িক কারণে নয়, ব্যক্তি স্বার্থের সিদ্ধান্তেও নয়, "মরু সমান মরমে দিতে হবে ভাষা যদনিয়া তুলিতে হবে আশা" দেশসেবার এই মনোভাব নিয়েই সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে ঘোষভায়েরা একদিন এগিয়ে এসেছিলেন। বলা বাহুল্য তখন অমৃতবাজার পত্রিকার জন্ম তো দূরের কথা, জন্মের পরিকল্পনাও হয়নি।

গত শতাব্দীর কথা। ছয়ের দশক শুরু হয়েছে। যশোরের গ্রাম বাংলা তখন অশিক্ষার অন্ধকারে আচ্ছন্ন। ব্রিটিশ সরকারের ওপর নির্ভর করলে চলবে না। তাই "ঘোষভ্রাতৃগণই অক্লান্ত পরিশ্রমে গ্রামে উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়, নৈশ বিদ্যালয় বালিকা বিদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎসালয় ডাকঘর, হাট-বাজার প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল" (সাহিত্য সাধক চরিতমালা ৮৬, পৃঃ ১০)। এবার সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প, কৃষি বিষয়ে এদের সচেতন করা দরকার এ ব্যাপারে গণ-শিক্ষার উপযুক্ত কার্যকর মাধ্যম হল সাময়িকপত্র। তাই অমৃতবাজার পত্রিকার জন্মের আট বছর আগে একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করা হল যশোরের পলুয়া-মাগুরা গ্রাম থেকে। নাম 'অমৃতপ্রবাহিণী'। ১৮৬২ সালে সম্ভবত ডিসেম্বর মাসে এর জন্ম। সম্পাদক ছিলেন বসন্তকুমার বোষ, স্বনামধন্য শিশিরকুমার ঘোষ ও মতিলাল ঘোষের অগ্রজ।

অমৃতপ্রবাহিণী জন্মলাভের ঠিক অব্যবহিত পরে এর সমালোচনা প্রসঙ্গে 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকা (১২ জানুয়ারী ১৮৬৩) লিখেছিল:—

"অমৃতপ্রবাহিণী। —এখানি পাক্ষিক পত্রিকা। ইহাতে বিজ্ঞানাদি ঘটিত বিবিধ বিষয় লিখিত হইতেছে। লেখা মন্দ হইতেছে না। আমরা বিলক্ষণ অনুভব করিয়া দেখিতেছি, এখন এ সকল বিষয় ভাল লোকে হস্তক্ষেপ করিতেছেন। অমৃতপ্রবাহিণী সাপ্তাহিক হইতেছে। ইহাও এদেশের একটি মহৎ লক্ষণ বলিতে হইবে। এতদিন মফস্বলে ঈদৃশ বিষয় সকলের অনুষ্ঠান সম্ভব ছিল না।"

মফঃস্বল ঈদৃশ বিষয় সকলের অনুষ্ঠান' অমৃতপ্রবাহিণীকে অনন্যসাধারণ গৌরবের অধিকারী করেছে।

অমৃতপ্রবাহিণী পাক্ষিক পত্রিকা দেশ ও দশের কতটা উপকার করেছিল জানি না তবে ভারতীয় সাংবাদিকতার ইতিহাসে 'অমৃতপ্রবাহিণী' তিনটি কারণে গুরুত্বপূর্ণ।

(১) অমৃতপ্রবাহিণী পরিচালনাকালে ঘোষভাইদের মনে রাজনীতি বিষয়ক পত্রিকা বার করবার ইচ্ছা জাগছিল।

(২) অমৃতপ্রবাহিণীর নিরুদ্ধ কাঠের যন্ত্রটি ছিল বলেই পরবর্তীকালে এই ইচ্ছার পুনরুপ দেওয়া সম্ভব হয়েছিল।

(৩) সর্বোপরি হেমন্তকুমার, শিশির-কুমার, মতিলাল ঘোষের হাতে-কলমে সাংবাদিকতার শিক্ষা অমৃতপ্রবাহিণী থেকেই সম্ভবপর হয়েছিল। (প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য ১৮৬২-৬৩ সালে শিশিরকুমার ঘোষ, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'হিন্দু পেট্রিয়টের' 'মফঃস্বল সংবাদদাতা' ছিলেন। এম এল এল ছদ্মনামেও তিনি লিখতেন। দ্রষ্টব্য সাঃ সাঃ চঃ ৮৬, পৃঃ ৯ পাদটীকা)।

এসব কথা যে কতখানি সত্য তার সমর্থন পাই হেমন্তকুমারের পুত্র স্বর্গত মৃণালকান্তি ঘোষের লেখা অমৃতপ্রবাহিনীর জন্মকথা বর্ণনায়, কবি নবীনচন্দ্র সেনের আত্মজীবনীতে যোগেশচন্দ্র বাগলের ভারতের মুক্তি-সন্ধানী গ্রন্থে এবং ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যসাধকচরিতমালায়।

সত্য কথা বলতে কি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত দাদা না পেলে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা কতটা বিকশিত হত তা যেমন বলা শক্ত, তেমনি বসন্তকুমারের মত দাদা না থাকলে শিশিরকুমার মতিলালের সাংবাদিক প্রতিভা কতটা বিকশিত হত তা বলা কঠিন। স্বয়ং শিশিরকুমার লিখেছেন—আমি

মহাত্মা শিশিরকুমার

দাদাকে ঈশ্বরের ন্যায় ভক্তি করিতাম। তাঁহার একটু সন্তুষ্টির নিমিত্ত আমি শত-বার প্রাণ দিতে পারিতাম। যেমন কাদা দিয়া পুতুল গড়ে, সেইরূপ তিনি আমাকে গড়িয়াছিলেন।' বঙ্গের জনশিক্ষার প্রচার, অমৃতপ্রবাহিনীর জন্ম-পরিকল্পনা এ সবই বসন্তকুমারের। তিনি ছিলেন স্কুলের হেড মাস্টার। ভাইদের গুরু, শিক্ষাদাতা ও সহকর্মী।

ভাইদের মধ্যে শিশিরকুমার ছিলেন প্রতিভাবান ও বহুমুখী গুণের অধিকারী। অন্তরে দাদার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করতে শিশিরকুমার তিনশ' টাকা নিয়ে কলকাতায় আসেন এবং মাত্র বত্রিশ টাকায় একটি পুরনো কাঠের ছাপাখানা কেনেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র বাইশ বছর। মতি-লালের বয়স তখন পনেরো। মৃণালকান্তি ঘোষ 'পদ্মপুষ্প'-এর আশ্বিন ১৩০৭ সংখ্যায় বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন—'শিশিরকুমার...কলিকাতায়...গিয়া কয়েক দিনের চেষ্টায় একটি কাষ্ঠনির্মিত প্রেস সরঞ্জামসহ অতি সস্তায় হস্তগত করিলেন। ...তাহার পর ছাপাখানার সরঞ্জামসহ শিশিরকুমার নৌকোযোগে বাটীতে আসি-লেন।...গ্রামা সূত্রধরের সাহায্যে কাঠের প্রেসটি মেরামত করিয়া খাটানো হইল। ইহার নাম দিলেন 'অমৃতপ্রবাহিনী পত্রিকা'. আর সম্পাদকীয় ভার লইলেন বসন্তকুমার নিজে। ইচ্ছা থাকিল কিছু রাজনীতি সম্বন্ধে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা বাহির করিবেন।'

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যসাধক চরিতমালার ৮৬ গ্রন্থের ১১ পাতায় এর সমর্থন আছে।

প্রতিভা বস্তুটি থাকলেই তা বিকশিত হয় না। উপযুক্ত জ্ঞান, শিক্ষা ও পরিবেশ তার বিকাশের পক্ষে অপরিহার্য। দাদার অসুস্থতা, অল্প বয়সে দায়িত্ব নিয়ে কাজ করা, সর্ববিষয়ে জানবার ও শেখবার আন্তরিক বাসনা ঘোষভাইদের প্রতিভাকে বিকশিত করতে এবং সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে সাহায্য করেছিল। তাঁরা কেউই আদৌ সাংবাদিক হয়ে ওঠেননি। একটি বিশিষ্ট ধারায় তাঁদের শিক্ষাদীক্ষা গড়ে উঠেছিল।

কিন্তু 'অমৃতপ্রবাহিনী' কিছুকাল নিয়মিত প্রকাশ হবার পর বসন্তকুমারের

প্রথম ছাপার এই স্মরণীয় মেসিনটি এখনও সসম্মানে রক্ষিত

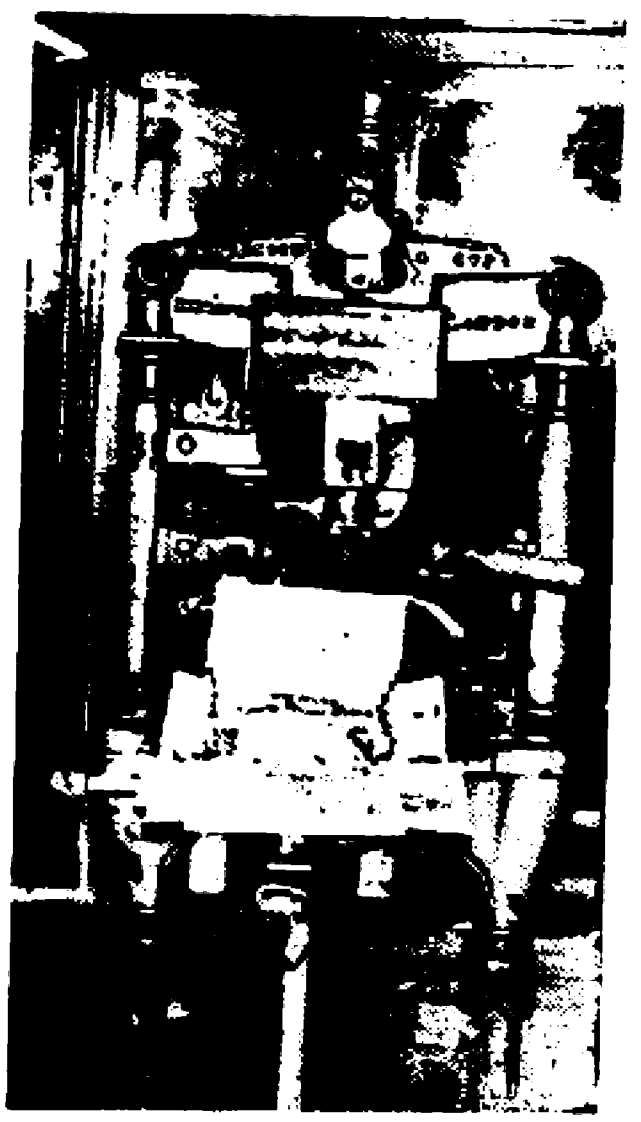

অসুস্থতা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তাঁকে নিয়ে সকলে ব্যস্ত থাকায় কাগজ বন্ধ রাখতে হল। ১৮৬৭ সালে ২৪ মার্চ তিনি মারা যান।

বসন্তকুমারের মৃত্যু যতই শোকাবহ ঘটনা হোক না কেন, দাদার অসমাপ্ত ইচ্ছাকে রূপ দিতে, রাজনৈতিক সংবাদপত্রের জন্ম দিতে এগিয়ে এলেন হেমন্তকুমার ও শিশিরকুমার। তাঁরা সভোর মুখোমুখী দাঁড়ালেন। দুজনেই আয়কর বিভাগের এসে-সরের চাকরি থেকে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করে মাতৃভাষায় দেশসেবার সঙ্কল্প গ্রহণ করলেন। মতিলাল বয়সে নবীন হলেও, মহৎ কাজে সহায়তা করতে এগিয়ে আসেন। দাদার মৃত্যুর এগারো মাস পর ১৮৬৮ সালের ২০ ফেব্রুয়ারী অমৃত-প্রবাহিনীর মুদ্রণকক্ষে অমৃতবাজার পত্রিকার জন্ম হল বাংলা সাপ্তাহিকরূপে। অমৃত-প্রবাহিনীর মত অমৃতবাজারের নামকরণও তাঁদের পূজনীয়া মায়ের নামানুসারে (অমৃতময়ী) রাখা হল। কবিবর নবীনচন্দ্র সেন তাঁর আত্মজীবনীতে 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন—

> উহার সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ, কম্পোজিটর শিশিরকুমার ঘোষ, প্রিন্টার শিশিরকুমার ঘোষ, এমনকি উহার প্রেস ও অক্ষর প্রস্তুতকারক পর্যন্ত শিশির-কুমার ঘোষ। কাগজখানির নামটি যে বড় বড় অক্ষরে ছাপা হয়, তাহার অক্ষর, লোকের বিশ্বাস, লাউ কাটিয়া কি কাঠ কাটিয়া প্রস্তুত করিয়াছেন শিশিরকুমার ঘোষ।...লোকের মুখে এ সকল কথা যেন উপাখ্যানের মত শুনিতে লাগিলাম (আমার জীবন, ২য় ভাগ, পৃঃ ১১)।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য—সে যুগের কাগজে সম্পাদকের নাম ছাপা হত না বলে পত্রিকার প্রথম সম্পাদক কে ছিলেন তা নিয়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত' গ্রন্থের ৫০২ পাতায় 'অমৃতবাজার পত্রিকার (প্রথম) সম্পাদক মতিলাল ঘোষ' বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু একথা ঠিক নয়। দীর্ঘকাল ধরে শিশিরকুমার ঘোষই ছিলেন অমৃতবাজার প্রথম সম্পাদক। তার প্রমাণ আছে বহুমুখী —সংবাদপত্রে গ্রন্থে পত্রে আত্মজীবনীতে বক্তৃতায় ও মোকদ্দমায়। যেমন নবীনচন্দ্র সেনের 'আমার জীবন' ২য় ভাগের ১১ পাতায়; যোগেশচন্দ্র বাগলের 'ভারতের মুক্তি-সন্ধানী' গ্রন্থের ১৩০ পাতায়; ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সাহিত্যসাধক চরিতমালা' ৮৬ গ্রন্থের ২০ পাতায় ও বাংলা সাময়িকপত্র ২য় খণ্ডের ২১৩ পাতায়; ইন্ডিয়ান ডেলি নিউজ, স্টেটসম্যান ও অমৃতবাজার পত্রিকার ১১ জানুয়ারী ১৯১১ সালের কাগজে; স্যার ভূপেন্দ্র মহা-রাজকে লেখা জাস্টিস সারদাচরণ মিত্রের পত্রে এবং শিশিরকুমারের ৬ষ্ঠ মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে বালগঙ্গাধর তিলকের ২৯ ডিসেম্বর ১৯১৭ সালের বক্তৃতায়। তাছাড়া চমাসের মাথায় লাইকেলের মোকদ্দমাটি ছিল সম্পাদক শিশিরকুমারের বিরুদ্ধে, আদালতে মতিলাল ছিলেন একজন সাধারণ সাক্ষী-রূপে। মাত্র ২৮ বছর বয়সে সম্পাদক হওয়ার নজীর ভারতীয় সংবাদপত্রের ইতিহাসে বিরল।

কিন্তু সাময়িকপত্র প্রকাশকালে ঘোষ ভাইদের মনে সংবাদপত্র প্রকাশের বাসনা জেগেছিল কেন—এ প্রশ্নের উত্তর তাঁরা লিপিবদ্ধ করে যাননি বটে, তবে ইতিহাস থেকে তার সঠিক জবাব খুঁজে নেওয়া সম্ভব।

উনিশ শতকের বঙ্গদেশ জাতীয় চিন্তা-চেতনা ধ্যান-ধারণার ধারক ও বাহক ছিল। পরাধীন দেশজননীর স্বার্থে সাহিত্য-বিজ্ঞান-শিল্পের চেয়ে বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল নিজেদের প্রকৃত অবস্থার কথা সোচ্চারে বলা, জাতিকে আত্মসচেতন করা।' কিন্তু পরিবেশ পিষ্ট করলেও সকলে সোচ্চার হন না সোচ্চার হবার ক্ষমতাও সকলের থাকে না, বিশেষত পরাধীন পর-পদানত সে যুগে। সোচ্চার হতে গেলে শক্তিশালী হাতিয়ারের দরকার, যার অপর নাম সংবাদপত্র। তাই 'অমৃতপ্রবাহিনী'র পুনর্জন্ম না ঘটিয়ে তাঁরা বৃহত্তর স্বার্থে অমৃতবাজার পত্রিকার জন্ম দিয়েছিলেন। পাক্ষিক থেকে এগিয়ে এসেছিলেন সাপ্তা-হিকে। তাই দেখি অমৃতবাজার পত্রিকার জন্মরহস্যের অন্তর্নিহিত প্রেরণার মর্মমূলে আছে সে যুগ ও জাতির ইতিহাস। অর্থাৎ যে পরিবেশ ও পটভূমিকায় অমৃতবাজার

য়েছিল তা বিশ্লেষণ করলেই
ই উপলব্ধি করা যাবে :

কর মনোভাগ থেকে দেশের
অসহনীয় হয়ে উঠছিল।
য়ত হচ্ছিল। বণিকের মান-
ণ দেশ দেবার ঠিক একশ
১৮৫৭ সালে প্রথম বিদ্রোহরূপে—
র সিপাহী বিদ্রোহরূপে—
স্বাধীনতা সংগ্রাম বলে হা
তে হয়ে আছে। কিন্তু 'হিন্দু
ক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
ডাস্থ এবং বৃটিশ সরকারের
মন করা উচিত বলে মন্তব্য
ক্যানিং এক বছরের জন্যে
৩৭ থেকে ১৩ জুন ১৮৫৮)
ব্যাপদ্রবে কণ্ঠরোধ করলেন।
লে অন্তত দুটি সংবাদপত্র
। বিদ্রোহ দেখলেই সরকার
মন করেন। রাজকর্মচারীর
ব ও পক্ষপাতদুষ্ট। ন্যায়-
ন কথা আপনার ভালো
ত পদক্ষেপে ঘৃণা আর

অপমান। স্বদেশী শিল্প ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, দৈনন্দিন জীবনে বিদেশী দ্রব্য ব্যবহার করা হচ্ছে ভারতবাসীদের। তার ওপর অর্থ-নৈতিক দিক থেকে ভারতকে শোষণ করা হচ্ছে, জনগণের অবস্থা হচ্ছে দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অভিযোগকারীর কণ্ঠরোধ করা হত। এদিকে প্রবল-বাংলাকেও শোষণ করছিলেন কিছু সংখ্যক নীলকর সাহেব। ইচ্ছার বিরুদ্ধে রায়তদের নীলচাষে বাধ্য করা হচ্ছে। অত্যাচার চরম পর্যায়ে উঠেছে। কিন্তু নেই কোন প্রতিকার। নিরুপায় বাঙালী নীরবে নিভৃতে কাঁদে!

হৃদয় থাকলেই সহৃদয় হওয়া যায় না। সহৃদয় হতে গেলে প্রাণপ্রাচুর্যের প্রয়োজন। সে যুগে ঘোরভাটিদের মধ্যে সহৃদয়তার প্রকাশ দেখা গিয়েছিল দেশের ভালো লোকের ভালো। অমৃতপ্রবাহিণী পত্রিকাকে এই পটভূমিকায় স্মরণ করতে গিয়ে তাঁর রুদ্ধশ্বাস হয়েছিলেন। তাই অমৃতবাজার পত্রিকার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল অনিবার্য-ভাবে। হয়তো বা ইতিহাসের প্রয়োজনে।

তাঁদের মনের পটভূমিকায় দি
কুমারের ইচ্ছার সার্থক রূপ
অমৃতের ভিন্ন সংস্করণের দু
এবং সমকালীন ইতিহা
প্রকাশের সঙ্গে নজীর।

লর্ড ক্যানিং-এর সংবাদ
করা আইন উঠে যাবার ম
সপ্তাহিক সোমপ্রকাশের জ
সাংবাদিকতার ইতিহা
বিষয়ের রাজমত আলোচ
'সোমপ্রকাশেই প্রথম পরে,
মলাসের পরিকল্পনায় ও প
প্রকাশ চলছে। সোমপ্রকাশের
অমৃতবাজার পত্রিকার ওপর
নিচিট নয়। সোমপ্রকাশ
অমৃতবাজার তার পরিপূ
বাজারের সূচনাপর্বেই তা
'ভারত ভাস্কর্যবোধীদের জন্য
লক্ষিত হচ্ছে। পরবর্তী
সুভাষচন্দ্র বসুও তাই চ
নীতিকেই রূপ দিতে মরিয়ম
এবং তুলে ধরা হয়েছিল—'

ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ আপনার
পরিবারের সকলের স্বাস্থ্যের জন্যে একান্ত প্রয়োজনীয়

ওঁরা কি তা যথেষ্ট পরিমাণে পাচ্ছেন?

এটি নিশ্চিত করার জন্যে ওঁদের রোজ ভিমগ্রান খেতে দিন। ভিমগ্রানে দিনভর কার্য্যক্ষমতার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় ভিটামিন আর খনিজ পদার্থ দুইই আছে।

ভিমগ্রান®

অপরিহার্য্য ভিটামিন ও খনিজ পদার্থযুক্ত বড়ি
১৩টি ভিটামিন+৮টি খনিজ পদার্থ

SQUIBB
VIMGRAN
SARABHAI CHEMICALS

SQUIBB
SARABHAI CHEMICALS LTD.

মাত্র একটি ভিমগ্রান আপনাকে সারাদিন কার্য্যক্ষম রাখবে

এই বাড়ী থেকেই বেরিয়েছিল প্রথম 'অমৃত প্রবাহিনী'

গরীতে থাকেন, তাঁহারা আমাদের
দেশে লোকের দুরবস্থার কথা
হয় জানেন।" আবার নানাস্থানে
দাতা নিযুক্ত করে দেশের প্রকৃত
া তুলে ধরা হয়েছে—যে ঘটনা যেরকম
সাধারণকে স্পষ্ট করিয়া দেখাই।
। অনুরোধে কিংবা কাহাকে বিরক্ত
ার ভয়ে কোমল করিয়া লিখি না।.....
দের দেশীয়েরা কিরূপ অবস্থায় আছেন
জক ও রাজনৈতিক বিষয়ে কিরূপ
বস্থায় আছেন, তাহা তাঁহারদিগকে
ই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য। আমরা
ক্ষার মাত্র" (৯-৭-১৮৬৮)। এই মহৎ
শ্যই বাস্তব রূপ নিতে অমৃতবাজার
ার জন্ম হয়েছিল—অমৃতপ্রবাহিনীর
ন্ম ঘটিয়ে তা সম্ভব ছিল না।

দেশের প্রতি সুগভীর মমতা ও নায়-
ণতা সুস্থ সাংবাদিকতার লক্ষণ।
ামরা ইংরাজ অপেক্ষা এদেশীয়দিগকে
ক ভালবাসি একথা স্বীকার করি।
ু বোধহয় ন্যায়পরতা আমাদের কাছে
পেক্ষা প্রিয়।' এই মহৎ আদর্শ আর
ক্ষম স্বদেশপ্রেম অমৃতবাজারের মূলধন

বেনারসী
সিল্ক • তাঁত
শীতের
শাল • আলোয়ান
মেঃ রামকৃষ্ণ ভাণ্ডার
১৪৫/১জি.টি.রোড (সাউথ) হাওড়া

ছিল। কবি নবীনচন্দ্র সেন লিখেছেন—
"শিশির মাতৃভূমির দুঃখের কথা কহিতে কহিতে কাঁদিয়া ফেলিতেন, উচ্ছ্বাসে উন্মত্ত হইতেন।.....যশোহরে লিখিত আমার খণ্ড কবিতায় ও 'পলাসির যুদ্ধে' স্বাধীনতার জন্য যে নিঃশ্বাস ও মাতৃভূমির জন্য প্রভূবিসর্জন আছে, তাহা কৃষ্ণনগরে শিশিরকুমারের সংসর্গের ও শিক্ষার ফল। তিনি ও তাঁহার পত্রিকাই প্রথম এই দেশে স্বদেশভক্তির পথপ্রদর্শক।" (আমার জীবন, ২য় ভাগ শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ, পৃষ্ঠা ২৬)। (ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত' গ্রন্থের ৫০২, ৫০৫—৪ পাতায় ভুল তথ্য আছে)

'সোমপ্রকাশে' উদ্ধৃত ইন্ডিয়ান ডেলি নিউজে' পুনর্মুদ্রিত (৩০ আগস্ট ১৮৮৭) এক প্রবন্ধে বলা হয়েছিল—

"The Editor of the Patrika....is not afraid, so to speak, to enter into fire and water and succour distressed. Tales of official oppression make him simply restless. He never fails to enter a fearless protest whatever the Government is found to do an act of injustice; and however high the official may be, his misconduct scarcely escapes his lynx eyes and the official is fearlessly exposed .... He never hesitates to attack sharply the English policy which makes a distinction between the white and the black In short, he is ready to sacrifice his own private interests for the sake of the welfare of his country .... His patriotism is unselfish. He has devoted his heart and soul to the cause of his country, and is ready to sacrifice for it. That our brother of the Amrita Bazar Patrika may continue to serve the interests of the country in an unselfish and independent way, is our humble and sincere prayer to God."

পরাধীন সেই যুগে বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে অমৃতবাজারের বলীবৃদ্ধের ভূমিকা

যে কত কঠিন কাজ ছিল সেকথা বালগঙ্গাধর তিলক লিখে গেছেন—

"It is a very difficult task now to criticise the Government — it was more so in those days and, not only biting sarcasm but great resourcefulness, great courage, great insight and large sympathy was required to make honest journalism a success in the land. Shishir Babu had those qualities in abundance. The authorities feared him. They could not raise their finger to crush him". (29 Dec. 1917).

তিলক ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন চরমপন্থী যোদ্ধা ছিলেন। তাঁর দৃষ্টিতে অমৃতবাজারের এই ভূমিকা গবেষণার দাবী রাখে।

প্রথম দিনের প্রথম পাতা থেকে জানতে পারি—যে স্থান হইতে এই পত্রিকা বাহির হইতেছে, তাহার পশ্চিমে ও উত্তরে ৩ দিনের পথ, পূর্বে তেড় বৎসরের ও দক্ষিণে তিন বৎসরের পথ পর্যন্ত একটিও মুদ্রাযন্ত্র নাই; সুতরাং সংবাদপত্র থাকাও অসম্ভব। অথচ সেই পত্রিকাই চার মাসের মাথায় শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে প্রথম সংঘর্ষে লাইসেন্সের মোকদ্দমায় হেরে, এক বছর পর সর্বস্বান্ত হয়ে কলকাতার বৌবাজারের উদ্বাস্তু হয়েছিল এবং তা সত্ত্বেও অতি অল্পকালের মধ্যে ইংলিশম্যান, হিন্দু পেট্রিয়ট, ইন্ডিয়ান মিরর ও সোমপ্রকাশের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে নিজের যোগ্যস্থান অর্জন করতে সক্ষম হল। শুধু তাই নয় জন্মের দু বছরের মধ্যে এর খ্যাতি ভারতের বাইরেও বিস্তৃত হয়। প্রখ্যাত ফরাসী প্রাচ্যতত্ত্ববিদ গারজোঁ দা তাসি তাঁর সুবিখ্যাত

'Historie de la Litteratteure Hindoule et Hindoustanie'

গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে (১৮৭০) ভারতের শীর্ষস্থানীয় সংবাদপত্রের মধ্যে অমৃতবাজারকে স্থান দিয়েছিলেন। দুর্দম্য নীয় প্রতিভা আর অদম্য ইচ্ছা ছাড়া এ জিনিস বাস্তবে সম্ভব নয়।

কিন্তু সব সম্ভাবনার মর্মমূলে আছে 'অমৃতপ্রবাহিনী'। অমৃতপ্রবাহিনী বীজ অমৃতবাজার তার পল্লবিত পুষ্পিত রূপ। অমৃতপ্রবাহিনীতে যে সাংবাদিক প্রতিভার স্ফুরণ অমৃতবাজারে সেই প্রতিভার বিকাশ। অমৃতপ্রবাহিনী যেন সাধনা, অমৃতবাজার তার সিদ্ধি। অমৃতপ্রবাহিনী ইতিহাসের অনুপ্রেরণা, অমৃতবাজার সৃষ্ট ইতিহাস। এইভাবে উৎস আর উদ্ভব পশ্চাদপট আর প্রক্ষপট ছায়া-কায়ার মতো একাত্ম হয়ে গেছে, অবিচ্ছেদ্য পরিপূরক হয়ে আছে। কিন্তু কালের কণ্ঠস্বর যেখানে পৌঁছয় না, অমৃতের প্রবাহ যেখানে ক্ষীণ—ইতিহাসের ভূমিকা সেখানে নীরব-মুখর। তাই সেই হারিয়ে যাওয়া উপেক্ষিত গৌরবময় ইতিহাসকে—অমৃতবাজারের ইতিহাসের ভূমিকাকে একবার স্মরণ করলাম।

CENTRAL LIBRARY

কলকাতা বই মেলা

রেখা বড়ুয়া

কুইন্সওয়ে জুড়ে গাড়ীর সারি। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের আশেপাশে মঙ্গলবার, বেলাশেষের ভিড় আজ নতুন নয়; তবে ওপাশের ক্যাথিড্রাল রোডটা প্রায়ই ফাঁকা থাকত। কিন্তু সেখানেও মানুষজনের আনাগোনা শুরু হয়ে গিয়েছিল। ফাঁক ফাঁক করে হলেও গাড়ী দাঁড়িয়েছে বেশ কিছু।

বিডলা তারামণ্ডলের মাঝামাঝি অনেকখানি জায়গা জুড়ে ঘেরা চত্বরের মধ্যে মেলা বসেছিল বই-এর। প্রবেশদ্বারে যথারীতি উৎসাহে জ্বলজ্বল করা মুখ নিয়ে তৈরী ছিল কাঁচা হলুদ, ক্রেতা আর দর্শকদের অভ্যর্থনার জন্য।

মেলায় ঢুকে প্রথমেই ডান হাতে ছিল উদ্যোক্তা পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স গিল্ড এর অফিস। তারপর সামনে পাশে চারদিকে স্টল আর প্যাভেলিয়ন ছোট বড় নানা মাপের। জবদা টিয়াপাখি, নীল, সাদা নানা রং-এর কাপড় দিয়ে সাজানো হয়েছিল এই অস্থায়ী দোকানগুলি।

বড় পসারীদের মধ্যে সবার আগে মন টেনেছে ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টের প্যাভেলিয়ন। অনেকখানি জায়গা নিয়ে বই-এর তাক সাজিয়েছিলেন এরা। সমবেশ এদের [illegible]। অন্যান্য শিল্পোদ্যোগ

টেক্সট বুক সবই ছিল। এর মধ্যে সব থেকে উল্লেখযোগ্য হল বিদেশী বই-এর সারি। পশ্চিমের ইংলণ্ড, আমেরিকা, জার্মানী ফ্রান্স থেকে পূবের জাপান, মালয়েশিয়া, শ্রীলঙ্কা পর্যন্ত সব দেশের সব ভাষার বই এরা সংগ্রহ করেছেন প্যাভেলিয়ান সাজাতে। এখানে বই দেখতে ততটা উৎসাহ সাধারণ মানুষের হওয়ার কারণ ছিল না, কেননা বেশীর ভাগ ভাষাই না জানা। তবু চোখ বুলিয়ে নিতে গিয়ে হঠাৎই থেমে গেছেন কেউ কেউ। জার্মান ভাষায় লেখা বই-এর মলাটে কপালে টিপ আঁকা দোমড়ানো টানা বাঙালী বধূর মুখ অথবা ফরাসীতে লেখা বই-এ সুন্দরবনের ডোরাকাটা বাঘরাজের ছবি—একলার হাতে তুলে না দেখে পারা যায় না। এছাড়া বাকী বই-এর মধ্যে এঁদের 'ইন্ডিয়া দা ল্যান্ড অ্যান্ড দা পিপল' সিরিজ চমৎকার।

ওরিয়েন্ট লং ম্যান্স পেঙ্গুইন সাজিয়েছিলেন ফুলের তোড়া দিয়ে। মজলুমী ফুলের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে ওদের পেপার ব্যাকের বই। চকচকে মলাটের কত বই ছোটদের জন্য। বড়দের বইয়ের অবশ্য চেহারার বৈচিত্র্য নেই, কিন্তু বিষয়বস্তুতে আছে।

অকসফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস অন্য [illegible] বহু

রকম। ভারতীয়দের [illegible] ককবরক ছাড়া পাবেন সাইড [illegible]

সাহিত্য একাডেমীর সংগ্রহ নেই বলা। প্রকৃত [illegible] সন্ধান পাবেন এখানেও।

স্টল এবং প্যাভেলিয়ান [illegible] কিছু বেশী কমবয়সীদের [illegible] এর মধ্যে কলকাতার সাইরেন [illegible] থেকেও প্রকাশক বিক্রেতা এসেছেন কয়েকজন। সাজানো গোছানো বিশেষ সম্পদগুলি তারা তুলে ধরেছেন সবার চোখের সামনে। বড় আয়োজন, কিন্তু তা বলে ছোটরা পড়ে ছিলেন না।

একটু ছোট স্টল, অল্প আয়োজন, কিন্তু ভেতরে কিছু বৈশিষ্ট্যের সন্ধান মেলায় মানুষের মন ভোলা আর রঙের প্রয়োগটাকে এরা ভুলে যাননি বরং বেশী নজর দিয়েছেন বই-এর ভিতরে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিবাহ সম্পর্কীয় রচনা থেকে নানা প্রস্তাবনা রচনার সংকলন রেখে বই প্রকাশের ব্যাপারে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দিকটির এদের বেশ [illegible] দেখা গেল।

আরও স্টল আছে, এইসব কিন্তু বই-এর মেলাকে [illegible] অসাধারণত্ব। অল্প পরিসরে [illegible] সামনে কাঠের প্যাডেলের ওপরও

ছড়ানো কথানি। তবুও নিশ্চয়ই দু-একখানি কিছুটা বিক্রয়ও। কিন্তু তা বলে দর্শক বা ক্রেতার ভিড় এখানে কম নয়। বন্ধুদের পাঞ্জাবি চাদরে সজ্জিত প্রায় পঞ্চাশোর্ধ্ব অধ্যাপক, সঙ্গে ট্রাউজার্সপরা মোটা চশমার ঢাকা অনন্যমনস্ক দৃষ্টি ছাত্র সবাই সমান ব্যস্ত এখানে বই কিনতে। প্রাচীন এবং আধুনিক কালের তথাসমৃদ্ধ কবিতা গুচ্ছের কিছু সম্ভারও এসব স্টলে এনেছে।

এমনি সব বিশেষ ক্ষেত্র ও সাধারণভাবে কলকাতার এই বই মেলার অনবদ্য সাহিত্যের বেশ কদর দেখা গেছে এবার। বিদেশী বই ছাড়াও বিভিন্ন ভারতীয় ভাষা থেকে অনূদিত বই-এর সংখ্যাও কম নয়। কৌতূহলী বাঙালী পাঠক এখানে তামিল, গুজরাটি, ওড়িয়ার মত নানা ভাষার বিশেষ সম্পদ সম্বন্ধে অবহিত হবার সুযোগ পেয়েছেন। অন্য ভাষাভাষীদের ক্ষেত্রেও এই সুবিধা সমানই।

এছাড়া ছিল কিশোর আর নিম্নমধ্যবিত্তের উপযোগী সাহিত্যের ডালি। এদের আকর্ষণ করতে শিশুবর্ষ, শিশুদের জন্য নতুন করে দৃষ্টি ফিরিয়েছেন সবাই। ওদের জন্য সুন্দর করে ছাপানো বাঁধানো নানা কাহিনী নানা জ্ঞানের বই এসেছিল মেলায়। এর মধ্যে অনুবাদও ছিল বেশ কিছু।

সাগরপারের ইংলণ্ড আমেরিকা, জার্মানী, কানাডার বহু ভারতীয়ের বাস। বহুকাল আগে অনেকে ঘর ছেড়েছেন সুখের বা জীবিকার সন্ধানে। তবু চিরকাল মনের মধ্যে ঘরের টান ফুরোতে চায় না কিছুতেই। তাই একটু বড় হতে আজকাল মনে ইচ্ছে হয়, ওরা জানবে এতো ইতিহাস কথা, ওদের মাতৃভাষাতে ভাষান্তরিত বহু। সিন্ডারেলা স্নোহোয়াইট গল্পের চাঁদ পড়তে না একটু রামায়ণের গল্প, রুবে প্রহ্লাদের কাহিনী, রাণা প্রতাপের ইতিহাস, নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জীবনী। তখন তড়িঘড়ি বেশি অর্ডার যায়, পাঠান কিছু ইংরেজী অনুবাদ।

আর অর্ডার আসে রঙিন বই-এর। গাড়িদের চড়িয়া এটা। ডংস্ট উপকরণের গুণাবে রোজকার বৃদ্ধা বিস্তার লাগছ টিনের কারার মধ্যে রেখে দেন। দুটিতে পাউন্ড অথবা পাঁচসাত ডলার প্রায় আর কি সব পাঠাতে করা দু একখানা ভালো ইতিহাসের বই, ছোট ছবি কিছু লেখা যায়।

এতো গেল একদিক। আর একদিকে শুদ্ধ হরপ্রসাদ জন্য, ছাত্রদের জন্য নানা উপহার। ক্লাসিকস থেকে শুরু করে বিভিন্নভাবে একালের গল্প উপন্যাস, বিজ্ঞান, সায়েন্স, অ্যাকাউন্টেন্সি, সাহিত্যের রেফারেন্স বই, কি ছিল না! কলেজ স্ট্রীট পাড়া অতিপরিচিত কত কিছু যা পাওয়া যায় নি তাও হঠাৎ মিলে গেছে—কোন এক স্টলে। এর সঙ্গে ছিল আর একটু, উপরি পাওনা আর কি সব পাবলিশার্সের সাহিত্য বিভাগে ঢুকতে চাইলে বাক্যের ভয় সম্ভবত বই পাওয়া যায় এখানে। কিন্তু হাতের কাছে সুযোগ থেকেও কেনার তাগিদটা কেন যেন তেমন দেখা যায় নি। এখন বইয়ের দাম তবে কম নয়। দশ পার্সেন্ট আর কতটুকু কমবে। তাই মাদুরেজন আসছে যাচ্ছে দেখছে উল্টে পাল্টে কিন্তু কিনছে না তেমন। মেলা বসেছে একটা বড় আকাশ আলো আছে, সানাই বাজছে লাউডস্পীকারে ঘুরে বেড়িয়েই আসা যাক একবার। তাছাড়া সন্ধ্যে বেলাটা ঘরে বসে থাকার চেয়ে তো ভালো সাধারণের মনোভাব হওয়াই বা এই। চত্বরের মধ্যে ফাঁকা জেলপুরী স্নাইস্কীম না থাকুক, ওপন এয়ার রেস্তোরাঁ আছে একটা দুটো। একটু ঘুরে ফিরে এসে বসা যাবে, কফির সঙ্গে মশলা দোসা বা দুখলা ফিসফ্রাই নিয়ে। পাশেই তো কিচেন একেবারে গরম গরম ভেজে আনবে একখানি। অনেক স্নীট পাড়ার ইনস্টলেশনগুলো হাওয়াটা হাই জমাতে পারে নি এখানে। তার বদলে নতুন বেশ একটা ঘরোয়া ভাব, যাকে বলা যায় ফ্যামিলী আটমোসফিয়ার। স্বামী-স্ত্রী, বালক পুত্র আর কিশোরী কন্যাকে নিয়ে বসেছেন গৃহকর্তা ঘিরে। কিন্তু শিশুসাহিত্যের এত সমারোহ হয়েও শিশুদের বড় একটা আকর্ষণ নি কেউ। এরাই তো বায়না ধরবে গল্পের বই-এর। পুজো নয়, দেওয়ালী নয় জন্মদিন নয় এখন বায়না ধরলে না হক খরচ খানিকটা।

অবশ্য শিশুর মায়েরাও খুব একটা কেনার মন নিয়ে যে এসেছেন তা নয়। পাশেই হ্যান্ডিক্রাফটস এগ্জিবিশন। কোনাকাটার যা কিছু সবই তো ওখানে। তবু বাঙালীর চুনোপুঁটি ভালোবাসা মাছপাগল এসেছিলেন কিছু। পাশেই ইকোটাইপস অ্যাকোয়ারিয়াম। ওদিকে গাড়ী পার্ক করে রেখে একবার ঘুরে যাওয়া হয়ত। কাজেই তো। 'স্পট এর বেস্ট' বইয়ের আর ফ্রেঞ্চের কটন-এর ড্রইং, ক্রানসেস ফ্রাঙ্কোয়ার্স আর সার্ট পরা কিছু ছেলেমেয়ে ওদিক পানে ঘুরছে ইতস্ততঃ। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে বই-এর পাতা উল্টে দেখবে এত সময় কই, তাদের হাতে। দেখা যাবে একেই হয়ে আর একদিন। আজে তো কিছুদিন আরো ভালটা ছিল মেলা এইরকম।

হল, কিন্তু পাবলিশার্সে প্যান্ড মুক্ত সেলার্সে গিল্ডও এর স্টলে এত ভীড়ের ভিড় নেই। জরেণ্ট সেক্রেটারী শ্রীমহল ধর ঘুরে আসবার। তাছাড়া এটা তো শুধুই পাঁচসাত দিনের ব্যাপার নয়। এটা হল ভূমিকা, মানুষজনকে মেজাজ তৈরী করার সুযোগ দেওয়া। আসল কাজ তো আসছে পরে। তার আয়োজন অবশ্য শুরু হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই।

কলেজ স্ট্রীটের কাছে বই পাড়ার জমি পাওয়া গেছে সাড়ে তেরো কাঠা। সেখানে তৈরী হবে সুদৃশ্য এক ইমারৎ। প্রকাশকদের সমবায় অফিস, বিদেশী আন্তর্জাতিক জন্য আন্তর্জাতিক লাইব্রেরী, ট্রেনিং সেন্টার সবই থাকবে সেখানে। প্রকাশনার ব্যবসাটাকে বুদ্ধি শিক্ষা আর অনুশীলন দিয়ে সাফল্যের পথে এগিয়ে দেওয়াই হল এই প্রতিষ্ঠান আসল উদ্দেশ্য। গ্রন্থ প্রকাশনার বিজ্ঞান সম্বন্ধে অজ্ঞতা দূর না হলে এই ব্যবসার অগ্রগতি থাকবে প্রশ্নচিহ্ন পদে পদে। গ্রন্থের বিষয়বস্তু, ভাষা বিচার, মলাটের কাগজ হরফ বাঁধাই, ক্রেতার রুচি, মার্কেট কোথা, সবের পেছনেই দরকার কিছু, কিছু অভিজ্ঞতা। এ সবের ঘাটতি পূরণের জন্যই গিল্ড-এর এই উদ্যোগ।

বিশ্ব জুড়ে জ্ঞানের পরিধি এবং আগ্রহের নিয়ত বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে চলতে হলে গবেষণার কিছু একটা করা দরকার। উদ্যোগী হয়ে সে ভার কাঁধে তুলে নিয়েছেন গিল্ড। কলকাতায় বই মেলা খুব পুরোনো ব্যাপার নয়। তাই এতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠবার জন্য ক্রেতাদের অবশ্যই কিছু সময় দিতে হবে, সাহায্য করতে হবে তাঁদের ক্রয়ের ক্ষমতা বাড়াতে, নইলে এত আয়োজন সবই বিফলে যাবে। প্রকাশনার ব্যবসাকে বাড়াতে হলে বইএর দাম সাধারণের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে নামিয়ে আনতে পারলে সেটা লেখক, প্রকাশক, পাঠক সবারই স্বার্থের অনুকূল হবে। সাধারণ মানুষের বই পড়ার নেশা, কেনার অভ্যাস বাড়ানোটা এক্ষুণি দরকার এবং সেটা—আর কিছু না হোক শুধু প্রকাশনার ব্যবসাটাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যই। আর তা বাড়াতে পারলে দেশের বই প্রকাশকদের চেহারাও পাল্টে যাবে অদূর ভবিষ্যতে। কফি পকোড়ার পয়সা বাঁচিয়ে যখন ছেলেমেয়েরা হুরদম ঢুকে পড়বে বই এর স্টলে, তখনই সব বয়সের মনোহরণ প্রকাশন আর প্রলোভন থেকে বাঁচিয়ে সারা বছরের কিছু, সঞ্চয় করে রাখবেন যাঁ মেলার এই মুহূর্তগুলি ছিল বাঁচির জন্য।

রেডিও কার্টুন—দিলীপকুমার সেনগুপ্ত।

বাক-সাহিত্য। ৩৩ কলেজ রো, কলকাতা-৯। দাম বারো টাকা।

রেডিও কার্টুন সাহিত্যে নতুন সংযোজন। নতুন কেবল বাংলায় নয়, কিংবা ভারতীয় ভাষাতেও নয়, সারা পৃথিবীতেই। ছাড়াও এ একটি মাধ্যম যা লিখিত আকারে প্রকাশিত হলেও ঠিক সাহিত্য কিনা তাও নিশ্চয় করে বলা শক্ত। যেমন ভাবতে হয়, চলচ্চিত্রের সিনারিও সাহিত্যের আওতায় পড়ে কিনা, যদিও বিদেশে এবং ইদানীং এদেশেও অনেক সিনারিও ছাপা অক্ষরে এবং বই আকারেও বেরিয়েছে। আর তা অনেক ক্ষেত্রে সাহিত্য এবং সাহিত্য-রসাশ্রিতও হয়েছে। রেডিও কার্টুনও সেদিক থেকে যথেষ্ট পরিমাণেই সাহিত্যগুণ-সম্পন্ন।

এই মাধ্যম জন্মলাভ করেছে দিলীপ-কুমার সেনগুপ্তের প্রতিভায়। আর শুধু পরিকল্পনাই করেন নি তিনি, রচনা করেও দেখিয়েছেন এ মাধ্যম কত যোজন।

রেডিও কার্টুন প্রচারিত হয় রেডিওতে এবং এর প্রধান অবলম্বন শব্দ ও ধ্বনি যা চোখে দেখা যায় না, শুধুই শোনা যায়। এটি কমিক স্কেচ বা হাস্যরস কি ব্যঙ্গের প্রচলন ধরনেরও নয়। এর প্রচারের সময় দু মিনিট থেকে তিন মিনিট এবং উদ্দেশ্য বাংলা ঠাট্টার একটি বাঁকারেখা আঁকা বা কার্টুনের মত মনে হবে। খবরের কাগজে যেমন চোখে দেখার কার্টুন ঠিক সেইরকমই। এটি কানে শোনার কার্টুন। ব্যাপারটা অভিনব তো বটেই খুবই উত্তাবনসাপেক্ষ। যেন হঠাৎ অন্ধকারের মধ্যে একটি লাল বা নীল রং-এর দেশলাই কাঠি জ্বলে ওঠা এবং কিছুক্ষণ পরেই নিভে যাওয়া। অথচ ঐ দ্যুতির অভিজ্ঞতাটি মনে গাঁথা হয়ে যায়, বাস্তবিক খবরের কাগজে যেমন অনেক সময় সুদীর্ঘ প্রবন্ধ বা আলোচনার চেয়ে কার্টুন অনেক বেশি বাঙ্ময়, রেডিও কার্টুনও সেইরকমই।

দিলীপকুমার সেনগুপ্তকে এজন্য অভিনন্দন জানাবো। পথিকৃতের সম্মান শুধু নয় একজন সার্থক স্রষ্টার সম্মানও তাঁর প্রাপ্য। রচনার সঙ্গে সমান তালে চলেছে কারুকাজ। বইটি সাগ্রহে পড়বার মতো এবং কাছে রাখবার মতো।

ম

এলাহাবাদে শরৎশতবার্ষিকী

সম্প্রতি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের উদ্যোগে স্থানীয় বিজয়-নগরম হলে অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠান গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করা হল। শরৎ সাহিত্য সম্পর্কে বিদগ্ধজনের বক্তৃতা নাটক-ভিনয় আলোচনাচক্র ইত্যাদিতে অনুষ্ঠানটি বিশেষ আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল।

শরৎসাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান ডঃ গুরুদাস ভট্টাচার্য বলেন শরৎ-চন্দ্রের জীবন ও সাহিত্য আজ নতুন দৃষ্টি-ভঙ্গী নিয়ে পড়া উচিত। শরৎচন্দ্রের কৃতিত্ব সম্পর্কে সমালোচকের অনুশীলন সবক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নয় তাই তাঁদের কথা শরৎ মূল্যায়নও সঠিক হয়নি।

শরৎসাহিত্যে সুপণ্ডিত এবং বলিষ্ঠ হিন্দী লেখক শ্রীবিষ্ণু প্রভাকর তাঁর বক্তৃতায় বলেন শরৎচন্দ্রই প্রথম বাংলা ঔপন্যাসিক যিনি সমাজের অবিচার এবং ভাতাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ছিলেন এবং সমাজের নীচুতলার মানুষের তাঁর সাহিত্যে সযত্ন মর্যাদা দিয়েছিলেন। তিনি জানান বঙ্কিম ভারতেও শরৎবাবুর লেখা বিশেষ জনপ্রিয় এবং তাঁর অনেক বই-ই বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

সাহিত্যের খবর

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরিজি বিভাগের অধ্যাপক এস বি মুখোপাধ্যায় বলেন, শরৎসাহিত্যের বিশেষ সামাজিক এবং অর্থনৈতিক মূল্য রয়েছে। তিনি আরও বলেন শরৎসাহিত্য যে ধারায় অবহেলিত মানবের দুঃখবেদনার রূপ দিয়েছে তা সম্পূর্ণরূপেই ভারতীয়। পাশ্চাত্য সাহিত্যের বিষয় এবং প্রয়োগরীতি থেকে তা সম্পূর্ণ-ভাবেই স্বতন্ত্র।

শ্রীমাধবের দিকেন্দ্রী তাঁর বক্তব্য রাখেন এইভাবে শরৎচন্দ্র তাঁর রচনার মাধ্যমে নারীর প্রতি পুরুষ সমাজের অত্যাচার সম্পর্কে পাঠকদের অবহিত হতে বলেন। এ সম্পর্কে তাঁদের সচেতন হবার মনোভাব গড়ে তোলার উপরেও জোর দিয়েছেন।

শরৎচন্দ্র সাহিত্য সম্পর্কিত আলোচনা-চক্রে অংশ নেন অধ্যাপক গুরুদাস ভট্টাচার্য অধ্যাপক এস বি মুখোপাধ্যায় এবং অধ্যাপক বাসেশ্বর সিং।

পরলোকে কুমুদরঞ্জন সরকার

কুমুদরঞ্জন কবি সাহিত্যিক কুমুদরঞ্জন সরকার সম্প্রতি কলকাতায় প্রয়াত গেছেন। সাপ্তাহিক বসুমতী সত্যযুগ ও মাসিক বাংলাদেশ পত্রিকার সঙ্গে জড়িত ছিলেন তিনি।

—চাষক

শেকসপীয়র অনুবাদ ও অনুবাদ সমস্যা

(আলোচনা)—বীণা ঘোষ। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার। ৩৮ বিধান সরণী। কলকাতা-৬। দাম ২৪ টাকা।

ইংরেজ এদেশে বাণিজ্য উদ্দেশ্যে এসে ছিল। কিন্তু সঙ্গে নিয়ে এসেছিল পাদ্রী এবং শেকসপীয়র। তারা চলে গেছে: কিন্তু শেকসপীয়র থেকে গেছেন। সম্ভবতঃ শেকসপীয়রের অমর সাহিত্য এদেশের মানুষের মন জুড়ে থাকবে আরও দীর্ঘ-কাল। এখনও তিনি বাঙালীর অনাত্ম প্রিয় বিদেশী লেখক। তাঁর রচনার অনুবাদ দীর্ঘকাল যাবৎ বাংলা-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। এবং তাঁর নাটক ও সনেট আজও প্রভাব বিস্তার করে আছে বাংলা সাহিত্যে। কলকাতায় চার্লক আমলের পরবর্তী সময়ে প্রতিষ্ঠিত ইংরেজদের বিভিন্ন রঙ্গালয়ে শেকসপীয়রের নাটক অভিনয় সুরু হয়েছিল। পরে বাঙালীরাও অভিনয় করে, এবং বিশ্ববিদ্যালয় ও বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীতে শেকসপীয়র অন্তর্ভুক্ত হন। সতের শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে বাংলা-সাহিত্যে শেকসপীয়রের রচনার অনুবাদ সুরু হয়ে যায়। গুরুদাস হালদার, মহারাজা বিদ্যাবাগীশ, হরচন্দ্র ঘোষ, তারাচরণ শিকদার এবং জি সি গুপ্তকে বলা যায় এক্ষেত্রে পথিকৃৎ। তারপর আবির্ভাব ঘটে মধুসূদনের। যাঁর নাটক ও কমিডিগুলি শেকস-পীয়রের প্রভাব পড়েছিল সুস্পষ্টভাবে। শেকসপীয়রের প্রভাব হ্রাস পেতে থাকে বিশ শতকের প্রথমে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর অবশ্য আধুনিক ইংরেজ নাট্যকার বাঙালী মানসিকতার নাড়ি স্পর্শে পরি-বর্তনের জোয়ার। শেকসপীয়রের জন্মের চারশতবর্ষ পূর্তি উৎসব উপলক্ষে তাঁর বহু নাটকের অভিনয় হয়েছিল। আজও শেকসপীয়র গ্রন্থাবলী প্রকাশের গল্প তার এই অসামান্য নাট্যকারের জনপ্রিয়তাই প্রমাণ করে। শেকসপীয়রের সনেটের একাধিক সংস্করণও প্রকাশিত হয়েছে।

শ্রীমতী বীণা ঘোষের বর্তমান গ্রন্থখানি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে তিনি যে গবেষণা চালিয়েছিলেন, তারই নিদর্শন। তিনি আলোচনা শুরুতেই শেকসপীয়রের সঙ্গে পরিচয় থেকে উনিশ শতকের শেষ সময় পর্যন্ত। মোট কুড়িটি অধ্যায়ে আলো-চিত বিষয়বস্তুকে যথা সম্ভব পূর্ণাঙ্গ করে-বার সচেষ্ট মূল্যায়ন। অন্যান্য অধ্যায়ে তাঁদের শেকসপীয়রের জনপ্রিয়তা, তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ অনুবাদ ও অনুসরণ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

শ্রীমতী ঘোষ একটি মূল্যবান বিষয় তাঁর গবেষণা নিয়োজিত করেছেন এবং কঠোর শ্রম ও নিষ্ঠার সঙ্গে সুপ্রচুর তথ্য উদ্ধার করেছেন। কিন্তু শেকসপীয়র সম্পর্কে আলোচনা বিশ শতকে পর্যন্ত এঁপর্যন্ত নিয়ে এলেন না কেন, সেটা বোঝা গেল না।

এই শতাব্দীতে, বিশেষ করে গত কয়েক বছরে বাংলা ভাষায় অপরাধ বেড়েছে দ্রুত লয়ে, তার প্রকাশকমতা ও আঙ্গিকেরও অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। এমনকি লেখক-পরিচয়ের যে ১৮নং সনেটটির অনুবাদে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত করেছিলেন সেই সনেটটিরই রূপান্তর সুধীন্দ্রনাথ দত্ত কিন্তু যে বা মণীন্দ্র রায়ের হাতে কীভাবে বদলেছে তা দেখলেও এটা বোঝা যায়। কাজেই শ্রীযুক্তা হেনা তাঁর এই তথ্যসেবকদের ধারাকে যদি চলতি সময় পর্যন্ত বইয়ে এনে বইটির দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করেন কাজ দেবে।

অপরাধ ও অপরাধী—সুকুমার বসু। রূপা এণ্ড কোম্পানী। ১৫ বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট। কলকাতা-১২। দাম বারো টাকা।

সভ্যতার আদিপর্বে সেই আদিম জীবন থেকে শুরু করেই অপরাধপ্রবণতা মানুষকে ছুঁয়ে রয়েছে। সভ্যতার বিবর্তনে পরিবর্তনের বিভিন্ন স্তর পার হয়ে মানুষ যেমন এগিয়ে চলেছে অপরাধও এসেছে সেই মতই। সেও কিছু থাকেনি, বরং বিবর্তনের তালে তাল মিলিয়ে তার সেই আদিম বৃত্তির ঘটেছে কিছু আনুষ্ঠানিক পরিবর্তন। এবং সেই সঙ্গে বেড়েছে জটিলতা। আজকের এই সভ্য দুনিয়ার আপাতদৃষ্টে সমস্তেও অপরাধ অনিবার্য ভাবেই কেন মানুষের সঙ্গী হয়ে রয়েছে। মানুষও নির্বিকার থাকেনি তাদের প্রবৃত্তির এই অদ্ভুত আচরণ সম্পর্কে। অপরাধের দমনে প্রয়োগ করেছে নানা আইনানুগ বিধি বিধান এবং সেই সঙ্গে চেষ্টা চালিয়েছে এই অপরাধের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করে তার উৎস আবিষ্কারের।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত মনোবিজ্ঞানের রীডার ডঃ সুকুমার বসু অপরাধ এবং অপরাধী সম্পর্কিত বহু তথ্যপূর্ণ আলোচনার অবতারণা করেছেন এই বইখানিতে। প্রচুর শ্রম এবং চিন্তা-ভাবনার সমন্বয়ে অপরাধ সম্পর্কিত মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাগুলি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে লেখকের দক্ষতার পরিচয় দেয়। প্রাচীন ভারতের অপরাধ বিজ্ঞান, অপ্রাপ্তবয়স্ক অপরাধী মনোবিজ্ঞানে অপরাধ প্রসঙ্গ বিশেষ লক্ষণীয় অবদান ইত্যাদি অধ্যায় বিশেষভাবে উল্লেখ করার মত। বইটির অন্য এক সম্পদ অপরাধ সম্পর্কিত একাধিক পরিসংখ্যান ছবি। এগুলি দেখে সাধারণ পাঠকও অপরাধীর গতিবিধি অপরাধের ধারা এবং অপরাধের সঙ্গে সম্বন্ধ সম্পর্কে কিছু ধারণা গড়ে তুলতে পারবেন। বাংলায় এই ধরনের বই খুব বেশি নেই। সেই হিসেবেও অপরাধ এবং অপরাধীর একটি স্বতন্ত্র মূল্য আছে। সইটি সংগ্রহ রাখার মত।

সম্বন্ধ—দুহিতা অপর্ণা দেবী—হেনা চৌধুরী। অ্যালফা-বিটা পাবলিকেশনস। ৫৫-১ কলেজ স্ট্রীট কলকাতা-১২। পাঁচ টাকা।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বাংলাদেশে যেকজন মহীয়সী নারী জন্মগ্রহণ করেছিলেন অপর্ণা দেবীর স্থান তাঁদের প্রথম সারিতেই। স্বাধীনতা সংগ্রামে তিনি বরাবরই তাঁর পিতার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। স্বাধীনতা সংগ্রাম ছাড়াও সমাজসেবার ক্ষেত্রেও তিনি এগিয়ে গেছেন যথাসাধ্য পণ করে। এই মহীয়সী নারীর জীবনই আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে লিখেছেন হেনা চৌধুরী। ঠিক আর পাঁচটা জীবনীগ্রন্থের মত না, অনেকখানিই সাক্ষাৎকারের ঢঙে। লেখিকার হাতে মুন্সিয়ানা থাকার দরুন ও আকর্ষণীয় উপস্থাপন ভঙ্গির জন্য কোথাও কোথাও অপর্ণা দেবী বড় বেশী করে জীবন্ত হয়ে উঠেছেন।

চলমান জনপদ—অরবিন্দ পালিত। পাঞ্জিদেশক। অ বুক স্টোর। কলকাতা-১২। দাম সাত টাকা।

বিচিত্র মানুষ অসংখ্য টুকরো টুকরো ঘটনার অনুরণন প্রতিফলিত হয়ে মানুষের চিরকালের সুখ-দুঃখ পাপ-পুণ্য লোভ লালসা দীনতা তার মহানুভবতা রূপায়িত হয়ে উঠেছে। লেখকের মুন্সিয়ানায় প্রতিটি টুকরো ঘটনাই জীবন্ত। বিশেষভাবে নারী দেহ বিবাহিতা নারী-বেশ্যা সানা এবং লেখকের রহস্যময় হৃদয়-সম্পর্কের আশ্চর্যকুহক। "আমি শুধু তোমার কাছ থেকে কয়েকটা মুহূর্ত চেয়ে নেব—সে মুহূর্তগুলোর উপর কারো কোনদিন কোন দাবী থাকবে না। তোমার স্ত্রীরও না। সে মুহূর্তগুলো হবে একান্তই আমার।" অতীত দাম্পত্যজীবনের দুয়ার দাঁড়িয়ে এমনি সব কথাই বলেছে সানা লেখককে। চিরন্তন রহস্যময় নারীর এক এক গ্রন্থির উন্মোচন ঘটেছে লেখকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার মুহূর্তগুলিতে। শুধু ঘটনাই নয় ঘটনার বুকে চরিত্রগুলিও প্রাণ পেয়েছে লেখকের দক্ষতায়। বিশেষভাবে সানা সইজে নমিতা সুমেন চটুল্লে, মজুমদার সাবানজি দত্ত, হুবোহল আর লেখক স্বয়ং চরিত্রগুলি মনে দাগ কাটে। ইংরেজির পটভূমিকায় লেখা শ্রীপালিতের বইখানি পাঠককে এক নতুন স্বাদ উপহার দিতে পারবে বলেই আশা রাখি। প্রচ্ছদ পরিচ্ছন্ন। ছাপা অবশ্য বাঁধাই উন্নত মানের।

সংকলন ও পত্রপত্রিকা

মহাদিগন্ত— সম্পাদক : উত্তমকুমার দাস মৃত্যুঞ্জয় সেন এবং পরেশ মণ্ডল। মহাদিগন্ত মুদ্রণী। বারুইপুর। ২৪-পরগনা। দাম : দুই টাকা।

লিখেছেন অরুণ মিত্র গোপাল ভৌমিক মৈত্রেয়ী দেবী মণীন্দ্র রায় পরেশ গুহ প্রফুল্ল দাশগুপ্ত, সুশীল রায়, রাম বসু, জগন্নাথ চক্রবর্তী শঙ্খ ঘোষ বিশ্ব বন্দ্যো পাধ্যায় আলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত কৃষ্ণ ধর আলোক সরকার কবিতা সিংহ শান্তিকুমার ঘোষ যতেন্দ্রর হাজরা গণেশ বসু বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, পরেশ মণ্ডল, উত্তমকুমার দাশ এবং আরো কয়েকজন। সংখ্যাটি সংগ্রহযোগ্য।

পদ্যের সংগ্রহ। সম্পাদনা রমাপ্রসাদ পত্র কর্মকার ৩১১, রামপুরে। বাঁকুড়া। দাম দেড় টাকা।

লিখেছেন সুকুমার সেন, শান্তি সিংহ, হীরেন পাল, দর্শনাস দে রামকৃষ্ণ দাস, রূপাই সান্যাল, অশোককুমার দাস এবং আরও কয়েকজন। পত্রিকাটি পরিচ্ছন্ন এবং রুচিসম্পন্ন।

সমন্বয়রাজ। গান্ধী জন্মবার্ষিকী সংখ্যা। ১৩৮২। সম্পাদক ইন্দুমাধব রায়। ১বি, ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রীট কলকাতা-১। দাম এক টাকা।

"চিকিৎসা শাস্ত্রবেত্তা মহাত্মা গান্ধী" হিংসা-অহিংসা মার্কসীয় আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে গান্ধীবাদ প্রবন্ধগুলি এই সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ, লিখেছেন অমল-শঙ্কর রায়, বিশু মুখোপাধ্যায় এবং নারায়ণ চৌধুরী। এ ছাড়া লেখক তালিকায় রয়েছেন সুনীলকুমার সেন, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, মলয় ঘোষ, ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও আরও কয়েকজন। ছাপা পরিচ্ছন্ন।

আলোচনা। সম্পাদনা ধীরেন্দ্রলাল মিত্র। দেওঘর। সংসঙ্গ। এস পি, দেড় টাকা।

লিখেছেন, সুব্রত চট্টোপাধ্যায়, অশ্বিনী মাহাতো, দেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ধ্যানেশ-নারায়ণ চক্রবর্তী রেবতীমোহন বিশ্বাস এবং আরও অনেকে।

স্নেহাঙ্কর ভট্টাচার্যের কবিতার বই

তৃষ্ণার তমসা

দাম : তিন টাকা

প্রাপ্তিস্থান : সিগনেট বুকশপ, ১২ বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কল-১২। মাধব বাদার্স, ১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কল-১২। এইচ সি সরকার এন্ড বাদার্স, ১১১ আশুতোষ মুখার্জি রোড, কল-২৫। গ্রন্থ জগৎ, ৪১ শ্যামাচরণ মুখার্জি রোড কল-২৬। সাহিত্য বুক স্টল, ২১০/১ সার্কিলার এভিনিউ, কল-২১।

CENTRAL LIBRARY

"রবীন্দ্রনাথকে যাঁরা সত্যিকারের ভালোবাসেন — তারা কোনো গানকেই অশ্রুধার চোখে দেখতে পারেন না। কারণ সকল গানের মিলন-তীর্থ হোলো রবীন্দ্রসংগীত।"

রণো গুহঠাকুরতা

খুব সম্ভব ১৯৭২ সালই সেটা হবে। কলামন্দিরে দক্ষিণীর এক উৎসবে গান শুনতে গিয়ে নানারঙা ফুলের বাগানের মতই কবির নানা ভাবের গানের আলিঙ্গনায় আপনাকে হারিয়ে ফেলার মুহূর্তে হঠাৎ চমকে উঠতে হোল এক কিশোর শিল্পীর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব-স্বাক্ষরিত একটি গানের ধাক্কায়। মাত্র একখানি গান। কিন্তু এতক্ষণের এমন শোভন পরিবেশনার এতগুলি গানকে ছাপিয়ে সে গান মনকে শুধু অভিভূত নয়, একেবারে আপ্লুত করে দিলো।

একেবারে অপরিচিত শিল্পী। ভাবভঙ্গি, ধরণ-ধারণ কোনো কিছুতেই চোখ ধাঁধাবার মত কোনো চমকানি নেই। কিন্তু ঐ অপরিচিত কিশোর কণ্ঠের মাত্র একটি গান এতদিনের অনেক ধূলিলিপ্ত ধারণাকে বদলে দিলো। ধারণাটি হোলো এই যে তথাকথিত ব্যবসায়িক সঙ্গীত প্রতিষ্ঠানগুলি সত্যিকারের কোনো শিল্পী সৃষ্টি করতে পারে না। কিছুটা তৈরী হতে-না হতেই অর্ধশিক্ষিত শিল্পীদের নিয়ে বছরে কিছু শো-এ অর্থোপার্জনের কাজে লাগিয়ে তাদের ঐ অ-পরিণত অবস্থায় ফেলে রেখে দেওয়া হয়। তারপর তাদের ভূমিকা থাকে শুধুই কোরাসে। সেখানে সাড়ে বত্রিশ ভাজার মত কিছু নাচ, গান আলোর খেলা, আবৃত্তি ইত্যাদি দিয়ে মঞ্চের কাজ হয়ত বা চলে যায়। কিন্তু শিল্পী উপযুক্ত পরিণতিতে পৌঁছে—আপন শক্তিতে শ্রোতাদের চিত্তে কোন ছাপ ফেলতে পারেন না। এ নিয়মের অন্যথা একটি ব্যতিক্রম দেখালেন দক্ষিণী। শিল্পীর নাম রণো গুহঠাকুরতা। পরে জেনেছি ইনি রবীন্দ্রসঙ্গীতের অন্যতম গুরু শ্রদ্ধেয় গুহঠাকুরতার পুত্র। আর রণুর গলায় শোনা প্রথম গানটি হোলো দিন ফুরালে। হে সংসারী। শিল্পীর দুটি চোখ নিমীলিত। এক একটি কথা আকুল-করা সুরের আবেগে গলা থেকে নয়, যেন বুক থেকে বেরিয়ে আসছিলো। আর কথা ও সুরই শুধু নয়, গাইবার ভঙ্গিতে মনে হচ্ছিলো একটা ব্যাকুল অন্তর কি যেন হাতড়ে বেড়াচ্ছে। 'হৃদয়ের নিভৃত নীড়ে শান্তি বারি-র চরণে মুক্ত থেকে একেবারে সপ্তসপ্তকে তারসপ্তকে পৌঁছতেই যেন শান্তিকামনার আর্তিই বেজে উঠেছিলো। সে রেশ আজও প্রাণ থেকে মিলোয়নি। আর এই রেশের সঙ্গেই মনের অতলে একাকার হয়ে মিশে আছে 'দিন ফুরালো'ও রণো গুহঠাকুরতা।

শক্তিশালী কণ্ঠ? সে ত অনেকেরই আছে। কিন্তু বিধিদত্ত কণ্ঠের সঙ্গে অন্তরের আবেগ মিশেছিলো বলেই এক নিমেষে সে অপরিচিত জনতার হৃদয়কে ছুঁতে পারলো।

গানটি শুনে অভিভূত হওয়ার আরো একটা কারণ ছিলো। এ গান আর পাঁচটা রবীন্দ্রসঙ্গীতের চেয়ে আলাদা ধাঁচের দিনশেষের গৈরিক আলোর বৈরাগী বিষণ্ণতা গভীর রঙে ফুটে উঠেছিলো সেইসব বলিষ্ঠ তানে যে তান শোনা যেতো একমাত্র দিলীপ রায় ও সাহানা দেবীর কণ্ঠে।

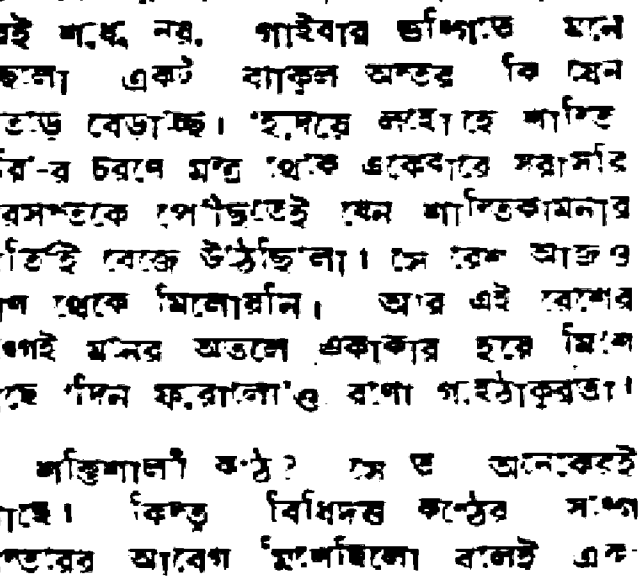

এ গানের সঙ্গে সাহানা দেবীর কোনো সম্পর্ক আছে কিনা বলতে পারো? তোমার কণ্ঠে এ পরবাসে বসে কে শুনেছি। সেদিন 'মায়ার খেলার গানও শুনলাম। তবু রণো গুহঠাকুরতা নামটা বহুবার শুনে তার সঙ্গে আর কিছু দিন ফুরালো।

সরল দুটি চোখ একটু যেন চিন্তার ছায়া মেখে গেলো। তারপরই রণো তার মুখচেনা ছেলেমানুষী ঢঙে বলল, 'এইরকম একটা কথা যেন শুনেছিলাম। কিন্তু দাঁড়ান বাবাকে ক্লাসেস করে বলেই একছুটে গিয়ে একেবারে শুভেন্দুকে (শুভ গুহঠাকুরতা) ধরে আনলো।

'কি ব্যাপার? আমি আবার কি অপরাধ করলাম যে আমায় তলব?'

হাসিমুখে সামনে এসে দাঁড়ালেন সদানন্দ মানুষটি।

আমি লজ্জিত 'ছিঃ! ছিঃ! একেবারে আপনাকে ধরে নিয়ে এলো?' এজন্য সংকোচের কোনো কারণ নেই। আমার বাড়িতে গান, বাজনা, তর্ক, আলোচনা দিনরাত্রি চলছে। এক মুহূর্তও যদি এ স্রোত থামে সঙ্গে সঙ্গে ভয় হয় বাড়িতে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লোনা ত?' কোরাস হাসিতে যোগ দিলেন মজলো গুহঠাকুরতা (ওঁর স্ত্রী), অশনীবাবু (ডকুমেন্টারী ফিল্মের স্বনামধন্য কর্ণধারদের অন্যতম) আর যাঁরা ছিলেন। তুমি ঠিকই ধরেছ। সাহানা দেবীর কণ্ঠের অনুকূল কিছু গান রচনা করে গুরুদেব ওঁকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। তাঁকে যখন পণ্ডিচেরী যাই আমি বলেছিলাম সেইসব গান ওঁর কাছে শিখে আসতে। আমি সেই গানগুলি সযত্নে সংগ্রহ করে রেখেছি। উপযুক্ত কণ্ঠ পেলেই শেখাই। কারণ বুঝতেই পারছ এসব গান শিখতে হলে কতখানি — সঙ্গীতশাস্ত্র বেসিসের দরকার?'

র কাছেই জানা গেলো একান্তভাবে
। দেবীর জন্য কবির রচিত এবং
কাছে সংগৃহীত অন্যান্য গানগুলি
াওয়া আসার এ কি খেলা
সাথী দিন যায়রে ও কে জানিও

টা স্বস্তি পেলো। আমার হিসেবে
গরমিল হয়নি?'
ছ থেকে রণোকে আরো ভালো
। গভীর সুরে গভীর গান-গাওয়া

গম্ভীর কণ্ঠের ছেলেটির সঙ্গে এ রণোর কোনো মিল নেই। আবার আছেও। ওর গানের প্রসঙ্গে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে যা জিজ্ঞেস করি সবের উত্তরেই শোনা যায় একটি কথা 'আমার গান বাবার গান। বাবা যা শিখিয়েছেন তাই গাই। তার বেশী কিছু জানিনা আর নিজেকেও সেই জানবার ক্ষমতাও নেই! কারণ রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনেক কথার মানেই ঠিক বুঝতে পারি না। আমি শুধু বাবার গানের কার্বন কপি করে যাই।'

'কিন্তু তোমার গান যে তার সাক্ষ্য দেয়? কথার অন্তরে প্রবে না পারলে গানে এমন আ ছোঁওয়া লাগতেই পারে না।'

পলকহীন দুটি চোখের দৃষ্টিতে যেন কিসের বিস্ময় ফু 'কই আমি ত কিছু বুঝি না? যা শেখান তাই গাই।'

পুরস্কার

হিন্দীতে রচিত পুস্তকের জন্য

মাতৃভাষা হিন্দী না হলেও আপনি কি হিন্দীতে সাহিত্য রচনা করেন ?

তাহলে কেন্দ্রীয় হিন্দী নির্দেশালয়ের আয়োজিত একটি সাহিত্য রচনা প্রতিযোগিতায় যোগ দিন

পুস্তকের শ্রেণী—

সাহিত্য (কথাকাহিনী নাটক; স্মৃতিচারণ, ভ্রমণবার্তা, প্রবন্ধ ও কাব্যরচনা-আদি), সুকুমার কলা, বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা অথবা অনুবাদের স্বত্বসাপেক্ষে কোনও উচ্চমানের সাহিত্যের অনুবাদ।

শেষ তারিখ : মার্চ ৩১, ১৯৭৬

বিশদ বিবরণ ও ফর্মের জন্য এই ঠিকানায় লিখুন :
অ্যাসিসটেন্ট ডিরেক্টর (এক্সটেনশান প্রোগ্রাম),
সেন্ট্রাল হিন্দী ডিরেক্টোরেট, মিনিস্ট্রী অফ এডুকেশান অ্যান্ড সোশাল ওয়েলফেয়ার, ওয়েস্ট ব্লক ৭, রামকৃষ্ণপুরম নিউ দিল্লী—১১০০২২

সর্ত ও নিয়মাবলী—

লেখককে ভারতীয় হতে হবে। কোনও জাতীয় বা আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় পুরস্কারপ্রাপ্ত কোনও বই গ্রহণ করা হবে না। বিগত পাঁচ বছরের মধ্যে এই প্রতিযোগিতায় কোনও পুরস্কার পেয়েছেন এমন কেউ এতে অংশ গ্রহণ করতে পারবেন না।

পুরস্কার—

ষোলটি পুরস্কার : প্রত্যেকটি নগদ
দেড় হাজার টাকার : তার সঙ্গে
একটি অভিজ্ঞানপত্র

ডি এ ভি পি ৭৫/৬০৪

এই ইনাসেন্সের সঙ্গে কার যেন মিল আছে? চকিতে মনে পড়ে গেলো ওস্তাদ মৈজুদ্দিনের সেই বিধিদত্ত শক্তির কথা। তিনি যে কোনো ওস্তাদের কাছে যা শুনেছেন—যত কঠিনই হোক না কেন, তার সূক্ষ্মতম তান শ্রুতি একেবারে যেমনটি তুলে গেয়ে দিতেন। কোনো শ্রোতা যদি মুগ্ধ হয়ে জিজ্ঞেস করতেন, 'ওস্তাদজী এখানে গান্ধারটা কি সুন্দর করেই না লাগালেন'—তিনি অবাক চোখে তাকিয়ে বলতেন, 'কই জানিনা তো!' এ তাঁর ভান নয়। সত্যিই এ বিষয়ে তাঁর কোনো সচেতনতা ছিলো না।

রণোর গান গাওয়ার ব্যাপারটাও অনেকটা সেইরকম। যা কিছু জানতে চাই—বলে 'আমি ও জানিনা। বাবা যা শিখিয়েছেন।'

'আমাদের বাড়ীর গান বাজনার পরিবেশ থেকে গানের ওপর টানটা একেবারে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মতই সহজ জিনিস হয়ে উঠেছে। কেন্তু গান ভাল লাগলেও আমার ঝোঁকটা বরাবর ছিলো খেলাধুলোর দিকেই। বাবা জোর করে আমায় দক্ষিণী-তে ভর্তি করে দিলেন গানের ক্লাসে। আমরা সবাই বাবাকে খুব মানি। তাঁর ইচ্ছের বিরুদ্ধে কিছু করার কথা ভাবতেই পারি না। তাই ভর্তি হলাম। গানও শিখতে লাগলাম। প্রথম, প্রথম সহজ গান শেখানো হোতো। তবে যে একটা ভালো লাগতে তা নয়, তবু শিখতাম,—বাবা চাইতেন বলে। কিন্তু শনিবার বিকেলে সঁতাই খুব মন খারাপ হয়ে যেতো। খেলা দেখা বন্ধ করে গানের ক্লাস করতে হোতো বলে। কিন্তু...

বুঝেছি। 'বাবা'—তো?—রণো কাঁচুমাচু হয়ে মাথা চুলকোতে লাগলো। 'তো—তবু মনে রেখো'র মত ঘুরে ফিরে সেই 'বাবার ইচ্ছে'—কথাটা শুনতে ভারি মিষ্টি লাগছিলো।

'তবু বলো—বাবার ইচ্ছের সঙ্গে তোমার ইচ্ছেটা মিলল কেমন করে?'

ফোর্থ ইয়ারে উঠে। থার্ড ইয়ার অবধি সারগম, পাল্টা, রেওয়াজ ও সহজ সুরের কিছু রবীন্দ্রসংগীত অনিচ্ছা সত্ত্বেও খাওয়া বার্লি ওয়ার্দারের মতই বিস্বাদ লাগতো। ফোর্থ ইয়ারে উঠে যখন ভালো ভালো রবীন্দ্রসংগীত পেলাম অল্পাস্তেই কেমন যেন ভাল লাগতে সুরু হোলো। সব কথার মানে ঠিক বুঝতাম না। কিন্তু বুঝতাম না বলেই ওদের ওপর কেমন যেন একটা আকর্ষণ অনুভব করতাম। ফোর্থ ইয়ারে অনার্স নিয়ে পাস করলাম। ফিফথ ইয়ারেও তাই। সিকসথ ইয়ারে স্পেশ্যাল ক্লাস টপ্পা, ক্লাসিক্যাল শিখতে শিখতে সুরের বৈচিত্র্য মনটার যেন মধ্যেতার ঘোর লাগতো। সে ঘোর আজও কাটেনি। যার নিজের সম্বন্ধের বেশী আর কিছু জানা নেই।

'কি ধরনের গান তোমার ভালো লাগে?'

'এ-কথা কেন জিজ্ঞেস করছেন?

'টেল মি হোয়াট ইউ সিং এ্যান্ড আই উইল টেল ইউ হোয়াট ইউ আর।'

'সত্যি?' চোখ দুটিতে বিস্ময় ঝলে ওঠে। একজন শিল্পী তার সমস্ত নম্রতা বিনয় ও সরলতা নিয়েই সত্যিকারের শিল্পী হয়ে উঠতে পারে তার আত্মপ্রকাশের পরিধি এতটুকুই হোক, আর এতবড়ই হোক। এ-বস্তু রণোর আছে। হয়ত বা স্বভাবের এই নির্মল ছায়াই তার গানে প্রতিফলিত হয় বলেই ওর গান একটা আলাদা বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র। সেদিন রণো শোনালো অনেক গান শুনি ঐ মনেকেনে আমারে বাঁধবি তোরা সকল বন্ধন ভরে যাওয়া আসার এ কি খেলা। শেষের গানটির

ডুবে যায় আঁখিজলে
বহু যতনে যারে সাজালি
তারে হেলায়।

চরণগুলির বিষণ্ণ মায়া—কোমল গান্ধারের নরম ছোঁয়ায়, রেখাব ও নিষাদের স্পর্শটুকু নিয়ে মনের মধ্যে যে রেশ রেখে যায়—অনুভবের অতল গভীরতার প্রসাদ ছাড়া সে রেশ সৃষ্টি করা হু সম্ভব নয়।

'তোমার ফেভারিট গান শুনে মনে হয় বিলম্বিত লয়ের অন্তরঙ্গ্যান আবেদনে তোমার মনটা বেশী সাড়া দেয়।'

'তা ওঠে। কিন্তু সন্ধ্যাদি গানে নানা ছন্দের ওঠা-পড়ার ঢেউ-এ ঢেউ-এ দুলতেও আমার খুব ভালো লাগে। শুনবেন এমন একটা গান?'

সঙ্গে সঙ্গেই রণো ধরল তার হাতে 'ছলো হাসির কুলের হার' সত্যিই অপূর্ব! ছন্দের বাহারে মনটা খুশি হয়ে ওঠে।

'সন্ধ্যাদি আপনাকে আর একটা সারপ্রাইজ দেব?' আবার একছুটে একটা রেকর্ড এনে ওদের বিরাট রেডিও গ্রামটার চালিয়ে দিল। ঐ গানটাই এক তরুণ কণ্ঠে ক মধুর হয়ে উঠেছে তিলক কামোদ ও ঝেঁপতাল-এর আলতো স্পর্শে।

'কার গলা বলুন তো?'

'আমার বাবার আগের রেকর্ড। ভাবতে পারেন?'

সাজা পারিনি। শুদ্ধ গায়কীতে তাঁর এই পরিমার্জিতবোধ পত্র ও স্বরের মধ্যে সঞ্চারিত করতে পেরেছেন বলেই সংযমের শাসনে অমন উতলা আবেগ স্তব্ধ হয়ে ও ধরা হাসি-অশ্রুর ইন্দ্রধনু হয়ে ফুটে ওঠে ওর গানে। অথচ কিছু জিজ্ঞেস করলেই বলে, 'আমি ও কিছু বুঝে গাই না। বাবা যেমন শিখিয়েছেন।

কি করা যায়—এ শিল্পীকে নিয়ে? আলিবাবা হেসে বললেন, 'আপনার সমস্যাটা কোথায়?'

'রণো বলছে—ও রবীন্দ্রসংগীতের অর্ধেক কথার মানেই বোঝে না। কিন্তু ওর মুখে যখনই কোনো গান শুনি মনে হয় কথা, সুর কি তার চেয়েও বেশী ভাবের অতলে ওর মনটা একেবারে ডুবে গেছে। এ সত্যি না হোতো গাওয়া-আসার এ কি খেলায় পড়েছি বাপের অমন বিরাট গাম্ভীর্য আর কোমল গান্ধারের নিখুঁত ছোঁওয়ার অমন ব্যাপ্তি পেতো না। ছেলের না ভেঙে ওর কথাকে অকপট সত্য বলেও ধরে নেওয়া যায়—তবু এই কথাটাই মনে হয় যে সচেতনভাবে না হলেও গান শুরু করামাত্রই ও তার মধ্যে নিজেকে একেবারে হারিয়ে ফেলে। গানের বাণী ওর কাছে স্পষ্ট কি অস্পষ্ট সে প্রশ্ন অবান্তর।'

আপনার ধারণা একেবারে নির্ভুল। রণো এমনিতে হাসি-খুশী, মজুকুরসল, হৈ-হৈ-এ ছেলে, শুধু তাই নয় ও ভাল পড়ুয়াও বটে—যে কোনো সময় ওর বাড়ী গেলে দেখতে পাবেন ওকে ঘিরে বন্ধুদের দল। কিন্তু গান গাইবার সময় ও একেবারে অন্য মানুষ।'

রণোর মধ্যে যে গুণটি আমায় মুগ্ধ করে সেটি হোলো এই যে রবীন্দ্রসংগীত গাইলেও ও হৃদয়োপর্ণ রবীন্দ্রসংগীত গাইয়ে নয়। ও সমান ভালোবাসে আধুনিক গান, হিন্দী ছবির গান, সারগমের গজল, পাশ্চাত্যসংগীত, লোকসংগীত আর বিশেষ করে খেয়াল, ধ্রুপদ। মনের এই মুক্ত প্রবাহ আছে বলেই ওর গানে এমন খোলা হাওয়ার উচ্ছ্বাস। সন্ধ্যাদি, রবীন্দ্রনাথকে যাঁরা সত্যিকারের ভালবাসেন, তাঁরা কোনো গানকেই অশ্রদ্ধার চোখে দেখতে পারেন না। কারণ, সকল গানের মিলনতীর্থ হোলো রবীন্দ্রসংগীত।' এতক্ষণে ও নিজেকে প্রকাশ করে ফেলে কিন্তু সে-ও অজান্তেই।

ওর ভারী ইচ্ছে ক্লাসিকাল গান শেখার। যদিও নিজেই বলে সময় নয়। ওর সঙ্গে অদ্ভুতভাবে মিশে আছে মিষ্টি ও বাপী ওর দু ভাই। ওর গানের সঙ্গে বাপী বাজালো শিয়ানো, মিঠু ধরলো গান। আর ওদের বাবার রেকর্ডের সঙ্গে ওদের সম্মিলিত কণ্ঠে 'ও তার হাতে ছিলো'—গাওয়ার সে আপনহারা আনন্দ ভোলার নয়।

কর্মক্ষেত্র সম্বন্ধে ওর ইচ্ছে চাকরী না করে বিজনেস করা। সে-বিজনেসের সঙ্গে গান থাকবে জড়িয়ে। যেমন কোনো ভালো মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টের দোকান। কোনো গেম-বিজনেসের সেবা শিল্পীদের (এদের মধ্যে অজ্ঞাত প্রতিভাও থাকতে পারে) গান তৈরি করে সাধারণের মধ্যে প্রচার বা এই-রকম ধরণের কিছু। ও চায়—গান থাকবে কাজের সঙ্গেও জড়িয়ে।

রণার গান ও টুকরো টুকরো কথা শুনে মনে হোলো শুধু রবীন্দ্রসঙ্গীতেই ওর মনটা ঠিক আশ্রয় পাচ্ছে না। ও চায় আরো, আরো সুরের বিস্তার, বৈচিত্র্য—

হাওড়া
ফ্রেণ্ডস্ সোসাইটী
বেনারসী·সিল্ক·তাঁত
মিলবস্ত্র·পোষাক
৫৪৫, জি. টি. রোড (সাউথ) হাওড়া
ফোনঃ ৬৭-৪৪৪৭

চমক দেয়। তাই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ওর মনকে এমন করে টানে। শেষ অর্ধি ও হয়ত ও শুধু রবীন্দ্রসঙ্গীতের মধ্যেই সীমিত থাকবে না। আমরা সাগ্রহে প্রতীক্ষা করে থাকব দেখতে—ওর আকৃতি ওকে কোন গানের রাজ্যে নিয়ে যায়?

*

[গোরা সর্বাধিকারী প্রসঙ্গে যে আলোচনা প্রকাশিত হয়েছিল, তার পরিশিষ্ট হিসাবে এই অংশটি পড়তে হবে।]

শান্তিদার উৎসাহেই শান্তিনিকেতনের শিক্ষার পরও ক্লাসিকাল গান শেখা, নানান গানের অনুষ্ঠানে, অডিশনে, খেলা-ধুলোয় যোগ দিতাম এবং এসব ক্ষেত্রে একটা বিশেষ অংশও গ্রহণ করেছিলাম।

'বাইরে যাওয়া নিয়ে, বোলো কেমন করে?'

'মোহরদিই আমায় জোরজার করে বাইরে নিয়ে এলেন—আমার 'কুনো' স্বভাবকে আমল না দিয়ে।'

'মোহরদি নস্তেই ত 'কুনো'র সাম্রাজ্ঞী। এহেন মানুষটির অপরকে সচল করবার আগ্রহ সত্যিই আশ্চর্যের ব্যাপার। তবে স্নেহের ক্ষেত্র সকল অসম্ভবই সম্ভব।

'সত্যিই তাই। মোহরদি ও বীরেনদার স্নেহ, মমতা, আদর আমার কাছে বিধাতার আশীর্বাদ। মাঝে মাঝে ভাবি জীবনে কি এমন সুকৃতি করেছি যে এঁদের মত মানুষের হৃদয়ের আশ্রয় এমন করে আমায় ঘিরে রেখেছে?'

কণিকা নীরবতার পর আবার গোরা সেই ধরে '১৯৬৪ সালে প্রথম গাইলাম বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনে—

'অতবড় আসরে ভয় করেনি?'

'শান্তিনিকেতনে গাইতে যারা অভ্যস্ত, তাদের কোথাও-ই ভয় পাবার কথা নয়।'

'কি গান গেয়েছিলে? মনে আছে?'

'আমার সেই প্রিয় গান যে গান আমি রেডিও অডিশনে (যেখানে বিচারক ছিলেন স্বয়ং শৈলজাদা), গ্রামোফোন কোম্পানীর অডিশন (সন্তোষ সেনগুপ্তর কাছে)—সব জায়গায় গেয়ে সফল হয়েছি 'আমি তোমায় যত শুনিয়েছিলাম গান'—

'রবীন্দ্রসঙ্গীতে তোমার আইডিয়াল শিল্পী কারা?'

'মোহরদি, সুচিত্রাদি, সুবিনয়দা, নিলীমা সেন—এই চারজনকে আমি শ্রেষ্ঠ শিল্পী বলে মনে করি। তবে সবকিছুকে ছাপিয়ে হেমন্তদার কণ্ঠ আমার কাছে এক বিস্ময়।

শিল্পীদের মধ্যে আমায় মুগ্ধ করে দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, মায়া সেন, বাপী ঠাকুর ও বনানী ঘোষ। গ্রামোফোন কোম্পানীতে শ্রদ্ধেয় এ সি সেনের সহৃদয়-তায় আমার রেকর্ড হয়। গান ছাড়াও আর 'দিন শ্রাবণ দিন যায়' ও 'বসন্ত'—গীতিনাট্যর এল পি-তেও গেয়েছি।

'সঙ্গীতজগতের অভিজ্ঞতা?'

'খুব ডিসাপয়েন্টিং। এতবড় আনন্দের রাজ্যে থেকেও এত তুচ্ছ ব্যাপারে মনো-মালিন্য, দলাদলি, একের কাছে অন্যকে ছোটো করবার হীনমন্যতা আমায় হতাশ করেছে। দেখে হাসি পায় আমার মত সামান্য মানুষকে কটাক্ষ করেও বড় বড় কাগজে কমেন্ট বেরোয়। আমি কি এঁদের এতটা মনোযোগ পাবার যোগ্য? তা তো নয়? মোহরদি আমায় স্নেহ করেন, গাওয়াতে চান, আমার উপলক্ষ্য করে এসব ঠাট্টা-বিদ্রূপের তীর তাঁরই ওপর নিক্ষিপ্ত হয়। আমি কি সেটা বুঝি না? বড় কষ্ট হয় যখন দেখি মোহরদির মত বিরাটপ্রাণা শিল্পীকেও আমারই জন্য এত অপদস্থ হতে হচ্ছে। আমার মত অনেককেই এগিয়ে যেতে উনি সাহায্য করেন। তবু কেন ওঁর প্রতি এতবড় অপবাদ?

'মাঝে মাঝে আমার মনে হয় হঠাৎ যেমন গানের ক্ষেত্রে এসে পড়েছি, তেমনই হঠাৎ একদিন সব ছেড়ে চলে যাব। এভাবে গাইতে ইচ্ছে করে না। গাওয়া উচিত নয়।'

গোরার দুটি চোখ জলে ছলছল করে ওঠে।

'শুধু বিরোধিতাই তোমার চোখে পড়েছে? আর কিছুই পড়েনি?'

'নিশ্চয়ই, আপনারা ছাড়াও শুভ গহে ঠাকুরবাড়ির মত উদার মানুষের স্নেহ-ভালবাসাই আমার অনেক দুঃখকে ভুলিয়ে দিয়েছে।'

গোরার একটি রেকর্ডের গান হোলো 'আঁখিজল মুছাইলে জননী'। কণিকা বন্দ্যো-পাধ্যায়ের সঙ্গে দ্বৈতকণ্ঠের রেকর্ড দুটিও খুব জনপ্রিয় হয়েছে।

অদ্বিতীয় ফরমুলা...অপারেশন ছাড়াই অর্শের সঙ্কোচন করে

প্রেপারেশন এইচ
আমেরিকান ডাক্তারদের পরীক্ষা করে দেখা
• কয়েক মিনিটেই চুলকানি বন্ধ করে
• সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণার উপশম হয়
• খুব বাড়াবাড়ি না হলে, অপারেশন ছাড়াই অর্শের সঙ্কোচন করে
• পিচ্ছিল ক'রে মলত্যাগের কষ্ট কমিয়ে দেয়

বিনামূল্যে! অর্শ সম্বন্ধে তথ্যপূর্ণ পুস্তিকা পড়ে থাকলেই এই ঠিকানায় লিখুন (সঙ্গে ২০ পয়সার ডাকটিকিট পাঠাবেন): ডিপার্টমেন্ট PH-68
পোঃ অঃ বক্স ১০১৩০, বম্বে ৪০০০০১

Agent: Hong Kong Ltd.: Gordon Woodroffe & Co. Ltd.

গোধূলিয়া

নিমাই ভট্টাচার্য

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

।। এগার ।।

এবার আর রিকসায় নয়, হাঁটতে হাঁটতেই বাড়ী ফিরছিলাম। বড় রাস্তা পার হয়ে গলিতে ঢুকতে যাব, এমন সময় দেবী বললো, চল, একটু ঘাট ঘুরে আসি।

এত বেলায় গঙ্গার ধারে যাবে?

এমন কিছু ত বেলা হয়নি। চল।

নিঃশব্দে ওর পিছন দশাশ্বমেধ ঘাটে গেলাম। দু'একবার এদিক থেকে ওদিক পায়চারি করলাম। হঠাৎ একজন মধ্যবয়সী মাঝি এসে জিজ্ঞাসা করল, বাবুজি, নৌকা চড়বেন?

আমি বললাম না।

দেবী বললো, না কেন? চল একটু ঘুরে আসি। ভাল লাগবে।

প্রতিবাদ করার মত মনের অবস্থা ছিল না। কিছু না বলেই ওর পিছন পিছন সিঁড়ি ভেঙ্গে নীচে নেমে একেবারে শেষ ধাপে পৌঁছলাম। দেবী নীচু হয়ে গঙ্গা স্পর্শ করে আমার মাথায় একটু জল ছিটিয়ে দিতেই আমি একটু হাসলাম।

হাসলে কেন?

তুমি আমার মাথায় গঙ্গাজল ছিটিয়ে দিলে বলে। এসব ত মা-মাসীরা করেন।

তোমার মা-মাসী যখন নেই তখন আমিই না হয় সে কাজটা করে দিলাম।

বুড়ো মাঝি জলের মধ্যে একটু নেমে নৌকাটা কাছে টেনে আনতেই আমরা উঠলাম। পাশাপাশি বসলাম। নৌকায় বসেই একবার দশাশ্বমেধ ঘাটের দিকে চেয়ে দেখি বিশেষ লোকজন নেই। সামান্য কয়েকজন নারীপুরুষ স্নান করছেন।

দেবী বললো, এবার পুজোর সময় এখানে এলো।

কেন?

বিজয়ার দিন দশাশ্বমেধ ঘাট সত্যি দেখার জিনিস।

[illegible]?

সারা শহরের সমস্ত দুর্গা প্রতিমা এই ঘাটে এসে জমা হয়। রাত্তির পর রাত অবধি চলে আর লাখ লাখ মানুষ ঘাটে দাঁড়িয়ে বা নৌকায় চড়ে সেটা দেখে।

আর কি হয়?

সন্ধ্যার পর নৌকার উপর থেকে যখন মূর্তি আরতি হয় তখন এই গঙ্গার রূপও যেন পাল্টে যায়। চারদিকে আলোয় আলো। কাঁসর-ঘন্টা-শাঁখের আওয়াজ, ধূপ-ধুনো, আরতি কীর্তন আর লোকের ভীড়—সব মিলিয়ে সত্যি অপূর্ব দেখায়।

বিসর্জন হয় কখন?

অনেক পরে। মিত্তির বাড়ীর ঘট বিসর্জনের পর একে একে অন্যান্য মূর্তির বিসর্জন হয়।

মিত্তির বাড়ীর ঘট বিসর্জনের পর কেন?

চৌধাম্বার জমিদার ছিলেন রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র। খুব প্রাচীন ও ধনেশ্বর পরিবার। বোধহয় ওদের বাড়ীতেই সব চাইতে বেশী দিন ধরে পুজো হচ্ছে। তাই।

তাই বলে এরপর ওদের মূর্তি বিসর্জন না হলে অন্য মূর্তি বিসর্জন হবে না?

এসব ব্যাপারে একটা প্রথা চলে আসছে সেটা চলতেই থাকে। তাছাড়া চৌধাম্বার মিত্তির বাড়ীর ঐতিহ্যই আলাদা।

কেন? জমিদার ছিলেন বলে?

শুধু তাই নয়। ও বাড়ীর প্রথম দিকে শুধু বড় জমিদারই ছিলেন না। তাঁরা ছিলেন প্রগতিশীল এবং সমাজী বিপ্লবীদের বিশেষ বন্ধু ছিলেন।

সমাজীর নাম শুনেই আমার মনে একটা প্রশ্ন এলো। অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, তাই নাকি?

হ্যাঁ। সমাজীরা যখনই কাশী এসেছেন তখনই ওদের বাড়ী উঠতেন।

তুমি ত কাশীর অনেক ইতিহাস জানো।

অনেক ইতিহাস জানি না; কিছু জানি।

বুড়ো মাঝি দু-হাতে দুটো দাঁড় টেনে নৌকা এগিয়ে নিয়ে চলেছে হরিশ্চন্দ্র ঘাটের দিকে। আমি এদিক-ওদিক দেখছি। দেবী মাঝে মাঝে গঙ্গাজলে একটা হাত ডুবিয়ে দিচ্ছে। একটু পরে ও আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, কেমন লাগছে?

ভাল।

নৌকায় চড়ে ঘুরে বেড়াতে আমার খুব ভাল লাগে।

কেন?

কাশীর নৌকারী আর তুলসীঘাট থেকে দূরে থেকে অনেক দিনের অনেক ইতিহাস মন চোখের সামনে ভেসে ওঠে। অমনি একটা দূরের একটা ঘাট দেখিয়ে দেবী বললো, ঐ চৌষট্টি ঘাটের কাছেই মধুসূদন সরস্বতীর আশ্রম ছিল।

কেন, মধুসূদন সরস্বতী?

চিত্তরঞ্জন মাইতির রোমান্টিক উপন্যাস ॥ প্রকাশিত হল

নির্জনে খেলা ১০·০০

নিমাই ভট্টাচার্যের সর্বাধুনিক উপন্যাস

হকার্স কর্ণার ৬·০০

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট। কলি-১২

আমার প্রশ্ন শুনে দেবী একটু হেসে বললো তোমাদের মত কলকাতার ছেলে-দের এই হচ্ছে দোষ। কিছু বই মুখস্ত করে বি-এ, এম-এ পাশ করো ঠিকই কিন্তু নিজের দেশের বিষয় কিছু জান না।

এবার আমি হেসে বললাম, এই বুঝি আমার প্রশ্নের উত্তর হলো?

ন.। শঙ্করাচার্যর বর্ণনাকে কাশীতে যিনি প্রতিষ্ঠিত ও জনপ্রিয় করেন সেই বাঙালী পণ্ডিত হচ্ছেন মধুসূদন সরস্বতী।

তাই নাকি?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

শঙ্করাচার্য ত কাশীতে এসেছিলেন।

শুধু এসেছিলেন তাই নয়, এখান-কার মণিকর্ণিকার শ্মশানেই শঙ্করভাষ্যের জন্ম হয়।

জন্ম হয় মানে?

দেবী আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, সে কাহিনী জান না?

না।

দেবী শুরু করল, শঙ্করাচার্য মণি-কর্ণিকা শ্মশানে ঘুরাঘুরি করছেন। এক চণ্ডাল ওকে বললো, সরে যাও। চণ্ডালের কথা শুনে শঙ্করাচার্য চমকে উঠলেন। ভাবলেন, কি সরে যাবে? আত্মা না দেহ? আত্মা বা চৈতন্য ত চির সত্য। সে ত কখনও অপবিত্র হয় না, হতে পারে না। তবে কি দেহ সরিয়ে নিতে বলছে? কিন্তু-অপ্-তেজঃ-মরুৎ ও ব্যোমের এই দেহের কোনটি অপবিত্র? দেবী একটু হেসে বললো, মণিকর্ণিকার শ্মশানে শংকরাচার্যর এই উপলব্ধি থেকেই শঙ্করভাষ্যের জন্ম।

আমি মুগ্ধ, স্তম্ভিত হয়ে শুধু বললাম কি আশ্চর্য! কত সামান্য একটা ঘটনা থেকে...

আমি কথাটা শেষ করার আগেই দেবী বললো, সব সময়ই সামান্য একটা ঘটনা থেকে ইতিহাস সৃষ্টি হয়। সেদিন তুমি যদি রাগ না করতে তাহলে কি আমি ওভাবে রাত্তির বেলায় তোমার কাছে যেতাম? নাকি আজ এভাবে তোমার পাশে বসে নৌকায় চড়ে বেড়াতাম?

তা ঠিক।

বুড়ো মাঝি জিজ্ঞাসা করল, আর আগে যাব?

দেবী বললো না। ফিরে চল। পাশের শ্মশান দেখিয়ে আমাকে বললো, এটা হরিশ্চন্দ্র ঘাট। এখানেই রাজা হরিশ্চন্দ্র...

কলকাতার ছেলেরাও রাজা হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী জানে।

কেন এভাবে চিমটি কাটছ?

একটু আগে ঘাড় ফিরে দিলে আর আমি তোমাকে চিমটি কাটব?

হঠাৎ দেবীর মুখের চেহারা পাল্টে গেল। বললো, এভাবে কথা বললে আমি এক্ষুনি ঘাড়টাকে জলের মধ্যে মুচড়ে ফেলে দেব।

ঘাড়টা কি আমার?

নিশ্চয়ই।

তাহলে তুমি জলে ফেলে দেবে কেন? হঠাৎ রাগ করে বলেছি।

এর মধ্যেই রাগ করতে শুরু করলে?

রাগ করা সব সময়ই অন্যায় কিন্তু আমাকে শুভাশুভ কথা বলাটাও বোধহয় তোমার উচিত হয়নি।

সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে একসঙ্গে হেসে ফেললাম।

দেবী বললো মাঝে মাঝে ঝগড়া করতে বেশ ভাল লাগে, তাই না?

হ্যাঁ।

ঝগড়ার পর ভাব হলে আরো ভাল লাগে, তাই না?

আমি হাসি চেপে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার বুঝি আজ ভাল লাগছে?

একশবার লাগছে।

আরো ভাল লাগছে মানে কি রকম লাগছে?

মিট মিট করে হাসতে হাসতে দেবী জিজ্ঞাসা করল, জানতে চাও?

হ্যাঁ।

তোমাকে আরো ভাল লাগছে আর...

দেবী কথাটা শেষ না করে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আর কি?

এই বুড়ো মাঝি না থাকলে তোমাকে একটু কাছে টেনে নিতাম।

কি সর্বনাশ!

সত্যি কথাটা বললাম বলে তোমার ভাল লাগল না, তাই না?

না, না, তা কেন হবে?

তাহলে সর্বনাশের কি হলো? আমি কি শিশু না কি দিদির মত বুড়ী যে তোমাকে একটু কাছে পেতেও ইচ্ছে করবে না?

দেবীর কথা শুনে আমি স্তম্ভিত না হয়ে পারি না। ভাবি এর কি কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই? ও কি জানে না এ সংসারে বাস করতে হলে আত্মাভিমান কিছু অনু-শাসন মেনে চলতে হয়? আমার সঙ্গে হৃদ্যতা-ঘনিষ্ঠতা করার পরি-সীমা খুব বিস্তৃত নয়। মনে মনে লুকিয়ে লুকিয়ে হয়ত অনেক কিছুই সম্ভব, কিন্তু এভাবে প্রকাশ্যে মনের ইচ্ছা বা সুপ্ত প্রবৃত্তি প্রকাশ করা কি খুব রুচিসম্মত? তাছাড়া সব-কিছু পরিণতিরই একটা নিয়ম আছে। গাছে ফুল হয়ে ফল ধরে কিন্তু

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

ভেনডেটা ৫·৫০

শুভদৃষ্টি

মনচোরা

ছায়াচারিণী

কত রঙ

নানারঙের দিন

মাটির দেবতা

ভূমিকালিপি পূর্ববৎ

আলোকে তিমিরে

জোনাকির দীপ

মরণাতিলাষ/মায়াজাল (রহস্য)

নবেন্দু ঘোষের

পলাশের রঙ ৪·০০

রমাপদ চৌধুরী ২·৫০

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ৩·৫০

সমরেশ বসু ২·৫০

প্রভাতদেব সরকার ৪·০০

নীহাররঞ্জন গুপ্ত ৩·৫০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ৩·৫০

অবধূত ৫·৫০

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ৫·০০

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ৫·০০

অমরেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ২·০০

গ্রন্থপীঠ ২০৯বি বিধান সরণি, কলিকাতা—৬

...ছে লাগা কিশোরীর সিঁদুরে না
। বুঝি আপন ভোলা যায় না?

...মি চলতে চলতে থমকে দাঁড়িয়ে
...দিকে চাইলাম।
...সী পণ্ডিতের চশমা জ্বেলেছো কবে
...কি ভেবেছো? জবাব দাও।

...মি জবাব দিতে পারলাম না।
...নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

...ার হাত ভিখারিণীর মত
...হাত ভিক্ষা চাইতে দেখি বলে
...মাকে ঠিক চিনতে পারছ না।

কি বলছ?

ঠিকই বলছি।

আমি অবাক চুপ।

আমি চুপ করে থাকলাম। কিন্তু চুপ করে রইলে না। বললো তবে কেন আমি ভবানীপুরের মত ভিক্ষা নিতে যাবো।

তার মানে?

তার মানে তোমার ধন-সম্পত্তির উপর আমি হাত দেব না।

প্রকাশিত হ'ল

সম্পাদনা ॥ শান্তনু দাস

দীর্ঘ সময়ের প্রতিনিধি বাংলা কবিতার বহু প্রতীক্ষিত সংকলন যা দিয়ে প্রমাণ করা সংকলন এবং তাদের একটি করে কবিতা সংকলন।

কালের কবিতা

রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে এই সাম্প্রতিক শতাব্দির কবিদের কবিতা এবং তাদের ছবিতে প্রতীয়মান কবি চন্দ্রবিন্দু থেকে শুরু করে ৭০ দশকের পর্যন্ত ২৫ জন নির্বাচিত কবির কবিতার এক সংকলনীয় সংযোজন তিনশো পাতার রঙিন ছেপে চেইসে লামী মার্বেলাইজের ছাপা সিল্কন বাঁধাই, প্লাস্টিক জ্যাকেট দাম : ১৫।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা ১০

দিনেশ দাস-এর **অসঙ্গতি** ৬ **কান্তে** ৩

আবু সয়ীদ আইয়ুব-এর **গালিবের গজল থেকে** ৮

শক্তি চট্টোপাধ্যায়-এর

পাবলো নেরুদার প্রেমের কবিতা ৩

• আসন্ন প্রকাশ করোকা ও উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ •

বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা
(শীঘ্রমুদ্রিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ)
প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ কবিতা
শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা
শান্তনু দাসের ।। কাফের
সুধীন্দ্রনাথ দত্তর কাব্য সংগ্রহ
অমিয় চক্রবর্তীর কাব্য সংগ্রহ
মণীন্দ্র রায়-এর কাব্য সংগ্রহ

দেজ পাবলিশিং / দে বুক স্টোর, কলিকাতা ৭৩, ফোন : [illegible]

আমার আমার ধন-সম্পত্তি কোথায়? তাছাড়া ভিখারিণীর মত কি ভিক্ষা দেবে?

শুধু অর্থই কি মানুষের একমাত্র সম্পদ? আমি যে সম্পদের কথা বলছি সে সম্পদ তোমার আছে, কিন্তু...

সোজা কথায় বল তো কি বলতে চাইছ।

বলব?

বলো।

কথায় কথায় বাগবাজারটায় পৌঁছে গেছি। তোমরা বলছো বাড়ী গিয়ে বলব।

গাড়ির মধ্যে আর কথা না বলে তাড়াতাড়ি বাড়ী গেলাম। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতেই দিদি বললেন, ঘড়ি কিনতে এতক্ষণ লাগল?

বললাম—না দিদি ঘড়ি কিনতে এতক্ষণ লাগেনি। ঘড়ি কেনার পর একটু সুন্দরীর ধর্মশালায় গিয়েছিলাম।

গিয়েছিলি?

হ্যাঁ।

দিদি একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললেন, মানুষ চলে যায়, কিন্তু তার স্মৃতি ত পড়ে থাকে।

আমি কোন কথা না বলে আস্তে আস্তে বসবার ঘরে ঢুকতেই রেবী বললো, দিদিকে ঘড়িটা দেখিয়ে যাও।

ওর কথাটা শুনে একটু লজ্জিত-ভাব করলাম। তাড়াতাড়ি ফিরে এসে ঘড়িটা দেখিয়ে বললাম, দিদি, ঘড়িটা খুব সুন্দর না?

খুব আশ্চর্য সঙ্গে ঘড়িটা দেখে দিদি বললেন, হ্যাঁ। খুব ভাল হয়েছে।

এত দামী ঘড়ি আমি কিনতে চাইনি কিন্তু তোমার বড়লোক শ্বশুরের জন্য বাধ্য হয়ে কিনতে হলো।

রেবী মুখের সামনে বলল আচ্ছা দিদি এর চাইতে সস্তা ঘড়ি হাতে দিয়ে আমার মত সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে ঘুরাঘুরি করা ঠিক?

দিদি একটু রাগ করেই ওকে বললেন, তোর কি কথা বলার কোন দিবি হবে না?

আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, দিদি, সবাই কি আমার মত ভদ্র সভ্য হয়?

দিদি বললেন, তা না বলেছিস। এবার আসল কথায় যেতে চল। অনেক বেলা হয়ে গেছে।

দিদি রান্নাঘরের দিকে একটু এগোতেই রেবী আমাকে বললো, তুমি বেশ আসাহেবী করতে পারো।

আমি মোসাহেবী করলাম?

এটাও যদি মোসাহেবী না হয় তাহলে মোসাহেবী কাকে বলে?

খাওয়া-দাওয়ার পর আমি আমার ঘরে বসে একটু পরেই রেবী এলো। জিজ্ঞাসা করল পান খাবে?

না আমি পান খাই না।

আঁচলের ভিতর থেকে এক প্যাকেট সিগারেট বের করে আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো নাও। এতে ত আপত্তি নেই?

আমি অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম।

কি দেখছ? নাও।

কিন্তু...

আবার কিন্তু কিসের?

মানে আমি সিগারেট খাই না।

এতদিন খাওনি বলে কি কোনদিনই খাবে না?

না তা না।...

সব কিছুই একদিন না একদিন শুরু করতে হয়। আজ না হয় সিগারেট খাওয়াই শুরু করলে।

হঠাৎ সিগারেট কিনলে কেন?

ছেলেরা একটু-আধটু সিগারেট না খেলে কি দেখতে ভাল লাগে?

লাগে না?

না।

কেন?

কেমন মেয়ে মেয়ে লাগে।

আমাকে ভাল লাগে না বলেই কি...

ভাল লাগে না তা একবারও আমি বলিনি।...

তাহলে...

সিগারেট খেলে আরো বেশী ভাল লাগবে।

আমি আর তর্ক না করে একটু হেসে হাত বাড়িয়ে বললাম দাও।

রেবীর হাত থেকে সিগারেটের প্যাকেট নিয়েই বললাম, দেশলাই কোথায়?

সত্যি সিগারেট খেতে যে দেশলাই লাগে তা খেয়ালই নেই। একটু দাঁড়াও এক্ষুনি আনছি।

রেবী ছুট করে বাথরুম থেকে দেশলাই এনে দিতেই আমি সত্যি সত্যি একটা সিগারেট ধরালাম। একটা টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বললাম, ভাল লাগছে?

রেবী সোজাসুজি আমার কথার জবাব না দিয়ে একটু আনমনা হয়ে বাইরের আকাশের দিকে তাকাল। তারপর দৃষ্টিটা গুটিয়ে এনে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, আসল কথা কি জান দীপ ভাল হয়ে থাকতে থাকতে মাঝে মাঝে হাঁপিয়ে উঠি। মধ্যে সংযম আর নিয়ম মেনে চলতে কি কারুর ভাল লাগে?

আমি বুঝতে পারলাম না ওর ভাল হয়ে থাকা বা সংযম আর নিয়ম মেনে চলার সঙ্গে আমার সিগারেট খাবার কি সম্পর্ক। তবুও কোন প্রশ্ন করলাম না।

রেবী আমার একটা হাতের আঙুলগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে বললো, এই পৃথিবীতে ভাল হয়ে থাকার কোন মূল্য নেই। ভাল হয়ে থাকলেই বঞ্চনার জ্বালা ভোগ করতে হবে। আমি সে বঞ্চনা ভোগ করছি বলে তুমি কেন ভোগ করবে? ও হঠাৎ আমার হাতটা একটু জোরে চেপে ধরে বললো তিলে তিলে শুকিয়ে শুকিয়ে আমি তোমাকে মরতে দেব না।

(ক্রমশঃ)

বঙ্গশ্রী
হাওড়া
৪১/১, জি, টি, রোড, হাওড়া
• বেনারসী
• জেড়-সিল্ক
• টাঁত-মিল
• পোষাক
• সার্টিং-সুটিং
ও ছিট কাপড়

বিজ্ঞানের কথা

জনসংখ্যার বৃদ্ধি ও বিস্ফোরণ

জনসংখ্যার চিত্র
(ভারত)

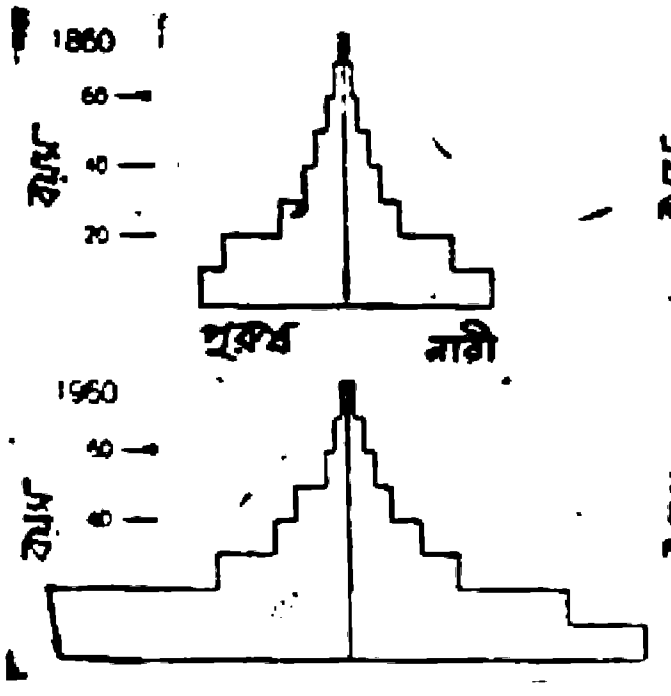

জনসংখ্যার চিত্র
(মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র)

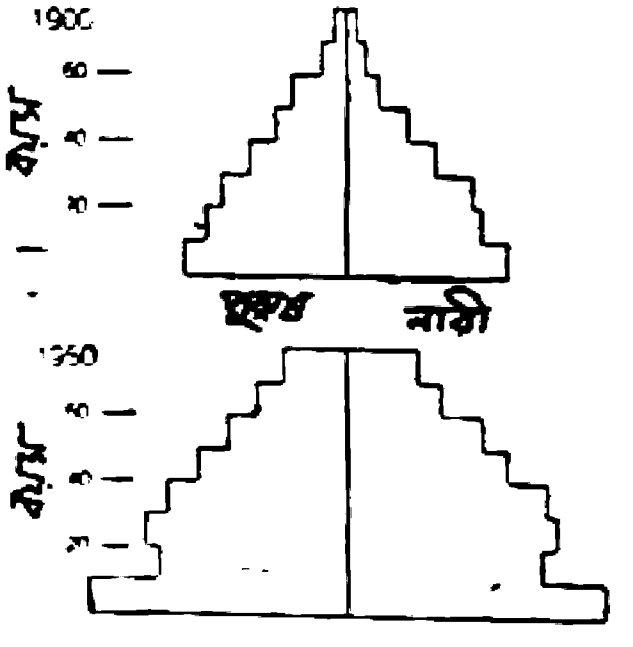

পৃথিবীর জনসংখ্যা এখন প্রায় ৪০০ কোটি, বর্তমানে যে হারে বাড়ছে তা বজায় থাকলে ২০০০ সালে হবার কথা ৭০০ কোটি। এত অল্প সময়ের মধ্যে পৃথিবীর জনসংখ্যা যে প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যাচ্ছে তার প্রধান কারণ, বলা হয়ে থাকে, মৃত্যুর হার কমে যাওয়া। বলা বাহুল্য বিষয়টি নিয়ে অনেক ভাবনাচিন্তা করার আছে। সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট থেকে প্রকাশিত হাউস জার্নাল সংবর্ধনা-এর প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ স্মরণ সংখ্যায় এ-বিষয়ে সুন্দর একটি আলোচনা উপস্থিত করেছেন সায়েন্টিফিক আমেরিকান পত্রিকার প্রকাশক গেরার্ড পীল। বিজ্ঞানের কথার পাঠকদের কাছে এই আলোচনাটি সংক্ষেপে উপস্থিত করতে চাই।

বিশ্বের জনসংখ্যা—এই বিষয়টি নিয়ে প্রথম যিনি ভাবনাচিন্তা করেছেন সম্ভবত তিনি হচ্ছেন ম্যালথাস। নামটি আমাদের সকলের কাছেই পরিচিত। বিশেষ করে যে বক্তব্যের জন্য তাঁর ভাষায় উপস্থিত করতে হলে, তা এই : 'মনে করা যাক, জনসংখ্যা হচ্ছে ১০০ কোটি, মানবজাতির সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এই সংখ্যাগুলির মতো—১, ২, ৪, ৮ ১৬ ৩২ ৬৪ ১২৮ ২৫৬। আর খাদ্যসংস্থান বৃদ্ধি পাবে এই সংখ্যাগুলির মতো—১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯। দুই শতকের মধ্যেই জনসংখ্যা যেখানে হবে ২৫৬ খাদ্যসংস্থান হবে ৯...'।

অর্থাৎ জনসংখ্যা বাড়ছে জ্যামিতিক হারে, প্রতিবারে দ্বিগুণ হয়ে হয়ে। আর খাদ্যসংস্থান বাড়ছে পাটিগণিতের হারে প্রতিবারে এক-এক যোগ হয়ে।

তাই যদি হয় তাহলে নিঃসন্দেহেই মানবজাতির ভবিষ্যৎ অন্ধকার। এমন এক সময় নিশ্চয়ই আসছে যখন পৃথিবীতে থাকবে মানুষ, তার তুলনায় খাদ্য অনেক কম পরিণামে এক অন্ধকার ভবিষ্যৎ।

ম্যালথাস কথাটা বলেছিলেন ব্রিটিশ জনসাধারণকে উদ্দেশ্য করে। তারা কিন্তু কথাটাকে বিশেষ আমল দেয়নি। তারা তখন মত্ত শিল্পবিপ্লব নিয়ে। অগ্রগতির জোয়ার চলেছে আর তাই মিলে চলেছে উৎসব। সময়টা তখন উনিশ শতকের গোড়ার দিক।

অনেক পরে পৃথিবীর জনসংখ্যা যখন বর্তমান হারে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে তখনই ম্যালথাসের তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা শুরু। দেখা যাচ্ছে পৃথিবীর জনসংখ্যা বাড়ছে বছরে ৭ কোটি ৭০ লক্ষ, পশ্চিমবাংলায় মোট যতো লোক বাস করে তার চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যায়। দিনের হিসেবে সংখ্যাবৃদ্ধি ২,০০,০০০। ঘণ্টায় ৮,০০০। সেকেণ্ডে দুটি।

পৃথিবীর জনসংখ্যা অনেকবার দ্বিগুণ হয়েছে, শেষবারের আগের বারে দ্বিগুণ হতে সময় নিয়েছে দুশো বছর। শেষবার দ্বিগুণ হয়েছে একশো বছরে। এখন যে হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে (শতকরা আড়াই-এরও বেশি) তাতে জনসংখ্যা দ্বিগুণ হতে সময় লাগবে ৩০ বছরেরও কম। আর জনসংখ্যার যে সংখ্যাটি দ্বিগুণ হচ্ছে তাও বিরাট—৩৫০ কোটি।

৩৫০ কোটির দ্বিগুণ—তার মানে ৭০০ কোটি। সংখ্যার বহর নিঃসন্দেহে উদ্বেগজনক। তবে প্রকৃতই ম্যালথাসের তত্ত্ব অনুযায়ী দ্বিগুণে হয়ে হয়ে বাড়ছে কিনা তা দেখা দরকার।

আমরা যদি পিছনের দিকে ফিরে তাকাতে চাই, ধরা যাক একেবারে শুরুর সময়ের দিকে, তাহলে আমাদের পিছিয়ে যেতে হবে প্রায় ২০ লক্ষ বছর। সে সময়ে পৃথিবীর জনসংখ্যা কত? বড়ো জোর কয়েক হাজার। যাদের হিসেবে ধরা হচ্ছে তারা মানুষ ছিল তো? অবশ্যই, কেননা মানুষ হবার সবচেয়ে বড়ো লক্ষণ, অর্থাৎ হাতিয়ারধারী হওয়া, তা তারা ছিল। যদিও তারা চলাফেরা করত দুই পা সমেত দুই হাতেও, কিন্তু হাতিয়ারধারী হওয়ার জন্যই তারা মানুষ হিসেবে গণ্য। মানুষ হিসেবে বিবেচ্য এই জীবগুলোর সন্ধান পাওয়া গিয়েছে আফ্রিকায়। সন্ধান বলতে গোটা জীবটির নয়, কিছু হাতের হাড়ের ও হাতিয়ারের।

এই আবিষ্কারের ফলে আমাদের নিজেদের সম্পর্কে আমাদের ধারণার বিপ্লব ঘটে গিয়েছে। হাতিয়ার যে ব্যবহার করে সে-ই মানুষ, হাতিয়ার ব্যবহার করতে পারাটাই মানুষের গর্ব। কিন্তু কুড়ি লক্ষ বছর আগেকার যে-জীবের কথা বলা হচ্ছে তারা আকারে ছিল খুবই ছোট (কুড়ি থেকে চল্লিশ কেজির মতো ওজন), হাঁটতে গিয়ে দুই পায়ের সঙ্গে দুই হাতও ব্যবহার করত, তবুও কিন্তু হাতিয়ার ব্যবহার করছে। এ থেকে সিদ্ধান্ত করতে হয় যে, মানুষ হাতিয়ার বানায় নি, হাতিয়ারই মানুষ বানিয়েছে। প্রাকৃতিক নির্বাচনে মানুষ হওয়ার দিকে ক্ষমতার নির্ধারক ভূমিকা হাতিয়ারের, হাতিয়ার বানাতে পারার, বানানো হাতিয়ার ব্যবহার করতে পারার। মানুষ যে মানুষ হতে পেরেছে তা হাতিয়ার বানাতে পেরেছে বলেই। অর্থাৎ গর্ডন চাইল্ডের বিখ্যাত বইটির নাম নিয়ে বলতে হয় : মানুষকে বানিয়েছে মানুষ নিজে।

এই প্রথম শুরুর সময় থেকে বিগত কুড়ি লক্ষ বছরের মধ্যে, হিসেব করে দেখা হয়েছে, ৭,০০০ কোটি মানুষ জন্মেছে ও মরেছে। এই সময়ে মানুষের গড় আয়ু সম্ভবত ২৫ বছরের বেশি ছিল না। কিন্তু এই সমস্ত মানুষ ও তাদের প্রযুক্তিবিদ্যার সাফল্যের প্রমাণ এই ঘটনায় যে মানুষের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটেছে। এক লক্ষ বছর আগে, যখন থেকে 'হোমো সাপিয়েন্স' বা জ্ঞানী মানুষের আবির্ভাব ঘটার প্রমাণ পাওয়া যায়, পৃথিবীতে মানুষের মোট সংখ্যা ছিল ৫০ লক্ষ।

এই হচ্ছে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রথম বিস্ফোরণ। তা ঘটতে সময় লেগেছে বহু বহু বছর। কিন্তু কী কারণে ঘটতে পারল? বলতে পারা যায় মানুষের ইতিহাসে এক সাংস্কৃতিক বিপ্লব ঘটে যাবার ফলে।

আমাদের এই সময়কার পর্যবেক্ষণের প্রত্যক্ষ নিদর্শন খুব বেশি নেই, কেননা তারা বাস করত প্রায়শই নদী বা সমুদ্রের ধারে। আর এই নদী বা সমুদ্রের ধারে ক্ষয় এত বেশি যে আসল জীবটির কোনো অস্তিত্ব থাকে নি, থেকে গিয়েছে শুধু তাদের ব্যবহৃত কিছু হাতিয়ার। তাও সব হাতিয়ার

র হাতিয়ারে উৎকর্ষ এত
ান করা যেতে পারে অন্যান্য
হারেও প্রযুক্তিবিদ্যার উৎকর্ষ
ার কোন্‌ নিদর্শন পাওয়া
তার ধরনই ছিল এমন যে
বিলুপ্ত হয়েছে।

ক ২৫,০০০ বছর আগে
) সর্বত্রই অতিমাত্রায় প্রভূত।
। পরিবেশের ওপরে প্রভূত
মের অঞ্চল থেকে শুরু করে
প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপ পর্যন্ত তার বিজয়মণ্ডিত বসতি।

আজ থেকে ১০,০০০ বছর আগে পৃথিবীর জনসংখ্যা সম্ভবত ছিল ৫ কোটি। প্রযুক্তিবিদ্যা উন্নত হতে হতে এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছয় যেখানে একটা কৃষি-বিপ্লব ঘটে যেতে পারে। তার ফলে পৃথিবীতে আরো অনেক বেশিসংখ্যক মানুষের অন্ন-সংস্থান সম্ভব হয়। জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে চলে। মাত্র ১০,০০০ বছরের মধ্যেই

পৃথিবীর জনসংখ্যা লাফি
১০০ কোটি সংখ্যাতে।
প্রবৃদ্ধটি এই সময়েই লি

আর এই দশ হাজা
যতো মানুষ জন্ম নিয়েছে
ছিল ৩,০০০ কোটি।
মানুষের আয়ু ছিল সেই
মানুষ জন্মাচ্ছিল যেমন প্রচু
মরছিল প্রচুর সংখ্যায়। প্র
লোক জন্মাচ্ছিল আর য

বড় পুরস্কার জিতে নিন

● এক লক্ষ টাকা আপনার হতে পারে

ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাঙ্কে এপ্রিল 10, 1976-এর আগে 200 টাকা বা তার বেশি দিয়ে একটি জমার খাতা খুলুন। পুরস্কারের জন্যে যত দিন আপনাকে প্রতীক্ষা করতে হবে, ততদিন আপনার খাতায় শতকরা 5 টাকা হারে করমুক্ত সুদ জমা পড়বে। আপনি ঐ খাতায় টাকা জমা দিতে বা তুলতেও পারেন, শুধু দেখতে হবে যে সেপ্টেম্বর 30, 1976 পর্যন্ত খাতায় বাকীর পরিমাণ যেন কখনও 200 টাকার কম না হয়। এই সর্ত মেনে চললে আপনি 1977-এ জানুয়ারী মাসের 'ড্র'-এ সামিল হতে পারবেন। আপনি নিজের নামে, বিভিন্ন ডাকঘরে, একাধিক খাতা খুলতে পারেন। তাছাড়া আপনার পরিবারের প্রত্যেকের নামে, এমন কি নাবালক/নাবালিকার নামেও অনুরূপভাবে একাধিক খাতা খুলতে পারেন।

মোট 20.50 লক্ষ টাকার 11,116 টি পুরস্কার

বছরে দুটি ক'রে 'ড্র'

পুরস্কার

একটি প্রথম পুরস্কার 1,00,000 টাকা	দশটি তৃতীয় পুরস্কার প্রত্যেকটি 20,000 টাকা	এক হাজারটি পঞ্চম পুরস্কার প্রত্যেকটি 500 টাকা
পাঁচটি দ্বিতীয় পুরস্কার প্রত্যেকটি 50,000 টাকা	একশটি চতুর্থ পুরস্কার প্রত্যেকটি 5,000 টাকা	দশ হাজারটি ষষ্ঠ পুরস্কার প্রত্যেকটি 50 টাকা

প্রণিধানযোগ্য যদি আপনি 1977-এর জানুয়ারী 'ড্র'-এ কোনও পুরস্কার না-ও পান, মনে রাখবেন যে যদি আপনার ঐ জমার খাতায় বরাবরই অন্ততঃ 200 টাকা বা তার বেশী থাকে তাহলে ভবিষ্যতে সব ক'টি 'ড্র-এ' পুরস্কার লাভের সম্ভাবনা থাকবে।

সম্ভব হ'লে আজই খাতা খুলুন

জাতীয় সঞ্চয় সংস্থা

পোস্ট বক্স নং 96, নাগপুর

davp 75/590

তফাৎটা দশেরও কম ছিল। তার মানে শতকরা এক ভাগেরও কম। জনসংখ্যার বৃদ্ধি ধীরে ধীরে। তার ওপর ছিল দুর্ভিক্ষ, মহামারী, যুদ্ধ ও যুদ্ধের দরুন বিপুল সংখ্যায় মৃত্যু।

প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতি অবশ্যই হয়েছে। কিন্তু একজন মানুষ তার জীবনকালে এই উন্নতির বিশেষ কোনো পরিচয় পায়নি। উৎপাদন বেড়েছে আরো বেশিসংখ্যক মানুষ দিয়ে আরো অধিক পরিমাণ সম্পদ ব্যবহার করতে পারার ফলে, উৎপাদনের ক্ষমতা বাড়ার ফলে নয়। এই গোটা সময়কাল ধরে একজন মানুষের জীবনে উৎপাদন ক্ষমতা থেকেছে স্থির, কিন্তু আরো মানুষ দিয়ে উৎপাদন করিয়ে উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে এমন একটা হারে যার সঙ্গে ম্যালথাসের পাটিগাণিতের মিল পাওয়া যায়। এই অবস্থায় অবশ্যই জাগতিক হারে মানুষের সংখ্যাবৃদ্ধির একটা চাপ থেকে গিয়েছিল।

শিল্প-বিপ্লব হতে মানুষ দেখতে পেল শ্রমের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ছে। তার প্রত্যক্ষ ফল দেখা দিল বৈষয়িক পরিবেশের উন্নতি-সাধনে। দেশের মানুষের অভিজ্ঞতায় তার ফলও কম বিস্ময়কর নয়।

কোনো একটি বিশেষ দেশ ধরে জন্ম-মৃত্যুর হিসেবের দিকে তাকালে ধারণাটা আরো স্পষ্ট হতে পারে। ধরা যাক সুইডেন। এই দেশটিতে জন্ম-মৃত্যুর হিসেব রাখার রেওয়াজ বহুকাল ধরেই চমৎকার। ১৮০০ সালে সুইডেনে মৃত্যুর হার ছিল হাজারে ২০ জনেরও অধিক (আয়ু ছিল ৫০ বছরেরও কম)। মৃত্যুর হার তারপরে কমতে থাকে, কমতে কমতে ১৯৬০ সালে প্রতি হাজারে ১০ জনেরও কম। আর ১৮০০ সালে সুইডেনে জন্মের হার ছিল হাজারে ৩০ জনেরও বেশি। তার মানে, জনসংখ্যার বৃদ্ধি শতকরা একেরও বেশি। তারপরে ১৬০ বছর ধরে জন্মের হার ক্রমেই কমেছে। চল্লিশ বছর আগে যে বিরাট মন্দা গিয়েছে সে-সময়ে জন্মের হার ছিল খুবই কম—মৃত্যুর হার ও জন্মের হারের মধ্যে তফাৎ ছিল সামান্যই।

সুইডেনের এই দৃষ্টান্ত থেকে একটি বিষয়ে বিশেষভাবে অবহিত হওয়া দরকার। এ-দেশে জন্মের হার ভীষণভাবে কমেছিল এমন এক সময়ে যখন নিরোধ-জাতীয় জন্মনিরোধের উপায় প্রচলিত ছিল না। কোনোরকম সাজসরঞ্জামের সাহায্য ছাড়াই মানুষ জন্মনিরোধের উপায় বার করে নিয়েছিল। আসল কথা ছিল উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হওয়া। হিসেবটা ছিল সহজ অঙ্কের—পরিবারে মানুষের সংখ্যা যতো কম খাদ্যের বরাদ্দ ততো বেশি।

অতএব দেড়শো বছর পার হয়ে এসে আমরা দেখতে পাচ্ছি মানুষের জৈবরাজ্যে নতুন একটি ব্যাপার। এমন এক মনুষ্য-সমাজকে পাওয়া যাচ্ছে যাদের মধ্যে মৃত্যুর হার কম, আবার জন্মের হারও কম। এই নতুন ব্যাপারটিকেই বলা যেতে পারে জন-সংখ্যার বিস্ফোরণ ঘটার মূলগত কারণ। তার জন্য দায়ী করতে হয় অবশ্যই শিল্প-বিপ্লবকে। মানুষের ইতিহাসে জনসংখ্যার প্রথম প্রকৃত বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে এই শিল্প-বিপ্লব। দৃষ্টান্ত, ইউরোপ। আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময়ে ইউরোপের জন-সংখ্যা ছিল বিশ্বের জনসংখ্যার ১৫ শতাংশ, আর এখন (যে-সময়ে বিশ্বের বাকি অংশের জনসংখ্যা অনেক বেশি) পুরোপুরি ৩০ শতাংশ। ইউরোপে এ-ব্যাপারটি ঘটেছে আরো বেশি সংখ্যায় মানুষের জন্ম হবার ফলে নয় (জন্মের হার বরং গোটা সময় ধরেই কমেছে), আরো বেশি আয়ু নিয়ে মানুষের বেঁচে থাকার ফলে। মনুষ্য নামক প্রজাতির ইতিহাসে এই প্রথম এক আশ্চর্য ব্যাপার সংঘটিত হল। মনুষ্যোচিত পূর্ণ আয়ু নিয়ে মানুষ বেঁচে থাকছে। এ-ব্যাপারটিকে অবশ্যই প্রকৃত একটি জৈব বিপ্লব হিসেবে স্বীকার করা উচিত।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দিকে তাকিয়ে এই বিপ্লবের চেহারাটা দেখা যাক। ১৯০০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যা ছিল সাড়ে সাত কোটি, ১৯৫০ সালে পনেরো কোটি। অর্থাৎ, ৫০ বছরে দ্বিগুণে। এবারে ১৯০০ সালের একটি ছবি আঁকা যেতে পারে। ভূমির রেখায় একদিকে পুরুষ, অপরদিকে স্ত্রী। লম্ব রেখায় দশকের হিসেবে বয়স। ছবির চেহারা দাঁড়ায় পিরামিডের মতো। লক্ষ করবার বিষয় এই যে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পুরুষ ও স্ত্রী উভয়েরই সংখ্যা কমছে—কিন্তু স্ত্রীর সংখ্যা কমছে মা হবার বয়সে অপেক্ষাকৃত বেশি।

এবারে একই ছবি যদি ১৯৫০ সালের বেলায় আঁকা যায় তাহলে বোঝা যাবে কেন জনসংখ্যা দ্বিগুণ হতে পারল। ভূমির রেখা ১৯০০ সালের তুলনায় সামান্যই বড়ো—দশ বছরের নিচে বড়ো জোর ত্রিশ কি চল্লিশ লক্ষ ছেলেমেয়ের অধিকা। তারপরে ৬০ বছর পর্যন্ত বয়স যতো বাড়ছে ততোই দেখা যাচ্ছে ১৯৫০ সালের ছবিতে বেঁচে থাকার সংখ্যা অনেক বেশি। জন্মের হার কম, মৃত্যুর হার কম—এই দুয়ের সমন্বয়ে এক সম্পূর্ণ চেহারার মনুষ্যগোষ্ঠী আবির্ভূত হয়েছে এই পৃথিবীতে।

এবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই ছবির সঙ্গে তুলনা করা যাক। চেহারাটি সেই পিরামিডের, কিন্তু ভূমির চেহারাটি অনেক বেশি ছড়ানো। আর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত ছোট হচ্ছে, বিশেষ করে স্ত্রীর দিকে। ভারতের জনসংখ্যা দ্বিগুণে হতে সময় লেগেছে একশো বছর—১৮৫০ থেকে ১৯৫০।

ভারতের বেলায় পিরামিডের যে চেহারাটি পাওয়া যাচ্ছে তা কম-উন্নত দেশের লক্ষণযুক্ত। অর্থাৎ, যে-কোনো কম-উন্নত দেশের জনসংখ্যার হিসেব ছবিতে প্রকাশ করলে এই চেহারাটি পাওয়া যাবে। এখানে জনসংখ্যার ৩৭ শতাংশ ১৫ বছর বা আরো কম বয়সের। মাঝারি বয়স কুড়ির কাছাকাছি। সন্তানের জন্ম দিয়ে থাকে এই মাঝারি বয়সীরাই—একথাটা মনে রাখা দরকার।

এ থেকে মনে হতে পারে, জনসংখ্যা আর যাতে না বাড়ে তার উপায় করাটা খুবই সহজ। এই মাঝারি বয়সীদের মধ্যে প্রচার চালিয়ে এমন মানসিকতা তৈরি করা যাতে তারা নিরোধ ব্যবহার করে।

বলা বাহুল্য, এই চেষ্টাই চলেছে। কিন্তু সফল হয়নি। বিশেষ করে গ্রামের গরীবদের মধ্যে ও শহরের বস্তিবাসীদের মধ্যে জীবনযাত্রার ধরনই এমন যে নিরোধ প্রচলন সম্ভব নয়। এটা বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা।

সোজা কথাটা এই যে পরিবার-নিয়ন্ত্রণের জন্য উদ্দেশ্য-প্রণোদিত করা চাই। সুইডেনের দৃষ্টান্ত থেকে দেখা গিয়েছে, উদ্দেশ্য-প্রণোদিত করা গেলে প্রায়োগিক সাহায্য ছাড়াই পরিবার-নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টি-টিউট থেকে সারা দেশব্যাপী এ-বিষয়ে যে সমীক্ষা নেওয়া হয়েছে তা থেকেও এই উক্তির সপক্ষে প্রমাণ পাওয়া যায়।

সমীক্ষায় পরিবারের আকারকে সম্বন্ধিত করা হয়েছে পরিবারের বয়সের সঙ্গে। দেখা গিয়েছে, হীনতম অবস্থার যারা আছে তাদের সন্তানসন্ততি জীবিত থাকে না। উপার্জন ও ব্যয় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেমেয়ের সংখ্যাও বাড়ে। কিন্তু উপার্জন একটা বিশেষ মাত্রা ছাড়িয়ে গেলেই ছেলেমেয়ের সংখ্যা কমে যায়। আরো দেখা গিয়েছে, এই বিশেষ মাত্রার উপার্জন সর্বত্রই সমান।

পরিবার নিয়ন্ত্রণের জন্য উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হওয়ার কথা আগে বলা হয়েছে। ভারতীয় পরিবারের বেলায় এই অবস্থাটি আসে উপার্জনের যে মাত্রার তা গড় উপার্জনের চেয়ে বেশি।

সোজা ভাষায় বলতে গেলে ব্যাপারটা এইরকম। অধিকাংশ ছেলেমেয়ে পাঁচ বছর বয়স হবার আগেই মারা যায়। মা-বৌ মারা যাওয়ার ঘটনাও কম নয়। বেশি বয়সের দিকে স্ত্রীর সংখ্যা কম, পুরুষের সংখ্যা বেশি। যে-সব স্ত্রী বেঁচে থাকে তারা ছটি থেকে আটটি সন্তানের জন্ম দিয়ে থাকে এবং বেশির ভাগ সন্তানই পাঁচদিন থেকে পাঁচ বছর বয়সের মধ্যে মারা যায়।

আরো একটি সমীক্ষার কথা বলা যেতে পারে। এটি নেওয়া হয়েছিল বিশেষ একটি গ্রাম মেডিকেল কেন্দ্র থেকে। কতক-গুলো গ্রামে জন্ম-নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে প্রচুর প্রচার চালানো হয়, কতকগুলো গ্রামে কোনো প্রচারই থাকে না। পাঁচ বছর পরে কিন্তু দেখা গেল প্রথম গ্রামগুলোতে ছেলে-মেয়ের সংখ্যা বেশি, দ্বিতীয় গ্রামগুলোতে কম। ছেলেমেয়ে কম-বেশি হওয়া নির্ভর করছে উপার্জনের মাত্রার ওপরে।

অতএব সিদ্ধান্ত নিতে হয়, বিশ্বের গরীব দেশগুলিতে যদি জন্ম-নিয়ন্ত্রণ করতে হয় তবে চাই দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নতি। যদি আমরা চাই বিশ্বের জনসংখ্যা চলনসই একটা মাত্রার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকুক—৮০০ থেকে ১০০০ কোটির মধ্যে— তাহলে অবশ্যই আমাদের চাইতে হবে গরীব দেশ-গুলির দ্রুত শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি। এই হচ্ছে গোটা বিশ্বের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রকৃত পথ।

অরুণকুমার

CENTRAL LIBRARY

পুনশ্চ

প্রবন্ধকার ও সমালোচক হিসাবে স্বর্গত অতুলচন্দ্র গুপ্ত সাহিত্যক্ষেত্রে যেমন খ্যাতিসম্পন্ন ছিলেন, তেমনি আইনজ্ঞ হিসাবেও তাঁর পরিচিতি সর্বজনবিদিত। ১৮৮৪ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং পরলোকগমন করেন ১৯৬১ সালে।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের সময় তিনি র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদে পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে মধ্যস্থতা করেন। আইনজ্ঞ হিসাবে তাঁর খ্যাতির সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট আচার্যের খ্যাতিও তিনি লাভ করেছিলেন গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যকর্মের জন্য। প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের 'সবুজ পত্র' পত্রিকায় প্রবন্ধকার হিসাবে তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটলেও পরিচয়: কবিতা প্রভৃতি আরও কয়েকখানি বিশিষ্ট পত্রিকা তাঁর মূল্যবান রচনা প্রকাশের গৌরব অর্জন করে। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে কাব্য জিজ্ঞাসা; নদীপথে: শিক্ষা ও সভ্যতা: ইতিহাসের মুক্তি' সমাজ ও বিবাহ' প্রভৃতি অধিক-তর পরিচিত।

অতুলচন্দ্রের রচনার গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য হিসাবে আমরা প্রাচীন 'কালি-কলম' পত্রিকার ২য় বর্ষে (বৈশাখ ১৩৩৪) ১ম সংখ্যা থেকে 'সমালোচক' নামক একটি নিবন্ধের অংশবিশেষ এখানে পুনশ্চ মুদ্রিত করে নিলাম। তিনি নিজে একজন বিজ্ঞ সমালোচক ছিলেন, কাজেই আলোচ্য নিবন্ধটি ইদানীন্তন কালের সমালোচকদের পক্ষে বিশেষ হিতকর ও জ্ঞানগর্ভ হিসাবে গণ্য হবে।

ঘড়ি

ও

গ্যারান্টিসহ ঘাড় মেরামত

রায় কার্জন এন্ড কোং

জুয়েলার্স এন্ড ওয়াচ মেকার্স

৪ বি, বি রোড, বাদ, কলি—১

ওমেগা ও টিসট ঘড়ির

অথরাইজড এজেন্টস্

।। সমালোচক ।।

সৃষ্টির ক্ষমতা যাঁর আছে তিনি সৃষ্টি করেন, যাঁর রসবোধের শক্তি আছে তিনি আস্বাদন করেন; এর মধ্যে সমালোচক লোকটি কে? ইনি ঠিক লেখকও নন, আবার শুধু পাঠকও নন, অথচ একাধারে পাঠক ও লেখক। আর সেই দ্বৈত ভাবের জোরে পাঠককেও চোখ রাঙান লেখককেও ধমক করেন। এই গুরুগিরির ফলে এঁর ধারণা জন্মে, আর সরল লোকেরও বিশ্বাস হয় যে ইনি পাঠকদের চেয়ে অনেক উঁচু, আর লেখকদের চেয়েও খাটো নন। এ মিথ্যা জ্ঞান নিরাশের এক উপায় 'সমালোচক' সম্বন্ধে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা।

সমালোচনার মূলতত্ত্ব বোঝা কঠিন নয়। সাহিত্যের সৌন্দর্য্য ও রসের অনুভূতি সকল পাঠকের সমান নয়। এ অনুভূতি কারও সূক্ষ্ম কারও মোটা; কারও ব্যাপক, কারও সঙ্কীর্ণ। বেশীর ভাগ পাঠকেরই সাহিত্যের বোধ সূক্ষ্ম ও ব্যাপক নয়। কিন্তু অনেক পাঠকের এটুকু শক্তি আছে যে দেখিয়ে দিলে তারা দেখতে পায়। সমালোচনার কাজ এই দেখিয়ে দেওয়ার কাজ। যাঁর অনুভূতিতে সাধারণ পাঠকের অতীত সূক্ষ্মতা ও রসের উপলব্ধি হয়, তাঁর যদি অপরকে তা দেখিয়ে দেবার শক্তি ও প্রেরণা থাকে তবে তিনিই সমালোচক। সাহিত্যের জগতে সমালোচক হচ্ছেন দ্রষ্টা ও দর্শয়িতা।

...সমালোচনা ইচ্ছা থাকলেই লেখা যায় না, যেমন ইচ্ছা করলেই কবি হওয়া যায় না। কিন্তু অকবি লোকেও কাব্য লেখে, আর যার কোনও সাহিত্যিক সূক্ষ্মদৃষ্টি নেই সেও সমালোচক হয়। স্বভাবতই তাদের সমালোচনায় আলো থাকে না, থাকে শুধু উত্তাপ। কোনও নূতন সৌন্দর্য্য কি রস তারা পাঠকদের দেখতে পারে না, কারণ তা তাদের নিজের চোখেই পড়ে না; সুতরাং তারা সোজাসুজি সাহিত্যের বিচারক হয়ে বসে ডিক্রি ডিসমিস-এর রায় দিয়ে থাকে। এবং ডিক্রির চেয়ে যে তাদের ডিসমিসের রায় হয় অনেক বেশী তার কারণ এতে সহজেই প্রমাণ হয় যে তাদের সাহিত্যিক আদর্শটা ভারি উঁচু, এত উঁচুতে বেশীর ভাগ সাহিত্যই তার সিঁড়িরও নাগাল পায় না। 'কিছু-হচ্ছে-না' বললেই ইংগিতে জানানো হয় যে 'হওয়া যাকে-বলে' তার ধারণাটা আমার কত বড় তা তেমরা সাধারণ লোকেরা ধারণাই করতে পারবে না।

সাহিত্যের এই হাকিম-সমালোচকেরা সচরাচর নবীন সাহিত্য ও নূতন লেখকদের সমালোচনা করেন। কালের কষ্টিপাথরে যে সাহিত্য সোনা বলে প্রমাণ হয়েছে তা নিয়ে আলোচনা কঠিন কাজ। তাকে 'কিছু নয়' বলা চলে না, 'খুব ভাল' বললে কিছু বলা হয় না। অন্য লোকে সে সম্বন্ধে যা বলেছে তার অতিরিক্ত কিছু চোখে পড়লে তবেই তা নিয়ে আলোচনা করা যায়। কিন্তু সমালোচক নাম নিলেই চোখে দৃষ্টি আসে না, সেটা বিধাতার দান। নবীন লেখকদের সমালোচনায় এসব আপদ নেই। সেখানে নির্ভয়ে হাকিমী করা চলে। চোখের দৃষ্টির প্রয়োজন নেই, ঘাড়ের জোর থাকলেই যথেষ্ট। অথচ নবীন সাহিত্যের সমালোচনায় রসবেত্তা সমালোচকেরাও যুগে যুগে কতই না অদ্ভুত কথা বলেছে। সেন্ট্‌সপায়রের যশ অচল হয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে কতদিন? শেলী থেকে বায়রণের চেয়ে বড় কবি একথা প্রথমে ইংলণ্ডের কোনও সাহিত্য-সমালোচক বলেনি, বলেছিল একজন ন্যায়শাস্ত্র ও অর্থনীতির পণ্ডিত—নাম জন স্টুয়ার্ট মিল। কিন্তু সমালোচকদের বিদ্যাবুদ্ধি যে সমসাময়িক নবীন লেখকদের সম্বন্ধে তাদের ভালমন্দ লাগাটা বড় ছোটর একেবারে নির্ভুল মাপকাঠি!

এই সমালোচকেরা ভাবেন যে তাঁদের নিন্দা-প্রশংসা সাহিত্যের বড় হিতকর। তাঁদের প্রশংসায় সৎ-সাহিত্য উৎসাহ পায়, আর অ-সাহিত্য ও কুসাহিত্য লজ্জায় মুখ ঢেকে সাহিত্য-সমাজ থেকে বিদায় হয়। এর কোনটাই হয় না। সাহিত্য-সৃষ্টির প্রেরণা রসগ্রাহী পাঠকের অপেক্ষা রাখলেও সমালোচনার কোন অপেক্ষা রাখে না। আর সাহিত্যের সংসারে অসাহিত্য টিঁকে থাকে বি-রসজ্ঞ পাঠকদের কৃপায়। তারা যতদিন আছে, এবং তারা চিরকাল থাকবে, ততদিন সমালোচকের লাঠি তার কিছুই করতে পারবে না।

সাহিত্যের জগতে সমালোচক ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর কিছুই নয়। সাহিত্যের সৃষ্টি কি পালন, কি সংহার তার কোনও হাত নেই। যে সমালোচক মনে করে যে সাহিত্য সৃষ্টির কাজে তার সহায়তা আছে, তার ভুলটা ঠিক সেই রকমের, যে জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত মনে করত যে গ্রহের চলাফেরার গতি আবিষ্কার করে তার গতির সহায়তা করা হচ্ছে। বিশ্বের রহস্য কবির মনে যে প্রকাশের আবেগ আনে তা থেকে কাব্যের সৃষ্টি হয়, সাহিত্যের বিশ্ব তত্ত্বদর্শী রসজ্ঞের মনে যে আনন্দের আবেগ আনে 'সমালোচনা' তার অভি-ব্যক্তি। ইন্‌স্পেক্‌টরি করা সমালোচকের কাজ নয়, তা 'স্যানিটেরিই' হোক আর 'লিটেরেরিই' হোক। সাহিত্যের হিতেচ্ছায় যে সব সমালোচনা তা অনেক সময় হিটলারের মত শুধুই পীড়াদায়ক।

ক্ষপণক

CENTRAL LIBRARY

ফেরত

তপন রায়

এক হাতে ছেলের দু গাল ধরে, চুল আঁচড়ে দিতে দিতে ঝর্ণার হঠাৎ-ই মনে হলো, টুবলুকে একেবারে শুভেন্দুর মতো দেখতে হয়েছে। অথচ শুভেন্দুর সঙ্গে প্রায় পাঁচ বছর তার কোনো সম্পর্ক নেই, আর টুবলুর বয়স আসছে ফাল্গুনে চার বছর পড়বে এখনও আড়াই মাসের মতো বাকী। তবু শীতের সেই ছোট্ট বিকেলে তার আচমকাই মনে হয়, টুবলুর মুখের সঙ্গে শুভেন্দুর মুখের এক আশ্চর্য মিল রয়েছে।

ঘরে টিউব লাইট জ্বলছে। সাড়ে চারটের মধ্যেই আজকাল আলো জ্বেলে দিতে হয়। দিন ছোট, আলো না জ্বাললে কাজ-কর্মের অসুবিধা হবেই। বিশেষ করে এই সাজ-গোজের সময়, একটু আগেই নিজে কিছুক্ষণ সিঁদুরে পরতে যাবার আগে আলোটা জ্বেলে সিঁথিতে সিঁদুর ও টিপ পরেছিল বাঁ হাতে। কেননা, মানদা তখন টুবলুকে জামা-প্যান্ট সোয়েটার পরিয়ে ফেলেছে। এখন ঝর্ণা চেঁছে কাজল আর চুলটা আঁচড়ে নিলেই টুবলু বেড়াতে যেতে পারে মানদার সঙ্গে। ঐ এক কামলা ছেলেকে নিয়ে। কিছুতেই সে মানদার হাতে কাজল পরবে না। কেঁদেকেটে একশা করবে। প্রথম প্রথম ঝর্ণা ভাবত আর পাঁচটা বাচ্চার মতো এটাও বোধহয় আবদেরে। শুধু ওর হাতে নয়ে এই কথা অকপটে দিয়ে টুবলু বোধহয় মেয়েলী হয়ে ওঠে। কিন্তু না, পরে ঝর্ণা ভেবে দেখেছে, জল ঘেঁটে মানদার হাতের অ্যালুমিনিয়ামের কৌটো থেকে বিশেষ করে নখের ডগা দিয়ে এই তন্বী ও কাজল পরাতে গেলেই টুবলু ভোঁয়, তাই টুবলুকে কাজল পরানো এবং চুল আঁচড়ে দেওয়াটা ঝর্ণাকে করে থাকে মানদা নিজের কাজ শেষ করে ফেলেছে দেখে ব্যস্ত হাতে কপালে টিপ পরতে হয় ঝর্ণাকে। তাড়াহুড়োর জন্যই টিপটা একটু বেঁকে যায়। বাসব ঠিক বলে, এ মা এই বড় মেয়ে টিপ পরতে পারে না। পাঁচ বছর বিয়ে হয়েছে, তবু ইচ্ছাকৃত কম নি এতটুকু। এখনও অফিসে যাবার আগে এবং ফিরে ঝর্ণাকে ও আদর করবেই। ওর জন্যই হয় ঝর্ণাকে রোজ বিকেল পাঁচটায় প্রায় চুল টুল বেঁধে একেবারে ফিটফাট হয়ে থাকতে হয়। এলোমেলো থাকা বাসবের মোটেই অপছন্দ। টিপটা বেঁকে গেছে, তাই মনের মধ্যে খচখচ করে বিঁধছিল। ঝর্ণা ভেবেছিল, ব্যাক মে, টুবলু চলে গেলে আবার ঠিক করে নেবে, টুবলুকে সোফায় বসিয়ে নিজে সেন্টারে বসে কাজলের ছোট কৌটো খুলতে খুলতে বলেছিল, একদম নড়বে না। চুপ করে বসে থাকো। কথা বলো না। টুবলু সে কথায় ভ্রূক্ষেপ না করে মেঝেতে পড়ে থাকা একটা খেলনা মোটর নিয়ে বলেছিল, ওটা লও না।

টুবলুকে ধরে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মানদা বলেছিল, পরে নেবে। আগে কাজল পরে নাও।

—না, আগে আমায় দাও ঐ গাড়ীটা। ও মা-মণি দেবে না।

ডান হাতের তর্জনীর মাথায় কাজল তুলতে তুলতে ঝর্ণা বলেছিল, আচ্ছা দাও। ছেলে যা ধরেছে না একটা।

বেঁকানো হাতে নিয়ে শান্ত হয়ে কাজল পরল টুবলু। শুধু দাস্টুমি করার জন্যই

মাঝখানে কয়েক বার বেশী চোখ পিটপিট করল। তখনই ঝর্ণার মনে হয়েছিল, এই রকম চোখ পিটপিট কে যেন করত? কিন্তু মনে পড়ে নি কিছুই। চুল আঁচড়ে দিতে গিয়ে হঠাৎই ঝর্ণা যেন এক চরম সত্যকে আবিষ্কার করে ফেলল। টবলুর মুখের সঙ্গে শুভেন্দুর মুখের আশ্চর্য মিল। বয়সের তফাতের দরুনই শুধু যা মুখ ছোট আর বড়। শুভেন্দুর বয়সে টবলুকে ওরই মতন প্রায় দেখতে হবে।

ভিডিও চালান বন্ধ রেখে অবাক হয়ে টবলুর মুখটা ভাল করে দেখে ঝর্ণা। না কোন ভুল নেই—সেই চোখ-নাক ভুরু, এমন কি ঠোঁট দুটোও। নীচের ঠোঁটটা একটু বেশী মোটা। একেবারে শুভেন্দুর ঐ বছর বয়স যেন কেটে বসান। এ বয়সে শুভেন্দু এমনিই দেখতে ছিল। যদিও তখন কার শুভেন্দুকে বা তার কোন ছবি ঝর্ণা দেখে নি, তবু কল্পনা করে নেওয়া যায়। টবলু যেন শুভেন্দুর ছেলেবেলা। কি করে এমন হল? সত্যিই কি এমন কখনও হয়? কে জানে, ঝর্ণা উত্তর খুঁজে পায় না।

মানদা টবলুকে নিয়ে বেরিয়ে গেলে, স্নানের ঝঞ্ঝাট। বন্ধ করতে করতে ঝর্ণার মনে পড়ে, তার গুরু বলাই ম্যাটিনি শো সিনেমার গেছে। ফিরবে কখন কোন ঠিক নেই। খাওয়া হতে পারে, আবার সাইটাও। ফেরা-টেরার ব্যাপারগুলো এখন সবই বলাইয়ের ইচ্ছের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে। যা হয়েছে আজকালকার বি-চাকররা। মেজাজের থৈ পাওয়াই ভার। পান থেকে চুন খসলেই পালাবে। তখন ঠ্যালা সামলাও ঢোক গেলাঘর, বিশ্বাসী এবং কাজের নতুন কোন লোক পেতে আজকাল সত্যিই অর্জিত পুণ্যের অনেকখানি খরচ হয়ে যায়। তারচেয়ে এ ধরনের ছোটখাট দু-চারটে অত্যাচার সহ্য করা অনেক ভাল।

বাসব ফিরে আসবে বলাইয়ের আগে কাজেই ওর জন্য কিছু খাবার তৈরী করে রাখা দরকার। কি করা যায় অল্প খেটে? করেকটা লুচি তৈরী করে ফেললেই লাগটা চুকে যায়। বাসবের আসতে ঘণ্টাখানেক দেরী আছে, কাজেই এত তাড়া নেই ভেজে রাখা। বরং বেলে-টেলে তৈরী হয়ে থাকা ভাল, বাসব ফিরলেই ভেজে দেওয়া যাবে। অল্প কটা তো লুচি, কতক্ষণই বা লাগবে ভেজে দিতে। তারের সঙ্গে লুচি ভালই লাগবে। তাছাড়া খুশীও হবে বাসব।

ময়দার কৌটোটা খুলতে খুলতে টবলুর চোখ পিটপিট করার কথাটা মনে পড়ে ঝর্ণার। কে যেন অমন করত? কে যেন? মনে পড়ে, মনে পড়ে যায় সব হঠাৎ। অমন করত শুভেন্দুর ছোট ভাই নবোদ্দু। ওকে বীতিমত বৌদি বলেই ডাকত তাকে। আর কি সুন্দর কথা বলত! ভাল আবৃত্তিও করতে পারত। দোষের মধ্যে ছিল এই চোখ পিটপিট করা। মুখের সামনে কেউ খুব চোখের পাতা ফেললে ভারী অস্বস্তি হয় কথা বলতে—এখনও ওকে কম ধমকেছে সে। কিছু বললেই নবোদ্দু হেসে ফেলে বলত, আগে নিজের বদ-অভ্যাসটা পাল্টাও, তারপর আমায় বলো।

—আমার বদ অভ্যাস কি শুনি?

—এই যে হাসলে তোমার দাঁতগুলো দেখা যায়, তুমি পার ওগুলো বন্ধ করতে? আমায় যে বলছ কেন? বলেই হাসত খুব করে।

ঝর্ণাও হাসত ঠোঁট টিপে। তার সুন্দর দাঁতের সুখ্যাতি মনে অহর্নিশি উঁকি মেরে গেছে। নবোদ্দু আবার ফিরে যেত পরেরো মুহূর্তে—তার প্রেমিকা ইনিমাকে ফোনে ডেকে দেওয়ার অনুরোধ জানাত। কতদিন ফোনে ইনিমাকে ডেকে দিয়েছে ঝর্ণা। ফোন ধরলেই কথা বলত নবোদ্দু। পাছে ওদের বাড়ীর কেউ বুঝতে না পারে সেই জন্য ওরা দুজনে সমানে তুই-তোকারী চালিয়ে যেত। শুনতে খারাপ লাগত ঝর্ণার। ও বলত, কি যে তোমরা এত তুই-তোকারী কর বুঝি না। এতই যখন ভয় তখন প্রেম করতে আসা কেন বাপু?

হাসত নবোদ্দু—তুমি আর কি বুঝবে বৌদি। বড় ঘরানে করতে হয় এসব। তোমাদের মতন হো আর ফিকসড কপি ভাগ্য নিয়ে জন্মাই নি।

সে কথা শুনে চমকে উঠত ঝর্ণা। সত্যিই সে বড় ভাগ্যবতী, তার সব কিছুই নির্ধারিত হয়ে আছে গত দু বছর ধরে। কোথাও কোন বাধা নেই। শুভেন্দুর সঙ্গে ফোনে ওকে তুই-তোকারীও করতে হয় না। বড় নিশ্চিন্ত ভবিষ্যত।

কতদিন হয়ে গেল, নবোদ্দুর কোন খবর পায় না ঝর্ণা। ওদের কি বিয়ে হয়েছে? নিজের জীবনকে কি ফিকসড করতে পেরেছে নবোদ্দু? কিছুই জানে না সে। ময়লা মাখতে মাখতে ঝর্ণার মনে হয় অনেক কিছুই ও ইচ্ছে করে জানতে চায় নি। পালিয়ে থাকতে চেয়েছে শুভেন্দু সম্পর্কীয় যাবতীয় ব্যাপারগুলো থেকে। কিন্তু পালাতে গিয়েও সে আরো বেশী করে জড়িয়ে পড়েছে। ঝর্ণা খেয়ালই করে নি এতদিন, শুভেন্দু টবলু হয়েই ফিরে এসেছে তার কাছে। কিন্তু এসব তার মনের ভুল নয়তো? নিশ্চয়ই তাই, নইলে যে শুভেন্দুকে সে পাঁচ বছর দেখে নি তার মত টবলুকে দেখতে হবে কি করে? এমনটি কখনও হয় নাকি। এত উদ্ভট চিন্তাও করে মানুষে! সঙ্গে সঙ্গে ওর এও মনে হয়, এতদিন পরে এমন একটা বিশ্রী কথা তার মনে হলই বা কেন? নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে। যে কোন চিন্তার পিছনেই একটা কারণ থাকে। এরও কি তেমন কিছু আছে নাকি? বিয়ের পর শুভেন্দুকে যত মুহূর্তে মনে পড়া ছাড়া আর তো কোন কারণই নেই। অমন মনে পড়লেই কি এরকম দেখতে হবে? তাহলে কি তার অবচেতন মনে এমনি সাধ ছিল?

পুরীতে যখন বিয়ের পর হনিমুন করতে গিয়েছিল, তখন কি একবারও শুভেন্দুর কথা মনে পড়েছিল? হ্যাঁ, মনে পড়ে। মনে পড়ে, আর এতদিন পরে তা মনে পড়তেই কি এক অদ্ভুত আতঙ্কে কেঁপে ওঠে ঝর্ণা। তবে কি ঐ কারণে এই সাদৃশ্য?

পুরীর সেই রাতে অন্তরঙ্গ এক মুহূর্তে বাসব তাকে ঠাট্টা করে জিজ্ঞেস করেছিল, কি চাও বল তুমি, ছেলে না মেয়ে।

বহু দূরের শুভেন্দু হঠাৎ যেন ফিরে এসেছিল সেই মুহূর্তে। তার সেই বাসনা টাও। শুভেন্দু চাইত, ওদের প্রথম সন্তান যেন ছেলে হয়, ঝর্ণারও ইচ্ছে ছিল তাই। বহুবার এ নিয়ে আলোচনাও হয়েছে দুজনের মধ্যে। কিন্তু সেই মুহূর্তে শুভেন্দুর কথা একদম মনে করতে চাইছিল না ঝর্ণা। কারণ তার বুক জুড়ে তখন বাসব। তাই শুভেন্দুকে এড়ানোর জন্যই যেন ঝর্ণা মিথ্যে বলেছিল, মেয়ে।

উত্তরে বাসব বলেছিল দেখবে, মেয়েই হবে আমাদের।

সত্যি হয়নি সে ইচ্ছে। এসেছে টবলু। আজ কেউ ধরতে পারছে না, কিন্তু যতদিন যাবে টবলু তো ততই শুভেন্দু হয়ে উঠবে। সে দিন তো চেনা লোকেরা সবাই সন্দেহ করবে তাকে। তখন? দোষ না করেও তাকে আসামী হতে হবে। আর টবলুও কি সব শুনে তখন ক্ষমা করবে তাকে? কথাটা ভাবতেই শরীর হিম হয়ে আসে ঝর্ণার।

রাত্রে বাসব বলল, তোমার কি হয়েছে মণি? এত চুপচাপ কেন? বাসব প্রথম প্রথম ঝর্ণা বলে ডাকত। অনেক বলেকয়ে ঝর্ণাই ওকে মণি ডাকতে শিখিয়েছে। এই আপত্তির কারণও ছিল। শুভেন্দু তাকে যে নামে ডাকত বাসব সে নামে ডাকবে কেন? শুভেন্দু ওকে ঝর্ণা বলে ডাকত, আর ঝর্ণা তাকে ডাকত শুভ। বাসবের আদরে গলায় মণি ডাক শুনতে বেশ লাগে তার।

সেই বিকেল থেকে তার যে কি হয়েছে, সবকিছু কেমন যেন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। ভাল লাগছে না কিছু। টবলু বেড়িয়ে ফিরে আসার পর তার সন্দেহ কেটে গেছে। সত্যিই শুভেন্দুর মত দেখতে হয়েছে টবলু। অনেকবার ছেলেকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখেছে ঝর্ণা।

তবু ভেবেছে এসব হয়তো তার পাপবোধ থেকেই হচ্ছে। পরক্ষণেই মনে হয়েছে না পাপ হবে কি করে সে তো কোন অন্যায় করেনি।

বাসবের কথায় তাই তার অস্বস্তি বেড়ে যায়। স্বাভাবিক হবার আপ্রাণ চেষ্টা করে বলে কি আবার হবে।

—নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে। সেই সন্ধ্যে থেকেই দেখছি তুমি কেমন যেন গম্ভীর হয়ে আছো? কি হয়েছে বলো না। বাসবের শিরদাঁড়া বরাবর নরম, আঙুল বুলিয়ে দিলে ঝর্ণা ওগো কি আবার হবে? তুমিও যেমন।

—সত্যিই বলছো? শরীর খারাপ হয়নি তো?

[illegible] শুভেন্দু যেন ইদানিং [illegible] বেশী অনাগ্রহী হয়ে [illegible]। শুভেন্দুর সেই অগ্রহের ব্যাপারটাও তাই অন্য দিকে দেখা যেতো না। সে এখন অনেক বেশী আনন্দ রাজনীতি নিয়ে মেতে থাকে। ক বাসব বাড়ি ঘাড়-পা রাজনীতি-চ হয়ে রয়ে নেই। আছে [illegible] আর উদ্দাম প্রভাব। [illegible] কুড়ে কয়ে নিজেকে কাটিয়ে নি [illegible] পারলেই যেন সে খুশী। শুভেন্দু যে লোকটা সব থেকে বড় হ [illegible] উঠেছিল তখন হয়তো [illegible] আত্মভিমান। শুভেন্দুর এই মেজাজের ব্যাপারটাই অসহ্য হয়ে উঠেছি [illegible] কণার কাছে।

পরিচিত প্রায় সকলেই জা শুভেন্দু-কণার প্রেম সংবাদটা। হ সকলেই প্রথমে অবাক হয়েছিল [illegible]

প্রকাশিত হলো

আগাথা ক্রিস্টির

পোয়ারো ইনভেসটিগেটস্/এরকুল পোয়ারোর গল্প-সংকলন

এরকুল পোয়ারো ১ম খণ্ড ॥ ১৪৲

এই সংকলনে তাঁর দুর্লভ সৃষ্টি এরকুল পোয়ারোর অসামান্য প্রতিভার স্ফুরণ ঘটেছে প্রতিটি বিচিত্র কাহিনীর জটিল রহস্য সমাধানে।

ক্রিস্টির অন্যান্য রহস্য উপন্যাস নেপথ্যে হাপদ ১২·০০ অন্ধকার আদিম ১৫·০০ বিষের স্বাদ মৃত্যু ১০·০০ মেঘের দেশে ঘুমের কোলে ১২·০০ তিনে লক্ষ্য চারে ভেদ ১০·০০ রইলো না আর কেউ ৫·০০ মমিরদেশের মেয়ে ১০·০০ সূর্যের নীচে অন্ধকার যন্ত্রস্থ

হ্যারল্ড রবিন্স । শুধু একটি উপল ২০৲ দি কার্পেট ব্যাগার্স ১ম খণ্ড ২০৲, ২য় খণ্ড ২০৲ ৭৯ পার্ক এভিনিউ, প্রকাশের পথে

ফ্রেডরিক ফরসাইথ

ওডেসা ফাইল ২০৲ শৃগালের শেষ প্রহর ২৫৲ এরিখ মারিয়া রেমার্ক । স্বপ্নের পাখিরা ১৬৲ প্রেম মৃত্যু ভালবাসা ১৪৲ । গর্কির শ্রেষ্ঠ গল্প ১ম ২০৲ ॥ জেমস হেডলী চেজ । জোনাকির ছায়া ১২৲ অন্ধকারে একা ১৫৲ । অ্যালিস্টেয়ার ম্যাকলন । তুষারে মৃত্যুর ছোঁয়া ১৪৲ জয় অ্যাডামসন । বর্ন ফ্রী ১০৲ লিভিংফ্রী ৮৲ ফরএভার ফ্রী ৮৲ জওহরলাল নেহরু । মা-মনিকে বাবা ৫৲ ফাঁসীর মঞ্চ থেকে ৫৲

প্রকাশক—পত্রপুট, পরিবেশক—কথা ও কাহিনী ১৩ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট-১২

পৃথিবীর সর্বপ্রথম ডিটারজেন্ট কাপড় ধোয়ার বার

সুপার ৭৭৭

পয়সা বাঁচান, বেশী সাদা করুন

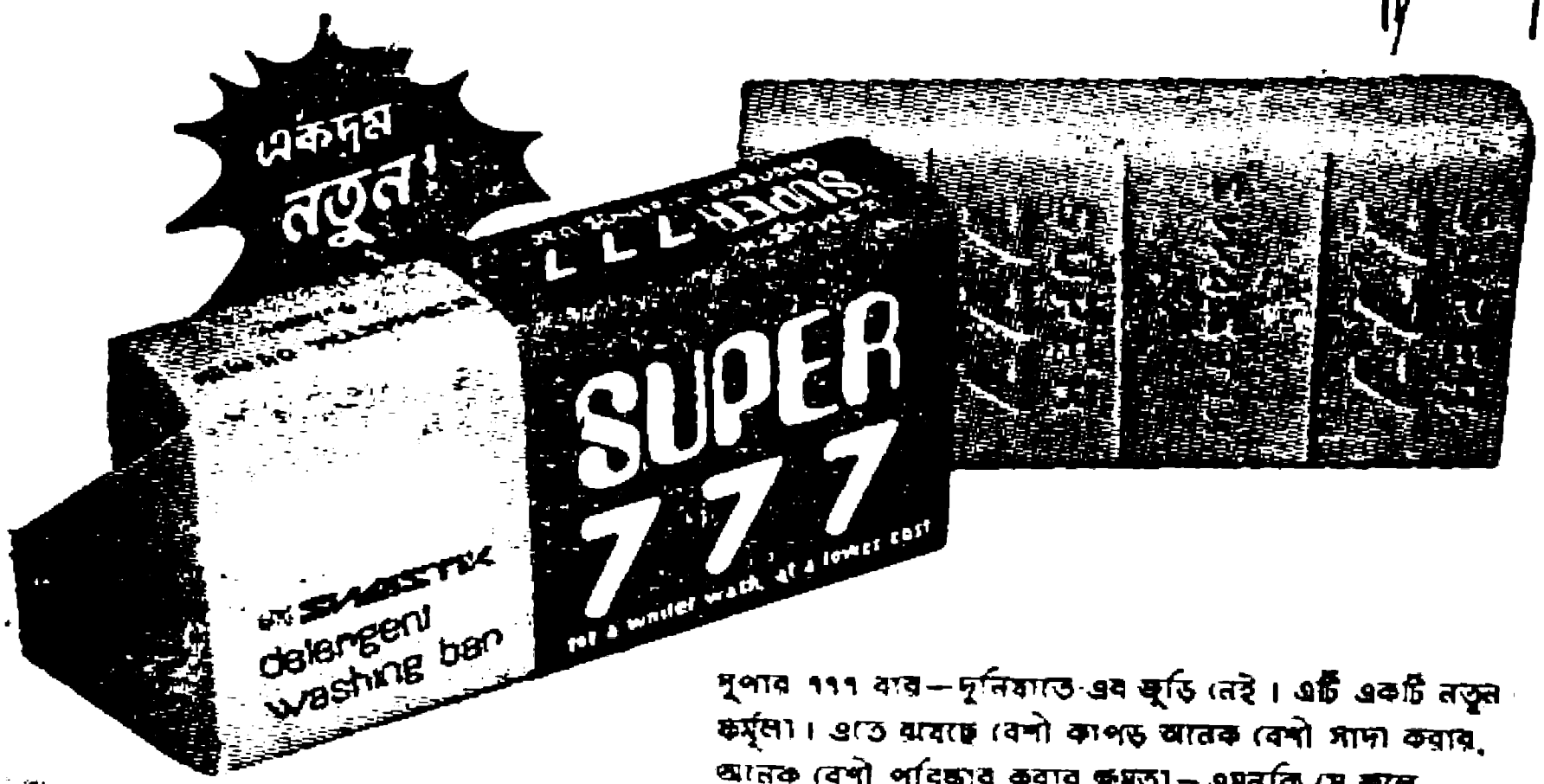

সুপার ৭৭৭ বার—দুনিয়াতে এর জুড়ি নেই। এটি একটি নতুন ফর্মুলা। এতে রয়েছে বেশী কাপড় অনেক বেশী সাদা করার, অনেক বেশী পরিষ্কার করার ক্ষমতা—এমনকি যে জলে সাধারণত একেবারেই ফেনা হয় না, তেমন জলে-ও। সাধারণ বার সাবানের তুলনায় দাম-ও কম।

এখন থেকে ব্যবহার করতে শুরু করুন নতুন ধরণের বার—সুপার ৭৭৭ ডিটারজেন্ট কাপড় ধোয়ার বার।

shilpi homa CA/73 BEN

শুভেন্দুর অপরাধ বড়ই গুরুতর ওর নামও আর শুনতে চায় না এই জাতীয় একটা ভলগী করে কর্ণা এড়িয়ে গিয়েছিল সবাইকে।

বাসবের পাশে শুয়ে কর্ণা ভাবে অতখানি দূরে সরিয়ে দেবার মত কোন দোষ কি শুভেন্দু করেছিল? বোধহয় না। বোধহয় কেন সত্যিই নয়। একরকম বিনা দোষেই শুভেন্দুকে শাস্তি দিয়েছে কর্ণা। সামান্য ব্যাপার নিয়েই তুলকালাম করে ছেড়েছে। শুভেন্দু অবশ্য তা নিয়ে তেমন কিছু বলেনি বা করেনি। করলে হয়তো ওকে ফিরিয়ে দেবার মত কোন যুক্তি-সংগত কারণও এতদিনে খাড়া করে ফেলতে পারতো কর্ণা। কিন্তু কিছুই করেনি শুভেন্দু। একরকম চুপচাপই মেনে নিয়েছিল সব। আত্মমর্যাদাবোধ ওর তীব্র সেই তীব্রতা এখানেও কাজ করেছে। যাবতীয় দুঃখ মনেতেই বয়ে বেড়িয়েছে। আর অপরদিকে সে ভালো কিছু পাবার লাভেই যেন আপ্রাণ চেষ্টা করেছে শুভেন্দুকে ভুলে যেতে কিন্তু পেরেছে কি?

শুভেন্দু এখানেই তাকে হারিয়ে দিয়েছে। কর্ণার অনেক অনেক সুখের সময়ে সে পেয়েছে নিজের জায়গা করে নিতে।

শুভেন্দুর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতার কথা বাসব আগে থেকেই জানতো। বিয়ের পরে একদিন সে বলেছিল যখনই তোমার ইচ্ছে হবে তুমি শুভেন্দুর গল্প আমায় বোলো আমি শুনব। আমি এসবে কিছু মাইন্ড করি না। মাইন্ড করলে কি তোমায় পেতাম? কর্ণা ঠোঁট বেঁকিয়ে বলেছিল ও'র কথা আবার বলার কি আছে?

বাস্তবিকই কর্ণা কোনদিনই নিজে থেকে শুভেন্দুর প্রসঙ্গে কোন কথা বলেনি। বাসবের কাছে। বাসবও বলেনি আর এসব কথা। কর্ণার অনেকবারই মনে পড়েছে শুভেন্দুকে কিন্তু কাউকেই বুঝতে দেয়নি। এমন কি বাসবকেও নয়।

কোরা বাসব গত দুদিন অকারণেই শুধু অবাক হয়েছে। অসংখ্যবার কর্ণাকে জিজ্ঞেস করেছে কি হয়েছে তোমার আমাকে বলো। প্রতিবারই কর্ণা শরীর খারাপের কথা বলেছে—একবারও মন খারাপের কথা নয়। বাসব জেগে থেকেছে অনেক রাত অবধি, কর্ণার মতনই ছটফট করেছে. ওপাশ ওপাশ তবু একবারও বলেনি তুমি নিশ্চয়ই কিছু আমার কাছে লুকোচ্ছো। ওকি বোঝেনি কর্ণার শরীর ঠিকই আছে খারাপ বলাটা নিতান্তই একটা অজুহাত? সব বুঝেও চুপ-চাপই থেকেছে ও—এটা ওর একটা মস্তবড় গুণ। কোন ব্যাপার নিয়ে কর্ণার ওপরে কখনই জোর খাটায় না। বিয়ের এতগুলো বছর কেটে যাবার পরেও নয়। এইজন্যেই মানুষটার উপর বোধহয় আরো বেশী দুর্বল হয়ে পড়ে কর্ণা। এই জোর না করার জোরটা তো বাসব তার ভালবাসা থেকেই অর্জন করেছে। বাসব তাকে সত্যিই দারুণ ভালোবাসে। আর বাসবে নাই বা কেন. কর্ণাও কি তাকে কম ভালবাসে? বাসবকে খুশী রাখতে কর্ণাও কি কখনও গাফিলতি করেছে?

কিছুক্ষণ আগে বাসবকে ফোন করে কর্ণা ইভনিং শো সিনেমা দেখতে যাবার কথা বলেছিল বাসব রাজী এক কথায়। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে তিনটে টিকেট কেটে বাড়ি ফিরবে কথা আছে।

তিনটে অর্থাৎ টুবলুও যাবে। বোঝে না কিছু তবু ওকে নিয়ে যেতে হবে। কেননা বাড়িতে রেখে যাওয়ার অসুবিধা অনেক। ঘরে তালা দিয়ে যাওয়া যায় না। দিনকাল খারাপ লোকজনকে বিশ্বাস নেই কখন কি হয়ে যায় কে জানে? তার চেয়ে তালা দিয়ে শুধু হায়ারটা বলাই আর মানদার জন্য খুলে রেখে যাওয়া অনেক বেশী সুবিধার।

সারাটা বিকেল, জানালায় দাঁড়িয়ে কেঁদেছে টুবলু। সে কিছুতেই সিনেমায় যাবে না। সিনেমার চেয়ে মানদার সঙ্গে বেড়াতে যাওয়া তার কাছে অনেক ভালো। এই নিয়ে হাজারও বায়না ছেলের। এটা চাই, সেটা চাই, অমুকটা দিতে হবে. তমুকটা দিতে হবে। আব্দারের আর অন্ত নেই। তাই নিয়ে কড়া করে ধমক দিতেই ছেলে সেই যে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে আর নড়বার নামটি নেই।

মানদা এসে বললো ও সাজবে না মা। বলছে আমি যাব না সিনেমায়।

খোঁপায় কাঁটা গুঁজতে গুঁজতে কর্ণা বলল, ওমা তাই নাকি? এত জেদ হয়েছে ছেলের?

টুবলু জানলায় দাঁড়িয়ে, কর্ণাকে ঘরে ঢুকতে দেখেই তাকিয়ে হাসলো। কর্ণা বোঝে ওর হাতে সাজবার জন্যই টুবলুর এই দস্টুমি। কিন্তু হাসি পেলেও হাসে না কর্ণা। শুধু বলে ঠিক আছে। আমি এসে তোমায় সাজিয়ে দেবো।

মানদা হাত গুটিয়ে দাঁড়িয়ে। টুবলু জানালায়। আগেই তাকে প্যান্ট জামা সোয়েটার পরিয়ে দিয়েছে সে। আর কিছু ও মানদার কাছে করবে না বলে আবার গিয়ে জানালায় দাঁড়িয়েছে। বেশ বড় বড় দেখাচ্ছে ওকে এখন।

কর্ণা একটু বাদে ফিরে এসেই ব্যস্ত হাতে ডানহাতের তর্জনীতে কাজল নিয়ে টুবলুকে ডাকতে গিয়ে আচমকা সব কেমন যেন এলোমেলো হয়ে যায়। সে স্পষ্ট দেখতে পায়—টুবলু নয়, জানলায় দাঁড়িয়ে শুভেন্দু বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে। সেই একই ভঙ্গী। এতটুকুও ব্যতিক্রম নেই। অবিকল একরকম। কর্ণা নিজের অজান্তেই যেন টুবলুকে নয়, শুভেন্দুকেই ডেকে বসে সেই পুরনো নাম ধরে—এই শুভ শুভ এদিকে এস।

CENTRAL LIBRARY

অঙ্গনা

কেন এই পথে ?

রাত দেখা গোধূলি আলো। লক্ষ্য শিয়ালদা মেন স্টেশন। জনস্রোত ঠেলে ঠেলে এগিয়ে চলেছি। হঠাৎ একটা ভীড়। কৌতূহলী জনতার চোখ বিস্ফারিত। কেউ কেউ আক্ষেপে বলছেন 'অবক্ষয়' শব্দটা একেবারে উছলে গেল।

ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম না। হা-হুতাশ শুনতে শুনতে একটু উঁকি দিলাম। জনা দশ-বারো মহিলাকে ঘিরে সিভিল ড্রেসে পুলিশ। মহিলাদের বয়সের বেড়ি আঠারো থেকে বত্রিশ-চৌত্রিশ। তারা সকলেই অতিমাত্রায় সুবেশা। পুলিশের হাতে-পায়ে ধরে মুক্তি ভিক্ষা চাইছে। কেউ বা চাইছে নিজের মুখকে সম্ভ্রমতো আড়াল করে পরিচয় গোপন রাখতে। কৌতূহলী জনতার দৃষ্টি হত উন্মুখ। এরি মাঝে ভীড় ঠেলে একজন বলে উঠলো কি সর্বনাশ। দিনদুপুরে ডাকাতি। আমাদের পাশের বাড়ির মেয়েটাও এদলে ধরা পড়েছে। আমরা জানতাম ও সাত চড়েও রা করে না। ভদ্রলোক সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠলেন।

ব্যাপারটা কিছু কিছু আঁচ করতে পারলাম। অপেক্ষা করার সময় নেই বাসনাও নেই বিন্দুমাত্র। আবার ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়লাম। বসলাম নির্দিষ্ট ট্রেণে। যাত্রীরা কেউ বা চুপিসাড়ে সে ঘটনাই আলোচনা করছেন। এবার কামরায় উঠলেন সেই ভদ্রলোক। যিনি তরিয়ে তরিয়ে দীর্ঘসময় তাঁর প্রতিবেশিনীর লজ্জাকাতর মুখটা বেশ উপভোগ করছিলেন।

যাত্রা শুরু হল। আমাদের যাত্রীর মুখে যেন খৈ ফুটতে লাগলো। সে ঘটনার প্রথম থেকেই সাক্ষী। তার মুখে ইতিবৃত্তান্ত অনেক কিছু জানতে পারলাম। তাছাড়া নিজেও কিছু কিছু প্রত্যক্ষ করেছি।

সুবেশা সব আসে কলকাতার আশেপাশের অঞ্চল থেকে। বিদ্যুতের বন্যায় যখন মহানগরী রূপসী হয়ে চোখ ধাঁধায় তখন আসে মন ভোলাতে আর নিজেদের পরিবারের জন্য দুটি অন্নসংস্থান করতে। ওরা নিজেদের মধ্যে অল্প দূরত্ব রেখে অপেক্ষা করতে থাকে। একে একে সকলে হাজির হলে নির্দিষ্ট স্থানে যায়। তারপর সময় মতো... মতো যায় যেখানে ঠাঁই হয় সেখানে তাদের তাদের মলিনোর কালিমার আর এক পোঁচ পড়ে। দিনশেষে ক্লান্ত কিছু মানুষ যখন ঊর্ধ্বশ্বাসে ট্রেন ধরার জন্য কলকাতা ছুটতে উতলা তখন ওরা মহানগরীর এখানে-ওখানে স্থির পায়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কারো ভাগ্যে রাঘব বোয়াল শিকার জুটলো তো কথা নেই আর যদি না জোটে অন্তত যে কোন একজন হলেই হল। বাছবিচার করার মতো অবকাশ নেই।

আমার ভাবনাকে তীক্ষ্ণ ছুরি দিয়ে একজন ফালাফালা করে কাটলেন। তাঁর মুখে আমি আবার সেই পুরনো শব্দটা শুনলাম—অবক্ষয়। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রচণ্ড লালসা তাই এই অবক্ষয়। অচল থাকতে পারে তাই বলে স্বভাব নষ্ট।

অবক্ষয় কাদের মধ্যে? যিনি একথা উচ্চারণ করছেন তাঁকেও আমার অতি সাধারণ মধ্যবিত্তের একজন বলে মনে হল। তিনি কি তাঁর আশেপাশের আর পাঁচটা পরিবারের কথা চিন্তা করেননি। তাদের অভাব অভিযোগ মানুষের মতো মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকার স্বপ্নটা অস্বীকার করতে পারেন! চোখের জলে ওদের বাঁচার আকুতিটুকুর সততা কোন মিথ্যার জালে উড়িয়ে দেওয়া যায়? তাদের কথা উপস্থিত কে ভুলতে পারেন যে সে রাতে যদি তার ঘরে ফিরে রোজগার করে না ফিরতে পারে তবে পরদিন হয়তো রেশন তোলা হবে না অসুস্থ স্বামী বা বাবার পথ্য বন্ধ হবে ভাই-বোন অথবা ছেলেমেয়েদের স্কুলের বাকি মাইনে আর এক মাসের বাড়ীওয়ালা ও মুদি দোকানদার তাড়া করে আসবে। আর এর সঙ্গে তো রয়েছে দৈনন্দিন সংসার পরিচালনার অর্থাভাব। এতথা জানার পর কোন সহৃদয় ব্যক্তি অবক্ষয় অবক্ষয় বলে সমাজের আসন পতনের ভয়ে শিউরে উঠবেন।

অবক্ষয়ের ভয়ংকর চেহারা আমাদের তথাকথিত একশ্রেণীর উচ্চমধ্যবিত্তদের মধ্যে যে রয়েছে সেকথা কজন সোচ্চারে বলতে পারছেন হয়তো শিক্ষা ও অর্থে বলীয়ান তার চেহারা অন্যরকম। সেখানে পার্টি অর্থ ভ্রমণজড়িত স্বামী-স্ত্রী বদলেও ভ্রূক্ষেপ নেই। কারণ সেটা আমরা দেখতে ও শুনতে অভ্যস্ত। বরঞ্চ আরো কিছু বং চড়িয়ে বলবো অমুকের স্ত্রী অমুকের সঙ্গে স্টীমার পার্টিতে গিয়েছিল। বেচারা স্বামী তখনও একা একা কি করেন। তিনিও বারে বসে কয়েক পেগ গলায় ঢেলে স্ত্রীর ব্যবহারের প্রতিশোধ তুললেন। আবার স্ত্রী ফিরে এলে যে কে সেই। এটা বোধহয় ঐ সমাজের আদব-কায়দা। শুধু কি তাই—চাকরী ও ব্যবসায়ের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য নিজেদের স্ত্রীকে পর্যন্ত তারা বিনা দ্বিধায় উর্ধতনের মনোরঞ্জনের জন্য ছিঁড়িয়ে দেন। সেখানেও অর্থাগম—একদিকে রয়েছে সারভাইভাল অন্যদিকে স্টেটাস উন্নত করার দুর্বার আকাঙ্ক্ষা।

যুগে যুগে আমাদের দেশে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে সাহিত্যিক মনীষী সমাজ সংস্কারক ও নীতি-বাগীশ আবির্ভূত হয়েছেন। কিছু কিছু

ন্ত স্বাস্থ্যদের মধ্যে। নেপায় মন্ত বিরোধী স্ত্রী ও পুরুষ এই । বাঁচিয়ে রাখার সবসময় চেষ্টা যদিও সমাজে এঁদের সংখ্যা নগণ্য।

ক্ষয়কে অবক্ষয় বলে স্বীকার কারো কোন আপত্তি থাকতে না। এই অবক্ষয়ের পথে যারা । ভিয়েছে তারা কিন্তু ব্যাপারটা জেনেও বুঝে হয়ে এগিয়েছে। খুবই সচেতন তাই তারা রর অন্য কাউকে অর এপথে দিতে চায় না। কিভাবে থেকে তারা রোজগার করে সে গোপন থ্রকে পরিবারের । কাছে। তারা চায় এ অবক্ষয় মুক্ত হতে। অপেক্ষা শুধু ুলির যেদিন তাদের পাপের আর পরিবারের অসহায় ছেটরা যখন সৎ পথে কিছু উপার্জন করতে পারবে। সেদিন তারা অবক্ষয়ের গ্লানি থেকে চিরতরে মুক্ত হয়ে সহজ ও সুস্থ সামাজিক জীবনযাপন করতে পারবে। সমালোচকদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো আন্তরিকভাবে এই অবক্ষয়কে বন্ধ করতে চান। শুধু সমালোচনা কিংবা মৌখিক সহানুভূতিতে অনাহার-ক্লিষ্ট মেয়েদের এই চাপের বোঝা হয়ে করা সম্ভব নয়। তবু উপায়ে বাঁচার মতো যদি কোন সংস্থানের সন্ধান এরা পায় তবে এদের অধি-কাংশই পরম স্বস্তিতে এপথ ছেড়ে আসবে। নারী কখনোই পণ্য হতে চায় না। সে চায় মা-বোনের পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে।

অঞ্জলি চৌধুরী

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষের

নতুন বই **চিত্র বিচিত্র**

একাল-সেকালের বিচিত্র কথা ও রসমধুর কাহিনী-সমারোহ

দাম : সাত টাকা।

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড

১৪, বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট কলিকাতা—১২

প্রবন্ধ, সমালোচনাওগবেষণামূলকগ্রন্থ

আবু সয়ীদ আইয়ুব	॥	আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ ১২
আবু সয়ীদ আইয়ুব	॥	পাশ্চাত্যের সঙ্গে ১২
বুদ্ধদেব বসু	॥	সাহিত্যচর্চা ১২
কিরণশশী দে	॥	রবীন্দ্রসঙ্গীত সংগ্রহ ১২
নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	॥	মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত ২০
ডঃ শিবেনকুমার চট্টোপাধ্যায়	॥	প্রভাতকুমার : জীবন ও সাহিত্য ১২
হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	॥	[illegible] ১০
রথি বাগচি	॥	যুগমানব শ্রীঅরবিন্দ ১৬
দীপ্তি ত্রিপাঠী	॥	[illegible] ১৬
সন্ধ্য ঘোষ	॥	ওকাম্পার রবীন্দ্রনাথ ৮
ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়	॥	[illegible] ৫০ সন্ধয় ১৯১৩-৪১) ২৫
অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়	॥	[illegible] ১০
অমৃত বসু	॥	[illegible] ১০
সমর গুপ্ত	॥	[illegible]
ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত	॥	[illegible] ৫
ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য	॥	বাংলার লোকসাহিত্য ৬/৩ প্রবন্ধ/পৃষ্ঠা ৬৫
ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য	॥	গীতিকবি শ্রীমধুসূদন ১৫
ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য	॥	পুরুলিয়া থেকে পাবিয়ে ১৫

বেঙ্গল পাবলিশার্স / বে বুক স্টোর· কলিকাতা-১২ ফোন : ৩৪-৫০৩৪

CENTRAL LIBRARY

চিঠিপত্র

সি এম ডি-এ প্রসঙ্গে

বহুদিন ধরে লক্ষ্য করছি যে অমৃত সাপ্তাহিকে সম্পাদকীয় মন্তব্য বিভাগে সি এম ডি এর কাজকর্ম সম্পর্কে উল্লেখ থাকে।

বহুদিন ধরেই জানাচ্ছি যে মন্তব্যের উপযোগিতা এবং বস্তুনিষ্ঠতা সম্বন্ধে আপনাদের অভিনন্দন জানাই, কিন্তু সাধারণত জনসংযোগ বিভাগ প্রতিবাদ পাঠাতেই অভ্যস্ত, অভিনন্দন পাঠাতে তাঁরা গড়িমসি করে থাকেন, আমিও ব্যতিক্রম নই। দেরী হলেও অভিনন্দন পাঠাচ্ছি।

কলকাতার কিছুই হবে না এই বদ্ধমূল ধারণা থেকে জনমানসকে অনেকখানি মুক্ত আপনি মুক্তি দিয়েছেন। জল সরবরাহ, জল এবং মল-নিকাশী ব্যবস্থা, পথ এবং পরিবহণ ব্যবস্থা, বস্তি এবং অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্পে সি এম ডি এর অবদান সম্বন্ধে আপনাদের পাঠকদের আপনারা যথেষ্ট সচেতন করেছেন। আশা করি ভবিষ্যতেও করবেন।

সমর বসু
জনসংযোগ অফিসার
সি এম ডি এ
কলকাতা : ৭০০০০১

সুধী প্রধানের চিঠির উত্তর

তেরই ফেব্রুয়ারী অমৃত পত্রিকায় সুধী প্রধানের একটি চিঠি ছাপা হয়েছে। তাতে ক্রীড়া বিনোদন সংস্থার প্রকাশিত অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তের লেখার প্রতিবাদ করা হয়েছে। প্রথমেই আমি শ্রীপ্রধানকে প্রশ্ন করতে চাই, তিনি কি করতে চাইছেন? কারণ আজ বিগত কয়েক বছর ধরে, একটি থিয়েটারের পত্রিকায় যে হাতে তিনি আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির ধারক-বাহক এবং সাংস্কৃতিকের অধিকর্তার প্রসঙ্গে অপবাদ দিয়ে লেখা শুরু করেছেন, তাতে কেবল প্রশ্ন জাগে কত দূর কি করেছেন বাংলা থিয়েটারের জন্যে তিনি নিজে? তাঁর চরম আক্রমণের লক্ষ্য শম্ভু মিত্রের ক্ষেত্রে। এখন তিনি যা কাজকর্ম করেছেন থিয়েটারে এবং লেখায় আর শম্ভুবাবু যা করেছেন, এই দুটি পাশাপাশি রাখলেই ছবিটি পরিষ্কার হবে।

শ্রীপ্রধানের সমস্ত লেখা থেকে পরিষ্কার হয়ে যায়, আজকের এই বাংলা থিয়েটারের যে অসামান্য উন্নতি ও লাবণ্য তাতে শম্ভুবাবুর কোন অবদান নেই। শম্ভু মিত্র মহাশয় এই থিয়েটারের জন্য কিছু করেন নি।

কিন্তু আমরা যারা এই নতুন দিনের থিয়েটারে এসেছি, এবং থিয়েটার নিয়ে গভীরভাবে ভাবছি, তাদের কাছে শম্ভু মিত্রের কার্যকলাপই আদর্শস্থানীয়। তাঁর কার্যকলাপেই আমরা পেয়েছি সামগ্রিক ভারতীয় নিজস্ব থিয়েটারের পরিচয়। যেমন নিজস্ব জাপানের নো থিয়েটার। আজ বহু নাট্য দল যে এগিয়ে এসেছে নাট্যের উন্নতির জন্যে, জীবনের কথা বলবার জন্যে, তার প্রেরণা এই শম্ভুবাবুর নেতৃত্বে গড়া বহুরূপী সম্প্রদায়ের আদর্শের অনুসরণ ও কার্যকলাপ। বিগত দিনের কিছু কাগজপত্র আমাদের হাতে আছে। কিন্তু এমন কোন কাগজ হাতে নেই যাতে প্রমথ সুধী প্রধানের চেষ্টায় কোন প্রযোজনা বা কোন নাট্য দল গড়ে উঠেছিল বা উঠেছে। বিগত কিছুদিন আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শম্ভুবাবু যে ভাষণ দিয়েছিলেন শিশির ভাদুড়ী ও আজকের নাটকের ওপর, সুধীবাবু কি তা জানেন? তিনি তো আই পি টি-এর হাত ধরেই এবং শম্ভুবাবুর নির্দেশনার অভিনয় করেই আমাদের কাছে তিনি পরিচিত।

শ্রীপ্রধান লিখেছেন সেই সময়ে গণনাট্যে চারুপ্রকাশ ঘোষ এবং গোপাল হালদার ছিলেন এবং এই সব মানুষেরা শিল্প কলাও বুঝতেন এবং রাজনীতিও বুঝতেন। একথার সত্যতা প্রমাণ করার জন্যে বেশী কিছু বলবার নেই। শুধু বলব, নিঃসন্দেহে চারুবাবু একজন পরমমানস, একজন মস্ত বড় অভিনেতা। কিন্তু তার মানেই যে তিনি ভাল নাট্যশিল্প অথবা সামগ্রিক থিয়েটারের শিল্পকে বুঝতেন, একথা ভাববার মত কোন প্রমাণ আমাদের হাতে নেই। শ্রীপ্রধানের কথা মত, তিনি তো পারতেন নীলদর্পণ প্রযোজনা করতে সেই সময়ে অথবা পরে কোন সময়ে। কি জানেন, ভাল ব্যাটসম্যান হলেই যে তিনি ভাল ক্যাপ্টেন হবেন, এমন কথা নেই। গ্যারিফিল্ড সোবার্স এবং কমই জন্মায়। গ্রন্থের গোপাল হালদার পন্ডিত ব্যক্তি, কিন্তু তাঁর ক্ষেত্রেও ওই একই কথা প্রযোজ্য।

নীলদর্পণ নিয়ে একথা সুধীবাবু বলেছেন তাতে প্রমাণিত, শিল্পীর কোন স্বাধীনতা এবং নাট্যনির্দেশকের একেবারে নিজস্ব স্বাধীনতা ছিল না সেই সময়ের গণনাট্যে। কারণ শম্ভু মিত্রের মত প্রজ্ঞাসম্পন্ন এবং গভীরভাবে থিয়েটারের প্রতি আস্থা আন্তরিক ব্যক্তি নীলদর্পণের বিষয়বস্তুর মধ্যে খুঁজে নিয়েছিলেন তৎকালীন পরিবেশের বস্তুনিষ্ঠতে ব্যাপারগুলো। এখানেই শ্রীদিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বা শ্রীপ্রধানের পসড়ার সঙ্গে পার্থক্য মনে হয়। কারণ তাঁর মত শিল্পীরই আন্তরিক মনস্তাপ জানাবে এই বিষয়বস্তুর মধ্য স্বতন্ত্রতা পুরনের স্বতন্ত্র ভাষা স্বতন্ত্র মেজাজকে বুঝে নেওয়া সম্ভব। থিয়েটারের প্রসঙ্গে জানী, স্টেজের প্রসঙ্গে জানা একজন গ্রন্থের 'অক্ষরই মূল ঘটনা' থেকে সরে গিয়েও একটি অসামান্য শিল্প আমাদের হাতে তুলে দেন। চলচ্চিত্রেও তাই দেখি নষ্টনীড়কে ঈষৎ বদলে জন্ম নেয় চারুলতা, অথবা একেবারে হালের জনঅরণ্য।

শম্ভুবাবুই তো প্রথম ভারতীয় নিজস্ব থিয়েটারের কথা বলেছিলেন, এবং তিনিই প্রথম স্বীকার করেছিলেন শিশির ভাদুড়ীর চিন্তার কাছে (দিগ্বিজয় নাট্য প্রযোজনা) তিনি ভারতীয় থিয়েটারের ভাবনা ও ন্যাশনাল থিয়েটারের চিন্তার অনুপ্রেরণার জন্যে ঋণী। এই সবের মূল সূত্রটুকু তিনি তাঁর কাছ থেকেই শোনেন। শ্রীপ্রধান এই নিয়ে মাত্র একটা লেখাও কি শম্ভু মিত্রের সম্বন্ধে লিখতে পারলেন না? নাকি এই সব তাঁর কাছে অত্যন্ত বাজে ব্যাপার? শম্ভু বাবুর এত বছরের কাজের মধ্যে একটুখানিও ভাল কিছু দেখতে পেলেন না তিনি। শম্ভুবাবু যা বহুরূপী নীলদর্পণ পরে আর প্রযোজনা করলেন কি করলেন না, সেটা মোটেই বড় নয় আমাদের কাছে। কারণ তাঁর নিজস্ব চিন্তা ও কাজের মধ্যে স্পষ্ট প্রতীয়মান, সমষ্টিগতভাবে সমাজগতভাবে রাজনীতিগতভাবে আনন্দে-দুঃখে, গভীর বিষাদের বিবর্ণতায় নিজস্ব জাতীয় পরান। নাট্য সম্পর্কে, থিয়েটারের সম্পর্কে সামগ্রিক কনভেনশনের ধারণা না থাকলে কখনই এই সৃষ্টির নির্মাণ সম্ভব হত না। এইটা কি গণনাট্য নয় শ্রীপ্রধানের কাছে? না বোধহয় তিনি গণনাট্য বলতে বোঝেন চাষী শ্রমিক গুলী-বন্দুক যে নাটকে থাকবে সেইটাই।

শ্রীপ্রধান বলেছেন শম্ভুবাবু নাকি মানুষের কাছ থেকে সরে এসেছেন। কিন্তু আমাদের কাছে প্রমাণিত, শম্ভুবাবু মুক্ত

কাজের মধ্যে সঠিক প্রমাণ করেছেন সেই 'পৃথিবীকে পরিবর্তনের দায়িত্বের কথাটা।

শম্ভু মিত্রই একমাত্র ভারতীয় নাটকের মধ্যে দর্শনের বাস্তবতার গভীরের সঙ্গে গভীর জীবনানুগ শিল্পের মেলবন্ধন ঘটিয়ে পরিবর্তনের ইঙ্গিত রূপান্তর ঘটিয়েছেন এবং তা অনবদ্য। ভারতীয় সমগ্রিক থিয়েটার এবং শিল্পসত্তার গভীর স্তরে যে পরিবর্তন আজকে আমরা দেখতে শম্ভু মিত্রই তার প্রেরণা। আরও বলতে চাই, শম্ভু মিত্র বাংলা থিয়েটারকে শুধু ভারতীয় থিয়েটারকে নতুন এক সম্ভাবনার দরজায় দাঁড়িয়ে করেছেন। নতুন এক যুগের দরজা খুলে দিয়েছেন। তিনিই শিল্পের গভীর সৃষ্টি ও মানুষের জীবনের সম্পর্কে আমাদের বিভ্রান্তি আমাদের অন্তর্দৃষ্টির অনগ্রসরতা ও রাজনীতির দৃষ্টিভঙ্গির সম্পর্কে সতীকারের ভাবিয়েছেন, আজকে তাঁরা তাঁর কার্যকলাপকে নস্যাৎ করতে চাইছেন বা কিছু ভালোভাবে না বুঝে অনুকরণ করতে চাইছেন তাঁদের মানুষের জীবনের গভীর আন্তরিক সমস্যার কোন বোধ না থাকার ব্যর্থ হচ্ছেন।

এবার মন্তব্যবাবুকে জানাতে চাই তাঁর স্বেচ্ছানির্বাসনের কি প্রয়োজন? তাঁকে আমরা আমাদের মধ্যে ফিরে পেতে চাই আবার। তিনি শুনেছি পারীরিক অসুস্থ তার জন্যে আর নতুন প্রযোজনা করছেন না। মেনে নিলাম। কিন্তু আজকে যখন তাঁর নামে এবং অন্য গুণী জ্ঞানী মানুষের সম্পর্কে আমাদের মনে অশ্রদ্ধার ভাব জাগাবার জন্যে অনবরত প্রচার চালানো হচ্ছে তখনও কি করে তিনি স্তব্ধ হয়ে থাকেন? জাতীয় সংস্কৃতির সম্পর্কে এই বিকৃতিতা কি করে সহ্য করছেন তিনি? তাঁর কাছ থেকে জানতে চাই গণনাট্যের ভাঙনের মূল সত্য রহস্যটুকু। শিল্পিবাবুর সম্পর্কে সতীকারের কিছু লেখা জাতীয় থিয়েটারের এবং অভিনয়ের ও প্রযোজনার বিষয়ে কিছু লেখা।

তিনি কি আমাদের ডাকে সাড়া দেবেন?

সন্ধ্যার মুখোপাধ্যায়
হাওড়া—২

নজরুল প্রসঙ্গে

নজরুলের বাইশ বছরের কর্মসচিব নজরুল কথা গ্রন্থের লেখক ব্রহ্মকুমার শান্তিপদ সিংহ মহাশয়ের প্রতিবাদপত্রটি (অমৃত, ২৭ ফেব্রুয়ারী) পড়া গেল। শ্রীসিংহ মাননীয় শান্তিলতা চট্টোপাধ্যায় বর্ণিত তথ্যকেই শুধু ভুল বলেন নি বাবা বাবা সাহিত্যিক এমন কি নজরুলীকান্ত দাস এবং অচিন্ত্য সেনগুপ্তকেও ভুল তথ্য পরিবেশনের অপরাধে টেনে এনেছেন। এছাড়া কিছু কিছু বিদ্রূপাত্মক ইঙ্গিতও তিনি করেছেন। বাংলা সাহিত্যের একজন অনুরাগী পাঠক ও লেখক হিসেবে এবিষয়ে আমারও কিছু নিবেদন আছে।

ভুল তথ্য পরিবেশিত হলে তা সংশোধন করার দায়িত্ব নিশ্চয় গৌরবের। একথা শ্রীসিংহ অবশ্যই স্বীকার করবেন। কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে: সেই সংশোধনের পদ্ধতিটি সংগতভাবেই রুচিপূর্ণ হওয়া চাই, যদি দোষ না হয়—আমার যেন মনে হোলো ভুল সংশোধন পদ্ধতি অহং-এ ভরা।

শ্রদ্ধেয়া শান্তিলতা নজরুল সম্পর্কে যে তথ্য পরিবেশন করেছেন সেটা নিশ্চয়ই তাঁর কল্পনা নয়। সে তথ্য সংগ্রহীত সেকথা তাঁকে দোষ দেবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। বহু বছর ধরে আমার কেবলই মনে হয়েছে শ্রীচট্টোপাধ্যায় সাহিত্যের শান্তিনিকেতন বিভাগটিতে যা কাজ করেছেন তা অসাধারণ এবং প্রশ্নাতীত বলিষ্ঠভাজন। যুগ অতিক্রম করে এর মূল্যায়ন অবশ্যই অবশ্যই হবে। তবে তাঁর এই কাজগুলোতে কিছু ত্রুটি কিছু থেকে থাকে তবে তা সংশোধিত হওয়াও একান্তই প্রয়োজন।

শান্তিপদবাবু জানিয়েছেন— এক একটা যুগে এসেছে বড় বড় লেখকের জীবনী লেখবার। মন্তব্যটির মধ্যে কোন প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ আছে বলে আমি মনে করি না। তবে এটুকু বলা বোধহয় ভুল নয় যে, বড় বড় লেখকের জীবনী লেখা নিশ্চয় আগ্রহীদের কাজ এবং তিনি নিশ্চয়ই তা করেছেন 'নজরুল তথ্য'। তা ছাড়া শুধু এখনই কি সে যুগে এসেছে এর আগে কি লেখা হয় নি?

শ্রীসিংহ লিখেছেন—স্মৃতি অনেক সময় বিভ্রান্ত করে প্রতারণাও করে। ভালো কথা। কিন্তু তার পরেই তিনি জানিয়েছেন —কিন্তু এক্ষি তাই: এগুলো কি ইচ্ছাকৃত ভাবে বানানো উপরে বা চাপানো নয়। এ দুটো মন্তব্যের মধ্যে কেমন যেন সাম, রসাহীনতার পরিচয় ফুটে ওঠে। কিংবা কতটা ব্যক্তিগত আক্রোশ ও অভিমান।

নজরুল সম্বন্ধে সঠিক তথ্যের একমাত্র অধিকারী তিনিই এবং বড় বড় বাবা বাবা সাহিত্যিক এমন কি নজরুলীকান্ত দাস, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত সকলেই দ্বিতীয়তীয় তথ্য হলে ধরেছেন, এটা বিশ্বাস করতে কিছুটা কষ্ট হওয়া স্বাভাবিক বলে মনে হয়। আমার প্রশ্ন: সকলেই যদি ভুল তথ্য পরিবেশন করে থাকেন তবে নজরুল সম্বন্ধে সঠিক তথ্যের অধিকারী আর কারা ছিলেন, যাঁদের জীবিত অবস্থায় শ্রীসিংহ এই প্রতিবাদ করলেন না কেন? তাঁদের অনুপস্থিতিতে যদি পরিবেশিত তথ্যই যে ঠিক তথ্য-ই বা কি করে আছে? আমার একান্ত বিশ্বাস উপযুক্ত তথ্য পরিবেশনের যাঁরা অধিকারী ছিলেন তাঁদের জীবিত অবস্থায় যদি প্রতিবাদ করা হোতো তবে নজরুলীকান্ত দাস, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত প্রভৃতির মত সাহিত্যিকের অনেকেই না জেনে নানান ভুল লিখতেন না কিংবা ঐ ভুলের প্রশ্রয়ই দিতেন না। অবশ্যই স্বীকার করে নেবার মত সহৃদয়তা নিশ্চয় তাঁদের ছিল।

শ্রদ্ধেয়া শান্তিলতা চট্টোপাধ্যায় যে তথ্যকে স্বীকার করার জন্যে বাধ্য তাঁর [illegible] অনুযায়ী শ্রীসিংহের প্রতিবাদ চিঠি ও অন্যান্য বক্তব্যটির পুনরাবৃত্তি হওয়া।

শ্রদ্ধেয়া লেখিকার সঙ্গে আমার অবশ্য পরিচয় নেই তিনি আমার অশ্রদ্ধেয়াও। তাঁর সঙ্গে কখনো দেখা হয়েছে বলেও মনে পড়ে না। তবে তাঁকে স্বীকার করার মত যথেষ্ট কারণ আছে। ঐ বিষয়ে তাঁর ঠিক কিনা।

শ্রীসিংহ অনাবশ্যক অপরাধ নিজের ঘাড়ে টেনে নিয়েছেন তাঁর কাছে আমার বিনীত জিজ্ঞাসা: নজরুল সংক্রান্ত অন্য কোন কবি-সাহিত্যিকের জীবনী 'কল্লোল-কালিকলম' আমাদের গল্প প্রবন্ধ তা অতিপ্রত্যক্ষ বা কল্লোল যুগের নজরুলীকান্ত দাস 'কল্লোল যুগ' লিখেছেন সাহিত্যিক সম্পাদক এবং অন্যান্য তাঁর সাহিত্যের আলোচনা করতে চেয়েছেন কি?

সত্য সিংহ
কলিকাতা-৪২

পাড় থেকে বলছি

শখের ক্রিকেট

পেশা ছেড়ে শখের নেশায় জড়িয়ে পড়ার মজাটি যে কি তা টের পেয়েছেন কলকাতার ক্রীড়া সাংবাদিকেরা। পেশা কলম ধরা। অপরের খেলা দেখে তার মূল্যায়নে হাত দেওয়া। বিশ্লেষণ, সমালোচনা করা। ভালকে ভাল বলা। আর ত্রুটি-বিচ্যুতি নজরে পড়লেই কুণ্ঠার লেখনীতে তৎক্ষণাৎ শান দেওয়া।

এ হেন পেশা বাঁধন কাঁদের হাতে কলম ছেড়ে ব্যাট-বল হাতে নিয়ে মাঠে নেমে পড়ার নেশায় পেয়ে বসেছিল। এই নেশার কিছুদিন কাটতে না কাটতে জনা কয়েক সাংবাদিক বা হয়ত কাগজে কিকেট খেলোয়াড় নাম মাঠে ছোটাছুটি করতে গিয়ে সার্টিফিকেটার ছিঁড়ে ফেললেন। পা পিছলে ব্যাটে পড়াগড়ি দেওয়ায় কারুর বা হাত পায়ের নরম গানড়া গেল কেটে। অনভ্যাসের ফোঁটা কপালে চড়চড় করলো। খেলতে নেমে ওঁরা অনেকে হাঁফিয়েই উঠলেন। খেলার চেয়ে মজাই হলো বেশি। আর সেই অভিজ্ঞতার সূত্রে ক্রীড়া সাংবাদিকরা হাড়ে হাড়ে মালুম পেলেন যে খেলার চেয়ে কলম চালানো অনেক সহজ। যেহেতু অঙ্গ চালনে শারীরিক সঞ্চালনের দরকার পড়ে। আর সে সঞ্চালন না থাকলেও কিন্তু মনের সুখে কলম ছোটানো যায়।

মাঠে নেমে সুবিধে করতে না পারলেও যে সব খেলোয়াড় সাংবাদিকদের সমালোচনার পাত্র পরিণত হয়েছেন, খেলার নামে সাংবাদিকদের ক্রিয়াকলাপ দেখে তাঁরা হয়তো মুখ টিপে হেসেছেন: তবে চেষ্টা ছাড়েননি। গায়ে না মেখেই সাংবাদিকরা কিন্তু তাঁদের নিজস্ব ক্রিকেট দলও তৈরি করে ফেলেন একটানা [illegible]

'অকাল আমার আজ জয়ন্ত বসু ক্রীড়া সাংবাদিকতার ক্ষীণ। যে আসরে প্রতিযোগী ছিলেন দিল্লী, বোম্বাই ও পশ্চিমবঙ্গের ক্রীড়া সাংবাদিকেরা। এই প্রতিযোগিতায় খেলার মান যে যতটুকুই পৌঁছে থাকুক না কেন দিল্লী ও বোম্বাইয়ের চ্যালেঞ্জ ডিঙিয়ে নিজের ঘরে জয়ন্ত বসু স্মৃতি ট্রফিটি তুলে রাখার সাধনা লাভ করেছে পশ্চিম বাংলার ক্রীড়া সাংবাদিকেরা। তবে সাংবাদিকদের ক্রীড়ামূল্যে প্রতিযোগিতার মেজাজ ছিল সম্পূর্ণই গৌণ ভূমিকায়। অনুষ্ঠানের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল এই সূত্রে পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়া। অন্যদের মন জানা। পারস্পরিক সমস্যার সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটানো। এবং সেই সঙ্গে পরলোকগত এক সহযোগীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানানো।

পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে এক দীর্ঘতম অথচ অর্থবহ ভাষণ দেবার সময় এই অনুষ্ঠানের তাৎপর্য। ব্যাখ্যা করে বলেন যে খেলাধুলোর উদ্দেশ্যই হলো পরস্পরের সঙ্গে সৌহার্দ্য, সম্প্রীতির বন্ধনকে নিবিড় করে তোলা। প্রীতি, শুভেচ্ছা বিনিময় করা। একটি ট্রফিকে সামনে রেখে দিল্লী বোম্বাই ও পশ্চিম বাংলার ক্রীড়া সাংবাদিকেরা খেলাধুলোর সেই অন্তর্গত শিক্ষাকেই বাস্তবায়িত করতে চেয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর বিশ্বাস, আদর্শের টানেই অদূরভবিষ্যতে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের পেশাদার সাংবাদিকেরা এই আসরে এসে অন্যান্যদের সঙ্গে মিলিত হবেন।

হাল্কা সুরে কথা বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান যে, ছাত্রজীবনে তিনিও ছিলেন সখের ক্রীড়া সাংবাদিক। সেকালের এক ক্রীড়া সাপ্তাহিকের প্রতিনিধি হিসেবে তিনিও একদা কলকাতার মাঠে ক্রিকেট খেলেছেন। সেই সাপ্তাহিক প্রকাশনের দায়ত্ব ছিল শ্রীজ্যোতিন বসুর ওপর। জ্যোতিবাবু আজ অন্য জগতের মানুষ তবুও এতোকাল পরেও ক্রীড়া সাংবাদিকতার কথা ভুলতে পারেন নি। তাই জয়ন্ত বসুর স্মৃতি রক্ষার প্রস্তাব শুনে তিনি স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসে একটি সুদৃশ্য ট্রফি অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের হাতে তুলে দেন।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় নিজেও একদিন সাংবাদিকদের সঙ্গে খেলেন। নিজের দল পরিচালনা করে রাইটার্স ক্রীড়া সাংবাদিক দলকে শোচনীয়ভাবে হারান। মুখ্যমন্ত্রীর দলের এই জয় ছিল একান্তই প্রত্যাশিত। কেননা পশ্চিম বাংলার একেবারে সামনের সারির আধ ডজন খেলোয়াড় নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর দল ভারী করা হয়েছিল। তাঁদের সঙ্গে খেলায়, কলমধরা বাঁদের পেশা তাঁরা পেরে উঠবেন কেন। প্রদর্শনী খেলা। উপলক্ষ্য তরফ সামান্যই। তবুও কাজের মানুষ মুখ্যমন্ত্রী প্রায় সারাটি দিন ইডেনে কাটিয়ে দিয়ে যাবার সময় স্বগতোক্তিতে জানান 'এমন কটা দিন আমার জীবনে যদি বারে বারে ফিরে আসতো। কিন্তু তা তো হবার নয়।'

সাংবাদিক জয়ন্ত বসু স্মৃতি ট্রফি

কোলকাতার ক্রীড়া সাংবাদিকরা মুখ্য মন্ত্রীর কাছ থেকে একখানি নতু ব্যাটও উপহার পেয়েছেন—মুখ্যমন্ত্রী এবং বাছাই সাংবাদিক দলের স খেলোয়াড় স্বাক্ষরিত সেই ব্যাট এ দুর্মূল্য স্মারক। সাংবাদিকরা চেয়ে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর হাতের ব্যাটটিকে স্মার হিসেবে হাতিয়ে নিতে। ক্রীড়ামন্ত্র শ্রীপ্রফুল্লকান্তি ঘোষেরও সমর্থন ছি সাংবাদিকদের আবেদনে, কিন্তু মুখ্যমন্ত্ কিছুতেই নিজের হাত-ব্যাটটি হাতছাড় করেন নি। ওই ব্যাটে তিনি সেদিন ইডে অপরাজিত ত্রিশ রান করেছিলেন। 'সা ব্যাট, কাউ ছাড়া করেনই বা কি করে বিকেলে তখনই দোকান থেকে আর একা আনকোরা ব্যাট আনিয়ে ক্রীড়ামন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী সেটি কলকাতার ক্রীড় সাংবাদিকদের উপহার দেন।

ত্রিদলীয় ক্রিকেট জয়ন্ত বসু ট্রফি খেলতে দিল্লী-বোম্বাই থেকে জনাতি ক্রীড়া সাংবাদিক কলকাতায় এসেছিলেন তাদের সুখ-স্বচ্ছন্দ্য বিধানে পশ্চিম বাংলা ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাব রাজ্য সরকার সি ব খিদিরপুর ক্লাব বেঙ্গল টেনিস ক্লাব ও লন টেনিস এসোসিয়েশন অফ ইণ্ডিয়া এবং আরও কয়ে জন বিশিষ্ট ক্রীড়ানোদী প্রত্যক্ষ সহযো সহযোগিতা পেয়েছেন। সকলের সম্মিলি চেষ্টায় আন্তর্জাতিক কলকাতায় অনুষ্ঠা

সুখকর হস্তান্তর বলেই মনে করা যায়। কারণ দিল্লীর আর শ্রীমান ও বোম্বাইয়ের এ টি পি পার্থসারথী কলকাতা ছাড়ার আগে বলেছেন 'এর চেয়ে উন্নততর ব্যবস্থা আর কিছু হতে পারে বলে মনে করি না।' এই প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় অনুষ্ঠান হবে আগামী বছর বোম্বাইয়ে।

জয়ন্ত বসু টেনিসে প্রথম বছর যাঁরা ঈডেনে খেলেছেন তাঁদের প্রায় সকলেই বর্ষীয়ান। চল্লিশ-পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছরের বেশ কজনকে এই উপলক্ষে মাঠে নেমে ছোটা-ছুটি করতে দেখা গেছে। এঁদের যাঁরা খেলোয়াড় এমন কজনও এঁদের দলে অবশ্য ছিলেন। তবে তাঁদের কাছে ক্রিকেট এখন নিছকই স্মৃতি থেকে খেলার মতই বিষয়। তবু অনভ্যাস ও শারীরিক অসুবিধে সত্ত্বেও কেউ কেউ যে স্যাট-বল সম্পর্কে মুন্সী-য়ানার পরিচয় রেখেছেন সেকথাও স্মরণযোগ্য—যথা পশ্চিম বাংলার শ্যামসুন্দর ঘোষ (দুটি ম্যাচ আটটি উইকেট ও একটি হ্যাটট্রিক) দিল্লীর নিগম (একটি ইনিংসে ৮৫ নট আউট) ও ওয়াণ্ডরানী (এক ইনিংসে ৪২) পশ্চিম বাংলার অলক দাস-গুপ্ত (এক ইনিংসে ৬৫) বোম্বাইয়ের পি বিজয়কর. (দুটি ম্যাচে ছটি উইকেট) প্রমুখেরা।

যে ক্রীড়া সাংবাদিকের স্মৃতি-তর্পণের সঙ্কল্প তাঁর সতীর্থরা নিজেদের ক্রিকেটের সামনে রেখে এবার উদ্যোগ এসে মিলিত হয়েছিলেন সেই জয়ন্তকুমার বসুর সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। এ পরিচয়ের প্রয়োজন আছে। যেহেতু সাংবাদিকেরা হলেন নেপথ্যের মানুষ। তাঁরা লেখনীমুখে খেলাধুলোর ধারাভাষ্য আঁকেন। খেলোয়াড়দের উপস্থাপিত করেন জন-সাধারণের সামনে। কিন্তু নিজেদের পরিচয় রাখেন পর্দার অন্তরালেই।

জয়ন্ত ছিলেন আরও অন্তঃপুরচারী। দিল্লী-প্রবাসী সাংবাদিক, প্রেস ট্রাস্ট অব ইণ্ডিয়ার এক নিষ্ঠাবান কর্মী। হঠাৎ দেখলে মনে হোত সাধারণ মানুষ। তবে গভীরতর দৃষ্টির কষ্টিপাথরে যাচাই করলে জয়ন্তের চরিত্রের অসাধারণ গুণা-বলীর ঠিকানা বেশ জানা। মানুষ হিসেবে নিরভিমানী। বিনয়। বন্ধুরূপে সদালাপী সহযোগিতায় আন্তরিক। এবং কর্মী হিসেবে বিলক্ষণ পরিশ্রমী ও মুক্ত মনের অধিকারী।

এমন ভদ্র মিতবাক চরিত্র এই কালে নিতান্তই দুর্লভ। একালের স্বভাব বড়ই উগ্র। অস্বাস্থ্যের ফেনাপিল তার গায়ে। সাজসজ্জা কিম্ভূতকিমাকার। মনে ফচকেমি। স্বভাবে গভীরতার অভাব। চলনবলনে পুরোদস্তুর ওপরচালাকীর ভাব। অতীতের বাতাসের এই ফলন্তরা সোনালী সাংবাদিক-দের স্পর্শ করে নি তা নয়। তবে যাদের তা ছুঁয়েছে কখনও প্রবোধই তাঁদের বশে ছিলেন না। পরিভ্রমণ এই পরিবর্তনেই। অথচ তিনি ছিলেন যেন বাসন্তপক্ষ। ঠিক যেন হাঁসের মত সাঁতার কাটা। লেখাই যার কর্তব্য ও অবগাহন কলম কিন্তু তার অল্প-প্রত্যঙ্গকে ভিজিয়ে দিতে পারে না। স্বভাবে বিচিত্র কালের চরিত্রের সঙ্গে জয়ন্তের বৈসাদৃশ্য ছিল বলেই বোধহয় বৈপরিত্যের টানে অনেকেও তাঁর কাছাকাছি গিয়ে নিবিড় হয়ে পড়তেন।

দিল্লী-প্রবাসী জয়ন্তের সঙ্গে কালে-ভদ্রে দেখা হোত। তা হোক কিন্তু তাঁর প্রীতির টানে আমরা সবাই তাঁর আপনজন হয়ে গিয়েছিলাম। বড় খেলা কভার করতে তিনি আসতেন কলকাতায় আমরাও যেতাম দিল্লীতে। দেখা-সাক্ষাৎ সেই সূত্রে। কল-কাতায় দিল্লীতে অথবা অন্য কোথায়ও! কাজের ফাঁকে মেলামেশার মেয়াদও সংক্ষিপ্ত। তবুও সেই সংক্ষিপ্ত অন্তরঙ্গতার স্মৃতি আজ অবিস্মরণীয় হয়ে আছে।

স্মৃতির ফ্রেমে আঁটা দু-একটি ছবি তুলে ধরছি। মনে হয় মানুষটিকে বোঝাতে হয়ত এই সব কাহিনী অর্থবহ হয়ে উঠবে।

এশীয় ক্রীড়া উপলক্ষে সেবার আমি আর জয়ন্ত বিভিন্নের এক সহরে আছি। পাশাপাশি রয়েছি বটে তবে আলাদা আলাদা হোটেলে। এক হোটেলের একটি ঘরে আমি একা। আর অন্য হোটেলের আর এক কক্ষে এক ভারতীয়ের সঙ্গে জয়ন্ত নিজে। জয়ন্তের সাথীসঙ্গী ওই ভারতীয় ছিলেন কিশিৎ আমুদে। কাজ সেরে রাতে ঘরে ফিরে তিনি নিজের জগতে ডুবে থাকতেন। ওই মুহূর্তে তাঁর আবার গল্প-গল্প করা চাই-ই। অতীত রাতে গল্প বলার সঙ্গী হিসেবে হাতের কাছে কাউকে না পেয়ে তিনি প্রতি রাতেই জয়ন্তকে জাগিয়ে রাখতেন।

দিনভোর হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর পর আর গভীর রাত পর্যন্ত গালগল্পে মেতে থাকা জয়ন্তের স্বভাব নয়। ধাতে সইছিল না। তাই একদিন কাঁচা ঘুমে আমার কাজে কাজে বলে ফেললেন 'কি ভাই বলুন তো? রুমমেটের সাইজ ইজ মাইন ইজার পছন্দে পড়েছে আমি যে শেষ হয়ে যাবার দাখিল।'

আমি যদি ভুল আসনে না আমার হোটেলে। ভাবল বেডের আবাসনা তো খালিই পড়ে রয়েছে।

মনে হল প্রস্তাবটি জয়ন্তের পছন্দ হয়েছে। তবু তাঁর আসা হল না। নিজের হোটেল থেকে পালিয়ে আসার কথা তিনি সাথীসঙ্গীকে মুখ ফুটে বলতেই পারলেন না। সভ্যতার বাণী কখনও মুখ ফোটেই হোটেলের সেই ঘরেই থেকে রাত-ভাগা সাথীটির সব অত্যাচারই সয়ে গেলেন।

এমনই ছিলেন জয়ন্ত। নিজের যাই হোক না কেন অপ্রিয় সত্যটুকু উচ্চারণ তাঁর কাছে ছিল অধর্ম করারই সামিল।

সেবারে আর একদিন গোঁড় সকালে দেখতে পাচ্ছিলাম এক স্টেডিয়াম। সহর থেকে মাইল বিশেক দূরে। তাই ছিল ভারতীয় প্রতিযোগী হাওয়া সিংয়ের থাকা খাওয়া সিং তাঁর প্রতিযোগিতার খতম করে দেবার পর দেখি সে আবাসের ব্যবস্থাটাও খতম হয়ে যাওয়ার মুখে। স্টেডিয়ামের হলের বাইরে থাকবার মত কিছুই নেই। সবই চাওয়া। কপর্দকের মুখ উবে গেছে। অসহায় সাংবাদিকরা যে যে কোথায় পড়ে রইলেন কে জানে। শুধু এইটুকুই জানি সে সন্ধ্যেবেলা এক ট্রাইডার সেবারেই বিদেশী বলে করুণার চোখে আমাকে পথ থেকে তুলে নিয়ে হোটেলে পৌঁছে দিয়েছিলেন।

হোটেলে ফিরলাম যখন তখন রাত ভোর হয়ে এসেছে। ঘুমের ভাটা সারা গায়টেস করে। বিছানায় এলাতে যাবো এমন সময় টেলিফোনের ঝনঝনানি। রিসিভার কানে লাগাতেই শুনি জয়ন্তের উৎকণ্ঠিত স্বর 'ঠিকমত ফিরতে পেরেছেন তো? আমি ভাবছি কি আবার কাণ্ডজ্ঞান হলো বেচারী! আমার ভাবনায় তখনও দু চোখের পাতা এক করতে পারে নি। অথচ সাতটা না বাজতে বাজতেই ওকে আবার স্টেডিয়ামে ছুটতে হবে।

বিউটিফুলেও জয়ন্তের চোখে-মুখে এই উৎকণ্ঠার ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠতে দেখেছি। নানা কারণে ওলিম্পিকের সোভার দিকে আমি প্রেস হাউসে জায়গা পাচ্ছিলাম না। জয়ন্ত আমার হয়ে ওকালতী করতে সর্বত্র চষে বেড়ালেন। পুরো একটা দিন ঘোরা-ঘুরিতেই কাটলো। তারপর বাস্তুহীন আমার থাকবার ব্যবস্থা সেদিনের মত উনিই করে দিলেন নিজের ডিনারের অর্ধাসনে আমার চেয়ারটি সাজিয়ে দিয়ে।

ইতস্তত বিক্ষিপ্ত সংক্ষিপ্ত স্মৃতি-টুকরো সব। কতই বা বলব। বলতে গিয়ে আজ কেবলই গলার কাছে আবেগের ডেলাটা জমাই যে শক্ত হয়ে উঠছে। থাক আর বলার দরকার নেই। বরং এই উপলব্ধিই সাক্ষ্য হয়ে থাক যে জয়ন্ত বিয়োগে আমাদের দেশের ক্রীড়া সাংবাদিককুলের এক গোষ্ঠী নষ্ট হয়ে গেছে। যে বাগানে ফুল ফোটে কদাচিৎ সেখানে একটি ফুটন্ত ফুলের পাপড়ি অকালেই ঝরে পড়ে গেল।

বড়ই অকালে। মাত্র ছেচল্লিশ বছর বয়সেই সব শেষ। নিয়তি নিষ্ঠুর। বিধি-লিপি কি নির্মম।

অজয় বসু

খেলাধুলা

শর্মক

ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ

প্রথম টেস্ট ক্রিকেট

ব্রিজটাউনের কেনসিংটন ওভাল মাঠে ১৯৭৬ সালের টেস্ট সিরিজের প্রথম টেস্ট খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এক ইনিংস ও ৯৭ রানে ভারতকে হারিয়ে ১—০ খেলায় এগিয়ে গেছে। পাঁচদিনের বরাদ্দ এই টেস্ট খেলাটি তৃতীয় দিনে খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ের ১৫ মিনিট আগে শেষ হয়ে যায়। ফলে দুদিনের পুরো খেলা মাঠে মারা যায়। এখানে উল্লেখ্য, ভারতের বিপক্ষে টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এই নিয়ে ৭ বার এক ইনিংসের ব্যবধানে জয়ী হল—ভারতের মাটিতে ৩বার এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজ মাঠে ৪বার (এর মধ্যে ব্রিজটাউনে ২বার)।

ভারত টসে জিতে প্রথম ব্যাট করতে নামে। প্রথম দিনেই চা-পানের সময় ভারতের প্রথম ইনিংস ১৭৭ রানের মাথায় শেষ হয়। লাঞ্চের সময় ভারতের রান ছিল ৪ উইকেটে পড়ে মাত্র ৭৯। প্রথম দিনে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ তাদের প্রথম ইনিংসের একটি উইকেট খুইয়ে ৯৭ রান সংগ্রহ করেছিল।

দ্বিতীয় দিনে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রথম ইনিংসের রান দাঁড়ায় ৪০১ (৫ উইকেটে)। ফলে ভারতের প্রথম ইনিংসের ১৭৭ রানের থেকে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ২৬২ রানে এগিয়ে যায়। তাদের হাতে প্রথম ইনিংসের আরও ৫টা উইকেট জমা থাকে। কলের অধিনায়ক ক্লাইভ লয়েড ৭৩ রান করে অপরাজিত থাকেন। দ্বিতীয় দিনের লাঞ্চের সময় ওয়েস্ট ইণ্ডিজের রান ছিল ১১৫ (২ উইকেটে)। খেলার তখন রিচার্ডস ৬৪ এবং কালিচরণ ৩৮ রান করে অপরাজিত ছিলেন। কালিচরণ দলের ৩২৮ রানের মাথায় নিজস্ব ১০ রান করে আউট হন। তৃতীয় উইকেটের জুটিতে কালিচরণ (১০ রান) এবং রিচার্ডস দলের ২২০ রান সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন। এখানে উল্লেখ্য, ভারতের বিপক্ষে টেস্ট খেলায় এই ২২০ রান ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে তৃতীয় উইকেট জুটির রেকর্ড রানে পরিণত হয়। এবিষয়ে পূর্বের রেকর্ড ছিল ১১৭ রান (ওরেল এবং উইকস, কিংস্টনের ৫ম টেস্ট, ১৯৫৩-৫৪)। ডিভিয়ান রিচার্ডস ১৪২ রান করে আউট হন। তিনি তাঁর এই ১৪২ রানে ১৯টা বাউণ্ডারী এবং একটা ওভার-বাউণ্ডারী করেছিলেন। টেস্ট ক্রিকেটে রিচার্ডসের এটা ৩য় সেঞ্চুরী, তথা ভারতের বিপক্ষে দ্বিতীয়।

তৃতীয় দিনে ৫০ মিনিট খেলার পর ওয়েস্ট ইণ্ডিজ তাদের প্রথম ইনিংসের ৪৮৮ রানের মাথায় (১ উইকেটে) খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। এইদিন ওয়েস্ট ইণ্ডিজ পঞ্চাশ মিনিটের খেলায় চারটে উইকেট খুইয়ে পূর্বদিনের ৪০১ রানের (৫ উইকেটে) সঙ্গে মাত্র ৬৯ রান যোগ করেছিল। দ্রুতগতিতে রান সংগ্রহ করতে গিয়ে তাদের সন্তার উইকেট হারাতে হয়েছিল।

অধিনায়ক ক্লাইভ লয়েড ১০২ রান করে আউট হন। ১৭২ মিনিট খেলে তিনি ১১টা বাউণ্ডারী এবং ২টো ওভার-বাউণ্ডারী করেন। তিনি ৫০তম টেস্ট ম্যাচ খেলে ১০টা সেঞ্চুরী করলেন—ভারতের বিপক্ষে এটা তাঁর তৃতীয় সেঞ্চুরী।

প্রথম ইনিংসের খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজের থেকে ৩১১ রানের পিছনে পড়ে ভারত দ্বিতীয় ইনিংসে খেলতে নামে। চা-পানের সময় ভারতের দ্বিতীয় ইনিংসের রান দাঁড়ায় ২০১ (৪ উইকেটে)। এই সময় বিশ্বনাথ ৫১ এবং গাইকোয়াড় অমরনাথ ১ রানে অপরাজিত ছিলেন। তৃতীয় দিনের খেলা ভাঙ্গার নির্ধারিত সময়ের দশ মিনিট আগে ভারতের দ্বিতীয় ইনিংস ২১৪ রানের মাথায় শেষ হলে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এক ইনিংসে ও ১৭ রানে জিতে যায়।

ব্রিজটাউনে এই নিয়ে ভারত বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মধ্যে যে ৩টো টেস্ট খেলা হল তার ফলাফল : ওয়েস্ট ইণ্ডিজের জয় ৩ এবং খেলা ড্র ১। এখানে উল্লেখ্য ওয়েস্ট ইণ্ডিজের টেস্ট ক্রিকেট আসরে ভারত এই নিয়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের কাছে ৭বার হার স্বীকার করলো।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ভারত : ১৭৭ রান (গাভাস্কার ৩৭ এবং মদনলাল ৪৫ রান। রবার্টস ৪৮ রানে ২ হোল্ডিং ২৪ রানে ২ এবং হলফোর্ড ২০ রানে ৫ উইকেট)

ও ২১৪ রান (বিশ্বনাথ ৬২ এবং মদনলাল অপরাজিত ৫৫ রান। রবার্টস ৬১ রানে ৩, হোল্ডিং ২২ রানে ২, হলফোর্ড ৫২ রানে ১ এবং জুমাদিন ৫৭ রানে ৩ উইকেট)

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : ৪৮৮ রান (১ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। [illegible] ৫৪ মিনিটে ১৬২, কালিচরণ ৯০ এবং লয়েড ১০২ রান। এছ অমরনাথ ৫৩ রানে ২, বেদী ১১০ রানে ০ এবং চন্দ্রশেখর ১৬০ রানে ৪ উইকেট)

ভারত বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ

(স্থান : ব্রিজটাউন)

বার্বাডোজের রাজধানী ব্রিজটাউনে ভারত বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজের টেস্ট ক্রিকেট খেলার আসর প্রথম বসে ১৯৫৩ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারী। ব্রিজটাউনের এই টেস্ট খেলাটা ছিল ১৯৫৩ সালের ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরের তালিকায় দ্বিতীয় টেস্ট খেলা। ব্রিজটাউনে এপর্যন্ত অনুষ্ঠিত ভারত-ওয়েস্ট ইণ্ডিজের টেস্ট খেলার ফলাফল দাঁড়িয়েছে : খেলা ৪, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের জয় ৩ এবং খেলা ড্র ১।

বিবিধ টেস্ট রেকর্ড

ব্রিজটাউনে অনুষ্ঠিত ভারত-ওয়েস্ট ইণ্ডিজের টেস্ট ক্রিকেট খেলার উল্লেখযোগ্য রেকর্ড :

খেলার ফলাফল

১৯৫২-৫৩ : দ্বিতীয় টেস্ট : ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১৪২ রানে জয়ী

১৯৬১-৬২ : তৃতীয় টেস্ট : ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এক ইনিংস ও ৩০ রানে জয়ী

১৯৭০-৭১ : ৪র্থ টেস্ট : খেলা ড্র

১৯৭৬ : ১ম টেস্ট : ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এক ইনিংস ও ৯৭ রানে জয়ী।

এক ইনিংসে দলগত সর্বোচ্চ রান

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : ৫০১ (৫ উইকেটে ডিক্লে), ১৯৭১

ভারত : ৩৪৭ রান, ১৯৭১

এক ইনিংসে দলগত সর্বনিম্ন রান

ভারত : ১২৯ রান, ১৯৫২-৫৩

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : ২২৮ রান, ১৯৫২-৫৩

এক ইনিংসে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : ১৭৮* গারফিল্ড সোবার্স ১৯৭১

ভারত : ১৫০ দিলীপ সরদেশাই, ১৯৭১

সেঞ্চুরী

ভারত (২) :
১৫০ দিলীপ সরদেশাই, ১৯৭১
১১৭* সুনীল গাভাসকার, ১৯৭১

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ (৩) :
১৭৮* গারফিল্ড সোবার্স ১৯৭১
১৪২ ডিভিয়ান রিচার্ডস, ১৯৭৬
১০২ ক্লাইভ লয়েড, ১৯৭৬

উল্লেখযোগ্য বোলিং

৮ উইকেট (৩৮ রানে)—লান্স গিবস, ২য় ইনিংস, ১৯৬১-৬২

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ইনিংস জয়

(বিপক্ষে ভারত)

ভারতের বিপক্ষে টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এপর্যন্ত ৭বার ইনিংসের ব্যবধানে জয়ী হয়েছে—ভারতের মাটিতে ৩বার এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মাটিতে ৪ বার।

ভারতের মাটিতে জয় (৩ বার) :
১৯৪৭-৪৮ : ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের প্রথম টেস্ট এক ইনিংস ও ১১০ রানে জয়ী হয়।

১৯৫৮-৫৯ : ওয়েস্ট ইণ্ডিজ কলকাতার ৩য় টেস্টে এক ইনিংসে ও ৩০৬ রানে জয়ী হয়।

১৯৬৬-৬৭ : ওয়েস্ট ইণ্ডিজ কলকাতার ২য় টেস্টে এক ইনিংসে ও ৪৫ রানে জয়ী হয়।

১৯৭৪—৭৬ : ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দিল্লীর ২য় টেস্টে এক ইনিংসে ও ১৭ রানে জয়ী হয়।

স্বদেশের মাটিতে জয় (৩ বার) :

১৯৬১-৬২ : ওয়েস্ট ইণ্ডিজ কিংস্টনের ২য় টেস্টে এক ইনিংসে ও ১৮ রানে জয়ী হয়।

: ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ব্রিজটাউনের ৩য় টেস্টে এক ইনিংসে ও ৩০ রানে জয়ী হয়।

১৯৭৬ : ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ব্রিজটাউনের ১ম টেস্টে এক ইনিংসে ও ৯৭ রানে জয়ী হয়।

বেটন কাপ

১৯৭৬ সালের বেটন কাপ হকি প্রতিযোগিতার ফাইনালে জলন্ধরের আর্মি সার্ভিস কোর প্রথম পর্বের খেলায় ০—০ ও দ্বিতীয় পর্বের খেলায় টাইব্রেকারে ৪—২ গোলে দিল্লীর সেণ্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশকে হারিয়ে বেটন কাপ জয়ী হয়, উভয় দলেরই পক্ষে বেটন কাপের ফাইনালে এই প্রথম খেলা। ফাইনালের প্রথম পর্বের খেলাটি গোলশূন্য অবস্থায় শেষ হয়। ফাইনালের দ্বিতীয় পর্বের খেলার নির্ধারিত সময়ে কোন পক্ষই গোল দিতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত টাইভাঙ্গা পদ্ধতিতে খেলার নিষ্পত্তি হয়।

১৯৬৬ সালের বেটন কাপের ফাইনালে বাইরের এই দুটি দল খেলেছিল—জলন্ধরের কোর অব সিগনালস এবং পাঞ্জাব পুলিশ। দীর্ঘ ৯ বছর পর, ১৯৭৬ সালে, বেটন কাপের ফাইনালে আবার বাইরের দুটি দলকে খেলতে দেখা গেল।

বেটন কাপের রেকর্ড

সর্বাধিকবার বেটন কাপ জয় :

১১ বার—কালকাটা কাস্টমস

১১ বার—মোহনবাগান

উপর্যুপরি তিনবার জয় :

(১) কালকাটা কাস্টমস ২ বার (১৯০৮-১০ এবং ১৯০০-৩২)

(২) ই এন আর (১৯৪০-৪৩)

(৩) মোহনবাগান (১৯৭০-৭৫)

বেটন কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে স্থানীয় এবং বাইরের দলের সংখ্যা ছিল সমান-সমান—চারটে করে। কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে সেমি ফাইনালে উঠেছিল মাত্র একটি স্থানীয় ক্লাব (কালকাটা কাস্টমস)। ফাইনালে উঠেছিল দুটি বাইরের দল। গত তিন বছরের বেটন কাপ বিজয়ী মোহনবাগান কোয়ার্টার ফাইনালে জলন্ধরের কোর অব সিগনালসের কাছে টাইব্রেকারে ৪—৬ গোলে হেরে যাওয়াতে তাদের উপর্যুপরি চারবার বেটন কাপ জয়ের সুযোগ হাতছাড়া হয়।

কোয়ার্টার ফাইনাল

কোয়ার্টার ফাইনালের চারটি খেলার মধ্যে তিনটে খেলার জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়েছিল টাই-ব্রেকারে।

কোর অব সিগনালস (জলন্ধর) টাই-ব্রেকারে ৬—৪ গোলে গত তিন বছরের বেটন কাপ জয়ী মোহনবাগানকে পরাজিত করে। খেলার নির্ধারিত সময়ে কোন পক্ষই গোল করতে পারেনি। এমনকি অতিরিক্ত সময়ের খেলাও গোলশূন্য থেকে যায়। শেষ পর্যন্ত টাই-ব্রেকারে খেলার নিষ্পত্তি হয়, তাও দ্বিতীয়বারের টাই-ব্রেকারে। প্রথম বারের টাই-ব্রেকারে খেলার ফলাফল সমান দাঁড়ায়—দুই দলই তিনটে করে গোল করেছিল।

সেণ্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ (দিল্লী) টাই ব্রেকারে ৪—৩ গোলে কালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন দলকে পরাজিত করে।

কালকাটা কাস্টমস টাই-ব্রেকারে ৭—৬ গোলে ইস্টবেঙ্গলকে পরাজিত করে। খেলার নির্ধারিত সময়ে খেলার ফলাফল সমান ছিল, দুই পক্ষই দুটো করে গোল করেছিল। অতিরিক্ত সময়ের খেলায় কোন গোল হয়নি।

আর্মি সার্ভিস কোর (জলন্ধর) ২—১ গোলে ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্সকে পরাজিত করেছিল।

সেমি-ফাইনাল

সেণ্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ (দিল্লী) ১—০ ও ২—১ গোলে জলন্ধরের কোর অব সিগনালসকে পরাজিত করে।

আর্মি সার্ভিস কোর (জলন্ধর) ০—০ ও ৫—১ গোলে কালকাটা কাস্টমসকে পরাজিত করে।

অল ইংল্যাণ্ড ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতা

ইংল্যাণ্ডের উইম্বলেতে আগামী মার্চ ২৪ থেকে অল ইংল্যাণ্ড ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতার আসর বসছে। আন্তর্জাতিক ব্যাডমিণ্টন খেলার আসরে এই অল ইংল্যাণ্ড ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতার যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। সারা পৃথিবীর খ্যাতনামা ব্যাডমিণ্টন খেলোয়াড়রা এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে থাকেন। সেই কারণে আজ দীর্ঘকাল ধরে এই অল ইংল্যাণ্ড ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতা বে-সরকারীভাবে বিশ্ব ব্যাডমিণ্টন খেলার আসর হিসাবে স্বীকৃতিলাভ করে আসছে।

১৯৭৬ সালের প্রতিযোগিতায় যাঁরা অংশগ্রহণ করবেন বলে নাম দিয়েছেন তাঁদের খেলার যোগ্যতা বিচার করে বাছাই তালিকা তৈরী হয়েছে। পুরুষ বিভাগের সিঙ্গলসের বাছাই তালিকায় উপর্যুপরি সাতবারের সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ান রুডি হার্তোনো (ইন্দোনেশিয়া) এবং এস জনসন (সুইডেন) যৌথভাবে প্রথম স্থান লাভ করেছেন। এই দুজনের পর পুরুষদের সিঙ্গলসের বাছাই তালিকায় পর্যায়ক্রমে স্থান পেয়েছেন—রিভেন সুই কিং (ইন্দোনেশিয়া), ফ্লেমিং ডেলফল (ডেনমার্ক), স্টেন পিপ্র (ডেনমার্ক), জুন জুন (ইন্দোনেশিয়া) এবং ইংল্যাণ্ডের রে স্টিফেন্স এবং পল হোয়েটনল। পুরুষদের ডাবলসের বাছাই তালিকায় শীর্ষস্থান পেয়েছেন গত বছরের চ্যাম্পিয়ান জুন জুন এবং ওয়াহুড (ইন্দোনেশিয়া)। মেয়েদের বিভাগে সিঙ্গলসে গত দু বছরের রানার-আপ মিসেস গিলক্স (ইংল্যাণ্ড) এবং তাতী সুমীরা (ইন্দোনেশিয়া) যৌথভাবে প্রথম স্থান লাভ করেছেন। মেয়েদের ডাবলসে শীর্ষস্থান পেয়েছেন মিসেস গিলক্স এবং সুই হোয়েটনল (ইংল্যাণ্ড)। মিকসড ডাবলসে প্রথম স্থান পেয়েছেন মিসেস গিলক্স এবং ডেরেক টালবোট (ইংল্যাণ্ড)।

ইণ্টারন্যাশনাল ব্যাডমিণ্টন ফেডারেশন চীনের সদস্যপদের আবেদন অগ্রাহ্য করায় জাপানসহ এশিয়ার কয়েকটি দেশ এ-বছরের অল ইংল্যাণ্ড ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতার আসর বর্জন করেছে। ফলে গত দু বছরের মেয়েদের সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ান হীরো জুকি (জাপান) এবং মেয়েদের গত বছরের ডাবলস চ্যাম্পিয়ান তাকেনাকা এবং মাচিকো (জাপান) এবছর খেলছেন না।

ইন্দোনেশিয়ার রুডি হার্তোনো উপর্যুপরি ৭ বার (১৯৬৮-৭৪) পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব জয়ের পর গত বছরের ফাইনালে ডেনমার্কের স্টেন পিপ্র কাছে হেরে যান।

প্রকাশিত হলো! প্রকাশিত হলো!

সম্রাট পেলে ২·৫০

ফুটবলের প্রতীক পেলে, সারা বিশ্বের দরবারে দিয়েছে তাঁকে সম্রাটের আসন, তাই ফুটবল অনুরাগীদের কাছে বিজ্ঞাপনের ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে তার খেলার কলাকৌশল জানান দরকার হয় না।

এতে থাকছে, পেলের সম্বন্ধে বিশেষ বিশেষ গোপন তথ্য যা এর আগে কোথাও প্রকাশিত হয়নি। রঙিন প্রচ্ছদ।

রূপা পুস্তকালয় ॥ ৮ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-১২

CENTRAL LIBRARY

শ্রাদ্ধ বিষ

শ্রদ্ধেয় ভট্টাচার্য (পরিচালনা) : রবীন্দ্র সে-সব-কার। অমৃত কণ্ঠে।

সত্যমাণিক

বস্ত্রসজ্জার স্টুডিও
সেখের গ্যালারি

প নাগ প্রোডাকসন ম্যানেজারকে
ালেন—একটা স্পেশাল আলমারী
। ছবির একটা আইটাল দৃশ্য।
কটা অভিনারী কাঠের আলমারী
চীন হবে না। জমিদারের
ক। মানে যতটা পারা যায় ভাল
পচয় দিয়ে সেট সাজাতে হবে।

ডিরেকটর বললেন—ঠিক আছে।
ব্যবস্থা করছি।

ারীর সাইজ নিয়ে সমস্যা দেখা
ব কিস্তাস মেরোটকে ওর মধ্যে
ব দেবেন অতএব খেয়াল রাখা
একটি মেয়ে আলমারীর মধ্যে
। দাঁড়াতে পারে। কমপক্ষে ছফুট
া চই।

প্রীটর এক নামজাদা আর্টি-
কানে পাওয়া গেল সেই বিশেষ
। মেহগনী কাঠের সুদৃশ্য
। তিনটি স্বতন্ত্র পাল্লা। ফলে
বীর ব্যবস্থা হল্প পুরি

ুলেই ওয়ার্ডরোব—কাম-কাপড় রা
ইত্যাদি রাখবার জায়গা বলতে পারেন
বললেন—কাল, এখনই আমাদের গড়ন
সৃষ্টি করব। ছবিদা মেরোটিকে পাঁচ
তোলা করে নিয়ে এসে পাল্লা খুলে তা
মধ্যে ঢোকান করে দিয়ে দুটি বন্ধ ক
দেখেন—ঠিক এইটুকু তো বাড়াবে।

এদিকে এই বাড়তিটুকু আনতে ক
সে এতদিন ধরে একটা বড় ছবিতে অভিনয়
করার সুযোগ পেয়েছে। তাই তার ম
ছিল সকলকে ইমপ্রেস করা। মনটু
ঢেলে অভিনয় করতে সবসময় তার ইচ্ছা
সে নিশ্চয়ই সকলকে মুগ্ধ করতে সমর্থ
হবে। পরিচালক কুশী হবেন। আর তাঁ
পরই যেন খুলে যাবে তার ভবিষ্যৎ
সৌভাগ্যের দরজা।

ছবি বিশ্বাস এগিয়ে গেল
পড়লেন। বিস্ফারিত নয়নে তার দিকে
তাঁর সেক্রেটারির মতোই কাজ
চেয়ে নিলেন
হয়ে গেলেন। মেরোটি

ভোলা ময়রা

উত্তমকুমার বিশ্বজিৎ পরিচালনা : পীযূষ গঙ্গোপাধ্যায়। অমৃত ফটো।

সহ কন্ট্রাক্ট পর একপাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে সব দেখছে। এটা তার স্বপ্নের জগৎ। এখানে তাকে প্রতিষ্ঠা অর্জন করতেই হবে। দর্শকের মুগ্ধ দৃষ্টি তাকে আকর্ষণ করতেই হবে। ধাপে ধাপে তাকে এগিয়ে যেতে হবে। জীবনের সফলতার সিঁড়ি বেয়ে। দিনের পর দিন সে স্টুডিওতে আসা-যাওয়া করছে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত কেউ তাকে বলবার মত তেমন কোন সুযোগ দেয়নি। ছোটখাটো পার্ট যা সে ইতিমধ্যে পেয়েছে তাতে তার মন ভরেনি। সে আরও বড় পার্ট চায়। অনেক, বড় হতে চায়। ছোটবেলা থেকেই যে সে অভিনেত্রী হবার স্বপ্ন দেখেছে।

দিলীপ নাগ তাকে বলেছেন—তুমি ভাই ভয়টা খুব হাল্কা করে নেবে। এখন তোমাকে দেখাতে হবে যে তুমি মরে গেছ। ছাদ থেকে পড়ে অ্যাকসিডেন্টে তোমার মৃত্যু হয়েছে। ছবিবাবু তোমাকে পাঁজাকোলা করে নিয়ে আসছেন—বুঝতে পারছ ব্যাপারটা?

মেয়েটি দ্বিধাগ্রস্তভাবে ঘাড় নাড়ে। তারপর গলা সাফ করার চেষ্টা করতে করতে বলে—হ্যাঁ বুঝেছি—

—ব্যাটস্ রাইট। এরপর উনি তোমাকে আলমারীর মধ্যে ঢুকিয়ে চাবি বন্ধ করে দেবেন—

মেয়েটির সবিস্ময় প্রশ্ন—কেন?

—ইয়ে, মানে যাতে পুলিশ তোমার ডেডবডির হদিস না পায়। চোর ধরলে বাড়িটা পুলিশ ঘিরে রেখেছে যে।

এতক্ষণে মেয়েটি বুঝতে পারে তাকে আলমারীতে বন্ধ করা হবে। মেয়েটি সামান্য নার্ভাস হয়ে যায়। এদিক-ওদিক তাকায়।

দিলীপ নাগ তাড়াতাড়ি তাকে ভরসা দিয়ে বলেন—না, না, ভয় পাবার কিছু নেই —মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের ব্যাপার। তোমাকে আলমারীর মধ্যে ঢুকিয়ে চাবি বন্ধ করার পর পরই আমি শট কেটে দেব। তৎক্ষণাৎ তোমাকে বের করে আনা হবে। কোন চিন্তা নেই।

এই মেয়েটি জানতোই না যে স্বয়ং চার্লি চ্যাটার্জি এই শট দিতে অস্বীকার করেছেন। আর এও সে জানতো যে এই ছবিতে সে সাবিত্রী চ্যাটার্জির 'নকল' হিসেবে পার্ট করছে।

মেয়েটির চোখে তখন জীবনে বড় হবার স্বপ্নের মায়াকাজল।

সে ভাল-মন্দ কিছুই বলল না।

ছবি বিশ্বাস আলমারীর চাবি নিজের হাতে নিলেন। তিনটি চাবি। তিনটিই একরকম দেখতে। কিন্তু যে পাল্লার চাবি সেটা ছাড়া অন্য চাবি দিয়ে সে পাল্লা খোলা যাবে না। ছবি বিশ্বাস চেষ্টা করে দেখলেন। হল না। তাই ওয়ার্ডরোবের চাবিটি তিনি স্মরণ রাখবার চেষ্টা করলেন। কারণ সমস্ত রিজল্টেনসটাই দাঁড়িয়ে রয়েছে ওই বিশেষ চাবিটির ওপর। চার পাঁচবার রিহার্সাল দেবার পর ছবি বিশ্বাস একসময় বললেন—ঠিক আছে দিলীপ, তুমি শট টেক করতে পার।

লাইট রেডি। আর্টিস্ট রেডি। মেক-আপম্যান শেষ বারের মত এসে চেক করে গেল। ছবি বিশ্বাসের পাঞ্জাবিতে নকল রক্তের ছোপ লাগিয়ে দেওয়া হল। মেয়েটির মৃতদেহ বয়ে আনছেন অতএব পাঞ্জাবিতে রক্তের দাগ ধরবেই।

মেয়েটিকে দু হাতে অনায়াসে তুলে ফেললেন ছবি বিশ্বাস। মেয়েটির দেহ নেতিয়ে পড়েছে। গুড, ছবি বিশ্বাস মন্তব্য করলেন—একদম হাত-পা ছেড়ে দাও—ভয় পাবার কিছু নেই, আমি তোমায় ফেলে দেব না—

বাংলা চলচ্চিত্রের সেরা শিল্পী তখন ছবি বিশ্বাস; তাঁর পরিশীলিত কণ্ঠস্বর স্টুডিওর ফ্লোরের অন্দরে ধাক্কা খেয়ে প্রতিধ্বনিত হয় তখনকার দিনে। সবাই মন্ত্রমুগ্ধের মত তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকে মাত্র।

সেই ছবি বিশ্বাস মেয়েটিকে অভয় দিলেন।

ক্যামেরা চলতে আরম্ভ করল। লম্পট জমিদার মৃতদেহ নিয়ে ঘরে ঢুকছে। উত্তেজনা ও মৃতদেহের ভারে সে হাঁফাচ্ছে ঘন ঘন। আলমারীটা লক্ষ্য করে সে ছুটে এলো। আলমারীর পাল্লার সামনা চাপ দিতেই পাল্লাটা খুলে গেল। দ্রুত ক্ষিপ্র হাতে মৃতদেহটিকে তার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে জমিদার তাড়াতাড়ি পাল্লাটা চাবি বন্ধ করে দিল।

ক্যামেরার পেছন থেকে দিলীপ নাগ হঠাৎ খেয়াল করলেন—চাবি বন্ধ করতে যেটুকু সময় লাগা দরকার—ছবিবাবু যেন তার থেকেও বেশী সময় নিলেন একটু।

জমিদার এরপর নিকষ পোষাকের দিকে তাকালো—একি? এ যে রক্তের ছাপ। তাড়াতাড়ি পাঞ্জাবিটা খুলে ফেলল সে। সাউণ্ড ট্রাকে তখন যেন পুলিশের এগিয়ে আসার শব্দ শোনা যাচ্ছে।

এই রকম একটা মুহূর্তে দিলীপ নাগ শটের কাট ঘোষণা করলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে ছবিবাবু উত্তেজিতভাবে বলে উঠলেন—দিলীপ সর্বনাশ হয়েছে। এখুনি আলমারীর পাল্লাটা খোলার ব্যবস্থা করো।

—সেকি দাদা!

—হ্যাঁ ভুল চাবি দিয়েছিলাম, মোড়াতে গিয়ে ওটা ভেঙ্গে ভেতরেই রয়ে গেছে মানে চাবিটা—

সবাই হৈ হৈ করে উঠলেন। অতক্ষণ মিনিট তিনেক পার হয়ে গেছে।

আলমারীটা রীতিমত মজবুত। পার্ক স্ট্রীটের দোকান থেকে পঁচিশো টাকায় কেনা। নিশ্ছিদ্র, অটুট মেহগনী কাঠের পালিশ করা আলমারী।

ভেতরে মেয়েটি রয়ে গেছে।

চাবি আর কিছুতেই খোলা যাচ্ছে না।

আর এই রকম পরিস্থিতিতেই মানুষের মাথার হঠাৎ কেমন সব সেন্স গণ্ডগোল হয়ে যায়। সবাই চেষ্টা করছে—কিন্তু কোন চেষ্টাই আসলে কাজে লাগছে না।

পাঁচ মিনিট পার।

ছবি বিশ্বাস থর থর করে কাঁপছেন তখন। বাঁচাও বাঁচাও ওকে বাঁচাও। সবাই পাগল হয়ে টানাটানি করছে, অথচ সে-পাল্লা এক সেণ্টিমিটারও ফাঁক হচ্ছে না। দিলীপ নাগ আন-নার্ভাস হয়ে ছোটাছুটি করছেন।

মেয়েটি ভেতরে রয়ে গেছে।

সাড়ে পাঁচ মিনিট অতিক্রান্ত।

একজন দৌড়ে লাথল আনতে ছুটল—ভেঙ্গে ফেল পাল্লা। শট বেয়ারফুল্—মেয়েটি ভেতরে রয়ে গেছে।

মেয়েটির পায়ে সেই ঘুঙুর। ওটা বাস্তবিকই অভিশপ্ত নাকি? সিনেমার গল্প আর জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা কি এক?

একজন সহকারী একটা বড় স্ক্রু-ড্রাইভার দিয়ে পাল্লার তলার একটা অংশ প্রাণপণে খোলবার চেষ্টা করছে। তার কপাল ঘামে। ছবি বিশ্বাস তো ঘেমে স্নান করে গেছেন।

ছ' মিনিট পার। হা ঈশ্বর।

আর সেই নাটকীয় মুহূর্তে খট করে লো একটা শব্দ—স্ক্রু-ড্রাইভারের পে পাম্পার লকটা খুলে গিয়ে পাম্পটা ং যেন দমকা হাওয়ায় খুলে স্থির হয়ে ডল।

ছবি বিশ্বাস লাফিয়ে এগিয়ে এলেন। মেয়েটি অজ্ঞান হয়ে ভেতরে লুটিয়ে ছে। সায়ানোসিস।

তাড়াতাড়ি তুলে এনে নাচঘরের াসে শুইয়ে দিলেন ছবি বিশ্বাস। ডাক্তার, এক্ষুনি একজন ডাক্তার ডাকো—

কয়েকজন হুড়মুড় করে ফ্লোর থেকে য়িয়ে গেল। সবাই হুমড়ি খেয়ে দেখবার ষ্টা করছে। ছবি বিশ্বাস হঠাৎ পাগলের ং চীৎকার করে উঠলেন—ক্রিয়ার আউট— য়ার আউট— এখানে মজা দেখার কিছু ই—

দিলীপ নাগ ও অন্যান্য টেকনিশিয়ানরা ইরের লোকদের ফ্লোরের বাইরে হটিয়ে লেন। ডাক্তার এলো। সঙ্গে সঙ্গে ইঞ্জেক- ন। অক্সিজেন। নার্সিং। ডাক্তার মন্তব্য ব করলেন আর মিনিটখানেক ওইভাবে কে—

বড় বড় দুটি পেডেস্টাল ফ্যান ফ্লোরে লে বড় তুলে ফিরছে। সিনেমার সেটের ল্য নিস্তব্ধ গেছে। উত্তেজনার ঘামে স্থৈর্য মুখের রং ধুয়ে গেছে। সবাই

মোহনবাগানের মেয়ে
জয়শ্রী রায় । দীপঙ্কর দে

সম্পাদিত
মুখোপাধ্যায় । পরিচালনা : অনিল সেন । অমৃত ফটো।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে আছেন।

ধীরে ধীরে মেয়েটির জ্ঞান ফিরে এল।

ছবি বিশ্বাস সাগ্রহে জিগ্যেস করলেন—এখন কেমন লাগছে তোমার?

মেয়েটি ক্লান্ত দুর্বল কণ্ঠে জানাল—ভাল।

বসে সে উঠে বসবার চেষ্টা করল, শশব্যস্ত ছবি বিশ্বাস বললেন, না উঠে না আরও কিছুক্ষণ শুয়ে থেকে বিশ্রাম নাও—

মেয়েটি অগত্যা শুয়ে রইল। ফ্লোরে শুয়ে সিলিং-এর দিকে তাকালে প্রথমে চোখে পড়ে বছরের পর বছর সিলিং-এ জমে থাকা ঝুল আর ময়লা চটের পর্দা। কড়িবরগা।

আর ঠিক তার নীচের বিচিত্র রঙীন সিনেমার জগৎ। হাসি আর কান্না মেশানো নাটকের রঙ্গমঞ্চ।

কিছুক্ষণ পর মেয়েটি উঠে দাঁড়া প্রোডাকশন ম্যানেজার তার বাড় ব্যবস্থা করে দিয়েছিল একটা গাড়ি মেয়েটি ধীরে ধীরে সেই গাড়িতে বসল। গাড়ি চলে গেল।

ছবি বিশ্বাস কিছুক্ষণ চুপচাপ। হঠাৎ মন্তব্য করলেন—দিলীপ, মেয়েটি ভালো না, তবে এটা বুঝলাম ওর উৎসাহ আছে। আমি ওর মধ্যে একটা সম্ভাবনা দেখেছি—পারলে পরের ছ ওকে একটা বড় পার্ট দিও। ও পারবে

রঞ্জন জানে সে মেয়েটি কে? লাইনের পুরোনো মানুষ যারা সকলেই জানে। আজ সে খুব বড় নেত্রী। এই কিছুদিন আগেও সে অ্যাকটেস আওয়ার্ড নিয়েছে—তার ঠিক একটি ছবিতে। অনুমান করুন আপনারা।

রঞ্জন

ক্লোর থেকে বলছি

সিস্টার
সুপ্রিয়া দেবী । পরিচালনা : পীযূষ বসু । অমৃত কথা ।

সিস্টার ছবির স্ক্রিপ্ট পড়ে আমি প্রথম ভেবে পাচ্ছিলাম না যে কী করব। সেদিন এই ছবির শুটিং দেখতে ফ্লোরে এতলোক ঢুকে পড়েছে যে, পীযূষ বসুর মত ঠাণ্ডা মাথার পরিচালক পর্যন্ত মাঝে মধ্যেই ক্ষেপে যাচ্ছেন। মাঝে মাঝে বেশ চড়া গলায় বলছেন—বাইরের লোকজন ফ্লোরে থাকলে আমি মশাই কাজ করতে পারব না।

প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্টের অ্যাসিস্ট্যান্টরা তখন তাড়াতাড়ি লোকজন সরিয়ে দিচ্ছিল। কিন্তু হলে কি হবে, আবার যে-কে সেই অবস্থা।

হট্টগোলের মধ্যে দেখলাম, ফ্লোরে একদল পুলিশ ঢুকে পড়ল। তাদের প্রত্যেকেরই হাতে একটি করে স্টেনগান। না না, সিনেমার নকল জিনিস নয়—রীতিমত আসল আগ্নেয়াস্ত্র। ছবির একজন সহকারী পরিচালক আগ্নেয়াস্ত্রগুলি অভিনেতাদের মধ্যে বেঁটে দিলেন। এই অভিনেতাদের মধ্যে পরিচিত তিনজনকে চোখে পড়ল। অরুণ রায়, শম্ভু ভট্টাচার্য এবং আর বড়ুয়া। এঁরা ছাড়া আরও অনেক সৈনিকের পোষাক পরে জোয়ানেরা রয়েছেন। তাঁরাও স্টেনগান হাতে তুলে নিলেন। একজনের মুখের ভাবভঙ্গী দেখে মনে হল—ভদ্রলোক এই প্রথম উঁচু ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র হাতে ধরলেন। কারণ, একজন পুলিশ মার্চের ভেঙ্গে তাঁকে অস্ত্রটা কিভাবে ধরতে হয় তা বেশ ভটল করে বুঝিয়ে দিচ্ছিল। অভিনেতা ভদ্রলোক তখন বেশ অসহায় ভঙ্গীতে তাকাচ্ছিলেন।

সেট দেখে মনে হল এটা হিমালয়ের কোন একটা জায়গা। কাছে কোথা বাড়ী

ফায়ার প্লেস রয়েছে। এটি তৈরী করেছেন আর্ট ডিরেক্টার সুবো চ্যাটার্জি। ঘরের মধ্যে অনেকগুলি খাট। প্রতিটি খাটে ট্রিপল লিপিং বার্থ। অর্থাৎ প্রথমে একটি বিছানা, তার মাথার ওপর আর একটি বিছানা। তারও ওপর আরেকটি। ঠিক যেমনভাবে যে ধরনের ব্যবস্থা আজকাল চালু আছে।

অনেকগুলি ফুলের মত সুন্দর মিশ. সেইসব বিছানায় বসে আছে। এরা এই ছবির ব্যাকগ্রাউন্ড আর্টিস্ট। পাশে আরেকটি ঘর। ওটি মেয়েদের জন্য আলাদা করা। বিভিন্ন বয়সের মেয়েকে দেখলাম মেক-আপ নিয়ে পোষাক পরে তাদের পার্টনারদের পাশে বসে রয়েছে। এদের মধ্যে দুটি কিশোরী মেয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করল—ঝলমলে চক্রবর্তী আর রাখী চ্যাটার্জি। এরা এই ছবিতে দুটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করছে বলে শুনলাম। ঝলমলের একটা স্বতন্ত্র পরিচয় পাওয়া গেল—ও হচ্ছে আবার পরিচালক মৃণাল চক্রবর্তীর ভাইঝি।

হঠাৎ নজরে পড়ল ফ্লোরের একপাশে একটি চেয়ারে বসে চিত্রনাট্যের খাতার পাতা ওল্টাচ্ছেন সুপ্রিয়া দেবী। ওঁর পরনে কালো গাউন। গলায় রূপোর চেনে ঝোলানো 'ক্রশ' চিহ্ন। শুনলাম উনিই নান-ভূমিকায় অভিনয় করছেন।

কাছে গিয়ে পরিচয় দিতে উনি হাসলেন। ওঁর মুখে শুনলাম—ছবির কাহিনীকার হচ্ছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। 'চিত্রনাট্য-পরিচালক পীযূষ বসু' নিজে লিখেছেন।

কিছুক্ষণের মধ্যে শটের একটা মনিটার হল। মনিটার অর্থে—শুটে কে কোথায় থাকবে, কি বলবে—কেমন অভিনয় করবে—তার পুরো একটা রিহার্শাল করা। ক্যামেরাম্যান, সাউন্ড রেকর্ডিস্ট এবং পরিচালক রিহার্শাল দেখে কারও কোন ভুল-ত্রুটি থাকলে তা তৎক্ষণাৎ সংশোধন করে নেবেন। প্রয়োজনে এই মনিটার কখনও তিন-চার বার ধরে করানো হয়। থিয়েটারের মত সিনেমায় কখনও একটানা নাটকের রিহার্শাল হয় না।

একটা চলিতাবেই আমি হাড় হাড়ে বুঝতে পারলাম—সাংঘাতিক একটা ছবি হচ্ছে এটা। একদল হানাদার হঠাৎ—এ বলার ভুল হোচ্ছি—এই সেটটা হচ্ছে একটি অনাথ আশ্রম—পঁয়ত্রিশটি অনাথ শিশুরা এখানে সিস্টারের সেবাযত্নে মানুষ হচ্ছে—হানাদাররা বাইফেল স্টেনগান নিয়ে হিংস্র নেকড়ের মত এই অনাথ আশ্রমে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এর আগে এই শান্ত নিরিবিলি পাহাড়ী গ্রামটি মোটামুটি তছনছ করে এসেছে। এবার এদের টার্গেট এই পবিত্র আশ্রমটি।

অরুণ রায় ও শম্ভু ভট্টাচার্য দেখলাম নৃশংসভাবে ঘুমন্ত বাচ্চাগুলিকে বিছানা থেকে টেনে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে। মেয়েরা বাচ্চাদের পরিত্রাহি চীৎকার করে সিস্টারকে ডাকছে। কাঁদছে প্রাণপণে। কিন্তু তাতে পশুদের চৈতন্য হচ্ছে না। ওদের অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে যাচ্ছে।

আমি স্তম্ভিত।

বাচ্চাদের আর্টিস্টদের মুখের দিকে তাকালাম। কয়েকজন মহিলা—আসল মা—বেশ উদ্বিগ্ন মুখে তাকিয়ে আছেন নিজের নিজের সন্তানের দিকে। ব্যাপারটা নিঃসন্দেহে অভিনয়ের। তবুও মায়ের মন—চোখের সামনে একদল সশস্ত্র হানাদার ছেলেদের ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে—মায়েদের পক্ষে চোখের সামনে এ-দৃশ্য সহ্য করা, রীতিমত কঠিন।

অল্প অল্প করে গল্পটি আমাকে সুপ্রিয়া দেবী শোনালেন।

ষড়লোক বিজনেসম্যানের মেয়ে কল্যাণী। গৌতম (অসীমকুমার) নামে এক সুশিক্ষিত সুদর্শন ছেলের সঙ্গে তার ভালবাসা। বিয়েও স্থির হয়ে গেছে। হঠাৎ কল্যাণী জানতে পারলে যে, সে বাবা এবং মা বলে যাঁদের এতদিন জেনে এসেছে—

এরা একযুগ
কল্যাণী চট্টোপাধ্যায়

তারা যে আক্রান্ত এবং শোচনীয় বন্দী দশায় জীবন কাটাচ্ছে—এই খবরটা যে কোন উপায়ে কর্ণেল দাশগুপ্তের কাছে পৌঁছাতে হবে। তাই সিস্টার জাঁত গোপনে আশ্রমের দুটি ছেলেকে রাতের অন্ধকারে হানাদারদের নজর এড়িয়ে পাঠিয়ে দিলেন বগমি পথে—ভারতীয় ঘাঁটির দিকে।

দীর্ঘপথ সেই মেজর আরও পাগল হয়ে উঠছে।

ওর নির্দেশে মরিয়াম নামের একটি কিশোরীকে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে মেজরের ঘরে—উদ্দেশ্য পরিষ্কার—সন্ত্রাসে পাগলের মত ছুটে এসে তাকে আগলালো। মরিয়মের বিনিময়ে সে নিজে গিয়ে ঢুকলো মেজরের ঘরে। মেজর সন্ত্রাসের দেহের শুচিতাকে নষ্ট করল।

গোপনে খবর পাঠাবার ব্যাপারটা কেমনভাবে যেন ফাঁস হয়ে গিয়েছিল। কারণ হঠাৎ দুজন হানাদারও নিরুদ্দিষ্ট। মেজর সন্দেহ করল—কেউ ষড়যন্ত্র করছে এখানে। তাই সে ভংকর আশ্রমের শিশুদের লাইন দিয়ে দাঁড় করালো অঙ্গনপ্রান্তের সামনে। বল তোমরা—কোথায় গেল আমাদের দুজন সঙ্গী? ভারতীয় মিলিটারীকে খবর কে পাঠিয়েছে? বাচ্চারা সবাই জানে। কিন্তু স্বীকার তারা কেউই করবে না। সিস্টার যে নিজের হাতেই দুজন হানাদারকে গুলী করে মেরেছে। ভারতীয় সেনাদের সেই খবর পাঠিয়েছে। মেজরের নির্দেশে একটি একটি করে শিশুকে গুলি করে হত্যা করা হতে লাগল। সিস্টার যেন পাগল হয়ে গেলেন। তিনি নির্নিমেষে তাকিয়ে আছেন অন্য কোনও দিকে। ভারতীয় সেনা থেকে তবে কি ওরা কেউ আসবে? বিদেশী হানাদারেরা শেষ পর্যন্ত কি এই পবিত্র মাটিকে নরক করে এইভাবে?

হিংস্রতার শেষের মুহূর্তের ছবি সামনে পড়ে আছে। মেজর এবার নির্দেশ দিতে যাচ্ছে—সিস্টারকে খতম করার—কিন্তু তা আর হল না। তার আগে ভারতীয় সেনাদের কাছ থেকে উপহার এসে গেল—বিকট শব্দে একটা শেল ফাটল হানাদার জমায়েতে।

এখন ওরা পালাচ্ছে। কি পালাবে কোথায়? শক্তিশালী আমাদের সৈন্যের সইবে তখন পালাবার পথ কোথায়? শিশুদের মৃত্যুর প্রতিটি গুলি কিংবা প্রত্যেকটি হানাদারকে খতম করল ভারতীয় জোয়ানরা।

কর্ণেল ছুটতে ছুটতে আশ্রমে এসে দেখলেন—এখন পাপের মত সিস্টার প্রতিটি শিশুর মৃতদেহ ছায়ে ছুঁয়ে যাচ্ছেন—ওরে তোরা একবার চোখ মেলে দেখ—তোদের আর কেউ মারতে পারে না—তাকা একবার তাকা—ওরে আমার দিকে তাকা—

শিশুর রক্তরঞ্জিত ভারতীয় সৈন্যের কর্ণেল মাথা নীচু করলেন।

মুসাফির

ছুটি আসলে তার বাবা-মা নন এই বাচ্চা ছেলে দুটোকে ফেলে এসেছেন এইখানে। ওদের দুজন হানাদার করেছিল। কল্যাণী ভাবল, সে অজাতকুলশীলা। বাস, চোখের সামনেটায় অন্ধকার হয়ে এলো কল্যাণীর। সে স্থির করল—অন্যথা করে এই অভিশপ্ত জীবনের যে অবসান ঘটাবে। কিন্তু তাকে বাঁচালেন একটি প্রৌঢ় মিশনারী ফাদার। বললেন জীবনে অনেক বড় কিছু করার রয়েছে তোমার। অন্তত ভাল কিছু করে যাও এই পৃথিবীতে। এছাড়া কাপুরুষের মত মরার কোন অধিকার নেই.....

ফাদারের সান্ত্বনা মোতাবেক এই অনাথ আশ্রমে এসে গেল কল্যাণী, তারপর সে স্বেচ্ছায় তুলে নিল এই দায়িত্ব। নিজেকে আগের সেই কল্যাণী বলে মনে হল। ইতিমধ্যে সেই কালোকের মানুষ হল। মৃত্যুর আগে তিনি সিস্টারকে এই অনাথ আশ্রমের পূর্ণ দায়িত্ব দিয়ে গেলেন।

ভারতীয় সীমানায় এই অঞ্চলে ঘাঁটির মাঝে মাঝেই গুলিগোলা চলে। ভারতীয় জোয়ানরা প্রতিবারই সাফল্যের সঙ্গে হানাদারদের হটিয়ে দেয়।

আশ্রম থেকে বেশ কয়েক মাইল দূরে এক দুর্গম পর্বতে ইণ্ডিয়ান মিলিটারী পোস্ট। কমান্ডে আছেন একজন বাঙালী অফিসার। তাঁর নাম জে কর্ণেল দাশগুপ্ত। তিনি মাঝে মাঝে এই আশ্রমে আসেন। সন্ন্যাসিনী সিস্টারের সঙ্গে তিনি মিশে উত্তমকুমার এই শিশুটি করছেন। মনে মনে সিস্টারকে শ্রদ্ধাও করেন। কর্ণেল যখনই এখানে আসেন সঙ্গে করে নিয়ে আসেন অনেক উপহার—আশ্রমের ফুটফুটে মত সন্দেহ ছেলেমেয়েদের জন্য। এইভাবে ভারতীয় সৈনিকদের সঙ্গে এই আশ্রমের নিবিড় শ্রদ্ধা-ভালবাসা মাখানো এক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।

বিনামেঘে বজ্রপাতের মত হঠাৎ তিনজন একদল সশস্ত্র হানাদার ভারতীয় সীমানায় ঢুকে এই পাহাড়ী গ্রামে হানা দিল। হাজির সেনা একজন মেজর (উৎপল দত্ত করছেন পার্টটি)। যেমন নির্মম তেমনি নিষ্ঠুর। সে জানতে চায়—ইণ্ডিয়ান মিলিটারী আউট পোস্ট কোথায় এবং তাদের কি রকম স্ট্রেংথ। তার কাছে খবর আছে—এই অনাথ আশ্রমের সঙ্গে ইণ্ডিয়ান ফোর্সের নিয়মিত যোগাযোগ আছে। অতএব আসল খবর এখানেই পাওয়া যাবে।

সিস্টার অত্যাচারের মুখে দাঁড়িয়ে অস্বীকার করলেন—না আমি জানি না ভারতীয় সেনাদের ঘাঁটি কোথায়। এবং তাদের কি শক্তি।

মেজর বুঝল সহজে কথা বের করা যাবে না। তাই সে উল্টো পথ ধরল। শিশুদের ওপর টর্চার আরম্ভ করে দিল। দিনের পর দিন যায়—শিশুরা মুখ বুঁজে সমস্ত মেজরের ঘরে—উদ্দেশ্য পরিষ্কার—সিস্টার খোলে না। হানাদাররা ক্ষিপ্ত হয়ে ওদের খাওয়া বন্ধ করে দিল। শিশুদের প্রাণ যায় যায়—তবুও ওরা সিস্টারের শান্ত সমাহিত মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

হঠাৎ একটি শিশুর মৃত্যু ঘটল। সিস্টার বুঝলেন এভাবে দিন চলবে না।

কিছুক্ষণ

নন্দিনী মালিয়া

'রাত যবে তুমি নাহি চলা সখা
আমি যে পথ চিনি না।
তোমার উপর করিনু নির্ভর
তোমা বই কিছু জানিনা...'

এই গানটির সব ও কথা কিছুই আজকালের হয়ে গেছে। এখনও যখন মাঝে মাঝে রেডিওতে গানটি শোনা যায় তখন একটি হাল্কা বিষণ্ণ মুখ যেন ভেসে ওঠে চোখের সামনে। ছুটি যাবার আগে এখনও ছোট শহরের কলেজের মন খেতে। ডাগর চোখ আর গভীর কালো ভুরু আজ আর কারুকে বোধহয় ছুটি পাইয়ে না।

আর ছবির যখন সত্যিই অমলিন তখন নন্দিনী মালিয়া কি করে হারিয়ে যাবে।

কোন সেই ছোট্ট শহর, কারে বলবো পড়ন্ত তাঁর কোনো ছবি নেই। ফ্রেমেও বোধহয় সেই।

এবার নাই আগে কবে কি ঘটেছিল সেসব ওঁর বন্ধুরা বলেছিলেন। এবং প্রথমেই তাদের মুখেই নন্দিনী মালিয়া ঘরের বাইরে থেকে হয়। তখন পড়ত ছুটির ঘণ্টা শেষ হবার পর আর বোধহয় কেউ ওঁর খোঁজ নেয়নি।

সেবারে নন্দিনী মালিয়া ফিল্ম লাইন ছেড়ে দিয়েছেন—এই সংবাদটি সত্য ধরে নিয়েছিলাম। সাধারণ দর্শকও তাই মনে করেছেন নন্দিনী ফিল্ম ছেড়ে দিয়েছেন।

কিন্তু কিছু দিন আগে একজন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানের সঙ্গে একজন প্রচারকের আলাপ হয়েছিল—ছুটির দিনে আবার আসবেন বলেছিলেন। সত্য কিনা জানবার জন্য যোগাযোগ করতে নন্দিনী মালিয়া বললেন—আসুন একদিন। সব সঠিকভাবে বলব।

কথামত নির্দিষ্ট দিনে সেই প্রচারকের বাড়ী। নির্দিষ্ট সময়ে ভাইকে সঙ্গে নিয়ে নন্দিনী এলেন।

সাধারণ প্রথাগত সিনেমার বাড়ীতে যেমন হয়ে থাকে তেমনি ওঁকে। মাঝার কারুকার্য চারদিকে চড়ানো তার গুপর। সাজের কোথাও কোনো বাহুল্য নেই সেই যেমনি একটি আভিজাত্য। একটি সোফায় বসলেন তিনি।

—বহুদিন বাদে দেখা হোল, না?

চোখ কপাল তাঁর সেই আগের মতোই দেখেছি ওঁকে, ইতিমধ্যে কোন পরিবর্তন হয়নি। বললাম—আপনিও তো প্রায় ছেড়ে দিয়েছেন কাজ। মেয়ে আর ঘরে কি করে?

গালে টোল পড়ল, হাসলেন তিনি। মুখশ্রীতে এসে গেছে পরিণত উজ্জ্বলতা। আসেনি একটু ভ্যাটও হয়েছে চেহারা। চোখের কোণে সেই ভ্রমরের বিষণ্ণতার ছাপ নেই, বলে বললে কথা মানাবে না তাঁকে।

: আবার ছবি করবেন শুনেছি।

একটু গম্ভীর হলেন যেন। ছবিতে কাজ করার ব্যাপারটা প্রকাশ করবেন কি করবেন না ভাবলেন বোধহয়। তারপর বললেন—করব মানে করার ইচ্ছে আছে আর কি! ভালো রোল পেলে কেন করব না!

: ইন্ডাস্ট্রীর অনেকেই কিন্তু ধরে নিয়েছেন আপনি আর কাজ করবেন না।

—সেজন্যই তো বলছি। ভালো ছবি, ভালো পার্ট হলে শোনা আবার কাজ করব। আর কোনো টান নেই এখন।

: টান মানে?

—বাধা।

সত্যিই বাধা ছিল এতদিন। যে বাধা ইচ্ছে থাকলেও অভিনয় জগৎ থেকে তাঁকে সরে থাকতে হয়েছে।

আসল কারণটা উনি স্বীকার করে বলেননি বটে, কিন্তু কথাবার্তায় হাবেভাবে স্পষ্টই বুঝেছি তা হোল নন্দিনীর শ্বশুরবাড়ী থেকেই আপত্তি ছিল প্রথমে। রক্ষণশীল পরিবার ছিল ওঁর শ্বশুরালয়। বিয়ের আগে সাইন করা ছবিগুলো শেষ করতেই অনেক বেগ পেতে হয়েছে।

অভিনয়ের জগতে নন্দিনীর সাফল্য ওঁর সমৃদ্ধিকে বোধহয় অনেকেই ঈর্ষান্বিত। ফিল্ম লাইন সম্পর্কে ওঁদের বাড়ীর ধারণা খুব একটা ভালো নয়। ওঁরা চাইতেন আমাকে সম্পূর্ণ ঘরকন্না করে রাখতে।

কিন্তু শেষ অব্দি তা সম্ভব হয়নি। প্রণয়ীর নন্দিনী স্বামীর মধ্যে চেয়ে নিজের ইচ্ছাকে বলি দিয়েছিলেন, অভিনয় ছেড়ে দিয়েছিলেন। কাজ আর করবেন না—এমন স্থিরও করেছিলেন, বম্বেতে বেশ্যবেবাড়ীর আত্মীয়ের কাছেও ছিলেন কয়দিন। নানা চাপের কাছে অবশেষে তাঁকে মাথা নোয়াতেই হোল।

স্বামী আর শ্বশুরালয়ের বন্ধন ছাই ওঁকে ছিন্নভিন্নই হোল। সাংসারিক জীবনের ছোটখাট অশান্তিকে আর বাড়তে না দিয়ে তিনি চলে এলেন কলকাতায়। নন্দিনী এখন পিত্রালয়ে।

চঞ্চল চঞ্চল—প্রাণবন্ত মানসিকতায় গভীর এবং চিন্তায় নন্দিনী যে কোনো তথাকথিত অভিনেত্রীর তুলনায় কম চিন্তাশীল নন। ইংরেজীর এম-এ নন্দিনীর এখন বেশীর ভাগ সময় কাটে বই আর স্মৃতি রোমন্থনে।

বললাম—'অফার কি রকম আসছে?'

—তেমন কিছু না। অনেকে জানেই না যে আমি কলকাতায়। ফিল্ম করার কথাটা পরে।

বছরের প্রথম ইতিমধ্যে দুটো ছবির অফার এসেছে ওঁর কাছে। কাউকেই তিনি 'না' বলেননি। অবশ্য তাঁদের কাছ থেকেও কনফার্ম হয়া নন্দিনী এখনও শোনেননি। তবে একটা কথা তিনি বললেন—ছোট

নিয়োজন চরিত্র কাজ। ভেবে আর দেখে কি করে বলুন?

গালে টোল পড়ল, হাসলেন তিনি। মুখশ্রীতে এসে গেছে পরিণত উজ্জ্বলতা। আসেনি একটু ভ্যাটও হয়েছে চেহারা। চোখের কোণে সেই ভ্রমরের বিষণ্ণতার ছাপ নেই, বলে বললে কথা মানাবে না তাঁকে।

: আবার ছবি করবেন শুনেছি।

একটু গম্ভীর হলেন যেন। ছবিতে কাজ করার ব্যাপারটা প্রকাশ করবেন কি করবেন না ভাবলেন বোধহয়। তারপর বললেন—করব মানে করার ইচ্ছে আছে আর কি! ভালো রোল পেলে কেন করব না!

: ইন্ডাস্ট্রীর অনেকেই কিন্তু ধরে নিয়েছেন আপনি আর কাজ করবেন না।

—সেজন্যই তো বলছি। ভালো ছবি, ভালো পার্ট হলে শোনা আবার কাজ করব। আর কোনো টান নেই এখন।

: টান মানে?

—বাধা।

সত্যিই বাধা ছিল এতদিন। যে বাধা ইচ্ছে থাকলেও অভিনয় জগৎ থেকে তাঁকে সরে থাকতে হয়েছে।

আসল কারণটা উনি স্বীকার করে বলেননি বটে, কিন্তু কথাবার্তায় হাবেভাবে স্পষ্টই বুঝেছি তা হোল নন্দিনীর শ্বশুরবাড়ী থেকেই আপত্তি ছিল প্রথমে। রক্ষণশীল পরিবার ছিল ওঁর শ্বশুরালয়। বিয়ের আগে সাইন করা ছবিগুলো শেষ করতেই অনেক বেগ পেতে হয়েছে।

অভিনয়ের জগতে নন্দিনীর সাফল্য ওঁর সমৃদ্ধিকে বোধহয় অনেকেই ঈর্ষান্বিত। ফিল্ম লাইন সম্পর্কে ওঁদের বাড়ীর ধারণা খুব একটা ভালো নয়। ওঁরা চাইতেন আমাকে সম্পূর্ণ ঘরকন্না করে রাখতে।

কিন্তু শেষ অব্দি তা সম্ভব হয়নি। প্রণয়ীর নন্দিনী স্বামীর মধ্যে চেয়ে নিজের ইচ্ছাকে বলি দিয়েছিলেন, অভিনয় ছেড়ে দিয়েছিলেন। কাজ আর করবেন না—এমন স্থিরও করেছিলেন, বম্বেতে বেশ্যবেবাড়ীর আত্মীয়ের কাছেও ছিলেন কয়দিন। নানা চাপের কাছে অবশেষে তাঁকে মাথা নোয়াতেই হোল।

স্বামী আর শ্বশুরালয়ের বন্ধন ছাই ওঁকে ছিন্নভিন্নই হোল। সাংসারিক জীবনের ছোটখাট অশান্তিকে আর বাড়তে না দিয়ে তিনি চলে এলেন কলকাতায়। নন্দিনী এখন পিত্রালয়ে।

চঞ্চল চঞ্চল—প্রাণবন্ত মানসিকতায় গভীর এবং চিন্তায় নন্দিনী যে কোনো তথাকথিত অভিনেত্রীর তুলনায় কম চিন্তাশীল নন। ইংরেজীর এম-এ নন্দিনীর এখন বেশীর ভাগ সময় কাটে বই আর স্মৃতি রোমন্থনে।

বললাম—'অফার কি রকম আসছে?'

—তেমন কিছু না। অনেকে জানেই না যে আমি কলকাতায়। ফিল্ম করার কথাটা পরে।

বছরের প্রথম ইতিমধ্যে দুটো ছবির অফার এসেছে ওঁর কাছে। কাউকেই তিনি 'না' বলেননি। অবশ্য তাঁদের কাছ থেকেও কনফার্ম হয়া নন্দিনী এখনও শোনেননি। তবে একটা কথা তিনি বললেন—ছোট

সগৌরবে চলিতেছে

আন্তর্জাতিক মহিলা বর্ষে উৎসর্গীকৃত একটি ছবি

হিন্দি ও অন্যান্য বহু ভাষায়

রাজশ্রী পরিবেশনা

ছবি আমাকে যেমন পপুলার করেছে সকলের কাছে, তেমনি অসুবিধেও কম হচ্ছে না কিন্তু! ভ্রমরকে ঘিরে আমায় নিয়ে এক সিম্বলিক হিরোইনের চেহারার ইমেজ তৈরী হয়ে আছে সবার মনে। এই ইমেজটা কাটাতে হবে সবার আগে।'

যে কোনো শিল্পীর কাছে এই ইমেজ প্রবলেমটা অবশ্যই খুব ক্লান্তিকর। প্রথম ছবিতে যে চরিত্রে নামলেন কেউ অমনি তাঁকে ঐ টাইপের চরিত্রাভিনেত্রী হিসাবে টাইপড হয়ে গেলেন। তায় আবার ছবিখানা যদি ছিট করেছে তো কথাই নেই! নতুন শিল্পীর অবস্থা তখন সংকটে পরিপূর্ণ।

নন্দিনীর ছবিটা হিট হবার পর এই একই প্রবলেম হয়েছিল। মাঝখানে যা 'সংসার' ছবিতে তিনি নুকুল মেয়ের চরিত্র দারুন কাজ করেও সেই ইমেজ কাটিয়ে উঠতে পারেননি। এখনও নয়।

অনেক প্রোডিউসারকে বলতে শুনেছি—নন্দিনী ওঁকে কোনো প্রাণবন্ত চরিত্র মানাবে না।'

কিন্তু ব্যাপারটা আদপে সত্য নয়। নন্দিনী ভ্রমর সেজে যে শান্তশিষ্ট, কম কথা বলা, চোখ বেশী বড় মেয়ের ইমেজ তৈরী করেছেন ব্যক্তিগত জীবনে তিনি সম্পূর্ণ বিপরীত। ছোটবেলা নাকি প্রায় মালিয়া) সঙ্গে আনন্দে হাসি মস্করায় বাড়ীটাকে সব সময় নাকি প্রায় মাথায় তুলে রাখেন। গোমড়ামুখো অমরের বদনাম তাঁকে কেউ দিতে পারবে না। কিন্তু কিসে ব্যাপারটা যেন কেমন উল্টো হয়ে গেল।

সেজন্যই এখন নন্দিনীর প্রধান কাজ হোল সেই ভ্রমরের ইমেজ ভেঙ্গে ফেলা। যদিও কাজটা যে খুব সহজ নয়, তা তিনি জানেন—তবুও চেষ্টা করছেন। কদ্দূর থাকার সময় হৃষিকেশ মুখার্জির সঙ্গে নাকি কথা হয়েছিল, উনি ওঁকে নতুন ধরনের একটি চরিত্র দেবার কথা ভাবছেন। তবে ফাইনাল হয়নি এখনও।

বাড়ীতে যতই নন্দিনী হরবোলা ছানা না কেন, ফিল্ম লাইনের লোকের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যাপারে খুব লাজুক তিনি—একেবারে ওঁকে ঘরকুনো বলতে পারেন। নতুন করে আবার তিনি আসতে চাইছেন ফিল্মে, সুতরাং যোগাযোগের কাজে ওঁকেই একটু প্রগতী হওয়া দরকার।

—আমি নাকি কারও কাছে গিয়ে কিছু বলতে পারি না। কে কি আবার ভাববেন। সলাজ ভাবে।

ঃ তাহলে কি করে হবে? যোগাযোগ চাইতো আসল।

কদিন আগে নাকি সন্ধ্যা রায় ওকে অন্য কার সঙ্গে যেন যোগাযোগ করতে বলেছিলেন, ভালো রোল ছিল। এই সাক্ষাৎকারের পর তিনি লজ্জায় পড়ে তিনকাযে যোগাযোগ করেননি। এতদিনে কি করেছেন জানি না।

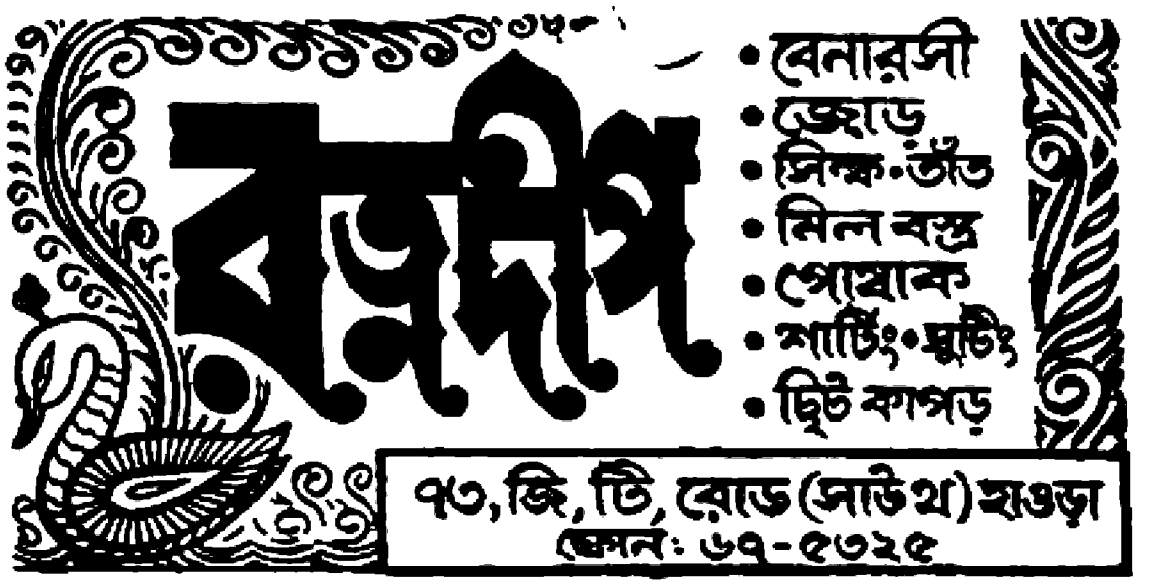

শুক্রবার, ২৬শে মার্চ থেকে—

একটি মেয়ের ঘিরে রাঙা-ছেলে 'মুখোমুখি' জীবনের ভিন্নমুখী সমস্যার আহ্বান!

উত্তরা : পূরবী : উজ্জলা : পদ্মশ্রী : অনন্যা : মেঘমল্লার : মায়া : অলকা : শ্রেষ্ঠ : অন্য : মীনা
শ্রীরামপুরে টকিজ : শ্রীকৃষ্ণ : বৈজয়ী : মেহাটী সিনেমা

এই হচ্ছেন নন্দিনী মালিয়া। ছটির সময়ের সঙ্গে যার জন্মক্ষণের এত মিল! লাজুক—অল্পভাষী। গভীর বেদনায় আচ্ছন্ন হয়েও হাসিখুশী আর চঞ্চলতার ভরা। চোখে যার বিদ্যুতের মেঘ ছড়ানো, কালো ভ্রূর বাঁকায় ঝলমলানি। আর ঠোঁটের আলগা সোহাগের আবীর ছড়ানো যেন।

আর তাই তিনি অমর হতে চান না। অমরের অনেক দুঃখ অনেক জ্বালা, অনেক বেদনা। সেই দুঃখ-জ্বালা-বেদনায় পাহাড় ডিঙিয়ে উঠল—অগণিত আনন্দ মল্লিনী আজ আবার ফেরারা হয়ে উঠতে চান। মনে মনে তেমন করে তৈরীও তিনি। শুধুমাত্র আলোর সংইচটা অন হবার অপেক্ষা।

নির্মল ঘর

নাটমঞ্চ

বালিগঞ্জ নাট্য সংঘের 'উলুখাগড়া'

বালিগঞ্জ নাট্য সংসদ সম্প্রতি পরিবেশন করলেন শম্ভু মিত্র রচিত 'উলুখাগড়া' নাটকটি। তিরিশ দশকেরও আগে রচিত নাটক যে ডেমেনডাবে মঞ্চে উপস্থাপিত করতে পারলে আজও দর্শকদের ভাল লাগে, তার প্রমাণ পাওয়া গেল সেদিন। এই কৃতিত্বের জন্য যেমন শম্ভু মিত্রর অনুপমী চিন্তাকে ধন্যবাদ জানাতে হয়, তেমনি প্রশংসা করতে হয় শিল্পীদের প্রচেষ্টাকে। এমন একটি জটিল কাহিনীর রূপায়ণ সত্যিই শিল্পীদের যোগ্যতা প্রমাণ করে।

অভিনয়েও শিল্পীরা প্রায় সকলেই প্রশংসার যোগ্য। বিশেষ করে শিবশেখর নস্কর, রত্না চৌধুরী গোপা গাঙ্গুলী ও অনুপম সেনগুপ্ত অভিনীত চরিত্রগুলি দর্শকদের অবাক করেছে।

এছাড়াও তরুণ সেন, ইন্দ্রাণী মজুমদার হিমাংশু দেবও সুন্দর।

অন্যান্য ভূমিকায় দীপক ভট্টাচার্য, অরুণ বর্মন ও প্রশান্ত মুখার্জী মোটামুটি স্বাভাবিক।

'ও সায়া সবা' গানটির গায়িকাকেও ধন্যবাদ তার সুরেলা কণ্ঠ ও সুন্দর পরিবেশের জন্য।

শিবশেখর নস্কর নাটকটি পরিচালনায় তাঁর যোগ্যতারই পরিচয় দিয়েছেন।

নির্মল হাসির নাটক স্বয়ংপ্রভা

নির্মল হাসির নাটক আজকাল আর প্রায় দেখাই যায় না। এখনকার নাটক প্রায়শই সিরিয়াস বক্তব্য ও সংলাপে ভরা থাকে। তার মধ্যে যদিও দুটি একটি চরিত্রকে দিয়ে হাসরসে পরিবেশনের চেষ্টা থাকে, সেটাও প্রায় সময়েই দর্শককে সেই আনন্দ দিতে পারে না, যা প্রাণখোলা এবং নির্মল।

সেই দিক থেকে বারেক ওন হলে নিয়মিত অভিনীত বনফুলের কাহিনী অবলম্বনে (নাটক দেবাশীষ গুপ্ত) 'স্বয়ং-প্রভা' নাটকটি সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম।

স্বয়ংপ্রভার গল্পাংশ সাধারণ। কিন্তু তাকে যেরকম ক্ষিপ্রগতিতে এবং মুন্সিয়ানার সঙ্গে মঞ্চে উপস্থাপিত করা হয়েছে এর জন্য নাট্যনির্দেশক শ্রীসত্য গোস্বামীকে ধন্যবাদ। আর যে হাসি এই নাটকের মূল লক্ষ্য সেই হাসি দর্শকদের মধ্যেও সহজেই ছড়িয়ে পড়েছে। এ বড় কম কথা নয়।

এ নাটকের বড় সম্পদ টিম ওয়ার্ক। এমন টিম ওয়ার্ক সচরাচর মঞ্চে দেখা যায় না।

অভিনয়ে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় নায়ক তপন চৌধুরী নায়িকা শেলী পাল, রঞ্জন দত্ত, সুনীত দাস ও স্বয়ংপ্রভা-রূপী গীতশ্রী দেবীর নাম। এঁদের অভিনয় দর্শক-দের বহুদিন মনে থাকবে। এমন স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতিময় এবং সাবলীল এঁদের অভিনয়।

এরপরেই নাম করতে হয় অমর চক্রবর্তী, নতুল চক্রবর্তী, লিলি সরকার ও দীপালি চৌধুরীর। এঁরাও বহুলাংশেই সুন্দর।

এছাড়া অন্যান্য ভূমিকায় সরোজ পাইন, হরাধন কুণ্ডু, স্বপন ভট্টাচার্য কালী গঙ্গোপাধ্যায়, গোপাল ভট্টাচার্য, সলিল ঘোষ, প্রশান্ত ঘোষ ও সুব্রত ঘটক স্বাভাবিক।

জানু বিশ্বাসের আলোর কাজ এ সংগীত পরিচালনায় গোপাল বসু, নাটককে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে।

এমন একটি সহজ হাসির নাটক দর্শক-দের নিশ্চয়ই আকর্ষণ করবে।

নাট্যসমালোচক

পরলোকে পালাসম্রাট ব্রজেন্দ্রকুমার দে

একদিন সোনাই দীঘি যাত্রা দেখার মানুষের উন্মাদনা হয়ত অনেকেই ভোলেন নি। এই নাটকের পিছনের মানুষটি যে আজও আমাদের মধ্যে ছিলেন সে খবর অনেকেই রাখেননি। আজ আর তিনি নেই। ব্রজেন্দ্রকুমার বিগত পঞ্চাশ বছর ধরে এক নাগাড়ে লিখে এসেছেন যাত্রাপালা। আরম্ভ করেছিলেন সখের দলের জন্য দিয়ে। সখের দীর্ঘ সময়ে লিখেছেন, বঙ্গবাসী, লক্ষ্যবিসর্জন, গঙ্গার ছেলে: রাজনন্দিনী, দেবতার গ্রাস, স্বাধীনের বলি, আকালের দেশ, মায়ের ডাক, বাঙ্গালী যাদের দেখে না কেউ, পালাবী কে, ধর্মের বলি, সোনাই দীঘি, চাঁদ বিবি, মহীয়সী কৈকেয়ী, জনতার অদালত, নটী বিনোদিনী বিদ্রোহী নজরুল, সীতার বনবাস—প্রায় ষেড়েপঞ্চাশখানি নাটক। তাছাড়া লিখেছিলেন অসংখ্য নাটা সংক্রান্ত প্রবন্ধ। মনে হয় আজও বাংলা নাট্যজগত নিয়ে এক অবিস্মরণীয় পালা রচনার হাত দিয়েছিলেন। যা শেষ করে যেতে পারেন নি।

ব্রজেন্দ্রকুমার দে-র সোনাই দীঘির সঙ্গে ইদানীংকার নটী বিনোদিনী রসিক দর্শক ও শ্রোতার মন কেড়ে নিয়েছে। এখনও নিচ্ছে।

ব্রজেন্দ্রকুমারের দীর্ঘকালীন সাধনার স্বীকৃতিস্বরূপ পালা সম্রাট নামে পরিচিত হয়েছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার আয়োজিত যাত্রা উৎসবে তাঁর নটী বিনোদিনী শ্রেষ্ঠ পালারূপে পুরস্কৃত হয়। মোহন অপেরা এবং রবীন্দ্র কানন যাত্রা সম্মেলন তাঁকে সম্বর্ধনা জানান। অভিনয় পত্রিকা আয়োজিত গুণীজন সম্বর্ধনায় তাঁকে সম্মানিত করা হয় লোকনাট্যগুরু হিসাবে। নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের বিগত তমলুক অধিবেশনে অন্যতম সেরা নাট্য-সাহিত্যিক হিসাবে তাঁকে এক হাজার টাকার বিশ্বরূপা পুরস্কার দেওয়া হয়।

শ্রীযুক্ত পেশাগত জীবনে ছিলেন শিক্ষক। দীর্ঘকাল শিক্ষকতা জগত জড়িত থেকে অবসর নিয়েছিলেন কিছুকাল আগেই।

ব্রজেন্দ্রকুমার যখন নাটক লেখা শুরু করেছিলেন সে সময়ে নাট্যকারদের অভাব ছিল না যাত্রাজগতে। কিন্তু তাঁর প্রবল খ্যাতি ও সম্মানের মূল কারণ তাঁর সহজ অথচ বলিষ্ঠ রচনাভঙ্গী। জনগণের মুখের ভাষাকেই তিনি রূপ দিয়েছেন পালায়। যাকে বলা যেতে পারে লোকশিল্পের ঢঙ। অপ্রয়োজনীয় স্বগতোক্তি ও দীর্ঘসংলাপ তিনি পালা থেকে বর্জন করেছিলেন। কারণ তিনি উপলব্ধি করেছিলেন সময়ের সঙ্গে তাল রেখে চলতে হলে এসব খোলস ফেলে এগিয়ে যেতে হবে। এমন একসময় ছিল যখন কৃত্রিম সংলাপ ও অতি-অভিনয়রীতিই আকর্ষণ করত শ্রোতাকে। ব্রজেন্দ্রকুমার দেখে-ছিলেন সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দর্শকের মানসিকগঠনও গেছে বদলে। উন্নত রুচির দর্শকের কাছে দীর্ঘ সংলাপ বিরক্তিকর, কোন আবেদন সৃষ্টি করে না। জনগণের কথা স্মরণ রেখেই তিনি সংস্কার করেছিলেন পালা নাটক।

আজকের পালা নাটকে ব্রজেন্দ্রকুমারের প্রভাব সুস্পষ্ট। বলা যেতে পারে, তিনিই যুগোপযোগী পালা নাটকের জন্ম দিয়েছেন ব্রজেন্দ্রকুমার।

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।

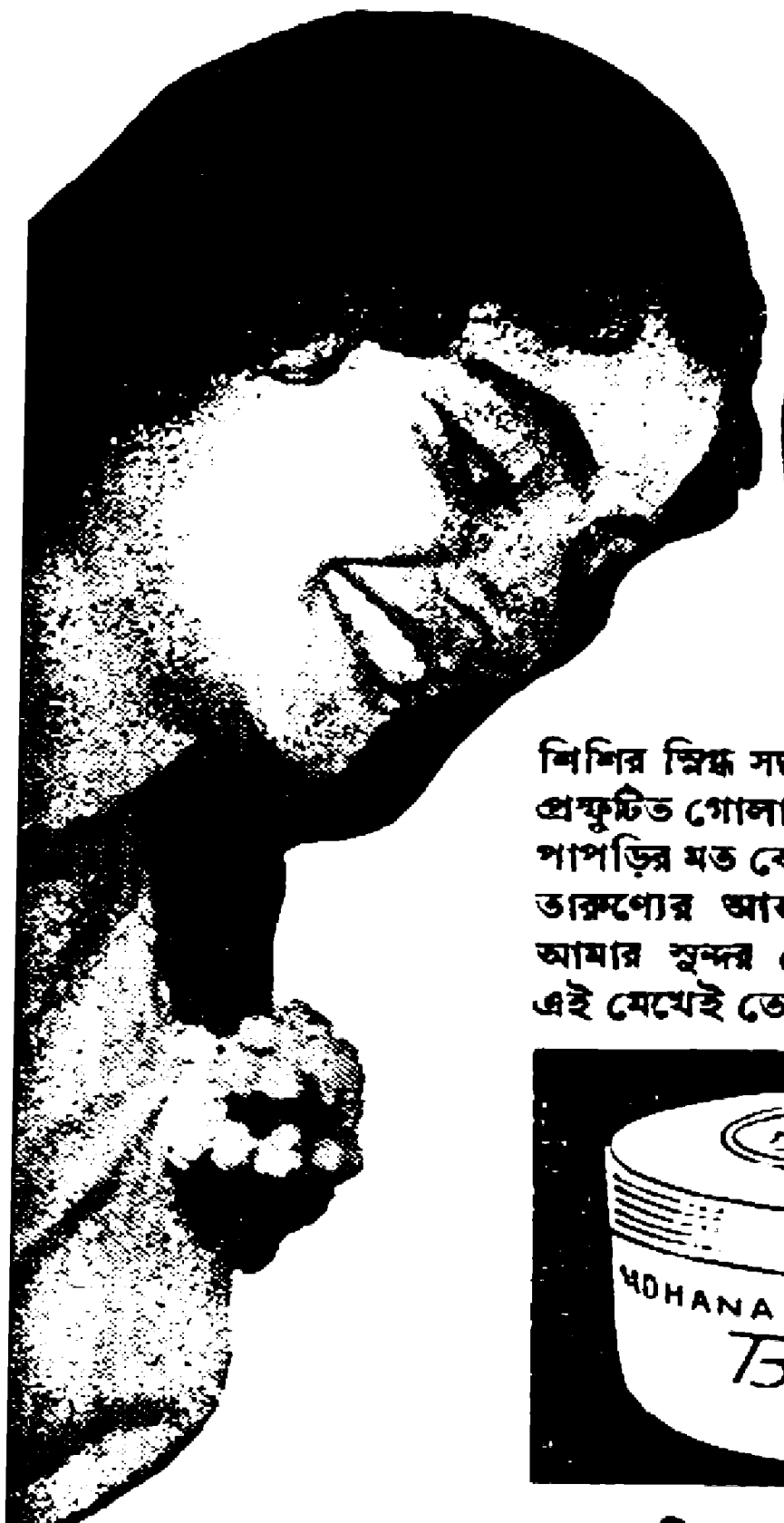

এর কোমল স্পর্শে সৌন্দর্য বিকশিত হয়

শিশির স্নিগ্ধ সন্ত
প্রস্ফুটিত গোলাপের
পাপড়ির মত কোমল ও
তারুণ্যের আভায় উজ্জ্বল
আমার সুন্দর দেহশ্রী
এই মেখেই তো।

সাধনা
বিউটি স্নো
একটি অতি আধুনিক
অঙ্গরাগ

১৪৩.১/১০

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা
কলিকাতা-৫

১২৭ বছরের অভিজ্ঞতায়
কুকমী গুঁড়ো মশলা
জনপ্রিয়তার সর্বোচ্চ
শিখরে

আমাদের
কোন ব্র্যান্ড
ও
নাম নেই

কুকমী
গুঁড়ো মশলা

প্রস্তুতকারক :
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাঃ লিঃ
(স্পাইস পাউডার ডিভিশন)
২৫৩, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা- ৭০০০৭০
পোষ্ট বক্স নং :- বড়বাজার ৬৮৮৫

CENTRAL LIBRARY

অমৃত

সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ /

১ এপ্রিল ১৯৮১ মূল্য ৭৫ পয়সা

UNIVERSITY OF CALCUTTA

১,০০,০০০ খুসী গ্রাহক

অর্থাৎ, ১,০০,০০০ খুসী পরিবার। খুসী—কেন না তাঁরা নির্বিঘ্নে-চালু কেলভিনেটর রেফ্রিজারেটর কিনেছেন। খুসী হওয়ার আরেক কারণ হ'ল যে তাঁদের বন্ধুবর্গ তাঁদের পছন্দর খুব তারিফ করেছেন। আর, খুসী হওয়ার পেছনে রয়েছে স্পেন্সারের নির্ভরযোগ্য সেবা পাওয়ার সুযোগ।

প্রত্যেক কেলভিনেটরের সঙ্গে বিখ্যাত স্পেন্সারের সেবালাভের গ্যারাণ্টী থাকে। সারা ভারতে শাখা প্রসারিত থাকায়, স্পেন্সারের কাছ থেকে অবিলম্বে, কার্যকর, সৌজন্যমূলক বিক্রয়োত্তর সেবালাভ সম্বন্ধে সুনিশ্চিত থাকা যায়। কেলভিনেটর সম্বন্ধে সবচেয়ে আনন্দদায়ক হ'ল যে কেলভিনেটর-ক্রেতা হিসাবে আপনাকে সব সময় মনে রাখা হয়।

কেলভিনেটরের অন্যান্য আকর্ষণীয় গুণ

- উপযুক্ত কার্যকর ডিজাইন দ্বারা বেশী জায়গা লাভ
- সিঙ্গল মোল্ড লাইনিং
- ম্যাগনেটিক ডোর গ্যাস্কেট
- পোলারস্ফীয়ার কম্প্রেসার
- সৌখীন, ছিমছাম ডিজাইন।

কেলভিনেটর

২৮৬, ১৬৫, ১৩৫ ও ৬৫ লিটার
সাইজে পাওয়া যায়।

স্পেন্সার অ্যাণ্ড কোং লিঃ

১৪৩ মাউণ্ট রোড, মাদ্রাজ ৬০০ ০০২
১৯-এ আলিপুর রোড, দিল্লী-১১০ ০০৬।
স্পেন্সার্স বিল্ডিং,
কোর্টেট স্ট্রীট, বোম্বাই-৪০০ ০৩৬।
ডায়মণ্ড হারবার রোড, খিদিরপুর,
কলকাতা-৭০০০২৩।

স্পেন্সার্স

১৮৬৫ সাল থেকে
সেবা করাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য

প্রত্যেক কেলভিনেটরের সঙ্গে
আই এস আই সার্টিফিকেট থাকে।

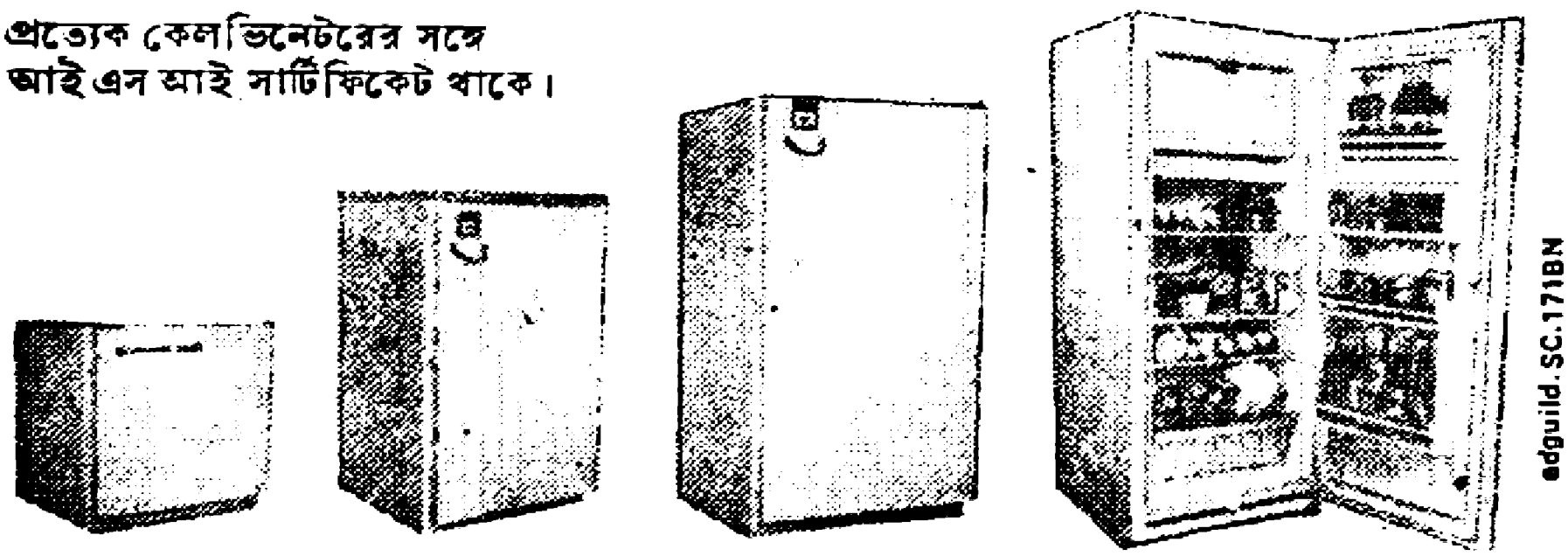

edguild.SC.171BN

প্রত্যেকটিই নিখুঁত! এই হ'ল স্পেন্সারের তৈরী কেলভিনেটর

সুভাষ সমাজদারের সোভিয়েত দেশ নেহরু পুরস্কারপ্রাপ্ত

গঙ্গা থেকে কাস্পিয়ান ১৮.

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের সাম্প্রতিক উপন্যাস

একাল চিরকাল ১০.

চিরঞ্জীবের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রয়াস

বিশ্বকাপ ফুটবল ২৫.

নিখিলচন্দ্র সরকারের সর্বাধুনিক উপন্যাস

সজনে নির্জনে ১২.

কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক উপন্যাস

থৈ থৈ হাহাকার ১৮.

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সাড় জাগানো উপন্যাস

চাঁদের কাছাকাছি ৭.

চিরঞ্জীব সেনের রহস্যোপন্যাস

মিরানজিয়া রহস্য ১০.

আবদুল জব্বারের স্মরণীয় রচনা

পল্লীর পদাবলী ১৬.

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের উপন্যাস

প্রেম ঘৃণা দাহ ৮.

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস

ভালোবেসেছিলাম ১৫.

শক্তিপদ রাজগুরুর উপন্যাস

অভয়ারণ্য

রুদ্রসাধব ভট্টাচার্যের উপন্যাস

স্বর্ণভ্রমর ১৪.

নিমাই ভট্টাচার্যের উপন্যাস

অন্যদিন ৪.

কল্যাণের উপন্যাস

খবরে প্রকাশ ১০.

সুচিত্রিতার উপন্যাস

মণ্ড ১০.

জ্যোতিবিন্দু নন্দীর উপন্যাস

স্বাতীওদীপু ১২.

নরেশ সান্যালের উপন্যাস

বিহঙ্গ বাসনা ১০.

অমরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস

সুবর্নাশীর ২০.

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের

নীলাঙ্গুরীয় ১২.

পরিতোষ মজুমদারের উপন্যাস

অগ্নিলতা ৫.

স্বারেশচন্দ্র শর্মাচার্যের উপন্যাস

পিছু ডাকে ৫.

ফণিভূষণ আচার্যের উপন্যাস

হারে কলকাতা ৬.

নিশিকান্তের উপন্যাস

হৃদয়ে নাবিক ৮.

সুবোধ ঘোষের গল্পগ্রন্থ

গলপ মণিঘর ১৪.

রবীন্দ্র লাইব্রেরী

১৫।২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩০০১২
ফোন : ৩৪-৮০৫৬

নারীবর্ষ শেষ হয়ে গেল

দীর্ঘজীবি হোক নারীযুগ!

নারীরা তাঁদের বিজয় বর্ষ পেরিয়েছেন,
পুরুষেরা তাই নিয়ে কৌতুকও করেছিলেন।
এখন এই 'যুক্ত নারীর' কি হবে?
উৎসাহটাই বড় কথা।
কারণ, যতই বলা বা করা হোক না কেন,
নারী বিশেষাধিকার পুরছেন না,
পুরছেন সুযোগ—জাতীয় জীবন স্রোতে
অংশ গ্রহণের সুযোগ।
স্টেট ব্যাঙ্ক সানন্দে তাঁকে এই সুযোগ দিচ্ছে—
অকুণ্ঠ সৌজন্যের মাধ্যমে
নিরপেক্ষভাবে।

স্টেট ব্যাঙ্ক

SBI-B-154 Ben

... শ্রীকুমারকান্তি ঘোষের ...

নতুন বই

চিত্র বিচিত্র

একাল-সেকালের বিচিত্র কথা
ও রসমধুর কাহিনী-সমারোহ

দাম : সাত টাকা

বেঙ্গল পাবলিশার্স

প্রাঃ লিমিটেড

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে

স্ট্রীট কলিকাতা—১২

সম্প্রতি প্রকাশিত

The Footprints on the Road to Indian Independence

শ্রীবিপিনচন্দ্র ঘোষ রচিত। ১৭৫৭ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত রাজনৈতিক ঘটনাবলীর কালানুক্রমিক ইতিহাস।

[টাঃ ১৫.০০]

Aurobindo and Jugantar

শ্রীঅরবিন্দ ও যুগান্তর সম্পর্কে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ রাজনৈতিক অধ্যায়ের প্রামাণিক তথ্যাবলী। [টাঃ ৫.০০]

স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন

পশ্চিমবঙ্গের অধ্যাপক ডঃ [illegible] ঘোষ প্রণীত তথ্যসমৃদ্ধ বিশ্লেষণমূলক ইতিহাসের রূপরেখা।

[টাঃ ২০.০০]

সংস্কৃত নাটকের গল্প

অধ্যাপিকা অমিতা চক্রবর্তী [illegible] ১০টি সেরা গ্রীক সংস্কৃত নাটকের সরলীকৃত গল্পরূপ। [টাঃ ৫.০০]

গিরিশ রচনাবলী পঞ্চম খণ্ড

গিরিশচন্দ্রের সমগ্র [illegible] পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত হল। [illegible] কবীর [illegible] বিল্বমঙ্গল [illegible]

[টাঃ ২৫.০০]

প্রাচীন হিন্দুস্থানের

[illegible] ডঃ নরেন্দ্রনাথ [illegible] সহজ বই।

গা [illegible] কা

[illegible]

১৩৮১ সালের মৌচাক পত্রিকা কর্তৃক
সুধীরচন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত
শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ রচিত
ছোট বড় সকলের মনের মত
বাংলা সাহিত্যের দু'খানি আশ্চর্য বই

বিচিত্র কাহিনী

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

মূল্যঃ—চার টাকা

(সপ্তম সংস্করণ চলছে)

ছোটদের উপযোগী সরস রচনা বাংলা সাহিত্যে খুব বেশী লেখা হয় নি। বিশেষ করে নানাবিষয়ে সত্য ঘটনা অবলম্বন করে ছোটদের মনের মত বিচিত্র রোমাঞ্চকর লেখা খুব সহজ নয়। 'বিচিত্র কাহিনী'তে লেখক সত্য ঘটনাগুলিকে নিজের সরস তুলিয়ানা দিয়ে এমন জীবন্ত আর আকর্ষণ করে তুলেছেন যে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি রচনাই অনবদ্য রস ও রোমাঞ্চে টইটম্বুর। মোট পনেরোটি কাহিনী ভিন্ন ভিন্ন রসের ফল্গুধারায় সিক্ত, বর্ণনায় মনোমুগ্ধকর।

'আরও বিচিত্র কাহিনী' বইটি কিশোর ও বয়স্কদের জন্য সমভাবে রচিত। লেখক শুধু ছোটদের জন্যই রস পরিবেশন করেননি, বড়রাও এই অমৃত আস্বাদন করে পুলকিত হবেন। অনবদ্য রস রচনাশৈলী এবং প্রতিটি কাহিনীর ভিন্ন ভিন্ন স্বর্ণ চুম্বকের মত পাঠককে টেনে নিয়ে যাবে। এ বইটিতে দশটি বিভিন্ন রসের কাহিনী রয়েছে এবং লেখক তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কাহিনীগুলি এমন সুন্দরভাবে রসযুক্ত করে উপস্থিত করেছেন যে পাঠককে বিমুগ্ধ করবে।

আরও বিচিত্র কাহিনী

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

মূল্যঃ—চার টাকা

(চতুর্থ সংস্করণ চলছে)

এ. সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ : ফোন ৩৪-১৭৮২

পৃষ্ঠা	বিষয়	লেখক
৩২	[illegible]	শ্রীঅমিয় সরকার
৩৩	পুনশ্চ	শ্রীপ্রফুল্ল রায়
৩৪	পুনশ্চ	শ্রীঅরুণকুমার
৩৫	অরুণা	শ্রীঅতুলি চৌধুরী
৩৬	মেঘলা দিনের গান	শ্রীনিলীপ ভট্টাচার্য
৩৯	মঠ থেকে বলছি	শ্রীপ্রণয় বসু
৪১	খেলাধুলা	[illegible]
৪৫	[illegible]	[illegible]
৪৬	[illegible]	[illegible]
৪৮	[illegible]	[illegible]
৪৯	[illegible]	[illegible]
৫০	[illegible]	[illegible]
৫১	[illegible]	[illegible]
৫৩	বিদেশের খোঁজে	
৫৫	কল উইদাউট সংবাদ	
৫৫	বিচিত্রকল্প	শ্রীনির্মলকুমার
৫৭	নাটমঞ্চ	শ্রীনান্দীমুখ
৫৮	[illegible]	[illegible]
৬০	[illegible]	[illegible]
৬১	বিবিধ সংবাদ	
৬১	নিবন্ধী ছবি	[illegible]
৬২	[illegible]	[illegible]
৬৩	[illegible]	[illegible]

প্রচ্ছদ : শ্রীনিতাই ঘোষ

সারদা-রামকৃষ্ণ

সন্ন্যাসিনী শ্রীমৎপ্রজ্ঞাত রচিত।

অনুবাদক—সর্বাধ্যক্ষানন্দ জীবনচরিত গ্রন্থখানি [illegible] হইয়াছে

অষ্টম মুদ্রণ চলিতেছে

গৌরীমা

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম মহীয়সী

সন্ন্যাসিনী শ্রীমৎপ্রজ্ঞাত রচিত।

ষষ্ঠবার মুদ্রিত হইয়াছে—৮.

দুর্গামা

শ্রীসারদেশ্বরীর মন্ত্রশিষ্যানন্দ জীবনকথা

শ্রীসারদেশ্বরী দেবী রচিত।

বেতার কথা:—[illegible] [illegible]

অসংখ্য ছবি [illegible]

সাধনা

[illegible]:—এমন [illegible]

পুস্তক বাংলায় [illegible]

পরিবর্ধিত ষষ্ঠ মুদ্রণ—৬·

শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম

২৬ গৌরীমাতা সরণী, কলিকাতা-৪

বিখ্যাত ডাটা গুঁড়ো মশলার প্রস্তুতকারক কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুকমী) প্রাঃ লিঃ এখন আপনাদের দিচ্ছেন একটি নতুন অতি সুদৃশ্য টিনের কৌটায় সবরকম গুঁড়ো মশলার অপূর্ব সংমিশ্রণ

এক কৌটা ডাটা রেডিমিক্সড কিচেন কুইন প্যাক কিনলে আর কোনরকম মশলা এমন কি পেঁয়াজ, আদা, রসুন প্রভৃতি আলাদা কাউ আর কিনতে হয় না। ডাটা রেডিমিক্সড কিচেন কুইন প্যাকের মাছ মাংস, ডিম ও সবরকম মুখরোচক তরিতরকারি অল্প সময়ে চটপট রান্না করা যায়। আপনার সবরকম রান্নায় আজই ডাটা রেডিমিক্সড কারি পাউডার (কিচেন কুইন প্যাক) ব্যবহার করুন।

ডাটা

রেডিমিক্সড কারি পাউডার

কিচেন কুইন প্যাক

প্রঃ কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুকমী) প্রাঃ লিঃ

২০৭, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭, পোষ্ট বক্স নং ৬৭৭৪,

ফোন: ৩৩-৩৪৩৭, ৩৩-১৭০৮

PAN—KCD-74

CENTRAL LIBRARY

ভাষার স্বীকৃতি

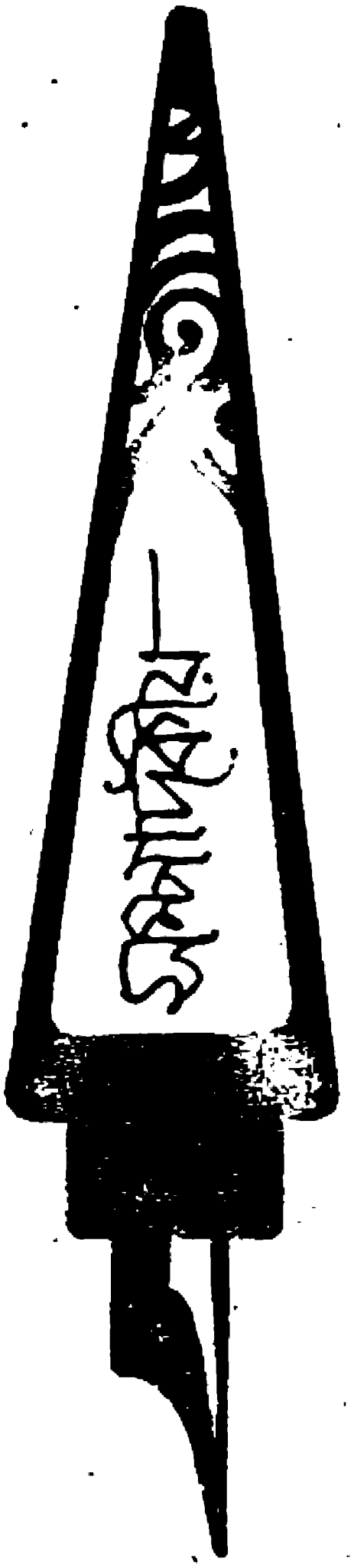

সাহিত্য আকাদেমি সম্প্রতি নতুন ভাষাকে স্বীকৃতি দিয়েছে। এই ভাষাগুলো হল নেপালী, মৈথিলি, ডোগ্রি ও রাজস্থানী। ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে অগুলো প্রধান তা উল্লিখিত হয়েছে সংবিধানের অষ্টম তপশীলে। হিন্দী, বাংলা, ওড়িয়া, অসমীয়া প্রমুখ প্রধান ভাষাগুলোর স্বীকৃতির অর্থ এই নয় যে অন্যান্য যে সমস্ত ভাষা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ ব্যবহার করে থাকে তার কোনো স্বীকৃতি নেই। আমাদের দেশে বহু ভাষা প্রচলিত। জাতিগোষ্ঠীর মতো বৈচিত্র্য, তার আচার্য, পোশাক এবং ভাষার বৈচিত্র্যও যথেষ্ট বিস্তর। একটি উপজাতিগোষ্ঠীর এই বৈচিত্র্য থাকাই স্বাভাবিক।

ভাষাগোষ্ঠীর ভিত্তিতে ভারতবর্ষ যখন রাজ্য পুনর্গঠন করা হয় তখন এই চিন্তা যে তা মনে ছিল না যে অন্যান্য বা সংখ্যালঘু ভাষার কী হল অথবা উপেক্ষিত থাকবে। গণতান্ত্রিক দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠের মর্যাদা যেমন স্বীকৃত, সংখ্যালঘুর দাবিও তেমনি সমান মর্যাদা। উভয়কে মিলিয়েই রাষ্ট্রীয় কাঠামো। ভাষার ক্ষেত্রে স্বাধীনতার পর সরকার নানাবিধ উদ্যোগ প্রকল্প গ্রহণ করেছেন। সাহিত্য আকাদেমি প্রতিষ্ঠা তার মধ্যে অন্যতম। আকাদেমির কাজ হল ভারতীয় ভাষাসমূহের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নে সহায়তা করা। বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর সাহিত্য কিভাবে পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হতে পারে তার জন্য আকাদেমি অনুবাদের কাজে হাত দিয়েছে। সাহিত্য আকাদেমি এবং ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট সক্রিয়ভাবে এবং পরিকল্পনামাফিক গ্রন্থ প্রকাশ করে ভারতীয় ভাষাসমূহের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে নিরত। সম্প্রতি একজাতীয় অভিধান প্রণয়নের জন্য আকাদেমি ও ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টের পারিচালনা পর্ষদ ও বোর্ডের ভীত দ্বৈধ অনুভব করা গিয়েছিল যে তাদের প্রকাশিত গ্রন্থের প্রতি আগ্রহ হ্রাসপ্রাপ্ত। তার কারণ এই যে অনেক গ্রন্থের মূল্য বেশি ও তা সাধারণ পাঠকের নাগালের বাইরে। তাছাড়া অনুবাদের কাজে যে ভাষাজ্ঞান ও সাহিত্যবোধ থাকা দরকার তার অভাব এই কাজ সুসম্পন্ন করার পথে বাধা সৃষ্টি করে।

সাহিত্য আকাদেমি এবং ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট ভারতীয় ভাষার অগ্রগতির সহায়কারূপে চিহ্নিত হবার দাবি রাখে। এজন্য প্রতি বৎসর বিভিন্ন ভাষার শ্রেষ্ঠ লেখকদের সম্মানিত সাহিত্য আকাদেমির একটি দায়িত্ব করণীয়। ভারতীয় ভাষায় কী কোন্ গ্রন্থ এবং কাদের লেখকের সমগ্র রচনা তা খুঁজে বার করে নির্বাচনের সময় তুলে ধরা আকাদেমির দায়িত্ব।

অনুরূপ দায়িত্বই তার ওপর অর্পণ করল আরও দুটি ভারতীয় ভাষাকে স্বীকৃতি দিয়ে। নেপালী পার্বত্যাঞ্চলের দার্জিলিং জেলার একটি প্রধান ভাষা। এছাড়া উত্তর প্রদেশ, বিহারে এবং আন্দামানে নেপালী উপনিবেশ ছড়িয়ে আছেন। মৈথিলী ও ডোগ্রি পূর্বাঞ্চলে হিন্দীরই রকমফের বলে চালাবার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু তা সত্য নয়। এই দুটি ভাষায় অনিন্দ্যসুন্দর সাহিত্যকর্ম রচিত হয়েছে। মিথিলার কবি বিদ্যাপতি বিহারে ও বাংলার প্রিয়কবি। ডোগরীতে রচিত সাহিত্যও পাঠক ও সমালোচকদের প্রশংসা পেয়েছে। কোঙ্কণি মহারাষ্ট্রের এবং গোয়ার অন্যতম ভাষা। এই ভাষার প্রাচীনত্ব সাহিত্যের ইতিহাসবিদেরা স্বীকার করেন। মারাঠী ভাষার সঙ্গে এর সাদৃশ্য থাকলেও কোঙ্কণি একটি পৃথক ভাষা। কাশ্মীরি ভাষা সংবিধানে স্বীকৃত হলেও ডোগরি ভাষা সবেমাত্র সাহিত্য আকাদেমির স্বীকৃতি পেল। জম্মু ও কাশ্মীরে ডোগরি ভাষা প্রচলিত। এই ভাষায় লোকসাহিত্য এবং আধুনিক সাহিত্যও রচিত হয়েছে। রাজস্থানী ভাষার সৌন্দর্য ও সুকুমার পাঠকদের আকর্ষণ না করে পারে না। যদিও রাজস্থানে হিন্দীভাষাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে সাধারণ লোকের মুখে রাজস্থানী কথাই শোনা যায়। সাহিত্য আকাদেমি এই ভাষাগুলোকে স্বীকৃতিই দিয়ে সাহিত্যানুরাগীদেরই শুধু নয়, কৃতজ্ঞ করল না সাধারণ মানুষের আশা ও আকাঙ্ক্ষাকেও রূপায়ণে সহায়তা করল।

সাহিত্য আকাদেমির স্বীকৃতিই অবশ্য কোনো ভাষার শেষ কথা নয়। আকাদেমি জীবন্ত ভাষাকেই পোষকতার দ্বারা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু ভাষাকে জীবন্ত রাখার দায় সাহিত্যিকদের এবং যাঁরা এই ভাষা ব্যবহার করেন তাঁদের। লাতিন বা সংস্কৃত ভাষার তুলনা নেই। কিন্তু এই ভাষা দুটির ঐতিহাপূর্ণ অতীত এবং শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি সত্ত্বেও দেশে থাকতে পারল না যেহেতু জনসাধারণের মুখ থেকে তা সরে গিয়ে পণ্ডিতদের মঞ্চে আশ্রয় নিয়েছিল। তেমন সাহিত্য আকাদেমি যে কটি ভাষাকে স্বীকৃতি দিল তাদের ভবিষ্যৎ উৎকর্ষ নির্ভর করবে এই ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ এবং শিল্পী-সাহিত্যিকদের ওপর। রাষ্ট্রীয় পোষকতার প্রয়োজন অনস্বীকার্য হলেও বলা যায় যে ভাষার স্বীকৃতি সাহিত্যানুরাগীদের কাছেই সবচেয়ে। তাঁরাই ভাষাকে জীবন্ত রাখেন এবং তাঁদেরই প্রচেষ্টায় ভারতীয় ভাষার উদ্যানে শতপুষ্প বিকশিত হয়ে ওঠে।

CENTRAL LIBRARY

কুয়াশা

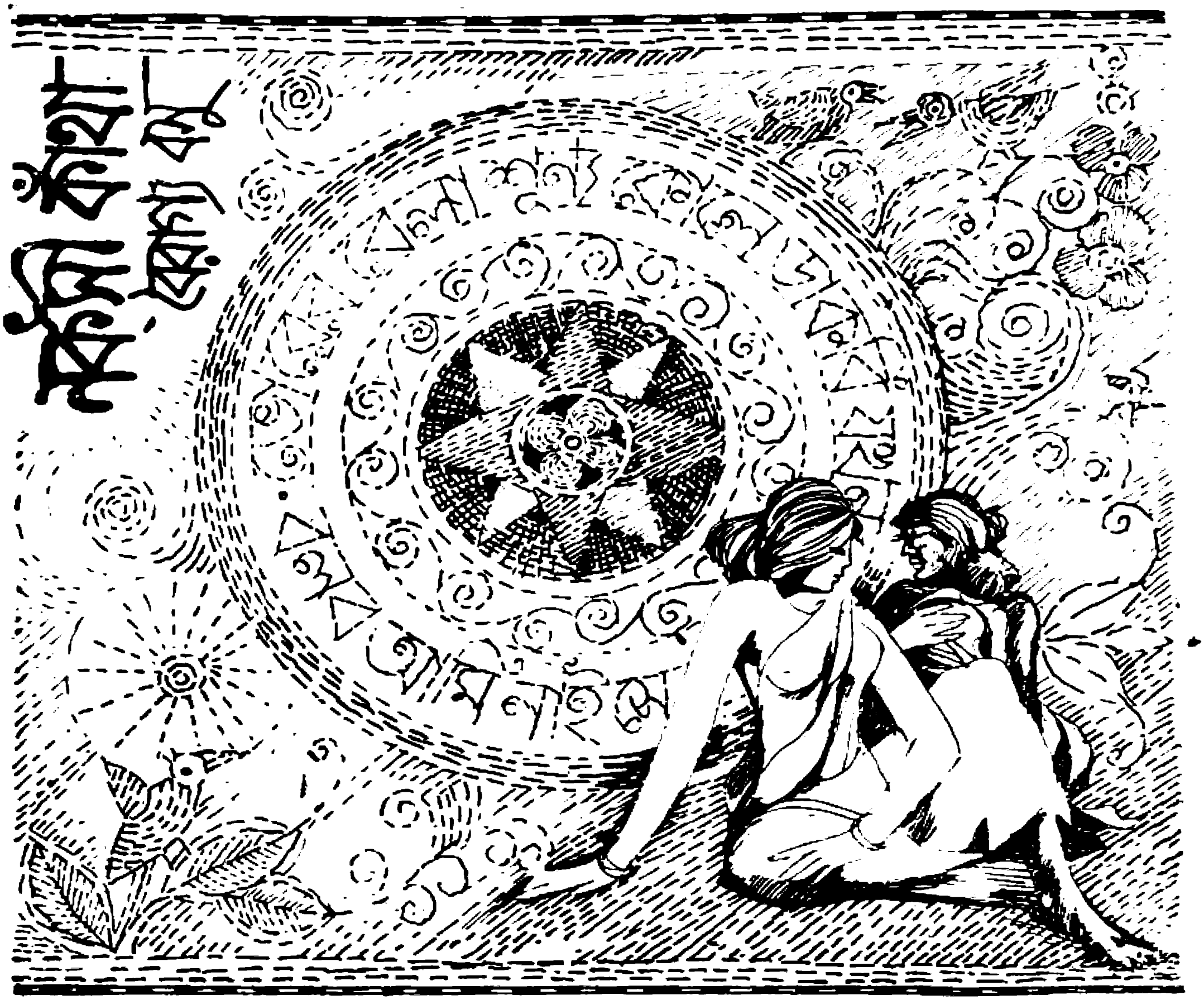

না: ! মাসের পয়লাই নেই ! হারুর মা গজর গজর করতে থাকে।

মেঘলা কেবল চুপচাপ শোনে। শোনে শাশুড়ির গজগজানি আর বুকের কাছে পুটলি করে ধরা নমাসের সন্তানের স্বাপ্টানোর প্রচণ্ড শব্দ। বুড়ি বলতেই থাকে—তোরে বল্লাম, মগা-বউ ব্যালা যে হচ্ছে, তাড়াতাড়ি কর। তা না—ইখন..... । মেঘলা কিছু উত্তর দেয় না।

ঘুম থেকে উঠতে আজ বড্ড দেরিই হয়ে গেছে। মেঘলা কুঁড়ের বাইরে এসে দেখে গ্রামটা প্রান্তরভরা কুয়াশা। মাঠ-পালা, খেত সবই পাতলা চাদরে ঢাকা। সূর্যের মুখ না দেখতে পাওয়াই সামিল। দুয়োরে গোবর-জল ছড়া দেওয়া শেষ করে দাঁত মাজি দিতে দিতে ডাক দেয় বুড়ি শাশুড়ি—অ বউ, হল তোর?

পুরনো কাপড়ের চার ভাঁজ থোকনকে ছাড়িয়ে নিয়ে কাঁপতে কাঁপতে উঠোনে বেরিয়ে আসে মেঘলা। তারপর শাশুড়ির সঙ্গে সে আলপথ বেয়ে চলতে থাকে।

পৌষের প্রথম দিক। ধনকাটা প্রায় সারা হয়ে এল। খেতগুলো কাঁকা। খড়ের গন্ধে গন্ধে ভূতের ওপর শিশিরেরা আসন পেতেছে। মাকড়সার জালেও শিশির ঝলমল করছে। খালি পায়ে চলতে চলতে পা ভিজে যায়। পায়ে গাঁড়ো গাঁড়ো মাটি লেগে কাদা হয়।

হারুর মা খুনখুনে বুড়ি হলে কি হবে? বেশ দ্রুতই চলছে সে। কোমরটা সামনের দিকে একটু নুইয়ে। গায়ের কাপড়খানার ওপর একটা পরনো কম্বলের ছেঁড়া টুকরোর বুক পর্যন্ত ঢেকে নিয়েছে। তার হাতে একটা পুটলি। তাতে মুড়ি আর ভেলিগুড়। হামপাতালের লাইনে বসে বসে ওরা খেয়ে নেবে। ওরা খেয়ে বেরোয়নি। শেষ হয়ে যাওয়ার ভয়ে মেঘলা দ্রুত চলতে চলতে একটা শূন্য ছেঁড়া জামার ভেতর থেকে বের করে খোকনের মুখে গুঁজে দেয়। খোকনের জোরেই টসর ঘড়ঘড় শব্দটা থামে। চকচক করে সে স্তন্যপান করতে থাকে।

পাকা রাস্তায় উঠে বুড়ো বটগাছের বাস-স্ট্যান্ডে দাঁড়াতে তখনো বাকি আছে। কিন্তু পথ বেয়ে দ্রুত পদক্ষেপে ওরা এগোতে থাকে। ভোরের বেলা তায় বেশ জাড়-শীত। একটা চলতে হাক তো পেয়ে যাবেই। হারুর মা মেঘলার পেছনে পড়ে গেছে।

চমকা কুয়াশা যেন সরে যায়। সূর্যের ঝলমলে মিষ্টি হলদে রোদে চারদিক ভরে যায়। মেঘলা আড়চোখে বুড়ির দিকে চায়। হারুর মা জিভের

পড়েছে। কোমরে বাঁ হাতখানা রেখে সোজা হয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করছে। তারপর সূর্যের দিকে খানিক চেয়ে খনখন করে চেঁচাল—বলি অ মঙ্গাবউ? ব্যালাটা কত হল দেখলি? এাই তর জনিা দেরটো হল! সূর্য তো মাথার উপর। আর মেয়ে কি হবে গা? মর.....মর...। ছেনাটাকে মার, নিজেও মর! মেঘলা চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে; নিজেদের গরুর দিকে তার দৃষ্টি—।

গ্রামের নাম পারুলিয়া। চারদিকে জমি-জমা বিস্তীর্ণ ধানখেত প্রসারিত হয়ে দিগন্তে বিলীন হয়ে গেছে। গ্রামটা অবিশ্যি তেমন সম্পন্ন নয়। পুবের দিকে দশ বারো ঘর জন-শ্রমিক বাস করে; দক্ষিণে ছ-সাত ঘর গরীব ভাগচাষী আর পশ্চিমে কয়েক ঘর বাগ্দী। উত্তর-ঘেঁষা ঘর কেবল চারঘর অবস্থাপন্ন চাষী। উত্তর দিকেই চওড়া আলপথ বেয়ে এগোলে এটা বিলক্ষণ ভাগ্যি চোখে পড়ে। তার ওপরে ছকঠরী প্রাইমারী স্কুল টালির ছাদ মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে। গায়ে সিমেন্টের অল্পবিস্তর প্রলেপ। আর ঐ ডাঙ্গার কিছুদূর দিয়ে শীর্ণকায় সাবং নদী বয়ে চলেছে। জনাদা গ্রামের ছেলে-মেয়েরা নদী পেরিয়ে এই স্কুলে পড়তে আসে। স্কুলের পাশ দিয়ে আর একটু পথে এগোলে ধনী কৃষক তারণ মল্লিকের দোতলা পাকা বাড়ি। তার বাঁদিকে বিশ-পঁচিশ হাত পরে অবস্থাপন্ন চাষী কুবের দাসের আটচালাখানা।

এই মোটামুটি গ্রামের চৌহদ্দি আর অবস্থান। শহর এখান থেকে আট ক্রোশ দূরে। যেতে হলে একটি করে টাকা মাথা পিছু লাগে। তার আবার মাইল দেড় আলপথ ভেঙ্গে নতুন পাকা সড়কে উঠতে হয়। বুরিওলা বুড়ো বটগাছের তলায় বাস থামে।

সেই বটতলা থেকে মেঘলারা বাড়ির উদ্দেশে ফিরে চলল। বুড়ি হারুর মায়ের বকুনি আর যেন থামতে চায় না। আট মাস ধরতে না পারার সমস্ত দোষ আলসে মগাবোয়ের—এটা সে তাকে জানিয়ে দিতে চায় এবং তার অতি আদরের বাপ-মরা নাতিটির যদি তেমন কিছু হয় (শত্রুরের হোক। তো সে-দায় সমস্তই মগাবোয়ের।

মেঘলা পূর্ববৎ নিরুত্তর থাকে। তার মন এখন আবার অন্য চিন্তে ভিড় করেছে। কাঁথাটা শেষ করতে হবে। নকসী কাঁথাটা। নানা কাজে সেটা আর শেষ হয়ে উঠছে না। খোকনের খুংড়িকাশি—সে তো জন্ম থেকেই লেগেই আছে। খানিক অযত্নে, অচিকিৎসায়, খানিক শীতের প্রকোপে। আজ যাব, কাল যাব করে সহরের হাসপাতালে আর যাওয়া হয়ে ওঠে না। আর উঠবেই বা কি করে?

সারাটা বেলা বুড়ি শাশুড়ির কাছে এ-তার ঘরে চালপাছড়, মুড়ভাজা, খাপরে খেতে আসে না প্রায়ই। ওটি তার সংসার খরচ বাঁচানোর পন্থা! সকালে কবুরে বাড়ি কাজ পড়লে সেটা সে দুপুরে নাগাদ করার ব্যবস্থা করে নেয়। তাহলে গেরস্তঘরে দুপুরে দু-মুঠো ভাত, ভাতের ওপর ডাল-তরকারিও জুটে যায়। কোন গেরস্ত আর দুপুরে একটা লোককে খালি পেটে খাটিয়ে মারতে চায়

তা বলে কি মেঘলার কাজ কম না রান্নাবাড়ায় জনিস কিছু কম লাগে? দিনের বেলা তাকে পুরোটাই খাটতে হয়। সূর্য যখন পশ্চিমে ঢলে, বিকেলের রোদ পড়ন্তের আমেজ কাটাতে আর সমর্থ হয় না তখন তার হাঁফ ছাড়তে সময় জোটে।

দুবেলার খাওয়ার জোগাড় একবেলায় করে রাখতে হয়। ডাল-ভাত, একটা চচ্চড়িতেই ঘণ্টাচার কেটে যায়। তারই মধ্যে খোকনকে সামলাতে হয়। স্তন দিতে হয়। পেচ্ছাপে ভিজে চট রোদে মেলতে হয়।

আকুল করে শব্দ কোলের মধ্যে এখন হেলদুলানো কণ্ঠে খোকন কাঁদছে। হাত-পা ছুঁড়তে পারছে না, কোলের মধ্যে শরীর মোচড়াচ্ছে। মেঘলা তার সন্তানের অসহিষ্ণুতার খবর রাখে। খোকন কতটা অস্বস্তি বা কষ্টবোধ করছে তা মেঘলা অনুভব করতে পারে। কিন্তু মায়ের মনও পাথর হয়ে যায় বুঝি একেক সময়! তবে কি মেঘলা তার সন্তানকে ভালোবাসে না? সে পাছ নকতে তার কুলকে কুটির ফলকে গড়ে তোলে, তার প্রতি কি গাছের মমতা নেই?

হাঁটতে হাঁটতে মেঘলার মনও আনমনে চলতে থাকে। মেঘলার বাপের আর্থিক অবস্থা মোটামুটি। দু দাদা চাষের কাজে সর্বদা ব্যস্ত। খেটেখুটে যা হয় তাতে তাদের সম্বৎসর চালাই যায়।

মেজদাই একদিন খবরটা দিল। পারুলিয়া গ্রামের হারু তার পাঠশালার বন্ধু। এখন সে শহরের জুট মিলে চাকরি করে। মেঘলার এখনও বেশ মনে আছে মেজদা চাকরি শব্দটা বেশ জোর দিয়েই বলেছিল। আসলে চাষ-বাসটা কাজ আর চটকলের কাজটা কাজ নয় তার চেয়েও মূল্যবান—চাকর এ রকম একটা তফাৎ বোঝাতে মেজদা বোধহয় কথাটা বলেছিল।

তখন মেঘলা রাঙা ডুরে শাড়ি পরে। দেহে যৌবনের বান না নামুক জল নেমেছে। গায়ে মাজে-সাজে সেমিজও দেয়। মাথার চুল লালচে ভাব ছেড়ে কুচকুচে রং ধরতে আরম্ভ করেছে। শ্যামলা বর্ণে টানটান ভাব লেগেছে।

মেজদা মাকে বলছিল—মেঘুর যদি ওখানে বিয়ে হয় তো ভাল। নন-জাতের গা-গতর নেই। এক করতে বুড়ি সাতটি তার অতি ভাল মানুষ। খোঁত-টোত নেই বটে তবে বাস্তু তো আছে। আর ফি-মাস পুজোর কাচা পয়সা!

হেঁসেল ঘরে মেঘলার সামনেই এসব কথা হচ্ছিল। জামবাটিতে হাতের গোছ ডুবিয়ে পালতো খাচ্ছিল মেঘলা। হাঁড়িঘাঁড় ধোওয়া শেষ করে পুকুরঘাটে হাত-মুখ ধুয়ে জামতলায় দিদিমার কাছে দৌড়ে গিয়ে বসে। দিদিমা তখন আধ-শুকনো ঘুঁটেগুলো তোলে উলটে পালটে দিচ্ছিল। মেঘলাকে দেখে শুধোল—খাওয়া হল? মেঘলা ঘাড় নাড়তে বলল—যা, ইবার কাঁথাটা নিই বসগে যা। মেঘলা বলে—দাঁড়াও না বাপু! একটু ভাত জিরেনটা নিই। তোমার ঐ এ্যাক কথা—কাঁথা শেষ কর কাঁথা শেষ কর! দিদিমা মৃদু হাসে—দ্যাখ মগা, মোর ঐ এ্যাক বিলো তা তোকে দি যাচ্ছি। দ্যাখবি কতই উবগারে লাগে!

মেঘলা কাঁথা তৈরী শিখেছিল দিদিমার কাছে। এমনি কাঁথা না নকসী কাঁথা। পুরনো কাপড় জোড় দিয়ে গায়ে দেবার ভারী কাঁথা। তার ওপর কারে রাঙা নীল দেওয়া সাদা ওয়াড়ে নকসা তোলা। সেটাই ভারী কঠিন কাজ! কলের সুতো জোটে না। পুরনো কাপড়ের নানা রঙীন পাড়গুলি ছিঁড়ে তার থেকে নানান রঙের সুতো একটি একটি করে বাছা, সেগুলি ছুঁচে পরিয়ে তা দিয়ে নকসা তোলা। মেঘলা অনেকটা আয়ত্তে এনেছে। সে আবার নকসা ছাড়াও বাড়তি কিছু কাজও করে। সে পাঠশালে তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছে। অনেক ছড়া তার ঠোঁটস্থ। সেসব ছড়া শুনে কাঁথায় তোলে। এটি তার নিজস্ব কৃতিত্ব। দিদিমা তাতে খুশি। নাতনীর বিদ্যের সঙ্গে বুদ্ধির যোগসাজস ঘটিয়ে দেয় সে। নকসী কাঁথা তৈরীর সমস্ত কৌশলগুলি সে নাতনীকে উজাড় করে দেয়।

পাঠশালে পড়া, ঘর-গেরস্থালীর কাজ-কর্ম জানা নকসী কাঁথা তৈরীতে সিদ্ধা মেঘলাদাসীর অবশেষে একদিন বিয়ে হয়ে গেল। হারুর সঙ্গে।

মেঘলার তৈরী ভারী নকসী কাঁথাটা শীতকালে গায়ে দিয়ে বিস্ময়ে ভরে ওঠে হারু—এ্যাতো অপরূপ তুমার হাতের কাজ! মেঘলা স্মিত হাসে। হারু কাঁথাখানা মেলে দেখে। অজস্র লতা-পাতা ফুল আর আলপনার নকসায় মাঝে সুন্দর করে লেখা—'সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে।' এ কথাটি মেঘলা দিদিমার মুখ থেকে শুনেছে। দুয়েকটি সামান্য ভুল সহ সেটি কাঁথায় সূচিস্থ।

হারু আদর করে মেঘলাকে কাছে টেনে নেয়। বাক পোয়ালে হারু সহায় চলে যাবে। আবার এক হপ্তার না দেখা, না কথা, না ছোঁওয়া, না ভালোবাসা। মেঘলা সরে যায়। দুজনে মিলে দুজনের মনকে ভালোবাসে দেহকে ভালোবাসে। ভালো-বাসার উত্তাপে দুজনে গলে যায়। একাত্ম হয়ে ওঠে।

এভাবে দিন কাটে। বেশ কাটে! পারুলিয়ার প্রতিটি দিন মেঘলার হৃদয়ে গাঁথতে হয়ে যায়। এ গ্রামটিকে তার যেন জন্ম-জন্মান্তরের সঙ্গী বলে মনে হয়। কাজের ফাঁকে ফাঁকে সে অপলক

লে দুর্ঘটনায় মারা গেছে চটকলের বাঁধা শ্রমিক ছিল। তাই তার কোন টাকা-কড়ি নেই। কলের মালিক তাকে ভিখারী। হাতুর পরিবারকে টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করে।

র শ্রমিক বন্ধুরা হাসপাতালে ছাড়ার পর রেহটা সাহেবের টে লাভ করে ফেলেছে। একজন টাকা কটা নিয়ে

বুড়ি কাঁদতে থাকল তারস্বরে যতক্ষণ দম থাকল। তারপর ক্লান্তভাবে ফোঁপাতে ফোঁপাতে এক সময় নিস্তব্ধ হয়ে গেল। কেবল মাঝে মাঝে বুকের ভেতর কাঁপনে হু-হু শব্দ এবং বেরিয়ে আসতে থাকল। আর মেঝেয় স্থাণুর মত দাওয়ার বাঁশ ধরে দাঁড়িয়ে রইল।

প্রতিবেশীরা সবাই যার যার কাজের দিকে আস্তে আস্তে চলে গেছে। এখানে লোকের ইচ্ছায় প্রস্তরীভূত যেন অচেতন শিশু সে ঘুমোচ্ছে আর দুটি মানুষ তার সজাগ চিন্তায়

সেই গ্রাম সেইসব মানুষ

মনোজ বসু

॥ ১৬.০০ ॥

॥ ডক্টর অমলেন্দু বসু ॥

...এ-কাহিনীতে একটা মহাকাব্যোচিত এপিক-সম্পত বিশালতা, গভীরতা, সূক্ষ্মতা, ব্যাপকতার রূপ ধরা পড়েছে, এ-কাহিনীতে একই কালে সংহত ও উচ্ছলিত, মালবী অঞ্চলের স্নিগ্ধ রহস্যময় এবং রৌদ্রতপ্ত প্রান্তরের সর্বপ্রকট প্রকাশ্যতা।...কাহিনী মহাকাব্যোচিত হলেও তার কাহিনীকথনের কলা-কৌশল মহাকাব্যপ্রকরণের চেয়ে অনেক বেশি জটিল, বিচিত্র এবং (স্বভাবতই) আধুনিক। এই কাহিনীতে বহু বিচিত্র শিল্পের প্রকরণ আশ্চর্য নম্রতায় সম্মিলিত হয়েছে : কাব্য, গল্পরীতি, চিত্রশিল্প, সংগীতশিল্প—সবই যেন মনোজ বসুর সৃজনীকল্পনায় জড়িয়ে গেছে হয়তো তাঁর নিজেরই অজ্ঞাতসারে...

॥ ডক্টর অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা-বিভাগের সর্বপ্রধান)

...একাসনে বসে পড়ে ফেলার বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করেছি।...এটি শ্রীযুক্ত বসুর সর্বাধুনিক উপন্যাস, এবং আমার মতে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা। শুধু তারই বা কেন, সাম্প্রতিক উপন্যাসের পরপর সারির দিকে তাকিয়ে মনে হয়, মনোজ বসু মহাশয় প্রবীণ নবীন সকলকে ম্লান করে দিয়েছেন। এই কথাগ্রন্থখানি বিলীয়মান গ্রামীণ জীবনযাত্রার একখানি 'সাগা' গ্রন্থে পরিণত হয়েছে। এই উপন্যাস, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, একালের বাংলা কথাসাহিত্যে একক মহিমায় বিরাজ করবে এবং অল্পকালের মধ্যেই এটি চিরায়ত সাহিত্যের মর্যাদা পাবে।

॥ ডক্টর ভূদেব চৌধুরী ॥

(বিশ্বভারতী বাংলা-বিভাগের সর্বপ্রধান)

...নিজেকে লেখক পরিপূর্ণ করে পেয়েছেন, একাধারে তাঁর বস্তু তাঁর বিশ্বসত্তার চূড়ান্ত সত্যকে—এই দুর্লভ ঊর্ধ্বগত আধ্যাত্মিকতার স্পর্শ-গভীর সেই পরিপূর্ণতাকে উপলব্ধি তাকে উদ্বোধিত করেছে, সমগ্র [illegible] পাওয়ার পরিতৃপ্তিতে ভরে রেখেছে সকল চেতনাকে...

গ্রন্থপ্রকাশ ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিঃ—৭৩

শ্বশুরকে ডাকবে কিনা তখনও সময়-ক্ষেপ করতে লাগল।

রাত বাড়ল। জোড়াসনার হেড পিতাম্বিত হতে থাকল। তবু মেঘলা আর তার বুড়ি শাশুড়ি বাইরের দাওয়া ছেড়ে তার ঘরে ঢুকল না।

কথায় আছে সময়ে সব সয়ে যায়। শোক তো একটা মস্ত আঘাত। তত সহস্র আঘাতের সময় তার প্রবাহ দিয়ে উজাড় করে নিয়ে যায়। মানুষ আবার স্বাভাবিক অনুভূতির বশবর্তী হয়।

হারুর শ্রাদ্ধ-শান্তি চুকলে মেঘলার বাবা অবলাকে নিয়ে যেতে চাইল। হারুর মা রাজি দিলেও মেঘলা যেতে চাইল না। নিজের কিছু অনুভূতি ছিল না। শুধু বলল—না বাবা, ইখান থিকে যাবনি। আর কোনো কথা না। সেই থেকে এভাবেই দিন কাটছে মেঘলার। খোকনকে নিয়ে বুড়ি শাশুড়িকে নিয়ে, নিজেকে নিয়ে। বাপের বাড়ির সমস্ত মায়া-মমতাকে সে নির্লিপ্তভাবে প্রত্যাখ্যান করল।

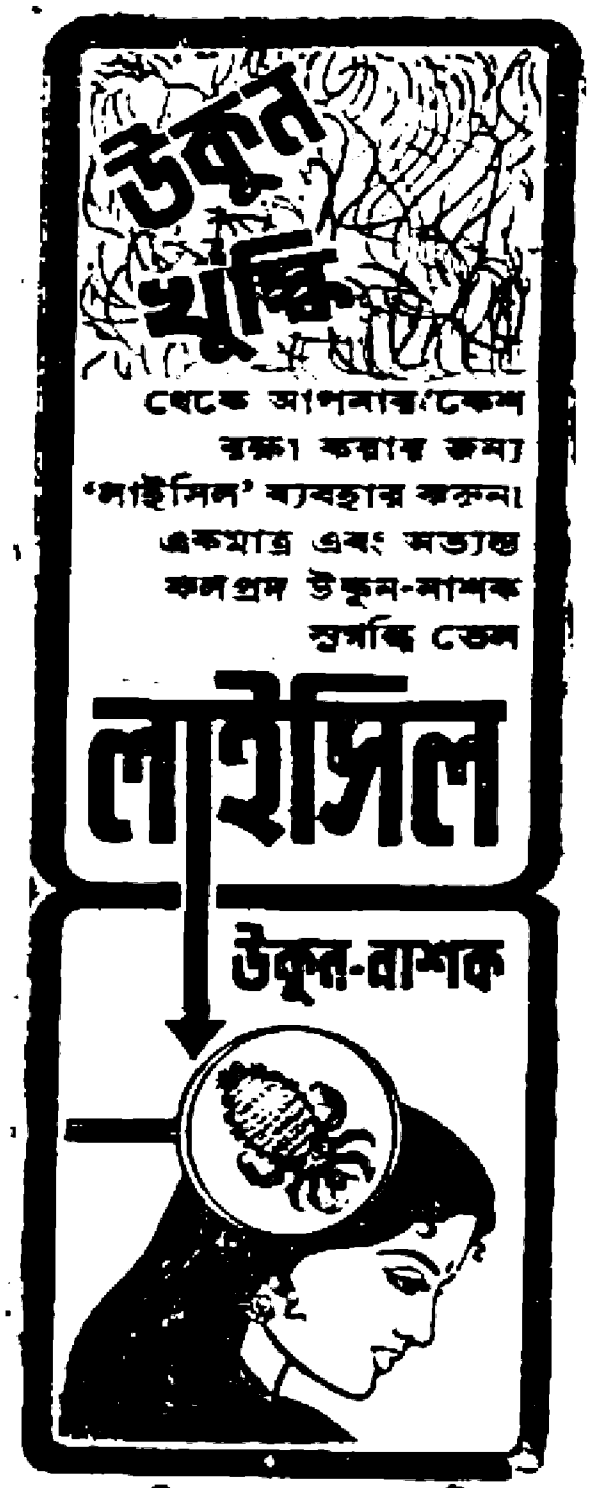

সুড়ি শাশুড়ি পেছন থেকে চেঁচিয়ে ওঠে—অ মাগ-বৌ! এই আস্তে হাঁট না। বুকে যে হাপ ধরে যায়ল! আপনমনে চিন্তায় জটিল বেই এতক্ষণে হুঁশ ফিরে এল মেঘলা। আপনমনে মেঘলা দ্রুতই চলছিল বটে একটু, খেয়াল হল না। খোকন বুকের মধ্যে পরম নির্ভরতায় এখন ঘুমোচ্ছে। শ্বাসের তালে তালে ওর শরীর ওঠা-নামা হচ্ছে। মেঘলারও দ্রুত নিশ্বাস পড়ছিল। এগিয়ে এসে তার সঙ্গে ধরল শাশুড়ি। বকতে লাগল—ইভাবে তুই কদ্দিন চলবে? মুই আর ত পারিনি। দুইও বাপের ঘর গ্যালিনি প্রায় বচ্ছোরেও দ্যাখলিনি! ছেয়ে-চিত্তে কি পেরাণ ধারণ হয়? আজও দিনটা এ্যামনি গ্যালো কালের বাজ হল কই?

এতক্ষণে কথা কয় মেঘলা। বলল—মা কাল নকসী কাঁথাটা মল্লিক-গিন্নীরে দিই আসবে। আজ সেরে যাবে। দশটা টাকা দেবে।

হারু মারা যাওয়ার পর একদিন তরণ মল্লিকের স্ত্রী ডেকে পাঠাল মেঘলাকে। বুড়ি শাশুড়ির সঙ্গে সাদা থানের অনেকখানা ঘোমটা দেওয়া মেঘলা পায়ে পায়ে মল্লিকবাড়ি গিয়েছিল।

গোবর-জলে নিকোনো তকতকে উঠোনের ওপর দিয়ে হেঁটে তারা মল্লিকবাড়ির অন্দরে ঢুকল। এর আগে মেঘলা এদের বাড়ি কখনো আসেনি। স্বভাব কৌতূহলে ঘোমটার ফাঁক দিয়ে চোখের মণি ইতস্তত চালনা করল সে।

গ্রামের মধ্যে ধনী কৃষক বলতে তরণ মল্লিকই। বাড়িটা তার পাকা। বাড়ির পেছনে লাগোয়া একটা বড় ভোবা: তার থেকে হাঁসের পাঁক-পাঁক শব্দ ভেসে আসছে। নতুন খড় সামনে স্তূপ করা আছে। থাকবন্দী হয়ে পাঁজা করে সাজানো। এদের আটগুলো ছোট ছোট জপ্প খড়ে বাঁধা। গাদার কিছু দূরে তিনটে বেশ বড় বড় মরাই। মালক্ষ্মী যথেষ্টভাবে সেখানে বিরাজ করছেন। মরাইয়ে নতুন খড় ছাওয়া হয়েছে। ঝকমকে চালে নিয়ে সেগুলো পূর্ণতায় সার্থকতায় দস্তুরমত গর্বিত।

সামনের উঠোনে চার-পাঁচটা মোরগ মুরগী ছোট ছোট বাচ্চাদের নিয়ে ধান খুঁটে বেড়াচ্ছে। বিরাট উঠোনের একধারে সেড়ার গা ঘেঁষে ডানদিকে একটা সবজী আর ফুলের বাগান। কুমড়ো লাউ গাছ ফলন্ত। গাঁদা ফুলের অজস্র সমারোহ।

বাগানের কিছুটা পেরিয়ে একটা আধ-তৈরি মাটির দেয়াল ঘর তৈরী হচ্ছে। সামনের মাটি খোঁড়া: গঙ্গাজলে গঙ্গাপুজোর মতন। ঘর তৈরী হলে ঘরের মাটি খুঁড়েই। পাঁচহাতি দেয়াল: বেশ শক্ত হচ্ছে। সেখানে তরণ মল্লিক তদারকিতে ব্যস্ত। দেয়ালটার কাঁধে একটা খরখরে মাথা গুঁজে পড়ে রয়েছে। তার কাছে জোড়া হৃষ্টপুষ্ট বলদ খোঁটার সঙ্গে বাঁধা রয়েছে। পেছনটা তাদের গোবরে কলঙ্কিত। তারা নির্লিপ্তভাবে চোখ বুজে জাবর কেটে যাচ্ছে।

মেঘলা যেন একটা সমুদ্র স্বপ্ন দেখতে দেখতে ভেতরে ঢুকল। মল্লিক-গিন্নী তাকে দিয়ে একটা বেশ ভারী ধরণের মোটা কাঁথা করতে চায়। তার লেপ তোষকের অভাব তার নেই তবু কাঁথা চাই। কাঁথায় যেন নকসার সঙ্গে ছড়া থাকে। লেপ তোষকে শীত কাটে বটে কিন্তু তাতে তৃপ্তি নেই। কাঁথা গায়ে দিয়ে শতেক আরাম। কাঁথার ওম চোখ আপনা হতেই বুজে আসে। পাড় আর কাঁথার কাপড় নিয়ে মেঘলা ফিরে এসেছিল। বুড়ি চাল পাছড়ানোর কাজটা বাগানের ডালে আটকে গেল।

সেই কাঁথা তৈরী হয়ে এসেছে। একটা ছড়া তুললেই সেটা দিয়ে দেওয়া যায়। মেঘলা পথ চলতে চলতে মনস্থ করল আজই ছড়াটা তুলবে। কাল সকালে ওটা দিলে টাকা আসবে। তবে হাঁড়ি চড়বে।

অবশেষে ওরা বাড়ি এল। আগড় খুলে হারুর মা আগে আগে ঢুকল। দাওয়ার একধারে চাঁচ দিয়ে ঘেরাটোপ। সেটি বারান্দা। আগুন ধরতে উনানে জল ভর্তি হাঁড়ি বসিয়ে মেঘলা বেরিয়ে আসে। দেখে বুড়ি শাশুড়ি ওঠার উদ্যোগ করছে। হারুরমা গুটি গুটি বেরিয়ে যায়। যাওয়ার আগে ঘাড় ফিরিয়ে তাকে বলে—লাতিনরে দ্যাখিস। মুই চললম।

অমৃত CENTRAL LIBRARY

এখন
অর্ধেক দামে
চোখ ধাঁধানো শুভ্রতা
স্বস্তিক

ডিটারজেন্ট কাপড় ধোয়ার পাউডার

যখনই
'স্বস্তিক'
কিনবেন
আপনি
৬ টাকা
বাঁচাবেন।

অপটিকাল হোয়াইটনার যুক্ত নতুন স্বস্তিক ডিটারজেন্ট কাপড় ধোয়ার পাউডার আপনার কাপড় পরিষ্কার করবে ও চোখ ধাঁধানো শুভ্রতা এনে দেবে। বেশী দামের উত্তম ডিটারজেন্ট কাপড় ধোয়ার পাউডারের মত, স্বস্তিক পাউডারও "ফ্রি ফ্লাইএড" করা হয়েছে যাতে অল্প সময়েই জলে গুলে যায়। আপনার কাপড় উজ্জ্বল ও শুভ্র হবে। এই পাউডার সব রকমের কটন, টেরীলিন, নাইলন ও উলের পক্ষে নিরাপদ। তবু, আপনি প্রতি কিলোতে ৬ টাকা বাঁচাচ্ছেন। এই পাউডার ১ কিলো ও ½ কিলো প্যাকেটে পাওয়া যায়।

সবার চেয়ে দামে কম, সবার চেয়ে কার্যকরী

Shilpi-DM 9/75 ben

১০০০ গ্রামের সর্বোচ্চ খুচরো মূল্য টাঃ ৭-১৬ পঃ (স্থানীয় কর সাপেক্ষ)

মেঘলা ছেলের দিকে তাকায়। খোকন হামা দিয়ে দাওয়ার পড়ে থাকা একটা ঘুড়ির দানা ধরার চেষ্টা করছে। কত না পারছে তত মুখ দিয়ে জে-জে শব্দ করে আবার ধরার চেষ্টা করছে।

বেলা বাড়তে ওর শরীরটা চাঙ্গা হয়ে উঠছে। ফেব্রুয়ারি চাঁদটা দিনের বেলা কম থাকে। রাতেই বেশি থাকে। যে কোন ধরণের অসুস্থতাই শীতের বলা দুর্বহ হয়ে ওঠে। খোকনেরও তাই হয়। একে গায়ে ঢাকাঢুকি দেবার শীতের কাপড়-চোপড় কিছু নেই. তার ওপর শরীরের ইকরানি। মেঘলাকে অনেক বিনিদ্র রাত্রি যাপন করতে হয়।

খোকনের নাকের সর্দি আঁচলে সযত্নে মুছিয়ে দেয় মেঘলা। তারপর ওর হাতে একটা সোল আলু এনে দেয়। খোকন সেটা নিয়ে খেলা করতে থাকে। ইত্যবসরে ঘর গোছানোর টুকিটাকি কাজ সেরে নেয় মেঘলা। তারপর হাঁড়িতে চাল ছেড়ে দিয়ে দাওয়ায় এসে বসে। কাঁথাটা নিয়ে।

বেশ ভারী কাঁথা। পুরনো একটা মোটা কাঁথার ওপর নতুন কাপড় চার পাট করে দিয়ে সেলাই করা। চারদিকে হলুদ রঙের কলের পাড়ের সযত্নে পাতার আলিঙ্গন। তারপর নানা নকসা। লাল নীল। মাঝে খানিক সাদা জমি। তাতে একটি ছড়া লিখতে হবে।

ছুঁচে সুতো পরিয়ে নেয় মেঘলা। কাঁথার গায়ে ছুঁচ গেঁথে টানে সুতোতে। খোকন তার মেলাই সামগ্রী বলে করতে দ্রুত এগিয়ে এল হামা দিয়ে। কাঁথার একপ্রান্তে ধরে টানা-টানি করে। মেঘলা কাঁথা ছাড়িয়ে নেয়। খোকন আবার টানে। বাধ্য হয়ে সেলাই বন্ধ রাখে মেঘলা। আলতো হাতে খোকনকে কোলে তুলে নেয়। মায়ের কোলে এসে খোকন তার বুকে মুখ ঘষে। কাপড় ধরে সরাতে চায়। তাড়িয়ে খেলে ধায় মেঘলার স্নেহ। হারুর কথা মনে পড়ে।

এক রকম জোর করেই খোকনকে নামিয়ে হেঁসেলে ঢোকে যায় মেঘলা। উনোন থেকে হাঁড়ি নামায় সে। গামলার ওপর হাঁড়িটা কাত করে ফ্যান গালতে থাকে। হাঁড়ি খালি হওয়ার পর কতদিন হলা লেগে ভাত করে সেছে। তরকারী পুড়ে অখাদ্য হয়েছে। উদাসী মেঘলার কোন হুঁশ নাই। খোকা কখন তার হাত ধরে তখন আর কিছু করার থাকত না। এখন সে অকথ্য কাঁচিয়ে উঠেছে সে।

ঘাটতে যায় মেঘলা। খোকন ভাক-স্বরে কাঁদছে। ওদিকে কান দিয়েও দিতে পারছে না সে। কাঠের আবাল থাকতে থাকতে রান্না সারতে হবে। আলু-পোস্ত হলে ভাল একটু সিদ্ধির ডাল করে নিয়ে নিশ্চিন্ত।

হরকারীর পাট চুকিয়ে ভাত বসিয়ে দাওয়ায় এসে বসে। কপালের ভেদে বিন্দুগুলো মুছে খোকনের মুঠি থেকে কাঁথাটা ছাড়িয়ে নেয়। ঘুমিয়ে পড়েছে সে। চটের ওপর খোকনকে শুইয়ে দেয়। তারপর কাঁথা নিয়ে আবার বসে। সমান্তরাল লাইনে বিভিন্ন রঙের সুতো মিশিয়ে সে তুলতে থাকে—তবে আমি যাই গো তবে যাই।

ভোরের বেলা শুনো কোলে
ডাকব যখন খোকা বলে
বলব আমি নাই সে খোকা নাই।
আগো, যাই।'

ঘুমন্ত খোকনের দিকে মেঘলা ফিরে তাকায়। শ্বাসের তালে বুকটা ওঠা-নামা করছে। শ্যামলা দেহে রোদের লুটোপুটি। রোদ কড়া হয়ে উঠছে আস্তে আস্তে। চটসুদ্ধ খোকনকে দাওয়ার দিকে টেনে নেয় মেঘলা। ডালে একটা আলু দিয়ে আবার খোকনের পাশে এসে বসে সে। দরের দিকে চোখ মেলে থাকে অপলকে। মনে মনে সে ভাবে কত কিছু। হারুর কথা হবেও বা! কত প্রীতির স্মৃতিই তো তার কথা মনে পড়িয়ে দেয়। নিজের কথা ভাবলেও হারুর কথা এসে পড়ে। খোকনের কথা ভাবলেও তাই। মেঘলা বরাবরই কম কথা বলে। হারুর মৃত্যুতে অজস্র নীরব অশ্রুই তার শোকের কিছুটা ঘটিয়েছিল। বর্তমানেও সে কারুর কথার অধিক বাকস্ফূর্তি ঘটায় না। নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া কথা বলে না সে। মনে মনে কিন্তু সে অনেক কথা বলে।

ঘুমের ঘোরে খোকন চমকে উঠল একবার। সর্দি-শ্লেষ্মার শব্দে মেঘলা তাকাল তার দিকে। খোকনকে হাসপাতালে দেখাতেই হবে। কাল টাকা কটা পেলে হাসপাতাল যেতে হবে। ওষুধ-বিষুধে হয়ত বিনাতে হতে পারে। তাছাড়া—।

মেঘলা উঠে গিয়ে ডালটা নামায়। তাছাড়া চাল-ডাল বাড়ন্ত। না কিনলে কাল হাঁড়ি চড়বে না। সংসারের ভাবনা এখন তাকেই তো একলা একলা ভাবতে হবে।

এইসব ভাবতে ভাবতে মেঘলা পেছনের পুকুর থেকে স্নান সেরে এল। তখন সূর্য পশ্চিমের এলাকায় ঢলে পড়েছে। বেলা পড়ন্ত। খেয়ে দেয়ে সে বেলায় ভাত তরকারী ঢাকা দিয়ে হাসপাতাল নাইট দিয়ে মেঘলা [illegible] পরল তখন মধ্য বিকেল করছে। [illegible] তীব্রতা [illegible]।

কাঁথাটা পাট করে ঘরে রেখে টুকিটাকি কাজ সেরে নেয় সে। তারপর ডালে দেওয়া আলুটা ছাড়িয়ে অল্প নুন দিয়ে চটকে নেয়। ঘুম থেকে তুলে খোকনকে আলু-সেদ্ধ খাওয়ায়।

এইসব করতে করতে সন্ধ্যে নেমে আসে। বুড়ি শাশুড়ির কুবের দাসের ঘর থেকে ফিরে আসে। আঁচলে বাঁধা মেয়-খানেক চাল, মেঘলাকে কুলোটা আনতে বলে হারুর মা। তাতে চালগুলো রেখে নিজ মেয় বুড়ি। মেঘলা প্রদীপটা জ্বালিয়ে সন্ধ্যে দেয়। শঙ্খধ্বনি করে। গ্রামের অন্যান্য ঘর থেকেও শাঁখের শব্দ শোনা যায়।

খোকনকে কোলে বসিয়ে হারুর মা বলে—বলতো সোনা? ইখান থেকে যারলন তাড়া. তাড়া গাল বাপদীপাড়া—কি সে? খোকন কথা বোঝে না। কথা শোনে না। আঙুল বাড়িয়ে বুড়ির নাকটা ধরতে চেষ্টা করে।

হেঁসেল থেকে রাতের খাবার এনে ঘরে ঢুকিয়ে ভেতর থেকে কুলুপ লাগিয়ে দেয় মেঘলা। সন্ধ্যে থেকে শীতটা জাঁকিয়ে বসতে শুরু করেছে। ঘরের ভেতরেও হিমভাব। কাপড়টা ভালভাবে গায়ে জড়িয়ে নেয় মেঘলা। খোকনের গায়ে সুতীর জামা তার ওপর নিজের পুরনো একটা কাপড় বেশ করে চাকরির মত পেঁচিয়ে দিয়েছে। শাশুড়ি তার ছেঁড়া কম্বলটা টেনে নিয়ে মন্তব্য করে—মণা-বউ? সাঁঝ থিকে আজ বাণ জাড় পড়ল যি রে! খোকনের এইতে অসুবিধে। ঠাণ্ডা পড়লে ওর কষ্ট বাড়ে। ঠাকুরমার কোলে চুপচাপ রয়েছে। ঘড়ঘড় করে শ্বাস-প্রশ্বাসের আওয়াজ উঠছে।

হারুর মা বলে—থে দে চটপট শুই পড় বউ। আককুটের মত আর দের বসিস না। শাশুড়ির দিকে মুখ তুলে তাকায় মেঘলা। প্রদীপের আলোর আবছায়াতে হারুর মাকে যেন মৃৎশিল্পীর তৈরী মূর্তির মত লাগছে। শীর্ণকায়া একটি নারী সমস্ত প্রস্তুতি নিয়ে যেন বসে আছে। মেঘলা বলে—কাথিাটা হই গ্যাছে, কাল সকালে নিই যেও। বুড়ি হতাশস্বরে দুধোয়—আর কয়কাল ইরকম চালাবি, শুনি? তারপর একটু থেমে বলে—বাপ ডাকল গাঙ্গিনি। মোর লেগে তোর চিন্তে বটি, কিন্তুক খোকনার কথা ভাব এটু। ইরকম থাকলে উ আর—। হারুর মা কথাটা সম্পূর্ণ না করে চুপ করে যায়।

প্রদীপের সলতেটা উসকে দেয় মেঘলা। তারপর হাত ধুয়ে দুটো সানকিতে ভাত বাড়তে বসে। শোকনকে চাটাইয়ে শুইয়ে হারুর মা উঠতে যায়। খোকন কাঁদতে থাকে। কফ জড়ানো গলায় ঘরঘর করে কাঁদে। বুড়ি আবার কোলে নিতে চুপ করে।

। সামনের রাস্তা দিয়ে দু'চারজন· যাত করছে, সর্বাঙ্গে তাদের চাদর । গাছের ডালেও দুরেক পাখির উঁড়, ডাকাডাকি।

হারুর মা ও ডাক দেয় মেঘলাকে—অ বউ? উঠ, উঠে পড়, মেঘলার ঘুম গ। আড়মোড়া ভাঙতে গিয়ে চমকে । সদ্য ঘুম ভাঙা শ্লথ শরীরের গুলি জ্বলে ওঠে। নকসী কাঁথাটা র গায়ে। ঘুমের ঘোরে কখন টেনে ছে। খোকন? ধড়মড় করে উঠে বসে া।

হারুর মা ওর ওঠার ভঙ্গি দেখে সে আসে—কি হল? তারপর সেও হয়—খোকন কই? মেঘলা কাঁথা া। দুজনে বিপন্ন মুখোমুখি দেখে— ন নিঃসাড়!

খোকনকে তুলতে যায় মেঘলা। বরফের কঠিন গা। তেমনি শীতল। হাতের বন্ধ করে ঈশ্বর যন্ত্রণার ছাপ মুখে মেখে ন মারা গেছে।

রাতে ঘুমের ঘোরে যখন উ খুঁজতে গিয়ে মেঘলা কাঁথাখানা নি মাথা পর্যন্ত টেনে নিয়েছে তখন ভারী কাঁথার তলায় একেবারে চাপা গিয়েছিল খোকন। তারপর শেষ—।

হারুর মা চিৎকার করতে থাকে উন্মাদের মত তার মুখ চেপে । মেঘলা—খবরদার! তুমি চিল্লাতে পা নি। খোকন কি তুমার একলার? ত বলি না কাঁদ, তুমিও কানতে পারবে আগে লোকের কাঁথা নিই এস। তা কেন।

কাঁথাখানা এনে বুড়ির হাতে গ লেন মেঘলা—নাও। ইখানে থেকে ধালা বাত্তিতেছে। যাও তুমি যাও মা বউড়কে ঠেলে বের করে দেয় ঘর থেকে

তারপর খোকনের মৃতদেহ কোলে ত নেয় সে। শ্লোকমার টান আর শোনা না। স্তনাপানের আকুলতা আর ক হয় না। তবু খোকন সযত্নে মা কোলে শুয়ে থাকে। মেঘলার বে খোকন পড়ে থাকে। যেন নকসী কা বুকে সেই ছড়াটার আলপনা!

আশাপূর্ণা দেবীর

কখনো দিন কখনো রাত ৩০

বিমল মিত্রের

বিষয় বিষ নয় ৭

ভৃগুজাতকের

হাত দেখতে শিখুন ৭

ভাগ্যলিপি ৯

সুমথনাথ ঘোষের

ওখানে পদ্মা এখানে গঙ্গা ৫

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

তিনে একে চার ২০

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

কিরীটী অমনিবাস

২য়—২০ ৩য়—২০ ৪র্থ—১৪ ৫ম—১৫ ৬ষ্ঠ—১৫ ৭ম—১৫

প্রথম খণ্ড ও অষ্টম খণ্ড যন্ত্রস্থ

অমর সাহিত্য প্রকাশন, ৭, টেমার লেন, কলিঃ-৯

CENTRAL LIBRARY

রঞ্জিকিশোর মণ্ডল

বিশ্ববাণী প্রকাশনী

বইপাড়ার দুর্দিন নয়, বরঞ্চ বলবো আসাম এবং বাংলাদেশের বাজার চলে যাওয়া সত্ত্বেও এখনও মুদ্রণ সংখ্যা কমে নি। ছোট গল্পের বাজার নেই বলে যাঁরা সরে আছেন, তাঁদের জানাই ২৬-২৭টি বই করার পর বাজার দেখে আমরা নতুন করে ভাবছি গল্পের বই-এর কথা।

সাহিত্যের নেপথ্যে

যাদবা মাসিবিহারী মণ্ডলের এ ছেলেটিকে নিয়ে চিন্তার শেষ ছিল না। কি করবে যায়, কিছু তো একটা করতে হবে। বাবা মা শয্যায় কাতর আছেন। কিন্তু তারপরই এই দুঃসময়ের চিন্তায় শেষ পর্যন্ত ছেলেটিকে দুঃসময় দেওয়া হোলো ইলেকট্রিক মিস্ত্রির কাজে। রাতভর কাজ আর চা-তা। তাদিনে পাঠ্যবইয়ের বদলে শুরু করেছে নজরুলের পড়া হয়ে গেছে। ছেলেটি আজ করে, কিন্তু কাজে লাগে না। একটাও না।

যখন তখন প্রতিষ্ঠিত লেখক। প্রায় কুড়ি পঁচিশটি বই বেরিয়েছে। সারাদিন ওকালতি করে রাতের দিকে যান এম সরকারের সেই বিখ্যাত আড্ডায়। সুবোধ সরকার, নৃপেনের বন্ধু, ফেলুবাবু, বাবার বন্ধু। সেই সূত্রে ছেলেটিকেও সবাই চিনে গেছে।

ঠিক এই সময় বাবার পরামর্শ নিয়ে ছেলেটি তাদের নিজস্ব প্রকাশনী 'বিশ্ববাণী' থেকে বই বের করলো। নাম 'নতুন পাতা'। ঔপন্যাসিক লাইব্রেরীতে একটা আধটা জানা-শোনা হয়েছে। ছেলেবেলা ছেলেটির ইস্কুলেসে কেটেছিলেন। তাঁর অভিজ্ঞতার ঝুলি দুটি কোথাও যেন একটা সাফল্যের ইঙ্গিত পেয়েছিলো।

কিন্তু আর দশটা উপন্যাসের মতো ভালো হওয়া সত্ত্বেও শ্যামবিহারী মণ্ডলের নাম তখন বই তেমন চলছে না। একেবারে ঠিক হয়েছে শ্রীবাসব নাম দিয়ে সাধারণ গল্প সুলেখা প্রতিযোগিতার পাঠিয়ে দিয়েছে নিজের অজান্তে। প্রথম পুরস্কার পেলেন শ্রীবাসব। —বাবা হেসে বাপান তো! ঠিক আছে এই ছদ্মনামে যতক বই বেরুবে বিশ্ববাণী থেকে। কারা প্রথমেকুমার মণ্ডলও লেখেন, দুটো বই বেরিয়েছে 'বনতুলসী' এবং 'অরুণাচিত্রক'।

শুরু হল বিশ্ববাণী। শুধু বিনা মূলধনের ব্যবসা। গ তিনেক টাকা বোধ হয় হাতে ছিল নতুন পাতার কিছু বিজ্ঞাপনের। বিশ্ব মুখোপাধ্যায়ই ঠিক করে দিলেন প্রমথনাথ বিশী আর প্রবোধকুমার সান্যালের বই। অ্যাপ্টিল প্রকাশক বিশ্ববাণীর তা নেই তখনো। কি দিয়ে যে কি হবে শ্রীগুরু তিনদিন কাগজপত্র দিলো। এপর্যন্ত বেরুলো শ্রীবাসব-এর 'গোমতী গাথা' আর 'দিগন্তরাল বাড়ি'। —সুপ্রিয়বাবু তখন আমাদের বই নিতেন বিক্রি হলে হিসেব পরের কবে দিয়ে দিতেন। ঠিক এই সময় চে বাবুর ভগবানের বলছেন— শুধু গুঁজে বই 'চ্ছো কেন, বাজারে বই ছড়িয়ে দাও। এমনের দাও। তাতে বাজার থেকে তুড়ি তাড়ি টাকা উঠে আসবে। এম সিকে কথাটা বললেম। ওঁরা বললেন—ঠিক আছে। এবার চড়ুরে পড়লো বই।

—সত্তর একাত্তর সালে এই মহাত্মা গান্ধীর নতুন দোকানে যখন উঠে এলুম তখন মূলধন টানল হাজার টাকা দেনা। এক বন্ধুর কাছ ধার করলাম ১১ হাজার টাকা। বলতে ছিল একটা বিশ্বাস আর সততা। আর এই বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন দে বুক স্টোর্স। এমনও হয়েছে, টাকা হয়তো তেমন কিছু পওয়া নেই অথচ বই বের করতে হবে, এমন অবস্থায় বেশ কয়েক হাজার টাকা দিয়ে দিয়েছেন হিমাংশুবাবু। আমিও সময়ে বই বিক্রি করে শোধ করে দিয়েছি। আমার একটা জেদ ছিল, যেটা ভেবেছি সেটা করবো। আর আজ পর্যন্ত ধারে ফিরে এসেছি এমন কোথাও একজনও নই। আর ব্যবসায়ের সততা ও পরে তাদের সঙ্গে পারিবারিক যোগসূত্রে গড়ে উঠেছে। বাহির হয়েছে আপন।

—একটা গল্প বলি শুনুন :

পয়লা দিন, সময় ৮টা/৯টার। পুজোর সেলের আগে শংকরবাবুকে ফোন করলাম: অন্তত ৮টা/৯টার দিন সবাই আসেন প্রসাদ নিতে মন, আপনিও আসুন না। জানতুম শংকর আসবেন না। যদিও ফোনে বলেছেন —যাচ্ছি। মন থেকে তবু সন্দেহ গেল না। কারণ 'শংকর' সবার ছোঁয়ার বাইরে। সব প্রকাশকরা লাইন দিয়ে বসে আছেন। একে লেখক লেখেন তার উপর বাজারে এত নাম ডাকডিদা। আর আমি তখন ছোট নগণ্য প্রকাশক। পুজোয় বসতে যাচ্ছি, এমন সময় শংকরবাবু এলেন। বিশ্বাসের বাইরে তখন বেলা হবে বারোটা সাড়ে বারোটা। আমি পুজোর সিঁদুর মাখা টাকাটা দিয়ে বললুম —দাদা, অমর এই আছে, এই দিলাম, যদি কখনো মনে করেন আমাকে উপন্যাস দেওয়া দায় তবে দেবেন। শংকর-এর সম্বন্ধে বাজারে যাই গুজব থাক না কেন একটা কথা— তিনি আজ পর্যন্ত অ্যাডভান্স নেননি। অ্যাডভান্স না নিয়েই এই দোকানের পত্তন হয়েছে আজ পর্যন্ত আমি সে ধর্ম থেকে বিচ্যুত হইনি।

—যাকগে সে কথা। তারপর ঘটনাটা আর মনে নেই, মান রাখার মতো ঘটনাও নয়। এর নিক দু বছর বাদে বিকেলে হঠাৎ শংকর ঢুকে এলেন ঘরেতে ঘরেতে। দোকানের ভেতরে তখন এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আছেন—শক্তি চট্টোপাধ্যায় অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, শংকরবাবু ঢুকতে দেখেই

একটু অবাক হয়েছেন। গল্প-গুজব জমে উঠলো। শঙ্করবাবু মুড়ি তেলেভাজা চা খেলেন। শুধু ওঠার সময় বলে গেলেন, কাল একবার দেখা করবেন তো।

পরের দিন যেতেই কোনো কথা না বলে পুরো আশা-আকাঙ্ক্ষার পাণ্ডুলিপিটা এগিয়ে দিয়ে বললেন— কত ফর্মা হবে দেখুন তো ? দেখবো কি, আমার হাত তখন থরথর করে কাঁপছে। বিনা অ্যাডভান্সে ছোট্ট একটা প্রকাশককে শুধু বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে শঙ্করবাবু এগিয়ে দিলেন জিনিস্টে।'

– তারপর ?

—তারপর— 'জনঅরণ্য' 'যেখানে যেমন' এবং 'সম্রাট ও সুন্দরী'। কলেজ স্ট্রীট পাড়ার প্রকাশকেরা যেন একটু অবাকই হয়ে গেলেন— পর পর, শঙ্কর ? এবং এই দোকানের ভিত শক্ত করতে আমি শঙ্কর-দার অবদানের কথা ভুলিনি।

আর ঠিক এভিনভাবে আমাকে সহ-যোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন সমরেশ বসু আর সুনীল গাঙ্গুলী। সমরেশবাবুকে তো, উপন্যাস কি, ধরাই মুস্কিল। কত লোক অ্যাডভান্স দিয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন, সেখানে উনি আমার হাতে গোটা কপি দিয়ে বলেছেন, ঐ এক কথা—কতো ফর্মা হবে দেখ তো। প্রুফটা দিও। প্রুফে অ্যারেকটু বাড়িয়ে দেবো। সেই সমরেশ বসুর অন্তত ১৪টা বই প্রকাশ করেছি। যে দিনার পাহাড় মাথায় নিয়ে আমি নেমেছিলুম, এক বছরে সেটা শোধ হয়ে গেল।

—আমার বাবা, এই ব্যবসা দেখে যেতে পারেননি, সেটা আমার সবচেয়ে বড়ো দুঃখ। তাঁর বয়ে যাওয়া ছেলেটা যে কখনো জীবনে সাহিত্য-নির্ভর হয়ে দাঁড়াতে পারবে, মৃত্যুর আগে পর্যন্ত সেটা বিশ্বাস করে যেতে পারেননি। মা কিছুটা দেখেছিলেন, তবে কিছুটাই। এখন আমার মা বাবা কেউ নেই। তবু কেউ কেউ বাবার মতোন হয়ে জীবনে আসেন। এমন একজন লেখকের ছোট্ট একটা গল্প বলি—

গল্পটা হোলো মজতবা আলীর। সৈয়দ-দার বই করা মানে প্রকাশনীর প্রেস্টিজ। উনিও তেমন প্রকাশনী আর তেমন মোটা অ্যাডভান্স না হলে কাউকে বই দেন না। কিন্তু আমি তো অ্যাডভান্স দিই না। এমন অবস্থায় একদিন সৈয়দদার বাড়ি গেলুম। বই প্রকাশের কথা শুনেই উনি বললেন— আমি যদি একদিনে তিন হাজার টাকা চাই, দিতে পারবে ? সবিনয়ে বললুম —বই বিক্রি করে টাইমমতো আপনার টাকা দিয়ে যাবো, বিশ্বাস করুন। খানিকক্ষণ চুপ করে কি যেন ভাবলেন,— ঠিক আছে, তোকে দেখছি। এর ঠিক তিন মাস পরে কলেজ স্ট্রীট পাড়ার সবাই দেখলেন— একজনের কাঁধে ভর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমার খোঁজ করছেন পরম শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক সৈয়দ মুজতবা আলী। সে বুক স্টোরে এসে জিজ্ঞেস করলেন— এখানে বুজ আছে। ওঁরা বললেন, এখানে আসে কিন্তু এখন তো নেই। —ঠিক আছে, এই কার্ডটা ও এসে দিয়ে যেবেন। ছোট্ট চিরকুটে লেখা ছিল—দেখা কোরো।

—পরের দিন দেখা করতেই কাঁপটা এগিয়ে দিয়ে বললেন— টাকাটা এখন দরকার নেই, দরকার হলেই চাইবো। কাঁপটা নিয়ে দেখলাম— শবনম। তারপর একে একে শহর-ইয়ার, স্বপ্নের মধুর মৌসুমী ছিটলার অবিশ্বাস্য কত না অশ্রুজল মুসাফির তুলনাহীন। প্রায় ৯।১০টা বই ছেপেছি।

—আমার গল্প কিন্তু এখনো বলিনি। বুঝতেই পারছেন প্রকাশকের সম্পর্ক ছাড়িয়ে কতখানি মনের কাছাকাছি, স্নেহের পাত্র হলে ওঁর একেকটা করে বই আমি পেয়ে যাই।

আমার মা মারা গেলেন। প্রথমে বাবা তারপর আমার একান্ত কাছের জন মা মারা যেতে আমি একটু ভেঙে পড়লুম। মায়ের শ্রাদ্ধকাজ হবে, সৈয়দদাকে গিয়ে বললুম— আমার মা মারা গেছেন দাদা, কাজে আপনাকে আসতে হবে। কথাটা শুনেই সৈয়দদা প্রচণ্ড রেগে গিয়ে বললেন—আমার মা, আমার মা বলছিস কেন শুয়োর ? বল আমাদের মা। কাজের দিন ব্রাহ্মণ, পুরো হিন্দু, আত্মীয়স্বজনকে নিয়ে শ্রাদ্ধশান্তির কাজ যখন চলছে, চলছে গীতা পাঠ। ঠিক সেই সময়ে ধুতি-চাদর পট্টবস্ত্রে এসে ঢুকলেন—দাদা। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে কাকাকে বললেন—মায়ের কাজে আমি একটু গীতা পাঠ করবো, আমি কিন্তু মোছলমান। আমার কাকা সঙ্গে সঙ্গে হাত ধরে বললেন—আপনি কিছুই নন, আপনি ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ মুজতবা আলী। আপনি পড়বেন এটা আমাদের পরম সৌভাগ্য। এবার হাত দিয়ে থামালেন পণ্ডিত মশাইকে। ঠিক যেখান থেকে পড়া শেষ হল, ঠিক তার পরের লাইন থেকে গীতা না দেখে অবিশ্বাস্যভাবে উদাত্ত গলায় পাঠ করে গেলেন। গোটা গীতার প্রতিটি অক্ষর সৈয়দদার মুখস্থ ছিল। এমন মানুষ যিনি রসিকতার সঙ্গে সঙ্গে গভীর দুঃখের কথা বলে যেতে পারেন, আমার বিপদে আপদে যিনি বাবার মতো প্রতিটি পদক্ষেপে উপদেশ দিয়ে গেছেন। কলকাতায় থাকলে মুখোমুখি, আর যখন বাংলাদেশের ধান-মন্ডির বাড়িতে ছিলেন, তখন চিঠিপত্রে লিখে। প্রায় দুশো তিনশো চিঠি আমার আছে আজি, যা কোন সময়ে প্রকাশ করলে শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিকের আরেকটা দিক উন্মোচিত হবে। সৈয়দদা, মায়া যেতে আমি আবার যেন পিতৃহারা। কেমন যেন অসহায় বোধ করতে লাগলুম। মনে হোলো বাবার পর গায়ে হয়ে যে-মানুষটা আমাকে রোদ ঝড় বৃষ্টি থেকে আড়াল করে রাখতেন, তিনি যেন হঠাৎ আচমকা কাড়ে ভেঙে গেলেন। সৈয়দদার মৃত্যুতে আমি তিনদিন বিনবাণী বন্ধ রেখেছিলুম।

—এমনি সব কতো গল্প জমে আছে আমার ছোট্ট জীবনে। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে আমি প্রায় শ দেড়েক বই বের করেছি, প্রায় সবাই আমাকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন—যাঁদের কথা বললুম, তাঁরা ছাড়াও প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিমল কর, মনীন্দ্র রায়, বনফুল, চৌধুরী আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, বিমল মিত্র, সৌরীন সেন, চিরঞ্জীব সেন, জ্যোতি-রিন্দ্র নন্দী, চিরঞ্জীব মাইতি নন্দী, বুদ্ধদেব গুহ এবং নিমাই ভট্টাচার্য। নিমাই ভট্টাচার্যর কথা আমি আগেই বলেছি, এখনো বলছি—যে কজন লোক নিমাইদার কাছের, তাদের যে-একজনের মধ্যে আমি পড়ি। তাঁর সঙ্গে এখন আমার যা সম্পর্ক তাতে লেখক প্রকাশক নয়, সম্পর্কটা পারিবারিক ভাই-দাদার সম্পর্ক। নিমাইদার কেরানী ব্যাচেলার থেকে এখন যা অমৃতে বেরোচ্ছে, সেই গোপালিকাও এসেছে অবশ্য আসবে আমার হাতে। প্রায় ৯।১০টা বই আমি করছি, যা প্রায় অবিশ্বাস্য। আরেক-জন মানুষ হলেন, বিকু দে। সুভাষদাই আমাকে বিকু দে-র সঙ্গে যোগাযোগ করে দিয়েছিলেন। তারপর আমি বিকুবাবুর বাড়িতে গিয়েছি। বিকুবাবু বলেছিলেন— যেন ছাপছো আমার বই আমার বই বের হলে প্রকাশকেরা হয় উঠে যায়, না হয় বন্ধ হয়। আমি বিকুবাবুর অনেকগুলো বই পুনর্মুদ্রণ করে বেশিয়ে নিয়েছি। যা, তাঁর বইও দিতে হয়। বছর পাঁচেকের মধ্যে দামী বই উচ্চমধ্যবিত্তের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে।

—আসলে কি জানেন, বইয়ের ব্যাপারে আমার নিজস্ব কিছু থিওরি আছে। যেমন ধরুন, আমি যেভাবে বিজ্ঞাপন দিই তাতে বইয়ের দাম অনেক কমে যায়। কিন্তু আমার মত হলো যে বইটা বেরুলো, তাড়াতাড়ি সেটা বাজার থেকে উঠিয়ে নেওয়া। তাড়াতাড়ি বইটা বাজারে কেউ গেলে আমি আবার নতুন ইনভেস্টমেন্ট করতে পারবো, ফলে পার্সেন্টেজটা কম থাকে, কিন্তু বই চলে যায়।

মাঝে মাঝে যে অসুবিধায় পড়িনি, তা নয় তবু এটাই আমার ভালো লাগে। সম্প্রতি কাগজ-টাগজের দাম কমেছিল, আমরা ফর্মার দাম কমিয়ে ৭০-৮০ পয়সায় নিয়ে এসে-ছিলুম। হঠাৎ এই যে ২৫ ভাগ কাগজের দাম বেড়ে গেল, এতে আবার সেই এক টাকায় ফিরে আসতে হবে। আমি একটা ব্যাপার বুঝি না। যে কাগজ বই ছাপানোর মধ্যে অসহায়ন, যা নাকি দেশের জ্ঞানবুদ্ধি সাহিত্য প্রসারে সহায়ক হয়, সেই ছাপার কাগজের দাম বেড়ে গেলে প্রকাশকদের কি অবস্থা হতে পারে। তবু বইয়ের দাম এত বেড়ে যাওয়া সত্ত্বেও একটা কথা আমার বিশেষভাবে মনে হয়, পাঠক বেড়েছে। আগের তুলনায় অনেক। প্রত্যেক প্রকাশক এখন ২২৩০-র কমে কাপি ভাবেন না। অথচ এখন বাংলার বাজার তত ভালো না, বলা দেশ সম্পূর্ণ বন্ধ। তা হলে ? তার মানে হল জন-সংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পাঠকও বেড়েছে।

—হ্যাঁ কবিতারও। অবিশ্বাস্য পাঠক বেড়েছে কবিতার। একটা উদাহরণ দিই, যেমন—সুনীল গাঙ্গুলী। আমি কি রকম-ভাবে বেঁচে আছি যখন প্রথম প্রকাশ হয়,

মনেই কুলেছিলুম
ই সই ২য় মুদ্রণ প্রায়
ন কেন, লক্ষ্য ঠিক আছে।
ী স্কুলের ইসলাম থেকে
কু ফে, মণীন্দ্র রায় সভাব
। তারপর শরৎ পুরন্দর,
ভাপতি। এবং একটা কথা।
ঙগত সম্পাদনা এক্ষেত্রে
মের হাত ব্যক্তিগতভাবে
তার প্রভাব থাকতে পারে

প্রকাশনীর সঙ্কীর্ণতাই। এবং এ সমস্যার
কোনো উপায় নেই। আসলে কবিতার আস্বাদ
ভালো লাগে, কবিতা পড়তে আমি ভালো-
বাসি। সুভাষদা-র যখন যেই চাপিয়ে চলেছে
সুভাষদাকে ছাড়া আর কাউকে

আসলে ভালো লাগা না লাগা মনের দুর্বোধ্য
অনুভূতি নিয়ে আমার চলছে রাত থেকে
দিন, দিন থেকে রাত। আমি চেয়েছিলাম
অন্য কিছু হই। হতে পারিনি। এখন
মোহভঙ্গ হওয়া থেমে গেছে। নিজেকে এখন

সেই ট্রেনের কামরার সেই ভদ্রলোক
পাঠিয়ে ছাড়া আর কোনো চারণী
স্বীকার করেই ছ
কিন্তু ভদ্রলোক কি নিজেই ভদ্রতা ছেড়ে
দিতে পারতেন? যাদের উদ্দেশ করে
করা এই একটা কথার জন্য আমি তাদের
কাছে সত্যিই ঋণী হয়ে রইলাম।

শর্মিলা বসু

আদি বিশুদ্ধতাই
ডালডা
মার্কা বনস্পতির
বিশেষত্ব

একদল জিনিষে ভাজা চলে। তবে একমাত্র
আসল জিনিষেই আসল তৃপ্তি। যেমন ডালডা
মার্কা বনস্পতি। ডালডার আদি বিশুদ্ধতার
দেখাদেখি বাজারে আরও বনস্পতি এসে হাজির
হয়েছে। তবে ডালডা-ই সবার আগে। তার
কারণ ডালডা হ'বার রিফাইন-করা। তাই ডালডার
ভাজা-করা খাবার সময় খাবারেই যে আসল স্বাদ
বজায় থাকে এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই!

মনে রাখবেন: ডালডা কখনও খোলা টিনে তুলবেন না।

যে রান্নাতে যেমন যত রোদ উঁচুদের বিশুদ্ধ ডালডা চাই
খাবারের আসল স্বাদের জন্যে

সিইটাস-DLDA-1036

হিন্দুস্থান লিভারের এক উৎকৃষ্ট উৎপাদন

CENTRAL LIBRARY

বাংলার খবর

ফরাক্কার জল

কলকাতা বন্দরকে বাঁচানোর জন্যে ফরাক্কা ব্যারেজ থেকে উপযুক্ত পরিমাণ জল পাওয়া যে কতো জরুরি, সে-বিষয়ে নতুন করে কিছু বলার বোধহয় এখন দরকার নেই। মাত্র কিছু দিন আগেই সংসদের হিসাব (পাবলিক একাউন্টস) কমিটি তাঁদের রিপোর্টে মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, কলকাতা বন্দরকে বাঁচাতে হলে ফরাক্কার ফিডার ক্যানাল দিয়ে শুখার সময় (মার্চ থেকে মে) ৪০ হাজার কিউসেক জল ভাগীরথীতে এসে পড়াই চাই। তা না হলে নদীর খাতের জমে-ওঠা পলি সাফাই হবে না, ফলে জাহাজও বন্দরে ভিড়তে পারবে না। কলকাতা বন্দর কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যে-রিপোর্ট পাঠিয়েছেন, তাতেও এই কথা বলা হয়েছে। গত বছর গরমকালে বাংলাদেশের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ার পর ঐ ৪০ হাজার কিউসেক (প্রতি সেকেন্ডে ৪০ হাজার ঘনফুট) জল পাওয়ার ব্যবস্থা হয়। তার পর বর্ষা এসে যায় এবং অক্টোবর থেকে ফরাক্কার জল নিয়মিত আসতে থাকে। এই পাঁচ মাসে যেভাবে ফরাক্কার জল পাওয়া গেছে তাতে কলকাতার গঙ্গার অবস্থার রীতিমতো উন্নতি ঘটেছে। পলি জমছে খুবে কম। এত দিন পলি সাফাই করার জন্যে নিয়মিত ড্রেজিং (যন্ত্র দিয়ে মাটি তোলা) করতে হতো। এখন ড্রেজিং করতে হচ্ছে সামান্যই। এদিকে জলের নোনা ভাবও অনেক কমে গেছে। সবচেয়ে বড় কথা, নদীর খাতে এই প্রথম একটা স্থিরতা এসেছে। এত দিন পর্যন্ত খাত কখনও এদিক, কখনও ওদিকে সরে যেত। তাই জাহাজ চলাচল খুব অসুবিধে হতো। গত একশ বছরের মধ্যে নদীর খাতের এতটা উন্নতি আর হয়নি বলে বিশেষজ্ঞেরা জানিয়েছেন।

এখন এই উন্নতি যদি অব্যাহত রাখতে হয়, তবে এই গরমকালে ৪০ হাজার কিউসেক জল পাওয়া বিশেষ জরুরি। কারণ, এই সময়টাতেই ওপর থেকে জলের যোগান কমে যায়, পলি জমে বেশি। আসলে বর্ষা শুরু হয়ে গেলে ৪০ হাজার কিউসেক কেন, তার চেয়ে বেশি জল পাওয়াও অসম্ভব নয়। কিন্তু জলের টানাটানি গরমের সময়। এ-বছরও মার্চ থেকে মে পর্যন্ত যথেষ্ট জল ফরাক্কা ব্যারেজ থেকে ছাড়ার প্রশ্ন নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে আলোচনার প্রস্তাব করেন। কিন্তু বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, এ-বিষয়ে কোনো আলোচনার আগে ফরাক্কা থেকে জল ছাড়া বন্ধ রাখতে হবে। ভারত স্বভাবতই এই ধরনের শর্তাধীন আলোচনার প্রস্তাবে রাজি হতে পারেনি। তবে আলোচনার দরজা ভারত সরকার খোলা রেখেছেন। কলকাতা বন্দরের এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞরা এই অভিমত প্রকাশ করেছেন, গরমের তিন মাস ফরাক্কা ব্যারেজ থেকে ৪০ হাজার কিউসেক জল ছাড়লে বাংলাদেশের কোনো ক্ষতির আশঙ্কা নেই।

বাঁকুড়ায় কয়লা

বাঁকুড়া জেলার মেঝিয়া এলাকার মাটির নিচে যে কয়লা মিলতে পারে, এমন একটা আভাস কয়েকমাস আগেই পাওয়া গিয়েছিল। এখন রাজ্য বিধানসভায় শিল্পমন্ত্রী তরুণকান্তি ঘোষের বিবৃতি থেকে মনে হচ্ছে সেই সম্ভাবনা বাস্তবে রূপ নিতে চলেছে। এ-বিষয়ে প্রথম আভাস মেলে জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার একটি রিপোর্ট থেকে। সেই আভাসের সূত্র ধরে ইস্টার্ন কোলফিল্ডস এবং সেন্ট্রাল মাইন প্ল্যানিং এন্ড ডিজাইন ইনস্টিটিউটের বিশেষজ্ঞরা অনুসন্ধান চালান। তাঁরা এখন এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, কয়লা তোলার জন্যে প্রাথমিক আয়োজন করতে পারলে মেঝিয়ায় কয়লাখনি হতে আর কোনো বাধা নেই। বাঁকুড়া-মেঝিয়া সড়ক থেকে ছয় কিলোমিটার দূরে অবস্থিত কালিদাসপুর থেকে শুরু করে অর্ধগ্রাম—কালিদাসপুর-বাকুলিয়া জুড়ে কয়লাখনির কাজ চলতে পারে। তরুণবাবুর বিবৃতি থেকে জানা যায়, মেঝিয়ায় খননযোগ্য মোট কয়লার পরিমাণ হবে ১৮ কোটি টন। এটা প্রাথমিক হিসেব। বিশেষজ্ঞদের মতে, শুধু কালিদাসপুরেই যে কয়লা আছে, তাতে অন্তত ২০ বছর ধরে প্রতি দিন ৮০০ টন করে কয়লা পাওয়া যেতে পারে। মেঝিয়ায় মোট যে-পরিমাণ কয়লা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তার মধ্যে সাড়ে চার কোটি টন বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে লাগানো যাবে। মেঝিয়ার কয়লাকে ঠিকমতো কাজে লাগিয়ে যাতে বাঁকুড়ার শিল্পোন্নয়ন ত্বরান্বিত করা যায় সেজন্যে রাজ্য সরকার একটি কমিটি গঠন করেছেন। মেঝিয়ায় কয়লা পাওয়া গেলে সাঁওতালডিহি আর কোলাঘাটে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্যে কয়লার ঘাটতি মেটাতে খুবই সাহায্য হবে। রাজ্য সরকার চাইছেন, দামোদরের ওপর একটা সেতু তৈরি করে বাঁকুড়া মেঝিয়া-রাণীগঞ্জের মধ্যে রেল যোগাযোগের ব্যবস্থা করা হোক। এই রেল যোগাযোগ স্থাপিত হলে শুধু সাঁওতালডিহি বা কোলাঘাটে কয়লা নিয়ে যাওয়াই সহজ হবে না, বাঁকুড়া জেলায় অন্যান্য শিল্প গড়ে ওঠার পথও প্রশস্ত হবে। রাজ্য সরকার এ-বিষয়ে সমীক্ষার জন্যে ইতিমধ্যেই ছয় লাখ টাকা বরাদ্দ করেছেন।

শহরের জমি কর

রাজ্যের অর্থমন্ত্রী বাজেট পেশ করার সময়েই জানিয়েছিলেন যে, শহরের খালি জমি ও তৈরি বাড়ির ওপর কর বসছে। শহরে জমির সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করে সম্প্রতি একটি আইন তৈরি করেছেন কেন্দ্রীয় সরকার। রাজ্য সরকারের কর-প্রস্তাব তারই পরিপূরক। এই কর-প্রস্তাব অনুমোদন করে রাজ্য বিধানসভায় একটি বিল গৃহীত হলো এখন। এই আইন অনুসারে শহর এলাকায় খালি জমির ওপর কর বসবে, তৈরি বাড়ির ওপর কর বসবে, জমি উন্নয়নের কর বসবে। তাছাড়া শহরের জমি বা বাড়ি পূর্বঘোষিত উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করলে তার ওপর কর (কনভারসান চার্জ) বসবে। তবে আপাতত তিন বছর খালি জমির ওপর কোনো কর বসবে না। ঐসব জমির মালিক যাতে জমিকে আরো ভালোভাবে কাজে লাগাতে পারেন, সে-ব্যাপারে উৎসাহ দেওয়ার জন্যেই এই রেহাই। তবে শহর এলাকায় তৈরি বাড়ির ওপর কর এই এপ্রিল থেকেই বসছে। যে-সব বাড়ির ভিতের স্লেট এলাকা তিনশ' বর্গমিটারের বেশি, সেগুলিই এই আইনের আওতায় আসবে। উন্নয়ন কর এবং কনভারসান চার্জ কবে থেকে চালু হবে তা পরে জানানো হবে। তবে যে-সব জমির ওপর কল-কারখানা আছে, সেখানে এই কর প্রযোজ্য হবে না। এই কর আদায়ের জন্যে রাজ্য সরকার একটি স্বতন্ত্র দপ্তর করছেন। সেই দপ্তরের শীর্ষে থাকবেন কমিশনার পদাধিকারী একজন অফিসার। এই আইন অনুযায়ী রিটার্ণ দেওয়ার দায়িত্ব থাকবে শহরের জমির মালিকদের ওপর। কেন্দ্রীয় আইন চালু হওয়ার পর পশ্চিমবাংলাতেই প্রথম শহরের জমির ওপর কর ধার্য করে আইন প্রণয়ন করা হলো।

১৯-৩-৭৬ এবেলা

বিদেশের কথা

উইলসনের বিদায়

বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড উইলসন শ্রমিক দলের নেতৃত্ব থেকে স্বেচ্ছায় বিদায় নিয়ে এক দারুন চমকের সৃষ্টি করেছেন। প্রধানমন্ত্রী উইলসন তাঁর মন্ত্রিসভার কাছে যে বিবৃতি দিয়েছেন তাতে তিনি বলেছেন যে গত ডিসেম্বর মাসেই তিনি রাণীকে জানিয়ে দিয়েছিলেন মার্চ মাসে তিনি পদ-ত্যাগ করবেন। মন্ত্রিসভাকে তিনি একথাও বলেছেন যে, গত সেপ্টেম্বর মাস থেকেই তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত কার্যকর করার কথা ভেবেছিলেন, কিন্তু তাঁর সরকারের মুদ্রা-স্ফীতি নিরোধ কর্মসূচীর ফলাফল কি হয় তা দেখার জন্য তিনি আরও কিছুদিন অপেক্ষা করা স্থির করেন।

তাছাড়া হ্যারল্ড উইলসন কিছুকাল আগেই বলে আসছিলেন যে ষাট বছর বয়স পার হয়ে গেলে সব রাজনীতিকেরই অবসর গ্রহণ করা উচিত।

কিন্তু উইলসন আগে যাই বলে থাকুন না কেন নিজে ষাট বছর পার হওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যেই তিনি যে তাঁর দলের নেতৃত্ব থেকে সরে গিয়ে তাঁর দলকে তাঁর উত্তরাধিকারী নির্বাচন করে বৃটেনের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রীর পদে বসার সুযোগ দেবেন এর জন্য বৃটিশ রাজনৈতিক মহলে বিশেষ কেউ প্রস্তুত ছিলেন না। বিশেষ করে সম্প্রতি যখন তাঁকে তাঁর বয়স নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল তখন তিনি বলেছিলেন, বয়সের ভার তিনি মোটেই অনুভব করছেন না। ডাউনিং স্ট্রীটে তাঁকে একদিনও ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমোতে হয়নি। সুতরাং একথা বিশ্বাস করা কঠিন যে হ্যারল্ড উইলসন শুধুই বয়সের ভারে ক্লান্ত হয়ে প্রধানমন্ত্রীর পদ ছেড়ে আসছেন। তাঁর এই সিদ্ধান্তের পিছনে অন্য গভীরতর কারণ থাকা সম্ভব।

মন্ত্রিসভার কাছে তাঁর বিবৃতিতে উইলসন তাঁর পদত্যাগের চারটি কারণ উল্লেখ করেছেন। কারণগুলি হল:—(১) গত ১০ বছর ধরে তিনি শ্রমিক দলের নেতৃত্ব করছেন। এই ১০ বছরের মধ্যে আট বছর তিনি শ্রমিক দলের নেতা হিসাবে সরকার চালিয়েছেন। এই শতাব্দীতে শান্তির সময়ে আর কেউ এত দীর্ঘকাল প্রধানমন্ত্রীত্ব করেননি। (২) তাঁর মন্ত্রিসভায় এখন অভিজ্ঞ ও প্রতিভাবান সদস্যদের যেরকম সমাবেশ হয়েছে এরকম সমাবেশ এই শতাব্দীতে এর আগে আর কখনও হয়নি। এখন নেতা নির্বাচন হলে দেখানে যাবে প্রতিভার সম্পদ কি পরিমাণে পাওয়া যেতে পারে। (৩) তাঁর উত্তরাধিকারী তখন নির্বাচিত হলে ঐ উত্তরাধিকারী বর্তমান পার্লামেন্টের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে নিজের কাজের বিশেষ ভঙ্গী চালু করার ও কর্মকৌশল স্থির করে নেওয়ার পর্যাপ্ত সময় পাবেন। (৪) যেসব প্রশ্ন এসেছে সেগুলির পুনর্বিবেচনার সুযোগ করে দেওয়া যাবে।

অর্থাৎ উইলসন বোঝাতে চেয়েছেন যে প্রধানমন্ত্রীর পদ আর বেশি দিন আঁকড়ে না থেকে উত্তরাধিকারীর জন্য জায়গা করে দেওয়ার সময় হয়েছে মনে করেই তিনি পদত্যাগ করেছেন।

মন্ত্রিসভার কাছে তাঁর বিবৃতিতে উইলসন একথা পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে তাঁর পদত্যাগের পিছনে ঐ কারণগুলি ছাড়া অন্য কোন রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক কারণ নেই। কিন্তু তবু বাস্তব ঘটনা হল এই যে তিনি এমন এক সময়ে পদত্যাগ করছেন যখন তাঁর সরকারের নীতি সম্পর্কে দলের ভিতরে একাংশ প্রায় প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। এই বিদ্রোহের কারণ হল উইলসন মন্ত্রি-সভার অর্থমন্ত্রী ডেনিস হীলির একটি হোয়াইট পেপার। এই হোয়াইট পেপারের বক্তব্য হল মুদ্রাস্ফীতির ফলে বৃটেন আজ গভীর অর্থনৈতিক সংকটে পড়েছে তা থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে সরকারী খাতে খরচ কমিয়ে বেসরকারী শিল্পে মূলধন নিয়োগে উৎসাহ দিতে হবে।

এই বক্তব্য অনুসারে হীলি প্রস্তাব দিয়েছেন যে আগামী চার বছরে বৃটিশ সরকারের খরচ ৮০০০ কোটি টাকার মতো কমিয়ে দিতে হবে। এই সরকারী খরচ কমাবার অর্থ জন-কল্যাণমূলক খাতে শ্রমিক সরকার যে অর্থ ব্যয় করে আসছিলেন তার অনেকখানি ছাঁটাই করতে হবে। প্রতি-রক্ষা শিক্ষা পরিবহণ গৃহ-সংস্থান প্রভৃতি অনেক খাতই এই ছাঁটাইয়ের আওতায় আসবে। অন্যদিকে বেসরকারী শিল্পে লগ্নীর পরিমাণ বছরে ৮০০ কোটি টাকার মতো বাড়বে।

জনকল্যাণ রাষ্ট্রের যে ধারণার উপর শ্রমিক দলের প্রতিষ্ঠা তার সঙ্গে উইলসন সরকারের ঘোষিত এই নতুন নীতির বৈসাদৃশ্য এতই বেশি যে শ্রমিক দলের বামপন্থী অংশের পক্ষে এটা হজম করা সম্ভব হয়নি। তাঁরা প্রকাশ্যেই এই নীতির বিরুদ্ধতা করছেন। তাঁরা হীলির হোয়াইট পেপারকে লাজাকর দলিল বলে আখ্যা দিয়েছেন কমন্স সভার সদস্য টাওনি বেনের বলেছেন, সরকারী ব্যয় যে ছাঁটাই করা হচ্ছে তার ফলে সম্পদ ও ক্ষমতা শ্রমজীবী মানুষ ও তাদের পরিবারবর্গের হাত থেকে চলে যাবে। তিনি আরও বলেছেন যে, যুদ্ধবিধ্বস্ত ড্রেসডেনের মতো সরকার পক্ষের অর্থনৈতিক নীতি এখন ধ্বংস ও হতাশার ভগ্নস্তূপের নীচে চাপা পড়ে গেছে।

ট্রিবিউন গোষ্ঠী নামে পরিচিত শ্রমিক দলের বামপন্থী অংশ উইলসনের এই সমাজতন্ত্র বিমুখ নীতির প্রবল সমালোচক। এই দলের ৩৭ জন সদস্য অনুপস্থিত থেকে উইলসন সরকারের বিরুদ্ধে রক্ষণশীল দলের একটি প্রস্তাব পার্লামেন্টে পাশ করিয়ে শ্রমিক দলের সরকারকে বিপদে ফেলেছিলেন।

উইলসন অবশ্য শক্তিশালী ট্রেড ইউনিয়নকে তাঁর সঙ্গে রাখতে পেরেছেন। যাঁরা অনুপস্থিত থেকে শ্রমিক দলের পরাজয়ে সাহায্য করেছিলেন তাঁদের ভোটে পরে উইলসন পার্লামেন্টে একটি আস্থা জ্ঞাপক ভোটও পাশ করিয়ে নিয়েছেন। তাছাড়া কোভেন্ট্রির উপ-নির্বাচনে শ্রমিক দলের জয় উইলসনের হাত শক্ত করেছিল। কিন্তু এসব সত্ত্বেও এটা ক্রমেই পরিষ্কার হয়ে আসছিল যে বৃটেনের টলমলে অর্থ-নীতি সামাল দিতে গিয়ে উইলসনকে ক্রমেই বেশি করে সমাজতন্ত্রের পথ থেকে সরে আসার অপবাদ নেওয়ার ঝুঁকি নিতে হবে।

নতুন একজন নেতা নির্বাচনের চ্যালেঞ্জ এখন দলের সামনে ছুঁড়ে দিয়ে হ্যারল্ড উইলসন তাঁর দলের বিভিন্ন অংশকে একটা অকপটদলীয় বিতর্কে নেমে এ বিষয়ে মন-স্থির করার সুযোগ দিলেন।

বৃটিশ পার্লামেন্টে শ্রমিক দলের এখন মাত্র দুজন সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে। পর্যবেক্ষকদের ধারণা শ্রমিক দলের নতুন নেতা একটু গুছিয়ে বসতে পারলেই পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দিয়ে নতুন নির্বাচন ডাকবেন।

১৭-০-৭৬ —প্রতিনিধি

ডঃ রেহলেন বসু এম.বি.বি.এস.
ডঃ এস এন পাণ্ডে এম.বি.বি.এস
যৌবনের রহস্য
প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য · মূল্য-৮৲
যৌনবিজ্ঞানের রঙীন ও রুচিচিত্রে চিত্রিত অতি আধুনিক সংস্করণ।
মোহন লাইব্রেরী

উপন্যাস

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

আদ্য শেষ রজনী

। পাঁচ ।

আমাকে নিয়ে বড় বড় কথা বলা যায়। কিন্তু প্রতিষ্ঠা দেওয়া যায় না। লাইনস্ লিখে অমিয় প্রায়ই কাগজ চাইল লীলার কাছে। এ ভায়ালগটা সে ভাবছিল।

নাটক শেষ। অন্তত এমনভাবে শেষ। এরপর যা বদলাবে রিহার্সেল দিতে দিতে। স্টেজে নামার পর আরও কিছু পালটাবে। গল্পটা খুব সাধারণ। বিখ্যাত লেখকের বিখ্যাত গল্পের সূত্র ধরে অমিয় এ নাটকের কাঠামো দাঁড় করিয়েছে। গল্পের সূত্রটিকে রেখে অমিয় একদম নতুন নাটক লিখে ফেলেছে।

নতুনই বলবে অমিয়। নতুন বলার কারণ আছে।

কোন কোন নাটক লেখার সময় তার মনে হয়েছে ভাবের বেগার খাটছে। কিছুই মাথায় আসছে না। বসে কতক্ষণ লাইন কলম থেকে উগরে দিতে হয়েছে। লেখবার সময়েই সন্দেহ তাকে কুরে কুরে খেত। এ কি নাটক হচ্ছে ঠিক?

আবার কোন নাটক লেখার সময় ছেড়ে দেওয়া চরিত্রগুলো অবাধ্য হয়ে তাকে দিয়ে নানারকম কথা লিখিয়ে নেয়। তখন নাটকের চরিত্রই নাটক ডোমিনেট করে। তখন পরিষ্কার বোঝা যায়—নাটক হচ্ছে। নাটক হয়েছে।

যাবতীয়কে নিয়ে বাইরে গিয়ে বসে পরিচয় দিয়ে নানা বিপত্তি। সাধারণ গৃহস্থবধূর মত ব্যবহার করতে গিয়ে যাবতীয়ার মনে নানা প্রশ্নের ঝড়। আপাতভাবে বাইরে থেকে দেখতে হাসি। সব ঘটনা ঘটে গেল। ভেতরে দেওয়াল, বাড়ি, দরজা সবই আসল ভেঙে পড়ছে। এই হল গিয়ে গল্প। এই অংশ নিয়েই সুজাতা।

অমিয়র যাবতীয়ার কাছে যাওয়ার কথাটা সুযোগ বুঝে, একবার সুজাতার ধার করতে সুধোর দিকে বাড়িয়ে দেয় মাসির কাছে গিয়েছিল। এখান থেকে সব ঠিক, শুধু কিছু টাকা আনার যাওয়া—ফেরার ভাড়াটা ঝামেলার না যায়। সেই লাইট পাতের নিচ দিয়ে হাঁটার সবাই একবার করে তাকিয়ে নেয় টাকা

[illegible] দিলে তাহলে কথার নড়চড় করে না কখনো।

—একটা গায়ের সস্তা মাছ ভাজা দিলে কেন? মন্ত্র কেন হয়েছে বল?

—আওনা একখানা লীলাও সঙ্গে নিয়ে বসল।

—আজ স্কুলে যাবে না?

—ইচ্ছে করছে না। মুডটা পিরিয়ড মোটে—

জানো লীলা—আজ খুব আমার সিস্টার কথা মনে পড়ছে—

—ওঃ! তোমার বালক বয়সের হিরোইন! বল না একটু শুনি।

—এই মাছ নিয়েই কথাটা। দাদামশাই চন্দ্রাভুজ বন্দ্যোপাধ্যায় মেস থেকে সাকাঁস করতেন। শনিবার বিকেলে এমনভাবে বাড়ি আসতেন—যেন চাকরি করে সংসারটা উদ্ধার করে দিয়েছেন। সবাই তটস্থ হয়ে থাকত।

স্কুল থেকে ফিরে দিদিমাকে বেরতাম সপ্তাহের খাওয়া খেয়ে বসেছেন। অর্থাৎ সংসারটা সামলে, গোছগাছ করে তবে খেতে বসতেন। তাও আবার মাছ খাচ্ছেন না। সব আমার জন্যে রেখে যাচ্ছেন।

খেয়ে আমি চেপে ধরলাম। তোমায় বলতেই হবে-কেন তুমি মাছ খাও না। বলতে চাইছ না। অনেক সাধাসাধির পর যা বলল, তা হল, এক শনিবার বিকেলে অমন সপ্তাহের ভাত খেতে বসেছেন। হাতে ইলিশ মাছের মাড়ো। দাদা হেলাফেলা টুন কলকাতা থেকে ফিরে দিদিমাকে মাছ খেতে দেখে—এগিয়ে এসে উঠন্ত দাতের ওপর ঘা করে এক লাথি কষলেন। আমি এলাম খেটেখুটে—উনি বসেছেন মাছের মাড়ো খেতে। সেই থেকে মাছ খাওয়া ছেড়েছি দাদু।

আমরা ছেড়ে দিলাম। দাদু পরিষ্কার মানুষ। আমি আরেকজন পরিষ্কার মানুষের হিসাব দাদুর পাশের প্রাইভেট করতে লাগলাম। ভাত খেতে বসে মাছ দেখেই বলতাম গা গুলোচ্ছে।

দিদিমা ধরলেন।

'তখন ঠিক বললাম, তুমি মাছ খেলে আমি খাব। নইলে নয়। তখন দিদিমা আমায় খেতে শুরু করলেন। একটু, একটু করে।

—দিদিমার কথা মনে পড়ছে কেন?

—বারবার মনে পড়ে। ওই মাকে ছাড়াও তিনি সারাদিন পরে গা ঘেঁষে পরিষ্কার হয়ে কবিতা লিখতে বসতেন। শুধু নিজের কবিতা। একটা একটা করে লাইন লিখতেন আর আমায় শোনাতেন। আমিই ছিলাম শ্রোতা। তখন তো জানতাম না আমিও একদিন একটা একটা করে লাইন লিখব।

লীলা ডাক বসিয়েছিল। উঠে গেল।

অমিয় গুনগুন করে গাইছিল। সিকায়েন্সটা হবে এমন: সুজাতাকে নিয়ে জীবন কলকাতার বাইরে হাওয়া বদলানোর জন্যে ছোট বাড়ি ভাড়া নিয়েছে। সেখানে দোর আটকে সবে বোতল নিয়ে বসেছে। সেখানে বালকা চালের কাওয়ালি গাইছিল সুজাতা। গায় অল্প জামাকাপড়। খুনসুটি চলছিল। সুজাতা খারাপ পল্লীতে মানুষ। পিছু পরিচয় নেই। বড় হতেই তার যা লোককে আনন্দ দেবার লাইন তাকে দিয়ে ধরিয়েছে। এমন সময় কলকাতা থেকে বেড়াতে আসা চেনাদের দল দরজায় এসে কড়া নাড়ল।

তখন সুজাতা ভেতরে গেল। জীবন দোর খুলে দিল। তারা সবাই এসে একসঙ্গে বলল, রবীন্দ্র গান শুনব।

সুজাতা ঘর থেকে পালিয়ে যাবার আগে জীবন মিঠে মিঠে তার সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দিয়েছে। একঘর লোকের ভেতর সুজাতা সেই সিঁদুর মাখায় লাল পেড়ে গরদ পরে ঘরে ঢুকেছে। একেবারে সাক্ষাৎ কোরাণী। সতীসাধ্বীর লক্ষ্মীশ্রী সারা মুখে। ঘরভর্তি লোক অবাক। সবচেয়ে অবাক স্বয়ং জীবন।

তাকে আরও অবাক করে দিয়ে সবার অনুরোধে সুজাতা যে গান ধরল, তার প্রথম কলি

'একি মায়াজালে জড়ালে আমায় বন্ধু,
কেন মোরে হিয়া ভরালে আমায় বন্ধু'

এ গানটি ভৈরবীর ওপর। সলো কাজ মিশিয়ে মিশ্র রাগের গান। হারমোনিয়মে

মধ্যমের ওপরে উঠে অঙ্ক মিটে রজনী পাইবে। দৃশ্যটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল অমিয়। রিটায়ার্ড জজ রাখালবাবু সস্ত্রীক খাটে বসেছেন। সরকারী অফিসার অনিমেষবাবুর মেয়ে নূপুর ডাক্তারির থার্ড ইয়ারের ছেলেবন্ধুদের নিয়ে মেঝেতে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে। স্থানীয় চালকল মালিক কেষ্টবাবু কোচার খুঁটটুকু গোলাপ ফুল ধরার স্টাইলে ধরে আছেন। একটুনি ফুল ভেবে গন্ধ শুঁকতে পারেন। ন' ক্লাশের তিনটি বন্ধুর মধ্যে একজন তোতলা। স্কুল মিস্ট্রেস আভা একঘর লোকের মধ্যেও উঁচু বুনছে, সুজাতা দাঁড়িয়ে গাইছে।

আসলে পুরো দৃশ্যটাই নাটকের মধ্যে নাটক। ওপরে একটা নাটক হচ্ছে। যেটি দেখতে দর্শকরা টিকিট কেটে আসবে। দেখতে এসে নাটকের পাত্রপাত্রীর ভেতর আরেকটি নাটক দেখতে পাবে। বারবনিতা, ফুর্তি, মদ্যপান—এ সব ওপরকার মোড়ক মাত্র। ভেতরে গাঢ় ছায়াধরা গাছগাছালির ভেতর দিয়ে কালো, শান্তিজল বয়ে যাচ্ছে। তার উৎস হৃদয়। পরিণামও হৃদয়।

লিখতে লিখতে এই ব্যাপারটাই কাজ করেছে আগাগোড়া। ডায়ালগ লিখে তো খালাস হওয়া যায় এক রকম। কিন্তু কোন ডায়লগ কে কোথায় থাকবে। পোশাকের কন্টিনিউটি। আলো। মিউজিক। এক্সট্রাস এবং একজিট। উপরন্তু রূপ। এতগুলো জিনিস মাথায় ধরে রাখতে হবে।

'এ কি মায়াজালে জড়ালে আমায় বন্ধু কেন গৌরব নিয়ে—'

'সুজাতে সিন্ধুরের গৌরব, এই গানের পর থেকেই সুজাতার হাবভাব পালটাবে। সে যেন আর খুনসুটি করার সময়ই নয়। এরপর থেকে গৃহিণীর মতই সে তোরে উঠে এসে জীবনের ঘুম ভাঙাবে। বাড়িতে নিজে রান্না করতে চাইবে। পাশের বাড়ির অসুস্থ বালকের কল্যাণে হনুমানজীর পায়ে পুজো পাঠাবে। আর জীবন যার যার তাকে মনে করিয়ে দেবে—সুজাতা তুমি দেহপণ্যা।

গল্পটা কি খুব পুরনো? গল্পটা কি খুব নতুন? না, গল্পটাই মানুষের জীবন। তাকে ফেলে ধরা—তাকে উদ্ভাসিত করাই নাটক। এ নাটক কি সত্যিই লাগবে?

সেট বানাতে কম টাকা লাগবে না। তিনটে জানলা চাই। একটা বালিশ। একটা বুক কেস। তিনটি অন্তত ফটোলাইট। ওপেন এয়ার থিয়েটারে এক সন্ধ্যায় অভিনয় করে এ নাটক জমানো যাবে না। পাকাপোক্ত হল চাই।

সবার আগে চাই টাকা। টাকা জিনিসটা যে কি করে পাওয়া যায়! অমিয় জানে দুর্গালালের গদি। বছ করে একটা জিনিস মনে পড়ে গেল অমিয়র। অন্তত দশ-বারো বছর আগেকার কথা। এমনিই মনে পড়ে গেল। সে তো রজনীর সঙ্গে আগে একবার অভিনয় করেছে। তাদেরই অফিস ক্লাবের নাটক। তখন রজনীর বয়স আরও কম ছিল। অমিয়রও বয়স কম ছিল। রজনী তখন পাবলিক স্টেজের সঙ্গে ঝগড়া করে অফিস পাড়ার থিয়েটারে যেপ দিত। পার নাইট পঞ্চাশ টাকা। কী দাপটের অভিনয়। মাসের মধ্যে অন্তত দশদিন কাজ থাকত রজনীর। আজ বঙ্গে বর্গী, আবার কালই সোশাল বইতে, অন্তত দশখানা বই ধরতে পারত রজনী। কী স্মৃতিশক্তি। কী উচ্চারণ। এখন বোধহয় পান জরদা ধরেছে। নরত হাস্যলে সেদিন সুন্দর সাজানো দাঁতে পানের ছোপ দেখলো কেন, মনে পড়ছে! মনে পড়েছে অমিয়র।

—'এই লীলা একবারটি আসবে।'

—'বল।'

ঘটনা ঘটছিল বোধহয়, হাতে হলুদের ছোপ। শাড়ির আঁচল ভিজে।

—'আমি রজনীকে চিনতাম।'

—'তা চিনবে না কেন? তোমরা নাটক লাইনের লোক, একসঙ্গে ছেকেছিলে?'

'উঁহু, শোন। মনে আছে আমাদের অফিস ক্লাবের নাটকে আমি ছোটবাবু করেছিলাম। যিনি পুটেশ্বরী সেজেছিলেন—তিনি এই রজনী। তাই বল—আমার স্মৃতিশক্তি এত উঁচুক হয়ে গেল কবে থেকে।'

লীলা যেমন এসেছিল তেমনি চলে গেল।

অমিয় মনে মনে হিসেবটা বলল—পেয়েছি, পেয়েছি, পেয়েছি। শেষ বারেরটা নিজেই শুনতে পেয়ে অমিয়র খুব লজ্জা হল। কি পেয়েছে? নাটকের হারিয়ে যাওয়া মেসেজ লাইন? না, পুরনো স্মৃতির ভেতর থেকে হারানো রজনীকে? রজনী তো আর কেউ নয়। তবু সেদিন কেমন অনুতাপ ঠাকুরঝির স্মৃতি মুছে দিচ্ছিল।

পটেশ্বরীর গলায় আজ থেকে দশ-বারো বছর আগে অফিস ক্লাবের অভিনয়ে রজনী মাতাল অবস্থায় ছোটবাবুকে ওরফে অমিয়কে বলেছিল—মদ আমার নেশা নয় গো—আমার নেশা তুমি।

আমি অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায়। বয়স চল্লিশ, ছাতি চল্লিশ। হাইট ছ ফুট এক। বিকু দত্তের ভাষায় ঈগল-নাশা। লম্বা কলমি, একঢাল কোঁকড়া চুলের মাথাটা নিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে তাকালে মনে হবে আমার জন্যে ভেথ ওয়েট করছে, ওৎ পেতে বসে আছে। বিপর্যয়ই আমার জন্যে নির্দিষ্ট ভাগ্য। তাই বিকুর মতে আমার পক্ষে অন্যমনস্ক হওয়া নিষিদ্ধ। অন্যমনস্ক হলেই নিয়তি এসে প্রবেশ করবে। একবার ঢুকলে আর এগজিটের নাম করবে না।

নিয়তির মানে অমিয় জানে না। এক এক সময় মনে হয়—নিয়তি একটি নির্দিষ্ট জায়গা, গ্রাম। সে গ্রাম হয়তো মাথার মধ্যে এক জায়গায় আছে। সে গাঁয়ের পাখির ডাক, বন্ধ আম গাছের সর্বাঙ্গে পরগাছা, লতার ক্রমশঃ আচ্ছন্নকারী মতো, কাঠবিড়ালীর আনাগোনা—সবই তার জানা। সময় হলেই সমগ্র গ্রামখানি তার চোখের সামনে ছবি হয়ে ধরা দেবে। সেই গ্রামখানি তার কাছে মৃত্যু কিংবা সাফল্য। একদিন সে মৃত্যুর নাম দেবে—নির্যাত, একদিন সে সাফল্যের নাম দেবে—নির্যাত। এ নাটক কি হাতছাড়া লাগবে? তাহলে কি লাগল?

ধড়মড় করে উঠে দাঁড়িয়ে অমিয় মাথাটা ঝাঁচড়ালো। বেরিয়ে পড়ার মুখে অমিয়কে লীলা ধরল। 'কোথায় চললে?'

—'আসছি।'

—'ফেরো যাও।'

—'আসছি।'

রাস্তায় বেরিয়ে অমিয়র মনে হল, চেম্বার সর্মাতর নূপুর মেয়েটিকে দিয়ে একটু নুনো পিনাকীর সঙ্গে নীল আলোয় স্পট লাইটের ভেতর নাচাতে হবে। ওরা দুজন জানাতে পারবে—দুজনকে দুজন ভালবাসে। সে ভালবাসাবাসি এখন ওদের মধ্যে জানাজানি হয়ে গেছে। আর কোন বাধা নেই। পিনাকী ডাক্তারীর থার্ড ইয়ারের ছাত্র। তার হাতে সবসময় ট্রানজিস্টর। পটোদি কি করল? কাঁধে ক্যামেরা। তাতে ছত্রিশখানা ছবির স্পুল। আর ছখানা ছবি তুললেই প্রিন্ট করতে পাঠানো যাবে, কিন্তু সেই ছখানা ছবিই তোলা হচ্ছে না।

ওদের এই অল্পবয়সের ভালবাসা-বাসির পাশেই নিষ্ঠুর নিয়তি দুটি খেলা একসঙ্গে খেলছিল। সুজাতা কৃপালনীর স্মৃতি তুলে দিয়ে ঘরণীর সামাজিক মর্যাদাটুকু আঁকড়ে ধরতে চাইছিল। আবার স্কুল

শরৎ অন্নদাশঙ্কর বাঙ্কিমচন্দ্র বহু তথ্যসমৃদ্ধ সচিত্র অর্ঘ্য—
শরৎচন্দ্র—মণি বাগচি—১৫৲
রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম • কাজী নজরুল ইসলাম • ২০৲
দেশবন্ধু • মণি বাগচি • ২০৲
মহানায়ক মুজিবুর-অন্নদাশঙ্কর রায়-১৫৲ মহাজীবন-অন্নদাশঙ্কর রায়-২০৲
মোহন লাইব্রেরী : ১৫ এ, সূর্যসেন স্ট্রীট • কলিকাতা-৯
ফোন : ৩৫-৩৩৩৯

মিলেনিয়ম আডার দিকে জীবন ঝুঁকে পড়ায় লক্ষাতীর ঠুনকো বয়সীর মর্যাদাও খান খান হয়ে ভেঙে পড়ছিল।

এখন রিহার্সেলের আগে চাই একখানা পাকাপোক্ত হল। সেখান থেকে ছুটে করে উঠে আসতে হবে না। একবার বর্ধমানে থিয়েটার করতে গিয়ে অমিয়র অনেকগুলো পোড়ো দৌড়ের ছোবে পড়েছিল। বিরাট মিছাই হলঘর। স্টেজ করে নিলেই দিব্যি নাটক করা যায়। আলু এসেশে এসেছিল সাহেবরা। বড়ো বয়রও হয়নি, তার জন্যে এত হল হয়ে গেল। নাটক কবেকার ক্লাসিক। তবু আজও সবার অভিনয়ের জন্যে সহজে পাওয়া যায় এমন মঞ্চ হল না। যাও বা আছে—তার ডেট পাওয়া কঠিন। গুহেদের অ্যাভভান্স। চেলার অঢেল মাঠ. অভিনয়ের সহজ মঞ্চ কবে যে হবে!

কলকাতার শিকড় আজও উইবে। দক্ষিণ স্রোত অলক্ষ্যে। ভাগ্যিস গুপেন এয়ার থিয়েটারটি হয়েছিল। তাই আজকাল ওদিকবার সন্ধ্যার বাতাসে নাটকের গন্ধ ভাসে। নয়ত দক্ষিণে তো আসল শুধু সিনেমা হলেরই জাপট। তবু উত্তরে কিছু পাকাপাকি নাটকের জায়গা হয়েছে।

হাঁটতে হাঁটতে দুর্গালালের গদী। দুর্গালাল নিজেই বসেছিল। অমিয়কে দেখে বসালো। আরও দু' ভদ্রলোক বসে। একজনের চোখে চশমা। গায়ে আদ্দেকা দিনের সুতোলি লাগানো ফতুয়া। হাতে সুন্দর হাতলের ছাতা। মোটা সুন্দর গোঁফে কয়েকটি সোনালি তার টঁকি দিচ্ছে।

—আসুন অমিয়বাবু। খবর কি?'

—'খবর তো আপনাদের। হল খুঁজছি।'

—টাকা লাগলে নিয়ে যাবেন।'

—'হল পাই আগে।'

সেই সুন্দর ছাতাটির মালিক বললেন—'যদি কিছু মনে না করেন—'

অমিয় ফিরে তাকালো।

দুর্গালাল ভদ্রলোককে বলল—বলুন না। অমিয়বাবু আমার চিনা পরিচিত আছেন।'

—'আমাদের একটি হল আছে। হল দিয়ে আপনি কি করবেন?'

—'আমাদের গ্রুপ থিয়েটারের নাটক হয়।'

—'সে তো মাঝে মধ্যে।'

—'না তেমন পেলে রেগুলার শো করা যায়।' অমিয় তখন মনে মনে বলছে—আহা! কোথায় হলটা বলেন না। কিন্তু পাড়ে বেশি আগ্রহ প্রকাশ পায়। তাহলে যা তা ভাড়া চেয়ে বসতে পারে। সুদীপ বলে ফেলল আজকাল তো অনেক হল হয়েছে—আপনাদের হল কোথায়?'

—'এই মধ্যেই। সায়েন্স কলেজ ছাড়িয়ে। আমি শ্রীরাম ট্রাস্টের সম্পাদক। হরিসাধন বসু আমার নাম।' বলেই পকেট থেকে একখানা কার্ড বের করে দিলেন। দু-একবার নাটক হয়েছে আমাদের হলে। পাকাপাকি ভাড়া দেওয়ার কথা আমরা কোনদিন ভাবিনি।'

দুর্গালাল বলল—'এইবার ভাবতে হোচ্ছে। স্টাফের মাইনা বাকি পড়ে গেছে। কর্পোরেশনের টাকস। আমি বলছি হরিবাবু—আপনারা অমিয়বাবুকে হল ভাড়া দিতে পারেন।'

—'বসার সিট আছে?' অমিয় অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল।

—'আছে। আদেকার কাঠের সিট। রামায়ণ গান শোনার জন্যে শ্রোতারা বসতেন। তা সে পাট তো আজ দশ বছর বন্ধ, লাইব্রেরী ছিল। বইপত্তরও আছে। কিন্তু পড়ে কে? আপনারা নেবে নিতে পারেন। আপনারাই বলুন না।'

—'আমি আর হল নিয়ে কি করব বলুন। আসবেস্টসের ছাদ?'

এবার পাশের ভদ্রলোকটি বললেন—'হুঁ। সাউন্ডের ব্যাপারে আপনার কোন অসুবিধে হবে না। দোতলার বালকনি সেভাবেই বানানো। শ্রীরাম ট্রাস্ট সেভাবেই তৈরি করেছিলেন। হল নিলে আপনার অবশ্য কিছু খরচা করতে হবে।'

দুর্গালালের গলা টিপ্পনির মত শোনালো। যে অমিয়বাবু করে নেবেন। আপনারা টাকা নিচ্ছিলেন স্টাফের জন্যে। আপনাদের আর কোন কাজে সই করার দরকার নেই।'

—'কেন দুর্গালাল?'

অমিয়র কথাবার্তা এমনই—দুর্গালাল মাঝে মাঝে থমকে যায়। এবারও গেল। কিন্তু লোকটা টাকা নিলে টাকা না পাবলে গয়না দিয়ে পুষে যায়। হেসে বলল—হল দেখুন না। আপনার পসন্দ হলে টাকা তো লাগবেই, সে টাকা তো ওঠাই পাকেন—'

—'ওঃ! আগে দেখি।'

ভাতা হাতে ভদ্রলোক বললেন—আসুন বেরুলে আসুন। ফোন করে আসবেন। আমি একবার আর্টার্স বাড়ি যাব।'

—'বেশ তো।' বলে অমিয়ই আগে বেরিয়ে এল। ইচ্ছে করেই এল। ভদ্রলোক দুজন দুর্গালালের কাছ থেকে তাদের কথা জানুক। তার কথা। মন্তব্যের কথা। চেহারাটি বুঝে নিয়ে বানানো। এদের হাতে আস্ত একটা হল গড়াগড় করছে। অথচ ভাড়া নেওয়ার লোক পাচ্ছে না। বলিহারি!

সেখান থেকে বেরিয়েই টাম লাইনের ওপর ওষুধের দোকান। বাস্তা থেকেই লাল টেলিফোনটা দেখা যাচ্ছে। টেলিফোন যে এমন দুষ্মকের মত টানতে পারে জানা ছিল না আগে। বুক পকেটে শ্রীরাম ট্রাস্টের সেক্রেটারির কার্ডখানা। এই হল কি আমাদের হবে? টাম লাইনের ওপর—অথচ এতদিন কোন খবর পায়নি। আশ্চর্য!

ভূতগ্রস্তের মত ডায়াল করে গেল। সাপ্তাহিক সম্বর্ধের লাইন পাওয়া কঠিন। পেলেও কি এখন সিনু নন্দকে অফিসে পাওয়া যাবে।

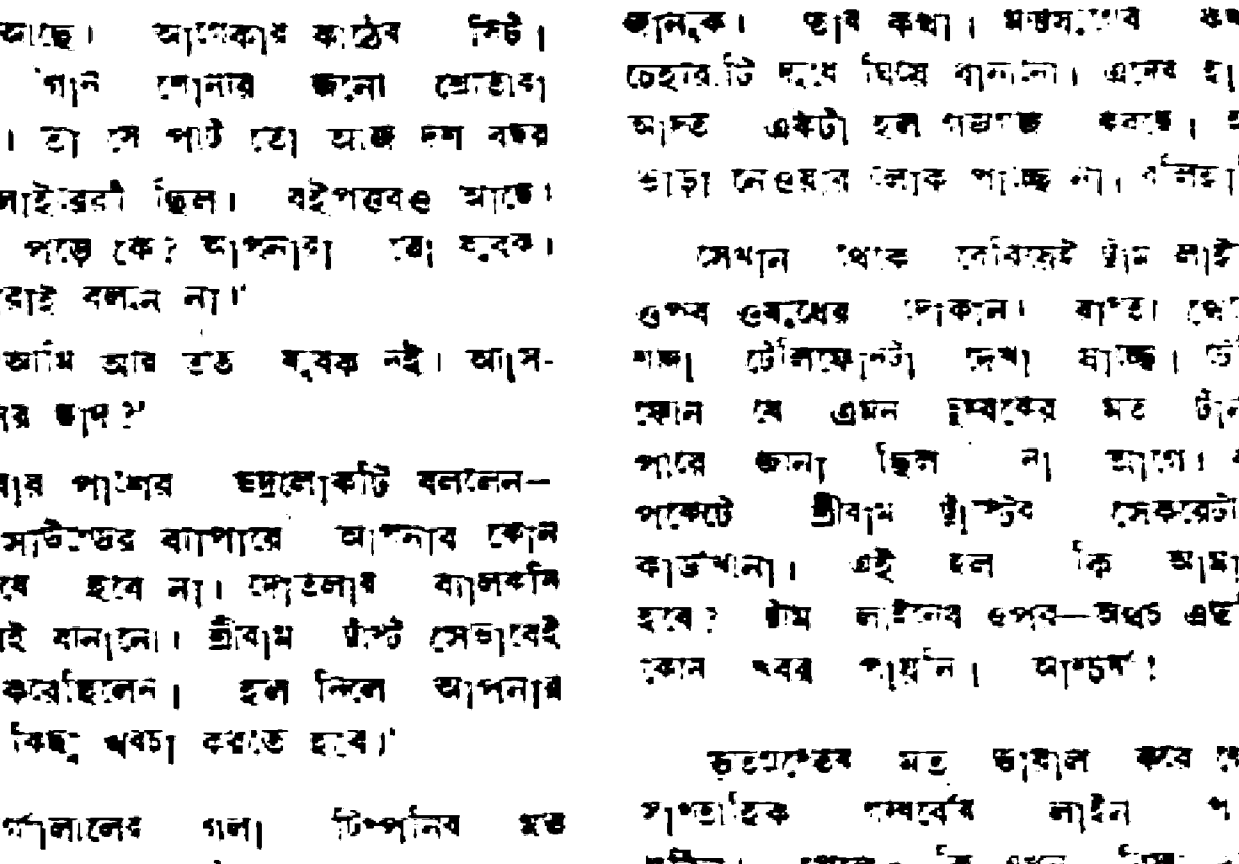

ফিরে আসছিল অমিয়। কি মনে করে আরেকটা লাইন ডায়াল করল। সঙ্গে সঙ্গে ওপাশ থেকে গলা এল।

—'রজনী আছেন?'

—'বলছি।'

—'আমি অমিয়—'

—'শুনেই বুঝেছি—'

—'কি করে বুঝলেন?'

—'গলাটা আমার চেনা মনে হল।'

—'আপনার তো সবই চেনা মনে হয়—'

—'না। তা হয় না। বলুন—'

—'বাড়ি থাকছেন। একবার যাব ভাবছিলাম—'

—'আসুন না। চলে আসুন।'

'অসুবিধা হবে না?'

—'কিসের অসুবিধে?'

—'আজ তো আপনাদের শো আছে—'

—'শো কোথায় আর হবে না—'

—'কেন?'

—'আসুন না।'

হল এখনো পায়নি অমিয়। পেলেও কাজের মত হবে কিনা জানে না। হলেও ভাড়া কত চাইবে তার ঠিক কি। সে ভাড়ার টাকা কোত্থেকে আসবে? দর্শকাসন আছে অবশ্য। ট্যাকসি এসে সেন্ট্রাল অ্যাভিনুতে পড়তেই অমিয় বলল, বাঁদিকে—

কয়েক ধাপ সিঁড়ি পেরোবার অপেক্ষা। তাও ভর সইছিল না। দরজা খোলা ছিল। সামনেই বড় সোফায় রজনী বসে। সারাটা বাড়ি নিঃশব্দ। উল্টো দিকের সোফায় বসতে বসতে অমিয় বলল—'আমরা একটা হলের সন্ধান পেয়েছি। রাস্তার ওপর—'

রজনী তখনো কোন উচ্চবাচ্য করছে না দেখে অমিয় মনে মনে বিমর্ষ হয়ে পড়ল। এত বড় একটা খবর—অথচ শুনবার পরে একটু উৎসাহ-বিহ্বল হল না রজনীর। ভাড়া এখনো ঠিক হয়নি।

—'হল দেখেছেন?'

—'আজ বিকেলে দেখব।'

—'দেখুন আগে।'

আগুনে জল ছোঁটানো গলায় রজনী কথা বলছিল।

'আমি কিন্তু আপনাকে অনেক আগে চিনতাম।'

—'তাই বুঝি। কবে থেকে?'

অমিয়র ভয় হচ্ছিল। রজনীর চোখের মণি পাশের শাদার সঙ্গে মিশে যেতে চাইছে মনে হল।

—'অনেক দিন আগে। অফিস ক্লাবে আপনি পটেশ্বরী করেছিলেন। আমি ছোটবাবু।

'সে আমার নেশা নরগো! আমার নেশা তুমি!' মনে আছে? এই ডায়ালগে আপনি ক্যাপ নিয়েছিলেন। স্টেজে আপনার পাশে আমি দাঁড়াতে পারছিলাম না।'

আচমকা গেয়ে উঠলো রজনী। একদম হঠাৎ। যেন কথার জবাবে গান: 'বাঁধিয়া বিনোদ বেণী—' এক পাক গেয়েই থেমে গেল রজনী। তারপর আপনা থেকেই বলল—'হল করতে যাচ্ছেন ভালই। বাধা দেব না। কিন্তু অনেক বিপদ, বুঝলেন। বাবাকে দেখলাম। বড়বাবুকে দেখেছি। এখন নিজে ভুগছি।'

—'কেন? আপনাদের তো ভালই চলছে।'

—'খারাপ তো চলার কথা নয়। কিন্তু এখন খারাপ চলছে। আমরা শো বন্ধ করে দেব। কত আর লস দেব বলুন?'

—'লস কেন হবে?'

—'লস তো হওয়ার কথা নয়, কিন্তু কেন হিসেব জানিনে। সবাই গোলমাল করছে। আটঘাট বেঁধেই দল করছিলাম। হাজার হোক আমি একজন মেয়েমানুষ তো। আমার কথা সব জায়গায় খাটবে কেন।'

—'একথা বলছেন কেন?'

—'বোলপুরে পরশুদিনো করিনি। ঘাবড়াতে এগারোর নাটকে গিয়ে যেই আটকে গেলাম—অমনি মা আমার স্টেজ টেনে নিলো। পড়বার মধ্যে রবি ঠাকুরের শ্যামা কবিতাটা শুধু মুখস্থ আছে—'

নিজেই আবার শুরু করল রজনী: 'অবিশ্যি ভালো ভালো লোকের সঙ্গ পেয়েছি। মায়ের পরিচয়ে। বাবার পরিচয়ে। বড়বাবুর পরিচয়ে। আমার নিজেরও যেটুকু অভিনয়ের ছোঁ—তার জোরেও বলা পেয়েছি। কৃষ্ণকলি গাইছেন: অন্ধ হৃদয় কেঁদে কেঁদে ফেরে—। গলায় কি ছিল তার জানি না। আমার বুক ভরে কান্না আসত। গোলাম হোসেন করতেন অহীনবাবু। আমি আড়ালে। স্টেজে ঢুকে দেখি তিনি এককোণে বসে আছেন। ঢুকতেই চাপা স্বরে বললেন—কাছে আয়। পিঠে হাত রাখ। এগিয়ে গিয়ে হাত রাখতেই উনি একসপ্রেশন দিয়ে হাসলেন। আর অমনি উল্টোদিক থেকে ক্যামেরার ক্লিক। সেই আমার জীবনে প্রথম ক্লাপ—

'ভালবাসাও পেয়েছি অনেক। অনেক গুণীর সঙ্গ পেয়েছি। আমি লেখাপড়া করিনি। সামান্য একটা মেয়ে। বড় বড়রা হাতে ধরে স্টেজে নিয়ে গেছেন। ভালবেসে চান্স দিয়েছেন। ও'দের কথা আলাদা। কিন্তু এখনকার লোকগুলো দেখুন।'

—'সবাই তো খারাপ নয়।

—'তা বলছি না। তবে কবিয়ালের দলা আর করছি না। এত দলা কি করে হয়ে গেল বুঝি না।'

—'অ্যাকাউন্টস দেখতেন না আপনি?'

—'আগে সবই দেখতাম। একদিন রাগা-রাগি করে সব ছেড়ে দিলাম। আমার স্বামী আর তৃপ্তিবাবু, অ্যাকাউন্টসের ভার নিলেন—'

—'তৃপ্তিবাবু তো পাকা লোক। হিসেবের গণ্ডগোল হওয়ার তো কথা নয়। আপনাদের টিমটিও ভাল। 'কবিয়ালে' রাজন করেন তো তৃপ্তিবাবু।'

—'ভীষণ পাকা লোক। সেটাই তো মুশকিল হয়েছে। আমাদের টিমও ভীষণ ভাল। যাক গিয়ে, নাটক কতদূর?'

—'লেখা শেষ। এবারে রিহার্সেল দিতে দিতে যা কিছু বদলাবে—'

—'হল দেখে রিহার্সেলে নামা যাবে।'

—'হাঁ। হলের এমন সন্ধান পাব আগে ভাবিনি।'

—'আজ দেখে আসুন বিকেলে।'

—'দেখতে যাচ্ছি। কিন্তু টাকার জোগাড় নেই এখনো!'

—'হয়ে যাবে। কিছু কি আটকায়।' বলতে বলতেই রজনী নিজের মনোমত গেয়ে ফেলল:

'মন মন্দিরে বিহর তুমি
নিরজনে রাখি তাই—

নীলদর্পণের এই গান কিছুতেই ভুলতে পারিনি। অথচ সেই কবে করেছি।'

—'আপনার টাকাটা আজও দিতে পারিনি—'

অমিয় এমন আচমকা সেদিনকার সেই টাকার কথা তোলায় রজনী তাকিয়ে পড়ল তার মুখের দিকে।

একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে খানিক পরে বলল—'পরে দিয়ে দেবেন।'

(ক্রমশ)

বিশ্বসাহিত্যের বিস্ময়

বিশ্বসাহিত্যের আসন্ন নব আবিষ্কৃত বিভঙ্গ 'মহাদীপিকা' (কাব্য+নাটক+প্রবন্ধ+উপন্যাস+আত্মরচনা • • • • বহুধারার মহাসঙ্গম) কবি রূপতরুর ১৮ বছরের দীর্ঘ-সাধনার ফলশ্রুতি। বহুবিষয়ক 'ইঙ্গিত' তারই আদিগ্রন্থ, তথা একক-সৃষ্টিরূপে বিশ্বের বিস্ময়! সাহিত্যপ্রেমী মাত্রেরই তা অবশ্য-পাঠ্য।

ইঙ্গিত /১৫·০০/ যন্ত্রস্থ

বিশ্বমন্দির প্রকাশনী, কলি-২৮

CENTRAL LIBRARY

যেখানেই বাসা বাঁধো ॥

বিষ্ণু দে

গ্রাম গ্রামান্তরে বাসা কিংবা মফস্বলে
অথবা শহরে যেখানেই বাসা বাঁধো,
সেই ক্লান্তি আর অসন্তোষ!
নানান অতৃপ্তি আর বিচ্ছিন্নতা! শুধু কি খোরপোশ?

অসংখ্য ক্লান্তির ভার জমে ওঠে ন্যুব্জ মনে,
যেন বহু কুব্জার শাপে! কংসারি গল্পেই ভালো।
এখানে যে বহুবিধ অসুবিধা নানা দ্বিধা,
দেশী ও বিদেশী, আর ওসারে বহরে।

অনেক ইঁদুর আর শেয়ালও নেকড়েও, কুমিরও!
এমন কি পরলোকগত শত ডাইনি
ডাইনো-টিরানো-সোরস!

অতএব?
অতএব হে সঞ্জয় অদ্ভুত দয়ায় গৃধ্নুতায়
হে সঞ্জয় তদা নাশংসে বিজয়ায়!

পরন্তু কি ক'রে বলো
লুটেপুটে খাবে যত লুটেরারা ?
যত কালীয় পুতনা আর যত কংসের বংশে?

সাহিত্যের খবর

পরলোকে নকসী কাঁথার কবি

যে কালে বাংলাদেশ কংক্রিটের অন্বেষণে দুঃভাগ হয়নি, খাল বিল নদী নালা ডাঙ্গা, তহর আর সবুজ শস্য এপার ওপার দু-পার বাংলার মাটিই ছুঁয়ে থাকত—সারি, জারি, বাউল, ভাটিয়ালীর সুরে উথাল-পাথাল হতে পদ্মা মেঘনার মানুষ—সেকালের গ্রাম মাটি মানুষ কবি জসীমউদ্দিনের কবিতার একতারায় অবিরাম গান হয়ে উঠত। পল্লী-জীবনের কবি জসীমউদ্দিন সম্প্রতি বছরে পা দিয়ে, রক্ত মাটি মানুষ আর তার ফুল-ফল, রক্তপাতা ছেড়ে চলে গেলেন। রেখে গেলেন কবির 'নকসী কাঁথার মাঠ' আর 'সোজন বাদিয়ার ঘাট'।

বিশিষ্ট কবি এবং বাংলা লোকসাহিত্যের একজন যথার্থ বোদ্ধা জসীমউদ্দিন তাঁর কবিকৃতি ছাড়াও বাংলার লোককাহিনী লোকসঙ্গীত এবং গাথা সংগ্রহ ও সংকলনের জন্য বাংলা সাহিত্যের চিরকালের আসন প্রতিষ্ঠিত রইলেন।

কলকাতার রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কবিকে দেশিকোত্তম উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। গত বছর গোড়ার দিকে তিনি নিখিল বাংলা সাহিত্য বিষয়ে একটি বক্তৃতা দিতে এসেছিলেন।

নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন

আগামী ১৭ এবং ১৮ এপ্রিল জোড়হাটে নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। ইতিমধ্যেই এর জন্য একটি শক্তিশালী অভ্যর্থনা সমিতি তৈরী হয়েছে। শ্রীযুক্ত ভূষারকান্তি ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন বসু প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিকে অধিবেশনে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানান হয়েছে। আসামের মুখ্যমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছাড়াও অন্যান্য মন্ত্রীও অধিবেশনে আমন্ত্রিত হয়েছেন।

সাহিত্য সেতুর 'কবিমেলা'

হিবেণীর ঐতিহাসিক জফর খাঁ গাজীর দরগায় গত ১৪ মার্চ 'সাহিত্য সেতু' পত্রিকার উদ্যোগে এক মুক্তাঙ্গন কবিমেলার আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান হয়ে গেল। সুন্দর পরিবেশে বহু তরুণ কবি স্বরচিত কবিতা পাঠ করে শ্রোতাদের আনন্দ দেন। কবিমেলার আগে পত্রিকার পক্ষ থেকে স্বর্গত সাহিত্যিক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ও শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় এবং কবি জসীমউদ্দিনের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

দর্পক

মতিলাল ঘোষ—শচীন্দ্রলাল ঘোষ। ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট। নিউদিল্লী। দাম তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

ভারতীয় রাজনৈতিক ইতিহাসে মতিলাল ঘোষ ছিলেন অক্লান্ত কর্মী, স্বাধীনতাপ্রিয় সাংবাদিক। উত্তেজনার সঙ্গ না দিয়ে নির্ভীক অথচ নিরপেক্ষ সমালোচনার এক ঐতিহ্য গড়ে তুলেছিলেন তিনি। সততা ও রসবোধ ছিল তাঁর 'বিস্ময়কর'। সাংবাদিক হিসাবে ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে শিশিরকুমার এবং মতিলালের আত্মপ্রকাশ আজকের দিনে জানা ঘটনা হলেও ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট আলোচ্য বই প্রকাশ করে ভাগ্য কাজই করেছেন। অমৃতবাজার পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাঁরা একশ আট বছর আগে। সেদিন অন্যায়ের বিরুদ্ধে কলম ধরে, ব্রিটিশ শক্তিকে তাঁরা ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিলেন। আজও অমৃতবাজার পত্রিকার সেই ঐতিহ্য রয়েছে অক্ষয়। শুধু মতিলাল ঘোষের জীবনী হিসাবে নয়, সমকালীন ভারতীয় রাজনীতি ও সংবাদপত্র জগতের তথ্যেও পাওয়া যায় বইটিতে। এর বহুল প্রচার কামনা করি।

কেরাণীপাড়ার কাব্য। বিমল কর। জনমা প্রকাশনী, ৬৬, কলেজ স্ট্রীট (দ্বিতল), কলিকাতা-১২। পনেরো টাকা।

শ্রীযুক্ত বিমল কর বাংলাভাষার একজন প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক। সদ্য একাদেমী পুরস্কারপ্রাপ্ত এই লেখক তাঁর একটি নির্দিষ্ট বিষয়ভাবনা ও বলার ভঙ্গি, সর্বোপরি জীবন সম্পর্কে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির জন্যই সংস্কৃতিবান পাঠকের দ্বারা অভিনন্দিত হয়েছেন। বিমল কর উপন্যাস লেখেন বুদ্ধির সঙ্গে আবেগ মিশিয়ে, সেই সঙ্গে এক চমৎকার কাব্যিকতা কখন যেন মিশে যায় লেখায়। প্রায় দেড় দশক আগে প্রকাশিত এবং সম্প্রতি পুনঃপ্রকাশিত উপন্যাস 'কেরাণীপাড়ার কাব্য' গ্রন্থে সেই বৈশিষ্ট্য দুর্লক্ষ্য নয়। এ-উপন্যাসে কেরাণীকুলের ছোট ছোট সংসার ছবি শুধু নয়, সেই সঙ্গে কেরাণীদের মানসিকতাও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত, বসন্ত—এরকম ঋতু দিয়ে চারটি পরিচ্ছেদ চিহ্নিত করেছেন লেখক। ঋতুগুলিকে প্রতীকী ব্যাখ্যায় আনলে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। একদা গ্রীষ্মে অংশে পূর্ববর্তী কথারম্ভের পর সত্যব্রতবাবু ও তাঁর পরিবারের চিত্র দিয়ে উপন্যাস শুরু। শেষ হয়েছে সত্যব্রতর মৃত্যুতে। বিরাট উপন্যাসের মধ্যবর্তী কাহিনীগুলিতে আছে প্রিয়ব্রত, দেবব্রত, সুন্দরব্রত, সুশীল, গৌরী, শ্বেতা মনোরমা, সরমা, ধরণী, চাঁপা শৈল—এদের দৈনন্দিন জীবনবেদ।

এ-বইয়ে সব থেকে আগে চোখে পড়ে লেখকের মানবিক বোধযুক্ত মনন। চরিত্রগুলি জীবন্ত, ঘটনাগুলি যেনবা চোখের সামনেই অতিপরিচিত মহলে ঘটে চলেছে—যে-কোন পাঠকের এরকম মনে হবেই। লেখক এ-উপন্যাসের চরিত্রগুলির সঙ্গে গভীরভাবে একাত্ম হতে পেরেছেন, কিন্তু প্রতিটি স্বতন্ত্র চরিত্রের সঙ্গে শিল্পীর নিরাসক্তি নিয়েই। এই 'ডিটাচমেন্ট' আছে বলেই কেরাণীপাড়ার কাব্যে লেখকের মানবিক মমত্ববোধের সঙ্গে শিল্পীর নিজস্ব মেজাজও ধরা দিয়েছে। বস্তুত কেরাণীপাড়ার কাব্য বিষয় করের স্বতন্ত্র বিষয় ও মেজাজের রচনা—যেখান থেকে তিনি সম্প্রতিকালের রচনায় অনেক বেশী এগিয়ে এসেছেন। 'কেরাণীপাড়ার কাব্য' উপন্যাসটিতে লেখকের একটি প্রধান মোড় ফেরাবার চিহ্ন ধরা পড়ে, এবং সেজন্যে বইটি বিশেষভাবে মূল্যবান।

বীরেন্দ্র দত্ত

চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথ। শিবনাথ সরকার। দে বুক স্টোর, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-১২। সাত টাকা।

রবীন্দ্রনাথ শেষ বয়সে ছবি আঁকতে বসেন। যা কিছু কথায়, সুরে, গল্পে, উপন্যাসের কাহিনীতে চরিত্রের মিত গ্রাপে বলার থেকে গেছে, তা বলা এক জটিল মাধ্যম—রং-তুলি, কখনো বা লেখার কলমের কালি দিয়ে—ধরতে চেষ্টা করেছেন তিনি শেষ বয়সে। পনেরু, জীবনসন্ধ্যার যে গদ্য-কবিতা এবং তার মধ্যে যে সব ছোট ছোট 'চিত্র' যেন সংয়ে-রাখার রহস্যময়তা প্রকাশে রবীন্দ্রনাথের একাধিক ছবিতে। শিবনাথ সরকার তাঁর 'চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে নানাভাবে কবির আত্মপ্রকাশের এই নতুন মাধ্যমটির তাৎপর্য বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। পরিশিষ্ট বাদে মোট দশটি অধ্যায়ে তাঁর চিত্রকলার বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন। ছবি আঁকার সূচনা, ছবি আঁকার প্রেরণা, আত্মসমালোচক রবীন্দ্রনাথ, অন্যদের উৎসাহ-

গান ছবির আলোচনা পরিচ্ছেদগুলি সুলিখিত এবং লেখক যে রবীন্দ্রনাথের ভাবনা, কাব্য ও দর্শনের সঙ্গে তাঁর ছবির সাদৃশ্য দেখেছেন—তা তাঁর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার পরিচয় দেয়। রবীন্দ্রনাথের শিল্প-কর্মের পূর্ণাঙ্গ আলোচনার এই কম। তা ছাড়া বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দিয়ে চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথকে বিচার করার প্রয়াসও তেমন দেখা যায় না। আলোচ্য গ্রন্থে এইসব দিক অভিনন্দনযোগ্য।

অজয়-গীতি সংগ্রহ : প্রকাশিকা—রেণুকা ভট্টাচার্য। পরিবেশক : এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা : ১২। মূল্য পনের টাকা।

অজয়-গীতি সংগ্রহ সত্যিই সংগ্রহ করে রাখার মত সঙ্কলন। রবীন্দ্রোত্তর যুগে যে সব গীতিকার তাঁদের বৈশিষ্ট্য ও শৈলীর পরিচয় রেখে গেছেন অজয় ভট্টাচার্য তাঁদের অন্যতম। তাঁর রচিত গীতিকা এক সময়ে বাংলা গানের জগতে জাগিয়েছিল নতুন স্পন্দন। আজ সেই গীতিকারকে কজন মনে রেখেছে?

শ্রীমতী রেণুকা ভট্টাচার্যের নিরলস আকুলতা তাঁকে একটি বড় কর্তব্য করতে সাহায্য করেছে। অজয় ভট্টাচার্যের গীতি-সংগ্রহ প্রকাশ করে তিনি বাংলা গানের জগতে একটি উজ্জ্বল অধ্যায় তুলে ধরেছেন।

এখন আমরা 'রাগপ্রধান' বাংলা গান কথাটা শুনি। এই রাগপ্রধান বাংলা গানে অজয় ভট্টাচার্য, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, হিমাংশু দত্ত, শচীন দেববর্মণের অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হয়। অজয় ভট্টাচার্যের রচিত গানে সুর দিয়েছিলেন ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, হিমাংশু দত্ত, শচীন দেববর্মণ। ভীষ্মদেবের নিজের সুরে গাওয়া যদি মনে পড়ে সেদিনের কথা' মনে করিয়ে দেবে অজয় ভট্টাচার্যের কথা। যখন শচীন-দেবের গাওয়া 'কথা কও দাও সাড়া' শুনি তখন মনে হয় সত্যি যদি সাড়া পাওয়া যেত আমাদের প্রিয় গীতিকার আর গায়কের। কিছু ব্যথা, কিছু উদাসভাব আসে মনে।

রুপোলি পর্দার লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিল্পীরা যখন তাঁর গান গেয়েছেন তখন সব স্তরের মানুষের মনকেই সে গান স্পর্শ করেছে। সেটাই কিন্তু বড় কথা নয়। আজও সে সব গানকে পুরনো বলে মনে হয় না। 'যে পথে যাবে চলি', 'স্বপ্ন দেখি প্রবাল দ্বীপে' 'বাংলার বধূ বুকে তার মধু', 'প্রেম নহে মোর হৃদয় ফুলহার' 'চৈত্র দিনের ঝরা পাতার পথে' গানগুলি হারানো দিনের ছবি তুলে ধরে।

অজয় ভট্টাচার্য রচিত ভাটিয়ালী গানের অবদানই কি কিছু কম? 'ওরে সুজন নাইয়া' মনকে নিয়ে যায় অনেক দূরে। যে গান আমাদের মনকে দূরে নিয়ে যায় সে গান আমাদের চিরদিনের সম্পদ।

যখন কোজাগরী চাঁদ উঠল : প্রতিমা রায়। প্রকাশক : নিম্মলেন্দু রায়, এড ২০০, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা-৬৪। ছ টাকা।

লেখিকা প্রতিমা রায় যখন কোজাগরী চাঁদ উঠল গ্রন্থে মূলতঃ নামগল্প ছাড়া বাকি তিনটি গল্প—রাঙামামার রঙ্গজগৎ, কাকজ্যোৎস্না ও রূপনগরের রূপকথা পাঠকদের সামনে উপস্থিত করেছেন। গ্রন্থের নামগল্পটি বেশ বড়—অনেকটা নভেলেটের মত। আগ্রার পটভূমিকায় রচিত। গল্পটি বেশ জমজমাট, সুব্রত-মিতালী সম্পর্ক, অমরেশ, মণিবেলা, অরুন্ধতী, শ্রীমোন, ঊর্মিলা, অপূর্ব মিত্র মিসেস সেনাই ইত্যাদি চরিত্র লেখিকা মনস্তত্ত্বের কুটিল জাল রচনার জন্যই এনে-ছেন। বাকি তিনটি গল্পও সুলিখিত। 'রাঙামামার রঙ্গজগৎ' গল্পের রাঙামামা, কামিনী, 'কাকজ্যোৎস্না' গল্পের দীপ্তি-ময়ী, সুখময়, বিশ্বরূপ ইত্যাদি চরিত্র সুঅঙ্কিত।

সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

ছন্দিতা। (অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত সংখ্যা)। সম্পাদক গৌরগোপাল দাশ এবং হেনা চৌধুরী। বি-৫১ রবীন্দ্রনগর, কলকাতা ১৮। দাম এক টাকা।

কল্লোল কালের অন্যতম কথাসাহিত্যিক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত বাংলা কথা-সাহিত্যে এক স্মরণীয় নাম। 'ছন্দিতা' পত্রিকার 'অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত বিশেষ সংখ্যা' প্রকাশিত হয়েছিল কল্লোলের এই শক্তিমান লেখকের জীবিতকালেই। সম্প্রতি তাঁর প্রয়াণ ঘটেছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে 'ছন্দিতা'র এই বিশেষ সংখ্যাটি তাৎপর্য-পূর্ণ। অচিন্ত্যকুমার সম্পর্কিত কিছু মূল্যবান লেখায় তাঁর সাহিত্যপ্রতিভার যথার্থ মূল্যায়ন আছে। সিরিয়াস পাঠকের কাছে তাই এই সংখ্যাটি বিশেষ মূল্যবান বলেই বিবেচিত হবে। লিখেছেন আশুতোষ ভট্টাচার্য, হরপ্রসাদ মিত্র, ভবানী মুখোপাধ্যায়, সুশীল রায় এবং আরও অনেকে। অচিন্ত্যকুমারকে লেখা রবীন্দ্রনাথ এবং অতুলপ্রসাদ সেনের দুটি চিঠি এই সংখ্যার গুরুত্ব বাড়িয়েছে। তবে রবীন্দ্রনাথের চিঠিখানি পাণ্ডুলিপির আকারে ছাপায় সম্পাদনার ত্রুটি নিঃসন্দেহেই প্রকটিত হয়েছে। ভবিষ্যতে এ-বিষয়ে সচেতন হওয়া দরকার।

অর্জুন (প্রথম বর্ষ, প্রথম সংকলন)—সম্পাদক : অর্ণব বর্ধন ও কৃষ্ণলাল মুখোপাধ্যায়। ১০২, রাসবিহারী পার্ক, কলিকাতা ৬৮। দাম দু টাকা।

অর্জুন সাহিত্য পত্রিকা হিসাবে প্রথম আত্মপ্রকাশেই চিন্তাশীল পাঠককে আকৃষ্ট করবে, একমাত্র প্রবন্ধের পত্রিকা খুব কমই দেখা যায়। 'অর্জুনে' প্রকাশিত প্রতিটি প্রবন্ধই মূল্যবান। 'লোকগীতি ও তৎ-সম্পর্কিত কিছু কথা', 'উড়িষ্যার দেব-দেউলে গজসিংহ', 'প্রাচীন ভারতে শিল্পীর মানসিকতা ও অধ্যাত্ম চেতনা' সব থেকে উল্লেখযোগ্য।

অন্যদিন। সম্পাদক শিশির ভট্টাচার্য। ৫৮।১২৮, লেক গার্ডেনস, কলকাতা-৪৫। দাম সেড় টাকা।

পরিচ্ছন্ন রুচির সাহিত্য পত্রিকা হিসেবে অন্যদিন পাঠক মহলে বিশেষ পরিচিত। সম্প্রতি এর শীত সংখ্যাটি একটু বিলম্বে হাতে এলো। সন্তোষকুমার অধিকারীর প্রবন্ধ 'রবীন্দ্রনাথের কাব্য সাধনার অজানা একটি অধ্যায়' এই সংখ্যার একটি বিশেষ আকর্ষণ। আরও একটি আকর্ষণ সুশীল রায়ের গল্প। কবিতা লিখেছেন, পরেশ মণ্ডল, রাণা সরকার, জীবন সরকার, শিশির ভট্টাচার্য, প্রফুল্ল মিত্র এবং আরও কয়েকজন। 'স্বদেশী কবিতার একটি অনুবাদ ছাড়াও বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার কবিতার অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। ছাপা পরিচ্ছন্ন।

বোম্বাই বিচিত্রা। লেখা সন্ত, মল্লিকা গঙ্গোপাধ্যায় এবং শালট ঘোষ সম্পাদিত। ওরলি হিলস। বোম্বাই ৪০০০১৮। দাম আড়াই টাকা।

বাঙালী ও মারাঠীর আত্মিক যোগা-যোগ শীর্ষক নিবন্ধটি ভালো লাগল। চার্লস চ্যাপলিনের বিখ্যাত ছবি মঁসিয়ে ভার্দুর একটি দৃশ্যের রঙ্গানুবাদ এই সংখ্যাটিকে বিশেষ মূল্যবান করে তুলেছে। অনুবাদ করেছেন কাঁর কৃষ্ণ ধর। প্রখ্যাত সংগীতশিল্পী এবং সুরকার শচীনদেব বর্মন সম্পর্কিত লেখাটিও ভালো। এছাড়া অন্যান্য লেখাগুলি চলনসই। সম্পাদনার বিষয়ে যত্নবান হওয়া দরকার। প্রচ্ছদও ভালো হওয়া উচিত।

সুসিদ্ধ গণনা ও বিশুদ্ধ ব্যবস্থা সম্বলিত
জ্যোতির্বিদ ও প্রকৃত ধর্মার্থী দের একমাত্র অবলম্বন।
১৩৮৩ সালের (৮৭তম বর্ষ)
বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা
প্রকাশিত হইয়াছে
সকল প্রসিদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক স্বীকৃত।
৪২, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬

'রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক গানগুলিতে গভীর ভাবের ছোঁওয়া লেগে এমন একটা মিস্টিক ব্যঞ্জনা সৃষ্টি হয়েছে যাকে একান্তভাবে রবীন্দ্রসঙ্গীতেরই মর্মরূপ বলা যায়। এই ভাব যাঁর গানে যত বেশী রূপময় হয়ে ওঠে তাঁর গায়কী তত বেশী প্রাণস্পর্শী'। মঞ্জরী লাল

মঞ্জরী লাল

সুরের আগুন

সঙ্গীতের আসরে এত ভিড় বিশেষ করে আমার মত নগণ্য শিল্পীর আসরে—

'অতবার করে নিজেকে নগণ্য বলে বিনীত হবার প্রয়োজন নেই। অ-বিনয় যেমন অসহনীয় আবার বিনয়ের বাড়াবাড়িও তেমনই অস্বস্তিকর।'

'আমি বিনয় দেখাবার জন্য বলিনি সন্ধ্যাদি বিশ্বাস কর।'

ওদেশের বেশীর ভাগ শ্রোতাই তো বিদেশী বাঙালী হলেও নর্থরজায় ইউনিভার্সিটিতে বেশীর ভাগই ছিলেন ওদেশী শ্রোতা। আমি অনেক গানের মধ্যে গেয়েছিলাম 'সাঁঝ ঐ বুঝি বাঁশী বাজে' এক বিদেশিনী এসে প্রশ্ন করেছিলেন 'ইজ ইট এ লাভ সং?' আমি 'জেজেস করলাম কি করে বুঝলে?' উনি হেসে বললেন. 'তোমার মুখের একসপ্রেশনে. আর সুরের টেম্পার থেকে।'

জয়েন অফ আমেরিকার আধঘণ্টার একটি ইণ্টারভ্যুও করেছিলাম। অটোয়ার দুটি অনুষ্ঠানের একটিতে ছিলো আমার আর চিত্রলেখার (চৌধুরী) গান। দ্বিতীয় দিনে ছিলো আমার টি. ভি প্রোগ্রাম। সকল অনুষ্ঠানেই আশার অতিরিক্ত সাড়া পেয়েছি।

'এ বিষয় আমার আর একটিই প্রশ্ন আছে। আমেরিকায় যাঁরা বিদেশী শ্রোতা তাঁরা কি রবীন্দ্রসঙ্গীত সংহাই এ্যাপ্রিশিয়েট করতে পারেন? যদি তাঁরা থাকেন. এ গানের কোন আবেদনের আবেগে।'

'সন্ধ্যাদি তুমি ধারণা করতে পারবে না আমাদের দেশের রাগসঙ্গীত কিভাবে ওদের ঘরের জিনিস হয়েছে। মধুর মধুর ধ্বনি বাজে গানটা শুনেই ওরা ফট করে ফোন করেছিলো এটাতে ইমন কল্যাণের কড়ি-মা লেগেছে না? অবশ্য এর মূলে আছে আলি আকবর ও রবিশঙ্করের দীর্ঘদিনের পরিশ্রম। শিকাগোতে যাঁরা গান-বাজনা করেন আমার হারমোনিয়মটা রাখবার জন্য কাড়াকাড়ি করতেন। কি মজা লাগতে কি বলব।

রবীন্দ্রসদনের বহু আসরে মঞ্জরীর একক সঙ্গীত শুনেছি, শুনেছি জাতেরী সিল্ভারমঞ্চের জ্ঞানসিংহের পদাবলীর রাধার সঙ্গীত সংলাপে—ন্যাপমোচনে রাধার ভূমিকায়। প্রতিটি অনুষ্ঠানেই মন ভরে উঠেছে ঐ মকুলিত সুরেতির মাধুর্যে। প্রথমের দিকের সম্ভাবনা আজ হয়েছে বিকশিত সুষমা এবং দিন দিন এগিয়ে চলেছে উজ্জ্বলতর পরিণতির পানে। সম্প্রতি টি. ভি প্রোগ্রামে (কোলকাতাতেও) খুব সাকসেসফুল।

মঞ্জরীকে গড়ে তুলেছে তার বিদগ্ধ পশ্চাদ্‌পট। ওর মা. বাবা সকলেই ছিলেন সঙ্গীতে সমর্পিতা চিত্ত। বাবা খুব উঁচু-মহলের ক্ল্যাসিকাল গাইয়ে। ভালো করে জ্ঞান হবার আগেই সারেগামা এসেছে তার কণ্ঠে।

ক্ল্যাসিক্যাল পটভূমিকায় রবীন্দ্র-সঙ্গীতের রং-ধরার শুভ মুহূর্ত এলো ওর বিবাহের পর। শ্বশুরবাড়ী নাম-করা ব্রাহ্ম পরিবার এবং শান্তিনিকেতনের সঙ্গে তাঁদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। ওর স্বামীর ঠাকুমা কুমুদিনী ঘোষ তখনকার বাংলাদেশের প্রথম মহিলা গ্র্যাজুয়েট। ঠাকুর্দা শ্রীঅশ্বিনীকুমার লাল সঙ্গীতরসিক এবং শিক্ষাবিদ। সারাজীবন ঐ সুরেই কাটিয়েছেন। কৃষ্ণলাল ঘোষ (কুমুদিনী ঘোষের দাদা) শান্তিনিকেতনের একেবারে প্রথম যুগের শিক্ষক ছিলেন। ক্ষিতিমোহন সেন. নিধানচন্দ্র রায় ও তাঁর পরিবার এ বাড়ীর সঙ্গে অন্তরঙ্গ সূত্রে জড়িত।

কিছুদিন আগেই মঞ্জরীলাল ফিরেছেন আমেরিকার সংস্কৃতি সফর শেষ করে। নবীনদের মধ্যে (সুচিত্রা রায় বাদে) সম্প্রতিকালের মধ্যে তিনিই সঙ্গীত বোদ্ধাদের আমন্ত্রণে সাগরপারে পাড়ি দিয়েছিলেন। শৈশবের সোসাইটি এবং ওয়াশংটনে সংস্কৃতি ইনফরমেশন (আই এন সি)-র মুখ্য আহ্বানে তিনি গিয়েছিলেন। এ ছাড়াও বোস্টনে হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির পিণ্ডির বাংলাদেশ মিলন থেকে তিনি যাকে বলে চেইন—প্রোগ্রাম করে এসেছেন। প্রতিটি জায়গাতেই সংবাদপত্র ও সঙ্গীতরসিকদের অকৃপণ অভিনন্দন প্লাবিত হয়ে তিনি নিজেও খুব উচ্ছ্বসিত। সবিনয়ে এবং সকৃতজ্ঞে জানালেন ওদেশের অভিজ্ঞতা তাকে নতুন করে এগিয়ে যাবার প্রেরণা দিয়েছে। এজন্য তিনি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ তাঁর অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায়, হিরণ্ময় রায় এবং সুচিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। 'জানো সন্ধ্যাদি অমিয়দা সাংঘাতিকের বিরুদ্ধ মানুষ বলতে যা বোঝায় তাই। দাদাও আমি ছ তেমন কোনো টপস্যাংকিং আর্টিস্ট নই? এখানে আমার মত অনেক শিল্পীই আছেন একথা আমি যেমন জানি উনিও নিশ্চয় জানেন। কিন্তু আচার আচরণে উনি আমায় এমন সম্ভ্রম দেখিয়েছেন যে ও'র লালন মর্যাদাবোধের কাছে আমার মাথা নত হয়ে গেছে। অমিয়দা বলতেন মঞ্জরী তোমার গানকে আমি সেল করব না. যথার্থ রসিক মানুষ তোমার গান শুনুক এইটেই আমি চাই।'

যেখানেই গেছি শ্রোতার ভিড় দেখে রীতিমত রোমাঞ্চিত হয়েছি। আমার গান শোনবার জন্য এত ভিড়? ভাবতেও পারিনি। দক্ষিণা. পারিচিতু সর্বত্রই সুরেই আমার প্রাপ্তি প্রত্যাশাকে অতিক্রম করেছে। কারণ যতদূর শুনেছি এবং দেখেছি ওদেশের শ্রোতারা বিশেষ করে নন্‌-প্রফেশনালদের ভক্ত হেমন্তদাও খুব পপুলার. কিন্তু বিশুদ্ধ সঙ্গীতের জোরেই। সেখানে রবীন্দ্র-

মঞ্জরীর প্রথম জীবনের অনেকগুলো দিন কেটেছে পাটনায়। চার পাঁচ বছর বয়স থেকে গান গাওয়া শুরু হয়েছিলো। বাড়ীতে অবিরাম উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের চর্চা শুনতে শুনতে। গান শেখা শুরু হোলো আট বছর বয়স থেকে, কুমার গন্ধর্বের কাকা লালুলাল গন্ধর্বের কাছে। ম্যাট্রিক থেকে শুরু করে বি-এ অবধি ও মিউজিক নিয়েই পড়েছে। রবীন্দ্রলাল রায় তখন পাটনা মিউজিক কলেজে ছিলেন। তাঁরই স-যত্ন তত্ত্বাবধানে এ শিক্ষা কণ্ঠ থেকে মর্মে পৌঁছতো নিরন্তর্গতিতেই।

আর হওয়া উচিত ছিলো ধ্রুপদ, খেয়াল অথবা ঠুংরী গাইয়ে সে চলে এলো রবীন্দ্রসঙ্গীতের দেশে এ অঘটন ঘটলো কেমন করে?' এই প্রশ্নের উত্তরেই উচ্ছল প্রবাহে বেরিয়ে এলো মঞ্জরী লালের রবীন্দ্র তীর্থযাত্রার মনোরম অভিজ্ঞতা।

স্বামীকে দেখিয়ে বলে 'এঁদের বাড়ীর সকলেই রবীন্দ্রসঙ্গীতমুখী বলেই বিয়ের পর দক্ষিণীতে ভর্তি হলাম ওঁদেরই ইচ্ছায়। কিছুদিন একসঙ্গে ক্লাশ করবার পর শুভ্রদা থার্ড-ইয়ারে ভর্তি করে নিলেন। আগে থেকে ক্লাসিকাল গানের তালিম ও রেওয়াজে গলাটা মোটামুটি শেখবার যোগ্য অবস্থায় ছিলো বলে ক্লাসিকাল গানের ক্লাশ আমায় করতে হয়নি। থার্ড এবং ফোর্থ ইয়ার দুবছর শুভদার গ্রুপেই শিখেছি। ওঁর শেখাবার পদ্ধতি সুন্দর। সেইজন্যই রবীন্দ্রসঙ্গীতকে ভালবাসতে দেরী হয়নি। আগে থেকেই অবশ্য রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রতি মনের গোপনে একটি সফট কর্নার তৈরী করে রেখেছিলেন শৈলজাদা।

পাটনায় যখন ছিলাম আমার শ্বশুরবাড়ীতে উনি প্রায়ই যেতেন। সেবারি (সেবা মিত্র) বর্তমানে যে'ক'খানি রেকর্ড বছরই একটা করে বড় শো হোতো। সেইসব অনুষ্ঠানে শৈলজাদা, মোহরদি, বাচ্চুদা এবং শান্তিনিকেতনের অন্যান্য ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে যেতেন। শৈলজাদা যেখানে থাকেন গানের গুঞ্জন ঘোরে ওঁর সঙ্গে সঙ্গে। ওঁর কাছে অনেক গান নেওয়া হয়ে গিয়েছিলো।

দক্ষিণীতে শিক্ষা শেষ হবার পর একাদিক্রমে ষোলো বছর ওখানে শিক্ষকতাও করেছি। প্রথম পাবলিক ফাংশন? দক্ষিণীর সব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। রেডিওতে ১৯৫৯ সাল থেকে গাইছি। এখন আমি বি-হাই।"

রেকর্ডের ক্ষেত্র এবং রসিক-সমাজের গোচরে আসতে দেরী হওয়ার কারণ?' মঞ্জরীর হাসিখুশী-ভরা মুখখানির আলো যেন দপ করে নিভে যায়। ম্লান হেসে বলে 'সব কথা কি বলা যায় সন্ধ্যাদি? এইটুকুই শুধু বলতে পারি আসা হয়ে ওঠেনি ভালো ছিলো না বলেই। রেকর্ড করবার আমন্ত্রণও গ্রহণ করতে পারিনি। অনেক পরে ১৯৭৩ সালে রেকর্ড করবার ডাক এলো সন্তোষ সেনগুপ্তর কাছ থেকে।

জিজ্ঞেস করলাম 'কবে অডিশন দিতে হয়েছিলো? তখনকার আমার অডিশন কি? তুমি ত বি-হাই। এতদিন কোথা থেকেও রেকর্ড করার অফার পাওনি?'

'পেয়েছিলাম'

'তবে'—আমি চুপ। সব কথার উত্তর কি দেওয়া যায়। যাই হোক ১৯৭৪ সালে প্রথম রেকর্ড হোলো মোহরদির গ্রুপিংএ 'আজ বুঝি আইলো প্রিয়' ও 'অবেলায় যদি এলে' তারপর 'আমাকে যে বাঁধবে ধরে' ও 'চিরবন্ধু, চিরনির্ভর, চিরশান্তি তুমি' (এই গানটি আজ অবধি কেউ রেকর্ড করেনি)।

এবার রবীন্দ্রজয়ন্তী সিরিজের জন্য সুচিত্রাদির গ্রুপিংএ দুটি গান রেকর্ড করেছি 'মধুর রূপে বিরাজ' ও 'মধুর, মধুর ধ্বনি বাজে'।

রেকর্ড করবার আহ্বান কেন এলো—কার উদ্যোগে জানিনা। আজ পর্যন্ত এ-খবর আমার অজানা। তবে তখন রেকর্ডিং-ডিপার্টমেন্টের অধিকর্তা ছিলেন শ্রী এ. সি. সেন। আর একটা কথা কেউ-ই বোধহয় বিশ্বাস করবে না—রেডিও রেকর্ড অথবা বাইরে যাওয়া কোনোটার জন্যই আমায় চেষ্টা-চরিত্র, অথবা এর-ওর কাছে হাঁটাহাঁটি করতে হয়নি। এ-সব সুযোগ আপনা থেকেই এসেছে ভগবানের আশীর্বাদের মতই। এজন্য তাঁর কাছে আমি কত যে কৃতজ্ঞ বলতে পারি না।

দক্ষিণীতে আমার সব ছাত্রছাত্রীদের শ্রদ্ধা, ভালোবাসা আমার কাজের উদ্দীপনা যোগাতো।

ওদের আমি কতটা শেখাতে পেরেছি জানিনা। কিন্তু ওদের শেখাতে গিয়ে নিজে শিখেছি বিস্তর। অনেকেই প্রতিভা ও মধুর কণ্ঠের অধিকারী। শেখার আগে ওদের নানাধরণের অ্যাপ্রোচ ও গাইবার ভঙ্গি এ-বিষয়ে আমায় নতুন করে ভাবতে শিখিয়েছি।

.....১৯৭৪ সালেই প্রথম রবীন্দ্রসদনের মত অভিজাত প্রেক্ষাগৃহে গেয়েছি। সুচিত্রাদি আমায় রবীন্দ্রজয়ন্তীতে ওখানে গাইবার জন্য অ্যাপ্লিকেশন করবার পরামর্শ দিলেন। —তপতীদি রেডিওতে আমার গান শুনেছিলেন। উনি খুব সমাদরের সঙ্গে আমায় গাইবার আমন্ত্রণ জানালেন। উনি যতদিন ছিলেন—ওখানে গাওয়ার ছেদ পড়েনি একবারও। তপতীদি অনেক ইয়ং টাালেন্টকে পুশ করেছেন।

আর গান গাইবার পর সর্বপ্রথম এবং অকৃপণ উৎসাহ পেয়েছি অমৃতবাজার গ্রুপের কাছে। এজন্য অন্যান্য শিল্পীর মত আমিও তেমার কাছে ঋণী। পরে অবশ্য অন্য কাগজেও আমার গানের সপ্রশংস সমালোচনা বেরিয়েছে। তবে প্রথম উৎসাহ যাদের কাছে পাওয়া যায়—তাদের বোধহয় মানুষ কোনদিনই ভোলেনি।

তুমি ঠিক বলেছ। আজ দশ বার বছর ধরে রবীন্দ্র-মেলায় গাইছি। প্রথমে দক্ষিণীর গ্রুপেই গাইতে গেছি। পরে আসতে আমার একটা করে সোলো প্রোগ্রাম ওদের বাঁধাধরা অনুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে।

তুমি ত প্রথম ক্লাসিকাল গানই শিখেছিলে? শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রসংগীতকেই আশ্রয় করে রইলে কিসের আকর্ষণে?

শ্বশুরবাড়ীর তাগিদে।—উপরন্তু করে কয়েকটা গান শেখা হয়ে যায়। কিন্তু নিজের ভালো না লাগলে অমন একান্তনির্ভর হওয়া যায়না।

ঠিকই ধরেছ। শ্বশুরবাড়ীর তাগিদে রবীন্দ্রসংগীত গাওয়া সুরু করলেও —এ গান ভালবেসেছি প্রাণের তাগিদেই। রাগ-সংগীত একটু আধটু শিখেছিলাম বলেই রাগভিত্তিক রবীন্দ্রসংগীতে —এ গানের স্রষ্টার গানের অন্তর্ভূতিকে কিছুটা উপলব্ধি করতে পারি, যেমন ধর 'এ পরবাসে রবে কে' 'কি ধ্বনি বাজে' 'কে বসিলে আজি'—'দিন ফুরালো' এ-গুলোতেই শুধু বোধহয় তান আছে। কিন্তু তান এখানে ওস্তাদীয়ানার কসরৎ অথবা পণ্ডিতের অহমিকা হয়ে ওঠেনি। ভাবের সঙ্গে সংগতি রেখে —সুর বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্ভূতিরও বিস্তার ঘটেছে। যেসব রাগ-সংগীতে তান নেই সেখানে নানারকমের তালে ছন্দের গতিতে বুঝিয়ে দিয়েছেন তাঁর ভাবের প্রকৃতি।

এমন অনেক বড় বড় তালের গান আছে যা সবাই গাননা। 'জগতে তুমি নাস্তা' অবশ্য সুবিনদা মাঝে মাঝে গান। 'কত বেশে তুমি প্রেমের পাশে ওহে প্রেমময় (বিলম্বিত ত্রিতাল) এ গান কারো কাছে শুনিনি। —এসব গানের ধ্রুপদী ভাব তাল ছন্দ লয় সমন্বিলয়ে এমন একটা ভারগৌরব সৃষ্টি করে যা সত্যিই ক্লাসিক্যাল।

আবার তাঁর সাধারণ গান তুই যে বসন্ত সমীরণ—কত সহজ মিষ্টি কিন্তু এসব গানেও রাগের সংগে অন্তরংগতা লক্ষ্য করলেই চোখে পড়ে।

অতএব রবীন্দ্রসংগীত রাগ-সংগীতজাত কোনো সৃষ্টিছাড়া জিনিষ নয়। বরং রাগ-সংগীতের অভিজ্ঞতা থাকলে রবীন্দ্রসংগীতের অন্তরে প্রবেশ করা সহজ হয়ে ওঠে।

রবীন্দ্রসংগীতের গায়কী-তে কিরকম কর?

নিশ্চয়ই কবি। টপ্পা ও গমকের কাজ মিশলে একটা অলংকার সৃষ্টি হয়। এ অলংকার রবীন্দ্রসংগীত ছাড়া অন্য কোনো গানে নেই। এই অলংকার রবীন্দ্রসংগীতের ভাবরূপের উপযুক্ত সজ্জা। এর মধ্যে রোমান্স আছে, গাম্ভীর্য আছে, কিন্তু কোনো চটুলতা নেই। সকল ভাবসংগীতই অল্পবিস্তর রোমান্টিক কিন্তু এই রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক গানগুলিতে গভীর ভাবের ছোঁওয়া লেগে এমন একটা মিষ্টিক ব্যঞ্জনা সৃষ্টি হয়েছে যাকে একান্তভাবে রবীন্দ্রসংগীতেরই মর্মরূপ বলা যায়। এই ভাব যাঁর গানে যত বেশী রূপময় হয়ে ওঠে তাঁর গায়কী ততবেশী প্রাণবন্ত।

এখন রবীন্দ্রসংগীতের ধারাকে পুরোধা স্থানীয় কিছু শিল্পী ছাড়া অনেকেই মর্ডার্নাইজ করবার চেষ্টা করছেন। এতে আপনার মন সায় দেয়না। রবীন্দ্রসংগীতের চিরন্ত-

যৌগিকটা অক্ষুণ্ণ রেখে এ-গান গাইতে না পারলে না গাওয়াই ভালো।

আমার ফেভারিট আর্টিস্ট হলেন রাজেশ্বরীদি, মোহরদি আর সুচিত্রাদি। রাজেশ্বরীদি তাঁর রাগদক্ষতা ও শ্রদ্ধা-প্রবণতার শক্তিতেই অনাড়ম্বরভাবে হয়েও এ গানে এমন একটি রূপ নিয়েছেন যাকে তাঁর সৃষ্টি বলা যায়। কতটা রাগসংগীত কতটা রবীন্দ্রসংগীত এসব চুলচেরা বিশ্লেষণ দিয়ে তাঁর মত বড় শিল্পীর বিচার করা যায়না। রবীন্দ্রনাথকে জানবেন বলেই তিনি রাগভিত্তিক। এইটেই বোধহয় তাঁর সুবচনের সবচেয়ে বড় কথা।

সুচিত্রাদির গান যেন ঝরঝরে তকতকে ঝরঝরে।

মোহরদির গানে একটি প্রশ্ন শুনতে পাই

'কেগো অন্তরতর সে?'—এ গান প্রাণকে না ছুঁয়ে পারেনা।

পুরুষদের মধ্যে পংকজ মল্লিককে আমি প্রণাম করি। শুনেছি রবীন্দ্রসংগীত মেয়েলী গান বলে অবজ্ঞেয় ছিলো। তাঁর প্রথম গান ওজস্বিতার কণ্ঠেই যেন সমালোচক এই মিথ্যা অপবাদের প্রতিবাদ জানিয়েছে।

আজ রবীন্দ্রসংগীতের ধারাই যাঁরা গানের সবচেয়ে শক্তিশালী ধারা সন্দেহ নেই। —এ গান সেই শক্তিতেই বেঁচে থাকবে। তবে আজকের এই অক্ষয় মত্ততা থাকবে না কারণ কোনো মত্ততাই স্বাভাবিক নয়। অস্বাভাবিক বস্তুর আয়ু বেশি হতে পারে না।

সন্ধ্যা সেন

সুরের আগুন প্রসঙ্গে

অমৃতের ২৭-২-৭৬ তারিখের সংখ্যায় 'সুরের আগুন' বিভাগে শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী অন্নদা ঠাকুর সম্পর্কে যে পরিচিতি প্রকাশিত হয়েছে, তাতে কিছু কিছু ত্রুটি ছাড়াও শিল্পীর জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বাদ পড়ে যাওয়ায় এই চিঠির অবতারণা।

রবীন্দ্রনাথের ভাঙা গানের তালিকা লক্ষ করলে দেখা যাবে, 'কী ধ্বনি বাজে' গানটি তিনি রচনা করেছিলেন পুরবী রাগের আকাঙ্ক্ষায় যেমন 'এ ধ্বনি চরণ পরসত' ভেবে।

এ প্রসঙ্গে অমিয়া দেবীর কাছে শোনা গল্পটি আমিও তুলে দিচ্ছি :

গঙ্গার ধারে খড়দহের বাগানবাড়ীতে রবীন্দ্রনাথ এসেছেন, দেখা করতে গেছেন অনেকে। অমিয়া সান্যালও গেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বললেন একটা হিন্দী গান শোনাতে। অমিয়া দেবী খানিকটা ভেবে নিয়ে ধরলেন 'এ ধনি ধনি চরণ পরসত'। গান হয়ে গেল, কখন সংবাদ দেওয়াও হয়েছে—আর অঞ্চলের সেরা গায়কদের মধ্যে জোড়াসাঁকোর কেবারে জনো না বাজিয়েছেন, এমন সময় সিঁড়ি থেকে তাঁর ডাক পড়লো রবীন্দ্রনাথের ঘরে। আমি তো অবাক তাঁকে কথাতেই বলি 'একবার মাত্র শুনে সেই সুরে গায়কীর সুরে গান রচনা করে ফেললেন। কখনই 'কী ধ্বনি বাজে' গানটি শোনাননি এবং আমাকে শিক্ষাও দিলেন। সেই রকমই, যতবারই নিজে আর সুর খুঁজে পাচ্ছি না মাঝখান থেকে অনেকদিন পরে ঋত্বিকদাদাই-এর ছোট ছবিটি তোলা হয়েছিলো।'

প্রসঙ্গের সঙ্গে সম্পর্ক না থাকলেও এই ধ্বনি ধনি চরণ পরসত গানটি নিয়ে আরেকটি ঘটনার উল্লেখ করছি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি হিন্দী গান অমিয়া সেনকে বারবার শুনতে চাইলেন গানটি আড়ালে থেকে শুনছিলেন তিনি। সন্ধ্যাবেলা এই গানটি শুনে একটি গান রচনার ইচ্ছে প্রকাশ করেন তিনি। এ প্রসঙ্গে তিনি যোগাযোগকারীর কাছে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিলেন।

সাধারণতঃ সুরের আগুনে সাধারণ উৎসবে আজ যাঁদের শুনছি খোলা গলায় গানটি অমিয়া দেবীকে হঠাৎ গাইতে হয়েছিল বলা হয়েছে। কিন্তু সেদিনের অনুষ্ঠান-সূচীতে এটা ছিল একটা আকর্ষণ সঙ্গীত এবং বলা বাহুল্য, গানটি হঠাৎ তৈরি গাইতে হয়নি। অনুষ্ঠানের আগের দিনের রিহার্সালে স্বয়ং গগনেন্দ্রনাথ আবহসংগীতটি কেমন হবে, তা দেখিয়ে দিয়েছিলেন। তখন অমিয়া দেবী, গগনেন্দ্রনাথকে চিনতেন না, বাবাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন 'উনি কে?'

'আমার খেলা'র অভিনয় প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, 'রবীন্দ্রনাথ এঁর কণ্ঠে শুনে মুগ্ধ হয়ে প্রমদা চরিত্রের জন্য মনোনীত করলেন।' আসল ঘটনা কিন্তু তা নয়। জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে এবং রবীন্দ্রসান্নিধ্যলাভ তাঁর আগেই হয়ে গেছে বর্ষামঙ্গল অনুষ্ঠান উপলক্ষে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কাছে 'ওগো আমার শ্রাবণ মেঘের খেয়াতরী' 'আজি' এবং 'দুঃখের বরষায় চক্ষের জল যেই' নামক গান দুখানি তাঁর শেখা হয়ে গেছে। সুতরাং 'আমার খেলা'র অভিনয়কালে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে চিনতেন এবং তাঁর কণ্ঠ-সম্পদ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। আসলে প্রমদার চরিত্রের জন্য সরলাদেবীই তাঁকে মনোনীত করেন এবং দার্জিলিঙে প্রমদার গান-গুলি তাঁকে তুলিয়ে ছেন। তারপর গান-গুলো শোনানো এবং আকাশনা দেখানোর জন্য সরলাদেবী তাঁকে রবীন্দ্রনাথের সামনে হাজির করলে তিনি বলেন, 'দার্জিলিঙে অত গান গলায় বসাতে পারে? গান শুনে মনে হচ্ছে না—কোনো গানের ব্যাকরণ ভেঙে চুরে সারা হয়েছে।' রাজারাজড়ার অন্যতম বিনোদের জন্য অনন্য বর্ষামঙ্গল অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া আর পাকা সভার চরনি করে সারাক্ষণ খেলা অনুষ্ঠানের পর অমিয়া দেবী সাংবাদিকী-সুলভ বর্ণনা সাংবাদিকা এবং সমালোচনী হিসাবে বিশেষ প্রশংসা লাভ করেন।

শ্রীমতী অমিয়া সান্যাল নিজে যখন গানটি তাঁর ভাইঝেদের শেখাচ্ছিলেন। সমীক্ষক-কর্মকর্তা সবিতা চট্টোপাধ্যায় নিজের ছবিটি তোলাতে পেরেছেন, তাঁরাই প্রকৃত

চিঠিপত্র

আর্থে রবীন্দ্রানুরাগী। এরকম রবীন্দ্রানুরাগী বাস্তবিক বিরল এবং অমিয়া সান্যাল স্বয়ং প্রতিষ্ঠানের মতন নেই বিরল বাস্তবিক-সম্পদ।

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়
কলকাতা-৬

বিশ্ব নারীবর্ষ

১৫ বর্ষ ৪০ সংখ্যা অমৃতে বেলা দে-র বিশ্বনারীবর্ষের পর লেখাটি পড়ে ম্রিয়মাণ হলাম। বিগত ঐ নারীবর্ষ গ্রামের মহিলা সমাজকে যে এতটুকুও এই নারীবর্ষের তাৎপর্যপূর্ণ পরিবেশে সংস্থাপন করা গেল না সেকথা বেলা দেবী উল্লেখ করে ধন্যবাদার্হ হয়েছেন।

স্মরণ করা যেতে পারে যে কিছুদিন আগে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী নারীবর্ষের এক সমাপ্তি অনুষ্ঠানে বলেছেন : ভারতীয় বিপ্লব এখনও অসমাপ্ত কারণ আমাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক রূপান্তরের জন্য সংগ্রাম করতে হবে। তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, পশ্চাৎকোণে অবহেলিত নারীদের কাছে যেতে হবে। বলতে বাধা নেই যে নারীবর্ষ বলে একটি বর্ষ উদ্‌যাপিত হল এটি গ্রামের অধিকাংশ মহিলাই জানেন না। বেলা দেবীর কথাতেই বলতে হয় না আছে শিক্ষার উপযুক্ত বন্দোবস্ত, না পরিবার পরিকল্পনায় সাড়া দেবার উৎসাহ, না স্ত্রী স্বাধীনতা। অন্যদিকে রয়েছে প্রকট কুসংস্কার যা যে কোন অগ্রগতিতে বাধা। বিশাল এই জাতির ভবিষ্যৎ বা সমস্যার কথা তারা চিন্তা করে না, বা প্রয়োজন বলেই মনে করে না। নিজের সংসারের বাইরে একটা জগৎ আছে স্বাস্থ্য আছে এ সম্বন্ধে তারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। অনেকক্ষেত্রেই তাঁরা অত্যাচারিত অবহেলিত একথা নির্দ্বিধায় বলা চলে। কুপ্রথা জাতিভেদ প্রথা, অল্পবয়সী মার পুরুষ নির্বাচনের সম্পদ বিষয়ে এখনও গ্রামের মহিলাদের সজাগ করা গেল না। স্বাধীন সমাজী নির্বাচন বা তেমন বিবাহের ক্ষেত্রে তাদের অধিকার খুব সীমিত। যার ফলে পণপ্রথার মতো ভয়ঙ্কর প্রথা টিকে আছে। আজ দারিদ্র্যের সমস্যা আর তাকে ছেড়ে কথা নারী নিয়ে অবৈধ পাপ ব্যবসা নিয়ে নারীবর্ষের পর একথাগুলো নিষ্প্রয়োজন মনে হচ্ছে।

অরুণা বিশ্বাসরায়
বোলিয়া (পশ্চিমবঙ্গ)

গোধূলিয়া

নিমাই ভট্টাচার্য

— বারো —

মিনিটখানেক চুপচাপ বসে থাকার পর দেবী নিঃশব্দে আমার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আমি বাধা দিলাম না। আমিও কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম। একবার মনে হলো দিদির কাছে যাই। জিজ্ঞাসা করি, দিদি, দেবীর বিয়ে দেবে না? দিদি নিশ্চয়ই প্রশ্ন করবেন, হঠাৎ তুই ওর বিয়ের কথা বলছিস কেন? একথার অনেক জবাব দেওয়া যায়। বলতে পারি, হাজার হোক ওর [illegible] বিয়ের বয়স ত হয়েছে। এখন বিয়ে না দিলে আর কবে বিয়ে দেবে? এই ধরনের অনেক জবাব দেওয়া ছাড়াও সোজাসুজি বলতে পারি, দিদি, একটা কথা বলব?

বল।

আমার মনে হয় এখুনি দেবীর বিয়ে দেওয়া।

কেন? ও কিছু বলেছে?

না, কিছু বলে নি। তবে ওর কথাবার্তা শুনে মনে হয় ওর বিয়ে করার ইচ্ছা হয়েছে।

আবার মনে হলো, না দিদির সঙ্গে এসব আলোচনা করা ঠিক হবে না। হয়ত মনে করবেন, আমিই ওকে বিয়ে করতে চাই। অথবা অন্য কিছু। তাছাড়া আরো অনেক কারণে দেবীর কথা তোলা ঠিক হবে না। শিখা নামে একটা আঠারো-উনিশ বছরের মেয়ে মাঝে মাঝে পিসীর বাড়ীতে আসা-যাওয়া করত। পিসী বাড়ীতে না থাকলে যদি কোন কাজে ব্যস্ত থাকত আমার সঙ্গে টুকটাক কথাবার্তা বলতো। পরে একদিন কথায় কথায় পিসী বললেন, শিখাকে দেখলেই মন খারাপ হয়ে যায়।

জিজ্ঞাসা করলাম, কেন?

পিসী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, আর বলিস না বাপু, কত কাণ্ড করে ওর বাবা-মা মেয়েটার বিয়ে দিল কিন্তু বাড়ীর ঘর করা ওর কপালে সইল না।

কেন? শিখা কি বিধবা?

প্রায় সেই রকমই।

প্রায় সেই রকমই মানে? স্বামী কি খুব অসুস্থ?

না না, সে হারামজাদা ছোড়ার মত টনটনে ঘুমে বেড়াচ্ছে।...

তবে?

ঐ হারামজাদারা মেয়েটাকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

কেন?

এক নম্বরের ছোটলোক ছাড়া আর কি বলব! সব কথা ওরাও বলে না, আমিও জিজ্ঞাসা করি না। তুইই বল, এসব বিষয় কি আলোচনা করা যায়?

তা ত বটেই।

তবে পাঠ শুনতে ঘাটে গিয়ে চৌধুরী গিন্নীর কাছে শুনেছি মেয়েটার বাবা যৌতুক কিছু দিতে পারে নি বলে ওরা ওকে রেখে চলে গেছে।

কিন্তু.....

কিন্তু কিন্তু নেই রে! ঘি-চাকরের মেয়ের থাকতে পারে কিন্তু বামুনের ঘরের বউয়ের একটু কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলেই শ্বশুর বাড়ীতে ঝাঁটা-লাথি খেতে হবে।

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তাই বলে বিয়ে করা বৌকে স্বামী তাড়িয়ে দেবে?

পিসী হাসতে হাসতে জবাব দিয়েছিলেন, মনে হচ্ছে তুই যেন শিখার কথা শুনে অবাক হয়েছিস?

অবাক হবো না?

এই বাঙ্গালীটোলায় এমন গণ্ডা গণ্ডা শিখা পাবি। আবার শিখার শ্বশুরবাড়ীরও অভাব নেই এই বাঙ্গালীটোলায় মলিতে।

বল কি পিসী?

আমার নীচের তলার মণির কথা তোকে বলেছি?

মানে মণি পিসী?

হ্যাঁ হ্যাঁ।

বলবে বলেছিলে কিন্তু বল নি।

মণি বাপীতে না জন্মালেও ছোটবেলা থেকেই এখানে। ওর বাবা-মা এখানে, এই বাঙ্গালীটোলায় বহুকাল ছিলেন। মণি যখন তেরো-চোদ্দ বছর বয়সের তখন ঘাটে পাঠ শুনতে গিয়ে জলাদবাড়ীর এক মহিলার সঙ্গে তার আলাপ হয়।

তারপর?

একদিন মার সঙ্গে মণিও পাঠ শুনতে গেলে ওকে দেখে ঐ ভদ্রমহিলার বড্ড পছন্দ হয় এবং ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিতে চান। মণিকে না দেখে মার কাছে শুনে সুখ্যাতি পারেন নি ওদের অবস্থা ভাল নয়। উনি নিশ্চয়ই আশা ক ছেলের বিয়েতে অনেক পাবেন।.....

মণি পিসীদের বাড়ীতে বুঝতে পেরেছিলেন যে ওরা সাধারণ পরিবার।

না, তা বুঝতে পারেন নি।

সে কি?

ছেলের বিয়ে দিতে এসে বাসরঘর, ভাঁড়ারঘর দেখে না। বা কেউ জানতেও পারে না কার ক দানা-টাকাপয়সা আছে।

কিন্তু যে কোন বাড়ীতে মোটামুটিভাবে তাদের অবস্থা বুঝে

পিসী একটু বকুনি দিয়ে তুই ছোঁড়া বড্ড তর্ক করিস। বাই দেখে বাঙ্গালীটোলার সব অবস্থাই এক মনে হয়। কোন বাড়ী তোর মনে হচ্ছে এ বাড়ীতে দিদে ব্যারিস্টার থাকেন?

আমি আর তর্ক করি না। তারপর চুপ করে শুনে যাই।

ঐ ভদ্রমহিলার ছেলের সঙ্গে পিসীর বিয়ে হয়ে গেল। মাসে ক শ্বশুরের জমিজমা দেখতে যাচ্ছেন মণি পিসীকে বাপের বাড়ীতে রে তিনদু জন দেশে গেলেন কিন্তু তাদের আর কোন খবর পাওয়া যায়

তারপর?

তারপর আর কি? তাদের ও হদিশ পাওয়া গেল না।

কি আশ্চর্য?

অবাক হচ্ছিস কেন? সবকিছু শোন। ইতিমধ্যে মণির এক হয়েছে এবং সেও বছর দুতিন গেছে, এমন সময় মণির বাবা মারা

হা ভগবান!

মণির মা এর-ওর বাড়ী রান্না করে কোন মতে সংসার চালাতে চালাতেই দশজনের সাহায্যে ছোট মেয়েটার বিয়ে দিলেন কিন্তু বছর ঘুরতে না ঘুরতেই মেয়েটা শাঁখা-সিঁদুর খইয়ে মার কাছে ফিরে এলো।

চমৎকার!

পিসী যেন মণি পিসীর দুঃখের কাহিনী বলতেও কষ্ট বোধ করেন। তাইতো বললেন ও যে কি দুঃখ-কষ্টে দিন কাটিয়েছে তা আমি ভাবতেও পারি না।

শ্বশুরবাড়ী থেকে আর ওকে নিতে আসে নি?

মণির যখন তেইশ-চব্বিশ বছর বয়স তখন একবার ওর হতচ্ছাড়া স্বামীর সঙ্গে কোথায় ঘাটে দেখা হয়েছিল কিন্তু সে হারামজাদা কসমইসী করে ওকে ফিরতে পাঠাল না।

মণি পিসীর মেয়ে কোথায়?

একবার বন্যার পর এখানে খুব কলেরা হয়। সেই কলেরাতেই ওর খোন আর মেয়েটা মারা যায়।

মণি পিসীর বিষয়ে আমি আর প্রশ্ন করি নি। পিসী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, কাশীতে থাকতে থাকতে কত হাজার হাজার মণি দেখলাম তা বলতে পারব না। কার জীবনে যে কি ঘটেছে তা শুধু বাবা বিশ্বনাথই জানেন।

তাইতো দেবীর ব্যাপারে দিদিকে আমি কিছু বললাম না। জানি না হয়ত ওর জীবনেও কিছু অঘটন ঘটে গেছে। দিদি, পিসী বা দেবী কেউই আমাকে কিছু বলে নি কিন্তু দেবীর হাবভাব আলাপ-আচরণ দেখে মনে হয়....

কসে বসে কি ভাবছ?

আপন মনে বসে বসে এত কথা ভাবছিলাম। হঠাৎ দেবী এসে প্রশ্ন করতেই একটু যেন চমকে উঠলাম। একটু হেসে বললাম, না, কি আর ভাবব?

দেবী হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করল, কেন, বলতে লজ্জা করছে?

লজ্জা করবে কেন?

তবে কি ভয় করছে?

ভয়?

হয় লজ্জা না হয় ভয়। যে কোন একটা কারণে আমাকে কিছু বলছ না।

তবে কি মিথ্যা?

এবার আমি কোন জবাব দিই না।

দেবী ইজিচেয়ারে বসে বললো, আমার কাণ্ডকারখানা দেখে তোমার মনে অনেক প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক। আমি সেজন্য তোমাকে দোষ দিই না।

আমি মুখ নীচু করে বসে থাকি।

দীপ!

বলো।

চলো সারনাথ ঘুরে আসি।

এখন?

এত বেলায় এখন সারনাথ গেলে ফিরতে দেরী হয়ে যাবে না?

হলেই বা ক্ষতি কি?

দিদি যদি কিছু মনে করেন?

কি মনে করবেন? দেবী একটু মুচকি হেসে বললো, তোমার প্রতি দিদির অগাধ বিশ্বাস। তিনি জানেন তোমার দ্বারা আমার কোন সর্বনাশ হবে না।

তুমি উকিল হলে না কেন?

উকিল হবো কেন?

যে-কথা আমরা কখনই বলতে পারব না, সে-কথা উকিলবাবুরা নির্বিবাদে বলতে পারেন।

ও! এই জন্য?

হ্যাঁ, এই জন্য।

আমি কি মিথ্যে কথা বলেছি?

আমি ত তা বলিনি।

তবে?

সত্যি কথাও এভাবে বলার কি দরকার? তাছাড়া তুমি কি করে আমার সম্পর্কে নিশ্চিত মনের কথা জানলে?

শুনতে চাও?

যদি আপত্তি না থাকে।

বিন্দুমাত্র না।

তাহলে বলো।

দেবী গম্ভীর হয়ে শুরু করল, নিজের প্রশংসা আমি করতে চাই না কিন্তু তবু একথা নিশ্চয়ই তুমি স্বীকার করবে আমাকে দেখে অনেকেরই ভাব করতে ইচ্ছে করে। দু-একজন অতি দূর সম্পর্কের আত্মীয় আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু দিদি একটু ইঙ্গিত পেতেই তাদের বিদায় করে দেন। অথচ তোমাকে নিয়ে যে আমি যেখানে খুশী ঘুরে বেড়াচ্ছি, তার জন্য দিদি একটি কথাও বলছেন না।

কিন্তু আমার সম্পর্কে দিদির উদাসীনতার কারণ কি? আমি কি সন্ন্যাসী? নাকি অবোধ শিশু?

দেবী উঠে দাঁড়িয়ে বললো, ওসব কথা বাদ দাও। চলো ঘরে আসি।

দিদি কোথায়?

নিশ্চয়ই শুয়ে শুয়ে কোন ঠাকুর-দেবতার গল্প পড়ছেন।

দাঁড়াও, আমি দিদিকে জিজ্ঞাসা করে আসি।

যাও কিন্তু দেখো, দিদি আপত্তি করবেন না।

আমি দিদির ঘরে যেতেই বললেন, কিছু বলবি?

বললাম, দিদি, আমি ত আর কয়েক দিনের মধ্যেই চলে যাবো, তাই ভাবছিলাম একটু সারনাথ ঘুরে আসি।

কদিনের মধ্যেই চলে যাবি কেন? হাজার হোক তুই সোনা বউয়ের ছেলে। তোকে কাছে পেলে যে কি ভাল লাগে তা বলতে পারব না।

তা জানি বলেই ত এসেছি।

এখনই সারনাথ যাবি?

তাই তো ভাবছিলাম।

তুই কি একলা যেতে পারবি? দেবী কি করছে?

আমার ঘরে বসে বই পড়ছে।

তুই বরং ওকে সঙ্গে নিয়ে যা।

ও বই পড়ছে। ও বোধহয় এখন যাবে না।

না, না, ওকে নিয়ে যা! তুই ছেলে গেলে ত ও হতভাগীও আর ঘর থেকে বেরুবে না।

ফিরতে ফিরতে নিশ্চয়ই সন্ধ্যে হয়ে যাবে। তুমি চিন্তা করো না।

তবে বেশী রাত করিস না।

বেশী রাত কেন করব? মনে হয় সাতটা-সাড়ে সাতটার মধ্যেই ফিরতে পারব।

দিদির ঘর থেকে বেরুতেই দেখি দেবী দাঁড়িয়ে আছে। হাসতে হাসতে আমার পিছন পিছন আমার ঘরে ঢুকেই বললো, দেখে মনে হয় ভাজা মাছটা উল্টে খেতে জান না!

আমি হাসতে হাসতে বললাম, কি করব? তোমার জন্য আরো কত কি করতে হবে তা কে জানে!

তাহলে আরো কিছু করতে চাও?

এই মাঝ-পথে গাড়ী থেকে নেমে পড়া কি ঠিক হবে? (ক্রমশঃ)

এখন ১০৲ টাকা অগ্রিম জমা দিয়ে গ্রাহক হোন এবং বই পাওয়া সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হোন

সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান

প্রধান সম্পাদক : ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত
সম্পাদক : শ্রীঅঞ্জলি বসু

দীর্ঘ পরিশ্রমসাধ্য বৌথ গবেষণায় রচিত। এই চরিতাভিধানে প্রায় সাড়ে তিন হাজার বাঙালীর যাঁদের বাঙলার সংস্কৃতি জগতে কোন না কোন ক্ষেত্রে উল্লেখ্য অবদান আছে, তাঁদের জীবন-চরিত সংগৃহীত হয়েছে, জন্মসূত্রে বাঙালী নন, তাঁদেরও জীবনী সন্নিবিষ্ট হয়েছে। বাঙলা ভাষার চর্চাকারী ছাত্র, শিক্ষক, লেখক, গবেষক, অনুসন্ধিৎসু পাঠক সকলের পক্ষে অপরিহার্য জীবনীকোষ। প্রায় সাড়ে ছশ পৃষ্ঠা, লাইনো হরফে ঝরঝরে ছাপা, মজবুত বাঁধাই। দাম ৪০৲ টাকা। ৩০ এপ্রিলের মধ্যে ১০৲ টাকা অগ্রিম জমা দিলে বই নেবার সময় ২৪৲ টাকা দিতে হবে। ৩ মে বই প্রকাশিত হবে।

তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ

সম্পাদক : অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য

কথাকোবিদ তারাশঙ্করের সমগ্র ছোট গল্প (প্রায় ২০০) কালানুক্রমিক সাজিয়ে তিন খণ্ডে প্রকাশিত হচ্ছে। ১ম খণ্ড প্রকাশিত, ২য় খণ্ড প্রকাশ আসন্ন। প্রতি খণ্ড ৪০৲ টাকা। অগ্রিম গ্রাহক মূল্য একত্রে ৮০৲ টাকা কিস্তিতে ৯০৲ টাকা। যোগাযোগ করুন।

সাহিত্য সংসদ
৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড,
কলিকাতা—৯

CENTRAL LIBRARY

বাংলা লোকনাট্য : কয়েকটি দিক

মানিক সরকার

বাংলা লোকনাট্যের ধারা বহু প্রাচীন। ওই প্রাচীন লৌকিক ধারার কতকগুলি নিজস্ব গুণ আছে, কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। এই বৈশিষ্ট্যের জন্যেই এখনকার থিয়েটার, যাত্রা, গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্য প্রভৃতি থেকে লোকনাট্য ভিন্নতর রয়েছে। আধুনিক নাট্যধারার বিভিন্ন শাখা-উপশাখার সঙ্গে লোকনাট্যের মিল ও অমিল উভয়ই আছে। এটা থাকাই স্বাভাবিক কারণ সকল শাখার উৎসক্ষেত্রেই লোকনাট্যের অবস্থান।

লোকাশ্রিত কাহিনী, কাহিনী আশ্রিত চরিত্র, চরিত্র অনুযায়ী ঊক্তি-প্রত্যুক্তি সহজ, সরল এবং বলিষ্ঠতার সঙ্গে লোকগীতি-নৃত্য-বহুল সংলাপ এবং লৌকিক বাদ্যযন্ত্রের ঐকতানের মাধ্যমে গুরুগম্ভীর ভাবভঙ্গির দ্বারা লোকাকীর্ণ উন্মুক্ত আসরে অভিনয়ের সাহায্যে যা প্রকাশ হয় তাই-ই সাধারণ অর্থে লোকনাট্য (ফোক ড্রামা)।

বাংলা লোকসংস্কৃতির পটভূমিতে লোকনাট্যের উৎস, বিকাশ এবং সংজ্ঞা ইত্যাদি বিষয় এ নিবন্ধে আলোচনা করব না। এ নিবন্ধে বাংলা লোকনাট্যের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করব। এই বৈশিষ্ট্যগুলিই তার স্বরূপ প্রকাশে বিশেষ সহায়তা করে।

গ্রামীণ জীবনের সকল চিন্তাভাবনা ও কর্মকে আশ্রয় করেই লোকনাট্যগুলি গড়ে থাকে। তারা গ্রামীণ নর-নারীর নাট্য-পিপাসাকে মিটিয়ে থাকে। তাতে মহাকাব্য বা পুরাণের চরিত্র থাকে। কিন্তু সে চরিত্রগুলি যে-নামেই খ্যাত হোক না কেন তা গ্রামীণ মানসিকতার ঊর্ধ্বে উঠতে পারে না। ঊর্ধ্বে উঠতে না পারলেও এর জীবন ও মর্তপ্রীতি সর্বত্র ছড়িয়ে থাকে। এই মর্তপ্রীতি লোকনাট্যের শ্রেষ্ঠ পরিচয়।

লোকনাট্যগুলি সকল। মুখে মুখে আসরে আসরে ঘুরে বেড়ায়। তাতে লেখনীর একচ্ছত্র বেড়ি নেই। লেখনীর শাসন নেই বলেই লোকনাট্য শৃঙ্খলাবিহীন নয়। একটি অলিখিত অনুশাসন সে মেনে চলে। আসরে পালা চলাকালে সংলাপে ও গানে নতুন নতুন বাক্যের নিত্য সংযোজন হয়ে থাকে। নিত্য সংযোজন নাটকের প্রবল বহন ক্ষমতার পরিচয় দেয়। এতে নট-নটীদের অভিনয় দক্ষতাও প্রদর্শিত হয়। নাটকের আকার ও আয়তন পরিবর্তিত হয়। কিন্তু এই পরিবর্তন মূল বিষয়-বস্তুকে বিকৃত করে না। নতুন নতুন বিষয়-বস্তু মূল কাহিনীতে অনুপ্রবেশ করে দর্শকগণের নাট্যোৎকণ্ঠা, কৌতূহল এবং আগ্রহকে বাড়িয়ে তোলে। বোলানে কোন লম্পট স্বামীর কুকীর্তি প্রকাশ করতে কিংবা কোন আড়লের কুকার্যের বিবরণ দিতে লোকশিল্পীদের কোন প্রকার অসুবিধা হয় না। শ্রোতা বা দর্শকগণের ঔৎসুক্য অক্ষুণ্ণ রেখেই এধরনের নিত্য সংযোজন ও রসগ্রাহী করে তার পরিবেশন আধুনিক থিয়েটার, যাত্রা প্রভৃতিতে নেই। লোকনাট্যগুলির নিত্য চলার শক্তির মধ্যেই তার প্রকৃত গৌরব রয়েছে। এ গৌরব অন্য কোন শাখার নেই। এদিক দিয়ে লোকনাটকে চলনাট্য বলা চলতে পারে। এর চলমান বৈশিষ্ট্যটি সত্যিই চমকপ্রদ।

ধর্মের প্রভাব লোকনাট্যে প্রবল, কিন্তু সে ধর্ম শাস্ত্রীয় ধর্ম নয়—একান্তভাবেই লৌকিক ধর্ম। লৌকিক ধর্মে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা নেই, নেই ধর্মগত কোন প্রকার বিদ্বেষ। বাংলার লোকধর্ম বহু শাখা-উপশাখায় বিভক্ত, সামন্ততান্ত্রিক জীবনবোধের গভীরে তা প্রোথিত। এই ধর্মবোধের মধ্য থেকেই বহু লৌকিক দেব দেবীর উদ্ভব হয়েছে। এই দেব-দেবীরাই অনেক ক্ষেত্রে লোকনাট্যের নায়ক-নায়িকা হয়েছেন। বনবিবির পালায় যা বনবিবির প্রতিপক্ষ হয়েছেন দক্ষিণ রায়। দক্ষিণ রায় লৌকিক দেবতা, বনবিবিও তাই। বনবিবি পালায় কোন প্রকার ধর্মগত ব্যাখ্যা অপেক্ষা লৌকিক জীবনের ঘাতপ্রতিঘাত গুণাবলী অধিক পরিমাণে প্রকাশ পায়। লোকধর্মে অলৌকিকত্ব আছে, অলৌকিকত্ব এবং লৌকিকত্বের বৈপরীত্যে লোকনাট্য পার্থিব জীবনের গৌরবকেই গৌরবান্বিত করে থাকে, শাস্ত্রীয় ও পার্থিবধর্ম-কর্মের মধ্যে একটা ধার ধারে না। তার নায়ক-নায়িকারা স্বর্গ থেকে মর্ত্যে আগমন করে, মর্ত্য থেকে স্বর্গে আরোহণ করে না। মর্তের পার্থিব জীবন নিয়েই লোকনাট্যের কাহিনী গড়ে ওঠে। মর্তপ্রীতিই লোক-নাট্যের শ্রেষ্ঠ ভূষণ।

চারিপাশে দর্শক পরিবেষ্টিত আসরে লোকনাট্য পরিবেশিত হয়। চারিপাশে দর্শক, তার মাঝে আসর। আসরেই সমগ্র দলটি অবস্থান করেন। নট-নটীদের প্রবেশ এবং প্রস্থান তাঁরা উঠে দাঁড়ান এবং বসে পড়ার মধ্য দিয়ে হয়ে থাকে। আসরে বসে-থাকা দলটিকে ঘিরে কুশি-লবেরা চলা-ফেরা করে থাকেন। কুশি-লবদের গতি আকারে সোলাকৃতি। দর্শক, অভিনয় এবং অভিনেতার নৈকট্য লোকনাট্যে বড়ই প্রবল। পালা চলাকালীন সময়ে এই তিনটি অংশ এক হয়ে যেন একাকার হয়ে পড়ে। লোক-নাট্যের অভিনয়ে দর্শক ও অভিনেতার স্বাভাবিক নৈকট্য সমগ্র নাট্যধারার একটি অমূল্য সম্পদ।

লোকনাট্যে সংলাপ স্বল্প ও লোক-গীতিই প্রধান। সংলাপে আবৃত্তি ও সুরের আধিক্য রয়েছে। আবৃত্তিতে পয়ার ছন্দের ব্যবহার হয়। ভাষা হিসাবে আঞ্চলিক উপভাষা ব্যবহৃত হয়। ভাষার সঙ্গে সুরের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।

লোকনাট্যের নট-নটীদের সাজসজ্জা এবং বেশভূষা অতি সাধারণ। ক্ষেত্রবিশেষে চরিত্র হিসাবে মুখোসের প্রচলন আছে। লোকনাট্যে পশুরাও অভিনয় করে থাকে।

লোকনৃত্য, লোকনাট্যের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। এখানে নাটক থেকে নৃত্যকে আলাদা করা যায় না। অভিনয় এবং গীতের সঙ্গে নৃত্য পরোপরি সংযুক্ত। নাটকের একটি নির্দিষ্ট ভাবকে প্রকাশ করবার জন্য গীত ও নৃত্যকে অবলম্বন করা হয় এবং এরা একটি অপরটির সহায়করূপে কাজ করে।

জয়ন্তী CENTRAL LIBRARY

গীতের তাল-লয়-ছন্দ এবং নৃত্যের তাল লয়-ছন্দ এক এবং অভিন্ন হয়ে নাটকের গতি সৃষ্টি করে এবং তা রসগ্রাহী হয়ে ওঠে। শ্রোতার মনকে ঐক্য রাখে। কাহিনীকে বাচনা ও নৃত্যের ঝঙ্কারে ভরিয়ে তোলে। দলকও পুলকিত হয়ে ওঠে। সখী নৃত্য এর একটি প্রধান আকর্ষণ। এমনি করে লোকনাট্যে গীত-নৃত্য-নাট্য অঙ্গীভূত এবং সঙ্গে হয় লৌকিক বাদ্যযন্ত্রগুলির ঐকতান। যেমন সারিন্দা বিভিন্ন ধরনের বাঁশের বাঁশী, ঝুমুর ঠুনঠুনি ঢাল খোল প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হয়। অঞ্চলভেদে অবশ্য বাদ্যযন্ত্রের তারতম্য ঘটে।

বঙ্গ বিদ্রূপ হাস্যকৌতুক অশ্লীলতাদুষ্ট লোকনাট্যে আছে। অর্থাৎ হাসি ঠাট্টা তামাসা ইত্যাদির মাধ্যমে দর্শক বিনোদন পেয়ে থাকেন। কখনও আবার বাঙ্গের কষাঘাতে দলকদের হর্ষকিত্ত নিয়ে থাকে। সাধারণতঃ বাঙ্গ-বিদ্রূপগুলি তুলিত সামাজিক অসঙ্গতিগুলিকে ফুটিয়ে তোলে।

লোকনাট্য আনন্দ বিতরণ করে, লোকনাট্য লোকশিক্ষাও দিয়ে থাকে। নাটকের জন্য নাটক—লোকনাট্য নয়, লোকনাট্য জীবনের জন্য, আনন্দের জন্য, শিক্ষার জন্য অভিনীত হয়ে থাকে। সে শিক্ষা মূলত নীতি শিক্ষা। নীতি অর্থে জীবন ও জগতকে মাধুর্যের গুণাবলী দিয়ে সুন্দর এবং সবল করণের কার্যকল্প। নীতিকথা মূলত জীবনবাদী অভিজ্ঞতা। বস্তুনিষ্ঠ জগতের মধ্যে বাস্তব জীবনসংগ্রামের ঘাত-প্রতিঘাতে মানুষ যে অভিজ্ঞতা অর্জন করে চলেছে তার মধ্য থেকেই নীতি-শিক্ষা অভিপ্রকাশ করেছে। লোকনাট্য সেই নীতি শিক্ষাকেই প্রচার করে থাকে।

লোকনাট্যে অলিখিত দৃশ্য ভাগ আছে। কিন্তু তা পালার ধারাবাহিকতাকে এক মুহূর্তের জন্যও থামিয়ে দেয় না। প্রথম আসরে বন্দনা হয়। আসর বন্দনা মূলত শ্রোতাদের বন্দনা। এর পর নাটক পরিচিতি বা তত্ত্ব উপস্থাপনা হয়, উপস্থাপনার পর নাটকের সূচনা হয়। সূচনার পর চরিত্রগুলি বক্তব্য অনুসারে একে একে উপস্থিত হয় তারপর হয় দ্বন্দ্ব সংঘাত। অবশেষে আসে পরিণতি। সূচনা থেকে পরিণতি এই পরিধির মধ্যে দর্শকদের রুচি এবং চাহিদা অনুযায়ী বহু নিত্য ঘটনার সংযোজন হয়। এ এক অভূতপূর্ব দক্ষতা। পালার পৌরাণিক কাহিনীর সঙ্গে স্থানীয় কাহিনীর সংযোজন, নট-নটীরা অতি সহজে করে থাকেন। এই সংযোজনে পালার কোন প্রকার ব্যাঘাত ঘটে না, বরঞ্চ শ্রোতারা পালার প্রতি আরও বেশী আকৃষ্ট হয়।

প্রেম অমৃত
যৌবন-যন্ত্র

উত্তেজনাপূর্ণ পালা। রঙ্গপতির মধু-যামিনীর সোমরস। বিয়োগে উপহার। বন্ধ হাসপাতাল। নায়কচরণ দে স্ট্রীট, কলিঃ।

পালার মধ্যে তাদের জীবনের ছাপ দেখতে পায়।

রামায়ণের অংশ বিশেষ নিয়ে উত্তরবঙ্গে কৃষ্ণান পালা হয়ে থাকে। লব-কুশের কাহিনীর মধ্যে কুশি-লবেরা অবলীলাক্রমে পরিবার পরিকল্পনার গানগান করে থাকেন। মালদার গম্ভীরা গানে শিবের স্তুতিতে জন্মনিয়ন্ত্রণের অত্যাচার তুলে ধরতে শিল্পীরা কুণ্ঠাবোধ করেন না। চার ইয়ারের সংলাপে হিটলার মুসোলিনী স্তালিন চার্চিলের আসতে বাধা থাকে না। এমনি করে একই পালার মধ্যে অতীতের সঙ্গে বর্তমানকে বিগত কালের সঙ্গে চলতি কালকে একই সূত্রে বেঁধে বাংলার লোকনাট্য তা দর্শক সমাজের সামনে উপস্থিত করে থাকেন। বাংলা নাটকের অন্যান্য শাখায় এ ক্ষমতা নেই।

বাংলার লৌকিক জীবনের সৌন্দর্যকে অবলম্বন করেই বাংলা লোকনাট্যের উদ্ভব হয়েছে। সমাজজীবনের অভ্যন্তরে দুই বিপরীত-মুখী শক্তির নিরন্তর যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত চলেছে তাই বাংলা লোকনাট্যের প্রধান দ্বন্দ্ব-সংঘাত। নাটকে দেব-দেবী চরিত্র অঙ্কিত বা চিত্রিত হলেও ওই দেব-দেবীর আচারআচরণের মধ্য দিয়ে সামাজিক দ্বন্দ্বকেই নানাভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। ২৪ পরগণার দক্ষিণ অঞ্চলে বিশেষ করে সুন্দরবনের জনপদগুলিতে বনবিবি পালা হয়ে থাকে। বনবিবি লৌকিক দেবী। ওই পালাতে বনবিবির প্রতিপক্ষ হিসাবে দক্ষিণ রায় চিত্রিত হয়েছেন। দক্ষিণ রায় ধনী-মহাজনের অর্থাৎ ধনীর দেবতারূপেই উপস্থিত হয়েছেন, বনবিবি দুঃখের অর্থাৎ দুঃখীজনের দেবীরূপেই নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। উভয়ের মধ্যে প্রবল সংঘাত, এমন কি প্রকাশ্য যুদ্ধ হয়েছে। বনবিবি বনাম দক্ষিণ রায়ের এই সংঘাত শুধুমাত্র দুই দেব এবং দেবীর সংঘাত নয়। সমাজের দুটি শক্তি—ধনী বনাম দরিদ্রের অহরহ সংগ্রামেরও তা প্রতিরূপ।

আমাদের সমাজে রাজা বনাম প্রজা, জমিদার বনাম রায়ত, ধনী বনাম দরিদ্রের মধ্যেকার শ্রেণীদ্বন্দ্বই প্রধানতঃ দ্বন্দ্ব-সমাজের রূপবিবর্তনের ধারায় এই দ্বন্দ্ব বহু কাল ধরে চলে আসছে। চর্যাগানে তার পরিচয় আছে, পরিচয় আছে গোপী-চন্দ্রের গানে, আছে চণ্ডীমঙ্গলে ভাঁড়ুদত্ত গানে, ধর্মমঙ্গল প্রভৃতিতে। লোকনাট্যে এ দ্বন্দ্ব স্পষ্ট।

উত্তরবঙ্গের লোকনাট্য 'চোর চুরনী' সামাজিক পালার কিছু অংশ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। কৃষক সন্তান সানাই, সে চরিত্র। তার বউ হলদি। দেশে আকাল এল। ঘরে ঘরে অনাহার, অর্ধাহার দেখা দিল। তিনদিন অনাহারে থাকার পর এক সের চালের জন্য অন্নদাতা কৃষক রমণী সেল গ্রামের মোড়ল এবং অবস্থাপন্ন নটেশ্বরের বাড়ীতে। অভিনয়কালে শোনা যায়—

হলদি : মুই তোমাকাঠে আসিচুং। মোক একসের চাউল ধার দেও।

নটেশ্বর : চাউল পেটে পুষ্ব হলদি, এখন আকালের দিনত কার ঘোকে চাউল ধার দিবার পারে?

হলদি : আজি একটা ব্যবস্থা করার খাবে। হামরা তিনদিন হাতে কিছুই খাই নাই।

নটেশ্বর : আহাহা তিনদিন হাতে কিছু খান নাই। এহো শুনিলেও বড় কষ্ট হয়। যাউক তিনদিন হাতে যখন কোন খান নাই হায় এক কাজ করেক, বাড়ীত তোর চাউলও নাই। তুই চাও ভাত রান্ধেক। আজি না হয় তুই এ—(লালসার অঙ্গভঙ্গি করে)।

হলদি : চুপ কর। না নাগে তোমার চাউল। কম রাখেন। দিন বদলিবে (ক্রোধ ও ধিক্কার জানিয়ে দ্রুত প্রস্থান)।

নটেশ্বর : ও! না খয়া মরিব ধরচে। তাও তার কত দেমাক। আচ্ছা মুইও দেখিম তুই কত বড় সতী।

(ডঃ গিরিজাশংকর রায়ের নিকট সংগৃহীত)

নটেশ্বর এবং হলদি একই বাংলার দুই রূপ, দুটি বিপরীত শক্তি। হলদি দরিদ্র কৃষক রমণী, নটেশ্বর জমিদার, সে গ্রামের মোড়ল। পালাটির শেষ হয় এই গানে—

'হায়রে ভিক্ষুকের বেশে
হলদি সানাই ফেরে দেশে দেশে'

চোর চুরনী পালাগান হইয়া গেল শেষ।*

হলদি এবং সানাই-এর কাঁধে ভিক্ষুকের বেশ গ্রহণ যে-বাংলার পরিচয় দেয় বাংলার লোকনাট্য কাহিনীর বিষয়বস্তু হিসাবে তাকেও গ্রহণ করে।

বাংলা লোকসংস্কৃতির অন্যতম শাখা লোকসাহিত্য। লোকসাহিত্যেরই একটি শাখা লোকনাট্য। লোকনাট্য নিয়ে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতাগণ স্বতন্ত্রভাবে কোন আলোচনা করেন নি। এমন কি বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসের আলোচনায় লোকনাট্য যোগ্য মর্যাদা পায় নি। লোক-সংস্কৃতি ও সাহিত্য নিয়ে ইতিপূর্বে যাঁরা মূল্যবান আলোচনা করেছেন তাঁদের কাছেও লোকনাট্য কতকটা উপেক্ষিত হয়েছে। অথচ প্রাথমিকভাবে বিভিন্ন জেলায় ক্ষেত্র অনুসন্ধান করে দেখেছি বাংলার লোকনাট্য এখনও সজীব হয়েছে। বাংলা লোক-সাহিত্যের ভাণ্ডারে লোকনাট্যের একটি উল্লেখযোগ্য স্থান আছে। গ্রামে গ্রামে এখনও যা ছড়িয়ে আছে তা সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ করলে এই সত্য প্রমাণ পাবে।

বর্তমানে বাংলার লোকনাট্যের ধারাকে উদ্ধার করতে পারলে সুপ্রাচীনকাল থেকে বহমান দেশীয় নাট্যধারার যথার্থ মূল্যায়ন সম্ভব হবে। বাংলার লোকনাট্যের ধারা আধুনিক জীবনবাদী নবনাট্য আন্দোলনকেও গুরুত্ব পরিমণ্ডলে সজীব করে তুলতে সাহায্য করবে।*

---

* দ্রষ্টব্য :

১। 'পশ্চিমবঙ্গ লোকসংস্কৃতি' গ্রন্থে ডঃ অজিতকুমার ঘোষের প্রবন্ধ।

২। বাংলা লোকনাট্যের ধারা ও আলকাপ—'মূল্যায়ণ', ১০ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

CENTRAL LIBRARY

আলোকচিত্রে খাজুরাহো মন্দির

অতীত শিল্প নিদর্শন হিসেবে আজও ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য মন্দির, প্রচীর ও পর্বতগাত্রে উৎকীর্ণ কারুকার্য খচিত শিল্প সম্ভার। তবে মনে হয় খাজুরাহোর মন্দিরগুলি আর্য ভারতীয় মন্দির স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

খৃষ্টীয় ৯৫০ থেকে ১০৫০ অব্দের মধ্যে আনুমানিক পঁচিশটি মন্দির নির্মিত হয়েছিল চান্দেল্লা মহারাজাদের আংকেলো ও উৎসাহে। দুঃখের বিষয় এই অনিন্দ্য-সুন্দর স্থাপত্য কীর্তির অধিকাংশই হারিয়ে গেছে কালের স্পর্শে। আর কয়েকটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ এখনও ছায়ামলিন অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে ধূলিধূসর প্রাচীন স্থাপত্যের সাক্ষী হিসেবে। এখন দর্শনযোগ্য মন্দিরের সংখ্যা মাত্র বাইশটি।

এর মধ্যে শৈব, জৈন, বৈষ্ণব, বৌদ্ধ প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মন্দির রয়েছে। তান্ত্রিক মন্দির চৌষট্ট যোগিনী মন্দির নামেই সুপরিচিত। ব্রাহ্মণ্য মন্দিরের মধ্যে কন্দরীয় মহাদেও মন্দিরটি আয়তনে বোধ হয় সব চেয়ে বড় এবং দর্শনার্থীদের কাছে সবচেয়ে প্রিয়।

খাজুরাহো মন্দির স্থাপত্যের নান্দনিক সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে বহু শিল্পী, সাহিত্যিক ও মনীষী সেখানে গিয়েছেন এবং সেই সম্পর্কে নানান ধরনের কাজ করেছেন। কিন্তু সম্প্রতি আলোকচিত্র শিল্পী অজয় দে কয়েকদিন সেখানে অতিবাহিত করে খাজুরাহো মন্দিরের বিভিন্ন দিককে তাঁর ক্যামেরায় ধরে রাখার চেষ্টা করেছেন। এবং কলকাতার তথ্যকেন্দ্রে ৬৫টি আলোকচিত্রের এক সুন্দর প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন।

এই আলোকচিত্রাবলীর মধ্যে দিয়ে খাজুরাহো মন্দিরগুলির গঠন প্রণালী অন্তরাল অংশ গর্ভগৃহ প্রশস্ত মহা-মণ্ডপ ছাদ স্তম্ভ খিলান প্রদক্ষিণ-পথ, অলিন্দ প্রভৃতির অলঙ্করণসমৃদ্ধ স্থাপত্য কলাকৌশল স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাছাড়া সেই যুগের মানুষের সৌন্দর্যচেতনা ও নিপুণ বৈজ্ঞানিক প্রতিভাও প্রতিভাত হয়েছে এই আলোকচিত্রাবলীতে। মন্দিরগাত্রের অসংখ্য-রূপ কারুকর্ম এবং ভাস্কর্যগুলোকে অজয় দে উপস্থাপিত করেছেন আলোকচিত্রের সাহায্যে।

এই প্রদর্শনীর আলোকচিত্রকে চার ভাগে ভাগ করা যায়—মন্দিরগাত্রের কারুকার্য, দেব-দেবীর ভাস্কর্য, মিথুন ও রতিক্রিয়ার দৃশ্য এবং যুদ্ধের বর্ণনামূলক শিল্পকলা।

এক কথায় বলা যায় রসিকজনের খাজুরাহো মন্দির সম্পর্কে একটা আটঘাট সুসংহত ধারণা গড়ে তুলতে অজয় দে সফল হয়েছেন। তাঁর দৃশ্য গ্রহণের ও নির্বাচনের তারিফ করতে হয়। ক্যামেরার কাজও ভাল। ছবিতে ডাইমেনসান কিংবা লাইট অ্যান্ড সেড দেখার মত। সাপিয়া প্রিন্ট করার ফলে তাঁর অধিকাংশ আলোকচিত্র রং এবং বিষয় আসলের মত প্রাণবান হয়ে উঠেছে।

ইতিপূর্বে অজয় দের অনেকগুলো প্রদর্শনী হয়ে গেছে। বিভিন্ন দেশী বিদেশী আলোকচিত্র প্রতিযোগিতায় তিনি বিভিন্ন সময়ে নানান পুরস্কারও লাভ করেছেন।

শান্তি নিকেতন কলাভবনের লিথোগ্রাফ প্রদর্শনী

সম্প্রতি বিড়লা আকাদমিতে এক নয়নাভিরাম লিথোগ্রাফ চিত্রাবলীর প্রদর্শনী হয়ে গেল। মূলতঃ শান্তিনিকেতনের কলা-ভবনের উদ্যোগেই এই আয়োজন। সেখানকার প্রবীণতম শিল্পী থেকে শুরু করে কলা-ভবন থেকে সদ্য পাশ করা শিল্পীর পর্যন্ত কাজ সন্নিবেশিত হয়েছে এবারই এই প্রদর্শনীতে।

ত্রিশ দশক থেকে সত্তর দশক পর্যন্ত শান্তিনিকেতনের লিথোগ্রাফ পেন্টিং-এর ধারাবাহিকতার মোটামুটি সন্ধান মেলে এই প্রদর্শনীতে এলে। কারণ রামকিঙ্কর, বিনোদবিহারী থেকে আরম্ভ করে একেবারে তরুণশিল্পীর নিদর্শন প্রদর্শিত হয়েছে এখানে।

শান্তিনিকেতনের বাইরের কয়েকজন বরীয়ান সুপ্রতিষ্ঠিত শিল্পীর শিল্পকর্ম প্রদর্শনীর আকর্ষণ বাড়িয়েছে অনেকখানি। এঁদের মধ্যে প্রথমেই বলতে হয় বাংলাদেশের প্রবীণতম খ্যাতিমান শিল্পী জয়নাল আবে-দিনের নাম। তাঁর নিজস্ব রীতিতে অঙ্কিত একটি মুখের প্রতিকৃতি সাদা কাগজের পাতার মত হয়ে উঠেছে কয়েকটি বলিষ্ঠ অথচ জোরালো রেখার পরিমিতিতে। এ ধরনের কাজে জয়নাল সিদ্ধহস্ত। কয়েক বছর আগেও বাংলাদেশ যুদ্ধের পর আমরা তাঁর ঐ ধরনের কাজ দেখেছি আকাদমি অফ ফাইন আর্টসে আয়োজিত বাংলাদেশের সম-কালীন চিত্রকলা প্রদর্শনীতে।

কলকাতার গোপাল ঘোষ কিংবা নীরদ মজুমদারের কাজ স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ। প্রকৃতিপ্রেমিক শিল্পী গোপাল ঘোষ কতিপয় রৈখিক বন্ধনীতে এঁকেছেন স্বেচধর্মী এক প্রাকৃতিক দৃশ্য। নীরদ মজুমদার স্বরচিত পায়রা দেবী প্রতিকৃতি প্রকাশে প্রয়াস পেয়েছেন। এ ছাড়া ভবেশ সান্যাল ও কে জি সুব্রহ্মনিয়ামের লিথোগ্রাফের কাজ চোখ মেলে দেখার মত।

শান্তিনিকেতনের শিল্পীদের মধ্যে রামকিঙ্কর ও বিনোদবিহারীর কাজ স্বকীয় মহিমায় সমুজ্জ্বল। রামকিঙ্করের ছিন্ন রেখাচিত্রে ভাস্কর্যের প্রভাব সুপরিলক্ষিত। বিনোদবিহারীর চিত্র রৈখিক বর্ণনে সাবলীল ও সরস।

এছাড়া দীনকর কৌশিক-এর ছিন্ন কয়েকটি উষ্ণ ও শীতল রঙের সমাহারে রমণীয় হয়ে উঠেছে। সোমনাথ হোরের কাজে তেল রং-এর মত একটা জমাট ভাব ফুটে উঠে বিষয় অনুযায়ী ছবির পরিবেশকে সুন্দর করে তুলেছে। ইলা বেরের সাদা-কালোর সমন্বয়ে কাজ বলিষ্ঠ। এস এল নাগল এর শিল্পকর্মে একটা নিপুণ সজাগ চোখকে তৃপ্তি দেয়। সুনয়না তাঁর চিত্রে সৃষ্টি করেছেন এক আভিনব অতীন্দ্রিয়-লোকের। তোজামুল হকের কাজ দেখে বোঝা যায় যে তাঁর কাজের জোর আছে। এ-ছাড়া ছিল আরোও অনেক সুধীন প্রবীণের নানা ধরনের রং বে-রং-এর কাজ।

নিঃসন্দেহে বলা যায় প্রদর্শনীটি নান্দনিক দৃষ্টিকোণ থেকে নয়নাভিরাম এবং মননশীলতায় মনোজ্ঞ। লিথোগ্রাফ চিত্রাবলীর এমন একটি একক বড় প্রদর্শনী বহুকাল পরে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হল। এ জন্যে শান্তিনিকেতনের শিল্পীদের ধন্যবাদ।

ক্যালকাটা আর্ট ফেয়ার

ধর্মতলা অঞ্চলে অবস্থিত কলকাতা পৌরসভার প্রধান কার্যালয়ের পাশে মকেট স্কোয়ারে প্রতি বছরের মত এবারও চারু-কলার এক মেলা হয়ে গেল। সপ্তাহ ব্যাপিক এই মেলায় সব মিলিয়ে প্রায় সাড়ে পাঁচশোর মত শিল্পনিদর্শন সাজানো হয়েছিল।

বিভিন্ন উপাদানের কারুকর্ম, নানান মাধ্যম ও বিবিধ ধ্যান ধারণার চিত্রকলায় মেলাটি ছিল জমজমাট। নবীন শিল্পীদের পাশাপাশি অনেক প্রবীণ শিল্পীর শিল্প-কর্মও ঠাঁই পেয়েছে এখানে।

বেশ কিছু শিশু চিত্রাঙ্কন ছিল মেলার আর এক মূল্যবান আকর্ষণ। বাইজ-এর পল্লী সাংস্কৃতিক সংস্থা আয়োজিত 'সিট অ্যান্ড ড্র' শিশু চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার এই বাছাই ছবিতে ছোটদের অনেক মজার মজার মনের খবর ও সজীব সতেজ রং-এর সন্ধান পাওয়া যায়।

এবারও দেখলাম বেশ কিছু শিল্পী অন দি স্পট সামান্য সময়ের মধ্যে ইচ্ছুক দর্শকদের প্রতিচ্ছবি আঁকছেন। রসিকরা ভীড় করে তাঁকা দেখছেন। আর এক কোণে বইয়ের স্টল। শিল্প সম্পর্কিত নানা ধরনের পুস্তক ও ছবির প্রিন্ট বিক্রী হচ্ছে। কিছু লিটল ম্যাগাজিনও রয়েছে স্টলে।

এবারে কলকাতার বাইরের শিল্পীদের এই মেলায় দেখা গেল না। পটুয়াদেরও পাত্তা নেই। ইতিপূর্বে এই মেলার প্রধান আকর্ষণ ছিল কালীঘাট মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চলের পটুয়াদের পট চিত্র ও পট গান।

যাইহোক এক কথায় বলা যায় মেলা মোটামুটি সফল হয়েছে।

প্রশান্ত ঘা

CENTRAL LIBRARY

পুনশ্চ

বিখ্যাত ইংরেজী 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রিকা এবং বাংলা মাসিক 'প্রদীপ' ও প্রবাসীর সম্পাদক স্বর্গত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী ছিলেন। জীবনের সুদীর্ঘকাল সাংবাদিকতার মধ্যে তিনি যে সাহিত্যনিষ্ঠা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়ে গিয়েছেন তার তুলনা হয় না।

তিনি ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী হলেও তাঁর মধ্যে কোন গোঁড়ামী বা একদেশদর্শিতা ছিল না। নিরপেক্ষভাবে সমস্ত বিষয়গুলি তিনি বিচার করতেন এবং যথাসম্ভব অন্য ধর্মাবলম্বীদের মতামত প্রকাশেরও সুযোগ দিতেন তাঁর পত্রিকায়।

এসম্বন্ধে একটি বিশেষ নিদর্শন ফাগ বা হোলী উৎসব নামক রাধা-কৃষ্ণের কাহিনী ঘেঁষা শ্রীসুমিতাকুমারী বসু রচিত একটি নিবন্ধ। এই সময়োপযোগী নিবন্ধটির অংশবিশেষ এখানে প্রকাশ করলাম। এটি প্রথম ১৩৫৪ সালের ফাল্গুন মাসের 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয়েছিল।

। ফাগ বা হোলী উৎসব ।

ভারতবর্ষে হোলী একটি বড় উৎসব। এই সময় জনসাধারণ, পুরুষ ও নারী নৃত্যগীত আনন্দ-উল্লাসে মত্ত হয়ে ওঠে। দোল-পূর্ণিমা বা হোলীর পূর্বে উত্তর ও মধ্য ভারতে হোলীকা-জ্বালানো উৎসব খুব সমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। ভারতের নানা স্থানে এই হোলীকা জ্বালাবার উৎসবের উপলক্ষে বহুপ্রকার নৃত্য-গীত সুরু হয়। দোল-পূর্ণিমাতে দেশভেদে এই উৎসবের ভিন্ন ভিন্ন নামও আছে।

এই হোলীকা-জ্বালানো উৎসবের একটি পৌরাণিক কাহিনী আছে। হিরণ্যকশিপু যখন অনেক চেষ্টা করেও প্রহ্লাদকে বধ করতে পারল না, তখন সে তার হোলীকাকে রাজী করাল যে, সে প্রহ্লাদকে কোলে নিয়ে বসবে ও তার চারদিকে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হবে. প্রহ্লাদ পুড়ে মরবে, কিন্তু হোলীকা মায়াবলে উদ্ধার পাবে। কিন্তু ফল দাঁড়াল অন্যরূপ, ভগবানের কৃপায় অগ্নি ভক্ত প্রহ্লাদের একটি কেশও স্পর্শ করতে পারল না, আর মাঝখানথেকে হোলীকা জ্বলে-পুড়ে মরল। বলা হয় এই ঘটনা ফাল্গুনী পূর্ণিমাতে হয়েছিল, তাই জনসাধারণ প্রতি বৎসর এই হোলীকা-জ্বালানো উৎসব করে থাকে।

ব্রজধামে একাদশীতেই হোলীকা সুরু হয়ে যায়। ঘরে ঘরে স্ত্রীলোকেরা গোবর দিয়ে ঢাল-তলোয়ার চন্দ্র সূর্য ইত্যাদি বানিয়ে শুকিয়ে রাখে, আর ওগুলি পূর্ণিমার দিন হোলীকার সঙ্গে জ্বালায়, প্রহ্লাদের জয়-জয়কার করে, আর দ্বিতীয় দিন রং-খেলা সুরু করে দেয়।

মহারাষ্ট্রে হোলী জ্বালাবার পর বসন্তের স্মৃতিতে তলোয়ার নিয়ে নাচ-গান করে আর হোলীর আগুনে জল গরম করে সেই জলেই স্নান করে।

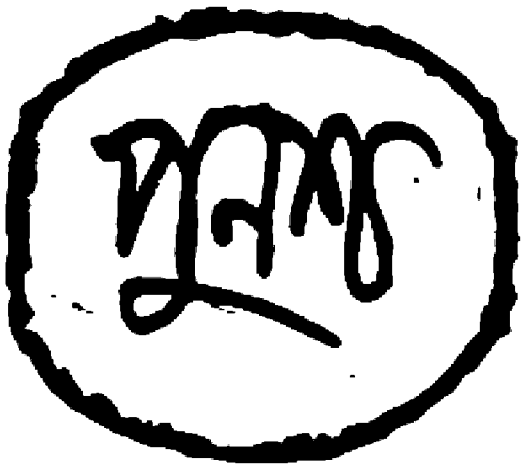

বিহারের ভোজপুরে হোলীকাদাহ শবদাহের সমান মনে করে। তারা হোলীকা জ্বালিয়ে ঘরে ফিরে স্নানাদি করে শুদ্ধ হয়। বিহারের গ্রাম্য ভাষায় হোলীকে 'ভাল' বলে। বসন্ত পঞ্চমীতে ঢোলক বাজিয়ে খুব গান গায়, ঘরে ঘরে নারীরা নানারূপ মিষ্টান্নবাদি তৈরী করে, চারদিকে আনন্দ-উৎসবের সাড়া পড়ে যায়।

দেশের যে যে স্থানে এই হোলীকা-জ্বালানো উৎসব হয়, সেই সেই স্থানের বালক ও যুবারা পনর-বিশদিন আগে থেকেই বাড়ী বাড়ী ঘুরে ও ছুরি করে ঘুঁটে ও কাঠ সংগ্রহ করে রাখে এবং দোল-পূর্ণিমার রাতে সেই স্তূপে আগুন ধরিয়ে নারিকেল উৎসর্গ করে ও 'হোলী' 'হোলী' করে চেঁচিয়ে ওঠে।.....

এই সময়টা উৎসবের পক্ষে খুবই উপযোগী। ফসল কেটে ঘরে তোলার সঙ্গে সঙ্গে নবান্নের অনুষ্ঠান হয়। হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর পর কৃষক সমাজ মেলে অফুরন্ত অবসর। সোনা-ভরা ধান আর প্রাণ-ভরা আনন্দ নিয়ে কৃষক ও কৃষক-বধূরা মেতে ওঠে নাচ-গানে। ফাগুনের ফাগ বা হোলী হল এই আনন্দের প্রাণ, বসন্তের রাগে রঙ্গীন হয়ে উঠে দেহ-মন, আর তারই প্রকাশ পায় হোলীর রং-খেলাতে।

উত্তর-ভারতের ব্রজভূমিতে এই হোলীকা উৎসবে নর-নারীর প্রাণে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। ঋতুরাজ বসন্ত এসে দোল দিয়ে যায় সবার প্রাণে। শীতের জীর্ণবস্ত্র ত্যাগ করে প্রকৃতি বসন্তের নব ফলসাজে সজ্জিত হয়ে ওঠে, গাছের শাখে শাখে কোকিল গেয়ে ওঠে কুহু কুহু, বিরহী-বিরহিণীর প্রাণ হয়ে ওঠে ব্যাকুল, প্রিয়ের সঙ্গে মিলনের আশায় প্রাণে জেগে ওঠে নূতনের ছন্দ, আনন্দ-বিহ্বল নর-নারীর সুরু হয়ে যায় রং-খেলা, হৃদয়ও রঙ্গীন হয়ে ওঠে কল্পনার জালে।

কল্পনায় রাধা-কৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি সজীব হয়ে ওঠে, ব্রজের কুঞ্জে গলিতে-গলিতে গোপবালাদের নূপুরের নিক্কণ ওঠে। অপূর্ব্ব বসন-ভূষণে সুসজ্জিতা সুন্দরী রাধিকা তাঁর সুরসিকা সখীদের নিয়ে চলেছেন রং খেলতে শ্রীহরির সঙ্গে। সখীদের পরনে লালরঙ্গের ঘাগরা, বাসন্তী রং-এর ওড়না, কুঙ্কুম ও বিল্ব-শোভিত মুখচন্দ্রমাকে মেঘের মত ঢেকে রেখেছে। মেখলা রাঙ্গানো চন্দনকলি অঙ্গুলিতে ধরে রেখেছে রং-ভরা পিচকারী, সে অতুল শোভা দেখে পথিকের বিভ্রম লাগে।

ফাল্গুনে-অষ্টমীতে নন্দগ্রামের পুরুষরা বরসানা গ্রামে হোলী খেলতে যায়। নন্দগ্রাম হল শ্রীকৃষ্ণের বাসভূমি, আর বরসানা হল শ্রীরাধিকার। এই হোলী-উৎসবে নন্দগ্রামের যুবকরা রং-আবীর-পিচকারী নিয়ে দল বেঁধে বরসানা গ্রামে গিয়ে নারীদের রঙ্গ গলাগলি হাসি-ঠাট্টায় ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। বরসানার নারীরাও কিন্তু কম যায় না, তারাও হাতে লাঠি নিয়ে তৈরী থাকে, আর যুবকদের হাসা-কৌতুকচ্ছলে লাঠি নিয়ে তাড়া করে, পিঠেও দু-চার ঘা লাগায়। তারপর যখন বরসানার যুবকরা নন্দগ্রামে যায় রং খেলতে তখন সেখানকার নারীরা তার শোধ তোলে বেশ ভাল করে। এইভাবে গ্রাম্যদুটি নৃত্য-গীতে হাসো লাস্যে রঙ্গে গলাগলে সজীব হয়ে ওঠে।

পরণে পীতাম্বর, এক হাতে মুরলী, অন্য হাতে আবীর-গুলাল ও রং-ভরা পিচকারী নিয়ে শ্যাম তৈরী হয়ে আছেন, রাধার সঙ্গে খেলবেন হোলী। সখীরা উৎফুল্ল হৃদয়ে রাধা আর শ্রীকৃষ্ণকে আহ্বান করছে সাদরে রং খেলতে—

প্রথম হি লাল জহার কিয়ো
মৃদুমুরলী বাঁধ বজার,
ইততে কুটিল কটাক্ষন পিয়ন্ত
চিতয়ো মৃদু মুস্কায়।
অরী চল নওল কিশোরী
গোরী, মোরী, হোরী খেলন আয়।

হে লাল, তুমি প্রথমে রং খেলতে সুরু কর। তোমার বাঁশরীতে মধুর সুর তুলে, করতাল বাজিয়ে, নয়নে কুটিল কটাক্ষ হেনে, মৃদু হেসে তুমি রং খেল, ওগো কিশোরী রাধা চল, কিশোরী কুমারীরা এস হোলী খেলতে।

উড়ত গুলাল, লাল ভয়ে বাদর,
আবীর কি ধুন্ধ মচী—

ধীরে ধীরে রং-খেলা সুরু হ'ল, বাসন্তী রং-ভরা পিচকারী চারদিকে ফোয়ারা ছুটাল দিকে দিকে আবীর উড়তে লাগল, আকাশ লাল হয়ে উঠল আবীর আর গুলাল নিয়ে চারিদিকে মাতামাতি সুরু হয়ে গেল।

*

রাধা হোলী খেলছেন। নন্দগ্রামের গোয়াল সখা আর বরসানের কিশোরী প্রীতিরসে স্নিগ্ধ হয়ে পরস্পরে মিলে রং খেলছে, তাদের হৃদয় আনন্দ রসে ভরে উঠেছে— বহু দিনন কে বিছুঠে শ্যাম
চলে হোলী মে মনাই লারো।

বহুদিন পর বিরহের অবসান হয়েছে, মিলনের দিন আগত, চলো আমরা অভিমানী শ্যামের অভিমান দূর করে খুশী করে দি হোলী খেলে।

(ক্রমশঃ)

—কণিক

অঙ্গনা

নিঃসন্তান বর্ষ

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পক্ষ থেকে ১৯৭৬ সালকে ১৯৭৫ সালের মত গুরুত্ব পূর্ণ করে দেওয়া হয়েছে। ১৯৭৫ সালকে কেন্দ্র করে যেমন নারীপ্রগতি অনেকখানি এগোতে পেরেছে তেমনি এ বছরের যে নতুন প্রচেষ্টা বিশ্ববাসী গ্রহণ করেছে তা হচ্ছে সারা বিশ্বের মানুষকে কিছুটা সুখের মুখ দেখাবে। শুধু ভারতবর্ষেই নয় বিশ্বের অধিকাংশ দেশই তাদের জনসংখ্যার ভারে বিব্রত। এই জনসংখ্যাকে সুস্থভাবে বাঁচিয়ে রাখতে হলে চাই উৎপাদনের সঙ্গে জনসংখ্যার এক সমতা রক্ষা করা। অধিকাংশ দেশই এই সমতা রক্ষা করতে গিয়ে হিমসিম। তাই অনাহারে ও রোগে জরাজীর্ণ বিশ্ববাসীকে ভবিষ্যতের সিনগুলির জন্য সচেতন করে দেওয়া হচ্ছে। ভবিষ্যৎ বংশধরেরা যেন সুস্থ ও সবল হয়ে দীর্ঘ-জীবন লাভ করে সেদিকে আজ সব দেশেরই সতর্ক দৃষ্টি। তাই বিশ্বের সামগ্রিক কল্যাণে বিভিন্ন দেশের যুবক যুবতীরা এই বছরটিকে নিঃসন্তান বর্ষ হিসেবে পালন করার শপথ গ্রহণ করেছে।

ভারত দরিদ্র দেশ। এদেশের জলবায়ুর গুণে জন্মের হারও পৃথিবীর মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য। তার সম্পদও সীমিত। দেশের ৫৫ কোটি মানুষকে খাইয়ে রাখা তার পক্ষে দুরূহ ব্যাপার। ভারতে প্রতি বছর নব-জাতকের সংখ্যা দাঁড়ায় ১ কোটি ৩০ লক্ষ এই হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হলে আজ থেকে ২৫ বছর পরে ভারতের জনসংখ্যা ৮০ কোটির ওপরে গিয়ে দাঁড়াবে। তাই দেশের স্বাস্থ্য বিভাগের উদ্বেগের যথেষ্ট কারণ আছে।

বেশ কিছুকাল ধরে সারা ভারতে জন-নিয়ন্ত্রণের ব্যাপক প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে সমাজকল্যাণ দপ্তর থেকে। বিভিন্ন হাস পাতালে নির্বীজকরণের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে, কিন্তু জনসাধারণের সহ যোগিতা ছাড়া শুধু সরকারী আগ্রহ ও প্রচেষ্টায় এ-কাজ সার্থক হতে পারে না। এই সহযোগিতা উচ্চ মানসিকতার ওপরই বহুলাংশে নির্ভরশীল। কেউ যদি সচেতন না হয়, তবে তার ফলভোগ তাকে যতটা করতে হবে, নবজাতককে তার চেয়ে আরো বেশী করতে হবে। কারণ, জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে পর্যাপ্ত রোধ না করতে পারলে বেঁচে থাকার জন্য নবজাতককে আরোও কঠিন সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হবে। সংগ্রামে সে কতটা সফল হবে তাতেও যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে।

কুসংস্কারে আচ্ছন্ন আমাদের দেশের অধিকাংশ নাগরিক, সন্তানের জন্ম দেওয়া তাদের কাছে বিধাতার এক আশীর্বাদ তাই এ-ব্যাপারে প্রকৃতির নিয়মের ওপরে এখনও তারা হস্তক্ষেপ করতে নারাজ বহু সন্তানের জনক-জননী হতেও তাই তাদের কোন দ্বিধা নেই, পরিবার পরি কল্পনার ক্ষেত্রে সরকার পুরস্কার ঘোষণা করা সত্ত্বেও এখনও আশানুরূপ সাড়া মেলেনি। এ জাতীয় নাগরিকেরা জনসংখ্যার ভয়াবহতার কথা ভুলে যায়। তারা ভুলে যায় যে, এদেশের ৬ কোটি শিশু পুষ্টির অভাবে ভুগছে। তারা একথাও জানে না যে, দেশের শতকরা ৭৫ ভাগ শিশুই সুস্থ ও সবল নয় এবং দেশের শতকরা ২১ কোটি ৫০ লক্ষ নিরক্ষর ও অজ্ঞ স্বী-লোকের হাতে শিশুদের শতকরা ৭৫ ভাগ প্রতিপালিত হচ্ছে। শিশু প্রতিপালন সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান নেই বললেই চলে। দরিদ্র ও অশিক্ষিতদের মধ্যে সন্তান বৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা দুর্বার। সাত কন্যার জননী পুত্রের বাসনায় এখনও তারা ছুটে দেবা-লয়ে। অষ্টম গর্ভের সন্তানের জন্ম দিতে পারলে নিজেকে ভাগ্যবতী মনে করে। অনেকের ধারণা প্রথম দিকের সন্তান দের চেয়ে পরের দিকের সন্তানেরা হয় বেশী মেধাবী—এইসব কুসংস্কারের অশিক্ষাই টিকিয়ে রেখেছে। কুসংস্কার ও অশিক্ষাকে পুরোপুরিভাবে দূর করা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার তবে দেশবাসীদের স্মরণে রাখতে হবে যে নারীকল্যাণ ও শিশুকল্যাণ একে অপরের ওপর নির্ভর-শীল। শিশুদের সম্বন্ধে সচেতন না হলে দেশের সামগ্রিক কল্যাণের দিকে আমরা কখনই পা বাড়াতে পারবো না। অনেকে হয়তো প্রশ্ন তুলবেন যে খাদ্যোৎপাদন বাড়ালেই হয়তো এ সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে। কিন্তু খাওয়া ছাড়াও শিশুর জন্য রয়েছে আরও নানাবিধ প্রয়োজন—যেমন বাসস্থান, শিক্ষা পোষাক ও চিকিৎসা। এসব সমস্যাগুলি একইসঙ্গে মেটাতে হবে। তা না হলে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা দেশের অগ্রগতির প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে।

মনে করা যেতে পারে যে যেখানে কয়েক বছর ধরেই তো পরিবার পরিকল্পনার কর্মসূচী ভারতের বিভিন্ন স্থানে পালিত হচ্ছে তবে আবার কেন নিঃসন্তানবর্ষের ডাক?

পরিবার পরিকল্পনার ক্ষেত্র ও পদ্ধতি বিস্তৃত। শুধুমাত্র ভেসেকটমি ও লুপের সাহায্যে সব সমস্যার সমাধান সম্ভব নাও হতে পারে। শুধুমাত্র স্বাস্থ্য-কেন্দ্রগুলিতে বক্তৃতা, সেমিনার প্রদর্শনী ও পুরস্কারের মাধ্যমে এই উদ্দেশ্যকে সিদ্ধ এই দেশের প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া এখনও এক কষ্টসাধ্য ব্যাপার। এই প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য পথও খোলা রাখতে হবে। শিক্ষিত কারিগরীবিজ্ঞানসম্পন্ন জুনস-জননীরা পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রে না গিয়েও পরিবারকে সীমিত রাখতে পারেন। এই সচেতন মা-দের মাধ্যে প্রচার ও উপদেশ দেওয়ার প্রয়োজন নেই। মাত্র এক বৎসর সন্তানের জন্ম না দেওয়ার কথাটা তাঁরা এমনিই পালন করবেন। অনেকে এই প্রতিশ্রুতিকে এক বছরের অধিকও পালন করতে দ্বিধাবোধ করবেন না। এদের মত নিঃসন্তানবর্ষের ডাকে কতটুকুই বা আমরা সাড়া দিলাম তবে একটা সময় দেখতে দেখতেই কেটে যাবে। এক বছর পরে তো এরই সমস্যা আবার দেখা দেবে। এবা সচেতন নাকি? শুধু এদের জন্য নিঃসন্তানবর্ষের আহ্বান করা হয় নি। এই আহ্বানের উদ্দেশ্য দেশের কোটি কোটি অশিক্ষিত মানুষের অন্ততঃ একবছরের জন্য সন্তানের জন্ম দেওয়া থেকে নিরস্ত করা। এই একবছরেই জনসংখ্যা বৃদ্ধির ১ কোটি ৩০ লক্ষকে এভাবে ঠেকিয়ে রাখা যেতে পারে।

নিঃসন্তান বর্ষ মানে সন্তানহীন হওয়া নয়, এর অর্থ অধিক সন্তানসন্ততির জন্ম দিয়ে তাদের পঙ্গু করে দেওয়া থেকে বিরত থাকা। মাত্র এক বছরের টেস্ট কেস হিসেবে ব্যবস্থাটিকে চালু করা যাবে ফলে ভবিষ্যতে দেশের আপামর জনগণ এর কল্যাণ উপলব্ধি করে অহেতুক সন্তানসংখ্যা বৃদ্ধি না করে, জীবিত সন্তানদের আরো বেশী সবল ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী করে গড়ে তুলে দেশের ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বলতর করতে পারে। নিঃসন্তানবর্ষের সার্থক রূপায়ণের জন্য অশিক্ষিতদের মধ্যে শিক্ষার আলো জ্বালিয়ে জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা তাদের উপ-লব্ধি করার সুযোগ দিতে হবে। তাদের মধ্যে চেতনার উন্মেষ হলে ভারতের জন-সংখ্যার ভয়াবহতা অনেকাংশে দূর করা সম্ভব হবে।

অঞ্জলি চৌধুরী

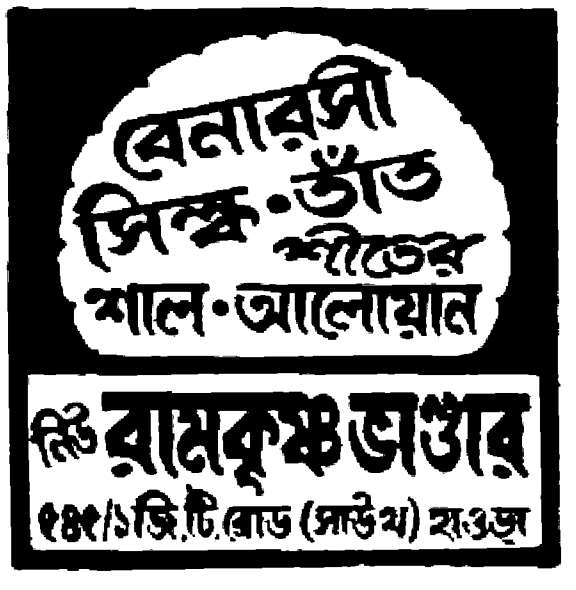

রহস্য ডিনার গান

দিলীপ ভট্টাচার্য

কিছুক্ষণ আগেই রজনীবাবু লক্ষ্মীর ঘর ছেড়ে চলে গেল। এখনো হয়তো সি ড়িতে ওর পায়ের শব্দ মিলিয়ে যায় নি। কাল রাতের অনেক দিন পর রজনীবাবু লক্ষ্মীর কাছে এসেছিল। ভোর না হতেই বেরিয়ে গেল। খুব্রোনো রং-চটা ড্রেসিং টেবিলের আয়নার মধ্যে মাটের ফুটফুটে সাদা বিছানাটা দেখতে পেল লক্ষ্মী। বিছানার চাদরের একদিকটা অনেকখানি ঝুলে গিয়ে ঘরের মেঝেতে ঠেকেছে। বালিশগুলো বিছানার ওপর তালগোল পাকিয়ে জড়ো হয়ে আছে। একটা ঝাপসা আলোকাভাস: গোল ঘরের বাতাসে এখনো ভরা। মাঝে পাশে ছোট টেবিলটার ওপর খালি গেলাস-গুলো। বিছানার দলা-পাকানো চাদরে কত-গুলো ফুল, এরই মধ্যে বিবর্ণ হয়ে উঠেছে। হঠাৎ আয়নার সামনে এসে লক্ষ্মী ওর মুখখানা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। ওর কপালের সাদা টিপটা মুছে গিয়ে একেবারে লেপ্টে গেছে। কালিপড়া বাঁ-চোখের কোল কাজলের কালিতে গাঢ় কালো। মাথার চুল বেসিনাস্ত উসকো-খুসকো। কপালের ওপর থেকে চুলগুলো বাঁ হাতের আঙুল দিয়ে সরিয়ে দিল লক্ষ্মী: নীচের ঠোঁটটা চাপল। ওর রাঙা ঠোঁট দুটো এখন বড় ফ্যাকাসে, রক্তহীন। তবু দিন এ সময় ঘর থেকে রজনীবাবু চলে গেলে লক্ষ্মী ঘরের আলো নিভিয়ে দিয়ে বিছানায় পড়ে থাকে মাতালের মত ঘণ্টা-মুহূর্তের মত ঘণ্টা-মুহূর্ত ধরে বিছানায় পড়ে থাকে। একেবারে বাইরেটা ফর্সা না হওয়া অবধি কিন্তু মোর চোখ বুজে পড়ে থাকে অনেকক্ষণ। আজ কিন্তু অন্য দিনের মত বিছানায় চুপ করে পড়ে থাকতে পারল না সে। বরং আলো নিভিয়ে দিয়ে ঘরের পশ্চিম দিকের জানালা খুলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস ঘরে এল। সেই সঙ্গে কাক আর পাখ-পাখালির কলরব। এখনো বাইরে পাতলা অন্ধকার। পশ্চিম আকাশের শেষপ্রান্তে ছেঁড়া মেঘের ফাঁকে দিয়ে মিলিয়ে আসা ক্লান্ত দাদাটে চাঁদ উঁকি মারছে। মুছে আসা দু-একটা তারা কোন রকমে টিপটিপ করে জ্বলছে। দূরে উঁচু পাকুড় গাছটার মাথায় ঘুঘু ভাকছে

ব বাড়ি থেকে প্রাচই শুনে আসত
তে অনেক জোর জোচোর হয়েছে।
ণ এবার দেখাবে মজা। এসব কথা
ই লক্ষ্মীর মা ভয় পেত। চোখ বড় বড়
কাঁপাগলায় বলত, 'রাখ দিকিনি, এক-
তরে সকলারই দুরোগ পইড়তে হবে:
মনিষ্যি যে ভগমানের রাজ্যিতে।'

বকেল ফুরিয়ে এলে বড় লাল আলার
সূর্যটা পশ্চিম দিকে বস্তীর পেছনে
লের উঁচু চিমনির আড়ালে চলে যেত।
নরম লালচে রোদ তখন লক্ষ্মীদের
ঘের চালে বেয়ে ওঠা লাউলতার গায়ে।
হে রোজ আবদুল খাঁড়োর বড় ছেলে
জ মুরগীগুলোকে তাড়িয়ে ঘরের
নিয়ে যায়। মোরগ-মুরগীগুলো
ও খুব। মাঝে মাঝেই ঝুড়ো ঝুটি-
। মোরগটা তাড়া খেয়ে বাবুদের বাড়ি-
উঁচু পাঁচিলটার ওপর দিয়ে উড়ে
। আজিজ লাঠি নিয়ে ওর পেছনে
ঃ চেষ্টা করত তাকে। মোরগটা
তেই ধরা দিত না। বাবুদের বাড়ির
। বস্তীর শেষে পাঁচিল ঘেঁষা কাঁচা-আম
র নিচু ডাল উঁচু গিয়ে যাবে লাফাত।

সূর্যটা তখন যেন মস্ত বড় সিঁদুর
ড়াত সারা পশ্চিম আকাশ জুড়ে। লাউ
লতার পায়ের পড়ন্ত রোদের লাল
আভাটা ততক্ষণে কাঁচ আমগাছটার ডগে
ডালে পাতায় পাতায়। বড় লাল মোরগটার
তখন টুকটুকে লাল আর ঘন সবুজে
লাগত।

এক-একদিন বড় কামলায় পড়ে
ছোট আজিজুল। সন্ধে ঘোর হয়ে চারদিক
যখন কালচে হয়ে উঠত, তখনই আজি
মোরগটাকে জোর করে ঘর পাঁচিল থেকে
নামাতে পারত। ওদের ছুটোছুটি লাফাদাফি
দেখতে দেখতে লক্ষ্মীর এক-এক সময়
কোন খেয়ালই থাকত না। এক-এক দি
হঠাৎ সন্ধ্যের ঘোর অন্ধকারে লক্ষ্মীর
ঘরে আসত। বিরক্ত হয়ে লক্ষ্মীকে ঝাঁঝি
উঠত, 'কি রে ছুই, মনিষ্যি না ভূত-পেত্নি
ধারা ঘোর নেগে গেল, লক্ষটাও জ্বালাবি না

লক্ষ্মী নিজের বেখেয়ালী জন্যের জ
বড় লজ্জা পেত তখন। তাড়াতাড়ি লক্ষ
জ্বালাবার জন্য রান্নাঘরে ছুটে চলে যেত
মা এবার একটু নরম হোত। হেসে বল

স্কুল লাইব্রেরীর উপযোগী
শিশু ও কিশোর সাহিত্য

সুন্দরবনে সাত বৎসর	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫·০০
কাউবাংলোর রহস্য	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	৫·০০
কাকতাড়ুয়া	দক্ষিণারঞ্জন বসু	৫·০০
বিচ্ছুদের বাহাদুরি	স্বপনবুড়ো	৪·০০
মঙ্গলগ্রহে ঘনাদা	প্রেমেন্দ্র মিত্র	৫·০০
নীলাতিমি	অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়	৫·০০
চার মূর্তি	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	৫·০০
দুরন্ত যাত্রী	ধীরেন্দ্রলাল ধর	৪·০০
হার্মাদ	প্রেমেন্দ্র মিত্র	৪·০০
বিজ্ঞান নির্ভর গল্প	চিত্তরঞ্জন ঘোষাল	৪·০০
কায়াহীনের কবলে	দক্ষিণারঞ্জন বসু	৪·০০
ঘনাদার জুড়ি নেই	প্রেমেন্দ্র মিত্র	৫·০০
আমাজনের অরণ্যে	সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ	৫·০০
বাঘের সিংহের সন্ধানে	শিশির ঘোষ	৫·০০
হট যাও হার্মাদ	দক্ষিণারঞ্জন বসু	৫·০০
রকমারি গল্প	বন্দনা গুপ্ত	৫·০০
শরৎচন্দ্র	মণি বাগচী	৫·০০
কলকাতার কেঁদো	সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ	৫·০০

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের
বাংলার ডাকাত
১ম খণ্ড ॥ ৫-০০ দ্বিতীয় খণ্ড ॥ ৬-০০ ৩য় খণ্ড ॥ ৬-০০

পূর্ণ তালিকার জন্য লিখুন
শৈব্যা পুস্তকালয় : ৮/১সি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—৭৩

Come,
fall in Love

With the beautiful world of
Luxury Cosmetics from
E.S. Patanwala

AFGHAN Beauty Aids

সেদিন বাপু জামা-কাপড়ে আগুন ধরাসনি যেন।'

একটু পরেই ঘরের বড় টিমনিটা ধরিয়ে মহামনিষ বিদ্যালয়ের ক্লাস ফাইভের বইগুলো দেয়াল তাক থেকে নামিয়ে পড়তে বসত সে। ভাই দুটো, কাতু আর গনু তখন পরিচয় প্রথম ভাগ পড়ত, আর শ্লেটে লিখত। সন্ধ্যে উতরে গেলেই বড় রাস্তার দিকে রহমত্তরাণের কয়লার দোকান থেকে একসঙ্গে অনেকগুলো গলার মিলিত একঘেয়ে সুরের 'রামা হো রামা হো' গান আর খেলা-কর্তাদের আওয়াজ শোনা যেত। এ সময় লক্ষ্মীর নিজের পড়ার দিকে যত না মন থাকত, তার চেয়ে অনেক বেশি মন থাকত কাতু আর গনুর পড়ার দিকে। ওরা কেন চুপ করল, কেন লিখছে না, কেন পড়তে পড়তে অন্যদিকে তাকাচ্ছে, ধমকে দিচ্ছে —এ তদারকি আর খবরদারি করতে করতেই সময় চলে যেত।

খাওয়া-দাওয়ার ঝামেলা মিটতে অনেক রাত হোত। এক-একদিন রাত দশটার গাড়ি চলে যাবার পরও ওর মাকে বাবার জন্য বসে থাকতে হোত। শীতের দিনে চারিদিক একেবারে নিঝুম। পুবে আকাশে ওঠা গোল রুপোর থালার মত চাঁদটা। এ সময় মাকে মাকে লোকের মাথা-উঁচু দেয়ালের গাছ-গুলো পেরিয়ে ঠিক বস্তীর মাথার ওপর দাঁড়িয়ে থাকে। লক্ষ্মীর বাবা প্রায়ই মাতাল হয়ে বাড়ি ফিরত। লক্ষ্মী এক-একদিন দরজা খুলেই বুঝতে পারত, ওর বাবা মদ খেয়ে এসেছে। ভুরভুর করছে বাঁকালো গন্ধ। গন্ধটা নাকে এলেই ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে দরজা খুলে দিয়ে সোজা পালিয়ে যেত বিছানার মধ্যে।

পাশের ঘর থেকে জড়ানো যাওয়া টুকরো টুকরো কথা ভেসে আসত। 'শলা মহাদেবের বাচ্চারা এর মধ্যেই লোডিয়ে পড়েছে। কত দব [illegible] এসেছি...'

পরের দিন ভোরবেলা উঠে ওরা কেউ বাবাকে দেখতে পেত না। রাত থাকতেই মাল বয়তে বাজারে চলে যেত তখন সে। কাতু আর গনু অবাক হয়ে ভেবে থাকত আগের রাতে বাবার আনা খেলনা আর জামা-কাপড়ের কথা। লক্ষ্মী ওর জামা বেছে নিয়ে আনন্দে বলে উঠত; দ্যাখ গনু, আমার জামাটা ঠিক বাবুদের বাড়ির বড় মেয়ে ছবির জামার মতো। অহঙ্কারে যেন গলে যেত লক্ষ্মী। ওর চোখ দুটো তখন খুশিতে চিকচিক করত। সেই মুহূর্তে লক্ষ্মীর মনে হতো, বাবুদের বাড়ির মেয়ের সঙ্গে ওর কি আর তেমন তফাৎ!

বস্তীর পাশেই বাবুদের বাড়ির ছেলে-মেয়েদের দেখে লক্ষ্মীরও ওদের মত চলতে ফিরতে সাজতে বেড়াতে ইচ্ছে করত। লক্ষ্মী মাঝে মাঝেই ভাবত, বলতে গেলে ওরা তো এক জায়গাতেই থাকে, তবে ওদের মত সাজতে দোষ কি। তারপর বস্তীর শেষে উঁচু পাঁচিলটার দিকে নজর পড়তেই একটা দীর্ঘশ্বাস ওর ছোট বুকটা থেকে বেরিয়ে আসত। এ সময় কেমন দুঃখ দুঃখ মনে হোত ব্যাপারটা।

লক্ষ্মীর আর একটা দুঃখও ছিল, সেটা ওর বাবাকে কাছে না পাওয়ার জন্য। বাবার সঙ্গে তেমন কথাই হোত না ওর। রাত্তিরে নেশার ঘোরে বাড়ীতে ফিরলে ওর বাবাকে একদম আলাদা লাগে। ওর মা পর্যন্ত ভয়ে ভয়ে থাকে তখন। অসুখ-বিসুখ করলেই বা মাঝে মধ্যে সারাদিন বাড়ীতে থাকত বাবা, একটু ভাল বোধ করলে লক্ষ্মীকে কাছে ডাকত, বিছানার পাশে বসে মাথায় চিরুনি চালাতে বলত। কখনো বা বলত, বাব্বা তো লক্ষ্মী মা, বড় চুল পাক ধরল!

লক্ষ্মীও সে সময় ওর মনে জমে থাকা কথাগুলো বাবাকে বলত। বাবুদের বাড়ীর মেয়ের মত আমার জামা চাই। ঠোঁটে মাখার রঙ, নোকে দেবার রঙও কিনে দিতে হবে।' মেয়ের কথাগুলো বলতে গিয়ে আবদারের সুরে ওর গলার আওয়াজ পাল্টে যাচ্ছে। মা অমনি বলে উঠত 'আসিখেতা! মেয়ের পাওনা-গণ্ডার শেষ নেই মো! এবার চাঁদ পেড়ে তবে ছাড়বে মেয়ে। বাবুদের বড়ীর মেয়ের সঙ্গে পাল্লা নেগেই ছেছে।'

বাপ-ঝির এসব কথা হলেই মা গজ গজ করত খুব।

লক্ষ্মীর বাবা কিন্তু লক্ষ্মীর কথা রাখত। দামী জামা-কাপড়, সাজবার নানা পাউডার, ঠোঁটের রঙ, নোকের রঙ লুকিয়ে লুকিয়ে মানুষটা মেয়ের জন্য আনত। এ সব পেয়ে লক্ষ্মী আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের মুখটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখত। এবার বাবুদের বাড়ীর মেয়ের মত ঠিক সাজব।' নিজের মনেই বলত কথাগুলো। আবার ভাবত, ছবিদের বড় বাড়ীটাতে বস্তীর সবাই বাবুদের বাড়ী বলে। ওদের বাড়ীর বৌগুলোর হাত পা ঠিক মোমের পুতুলের মত। ছবিরও তাই। বাবুদের বাড়ীর সবাই কেমন ঝকঝকে আর ছিমছাম। বস্তীর সবাই ওদের জন্য চোখে রেখে। পটলী পিসী বাবুদের বাড়ী কাজ করে। বাবুদের বাড়ীর কত সব কথা লক্ষ্মী পটলী পিসীর কাছ থেকে শুনত। বাবুদের বাড়ীর কথা বলতে গিয়েই তো একদিন পটলী পিসী লক্ষ্মীর দিকে অনেকক্ষণ এক-দৃষ্টে চেয়েছিল। তারপরই হেসে বলেছিল, লক্ষ্মী, তোর মা গঙ্গার রঙ আর গড়ন, ঠিক বাবুদের বাড়ীর নোকের মত। বাবুদের ছেলেটার সঙ্গে তোর বে দিলে ঠিক হয়।'

'ভাগ' পটলী পিসীর কথায় লক্ষ্মীর সেদিন কি লজ্জাই না লেগেছিল।

সেদিন লক্ষ্মী আর পটলী পিসীর সামনে দাঁড়াতেই পারে নি।

কিন্তু আশ্চর্য, পিসীর সেই কথাটা তার-পর থেকে প্রায়ই মিষ্টি একটা গানের সুরের মত লক্ষ্মীর কানে বাজত। কথাটার মধ্যে অদ্ভুত একটা ভাল লাগার ব্যাপার ছিল যেন। লক্ষ্মী নিজেও আড়ালে যার বার কথাটা কিস ফিস করে বলত। আবার বাবুদের বাড়ীর ছেলে রজনী যখন একবাগ বিস্ময় নিয়ে ওর দিকে মাঝে মাঝে তাকিয়ে থাকত তখন কেমন যেন অনেক লজ্জার মধ্যেও ভাল লাগার সেই মিষ্টি নেশাটা ওকে পেয়ে বসেছিল। রজনীর কানাই লক্ষ্মীর সব সময় সেজে থাকতে ইচ্ছে করত। আড়ালে আবডালে আয়নার সামনে নিজেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখত। ভাবত, বাবুদের বাড়ীর মেয়ের মত আমায় কি দেখতে ভাল লাগছে না? নিজেই ওর গায়ের রঙ, নাক চোখ মুখের আদল দেখে তৃপ্তি পেত, তখন খুশী উপচে পড়ত যেন। সেদিন স্কুলের পথে বাবুদের বাড়ীর বাগানটার সামনে রজনী হঠাৎ গোপনে লক্ষ্মীর হাত ধরে বলেছিল, জানিস লক্ষ্মী, আমি তোকে একদিনও না দেখে থাকতে পারি না। সেদিন রজনীর কথায় লক্ষ্মীর দেহে হঠাৎ যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্মী স্পর্শ-পাওয়া লজ্জা-বতী লতার মত কুঁকড়ে ছিল। মাটির থেকে চোখ তুলতেই পারছিল না। বাবুদের বাড়ীর সেই ছেলে যাকে কিনা লক্ষ্মী স্বপ্ন-রাজ্যের পুরুষ মনে করে, সেই কিনা লক্ষ্মীকে না দেখে থাকতে পারে না বলছে! এ যে লক্ষ্মী কল্পনাও করতে পারে না। স্বপ্নেও ভাবতে পারা যায় না বস্তীর মেয়ে লক্ষ্মী আর বাবুদের বড় বাড়ীর ছেলে রজনী—এত কাছাকাছি এত সহজে নেমে আসতে পারে। এক রাজপুত্র আর এক ভিখিরীর মেয়ের সেই গল্পটা লক্ষ্মী কত-বার ওর ঠানদার মুখে শুনেছে। গল্প আবার সত্যি হয় নাকি? আশ্চর্য এত অল্প সময়ে, এমন মিলে যায় সব!

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তখন প্রায়ই এসব কথা ভাবত সে। আর তখন মন হোলপাড় করত ওর। সব সময়ই সেজেগুজে ছিমছাম থাকতে ইচ্ছে করত। সেজেগুজে কোলান আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে সাজত। কাজললতা থেকে কাজল নিয়ে ওর বড় চোখ দুটোকে আরও বড় বানিয়ে তুলত, তখন নিজেই আবিষ্কৃতে নিজেকে দেখে ফিস ফিস করে প্রশ্ন করত, বাবুদের বাড়ীর

বঙ্গশ্রী
হাওড়া
৪১/১, জি, টি, রোড, হাওড়া
• বেনারসী
• জেড • সিল্ক
• তাঁত • মিল
• পোষাক
• সাড়ি • সুট
ও ছিট কাপড়

মেয়ে হবি—রজনীর বোন. আমার চেয়ে দেখতে ভালো?'

নিজের রূপের জন্য তখন ওর বেশ দেমাক ছোত। তারপর গুনে গুনে কয়ে সবে দেখা সিনেমার একটা গানে গাইতে গাইতে ছাপাড়ের সঙ্গে মানিয়ে টিপ আঁকত কপালে। খুশীতে এবং আবেশে বার বার চোখ বন্ধ করত আর খুলত। তারও পরে সুযোগ বুঝে এক সময় লুকিয়ে বড় বাড়ীর পেছন দিককার বাগানে গাছের ছায়া ফেলা নির্জন পথে ওরা দুজনে এসে জুটত। ওখান থেকে নোকের ছায়া ছায়া রূপসে একসঙ্গে কত পথই তো চলেছে দুজনে। লক্ষ্মীকে তখন দেখলে কেউ ভাবতেই পারত না যে ও বস্তীর নয় গাইনের মেয়ে, বরং ওর চটক দেখলে লোকে অবাক হয়ে যেত।

তবু লক্ষ্মী রজনীর সঙ্গে যেমন কথা বলতে পারত না। কিন্তু বলতে চাইত। অথচ রজনীর সামনে এলেই সব কেমন যেন গুলিয়ে যেত। তার একটা বড় কারণ বাবুদের বাড়ীর বড় ছেলে রজনী যে কলেজে পড়ত, বড় পড়া লেখা করে। বড় ঘরের ব্যাপার! আর লক্ষ্মীকে তো কবেই ওর মা স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। জানা ছেড়ে বাড়ী ধরতেই মা একদিন স্কুলে যাবার সময় পেছন দিক থেকে বলল, এত লেখা-পড়ায় কি হবে? যত সব আদিখ্যেতা!

ওরও তাই মত। আদিখ্যেতাই বটে। ওর কি আর লেখাপড়া হোত। ওসব বাবুদের বাড়ীর ছেলেই পারে। সাজতে সাজতে কত-বার এ কথাগুলো ভেবেছে লক্ষ্মী। ছবিকে একগাদা বই নিয়ে যখন স্কুলে যেতে-আসতে দেখত, তখন লক্ষ্মী অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকত। ভাবত, এত পড়ার চাপ ওর সইবে? ওর লেখাপড়া ছেড়ে দেবার ব্যাপারটা রজনীর কিন্তু প্রথম দিকে মোটে একটা পছন্দ ছিল না। তাছাড়া স্কুলে যাবার পথে ওর সঙ্গে দেখা করার ব্যাপারটা আগে যেমন সহজ ছিল, তেমন সহজভাবে রজনী লক্ষ্মীর সঙ্গে পরের দিকে আর দেখা করতে পারত না। স্কুলের পথ ছেড়ে লক্ষ্মীকে রজনী কত জায়গায় নিয়ে গেছে! কত দূপুরেই পথ চলেছে ওরা শহরের নারিকেল ঘেরা ছড়ানো পার্কের পথে। নরম ঘাস বিছানো লেকের জল-ছোঁয়া জমিতে কত দূপুর বিকেলেই তো ওরা পাশাপাশি বসেছে।

লক্ষ্মীর কল্পনা রাজ্যের রাজপুত্রই ছিল এই রজনী। বাবুদের বাড়ীর ছেলে রজনী ওর সঙ্গে পাশাপাশি হাঁটছে, গল্প করছে! আশ্চর্য, এ যেন স্বপ্ন ছিল তার কাছে। এই স্বপ্নের ঘোরেই বুঝি লক্ষ্মী বড় বাড়ীর ছেলে রজনীর সঙ্গে একদিন দুপুরবেলা লুকিয়ে বস্তী থেকে পালিয়ে-ছিল। পালিয়ে গিয়ে আনন্দে আহ্লাদে রজনীর সঙ্গে মিলে মিশে এক হয়ে গিয়ে-ছিল।

পালিয়ে ওরা কলকাতা ছেড়ে সোজা শিয়ালদহের গিয়ে উঠেছিল। সেখানে অনেক দিন এক সঙ্গে বসবাস করেছে ওরা। রজনী সত্যি সত্যিই মাতালের মত লক্ষ্মীকে উড়িয়ে নিয়ে গেছে। উল্কার মত ছুটিয়েছে। লক্ষ্মীর কাছে রজনীকে পাওয়া ছিল পরম তৃপ্তি। মস্ত গর্ব আর সুখে, হঠাৎ যেচে আসা যৌবনের ঢেউ যেন রজনীর কামনার সমুদ্রতটে বার বার আছড়ে পড়তে চেয়েছে। রজনীর কামনার আগুনে পতঙ্গের মত লক্ষ্মীর যৌবন ঝাঁপ দিয়ে জ্বলতে পুড়তে মরতে চেয়েছে।

অনেক রাতের যৌবনের বিনিময়ে লক্ষ্মী রজনীকে জয় করেছে। বাবুদের বাড়ীর ছেলে ওকে ভালবাসে, ওকে কোন দিন ছেড়ে যাবে না—এ এসব স্বপ্ন এত তাড়াতাড়ি মাটা হয়ে উঠতে পারে, এ যে লক্ষ্মী কখনই ভাবতে পারত না। ওর বাবার বেসের মাঠে টাকা জিতে যাবার আনন্দটা লক্ষ্মী যেন হঠাৎ বুঝতে পারল। বুঝতে পারল, ভাগ্যে থাকলে মানুষ কত অল্পেই রাজরাণী হয়। রজনীর ভালবাসা, এ তো রাজার ভালবাসা!

অনেক দিন শিয়ালদহের কাটাবার পর টাকা-পয়সার টান ধরল। রজনী তখন লক্ষ্মীকে নিয়ে কলকাতায় ফিরল।

বালীগঞ্জের রেল লাইন পেরিয়ে কলবার ভেতর দিকে লক্ষ্মীর জন্য রজনী বাড়ী নিয়েছে।

লক্ষ্মীকে রেখে রজনী হঠাৎ একদিন নিজের বাড়ীতে গিয়েছিল। নিজেদের বড় ব্যবসা। রজনী বাড়ীর বড় ছেলে। অনেক দিন পর বাবা-মা রজনীকে পেয়ে তো মহা-খুশী, ছেলে ঘরে ফিরল। কিন্তু লক্ষ্মীর আর ফেরার পথ ছিল না। ঘরছাড়া মেয়ের কাছে চিরকালের জন্যই বুঝি ঘরের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। তাছাড়া লক্ষ্মীর ঘর ছাড়ার পরই নাকি নতুন গাইন ওর বৌ আর দুই ছেলে নিয়ে বস্তী ছেড়ে চলে গিয়েছিল। রজনী এসে হঠাৎ একদিন লক্ষ্মীকে বলে-ছিল, তোদের সেই বস্তীটা প্রায় উঠেই গেছে। গংগার ধারটায় আর নেই। সেখানে নাকি বড় বড় বাড়ী হবে। কথাটা আচমকা শুনে লক্ষ্মীর বুকের ভেতর ব্যথায় টন টন করে উঠেছিল। সব শেষ হয়ে গেছে? বড় বড় চোখ তুলে হতাশায় সুরে লক্ষ্মী রজনীকে জিজ্ঞাসা করেছিল।

হ্যাঁ হ্যাঁ, ভালই হয়েছে। রজনীর গলার স্বর কেমন যেন রুক্ষ শোনাল।

কিন্তু লক্ষ্মীর হঠাৎ মনে পড়ল বস্তীর মানুষগুলোর কথা। গণ্ডা, আবদুল বুড়ো, ভোলাকাকা, পটলী পিসী, নিতাই নিমাই-এর মা। কথাটা শুনে সবার জন্য মনটা খারাপ হয়ে গেল তার। শীতের দিনে বাড়ীর ভাঙা পাঁচিল ডিঙিয়ে রোদের ফালি বারান্দায় আসত। কাড় আর গুল এক একদিন ঐ রোদটুকুর জন্য কত ধাক্কা-ধাক্কি করত। কলের জলধরা নিয়ে কত কথা হোত। আবদুল বুড়োর ঘরের সামনে প্রায়ই বাঁদর নাচ হোত। বস্তীর এ রকম অনেক পুরনো কথা মনে পড়ল লক্ষ্মীর।

রজনী কাছে এসে সোহাগভরে জিজ্ঞাসা করল, কি ভাবছিস রে?

লক্ষ্মী অনেকক্ষণ কোন কথা বলতে পারছিল না। শুধু একটু পরে ভয়ে ভয়ে আর আস্তে আস্তে বলেছিল, আচ্ছা আমাদের যে হবে না? পরেশের সামনে...

ওর কথা শুনে রজনী সেদিন হো হো করে হেসে উঠেছিল। তারপর যেন লক্ষ্মীর কথাটার কোন অর্থই হয় না এ রকম ভাব করে ঠাণ্ডা গলায় বলে উঠেছিল, যে আর এখন কি হবে রে,—সবই তো হয়ে গেছে। এখন আবার ন্যাকামো কেন বাবা!

শেষের কথাটা বলার সময় রজনীর মুখভঙ্গী কেমন যেন লক্ষ্মীর বুকে ছেঁচি কাটার মত লাগল।

লক্ষ্মীকে মন্ত্র পড়ে বিয়ে রজনী কোন দিন করল না। কিন্তু রজনী মন্ত্র পড়ে ওদের সেই বড় বাড়ীতে আর একজনকে যে মহাসমারোহে বিয়ে করে এনেছিল একথা পরে লক্ষ্মী জানতে পেরেছিল।

লক্ষ্মীকে কলবার এ বাড়ীতে দুজনে বিয়ের ওপর তদারকীর ভার দিয়ে রজনী আজকাল প্রায় নিশ্চিন্ত। এখানে খুব কম আসে এখন। মাঝখানে একবার শক্ত এসে-ছিল জ্বর নিয়ে। সাত দিন সাত রাত খাওয়া নাওয়া আর ঘুম ভুলে রজনীকে সেবা করে ভাল করেছে লক্ষ্মী। রজনী ভাল হবার পর আনন্দে লুকিয়ে গিয়ে সে কালী মন্দিরে পুজো দিয়ে এসেছে। ওর মঙ্গল কামনা করেছে। রজনী ছাড়া লক্ষ্মীর আর কেই বা আছে সংসারে।

লক্ষ্মীর সমস্ত সাধ আহ্লাদ সবই তো রজনীকে ঘিরে। আজকাল মানুষটাকে সব সময় কাছে কাছে রাখতে ইচ্ছে করে। বড় খাটুনী মানুষটার। এত খাটুনীতে কি আর কারুর শরীর ভাল থাকে। আজকাল লক্ষ্মীর বড় মন খারাপ লাগে রজনীর জন্য। একে নিজের বড় কারবার দেখা। কাজ কি কম! তার ওপর আবার পাঁচ-জনের পাঁচ কাজের ঝাটুনী। রাজার জন-মনিষ্যির কামলা খাটি যেন এই এক-জনেরই মাথায়। লক্ষ্মী ওর কাজের খাটুনীতে মাঝে মাঝে বড় বিরক্ত হয়। আর বড় হবার কামলা কি কম! রজনীবাবুর এখন কত মান, কত যশ! বাবুদের বাড়ীর সেই বড় ছেলে রজনীবাবুকে আজ শহরে কে না চেনে? সারাক্ষণই লোকটার কাজ আর কাজ। এখন কি আর লক্ষ্মীর জন্য এত ভাববার সময় আছে তার। মানি গুনি মানুষের হুট হুট করে এখানে এলেই হল? কথাটা মনে আসতে একটা বুকভাঙা দীর্ঘ-শ্বাস ফেলল সে।

হঠাৎ জানালার পাল্লার ফাঁকে কাকটা জোরে ডেকে উঠতেই লক্ষ্মীর চমক ভাঙল। সহসা ওর হুঁস হল যেন। এবার জানালা দিয়ে রোদের আকাশটা দেখল। মেঘলা আকাশ। এখনো রোদ ওঠে নি। চারি-দিক কেমন থমথম, মুখভার

মেঘলা আকাশ দেখতে দেখতে হঠাৎ আজ লক্ষ্মীর মনে হোল বস্তী আর বাবুদের বাড়ীর প্রাকখানের সেই লম্বা পাঁচিলটা এখনো ঠিক যেন আগের মতই আছে। পাঁচিল-ঘেঁষা ভাঙাচোরা সেই আর গাছটা এত দিন পরে আবার রূপসী হয়ে বাবুদের বাড়ীটা এক দম আড়াল করে দিয়েছে। বস্তী থেকে বুঝি আর দেখাই যায় না।

CENTRAL LIBRARY

পার্থ থেকে বলছি

হার্ডলার রঞ্জন

অ্যাথলেটিকসে সোনা

রোদ-বৃষ্টি, জল-ঝড়, ভাপসা গরম হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডা, কোনো কিছুতেই ভ্রুক্ষেপ নেই। শরীরের নাম মহাশয়, হিসেব করা ক্রিয়াকলাপ তো বটেই, সেই সঙ্গে প্রকৃতির যে-হিসেবী হেরফেরকে নিজেদের ধাতে সইয়ে নেওয়ার জন্যে ওঁরা কোমর বেঁধেছেন। লক্ষ্য সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া। আন্তর্জাতিক এই কাজে অ্যাথলেটিকসের উঁচু মানে দাঁড়িয়ে ওঠা। এই লক্ষ্যে পৌঁছতে ওঁরা নিরন্তর মেহনত করছেন। মস্তিষ্কের প্রেরণার সঙ্গে পরিশ্রমের সমন্বয় ঘটাচ্ছেন। ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, আরাম-বিরাম, আমোদ-আহ্লাদ সব কিছুই আপাতত শিকেয় তোলা। এখন শুধু খেটে যাওয়ার তাগিদ। একেই তো বলে সাধনা।

এমন সাধনরতী দৃষ্টান্ত দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। দেখতে চলো তো চলে কলকাতার গড়ের মাঠের এক কিনারে। গড়ের মাঠ কলকাতার ক্রীড়ামহলের প্রাণকেন্দ্র। ঘাসের দাপাদাপিতে মাঠকে আজ কিশোর করছে। কখনো ফুটবলের, কখনো ক্রিকেটের, আবার কখনো হিমঘরের লোহালক্কড়ের সারা পরিপার্শ্ব সেজেছে। কিন্তু আলোর দুনিয়ায় যেখানে নিরন্ধ্র সেখানে প্রাণের সাড়াশব্দের শেষ নেই। অঞ্চলটি অপেক্ষাকৃত শান্ত। নিরিবিলি। সাধনার উপযুক্ত তীর্থ ভূমি বটে। সেখানেই ওঁরা নিজেদের কাজে নিজেদের ডুবিয়ে রেখেছেন। হুঁক, ক্রিকেট ফুটবল নিয়ে অন্যেরা মাথা ঘামাচ্ছেন। কেউ আবার মাথা ফাটাফাটিও করছেন। কিন্তু তাতে ওঁদের কিছু যায় আসে না। ওঁরা মেতেছেন অ্যাথলেটিকস চর্চায়। মাথার উপর বাজ পড়লে, বিশ্বসংসারের সর্বনাশ ঘনিয়ে এলেও বুঝি ওঁদের তপস্যা ভঙ্গ হবে না।

খোলা মাঠের খেলায় অ্যাথলেটিকসই হলো আদ্যাশক্তি স্বরূপা। তবুও পশ্চিম-বাংলায় অ্যাথলেটিকসের তেমন প্রচার নেই। তাই একজন প্রথম সারির ক্রিকেটার বা ফুটবলারের নামোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই সবাই তাঁকে চিনে নিতে পারেন। কিন্তু যদি বলি, সুব্রতা দেবনাথ আর রঞ্জয় রায় কে? তাহলে হয়তো এই বাংলারই

লঙ্ঘনে সুব্রতা

তথাকথিত অনেক কৃতীনুরাগীই মাথা চুলকে স্মৃতির কোটরে হানা দিয়ে ঘুরে বেড়াতে শুরু করে দেবেন। তবে বিস্মরণের আড়ালে থাকতে হচ্ছে বলে সুব্রতা, ও রঞ্জয়ের কোনো দুঃখ নেই। অন্যদের মুখের দিকে না তাকিয়েই তাঁরা নিজেদের কাজেই আত্মস্থ হয়ে আছেন। প্রতিদিনের অভ্যাস ও অনুশীলনে তাঁরা নিয়োজিত। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কল্যাণে নতুনতর পাঠও তাঁরা গ্রহণ করছেন। পাচ্ছেন উচ্চতর শিক্ষাও।

ময়দানের ওই অঞ্চলটি কলকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার সীমানা হিসেবে চিহ্নিত। ওখানে প্রতি অপরাহ্ণে জড়ো হন একপাল তরুণ-তরুণী। কোনো প্রচারের মোহ তাঁদের টানে নি। মাঠের দিকে তাঁদের টেনেছে অন্তরের তাগিদ। এগিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখেন বলেই ওঁরা এসেছেন মাঠে। লাফালাফি, ছুটোছুটি করে নিজেদের প্রাণ-শক্তিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বাড়তি প্রাণের ঠিকানা জেনে নিচ্ছেন। গুটিকয়েক চরিত্রের সমাবেশ ওখানে। তাঁদের ভীড় ঠেলে আজ কেন যে শুধু সুব্রতা ও রঞ্জয়কে বেছে নিচ্ছি, তারও এক অংবহ কারণ আছে।

আমরা জানি, সর্বভারতীয় অ্যাথ-লেটিকসের সিনিয়ার আসরে বাংলার প্রতিষ্ঠা তেমন নেই। দুনিয়ার মহফিলে বাংলা অগ্রগণ্য। কিন্তু বাংলার সিনিয়ার অ্যাথ-লিটদের ভাগ্যে সোনা রূপা, এমন কি ব্রোঞ্জ আঁকা তিলক জোটে বড়াচিৎ। এ হেন পরিস্থিতিতে সুব্রতা ও রঞ্জয় যেন ব্যতিক্রম: সর্বভারতীয় অ্যাথলেটিকসে পশ্চিমবাংলার প্রত্যাশা পূরণে তাঁরাই কিছুটা সফল। হয়তো তাঁরা শিবরাত্রির সলতে। কিন্তু মশাল যে কলকাতায় জ্বলছেন, তাই বা অস্বীকার করবে কে?

ওঁদের সাফল্য বা স্বর্ণ সঞ্চয়ের নজীর।

সহাস্ত অতর্কিত ও বিক্ষিপ্ত ঘটনা নয়। বছরের পর বছর ওঁরা নিজেদের বিভাগের স্বর্ণপদকটি নিজেদের অধিকারে রেখে দিয়েছেন। ১৯৭৩ (হায়দরাবাদ) ও ১৯৭৬ (পালাই)-এর জাতীয় অ্যাথলেটিকসের স্বল্পপাল্লার হার্ডল দৌড়ে রঞ্জয়ই চ্যাম্পিয়ন। আর সুব্রতা তো ১৯৭০ সাল থেকেই শটপুটের স্বর্ণপদকটি নিজের গলায় ঝুলিয়ে রেখেছেন। ওই সম্পদ তাঁর কাছ থেকে আজ পর্যন্ত কেউ ছিনিয়ে নিতে পারেন নি। ডিসকাসেও একদিন তাঁর সুদিন ছিল। কিন্তু ১৯৭৪ সালে অনুসয়ার চালেঞ্জের চাপে সুব্রতাকে ডিসকাসে একধাপ পিছিয়ে পড়তে হয়। কিন্তু শটপুটে সুব্রতার জুড়ি আমাদের দেশে কেউ নেই। বিবাহিত জীবন তথা সংসারে জড়িয়ে পড়ার পরও কোনো ছেদ পড়েনি। শটপুটে সুব্রতা এখনো যেন আরও পাকা হাতের ছাপ রাখছেন। ১০-১৩ মিটার অবলীলায় করেছেন এবং একই বছরে বারদুয়েক জাতীয় রেকর্ড গড়েছেন সুব্রতা কুমারী জীবনকে পেছনে ফেলে আসার পরই, জীবনসঙ্গী বিজয় দেবনাথও ছিলেন নামী খেলোয়াড়। বয়সের অঙ্কে এগিয়ে থাকার পর সুব্রতা যাতে তাঁর ক্রীড়া-জীবনের সঙ্গে আড়ি পাতিয়ে না বসেন তার দিকেও বিজয়ের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আছে।

সাধারণ বাঙালীর ঘরের মেয়ে সুব্রতা শারীরিক সম্পত্তিতে অসামান্যা। যেমন দীর্ঘাঙ্গী, তেমনই মজবুত শরীর। তার লোহাগোলক ও ডিসকাস ছোঁড়াছুঁড়ির অভ্যাস নিয়মিত। সেই অভ্যাসের পরিণামে পেশীগুলিও পুষ্ট ও সুগঠিত। বিশ্ব রূপসীদের অধিকারিণী তিনি। এমন দীর্ঘাঙ্গী ও সুগঠিত শরীর বাঙালী মহিলা সমাজে প্রায় বিরল। বড়সড় চেহারা তাঁর সম্পদ, অথচ এই চেহারার জন্যেই একদিন তিনি হাত-পা গুটিয়ে ঘরের মধ্যে বসে থাকতে চেয়েছিলেন। বেলাধুলো করলে পাছে 'ধিঙ্গি'পনার অপবাদে চারিদিকে দুয়ো পড়ে যায়, এই ভয়ে সুব্রতা ছেলেবেলায় মাঠমুখো হতে চাইতেন না। হঠাৎ কলেজের বার্ষিক ক্রীড়ায় একদিন পাঁচজনের পেড়াপিড়িতেই শটপুটে নাম দিয়েই প্রথম প্রচেষ্টাতেই প্রথম হয়ে বসেন। তারপরই সুব্রতার জীবনের মোড় ঘুরে যায়। সেই থেকে ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশনের সোদনের ছাত্রীটি ধাপে ধাপে এগিয়ে গিয়ে সারা ভারতের অ্যাথলিট কুলের সামনের সারির আসনটি দখল করে নিয়েছেন। অ্যাথলিট হিসেবে গড়ে ওঠার মুখে প্রাক্তন অ্যাথলিট চিত্রা ব্যানার্জিই ছিলেন সুব্রতার প্রেরণার উৎস, আর হাত ধরে শিখিয়েছেন, অনুশীলন করিয়েছেন বালীর সুনীল চ্যাটার্জি। আদিগুরু সুনীলবাবুই। পরে বেশ কিছুদিন সুব্রতা কোচ জি কে মেননের তত্ত্বাবধানে ছিলেন।

সুব্রতা ভারতীয় দলের সঙ্গে বহির্ভারতও সফর করেছেন। তবে নামমাত্র একবারই। সেবার সিঙ্গাপুরে কেতা-দুরস্ত অ্যাথলেটিকসে অংশ নিয়ে সুব্রতা নিজের বিভাগে ব্রোঞ্জ পদক পান। ১৯৭০-এ ভারত-শ্রীলঙ্কা দ্বৈত অ্যাথলেটিকসেও সুব্রতা হয়েছিলেন তৃতীয়। ১৯৭৪ সালে এশীয় ক্রীড়াভূমিতেও তাঁর হাজির থাকার কথা ছিল। নির্বাচনী অনুষ্ঠানে যোগ্যতার পরিচয় রেখে সুব্রতা তেহেরানগামী ভারতীয় দলভুক্তও হন। কিন্তু তারপরই নেপথ্যের কোন অলিগলিতে সুব্রতা টানা-টানির সূত্রে তিনি হলেন দলছুট। আর দলের সেই ফাঁকটুকু পূরণ করা হলো অতিরিক্ত একজন পুরুষ অ্যাথলিটকে দিয়ে। দল বিন্যাসে এই পরিবর্তন রীতিমতো বিস্ময়কর। মনোনীতা এক মহিলার বদলে দলে ঢুকে পড়লেন জনৈক পুরুষ। এমন সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড আর কখনো ঘটেছে কি? কর্তাদের কাণ্ড দেখে সুব্রতা শুধু অবাকই নন, কিছুটা ক্ষুব্ধও বৈকি। অনুযোগের সুরে তাই মাঝে মাঝে বলে বসেন, 'আমার জন্যে, পশ্চিমবাংলার অ্যাথলিটদের জন্যে বাংলার বুঝি কেউই নেই!'

অভিমানটি রঞ্জয়ের কণ্ঠেও প্রতিধ্বনিত হয়েছে। দৃষ্টান্ত দিয়ে রঞ্জয় বলেছেন যে সাদার্ন রেলের লক্ষ্মণ যে নিজেদের অ্যাথলিটদের সম্পর্কে কতো কি করেন তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। পশ্চিমবাংলার অ্যাথলিটরা যদি কর্মকর্তাদের বরাদ্দ পৃষ্ঠপোষকতা পেতেন তাহলে ভাগ্যের কাছে তাঁরা কৃতজ্ঞ হয়ে উঠতেন। কিন্তু কি দুর্ভাগ্য, এমন সহৃদয় পৃষ্ঠপোষকতা যেন পশ্চিমবাংলা ছাড়া অন্য অঞ্চলের অ্যাথলিটদের জন্যেই সংরক্ষিত। পশ্চিমবাংলার অ্যাথলিটদের কপালে বুঝি বঞ্চনা ও অবহেলাই জমে আছে।

বরাতক্রমে সুব্রতা তেহেরান যেতে না পারলেও শ্রীরূপা চ্যাটার্জি সেখানে গিয়ে-ছিলেন। শ্রীরূপাও পশ্চিমবাংলার মহিলা অ্যাথলিটকুলের গর্ব। সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় শ্রীরূপা অবশ্য সুব্রতার মতো স্বর্ণ সঞ্চয়ের ধারাবাহিকতায় সফল নন। তবে তিনি ১৯৭৫ সালে লুধিয়ানার মুক্ত অ্যাথলেটিকসের জাতীয়তার দৌড় শীর্ষস্থান পাওয়ার পথে জাতীয় রেকর্ড (১২-২ সেঃ) স্পর্শ করেছিলেন। সর্বভারতীয় অ্যাথলেটিকসের মানের পরিপ্রেক্ষিতে সুব্রতা ছাড়া বলতে গেলে পশ্চিমবাংলার মহিলা অ্যাথলিটদের মধ্যে একা শ্রীরূপাই সুসমঞ্জস। অনন্তা চ্যাটার্জি, সাবিত্রী সরেরা তেমন মানানসই হতে প্রশংসনীয় চেষ্টা করছেন সত্যি। তবে ওঁরা এখনও সুব্রতা-শ্রীরূপার প্রতিচ্ছবির নাগালে পৌঁছতে পারেন নি। কাজটা রীতিমতো কঠিন। অপরিমিত কর্ম-পর্বের সমন্বয় ছাড়া সে কাজ করে ওঠা যাবে বলে মনে হয় না।

রঞ্জয় রায়ও বালীর ছেলে। সুব্রতার মতো তিনিও অ্যাথলেটিকসে প্রথম পাঠ নিয়েছেন সুনীল চ্যাটার্জির কাছে। পরে তাঁর প্রশিক্ষণের দায়িত্ব নেন এন আই এস কোচ সুধীর পাল। পালইয়ে জাতীয় অ্যাথলেটিকসের সিনিয়র বিভাগে বাংলার মাত্র দুজন প্রতিযোগী স্বর্ণপদক পেয়েছেন —দুশ মিটার দৌড়ে ও এন টমাস ও স্বল্প-পাল্লার হার্ডল দৌড়ে রঞ্জয় রায়। এঁদের মধ্যে রঞ্জয়ই হলেন এই বাঙলার খাঁটি সন্তান। কারণ টমাস কদিন আগেও ছিলেন বিহারের প্রতিনিধি, চাকুরীর সূত্রে পশ্চিম-বাংলায় স্থানান্তরিত হয়েছেন বলেই আন্তঃ রাজ্য বা জাতীয় অ্যাথলেটিকসে এবারেই সর্বপ্রথম বাংলার প্রতিনিধিত্ব করেন।

রঞ্জয় এখন ভারতশ্রেষ্ঠ হার্ডলার। স্বল্পপাল্লার হার্ডল দৌড়ে তাঁর সেরা সময় ১৪-৮ সেকেণ্ড। অথচ তাঁর অ্যাথলেটিক জীবন শুরু হয়েছিল জাম্পার হিসেবে। তখন তিনি লংজাম্প ও ট্রিপল জাম্প করতেন। সুনীল চ্যাটার্জির পরামর্শেই রঞ্জয় হার্ডলের দিকে ঝোঁকেন। ১৯৭১-এ আমেদাবাদে হেপ্টাথলনের হার্ডল দৌড় দেখে রঞ্জয় প্রায় মুগ্ধ হয়ে যান। দৌড়বার লাফাবার, বাধা ডিঙিয়ে হেপ্টাথলনকে তরতরিয়ে এগিয়ে যেতে দেখে রঞ্জয়ের হার্ডলার হবারই সাধ জাগে। সেই সাধে উৎসাহ যোগান সুনীল চ্যাটার্জি। সুনীলের চোখ ছিল জহুরীর মতো। ট্রিপল জাম্প করার সময় রঞ্জয়ের মেরুদণ্ডের বাঁক লক্ষ্য করে সুনীল বুঝেছিলেন যে এই ছেলের হার্ডল দৌড়েই সম্ভাবনা বেশি। কাজেই মনের সাধ মিটিয়ে ফেলতে তিনি রঞ্জয়কে কোনো বাধাই দেন নি।

কোচ সুধীর পালের সম্মতি নিয়ে রঞ্জয় ১৯৭৩এ রাজ্য অ্যাথলেটিকসে সর্ব-প্রথম হার্ডল দৌড়ে অংশ নিয়ে প্রচেষ্টাতেই নতুন রেকর্ড করেন [redacted] বিভাগে। সমকালীন উঠতি অ্যাথলিট বিকাশ পাল সেই বছরে রঞ্জয়কৃত রেকর্ডটি ডিঙিয়ে গেলেও ১৯৭৩ এর জাতীয় অ্যাথলেটিকস উপলক্ষে দুর্গাপুরের আসরে

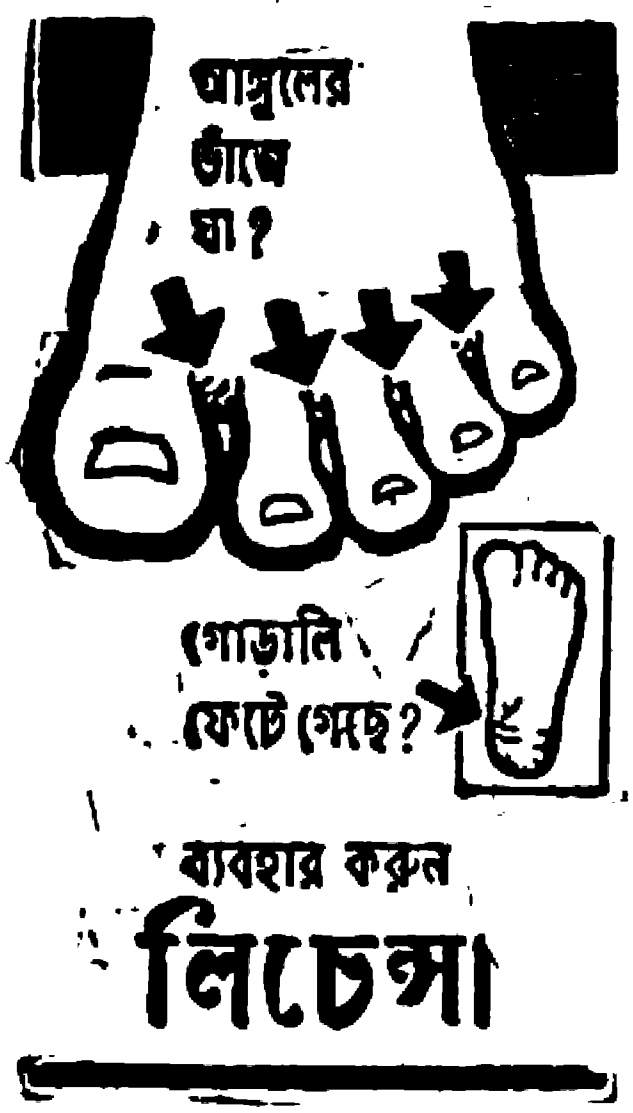

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

শরৎচন্দ্রের

পথের দাবী ঃ বাজেয়াপ্ত ও রাহুমুক্তি

টেগার্টের চিঠি—ইংরেজ চিফ সেক্রেটারীর কাছে, বাজেয়াপ্ত করার বিষয়ে গেজেটে বিজ্ঞপ্তি, কাউন্সিল চেম্বারের সমর্থনসূচক চিঠি।

রাহুমুক্তির ব্যাপারে ১৯৩৭ সালে অ্যাসেমব্লিতে প্রশ্নোত্তর, ১৯৩৯ মার্চে রাহুমুক্তির গেজেট বিজ্ঞপ্তি। সঙ্গে আনুষঙ্গিক নথি ও ফটো, এবং তথ্যমূলক আলোচনা।

লিখছেন

প্রমোদ মুখোপাধ্যায় (ডঃ)

রঞ্জয় ষোল পদক পান। ১৯৭৪এ সিনিয়ার হিসেবে এক জি লেভিস রাজ্য রেকর্ড ১৫-১ সেঃ) স্পর্শ করেন এবং একটি বছর ঘুরতে না ঘুরতেই ১৪-৮ সেকেন্ড নির্ধারিত পথ অতিক্রম করে নতুন রাজ্য রেকর্ড গড়ে দেন।

১৯৭৫ ও ১৯৭৬, পর পর দু বছরই রঞ্জয় স্কুলপাঠ্যায় হার্ডল দৌড়ে ভারত-শ্রেষ্ঠের স্বীকৃতি পেয়েছেন। তবুও তাঁর ভাগ্যে এখনও বিদেশ যাওয়ার সুযোগ আসে নি। গত বছরে সেই সুযোগ অল্পের জন্যে তাঁর হাতছাড়া হয়ে গেছে। সাধারণ ছেলের লক্ষ্মণের মতো কোনো অতিমানবীয় দৈহিক পটুত্বের অধিকারী হওয়া যদি যাওয়া যেতো তাহলে দেশের গণ্ডী পেরিয়ে রঞ্জয় এশীয় অ্যাথলেটিক আসরে উপস্থিত হতে পারতেন।

কিন্তু সে সুযোগ না পাওয়া সত্ত্বেও রঞ্জয় কিন্তু মুষড়ে পড়েন নি। বরং যথেষ্ট উৎসাহেই অ্যাথলেটিকস অনুশীলন করে যাচ্ছেন। পশ্চিমবাংলায় অ্যাথলেটিকসের আদর-কদর কম। তবু রঞ্জয়ের কোনো অভিযোগ নেই। উলটে ভবিষ্যতের রঙিন ছবি দিয়ে এখনও তিনি মনে মনে স্বপ্নের জাল বোনেন। তাঁর ধারণা, অ্যাথলেটিকসে পশ্চিমবাংলার সম্ভাবনা কম নয়। সংগঠন যেমনই হোক না কেন, পশ্চিমবাংলার ছেলেমেয়েদের দক্ষতা অনেকটা সহজাত। দুনিয়ার মহলে পশ্চিমবাংলার কিশোর-কিশোরীরা সারা ভারতের সামনের সারিটি দখল করে রেখেছে। তাদের কৃতিত্বের যেসরকারী মূল্যায়ণে বাংলা দল হিসেবে সবার পুরোভাগে থাকছে। তাছাড়া রঞ্জয়ের অভিমত উচ্চশিক্ষিত স্বীকৃত কোচেরও অভাব নেই এই বাংলায়। তাঁরা অতি প্রয়োজনীয় উপদেশ দিচ্ছেন। হাতে ধরে শেখাচ্ছেন। প্রশিক্ষণের এমন সুযোগ বিগতকালে ছিল না। এখন যা আছে সেই সম্পত্তিকে সংহত করার দরকার।' কথাগুলি শুনে মনে হোল যে রঞ্জয়ের মনের ইচ্ছা রয়েছে খোলাই। সুস্থ মানসিকতাই তাঁর সম্বল। পরাজিতের পলায়নী মনোভাবের অভিশাপের কোনো প্রতিফলনই ঘটে নি তাঁর চিত্তরাজ্যে। খেলাধুলোর অনেক ক্ষেত্রেই পশ্চিমবাংলা নৈরাশ্যে ডুবলেও রঞ্জয়ের মনের আকাশে আশার আলো ঝলমলিয়েই আছে। দৃষ্টান্তটি বাহিকম হতে পারে। কিন্তু সর্বতোভদ্র ও আশ্বাসজনক।

ছেলেবেলায় রঞ্জয় ফুটবল খেলতেন। বাঙালী প্রতিভার সভা হিসেবে সারা রাজ্যই সবে রেডিয়েছেন। তারপর শখ করে একদিন কলেজের স্পোর্টসে যোগ দিয়ে জাম্পিংয়ের তিন বিভাগে প্রথম হতেই তাঁর খেলাধুলো জীবন বাঁকের মুখে ঘুরে যায়। সেই থেকেই রঞ্জয় একজন অ্যাথলিট। তবে মনের কোণে ক্রিকেটার হওয়ার ক্ষীণ সাধও তিনি পুষে রেখেছেন। সুযোগ সংবেধে হলে সে সাধ বাস্তবায়িত করার দিকে ঝুঁকবেন। সুব্রতারও ইচ্ছে ক্রিকেট খেলা। এবং মজা এই যে দুজনেই চান পেস বোলার হতে। নিকট ভবিষ্যতে ওঁদের মধ্যে কে যে পেস বোলার হতে পারবেন জানি না। যেহেতু বেলা বয়ে চলেছে। তবে বিগ মাসলসের অধিকারিণী সুব্রতা স্থানীয় আসরে মহিলা ক্রিকেটার মহলে পেস বোলিংয়ের ঘাটতি পূরিয়ে দিলেও দিতে পারেন বলেই আশা করা যায়। যেহেতু অনান্য মহিলা ক্রিকেটারের অনুপাতে সুব্রতা কাঠামোর বড় বেশি। আর পেস বোলিং করতে হলে ওই বস্তুটির প্রয়োজন যে কতো বেশী তা আর বলে বোঝাবার অপেক্ষা রাখে না।

সুব্রতা আর রঞ্জয়ের জীবনধারায় মিল রয়েছে যথেষ্ট। বাঙালীর ছেলেমেয়ে তাঁরা দুজনেই আদি শিক্ষাগুরু অভিভাবক একদিন শখ মিটোতে দুজনে অ্যাথলেটিক আসরে এসেছিলেন। আর ছেড়ে যেতে পারেন নি। সেদিনের শখ এখন পরোপুরুর নেশায় পরিণত হয়েছে। এই নেশা কিন্তু দুজনেই নাকি ক্রিকেট মাঠে বসেও এবং পেস বোলিংয়ে হাত পাকাবার চেষ্টা করবেন। চাকুরীতেও তাঁরা একঠাঁই—স্পোর্টস এডুকেশনের কর্মী।

জীবনধারায় এমন মিল রয়েছে বলেই সুব্রতা আর রঞ্জয়ের সাধন ভূমি অভিন্ন। রেওয়াজী অনুশীলন একই ছকে বাঁধা। তফাৎ শুধু রঞ্জয় বাধা টপকাতে ঊর্ধশ্বাসে ছোটেন। আর সুব্রতা দূরত্বের বাধা ডিঙোতে ঝাঁপ নিক্ষেপ করেন।

শুধু তফাৎ ধরেই ট্রেনিং। মুহূর্তের ছেদ নেই। মরশুমে প্রতিযোগিতার যোগ দিতে হয় বলে সপ্তাহে চারদিন। বে-মরশুমে সাপ্তাহিক অনুশীলন পাঁচদিন করে। দৈনিক অনুশীলন তিনঘণ্টার একটানা মেহনত।

অনুশীলনের রীতি হরেকরকম। হার্ডল দৌড়, ফুটপুট, ডিসকাস ছোঁড়ার অভ্যাস তো সুখাই। সেই সঙ্গে সহনশীলতার নানা পরীক্ষা—মাইল পাঁচেক ক্রস কান্ট্রি দৌড়। কখনো উঁচু নীচু পথ ধরে ছোটা। কখনো নরম বালীর ওপর দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা। এ ছাড়া নানা কায়দায় ব্যায়াম করা—পরিভাষায় যাকে বলে সার্কিট ট্রেনিং। ওঁদের মতে, পরিশ্রম ক্ষমতা ও সহনশীলতা বাড়াতে সার্কিট ট্রেনিংই হলো সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যায়াম।

কোনো সন্দেহ নেই যে এই অতি উপযুক্ত ব্যায়াম চর্চার সুফল সুব্রতা ও রঞ্জয় নিজেদের জীবনে যথোপযুক্তভাবেই পেয়েছেন।

অজয় বসু

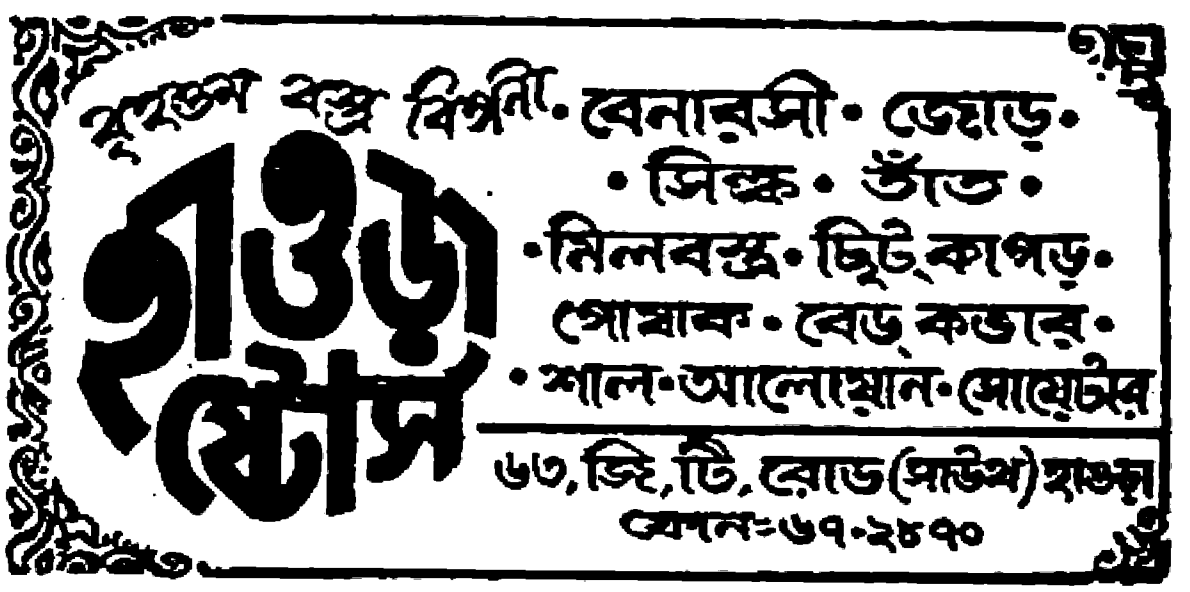

খেলাধুলা

দর্শক

আন্তর্জাতিক টেনিস খেলা

আমেরিকার টেনেসি স্টেটের মেমফিস শহরে আয়োজিত মেমফিস র‍্যাকেট ক্লাব টেনিস টুর্ণামেন্টের আসরে ভারতের ১নং টেনিস খেলোয়াড় বিজয় অমৃতরাজ সিঙ্গলস ও ডাবলস খেতাব জয়ের সূত্রে নগদে মোট ১৯০০০ হাজার ডলার প্রথম পুরস্কার হিসাবে উপার্জন করেছেন—সিঙ্গলসের খেলায় ১৭০০ হাজার ডলার এবং ডাবলসের খেলায় ২০০০ হাজার ডলার। টেনিস খেলার একটি আসর থেকে এই সময়ে খেলার পুরস্কার হিসাবে এরকম বিপুল পরিমাণ অর্থ উপার্জনের নজির অপর কোন ভারতীয় টেনিস খেলোয়াড়ের পক্ষে নেই। মেমফিস র‍্যাকেট ক্লাব টেনিস টুর্ণামেন্টে সিঙ্গলসের ফাইনালে বিজয় অমৃতরাজ ৬—২, ০—৬ ও ৬—০ গেমে ১৯৭২ সালের উইম্বলেডন সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ান আমেরিকার স্টান স্মিথকে পরাজিত করেন এবং ডাবলসের ফাইনালে বড়ভাই আনন্দ অমৃতরাজকে জুটি করে ৬—৩ ও ৬—৪ গেমে আমেরিকার বিখ্যাত জুটি রোসকো টানার এবং ব্রাউ ডিক্সনকে হারিয়ে দেন। এই প্রতিযোগিতার বিজয় অমৃতরাজের থেকে অনেক বেশী নামকরা খেলোয়াড়রা অংশ গ্রহণ করেছিলেন—যেমন বর্গ, বব লুক, জন নিউকম্ব, টম গোর্ড, রোসকো টানার প্রভৃতি। প্রতিযোগিতার অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়দের যোগ্যতা বিচার করে সে বাছাই তালিকা তৈরী হয়েছিল, তাতে বিজয় অমৃতরাজ কোন স্থানই পাননি।

এই মেমফিস র‍্যাকেট ক্লাব টেনিস টুর্ণামেন্টের সিঙ্গলস ও ডাবলস খেতাব জয়ের সূত্রে বিজয় অমৃতরাজ আগামী ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ানশীপ টেনিস (ডব্লিউ সি টি) টুর্ণামেন্টের ফাইনালে খেলবার বিশেষ সম্মান লাভ করেছেন। আমেরিকার ডালেসে আগামী ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ানশীপ টেনিস টুর্ণামেন্টের ফাইনালে বাছাই করা ৮ জন খেলোয়াড় অংশ গ্রহণ করবেন। ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ানশীপ টেনিস টুর্ণামেন্টের অনামন্ত্রিত বিভিন্ন নামকরা টেনিস প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে যাঁরা সাফল্যের সূত্রে পয়েন্ট অর্জন করেন, তাঁদের মধ্যে পয়েন্টের তালিকায় শেষ পর্যন্ত মাত্র প্রথম আটজন খেলোয়াড় ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ানশীপ টেনিস টুর্ণামেন্টের ফাইনালে খেলবার যোগ্যতা লাভ করে থাকেন। এই টুর্ণামেন্টের ফাইনালে সিঙ্গলস খেতাব বিজয়ী খেলোয়াড় প্রথম পুরস্কার হিসাবে নগদ ৫০,০০০ হাজার ডলার এবং সেই সঙ্গে ২৪-ক্যারেট সোনার একটি সুদৃশ্য টেনিস বল। গত বছর এই ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ানশীপ টেনিস টুর্ণামেন্টের ফাইনালে জয়ী হয়েছিলেন আমেরিকার প্রখ্যাত নিগ্রো টেনিস খেলোয়াড় আর্থার অ্যাশ।

১৯৭৮ সালের ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ানশীপ টেনিস টুর্ণামেন্টের ফাইনালে ইতিমধ্যে যাঁরা খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন আর্থার অ্যাশ, স্টান স্মিথ এবং বিজয় অমৃতরাজ। গত বছরের চ্যাম্পিয়ান আর্থার অ্যাশ বর্তমানে সর্বাধিক ৮৭০ পয়েন্ট সংগ্রহ করে এগিয়ে আছেন। অপরদিকে স্টান স্মিথ সংগ্রহ করেছেন ৩৮৫ পয়েন্ট এবং বিজয় অমৃতরাজ ৩৫৫ পয়েন্ট।

ভারতীয় ক্রিকেট দলের ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফর

ত্রিনিদাদের রাজধানী পোর্ট অব স্পেনের কুইন্স পার্ক ওভাল মাঠে ভারতীয় ক্রিকেট দল বনাম ত্রিনিদাদ দলের চারদিনের খেলাটি অমীমাংসিত থেকে যায়। বৃষ্টির জন্য খেলার বেশ কয়েক ঘণ্টা সময় নষ্ট হয়।

প্রথম দিনে ভারতীয় দল প্রথম ইনিংসের ৫টা উইকেট খুইয়ে ২৯১ রান করেছিল। অধিনায়ক গাইকোয়াড় ১২৪ রান করে রান-আউট হন। এবারের ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরে ভারতীয় দলের পক্ষে তিনি প্রথম সেঞ্চুরী করার গৌরব লাভ করেন। ২য় উইকেটের জুটিতে মহীন্দর অমরনাথ (৫৮ রান) এবং অশোকমাল গাইকোয়াড় দলকে ১২৫ রান তুলে দিয়েছিলেন।

দ্বিতীয় দিনে ভারতীয় দল লাঞ্চের ৩৪৫ রানের মাথায় (৮ উইকেটে) প্রথম ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। এবারের ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরে ভারতীয় দলের এই ৩৪৫ রানই এক ইনিংসের খেলায় সর্বাধিক রান। এইদিন ত্রিনিদাদ প্রথম ইনিংসের ৫টা উইকেট খুইয়ে মাত্র ১১৮ রান সংগ্রহ করেছিল।

তৃতীয় দিনে ত্রিনিদাদের প্রথম ইনিংসের রান দাঁড়ায় ২৪১ (৫ উইকেটে)। অসমাপ্ত ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে গোমেজ ডাহুস্বর—ল্যারী (৯৭ রান) এবং শেলডন (৭৮ রান) ১৫১ রান তুলে অপরাজিত ছিলেন।

লাঞ্চের সময় ত্রিনিদাদের রান ছিল ১৯১ (৫ উইকেটে)।

খেলার শেষ চতুর্থ দিনে লাঞ্চের ৬০ মিনিট আগে ত্রিনিদাদের প্রথম ইনিংস ৩০০ রানের মাথায় শেষ হলে ভারতীয় দল ৪২ রানে এগিয়ে যায়। ল্যারি গোমেজ ১১০ রান এবং শেলডন গোমেজ ৮০ রান করে আউট হন। এই দুজনের ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে দলের ১৫৫ রান উঠেছিল। ল্যারি ৬ ঘণ্টা ১২ মিনিট এবং শেলডন ছিলখণ্টা ৪৭ মিনিট খেলেছিলেন। এই দুই ভাইয়ের দৃঢ়তাপূর্ণ খেলার জন্যই ভারতীয় দলের জয়ের আশা নির্মূল হয়ে যায়।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ভারতীয় দল : ৩৪৫ রান (৮ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড)। গাভাস্কার ৫২, গাইকোয়াড় ১১৯, মহীন্দর অমরনাথ ৫৮ এবং ব্রিজেশ প্যাটেল ৬৬ রান। ইঁসমান আলি ১২৭ রানে ৫ উইকেট)

ও. ১৮৫ রান (৫ উইকেটে)। ভেঙ্কাসবকার ৩৯ এবং গাভাস্কার ৫৭ রান। রামকিষেণ ৫০ রানে ৪ উইকেট।

ত্রিনিদাদ : ৩০৩ রান (ল্যারি গোমেজ ১১০ এবং শেলডন গোমেজ ৮০ রান। বেদী ১০৪ রানে ৬ এবং ডেংকট ১১০ রানে ২ উইকেট)।

জাতীয় সাইক্লিং প্রতিযোগিতা

পাটিয়ালায় আয়োজিত ২১তম জাতীয় সাইক্লিং প্রতিযোগিতার পুরুষ বিভাগে বিহার, মেয়েদের বিভাগে বাংলা এবং বালকদের বিভাগে মণিপুর দলগত চ্যাম্পিয়ান হওয়ার গৌরব লাভ করেছে।

চূড়ান্ত ফলাফল

পুরুষ বিভাগ : ১ম বিহার (৪৫ পয়েন্ট) এবং ২য় মহারাষ্ট্র (১৬ পয়েন্ট)।

মহিলা বিভাগ : ১ম বাংলা (১৬ পয়েন্ট) এবং ২য় ওড়িশা (১০ পয়েন্ট)।

বালক বিভাগ : ১ম মণিপুর (১৫ পয়েন্ট) এবং ২য় রাজস্থান (১৪ পয়েন্ট)।

ব্রেস্ট সাইক্লিস্ট

পুরুষ বিভাগ : পরমজিৎ হান্ডেওয়ালা (মহারাষ্ট্র)

মহিলা বিভাগ : বাণী ঘোষ (বাংলা)।

বালক বিভাগ : শয়ং চাঙ্গ (মণিপুর)।

খেলার জগৎ মেয়ে

এরো মডলিং-এ জয়িতা ব্যানার্জি

এবার বেহালা অসমরিক বিমানচালনে মডেল বিমান তৈরী প্রতিযোগিতায় একমাত্র মহিলা প্রতিযোগী জয়িতা ব্যানার্জী প্রথম আবিভাবেই বিজয়িনীর সাফল্য অর্জন করে এক অনন্যসাধারণের অধিকারিণী হয়েছে। অমৃতের পাঠক পাঠিকার কাছে জয়িতা পরিচিত। এর আগে জয়িতার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের বিবরণী মেয়েদের খেলাধুলোর পাতায় প্রকাশ করা হয়েছে। জয়িতা সত্যি এক অপূর্ব গতি-চাঞ্চল্যে ভরা মেয়ে। ওর আশা আকাঙ্ক্ষার যেমন শেষ নেই, নিরলস সাধনাতেও তেমন ক্লান্তি ক্লান্তি নেই। এর আগে যখন এরোমডেলিং শিখতে আরম্ভ করে তখনই ও আমার পাশে ওর উচ্চাভিলাষ ব্যক্ত করেছিল। এন সি সি-র সভ্যা হিসাবে এরোমডেলিং-এর প্রশিক্ষণ নিতে জয়িতা মোটেই দ্বিধা করেনি। নিজের শক্তি সামর্থ্যের ওপর ওর অগাধ বিশ্বাস যে আছে, তা এর আগেও ওর কথাবার্তায় বোঝা গেছে।

এবারের সাফল্য তাই ওর কাছে অভাবনীয় কিছু নয়। বড় সড়ো একটা কিছু করার জন্য জয়িতা নিজের মনকে তৈরী রেখেছে। নিজের প্রতিভাকে ঠিকমত কাজে লাগাবার সুযোগ জয়িতা হাতছাড়া করেনি। তাই এন সি সি-র ২য় বেঙ্গল এয়ার স্কোয়াড্রনে যোগ দিয়ে একনিষ্ঠভাবে এরোমডেলিং ও বিমান বিজ্ঞানে হাতে কলমে পাঠ নিতে থাকে। এ ব্যাপারে ভারপ্রাপ্ত অফিসাররা-ও মেয়েটির আগ্রহ দেখে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন। জয়িতা এজন্য ফ্লাঃ লেঃ অমিতাভ সেন, টি কে মিত্র ও এন সি হালদারের প্রতি সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। এই সঙ্গে ও জানায় যে, এন সি সি-র ওই ইউনিটের চীফ সার্জেন্ট অলোক চৌধুরী ওকে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করেছেন। শ্রীচৌধুরী নিজে ১৯৭০ থেকে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় কৃতিত্ব প্রকাশ করে পুরস্কার ও খ্যাতি অর্জন করেছেন। জয়িতা বলে— এই অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকের সহৃদয় সহায়তা না পেলে হয়ত আমি সফল হতেই পারতুম না।

জয়িতার এই সরল সাবলীল কর্মোৎসাহের পেছনে যাঁর প্রেরণা সর্বাধিক তিনি হলেন ওর বাবা ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, অমৃতবাজার পত্রিকার প্রবীণ চীফ সাব এডিটর। মেয়ের সাফল্যে আনন্দিত বাবা ললিতবাবু বলেন, ওর কাজের সাজসরঞ্জাম জোগাড় করাই এদেশে এক দুরূহ ব্যাপার। তবু, যতো সম্ভব চেষ্টা চরিত্র করছি, যাতে একটি বাঙালী মেয়ে এই বিমান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নাম করতে পারে এবং ভবিষ্যতের মেয়েদের সামনে আদর্শ স্থাপন করতে পারে। শ্রীব্যানার্জীর আশা জয়িতার দেখা দেখি অন্য মেয়েরাও এগিয়ে আসবে বিমান মডেলিং ও বিমান চালনার পথে।

জয়িতা নিজেও ২য় বেঙ্গল এয়ার স্কোয়াড্রনের (এন সি সি) একজন এয়ার সার্জেন্ট।

এবারের প্রতিযোগিতায় জয়িতাই ছিল একমাত্র মেয়ে মহিলা প্রতিযোগী। ও এয়ার মডেলিং করছে মাত্র বছর দেড় খানেক। এরমধ্যেই প্রথম বেঙ্গলীর ২৫-তম মডেল বিমান র‍্যালিতে যোগদান এবং নিজের ক্ষমতার পরিচয় দেয়। ৬ষ্ঠ এবারের প্রতিযোগিতায় ওর পোষক মডেল বিমানটির জন্য এবার মার্শাল সহ্যত মুখার্জী চ্যালেঞ্জ গ্রীফ লাভ করেছে। এটি দেওয়া হয় শ্রেষ্ঠ ফ্রি ফ্লাইট প্রতিযোগিতাকে। এই অল্পের ছেলেদের হারিয়ে ট্রফি জয় করা কম সামর্থ্যের পরিচয় নয়।

এছাড়াও জয়িতা মহিলা প্রতিযোগী হিসেবে সর্বোচ্চ পয়েন্ট সংগ্রহের সম্মানিত স্বরূপ জয়িতা উমাশশী চ্যালেঞ্জ কাপটিও লাভ করেছে। পরে জানলাম জয়িতাই রেকর্ড সংখ্যক পয়েন্ট পেয়ে প্রথমস্থান অধিকার করেছে।

ছাড়া মডেলের সুন্দর সমাবেশের জন্য প্রথমস্থানে অধিকার করে রাজা কানোরী চ্যালেঞ্জ কাপ ফর কম্পিটিশন এক্সিলেন্স পেয়েছে। এর পূর্বে অলোক চৌধুরী এবার তিনটি বিভাগে পুরস্কার লাভ করেছেন, তবে, বড় কথা হল জয়িতা এই আসরে বেশ কয়েকজন অভিজ্ঞ মডেলারকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গেছে।

জয়িতা এক সময় সাঁতারেও বিশেষ কুশলতা অর্জন করেছিল। স্কুলের আসরে রাজ্য স্কুল ও কলেজে সাঁতার ছাড়াও ও ব্যাডমিন্টনেও প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পায়।

নম্র স্বভাব, মধুরভাষিণী জয়িতা যে অদূর ভবিষ্যতে আরও সাফল্যের নজীর সৃষ্টি করবে, তা ওর আচরণে আত্ম বিশ্বাস ও একান্তিক নিষ্ঠা থেকেই বোঝা যায়। জয়িতার একান্ত ইচ্ছা একজন ভাল পাইলট হয়। সেজন্য ও এখন থেকেই প্রস্তুত হচ্ছে। নিষ্ঠা এবং প্রশিক্ষক দের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধার পাথেয়ই একদিন জয়িতাকে দেবে কাঙ্ক্ষিত পাইলট-দের মধ্যে স্থান করে নেবে এই বিশ্বাস নিয়ে বিদায় নিই।

অমর

জয়িতা ব্যানার্জি

শতবর্ষের স্মরণীয়

নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী—১

।। ১ ।।

জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এক এক সময় এমন সব দিকপাল প্রতিভার আবির্ভাব ঘটে, যাঁদের প্রতিভালোকে জাতীয় জীবনের এক একটি দিক নতুন করে প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে। নটগুরু গিরিশ চন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁর সাধনা নিয়ে ও একমাত্র পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঘোষের (দানী-বাবু) এক প্রতিভার দ্যুতিতে বাংলা রঙ্গমঞ্চের আলোকমালা প্রদীপ্ত রাখা যখন প্রায় অসম্ভব বলে মনে হচ্ছিল তখনই আবির্ভাব ঘটলো গিরিশচন্দ্রের একলব্য শিষ্য ও উপযুক্ত উত্তরাধিকারী নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ীর। নটগুরুর যখন জীবনাস্ত সময় তখনই আবির্ভাব-প্রস্তুতি চলছিল বাংলা রঙ্গমঞ্চের পরবর্তী নট-গুরুর। গিরিশচন্দ্র প্রবর্তিত অভিনয়-শৈলী নবযুগে নতুন জীবনের মধ্যে শিশিরকুমার যেভাবে প্রবর্তন করলেন—তাই স্বীকৃতি পেল নবনাট্যধারা নামে। আর এই ধারার প্রবর্তক হিসেবে শিশিরকুমার অভিষিক্ত হলেন বাংলা রঙ্গমঞ্চের নাট্যাচার্য রূপে। শুধু অভিনয় নয়—নাট্য প্রযোজনার ক্ষেত্রেও তিনি প্রবর্তন করলেন নতুন প্রয়োগ-শৈলী।

ইংরেজী ২ অক্টোবর, ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুরে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী। পৈতৃক বাড়ী হাওড়া জেলার সাঁতরাগাছি (বেলা ধাঞ্জাতলা)। প্রাচীনপন্থী গোঁড়া বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন শিশিরকুমার। পিতা হরিদাস ভাদুড়ী বহু পূর্বেই স্বর্গারোহণ করেন। মাতা কমলা দেবী বাংলা ৬ শ্রাবণ, ১৩৫৭ (ইংরেজী ১৯৫০) সালে পরলোকগমন করেন। দুই ভ্রাতা ও এক ভগ্নীর মধ্যে নাট্যাচার্য ছিলেন জ্যেষ্ঠ। ১। শিশিরকুমার ভাদুড়ী, ২। তারাকুমার ভাদুড়ী, ৩। বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, ৪। ভগ্নী গৌরী লাহিড়ী (কৃষ্ণনগরের ডাঃ শম্ভুচরণ লাহিড়ীর সঙ্গে বিবাহ হয়), ৫। কবিকুমার ভাদুড়ী, ৬। মহরীমোহন ভাদুড়ী, ৭। ভবানীকিশোর ভাদুড়ী।

বিবাহিত জীবনের চার-পাঁচ বছর পরে একমাত্র পুত্র অশোককুমার ভাদুড়ীকে রেখে সতী ঊষা দেবীর মৃত্যু হয়। স্ত্রীর মৃত্যুর পর শিশিরকুমার দ্বিতীয়বার আর বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হননি। মাতৃবিয়োগের সময় অশোককুমারের বয়স ছিল মাত্র দু বছর। ২৭৮, বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডস্থিত বাসাবাড়ীতে ইংরেজী ১৯৫৯, ২৯ জুন, রাত ১-৩০ মিনিটে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে নাট্যাচার্য মারা যান।

শিশিরকুমারের মধ্যমভ্রাতা তারাকুমার ভাদুড়ীও ছিলেন একজন শক্তিমান অভিনেতা। 'নবকিশোর শ্রীকান্ত চিত্রখানি পরিচালনা করেন। শিশিরকুমারের মৃত্যুর সময় তারাকুমার জীবিত ছিলেন। মধ্যম ভ্রাতা বিশ্বনাথ ভাদুড়ী পূর্বেই মারা যান। শিশিরকুমারের পরই বিশ্বনাথ খ্যাতি অর্জন করেন সবচেয়ে বেশী। অভিনয় বা নাট্য পরিচালনায় শিশিরকুমারের যোগ্যতম শিষ্য ও ভ্রাতা হিসেবে বাংলার নাট্য ও চিত্রামোদীরা কোনদিনই বিশ্বনাথকে ভুলতে পারবেন না। ব্যক্তিজীবনে ছিলেন মধুর স্বভাবের একটি মানুষ। শিশিরকুমারের পাশাপাশি থেকেও অভিনয়-প্রতিভায় স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়ে মুগ্ধ করেন। শিশির-জননীকে মাত্র এই একটি সন্তানের শোক সহ্য করতে হয়েছিল। বাংলার নাট্যজগতে ভাদুড়ী ভ্রাতৃবর্গের অন্যতম উল্লেখযোগ্য উপহার ভবানী ভাদুড়ী। স্বল্পকালের জন্য হলেও তার বিস্ময়কর প্রতিভার দ্যুতিতে চমৎকৃত হয়েছিলাম। ভবানী কিশোরের মধ্যে দেখেছিলাম স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্রের সিরাজদ্দৌল্লার ভবানী ভাদুড়ীর করিম চাচা ভুলবার নয়। এই নাটকেই নামভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন মহরীবাবু ভাদুড়ী। অন্যতম ভ্রাতা কবি ভাদুড়ী অভিনয়ে অংশগ্রহণ করলেও তাঁর কৃতিত্ব ছিল ভাদুড়ী সম্প্রদায়ের সর্বাধ্যক্ষরূপে।

ছাত্রজীবনে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গবাসী স্কুল থেকে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বঙ্গবাসী স্কুল ও কলেজের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য গিরীশচন্দ্র বসুর অত্যন্ত প্রিয় পাত্র ছিলেন। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে বি. এ. এবং ১৯১০ খৃষ্টাব্দে ইংরেজীতে এম-এ পাশ করে তদানীন্তন মেট্রোপলিটান—বর্তমান বিদ্যাসাগর কলেজে ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপকরূপে যোগদান করেন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সসম্মানে এবং পরম গৌরবের সঙ্গে অধ্যাপনা করেন। শেষ পর্যন্ত অধ্যাপকের পদে ইস্তফা দিয়ে পেশাদার রঙ্গমঞ্চে যোগদান করেন। সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে দিতে বলেছিলেন শিশির-কুমারকে। কিন্তু বিদ্যালয়ের ইংরেজী সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপকের পদে বসে করতে চেয়েছিলেন শিশিরকুমারকে। শিশির-কুমার তার উত্তরে বলেছিলেন 'আমার জন্মই রঙ্গমঞ্চের জন্য। আই অ্যাম মিন্ট ফর দি স্টেজ'।

বালাবয়স থেকেই প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় আবৃত্তিতে। স্কুল জীবনে এই প্রতিভা আরো বিকশিত হয়ে ওঠে। ছোট-বেলা থেকেই ছিলেন অসম্ভব ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। অসম্ভব ছিল জ্ঞানস্পৃহা। পাঠ্যপুস্তকের মধ্যেই এই জ্ঞানস্পৃহা আবদ্ধ থাকতো না। ভাল কথা বলতে পারতেন। ক্ষণিকের আলাপেই আকর্ষণ করতেন আশেপাশের সকলকে। তাঁর মত আলাপচারী সমবয়সীদের মধ্যে খুব কমই ছিল। জ্ঞান-আলাপে ব্যক্তিত্বে সমবয়সীদের চেয়ে সব সময়েই তাকে বড় বলে মনে হতো। ছাত্রজীবনে ডিবেটিং, স্টাডি-সার্কেল প্রভৃতি সংগঠনে ও পরিচালনায় অদ্ভুত দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যেত। কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের সঙ্গে ছাত্রজীবন থেকেই নিবিড় যোগ গড়ে ওঠে। ধীরে ধীরে শিশিরকুমারকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হতে থাকে ইনস্টিটিউটের এক গৌরবময় অধ্যায়। ছাত্র ও অধ্যাপক জীবনের সে অধ্যায় সমগ্র বাংলাকেই বিস্ময়াভিভূত করে।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দে শিশিরকুমার স্কটিশ চার্চ কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। ইংরেজী নাটকের অভিনয়ে ছাত্র সম্প্রদায় বেশী মেতে থাকতেন—চৌরঙ্গী অঞ্চলের থিয়েটারে নিয়মিত ইংরেজী নাটক অভিনয় হতো। শেকসপীয়রের নাটকের জনপ্রিয়তা তখনও হ্রাস পায়নি। ঠিক যেমন ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠার পূর্বে যেমন ছিল। বিভিন্ন সময়ে বিশেষ করে বড়দিনের মরশুমে ইউরোপ থেকে আসতো বিভিন্ন নাট্যসম্প্রদায়, শিশিরকুমারের অধিনায়কত্বে স্কটিশচার্চ কলেজের ছাত্ররা জুলিয়াস সীজার নাটক অভিনয় করবেন বলে স্থির করলেন। চৌরঙ্গী অঞ্চলে একটি বৈদেশিক নাট্যসম্প্রদায় কর্তৃক অভিনীত হচ্ছিল তখন শেকসপীয়রের নাটক। তাদের কাছে শেকস-পীয়রের নাটকের পোশাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কে জানতে গিয়ে ব্যর্থ হন ছাত্ররা। অভিনয়ের তখন এক সপ্তাহও বাকী ছিল না। প্রস্তুত ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তখন স্কটিশ চার্চ কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। সুনীতিকুমারের ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস ও সংস্কৃত সম্পর্কিত পাণ্ডিত্য আজ দেশ-বিদেশে স্বীকৃত। প্রভাতসূর্যের মধ্য দিয়েই যেমন সমস্ত দিনের সূর্যকে উপলব্ধি করা যায় তেমনি আজকের সুনীতিকুমারে সেদিনই তাঁকে শীর্ষে নিয়ে দেখা গিয়েছিল। জুলিয়াস সীজার নাটকের পোশাক-পরিচ্ছদ পরিকল্পনা ও অন্যান্য সবকিছুর দায়িত্ব নিয়েছিলেন তিনি। জুলিয়াস সীজারের অভিনয় ও সামগ্রিক প্রযোজনা বিরাট আলোড়ন আনে। ব্রুটাস চরিত্রে শিশিরকুমার বিস্ময়াভিভূত করেন।

(ক্রমশঃ)

কালীশ মুখোপাধ্যায়

CENTRAL LIBRARY

ছোট্ট

ই চিলোটো ছিল—জাহাজটা হঠাৎ
গয়ে পড়েছে। পরিচালক ভ্রূ কুঁচকে
। পড়ে সত্য করে সেই লাইনটা কেন্দ্রে
—হ্যাঁ, জাহাজ ঝড়ে পড়লে আর রক্ষে
প্রোডিউসার মারা পড়বে—

ামি তখন সবেমাত্র এসেছি ফিল্ম
। শুনে আমি তো অবাক। কেন?
ঝড়ে পড়াতে প্রোডিউসারের কি
ধে? অথচ সাহস করে কথাটা জিগ্যেস
পারলাম না। বাবা, যা মেজাজী
টার—হয়ত চাকরিটাই নট্ হয়ে যাবে।
রিচালক লিখলেন, ওটা জাহাজ নয়,
। স্টিমারে ডেপো ছবির হিরো
লে। আর ওই একই স্টিমারে আসছিল
। তারপর স্টিমার যখন হঠাৎ ঝড়ে
তখন সাংঘাতিক টেন্স-মুটাল অবস্থা।
। কেবিনে ছিল। স্টিমার উথাল-
। হচ্ছে দেখে সে সন্ত্রাসে কেবিন থেকে
এল। বাইরের ডেকে দাঁড়ানো যাত্রী
ডকের যাত্রীরা ভয়ে চীৎকার করছে।
ড় বয়ে যাচ্ছে ডেকের ওপর দিয়ে।
গে ফেলল কান্না। নায়িকা কি যে
—মুখে উঠতে পারছে না। তার কান্না
কি, লিখছ?

হ্যাঁ লিখছি দাদা—

বেশ।.....আচ্ছা, আসীব এখন
?

ামি তৎক্ষণাৎ চিন্তা করে দেখলাম
ব কোন্ এই সময়টা পরিচালকের

কোয়ালিটা রেস্টুরেন্টে আড্ডা মেরে থাকে
অতএব কনফিডেন্টলি বললাম—আশীষ
এখন কোয়ালিটাতে—

সঙ্গে সঙ্গে প্রচন্ড এক ধমক।—আচ্ছা
উজবুক তো! হিরো এখন কোথায়?

থতমত খেয়ে বললাম—হ্যাঁ দাদা, হিরো
এই সময়টায় কোয়ালিটীতেই আড্ডা মেরে
থাকে। আর না হলে বাড়িতে। ও আজ তো
বেরোবার। আজ তাহলে এতক্ষণ বাড়িতে।
একটুনি স্নান-টান করে খেয়ে-দেয়ে ওকে
থিয়েটারে বেরোতে হবে—

—উঃ, শ্রীমু সত্যি সত্যিই একটি ইডিয়ট
আমি আশীষের ওসব কথা শুনতে চাইনি
না। আমি জানতে চাইছি এই যে হিরোইন
এখন ঝড়ের মধ্যে দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে
—এখন হিরো কোথায়?

শুনে লজ্জায় মাথা কাটা যাবার অবস্থা।
যাঃ!

কুঁই কুঁই করে বললাম—আজ্ঞে সে
কেবিনে।

—কি করছে?

—শুয়ে আছে।

নির্মল দে হাসতে হাসতে বললেন—আরে
ধুর—কাটো কাটো লাইনটা। ঝড়ে পড়েছে

জাহাজ মানে স্টিমার—ও শুয়ে থাক
কী? ও এখন কেবিন থেকে বেরিয়ে আসবে
ডেকে।

এটা লিখতে লিখতে আমার হঠাৎ
একটা কথা মনে পড়ে গেল। কিছুদিন আগে
লুইনস্ পার্কের নির্জন রাস্তায় একটা ছবির
আউটডোর শুটিং হচ্ছে। উত্তমকুমার
আর্টিস্ট। ওঁর সঙ্গে অপর্ণার মা
ওঁকে নমস্কার হঠাৎ দেখা হয়ে যাচ্ছে
দুজনকে দেখে হাসবেন। তারপর
আলাপ শুরু করে দেবে।

আমি ছবির শুটিং করতে গেছি।

কামেরা সাউন্ড সব রেডি। পাড়াটা
বড়লোকদের। ফলে বেশ নির্জন। মাঝে
মাঝে দু-একখানা যা প্রাইভেট গাড়ি
যাতায়াত করছে। পায়ে হাঁটা লোক নেই
বললেই চলে। কেন হাঁটতে যাবে? এ
তল্লাটে প্রত্যেকেরই তো গাড়ি আছে—
একখানা নয়খানা করে!

ক্যামেরার সামনে প্রথমে এসে দাঁড়ালেন
উত্তমকুমার। ডিরেকটর জানতে চাইলেন—
আপনি রেডি হলে আমরা শট্ নেব।

উত্তমকুমার তখন অন্যমনস্ক। ছবির এই মুহূর্তের নাটকের কথা ভাবছিলেন সম্ভবতঃ। অর্থাৎ শটে উনি কিরকম অ্যাক্টিং করবেন—সেটা ভাবছিলেন। পরিচালকের উদ্দেশ্যে ঘাড় নেড়ে জানালেন—হ্যাঁ, আমি রেডি। এরপর পরিচালক শুটিং ফ্লোরের চারিদিকে শেষবারের মত একবার সতর্ক দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে যেই শটটি সাউন্ড বলবার উদ্যোগ করেছেন, হঠাৎ উত্তমকুমার বলে উঠলেন—আচ্ছা আমি এখন কোথায়?

সামনেই দাঁড়িয়েছিল জনৈক সহকারী পরিচালক। পরিচালক জবাব দেবার আগেই সে স্মার্টলি বলে উঠল—আপনি এখন কুইনস পার্কে যাচ্ছেন।

আর যাবে কোথায়। উত্তমকুমার হো হো করে হেসে উঠলেন। তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন পরিচালক। হাসির জিনিসটা দারুণ সংক্রামক। দেখা গেল ক্রমে ক্রমে সবাই সেই হাসিতে যোগ দিয়েছেন। আর সেই ছেলেটি অর্থাৎ সহকারী পরিচালক মহা অপ্রস্তুত অবস্থায় দাঁড়িয়ে। সে তখনও ভেবে পাচ্ছিল না—আচ্ছা কি এমন মজার কথা বললাম আমি যে সবাই এমন হাসছে?

হাসির বেগ একটু প্রশমিত হতে পরিচালক তাকে বললেন— তোমাকে উনি কুইনস পার্কের কথা জিগ্যেস করেছেন?

—হ্যাঁ, তাই তো যেন বললেন। বললেন —আমি এখন কোথায়? তাই তার জবাবে আমি বললাম যে আপনি এখন কুইনস পার্কে। ভুল বললাম কোথায়?

—আরে না না। উনি আসলে জানতে চাইছিলেন যে এখন উনি এই ছবির নাটকের কোন জায়গায়। কত নম্বর সিন? মেয়েটির সঙ্গে অন্তরঙ্গতা কতদূর গড়িয়েছে।

সেদিন সবাই হেসেছিল। কিন্তু আমি পারিনি। এই একই ঘটনা আমার জীবনে ঘটে গেছে যে। পরে আশীষকুমার সেটা শুনতে পেয়ে তার সে কি হাসি! এ নিয়ে ও আমাকে কম ঠাট্টা করেনি।

সেই আশীষকুমার, কলকাতার ফিল্ম লাইনের লোকেরা যার কথা বেমালুম ভুলে গেছে—সে এখন বোম্বেতে আবার নতুন করে বেঁচে উঠেছে। আশীষকুমার কলকাতায় যখন কেউ তাকে আর কেউ চাইছে না—তখন নাক চাঁই করতে ও সটান বোম্বে চলে গিয়েছিল। অবশ্য একটা উস্কানি ছিল। বোম্বের কোন একজন হিরোইন, ওকে প্রায় জোর করে এখান থেকে বোম্বে নিয়ে গিয়েছিল। হ্যাঁ, ওই 'প্রেম-ট্রেম গোছেরই একটা ব্যাপার আর কি। তারপর আশীষের ভাগ্যে ভাল কিছু এখানে জোটেনি। ছবির পর ছবি ফ্লপ হলেও, আশীষকুমার এখানে নায়কের চরিত্রেই বরাবর অভিনয় করেছে। পেইজও ছিল দারুণ। সেই ছেলে বোম্বেতে গিয়ে যেন তাঁহা জলে পড়ল। কেউ আর কাজ দিতে চায় না। যে নায়িকা (কলকাতারই নায়িকা) তাকে আগু দিয়ে নিয়ে গিয়েছিল—সে-ও ডেজার্ট করল। ফলে হীতিমত স্ট্রাগল করে আশীষকুমারকে দীর্ঘদিন বোম্বেতে থাকতে হয়েছে।

সামাজিক কাহিনীতে ওকে কেউ নিতে চায়নি। আশীষকুমার তখন পৌরাণিক ছবির দিকে। সামাজিক মর্যাদার খাটো হয়ে গেল। আর সেটাই ওর আশীর্বাদ হয়ে উঠল।। এক 'জয় সন্তোষী মা' ছবিতে অভিনয় করে আশীষকুমারের ভাগ্য ফিরে গেছে। গতবার বোম্বেতে ওর সঙ্গে দেখা হল। বলল—এখন আঠার উনিশখানা মাইথোলজিকাল ছবি ওর হাতে। বৌ-বাচ্চা নিয়ে ও এখন সুখেই আছে।

শুনে আমার খুব ভাল লাগল। বহু পুরোনো বন্ধু আমরা। জীবনের বহু সুখ-দুঃখের দিনে সাথী আমরা। আশীষ যে বোম্বেতে আবার নতুন করে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে —এতেই আমি খুশী।

ওর মুখে গল্প শুনলাম: জয় সন্তোষী মা যখন উঠছিল এখন কেউ কল্পনা করতে পারেনি যে ছবি এইরকম সুপারহিট হবে। ছবির ডিরেক্টরি কেউই বিক্রী হচ্ছিল না। তারপর হঠাৎ এক অলৌকিক ঘটনা একে একে ঘটতে লাগল। কোন একটি থিয়েটারের ডিস্ট্রিবিউটর হঠাৎ একদিন প্লেনে করে বোম্বে এসে হাজির—সঙ্গে থোক থোক টাকার বান্ডিল—প্রোডিউসারকে বলল—এই নিন মশাই টাকা। ছবি আমার চাই। সবাই অবাক। এ ভদ্রলোক কিছু আগাম দিয়ে ঠিক করেছিলেন ছবি উনি নেবেন না। হঠাৎ এই মতের পরিবর্তন? ডিস্ট্রিবিউটার জানালেন, আমি স্বপ্নাদেশ পেয়েছি। স্বয়ং সন্তোষী মা আমায় স্বপ্ন দিয়েছেন। তাই লাভ হোক—লোকসান হোক—এ ছবি আমারই নিতে হবে।

বোম্বেতে ছবি যে হাউসে রিলিজ হলো তার এয়ারকন্ডিশান মোশনে গন্ডগোল ছিল। তাই নোটিশ টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে যিনি ছবি দেখবেন তাকে এই অসুবিধে স্বীকার করেই দেখতে হবে। কিন্তু কি কান্ড: যেদিন ছবি রিলিজ হলো—হঠাৎ দেখা গেল—এয়ার কন্ডিশান মেশিন ঠান্ডা হয়ে গেছে। আর কি বিক্রী! প্রতিটি শো-ই হাউসফুল। যেদিন এই ছবি উঠে গেল—আবার এয়ারকন্ডিশন মেশিনে গন্ডগোল। আবার নোটিশ। এই ঘটনা নাকি অনেকবার ঘটেছে। বিহারে আর উত্তরপ্রদেশে লোকে তীর্থে যাবার মত করে এ-ছবি দেখে যাচ্ছে। এখনো পর্যন্ত পড়ছে হাউসে হাউসে। ছবি দেখে কারও কারও শিবের অসুখ হয়ে নাকি সেরে গেছে বেমালুম।

আমি তো এসব শুনে...

আশীষ বলল—তারপর একের পর এক প্রোডিউসার আসতে লাগল আমার কাছে। এখন তো বোম্বেই শুটিং করছি। সবই পৌরাণিক ছবি অবশ্য।

(ক্রমশ)

অজন মজুমদার

বিল্বমঙ্গল

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা ঃ

গোবিন্দ রায়

যে প্রেম বিশ্বসংসারকে ভুলিয়ে দেয় যে প্রেম সকল বিপদ যাধাকে তুচ্ছ করে—যে প্রেমে প্রেমিক পৃথিবীর সকল সুন্দরের মাঝে তার প্রেমাস্পদকেই দেখে, সেই প্রেমের হৃদয় নিয়েই কবি বিল্বমঙ্গল নটী চিন্তামণিকে ভালবাসে। চিন্তামণিও খুঁজে পায় তার মনের মানুষকে যে তার গানে ও রূপে মুগ্ধ। কিন্তু সমাজ তাদের ভুল বোঝে। প্রেম-পাগল বিল্বমঙ্গল তখন ঘর ছেড়ে পথে বেরোয় সেই সুন্দরকে খুঁজে পাবার উদ্দেশ্যে। অন্তরের দেবতাকে পাবার জন্য সে অন্ধ হয় কারণ বাহির-দৃষ্টি বন্ধ করলেই তো অন্তর-দৃষ্টি মেলে। এই ঘর-ছাড়া প্রেমের ডাকে চিন্তামণিও সাড়া দেয়। অবশেষে প্রেমের ঠাকুরের কৃপায় চিন্তামণি ফিরে পায় তার মনের মানুষকে আর বিল্বমঙ্গল পায় অরূপের সন্ধান।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ-এর 'ভক্তমাল' অবলম্বনে নির্মিত 'বিল্বমঙ্গল' চিত্রটি একসময়ে বাংলার দর্শকসমাজে খুবই সমাদৃত হয়েছিল। তবে বর্তমানের চিত্রটিতে সেই পুরানো স্মৃতি রোমন্থন ছাড়া বোধ হয় নতুন করে কিছু পাবার নেই। চিত্রনাট্য, কলাকৌশলগত কাজ, অভিনয় এবং সর্বোপরি পরিচালনা আর একটু ভাল হলে ছবিতে ভক্তিরস জমাট হয়ে উঠতে পারত। এই মন্থর গতির ছবিটিতে আর একটু প্রাণসঞ্চারেরও প্রয়োজন ছিল। তবুও ছবির কিছু মুহূর্ত এবং দৃশ্য বেশ সুন্দর এবং ছবি যেটুকু জমে ওঠে তা শেষের দিকে। সবচেয়ে ভাল এ ছবির সঙ্গীত। অনিল বাগচীর সুরে মোট তেরোখানি গান (যা বারবার শোনার মত) ছবির একটি বিশেষ আকর্ষণ। গানগুলি অত্যন্ত দরদভরা কণ্ঠে গেয়েছেন মান্না দে ও আরতি মুখোপাধ্যায়।

বিল্বমঙ্গল চরিত্রে সমিত ভঞ্জ এবং চিন্তামণিরূপে সোমা দে কোনোরকমে নিজেদের মানিয়ে নিয়েছেন। অন্যান্যদের মধ্যে বালকবেশী কৃষ্ণের ছোটকার মাস্টার পার্থ এবং তরুণকুমারের অভিনয় বেশ ভাল। বহির্দৃশ্য এবং ক্যামেরার কাজও ভাল।

গীতিকার প্রণব রায়ের পাণ্ডুলিপিকে ইসেগীকৃত এবিটি সঙ্গীতবহুল চিত্র হিসাবে ভাল লাগা খুবই স্বাভাবিক।

চিত্রবিদ

আমার সেই ছবির নাম 'নিয়তি নাহি মানে'। নির্মল দে পরিচালক। আর ক্যামেরাম্যান ছিলেন রামানন্দ সেনগুপ্ত।

নির্মল দে ছবির প্রযোজককে বললেন — আপনাদের মশাই বাঁচিয়ে দিলাম। স্ক্রীন-প্লে তো ছিল জাহাজ। সেখানে নায়ক আর নায়িকার প্রথম দেখা হচ্ছে ঝড়ের মধ্যে। তা আমি জাহাজ বাতিল করে স্টিমার লিখেছি। এখন সেইমত ব্যবস্থা করুন।

কাহিনী ছিল নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত মশায়ের। তিনি তার কল্পনায় যা আসে তাই লিখেছেন। এখন সিনেমার লোকেরা যে জাহাজকে স্টিমার বানাবে তা তিনি ভাববেন কি করে? গল্প যখন প্রযোজক নির্বাচন করেন, তিনিও তখন লাভ লোকসান বিচার করেন। তা যে এ'ভেনা বদলা হয়ে গেল। এবার স্টিমার, তার আবার ঝড়, সর্বনাশ। কি হবে?

একদল সকলকে ডেকে মিটিং করে বসলেন। স্টিমার তো নিশ্চয় পাওয়া যাবে। কিন্তু ঝড়? সারেঙ্গ ছেলে আস্তর-ঘরে মশাই, ঝড়ের সময় আমরা স্টিমার চালাবই না। গঙ্গানদীতে তুফান তুললে অবস্থা কি দাঁড়ায়, তা আপনারা কি করে বুঝবেন? মনুষ্যের জন্ম নিয়ে টানা-হ্যাচড়া পড়ে যায়। আর আপনি বলছেন তখন মাঝ গঙ্গায় স্টিমার ভাসিয়ে শুটিং করবেন। হুঃ!

কিশলবাবু ছিলেন ওই ছবির কস্ট্যুমার এবং আর্টডিরেক্টার। তিনি কলকাতা ফিরে এসে রিপোর্ট করলেন—না নির্মলদা, স্টিমার ওই সিচুয়েশান তৈরী করে শুটিং করা অসম্ভব।

—তাহলে?

—অন্য পথ কিছু দেখতে হবে।

—কি পথ? সেটা বলো।

—ভাবছি দাদা।

একটা কোরাপসডেন্সের ব্যাপার মাত্র; নায়কের সঙ্গে নায়িকার বিয়ে প্রায় ঠিকঠাক। ঘটনাচক্রে সেই নায়ক নায়িকাই প্রথম মুখোমুখি হচ্ছে স্টিমারে। তার পর ঝড়ের ধাক্কায় নায়িকা জলে পড়ে যাচ্ছিল—নায়ক ছুটে গিয়ে জাপটে ধরে তাকে বাঁচাচ্ছে। নায়কের কোলে নায়িকা অজ্ঞান। নায়কের সেবা-শুশ্রূষা। তারপর 'লভ এ্যাট ফার্স্ট সাইট'। এটা বাদ দেওয়ার উপায় নেই। তাহলে তো গল্প ঘোরাতে হয়। গল্প ঘোরানো মানে বাজেট বেড়ে যাওয়া; লংডেস্ট ব্যাপার।

ছবির নায়ক আশীষকুমার। আর নায়িকা হচ্ছে মঞ্জুলা। মঞ্জুলার সঙ্গে তখন সবেমাত্র অনুপকুমারের বিয়ে হয়েছে। সুখী দম্পতী বলতে। কাহিনীটা সেই সময়ের। কার্তিক চ্যাটার্জি ওঁদের দুজনকে নিয়ে জোক জমপেশ ছবিটা শেষ করেছেন। (চলবে)

রঞ্জন মজুমদার

জহর গাঙ্গুলী
অপর্ণা সেন ও প্রবীর চ্যা

ক্লোর থেকে বলছি

স্বর্গত জমিদার সুবর্ণ সেনের দত্তক পুত্র বাবুমশাই; একটি টিপিক্যাল ক্যারেক্টর। এই নামে ছবি তুলছেন পরিচালক সলিল দত্ত।

কয়েকদিন আগে নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে এই ছবির শুটিং হ ভেতরে গিয়ে এক পাশে চুপ করে ব ছিলাম। হঠাৎ দেখি— সলিলবাবুর স সহকারী শ্রীকান্ত গাঙ্গুলীমশাই আমার এগিয়ে আসছেন। বললেন— এসেছেন?

—হ্যাঁ।

—বসুন। শুটিং দেখবেন তো?

আমি বললাম— আমি বাবুম দেখতে এসেছি। তিনি কোথায়?

শ্রীকান্ত জবাব দিলেন— মেকআপ নেছেন। এখুনি আসবেন ফ্লোরে।

কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম। গানের সট তোলা হচ্ছিল। মহুয়া চৌধুরী একটা তক্তপোষের ওপর পা বসে গেল-ব্যাকে গাওয়া গানের সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে বিহ্যাসাল করছিলেন। অনুপকুমার মুগ্ধ বিস্ময়ে ওঁর অপলকে তাকিয়ে ছিলেন। শ্রীকান্ত বলেন— মহুয়া আর অনুপকুমার— দুজনেই এ ছবিতে দুটি বড় চরিত্রে নয় করছেন। মহুয়া সেজেছেন রানী অনুপদা হচ্ছেন নফর—

সঙ্গিল নজর সেখা কথা হ'ল এক নজর।

উনি বলবেন— হ্যাঁ নজর নজর ছাড়া আর কী? ফিউডাল সিস্টেমের সবচেয়ে বড় অবদান হচ্ছে— নজর। নজর ছাড়া যেন জমিদারের চরিত্র চিন্তায় আসে না। বাদশার যেমন উজির, রাজার যেমন মন্ত্রী, ফ্রেঞ্চ্রাক্টসে মন্ত্রীর যেমন সি. এ (কনফিডেন্সিয়াল অ্যাসিসটেন্ট)। হাজেশেকপর নায়কের যেমন চাকরটা— ঠিক তেমনি নায়ক ছিল। নজর আছে। নজর থাকবেও। আমাদের প্রত্যেকেরই কেউ না কেউ নজর আছে। নজর ছাড়া কেউ এক পা নড়তে পারব না। তা আমি একদিন বিমল মিত্র মশাইয়ের বই পড়ছি। পড়তে পড়তে হঠাৎ ওঁর লেখা নজর সংকীর্তন গল্পটা নজরে পড়ল। পড়ে মশাই আমি অবাক, এই রকম গল্পই তো আমি খুঁজছিলাম। এই গল্পে প্রফাইমন জগতের একটা বড় অ্যাঙ্গেলকে ধরা হচ্ছে। আচ্ছা দাঁড়ান, আমি আমার ভাষায় গল্পটা একটু বলছি— আপনি ভেবে ভাবুন তো—

বাবুমশাই শুনতে পেল কে কে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে। এত বড় সম্পত্তি ভোগদখল হচ্ছে। শুনে বাবুমশাই মনে বড় সুখ পায়। করবে তো আর কিছু নেই তার। মানুষটা একটু ভীতু স্বভাবের। অন্তঃকরণটা সবল। কোন জোরপাট নেই মনের মধ্যে। বিয়ে হয়েছে এক সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে। কিন্তু জমিদারের যা সাধারণ বেওয়াজ— ঘরে স্ত্রীকে পুষে রেখে বাইরে মন-মেজাজমতো

খাবুমশায়
সৌমিত্র এবং নবীগতা পাণ্ডেকে মুখোমুখি

খুশি না করলে সে আবার ইজ্জত বাঁচে না। এসব ব্যাপারের জন্যেই তো নফর রয়েছে। নিতানতুন রমণী আর সুরার স্রোতে মনিবকে যথাস্থানে ভাসিয়ে দেবার প্রধান দায়িত্ব তার। নববিবাহিতা স্ত্রী মৌসুমীর আপত্তি আর কে গ্রাহ্য করছে? জমিদার শিল্পী অর্থাৎ রূপসীমা উল্টে বৌ-কে বোঝাচ্ছেন— তোমার এত রূপ-যৌবন, এ-দিয়ে স্বামীকে ঘরে ধরে রাখতে পার না? তাহলে কিসের তরে ওই রূপ-যৌবন?

স্বর্গত জমিদারের পালক জগৎতারণ উৎপল দত্ত করছেন, অতএব বুঝতেই পারছেন) মানুষটি বড়ই কুটিল। অপরের ভদ্রাসনটি তার হাবাগোবা ছেলেটিকে দত্তক না নিয়ে বাবুমশাইকে নিয়েছিল বলে এমনিতেই তার রাগ ছিল ছোঁড়ার ওপর। এখন জগৎতারণ বেগে পড়েছে— ছোঁড়াটিকে সিধে করে দিয়ে কিভাবে জমিদারী হাতড়ে নেয়া যায়। তাই সে মামা হয়েও বাবুমশাইকে সঙ্গে নিয়ে প্রায়ই কাববিনতাদের বাড়ি যায়। মেয়েগুলোকে উস্কে দেয় যাতে ওরা বাবুমশাইয়ের মাথার ভাল লক্ষ্য রাখা করতে পারে। কিন্তু ওই যে বলা হল—বাবুমশাই মানুষটি বড় ভীতু স্বভাবের— তাই দস্তুরমতো মেয়েগুলো ওকে কিছুতেই আর কাবু করতে পারে না। একটু মদ খাওয়া, তারপর এক আধখানা গান শোনা হতেই বাবুমশাই বাড়ি ফিরতে চায়। আরে মাকরাত না হলে কি ওসব জায়গায় মাইফেলের আসর জমে?

কিন্তু তার আগেই—নফর, আমার বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে চল্—

জগৎতারণ ছোঁড়াকে কায়দা করতে পারে না। হঠাৎ একটা সুযোগ পেল সে। বিপিন নামে এক প্রতিবেশী ছিল তার। একই অফিসে দুজনে চাকরী করত। বিপিনের ছিল দারুণ রেস খেলার নেশা। ওতে আর কজন জেতে? হেতে হেতে শেষ পর্যন্ত নিজের ভদ্রাসনটাও বিপিন একদিন বাঁধা দিল জগৎতারণের কাছে। জগৎতারণ পাকা শিকারী। সে খেলিয়ে খেলিয়ে যে মাছটি ডাঙায় তুলছিল সে হচ্ছে বিপিনেরই একমাত্র মেয়ে, সুন্দরী মেয়ে রাণীকে। উদ্দেশ্য নিজের জন্যে নয়— বাবুমশাই-য়ের জন্যে। বেশ্যায় যখন অরুচি—তখন ভদ্রঘরের কুমারী মেয়েতে নিশ্চয় মজবে ছোঁড়া। রাণীকে তখন টোপ হিসাবে ব্যবহার করতে পারলে কাজ হাসিল হতে দেরী হবে না।

বিপিন একদিন, এসব ক্ষেত্রে যা হয়, রেস খেলে ফুঁত হয়ে মনের দুঃখে মোটেই মাতাল হয়ে বাড়ি ফিরে এসে নিজের বৌ-কে ধরে আচ্ছাসে ঠ্যাঙাতে লাগল। বৌ-এর ছিল হার্টের অসুখ। যা হতচ্ছাড়ি তাতেই তার মৃত্যু ঘটল। বিপিন তখন সন্তস্থ। খুনের

ডাক

প্রযোজনা : বিজয়কুমার

রাজু আসলে ডাকাত নয়, ওর সবচেয়ে বড় পরিচয় সে দীন ও দরিদ্রের বন্ধু। অন্যায়ের প্রতিবাদ করার জন্যে নিজের জীবনকেও সে মরণের মুখে ঠেলে দিতে পারে। ছেলেবেলার খেলার সাথী বেচারাকে যখন লখা ডাকাত অপহরণ করলো তখন রাজু তার চুপ করে বসিয়ে সেই অত্যাচার সহ্য করতে রাজি হোল না। ইতিপূর্বে রাজুর বাবাকে সত্য কথা বলার জন্যে সে হত্যা করেছিল। রাজু সেই হত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্যেই ডাকাত হোল এবং লখার বাইচাঁপাড়া থেকে বহুদূরে উধার করে সংগী সাথীর সহায়তায় নিজের পত্নী হিসাবে তাকে স্বীকার করে নিল। ওদের এক জন্য সন্তানও হোল। তার ওপর সাধারণ মানুষের জীবনের কোন ক্ষতি যাতে না হয়, সেজন্যে সর্বদা তাদের সাবধান করে দিত। এক পরিবারের বোঝা ছিল ওকে জীবনের শেষ দিনটির জন্যে। কেমন করে সে মারা হোল এবং তাকে একমাত্র সন্তানের কিভাবে নিধন হোল, তাই নিয়ে কাহিনী। সময় — ১৯ শতাব্দীর শেষভাগ। স্থান — বাইচাঁপাড়া ও তার আশে পাশে। চিত্রনাট্য ও সংলাপ রচনা করেছেন বিজয়কুমার। চিত্রগ্রহণ করেছেন বিমল মুখার্জি। সম্পাদনা করেছেন অরুণ ভট্টাচার্য। শিল্প নির্দেশনা করেছেন সুনীল সরকার। সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন রবীন চট্টোপাধ্যায়। শব্দগ্রহণ করেছেন অমূল্য চক্রবর্তী। রূপসজ্জায় আছেন পরেশ রায়। পরিচালনা করেছেন সুধীর মুখার্জি। রূপায়ণে আছেন বিশ্বজিৎ, সুমিত্রা মুখার্জি, অনুপকুমার, অনুভা গুপ্তা, অনিল চট্টোপাধ্যায়, অমিতা চট্টোপাধ্যায়, অমিতা মুখার্জি, সুনীল মুখার্জি, সুধীর মুখার্জি, সুধীর সরকার, সুধীর দত্ত, সুধীর ব্যানার্জি, সুধীর চক্রবর্তী, সুধীর ভট্টাচার্য, সুধীর ঘোষ, সুধীর সেন, সুধীর বসু, সুধীর রায়, সুধীর সিংহ, সুধীর গুপ্ত, সুধীর দাস, সুধীর পাল, সুধীর কর, সুধীর নাথ, সুধীর বিশ্বাস, সুধীর ঘোষাল, সুধীর মিত্র, সুধীর সেনগুপ্ত, সুধীর চৌধুরী, সুধীর ভট্টাচার্য

কলকাতায় কবীর বেদী

বাস্, ট্রাক্‌চালক ও ছোট্ট ছবির নায়ক কবীর বেদী কলকাতায় এসেছিলেন। কবীর একটি মাত্র ইতালীয় টি ভি ছবি সাক্ষাৎকার-এ অভিনয় করে ইতালীতে সর্বাধিক ভারতীয় তারকা হিসাবে পরিচিত হয়েছেন। ইতালীয় পাঠ এবং সংলাপের সঙ্গতি রক্ষা করাই অসম্ভব হয়ে পড়েছিল কবীরের। এমনও ইউরোপের অন্যান্য দেশে বিশেষ করে জার্মানী ও ফ্রান্সে সাক্ষাৎকার দেখানো হয়েছে।

তিন বছর বয়সে কবীরের মন্ত্র সাহেবে, বাবা ভারতীয়, মা আইরিশ, বাল্যকাল কেটেছে কাশ্মীরে ও আন্তর্জাতিক স্কুলে। স্কুল ও কলেজের শিক্ষা দৈনিকালে আর কর্মজীবন শুরু হয় বম্বের বিজ্ঞাপন সংস্থায়। দুটি সংস্থায় মডেলিং বিজ্ঞাপন চিত্র অভিনয় করেছেন। সম্প্রতিকালে দুই সংস্থার হয়ে বিজ্ঞাপন মন্ত্রান্ত চলচ্চিত্রও তৈরী করেছেন। ওর প্রথম ছবি ও পি রলফের 'হালচাল' নায়িকা ছিলেন প্রমন, এর পর সীমা নায়িকা সাথী, আলোয়া জলে ভাইরাস বিপর্যয়ে, কাছে যাওয়ার মৌসুমীর বিপর্যয়ে, প্রানভ্রাতে শর্মিলার বিপর্যয়ে, মাঞ্জিলে অউর ভি হ্যায় রেখা-গোবিন্দের বিপর্যয়ে। ওর সাম্প্রতিকালের সফলতম ছবি ছোট্ট ভাই এবং বিশেষ দাবি। বহুমুখী ছবির সংখ্যা ভয়াবহ—এদের মধ্যে উল্লেখ্য 'হোলি—ধর্ম নায়কের ভাই ভরত মহাত্মা বিজয় আনন্দের ছোট্ট বাড়ির সলতানের অভিনয় করার কি সব ছবি ও মহেশ ভট্টের পরবর্তী ছবি ১৯৭৬ থেকে ভারতীয় ছবির সংখ্যা বলিউডের প্রথম অভিনীত কাজিনের ছবিতে অভিনয় করবেন না বলে বিদেশে সফরে চলে ছবিতে অভিনয় করবেন। এখনে ইতালীর সিনে সেত সাক্ষাৎকার টি ভি ঘোষণা ছবিতে অভিনয় করছেন নায়িকা সাথে আছেন; ওর প্রিয় ভারতীয় পরিচালক—সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক, বাস, ভাগ্যায় ও মহেশ ভট্ট এবং বিদেশের তেতিত লিন বাগমান ফেলিনি সাতোই কিরন শ্যাম ও পাসলিনো এবং ভট্টর ক্লেয়াগো ও শুভ মুনি ওদের মধ্যে প্রিয় ক্লাস ও শায়ক।

—মাধবেন্দ্র মজুমদার

ধারে কেঁসে যাবার ভয়ে সে পালিয়ে বাঁচল। আর জগৎতারণ ওর পুত্রে সুযোগটা নিয়ে বসল।

রাণী তখন একেবারে অনাথ; নিজের লোকে মুহ্যমান। জগৎতারণ ফিরে বলল—ভেবে আর কী হবে, এখন বাড়ি যাওয়া হবে যে।

—তাহলে আমি কোথায় যাব?

—জানি না। তবে তোমার বাবা এই বাড়ি আমার একরকম লিখেই দিয়ে গেছে—

নিরাশ্রয় রাণীর চোখে জল এসে গেল। ধূর্ত জগৎতারণ তাল বুঝে এবার কথাটা পাড়ল— ভেবেছ পড়ছ কেন? আমি তো করেছি। শুনেছি তুমি গান-টান না জান। তাহলে একটা গানের ইস্কুল খুলে দিচ্ছি। সেখানে গিয়ে থাক। গান-টান শিখিয়ে তোমার নিজের খরচটা চলে যাবে।

রাণী রাজী হয়ে গেল। তাছাড়া উপায়ই বা কী?

আসলে সেটা বাসুমেশাই-এর বাগান বাড়ি। রাণীকে নফর সেখানে নিয়ে উপস্থিত করল মামাবাবুর নির্দেশে। মেয়েটাকে এবার পটাও। তারপর বাসুমেশাইয়ের সঙ্গে ভিড়িয়ে দাও। ও তো গানবাজনা জানে। ভদ্রলোকের মেয়েই খুঁজছে।

নফরের চোখ ভীষণ খেলা। এ-যেন সেই ভোলাদা হেসেন! সে সব বোঝে— সব জানে— কিন্তু মুখ খোলে না। জমিদারবাড়ির বাঁধানো বাসনটি মাজে মাজে নফরকে ডেকে বলে— এসব তুই কি করছিস নফর? এতে মাতোপাপ হবে। বাসুমেশাইকে তুই উল্টোপাল্টা পাঠাচ্ছিস? না নফর, এটা তুই ভাল করছিস না—

নফর চটে নয়— বলে— এতে তোমার কি বামুনদি? আমরা করব। কে কাকে নিয়ে গেল আর কে বলল— এসব আমরা দেখব কথা নয়। আমি যাদুমশাই-এর চাকর। আমি হুকুম তামিল করেই খালাস। পাপ-পুণ্যের কথা বলতে কি আমার আছে? আমার বাবা কে, মা কে— কিছুই জানি না। কেউ আমায় ভালবাসে না। সুতরাং ওসবে আমি ভয়ই না।

বামুনদির চোখ দিয়ে এবার টস টস করে জল গড়ায়। আহা বেচারী কিন্তু তবু সাবধান করে, অনেক করে বোঝায়। নফর শোনে না।

রাণীর অসহায় অবস্থা দেখে আর তার মুখের কথা শুনে এই পাপ হইতে যেন রক্ষা পায়। আর এরপরেও যা নেই। বাবাও নিরুদ্দেশ। মামাটিকে সে বাড়ির ভিতর করে। কিন্তু জগৎতারণ এখন চরিত্রকে মহত্বের জাল বিস্তার করেছে। সেই জাল কেটে বেরোবার হবে। কোথায়?

নফরের ওপর সম্পূর্ণ অনেক নির্ভর রাণী হঠাৎ সম্পর্কটাকে যেন একটু অন্য জগৎতারণ মহা চিন্তিত। এরকম প্রস্তাবে একটা সন্দেহ জাগে মনে

রিডাকশন সেল
শাড়ী • ধুতি • গেঞ্জি • বেডসিট • তোয়ালে • কাটপিস
৭৩, জি, টি, রোড (সাউথ) হাওড়া • ফোন: ৬৭-৫৩২৫
রঞ্জনী

কলাশয্যা/অনুপকুমার/সারথী

বাড়ীর পরিত্যক্ত গো-ডাউন থেকেই রাণীকে পাওয়া গেল, তখন এটা স্পষ্ট হলো যে—নফরেরই কীর্তি।

জগৎতারণ রাণীকে আবার এই বাগানবাড়িতে বহাল করল। তবে স্পষ্ট সে কথা মুখ ফুটে না বললে বিপিনকে ঘুনের হাতে পরিশোধ করিয়ে নেবে। বিপিন যে এখন কোথায় গা-ঢাকা দিয়ে আছে—সেটা জগৎতারণ ভাল করেই জানে।

—আমায় কী করতে হবে?

—নেতে গেয়ে, মানে লটকনার গান যাকে বলে, মদ খাইয়ে ওই বাবুমশাইকে আউট করে দিতে হবে। এবং তারপর এই দলিলে ওকে দিয়ে সহি করিয়ে নিতে হবে।

অভিনয়

নাট্যপত্র আলোচিত

ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য

পর্যন্ত একাঙ্ক নাটক রচনা

প্রতিযোগিতা (১৯৭৬)

প্রঃ পুরস্কার ১০১্। দ্বিতীয় পুঃ ৫১্

প্রবেশ দক্ষিণা ১০্ নিয়মাবলী সম্পাদক।

১০১ হরিতলা মুখার্জী রোড কলিঃ-২৬.

৪৭-৫৩০৭

রহস্য নাটক? মনোবিজ্ঞান নাটক?

চতুরঙ্গ প্রযোজনা:

অতন্দ্রিক

মুক্তি অঙ্গন/৬ই এপ্রিল/৭৪

একাডেমী/২ই এপ্রিল/৭৪

কর্ণাজুন—৩৩ এম এন সেন রোড,

কলিকাতা—৩০

যে দলিলে বাবুমশাই তার সম্পত্তির সব অধিকার—সেচ্ছায়, সজ্ঞানে নাকি মামাবাবু জগৎতারণকে দিয়ে দিচ্ছে। রাণী জগৎতারণের মতলব আগে বুঝেছিল নফরের কাছে। এবার আরও ভাল করে বুঝতে পারল। কিন্তু এখন সে কি করবে? নফর ছিল। এখন জগৎতারণ তাকে তাড়িয়েছে বাবুমশাই-এর কাছ থেকে। সেখানে প্রচণ্ড ধস্তাধস্তি হয়েছিল নফরের সঙ্গে। সে জগৎতারণকে সহজে রেহাই দেয়নি। কিন্তু যেদিন রাণীমা যখন নফরকে এ-বাড়ি থেকে চলে যেতে বললেন, তখন আর নফর নড়েনি। অথচ রাণীমা জানতেন জমিদার যেদিন বাবুমশাইকে দত্তক নিয়েছিলেন—সেদিন এ-বাড়িতে নফর এসেছিল বলে স্বর্ণ সেন বলেছিলেন—যতদিন নফর বাঁচবে—ততদিন সে এ-বাড়ির আশ্রয় আর অন্ন-বস্ত্র পাবে।

ভালমানুষ বাবুমশাই এর প্রতিবাদ করতে গিয়েছিল কিন্তু সাহস করে উঠতে পারেনি। সে একটা সিস্টেমের দাস। এই সিস্টেম তাকে দিয়ে যা করাবে—তাকে তাই করতে হবে। এ যেন তার অমোঘ নিয়তি। সুন্দরী বৌ-কে সে ভালবাসে। সে নিশ্চিন্ত, নিরুপদ্রব জীবন ভালবাসে। সে সাধারণ মানুষের মত বাঁচতে চায়। কিন্তু সিস্টেম তাকে কেবলই গোলকধাঁধায় ঘোরায়। যেমন চোখে ঠুলি-বাঁধা কলুর বলদ ঘানিতে ঘোরে।

সলিল দত্ত সহাস্যে বললেন—পরিণতিটা অবশ্য মারাত্মক। গল্প যখন ক্লাইমেক্সে উঠছে তখন হঠাৎ একদিন রাণীমার কাছে বেনারস থেকে এলেন তাঁর বংশগুরুর ছেলে। রাণীমা তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা করলেন। গুরুপুত্র জগৎতারণকে রাণীমাকে একটি দলিল দিলেন—পড়বার পাঠিয়ে দিয়েছেন আপনাকে দেবার জন্যে।

দলিলটি পড়ে রাণীমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হল। তাতে প্রকাশ পেল যে এই নফরই হচ্ছে স্বর্গত জমিদার স্বর্ণ সেনের একমাত্র সন্তান, গোপন অবৈধ জন্ম তার। কে এই নফরের জননী? রাণীমা জানতে পারলেন—এ-বাড়ির রাঁধুনী রামমণি হচ্ছে এই নফরের জননী। জমিদারের সঙ্গে রামমণির অবৈধ সংসর্গেই ফলশ্রুতি। ঘটনা বেনারসেই ঘটেছিল। রাণীমা স্বামীর সঙ্গে স্বাস্থ্যোদ্ধার করতে গিয়েছিলেন এক সময়: সেখানেই এই অঘটন ঘটে যায়। স্বর্ণ সেন এক দুর্বল মুহূর্তে নিরীহ এই রামমণিকে অঙ্কশায়ী করেছিলেন। দলিলে স্পষ্ট করে লেখা—অতএব এই সম্পত্তির বারো আনা আমি দিয়ে যাচ্ছি আমার নিজের ছেলেকে। আর চার আনা দিচ্ছি দত্তকপুত্র বাবুমশাইকে।

এই যখন অবস্থা তখন বাগানবাড়িতে আর এক নাটক। জগৎতারণ জোর জবরদস্তি করে দলিল লেখাবার চেষ্টা করছিল তার গুণ্ডাবাহিনীর সাহায্যে। হঠাৎ সেখানে সদলবলে নফরের আগমন। বেধে গেল জোর লড়াই। বিপিন লুকিয়ে, মেয়েকে দেখতে এসেছিল। ঘটনাচক্রে সে মরল তোর জগৎতারণের হাতের ছোরাতে। পুলিশ এসে জগৎতারণ এবং তার দলবলকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল। আর রাণীকে নিয়ে নফর ফিরল জমিদারবাড়িতে।

এবং এখানে, হ্যাঁ, আচমকা নফর জানতে পারল আসলে সে কে? কে তার বাবা—কে তার মা। বাবুমশাই এই সংবাদে কি করল? সেটাই বড় কথা: নফর সিস্টেমের পাশে ছিল; এবার নিয়তি তাকে ছেড়ে টেনে নিল। এবার নফর কি করবে: কোথায় যাবে? বাবুমশাই বলল—তুমি সব পেয়ে গেলে। কিন্তু আমি? কে আমার বাবা আর কে মা আমি কিছুই জানিনা। জ্ঞান হয়ে অব্দি আমি বাবুমশাই হয়ে আছি: এবার আমার আসল পরিচয় জানার পালা। ভাই নফর, সম্পত্তির চার আনা অংশ আমি তোমাকেই দিয়ে দিচ্ছি। তুমি আমায় মাফ দাও। মুক্তি দাও। মাফ দাও।

ফ্লোরে আলো জ্বলছে। আবার নিভছে। আবার জ্বলছে। এটা চলতেই থাকবে যতক্ষণ না পরিচালক দিনের শেষে প্যাক আপ বলেন।

'বাবুমশাই' ছবিতে অভিনয় করছেন সৌমিত্র চ্যাটার্জি, উৎপল দত্ত অনুপকুমার, নবাগত গায়ত্রী মুখার্জি, দীপ্তি রায়, মহুয়া রায়চৌধুরী, সুলতা চৌধুরী অলকা গাঙ্গুলী, বসন্ত চৌধুরী, হারাধন ব্যানার্জি, সতু ব্যানার্জি, রত্না ঘোষাল, সুখেন দাস, অতি দাস এবং গোপী ব্যানার্জি। সঙ্গীত পরিচালনা করছেন মান্না দে।

মনোজিৎ

CENTRAL LIBRARY

লোকেশন থেকে

হোটেল হিন্দুস্থান ইন্টারন্যাশনালের লিফ্‌টের সামনে দাঁড়িয়ে আছে অবনী। এক নামকরা ওষুধ কোম্পানির মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ। বেশ স্মার্ট, পরিচ্ছন্ন সাজ। আজ তাকে এখন দেখতেও যারপর নাই। বিশেষ করে আধুনিক মেয়েদের চোখে পড়ে যাবার মত চেহারাই বটে।

এই অবনী এক নতুন ছেলের ফর্মুলা আবিষ্কার করে প্রাক্তন সহকর্মী সট-আফটার-এ অফিসে কাটিয়ে এসেছে। ছেলে মাথায় কিছু চুলগুলো টাকে ঢুল পাকায়, কারো বা ঝুরঝুরে দাড়ি একেবারে পাকবে মাঠে। কারুর টুটি ধরতে গিয়ে ধরা পড়ে গেছে গোঁফ নিজে।

আর সেই সঙ্গে তার মনটাকে আবিষ্কার হয়ে পড়ে ঐ ছেলের এক অভাবনীয় মাত্রার কথা। কোনো প্রবাসে কয়েক ফোঁটা ছেলে যদি কারও পেটে পড়ে তাহলে তার রক্ষে নেই। গলা গল্‌ করে সব সত্যিকথা বেরিয়ে আসবে। খাবে তার পেট থেকে। ছেলের কথাই থেকে শুরু করে অতি তুচ্ছ কথা পর্যন্ত কেউই এই ছেলের কাছে লুকোতে পারেনি। সিগারেট না কোকাকোলা মিষ্টি খাওয়া যাক না কেন। মাত্রেই ছেলে বিএ্যাকশন করে যায়।

এমন বস্তুটির আবিষ্কারক অবনী সে বিষয়ে বাঙ্ময় হয়ে যাবে তাতে আর সন্দেহ কি। হাসতে হাসতে তার বাবসায়ী হবার কথা বলে ফেলে ফর্মুলাটা হাতে তুলে দিতে। হাজার টাকা ফেলেও কথা হয়নি। টাকা-পয়সাকে কিছুতেই না অবনী এ আবিষ্কারকে নিজের জীবনের মূল্যের একটা কিছু নিয়ে বাঁচে নয়। নতুন এই ছেলে নিজেই ব্যবসা করবে বলে করেছে।

কিন্তু দুদিন বসে থেকেও সে পালাতে পারে, ওষুধ করবে তাও সময় নেই অবনীর। পালানিক থেকে বাতিলপত্র করে তুলেছে সাংঘাতিক। বড় বড় ব্যবসায়ী ও এসে সন্ধান নিয়ে হাত করতে চাইছে। তাও বেশ অবনী। এই আবিষ্কারের কথা যদি কেউকে জানতে পারতো কিছুদিন আগে।

তাহলে আর সে এমন করে অবনীর প্রথম প্রেমের কার্বিটকে মাড়িয়ে যেত না। অবশ্য এখন অবশ্য সেজন্য মনে তার খুব একটা আফশোস নেই। কেতকীর মত অনেক মেয়ে এখন অবনীর চারপাশে মৌমাছির মত ভীড় করে। যদিও এদের সব কিছুতেই উচ্ছ্বাস তেমন নয়, তেমন তৃষ্ণায় পেয়ে ফেলানো ছাড়িয়ে নেওয়া। অবনী তবু সুখী বোধ করে পাকে প্রকারে ওদের ঐ ছেলে খাইয়ে আসল সত্যকথাটা কেড়ে নিতে সক্ষম হবে না।

এই মুহূর্তে তাই অবনী ওষুধের কোম্পানির সে সুন্দর ফ্ল্যাটের বসবার একটি সোফায় বসে আছে। আর এখানে ওর প্রথম প্রেমের কার্বি মাতৃমূর্তী হয়ে সংসার সাজাচ্ছে।

একটু আগে ড্রাম ভিক্ষে সাটিং ছবি তোলা পড়ে যাওয়ার ইতস্তত ভাবটা কেতকীর এই হোটেলের এমন কামরায় নিয়ে আসতে বেশ কিছুক্ষণ সময় লেগেছিল। সেই এখানের ভাব নিয়ে কথা বলতে বলতে এখানে এসে হাজির। এখন মানসিক দেনা-পাওনা। সাহস করে অবনী হাত ধরে ফেলে। এরপর ঘোর লাগা ওদের কেতকী ড্রাম থেকে নিয়ে আসে। হাসতে হাসতে ওর হাতে গ্লাস দিয়ে সঙ্গে সঙ্গীতকে পাড়ে।

কেতকী নিজে গেলাস অপেক্ষা করছে হাতে। ঠোঁটের আবেদন। নরম ভেজা ওদের অনুভূতি হচ্ছে। ঠোঁট করে তার হাত ধরে ওপর উঠাতে গিয়ে ঢালাই ফেলে দেয় কাল।

কেতকীর বসবার ঘরে ছবি এখানে। ওষুধের কোম্পানির কাজ করে দিয়েছে। তখন সেই সময়ে ঘরে ঢুকে

ক্রমশ জলে পড়বে তার নির্দেশ দেবার জন্য প্রস্তুত। ব্যাপারটা ওখনও অনেকেই জানে না।

ইতিমধ্যে বেয়ারা বে-মালুম সুইচ অন করে দেখে ঠিক। স্টার্ট বলতে ফিরে আসতে গেলেন তপনবাবু। অগত্যা বসে কিছুক্ষণ চুপচাপ। প্রযোজক মামাজী একটা ফ্রেঞ্চ বাস হেরাল্ড ট্রিবিউন' পত্রিকা দেখার মগ্ন হলেন।

আসিস্ট্যান্ট বিবেক বক্সী, বলাই সেন কপাল হাত রেখে সুমিত্রাদের গতিবিধি লক্ষ্য করছেন। আর মনে মনে যেন কাকে নির্দেশের সুরে কিছু বলছেন। একটু বাদেই আলো পাওয়া গেল। ডিরেক্টরের বাংলো আলো রিফ্লেক্ট করে পড়লো অবনীর ওপর।

'স্টার্ট' আর 'অ্যাকশন' বলার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতে লাগল ক্যামেরাটা। অবশ্য—কপাং। এপাশে কয়েক সেকেন্ড বাদে তপন সিংহের নির্দেশ পেয়ে আমিও কপাং করে।

ইয়ং ক্যামেরাম্যান একটা কয়েক সেকেন্ডের জন্য ক্যামেরার ক্লাপার-বোর্ড-এর শব্দ বন্ধ. কিন্তু কোনো কথা নেই কারো মুখে। বিস্ময়ে নির্বাক গার্ডেন ঘুরে গেল ইউনিটের অনেকের মুখের ওপর দিয়ে। দৃশ্য গ্রহণ শেষ হলে এগিয়ে এলেন তপনবাবু, বললেন—কি ব্যাপার, কারেক্ট বলে হয়ে গিয়েছিল মনে হোল?

ক্যামেরাম্যান অ্যাসিস্ট্যান্ট সবার মধ্যে একটু চঞ্চলতা দেখা গেল। যেন এমন হোল' সেটাই সমস্যা। ইতিমধ্যে দীপঙ্করের দে-ব জামাকাপড় সব ভিজে গেছে। ইচ্ছে থাকলেও আবার ঐ দৃশ্যের রিটেক এখন আর সম্ভব নয়। চিন্তায় পড়লেন সবাই।

ইলেকট্রিক কানেকশন ঠিক করা হোল আবার। তপনবাবু বললেন—ঠিক আছে। শটটা নেওয়া হোক। তবে এটার কিছু কন্টিনিউয়িটি রাখতে হবে।

সেই মত আজ কাজের পরিমাণ বদল হোল। এবার একটু ক্লোজে। সুমিত্রা নিজে এবার জলে নামলেন।

আর জল সেখানে যা হয় তার কি। পুলিসকে মামাজীর বারণ অগ্রাহ্য করে সাঁতরাতে লাগলেন এধার ওধার। একসময় মামাজীকেই বললেন—চান করবেন, চলে আসুন। তিনি তখন ডাঙার দিকে চেয়ে হুইসল—কি পাগল বলুন তো।' তাঁর গলায় আদর মেশানো অভিভাবকের সুর।

দীপঙ্করের চোখমুখ, শরীর, আর সুমিত্রা দীপঙ্করকে পাশের ঘরে টানতে টানতে নিয়ে প্রত্যেকে এই শটটা নেওয়া হবে। ফ্রেমিং ঠিক করার পর এবার সুমিত্রাদের ক্লোজ-আপ। একটু আলোর কারিক আসতেই শটটা নিলেন বিমল মুখার্জি।

আধ ঘণ্টা জলে কাটিয়ে দীপঙ্করের মুখটা হাঁ করিয়ে উপর উঠলেন। তার সামনে তাব তো জলের প্রাণ পিতাদের প্রেম দেখে তপন সিংহ লাফ দিয়ে একটা ঝাঁপ দিয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তাকে হেসে ভাঙিয়ে তিনি চলে গেলেন পোশাক বদলাতে। আর আমি তখন সহকারী বলাই সেনের সঙ্গে এই ছবির বিস্তারিত জানতে ব্যস্ত।

পরিচালক তপন সিংহের নতুন এই হাসির ছবির নাম এক যে ছিল দেশ।' স্বাধীনতার সংকট। চিত্রনাট্য লিখেছেন পরিচালক নিজে। এই পর্যায়ের শুটিং শেষ করে ইউনিট যাবেন দিল্লী। ওখানে বাঁধা-ছোঁয়া হলে করার পর শুটিংয়ে সেট পড়বে অবনীর ঘরে। আর সে-কাজটুকু হলেই ছবির শুটিং শেষ। অবনী তখন মুক্ত হবে; দীপঙ্করও।

দুঃসংবাদ !

ইতালীর চলচ্চিত্র জগতের উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্কটি অকস্মাৎ গত বুধবার (১৭ মার্চ) কক্ষচ্যুত হয়ে অসীম আকাশে চির-চিনার মত হারিয়ে গেল। জ্যোতিষ্কটির নাম লুচিনো ভিসকন্তি। শুধু ইতালীতে নয়, সারা ইউরোপ জুড়ে তাঁর নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হয় সিনেমার কোন আলোচনা প্রসঙ্গে।

সিনেমার জগতে শুধু নয়, দেশের নাট্য জগতেও এই জ্যোতিষ্কটি ছিল নিত্য পুরস্কৃত ভাস্বর। লা টারেতা, দে বালো' আগ্নি যোভান্না, ঈপিক্লেনয়া ইন টটিবাস' ইত্যাদি অপেরা ও নাটকের নির্দেশক হিসাবে লুচিনো ভিসকন্তি মঞ্চরসিকদের প্রাণে প্রণম্য।

আর ছবির জগতে তাঁর খ্যাতি ও জনপ্রিয়তার কথা সারা বিশ্বব্যাপী। জঁ রেনোয়ার সঙ্গে পরিচিত হবার দিন থেকেই ভিসকন্তির মনজগতে সৃষ্টির বেদনা জেগেছিল। সেই বেদনার উপশম ঘটল যখন তিনি অবসেসন ও আর্থ মুভ্‌মেন্টস নাম দুখানা ছবি করলেন। ইতালীর ছবি জগতে যেন ভূকম্পন জাগাল দ্বিতীয় ছবিখানা। নব-তরঙ্গ চলচ্চিত্র আন্দোলনের পথিকৃৎ হিসাবে ভিসকন্তি পেলেন জগৎজোড়া খ্যাতি। এই পর্যায়ে তাঁর দুখানা ছবি—বোকো এণ্ড হিজ ব্রাদার্স' ও দি লেপার্ড' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভিনিসে অনুষ্ঠিত তৃতীয় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব ভিসকন্তির ছবি দি লেপার্ড' স্বর্ণমুকুট লাভ করে। গত জানুয়ারীতে বম্বের আন্তর্জাতিক চিত্র মেলায় দেখানো হয় বি কনভারসেসন পিকচার।

* * *

সুইডেনের সবচাইতে বিতর্কিত এবং বিদেশে আদৃত (কলকাতায় তো বটেই) প্রতিভাবান পরিচালক ইংমার বার্গম্যান এখন স্টকহোমের হাসপাতালে। মানসিক ভারসাম্য নাকি তিনি হারিয়ে ফেলেছেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে হাসপাতালে যাবার তিন-চার দিন আগে ট্যাক্স ফাঁকি দেবার গুরুতর অভিযোগে সরকার তাঁকে গ্রেপ্তার করেছিল। তাঁর পাস-পোর্টও নাকি বাতিল করা হয়। এ ব্যাপারে পুলিশ বার্গম্যানকে তাঁর বাড়ীতে দীর্ঘ কয়েকঘণ্টা ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং তারপরই তাঁর এই অসুস্থতা। ইতিমধ্যে জানা গেছে অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হলে বার্গম্যানকে প্রায় দু বছরের জন্য জেলে যেতে হবে।

স্থানীয় চলচ্চিত্র মহল এই ঘটনায় তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। বার্গম্যান নিজেও বলেছেন—আমি একজন শিল্পী, টাকা-পয়সা কোথায় যায় আমি কিছু জানি না।

হাওড়া
ফ্রেণ্ডস্
সোসাইটী
বেনারসী·সিল্ক·তাঁত
মিলবস্ত্র·পোষাক
৫৪৫, জি, টি, রোড (সাউথ) হাওড়া
ফোন: ৬৭-৪৪৪৭

কান্ উৎসব সংবাদ

পশ্চিম ইউরোপ অনুষ্ঠিত চলচ্চিত্র উৎসবগুলির মধ্যে কান্ উৎসবের নাম নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। বিশেষ করে ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতের কাছে তো বটেই। এই উৎসবে সত্যজিৎ রায়ের ছবি যেমন একদা পুরস্কৃত হয়েছে তেমনি গত বছর ভারতীয় একটি ছবি এই উৎসব মানকে করে দিয়েছিল।

১৯তম কান্ উৎসব আগামী ১৩ থেকে ২৮ মে পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। ইতিমধ্যে কর্তৃপক্ষ ছবি বাছাইয়ের কাজ শুরু করে দিয়েছেন। আটটি দেশের একুশখানি ছবি মনোনয়ন পেয়েছে। এই তালিকায় আছে পশ্চিম জার্মাণী থেকে একটি গোদার্দের লা মারকুইজ ভন্-ও, স্টার্লিং স্টিনের 'কোমার গার্ড' ইতালী থেকে আসছে লুচিনো ভিসকন্তির 'অবসেসন'। সিটিও সা পিয়ের পাওলো পাসোলিনির 'লা অরিগত'। আফ্রিকান আলবাত্রো গ্রিকের 'আনা' এস্তোনো ফেলোনির 'ভাঁচি পেনাচি' কার্ভিভ ফ্রান্সেসকো রোসির 'কাদাভের একসেলেন্টি' মার্কিনের 'আকটস্ দা মারুলিয়া' (সিওয়েল লিটিন) সুইডেনের 'থেন্স টু ফেস' (ইংমার বার্গ-ম্যান) হাঙ্গেরী থেকে গুইলা মারের 'ডেটেন হলডান': ওট্টে ফকির ব্যবিফ্রম ও আঁদ্রে কোভকাসের 'লা সিরিনিথ'। আমেরিকা থেকে আসছে ছবানা ছবি—রবিন হুডম্যানের 'নাইট লাইফ' রবার্ট অলটম্যানের 'বাফেলো বিল্ এণ্ড দি ইণ্ডিয়ানস্', পল্ মাজুরস্কির 'নেকস্ট স্টপ গ্রীনিচ ভিলেজ', মার্টিন স্কর্সিসের 'টাক্সিস ড্রাইভার' [illegible] হাইম্যানের 'দি আইসম্যান কামস্', টনি রিচার্ডসনের 'এ ডেলিকেট ব্যালান্স' ও আলবার্ট মেসলস এবং 'গ্রে গার্ডেন্স' এবং কানাডার 'আমোর ব্রিস'।

CENTRAL LIBRARY

ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়

। আগে অভিনেতৃ সংঘ আয়োজিত
স্থানে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় বলে-
'প্রাইজ পাওয়াকে চাইতে প্রাইজ
থাটাকে স্বাগত জানাচ্ছি বেশী
াইজ পাওয়া বাঙালী শিল্পীর
হ, নয়, কারণ তাঁরা এমন মাটিতে
করেছে যে মাটিতে গিরিশ ঘোষ
ভাদুড়ি, প্রভাদেবী ছবি বিশ্বাস
রেন। প্রাইজ পাওয়াতে বাঙালী
জন্মগত অধিকার বলা যায়...।
নেক কথা।

এই কথাগুলো শুনতে শুনতেই
ল পর্দায় যে ভানুকে দেখে
সে গড়িয়ে পড়ে ব্যক্তি-চরিত্রে ঐ
নিশ্চয়ই তেমনি হালকা মেজাজের
রিতা আছে।

র এই ধারণা যে কতখানি সত্যি
ণ পেলাম তিন-চারদিন পর তাঁর
য়। ফোন করে দেখা করার ইচ্ছেটা
জানাতেই তিনি বলেছিলেন— ইন্টারভিউ?
কি হবে?

আর দরজায় দাঁড়িয়ে ঘরে বসতে বলার
মুহূর্তেও সেই একই সুরের পরিচয়
পেলাম। বললেন—আমরা তো এখন বাঙ্ক
ডেটেড—পাতে পড়ার পর্যায়ে পড়ি কি?

—কি যে বলেন দাদা?

গায়ে গেঞ্জী আর লুঙ্গিতে একবারে
ঘরোয়া মেজাজে তিনি ছিলেন তখন।
আমাকে বসতে দিয়ে ওপরে দোতলায়
কাজের মেয়ে নির্দেশ দিয়ে এসে গাঢ়ি হয়ে
বসলেন—বলো ভাই এবার তোমার কি
ব্যাপার?

—ব্যাপার কিছু নয়। আপনার মুখ
থেকে আপনারই কিছু কথা শুনব এই
আশা নিয়ে এসেছি। প্রশ্ন টশ্ন করে আব-
হাওয়াটাকে মাটি করতে চাইছি না।

আপনারা কথাই-ই। নিশ্চয় জানেন
কৌতুক-অভিনেতা ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় বেশ
কয়েক বছর যাবত আর তেমন
কাজ করছেন না। কিন্তু তাঁর
এবং পপুলারিটি যে আজও
কমেনি তার প্রমাণ হাতের কাছেই
যাত্রার আসর তিনি মাতিয়ে রেখেছেন

জানতে চাইলাম— কেন এমন
জবাবে তিনি 'কমেডিতে যা
সেগুলোর পুনরাবৃত্তি করলে
বাড়ার বই কমবে না। ইন্ডাস্ট্রির
রাজনীতির ঘোলা জলে আর ঢিল
ইচ্ছে নেই ভানুদার। তাই বেশ
কোঁচিং দিয়েই তিনি বললেন
লিখতে পারো যে কয়েক বছর আগে
দলাদলির কারণে কাটকে কাটকে
মাইজড করার কথা হয়েছিল। শেষ
পোধহয় আমিই একমাত্র বলি হলা
কুকর্মের পেছনে যাঁরা ছিলেন
তাঁদের কি আমার তা নিয়ে আর
তোলার প্রবৃত্তি আমার নেই, কিন্তু
যে আলটিমেটলি ডিকটেমাইজড
এটাই মোদ্দা কথা।

তিনি কম দুঃখে ফিল্ম ছেড়ে
কথা ভাবেন নি, অনেক ভিক্ত অ

ছুটির ঘন্টা :
স্যঃ শাহজাহান্

সঙ্গে করেই তিনি প্রতিজ্ঞা করে ছিলেন—যাত্রা করব, যাত্রা, ফিরব না আমার।

সেই প্রতিজ্ঞা তিনি রেখেছেন। সেই উনসত্তর সাল বোধহয় তৈরী করেছিলেন সুশীল নট্ট কোম্পানী। ঐ যাত্রাদলের হর্তা কর্তা ছিলেন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে। বেঁটে থাকলেরের সঙ্গে তিনি একের পর এক পালা করে যেতেন। কলকাতা থেকে প্রায় নির্বাসনে ছিলেন তিনি। গ্রাম গঞ্জ আর শহরের লোকের কাছে ভানু ব্যানার্জি তখন পালাদার অভিনেতা। কতদিন বছরের বন্ধ পর্যন্ত তাঁর অভিনয়ে মুগ্ধ হয়ে আদর করেছে ওঁকে।

প্রায় কোনে তিনশ ছবি যাঁর ক্রেডিটে সেই শিল্পী বলেন প্রায় বিরাশিটে। প্রায় নশর ছবিটি নিয়ে আসত অনাথা টেলিফোন। এই ভাবে ভাঙা হবার লোক নন অবশ্য তিনি, সংসার করে বাঁচার মতো বুকের পাটা আর কলিজার জোর দুটোরই হয়তো ছবির কপালে একমাত্র ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ই আছে। কিন্তু বরাবরই চরিত্রে তিনি যেভাবে মোকাবিলা করেছেন—সে কথা একথাই প্রমাণ করে। আজও তিনি সমান খাটতে নেহাৎ কম উনি কাঁ বাঁড়ুয়ে আছেন।

অবশ্য এখন পিকচারটা একটা অন্যরকম যে কারণেই হোক ওঁকে নিয়ে বলাবলির তীব্রতা তেমন আর নেই। এখন আপনা সবাই ভানুদাকে ডাকছেন, কাজ নিচ্ছেন। শারীরিক অসুস্থতা থাকলেও অভিনয়কে তিনি ছাড়তে পারছেন না।

আসল কারণটা কোথায় তাঁর বুঝে নেন। এই ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি আর ফিল্মের লোকদের কত আপনার করে ভাবতেন তিনি, যে কোনদিন এঁদের কাছ থেকেই অন্য কিছু আসবে তা ভাবেন নি। এখনও ভাবেন অবাক হয়ে যান- এমনটা হল কি করে?

নতুন করে যখন আবার অফার আসছে তখন আর নাচুন করার মতো মানসিকতা তাঁর ছিল না। বাধার সময়ের প্রলেপ আর অনুগ্রহ জমেছে। তাই এখন বেছে নেবার ব্যাপারে তিনি খুবই চুজি। তপন সিংহের 'এক যে ছিল দেশ' রামের সুমতি' ঋত্বিক ঘটকের অযান্ত্রিক আর পাটা দুই ছবিতে বোধহয় কাজ করেছেন তিনি।

ক ... কুড়ি আর শতাব্দী বইতে পারছে না। দাঁতগুলোর কারেলাও কম নয়। বয়সের ভার ইতিমধ্যে তাঁর শরীরে জমা এসেছে। দল নিয়ে মফঃস্বলে বার-তিনের বেশী আর যেতে পারছেন না এখন।

সাংসারিক দিক থেকে অবশ্য এখন তেমন আর ভিড় নেই। বড় ছেলে সুনীল বিকার চাকরী করছে। ছোটছেলের বিয়ে নেমে আছে কলকাতায়। আর মেয়ের তো বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন। (অভিনেতার সেই ফুটফুটে মেয়েটির কথা নিশ্চয়ই ভোলেন নি আপনারা।)

সুতরাং ভরণপোষণের প্রয়োজনটুকু মিটিয়ে বাড়তি চাহিদা আর নেই তাঁর। শরীরকে আর বৃথা ব্যস্ত করা কেন।

ভানু ব্যানার্জীর সঙ্গে গল্প করতে বসার অর্থ যে ঘড়িকে ছুটি দেওয়া এটা আমার জানা ছিল না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সত্যেন বোসের ছাত্র ছিলেন তিনি, ডঃ মহীন্দ্রলালের প্রিয়পাত্র। কলকাতায় এসেও সত্যেন বোসের সঙ্গে ওঁর সম্পর্ক ছিল খুব ঘনিষ্ঠ। তার প্রমাণস্বরূপ দেখলাম বসবার ঘরে ঠিক মাথার ওপর সত্যেন বোসের সঙ্গে ভানুদা আর বৌদির একখানা বড় ছবি টাঙানো। সেইসব স্মৃতিরোমন্থনে সময় যায় মনে হয় তাঁর কাছে।

ছবি বিশ্বাস দেবকী বসু তুলসী চক্রবর্তীর সঙ্গে ভানুদার সম্পর্ক যে কি গভীর ছিল তার প্রমাণ মিলবে একবার ঐ প্রসঙ্গ কোন কথা তুললেই।

অভিনয় নিয়ে আলোচনা করুন—তাতেও তিনি জাঁদরেল শিক্ষাবিদদের মত বক্তৃতা দিয়ে যাবেন। কৌতুক অভিনেতাদের সম্পর্কে সাধারণ দর্শকের যে হালকা ধারণা থাকে তা যে কতখানি ভিত্তিহীন এবং ভুল তার জ্বলন্ত প্রমাণ ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিনয়ের গঠনতন্ত্র ও তার ইমপ্লিকেশন না জানলে কৌতুক অভিনয় করা যায় না—এটা কজন জানেন? টাইমিং সেন্স সম্পর্কে যিনি যতখানি সজাগ তিনি তত ভাল কৌতুক অভিনয় করতে পারেন। আর এই কাজে ভানু ব্যানার্জীর দক্ষতা অনস্বীকার্য।

জানতে চেয়েছিলাম— আপনার অভিনয় গুরু কে?

কোনো ভনিতা না করে খুব শ্রদ্ধা আর মনের সঙ্গে যে নামটি করলেন তাকে আমি—আপনি কেউ-ই চিনি না চেনার কথাও নয়। ঢাকার কোন এক আমোদ প্রমোদ গুণ্ডা, নামকরা হুকি খেলোয়াড় ছিলেন নাকি তিনি। ঢাকাতেই ভানুদার হাতেখড়ি হয়েছিল ওঁর কাছে। এখন জামসেদপুরে থাকেন।

তখন কিন্তু তিনি কৌতুক শিল্পী ছিলেন না। রীতিমত সিরিয়স। চন্দ্রগুপ্তের চানক্য বা নতুন ইহুদী নাটকেও তাঁর চরিত্র ছিল সিরিয়স টাইপের।

—এই পরিবর্তনটা হোল কিভাবে?

এ প্রশ্নের জবাব তিনি নিজেও জানেন না। 'পাশের বাড়ী' আজও কয়েকটি ছবিতে হাসির চরিত্র করবার পরই ঘটলো এই পরিবর্তন, অবশ্য এজন্য তাঁর কোন অভিযোগ নেই। কারণ ভাল কমেডিয়ান হতে পারাটাই একজন অভিনেতার সার্থকতা। সেই অর্থে তিনি সার্থক।

যখন তাই কোন কাগজে তাঁর সম্পর্কে লেখা হয়—ভানু ব্যানার্জী দুটি হাসির মুহূর্ত উপহার দিয়েছেন। তিনি ক্ষুব্ধ হন। তিনি বলেন—হাসির মুহূর্ত স্টেশনারী দোকানের মাল নাকি, যে কিনে উপহার দিলুম।

তাঁর এই ক্ষোভ মনে মনেই। মাঝে-মধ্যে দু-চারজনের কাছে দুঃখে ক্ষোভটা প্রকাশ করে ফেলেন, নইলে বলেন —লিখতে গেলে ওতে সেই ক্রিটিকের 'বদোটাই বেরিয়ে পড়ে' আমার আর কি?

ফিল্মে নয়, মঞ্চের প্রতিও তাঁর আকর্ষণ কম নয়। এবারে অভিনেতৃ সংঘের নাটোৎসবে নতুন নাটক করার চেষ্টা করেছিলেন সময়াভাবে পারেননি। আর মঞ্চকে ভাল না বাসলে যাত্রা করতে যাবেন কেন?

নির্মল ধর

নাটমঞ্চ

অভিনেত্রী সংঘের নক্টোৎসব

প্রায় তিন বছর বাদে সম্প্রতি (২৩-২৭ ফেব্রুয়ারী) এক নাট্যোৎসবের আয়োজন করেছিলেন অভিনেত্রী সংঘ রবীন্দ্র সদন মঞ্চে মোট চারটি নাটক নিয়ে। দুটি পুরনো নাটক বিদেহী ও রাজকুমার এবং দুটি নতুন নাটক গৃহদাহ ও বিলে জুন।

সুতরাং আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকছে নতুন দুটি নাটকের মধ্যেই।

শরৎচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে সংঘের সভ্যবৃন্দ নিবেদন 'গৃহদাহ'। অচলা, সুরেশ মহিমের মত জটিল চরিত্রের রূপদান খুবই কঠিন। তবু অভিনয় দিয়ে শিল্পীরা তাকে বাস্তবগ্রাহ্য করার চেষ্টা করেছেন। বিশেষ করে প্রধান তিনটি চরিত্র চিত্রা সেন, সন্দীপ ভট্টাচার্য ও দিলীপ রায়ের প্রাণবন্ত অভিনয় দর্শকদের প্রচুর সাধুবাদ কুড়িয়েছে।

তবে নাট্যরূপের ব্যাপারে আরো কিছুটা সতর্ক দৃষ্টির প্রয়োজন আছে বলে মনে হোল।

নাটকটির নাট্যরূপ ও নির্দেশনায় ছিলেন শ্যামল সেন।

উৎসবের দ্বিতীয় নতুন নাটক বিলে জুন এল নাটকার মিকলস ছিয়ারফাস।

বিজ্ঞানী রোজেনবার্গ দম্পতি আণবিক বোমার ফর্মুলা রাশিয়ার পাচারের অভিযোগে অভিযুক্ত। শাস্তি নির্ধারিত হয়েছে মৃত্যুদণ্ড। দণ্ডাদেশ কার্যকরী হবার কয়েক ঘণ্টা আগে এক রাজদূত এসে তাঁদের মত পরিবর্তনের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। মোটামুটি এই হোল নাটকের বিষয়বস্তু।

রোজেনবার্গ দম্পতির ভূমিকায় সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও অঞ্জনা ভৌমিক সম্ভাব্য বাহুল্য আরোপ করার চেষ্টা করেছেন। রাজদূত হিসেবে নির্দেশক জানেশ মুখোপাধ্যায়ের অভিনয়ে কিছুটা অতিনাটকীয়তা লক্ষ্য করা গেছে। সেদিক থেকে দারোয়ান হেডলেসের ভূমিকায় আলাক মিত্রর বাস্তবানুগ অভিনয় লক্ষ্য করার মত।

দক্ষিণেশ্বরের ঐকতান-এর নাট্যোৎসব

গত ১৭ ও ১৮ জানুয়ারী দক্ষিণেশ্বরের ঐকতান গোষ্ঠীর উদ্যোগে এক নাট্যোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মোট চারটি নাটকের মধ্যে 'নন্দলাল' নাটকটি পরিবেশনায় অভিনবত্বে দর্শকদের প্রশংসা পায়। শিবেন্দ্রলাল রায়ের কবিতা 'নন্দলাল'-এর নাট্যরূপ দেন দেবাশীষ চাকী। নাটকের প্রারম্ভে পাহাড়ের ধরণে গোটা কবিতাটি গান ও ছন্দের মাধ্যমে উপস্থাপিত করা হয়। নামভূমিকায় সুন্দর অভিনয় করেন হরিপদ ঘোষ। সুব্রত নাটকার প্রদত্ত। 'ঠিকানা' নাটকে (সুকান্ত ভট্টাচার্য অবলম্বনে) বিদ্যুৎ শর্মা রায় ও শংকর রচিত 'গ্রেটম্যান' নাটকে দেবাশীষ চাকীর অভিনয় সুন্দর।

এছাড়া রতন গাঙ্গুলী হেমেন ব্যানার্জি তাপস পাল সন্দীপ চ্যাটার্জি রতন রায় অর্ণিজিৎ ঘোষ অমিত দাস গৌতম চক্রবর্তী নাটকের বিভিন্ন ভূমিকায় সুন্দর।

সিনথি ইয়ুথ কর্নারের নাট্যাভিনয়

বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে সংস্থার সদস্যবৃন্দ দুটি নাট্যাভিনয়ের আয়োজন করেন। দীনবন্ধু মিত্রের প্রখ্যাত নাটক 'নীলদর্পণ' ও অনিল ঘোষ রচিত 'যুগসূর্য'—নাটক দুটি পরিচালনা করেন নাটকার স্বয়ং। এঁদের বলিষ্ঠ প্রয়াসকে সার্থক করে দুটি নাটকের বিভিন্ন ভূমিকায় প্রশংসনীয় অভিনয় করেন অনিল ঘোষ সুনীত ঘোষ অলোক ঘোষাল সুবিমল চক্রবর্তী ছায়া ঘোষ প্রভৃতি শিল্পীগণ।

কল্যাণীর অপেরা

নাটক এবং যাত্রার মধ্যে এখন ক্রমশই ফারাকটা কমে আসছে। এটা ভাল কি মন্দ বিচার না করেও বলা যায়, সাধারণ দর্শকের আকর্ষণ বা আগ্রহ কিন্তু বেড়েই যাচ্ছে এদিকে।

এ কথাটা মনে হোল সম্প্রতি মহাজাতি সদনে কল্যাণীর প্রথম নিবেদন তারাশঙ্করের মঞ্জরী অপেরা দেখতে গিয়ে। যাত্রার সেই বর্ণাঢ্যতার পাশাপাশি হাল আমলের নাটক পরিবেশনের রীতি যেন সেদিন অঙ্গাঙ্গী হয়ে গিয়েছিল।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মঞ্জরী অপেরাকে নাট্যরূপ দিয়ে মঞ্চে সার্থক ভাবে মঞ্চস্থ করা রীতিমত পরিশ্রমসাপেক্ষ এবং কঠিন ব্যাপার। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, কল্যাণী যাত্রা সংস্থা তাঁদের প্রথম প্রচেষ্টায়ই দর্শকদের অবাক করে দিয়েছেন।

'মঞ্জরী' অপেরার (নাট্যরূপ নন্দগোপাল রায়চৌধুরী) প্রধান সম্পদ কুশীলবদের প্রাণবন্ত অভিনয়। কি যাত্রায় চরিত্রে কি ব্যক্তিগত ভূমিকায়—প্রায় সব অভিনেতা অভিনেত্রীই অত্যন্ত স্বাভাবিক।

বিশেষ করে নির্মল ঘোষ, তনু চট্টোপাধ্যায়, শ্যামল সরকার, মনোজ মান্না বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রকলা রায় ও রুবী দত্তর অভিনয় দর্শকদের মুগ্ধ করে রেখেছে। এছাড়া শেখর মজুমদার, সুব্রত মিত্র মন্টু চক্রবর্তী স্বপন গুপ্ত স্বপন রায় অরুণ দাস ও জগদীপ ব্যানার্জীর অভিনয়ও অত্যন্ত স্বচ্ছন্দ।

অন্য দুটি নারী চরিত্র গীতা প্রধান ও মধুমিতার অভিনয় আন্তরিক।

মঞ্জরী অপেরার অন্য এক বড় আকর্ষণ চন্দ্রকলার দুটি নৃত্যনাট্য। (মূক পরিচালক বিনয় ঘোষ)।

আলো (তাপস রায়), সঙ্গীতযোজনা (নাট্যকার)। মঞ্জরী অপেরাকে বলিষ্ঠ করে তুলেছে। গতির সঙ্গে সুসমন্বয় মিশ্র। ভাল, কিন্তু পরিবেশন তত অনুপাতে কিঞ্চিৎ দুর্বল।

এমন একটি সুন্দর উদ্যোগকে জন্য

অভিনেতৃ সংঘের বিলে জুন নাটকে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এবং অঞ্জনা ভৌমিক। পরিচালনা জানেশ মুখার্জি।

অমৃত হয়ে

কল্যাণী সংস্থা এবং নাট্যপরিচালক জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ।

ইউ টি সির 'বাদশা নসিবা'

একালের গ্রুপ থিয়েটারগুলির মধ্যে নাটা প্রযোজনার ক্ষেত্রে ইউ টি সি নাট্যগোষ্ঠী স্বাতন্ত্র্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। এর প্রমাণ পাওয়া গেল তাঁদের সাম্প্রতিক নাটক 'বাদশা নসিবা' দেখে।

এই নাটকের (নাটক ও সঙ্গীত দ্বাধারমক্ষ নেই) প্রধান সম্পদ কাহিনীকে সার্থকভাবে পরবেশনার ক্ষেত্রে ষ্টোটাল টিম ওয়ার্ক। সেদিক থেকে নাট্যকারের প্রচেষ্টা সফল। নাটকটি হৃদয়গ্রাহী করে তোলার কৃতিত্ব কেমন পরিচালক-অভিনেতা বিশ্বজিৎ চক্রবর্তীর।

অভিনয়ে নাটকটিতে যাঁরা জমিয়ে রেখে ছিলেন তাঁরা হলেন অনিল ভট্টাচার্য (হরিপদ), শঙ্কর পালুই (কেনু), বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী (অর্জুন), কৃষ্ণকুমু চৌধুরী (পদ্ম), জয়না পাল (খোকো) ও সুপ্রকাশ পালোল (ভোলা)।

মনসু বক্সী (সংঘর্ষ) ও সুবল ব্যানার্জীর (ভূষণ) অভিনয় স্বাভাবিক হয়েও যেন কিছুটা অতি অভিনয়ে ভারাক্রান্ত। কিন্তু কল্যাণ গাঙ্গুলী, স্বপন চক্রবর্তী ও রঞ্জিত দে স্বাভাবিক।

নাচ গানে ভরা নাটকটিতে উপভোগ্য দৃশ্য ও সংলাপ রয়েছে। দর্শক সে সব উপভোগ করবেন।

গানের সুর ও কথার জন্য রাধারমন বাবুকে ধন্যবাদ প্রাপ্য।

বৈদ্যনাথ নন্দীর আলো, রঞ্জিত দের মঞ্চ নাটকটিকে প্রাণবন্ত করে তুলেছে।

ইউ টি সি প্রযোজিত বাদশা নসিবা নাটকের একটি দৃশ্য

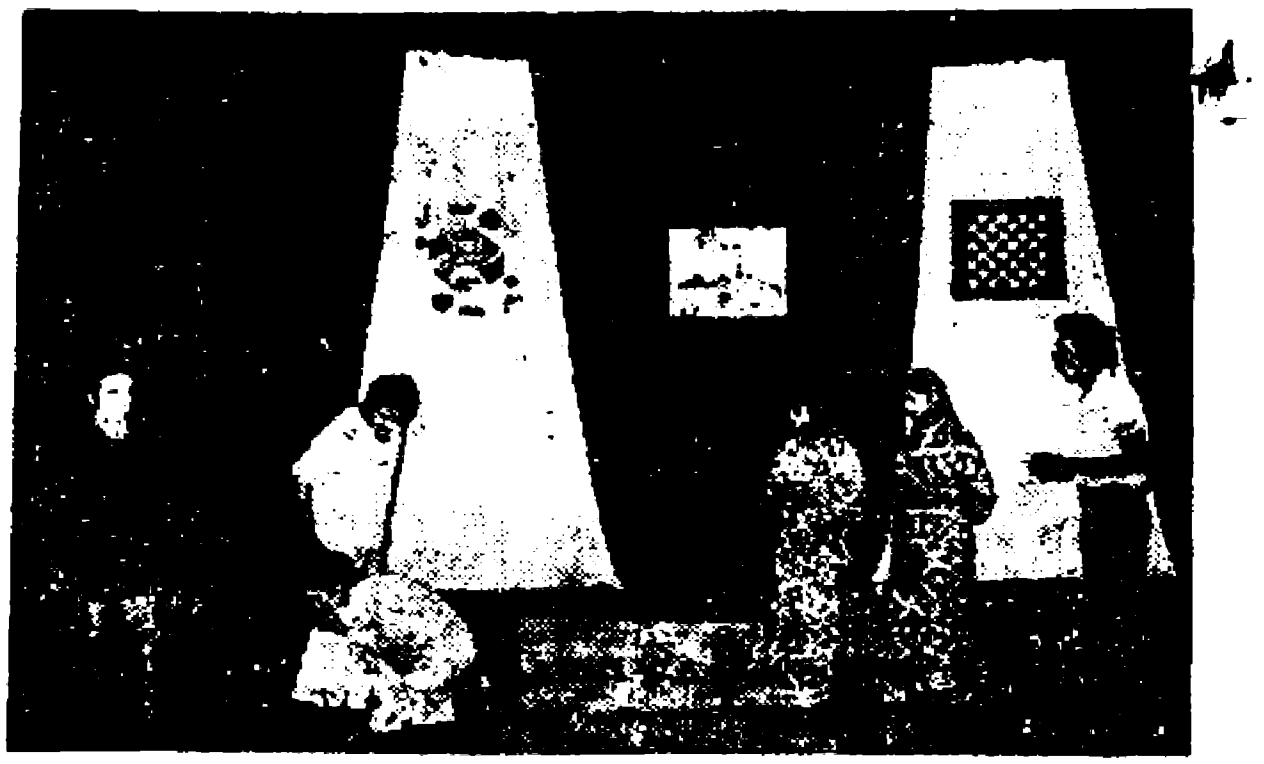

কোমল গান্ধার-এর 'নীলের পালা'

নীলকর সাহেবদের নিয়ে দীনবন্ধু মিত্রের নীল দর্পণ বাদে প্রথম বিদ্রোহী নাটক নয়, সেই নাটক এখন ক্ল্যাসিক সাহিত্যের পর্যায়ে। তারপর থেকে বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন ধারায় নীলকর সাহেবদের স্বেচ্ছাচারিতা এবং অত্যাচারকে উপজীব্য করে বহু লেখা হলেও সার্থক নাটক আর লেখা হয়নি মধ্যের দীর্ঘ সময়ের মধ্যে।

সেই অভাব বোধহয় কিছুটা পূরণ করলেন নাট্যকার চিত্তরঞ্জন ঘোষ। সম্পূর্ণ নতুন পটভূমিতে এবং দৃষ্টিভঙ্গীতে তিনি উপস্থাপিত করেছেন এই নাটকটি।

নাটকের নাম 'নীলের পালা'। প্রযোজনা করেছেন কোমল গান্ধার এবং নাটকটি পরিচালনা করেছেন অসিত মুখোপাধ্যায়।

এ নাটকের পটভূমি পূর্ববঙ্গ। চরিত্রগুলিও সেখানকার এবং সেই সঙ্গে নীলকর সাহেব।

দীনবন্ধু মিত্রর নীল দর্পণে সাধারণ শ্রেণীকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু চিত্তরঞ্জন বাবুর 'নীলের পালায়' প্রাধান্য পেয়েছে মধ্যবিত্ত (?) শ্রেণী। যাঁদের কাছে সম্ভ্রম নিয়ে বেঁচে থাকার সঙ্গে ইজ্জতের প্রশ্নটাও খুব বড়। এ নাটকের মূল কেন্দ্র এমন একটি পরিবার যাঁদের জীবনধারণ চাষের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হলেও সম্মানবোধ এবং সচেতনতা অন্যদের তুলনায় কিছুটা বেশী। তাঁদেরই ঘিরে ঘিরে এই নাটকের বিস্তার।

নাটকের প্রারম্ভ দৃশ্যটি এক কথায় অপূর্ব। যেন ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড় সমকালীন বাংলা দেশের কৃষ্ট সংস্কারে লালিত পল্লী বাংলার এক গ্রামের একটি সচ্ছল পরিবারের কাহিনীর সূত্রপাত ঘটানো হয়েছে মঞ্চে। দর্শকরা যেন সেই পরিবেশ অতীতে ফিরে গিয়ে একাত্ম হয়ে গিয়েছিল সেই পরিবেশের সঙ্গে এমন নিখুঁত অথচ সুন্দর সে পরিবেশ।

এ নাটকে বিদ্রোহের সুরটি যেমন সতত তেমনি নীলকর সাহেবের ফাঁদে পড়ে শেষ পর্যন্ত ইজ্জৎ দেবার ব্যাপারটিও বড় মর্মান্তিক। আর সবচেয়ে মর্মান্তিক হোল, নীলকর সাহেবের ইচ্ছাপূরণ এবং মিঠা শত্রু যে ঘটাল সেও এদেশীয় মানুষ এবং সেই পরিবারেরই ঘনিষ্ঠ আত্মীয়।

ছুটির ঘণ্টা

কাহিনী, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা: বরুণ কাবাসী

আত্মের সুরভি ছেলে কপি মেয়ে জন্তুদের মুক্তির আনন্দে ছুটে বেড়ায়। সে নিজে যেমন কোনো বাঁধন মানে না তেমনি অপরকেও করে মুক্ত। খাঁচার পাখীকে উড়িয়ে দেওয়া, বাঁধা গরুকে ছেড়ে দেওয়া ও জেলেদের জাল থেকে মাছ নিয়ে জলে ছেড়ে দেওয়াও হয় অবাধে। স্কুল না যাওয়াকে যে স্কুলের ছুটির ঘণ্টা বাজাতে কোনোদিন ভোলে না, এমন অনেককেও মুক্তির স্বাদ দিতে রোজ নিতে হয় নদীর পাড়। দিদিমণি কণা (মাধবী) তাকে বুঝতে পারে তাকে ভালবেসে কাছে টেনে নেয় মায়ের টানে। কিন্তু ছবির শেষে এক নিষ্ঠুর ঘটনার মধ্যে দিয়ে কণাকেও জীবন থেকে ছুটি নিতে হয়।

ছবি দেখে এটুকু নিঃসন্দেহে বলা চলে যে নির্মাতাদের আরও কিছুটা প্রস্তুতির প্রয়োজন ছিল। অগোছালো খাপছাড়া ও সংলগ্নতার অভাব থাকার ফলে কোনো চরিত্রই তেমন বিশ্বাসযোগ্য বা কোনো বক্তব্যও তেমন পরিস্ফুট হয়ে ওঠেনি। তবুও পরিচালক সাধুবাদ যে তিনি একটি ভাল আঙ্গিক ছবি করতে চেষ্টা করেছেন। কিছু দৃশ্য বা ঘটনা, যেমন গ্রাম্য যুবকদের একসঙ্গে বসে মদ খাওয়া ও তথাকথিত অশ্লীল বলা, অন্ধ গায়কের চোখদুটি বেরিয়ে শিল্পী হয়ে যাওয়া ও গানের কথা অনুযায়ী দৃশ্যাবলী (যা এই ধরনের ছবিতে প্রায়শঃ থাকে) এবং সংহিতাকে সহজ সেন্সর প্রমাণ ছবি থেকে বাদ দিলে ভাল হত। কণার ঘর আগুন লাগিয়ে ওইভাবে তাকে জীবন থেকে ছুটি না দিলেও চলত।

প্রধান চরিত্রের শিল্পীরা বিশেষতঃ মাধবী মুখার্জী ছবিটিকে উন্নতে বিশেষ সাহায্য করেছেন। তাঁদের চরিত্রায়ণ আমাদের বেশ ভাল লাগে। অপর দুটি ছোট চরিত্রে বিমল দেব ও ক্রাই বাবা ভাল অভিনয় করেছেন। অমল মুখার্জীর সুরে রবির গানগুলি সুন্দর। কলাকৌশলের কাজ মোটামুটি। তবে বাঁহুদৃশ্য ও ক্যামেরার কাজ ভাল।

চিত্রবিদ

সাধ করে বিয়ে দেওয়া ছেলের নাকে শেষ পর্যন্ত সংসারের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য নীলকর সাহেবের ইচ্ছার কাছে নতি স্বীকার করতে হয়েছিল। কিন্তু সেখানেই নাটকের শেষ নয়। তারপরের পর্বে তাকে যখন নীলকর সাহেবের হাতের থাবা থেকে উদ্ধার করে আনা হোল তখন প্রশ্ন দাঁড়াল সেই মেয়েকে আর সমাজে এবং সংসারে ফিরিয়ে নেওয়া চলে কিনা। কুচক্রী ব্রাহ্মণ শাসিত সমাজ তাকে দয়াপরবশ (!) হয়ে (নাকি এটাও একটা বাহাদুরী) গ্রামের বাইরে নির্বাসনের ব্যবস্থা করে দিল। কিন্তু সেই অল্প বয়সী স্ত্রীকে ভালোবেসে ফেলা স্বামী কি শেষ পর্যন্ত তা মেনে নিয়েছিল ?

এ নাটকে কাহিনী অনেক ঘটনাও অনেক। তা সত্ত্বেও নাট্যকার যেমন ঋজু রীতে তাকে বাস্তবসম্মত করে তুলেছেন তেমনি তার পরিবেশনে মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন পরিচালক অমিত মুখোপাধ্যায়। এমন একটি দীর্ঘ নাটককে সুষ্ঠুভাবে মঞ্চস্থ করা কম কৃতিত্বের কথা নয়।

তবে নাট্যকার এবং পরিচালক সমীপে একটি নিবেদন নাটকের কয়েকটি সংলাপে কিছুটা অসঙ্গতি (বিশেষ করে ছেলের মার মুখে নীলকর সাহেবের উদ্দেশ্যে গালির (সংলাপে) লক্ষ্য করা গেছে। এ সম্পর্কে বোধহয় একটু সচেতন হবার অবকাশ আছে।

অভিনয় আলাদা করে যেন কাউকেই চিহ্নিত করা যায় না, এমনি সুন্দর এ নাটকের টিম ওয়ার্ক। তবু বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে নায়কের (অর্থাৎ ছেলে) মা ও স্ত্রীর ভূমিকাভিনেত্রী। তাদের সহৃদয় অভিনয় ভুলবার নয়।

অভিনয়াংশে ছিলেন প্রদ্যোৎ চট্টোপাধ্যায়, রবীন মিত্র, বিশ্বনাথ মুখোর্জী নিশীথ, রহুল ঘোষ, অনন্ত ঘোষ, শ্যামল বসাক উজ্জ্বল সেনগুপ্ত শি কে চ্যাটার্জী, সুব্রত সমাদ্দার অপূর্ব বসু, কল্যাণ মুখার্জী, কমল রায়, বিজয় চৌধুরী মমতা চট্টোপাধ্যায়, কল্লোল গাঙ্গি, রাসবিহারী মান্না অঞ্জনা দে চাঁপক ভৌমিক শ্যামল মুখার্জী, ভবরূপ ভট্টাচার্য অক্ষয় রায় দেবকৃষ্ণ ব্যানার্জি প্রদীপ বসুরায় কৃষ্ণগোপাল সাহা সুশান্ত শীল মনল ঘোষ [illegible] মজুমদার মধুচৈতালী ভট্টাচার্য [illegible] সুস্মিতা বসু।

সঙ্গীতের প্রয়োগ (সুর দুলাল আদ্য) আবহ সঙ্গীত ভাস্কর মিত্র। বড় ভাল এবং পরিবেশ সৃষ্টির সহায়ক হয়েছে। দিলীপ প্রামাণিকের রূপসজ্জা বাস্তবানুগ। তাপস সেনের আলোর কাজ সাবলীল।

নানা রঙের দিনগুলি
রঞ্জিত মল্লিক

এমন একটি উল্লেখযোগ্য এবং বিশিষ্ট নাটক উপহার দেবার জন্য নাট্যকার ও পরিচালককে ধন্যবাদ।

কোমল গান্ধার এর 'নীলের পালা' নাট্য আন্দোলন ও প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট সংযোজন বলে স্বীকৃত হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

সারথীর সুখী রাজপুত্র

ইদানিং ছোটদের জন্য নাটক মঞ্চস্থ করার ঝোঁকটা যেন বেশ বেড়ে যাচ্ছে। এটা সত্যি খুব আনন্দের বিষয়। এবং এজন্য প্রযোজকদেরও ধন্যবাদ।

সম্প্রতি সুখী রাজপুত্র (অস্কার ওয়াইল্ডের হ্যাপি প্রিন্স অবলম্বনে। রচনা ও পরিকল্পনা সমীর ঘোষ) নামক একটি সুন্দর নাতিদীর্ঘ নাটক পরিবেশন করলেন সারথী গোষ্ঠী। ছোট ছোট বাচ্চারাও যে নাচ গান অভিনয় কেমন পারদর্শী যাঁরা এই নাতিদীর্ঘ নাটকটি দেখেছেন তাঁরাই তা সানন্দে স্বীকার করবেন।

এই নাতিদীর্ঘ নাটকের আর এক সম্পদ সলিল মিত্রের সঙ্গীত পরিচালনা। নৃত্য পরিকল্পনাও (পদ্মা মুখোপাধ্যায়) সুন্দর।

অনুষ্ঠানের পূর্বে শ্রীমান কুনাল ঘোষের ইলেকট্রিক গীটার দর্শকদের মাতিয়ে দিয়েছিল। এত চমৎকার তার বাজনা।

অবেক্ষণ-এর অভাগীর স্বর্গ

শরৎচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে অবেক্ষণ নাট্যগোষ্ঠী সম্প্রতি একটি সুন্দর নাটক উপহার দিলেন দর্শকদের। তাঁরা অভিনয় করলেন অভাগীর স্বর্গ। নাটকটি দেখতে দেখতে মনে হচ্ছিল শরৎচন্দ্রের গল্প বা কাহিনী যাচ্ছে যেন অম্লান। সেই সঙ্গে অভিনয়ও সুন্দর।

বিশেষ করে অভাগীর ভূমিকায় সীতা মুখার্জির অভিনয়ের যেন তুলনা হয় না। এমন আবেগমাখানো সংবেদনশীল উচ্চাঙ্গের অভিনয় তার।

সতীশের দেবনাথের কাশলীও সুন্দর। তবে বয়েস একটু কম হলে যেন ভাল হোত। পিসির ভূমিকায় সীমা বসুও সুন্দর।

অন্যান্য ভূমিকায় অনাদি বসু, স্বদেশ ব্যানার্জী, মৃন্ময় কুণ্ডু, সুশীল মুখার্জী উৎপল ঘোষ সুব্রত ঘোষ কিশলয় সেন অমিয় মজুমদার, বরেন রায়, নীলয় ও বরুণ বাবু অশোক ঘোষ সুনীল মিত্র বিশ্বনাথ পাল

দক্ষিণী

দক্ষিণী ভবন :: ১, দেশপ্রিয় পার্ক ওয়েষ্ট,
কলিকাতা-২৬ • ফোন : ৪৬-২২২২

পরবর্ত্তী শিক্ষাবর্ষ

আগামী মে মাস থেকে দক্ষিণীর যে শিক্ষাবর্ষ সুরু হবে তার জন্য নতুন শিক্ষার্থী ১লা এপ্রিল থেকে ভর্তি করা সুরু হবে। দক্ষিণীতে কেবলমাত্র রবীন্দ্রসংগীত ও শাস্ত্রীয় নৃত্যকলা শিক্ষাদান করা হয়। শিক্ষাগ্রহণ ও ভর্তির সময় : শনি, মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার বিকাল ৪—৮॥, রবিবার সকাল ৮—১২ ও বিকাল ৪—৬॥ এবং বুধবার বিকাল ৪॥—৭।

সুদেব গুহঠাকুরতা (কর্মাধ্যক্ষ)

অশোক বিশ্বাস. চমৎকার সংলাপ ও ছোট ভূমিকায় দীপালি দাস চরিত্রানুযায়ী এবং সুন্দর।

সঙ্গীত পরিচালনা মুকুলেশ চট্টোপাধ্যায় এবং গান কণ্ঠসঙ্গীতে কিশলয় সেন অপূর্ব। দীপক ব্যানার্জী সুচিত্রা বিশ্বাস লিখা গুপ্ত শ্রীলেখা যে সহজ অভিনয়ের মাধ্যমে নাটকের সৌষ্ঠব বাড়িয়েছে। বিপ্লব ব্যানার্জীর নেপথ্য কণ্ঠদান নাটকের চরিত্রকে ফুটিয়ে তোলায় সহায়তা করেছে।

সবশেষে ধন্যবাদ মানবেন্দ্র গোস্বামীকে চমৎকার নাটকটি নির্বাচন ও পরিচালনার জন্য।

'বহ্নিশিখা' নাট্যনিকেতনে

কলকাতার কর্মাশিয়াল থিয়েটার ব্যবসায়ীদের সম্প্রতি স্টার রঙ্গমঞ্চে পরিবেশন করলেন ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্ত রচিত 'বহ্নিশিখা' নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে। নাটক যে রীতিমত জমে উঠেছিল তা বোঝা গেছে দর্শকদের ঘন ঘন করতালিতে। অপেশাদার ক্লাবের নাটক পরিবেশনের ক্ষেত্রে এ বড় কম কৃতিত্বের কথা নয়।

অজিত বক্সী, অরুণ মুখার্জী সুব্রত সেনগুপ্ত অরুণ চৌধুরী, হৃষ্টি দাস দীপা দে 'শুভা চক্রবর্তী ও নীলিমা মণ্ডলের অভিনয় দর্শকদের প্রীতিমত বিস্মিত করেছে।

এছাড়া প্রেমেন্দু বসুমল্লিক, আশীষ গুপ্ত সলিল বিশ্বাস, অরুণ দত্ত অনেক কলাকুশলী দেবু বাগচী বৈদ্যনাথ মিত্র বিপুল

---

৫৩ সংখ্যা অমৃতে ২৮ পৃষ্ঠার আলোকচিত্রে অনুষ্ঠান প্রতিবেদনটির ভ্রমবশতঃ উল্লেখ করা হয়েছে। বিজয়া পালের স্থলে ১২৭৯ খঃ।

মুখোপাধ্যায় সত্যনারায়ণ ভৌমিক কালীপদ হেরম্ব রঞ্জন সেন এস এন ঠাকুর ও অন্য চরিত্র সুন্দর।

নাটকটি পরিচালনা করেছেন শ্রীমতী ব্যানার্জী।

নাট্য সমালোচক

জীবন নদীর প্রান্তে : সংসদ/কল্যাণী/মানবেন্দ্র ভট্টাচার্য

মহিলা 'সন্ধী' মহলের পক্ষ থেকে পরিচালনা করেন শ্রীমতী সুলেখা দেবী। বেতার শিল্পীবৃন্দ মলিনা দেবী, প্রকাশিকা পূরবকায়স্থ, সন্ধ্যা রায় (বাংলার শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী) আশাপূর্ণা দেবী (লেখিকা) এবং আরও বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি।

তপস্যা

প্রযোজনা : রাজশ্রী প্রডাকসন্স প্রাইভেট লিমিটেড

অধ্যাপক চন্দ্রনাথের বড় মেয়ে ইন্দু পোস্ট গ্র্যাজুয়েটের ছাত্রী হয়েও সংসারের সব দায়িত্ব নিজের হাতেই করে। ছোট ভাই-বোনদের শিক্ষা-দীক্ষাই হোক অথবা অসুস্থ পিতার পরিচর্যা হোক, সবকাজই ওর মনোযোগ বেশী। বাড়ীর বড় ছেলের সব দায় বাঁচিয়ে ইন্দুর উপর নিয়ে চন্দ্রনাথ বাবুও তাই নিশ্চিন্ত। আচমকা হার্ট অ্যাটাকে ইন্দু ভাবনায় চিন্তিত হয়ে পড়ে। এখন ওদের একমাত্র ভরসা পরিবারের বন্ধু ডাক্তার সাগর। সাগর ওকে পরামর্শ দিল ছোট ভাই-বোনদের নিয়ে ওদের বাড়ীতে এসে থাকতে। ইন্দুরও সাগর এবং তার সঙ্গে ইন্দুর পরিচয় করিয়ে দিয়েছে ভাবী স্ত্রী হিসেবে। তবু ইন্দু লজ্জায় তার নিজের ও ছোট ভাই-বোনদের সব দায়িত্ব সাগরের উপর চাপিয়ে দিতে পারলো না। বাড়ীতেই সে ওদের জন্য একটা স্কুল খুলে ভাইবোনদের মানুষ করে তুলল। এক সময় ছোট ভাই একটা ভাল চাকরীও পেল। কিন্তু সর্তে হোল, তার বিনিময়ে তাকে ঘর-জামাই হয়ে থাকতে হবে। সুতরাং উচ্চ পদের লোভে ছোট ভাই বাড়ী ছেড়ে গেল। ইন্দু প্রনেক চেষ্টা করে ছোট ভাই-বোনের বিবাহ দিল। এরপর অনেক চমকপ্রদ ঘটনার শেষে ইন্দুর সঙ্গে ছোট ভাইয়ের ভুল বোঝাবুঝি মিটে গেল। সাগরও ইন্দুকে স্ত্রী হিসাবে পেল এতদিন বৈধ ব্যবধানের পর। এখন অবশ্য দুজনেই যৌবন অতিক্রম করেছে।

আশাপূর্ণা দেবীর মূল কাহিনীকে সর্বভারতীয় দর্শকদের জন্য চিত্রনাট্যকার পরিচালক অনিল গাঙ্গুলী যে পরিবর্তন করেছেন সেজন্যেই কিছু কিছু দৃশ্য ছাঁদকাটা হয়ে পড়েছে এবং রিলিফের জন্য নাচ-গান ও কৌতুক দৃশ্যের প্রয়োজন হয়েছে। দুর্বল চিত্রনাট্য ছাড়া ছবির পরিচালনা, অভিনয় ও অন্যান্য এক কথায় চমৎকার। ইন্দুর ভূমিকায় রাখীর অভিনয় এককথায় অসাধারণ। অন্যান্য ভূমিকায় পরিচালক মাস্টার সাগর আসবানী ছোট নায়ক তরুণ রায়। আশা ও গীতা দুই বোন। এর অভিনয় বাস্তবানুগ। বিশেষ করে মধ্যবিত্তের আত্মসম্মানবোধ গ্রহণ করার দৃশ্যে বিশেষ নজরকাড়া। রবীন্দ্র চ্যাটার্জির সঙ্গীত পরিচালনাও সুন্দর।

চিত্রদূত

বিবিধ সংবাদ

নাচ উঠে সংসার

রিগাল থিয়েটারের সঙ্গীতবহুল ছবি 'নাচ উঠে সংসার' বর্তমানে মুক্তি প্রতীক্ষায়। এতে নায়ক নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন শশী কাপুর ও হেমা মালিনী। অন্যান্য ভূমিকায় আছেন অরুণা ইরাণী, সুসমি গাঙ্গুলী, রাজেন্দ্রনাথ, তিওয়ারী ও ভি গোপাল। লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলাল ছবির সুরকার এবং কাহিনীকার এ কে আগরওয়াল ও গীতিকার মজরুহ সুলতানপুরী। ছবিটি পরিচালনা করেছেন ইয়াকুব হাসান রাজভী এবং ছবিটি প্রযোজনা এর চিত্রনাট্য ও সংলাপ রচয়িতা মাহমুদ সারোজ।

জাতির স্মরণীয় দিনে অভিনব শিশু উৎসব

ভাই-বোনেদের আসরের মাধ্যমে শতাধিক বিদ্যালয়ের সহযোগিতায় এবারেও জাতির স্মরণীয় দিন ২০শে থেকে ২৬শে জানুয়ারী চারদিনব্যাপী সুপরিকল্পিত অনুষ্ঠানের সাহায্যে সোনারপুরে এক শিশু-উৎসবের আয়োজন করা হয়।

এবারের অনুষ্ঠান-সূচিতে ছিল—দেশাত্মবোধক সঙ্গীত নৃত্য-নাটক ছড়াকারী নৃত্য আন্তঃ বিদ্যালয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও সমবেত কণ্ঠে দেশাত্মবোধক সঙ্গীত প্রতিযোগিতা শিক্ষাগুরুর প্রতি ভক্তি রাখা অনুষ্ঠানে শিক্ষক-সম্বর্ধনা।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, আনন্দের মাধ্যমে শিক্ষা দেবার এই অভিনব পরিকল্পনায় শিশু-উৎসবের আয়োজন ও পরিচালনা করেছেন শিশু-সাহিত্যিক বিজনকুমার গঙ্গোপাধ্যায়।

ভি শান্তারামের নতুন ছবির কাজ সুরু

জুনেজ ছবিটি মুক্তিলাভ করার পর পরই প্রবীণ পরিচালক ভি শান্তারাম তাঁর পরবর্তী ছবি ছানি-র কাজে হাত দিয়েছেন। একটি গান রেকর্ডিং করে তিনি শুটিং শুরু করলেন।

হৃদয়নাথ মঙ্গেশকরের সুরে গান গাইলেন আশা ভোঁসলে ও লতা মঙ্গেশকর। গান লিখেছেন ভরত ব্যাস। এ ছবির একটি বড় আকর্ষণ ভি শান্তারামের নাতনীর নাতি সুশান্ত রায়ের মুখে গান। সে এ ছবিতে অভিনয়ও করছে। সুশান্ত চার বছর বয়সে প্রথম জন্মদিন মহফিলে নৃত্য দিন বিজলিতে অভিনয় করে।

ছানি ছবির কাহিনী নেওয়া হয়েছে সি টি খানোলকরের বাস্তবধর্মী উপন্যাস থেকে এবং সংলাপ লিখেছেন রজেন্দ্র গৌড়।

ছবিটি সম্পূর্ণ আউটডোরে তোলা হবে। আগামী মাস থেকে ভি শান্তারাম তাঁর শুটিং শুরু করছেন।

বাঙলা ছবি

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাব উৎসব

গত দোল পূর্ণিমার দিন শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর পুণ্য আবির্ভাব লগ্নে দেশপ্রিয় পার্কে যে মহোৎসবের সূচনা, তা চলে তিনদিন ধরে। প্রতিদিনই হাজার হাজার ভক্ত নরনারীর সামনে পূজা, প্রার্থনা ও ধর্ম-সভার সঙ্গে প্রখ্যাত শিল্পীদের ভক্তিমূলক গান ও মহাপ্রভুর জীবনী অবলম্বনে নৃত্য-নাট্য পরিবেশিত হয়।

অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণের পর শেফালী ঘোষ গাইলেন উদ্বোধন সঙ্গীত। সঙ্গীত নয় মহাপ্রভুর নামগান।

অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন বিচারপতি শঙ্করপ্রসাদ মিত্র, উদ্বোধনী ভাষণ দেন পণ্ডিতপ্রবর জ্যোতিময় নন্দ, মহাপ্রভুর জীবনে ঘটে যাওয়া অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ করে বলেন প্রধান অতিথি ডক্টর মহানাম-ব্রত ব্রহ্মচারী, প্রচুপাদ মদনমোহন গোস্বামী নিবেদন করেন মহাপ্রভুর সেবা ও প্রেমভক্তি দর্শনের কথা। শ্রীতুষারকান্তি ঘোষও তাঁর বক্তব্য রাখেন অনুষ্ঠানে।

তারপর ভক্তিগীতির আসরে এক এক করে উদাত্ত কণ্ঠে কীর্তন ও ভজনে দেব-বন্দনা করলেন মানবেন্দ্র মুখার্জি হেমন্ত মুখার্জি সতীনাথ মুখার্জি রামকুমার চাটার্জি সনৎ সিংহ কেতু মুখার্জি উৎপলা সেন, ইলা বসু শেফালী ঘোষ, মাধবী গুপ্ত হৈমন্তী শুক্লা ছবি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। রাধাকান্ত নন্দী, অমিয়া মুখার্জি সুদর্শন দাস, ভ্রমর দাস, নীরেন দে, স্বপন মিত্র আবু সান শুকদেব গোস্বামী, শ্রীকুমার চাটার্জি গৌরাঙ্গ দাস বিজেন সেনগুপ্ত প্রমুখ মুকাভিনয় করেন।

নিমাই সন্ন্যাস পরিবেশন করেন শিশির-কুমার ইন্সটিটিউটের সদস্যরা। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। দ্বিতীয় দিন কৃষ্ণকথা পরিবেশন করেন রাধাকৃষ্ণ আচার্য পরে ভারতীয় শিল্পী পরিষদ নিবেদন করেন শ্রীচৈতন্য নাটানাট্য।

সুইডেনের ছবি

ছাড়াও গত ফেব্রুয়ারী মাসে স্টকহোম মেট্রোপোলিটান থিয়েটার মূল পাপেট দল নিয়ে ভারতবর্ষ ভ্রমণ করে গেলেন। এই বিশ্ববিখ্যাত পাপেট থিয়েটার দল আমেদাবাদ উদয়পুর বোম্বাই ও নয়া-দিল্লীতে দি লিটল প্রিন্স অভিনয় দেখান। এ নাকি এক বিরল অভিজ্ঞতা। দুঃখের বিষয় কোলকাতার দর্শকরা সেই আনন্দ ও সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হোন।

নিউ এম্পায়ারের আকর্ষণ

নিউ এম্পায়ারের বর্তমান ছবি 'এন্টার দি ড্রাগন' যাঁরা দেখেছেন তাঁদের কাছে খুবই আকর্ষণীয় হবে সন্দেহ নেই। ছবিটি যেমন ক্ষিপ্রগতি তেমনি এ্যাকশনে ভরা। ছবিতে অনেকগুলি স্থলে হয়ে বসে দেখার মত দৃশ্য আছে। বিশেষ করে জুজুৎসু পাঁচ ও মারের দৃশ্যগুলি খুবই দর্শনীয়। বুস লী, জন স্যাকসন ও বব ওয়াল প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করেছেন।

সম্প্রতি এই ছবিটি পরিচালনা করেছেন রবার্ট ক্লোস।

পল মিউনির ছবির উৎসব

পল মিউনি আজকের যুগের চলচ্চিত্র দর্শকদের কাছে হয়ে একটি অপরিচিত নাম নয় একটি কিংবদন্তী। কলকাতায় কিছুকাল আগেও মিউনির বই দেখতে পাওয়া যেত, আজকাল আর যায় না।

সম্প্রতি ইউসিসের এক চলচ্চিত্র উৎসবে তাঁর অভিনীত চারটি ছবি দর্শকরা দেখতে পেলেন। বই চারটির নাম গড আর্থ, আই এ্যাম এ ফিউজিটিভ ফ্রম চেইন গ্যাং দি স্টোরী অফ লুই পাস্তুর এবং তাঁর শেষ ছবি দি লাস্ট অ্যাংরি ম্যান।

বলাই বাহুল্য এই ছবিগুলি দেখতে পাওয়া দর্শকদের এক বিরল সৌভাগ্য। উদ্যোক্তাদের এজন্য ধন্যবাদ। এই ছবিগুলির

সবে মাঝেন। 'মটাক্ত ডেওতা
পুরু করে নি পেরে ভার ভাবিং মিল
মল কাজই হয় এখানে। আর
ধাপোয়াই করতে হয় সতেরো বছর

ছোটবেলায় বিজ্ঞানের ছাত্র
'ডলস লাইন্স' বই পুরো প্রবীণ প
ছে ড় ধরলো। শ্রীইরাণীর কাছে
সহর শিক্ষানবিশী করার পর ভাতে
ডাক্তি কেলা সুরু হলো আর্থার ড
ধাছে, এখানে না—সেখান পার।

সন্ধ্যেভাবে অ্যাক্ট রেকর্ডিস্ট
সতেরো বছরের প্রথম ছবি 'নিল ডক্টর
(১৯৫৮)। তখন তিনি ভারত
টি ডিওয় কাজ করছেন। এই সূত্র
থেকেই সত্যজিৎ মুখ দেখলেন
করকে ছবির মধ্যে পাশী মিত্রের
ইন্ডিয়া ন্যাশনেটারী ব্যাঙ্কে ট্রাফিক
এ এসে গেছেন। এখনও আছেন
খানে। সাউন্ড রেকর্ডিস্ট হিসাবে ঐ
চু ছবির অনারম্ম পাচ্ছলাহ তিনি

ইতিমধ্যে কমেপাণ্ডেন্স
পাণ্ডলির এ এম বাই ই টি
পেয়েছেন। স্বাধীনতা বছর পাত্রেক
ভেদ নাগের সঙ্গে যুক্তলে

CENTRAL LIBRARY

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। পরিচালনা সলিল সেনগুপ্ত। প্রযোজনা

...ভুলো এলো ... চরণে ... ধরচাঁদবুরী, কৌশিক বসু, এস পি ...
...রধার কেন ঠিকানা ও ... মুখোপাধ্যায়, হেমন্তী শুক্লা, গোয়েছেন শিবাজী ...
...ন অরুণ মুখোপাধ্যায়, জটিলেশ্বর পাধ্যায়ের সুরে। ললিতা ধরচাঁ...
...ধ্যায় ও বনশ্রী সেনগুপ্ত। কণ্ঠ সুন্দর, তবু বলব ...

...ট ডিস্কের প্রথমটি তরুণ শিল্পীদের গানের সাফল্যে একটা ...ভড় অংশ ...
...ট নামীদের। প্রতিটি গান বিশ্বাসের মতো সুর ...
...ই শুধু নয়। বাংলা গানে স্বখন যুগে এ দুটি ডিস্ক যেন মধু-
ওয়েসিসের স্বপ্ন। অশোক ধায়

ডিস্কটির মধুর সুরের রূপকার।
আমাদের অনেক ধন্যবাদের তিনি
...য়। 'নূপুর চরণে' গানটি যে বার-
...তে ইচ্ছে করে সে কৃতিত্ব কার?
মুখোপাধ্যায়ের? না অশোক
—অনেকদিন বাদে জটিলেশ্বর
...ধ্যায়ের কণ্ঠ বড় ভালো লাগলো।
...গানগুলিও প্রাণকে ছুঁয়েছে
...ধুনিক গানের সিন্থেসিস এবার
...শুরু নতুন সংযোজন এবং
...ও। অন্যান্য শিল্পীরা হলেন ললিতা ধরচাঁদবুরী, কৌশিক বসু, এস পি ...
পাধ্যায়ের সুরে। ললিতা ধরচাঁ...
কণ্ঠ সুন্দর, তবু বলব ...
গানের সাফল্যে একটা ...ভড় অংশ ...
হেমন্ত বিশ্বাসের মতো সুর ...
স্বখন যে চেহারা যেন দাঁড়িয়ে নিয়ে
কৌশিক বসুর।

...ই পি ডিস্কে ছটি গানে গেয়েছেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ও ...ভাদুপুরী শ্যামলী মুখোপাধ্যায়। স... মুখোপাধ্যায়ের গানের আলোচনা নিষ্প্র...জন। কিন্তু শ্যামলী মুখোপাধ্যায়ের ...গতে এক নতুন আশ্বাস। তাঁর গা... গান দুটি হোলো 'তারবার নিজে' ...আমার কি আছে আর'।

আধুনিক গানের আর একটি ই... ডিস্ক সু-পরিবেশিত চারটি গানের ...স্বর হলেন উৎপলা সেনগুপ্তা ও সু... সরকার।

CENTRAL LIBRARY

শ্রীশ্রীলক্ষ্মী
অসীমকুমার ও ললিতা চ্যাটার্জি

নিমলেন্দু চৌধুরীর পরিচালনায়— একটি সুন্দর ছোটদের ছবি ছুটিয়েছেন স্বপ্নের রাত, অতীন বন্দ্যো, প্রসাদ কুমার, পীনাকী সেনগুপ্তা, ভানুজী পাল, শীতল চৌধুরী ও গোপাল বসু। পরীগীতি সংকলন এই ছবির শীতল নিয়ে হেলেন মায়ামুখার্জি ও চন্দ্র আবেদন গান।

শম্ভু মহারাজের শিল্পীরা। অতসী ঘোষাল, ভোলা ঘোষ, সমিতা ঘোষ, তাপসী ঘোষ সুতপা বাগচী সুরঞ্জনা মুখোপাধ্যায় ও কমলেশ ঠাকুর। অনুষ্ঠানের গান শুনিয়েছেন হেলেন মুখোপাধ্যায়ের সংগীত পরিচালনায় সমর চট্টোপাধ্যায়ের কথা ও সুরে।

রবীন্দ্রসংগীতের রেকর্ডগুচ্ছে একটা বড় পাওনা হেমন্ত কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠের দুটি গান ওগো সুরবাসী ও একলা চলেছি এ ভবে। এই ইপি ডিস্কটির অপরদিকে হেমন্ত সবাধিকারীর কণ্ঠের দুটি গান তুমি নব নব রূপে ও পাখা বনে। এবার আরো পরিচয়।

অন্য দুটি ইপি ডিস্কে ৮টি সুনির্বাচিত গানের একটি চারখানি গান ওরে মাঝি, পাগল যে তুই নির্নিমেষ মোর নয়নে ও লেছে তোমার নাম আর একটি ডিস্কে দুই তরুণ শিল্পী রীতা ঘোষ ও শঙ্কর চট্টোপাধ্যায় খুব আন্তরিকতার সাথেই গেয়েছেন মহাদেব এ কি মায়া ও নীল আকাশের কোনে কোনে এবং তোমার দুয়ার খোলার ধ্বনি ও তার অন্ত নাইগো। নজরুল গীতির রেকর্ড একখানিই। সে হেমন্ত চারখানা বাগপ্রধান গেয়ে ও তরুণ চক্রের হাতে তুলে দিতে ভুল হয় না। সুকুমার মিত্রের পরিচালনায় তিন গেয়েছেন তারে ডেকে ও এই কোন সংগীতা অপনি রাধা বলে নেম যমুনা ও জাগো সাকী হয় সবাই।

আর একটি ইপি ডিস্কে সুরে উজ্জ্বল করে তুলেছেন বুদ্ধা গুহঠাকুরতা ও ভূপেন হাজারিকা। এক পক্ষ শোনা যায় তাঁদের যুগ্ম কণ্ঠের দুটি গান হেমেন হাজারিকার সুরে। মূল অসমীয়া গানের বাংলা অনুবাদ করেছেন শিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। অন্যদিকে চারখানি গান সুরসুরে গেয়েছেন ভূপেন হাজারিকা।

কয়েক বছর আগে গ্রামোফোন কোম্পানী 'চাউন মেমরি লেন' শীর্ষক এল পি ডিস্কে কিছু পুরোনো গানের সংকলন করেছিলেন। এবার কমল দাশগুপ্তের প্রতি সম্মানার্থে তাঁরা প্রকাশ করেছেন তাঁরই সুরে তাঁর সহযোগী গীতিকারদের (প্রণব রায়, মোহিনী চৌধুরী, সুবোধ পুরকায়স্থ, গিরীন চক্রবর্তী) গান। গেয়েছেন একালের জনপ্রিয় শিল্পীরা মান্না দে, ফিরোজা বেগম, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মাধুরী চট্টোপাধ্যায়, তালাত মাহমুদ ও সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। এক যুগের সুরকার ও গীতিকারদের গান অপর যুগের শিল্পীর কণ্ঠে অনুরণিত। এ মিলনেরও একটা আলাদা দাম আছে। ভাল-মন্দ লাগা ব্যক্তিগত রুচি অনুচর ব্যাপার। বলতে ভুলেছি পরিপূর্ণ ভোজের পর এক কাপ কফির মতই উপভোগ্য সুশীল মজুমদার ও

সম্প্রদায়ের নকসা 'চোখে চোখে মাসতুতো ভাই'। বুদ্ধিদীপ্ত কৌতুক কাহিনীর রচয়িতা হলেন গোবিন্দচন্দ্র দে।

সুনন্দা পট্টনায়ক ডক্টরেট উপাধিভূষিতঃ সংগীতালঙ্কার শ্রীমতী সুনন্দা পট্টনায়ককে গন্ধর্ব মহাবিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে ডক্টর অফ মিউজিক উপাধিভূষিত করা হয়েছে। হিন্দুস্থানী সংগীতের ওপর তাঁর অনন্যসাধারণ অধ্যবসায় ও একনিষ্ঠ সাধনার প্রতি সম্মান দেখিয়ে। গন্ধর্ব মহাবিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীবিমলচন্দ্র মজুমদারিয়া (দিল্লী) কটক এসে একটি বিশেষ অনুষ্ঠান তাঁর হাতে উপাধিপত্র অর্পণ করেন।

গঙ্গাপুরী মিউজিক কলেজের সংগীতানুষ্ঠান

সম্প্রতি টালিগঞ্জ স্থিত গঙ্গাপুরী মিউজিক কলেজের প্রয়াগ সংগীত সমিতির অন্তর্ভুক্ত। তৃতীয় বার্ষিক সংগীত সম্মেলনী অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। বহু বিশিষ্ট শিল্পী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। কলেজের অধ্যাপক অধ্যাপিকা এবং ছাত্রছাত্রীগণ গান বাজনা ও নৃত্য পরিবেশন করে অনুষ্ঠানটিকে আরও মনোজ্ঞ করে তোলেন। ছাত্রীরা পরিবেশন করে কবিগুরুর 'আপনি মোরে নাচালি'। অপূর্ব ছন্দোময় নৃত্য দর্শকদের মন কেড়ে নেয়। তবলায় শ্বেতা লহরা পরিবেশন করে কলেজের ছাত্র গণেশ ভট্টাচার্য এবং দীপু বোস।

উচ্চাঙ্গ সংগীত পরিবেশন করেন কলেজের অধ্যাপক বিমল ভট্টাচার্য। তাঁর সুমিষ্ট গলায় প্রথমে রাগ নন্দ এবং পরে দুহরী শ্রোতাদের মুগ্ধ করে দেয়। তাঁর গানে মীড়ের কাজ এবং তান শ্রোতাদের বিস্ময়াবিষ্ট করে রাখে। তাঁর গলায় সুরের মূর্ছনা ও কাজের বাহার তাঁর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সূচক। তাঁর সঙ্গে পাখোয়াজে তবলায় সহযোগিতা করেন প্রণব ভট্টাচার্য।

সব শেষে যুগলবন্দী পরিবেশন অনুষ্ঠান টিকে সার্থক করে তোলে। যুগলবন্দী পরিবেশনে ছিলেন জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ (হারমোনিয়াম), পান্ডিত চিত্ত ঘোষ (বেহালা) এবং শ্রীশঙ্কর ঘোষ (তবলা)। প্রথমে রাগ বেহাগ এবং পরে দুহরী পরিবেশন শ্রোতাদের মন ভরিয়ে দেন এই যুগ্ম।

চিত্রাঙ্গদা

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস ২ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা ৩ হইতে মুদ্রিত ও ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা ৩ হইতে প্রকাশিত।

20 MAR 1975

CENTRAL LIBRARY

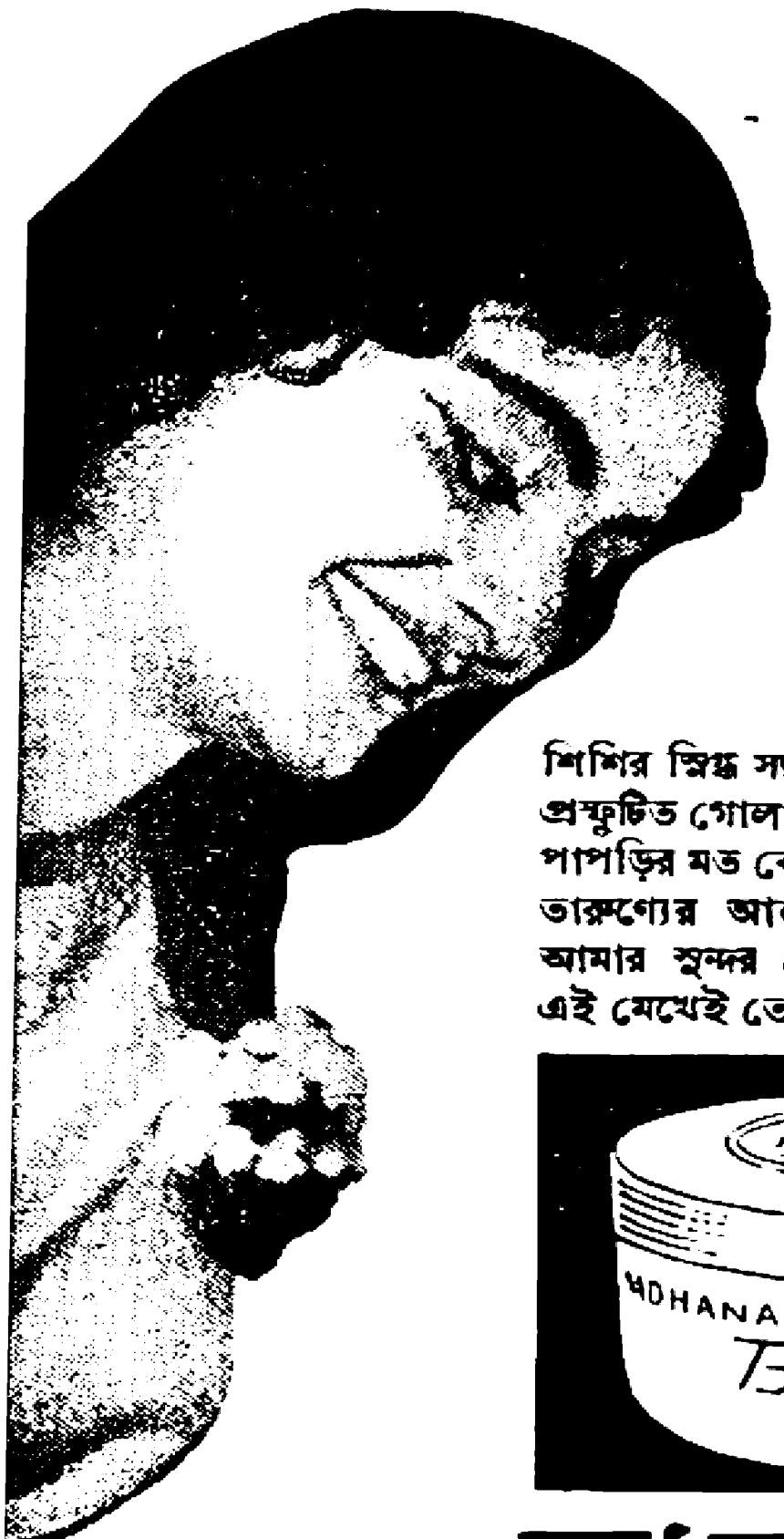

এর কোমল স্পর্শে সৌন্দর্য বিকশিত হয়

শিশির স্নিগ্ধ সন্ত
প্রস্ফুটিত গোলাপের
পাপড়ির মত কোমল ও
তারুণ্যের আভায় উজ্জ্বল
আমার সুন্দর দেহশ্রী
এই মেখেই তো।

সাধনা
বিউটি স্নো
একটি অতি আধুনিক
অঙ্গরাগ

SBS-৯/70

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা
কলিকাতা-৫

AMRITA

অমৃত

সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ /

৯ এপ্রিল ১৯৭৬ ॥ মূল্য ৭৫ পয়সা

CENTRAL LIBRARY

UNIVERSITY

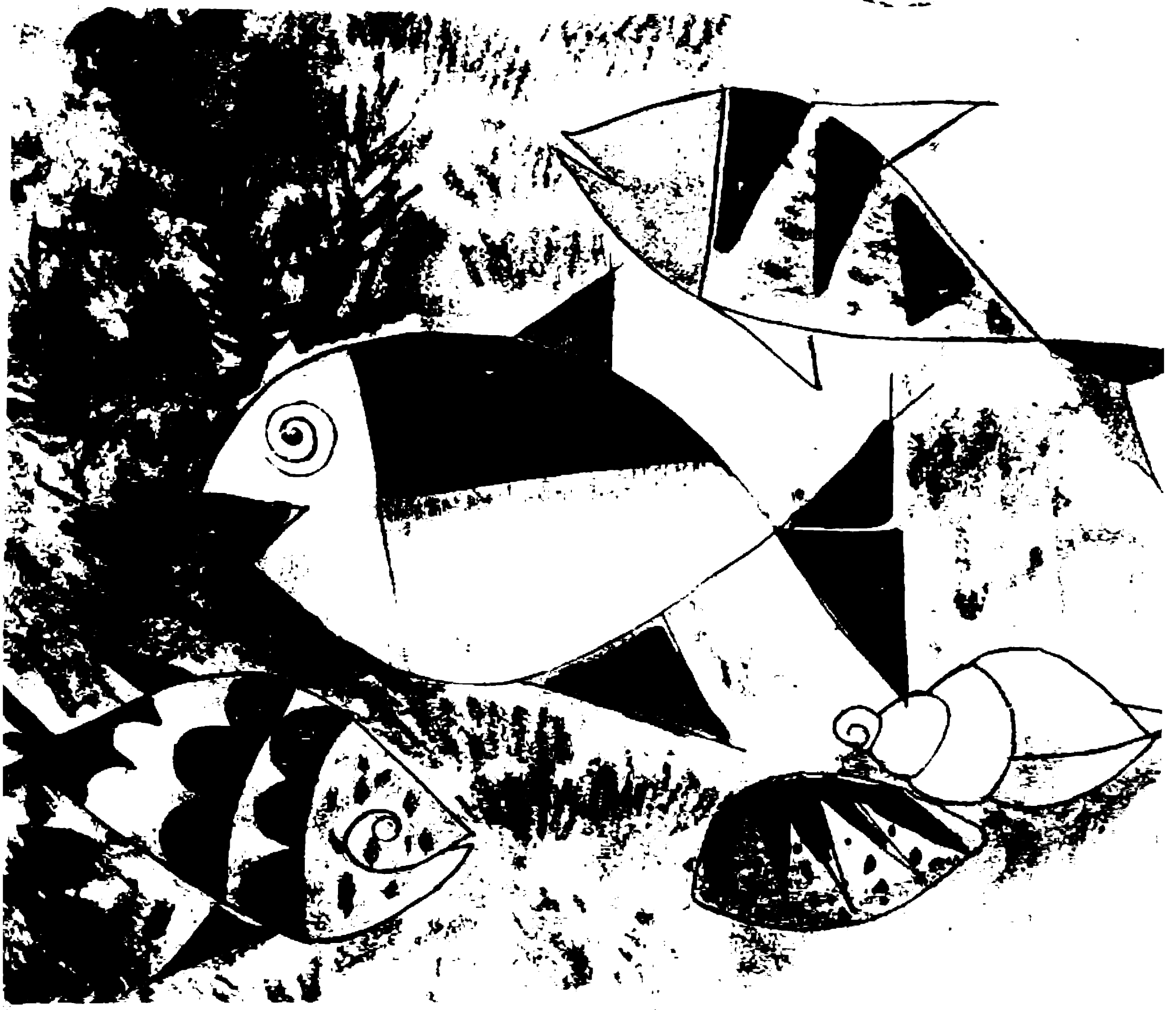

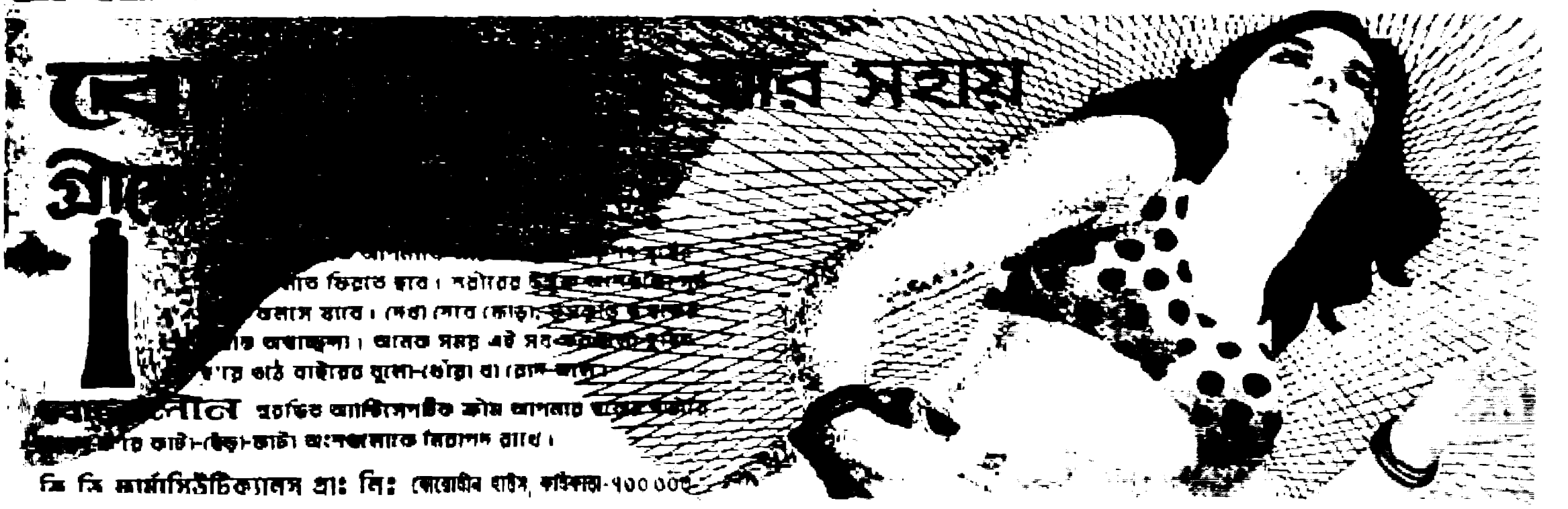

CENTRAL LIBRARY

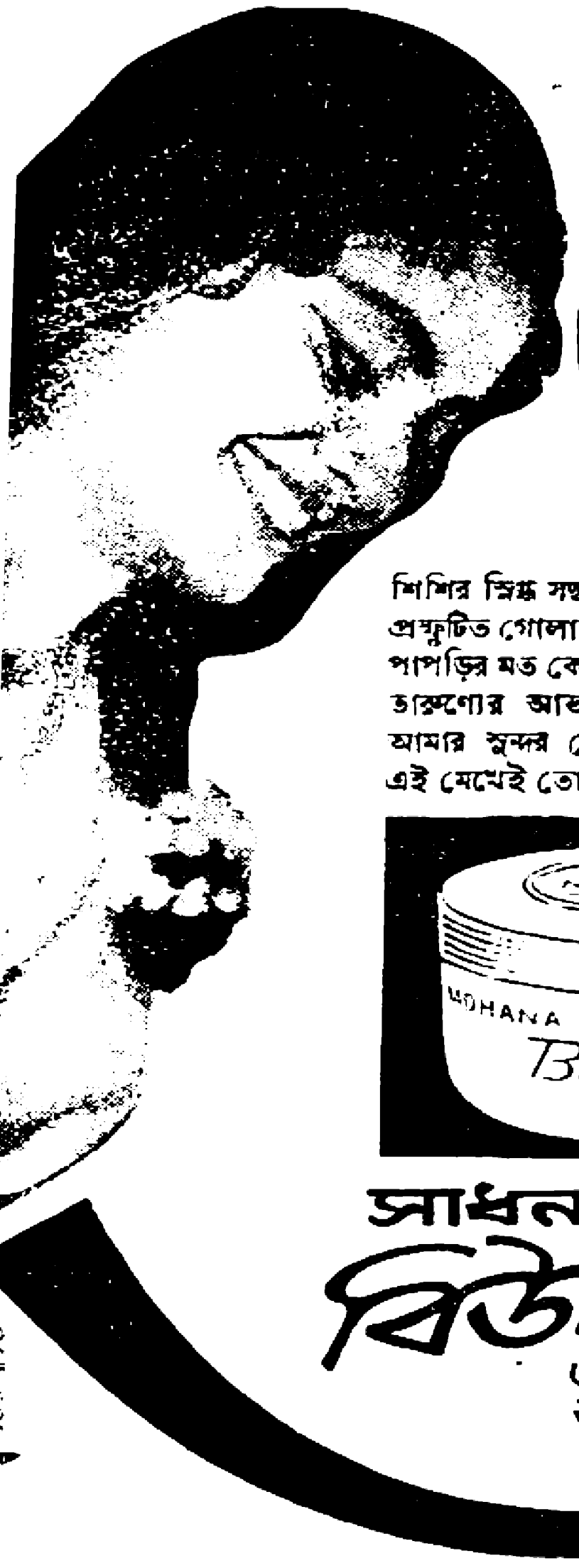

এত কোমল স্পর্শে
সৌন্দর্য
বিকশিত হয়

শিশির স্নিগ্ধ সন্ত
প্রস্ফুটিত গোলাপের
পাপড়ির মত কোমল ও
তারুণ্যের আভায় উজ্জ্বল
আমার সুন্দর দেহশ্রী
এই মেখেই তো !

সাধনা
বিউটি স্নো
একটি অতি আধুনিক
অঙ্গরাগ

১০১.৩/৭৩

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা
কলিকাতা-৫

ভৃগুজাতকের নবতম সৃষ্টি

১৩৮৩ কেমন যাবে ও বর্ষফল পঞ্জিকা

সম্পূর্ণ পঞ্জিকা সঙ্গে বাড়তি ৫৭ রাশির ফলাফল জানতে একমাত্র বই।

॥ দাম চার টাকা ॥

॥ প্রকাশিত হয়েছে ॥

সৈয়দ মুজতবা আলীর

পরিবর্তনে অপরিবর্তনীয়

নয় টাকা

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের

রঙিন সাঁঝে

নয় টাকা

সমরেশ বসুর

সুপ্রভাতা

নয় টাকা

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

গুপ্তধনের চাবি ৬

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের

বন্ধনে ফেরা ৭॥

পদ্মশ্রী আশাপূর্ণা দেবীর

অলৌকিক সৈনিক ৭॥

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের

মনে মনে খেলা ৬॥

বারীন্দ্র ভদ্রের

নক্ষত্রলোকের দেবতাত্মা ১৪

জনারণ্যে একমুখ ১৪

॥ পুনর্মুদ্রণ বেরিয়েছে ॥

লীলা মজুমদারের

আর কোনোখানে ১০

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

গল্পাবেগম ১২

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

অনুবর্তন ১২

অশোকজ মুখোপাধ্যায়ের

সাত পাকে বাঁধা ১০

জরাসন্ধের

নিঃসঙ্গ পথিক (২য় খণ্ড) ১৮

প্রমথনাথ বিশীর

কেরী সাহেবের মুন্সী ১৫

বাংলা শুভ নববর্ষে আমরা আমাদের পাঠক সাধারণ, ক্রেতা বন্ধু, পৃষ্ঠপোষকগণ, পুস্তক বিক্রেতা বন্ধুগণ ও সম্মানিত লেখকবর্গকে জানাই শুভেচ্ছা ও প্রীতি নমস্কার।

১৩৮৩ সালে বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সংযোজন

বিমল মিত্রের নবতম উপন্যাস

যে অঙ্ক মেলেনি

চিন্তাবিদ বা মহৎ লেখকদের মধ্যে আবার সব সমস্যাকে সব মানুষকে এক সূত্রে গাঁথবার চেষ্টা চলেছে। সারা পৃথিবীর সমস্ত মহৎ সাহিত্যিকের এখন এই একই লক্ষ্য। অর্থাৎ বৈচিত্র্যের মধ্যেও একটা ঐক্যসাধন প্রচেষ্টা। লেখকের এই নূতন উপন্যাসটি এই চিন্তা ভাবনা থেকেই উদ্ভূত।

১লা বৈশাখ প্রকাশিত হচ্ছে। দাম বারো টাকা

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ,

১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-১২
৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯

মশার দৌরাত্ম্যে প্রাণ যায়!

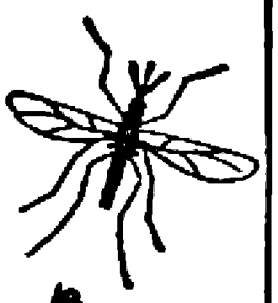

তাহলে ব্যবহার করুন

ওডোমস

কয়েক ঘন্টার মশা বিতাড়ক

লক লক লোক এর ওপর নির্ভর করেন আর এটাই ব্যবহার করেন • শিশুদের পক্ষেও সম্পূর্ণ নিরাপদ

বালসারা
উন্নততর জীবনযাত্রার
আধুনিক সহায়ক
BALSARA

SHAITRA BLS 45 BEN

১৫ বর্ষ

অমৃত

সংখ্যা ১৫

"ইন্ডিয়ান অ্যান্ড ইস্টার্ণ নিউজ পেপার্স সোসাইটির সদস্য"

Friday, 9th April, 1976 শুক্রবার, ২৬ চৈত্র, ১৩৮২

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
৬	সম্পাদকীয়		
৭	ভূমিকম্প	(গল্প)	শ্রীমানব ভট্টাচার্য
১৬	সাহিত্যের খেলাধুলো		শ্রীশৈলিলা চক্রবর্তী
১৯	এই বাংলোর খবর		শ্রীবেদদত্ত
২০	বিদেশের কথা		শ্রীপুলকরাজ
২১	শরৎচন্দ্রের পথের দাবী— বাজেয়াপ্ত ও বাজমুক্তি		শ্রীপ্রফুল্ল মুখোপাধ্যায়
২৪	অতএব	(কবিতা)	শ্রীগৌতম গুহ
২৪	ভোরবেলার পাখি	(কবিতা)	রবীন্দ্র সরকার
২৪	প্রত্যাবর্তন	(কবিতা)	শ্রীবেলাল চট্টোপাধ্যায়
২৫	আর কেহ রহিল না	(উপন্যাস)	শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
৩০	রবীন্দ্রচর্চা বইঃ সেই প্রথম সেই সব মানুষ		অমলেন্দু বসু

হোমার রচনাসমগ্র

এক খণ্ডে সম্পূর্ণ, গ্রাহকমূল্য পনের টাকা। গ্রাহকরা কার্ডে নির্দিষ্ট মূল্যেই পাবেন। অনুবাদ : সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ।

মপাসাঁ

৪ খণ্ডে সম্পূর্ণ ৬০ টাকা, ৩ খণ্ড পাওয়া যাচ্ছে।
অনুবাদ : সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ, শেখর সেনগুপ্ত ও সুনীলকুমার ঘোষ।

শেক্সপীয়ার

৫ খণ্ডে সম্পূর্ণ ৬০ টাকা। ৪ খণ্ড পাওয়া যাচ্ছে। ৩৭টি নাটক, ৪টি দীর্ঘ কবিতা ও সম্পূর্ণ সনেটের অনুবাদ।
অনুবাদ : সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ।

অস্কার ওয়াইল্ড রচনাসমগ্র

দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ। উপন্যাস, নাটক ও ছোটগল্পের আক্ষরিক অনুবাদ। ৫০ টাকা অগ্রিম নিয়ে গ্রাহক করা হচ্ছে। প্রকাশ অগস্ত। অনুবাদ : সুনীলকুমার ঘোষ।

অবশ্যই—বাংলা সাহিত্যে একটি অবিস্মরণীয় নাম

পথে যেতে যেতে ৫৲

...বরফশীতার নিকৃত অন্দরমহলের অন্তরালে কত বড় অমানুষিক অভিনয় লুকিয়ে আছে, তা জেনে ফেললেন তাঁরা। জেনে ফেলা নয় শুধু, অভিনেতার এক পৈশাচিক মূল্য দেখলেন তাঁরা। চোখ মেলে দেখে ভয়ে বিস্ময়ে বোবা হয়ে গেলেন। অর্থেক রাতে স্বয়ং অরুন্ধতী বরফশীও আবার একবার ফিরে যেতে বাধ্য হলেন তাঁর পায়-হেঁটে-আসা ইতিহাসের অন্তরগহ্বরে।

অমরেন্দ্রকুমার ঘোষ — চৌধুরী জেবুন্নেসা হোসেন

অগ্নিযুগের নায়ক ৬৲ দুর্গম চিসূল ৬৲

ডুলি-কলম : ১, কলেজ রো, কলকাতা-৯ ৩৪-৮১৮০

কলেজ পাঠ্যপুস্তক

দর্শন (Philosophy)

অধ্যাপক প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত প্রণীত

ভারতীয় দর্শন—১ম খণ্ড—৮ম সংস্করণ 12.00
ভারতীয় দর্শন—২য় খণ্ড—৩য় সংস্করণ 7.00
ভারতীয় দর্শন—৩য় খণ্ড (বেদ ও উপনিষদ) 7.00
পাশ্চাত্য দর্শন—১১শ সং 12.00
নীতিবিজ্ঞান—৮ম সংস্করণ 12.00
সমাজদর্শন—২য় সংস্করণ 12.00
মনোবিদ্যা—৭ম সংস্করণ 22.00
Hand Book of Social Philosophy—2nd ed. 16.00
পাশ্চাত্য দর্শনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—(বেকন-হিউম) —৩য় সংস্করণ 12.00
পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস (কান্ট) 7.00
ধর্মদর্শন (Philosophy of Religion) 22.00
সমাজ-মনোবিজ্ঞান (Social Psychology) 10.00
অধিবিদ্যার কয়েকটি সমস্যা 6.00

শিক্ষা (Education)

অধ্যাপক অরেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত

শিক্ষাতত্ত্ব—৩য় সংস্করণ 14.00
ভারতের শিক্ষা সমস্যা—৩য় সংস্করণ 15.00

অধ্যাপক সেনগুপ্ত ও রায় প্রণীত

শিক্ষা মনোবিজ্ঞান—৪র্থ সং 22.00
[illegible] Education Honours [illegible] Papers ... 5.00

শিক্ষক শিক্ষণ (B.Ed., Basic)

অধ্যাপক গৌরদাস হালদার প্রণীত

শিক্ষণ প্রসঙ্গে পদ্ধতি ও পরিবেশ 16.00
শিক্ষণ প্রসঙ্গে অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান 14.00
শিক্ষণ প্রসঙ্গে ইতিহাস 15.00
ভারতের শিক্ষা সমস্যা (প্রাচীন ও মধ্যযুগ) 4.00

অধ্যাপক হালদার ও রায় প্রণীত

শিক্ষণ প্রসঙ্গে শিক্ষার ইতিহাস 16.00

অধ্যাপক সেনগুপ্ত, রায় ও ঘোষ প্রণীত

শিক্ষণ প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞান —৩য় সংস্করণ 25.00

অধ্যাপক ঘোষ ও রায় প্রণীত

শিক্ষণ প্রসঙ্গে শিক্ষাতত্ত্ব 16.00

ব্যানার্জী পাবলিশার্স

BP

৫।১।১, কলেজ রো
কলিকাতা-৭০০০০৯
ফোন : ৩৪-৭২০৯

নূতন বছরে অমৃতের প্রকাশিত বই নীচে তিনশত টাকার জন্য করিলে পুস্তক বিক্রেতাগণ আপনার কাছে পাইবেন। মফঃস্বলের পুস্তক বিক্রেতাগণ নির্দিষ্ট দিনে অর্ডার সহ টাকা পাঠাইলে এই সুযোগ পাইবেন।

স্বনির্বাচিত গল্প	॥	আশুতোষ মুখোপাধ্যায়	১৬-০০
সোনার কাঠি রুপোর কাঠি	॥	আশুতোষ মুখোপাধ্যায়	১০-০০
অরণ্যে একা	॥	হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	১০-০০
দেহপট	॥	হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	৭-০০
এক বিন্দু সুখ	॥	প্রফুল্ল রায়	৭-৫০
মাটি আর নেই	॥	প্রফুল্ল রায়	১২-০০
বায়োস্কোপিক (১ম)	॥	রঞ্জন মজুমদার	১২-০০
মলোটফ ককটেল	॥	চিরঞ্জীব সেন	১০-০০
মার্কিনী ষড়যন্ত্র	॥	চিরঞ্জীব সেন	৮-০০
দেওবনের দিগন্তে	॥	সুনীল চৌধুরী	১০-০০
হিমালয়ের মানুষ	॥	সুনীল চৌধুরী	৮-০০
নীল ডুংরি	॥	অজাতশত্রু	১২-০০
সঙ্গী তিনজন	॥	অজাতশত্রু	১২-০০
কে ডাকে আমায়	॥	তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী	৭-০০
নীল সায়রে	॥	তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী	৭-০০
জান্ তান্ কৃশান্	॥	কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫-০০
রক্তান্ত খাইবার	॥	কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়	১২-০০
হায়নার হাসি	॥	কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়	১১-০০
সোনা সুরা ও সাকী	॥	শঙ্কু মহারাজ	৭-৫০
চরকাশেম	॥	অমরেন্দ্র ঘোষ	৬-০০
সনাক্তকরণ	॥	প্রলয় সেন	৯-০০
না নিষাদ	॥	সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ	৮-০০
ঝলসানো বরাভয়	॥	শেখর সেনগুপ্ত	৯-০০
আরব্ধ রাত্রি	॥	নিশাচর	৬-০০
তখন হেমন্তকাল	॥	অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়	৬-০০
হৃদয় জ্বালা	॥	জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী	৫-০০
বাতাসে বিষ	॥	কপিল চৌধুরী	৭-০০
রুপালী রেখা	॥	নরেন্দ্রনাথ মিত্র	৪-০০
কীর্তদাসী	॥	অমরেন্দ্র দাস	৫-০০
নির্বান্ধব	॥	শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়	৫-০০
চন্দন গ্রামিকা	॥	অচিন্তাকুমার সেনগুপ্ত	৩-৫০
হারেমের নায়িকা	॥	সুভাষ সমাজদার	৬-৫০
মোহনা	॥	বিমল কর	৪-৫০

ছোটদের বই :

পটলার গঙ্গা দর্শন	॥	শক্তিপদ রাজগুরু	৩-০০
ওস্তাদ	॥	পরেশ ভট্টাচার্য	৪-০০
তারা সাতজন	॥	শিশির লাহিড়ী	৪-০০
গিরীভিতে দেবেশ্বর	॥	নির্মলেন্দু গৌতম	৪-০০
রক্তচন্দন	॥	জিতেন্দ্রমোহন ভৌমিক	৪-০০
দানব পাখির আজব কাহিনী	॥	বীরু চট্টোপাধ্যায়	৪-০০
নরখাদকের দেশ	॥	অজাতশত্রু	৪-০০
দুরন্ত হার্মাদ	॥	প্রলয় সেন	৪-০০

সাহিত্য প্রকাশ ৫/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

পৃষ্ঠা	বিষয়	লেখক
৫২	সূর্যের আগুন	শ্রীসন্ধ্যা সেন
৫৭	নিজস্ব [illegible]	শ্রীঅরুন্ধতী
৬০	পুনশ্চ	শ্রীঋণপাক
৬১	অভয় (গল্প)	শ্রীসুপ্রিয় গঙ্গোপাধ্যায়
৪৪	সুন্দরবন [illegible] একটি ভ্রাম্যমান	শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু
৪৬	চিঠিপত্র	
৪৭	অশনি	শ্রীঅরুণি চৌধুরী
৪৮	মঠ থেকে বলছি	শ্রীঅভয় বসু
৫০	খেলাধুলো	শ্রীদর্শক
৫১	শহরবেলার সুবর্ণরেখা	শ্রীকল্লোল মুখোপাধ্যায়
৫৩	সিনেমা টিভি টক	শ্রীরঞ্জন মজুমদার
৫৬	কিছুক্ষণ	শ্রীনির্মাল ধর
৬০	নাট্যরঙ্গ	শ্রীনান্দীকর
৬৪	জলসা	শ্রীচিত্রপটা

প্রচ্ছদ : শ্রীনন্দ [illegible]

ডাঃ প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়
লিখিত

আধুনিক চিকিৎসা

একমাত্র নির্ভরশীল
হোমিও বই

মূল বিক্রয়কেন্দ্র — আমাদের কলিকাতার চিকিৎসা কেন্দ্র-দ্বয় ও হেড অফিস।

চিকিৎসা কেন্দ্রদ্বয় : ১১৪-এ আশুতোষ মুখার্জি রোড, কলি-২৫ এবং ৫০ সি স্ট্রীট, কলি-৬

হেড অফিস: ৩৬বি শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, কলি-২৫

পাইকারী ক্রেতা / বিক্রেতাগণ হেড অফিসে যোগাযোগ করিবেন

বিখ্যাত ডাটা গুঁড়ো মশলার প্রস্তুতকারক কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুকমী) প্রাঃ লিঃ এখন আপনাদের দিচ্ছেন একটি নতুন অতি সুদৃশ্য টিনের কৌটায় সবরকম গুঁড়ো মশলার অপূর্ব সংমিশ্রণ

এক কৌটা ডাটা রেডিমিক্সড কিচেন কুইন প্যাক কিনলে আর কোনরকম ঝামেলা এমন কি পেঁয়াজ, আদা, রসুন প্রভৃতি আলাদা করে জোগাড় করার দরকার হয় না। ডাটা রেডিমিক্সড কিচেন কুইন প্যাকের মাংস, মাছ, ডিম ও সবরকম মুখরোচক তরিতরকারি অল্প সময়ে চটপট রান্না করা যায়। আপনার সবরকম রান্নায় আজই ডাটা রেডিমিক্সড কারি পাউডার (কিচেন কুইন প্যাক) ব্যবহার করুন।

ডাটা রেডিমিক্সড কারি পাউডার
কিচেন কুইন প্যাক

প্রস্তুতকারক : কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুকমী) প্রাঃ লিঃ
২০৭, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭, পোষ্ট বক্স নং ৬৭৭৪.
ফোন : ৩৩-১৩৩৭, ৩৪-৬৭০৮

PAN—KCD-74

দেশের মগজ বিদেশে

ব্রেন ড্রেন বা মগজ বফতানি কথাটি নিতান্ত আলংকারিক অর্থেই ব্যবহৃত হয় না। নদীয়া দিয়ে পানিতাস জিনিসই যাবার কথা। কিন্তু এখন অত্যন্ত মূল্যবান বস্তুও বিদেশ যাবার পথিক দিয়ে চিরকালের জন্য দেশান্তরী হয়ে যাচ্ছে। হরগোবিন্দ খোরানা যখন বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেলেন তখন নানান ভারতীয় দেখে আমরা উল্লসিত হয়েছিলাম। কিন্তু নাগরিক তিনি মার্কিন দেশের। ভারতবর্ষ তাঁর জন্মভূমি ও স্বদেশ হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে ভারতীয় বলা যায় না। আপেক্ষের মূল্য যখন বাড়তে লাগল তখন খেবনব চিকিৎসা-কেন্দ্র খোঁজ করে জানা গিয়েছিল যে ভদ্রলোক ভারতবর্ষে থাকতেই চেয়েছিলেন। এখনকার বিজ্ঞানীগবেষণাগুলো তাঁকে একটা ভদ্রগোছের মাইনে ও কাজ করার সুযোগ পর্যন্ত দেয়নি। একটু টনক নড়েছিল তখন। সরকারী আনুকূল্য একটু বাড়ল। বিলেত থেকে জরন্ত বিষ্ণু নার্লিকারের মতো প্রতিভাবান তরুণ বিজ্ঞানীকে দেশে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছিল সে সময়ে।

আবার অবস্থা আগেকার মতোই। আনন্দবাজারের ঘুম সহজে ভাঙ্গে না। অভিযোগ প্রায়ই শোনা যায় যে বিদেশ থেকে প্রয়োগবিদ এনজিনিয়ার বিজ্ঞানীরা দেশে চাকরির দরখাস্ত করে আশানুরূপ সাড়া পান না। সুতরাং বিদেশকেই তাঁরা যৌবনের উপবন এবং বার্ধক্যের বারাণসী জ্ঞান করতে বাধ্য হন। মগজধারীদের দেশান্তর প্রায় সব দেশ থেকেই হচ্ছে। জাতের অর্থনীতির আওতায় গিয়ে কাজ করার চাওয়ার মধ্যে অন্যায় বা অসঙ্গতি কিছু নেই। ইংলান্ড থেকে বলে চলে বিশেষ বুদ্ধিধারী তরুণ-তরুণীরা আমেরিকা ও কানাডায় পাড়ি দেয়। কেউ কেউ যায় অস্ট্রেলিয়া। স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলোতেও বিদেশীর আনাগোনা কম নয়। সুযোগসুবিধা অর্থনীতির সচ্ছলতাই এই আকর্ষণের হেতু। পাশ্চাত্য দেশে যা চলে আমাদের মতো গরিব দেশের পক্ষে তা অচল বলেই মগজ বফতানি বন্ধের জন্য এই আবেদন নিবেদন।

প্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি তাঁর বেশ কয়েকটি ভাষণেই বিজ্ঞানী প্রযুক্তিবিদ ডাক্তার এনজিনিয়ার প্রমুখ বুদ্ধিধারীদের স্বদেশের প্রয়োজনের কথা মনে রাখতে বলেছেন। বিশেষের ঐশ্বর্য সচ্ছলতা

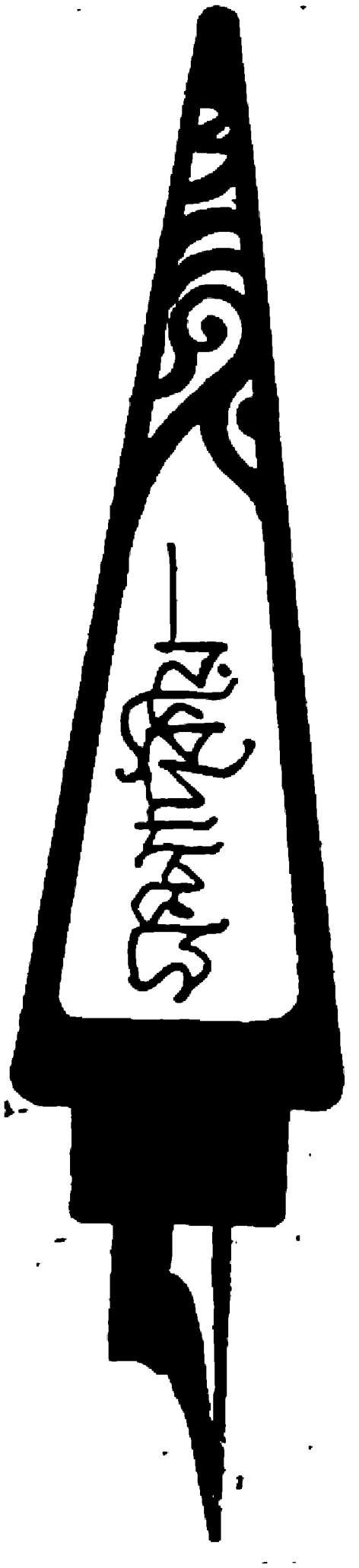

এবং উন্নততর জীবনযাত্রার হাতছানিকে প্রলুব্ধ হয়ে আমাদের দেশের তরুণরা সুযোগ পেলেই পাড়ি দিচ্ছেন। এমনও দেখা গেছে যে সরকারী বৃত্তি নিয়ে বিদেশে গিয়ে আর দেশে আসার তাগিদ অনেকে অনুভব করেন না। সরকারী অর্থ ফিরিয়ে দিয়েই মনে করেন যে তাঁরা দায়মুক্ত। প্রশ্নটা ব্যাখ্যাবিশ্লেষণের নয়। গণতান্ত্রিক দেশে বিদেশযাত্রা বন্ধ করাও যায় না। কিন্তু নিজের মা লীন-দুখী বলে কৃতী সন্তান কি তাকে কুঁড়ে ঘরে ফেলে রেখে প্রাসাদে বাস করে? সে করে তাকে তো, ধিক্কার ও তিরস্কারই সহ্য করতে হয়। ভারতবর্ষের মতো দেশে একজন ভাক্তার এনজিনিয়ার বা প্রয়োগবিদ তৈরি করতে দেশবাসীর কত হার্ডআর্নড সম্পদ যায় হয়। একথা ঠিক যে সকলেই কি স্বেচ্ছায় দারিদ্র্য বরণ করবে? এখনও আমাদের দেশে ডাক্তার এনজিনিয়ার বা প্রয়োগবিদদের মর্যাদা কমেনি। আপেক্ষিকভাবে ভালো আয় তাঁরা করেন। তবে পাশ্চাত্য দেশের মতো সুযোগ আমরা দিতে পারব না। আজ বিদেশে যাবার সুযোগ বেড়েছে বলেই আমাদের সেরা ছেলে-মেয়েরা বিদেশে গিয়ে নিজেদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে এটা দেশের পক্ষে বেদনাদায়ক। প্রধানমন্ত্রী দেশ ও সমাজের স্বার্থেই তাঁদের নিজের দেশেই থাকতে এবং কাজ করতে আবেদন জানিয়েছেন।

এর জন্য স্কুল-কলেজে শিক্ষার সময়েই ছাত্র-ছাত্রীদের মনে দেশের সেবা ও প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতন বোধ গড়ে তোলা দরকার। সমাজের প্রতি, দেশের প্রতি প্রত্যেক মানুষেরই দায়িত্ব আছে। বিজ্ঞানী, প্রয়োগবিদ, চিকিৎসক প্রমুখের দায়িত্ব তো আরও বেশি। দেশের উন্নয়নের জন্য যে বিরাট কর্মযজ্ঞ শুরু হয়েছে তাকে সফল করে তুলতে হলে প্রতিটি মানুষের যথাসাধ্য সহায়তা প্রয়োজন। উন্নয়নশীল দেশের পক্ষে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের প্রয়োজন তো আরও বেশি। দেশকে বিত্ত করে দেশেরই খ্যাতিমান ও প্রতিভাবান বিশেষজ্ঞরা বিদেশে চলে গেলে আমাদের দুঃখের সীমা থাকে না। তবে যাতে প্রতিভাবানরা দেশে থাকতে পারেন এবং কাজের যথাযোগ্য সুযোগ পান তার জন্য সরকারকে অগ্রণী হয়ে সব ব্যবস্থা করে দিতে হবে। প্রবাসী ভারতীয় বিজ্ঞানী, অধ্যাপক, প্রয়োগবিদরা যাতে মোটামুটি কাজ করার সুযোগ পেলে দেশে ফিরতে পারেন তার জন্যও বিভিন্ন গবেষণাগার, বিশ্ববিদ্যালয় প্রমুখ প্রতিষ্ঠানকে সচল ও সজাগ থাকতে হবে। টাকার চেয়ে মূল্যবান হল কাজ করার সুযোগ এবং কাজের স্বীকৃতি। এর অভাবেই হতাশায় আক্রান্ত হয়ে বহু প্রতিভাবান তরুণ বিদেশে চলে যেতে বাধ্য হন। যাতে তাঁরা বিদেশে না যান এবং প্রবাসে যাঁরা আছেন তাঁদের উপযুক্ত মর্যাদা ও সুযোগ দিয়ে ফিরিয়ে আনাই হবে প্রধান কাজ। এখনও অনেক কাজ অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও ব্যাধির বিরুদ্ধে যে নিরন্তর সংগ্রাম চলছে তাতে সকলের একযোগে হাত লাগাতে হবে এবং তার নেতৃত্ব দিতে পারেন দেশসেবায় উদ্বুদ্ধ অজস্র মেধাবী বিশেষজ্ঞ কর্মীবাহিনী।

CENTRAL LIBRARY

তুমি বন্ধু মানব ভট্টাচার্য

অবশেষে বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক মানুষটি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। এ কোন বাহ্যিক আঘাত পীড়া নয় কারণ তাঁর স্বাস্থ্য এখনও অটুট, শুধু মানসিক ভারসাম্য গেছে নষ্ট হয়ে। এ ব্যাপারে চিকিৎসকরা সাধ্যাতিরিক্ত চেষ্টা করেছেন—বিশ্বখ্যাত দেশবরেণ্য ব্যক্তি বলে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁরাও হতাশ হলেন। সরকারী কর্তৃপক্ষেরও মাথায় হাত। শেষ পর্যন্ত অভিজ্ঞের বোর্ড বসানো হোল; তাঁরা জানালেন, জ্ঞানবৃদ্ধ কার্টাটোনিক সিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত—দুরারোগ্য এ ব্যাধি।

পদার্থবিদ্যার বুদ্ধের গবেষণাগুলির কালের বিষয়বস্তু ছিল সর্বাধুনিক। এতদিন অমিতশক্তির গুরুত্ব আমাদের জানা ছিল না। এখন তাঁরই নিরলস সাধনার ফলে সে রহস্য ভেদ করা সম্ভব হয়েছে। ইতিমধ্যে এমন একটি চমকপ্রদ সাফল্য তিনি দেখিয়েছেন যার ফলে প্রতিরক্ষা বিভাগে যেমন উল্লাসের বন্যা বয়ে যায় অপরদিকে তেমনি আন্তর্জাতিক শক্তিসাম্যের বড় রকমের পরিবর্তনও ঘটে গেল। ঘটনাটি সাম্প্রতিককালের এবং সঙ্গত কারণেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশবাসীরা সব খবরই রাখেন, কিন্তু এ বিষয়ে বিশ্বের শক্তিবর্গ তো আমাদের চেয়েও অনেক বেশী ওয়াকিবহাল। এমন সময় মহাবিজ্ঞানীর এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতই শামিল। উর্ধ্বতন কর্তাব্যক্তিরা তাই সচেতন; বিরূপ প্রতিক্রিয়ার কথা স্মরণ করে সংবাদপত্রও এ খবর ছাপতে দেননি। দেশ বা জাতির স্বার্থে সবকিছু গোপন করেই রাখা হোল।

অতঃপর চিকিৎসকরা পরামর্শ দিলেন কর্মযোগীর বিশ্রাম নেওয়া একান্ত প্রয়োজন। কাজেই কালবিলম্ব না করে তাঁকে নিয়ে আসা হয় নৈনিতালে। নৈনিতাল মনোরম শৈলনগরী। পাহাড়ের ঢালের বুকে নৈসর্গিক দৃশ্য সেখানে অপূর্ব, সেখানে ছবির মত সুন্দর একটি পরিচ্ছন্ন কুটিরে তাঁকে রাখা হোল। জায়গাটি পাইন-গাছে ঘেরা—ছায়াচ্ছন্ন এবং গভীরভাবে মগ্ন।

এখানে পৌঁছে কিন্তু বন্ধু হঠাৎ অঘোরে ঘুমোতে শুরু করলেন। নিরবচ্ছিন্ন নিদ্রা—পরম শান্তিময় অচেতনা-জীবন, কেবল তাঁর মুখে ছোঁয়ানো ইষৎ শ্লেষের হাসি, এটি ডাক্তারী বিধি-ব্যবস্থার বহির্ভূত ঘটনা, তাই অনেকে হলেন চিন্তিত, কেউ কেউ আবার আশার আলোও দেখলেন স্নায়ু পরিবর্তনের মাহাত্ম্য কিনা তা নিয়েও অবশ্য গবেষণা হয় প্রচুর।

অবশেষে সব জল্পনা-কল্পনার অবসান হোল। তিনদিন পর আবার তিনি জেগে উঠলেন এবং পূর্বের মতই আচরণ করতে শুরু করলেন। এবার শুভাকাঙ্ক্ষীরা হলেন নিরুৎসাহ—কিছুটা বা বিরক্ত। বেতনভুক কর্মচারীদের কথা স্বতন্ত্র, তাঁরা যথা নিয়মে কাজ করে যান ঠিকই, কিন্তু নিষ্ঠা থাকে না এতটুকু।

বর্ষা শুরু হতেই ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা সবাই সমতলে নেমে গেলেন। তাঁদের ঘর আছে, জীবিকা নির্বাহের ব্যাপারটা আছে—সকলেই বুদ্ধিমান, প্রতিভাবান নন কেউই শুধু ভ্রমণবিলাসী ব্যক্তিদের মত ছুটিটা এখানে কাটিয়ে গেলেন। অকৃতদার বন্ধু নিঃসঙ্গ হয়েও কেবল হাসলেন, প্রাণখোলা অট্টহাসিতে কয়েকটা দিন ছোট কুটিরটা রইল সরগরম। তারপর অকস্মাৎ

অমৃত CENTRAL LIBRARY

একদিন হলেন গম্ভীর—গম্ভীর
ন কোন ঋষির মত।

ভাবে বেশ কিছুদিন কাটল, মুখে
একটি কথা বিস্ময় নিল। এখন
হুল গিরিশিখরে সাদা মেঘের
কোথাও বা সবুজ গহ্বরে সাজানো
ঘনালো হবার সময় হয়েছে—মমতা
ষ্টীকে হবু স্পর্শ করে থাকে।

জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ নিরুত্তরেণে দিন
ন. তাঁকে বিরক্ত করবার কেউ নেই।
ধ্যে যাঁরা গোপনে খবর পেয়ে
তাঁরা হচ্ছেন অপেক্ষাকৃত বাক-

এছাড়া সংখ্যায় যাঁরা বেশী
তাঁরা স্ব বন্দোভাবাপন্ন ব্যক্তি।
য় গোষ্ঠীর মধ্যে চরিত্রগত মিল
কমন এক স্থলে কৌতূহলী দৃষ্টি
রা কিছুক্ষণ গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে
। বলা বাহুল্য সরকারের অনু-
তা ভিতরে প্রবেশ নিষিদ্ধ।

দিন সকালে ডাক্তারী পরীক্ষা হয়ে
রও বন্ধ ঘর ছেড়ে বেরুলেন না
চেয়ারে বসে আছেন। ঘরের
লি খোলা, পর্দাগুলি সরানো
নীচেই রয়েছে অন্তহীন নীল
ন শরতের নিষেধ নীল আকাশে
য় স্নিগ্ধরত সূর্য। চারিধারে
পাইনে ঢাকা শৈলশ্রেণী, সেখানে সূর্যের
সোনালী রং আরও বেশী করে বাড়ানো
এ যেন শান্তিময় অপূর্ব এক ভাবজগৎ।

বৃদ্ধ পুলকিত হয়ে উঠলেন। বিস্মৃত
প্রায় অতীতের কথা তাঁর মনে পড়ে যায়
হয়তো শৈশবের কথাই চিন্তা করছেন
হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে তিনি উঠে দাঁড়ালেন
ঘন ঘন তৃপ্তিবোধক মাথা নেড়ে ঘরের
ভিতর পায়চারি শুরু করে দেন, মুখে
মৃদু সকৌতুক হাসি। অস্ফুটোক্তিগুলি যে
বিচ্ছিন্ন সংলাপ এবং অদ্ভুত ধরনের ধ্বনি-
যুক্ত। এক সময় দৌড়ে তিনি ঘর থেকে
বেরিয়ে পড়লেন। সিঁড়ি বেয়ে নীচে
নেমে এসে দাঁড়ালেন মস্তাখানে উঁচু
দু বাহু প্রসারিত করে কিছুক্ষণ সূর্য
স্নানে মগ্ন থাকেন, তারপর নিমীলিত চক্ষু
মেলে সহসা তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন
বাগানে। মধুময় শরতের ঈষৎ হিমেল
বাতাসে আন্দোলিত হচ্ছে মৌসুমী ফুলের
গাছগুলি। চারিধারে শত সহস্র বর্ণবিচিত্র
ফুলের সমারোহ, মাঝখানে গিয়ে তিনি
আকুল হয়ে তার ঘ্রাণ নিলেন। নিষ্কাম
আসক্তি লিপ্সায় বারবার জড়িয়ে ধরেন
গাছগুলিকে এবং সবশেষে তিনি
ধরিত্রীকে দিলেন চুম্বন—নিবিড়ভাবে
শিশুর মত আবেগে।

শৈব্যার নতুন বই

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের
গোপনে নির্জনে

একজন সুশিক্ষিত নগরবাসী যুবক আর এক গ্রামীন অশিক্ষিতা অনিন্দ্য যুবতীর মধ্যে জলবায়ু গড়ে উঠলে সহজে তা তথাকথিত বন্ধু ও কিমাকার কেজোকারিতে ফেলা হয়তো যায়। কিন্তু এ কাহিনীর কেন্দ্রবিন্দু অনাকিছু, লেখক গুন্টা এমন জায়গায় নিয়ে গেছেন, দেখা যাবে, জীবনের একই জায়গায় ওই দুজাতের মানুষ পরস্পরের দিকে পিঠ ফিরিয়ে হাসাকর ভাবে বসে আছে! কুসুম বন্য মেয়ে। তার মধ্যে অলৌকিক শক্তির ভয় ওঠে মাঝে মাঝে। সে চুল এলিয়ে ভয়ের খেলা মতো। অদ্ভুত কথা বলে। কেন-কেন্দ্রটা মিলেও যায় সাঁতারাতি। কৃষি বিজ্ঞানী প্রিয়নাথের জেদ চড়ে যায়। কুসুম জানে, নতুনবাবু ভদ্রলোক। সে তাকে কোনদিন ঘা করে ঘাড় ফুলাতে পারবেনা। অথচ জলবায়ুর হাত থেকে পরিত্রাণ নেই। অবশেষে নির্জনতা মতো এসে দাঁড়ালেন স্বয়ং প্রকৃতি সব দ্বন্দ্বের মীমাংসা করতে। তিনি যে প্রকৃতিনন্দিনী! প্রিয়নাথ কুসুমের অলৌকিক শক্তির বড়াই করতে গিয়ে হত যাওয়ায়, প্রকৃতি তাকে শাস্তি দিলেন। "সুন্দর দিবার ক্ষয়" নামক শরদীয় অমৃতে বেরিয়েছিল।

চলচ্চিত্রে রূপায়িত হচ্ছে। দাম : ৮-০০ টাকা

কোণে মনে বনে	আশুতোষ মুখোপাধ্যায়	৭-০০
মানুষের জন্য	প্রফুল্ল রায়	৫-০০
শাঁকো প্রায় পেরিয়ে	দক্ষিণারঞ্জন বসু	৫-০০
হঠাৎ গাওয়া গান	তপতী রায়	১৫-০০

শৈব্যা পুস্তকালয় ৮।১ বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

ক্ষে শুরু করলেন তখন নির্ভাবে
প দিল নিক্কেকে, বয়সের
ধরা থাকা সত্ত্বেও বলা যায় যে
প্রকৃত শিশু এবং উভয়ের মধ্যে
ধরনের ভাগোচ্ছল. ছেলেটিকে
বার পূর্বে তিনি উপহার দিলেন
ন কাঠের সুদৃশ্য বাক্স যে গুপ্তধন
অপূর্ব শিল্পনিপুণতা তাঁর
ফুলে উঠেছিলেন. তিনি খুশিতে
জিনিসটি কিভাবে তাঁর সঙ্গে
স। বালকটি খুলি মনে ঘোরে
চলে আসে। বালকটি খুলি মনে
লো এলো তাঁর প্রত্যেকটা কিছুর
ছলোক সম্পর্কে প্রকৃত পরিচয়
পরে অভিভূত হয়ে পড়েন।

দিনের মধ্যেই নাস মেয়েটি
অত্যন্ত অন্তরঙ্গ হয়ে উঠল।
তরুণী বুদ্ধিমতী মেয়েটি
ভাময়ী নারী। বন্ধনহীন কৌতু-
খবীর বুকে মহাজ্ঞানী অকস্মাৎ
ীর হয়ে ওঠেন তাঁর নিষ্করুণ
বঞ্চনাভিত ভাবনার গুপ্ত
বলা বন্ধে যায়। উদারপ্রাণ
উৎফুল্ল হয়ে ইন্দ্রজাল, লৌকিক
মাচরণের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে
। বেশ কৌতুকাবহ ঘটনাটি তখনই
ন কারণে-অকারণে সেই পরিচিত
মুবকটি এসে যায় তাঁকে. কেমন যেন
ধাগ্রস্ত ভাব অথচ উপায়হীন. মুখোটি
নিষ্পৃহতা তাঁকে আরও বেশী উৎসু
করে। পরিশেষে শুধু একটি দৃষ্টি বিনি
ময়ে সাফল্য অর্জন করে সে আবার চ
ফিরে যায়। বৃদ্ধ পরিতৃপ্ত মনে ঘন ঘ
মাথা নাড়েন. মুখে অনাবিল হাসি
মুবকটি সরকারী কর্মচারী. সরকার
সচিবের কাজ নিয়ে এখানে এসেছে: এক
প্রকৃতজ্ঞাত কাহিনীর রচনা-কৌশল ব
পরম কৌতুকে অনুধাবন করে চলেন।

একদিন তরুণীটি তাঁর কাছে জান
চাইল মাঝে মাঝে হাসেন কেন

বৃদ্ধ মুহূর্তকাল আরও জোরে হে
ওঠেন. কোন মতেই উত্তর চেপেও অন
বেশী ভাবয়াকুল।

নাস মেয়েটি আরও গভীর ম
নিজে সরে দাঁড়ায়।

দিনের পর দিন চলে যায়. সপ্তা
পর সপ্তাহ। একদিন বিকেলে ব
বারান্দায় বসে আছেন। কিছুক্ষণ আ
একজন মানসিক চিকিৎসাভিজ্ঞ ডা
আলাপ করে বিদায় নিয়েছেন। সূর্য এ
অস্তাচলগামী। রক্তিম আলোর বন্যা
পূবের পাহাড়গুলিকে রঙমহল করে তু

অমৃত

সম্পাদক : শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

প্রতিবারের মত এবারও পঁচিশে বৈশাখ রবীন্দ্র জন্মদিবসে
অমৃতের নববর্ষ সংখ্যা প্রকাশিত হবে। এই সংখ্যায় থাকবে

বিভূতিভূষণের একটি অপ্রকাশিত ডায়েরী

যা বহন করছে এই শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের
অন্তর্জীবনের অপরূপ আলেখ্য

একালের খ্যাতিমান কথাশিল্পী
প্রফুল্ল রায়ের সম্পূর্ণ উপন্যাস

এবং আর একটি অত্যন্ত চমকপ্রদ রচনাসংগ্রহ!
যার জন্য পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি লক্ষ্য করুন।

দাম পাঁচ টাকা ॥ ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলকাতা-৩

ও পাইলের নিরদেশ আরও বেশী
হল। এমন সময় স্ক্রাতিমর্ত
ভেদ করে একটি সঙ্গীহীন সারস
পক্ষ বিধুনেন এগিয়ে এল
ড়র কোলে। অবিশ্রাম যাত্রাপথ
র তার শেষ হয়ে এসেছে। বন্ধের
সমাহিত ভাব সহসা ছিন্নভিন্ন
গেল. কেন চরম উত্তেজনার প্রতীক্ষা
হিত হয়ে উপস্থিত। জ্ঞানযোগী
ীন রইলেন। কোন চাঞ্চল্য প্রকাশ পা

না শুধু চক্ষু দুটি বুজে রইলেন। তিনি
মানসনেত্রে অবলোকন করলেন সামনে এক
বিস্তীর্ণ মরুপ্রান্তর. অসমতল ধূসর
রুক্ষ ভূমিতে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে
শুধু কাঁটাগাছের ঝোপঝাড়। অগ্নিবর্ষী
মার্তণ্ডদেব কিসের মহাশঙ্কায় প্রহর গুন-
ছেন। বন্দিনী ধরিত্রী ধৈর্যহারা নীরব
মহা উদ্বিগ্ন কিন্তু অবিচল। অবশেষে
তিনি অনুমতি দিলেন শান্তকণ্ঠে কিন্তু
বজ্রনির্ঘোষে সে-ব-তো কোথাও পৌঁছে

গেল। মুহূর্ত পরেই ঘ
অমিতশক্তির আবির্ভাব। তাঁর
বিস্ফোরণে মেদিনী ভীষণভাবে
ওঠে। বহুদূরে হঠাৎ-উদ্ভূত
পাহাড়টি ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয়ে
নিমেষে কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায়
ঘটে গেল? মহাবিজ্ঞানীর প্রশ্ন
সহস্র মানুষের যা জানা আছে
আপনার নতুন করে জানতে চাইলেন
ঘটার পর আকাশে উড়লেন। নী

আপনাকে কি লটারী ও শব্দশৃঙ্খল প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের টাকা দিতে হয়?

তাহলে আপনি

এক হাজার টাকার বেশি দিতে হলে নির্ধারিত হারে আয়কর কেটে নিন

এবং

কেটে নেওয়া করের টাকা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের নামে জমা দিন।

কর কেটে নেওয়ার আয়কর	* মাত্রা সারচার্জ	এই সব ক্ষেত্রে
		(১) কোম্পানী ব্যতিরেকে কোনও ব্যক্তি
৩০%	৩%	(ক) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি দেশে বসবাস করলে
৩০% (অথবা এই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য উচ্চতর হার)	৩%	(খ) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ভারতে বসবাস না করলে
		(২) কোনও কোম্পানী
৩০%	৩%	(ক) কোম্পানী ডোমেসটিক শ্রেণীর হলে
৭০%	৩.৫%	(খ) কোম্পানী ডোমেসটিক শ্রেণীর না হলে

মনে রাখুন

এটা না করার পরিণাম কী?

না করলে আপনাকে—

* জমা না দেওয়া করের টাকা,
* সুদ ও অর্থদণ্ড দিতে হতে পারে এবং অভিযুক্ত হলে জরিমানা ও তার সঙ্গে সশ্রম কারাদণ্ড,

যার মেয়াদ :—

(ক) সংশ্লিষ্ট অর্থের পরিমাণ যে ক্ষেত্রে একলক্ষ টাকার বেশি সে ক্ষেত্রে ন্যূনপক্ষে ছ'মাস থেকে সর্বাধিক সাত বছর পর্যন্ত

(খ) অন্যান্য ক্ষেত্রে খেলাপের দরুন. কমপক্ষে তিন মাস থেকে সর্বাধিক তিন বছর পর্যন্ত

নিজের স্বার্থে দেশের কল্যাণে কর বিধি পালন করুন

ডিরেকটার অফ ইনসপেকশান
(পাবলিকেশান্স অ্যান্ড পাবলিক রিলেশান্স)
ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেণ্ট নিউ দিল্লী

ডিএভিপি ৭৫।৭০৩

ং ভপেক্ষায় ছয়া তখন ডিনি বিষাদ-
উদ্ভ্রান্ত। তাঁর ধারণা আজকাল
গাছে সাংঘাতিক সব কাণ্ড-কারখানা
াচ্ছে। আকাশ থেকে কাঁদি কাঁদি
। লুটিয়ে পড়ছে মাটিতে অবশ্য
পশুও জীবিত নেই এবং জলে
উঠছে রক্ত মাংস ভক্ষণের প্রবৃত্তী।
লোকমাত্র প্রায়ই তিনি স্বপ্নে
।

একদিন নার্স মারফৎ ধারাকাল
পাশে এসে দাঁড়াল। সুরেশ

নিস্তেজ উজ্জ্বলতা বসন্তের আলো
বিকেলের পরিবেশ মনোরম হয়
উঠেছে। সুরেশের আজ ছুটির দিন
তার সজ-সজ্জায় চাঞ্চল্যের পরিবর্তন
সহজেই নজরে পড়ে।

মুখ তুলে দেখে মাথা নো
তারিয়া করেন; জানতে চাইল
ঠিকানা বাড়ি?

—হাঁ আমি।

ছোট একটি উত্তর—ভদ্রতা দিয়ে
ওজন তার কণ্ঠস্বর ভারালো; আর কো

বিমল মুখোপাধ্যায়ের অভিনন্দনীয় গ্রন্থ

কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত

কলকাতা শহরের সামাজিক সাংস্কৃতিক ও নগরাদির ইতিহাসের সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ বই
প্রচুর চিত্রাবলী ও মানচিত্র সহ ৭০০ পৃষ্ঠার গ্রন্থ। মূল্য : ৫০-০০

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের নতুন উপন্যাস নবরূপে প্রকাশিত হবে।

প্রথম ও অপ্রকাশিত বিভূতি
ডঃ পশুপতি ভট্টাচার্যের

বিশেষজ্ঞ অপরাধতত্ত্ব

বিমল মিত্রের
গল্পসম্ভার ২২-০০

অপরাধ বিজ্ঞানের নতুন গবেষণামূলক তথ্য সহ বিস্তৃত আলোচনা। ১ম খণ্ড নবরূপে প্রকাশিত হবে।

শংকর-এর

চৌরঙ্গী মানচিত্র এক যে ছিল

রজত জয়ন্তী সংস্করণ রজত জয়ন্তী সংস্করণ ৫ম মুদ্রণ ৮-০০
প্রকাশিত হল। ২৫-০০ প্রকাশিত হয়েছে। ১০-০০ এক যে ছিল দেশ
নামে চিত্রায়িত হচ্ছে।

নির্মল গুপ্তের দুখানি কবিতার বই

রুবাইয়াৎ-ই-ওমার খৈয়াম মুণ্ডার কবিতা গুচ্ছ

দাম : ৩-০০ দাম : ৩-০০

আচার্য সুকুমার সেনগুপ্তের শ্রীদিলীপকুমার রায়ের

গরীয়সী গৌরী শ্রীঅরবিন্দ স্মরণে

৩য় মুদ্রণ ৬-০০ দাম : ১৫-০০

সতীনাথ ভাদুড়ীর বনফুলের সৈয়দ মুজতবা আলীর

জলভ্রমি এক ঝাঁক খঞ্জন শেষ পাতা গল্প

২য় মুদ্রণ ৩-৫০ দাম : ৬-৫০ ৬ষ্ঠ মুদ্রণ ৭-০০

বিমল মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

কবি সত্যেন্দ্র নাথের গ্রন্থাবলী

১ম খণ্ড ২০-০০ ২য় খণ্ড ১৮-০০

বাক সাহিত্য প্রাইভেট লিমিটেড ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

কথা বলে না। কিন্তু একটা জানাবে বলে সে এসেছে—অপেক্ষা করে হয়তো বা প্রস্তুতি নেয়; কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই বলা হয় না। তার গণ্ডদেশে উত্তেজনা লজ্জায় আবর্তিত মুখ। নতুন মুক্তোর আংটিটি সে বাঁ হাত দিয়ে ঢেকে রাখল।

বৃদ্ধ বন্ধু হঠাৎ সকরুণ হয়ে ওঠেন। এক সময়ে ডেকে পাঠালেন নার্স মেয়েটিকে। আরাম কেদারায় বসে আছেন। তরুণীটি ঘরে ঢুকতেই তিনি ওকে নিবিড়ভাবে বাহু টেনে নেন। পলিটকেল বৃদ্ধ—তেমন যেন কামনাময় গভীর সুখ তাঁকে অভিভূত করে রেখেছে। শীর্ণ হিমশীতল ডান হাত-খানি দিয়ে মেয়েটিকে স্পর্শ করেন। ধীরে ধীরে আলতোভাবে সঞ্চালিত হতে থাকে তাঁর আঙুল। মেয়েটির যেখানে যেখানে নারীত্বের রেখাগুলি যৌবনের প্রতিশ্রুতি নিয়ে ফুটে উঠেছে সেখানে শিহরণ জাগায়। তরুণীর কামনাচিহ্নিত মুখ লজ্জা কোন প্রদীপের শিখার মত চোখে বিস্ময় বিমূঢ় সৃষ্টি। মহা-বিজ্ঞানীর অভীপ্সিত আকাঙ্ক্ষার কথা ওর কাছে আর গোপন রইল না। পলিটকেল বৃদ্ধ ওর চিবুক থেকে স্পর্শ তুলে নিয়ে চুম্বন করেন। এমন ধরনের লৌকিক আচরণ শুধু পূর্বজন্মতীর্থকারই করে থাকেন।

বিনা অস্ত্রোপচারে
অর্শের
জ্বালা-যন্ত্রনা
থেকে
দ্রুত আরাম
পেতে হলে
হ্যাডেসা
মলম
ব্যবহার করুন!

বৃদ্ধ বন্ধু বিজ্ঞানীর শিরে অভয় দেন। এমন কোন পার্থিব ভাবানুভূতিতে উত্তেজিত হয়ে ওঠেননি শুদ্ধ পারদর্শিতা করেছেন। তাঁর সেই অদমনীয় আকাঙ্ক্ষার আনন্দ ক্রমেই দুঃসহ হয়ে উঠতে থাকে। এক সময় নীলাভ প্রায় অন্ধকার ঘর ধীরে ধীরে এক স্বপ্নময় জগৎ গড়ে উঠল। তাঁর মনে হয় এ যেন কারুর পদপাত কক্ষ—তাঁর অদেহী আত্মা যেখানে বাঞ্ছিত এক অতিথি। নব-দম্পতির প্রেমালাপ ওদের সুরেলা হাসির গনক রোমাঞ্চকর স্পর্শ সৌরভ—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সব কিছুই তাঁকে অভিভূত করে। পরিশেষে তাঁর কানে এলো কল্পনাময় কিছু আর্তস্বর—সেই পরম-দম্পতির সংগীতহারা করুণ কোরাস। তিনি কোন এক উচ্চ উল্লাসে হারিয়ে গেলেন; এক গভীর অন্ধকারে ওঁর সেই সুপ্ত বাসনা হোল বন্দী। রূপান্তরের মহাশিল্পী এলেন প্রসন্নমুখে; নির্মাণ কাজ শুরু করলেন। দীর্ঘ দশ মাস হোল অতিবাহিত। তারপর অকস্মাৎ স্খলিত চরণে উনি নিলেন বিদায়—বিস্ময় ওঁর মুখ। সেইদিনই কোমল রক্তাপ্লুত সংকীর্ণ পথ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে মহাজ্ঞানী নবকলেবরে আবির্ভূত হলেন বিশ্বলোকে। মহাকাল এসে তাঁকে তিন-বার আলিঙ্গন করেন। অদৃষ্ট তাঁর কপালে তপ্ত শীতল দুটি চুম্বন দিয়ে অদৃশ্য হন। সাগ্রহে আলো আর বাতাস তাঁর স্বাগতসম্ভাষ করল অভিনন্দন। বৃদ্ধ কিন্তু তাঁর বীভৎস অবয়বের দিকে তাকিয়ে ভীষণভাবে চমকে উঠলেন। এমন তো তাঁর স্বপ্ন ছিল না। জননীর রক্তাক্ত হয়ে স্তন্যপানে তিনি বঞ্চিত। তবে ওষ্ঠে কই? তিনি বিকলাঙ্গ। মৃতা মার্তস্বরে মা বলে ডেকে ওঠবার চেষ্টা করলেন—পারলেন না। স্পন্দনহীন হয়ে রইল শুধু তরুণী। তাঁর স্বপ্নলালী কই? অতি ক্ষুদ্র এক যন্ত্রের সেই ঘূর্ণায়মান এবং স্থির কতু কলাগুলি আর একবার প্রচণ্ড সংঘর্ষের সম্মুখীন হোল।

পরদিন সকালে বৃদ্ধ প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হলেন। বিকারগ্রস্ত অবস্থায় তিনি অসংখ্য পঙ্গু মানুষকে দেখলেন যারা তাঁকে ঘিরে ধরেছে। স্নায়ুসাহীন কিম্ভূত-কিমাকার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ে কারা সব ঘরে আছেন তাঁকে—যেন অনন্ত আদিম কতকগুলি জীব। চিকিৎসকরা বুদ্ধিহীন হইলেন উদবিগ্ন। তাহলেও শেষ পর্যন্ত তাঁরা অবস্থাকে আয়ত্তে আনলেন; তাঁদের আশঙ্কা ছিল মহাজ্ঞানী স্নায়বিক অথবা নিউমোনিয়ায় না আক্রান্ত হন।

সপ্তাহকাল পরে বৃদ্ধ আরোগ্যলাভ করলেন। কিন্তু এবার একেবারেই ভিন্ন মানুষ। তিনি বিশ্রান্ত-এ যেন উন্মাদ, সেই মনে অস্বাভাবিক অস্থিরতা। হঠাৎ ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন কখনও বা অকারণ আনন্দাতিশয্যে দেওয়ালে মাথা ঠোকেন। ইতিমধ্যে একদিন তিনি প্রচুর পাথুরে নুড়ি সংগ্রহ করে নিয়ে এসেছেন ঘরে—কী এক গোপন পরিকল্পনা আছে তাঁর মাথায়। মাঝে মাঝে সকলের অজ্ঞাতে বৈদ্যুতিক তারে হাত দেন—তৎক্ষণাৎ বলপূর্বক ছিটকে সরে আসেন। আত্মহত্যা কখনও ইচ্ছা করেই হিমশীতল জলে পা ডুবিয়ে রাখেন—যতক্ষণ অঙ্গটি নীল অবশ না হয়ে যায়। এসব নিছক কোন আত্মপীড়নের ব্যাপার হয়তো নয়। লোকজনের নাম ভুলে গেছেন আলোচ্য বিষয় মনে থাকে না শুধু নার্স মেয়েটির দিকে করুণ দৃষ্টিতে সময় সময় তাকিয়ে থাকেন।

কর্তৃপক্ষ আর দেরি করলেন না পরিবর্তনহীন অবস্থায় কথা চিন্তা করে তাঁদের শুরু মুখপাত্র ঘটনাটির আদ্যো-পান্ত পরিষ্কারভাবেই প্রকাশ করে দিলেন। রীতিমত চাঞ্চল্যকর তথ্য—অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে সবাই সাগ্রহে তা শুনলেন। সাংবাদিকরা কিন্তু জাক-বাদ পড়ে গেলেন তাঁরা দরবার করলেন মহাবিজ্ঞানীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। পাখি মঞ্জুর হোল। সংবাদসেবীরা রাজ-ধানী ছেড়ে বল বেঁধে তাই ছুটে এলেন নৈনিতালে।

২১শে জানুয়ারী রবিবার। শীতের রৌদ্রালোকিত মধ্যাহ্ন। নির্দিষ্ট সময়ের বহু পূর্বেই বাড়ির সবচেয়ে বড় ঘরখানি জনসমাগমে পূর্ণ হয়ে যায়। সকলেই অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছেন। একসময় তরুণী নার্সটিকে সঙ্গে নিয়ে জ্ঞানবৃদ্ধ ঘরে ঢুকলেন। তাঁর দুজন সচিবও সেখানে উপস্থিত। অস্ফুটোক্তি বন্ধ হোল পরিহাস মুহূর্তের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে যায়। বিস্ময়কর মানুষটির দিকে সবাই অপলক দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকেন। ধীর স্থির হয়ে চেয়ারে গিয়ে বসলেন বৃদ্ধ; মুখে মৃদু সকৌতুক হাসি। ঘরের মধ্যে অদ্ভুত নীরবতা বিরাজ করছে।

—একজন সাংবাদিক দাঁড়িয়ে উঠলেন। অভিজ্ঞা জানাবার পর প্রশ্ন করেন: ডাঃ চৌধুরী আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। ফিরে গিয়ে নিশ্চয় গবেষণার কাজে হাত দেবেন?

—পরোক্ষভাবে নিশ্চয় প্রবৃত্তির ক্ষেত্রে এমন কথা বলা চলে; 'গবেষণা' শব্দটি কেমনযেন আত্মগত বলে আমার ধারণা। বৃদ্ধ বেশ শান্ত কণ্ঠে কথাটি বললেন।

অপর একজন উঠে দাঁড়ালেন—আপনি এখানে সময় কাটান কিভাবে?

ীরের নজরে পড়তেই মুখার্জি
আসা হোল ঘরে। সম্পূর্ণ নগ্ন
—লিঙ্গোত্থিত; তবে দুর্বল হলেও
ন নন। তাঁর অভিব্যক্তিতে অস্বাভাবিক
—ভয়ঙ্কর উল্লাসগ্রস্ত দৃষ্টি।

ীর কালবিলম্ব না করে তৎক্ষণাৎ
ক আত্মবাহীন করা হোল।
াগুলিকে পুরু কাঠের তক্তা দিয়ে
ে ফেলা হোল। অনেকটা
উঁচুতে— লিফিং-এ খুব কোলা
বইল একটি আলোর বাল্ব। দরজা
চাবি দেওয়া হোল, খুব ভূনো
প্রাচীর দিয়ে ঘেরা একটি কক্ষে যেন
কেন অবরুদ্ধ হলেন।

এই অবস্থায় পরিচারিকাটি আ
মর্মান্তিকী হয়ে ওঠে। অভ্রান্ত আকাঙ্ক্ষ
ভালোই অপত্য স্নেহে উর্বশী
উর্বোলিত। তাকে প্রশ্রয় করে কামনা, স
দেহমনে যা নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আ

অমিতাভ চৌধুরীর

অন্য রবীন্দ্রনাথ

সাত টাকা

ফাদার দ্যাতিয়েন-এর

রোজনামচা বারো টাকা

বিক্রমাদিত্যের

ব্ল্যাকমেইলিং চোদ্দ টাকা

অমিতাভ রায়

রাসপুটিন দশ টাকা

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

বিবাদী রাগ বারো টাকা

অতীন বন্দোপাধ্যায়

যুবতী পরম রূপবতী

আকাদেমী পুরস্কারপ্রাপ্ত বিমল কর-এর

আয়োজন

অনন্য প্রকাশন • ৬৬ কলেজ স্ট্রীট (দ্বিতল) কলকাতা-১২

বেশীর ভাগ হেয়ার ডাই কিনে হয়ে যায় কমপ্লেক্স
তা কেবল চুলের ওপরের স্তরই ডাই করে...

ট্রু-টোন

প্রত্যেক চুলের গভীরে পৌঁছে...
আপনাকে দেয় অনেক দীর্ঘস্থায়ী স্বাভাবিক রূপ!

ট্রু-টোন তরল হেয়ারডাই যার
গড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ে না এমন ট্রু-টোন ক্রেম
যেটি খুশি বেছে নিন।
দুটিতেই আছে হেয়ার কন্ডিশনার যা আপনার
চুলকে রাখে নরম, উজ্জ্বল আর সুবিন্যস্ত!

এই প্রথম চুল ডাই করার কথা ভাবছেন? বিনামূল্যে পুস্তিকা
"হেয়ার ডাই: এভরেডি"-এর জন্য এখানে লিখুন—
জে. বে. হেলীন কার্টিস লিঃ, জে. বে. বিল্ডিং, বম্বে ৪০০ ০৪৩

তরল হেয়ারডাই

ক্রেম হেয়ারডাই

এমন কমলা আর ঘরোয়া, খুরুলতে অন্তত বিশেষ ভাল।

এই ঠিকানায় সরাসরি যোগাযোগ করুন ঃ

জি. এথারটন এণ্ড কোঃ প্রাঃ লিঃ,
কোলকাতা, পাটনা, গৌহাটি, কটক এবং ডিব্রুগড়।

শে সহসা স্তিমিত হয়ে উঠলেন।
হেরণী পরিচারিকা বিষণ্ণ মনে ঘর
বেরিয়ে আসে।
শেষ রাতে বৃদ্ধের ঘর থেকে শোনা
ভীষণ গর্জন আর আর্তনাদ—প্রায়
সকলে। কুঠির সকলের ঘুম ভেঙে
সবাই ভীত হয়ে ছুটে এলেন।
দরজা খোলামাত্র অমানুষিক শক্তি
বৃদ্ধ ঝাঁপিয়ে পড়লেন তাঁদের ওপর।
ওয়ার্ডাররা কোনক্রমে তাঁকে ধরে
। রক্তাক্ত শরীর, পশুর মত নখদন্তে
আহত করেছেন। ভয়ঙ্কর ক্রোধান্ধ
গর্জন বীভৎস। ক্রমবিসর্প ক্রন্দনধ্বনি
ক্ষীণ হয়ে আসে।

সর্বোদয়ের পর এক পশলা বৃষ্টি
গেল, তারপরই স্বর্ণাভ ঝলমলে রৌদ্র—
সরে ঔদ্ভাসিত অনাস্তরণের একটি
ত। চারধারে মৌন গম্ভীর গিরি-
শ্রেণী, মাঝখানে অন্তলীন নীল হ্র
ওপর পাখিরা ডানা মেলে ভেসে
আজ বাস্ত শুধু অল্পবিস্তর বিষণ্ণ
ওঠেন বৃদ্ধের আসন্ন বিদায়ের কথা চি
করে। সিদ্ধান্ত পূর্বেই নেওয়া ছিল
অল্পক্ষণ পরেই সবাই ধারমুক্ত হবেন।

ইস্পাতের চাদরে মোড়া ভ্যানটি অপে
করছে পাহাড়ের কোলে—নীচে সে
পাহাড়িরা হস্তশ্রী শালবনের সীমানা
হয়েছে। জনহীন নিস্তব্ধ পল্লী,
ঔৎসুক্যের অভ্যর্থনা নেই। কেবলমাত্র
পরিচারিকা তরুণীটি তার ভাবী সন্তা
শেষবারের মত দেখবে বলে দাঁড়িয়ে আ
গেটের ধারে।

বিজ্ঞানাচার্য শৃঙ্খলিত হয়ে বৃদ্ধ
কক্ষ থেকে বেরিয়ে এলেন। চারপাশে স
প্রহরী। স্খলিত চরণে বৃদ্ধ ধীরে
তিনি এগিয়ে চললেন।

১লা বৈশাখ বের হচ্ছে

গী দে মোপাসাঁর অবিস্মরণীয় উপন্যাস (নতুনতর)

বুল দে সুইফ ৬·০০

ফ্রান্সের প্রাণান যুদ্ধের পটভূমিতে লেখা এই উপন্যাসে এক গণিকার দেশপ্রেম ও তার পাশে বড় ঘরের মেয়েদের কুটিলতা ও হৃদয়হীনতা এমন নিপুণভাবে চিত্রিত হয়েছে যে মোপাসাঁর কড়া সমালোচকরাও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, বিশ্ব সাহিত্যে এ বইয়ের তুলনা নেই। পাঁচ রঙের প্রচ্ছদ বইটিকে লোভনীয় করে তুলেছে।

আমাদের আরও দুখানা অসাধারণ গ্রন্থ

ভ্যাম্পায়ার ৮·০০

Inspector North & Stravel Tragedy নামক অসাধারণ চমকপ্রদ রহস্য উপন্যাসের অনবদ্য ভাষান্তর। এই উপন্যাসেই সর্বপ্রথম 'ওয়্যারি টকিং' মাধ্যমে অপরাধীকে সনাক্ত করা হয়েছে।

অভিশপ্ত ৫ই অক্টোবর ১০·০০

মোর অফ দি ক্লোমান ভয়েজের **Mystery of Clumber**

শীগগিরই বের হবে

লেডী চ্যাটার্লিস লভার-এর বহু বিতর্কিত লেখক

ডি. এইচ্. লরেন্সের

আর একটি বিতর্কিত উপন্যাস **The Princess** -এর ভাষান্তর

রাজকন্যা ৬·০০

প্রতিটি বইয়েরই ভাষান্তর করেছেন শ্রীইন্দুভূষণ বসু

প্রদীপিকা : ১৫-বি টেমার লেন, কলিকাতা-৯

CENTRAL LIBRARY

শুধু উপন্যাস প্রকাশ নয়, প্রকাশকদের পাঠকের ব্যক্তিগত সংগ্রহের দিকে নজর দিতে হয় এবং সেটা উপন্যাস নয়, তা হ'ল অন্য বিষয়কেন্দ্রিক। সম্প্রতি কাগজ কালির যা দাম বাড়লো, তাতে বই প্রকাশ অনেক কমে যাবে, দাম বাড়বে কিছু বেশী।

বেঙ্গল পাবলিশার

সাহিত্যের নেপথ্যে

আজ থেকে অনেক অনেকদিন আগেকার গল্প। তখন আমরা জন্মাই নি তাই সে চেহারা লিখবো বললে সেই যুগে ফিরে যেতে হয়, সেই নামটা হল বটতলা। তার বাজার তখন রমরমা। চকচকে মলাটে সিল্কোফেন কাগজে মোড়া কভার, আর তার কি সব নাম! সিঁদুরে দিও না ফেলে, ওগো প্রিয় চুম্বন যমুনার জলে ছিয়ার ছিয়ার! এই বাজারে তখন জাঁকিয়ে বসেছেন একজন ভিনব্যবসার বই-ব্যবসায়ী, তাঁর নাম ছিল ভাগ্যচাঁদ বসু। ভাগ্যচাঁদবাবুর স্টেকস্ট বইয়ের ব্যবসা ছিল। অনেক মাঝারি রকমারই দোকান ছেলেন, তাঁদের একজন ছিলেন মনোজ বসু। মনোজবাবুও লিখতেন একটা বই। বইটা দারুণ চলছিলো। কিন্তু ভাগ্যচাঁদের ব্যবসা ভাল চলছে দেখে, শত্রুরা চুপ করে বসে রইলো না, তারা বটতলার ঘুঁটোতে শুরু করলো—বাঙালীর দোকান থাকতে ওখানের বই কেন? গজেবটা ছড়াবার সঙ্গে সঙ্গেই ভাগ্যচাঁদ মনোজবাবুকে একটা প্রস্তাব দিয়ে বসলেন—দেখুন, আপনি নিজে একটা দোকান খুলুন। টাকাকড়ি সব আমার, আপনার বুদ্ধি। পার্টনারশিপে দোকানটা চলবে। চলবে। তৈরী হল বেঙ্গল পাবলিশার। আহিরিটোলার সে দোকান ঘর কিছুদিন বাদে টি বি রোগে ভাগ্যচাঁদ মারা গেলেন, তাঁর ছেলেরা বলল—আমরা পার্টনারশিপের কোন ব্যবসা রাখব না, আপনি বাকী শেয়ারটা কিনে নিন। মাস্টারমশাই তখন অত টাকা পাবেন কোত্থেকে? তবু জোগাড়-যন্ত্র করে দোকানটা নিজের নামে নিলেন—সালটা কত মনে আছে?

ঠিক সালটা বলা যাবে না, তবে সে প্রায় ৪০।৫০ বছর আগেকার কথা।

গোড়া থেকেই ঠিক হল, আমরা সাহিত্যের বই ই বের করব। কারণ বাবা লেখার লাইনের লোক, এ ছাড়া ভাবনা হয় কি করে? প্রথমে তিনটে বই বেরুল—একটা সুনীতি চাটুজ্জের বই একটা মানিক বাড়ুজ্জের সমুদ্রের স্বাদ আরেকটা বাবার—তুঁষ নই।

বাড়ীর আড্ডাটা এবার দোকানে গিয়ে জমলো। আসেন অনেকে। আসেন বিভূতিভূষণ ভট্টাচার্যের মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কখনও আসেন সজনীকান্ত দাশ, নারায়ণ গাঙ্গুলী। সমরেশ বসু তখন সবে এসেছেন, কমলেশ্বর কাগজ পরিচালনা নিয়ন্ত্রিত লিখছেন। লাজুক মুখচোরা বিনয়ী। কত রকম গল্প হয় সাহিত্য ছাড়িয়ে জীবনের, সেখান থেকে কখনও কখনও হয় পারিবারিক।

মানুষ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখলে বোঝা যাবে না, তাঁর কলমের ধার কতটা ও তারপর ছাপাটাপা কি হবে, এসব ব্যাপারে কোন প্রত্যক্ষেপ ছিল না। অমায়িক সরল মানুষটা ভেতরের আগুনটা বাইরে থেকে দেখে বোঝবার উপায় ছিল না। মানিক বাবুর অধিকাংশ বই তখন বেঙ্গল থেকে বের হচ্ছে। যাই হোক বেঙ্গলের প্রথম তিনটে বই-ই বাজারে ধরলো। ভূঁস নাই নিয়ে এল অসম্ভব জনপ্রিয়তা। কিন্তু প্রকাশনী দাঁড়াল অন্য একটা ঘটনা থেকে। সেটি কিছু বলার মতো।

বাংলাদেশে, মানে তখনকার বাংলাদেশে দারুণ দুর্ভিক্ষ চলছে। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তখন জনপ্রিয়তার চূড়োয়। তাঁর নামে বাংলাদেশ ভিড় জমে যায়, উনি তখন এখান-ওখানে শ্রদ্ধানীপুরে বক্তৃতা দিচ্ছেন। ওঁর বই বেরিয়েছে ইংরেজীতে। তখন বেঙ্গল শ্যামাপ্রসাদের বক্তৃতাগুলো ভাগ ভাগ করে একটা বই প্রকাশ করল। তার নাম দেওয়া হল — পঞ্চাশের মন্বন্তর।' বইয়ের ভেতরে মন্বন্তরের ছবি। হট কেকের মত বইটা বিক্রী হল। মুদ্রণের পর মুদ্রণ। আমরা বইয়ের খরচটা বাদ দিয়ে আমাদের প্রাপ্য এবং শ্যামাপ্রসাদের রয়্যালটিসহ সব টাকা দিয়ে দিলাম—দুর্ভিক্ষ ত্রাণ তহবিলের জন্যে, শ্যামাপ্রসাদের হাতে। তখনই হৈ-চৈ পড়ে গেল। কে না কে, কোথাকার একটা বেঙ্গল পাবলিশার, তাকে কিনা শ্যামাপ্রসাদের মত লোক বই দিলেন? আমাদের প্রকাশনীর প্রেস্টিজ, জনপ্রিয়তা সেই তখন থেকেই শুরু হ'ল। তখন থেকেই 'বেঙ্গল' থেকে বই বেরুলো মানে প্রেস্টিজের ব্যাপার।

আমরা আরেক হিন্দু হোস্টেল থেকে আসা লেখকদের থেকে তফাৎ করে নেতাজী সুভাষ বসুর বই ছেপেছি। রাতদুপুরে আক্রান্ত হিন্দু হোস্টেলের লোকেরা এসে বই ছাপবার ভিক্ষা নিয়ে গেছে। দিয়ে গেছে নতুন নতুন উপহার। আমরা বইটার নাম দিয়েছিলাম—'দিল্লী চলো'। সুভাষ বসু, শুধু নয়, আমরা আর্যবিহারী বসুরও বই ছেপেছি ঐ একই সঙ্গে।

যে লিখেছেন, অর্থের জন্যে সাহিত্য-বিক্রী করি না, এটা ঠিক কথা নয়।

পোরটা সার্থকভাবে মিটে গেল। এ লোকনাথ মাস্টারের চরিত্র ও এঁকেছিলেন—সেই মাস্টার, যোগে ছা। কারা যেন জ্যোতিরিন্দ্রবাবুকে ছিল, ঐ চরিত্রটি আপনাকে নিয়ে জ্যোতিরিন্দ্রবাবু বুঝেছিলেন এবং সেদিন খাপ্পা হয়েছিলেন বনফুলের ওপর। ক বনফুল ও ঘটনার জের টানলেন পোস্টারের পাতা সংখ্যায় জ্যোতি-নিয়ে একটা কার্টুন গল্প লিখলেন।

বার বাংলার লিটল ম্যাগাজিন যজ্ঞে উঠল, কারণ বনফুলের শ্রেষ্ঠ গল্প বলাইটাঁদ বের করেছে।

অসংকলন পত্রের কথা। মোহিত-র পর্যায় 'বলাদর্শন' বের করছেন। যে ধারাবাহিক লেখা যাচ্ছে মোহিত-শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র। সেখানে অন্য লেখকের কথা আসার কথাও নয়। রৎচন্দ্র প্রসঙ্গে কোন এক জায়গায় করে আলোচনা করলেন মনোজ-মাধবের গল্পটি। এবং একথাও —এই লেখক যদি জীবনে আর গল্প না লেখেন, তবু এই গল্পের তিনি সাহিত্যে আলোচিত হবেন। আরেক মানুষ মোহিতলালকে দেখা যনি মহান। এবং সাহিত্যসমা-র সময় যিনি পরিশ্রম কিছু মনে না।

বেলাল বই বের করছে লেখক লেখে মানুষ দেখে নয়—যেমন বের করেছে সুবোধ ঘোষ পাশাপাশি মানিক বাড়ুজ্যে গোপাল হালদার। একদিকে নেতাজীর বই অন্যদিকে গান্ধীর ওপর লেখা। যে কম্যুনিস্ট, যে কংগ্রেস ঠিক সেই মাপ কাঠিতে ফেলে নয় লেখকের গুরুত্ব বিসেবে।

মুখে বসু তখন কলেজে পড়তেন ১৯৬৬ থেকে দোকানে আসতে শুরু করে ছেন। একেবারে আনকোরা শখে, বন্ধুর বুদ্ধিতেই চলে গেল দু বছর কিন্তু সম্পূর্ণ আধুনিক মনের প্রকাশনীকে নতুন ছাঁচে গড়ে তুললেন।

—আমি ভেবেছিলাম, প্রকাশক মানে উপন্যাস। তা কেন হবে? আমার সামনে উদাহরণ হিসেবে ছিল পেঙ্গুইন। দেখলাম বিভিন্ন বিষয়ে পাঠকের চাহিদা থাকতে পারে। প্রকাশনী শুধু লাইব্রেরী-নির্ভর হবে? কেন? ব্যক্তিগত চাহিদাও তো থাকতে পারে। এ প্রসঙ্গে মনে হল প্রতি বছরেই তো হাজার হাজার লোক পুজো বা ছুটিতে ভ্রমণে যায়, ট্যুরিস্ট গাইড করলে কেমন হয়! একটার পর এক ট্যুরিস্ট গাইডের বই বেরিয়ে গেল, জনপ্রিয়তাও পেল। ব্যক্তিগত সংগ্রহ করতে বিভিন্ন পাঠক। ভ্রমণের পর আমরা ধরলাম খেলা। খেলার সরঞ্জাম বা 'লক্ষ বিষয়ে বই থাকা উচিত, বাজারে তা আছেও কিন্তু ধরনে আমরা যে খেলার বই করেছি তা হল ক্রিকেটার রোহন কানহাইয়ের জীবনের গল্প। একটা খেলোয়াড়ের পা

লেখক মুস্তাফা সিরাজের সর্বশ্রেষ্ঠ রহস্য উপন্যাস

কিছু অলৌকিক ৮, হাঙর ৬,

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য নিয়ে লেখা
গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের জীবনী উপন্যাস

অপুর পাঁচালী ১৫০০

বিশ্বেশ্বরের রহস্যঘেরা ঐতিহাসিক উপন্যাস

যখন চেঙ্গিস ৮০০

বিদ্রী যখন মহাশূন্য ৮·০০ ... অর্ণব ... ৬·০০

জ্যোতিরিন্দ্রর নন্দীর উপন্যাস ... বিশ্বনাথের উপন্যাস

প্রেমিক ৬·০০ বিনোদিনী ৫০০

... ৫·০০ ... ৬·০০

পুস্তক প্রকাশনী— ৮২।১ মহাত্মা গান্ধী রোড, ...

CENTRAL LIBRARY

ওঠার কাহিনী উপন্যাসের চেয়েও অকল্পনীয় হতে পারে। সেভাবেই আমরা ছেপেছি মুস্তাক আলীর সচিত্র জীবনী। আসলে সাপ্তাহিক বিশ্বের চোখ কান খোলা রাখলে এমন এমন জিনিস চোখে পড়ে যা প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। যেমন ধরুন হিসেব কষে লেখা যাবে গত কয় বছরের মধ্যে কলকাতায় চাইনিজ রান্না

হাওড়া
ফ্রেণ্ডস্
সোসাইটী
বেনারসী·সিল্ক·তাঁত
মিলবস্ত্র·পোষাক
১৫৫, জি, টি, রোড (সাউথ) হাওড়া
ফোন : ৬৭-৪৪৪৭

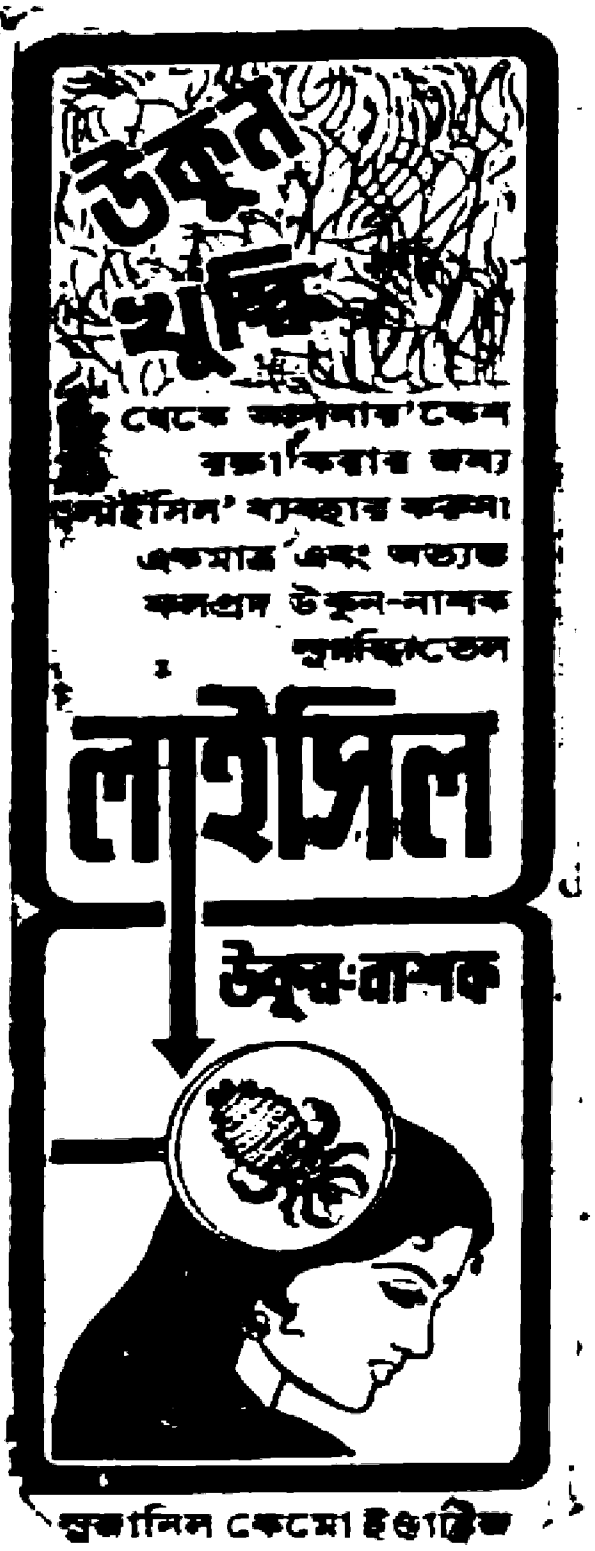

লুজালিন কেমো ইণ্ডাষ্ট্রিজ
রসেশনগর, চিনচওয়াড,
পুণা-১৯

কত পপুলার হয়েছে। শুধে মাত্র চীনে রেস্তোরাঁর নয়, বাড়ীতে বাড়ীতে এ-রান্নার উপকরণের চাহিদা, গড়িয়াহাট বা লেক মার্কেটে গেলেই দেখতে পাবেন। এ প্রসঙ্গে আমরা প্রকাশ করলুম চাইনিজ রান্নাসহ দেশ-বিদেশের খাবার, ভারতীয় রান্না, স্কেচ রান্নার গাইড বুক। অনেকের ব্যক্তিগত সংগ্রহে স্থান পেল এবং সব কটি বইই জনপ্রিয় হল। শিকার সম্বন্ধেও আমাদের ভাবনা ঠিক একই রাস্তায় চলেছে। ধরুন, শিকারের জগতে জীম করবেটের নামটা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে, বিশেষ করে ভারতের ইতিহাসে এ নামটা তো স্মরণীয়। কিন্তু জিম করবেটকে নিয়ে কখনো বই হয় নি। আমরা প্রকাশ করেছি 'জিম করবেটের জীবনী। এভাবেই প্রেতাত্মার উপর, তন্ত্রের উপর, দানিকেন, ভন্যান্তরবাদের উপর আমাদের বই আছে। বাংলা ভাষায় সায়েন্স ফিকশন দুর্বল বলে আমরা জুল ভের্নের অনুবাদ করেছি। সঙ্গে সঙ্গে চলছে উপন্যাস, রচনাবলী, শ্রেষ্ঠ গল্প।

—আন্দাজমতো কত বই হবে আপনাদের?

: সে অনেক, হিসেবের বাইরে।

—হিসেবের বাইরে?

: তার কারণ হচ্ছে আগের অনেক বইতে আমরা ছাপিনি, নামটামও ঠিক মনে নেই। তবে চালু-অচালু বইয়ের সংখ্যা হবে ধরুন চারশো-পাঁচশো।

পা-চ-শো? আচ্ছা নমস্কার, আপনাদের সেলের ব্যাপারটা কিভাবে অর্গানাইজ করেন?

—এ-ব্যাপারটার সবটার নিজের একটা দৃষ্টিভঙ্গীর ওপর নির্ভরশীল। আমরা প্রথমতঃ ক্যাটালগিং-এর ওপর জোর দিই, দ্বিতীয়তঃ নির্ভর করতে হয় ডিস্ট্রিবিউটারের ওপর, মানে হোলসেলারের ওপর এবং হোলসেলারদের কাছ থেকে বই কাটবার জন্যে সাপ্তাহিকে বিজ্ঞাপন দিতে হয় নিয়মিত। চেনের মতো একটার সঙ্গে একটা জড়িয়ে আছে।

: আচ্ছা নমস্কার, এই যে বিজ্ঞাপনের রেট বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সম্প্রতি যে কাগজের ওপর ২৫ ভাগ আর ব্যাপার কালির ওপর ট্যাক্স বসলো, এতে প্রকাশকদের প্রতিক্রিয়া কি রকম বলুন তো?

কি রকম আবার বইয়ের সংখ্যা কমে যাবে। কারণ কিছুদিন আগে কাগজের দাম একটু কম যাওয়াতে আমরা ফর্মা হিসেবে দাম ধরেছিলুম ৮০ পয়সা। এখন আবার ফর্মা সেই এক টাকাতেই ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হয়েছে, কারণ, উপায় নেই। ইদানীং বই একটু বেশী ছাপা হচ্ছিলো, সেভাবে এখন আর এগুবে না, একটু কমবে।

: আচ্ছা আপনারা বছরে কটা বই বের করেন?

—বছরে? তা ধরুন ২০-৩০টা। এখন আমরা ইংরেজী বইয়ের মাধ্যমে ভারতের অন্য ভাষাভাষীদের কাছে যাবার চেষ্টা করছি। নিশ্চয়ই দেখেছেন কলকাতা বুক ফেয়ারে আমরা অংশগ্রহণ করেছি। এতে পাঠকের সঙ্গে বইয়ের সরাসরি একটা যোগাযোগ হয়ে ওঠে।

: আচ্ছা একটা কথা আমার জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করছে, কবিতার বই তো আপনারা প্রকাশ করেন। কাব্যগ্রন্থের এখনকার বাজার কি রকম বলুন তো?

—দেখুন একটা ব্যাপারে নিশ্চয়ই এখন স্থির সিদ্ধান্তে আসা যায়—কবিতার বই যদি ভালোভাবে প্রোডাকসন করা হয়, অবশ্য মোটামুটিভাবে পরিচিত কবির, তবে তার একটা বিক্রি আছেই। দশ বছর আগে যা ভাবা যেতো না।

—তাহলে পাঠকও নিশ্চয়ই বেড়েছে।

: কেন? তখন কি পাঠক ছিল না? ছিল, তবে প্রকাশকেরা ঠিক এমনিভাবে, আজকের মতোন এগিয়ে আসেনি। ধরুন ভালো ভালো কবির কথা জানি যাঁদের প্রথম বইয়ের প্রথম মুদ্রণ শেষ হয়ে যাবার পরও দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয়নি। প্রকাশকেরা তখন হিড়িকে চলতো। এই ঐতিহাসিক উপন্যাস বাজারে ধরেছে তো চালাও হাজার হাজার ঐতিহাসিক উপন্যাস। ভ্রমণ কিংবা সুভাষ লাগলো তো চালাও ভ্রমণ, সুভাষ। খুন বাজার নিচ্ছে তো চালাও খুন। সে প্ল্যাটফর্ম থেকে অবশ্য প্রকাশকেরা একটু সচেতন হয়েছেন।

যাঁরা সাহিত্যিক মনোজ বসুর চিন্তা দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে সাহিত্য-প্রাণ দিয়ে যে-সংস্থাকে গড়ে তুলেছেন, আজও বয়সে এই বয়সে আধুনিক মননে তাকে রূপান্তরিত করেছে স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গীতে। কত আর বয়স হবে মনোজের—তিরিশের কম-বেশী কিছু। কিন্তু কলেজ স্ট্রীট পাড়ার একটা ভারী প্রবীণ প্রকাশনীর হাল ধরেছেন তরুণতর এক কর্ণধার।

কিন্তু আট বছরের অধিকাল বেঙ্গল পাবলিশার্সের সঙ্গে শ্রীমনোজ বসুর কোন সম্পর্ক নেই। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানের পরিচালক তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্রবধূ শ্রীমতী নন্দিতা বসু এবং কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমন্মথ বসু।

শাণ্ডিল্য চতুর্বেদী

CENTRAL LIBRARY

বাংলার খবর

টাকার টানাটানি

কলকাতা পৌরসভার টাকার টানাটানির কথা এখন সকলেরই জানা হয়ে গেছে। তবু ১৯৭৬—৭৭ সালের বাজেট পেশ করতে গিয়ে পৌর প্রশাসক শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় আবার নতুন করে কথাটা মনে করিয়ে দিলেন। অবশ্য টাকার টানাটানি বললে বেশ কম করেই বলা হয়। পৌর কর্তৃপক্ষের ভাষায় বলতে গেলে পৌর-সভার আর্থিক অবস্থা এখন ভেঙ্গে পড়ার মতো হয়েছে। আগামী আর্থিক বছরে পৌর বাজেটে ২৮ কোটি পাঁচ লাখ টাকার কিছু বেশি খরচ ধরা হয়েছে। অথচ আয় ২৩ কোটি ৪৪ লাখ টাকার মতো। অর্থাৎ চার কোটি ৬১ লাখ টাকা ঘাটতি। বকেয়া ঘাটতির দায় ১১ কোটি টাকা। পৌরসভার এই সংকটের কারণ কী? পৌর প্রশাসক বলেছেন কলকাতা পৌরসভার খরচ দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে অথচ আয় বাড়াবার রাস্তা হচ্ছে না। তাই ঘাটতি থেকে যাচ্ছে। এখন অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে রাজ্য সরকারের দেনা শোধ করার ক্ষমতা পৌরসভার নেই। কিছুদিনের জন্যে সরকার যাতে এই দেনা শোধের দায় থেকে রেহাই দেন সেজন্যে সরকারকে অনুরোধ করা হয়েছে।

কিন্তু পৌরসভার আর্থিক সংকট থেকে উদ্ধার পাওয়ার পাকাপাকি ব্যবস্থা কীভাবে হতে পারে? পৌর কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে আগেই নানা প্রস্তাব করেছেন। আবার সেই সব প্রস্তাবই করতে চান। প্রবেশ-কর চাকুরি-কর, শিক্ষা ব্যবদ বিশেষ 'সেস' ব্যবসার লাইসেন্স কর ইত্যাদি প্রবর্তনের জন্যে পৌর কর্তৃপক্ষ আগেও সুপারিশ করে-ছিলেন এ বছরেও করেছেন। তাছাড়া বিদ্যুৎ শুল্ক ব্যবদ সরকারী আয়ের শতকরা দশ ভাগ প্রমোদকর ব্যবদ আয়ের শতকরা ২৫ ভাগ, মোটর ভিহিকিলস কর ও চুঙ্গীর একটি বড় অংশ (শতকরা ৩৫ ভাগ) পৌর-সভাকে দেওয়ার জন্যেও প্রস্তাব করা হয়েছে। মহানগরীর বহুতল বাড়ি-গুলোর ওপর যে সম্পদ কর ধার্য হয় তার অধিক পৌরসভাকে দেওয়ার জন্যে এবং সম্পত্তি হস্তান্তরের সময় কর ধার্যের জন্যে পৌরসভাকে ক্ষমতা দেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন পৌর কর্তৃপক্ষ। আরো একটি নতুন করের প্রস্তাব করা হয়েছে। তার নাম হবে লুইস ট্যাক্স। কলকাতা পৌর এলাকায় পঞ্জীভুক্ত যানবাহনের মালিক-দের কাছ থেকে এই কর আদায় করা হবে। এর হার হবে সরকারের মোটর ভিহিকিলস ট্যাক্সের অর্ধেক। যতো দিন না এই সব নতুন আয়ের পথ খুলছে ততোদিন পর্যন্ত ঘাটতি মেটাবার জন্যে এবং মরলা সাফাই ও

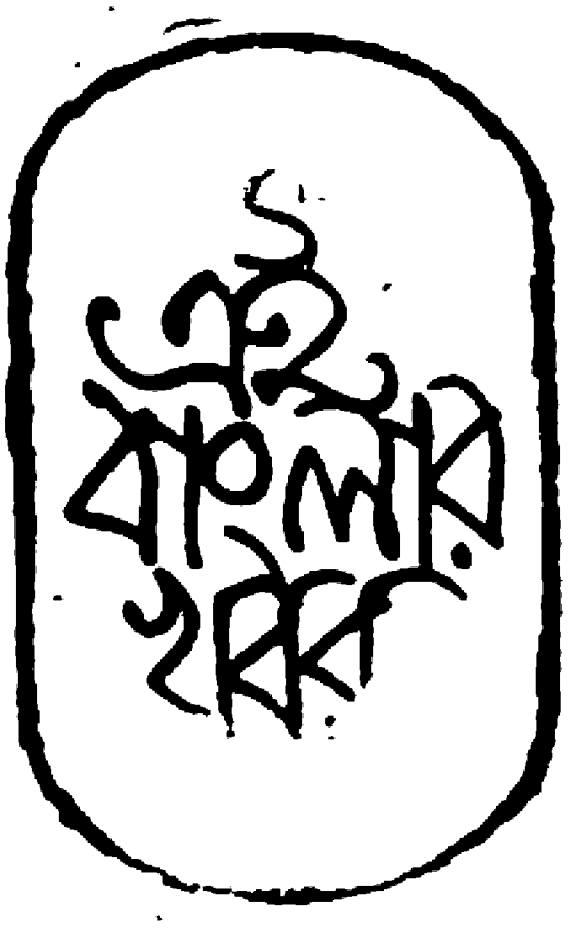

রাস্তা সংস্কারের জন্য রাজ্য সরকার দশ কোটি টাকা সরাসরি অনুদান দিন পৌর কর্তৃপক্ষের এই অনুরোধ এখন সরকারের বিবেচনাধীন।

পরিবেশ বিকার

কলকাতা পৌরসভার অর্থসংকটের মতো কলকাতা মহানগরীর পরিবেশ বিকারের খবরও এখন আর অজানা নয়। তবু একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী যখন সংসদে দাঁড়িয়ে এই খবর দেন তখন তার গুরুত্ব বাড়ে। সংসদীয় বিষয় দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী ওম মেটা রাজ্য-সভায় জানান যে শীতকালে কলকাতা ও হাওড়ার বাতাস বিশেষভাবে দূষিত থাকে বলে সম্প্রতি এক সমীক্ষায় জানা গেছে। জাতীয় পরিবেশ এঞ্জিনীয়ারিং গবেষণা প্রতিষ্ঠান (নাগপুর) এই সমীক্ষা চালায়। যেসব কল-কারখানার কাজ-কর্মের দরুন কলকাতা ও সহরতলীর বাতাস দূষিত হচ্ছে তার মধ্যে আছে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র রাসায়নিক এঞ্জিনীয়ারিং কাঁচা পাট ও কাপড়ের কল। বাতাসের বিকারের মাত্রা যাতে কমানো যায় সেজন্যে ঐ প্রতিষ্ঠানের অন্তর্বর্তীকালীন রিপোর্টে কয়েকটি সুপারিশ করা হয়েছে। প্রস্তাবিত এই সব ব্যবস্থার কয়েকটি স্বল্প মেয়াদী এবং কয়েকটি দীর্ঘমেয়াদী। এদিকে এই বাংলায় জল ও বাতাসের বিকার সংক্রান্ত সমস্যার ব্যাপকতার দিক খুঁটিয়ে দেখার জন্যে রাজ্য যোজনা পর্ষদ একটি বিশেষ সমীক্ষক দল গঠন করেছেন। অর্থমন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ (তিনিই যোজনা পর্ষদের চেয়ারম্যান) বলেছেন পরিবেশের বিকারের সমস্যা কল-কারখানার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ জটিল হয়ে উঠছে। এই সমস্যা সমাধানের জন্যে আরো কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। তার আগে সব ব্যাপারটা খুঁটিয়ে দেখতে হবে। কৃষির কাজে ব্যবহার্য জল যাতে দূষিত করা না হয় সেজন্যে সরকার আইন তৈরির কথা ভাবছেন। মাটি যে দূষিত হচ্ছে তার কারণ মাত্রাতিরিক্ত পোকা-মাকড় ওষুধের ব্যবহার। স্মোক নুইসেন্স আক্ট সংশোধনের কথা আগেই উঠেছে। এই আইন আরো কড়া করা হবে। যেসব কল-কারখানা এই আইন ভঙ্গ করে তাদের আরো কড়া সাজা দেওয়া হবে।

শিল্প সংকট

এই রাজ্যের শিল্পের ক্ষেত্রে এখন পরস্পরবিরোধী দুটি ছবি চোখে পড়বে। একদিকে যখন নতুন নতুন কল-কারখানা স্থাপিত হচ্ছে তখন রাজ্যের কয়েকটি প্রতিষ্ঠিত শিল্প পড়েছে সংকটের মধ্যে। তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে চটকল। শ্রমমন্ত্রী বিধান-সভায় যে বিবৃতি দিয়েছেন তা থেকে জানা যায় পাঁচটি চটকল ইতিমধ্যেই বন্ধ হয়ে গেছে, আরো গোটা আষ্টেক কয়েকদিনের মধ্যেই বন্ধ হয়ে যেতে পারে। পশম কাপড়ের কলকে বাঁচাবার জন্যে যেমন জাতীয় বস্ত্রকল কর্পো-রেশন গঠন করা হয়েছে তেমনই পশম চটকলের জন্যে জাতীয় চটকল কর্পোরেশন গঠন করলে তবেই চট-শিল্পকে বাঁচানো যেতে পারে। সরকার যদি এগিয়ে না আসেন তবে এই শিল্প বাঁচবে না। চটকলগুলোর যন্ত্রপাতির আধুনিকীকরণ খুবই দরকার। এর জন্যে অনেক টাকা চাই। শ্রমমন্ত্রী এই প্রসঙ্গে ষ্টেড ইউনিয়নের দাবিদাওয়ার কথাও স্মরণ করিয়ে দেন। চটকলকে সাহায্য করার জন্যে কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যেই কয়েকটি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। বিদেশের বাজারে পাটজাত পণ্যের চাহিদা কমে যাওয়াই চটকলের সংকটের প্রধান কারণ। তাই পাটজাত পণ্যের ক্ষেত্রে রপ্তানি শুল্ক তুলে দিয়েছেন কেন্দ্রীয় সরকার। তা ছাড়া চটকলের রোগ নির্ণয়ের জন্যে একটি কমিটিও নিয়োগ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রকের সচিব এস জি বসু মল্লিক এই কমিটির সভাপতি। এই কমিটি একটি অন্তর্বর্তী-কালীন রিপোর্ট পেশ করেছেন। উৎপাদন ছাঁটাইয়ের জন্যে চটকলের মালিকেরা যে প্রস্তাব করেছিলেন কমিটি তা মানতে পারেননি। তবে চটকলগুলোকে সাহায্য করার জন্যে ব্যাঙ্কের ঋণ দেওয়ার ব্যাপারে কড়াকড়ি কিছুটা শিথিল করার জন্যে সুপারিশ করেছেন এই কমিটি।

২৪-৩-৭৬

—দেবব্রত

বিদেশের কথা

মিশরের বন্ধুবিচ্ছেদ

মস্কোর সঙ্গে কায়রোর সম্পর্কের গাঁটছড়ার বেশ কিছুকাল যাবৎই টান ধরছিল। ১৯৭১ সালের মিশর-সোভিয়েট মৈত্রী চুক্তি একতরফাভাবে বাতিল করে দিয়ে প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত সেই ঘটনারই একটি আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিলেন। প্রেসিডেন্ট নাসেরের আমলে দুই দেশের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল নাসেরের উত্তরাধিকারীর আমলে সেই সম্পর্ক যে অটুট নাও থাকতে পারে তার ইঙ্গিত সাদাত ক্ষমতার আসার পরই দিয়েছিলেন। আলি সাবরি প্রমুখ নাসেরের যে সব ঘনিষ্ঠ সহযোগী সোভিয়েট-অনুগামী বলে গণ্য ছিলেন প্রথম ধাক্কায়ই তাঁদের সরিয়ে দিয়ে তিনি মিশরে পালা বদলের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন।

এই ইঙ্গিত বুঝেই সোভিয়েট রাশিয়া প্রেসিডেন্ট সাদাতের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ার আসার জন্য তাড়াহুড়া করছিল। আলি সাবরি প্রমুখের অপসারণের অব্যবহিত পরেই, ১৯৭১ সালের মে মাসে সোভিয়েট প্রেসিডেন্ট পদগোর্ণির নেতৃত্বে এক বড় প্রতিনিধি দল কায়রোতে চলে এলেন। প্রেসিডেন্ট পদগোর্ণির এই সফরের সময়েই স্বাক্ষরিত হল মিশর-সোভিয়েট মৈত্রী চুক্তি। ঐ চুক্তিতে মিশরের সঙ্গে সোভিয়েট রাশিয়ার সামরিক সহযোগিতা চালিয়ে যাওয়ার ও ঐ সহযোগিতাকে আরও গভীরে নিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হল। সোভিয়েট রাশিয়ার কাছ থেকে মিশর যে সব জটিল অস্ত্রশস্ত্র ও সামরিক সাজসরঞ্জাম পাবে সেগুলি ব্যবহার করার জন্য সোভিয়েট রাশিয়া যে মিশরীয়দের তালিম দেবে সেকথাও এই চুক্তিতে নির্দিষ্ট করে বলা হল।

নাসের যে পথ দেখিয়ে গেছেন সেই পথ থেকে মিশর যাতে সরে না যায় সেজন্য সোভিয়েট রাশিয়া ঐ চুক্তিতে মিশরকে সামরিক সাহায্য দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুই দেশের মধ্যে রাজনৈতিক বন্ধনের কথাটিও বড় করে উল্লেখ করে রাখল। বলা হল, সোভিয়েট রাশিয়া যেমন একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র, মিশরও তেমনি সমাজতন্ত্রের পথে সমাজ পুনর্গঠনের লক্ষ্য নিজের সামনে রেখেছে এবং দুই দেশ জনগণের অর্জিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার-গুলি রক্ষা করার জন্য ও সেগুলিকে রক্ষা করার জন্য নিজেদের মধ্যে সহযোগিতা করবে।' যদিও চুক্তির প্রথম ধারায় বলা হয়েছিল যে, দুই দেশ পরস্পরের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না তাহলেও এই চুক্তি সম্পর্কে মন্তব্য করতে প্রাভদা পত্রিকায় প্রসঙ্গত লেখা হল, অভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধেও মিশরকে সোভিয়েট রাশিয়া সাহায্য করবে।

যদিও পরবর্তী কালে প্রেসিডেন্ট সাদাত বলেছেন যে প্রেসিডেন্ট পদগোর্ণি তাঁর পকেট থেকে ঐ চুক্তির কাগজটি বের করে তাঁকে সই করতে বাধ্য করেছিলেন তাহলেও ১৯৭১ সালে তিনি উচ্ছ্বাসভরে বলেছিলেন, দুই দেশের মধ্যে এই মৈত্রীর চুক্তি মাত্র ১৫ বছরের জন্য না হয়ে অন্তত ৩০ বছরের জন্য হলেই তিনি খুশী হতেন।

শুধু তাই নয়, আসোয়ান বাঁধের উদ্বোধনের সময় প্রেসিডেন্ট সাদাত সোভিয়েট রাশিয়ার সাহায্যের কথা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করে বলেছিলেন, 'আমেরিকানরা যে সব প্রতিশ্রুতি অপূর্ণ রেখেছেন সেগুলির প্রত্যেকটি সোভিয়েট প্রতিশ্রুতির দ্বারা পূর্ণ করা হয়েছে।

কিন্তু এই সব উচ্ছ্বাস সত্ত্বেও প্রেসিডেন্ট সাদাত রাশিয়ার সঙ্গে মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষর করার অব্যবহিত পরেই ১৫ হাজার সোভিয়েট কর্মীকে মিশর থেকে বের করে দিলেন। তখনও কিন্তু উভয় পক্ষ অব্যাহত মৈত্রীর ভানটা বজায় রাখার চেষ্টা করে গেছেন। প্রেসিডেন্ট সাদাত বললেন, এটা হচ্ছে বন্ধুর সঙ্গে সম্পর্কের মধ্যে একটা সাময়িক বিরতি। সোভিয়েট রাশিয়াও ভান করল যে, সোভিয়েট প্রশিক্ষকরা তাঁদের কাজ সারা হয়ে যাওয়ার পরই স্বদেশে ফিরে যাচ্ছেন।

মিশর ও সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যে সম্পর্কের এই অবনতি ১৯৭৩ সালের লড়াইয়ে ইজরায়েলের বিরুদ্ধে মিশরকে সোভিয়েট অস্ত্রসাহায্য সরবরাহের পথে বাধা হয় নি।

১৯৭৩ সালের এই লড়াইয়ের পর সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে মিশরের ব্যবধান বাড়তে থাকে। ইজরায়েলের সঙ্গে মিশরের দ্বৈধবিরতি চুক্তি সম্পাদনে মার্কিণ পররাষ্ট্র সচিব কিসিঞ্জার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। অপর দিকে, এ ব্যাপারে সোভিয়েট রাশিয়ার ভূমিকা প্রায় শূন্যের কোঠায় গিয়ে পৌঁছায়।

একই সঙ্গে আরও কতকগুলি ঘটনা ঘটে যাতে মিশরের সঙ্গে আরব দুনিয়ার ব্যবধান বাড়তে থাকে। সিরিয়ার স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে ইজরায়েলের সঙ্গে চুক্তি করায় সিরিয়া মিশরকে বিশ্বাসঘাতকতার অপবাদ দিল। প্যালেস্টিনীয়দের মধ্যেও এই সন্দেহ দেখা দিতে আরম্ভ করল যে মিশর তাদের পথে বসিয়ে ইজরায়েলের সঙ্গে বোঝাপড়া করে নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

যে প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের জোরে নাসের একই সঙ্গে মিশর ও সমগ্র আরব দুনিয়ার নেতৃত্ব দিয়ে গেছেন সেই ব্যক্তিত্বের জোর সাদাতের মধ্যে নেই। আরবদের সামগ্রিক স্বার্থে মিশরীয়দের দুঃখ-কষ্ট স্বীকার করে নিতে উদ্বুদ্ধ করার যে ক্ষমতা নাসেরের ছিল সেই ক্ষমতা সাদাতের নেই। বরং তাঁর আমলে মিশরীয়দের মনে এই ধারণাই প্রশ্রয় পেয়েছে যে ইজরায়েলের সঙ্গে গোটা আরব দুনিয়ার হয়ে প্রায় একক ভাবে লড়াই করতে গিয়ে মিশরকে অত্যন্ত বেশী স্বার্থ ত্যাগ করতে হচ্ছে।

এদিকে ক্রমবর্ধমান বৈষয়িক সঙ্কট মিশরকে ক্রমেই বেশী করে সৌদী আরব ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্যের মুখাপেক্ষী করে তুলছিল। এই সাহায্য পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করার জন্য প্রেসিডেন্ট সাদাতের পক্ষে একথা প্রমাণ করার দরকার হয়ে পড়ছিল যে, তিনি কম্যুনিস্টদের সংসর্গ ত্যাগ করেছেন।

মিশর সোভিয়েট রাশিয়ার কাছ থেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে সব সাহায্য পেয়ে এসেছে সে সব সাহায্য বন্ধ হয়ে গেলে সোভিয়েট রাশিয়ার শূন্য স্থান কে পূরণ করবে সেটা এখনই নিশ্চয় করে বলা মুস্কিল। নির্বাচনের বছরে আমেরিকা ইজরায়েলকে চটিয়ে মিশরকে খুব বেশী সাহায্য দিতে পারবে বলে মনে হয় না। আবার, ইজরায়েলের সঙ্গে মিটমাট করে নেওয়ার জন্য মিশর খুব বেশী আগ্রহ প্রকাশ করলে সৌদী আরব বা কুওয়াইট তাকে সাহায্য করার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠবে বলেও মনে হয় না।

প্রেসিডেন্ট সাদাত নিঃসন্দেহে একটা বড় ঝুঁকি নিয়েছেন।

২০-৩-৭৬ পুষ্করীক

শরৎ জন্মশত বার্ষিকীতে বহু তথ্যসমৃদ্ধ একক গ্রন্থ—
শরৎচন্দ্র—মণি বাগচি—১৮৲
রুথাইয়াৎ-ই-ওমর খেয়াম • কাজী নজরুল ইসলাম • ২০৲
দেশবন্ধু • মণি বাগচি • ২০৲
মহানায়ক মুজিবুর—অমরেন্দ্রকুমার ঘোষ-১৫৲ মহাজীবন—অমরেন্দ্রকুমার ঘোষ-২০৲
মোহন লাইব্রেরী : ৩৫ এ, সূর্যসেন স্ট্রীট • কলিকাতা ৯ ফোন : ৩৫ ৩৬৩৩

CENTRAL LIBRARY

...ারী
...ত ও রাহুমুক্তি

প্রমোদ মুখোপাধ্যায়

মোটামুটিভাবে অনেকের জানা
...াই পুনরুল্লেখ করছি না।

...ত গ্রন্থের (প্রথম প্রকাশ) রূপ-
...লো ছিল না। সাদা কাগজ দিয়ে
...পল্লবোর্ডের মলাট—মাথার ওপর
...রফে ছাপা—পথের দাবী। নীচের
...শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নাম। দাম
...া। ছাপানো হয় তিন হাজার
...ই-এর প্রকাশ-তারিখ ভাদ্র, ১৩৩৩
প্রকাশক—উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।
...রে বিস্তৃত আলোচনা প্রকাশিত
...মৃত শরৎ-শতবার্ষিকী সংখ্যায়,
...দি মুখোপাধ্যায় লিখিত 'পথের
প্রকাশন প্রসঙ্গ' শীর্ষক নিবন্ধে)।

...কদিনের মধ্যেই মুদ্রিত সমস্ত
...শেষ হয়ে যায়।

নিশ্চিন্ত নিঃশঙ্কচিত্তে
প্রকাশক এবং শুভানুধ্যায়ী অসংখ্য
সরকারী প্রতিক্রিয়া ও হুকুম
অপেক্ষায় থাকেন।

অপরদিকে সরকারী মহলেও
নানান আলোচনা ও রিপোর্টের বি
শান্তিমূলক ব্যবস্থার তোড়জোড়।
অবশেষে তখনকার পুলিশ কমি
টেগার্ট সাহেব একটি সুনির্দিষ্ট
নিয়ে এ-ব্যাপারে তদানীন্তন বঙ্গ
কারের অস্থায়ী মুখ্যসচিব মিস্টার
টিসের কাছে একটি চিঠি পাঠালেন।

...ম স্যার চার্লস টেগার্ট, কেটি, সি
এস ভি ও, কমিশনার অফ পু
কালকাটা

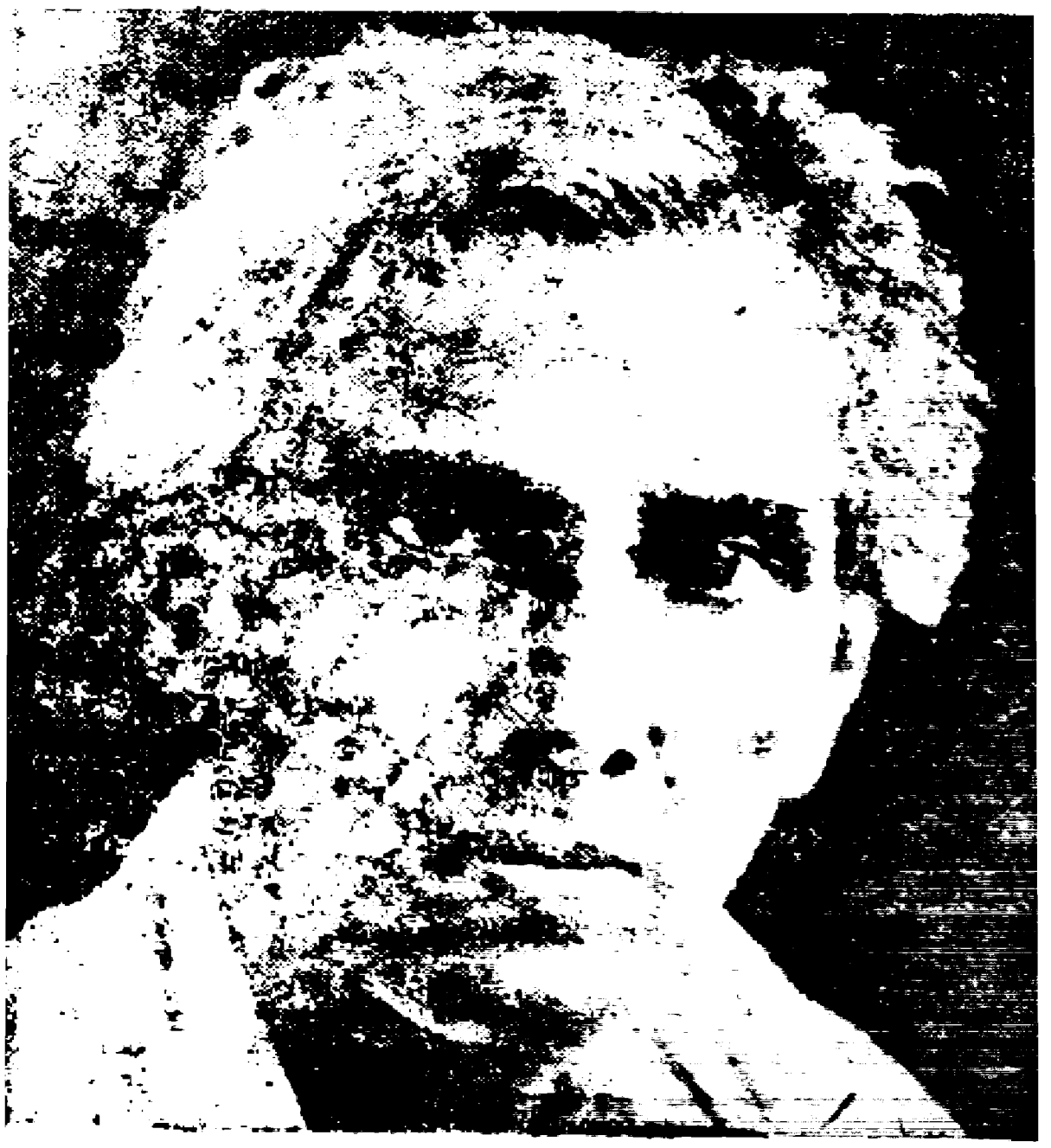

(কনফিডেন্শিয়াল) নম্বর ৫২৭২ জি'ড
ট্ দি চীফ সেক্রেটারি টু দি গভঃ অফ বেঙ্গল
পলিটিক্যাল ডিপার্টমেণ্ট
ক্যালকাটা, ২৫ নভেম্বর ১৯২৬

সার,

আই হ্যাভ দি অনার টু ফরওয়ার্ড হিয়ারউইথ, ফর দি কনসিডারেশন অভ গভর্নমেণ্ট, দি ট্রান্সলেশন অভ অবজেকশনএবল প্যাসেজেস ফ্রম দি বুক এনটাইটেলড 'পথের দাবী—রিটেন বাই শরৎচন্দ্র চ্যাটার্জি—এ ওয়েল-নোন নভেলিস্ট অফ বেঙ্গল. প্রিণ্টেড বাই সত্যকিঙ্কর বানার্জি ফ্রম দি কটন প্রেস ৫৭, হ্যারিসন রোড অ্যান্ড পাবলিশড বাই উমাপ্রসাদ মুখার্জি ফ্রম ৭৭, আশুতোষ মুখার্জি রোড, ভবানীপুর, কালকাটা। এ প্রিণ্টেড কপি অফ, দি বুক ওয়াজ সেণ্ট টু দি পাবলিক প্রসিকিউটর কালকাটা ফর হিজ ওপিনিয়ন অ্যান্ড হি অ্যাডভাইসেস দ্যাট দি বুক ইজ লাইএবেল টু বি প্রোসিকিউটেড আণ্ডার সেকশন ১৯এ অফ দি ক্রিমিনাল প্রসিডিওর কোড অ্যান্ড দি অথর অ্যান্ড প্রিন্টার টু বি প্রসিকিউটেড আণ্ডার সেকশন ১২৪এ অফ দি ইণ্ডিয়ান পেনাল কোড।

দি ট্রান্সলেশন মে কাইণ্ডলি বি রিটার্নড আফটার পেরুজাল।

আই হ্যাভ দি অনার টু বি,
সার,
ইয়োর মোস্ট ওবিডিয়েণ্ট সারভেণ্ট
(স্বাক্ষর অস্পষ্ট)
ফর কমিশনার অফ পোলিশ, কালকাটা।

উপরের চিঠিতে ফর কমিশনার-এর ওপর স্বাক্ষরকারীর নাম জানা যায়নি।

চিঠির সঙ্গে মূল গ্রন্থের পৃষ্ঠা সংখ্যা উল্লেখ করে বিভিন্ন অংশের ইংরাজি অনুবাদ দেওয়া হয়েছিল। ধারাবাহিকভাবে এগুলি হোলো :—

১১ ৪৮ ৬৮ ৬৯ ৭৫ ৭৬ ৮১ ৮২ ১২৭ ১৫১ ১৫২ ১৮৪ ১৯৬ ১৯৮ ২০৫ ২১১ ২১৩ ২১৫ ২১৬ ২২৫ ২৪৫ ২৪৪ ২৬৫ ৩০১ ৩০১ ৩২২-২৪ ৩২৬ ৩২৮ ৩৩৩ ৩৩৫ ৩৩৭ ৩৩১-৪৫ ৩৪৫ ৩৪৮ ৩৭১ ৩৯৫-৯৭ ৩৯৯ এবং ৪১৫

কালি দিয়ে মূল নথির মার্জিনে লেখা আছে : কালেকটেড বাই কে ডি রায়। বিটি অফিস ১৮-১১-২৬। বিটি অফিস মানে বেঙ্গল ট্রানস্লেটরস অফিস।

দ্বিতীয় স্টেগার্ট সাহেবের চিঠি—সুতরাং ব্যবস্থা গ্রহণ শুরু হয়ে গেলো।

মূল নথির প্রথম পৃষ্ঠাটি নিম্নরূপ :—

পথের দাবী বাজেয়াপ্ত করার সরকারী নির্দেশনামা

NOTIFICATION

No. 1031P.—The 4th January 1927.—In exercise of the power conferred by section 99A of the Code of Criminal Procedure, 1898, as amended by the third schedule of the Press Law Repeal and Amendment Act, 1922 (Act XIV of 1922), the Governor in Council hereby declares to be forfeited to His Majesty all copies, wherever found, of the Bengali book entitled "Pather Dabi" written by Sri Sarat Chandra Chattopadhyay, printed by Sri Satya Kinkar Banerjee at the Cotton Press, 57, Harrison Road, Calcutta, and published by Sri Umaprasad Mukhopadhyay 77, Ashutosh Mukherji Road, Calcutta, on the ground that the said book contains words which bring or attempt to bring into hatred or contempt and excite or attempt to excite disaffection towards the Government established by law in British India, the publication of which is punishable under section 124A of the Indian Penal Code

Bengal.

W. D. R. PRENTICE.
Chief Secretary to the Government of Bengal (offg.)

স্যাক্ত দিস দি পলিসি অফ দি গভঃ নট টু প্রোসিকিউট এনি বুক অর নিউজপেপার আনলেস দেয়ার আর ভেরি গুড গ্রাউণ্ডস টু শো দ্যাট এ প্রোসিকিউশন উড বি সাসসেসফুল ভাইড প্রেসিডেণ্ট।

স্যাক্ত অস্পষ্ট।
স্বাক্ষর—অস্পষ্ট
২৫-১১-২৬

এর পরপৃষ্ঠায় মুখ্যসচিব প্রেনটিস লিখছেন (কালো ভুষো কালিতে লেখা—হাতের লেখা খুব জড়ানো) :—

দিস ইজ এ পরজেনাস প্রোডাকসন বাট অ্যাজ আন্ডার আণ্ডার অফ ১৯এ কান বি প্রোসেসড টু দি হাইকোর্ট আই থিঙ্ক উই শাড হ্যাভ দি অ্যাডভাইস অফ জেনারেলস ওপিনিয়ন বেফোরেদার এ প্রোসিকিউশন উড বি আণ্ডার অফ ১২৪ অফ আই পি সি।

স্বাক্ষর—ডবলু ডি আর প্রেনটিস
২৫-১১-২৬

এরপর গভর্নরের একজিকিউটিভ কাউন্সিল সভ্য নবাব বাহাদুর আলী সাহেব লিখছেন—

বেটার গো ট 'দ বুক ইটসেলফ কাস্ট
স্বাক্ষর—
২৫-১১-২৬

তিনি নথিটি পাঠান এ ডি এস-কে। এ ডি এস ২৬-১১-২৬-এ (স্বাক্ষর অস্পষ্ট) বলছেন—'সি পি মে বি আস্কড ফর দি বুক এম ডি।'

তারপর কমিশনার অফ পুলিশ মূল বইটি নথিভুক্ত করলেন।

নথির এই পৃষ্ঠার মার্জিনে অস্পষ্ট স্বাক্ষরসহ (২৬-১১-২৬) পেন্সিল-নোট আছে—'ইট হ্যাজ বিন অ্যাসসারটেইনড ফ্রম বি টি অ্যাণ্ড দি লাইব্রেরিয়ান বেঙ্গল লাইব্রেরী দ্যাট দি অরিজিনাল কপি অ্যাভেলএবেল ইন দি বেঙ্গল লাইব্রেরী ইজ উইথ সি পি।'

উপরোক্ত নথিভুক্ত লিপিবদ্ধ বিষয়ের প্রসঙ্গে কিছু বক্তব্য নিবেদন করছি।

(১) সমকালীন বৃটিশ এবং এদেশীয় উর্ধ্বতন সরকারী কর্তৃপক্ষ নিজ হস্তে কালি দ্বারা স্বীয় বক্তব্য লিপিবদ্ধ করে তারিখসহ স্বাক্ষর দিতেন।

(২) একটি গল্প প্রচলিত আছে যে, পথের দাবী প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজ কর্তৃপক্ষ লেখক, মুদ্রাকর ও প্রকাশককে শাস্তিবিধান করতে মনস্থ করেছিলেন কিন্তু সে সময়ের বাঙ্গালী পাবলিক প্রসিকিউটার রায়বাহাদুর ডাকুনাথ সাহা তাঁদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঐ কাজ থেকে নিবৃত্ত করেন এবং শেষ পর্যন্ত শুধুমাত্র গ্রন্থটিকে বাজেয়াপ্ত করার হুকুমনামা জারীর ব্যবস্থা করেন।—কমিশনারের চিঠির শেষাংশের বক্তব্য উপরোক্ত গল্পের অসত্যতা প্রমাণ করছে।

(৩) উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং অন্যান্য অনেকে বলে, কয়ে শুনেছি পুলিশ প্রকাশকের বাড়ী সার্চ করতে গিয়ে পথের দাবীর কোনো কপি না পেয়ে শেষে অনুরোধ করেন, যে-কোনও ভাবে হোক একটি কপি জোগাড় করে দিতে। তখন এক নিকট-আত্মীয়ের বাড়ী থেকে একটি কপি সংগ্রহ করে পুলিশের হাতে অর্পণ করেন শ্রীমুখোপাধ্যায়। কিন্তু প্রান্ত সেই কপিটি সংগ্রহের আগে সুচতুর ষ্টেগার্ট সাহেব যে বেঙ্গল লাইব্রেরীর একটি মাত্র কপি হস্তগত করেছিলেন, তা নথির মার্জিনে পেন্সিল দিয়ে লেখা থেকে জানা গেল।

পুলিশ কমিশনার মূল বইটি নথিভুক্ত করার পর এ ডি এস একটি মজার নোট দিলেন।

"The I.B. wanted the whole of this book be translated. This would have involved entertaining additional staff in the B.T.'s office. On consulting the I.B. I learnt that they would be satisfied with what C.P. had called for. I presume that H.M. now desire the whole book to be prosecuted.

নোটটি মুখ্য সচিবের কাছে গেল। তিনি প্রথমে লিখলেন—

H.M. for orders with reference to his note of 25th.

তারপর স্বাক্ষর করে (২৯-১১-২৬) আবার লিখছেন (যেটি আইনঘটিত একটি সূক্ষ্ম প্রশ্ন) :—

"I noted that on the third leaf of the book appears a notice that this novel appeared in serial form in the Banga bani newspaper. A point that will have to be looked into after H.M. has passed orders is whether the passages now objectionable he actually appeared in the Bangabani

and if so whether any action was taken regarding them then.

Sd/ W. Printice
29. 11. 26.

মাননীয় সদস্য দ্বিধাগ্রস্ত হলেন। তিনি সুস্পষ্ট কোনো আদেশ না দিয়ে লিখলেন—

'আই ডিড নট ইন ভিউ দ্যাট দি হোল বুক শুড বি ট্রানস্লেটেড বাট ওন্যানটেড ইট শুড বি ইন দি ফাইল ইন কেস দি অ্যাডভোকেট জেনারেল ইনভাইটেড অর রেফারেন্স অফ ইট। উইল এল অ্যাক্ট নাউ শিজ অবটেইন হিজ ওপিনিয়ন।'

স্বাক্ষর—
২১-১১-২৬

লীগাল রিমেমব্রান্সার ৩০।১১।২৬ তারিখে অ্যাডভোকেট জেনারেলের কাছে নথিতে লিখে পাঠালেন—

'ফরওয়ার্ডস টু অ্যাডভোকেট জেনারেল ফর হেবার অফ ওপিনিয়ন হোয়েদার প্রোসিকিউশন উড বি বেড অফ ১২৪-এ আই পি সি।'

এরপর অ্যাডভোকেট জেনারেল শ্রীবি এল মিটার কালো ভুষো কালিতে সুন্দর হস্তাক্ষরে লেখা প্রায় সাড়ে ছয় পৃষ্ঠাব্যাপী (ফাইলে ৩—৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত) নোট দিলেন ১১ ডিসেম্বর ১৯২৬-এ। প্রকারান্তরে আসলে এই বাঙ্গালী মিত্র সাহেবের কাছ থেকে শাসক ইংরেজ পথের দাবী সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় শাস্তিবিধানের আদেশ জেনে নিলেন। অ্যাডভোকেট জেনারেল স্যার বীরেন্দ্রনাথ মিত্র পরবর্তীকালে বড়লাটের কাউন্সিল (এক্জিকিউটিভ) সদস্য এবং আইন পরামর্শদাতার পদ অলঙ্কৃত করেন। এবং আরো পরে স্বাধীন ভারতে অস্থায়ীভাবে কিছুদিন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের দায়িত্বও গ্রহণ করেন।

নোট-এর প্রথম দিকে তিনি লেখক সম্বন্ধে এবং পথের দাবীর উপন্যাস-গত দোষ-গুণ আলোচনা করেছেন।

"I have carefully read the book 'Pather Dabi'. The author is one of the foremost novelist in Bengal and is widely read. His previous novels dealt with social problems. This is to my knowledge the first book dealing with political matters. As a novel the book is in artistic. But it has considerable literary merit. Certain political doctrines are propounded with force and skill. The caution observed in the earlier parts of the book has not been maintained in the latter part.

এরপর শ্রীমিত্র পথের দাবী নামকরণের ব্যাখ্যা করে বলেছেন—

"The title 'Pather Dabi' is explained at the top of P127. A literal translation of the title is—"the right of unobstructed passage."

Sabyasachi of Doctor starts a club or association named 'Pather Dabi' with Sumitra as President and Bharati as Secretary. The hero is a revolutionary who is avoiding arrest by Police.

এরপর পথের দাবী গ্রন্থের রাজনৈতিক দিক সম্বন্ধে শ্রীমিত্রের বক্তব্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য:—

"There are three dominant ideas which run through the book. First, that a dispute between Indians on the one hand and Europeans or Eurasians on he other hand, the former get no justice in the courts in India. Secondly, that the cupidity of the European millowners has brought about grinding poverty of the labourers in India and brutalized them. And thirdly that the British Government in this country is run in the interests of British merchants resulting in inhuman exploitation and reducing the people to a state of abject poverty and helplessness. Towards the end of the book the hero works himself up to a state of frenzy, throws away all restraint and preaches pure bolshevism. He says he is out to destory Christian civilisation and Western civilization..... But reading the book as a whole I have no doubt that the author has failed to conceal his real intention which is to excite hatred and disaffections towards the Government established by the English in India."

এরপর নোটের শেষাংশে তাঁর সিদ্ধান্ত-স্বরূপ বলছেন:—

"I am not unmindful of the fact that the precise method to be employed in bringing about the revolution is nowhere clearly indicated in the book. Nor am I unmindful of the fact that the story ends with the dissolution of the Association implying that the country is not ripe for a revolution. Nevertheless the attempt to bring the Government into hatred is abundantly clear.

I think therefore that this book comes within the scope of Sec 124A, I.P.C. to justify action under Sec 99A of P.C.'

Sd.- B. L. Mitter
11th Dec. 1926

(ক্রমশঃ)

সম্প্রতি প্রকাশিত

The Footprints on the Road to Indian Independence

শ্রীকালীচরণ ঘোষ রচিত। ১৭৫৭ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত রাজনৈতিক ঘটনাবলীর কালানুক্রমিক ইতিহাস। [টাঃ ১৫-০০]

Aurobindo and Jugantar

শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ প্রণীত একটি স্বল্পপরিচিত রাজনৈতিক অধ্যায়ের প্রামাণিক তথ্যাবলী। [টাঃ ৫-০০]

স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন

পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী ডঃ শঙ্কর ঘোষ প্রণীত তথ্যসমৃদ্ধ বিশ্লেষণমূলক ইতিহাসের রূপরেখা।
[টাঃ ২০-০০]

সংস্কৃত নাটকের গল্প

অধ্যাপিকা অমিতা চক্রবর্তী রচিত ১০টি সেরা প্রাচীন সংস্কৃত নাটকের সাবলীল গল্পরূপ। [টাঃ ৮-০০]

গিরিশ রচনাবলী পঞ্চম খন্ড

গিরিশচন্দ্রের সমগ্র রচনা পাঁচ খন্ডে প্রকাশিত হ'ল। জীবনী ও সাহিত্যকীর্তি আলোচিত ও কয়েকটি বিশেষ প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট। [প্রতি খন্ড [টাঃ ২৫-০০]

প্রাচীন বিশ্বসাহিত্য

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য রচিত তথ্যসমৃদ্ধ বই। [টাঃ ২৫-০০]

সাহিত্য সংসদ
৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড,
কলিকাতা—৯

বিশ্বের দুঃসাহসিকা তরুণী গুপ্তচর মার্থা নাকেলের রচিত I was A Spy -এর সরল অনুবাদ

স্পাই মেয়ে মার্থা ১০-০০

ভাষান্তর : শ্রীইন্দুভূষণ দাস

কোর্ট মার্শালের বিচার শেষ। রায় বেরোবে আগামীকাল। রাত্রি কয়েকের সেলে শুয়ে পড়েছে মার্থা। স্বপ্ন দেখছে সে। তাকে দাঁড় করানো হয়েছে ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে। হাত দুখানা পেছনের দিকে হাতকড়া দিয়ে বাঁধা। সামনে দাঁড়িয়ে আছে দশজন রাইফেলধারী সৈনিক। রাইফেলগুলোর নল তাক্ করা রয়েছে তার বুকের দিকে। একজন অফিসার দাঁড়িয়ে আছে পাশে। হঠাৎ সে বজ্রগম্ভীর স্বরে আদেশ দিলো—ফায়ার!! — বুক নিঃশ্বাসে পড়বার মতো বই।

প্রাপ্তিস্থান : জ্ঞান নিকেতন : ১৮-এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

CENTRAL LIBRARY

কবিতা

ভোরবেলার পাখি ॥

রুদ্রেন্দু সরকার

তোমাদের কোলাহলে
আমার স্মৃতি শাড়ী পরে হাঁটে...
জানি বেদনা আমার ভোর বেলার পাখি
সে গান গায় — আমি শুনি।
তুমি কি ভেবেছিলে
আলোর জোছনা
আমার অমাবস্যার জীবনে
আলো ছড়ে মেরে—
নাকি হলদে ফুল
সাদা টগর গাছে ফুটবে...

কোন কিছুই তো হয়নি শেষ
আশা কল্পনা তুমি
এই মরুভূমি জীবনের অন্তর্যামী...
তুমি কি জানো—
ভুলের আকাশ তবু দাঁড়িয়ে
একলা আমি আর তুমি।

অতএব ॥

গৌতম গুহ

রমটা কেমন মুষড়ে যাচ্ছে যেন তোমার বাড়ি যাওয়ার আগে
আদর করবে কি তুমি
পথ হেঁটে বাড়ি ফিরে
অমন আদর পায় সবল পুরুষ
প্রমত্তা দেয় না কেউ
ভাবে না আমিও বাঁচতে চাই কিছুটা ঐ প্রেমিক কেলের মতো
হাত ছেড়ে চলে যায় দরদিয়া
এক লাইনও চিঠিনা না লিখে
আদর খনিয়ে যায় পইঁতির শব্দ

চৌলস্বাকের জন্য ছেড়ে
পাখিটা কেবল পাখিনীর জন্য ছোটে
আমি কোথাও ছুটি না;
চুপ করে বসে থাকি
অস্তিত্বের কোথাও মেদিনীমৃত্তিকা অবশ্য কাঁপে
বিকেলে হাওয়া এলে ভাবি, হাওয়ার পিছনে
কেউ আসছে
সে সুটকেস ভরে আনছে
সারাজীবন ধরে যা যা আমি চেয়েছি
নিয়ে যাবে সে অনেক দূরে
সেখানে সুখের প্রাসাদ দাঁড়িয়ে আছে
আমি বলব : তুমি আমায় ভালবাস
আমিও তোমায় খুব ভালবাসি
কিন্তু আরও ভালবাসি সেই সুখ
যা দুঃখের বিনিময়ে পাই
অতএব
তোমার ঐ সুটকেস নিয়ে যাও, গোছাই!

প্রত্যাবর্তন

বোলান গঙ্গোপাধ্যায়

অন্ধকার ঘনালে,
এখনও স্বপ্ন জাগে;
অন্ধকার ঘনালে,
এখনও জেগে ওঠে এসপ্ল্যানেডের খাঁ খাঁ রোদ
অথবা বন্ধুর হাতে হাত রাখা সেই যুবতীর চোখ।
অন্ধকার বিড়ালীর শিকারী চোখ
আমি কোনদিন দেখতে পাই না।
আর তাই প্রতিদিন
বহু পথ প্রান্তর পার হয়ে
আমি আবার ফিরে আসি
সেই উদাসী দুপুরে,
প্রেম তবু প্রেম নয়
সাহচর্য ভালোবাসায় কাছে টানা
বন্ধুত্বের নিবিড় বন্ধনে।

উপন্যাস

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

আদ্য শেষ রজনী

(৯ম)

কলোবস্ত খারাপ নয়। চেওয়াল ঘেরা আঠা চোদ্দ জায়গা। টানা চওড়া। লম্বা ঝোলানো বারান্দা। দু ধারে দুটো বাথরুম আছে। আজকাল দলকরা নাটকের আগে পরে চা খেতে খেতে আলাপ আলোচনা করতে ভালবাসে। চায়ের দোকান করবার মত একটা জায়গাও রয়েছে ভেতরে। সিটগুলো বদলাতে হবে। স্টেজে অনেক কাজ আছে। ইলেকট্রিক লাইন আরও একটা টানা দরকার। মেক আপ রুম বলতে কিছুই নেই। ভাড়া ঠিক হল প্রতি শো একশো বাট টাকা। ছ' মাসের চুক্তি। আগাম পেমেন্ট। টাকা দিল দর্গাদাস। হুইলচেয়ার আর আটটার ভেতর সব কমপ্লিট। বাড়ি ফিরতে লীলা বলল, 'একটা সুখবর নিয়ে ঢুকবে বাড়িটায়—

অমিয় কী মনে পড়তে বলল 'জানো একটা নারকেল গাছ আছে কম্পাউণ্ডের ভেতর।

—'তাদের ওপর অধিকার থাকবে আমাদের?'

—'আগে দাদো নাটক কেমন লাগে তার ওপর সব কিছু নির্ভর করছে। প্রথম দিনের রিহার্সেল রজনীদের বাড়িতে—

—'ভালো করেছো। কেন বাড়িতে হলে রিহার্সেলটা ভাল হয়। বিকুবাবুকে জানিয়েছ?'

—'অনেককেই জানানো হয়নি এখনো। শংকর তো ক্ষেপে লাল হয়ে আছে—

—কেন?

—'ঘোরিওয়ালার মতো যাতায়াত তুলে দেওয়ায় ও রীতিমত হার্ট হয়েছে।'

—'তা তো হবেই। সবে জমে উঠেছিল।'

—'আমার ভাল লাগছিল না। যে ঝার মত ঘাড়ে চেপে ছিল আমার। কোন আনন্দ পাচ্ছিলাম না। শংকর ওরা বোঝে না—দর্শক হলেই সে নাটক সফল এ কথা কে বলেছে ওদের?'

—'ওদের নিয়েই তো তুমি এগিয়েছো এতদিন।'

—'মানছি। কিন্তু কোথাও কোথাও তো আমাকে এগিয়ে গিয়ে ঠিক কথাটা বলতে হবে।'

—'ওদের মত তা ঠিক বলে মনে না হয়?'

—'নকের একটা ডিসিপ্লিন আছে তো।'

—'ডিসিপ্লিনের নামে যত কুইক ডিকটেটর হয়ে দাঁড়াও।'

—'আমিও ডিসিপ্লিনের বাইরে নয় লীলা। শংকরের কথা বলছো তুমি। ও অবশ্য সত্যি আমাদের ভাল। বর্ধমানে শো করতে গিয়ে ওকে পাই মনে আছে। খুব নাম—থিয়েটারে নামের স্টেজের পাশে গ্রীনরুমের কিনারে ঘুরঘুর করছিল। কলকাতায় এসে দেখা করতে বললাম। ভেবেছিলাম—আসবে না। এলো একদিন। পরীক্ষা করার জন্যে একমাস পরে ডেট দিয়ে দেখা করতে বললাম। তখনো এল সেবারে বললাম, একটা কিছু কাজ জোগাড় করে এস দেখা করবে।'

লীলা এখানে হেসে ফেলল, 'কাজ জোগাড়ও করে এল। বড়বাজারে বাসন পালিশের কাজ। মন আড়াই টাকা!'

—'তারপর শংকরকে নিতে বাধা হলাম। সময় মত শোয়ের ভেতর সেট বদলাতে। আর রিহার্সেলের সময় বসে বসে শুনতো। একদিন অরুণানের ব্রজবাবু আসেননি। ও লেখা দাদা গং তুলছে বসে বসে। আমায় দেখে বলল, যাবো দাদা?'

বললাম, যাও।'

তারপর থেকে তো পাইছে, বাজাচ্ছে, হাসির সঙ্গে হাসাচ্ছে দর্শককে। ও থিয়েটারের ডিসিপ্লিন জানে। ওকে কিছু বলতে হবে না। শংকরের মত লোক এখন আমার পাশে থাকা দরকার। দর্গাদাসের কাছ থেকে যে টাকার অফার নিলাম মনে হয়। দর হবে নাটক না লাগে! তখন? তখন কোথায় দাঁড়াব আমরা? নাটক শুধু ভাললেই চলবে না। লাভ হওয়া চাই। দর্গাদাসের সুদের খাই তো জানা।

—'আমার চাকরিটা তো আছে। ভাবনা কিসের তোমার!'

—'তুমিই তো আমার ভাবনা। নাটকের জন্য, আমার জন্যে—আর কতকাল এত খাটবে। জানি না শরীরে কি আছে।'

আজ রিহার্সালের শুরু দিন। দশ পনেরজন, ঘনিকক্ষণ বসেছিলেন। তারপর সেই যে ভেতরের ঘরে গেলেন—আর বেরোননি। বকুলদির বড় ছেলেও খানিকক্ষণ ছিল। তারপর সেও উঠে গেছে। অমিয় ভাবতে পারেনি—একটা এত ঝাড়াঝাড়ি খাতা না দেখে লাইনগুলো মুখস্থ বলে দেওয়া যায়। এর আগে ছোটে দুদিন পড়েছে।

সক্কোতা নাটক লিখেছে সুলাল—ফুটিবাজ থার্ড ইয়ার এম বি বি এস স্টুডেন্ট। গান আছে। নাচ আছে। ওর অভিনয়ের ধাক্কায় নাটকের গল্প এগিয়ে যাবে।

একদিন অন্তর একদিন এখন একটানা রিহার্সেল দিয়ে যেতে হবে। তার ভেতরেই অমিয় কাঠের মিস্ত্রি, রাজমিস্ত্রি, পেন্টার লাগিয়েছে। সিটগুলো রিপেয়ার করে ঠিক করে নেওয়া হচ্ছে। তুলো, রেকসিন, রঙ, পেন দিয়ে খানিকটা করে সিট রিপেয়ার হচ্ছে। পাশাপাশি স্টেজের ফোকাস ঝোলানোর জন্যে স্ট্যান্ড দেওয়ালে গেঁথে বসাতে হচ্ছে। একটি সেটের ওপর সবগুলি নাটক। তার দেওয়ালে কাঠ সেটে বড় বড় জানলা বসাতে হচ্ছে।

ভোরবেলা সক্কোতা চা খেতে এসে অমিয়কে ফোকাসের আগে নিজের

কাপে আলতো একটা চুমুক দিয়েই এই দু জানলার পর্দা সরিয়ে দিয়ে ঝকঝকে আলো এসে সব কিছু উজ্জ্বল করে দেবে। অডিটোরিয়াম তখন অন্ধকার।

সেই জায়গাটাই দু'বার রিহার্সেল হল। বরবর্ণিনী সুজাতা প্রথম ঘরণীর স্বাদ পাওয়ার পরদিন ভোরে ঠিক বউয়ের মতন করে স্নান করে ঢুকেছে। লাল কালো চওড়া পাড় শাড়ি পরনে। কোমরে আঁচল পেঁচিয়ে নিয়েছে সুজাতা। অভ্যস্ত ঘরণীর দ্রুত পায়ে ঘরে ঢুকলো সুজাতা। জীবন উপুড় হয়ে শুয়েছিল।

এই ওঠো। ওঠো না। ভোর হয়ে গেছে। যাও বাজার করে নিয়ে আসবে। আজ আমি এখানে রান্না করব।

জীবন কিছুতেই উঠছে না। তখন রজনী একটা বালিশ ধাঁই করে অমিয়র পিঠের ওপর ফেলল। অমিয় উঠে দাঁড়াল। ঘুমে চোখ বন্ধ। তখন তাকে ধরে কলঘরে নিয়ে যাওয়ার পথে রজনী গতরাতের একটা ডায়ালগ রিপিট করল। চল চল। কাশ্মীর যাবে না। হেঁটে হেঁটে কাশ্মীর।

গতরাতে জীবন নেশার ঝোঁকে বলেছিল। আগের সিনের কথা এ-সিনে এভাবে নিয়ে আসার কথা অমিয় ভাবেনি আগে। কিংবা বালিশপেটা করে তাকে তুলে দেওয়ার আইডিয়াটাও নতুন। রিহার্সেল দিতে দিতে রজনী যে কত খাঁজখোঁজ বের করে আনছে।

অমিয় প্রতি মিনিটে বুঝতে পারছে—সে এই প্রথম কমপিটেন্সের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অভিনয় করবে। তার ডায়ালগ—রজনীর ঠোঁটে পড়ে আরও পাঁচ ছটা মানে সুদ্ধ ফুটে উঠছে। এ রকম লোকের সঙ্গে সব সময় লড়াই করতে করতে রিহার্সেল দিতে হয়। স্টেজেই দেখেছে রজনীকে। রিহার্সেলে যে রজনী আরও কত রঙের হবে তখন!

দুটো ডায়ালগের মাঝখানে চল্লিশ সেকেণ্ডের জন্যে থেমে সেই গানটা ধরে দিল : বাঁধিয়া মনোল বেণী—ই—ই—'

নজরুলের গান। রাগাশ্রয়ী সুরে গলা ঝরনার মত বয়ে যেতে যেতে এক সময় থেমে গেল। অমনি সেই গলা থেকেই সুজাতার সংলাপ ছিটকে বেরিয়ে এল : সেই থেকে বচর বচর করছো।

গুরুপ্রসাদ চলে গেছে। শংকর ছিল। আর ছিল বিকু দত্ত। কাগজের অফিস থেকে আসতে আসতে দেরি হয়ে গেছে। শেষ ডিসসেন্সটা লোকার বসে বসেই একটু হাত হয়ে মেকেতে ঠুকেছিল। রাত সওয়া দশটা হবে। এমন সময় ফোনটা বেজে উঠলো।

রজনী উঠে গিয়ে ফোনটা ধরল। সঙ্গে সঙ্গে চোখ মুখ কঠিন হয়ে উঠল।

—আপনাকে তো বলেছি, ফোনে এমন খারাপ খারাপ কথা বলবেন না।

ঘর ঠাণ্ডা। তিনজনই একসঙ্গে রজনীর দিকে তাকিয়ে পড়ল। ও পাশের কথা শোনা যাচ্ছে না। রজনী আবার বলল: 'শো আর হবে না। ব্লাক হবে। টিকিট বিক্রি হবে। অথচ লাভ হবে না। লোকসান দেওয়াই যাবে। ও আবদারে আমি আর নেই।'

ফোনের ওপাশ থেকে আবার খানিক কি শুনলো রজনী। তারপর বেশ রেগেই বলল, 'আপনাকে বিয়ের কথা আমি কোন-দিনই ভাবিনি। ও সব মাথা থেকে ফেলে ফেলুন। আমি ফোন রেখে দিচ্ছি—'

বলেও রাখতে পারলো না রজনী। কানে ফোন। মুখ আরও শক্ত হয়ে উঠল।

—আপনার বয়স হয়েছে এখন। ফোনে খারাপ খারাপ কথা বলার বয়স আর নেই আপনার। বললাম তো, আমি কটি ছেলে-মেয়ের মা। আমার ফিরে বিয়ে বসার কোন কারণ ঘটেনি।

অমিয় এগিয়ে এসে রজনীর কানে কানে খুব আস্তে আস্তে বলল, কথা চালিয়ে যান। আমরা আসছি এখুনি।

রজনী ফোন হাতে চেপে ধরে নিরুপায় ভঙ্গীতে বলল, তৃপ্তি আমার জীবন ফোনে ফোনে অসহ্য করে তুলেছে। এতটা বয়স হল লোকটার, বুদ্ধি শুদ্ধি—

অমিয় বিকু আর শংকরকে নিয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে বলল, কথা চালান। থামবেন না। আমরা এখুনি আসছি। এখন বি কে পালের দোকানের কাছে ছাড়া কোথাও আর পাবলিক ফোন নেই। কাছাকাছিই তৃপ্তির বাড়ি। কথা চালিয়ে যান। আমরা আসছি। জাল জাল কথা বলুন দু-একটা—

জুলাইয়ের মাঝামাঝি। বৃষ্টি হচ্ছে। থেমে যাচ্ছে। জাগিয়া জাল। বেরোতেই ট্যাকসি পেল।

ট্যাকসিতে বসে বিকু বলল, আমি কোনদিন কারো গায়ে হাত দিই নি। আমি ও সব পারব না।'

শংকর বলল, শালাকে আগে পাই। তারপর যা করার।

যা করার দরকার হল না। ছোট্ট ওষুধের দোকানে নিওনের নিচে ওষুধ কোম্পানীর অনেকগুলো রঙীন লিটারেচার। তৃপ্তির গায়ের গেরুয়া পাঞ্জাবির হাতা জুড়ে আলোর নানা পোকা বসেছে। সেদিকে খেয়াল নেই। শংকর কাছে গিয়ে জড়িয়ে ধরতেই তৃপ্তি ফিরে তাকালো। টেলিফোন হাত থেকে পড়ে যাচ্ছিল। দোকানদার ছুটে এল। এমনিতে দোকানটা ফাঁকা তখন।

শংকর পাঞ্জাকোলে তৃপ্তিকে তুলতে তুলতে দোকানদারকে বলল, রাত হয়ে গেছে তো! বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছি।

—আমি চাঁচাবো কিন্তু। কি হচ্ছে মাইরি! এ সব কি?

—কতটা খেয়েছো!

—তোমার বাপের পয়সায়। ছাড়ো বলছি। আমার টেলিফোনটা কেটে গেল।

ট্যাকসি বাড়ি কাছেই ছিল। সর্দার-জীকে অমিয় কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, 'ভারি বিপদ সর্দারজী।' ট্যাকসি ছাড়তে প্রথম কথা বলল অমিয়। লাইন কেটে যায় নি? একদম সামনাসামনি কথা হবে এখন! সেখানেই তো যাচ্ছি আমরা।

রজনী এতটা ভাবেনি। দোতলায় তুলতে তুলতে তৃপ্তি একদম ফায়ার। এভাবে ধরা পড়ে গিয়ে আরও তেরিয়া হয়ে চেঁচাতে লাগল। মুখে তখন যা তা। সেই চীৎকারে শংকর উঠে এল। নীল পাজামা। ওপরের দিকে শাদা ফতুয়া। পাট করে আঁচড়ানো চুল মাথায়।

—'দ্যাখো শংকর তোমার বউয়ের কাণ্ড। তার পিরীতের লোকদের নিয়ে এই মাঝ রাতে—'

এখানে শংকর একটি চড় কষালো। তৃপ্তির গালে। একদম সোজাসুজি।

ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল তৃপ্তি। তার-পর হাউমাউ করে চেঁচিয়ে বলতে লাগল, শো বন্ধ। শংকরকে কব্জা করে দল তুলে দিলে রজনী। আমার কেরিয়ার—'

—বলেছি তো তৃপ্তি— আমি তোমার ও চোখে দেখি না। তুমি রোজ মদ গিলে বাড়ি ফেরার পথে আমার ফোন তুলে

এ মাসের সেরা প্রকাশিত বই
দুরন্ত ঝড়, দুরন্ত ঘূর্ণি আর দুরন্ত হওয়ার মতোই দুরন্ত বিগত দশক
দুরন্ত দশক ১৫
লিখেছেন নির্ভীকবান সাংবাদিক নির্মল সেনগুপ্ত
আকৃষ্ট করেছেন তাকে খণ্ডকালের ইতিহাসের ধারায়
ভোলানাথ প্রকাশনী | ৩৭।১১ বেনিয়াটোলা লেন
ফোন : ৩৪-১০৪৮ | কলিকাতা—৯

এইচ-এম-ভি
ডিস্কোফোন-এর
সঙ্গে বিনামূল্যে
১টি রেকর্ড
তাছাড়া
আরো ৫টি এল পি রেকর্ড কিনলে
আকর্ষণীয় ডিসকাউন্ট

এইচ-এম-ভি
ফিডেলিটা
ট্রান্স-মেইন্স এর
সঙ্গে বিনামূল্যে
২টি রেকর্ড
তাছাড়া
আরো ১০টি
এল পি রেকর্ড
কিনলে আকর্ষণীয়
ডিসকাউন্ট

আপনার এইচ-এম-ভি
ডীলারের কাছে খোঁজ নিন
হিজ মাস্টার্স ভয়েস
ইন্ডিয়ান গ্রামোফোন কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড

HMV

না হোক কত কথা বল। আজ ধরা পড়ে এত চীৎকার! কান্নাকাটি। দে চালু রেখে হবে কি বল? লোকসান বাড়বে তো শুধু। টিকিট বিক্রির কোন হিসেবই পাব না। অথচ স্টেজে ঢুকে দেখি হাউস ফুল। তাতে তো তোমারই লাভ। তুমি চাও অনন্তকাল ধরে তাই চলুক।'

অমিয় তৃপ্তির ঘাড়টা ধরে বলল, ক্ষমা চাও। বল আর কোনদিন এ রকম করবে না।

সব চেয়ে অস্বস্তি লাগছিল বিকুর। এ বাড়িটা শশাঙ্ক দত্তের। এই মানুষটা এখনো একটা কথা বলেনি। কদিন আগে এরই সংগে বিকু কাঁচালঙ্কার চাষ নিয়ে ডিটেলে ডিসকাস করেছে। বসার ঘরে খানিক আগে রিহার্সেল হচ্ছিল। সে ঘরে এখন আসল নাটক হচ্ছে। কোন রিহার্সেল ছাড়াই। এ কথাটাই প্রথম মনে এল ড্রামাটিক বিকু দত্তর।

ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তৃপ্তি চোখ মুছছে। মধ্যবয়সী মানুষ। অমিয় সেদিন রাজনের মেলে তৃপ্তির আকটিং দেখে মুগ্ধ হয়েছিল। আজ তাকেই এই অমানুষিক অবস্থার সাক্ষী হতে হচ্ছে। আস্তে বলল, আর করব না বললেই ছেড়ে দেব।

এই প্রথম শশাঙ্ক কথা বলল, মাত হয়ে যাচ্ছে—

কথাটা কার জন্যে বোঝা গেল না। রজনীকে লক্ষ্য করে? না অমিয়দের লক্ষ্য করে? কিংবা সবাইকে?

বিকু বলল চল যাওয়া যাক।

শশাঙ্ক বলল তৃপ্তিবাবু যাবি কি করে? বাস ট্রাম কি আছে এখন?

রজনী তার স্বামীকে বলল সে ভাবনা তৃপ্তির। তোমার নয়। ফোন করে জানাও।

—তা আমি কি করতে পারি।

—তুমি কে হও আমার?

এর পরই অমিয় তাড়াতাড়ি পায়ে নেমে এল। তৃপ্তিকে নিয়ে। কোন চিন্তা নেই শশাঙ্কবাবু। ও পথ দিয়ে যাবো তো আমরা —নামিয়ে দিয়ে যাব তৃপ্তিকে—

ঘড়ি

ও

গ্যারান্টিসহ ঘড়ি মেরামত

রায় কাজিন এন্ড কোং

জুয়েলার্স এন্ড ওয়াচ মেকার্স

৪·বি, বি ডে, বাস, কলি—১

ওমেগা ও টিসট্ ঘড়ির

অথরিসরাল এজেন্টস্

কথাটা একটা চড়ের মত এসে রজনীর নাকের ওপর পড়ল। চিড়বিড় করে উঠলো সারাটা শরীর। ছুটে দোতলায় ফুল বারান্দায় গেল। তৃপ্তিকে নিয়ে ওরা ট্যাকসিতে উঠছে।

ঘরে ফিরে এসে শশাঙ্ককে পেল। তৃপ্তিকে বাড়ি পৌঁছে দেবার ভার ওদের?

—ওরা তো তোমার বন্ধু। দিলেই বা—

—জলে ভেসে আসা বন্ধু।

—তাই বলল নাকি তৃপ্তি!

নিজেকে আর রাখতে পারল না রজনী। তৃপ্তি বলেছিল তার পীরিতের লোকদের দিয়ে। রজনী সামনে ছুটে গিয়ে বলল তৃপ্তি তোমার বন্ধু। তাকে তো মুখ ফুটে একটা কথা বললে না। তোমরা দুজনে মিলে গলাটা তুলে দিলে। সত্ত আট লাখ টাকার বিজনেসের পর এখন আমাদের মাথায় দেনা। এখানে থেমে নিজেকে সংশোধন করল রজনী। আমার একার মাথায় দেনা চাপিয়েছ! কার সংগে মিশে? না, যে লোকটা তোমার বউকে রোজ ফোন তুলে খারাপ কথা বলবে।

—এত রাতে আমার চেঁচামেচি ভাল লাগে না রজনী। ছেলেমেয়েরা বড় হয়েছে। আমি পুলিশ ডাকব। এ সব ঝামেলা আমার ভাল লাগে না।

—বাড়ির বাইরে গিয়ে পুলিশ ডাকো। এ বাড়ি আমার। ভাড়া আমি দিই। চাকরি করে দিয়েছিলাম। সে চাকরি রাখতে পারো নি— চাকরি যাওয়ার পর—ওরা তখন খুব ছোট—তুমি সেদিন কেঁদে ফেললে— আমি বলেছিলাম ভেবো না। আমি তো অভিনয় করি। এই করেই সংসার চলে যাবে। তারপর? তারপর তুমি কাজকর্ম থেকে পাকাপাকি রিটায়ার করলে।

নিষ্পলক আক্রোশে রজনী ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে। কখন অজান্তে নিচের ঠোঁট ওপরের পাটির দাঁতের কামড়ে আটকে গেছে। কার সংগে সে লড়াই করবে। এই লোকটিকে নিয়ে সংসার শুরু করেছিল। এখন আর সে একা নয়। কটি ছেলেমেয়ের মা। এখন সে কোথায় যাবে? শশাঙ্ক রজনীর এই বন্ধনের কথা জানে। জানে বলেই এত নিশ্চিন্ত। নিশ্চিন্ত বলেই তৃপ্তিকে কোন বাধা দেয়নি। কিন্তু রজনী তাকে বাধা না দিয়ে পারেই বা কি করে? আমি তো ওর বউ।

তার সামনে শশাঙ্ক দাঁড়িয়ে। এই লোকটা এতদূরে অপদার্থ—এতদূর অকর্মণ্য —একবার এগিয়ে গিয়ে তৃপ্তির কাছে হিসেবটা পর্যন্ত চাইতে পারে না। আমার সম্মান না হয় ওর কাছে কানাকড়িও দাম পায় না। কিন্তু যে মেয়ে আমি যে এতদিন অভিনয় করলাম—তার টাকা পয়সা যে একটা ঠেকালো—তাকে পিটিয়ে টাকা আদায় না করতে পারলে শশাঙ্কর নিশ্চিন্ত আরাম বিশ্রামও তো ভণ্ডুল হয়ে যাবে। সে খেয়াল নেই মানুষটার। কি দিয়ে তৈরি!

—তুমি কি করে তৃপ্তির বাড়ি পৌঁছনো নিয়ে ভেবে সারা হচ্ছিলে? আমার তো মাথায় আসে না কিছুতেই।'

শশাঙ্ক সে কথায় গেলই না। পরিষ্কার জানতে চাইল, 'তুমি চাও না আমি এ-বাড়িতে থাকি?'

—কোথায় আর যাবে! ফড়পুকুরে? সে পাট তো করে চুকিয়ে দিয়ে এসেছো। বলতে বলতে রজনী ভেতরের ঘরে চলে এল। যাবার সময় বলে গেল, 'আলোটা নিভিয়ে দিও। এ মাসে মোটা বিল এসেছে ইলেকট্রিকের।'

আশ্চর্য কান্ড! শুয়ে শুয়ে গাইতে ইচ্ছে করল রজনীর। একসঙ্গে অনেক গান ভীড় করে আসছে। কোনটা রেখে কোনটা গাইবে?

—'মন মন্দিরে মন বিহারী তুমি
নিরজনে রাখি তাই—'

বিহারীর জায়গায় এসে রজনীর গলায় একটা সামান্য মোচড় ভাবা, শব্দ, সুর—সব মিশিয়ে জন্য 'জনিস' করে দেয়। পাশের ঘরে বড় ছেলে ঘুমোচ্ছে। কিংবা হয়ত তারই মত জেগে শুয়ে আছে। ছেলের বয়স এখন সতর-আঠেরো। আর স্কুলে যায় না। শুধু টো টো। খাতা, কাগজ, কলমের বায়না করবে বলে তার কাছে টাকা চেয়েছিল। দেয়নি রজনী। টাকাগুলো নষ্ট করবে। এই টাকা আর করেই তার কাল হয়েছে। সারাটা সংসার তার মুখের দিকে তাঁকিয়ে। সংসারে শশাঙ্ক যদি টাকা আনার লোক হত তাহলে এত গন্ডগোল বাধতো না।

অবশ্যই রজনীকে টাকা আর করতে বাধা করেছে। শশাঙ্ক যদি একটু বুঝতো। এখন সে কোনদিক সামলাবে। 'কবিরাজের' দোদারিক তার জন্যে হাঁ করে বসে আছে। অথচ এই 'কবিরাজ' নাটক গত এক বছরে তাদের স্বাচ্ছল্য দিয়েছিল। দিয়েছিল স্বস্তি। তাও টিকিয়ে রাখতে পারল না শশাঙ্ক। ঠিক তার ভাবি গয়নাগুলোর মত। কেমন সোজা উড়িয়ে দিল। বন্দকী ঘর থেকে আর ফেরল না। অথচ কোন ভাবোদ্রেক নেই শশাঙ্কর।

শশাঙ্ক খেজুও নেয় না। আমি কি করে টাকা আনি। কোথেকে টাকা পাই। এখন তো অনেকদিন সরলভাবে টাকা আসে। এখন থিয়েটারে এক নাইট আমি করলে তিনশো টাকা যে কেউ দেবে। আমার নামে টিকিট বিক্রি হয়। যাত্রাদলে জয়েন করলে মাস মাইনে ছাড়া বছরে অন্তত বিশ-বাইশ হাজার টাকার রয়ালটি পাব।

কিন্তু সেটা

যখন খোকনের টাইফয়েড। মাসে চার-পাঁচ দিনও কাজ পাই না। পেলেও পায় নাইট চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকা মাত্র। অফিস-ক্লাবের নাটক সব। তাতেও কম্পিটিশন। কত ক্যান্ডিডেট। ক্লাবের কর্তারা কাকে ফেলে কাকে নেবে? যে রিহার্সেলের পর বেশিক্ষণ থাকতে পারবে। তাকেই নেবে।

সেই সব ক্ষেপও ধরতে হয়েছে রজনীকে। পাল্লা দিয়ে। কম্পিটিশন করে। খোকন ছোট। শেষের মেয়ে দুটো আরও ছোট। খোকনের ওপরের মেয়েটা—আগে ওরা স্বামীস্ত্রীতে বড় মেয়ে বলে ডাকত—সেই মালতী রান্না করে রাখত। হাত পুড়িয়ে। ভাত পুড়িয়ে। এ সংসারে মালতী আমার দুঃখ বুঝতো। বিয়ে হয়ে গিয়ে মেয়েটা আর আসে না। কতদিন আসে না।

তখনকার দিনে —সেই সেদিন আমার বিসর্জন হয়।

উনিশশো চৌষট্টি সনের একুশে সেপ্টেম্বর।

সেদিনও তো শশাঙ্ক এতটা নির্বিকার ছিল না। অন্তত সেদিনের জন্যে শশাঙ্ক স্বামীর মত ব্যবহার করেছিল। তবে বাড়ি ফেরার পরে। অনেক রাতে। সিগারেটের ছাইতে শাড়ির আঁচলে তখন তিনটে ফুটো। মুখে গন্ধ। রাত অনেক। দরজা খুলে দিয়েছিল শশাঙ্ক নিজে।

পরিষ্কার মনে পড়ল রজনীর। তারিখটা ছিল একুশে সেপ্টেম্বর। ঠিক পুজোর আগটায়। খোকনের টাইফয়েড। সাতদিন হয়ে গেল ওষুধ পড়ছে না। মালতী একা আর কত জলপটি দেবে মাথায়।

বিকেল থেকে টিপটিপ করে বৃষ্টি হচ্ছিল। অফিস ক্লাবের বই। বিকেল থেকেই রিহার্সেল ছিল। রজনীর মৌন রোল। আজ আর বইয়ের নাম মনে পড়ছে না। পাট কোম্পানীর মোটা মাইনের বাবুদের বার্ষিক হর্ষপ্রকাশের জন্যে সোসালে ঐ বইটি হচ্ছিল। ডিরেকটর একজন ম্যাচ-বয়সী গুদামবাবু। ঢোলা হাতার পাঞ্জাবিতে সেন্ট মেখে রিহার্সেল রুমে আসত। মোশান দেওয়ার সময় রজনীর গায়ে হাত রেখে বোঝাতো। ফিলিংস কি করে আসে! কথায় কথায় দুর্গা-দাস অহীন চৌধুরীর নাম লোকটার মুখে খইয়ের মত ফুটতো। কাছে এসে কথা বললে রামের মিহি গন্ধ ভেসে আসতো।

সেদিন রিহার্সেলে শুধু সেই মাঝবয়সী [illegible] আসেনি। পৌঁছেই রজনী বুঝলো তার আর বেরোবার পথ নেই। সে নিজেও সেদিন বেরোতে চাইছিল না। দেখা না লোকটা কতদূর এগোয়। লোকটা ছেড়—বাবুটি কাঁচা পয়সার মালিক। ফাইন আন্দির মুক পকেট থেকে নোটের গোছার আভা ফুটে উঠত।

রজনী বলেছিল গাটা ম্যাজম্যাজ করছে।

—দুপুরে ঘুমিয়েছেন নিশ্চয়। আপনাদের—বিশেষ করে আর্টিস্টদের সতর্ক থাকা উচিত। আসুন রিহার্সেল থাক আজ। কেউ বোধহয় আর আসবে না।

বলতে বলতে লোকটা ছিপি খুলে ফেলেছিল। 'ইফ ইউ ডোণ্ট মাইন্ড। কুলো থেকে একটু জল পাড়িয়ে দেন যদি।'

জল এগিয়ে দিয়ে রজনী বলেছিল—'আজ চলি—বৃষ্টি আসছে ঝেঁপে—'

দোতলার ঘর থেকেই শেয়ালদার ভিড় দেখা যাচ্ছিল। বাতাসে শরতের গন্ধটা উড়ছিল। ঘরে খোকনের জ্বর। সেই অবস্থায় সেজে রিহার্সেল দিতে আসতে হয়েছে। কাজে বেরোলে মেয়েদের পরিপাটি হয়ে বেরোতে হয়। নইলে হয় না। সিল্কের অনাবধানী আঁচল সরে যেতেই টেনে ঠিক করেছিল রজনী। 'আমি চলি—'

—উহু। আরেকটা গ্লাস দিন না। একটুখানি। বেশ ফ্রেস হয়ে যাবেন—'

লোকটার অনুরোধ করবার কায়দাই ছিল অন্যরকম। অফিস সোসালের সুভেনিরগুলো চামড়ার বাঁধাই করে তাকে থাক থাক সাজানো। প্রত্যেক সুভেনিরেই পরিচালক হিসেবে মল্লিক-বাবুর ছবি। শশাঙ্কের চেয়ে কিছু বড়ই ছিল লোকটা।

খুব ফ্রেস হয়ে গেল রজনী। ভীষণ ফ্রেস। তেমন কোনদিন যায়নি রজনী। অন্তত সেদিনের আগে। মল্লিকবাবু নিজে গাইছিলেন। রসিক গাইয়ে। নিধুবাবুর গান। তাল লয় কিছুই ছিল না। ছিল শুধু নেশা। রজনীকে কাছে পাওয়ার নেশা।

রজনীও গলা মিলিয়ে ধরছিল।

তারপর সেখান থেকে কোথায় গিয়েছিল—রজনীর তা মনে নেই। সে নিজেকে কিছুতেই সামলাতে পারছিল না সেদিন। বুঝতে পারছিল—কী একটা হয়ে যাচ্ছে।

পরিষ্কার বিছানা। ধবধবে। সুন্দর আটাচড বাথ। মাংসের ঝড়। তারপর আর মনে নেই। মল্লিকবাবুদের অফিসের গাড়ি নামিয়ে দিয়ে হুস করে চলে গিয়েছিল। গলির মুখে পোড়া পেট্রোলের গন্ধটা বাতাসে মিশে যেতে তবে রজনী দোতলায় উঠেছিল। বাস্তব আলোয় দোতলার বালকনি থেকে কুলে পড়া ছাদটা যে শশাঙ্কের হা নিচে থাকতেই বুঝতে পেরেছিল রজনী।

দরজা খুলে প্রথম যে কথা বলেছিল শশাঙ্ক, তা হল, 'কাল ভোর হলেই এলে পাবতে। একদম চা জলখাবার সেরে। রিহার্সেলও ভাল হত।'

রজনীর তখন গা হাত পা পুড়ে যাচ্ছিল। এক ছুটে বলঘরে। মিনিট পনেরো বাদে সেখান থেকে আরেক ছুটে একদম বিছানায়। ঘুম ভেঙেছিল পরদিন সকাল আটটায়। সাবধানে উঠে প্রথমেই সাতখানা দশ টাকার নোট ধোলাইয়ের নিচ থেকে বের করে দেরাজে তুলে রেখে-ছিল। গুনে গুনে। এক নাইটের অভিনয়ের চেয়েও কড়ি ঢের বেশি।

(ক্রমশঃ)

আশ্চর্য বই

সেই গ্রাম সেই সব মানুষ

অমলেন্দু বসু

...এক হাজার ছবি, হাজার মুখ মন' ...ভরে রেখে দেয়...মন ধরে রেখে দেয়, দরকার মতো বের করে দেয়'—একথা বলেছিলেন অবন ঠাকুর। ধরে রাখে তো মনই কিন্তু সবার মনই ধরতে পারে না, কিম্বা সব জিনিষই ধরে রাখার মতো নয়। মনোজ বসুর মনে ধরে রাখার শক্তি আছে যে-স্মৃতি, বিধৃত হয়েছে তা অবশ্যই ধরে রাখার মতো। হাজার মুখ হাজার ছবি ধরে রাখার মতো অসামান্য সংবেদনা ও নিপুণতার মালিক মনোজ বসু। সেই গ্রাম সেই সব মানুষ—এই শিরোনামেই সূচিত হয়েছে একটা বিমাথিত বেদনাবোধ এমন এক সমাজের জন্য যাকে আজ আমরা খুঁজে পাই না (খুঁজে পাওয়া সম্ভবই নয়) যাকে আর পাওয়া যাবে না, কিন্তু হারানো যার জন্য মনোজ বসুর ও আমাদের সহস্র সাধারণীর স্মৃতিকাতর চিত্তের অন্তস্তলে ছড়িয়ে আছে অহর্নিশি একটা হুতাশ মিশ্র অথচ সংগুপ্ত বেদনাবোধ।

মনোজ বসুর এই আশ্চর্য বইয়ে চিহ্নিত হয়েছে একটি প্রায়-বিস্মৃত জীবন পরিবেশ। বিস্মৃতে তো সব কিছুই হয় কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধনমান। এসেই ভেসে-যাওয়া জীবনকে শিল্প-কল্পনার সাহায্যে ফিরিয়ে আনতে পারেন শিল্পী। মনোজ বসু সেই শ্রেণীর শিল্পী। সেই গ্রাম সেই সব মানুষ: কোন গ্রাম কোন সব মানুষ? লেখক গ্রামের নাম দিয়েছেন 'সোনাখাড়ি'। এ নামের গ্রাম কি কোনোকালে ছিল যেমন ছিল বিক্রমপুরের সোনারং গ্রাম এবং কে জানে কত অখ্যাত বিস্মৃত ভুলনামী গ্রাম? কিন্তু সোনাখাড়ির বাস্তব সত্তা আদৌ মুখ্য কথা নয়। নাই বা ছিল সোনাখাড়ি গ্রাম নাই বা ছিল ভবনাথ — দেবনাথ — মুক্তকেশী— অলকা বউ— উমাসুন্দরী — কমল এরা আর ওরা এবং আরো অনেকে। বাস্তব সত্তাই একমাত্র সত্য নয় মহত্তর সম্ভবও সত্য। ইংরেজ চিত্রশিল্পী টার্ণার সম্বন্ধে কাহিনী আছে যে তিনি সেকালে একের পর এক ছবি এঁকে যেতেন সুধীমণ্ডলে তখন জনৈকা মহিলা সদর্থক বলেছিলেন—মিঃ টার্ণার ছবিগুলির রং তো সুন্দর কিন্তু এরকম সত্যিকার [illegible] —টার্ণার জবাব দিয়েছিলেন—দেখেননি ছবিতো কিন্তু দেখতে পারলে কী সুখী হবেন না? মনোজ বসুর সোনাখাড়ি তেমনই এক গ্রাম ভবনাথ-দেবনাথ-উমাসুন্দরী-অলকা তেমনই নর-নারী যাঁদেরকে পাঠকরা দেখেননি, লেখকও সম্ভবত হুবহু তাঁদের দেখেননি। বস্তুত এই সব নর-নারী গ্রন্থমাংসের নর-নারী ছিলেন না। তাঁরা তাঁদের নিবাস তাঁদের রীতিনীতি আচার ব্যবহার ধ্যানধারণা তাঁদের স্বপ্ন তাঁদের কর্ম কোনো লৌকিক জগতের ঠিকানায় মিলবে না মিলবে আমাদের কল্পনার জগতে। কিন্তু তবুও এসবই আমাদের অসংখ্য লৌকিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গড়া এবং সেজন্যই এদের একটা অনবদ্য প্রকৃত সত্তাও ধরা পড়েছে এই শক্তিশালী লেখকের রচনায়। সোনাখাড়ি নামের কোনো গ্রাম থাক না থাক পৃথিবীর যে অঞ্চল সেদিন অর্থাৎ পূর্ববঙ্গ নামে পরিচিত ছিল প্রাচীন ইতিহাসে সমতট বঙ্গ বঙ্গাল নামে অভিহিত হত যে অঞ্চল ভারতীয় ইতিহাসের বেদনা বিধুর অধ্যায়ে ভারত বা ইণ্ডিয়া থেকে বিযুক্ত হয়ে গেল সেই পূর্ববঙ্গের একটি গ্রামীণ জীবন নিয়ে কাহিনী রচনা করেছেন মনোজ বসু, এমন অপক্ষপাতী সমানুভূতি দিয়ে এমন নিপুণ চিত্র শিল্পের অবিস্মরণীয় বলা যেতে এমন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তথ্য সম্ভার দিয়ে যে যাঁরা সেই পূর্ববঙ্গের গ্রামে বাস করেছেন অথবা যাঁরা পূর্ববঙ্গে না গিয়ে থাকলেও সেখানকার কথা জানেন যাঁরা রাজনৈতিক রূঢ়তা সত্ত্বেও দুই বাংলার অচ্ছেদ্য সম্পর্কে বিশ্বাস করেন তাঁদের সকলের কাছে সোনাখাড়ি হবে একটি প্রতীক ভবনাথ — দেবনাথ — উমাসুন্দরী — অলকা কমলের জীবন হবে সেই চিরন্তন বাংলার অবিনশ্বর অধিবাসী সে বাংলা সম্পর্কে জীবনানন্দ লিখেছিলেন: বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি তাই আমি পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাই না আর নিষ্কেপ বাণী উচ্চারণ করিছিলেন পৃথিবীর এই সব গল্প চেয়ে রবে চিরকাল- এ-নদী-প্রান্তর মুক্তো আজ— যেখানে তাই হয়ে আছে। সেই গ্রাম সেই সব মানুষদের উদ্দেশ করে মনোজ বসু উৎসর্গ পত্র লিখেছেন:

তোমরা ছিলে, চিরদিন স্বাধীনতার তাড়নায় বড় তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেলে। আমার এই দীর্ঘজীবনে তোমাদের অন্তিম তর্পণ। তোমরা ছিলে আছ হয়ে গেলে... অন্তিম তর্পণ—তাতটি কথায় নিঃসন্দেহে—আর আপনজনকে স্মরণ করা হয়েছে এবং এই প্রত্যক্ষী স্মরণের বেদনার্ত সংক্ষিপ্ত বাণীতে উদ্ভাসিত হয়েছে সমগ্র পূর্ববঙ্গের হারিয়ে-যাওয়া জীবন।

মনোজ বসুর এই সূক্ষ্ম প্রেমসিক্ত চিত্রণে কিন্তু কোনো হালকা ভাবালুতা নেই। তাঁর চিত্রকর্ম আশ্চর্য তথ্যসমৃদ্ধ। কত যে গ্রামীণ প্রথা ও বিশ্বাস তিনি ধরে রেখেছেন এই বইয়ে! তিনি বলছেন কত সব গ্রাম্য প্রথার ও সংস্কারের কথা যেগুলি আজকের নাগরিক জীবনে প্রবহমান নেই, আজকের অন্যরকম জীবনসংগ্রামে বিলুপ্ত হয়ে গেছে! তিনি বলছেন নষ্টচন্দ্রের কথা (আকাশের চাঁদ ঐদিনে নষ্ট হয়ে যায়, দর্শন নিষেধ—পৃঃ ১২৪), ভাদ্র সংক্রান্তির কথা (আজ যারা সকালবেলা শুয়ে গড়াবে ভাদুমাস যাবার মুখে বেদম কিলিয়ে সর্বাঙ্গ তাদের ব্যথা-ব্যথা করে দিয়ে যাবে—পৃঃ ১২৬), আকাশপ্রদীপ কেন দিতে হয় মহালয়ার তর্পণের পর থেকে (১৩৯—১৪০ পৃঃ। ষষ্ঠীর দিন থেকে কোজাগরী লক্ষ্মী-পুজো অবধি ঢেঁকির পাড় পড়তে নেই (১৪৪ পৃঃ) কোজাগরীতে নিশি জাগরণ অক্ষক্রীড়া চিপিটক নারিকেলোদক ভক্ষণ (১৪৮ পৃঃ), তিরিশে আশ্বিন সংক্রান্তির দিনে ধানবনকে সাধ খাওয়ানো (অর্থাৎ ধানের ক্ষেতকে মা ভেবে, মাকে গর্ভবতী কল্পনা করে মায়ের সুসন্তান জন্মাবে এই কল্পনার মাকে সাধ খাওয়ানো, পৃঃ ১৪৯) গাঁয়সির রীতকর্ম (১৪৯—১৫০ পৃঃ)। আশ্চর্য নিপুণতার সঙ্গে কবিজনোচিত সমানুভূতির সঙ্গে নৃতাত্ত্বিক ও সমাজ-তাত্ত্বিক উৎকর্ষপরায়ণতার ঐশ্বর্য মিলিয়েছেন এই সংস্করণগুলির ব্যাখ্যায় মূল কাহিনীর সঙ্গে এদের অন্তর্গ্রন্থনে। গ্রামে তো বাস করেছেন কত লেখক, কিন্তু মনোজ বসুর মতো এমন নিবিড় একাত্মতায় সেই গ্রাম্য সংস্কৃতির জ্ঞান ধারণ করে রেখেছেন আর কজন? গাছেরই নাম দিয়েছেন কত!—বেলতলি, খেজুরতলি, নারকেলতলি জামতলি বাদামতলি তুমুর-তলি (৫৩ পৃঃ), আর আছে গোপাল-গোপা কানইবাঁশী টুরে চাটাল ছুঁই কালমেঘ। তেমনি আবার ধানের নাম: 'ধানের নামেই তো প্রাণ কেড়ে নেয়।' (২০৩ পৃঃ): কাজলা, অঘ্রাণসাল নারকেল-ফুল গজমুক্তা সীতাশাল গিন্নি পাগলা শিবজটা সোনাখড়কে সুবর্ণাণি পায়রাঝুঁড় বাদশাপছন্দ। মনোজ বসুর কাহিনীতে একটি চরিত্র আছে, রয়ণী মাসী সে বলে ওক কথা অর্থাৎ রূপকথা: রাজপুত্তুর, কোটালপুত্তুর পাতালবাসিনী রাজকন্যা বাপগাছাড়াগমী গোবর-চাপা দেওয়া সাপের মাথার মানিক—এই সব গল্প।

এবং এসব পূর্ণবিস্মৃত অথবা প্রায়-বিস্মৃত গ্রাম্যীণ সংস্কৃতি ও কাহিনী পাঠকের কাছে তুলে ধরার সময় মনোজ বসু প্রয়োগ করেছেন অকৃত্রিম অথচ সোনালি আপ্তবাক্যের অবিধানের মূল্যবান প্রবন্ধাবলী।—

ন্য· সেগুলির রূপান্তরন হয়েছে
ী সত্যে। সুতরাং সম্পূর্ণ
ট উজ্জ্বল হয়েছে একটি পবিত্র
মূর্তিতে।

ু নাটকীয় সূত্রপাত থেকে আমরা
চলি গল্পকথনের আঙ্গিকে। এবার
ন শুরু হল: সোনাঝুড়ির দেবনাথ
টবেহারার পাল্কি চড়ে এসেছেন

এইটুকুন বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে
কল্পনা বিশ শতকের চতুর্থ পাদ
য়ে চলে যায় প্রথম পাদে। কার্যত
। নয় তা-ই হল অর্থাৎ সময়ের
ে না এগিয়ে গেল পিছিয়ে।
আঙ্গিকে এমনটি হয়)। নাট্যধর্ম
ামরা এসেছি গল্পকথনে। আবার
পৃষ্ঠা পরে (১০—১৪ পৃষ্ঠায়)
গেলাম কাব্যে: বর্ণনাধর্মী কাব্যে.
সঙ্গীতশিল্পে, চিত্রশিল্পে। কত না
সমাবেশ! মনোজ বসুর নাট্যায়িত
বহু শিল্প মিশেছে। সেই যে
ছর আগে জার্মান দার্শনিক গট্-
র্লেসিং বলেছিলেন যে শিল্পরূপ-
বিভিন্ন নয়, শিল্পত্বের একান্ত
ুধর্মে তারা সবাই সমান তবু
অন্যে পরিবর্তিত হতে পারে।
নময় রূপান্তরণ সমীকরণের কৌশল
ী শিল্পের উজ্জ্বলতম কীর্তি।
কের কাব্যে উপন্যাসে নাটকে এই
ণ সমীকরণ সতত লক্ষ্য করা
কবিতার নাটকীয়তা চলে আসে.
ম্পূর্ণ কবিতার অঙ্গসৌষ্ঠব (যেমন
র ওয়েইস্ট ল্যান্ড কাব্যে) চতুর-
ন্ট্য সিমফনির অঙ্গসৌষ্ঠবে মিশে
য়ে। এক শিল্পরূপ থেকে অন্য
প উত্তরণ সবচেয়ে প্রকৃষ্টভাবে
প্রকাশ পেয়েছে সিনেমা জগতে। সিনেমা
নিয়েছে চিত্রশিল্পের ও ধ্বনিশিল্পের বাঙ্ময়,
কিন্তু নেওয়ার পরে উত্তমর্ণ শিল্পগুলিকে
সুদে আসলে ফিরিয়ে দিয়েছে মহাজনের
আঙ্গিক দান করে। সিনেমা শিল্পের রূপা-
প্রতিমা (ভিসুয়াল ইমেজারি) মনোজ বসুর
এই গ্রন্থের সমগ্রধর্মের আঙ্গিক। এরের
আবেকদৃশ্য আমাদের চোখের সামনে
কল্পনার সামনে এসে দাঁড়ায়, মনকে ধাক্কা
আমাদের মিলেও যায় পরবর্তী অন্য একটি
দৃশ্যের গায়ে। সমগ্র সংগঠনের রূপাকল্পটি
পারম্পর্য এমনভাবে রচিত হয়েছে
যেন যে কোনো দৃশ্য তার পূর্ববর্তী
দৃশ্যের জঠর থেকেই উদ্ভূত হয়েছে।
সিনেমা শিল্পের অধুনা সুপরিচিত আঙ্গিক-
গুলি মনোজ কোলাজ ফেড-আউট প্রভৃতি
আঙ্গিক মনোজ বসুর এই গ্রন্থে অতীব
নিপুণভাবে প্রযুক্ত হয়ে কাহিনীকথনের
ঐশ্বর্য বাড়িয়েছে।

বইখানা পড়তে পড়তে মনে হয়েছে এই
বইখানা লেখকের বিশ্বতীর্ণ কর্তৃত্ব রূপ
জগতের অংশমাত্র। তেমনি ছিলে। এই সব
নরনারী একদা ছিলেন কিন্তু তাদের
জীবনের যে বিচিত্র বহমানতা ছিল সেই
প্রবাহ প্রদর্শন করতে হলে আঙ্গিকটিকে
এগোতে হবে আরো। এগোতে হবে সেই
রূপে যেখানে বড় তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে
গেলে লেখকের এই বেদনাবিধুর উক্তিটি
সার্থক হয়ে যায় আরো অনেক নরনারীর
অনেক ঘটনার অনেক আনন্দ-বেদনা—আশা
নিরাশার আবর্তের মধ্য দিয়ে চলে সর্বধ্বংসী
নিষ্ঠুর বজ্রপাতের তুলা দেশ বিভাগের
ফলে। সেই শেষের দিন সে ভয়ঙ্করের
প্রতীক্ষায় বসে থাকবেন বুদ্ধিমান পাঠক।

ইতিহাসাচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদার
বাংলা দেশের ইতিহাস

চতুর্থ খণ্ড (মুক্তিসংগ্রাম) প্রকাশিত হইল

১৯০৫ হইতে ১৯৪৭ সনে স্বাধীনতাপ্রাপ্তি পর্যন্ত মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস। বহু অজ্ঞাত তথ্যে পূর্ণ এইরূপ ডকুমেন্টারী গ্রন্থ ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয় নাই। আলোচ্য যুগের রাজনীতিক ইতিবৃত্ত ছাড়াও ইহাতে বাংলার সমাজ-জীবন, সাহিত্য, শিল্প ও স্থাপত্য সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা আছে।

॥ পৃষ্ঠাসংখ্যা : ৬১২ : : মূল্য : চল্লিশ টাকা ॥

১ম খণ্ড [প্রাচীন যুগ] ১৫-০০; ২য় খণ্ড [মধ্য যুগ] ২৫-০০;
৩য় খণ্ড [আধুনিক যুগ] ৩৫-০০ *চার খণ্ড একত্র ১০০ টাকা

[জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড প্রকাশিত]

জেনারেল বুকস্

এ-৬৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা—৭০০ ০০৭

CENTRAL LIBRARY

"নিজেকে ছাপিয়ে ওঠার শক্তি একমাত্র রবীন্দ্রনাথের গানেই আছে। সেই শক্তিই আমার এমন করে টানে।

প্রতিমা মুখোপাধ্যায়

সুরের আগুন

বহু বছর আগে। কলেজ জীবনেই— জড়ুবার ঘরে গান শুনতে স্থান নিয়েছিলাম। খুব সম্ভব সেটা হবে ১৯৫৭ সাল। গিয়ে দেখি জয়ন্তী মজুমদার, গুপ্তা এবং আর এক মহিলা (সুশোভনা বলেই বোধহয় এক-নজরেই চোখে পড়েছিলো)—খুব মন দিয়ে একটি রেকর্ড শুনছেন। রেকর্ড শেষ হবার পর প্রথম দুজনের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা সাধুবাদে মেয়েটি নতমুখী। বোঝা গেলো গানটি তারই। সুকণ্ঠী সুশ্রী এবং বিনম্র— জানা গেলো নাম তার প্রতিমা। জয়ন্তীদা আলাপ করিয়ে দিলেন। সেইদিনই শুনলাম ওর অনেক গান। মধুর কণ্ঠের সঙ্গে মিলেছে হৃদয়ের বিনীত আর্তি—প্রতিটি গানেরই কথা ও সুরে ছিলো আকুল প্রার্থনা। সংযমের শাসন ছিঁড়িয়ে হৃদয়ের আবেগ ওর গানকে ভিজিয়ে দিয়েছিলো বলেই বোধহয় সে গান শ্রোতাকে এমন করে ছুঁতে পারতো।

এরপর যেন যোগাযোগটা মধুর হতে গেলো। রবীন্দ্র শতবার্ষিকীর রেকর্ড-গুচ্ছে তরুণ শিল্পীদের যে কটি গান আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলো তারই একটি গান হোলো সুবলপাত্রে চোখ মেলে দেখি অনাদিকে ছিলো কেন যে মন ভেবেলে। শোবেলে যোগাযোগ নাম আছে প্রতিমা মুখোপাধ্যায়। কণ্ঠস্বর আরো পরিণীলিত— গাইবার ভংগিতে আত্মবিশ্বাসের দৃঢ়তা।

মনটা খুশী হয়ে উঠলো এই ভেবে যে সেই মহিলা এখনও গানের সংগে আছেন, শুধু কয়েকটি না—রীতিমত আকাশবাণীতে এসেছেন। তাহলে এত দুঃখ দারুণ শিল্পীদের গান শোনার পরও ওঁর গান শুনতে এত ভালো লাগতো না। এ গান যেন তৈরি মাংস ভুনিখিচুড়ির পেছে বিকেলবেলার একমুঠো বাদাম ভাজার মতই প্রাণ-জুড়ানো।

তারপর। কুলদাবাবু যেমন রবীন্দ্রসংগীতের সর্বব্যাপী আসরে প্রতিমা মুখোপাধ্যায়ের গান অনেক অনুষ্ঠানে শুনেও পেয়ে আসছি রবীন্দ্র-জয়ন্তী সিরিজে। ওঁর রেকর্ডের গান-গুলি শুনলেই অন্তর্মুখী মনটিকে চেনা যায়। পথ ভোলে ডেকেছিলে: ডাকব না ডাকব না; ঘরেতে ভ্রমর এলো: আমার মাধবী বনে: মধ্যদিনে ঝরে পাতা: সে কি ভাবে: আমার সকল রসধারা: তোমার এই মাধুরী ছাপিয়ে: নিত্য তোমার যে ফুল ফোটে: না বলে যায় পাছে: পূর্ণ প্রাণে চাবার: আমি কবের-না না গো না: আকাশ জুড়ে—গানগুলি শুনলে মনে হয় পূজার্থিনী দেবতার মন্দিরের দরজায় প্রণাম জানিয়েই খুশী। প্রার্থনা মঞ্জুর হলে কি হবে না তা নিয়ে ভাবনায় দারিদ্র রাখে না।

কেন জানি না পূজা পর্যায়ের গান গাইতে আমার ভারী ভালো লাগে। অন্য গানও গাই। তবে পূজার গান গাইলেই মনটা যেমন ভরে ওঠে এমনটা অন্য গানে হয় না—'

আমার নস্টালজিয়ার এলোমেলো দরদীর সঙ্গে গল্প করতে করতে বললেন— প্রতিমা মুখোপাধ্যায়।

ওঁর গানের মত মুখখানি আজও স্নিগ্ধ তেমনই মায়াময়ী যখন চোখে-ছিলাম অনেকদিন আগে জয়ন্তীর বাড়ীতে।

আমি সে কেমন করে গানের জগতে চলে এলাম এবং আজও গান নিয়ে রয়েছি এটা আমার কাছেও একটা প্রচণ্ড বিস্ময়। আমাদের বাড়ীতে গানের চল এমনিতেই ছিলো না। এখান ওখানে রেডিওতে কারুকে শুনে শুনে পছন্দসই কিছু কিছু গান তুলে গাইতাম স্কুলের টিফিন পিরিয়ডে কিম্বা বিকেলবেলা কোনো বন্ধুর বাড়ী গেলে। আর আমার গানের উৎসাহই বল প্রেরণাই বল এ সবের মূলে ছিলো আমার বন্ধু কৃষ্ণা রায় (এখন - মুখার্জি)। ওরই উদ্যোগে বৈতানিকে ভর্তি হয়েছিলাম। সেখানে সুমিত্রাদি আন্টি (এখন সেন তখন দাশ-গুপ্ত ছিলেন) সবাই একসঙ্গে শিখতাম। ওখানে প্রসাদদা এত যত্ন করে শেখাতেন—কি বলব। যখন যে গানই শেখাতেন মনে হোতো আমাদের চেয়ে ওঁর আগ্রহই যেন বেশী। —এ প্রসাদদা কিন্তু দক্ষিণীর প্রসাদ সেন নন। ইনি অন্যজন।

বৈতানিকে শিখতে শিখতেই কৃষ্ণার সংগে একদিন রেডিওতে অডিশন দিয়ে এলাম পাশও করলাম। হিমেনদা (ঘোষ) রেডিও সিটিং-এর একটা অনুষ্ঠান শুনে খুব তারিফ করে-ছিলেন। তারপর থেকে নিয়মিতভাবে প্রোগ্রাম করার ব্যবস্থা উনি করে দিয়েছিলেন। এই রেডিওতে গাইতে গিয়েই জীবনে এক স্মরণীয় মোড় ফেরার যোগাযোগ ঘটে গেলো।

তখন লাইভ প্রোগ্রাম করতে হতো। টেপ রেকর্ডের প্রচলন হয়নি, একদিন রাত ১০-৪৫-এর অনুষ্ঠান শেষ করে অনুষ্ঠান কক্ষ থেকে বেরোচ্ছি হঠাৎ ও-সি ডেকে পাঠালেন, আপনার একটা ফোন এসেছে। ফোন ধরতেই মিষ্টি গলা ও পরিচয় পেলাম ইনি হেমন্তকার স্বয়ংপ্রভা, গায়িকা মঞ্জু গুপ্তা। আমি একেবারে কোয়ান্টাম। আমার মত নগণ্য শিল্পীকে মঞ্জু গুপ্তার মত একজন আর্টিস্ট নিজে থেকে ফোন করে অভিনন্দন জানাবেন এটা ছিলো স্বপ্নেরও অতীত। উনি বললেন, ভজনাদার কাছে রবীন্দ্রসংগীত শিখছ না কেন? শিখবে? আমি তাহলে ব্যবস্থা করে দেব। আমি ত হাতে স্বর্গ পেলাম।

এই ঘটনার দু-একদিন বাদেই মঞ্জুদি নিজে আমার বাড়ীতে এসে আমার গাড়ী করে ভজনার কাছে নিয়ে গেলেন।

ঘটনার কেমন লিংক দেখ সখ্যানি! ঠিক তার দু-চার দিন আগেই মহাজাতি সদনের একটা ফাংশনে আমার গান শুনে ভজনা গ্রীনরুমে নিজে এসে আমার সঙ্গে দেখা করে আশীর্বাদ করেছিলেন। উনি সেখানে সঙ্গীতশিল্পী অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন। পুরু থাইতে যাননি।

যাই হোক মজুমদার সংগে যেতে জর্জদা খুবই সমাদর করলেন—লেখাতে রাজীও হলেন। উনি বললেন—আমার কাছে শিখতে হলে দুটি জিনিস মনে রাখতে হবে। প্রথমত যত নামডাকই হোক সবসময় মনে করবেন 'আমি ছাড়া গাইছি। দ্বিতীয়ত কখনও সোলো কারণে মনে যেন অহংকার না আসে—তাহলেই গান। সারা পৃথিবীর দিকে হাত তাকিয়ে দেখেন যুক্তবেন এত বড় বড় শিল্পী আছে যে একটু আধটু ভালো গাওয়াটা কিছু এমন বাহাদুরীর ব্যাপার নয়।

এর পরের অধ্যায়ে বিপক্ষ শ্রোতাদের সংস্পর্শে আসার নানান ঘটনাপ্রবাহ।

কংগ্রেসের কালচারাল সেকসনের একটা ফাংশন হয়েছিলো চৌরংগী মেন রোডের ওপর। সেখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিচালনায় অরূপ রতন নৃত্যনাট্য সুরংগমার ভূমিকায় ১২টি গান গেয়ে প্রতিমা মুখোপাধ্যায় তাঁর যোগ্যতা সম্বন্ধে রবীন্দ্ররসিক মহলকে সচেতন করেছেন যদিও তখন রবীন্দ্র নৃত্যনাট্য অথবা সংগীতানুষ্ঠান এখনকার মত প্রতিদিনের সকাল-বিকালের ঘটনা ছিলো না।

নির্মলেন্দু দে ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাতি) আমন্ত্রণে রাশিয়ায় গেছেন খুব উৎসবে। সেখানের অজস্র অনুষ্ঠানে প্রতিমা মুখোপাধ্যায়ই একমাত্র শিল্পী যিনি রবীন্দ্রসংগীত গেয়েছেন এবং গেয়েছেন কোন যন্ত্রসংগত ছাড়াই। এই প্রসংগেই শিল্পী একটি স্মরণীয় ঘটনার উল্লেখ করলেন।

রুশকার একটা খুব জনপ্রিয় গান 'রানীবেতলী' শুনে আমি একেবারে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। গানটি আমার হৃদয় বিশেষ আবেদন রেখেছিলো। ভারতীয় সংগীতের সংগে এ গানের সুরের কোথায় যেন একটা মিল ছিলো বলেই বোধহয়। গানটি আমি শিখে নিলে প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানে সমাপ্তি সংগীত হিসেবে গাইতাম। সভাশুদ্ধ সে গান শুনে ওদের সেই বিপুল উচ্ছ্বাস আমি আজও ভুলতে পারিনি। বিনা যন্ত্রেই গাইতাম। গান শেষ হয়ে যেতো কিন্তু শেষ হোতো না ওদের হাততালি। অনুষ্ঠান পরিচালক এসে বলতেন এর মানে কি জানেন? আপনাকে গানটা আবার গাইতে হবে।

অজস্র আনন্দ নিয়ে ওখান থেকে ফিরে এলাম। কিন্তু জানদের সংগে ভারসাম্য রাখার জন্যই বোধহয় একটা বেদনাদায়ক ঘটনার মুখোমুখি দাঁড়াতে হোলো। নানা কারণে জর্জদার পক্ষে আমাকে গান শেখানো আর সম্ভব হোলো না—

তবে বিধাতা অকরুণ হলেও একেবারে নিষ্ঠুর হননি। রেডিওতে এই সময় মাঝার খেলা গীতাভিনয়ের রিহার্সালের সময় গীতাদি (সেন) প্রস্তাব করলেন নীহারদার কাছে শেখবার। এ সুযোগ আমার জীবনে ভগবানের একটা বিরাট আশীর্বাদের মতই। নীহারদার (নীহাররঞ্জন গুপ্ত) শিক্ষা সংগীত ও সব ক্ষেত্রে এগিয়ে দেবার আন্তরিকতা আমার শিল্পীজীবনে এক অমূল্য অবদান।

আরতি একবার চিত্রাংগদা নৃত্যনাট্যে অভিনয়ের জন্য কোলকাতা থেকে অনেককেই শান্তিনিকেতনে নিয়ে গিয়েছিলেন। তার মধ্যে আমার নিমন্ত্রণও ছিলো। এত সুন্দর রিহার্সাল হোলো—সবাই কি খুশী। কিন্তু ঠিক পয়লা বৈশাখের দিন এমন কালবৈশাখীর ঝড় উঠলো যে বিদ্যুৎ সরবরাহে গোলমাল হল। দুদিনও লাইন ঠিক হলো না। সবাই ফিরে এলো। অতএব আমাকেও ফিরতে হোলো। গাওয়া আর হোলো না।

১৯৬৭ সালে প্রতিমা মুখোপাধ্যায় ইণ্টারকলেজ কম্পিটিশনে জাস্ট ফাস্ট হয়েছিলেন বিকপাল সংগীতজ্ঞ বিচারকদের তুষ্ট করে।

গ্রামোফোন কোম্পানীর জবোলে প্রথম রেকর্ড করেছেন সি. কে. সেনের আমলে। অবনীন্দ্র ঠাকুরের নাতি সুহৃদ মুখোপাধ্যায়ের সহায়তায়। তার আগে অবশ্য কোহিনুর কোম্পানীতে সুকুমার চক্রবর্তীর কথা ও সুরে দুটি পল্লীগীতি রেকর্ড করেছেন। গ্রামোফোন কোম্পানীতে এই প্রথম রেকর্ড কিন্তু রবীন্দ্র সংগীতের নয় আধুনিকের। একটি অনল চট্টোপাধ্যায়ের গাইং-এ (একটি গানের একটি কলি) অপরটি শৈলেন মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় কতকটা অসমীয় সুরে ও ছন্দে—কে যেন চেনা চেনা নামেতে ডেকেছে।

প্রতিমার প্রতিটি রবীন্দ্রসংগীতের রেকর্ড বিপুল মহলে সমাদৃত হয়েছে। কিন্তু সবের ক্ষেত্রে সব ক্রটিকেই অতিক্রম করেছে সকল রসের ধারা। কোন রবীন্দ্রসংগীতে উনি কখনো সুন্দর সুরের গান রেকর্ড করেছেন—যে কেবল পালিয়ে বেড়ায় ও তুমি যে সুরের আগুন।

সংগীতের শিক্ষা অভিজ্ঞতা ও প্রয়োগ ক্ষেত্র এত বহুমুখবিস্তৃত। সুধীন দাশগুপ্ত প্রবীর মজুমদার শৈলেন মুখোপাধ্যায় অনল চট্টোপাধ্যায় সুরেন চক্রবর্তী এবং চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়ের শিক্ষাধীনে উনি রেডিওতে আধুনিক (চিন্ময়বাবুর কাছেও) গীত কিছু পল্লীগীতি গেয়েছেন।

আর ওতরকম গান অনায়াসদক্ষতায় গাইতে পারার কারণ শিক্ষাজীবনের প্রথমের দিকে ডিকসন লেনে জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের কাছে বেশ কিছুদিন উচ্চাংগ সংগীত শিক্ষা ও অনুশীলন। ভারতীয় সংগীত পরিষদে রেডিওতে এবং আরও নানা জায়গায় জলিলবাবুর পরিচালনায় ভজন গেয়ে হিন্দী উচ্চাংগ এবং গানটির আঙ্গিকে রাগের ওপর কিভাবে জোর দিতে হয় সে বিষয়ে এঁর দৃষ্টি অনেক স্বচ্ছ হয়েছে।

দক্ষিণামোহন ঠাকুরও ওঁর গানে মুগ্ধ হয়ে অনেক অনুষ্ঠানে ওঁকে আহ্বান জানিয়েছিলেন। রেডিওর রমাগীতির অনুষ্ঠানে প্রতিমা মুখোপাধ্যায়ের একক সংগীত শোনা গিয়েছিলো তাঁরই আগ্রহে ও উদ্যোগে। কি এল চিত্র অনেক নৃত্যানুষ্ঠানের গানও প্রতিমাই গেয়েছেন।

এতরকম গান এত গানীর শিক্ষায় এমন সুন্দরভাবে যে গেয়েছেন তবু আপনার গানের তরী রবীন্দ্রসংগীতের ঘাটেই ভিড়লো কেমন করে?

'রবীন্দ্রসংগীতের ওপর আমার অনুরাগ ছিলো প্রথম থেকেই। কিন্তু ঘটনাচক্রে সবরকম গান গাইবার এবং শেখবার সুযোগ এসে গিয়েছিলো। সাঁড়াকারের ভালো গুরুর সাহচর্য পেয়েছি বলেই সব গানকে এমন করে গ্রহণ করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছে। রাশিয়া যাবার আমন্ত্রণ আসতে যাব কি যাব না'র দ্বিধায় দুলছিলাম। আমার মনের মনায় বললেন 'এ সুযোগ বারবার আসে না। আমরা তোমার কোনোদিনও রাশিয়ার গান গাইতে পাঠাতে পারব না।' তিনিই বলেছিলেন ওখানে রবীন্দ্রসংগীত গাইতে। কারণ আমাদের সাংস্কৃতিক জগৎকে তুলে ধরা যায় ঐ একটি মানুষের গান ও সুরে।' ওদেশে এবং এখানেও গত বছর পনেরো আমার গুরু সুধীনকুমার মিত্র পুণা, হায়দ্রাবাদ, সেকেন্দ্রাবাদ, তারপর এলাহাবাদেও আমায় নিয়ে গেছেন। রাঁচিতেও গীতভারতী প্রতিষ্ঠান শান্তিদা (শান্তিদেব ঘোষ) ও আমার একক গানের আসরে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। ১৮খানা গ— একাধিকবার গেয়েছি, কিন্তু সবাই চুপ করে বসে শুনেছেন, ভালও বেসেছেন—আমি রবীন্দ্রসংগীতের স্টার আর্টিস্ট নই, একথা জেনেও। স্বল্পরসজ্ঞায়ের উপদেশে বিদেশ এবং অবাঙালী সমাজে রবীন্দ্রসংগীত গেয়ে এই অভিজ্ঞতাই হয়েছে, যে শুধু সুরে নয়, রবীন্দ্রসংগীতের কথারও এমন একটা ওজন আছে যার গুরুত্বে বাংলাভাষায় অজ্ঞ শ্রোতারও বুঝতে দেরী হয় না। আমার মনে হয় কোন্ সুরটি কোন কথার অর্থসহ মানুষের হৃদয়ে পৌঁছে দিতে পারে সে-সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের দিব্যদৃষ্টি ছিলো বলেই এ গান এমন অব্যর্থ। ক্লাসিকাল গানের মত এ গানের আবেদনও সর্বব্যাপী।

তাছাড়া রেডিওতে আমি সবরকম গানই গাইতাম। কিন্তু অজস্র শ্রোতা এবং নাম-করা লোকেরও চিঠি রেডিও অফিস থেকে রি-ডাইরেকটেড হয়ে আমার কাছে আসতে লাগলো বিশেষ করে রবীন্দ্রসংগীত গাইবারই অনুরোধ নিয়ে।

আর সবরকম গান গেয়েছি বলেই সুরের আগুনে সিরিজেই প্রকাশিত কানন

সেবার মন্তব্যটিরই আমি পুনরুক্তি করে বলছি যে আগেকার দিনের প্রতিভাবান ময়মী গীতিকাররা চলে যাবার পর তাদের স্থান পূর্ণ করবার মত গান-রচয়িতার অভাব ঘটছে। এখনকার গানের কথায় টৈনো মনটা বড় সঙ্কুচিত হয়ে যায়। কোনো পরিশীলিত মনের অধিকারী শিল্পীর এসব গান গাওয়ার প্রবৃত্তি হবে না। এ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রসংগীতকে আশ্রয় করা ছাড়া গতি কোথায়?

সেখা ১৯৭০ সাল থেকে আমি বিদেশ-ভারতীতে গান শেখাচ্ছি। ১৯৭৪এ আমার পরিচালনায় 'চিত্রাংগদা' মঞ্চস্থ হয়। শাপমোচনও করেছিলাম আমি ও সাগর সেন। এর পি ভঙ্কের মায়ার খেলা, চিত্রাঙ্গদা, বাল্মীকি প্রতিভা ও শাপমোচনেও গান শেখেছি। এইসব নাটকের গান গাইতে গাইতে অনেক অনুভবের দরজা যেন হঠাৎই খুলে গেছে। এ-সব দরজা যে গান ছাড়া অন্য কোনো আঘাতে খোলে না, এ কথা এমন করে আগে ত বুঝিনি? রবীন্দ্রনাট্যে ঘটনার সংঘাতটাই প্রধান নয়। ভেতরের বিশ্লেষ, অনুভবের স্পন্দন মানে মনের সূক্ষ্মতর দিকটি যার অস্তিত্ব জানা না গেলেও নাড়ী প্রবল, এ খবর এইসব গানেই পেয়েছি। সেই মন নিয়ে যে কোনো রবীন্দ্রসংগীত গাইতে গেছি—তাদের মধ্যে এমন অনেক কিছু দেখেছি যা আগে চোখে পড়েনি। —আর এইসব ঘটনা ও যোগাযোগ মিলে মনটা এমনভাবে রবীন্দ্রসংগীতমুখী হয়ে গেছে যে আর ফেরার পথ নেই। এখন অন্য গান গাওয়াটা কিছুক্ষণের জন্য বাড়ীর বাইরে কোথাও বেড়াতে যাওয়ার মতই। একটু বাদেই মনটা ছট্‌ফট্‌ করে—কখন বাড়ী যাই—কখন যাই। আওয়ার লেডী ভুইন অফ দি মিশনে আমি সপ্তাহে একদিন করে গান শেখাই। ওরা যে কি আগ্রহ নিয়ে রবীন্দ্রসংগীত শেখে! এই যেন ওদের নিজেদেরই গান। রবীন্দ্রসংগীতের মধ্যেই এমন কিছু আছে যেটা 'পরকে আপন করে' সেটা কি আমরা জানি না। তিনি জানতেন।

রবীন্দ্রসদনে যেবার শাপমোচন করেছিলাম তপতীদি (ডঃ তপতী মুখার্জী) আমার জড়িয়ে ধরেছিলেন। উনি খুব গুণগ্রাহী। অনেক ইয়ং আর্টিস্টকে লোকে জেনেছে ওঁরই জন্য। উনি বলেছিলেন—নিজেকে ছাপিয়ে ওঠার শক্তি রবীন্দ্রনাথের কাছেই মেলে। রবীন্দ্রসংগীতের এই শক্তিই আমায় এমন করে টানে।

গায়কী? কি বলব?—এ গানের একটা আলাদা দীপ্তি আছে। এই আলোর যার গানের প্রদীপ জ্বলে ওঠে তার গানের ভংগিই রবীন্দ্রসংগীতের গায়কী হয়ে ওঠে।

রাজেশ্বরীদি, সুচিত্রাদি, মোহরদি কিংবা জর্জদা, হেমন্তদা—এঁদের প্রত্যেকের গাইবার ধরণ আলাদা। তবু এঁদের প্রত্যেকের নকশাকে রবীন্দ্রসংগীতের গায়কী বলা যায়।

ট্রেন্ড! আগের চেয়ে রবীন্দ্রসংগীতের প্রচার বেশী হওয়ার দরুণ নতুন কিছু পরিবেশনার প্রেরণায় অনেক শিল্পী বহু না-জানা গানকেও শ্রোতাদের গোচরে আনছেন। এতে আমাদের জানার পরিধিও বিস্তৃত হচ্ছে। সেটাই বা কম কি?

"প্রতিটি রাগের একটা নিজস্ব দর্শন আছে। সেই দর্শন রবীন্দ্রনাথের কাছে ধরা দিয়েছিলো বলেই কথা তাঁর গানে সুরের হাত ধরে নিরুদ্দেশের পথে এমন অনায়াসছন্দে পাড়ি দিতে পেরেছে।"

সাবিত্রী ঘোষ

শব্দমানকাল, সহকালীন সংগীত ধারার রুচিপ্রকৃতির পরিবর্তন অস্থির কোলাহল সবকিছুকে উদাসীন শৈথিল্যে একপাশে সরিয়ে রেখে স্বপ্ন দিয়ে গড়া সুরের স্মৃতিলোকে বাস করছেন যে শিল্পী, তাঁরই নাম সাবিত্রী ঘোষ। সারাদিন নিজের মনে বসে নানান মূর্তি গড়ছেন, নিজের হাতের তৈরী সাজে তাঁদের সাজাচ্ছেন আর কিউরিও কে সব ভিন্ন কোন নানান নকশায় ঘর ঘর সাজিয়ে উঠিয়ে পড়োশীর সংসার তৈরী করছেন। কাজের সঙ্গে সঙ্গে গুনগুন করে গাইছেন সেইসব গান যে গান শুনেছিলাম আমাদের কৈশোরে। সরকার হিমাংশু দত্ত, প্রফুল্লকালী ঘোষাল, অনাদি দস্তিদার, গিরিজাবাবু, সুধেন্দুবাবু সবাইই যেন আপন আপন মহিমায় ভাস্বর করে রেখেছেন ওঁর সঙ্গীতলোক। আর সকল আলোর ধারাকে মিলেছে রবির জ্যোতির্ময় দ্যুতি। আজ শিল্পী নিজে প্রাণ ভরে উঠছেন তাঁরই গানের মাধ্যমে। এ গান মনে

সেই গান শুনে শুনে আমার অন্তরের সম্পদ হয়ে গিয়েছিল। আমিও গাইতাম ঠাকুরঘরের বাইরে, আমার খেলার আঙ্গিনায়।

সেই গান শুনে জ্যাঠামশাই বাবার মনোযোগ আকর্ষণ করলেন ও সাতাকারের টেলেন্টেড মেয়ে। গলাও সুন্দর কোনো শিক্ষা ছাড়াই। একে গান শেখানো দরকার।

বাবা আর জ্যাঠামশাই-ই উদ্যোগী হয়ে শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে শেখাবার ব্যবস্থা করে দিলেন। নিষ্ঠাভাবে শিখতাম। মনের আনন্দে গাইতাম এই অবধি। তখনকার দিনে গানের এত স্কোপ ছিল না ত।

তারপর বাবা আলতলায় বাড়ী নিলেন। সেইখানেই সংগীত সঙ্ঘ ছিলো। পরে নবাববাড়ীর নীচে চলে গিয়েছিল। সংগীতসংঘের উৎসব উপলক্ষে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে গাওয়া হতো। তা ছাড়া রেডিওতেও এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীরা অনুষ্ঠান করতেন। তারই মাধ্যমে সংগীতানুরাগী মহল সুকণ্ঠের অধিকারী তরুণ শিল্পীদের সঙ্গে পরিচিত হতেন।

সংগীতসংঘে ক্লাসিকাল তথা ধ্রুপদ খেয়াল থেকে সুরু করে বাংলা গান, (রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, নজরুল) ঠুংরী, রাগপ্রধান ভজন সবরকম গানই খুব যত্ন করে শেখানো হোতো। আমার প্রথম রেকর্ড হিমাংশু দত্তর ট্রেনিং-এ 'নিশিথে চলে হিমেল যামা' এবং 'বন্দনাতে নিবেদিত প্রাণ'—ইমনশঙ্কর ও মিশ্র শিবরঞ্জনী রাগের নকশায়।

গ্রামোফোন কোম্পানীর সঙ্গে যোগাযোগ? ওঁরাই করেছিলেন। তখনকার দিনে আর্টিস্টের সংখ্যা খুব বেশী ছিলো না। কে ভাল গাইছে ওঁরা খবর রাখতেন এবং নিজেরাই যোগাযোগ করতেন। তখন যাঁরা সরকার বা গীতিকার ছিলেন তাঁরা গানকে ভালবাসতেন এবং সেইজন্যই শিল্পীদের প্রতিও ছিলো তাঁদের অসীম সমবেদনা এবং

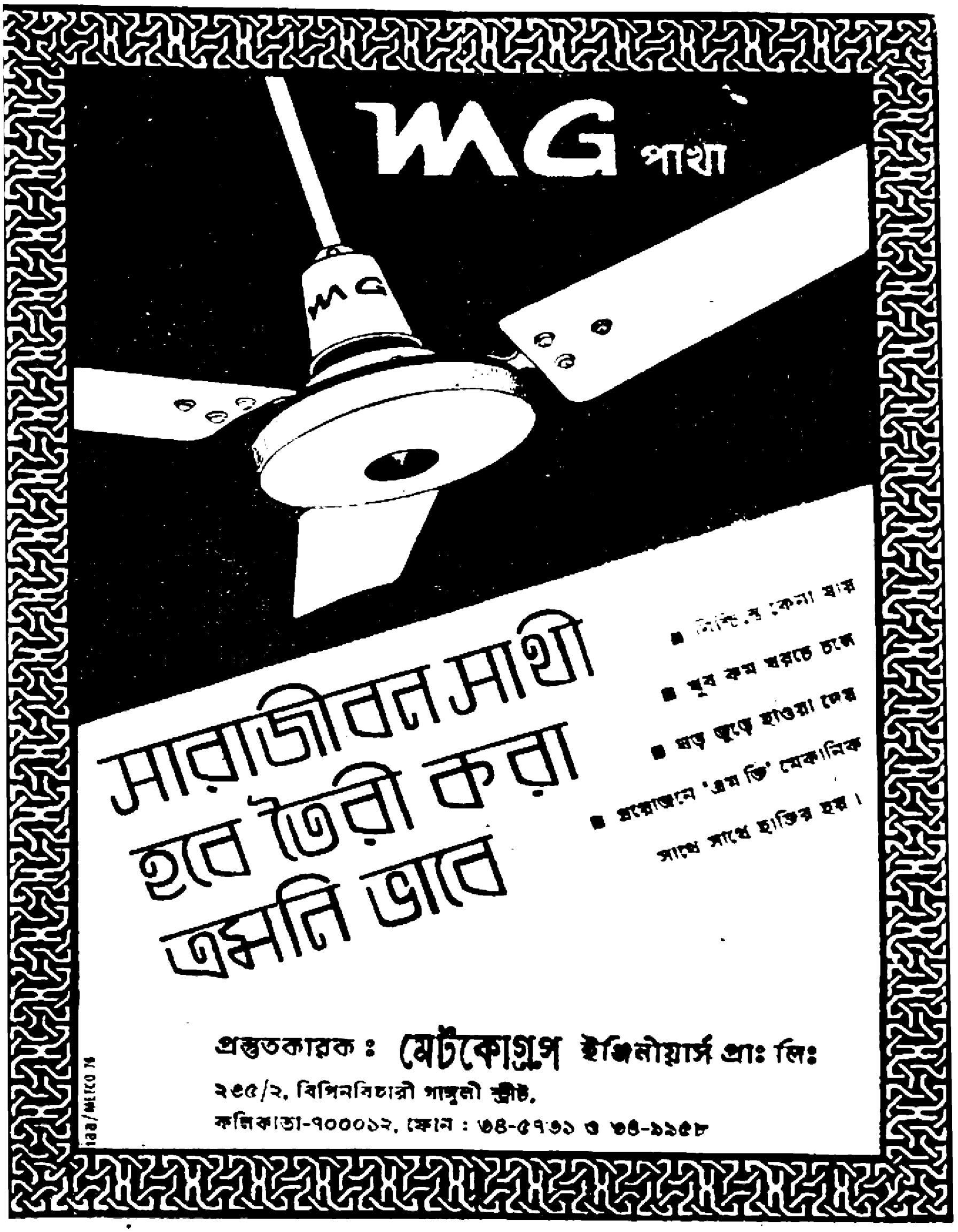

প্রতি মঙ্গলবার রেডিওতে রাত ৮-৪৫ মিনিটে বিবিধ ভারতী শুনুন—'অবিশ্বাস্য'

সহযোগিতা। আমার গান শুনে হিমাংশু-বাবু এত খুশী হয়েছিলেন যে রেকর্ডের বাইরেও অনেক গান উনি শেখাতেন। কী করে গলা সাধা করতে হয়, কোন কথার ওপর কীভাবে জোর দিলে গানের বক্তব্য স্বচ্ছ হয়ে ওঠে এসব শিক্ষা ওঁরই কাছে। উনিই আমায় স্বরলিপি করতে শিখিয়েছিলেন। তখনকার অনেক সংগীত পত্রিকায় আমার লেখা গানের স্বরলিপিও প্রকাশিত হতে-ছিলো। আমার দ্বিতীয় রেকর্ড হলো নজরুলগীতির।

১৯৫৭ সালে ম্যাট্রিক ক্লাসে ওঠার পর বিয়ে হয়ে গেলো। তারপরই চলে গেলাম ঢাকা। পরীক্ষা তখনকার মত মুলতুবী রইলো। কিন্তু সে কণ্ঠস্বরের মিলন গানের কাছে। আমার শ্বশুরবাড়ী ছিলো গানেরই বাড়ী। ইন্দিরা সেন আমার ননদ। তাঁর তখন খুবই নামডাক। ১৯৩৯ সালে ঢাকায় প্রথম রেডিও স্টেশন খোলে। ওখানে গাই-তাম। আবার কোলকাতার রেডিও স্টেশনেও অনুষ্ঠান করতাম। এই সময় প্রকাশকালী ঘোষালের কাছে প্রচুর গীত, ভজন শেখবার সুযোগ পেয়েছিলাম।

প্রথম প্লে-ব্যাক করেছিলাম শচীনদার (শচীন দেববর্মণের) ট্রেনিং-এ। শচীনদা আমার কাছে এ প্রস্তাব নিয়ে আসতে আমি তো ভয়ে অস্থির। ওরে বাবা! প্লে-ব্যাক গাওয়া মানে আমি পাশ থেকে গাইব আর ছবিতে আমায় দেখা যাবে?

'আরে না, না। সে ব্যাপারই নয়।' উনি ব্যাপারটা আমায় বুঝিয়ে দিলেন। শচীনদার মত শিল্পীমন খুব কমই দেখেছি। গান শেখাবার সময় উনি কিভাবে যে আমাদের সুবিধে অসুবিধার প্রতি লক্ষ রাখতেন কি বলব। ওঁরই ট্রেনিং-এ প্রথম হেমন্তবেলারই গান গেয়েছিলাম 'আকাশ কেন নিল ধরা' ও 'আজিকে মধুবনে' (সঙ্গে ভট্টাচার্য)। দুটি গানই খুব জনপ্রিয় হয়েছিলো।

অপারেশন শচীন দেব বর্মণের সুরে 'নিউ থিয়েটার্সে বাইবার্স' (হেমন্তমুখো) চিত্ত রায় ও দুর্গা সেনের সুরে নানা ছবিতে প্লে-ব্যাক করেছি। তুলসীদাস ছবিতে গেয়ে-ছিলাম অনুপম ঘটকের সুরে।

হিজ মাস্টার্স ভয়েসে আমার রেকর্ড করার সুত্র হিন্দুস্থান কোম্পানীতে প্রথম রেকর্ড করেছিলাম জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের (চিত্ত রায়ের) এবং দুর্গা সেনের সুরে (আমার বসন্ত যে যায়) এই কোম্পানীর হিট গান হয়েছিলো অনুপম ঘটকের সুরে 'কাশফুলের আড়ালে যে রক্ত রাঙা ও গোধূলি মনে পড়ে চাহি'।

এরই ফাঁকে থীয়েটারে উপাধি পেয়ে-ছিলাম। পরীক্ষক ছিলেন বীরেন্দ্রকিশোর ও রচোধুরী, দানীবাবু, নরীবাবু, অহীন্দ্র চৌ সাহেব আরও অনেক গুণী।

সাবিত্রী মেয়ের জীবনে গানের প্রবাহ কখনও থেমে থাকে নি কিন্তু সবচে সুখের সময়টা ছিলো ১৯৫৫ সালে ওঁর ছেলে যখন তের বছরের সে বছরই উনি সকল ফাইনাল পাশ করে এবং এ ইন্টারমিডিয়েট, বি-এর গণ্ডী পেরিয়ে ১৯৭১ সনে বাংলা নিয়ে এম-এ পাশ করেছেন। সংগীতের ক্ষেত্রে ওঁর চিন্তার স্বাক্ষর বহন করছে নানা পত্রপত্রিকার লেখা, সংগীতের ওপর ওঁর নানা নিবন্ধ। সাবিত্রী দেবীর একটি বইও বেরুচ্ছে হয়ে আছে 'বাংলা গানের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস'।

এতরকম গান গেয়েও রবীন্দ্রসংগীতের প্রতি তিনি প্রবল আকর্ষণ অনুভব করেন, বোধহয় সবরকম গানে অন্তরঙ্গ মনের আত্মকেন্দ্রিক উপলব্ধির প্রকাশ। আগে ভজন, রাগপ্রধান, আধুনিক, নজরুল সবই গাইতাম, রবীন্দ্রসংগীতও গাইতাম না তা নয়। ১৯৫৭ সনে অল ইন্ডিয়া রেডিওর সূত্রেই দিল্লীতে গিয়েছিলাম। সেখানে 'আপনি কোন ধরনের কি গানের ছিচারে' আমি রবীন্দ্র-সংগীত গেয়েছিলাম। সুরেশ চক্রবর্তীও তখন সেখানে ছিলেন। সবাই ওখানে খুব পছন্দ করেছিলেন। অনেকেই প্রশ্ন করেছিলেন আমি কেন রবীন্দ্রসংগীত গাই না?

'পরের বছর ১ বৈশাখে রেডিও প্রোগ্রামের আমন্ত্রণের সঙ্গে সঙ্গে পেলাম বেঙ্গল ক্লাবেরও এক আমন্ত্রণলিপি, আমি যেন রেডিও অনুষ্ঠানের কিছুদিন আগে গিয়ে ওঁদের উৎসবেও অংশ গ্রহণ করি। সে আসরে আমি গেয়েছিলাম রবীন্দ্র সংগীত। কোলীদা (ডি টি ঘোষাল), সুরেশ-বাবু, হুমায়ুন কবীর আরও অনেকে। প্রত্যেকে আবার তুললেন একই প্রশ্ন, আমি কেন নিয়মিতভাবে রবীন্দ্রসংগীত গাই না? বললাম কি করে গাই? এখানেও যে ক্লাসি-ফিকেশন আছে—এই এই আর্টিস্ট এই এই গান গাইবেন।' হুমায়ুন কবীর সুরেশ-বাবুকে বললেন 'এটা খুব অন্যায়। উনি এত সুন্দর রবীন্দ্রসংগীত গান তবু আপনারা গাইতে দিতে এত আপত্তি কেন?' উনি বললেন 'দেখি কি করা যায়।'

এরপর কোলকাতায় আসার কিছুদিন বাদেই অন্যান্য গানের সঙ্গে রবীন্দ্রসংগীত গাইবার অনুমতি পেলাম। ১৯৬০ থেকে রবীন্দ্রসংগীত গাওয়া সুরু হয়েছিলো। এখনও চলছে। এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের উৎসাহ আমাকে অনেক প্রেরণা যুগিয়েছে। আমি রবীন্দ্রসংগীত গাইতে ইতস্তত করলেই ও বলতো কেন গাইবে না? তোমায় গাইতেই হবে। দেখবে গাইতে গাইতে মনের কত বন্ধ দুয়ার খুলে যাবে।' সবই ত বুঝি ভাই, কিন্তু তোমাদের কত কি সব নিয়ম-কানুন হয়েছে এটা ভুল, সেটা ভুল। সেই ভয়ই ও গাইতে ভরসা পাই না।'

ওই পরামর্শে সুশীল চট্টোপাধ্যায়ের কাছে অনেকদিন অনেক গান তুলেছি। হেমন্তদার কাছেও শিখেছি 'বৈশাখের এই ভোরের হাওয়া'। কার যেন এই মনের কথা, নাই বা চিনল যদি'। ওঁর প্রকাশ-ভঙ্গি ভারী সুন্দর। কত সহজে উনি গানের ভাবকে মনের মধ্যে পৌঁছে দিতে পারেন।

আর এক শিল্পী কণিকা। ওর মতই যত বেশী গানের পরিধি দিনদিন বিস্তৃত হয় ততই। প্রতি বছরই ওর গান আগের বছরের গানকে পিছনে রেখে অনেক দূরে এগিয়ে যায়। অপেক্ষাকৃত ভাব, শ্রেষ্ঠ সবই আলাদা ধরনের, দেখবে ওর গানেও তার ছায়া পড়েছে।

রবীন্দ্রনাথের গান বাংলা সংগীতের ক্ষেত্রে সবদিক দিয়েই একটা বিপ্লবের যুগ সৃষ্টি করেছে। সুরের পরিপ্রেক্ষিতে যদি বিচার করি, এ গানে পুরোপুরি ক্লাসিকাল কনভেনশনের ওপরই দাঁড়িয়ে আছে। রাগ-সঙ্গীতের বিরাট ঐতিহ্য ও সুরের বহুধা বিস্তার তাঁর মত মহাশিল্পীর কল্পনাকে নাড়া দিয়েছিলো বলেই এতরকমের গান তাঁর কাছ থেকে পাওয়া গেছে। 'সুন্দর লাগিয়ে হ্যায়' শুনে তিনি রচনা করলেন 'খন্দিত মম কে আসিলে', 'কারসে নিকালে চাঁদিনী' তাঁর কাছ থেকে আদায় করলো 'আজি কমলমুকুল দল উঁদিলো'। এ গানটি রাজেশ্বরী দত্ত তারী সুন্দর গেয়েছিলেন মাত্র তিন মিনিটের রেকর্ডে। এই সমন্বয় সুরচেতনার সঙ্গে মিশেছে তাঁর সাহিত্যচেতনার বিশ্ব অনবদ্যতা, এই মিলন তাঁর গানকে যে কোথায় পৌঁছে দিয়েছে তা ভাষা যায় না।

টপ্পার কথাই ধর না। টপ্পা ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতের একটি শক্তিশালী ধারা। এইটেই সবাই জানতাম। নিধুবাবুর পর তাঁর কিছু উত্তরসূরীর অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে টপ্পা হয়ত ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যেতো। কিন্তু টপ্পার মাধুর্য ও শক্তিকে কবি তাঁর মরমী মন দিয়ে চিনেছিলেন বলেই তাঁর গানে টপ্পা একটা অসাধারণ রূপ সৃষ্টি করেছে যা ভাষা যায় না। 'বঁধু রহো রহো সাথে'—এখানে টপ্পার অবরোহীর মুখে গড়িয়ে যাওয়া তান যেন প্রতিটি কথার ভাবকে নিংড়ে বার করে নিচ্ছে।

তাঁর গানে অনেক ক্লাসিকাল রাগের প্রয়োগ রাগের মূল প্রকৃতিকে ছাপিয়ে এক অভিনব সংগীতলোক রচনা করেছে।

এই কথাটা বুঝতে পারছি বিশেষ করে গীতবিতানে দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষকতা করে। ওখানে রবীন্দ্রসংগীত শেখান কনফিডেন্স। বাংলা গানের অন্য বিভাগ আমার। কাজের ফাঁকে যখন কনফিডেন্স ক্লাশের সুর কানে আসে নতুন করে অনুভব করি প্রতিটি রাগের ফিলসফি। ওঁর কাছে প্রত্যক্ষভাবে যা নিয়েছিলো বলেই সুরের হাত ধরে কথা এমন অনায়াসচ্ছন্দে নিরুদ্দেশের পথে পাড়ি দিতে পেরেছে। কথা সুরের পায়ে শৃংখল হয়ে ওঠেনি বরং তার গতিকে আরো সাব-লীল করেছে।

আর রবীন্দ্রসংগীতের ধারা আজ প্রবল কারণ বাংলা গানের রাজ্যে এখন এমন একটা অবক্ষয়ের যুগ চলেছে যে শিক্ষিত মন একে মানতে নারাজ। আগেকার দিনের বাংলা গানের মান এখনকার শ্রোতারা দেখতে পেলেন না বলে বড় কষ্ট হয়। যেমন 'ওগো, সুন্দর মনের গহন', এ গানের স্ট্যান্ডার্ড এখন ভাবা যায়? কথার মধ্যে এই ওজনের অভাবই আমায় রবীন্দ্রসংগীতের দিকে টেনেছে। আগে আধুনিক গাইতে ইচ্ছে করতো, এখন এ'কথা'ই করে না। কারণ যা চাই তার সবটাই পাই রবীন্দ্রসংগীতে।

অন্যা সেন

CENTRAL LIBRARY

। বিবেচনা করার আছে। পাখির
। পাওয়া ও তাগিদ অনুভব করা।
। পাওয়াটা সম্ভবত শিক্ষণীয় বিষয়।
াপ বিজ্ঞানী গডফ্রে হ্যামের মতে
। পাখিরা পথের হদিশ পায় সূর্যের
থান থেকে। দক্ষিণদিকে উড়ে যাচ্ছে
পাখি সে সকালবেলা ওড়ে সূর্যকে
কে রেখে, দুপুরবেলা সূর্যকে ঠিক
র ওপরে রেখে, আর বিকেলবেলা
কে ডানদিকে রেখে। আর রাত্রিবেলা?
বেলা সম্ভবত একই পদ্ধতিতে তারার
থান থেকে হদিশ নেয়। মেঘলা দিনে
নে কুয়াশার দিনে? মনে হয় সেটা
ন্তরী হবার পক্ষে খুব অনুকূল
ধা নয়, ঘন মেঘ বা কুয়াশা দেশা-
। পাখিকে বিভ্রান্ত করে।

আর তাগিদ? এক্ষেত্রেও নির্দিষ্ট
মত এখনও গ্রাহ্য নয়। অনেকটাই
ান ও প্রস্তাব। উত্তর থেকে দক্ষিণে
ন্তরী হয় যে-সব পাখি তাদের
র্তা আসে—যাকে বলা হয় গোনাড
প্রজননগত কতকগুলো অনির্দিষ্ট চিহ্ন
র আভ্যন্তরিক অবস্থা থেকে। এই
াটি না ঘটা পর্যন্ত দেশান্তরী হবার
ন থাকে না। পিটুইটারি গ্ল্যান্ডের ক্রিয়া
প্রকৃতি নির্ভর করে
সেখার ওপরে। পিটুইটারি গ্ল্যান্ড
হলে গোনাড উত্তেজিত হয়।
উত্তেজিত হলে স্নায়ুতন্ত্রের মা পড়ে।
সকলে জাগে দেশান্তরী হবার ও
বাঁধার।

দেশান্তরী হবার সময়ে কোন
যেমন শকুনি) উড়ে যায় আকাশের
উঁচু দিয়ে প্রবহমান বাতাসের সা
কোনো কোনো পাখি অপেক্ষাকৃত
বয়ে, তারা অনুসরণ করে জমির
চিহ্ন, উপকূলরেখা, নদী পর্বত ই
(অবনীন্দ্রনাথের বুড়ো আংলার
শেষোক্ত দলের।)

প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে, কিব
যে ধরতে পারেন কোন ঋতু
থেকে কোথায় দেশান্তরী হয়েছে তা
উপায়ে চিহ্নিতকরণের সাহায্যে।
পাখির পায়ে আংটি পরিয়ে দেওয়া
পরী জাতির কাছে চলতি এই।
ইত্যাদি। নির্দিষ্ট চিহ্ন
হবার পরেও নির্দিষ্ট ঋতুতে ফি
চলে। ঋতুকালের দেশান্তরী
ব্যাপারটি নিয়ে সুপরিকল্পিত

ই পাখিরা বছরে দু-বার গোটা ভূ-গোল ঘুরে যায়

শুরু হয়েছে আঠারো শতক

•

রী হয়ে থাকে এমন কয়েক-
ক্ষুদ্রতম জীবের দিকে তাকান

সমুদ্রের যেসব কোনো
জায়গায় চলে আসে নবীন,
কাজ ফিরে যায় সমুদ্রে।
দেখা যাচ্ছে সমুদ্রতলের
ন, শীতলতায় গভীর জল।

এখানে একটা কথা বলার আছে। সমুদ্র থেকে মিষ্টি জলের এলাকায় চলে আসা, আবার জল থেকে ডাঙ্গায় উঠে আসা—সম্ভবত এই সময়ের কাজকারখানা থেকেই মিষ্টি জলের জীব ও ডাঙ্গার জীব বিবর্তিত হয়েছে। এমনও হতে পারে, সমুদ্র থেকে সরে আসা কোন কোন জীব আর ফিরে যেতে পারেনি, তারাই হয়েছে মিষ্টি জলের ও ডাঙ্গার জীবের বিবর্তনের শুরুতে।

সামুদ্রিক গলদা-চিংড়ি। এই জীব-গুলো খুব দ্রুত খুব দূরে সরে যায়। সরে যাওয়ার ভাগিদটা আসে সম্ভবত ডাঙ্গমাত্রার পরিবর্তন থেকে।

কাঁকড়া : ডাঙ্গার কাঁকড়া সমুদ্রে যায় ডিম পাড়তে। প্রশান্ত ও ভারত মহাসাগরের বিভিন্ন দ্বীপে দেখা যায় কাঁকড়ারা সার বেঁধে উপকূলের দিকে চলেছে উপকূল থেকে জলের মধ্যে। ডিম পাড়বার সময় কাঁকড়ারা ফিরে আসে ডাঙ্গায়। সমুদ্র-উপকূলের কোন কোন কাঁকড়া দেশা-

দাঁতের ডাক্তাররা বলেন

নিয়মিত দাঁত ব্রাশ করলে আর মাড়ি মালিশ করলে মাড়ির গোলযোগ ও দাঁতের ক্ষয় রোধ করা যায়

নিয়মিত ফরহান্স টুথপেষ্ট ব্যবহার করেন এমন অনেকে অযাচিত প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে লিখেছেন:

"আমার মাড়ির গোলযোগ ছিল···একে একে আয়ুর্বেদিক, হোমিওপ্যাথিক আর অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ সাধ্যমতে আমার নেওয়া হয়েছে। শেষ পর্যন্ত এক দাঁতের ডাক্তারের কথামত ফরহান্স টুথপেষ্ট ব্যবহার করতে শুরু করলাম, আর আশ্চর্য! ···এখন আমার দাঁত আর মাড়ি অনেক ভালো। আর শক্ত হয়েছে···আমি নিশ্চিন্ত।"
(ডাঃ) গোপাল সিং
কোটা

"···আমার স্ত্রী দাঁতের গোলযোগে ভুগ-ছিলেন···টুথপেষ্ট বদলে ফরহান্স ব্যবহার করতে শুরু করলেন···এখন সুফল পেলেন, যে এখন অন্য কারো মাড়ির গোলযোগ হলেই উনি তাকে ফরহান্স ব্যবহার করতে বলে করেন। আমার ভাই যিনি ইংলাণ্ডে, তিনিও ভারতে তৈরী ফরহান্সের ৬টি টিউব পাঠানোর জন্যে পীড়াপীড়ী করে লিখেছেন।"
(ডাঃ) টি. কি. এম. ভিত্তলা
বম্বে

"রাজমুদ্রির এক ডেন্টিষ্ট···দাঁত আর মাড়ির জন্যে আমাকে ফরহান্স টুথপেষ্ট ব্যবহার করতে বললেন। আমি অবিলম্বে ওঁর উপদেশ পালন করলাম, আর অল্প সময়ের মধ্যেই আমার নিঃশ্বাস আর মাড়ি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলো। সেই থেকে, আমি ফরহান্স ছাড়া আর কিছু জানি না। আমার সারা পরিবার (আমরা ৯ জন)। ফরহান্স ব্যবহার করি, আর আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই অভ্যাস আর বিশ্বাস আমাদের পরিবারে পুরুষানুক্রমে চলবে।"
(ডাঃ) পি. কে. নাভার
চিরালা, আন্ধ্র প্রদেশ

(এই প্রশংসাপত্রের প্রতিচ্ছবি (ফটোস্ট্যাট) ফ্রি ফরহান্স এণ্ড কোং লিঃ-এর যেকোনো অফিসে দেখতে পারেন।)

আলোভাবে দাঁতের যত্ন নিতে হলে রোজ রাত্রে আর সকালে ফরহান্স টুথপেষ্ট ও ফরহান্স টুথব্রাশ ব্যবহার করুন···আর নিয়মিত আপনার দাঁতের ডাক্তারের পরামর্শ নিন।

ফ্রি নমুনা! তথ্যপূর্ণ রঙীন পুস্তিকা "আপনার দাঁত ও মাড়ির যত্ন"। এই পুস্তিকা পেতে হলে অনুগ্রহ করে এই কুপনের সঙ্গে ২৫ পয়সার ডাকটিকিট পাঠান, এই ঠিকানায়: ম্যাক্সাস হেল্থকেয়ার ইনফরমেশন ব্যুরো, পোষ্ট বক্স নং: ১০০৩১, বম্বে ৪০০০০১।

নাম _____ বয়স _____

ঠিকানা _____

•অনুগ্রহ করে যে ভাষায় চান তার নীচে দাগ কেটে দিন—ইংরিজী, হিন্দী, মারাঠী, গুজরাটী, উর্দু, পাঞ্জাবী, বাংলা, অসমীয়া, তামিল, তেলেগু, মালয়ালম, কানাড়ী।

ফরহান্স টুথপেষ্ট এক দাঁতের ডাক্তারের তৈরী

ন্তরী হবার সময়ে ছ মাসে আট মাইল পর্যন্ত পাড়ি দিতে পারে দেখা যায়।

প্রজাপতি : কীটপতঙ্গের মধ্যে দেশান্তরী হবার সবচেয়ে ভাল দৃষ্টান্ত প্রজাপতি। প্রজাপতিরা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে আছে। বসন্তকালে দেশান্তরী হবার সময়ে তিন হাজার কিলোমিটারেরও ওপর পাড়ি দিতে পারে। ডিসেম্বর মাসে কখনও কখনও দেখা যায় ঝাঁকে ঝাঁকে প্রজাপতি কোথা থেকে কোথায় যেন উড়ে চলেছে। পশ্চিমবাংলার কোন কোন এলাকায় এই সময়ে প্রচুর প্রজাপতি ধরা যেতে পারে। সারা শীতকালটা তারা থাকে, তারপরে এপ্রিলে আবার উধাও। এমন নজিরও আছে যে একই গাছের একই ডালে প্রতি বছর একই সময়ে হাজার হাজার প্রজাপতি এসে ভিড় জমায়।

এবারে মেরুদন্ডী প্রাণী।

মাছ : বিভিন্ন প্রজাতির মাছ বিভিন্ন ভাবে দেশান্তরী হয়। কেউ নোনা জল থেকে মিষ্টি জলে, কেউ দূরের সমুদ্র থেকে কাছের সমুদ্রে, কেউ গভীর থেকে অগভীর সমুদ্রে।

এ-ব্যাপারে ইলিশ এক চমৎকার দৃষ্টান্ত। যে-সব ইলিশ খাড়িতে বা সমুদ্রে থাকে তারা বর্ষাকালে ও শীতকালে ডিম পাড়বার সময়ে নদীপথে ওপরে ওঠে। গঙ্গাপথে এমনিভাবে ইলিশের আগমন ঘটে বহরমপুর পর্যন্ত—প্রায় তেরো-শো কিলোমিটার ছাড়িয়ে। তবে সব ইলিশই দেশান্তরী হয় না। কোথাও কোথাও আবার সারা বছরই মিষ্টি জলের এলাকার থেকে যায়। চিলকা লেকের ইলিশের কথাও বলা যেতে পারে—চিলকার ইলিশ চিলকাতেই থাকে।

দেশান্তরী হওয়ার ব্যাপারে ইলিশ একক নয়, আরও আছে। তবে দেশান্তরী হওয়ার ধরনটা একই রকমের। যেমন আটলান্টিকের বৃহৎ মাছ সামন। সমুদ্র থেকে নদীপথে তারা হাজার কিলোমিটার পাড়ি দেয় এবং প্রবল স্রোত ও অগভীর জলের এলাকায় গিয়ে ডেরা বাঁধে। তারপর ডিম ছাড়া ও ডিম থেকে পোনা নির্গত হওয়া। মাছগুলো অধিকাংশই মারা যায় অল্প কয়েকজনই ফিরে যেতে পারে।

ইলিশের দেশান্তরী হওয়াটা যেমন সমুদ্র থেকে মিষ্টি জলের দিকে তেমনি তার উলটোটা ঘটারও দৃষ্টান্ত আছে। আমেরিকান ঈল থাকে পুকুরে খাড়িতে নদীতে, সমুদ্রের উপকূলভাগের জলে। বছর কয়েক পরে যখন জোড় বাঁধার বয়স হয় তখন হাজার পাঁচেক কিলোমিটার পার হয়ে গিয়ে হাজির হয় সারগোসা ও ক্যারিবিয়ান সাগরের জলে। সেখানে ডিম ছাড়া ও জোড়ের অবধারিত মৃত্যু।

উভচর প্রাণী : নামেই বোঝা যায়, উভচর প্রাণীর বাস যেমন জলে তেমনি ডাঙ্গায়। জন্ম জলে, শরীরের মধ্যে ফুসফুস না হওয়া পর্যন্ত জলেই বাস, তারপরে উঠে

প্রজাপতির পাখায় এমনিভাবে চিহ্নিতকরণ হয়ে থাকে। দেশান্তরী হওয়ার পর আবার চিহ্ন মিলিয়ে নির্দিষ্ট করা হয়

আসে ডাঙ্গায়। আবার জলে ফিরে যায় ডিম ছাড়ার সময়ে। উভচর প্রাণীর দৃষ্টান্ত হচ্ছে ব্যাঙ, সালামান্ডার (গিরগিটি-জাতীয়, সর্পসদৃশ বিশেষ), নিউট ইত্যাদি।

সরীসৃপ : সামুদ্রিক সরীসৃপরা সকলেই দেশান্তরী হয়ে থাকে। ইকুয়াডোর উপকূলের অদূরে যে গালাপাগোস দ্বীপ সেখানকার বিপুলাকার ও দীর্ঘজীবী কচ্ছপরা। কিন্তু ঠাইনাড়া হয় বটে কিন্তু সেটা এক দেশ থেকে অন্য দেশে নয়—উচ্চতার দিকে। তারা ডিম পাড়ে উপত্যকার সমতল বালুকাময় তটে বসন্তে ও বর্ষায়। কিন্তু শুকনো দিন শুরু হলেই উঁচুদিকে উঠতে শুরু করে—ছশো মিটার পর্যন্ত উঠে যায়। পরের বসন্তে আবার আগের জায়গায় ফিরে আসে।

পাখি : পৃথিবীতে যত জীব আছে দেশান্তরী হওয়ার ব্যাপারে পাখিদের মত আর কেউ নয়। তার একটা কারণ পাখিদের আছে ডানা আর আকাশ অবাধ। ডানা মেলা আর অবাধ গতিসম্পন্ন হওয়া বিশেষ সব ভাবাতেই সমার্থক। তবে পাখিদের দেশান্তরী হওয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উত্তর থেকে দক্ষিণের দিকে বা মেরু থেকে বিষুবের দিকে, বা কম অক্ষাংশ থেকে বেশি অক্ষাংশের দিকে। উত্তরের দিকে রয়েছে বিশাল আয়তন জুড়ে ভূমি ও বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে খাদ্য-সংস্থান। তাই গ্রীষ্মকালটা এখানে পাখিদের পক্ষে মহানন্দের দিন। কিন্তু শীত শুরু হলেই অন্তর্ধান। তখন ডানা মেলে দেওয়া ও দক্ষিণের দিকে পাড়ি দেওয়া। বলা বাহুল্য যে-সব পাখির বাস এমনিতেই গরম এলাকায় তারা আর শীতকালে দেশান্তরী হবার প্রয়োজন বোধ করে না।

পাখিরা দেশান্তরী হয়, যে-কথা আগে বলেছি, পুরুষানুক্রমে একই পথ অনুসরণ করে, বছরের একই সময়ে। ফিরে যাওয়াটাও তাই। আসা এবং যাওয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঝাঁক বেঁধে। ওড়ার বেগ কখনো কখনো ঘণ্টায় ৪৮ থেকে ৮০ কিলোমিটার পর্যন্ত, তবে গড় অতিক্রমণ দৈনিক ৪০ কিলোমিটার।

দেশান্তরী পাখিদের প্রসঙ্গে ভারতের কথা বিশেষভাবে বলতে হয়। কেননা হিমালয়ের মানস-সরোবর থেকে বহু পাখি শীতকালে কাটাতে যে ভারতের বিভিন্ন এলাকায়। আসে পাস এই কলকাতাতেও—চিড়িয়াখানায় ও লবণ হ্রদে। তাতে পক্ষী-আবাস খুব বেশি নেই, কিন্তু অ্যাকট আছে সবই এখনো পর্যন্ত পাখির বেশ ভিড়। তবে কতদিন থাকবে তা বলা শক্ত। কারণ পরিবেশ বাধ্যত ঘটছে, কলখানার উদ্গীরণে ও বর্জনে বাতাস কলুষিত হচ্ছে, প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হচ্ছে কীটনাশক ওষুধ—তদুপরি আছে ব্যাপক হাওয়ায় অবস্থার বড়োরকমের অদলবদল ঘটে যাওয়া, ভূদৃশ্যে চোখে পড়ার মতো চিহ্নগুলো অন্যরকম হয়ে যাওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি। কলকাতার চিড়িয়াখানায় এ-বছর পাখির সংখ্যা কম, এ-খবর তো আগেই জানানো হয়েছে।

স্তন্যপায়ী জীবদের মধ্যেও দেশান্তরী হওয়ার দৃষ্টান্ত আছে, তবে সংখ্যায় খুবই কম। তাই বলে স্তন্যপায়ীরা এক জায়গায় স্থাণু হয়ে আছে তা নয়। অনবরত ঘুরে বেড়াচ্ছে। অনবরত। বিজ্ঞানীরা ধারণা করেছেন, বিশাল এই জীবজগৎ ঘুরেই মরছে—আর তাই অগ্রসর হওয়ার নাম জীবন, গতিহীনতা মৃত্যু।

এই লেখার কিছু তথ্য সোভিয়েত ইউনিয়নের কিয়েভ-এর ইউক্রাইন মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্মরত বিজ্ঞানী ডঃ বি বি জানার একটি প্রবন্ধ থেকে নেওয়া হয়েছে।

অয়স্কান্ত

CENTRAL LIBRARY

। ফাগ বা হোলী উৎসব ।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

নিত নিত হোরী ব্রজমে রহো
বিহরত হরিসঙ্গ ব্রজ যুবতীগণ
সদা আনন্দে রহো।
প্রফুলিত ফলিত রহো বরণ
মধুপ কুরুণে করো
হরীচন্দ নিত সরস সুধাময়
প্রেম প্রবাহ বহো।

হোলীর মধ্যে আনন্দে বিহ্বল হয়ে কবি গেয়ে উঠছেন, আহা সর্বদাই যেন ব্রজে এমনি হোলীর উৎসব হয়। শ্রীহরি-সঙ্গে ব্রজবালারা আনন্দে মগ্ন হয়ে বিহার করছে। এ রকম আনন্দে চিরদিন থাক। বৃন্দাবন ফুল ফুলে সুশোভিত থাক, আর মধুকর ফুলে ফুলে উড়ে কুরুণগুঞ্জন করুক। শ্রীহরির চরণসঙ্গ, সুধাময়, চারদিকে প্রেমের বন্যা বয়ে চলুক।

•

হোলী খেলা কি সুন্দর ও মধুর ভাবে হচ্ছে, আবীর ও লাল যেমন চারিদিকে ঘুরছে, গিরিধর শ্যামও সেভাবে চারিদিকে ঘুরছে। গোপকুমারীরা ও সকল ব্রজ-বালকরা হোলী খেলছে, গোপকুমারীদের কোমরে কোমরবন্ধ, আর হাতে থলায় রঙ ভরা আবীর ও গুলাল, তারা এ ওর গায়ে থলে ঝেড়ে ঝেড়ে আবীর ফেলছে।

রং না ডার তুসমুত কে লাল
ভীজ গই মোরি চুনর সাড়ী।
হে যশোমতী-নন্দন আর আমাকে রং দিও না, আমার সব ওড়না ভিজে গেছে।

বেনারসী সিল্ক • তাঁত শাড়ীর শাল • আলোয়ান
রামকৃষ্ণ ভাণ্ডার
৫৪২/১ জি.টি.রোড (সাউথ) হাওড়া

ডাঃ রেহলজ বসু এম.বি.ডি.জি.ও.
ডাঃ এস এন পাণ্ডে এম.বি.বি.এস
যৌবনের রহস্য
প্রত্যেক স্বামীর জন্য • মূল্য-৮০
যৌন বিজ্ঞানের রঙীন ও বহুচিত্রে চিত্রিত অতি আধুনিক সংস্করণ।
মাহন লাইব্রেরী
৪৮ টাকার পরিবর্তে ৩০ টাকা পাঠালে ডাকমাশুল ফ্রি

পুনশ্চ

হোলীর পনের-বিশ দিন পূর্ব থেকেই নারীদের নৃত্য-গীতে মালব মুখরিত হয়ে ওঠে। অধিকাংশ গীতই বিরহ-প্রেম নিয়ে রচিত।

মালবে বাসন্তী রংয়ের বড় আদর, নারীরা পরিশ্রম করে বাসন্তী রং তৈরী করে আর পিচকারী ভরে ভরে রং খেলতে সুরু করে।

সাজন সঙ্গ খেলুংগী হোরী
কায়ন কো তো রং বনা হায়
তো কায়ন কো পিচকারী,
কাচী কাঁচন কো রং বনা হায়
তো কুঞ্চন কী পিচকারী
ভর পিচকারী মোরে মুখ পো মারী
তো ভীগ গই মুলসাড়ী।

আজ প্রিয়র সঙ্গে হোলী খেলব। তোমার রং কি দিয়ে তৈরী? তোমার কিসের পিচকারী?

বাসন্তী রং আমার, আর সোনার পিচকারী। প্রিয় রং ভরে পিচকারী দিয়ে আমার মুখে রং ছুড়িয়ে দিলে, আর আমার রঙীন সাড়ী ভিজে গেল।

•

বহারে সারাদিন দল বেঁধে খুব রং খেলা হয় ও সন্ধ্যেবেলা সবাই স্নান করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে নেয়, তারপর আবার যে-যার বন্ধু-বান্ধবের বাড়ী সদলবলে উপস্থিত হয়। সবাই তাদের খুব আদর-যত্ন করে সম্বর্ধনা করে, খাওয়া-দাওয়া নাচ-গান হয়। বন্ধুদের বিদায় দেবার সময় তারা গায়—

সদা আনন্দ রহে এহী দ্বার
মোহন খেলে ফাগ রে।
এক ওর খেলে কুঙ্কুম কনাইয়া
এক ওর রাধা প্যারী রে।
ইততে নিকলী নওল রাধিকা
ওততে কুঙ্কুম কনহাই,
খেলত ফাগ পরস্পর হুলমিল
শোভা বরণি ন জাই।

সবার ঘরে ঘরে কেন এই আনন্দ থাকে, মোহন ফাগ খেলছে। একদিকে কুমার কানাইয়া, আর একদিকে পিয়ারী রাধা রং খেলছে। এদিক দিয়ে সুকুমারী রাধিকা, আর ওদিক দিয়ে কুমার কানাই এসে দুজনে মিলেমিশে ফাগ খেলতে লাগল, আহা এর শোভা বর্ণনা করা যায় না!

মধ্যপ্রদেশের বুন্দেলখণ্ডের প্রাকৃতিক শোভা অপূর্ব। চারিদিকে শ্যামল বনানী, শাখে শাখে রং-বেরংয়ের পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়ে সুগন্ধ বিতরণ করছে, নানাবিধ বন্য পাখীর কূজনে পথ-ঘাট-মাঠ মুখরিত। সেখানে বসন্তে প্রকৃতিরাণীর সঙ্গে সঙ্গে পল্লীবধূরাও দেহ-মনে সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে।

রং-বেরংয়ের ঘাগরাপরা বধূরা বাসন্তী রংয়ের চুনরীতে মুখ ঢেকে অঙ্গনে গোলাকার হয়ে বসে হায়। ঢোলক বাজিয়ে-বাজিয়ে তারা সললিত রাগিণীতে হোলী-গীতের মধুর তান তোলে, গ্রামে সুরের বন্যা বয়ে যায়।

•

এই সমস্ত পল্লীগীতিতে শব্দের সমারোহ বা কঙ্কার নেই, নিতান্ত সহজ সরল, গ্রাম্য ভাষায় বধূরা মনের কথা ব্যক্ত করছে, কিন্তু যখন প্রতি সন্ধ্যায় পল্লী-বালারা একত্রিত হয়ে তাদের মধুর সুরে এ সমস্ত গীত গাইতে থাকে, তখন শ্রোতারা আত্মহারা হয়ে যায়। গ্রাম্যললনার স্বাভাবিক মধুর উচ্চকণ্ঠে যখন ঝঙ্কার তোলে, তখন এ সমস্ত নিতান্ত সাধারণ কথাই অপূর্ব হয়ে ওঠে শ্রোতার মনে, বিরহিণীর করুণ-মধুর সুর হৃদয়ে ঝঙ্কার তোলে, 'ওগো আমার প্রিয় পরদেশে চলে গেছে, সে তো আর ফিরে এলো না!'

এই সব পল্লীগীতিতে আর একটা জিনিস লক্ষ্য করবার মত। পল্লীবধূরা শুধু রাধাকৃষ্ণের প্রেম-বিরহ অবলম্বন হোলীর গীত রচনা করেনি। তাদের সীতামাঈ আর রাম-লছমন, যাঁরা নিয়ত তাদের হৃদয় আলো করে আছেন, তাঁদের নিয়েও পল্লী-বধূরা শ্রদ্ধা-ভক্তি দিয়ে সুন্দর সুন্দর গান রচনা করেছে, আর সাধারণ হোলী-গীত-গুলির ভিতর দিয়ে তারা কৌশল্যানন্দন আর জনক-দুলারীর মানবীয় ভাব সুন্দর-ভাবে ফুটিয়ে তুলেছে।

•

মানব-ললনা গাইছে—
জনকপুরে সীতা খেলে হোলী
এক বন খেলে রাম লছমন
দুজে বন সীতা অকেলী
ভাঁত ভাঁত কা রং বনায়া
কঞ্চন কী পিচকারী।

জনকপুরে সীতা হোলী খেলেন। একদিকে রাম-লক্ষ্মণ, আর একদিকে সীতা একেলা। কত রকমের রং তৈরি করে রাখা হয়েছে, আর সোনার পিচকারী।

কল্পতরু

CENTRAL LIBRARY

ভাত

সুপ্রিয়া দাশগুপ্ত

সঙ্কীর্ণ রান্নাঘর, তবু তার মধ্যে কী সুন্দর সাজে। অফিসের ভাত টিফিন সবই শেষ না থাকলেও কষ্টিন মধ্য স্বাভাবিক স্বরেই নেই। ছোট জানলার আলমারী থেকে বাসনের ডাক উনুন শিলনোড়া চাকী বেলুন জলের বালতি। বালতি থাকার কারণ কল নেই ঘরে। তাই দুবেলাই জল আনতে হয় বাইরের কল থেকে, কাজেই নিতাকার বাঙালী গৃহস্থ সংসারের যা যা প্রয়োজন সবই রয়েছে ঐ ঘরে। হাটলে চললে ধাক্কা লাগে, মশলা বাটতে বসলে উনুন থেকে কড়াই নামানো যায় না। তবে গৃহস্বামিনী ক্ষীণকায়া এই যা ভরসা। পটীলোকের সুকুমারী দেহযষ্টির কত প্রশংসা করে গেছেন। নীলচে কালো মোটা ডুরে শাড়ির অন্তরালে গৃহিণীর দেহখানি সত্যি যষ্টি—শুষ্ক কাষ্ঠের নির্মিত বোধকরি। তবে যতই শুষ্ক হোক, সেই দেহখানি কিন্তু বেশ শক্ত। শক্ত হলেও নারী শক্তিরূপিণী।

রান্নাঘরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, গৃহিণী অনিমা এখন সত্যিই ব্যস্ত। বেলা আটটা বাজতে হবে আর দশ পনেরো মিনিটের মধ্যে। রোগা খাটো পেটমোটা গৃহকর্তাটি কিঞ্চিৎ হৃদয়রোগী এবং সময়ানুবর্তিতা তার স্বভাবের বিশেষত্ব। তিনি এই বাজারেও যত ভাল খাওয়া যায় তার চেষ্টা করেন। প্রায়ই ছেলে এবং গৃহিণীকে বলে থাকেন, ভাল করে খাও দাও ডাক্তারকে পয়সা দিও না। টিফিনের বাক্সে লুচি সাজাতে সাজাতে অনিমা ভাবলেন, কে যেন একবার বলেছিল 'কপলের চার আঙ্গুল বাদ দিয়ে বাঙালীর সবই পেট'। হঠাৎ কানে আসে, হ্যাগা শুনেছো, আমার অফিসের জুতো-জোড়া পালিশ করে কোথায় রাখলে আবার? সত্যিই তোমাদের এসব সেন্স কবে যে হবে।

কয়েক বছর আগে হলে অনিমা কুম্ভ গলায় জবাব দিতেন। এখন সেরকম মেজাজ বলেন, আলমারীর পাশেই রেখেছি বং দিয়ে। খুঁজে নাও।

স্বামী পুত্রকে অফিস এবং কলেজে পাঠিয়ে কিছুটা হাত ছেড়ে অনিমা ধীরে সুস্থে ঘরের কাজ সারেন। ক্রমে বেলা বাড়তে থাকে। রান্নাঘরের সরু জানালা দিয়ে যেটুকু আলো সকালে ঢোকে তাও ক্রমে কমে আসে একসময়। এবার আলো জ্বালাতেই হবে ঘরে। এমনি অন্ধকার ঘর। তাকে ভাবতেই বিকেলের জলখাবারের আয়োজন চলে, সঙ্গে অনিমার অক্লান্ত মুখ হাত। একবারও ভাবতে হয় না কোনটার পরে কি করবেন। সবই যেন পরীক্ষার পড়ার মতো মুখস্থ। এই একঘেয়েমির একটা বিরাট সুবিধেও আছে। বেটা অনিমা বেশ বুঝতে পারেন। কারণ নিত্যকর্মের এই একঘেয়েমির

শান্তি : সুন্দর

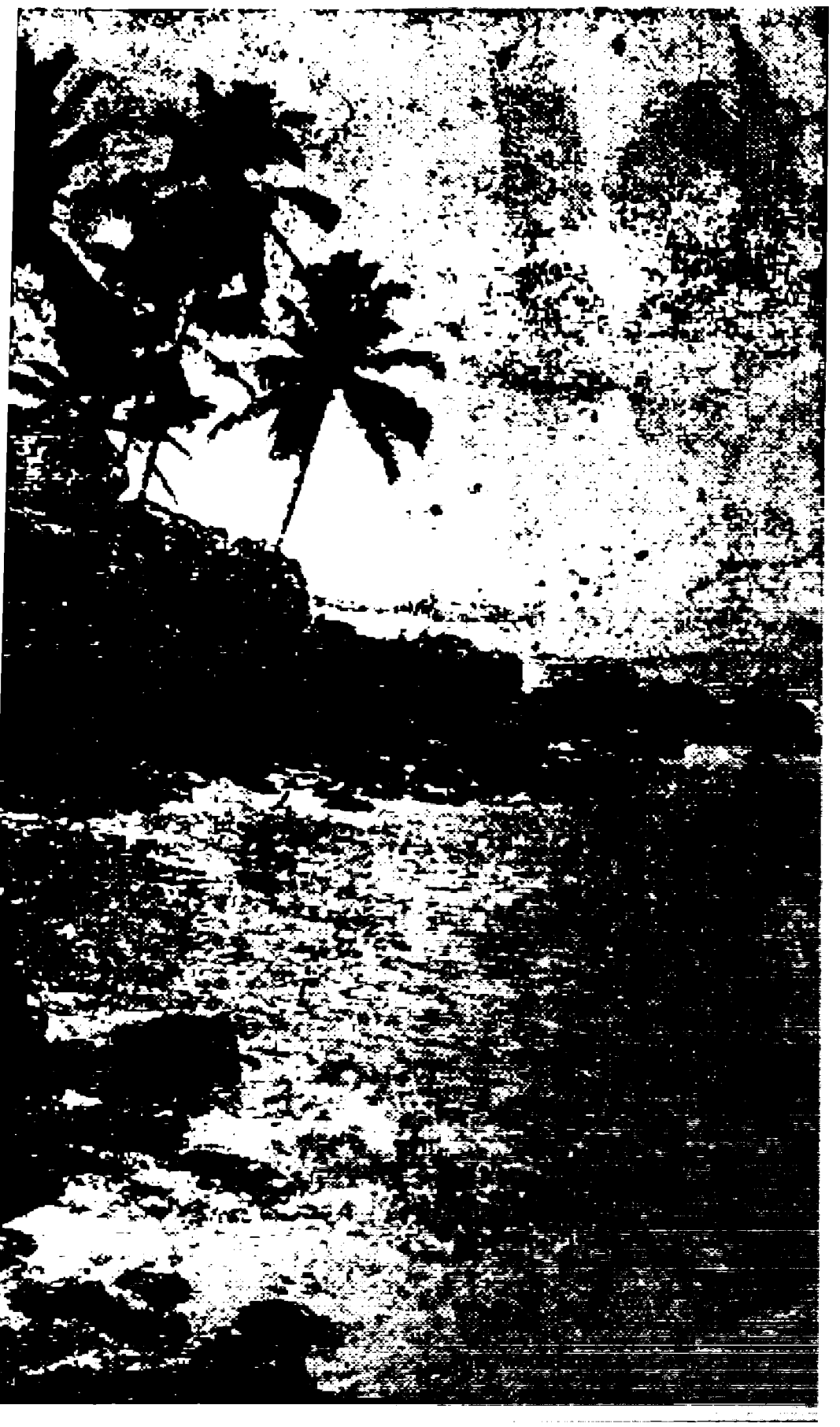

তাঁর মন চলে যায় দূর

নিজেদের স্থিমিত বিশ্বাসকেই তাঁর

বারে প্রবোধ দিতে চান এ কথাটি

ছুটির দিনমান। সন্ধ্যে সেই
। বাড়িঘর স্নানের ঘর। স্ব
এক মিনিট হাঁটাচলা করলেই
র। প্রথম প্রথম তাঁর নিঃশ্বাস বাধ
তো। মনে মনে গজগজ করতো।
আর কথা যায়। আজকাল এই
র চেয়ে ভালো কিছু তো আশা
া না। এরই মধ্যে একখানা ঘর
করতে হয়েছে তাঁদের একজন
সরকারী কোয়ার্টারকে। বার
থাকার আছে। অন্তত ভাড়াটা
সরকারী চাকুরে তো অন্তত' এই
ঘর আগে পরিবারের পুরুষজনের
নেকবার শোনা যায়। সেধরনের

হয় প্রাক বিবাহ-অনাকাঙ্ক্ষা
যেন বিয়ের পিঁড়িতে বসলেই
পেয়েছির দেশে পৌঁছে যাওয়া
আশ্চর্য! বহু সম্ভাবনার অনাগ
তাঁতে করুণ হয়ে, কাকিমার ঘর
সবাইকে নিমন্ত্রণ
ওঁরা চলে, এগুলো সেই ঘর
নিষ্ফল হলো কেন? কোন্ কো
তবেই তাকে কিছু
পায়তো, দুঃখের কৈফিয়ত
না কিছু। সাধারণের
জীবনে যেমন হয় তার নয়
চলছে না। আসলে তাদের
হয়েছে কি তাদের

ডেকে সাউথ খুলতে খুলতে প্রায় অবিকলই কণ্ঠেই বলে, এত ভয় পাও কেন, সবেতেই এত ভয় তোমার? যাকগে চা দাও, খাবার থাকে তো তাও দাও এখুনি বেরুতে হবে। বাকা বিন্যাসে নববাকা বাজনার কি বিরাটের বেশ শুনতে পান তিনি ছেলের কণ্ঠে। অনিমা কোন কথা না বলে চলে যান রান্নাঘরে পুত্রের বৈকালিক চা জলখাবারের আয়োজন করতে। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র এই রান্নাঘরখানিই যেন তাঁর একান্ত নিজস্ব।

রণেন খেয়ে বেরিয়ে গেছে। আজ তো ভবু ছেলে বাড়ি এসে খেয়ে বেরিয়েছে: কৃতজ্ঞচিত্তে ভাবেন অনিমা। রণেন অনিমার একমাত্র জীবিত সন্তান। ওর পরের এক ভাই ও বোন দুজনেই মৃত। অনিমা আজও শোক করেন মৃত পুত্র কন্যার জন্য। তবু একটা স্বস্তি, তারা তো বারে বারে আর তাঁকে আঘাত দিতে পারবে না। প্রতিদিন তাকে আর তাদেরও পথের দিকে তাকিয়ে ভয় পেতে হবে না কিংবা বিলম্ব হলে বা রাত গভীর হলে বুকের ভেতরটা হিম হয়ে যাবে না। সেই পুত্র ও কন্যা এখন ঈশ্বরের কোলে চিরনিদ্রায় শান্তিতে রয়েছে। শুধু দেবদূতের মতো কচি মুখ দুখানি ফটো-গ্রাফারের ছবিতে ধরা রয়েছে তাঁর শোবার ঘরের দেওয়ালে। থাকবেও সেই ছবি সেখানে। তিনি দেখবেন সেই ছবি প্রতাহ যতদিন না তাঁর চোখের জ্যোতি নিভে যায়।

কিন্তু অনিমা তাঁর একমাত্র জীবিত সন্তানকে বুঝতে পারেন না। পুত্র তাঁর মায়ের চরিত্র পায় নি। মাতুলের ধারাও তাকে নরাপাং মাতুলবম করে তোলে নি। কারুর সঙ্গেই তার মিল নেই। একটু যেন স্বতন্ত্র আর চাপা স্বভাব ছেলের। রণু কী ভাবে, কোথায় যায় একথা তিনি জানেন না। এটা অবশ্য তাঁর দুঃখের কারণ নয়: স্বামীর বন্ধুবান্ধবের সবার সঙ্গেও তাঁর পরিচয় নেই। তাতে তিনি কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ নন, বরং রেহাই পাবার আনন্দে কিছুটা স্বস্তি পান তিনি। কিন্তু রণেনের যে সব-টাই অচেনা তাঁর কাছে। সে গম্ভীর, স্বল্প-ভাষী, তবু এ যেন কোনো সংজ্ঞায় সঙ্গেই মেলে না। পাশের বাড়ির বখাটে ছেলেটার মতো সে চেঁচিয়ে মা বাবাকে অশালীন কথাবার্তা বলে না। রণুর কথা স্বল্প ও মৃদু। তবু ও বড় দুর্বোধ্য সব মিলিয়ে। রণুর পিতা ছিলেন অতি সাধারণ মানুষ: অষ্টাদশী অনিমা নিয়তির অমোঘ নিয়মে একদা সাতাশ বছরের অতি মামুলী এক যুবকের সঙ্গে উদ্বাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। স্বল্পশিক্ষিত নধর গড়ন যুবক তাঁকে জনাদর করে নি বিয়ের প্রথম কয়েক বছর। বরং নতুন পাওয়া খেলনার মতো মোটামুটি সমাদর তিনি পেয়েছেন সাদাসিধে স্বামীটির কাছে। তিনি তখন সিনেমা থিয়েটারেও নিয়ে গেছেন স্ত্রীকে। বৎসরান্তে ফ্যাসন উপযোগী শাড়িটাও পেয়েছেন। প্রথম প্রথম। আর তিনি অতি সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে, তা এতেই সন্তুষ্ট থেকেছেন তিনি।

প্রথম সন্তানকে ঘিরে দুই সংসারেই সুখী পুরুষ খুশী হয়েছেন এবং কি একটা যোগসূত্র অনুভব করেছেন নিজেদের মধ্যে শিশুটিকে কেন্দ্র করে। কিন্তু তারপর! কত বছর কেটে গেছে। অনিমা তাঁর ঘর সংসার, সন্তান শোক নিয়ে সংসারের একপাশে রয়েছেন। অন্যদিকে রয়েছেন কিছুটা বয়েজাড়া সংসারটা স্বামী ভদ্রলোক, তাঁর অফিস এবং বন্ধু-বান্ধব নিয়ে।

রাত মন্দ হয় নি। সেই কখন অনিমা গা ধুয়েছেন, চুল বেঁধেছেন। রাত্রের রান্নাও শেষ হয়ে গেছে। খাদ্যরসিক স্বামী— জল-খাবার খেয়ে আড্ডায় বেরিয়েছেন। ঘরের কথা সাপেক্ষ খাদ্য, সযত্নরচিত লবার কথা রাত দশটা না বাজলে তাঁর মনে পড়বে না। রণেনের তো খোঁজই রাত হয়। বাবার মতো খাদ্যের প্রতি আসক্তি নেই তার,—ক্ষুধা নিবারণের জন্য খাদ্য, রসনার জন্য নয় রণেন তাই বিশ্বাস করে। এখন তাই অনিমারও অবশ্য অবস্থা। পাশের বাড়ির বৌটি এসেছিলেন সন্ধ্যায়। তিনিও প্রতি বুধবার সাধু গোবিন্দ আশ্রমে যাওয়া শুরু করেছেন বললেন। গলির শেষ প্রান্তে ফিকে গোলাপী রঙের তেতলা বাড়ির নন্দ-বাবুর স্ত্রীও এসেছিলেন। এইমাত্র গেলেন। ওঁরা সবাই নাকি প্রতি বুধবার গোবিন্দ আশ্রমে যাচ্ছেন। অনিমাও অবশ্য এক বুধ-বার গিয়েছিলেন। সাদা কাপড়, সাদা ফুল, সাদা দেওয়াল, ধূপ ধুনোর সুখ গন্ধ, সম্মিলিত কণ্ঠে পবিত্র ধর্ম সংগীত, সব মিলিয়ে শান্তি আছে বইকি সেখানে। অনিমার তাই মনে হয়েছে।

এবার কর্তার বাড়ি ফেরার সময় হয়ে এলো। অনিমার এখন রান্নাঘরে যাবার সময়। নরম করে মুখা আটার লেচি কেটে গরম গরম রুটি করে টিফিন বাটিতে ঢাকা দিয়ে রাখেন। গৃহকর্তা গরম রুটি ছাড়া মুখে তুলতে পারেন না। অনিমা তাই অনলসভাবে স্বামী দেবতাকে তুষ্ট করার জন্য সর্বদা চেষ্টা করেন।

অনিমা রণেনের খাবার ঢাকা দিয়ে গরম জলের ডেকচির ওপরে বসিয়ে রাখেন। রণু কত রাত্রে আসবে কে জানে। ততক্ষণ তাকে জেগে বসে থাকতেই হবে। রণেনের বাবার সকাল হলেই বিস্তর কাজ। পরিপাটি করে বাজার করা, তৃপ্তি সহকারে আহার ও তারপরে অফিসে যাওয়া। কাজেই তিনি এখন গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। অনিমাকে কে কেন বলেছিলো, রণু বোধহয় রাজনীতি করে। তাদের যুগে তিনি স্বদেশী করা দেখেছেন, শুনেছেন। তাঁর পিসতুতো দাদাই তো ছিলেন ঘোর স্বদেশী। কিন্তু সে যুগ আর এ যুগে তো অনেক পার্থক্য। ছোট্ট রণুর কচি মুখখানা মনে পড়ে। ঘুমে নিভে এক মিনিট দেরী হলে ছেলের সে কি কান্না। এখন সেই রণেনই এত চুপচাপ।

রণু এলো অবশেষে। এবার সে খাবে, তারপর শোবে। কালও রণেনের দেরী হবে, তার পরদিনও হবে। তারপর থেকে অবশ্য রাতগুলিও ক্রমাগত দেরী হবে, অনিমা জানে।

সেই রণুই নিজে থেকে যাচ্ছে আগে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছে যায় অনিমা। এবার থেকে তিনিও নিয়মিত যোগদান আশ্রমে যাবেন। পাশের বাড়ির নন্দবাবুর বিধবা বৌঠান ও মেলতলার মাসিমার দলে যোগ দেবেন অনিমা। তার পরে, তারই মত আরো অনেক অনেক সকল মহিলা জুটে যোগ দেবেন গোবিন্দ আশ্রমে অথবা ঐ রকম অন্য কোথাও। এবং এইভাবেই তাঁরা পরের জীবনটুকু পার করে দেবেন একটা অন্ধ আশ্রয়ে।

এখন ১০৲ টাকা অগ্রিম জমা দিলে গ্রাহক হোন এবং বই পাওয়া সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হোন

সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান

প্রধান সম্পাদক : ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত
সম্পাদক : শ্রীজজনি কর

দীর্ঘ পরিশ্রমসাধ্য বৌথ গবেষণার ফসল। এই চরিতাভিধানে প্রায় সাড়ে তিন হাজার বাঙালীর যাঁদের বাঙলার সংস্কৃতি জগতে কোন না কোন ক্ষেত্রে উল্লেখ্য অবদান আছে, তাঁদের জীবন-চরিত সংগৃহীত হয়েছে, জন্মসূত্রে বাঙালী নন, তাঁদেরও জীবনী সন্নিবিষ্ট হয়েছে। বাঙলা ভাষার চর্চাকারী ছাত্র, শিক্ষক, লেখক, গবেষক, অনুসন্ধিৎসু পাঠক সকলের পক্ষে অপরিহার্য জীবনীকোষ। প্রায় সাড়ে ছ'শ পৃষ্ঠা, লাইনো হরফে ঝরঝরে ছাপা, মজবুত বাঁধাই। দাম ৪০৲ টাকা। ৩০ এপ্রিলের মধ্যে ১০৲ টাকা অগ্রিম জমা দিলে বই নেবার সময় ২৪৲ টাকা দিতে হবে। ৩ মে থেকে প্রকাশিত হবে।

তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ

সম্পাদক : অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য

কথাকোবিদ তারাশঙ্করের সমগ্র ছোট গল্প (প্রায় ২০০) কালানুক্রমিক সাজিয়ে তিন খণ্ডে প্রকাশিত হচ্ছে। ১ম খণ্ড প্রকাশিত, ২য় খণ্ড প্রকাশ আসন্ন। প্রতি খণ্ড ৪০৲ টাকা। অগ্রিম গ্রাহক মূল্য একত্রে ৮০৲ টাকা কিস্তিতে ১০৲ টাকা। যোগাযোগ করুন।

সাহিত্য সংসদ
৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড,
কলিকাতা—৯

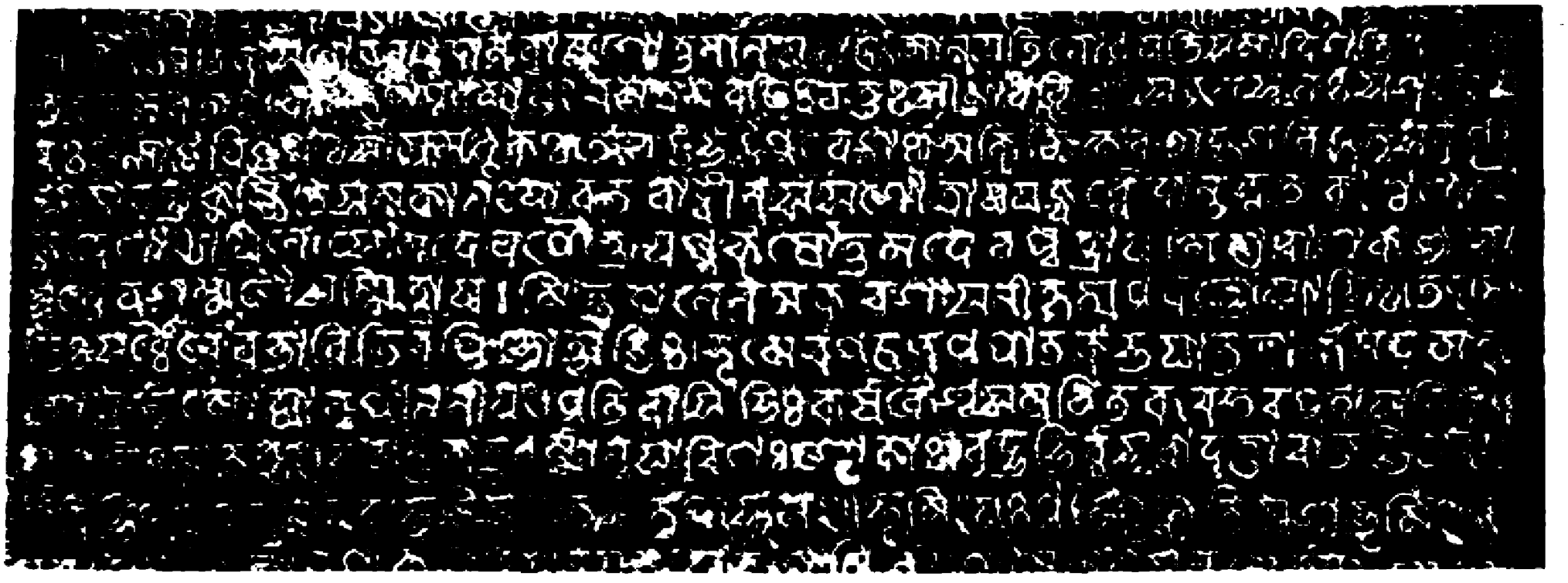

সুন্দরবন ভূখণ্ডের একটি তাম্রশাসন

গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু

প্রথমেই উল্লেখ করা দরকার বঙ্গোপসাগর তীরবর্তী সারা বাংলার দক্ষিণ প্রান্তিক গভীর অরণ্যে আবৃত বিস্তীর্ণ ভূভাগ যা সুন্দরবন নামে বহু শতাব্দী ধরে পরিচিত, সে অবশ্য খুব পুরোনো নয়, ভূভাগটি প্রাচীন এবং সেটি অরণ্যাবৃত হওয়ার আগে বিশেষ উন্নত সমৃদ্ধ জনপদে পূর্ণ ছিল। সে বিষয় ভালভাবেই জানা গেছে উক্ত অঞ্চলের স্থানবিশেষের খনন-উৎখনন ও ঐতিহাসিক নথিপত্রাদি আবিষ্কারের ফলে। বর্তমানে প্রত্নতাত্ত্বিকদের দৃষ্টি সুন্দরবনের প্রতি গভীরভাবে কালের বিষয়ে প্রবন্ধাদিও প্রকাশিত হচ্ছে।

বর্তমান প্রবন্ধে আলোচ্য নৃপতি সেই যুগে—খৃষ্টীয় স্বাদশ শতকে বঙ্গোপসাগর তীরবর্তী খটিকা (বা খাড়ি) নামক ভূখণ্ডের মধ্যে একটি গুরুত্বময় স্থানে স্বাধীনভাবে রাজা শাসন করতেন, সে বিষয় জানা গেছে।

ঐ খটিকা (বা খাড়ি) বিষয় বলছি। এ অঞ্চল ছিল, রাজাদের অধিকারকালে বাংলার সর্বাপেক্ষা বৃহৎ বিভাগ ছিল পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্তি, এই ভুক্তির অন্তর্গত ছিল কয়েকটি বিষয় বা মণ্ডল। বাঙ্গালেশ্বর লক্ষ্মণসেন অথবা বা বঙ্গোপসাগর তীরবর্তী ভূভাগ খটিকা ছিল একটি বিষয় বা মণ্ডল। মহারাজা বিজয় সেন ও মহারাজা লক্ষ্মণ সেনের রাজ শাসনে এই খটিকার উল্লেখ লক্ষ্য করা যায়। খটিকা বা খাড়ি অঞ্চলের কথা কিছু বলা দরকার। কারণ: আলোচ্য নৃপতি সম্পাদিত রাজ শাসনটিতে বর্ণিত স্থানের মধ্যে এই খটিকার উল্লেখ আছে। খটিকা পূর্ব ও পশ্চিম দু ভাগে বিভক্ত ছিল, আলোচ্য নৃপতির রাজ্য ছিল পূর্ব খটিকা।

চব্বিশ পরগণা জেলার দক্ষিণতম অংশে (প্রাচীন খটিকা সীমার মধ্যেও বর্তমান) ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার অন্তর্গত বঙ্গোপসাগরের তীরের কিছু দূরে ও হুগলী নদীর মোহানার কাছে ক্যানিং পর্বে এফলট নামে চিহ্নিত অঞ্চলে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ—হাতিয়াগড়। সুন্দরবন সীমার মধ্যে অবস্থিত।

প্রত্ন সম্পদ-সমৃদ্ধ এই দ্বীপ—এ স্থানে কয়েকটি প্রাচীন স্তূপ ও অট্টালিকা ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে বলে হাসিলের পর। এইরূপ একটি স্তূপ খননকালে মাটির নীচ থেকে পাওয়া গেছে আলোচ্য মহামূল্যবান ও চিত্তাকর্ষক তাম্রশাসনটি, সে কারণে এটি ঐতিহাসিক মহলে ও সরকারী বা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাগজপত্রে হাতিয়াগড় তাম্রশাসন বলেই অভিহিত।

এই তাম্রশাসনটি থেকে মাত্র প্রাচীন যুগের একটি নৃপতির বিষয় নয় — সুন্দরবন ভূখণ্ডের অতীত গৌরবজনক সভ্যতার অলঙ্করময় ইতিহাস জানা যায়। খৃঃ দ্বাদশ শতকের শেষে (মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বকালে) ঐ পূর্বে খটিকার এক সামন্ত রাজা শ্রীভোম্মন পালদেব (বঙ্গাধিপতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে স্বীয় শাসন সীমায় স্বাধীন নৃপতি হন। (আলোচ্য তাম্রশাসনটি ভোম্মন পালদেবের একটি ভূদান ব্যাপারে সম্পাদিত হয়েছিল শক ১১১৮ অব্দে (খৃঃ ১১৯৬ সালে)।

এই তাম্রশাসন থেকে আলোচ্য নৃপতি ও সে সময়ের যে সামান্য ইতিহাস পাওয়া এ পর্যন্ত গেছে সে বিষয় আলোচনা করছি।

মহারাজা লক্ষ্মণ সেনের শেষ বয়সে (তুর্কী আক্রমণের পূর্বেও) তাঁর রাজ্যে আভ্যন্তরিক গোলযোগে অরাজকতা দেখা দেয়। অতিবৃদ্ধ ও ধর্মপরায়ণ রাজার শাসন শক্তি শিথিল হতে থাকে সেই সুযোগে তাঁর অধীন বহু অঞ্চল-শাসক বা সামন্তরাজা ও মাণ্ডলিকরা কেন্দ্রীয় শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বা অগ্রাহ্য করে স্ব স্ব সীমায় স্বাধীন অধিপতি হয়ে যান।

পূর্ব খটিকা বা খাড়ির সামন্তরাজা ভোম্মন পালদেব ছিলেন সেন মহারাজের জনৈক মাণ্ডলিক (বা অঞ্চল-শাসক)—পরে তিনি স্বাধীন সীমার শেষে বিদ্রোহী হন এবং নিজেকে স্বাধীন রাজা বলে ঘোষণা করেন। সে বিষয় স্পষ্টভাবে উল্লেখ পাওয়া যায় আলোচ্য বা হাতি সম্পাদিত তাম্রশাসনটিতে। দেখা যায় আলোচ্য নৃপতি নিজের নামের সঙ্গে মহারাজাধিরাজ উপাধিও ব্যবহার করেছেন।

উক্ত তাম্রশাসন নির্ভর করে ইতিহাসে অজ্ঞাতপ্রায় ডোম্মন পাল পাল রাজবংশীয় কিনা, সে বিষয়ে দু-একজন ঐতিহাসিক আলোচনা করেছেন, কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন—ডোম্মন পাল পাল-রাজবংশীয় হতে পারেন, সেনদের সময় ঐ বংশীয়রা রাজ্যচ্যুত হলে তাঁদের কোন কোন শাখা এলেশে স্থানবিশেষে অজ্ঞাতপ্রায় অবস্থায় থেকে যান। সেই সময় ডোম্মন পালের কোন পূর্বপুরুষ বঙ্গোপসাগর তীরস্থ অঞ্চল বিশেষে আশ্রয় নেন। পরে সেন রাজত্বকালে ঐ বংশের ডোম্মন পালের পিতা সেন রাজাদের অধীন একজন মাণ্ডলিক হন ঐ স্থানের বা খাড়িকা-মণ্ডলের।

এই মাণ্ডলিক পদে ডোম্মনপাল প্রথম জীবনে খাড়ি মণ্ডলের সামন্তরাজ ছিলেন পরে কেন্দ্রীয় শক্তিকে সহায্য করে স্বাধীন মহারাজাধিরাজ হন।

ডোম্মন পালের বিষয়ে ঐতিহাসিকদের ভিন্ন মত আছে। উক্ত তাম্রশাসনের স্থান বিশেষে ডোম্মন পাল বরল সামন্তরাজ বলে উল্লিখিত হয়েছে। এ কারণে ধারণা করা যায় (কোন কোন ঐতিহাসিক অনুমান করেন) ডোম্মন পালবংশ কনৌজের গুর্জর প্রতিহার রাজাদের একটি শাখা, পাল রাজাদের অভ্যুত্থানকালে বাংলাদেশে এসে তৎকালীন রাজধানী থেকে দূরে শাসন শিথিল স্থানে—বঙ্গোপসাগর তীরস্থ অঞ্চল বিশেষে (পূর্ব খাটিকায়) আশ্রয় নেন এবং পরে বঙ্গাধিপতি সেনরাজাদের অনুগত মণ্ডলনায়ক পরে সামন্তরাজ হন এবং আরো পরে (ডোম্মন পালের সময়) উক্ত খাটিকা বা বঙ্গোপসাগর তীরের স্থান বিশেষের অধিপতি—স্বাধীন রাজা হয়ে যান।

আলোচ্য তাম্রশাসনে উল্লেখ আছে—ডোম্মন পালের পূর্বপুরুষরা অযোধ্যা থেকে এসে পূর্ব খাটিকা বা পূর্ব খাড়ি অধিকার করেন। তাম্রশাসনের এ উল্লেখটির মধ্যে ঐ রাজবংশের খাটিকা অধিকার করার বিষয় কোন সন্দেহের অবকাশ নেই, তবে প্রশ্ন আছে অযোধ্যা বিষয়ে। উক্ত অযোধ্যা কি উত্তর ভারতের পুরান প্রসিদ্ধ অযোধ্যা না ঐ অঞ্চলের কোন স্থান বা পল্লী? ডোম্মন পাল বিষয়ে গবেষকদের দু-একজনের মনে এই প্রশ্ন জেগেছে, তাঁরা অনুমান করেন—ডোম্মন পাল খাটিকা বা বঙ্গোপসাগর তীরস্থ কোন স্থানের ব্যক্তি ছিলেন সে স্থানের নাম ছিল 'অযোধ্যা'। সেই সময়ে ঐ অঞ্চলের কৈবর্ত জাতি মহাপরাক্রান্ত ছিলেন, সামন্তরাজ ডোম্মন পাল তাঁদের শক্তিতে পুষ্ট হয়ে কেন্দ্রীয় রাজশক্তিকে অস্বীকার করেন ও স্বাধীন রাজা হন। ডোম্মন পাল কৈবর্ত জাতি-সম্ভূত হতে পারেন।

ডোম্মন পালের সম্বন্ধে বা তাঁর কালে আলোচনের রাষ্ট্রনৈতিক বিষয় এর বেশী এ পর্যন্ত জানা যায় নি, তবে আশা করা যায়—উক্ত তাম্রশাসনটি উপজীব্য রেখে বিভিন্ন দিক থেকে গবেষণা করলে কিছু ইতিহাস বা ইতিহাসের উপকরণ পাওয়া যেতে পারে। সে কারণ তাম্রলিপিটির বিষয় আলোচনা করা বিশেষ দরকার।

তাম্রশাসনের পিছনে আঁকা রেখাচিত্র

পূর্বে বলেছি, তাম্রশাসনটি একটি ভূদান বিষয়ক। এটি শক ১১১৮ অব্দে খৃঃ ১১৯৬ সালে মহারাজাধিরাজ উপাধি ধারী ডোম্মন পাল দেব সম্পাদিত। এর বর্ণনা থেকে জানা যায়—

পরম মহেশ্বর এবং বিষ্ণুভক্ত মহাসামন্ত রাজা শ্রীডোম্মন পালদেব—যিনি গৌড়েশ্বরের বিদ্রোহী হয়ে স্ব শাসন ক্ষেত্রে স্বাধীন নৃপতি হন—মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করেন...তাঁর বংশ অযোধ্যা থেকে পূর্ব খাটিকায় এসে, সে স্থানে রাজা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি জনৈক মহাব্রাহ্মণ (সম্ভবত সভাপণ্ডিত) যিনি যজুর্বেদের কান্বশাখাধ্যায়ী সেই বার্ষিনস গোত্রের সোমদেবের পুত্র এবং পরমযোক্ত দেবের পৌত্র শ্রীবাসুদেব শর্মাকে পূর্ব খাটিকা অন্তর্গত ধামহিত (পাঠান্তরে বামহিত) গ্রাম মিত্র হিসাবে দান করেছেন।

ঐ গ্রাম দানকালে ডোম্মন পাল স্বীয় রাজ্যের রাজ্ঞী ব্রাহ্মণ রাজন রাজন্যক রাজপুত্ররা সপ্ত অমাত্য সকল রাজকর্মচারী রক্ষানুগৃহীত ব্যক্তিরা একপাত্র রাণক দণ্ডনায়ক অশ্ব-রক্ষক চট্ট-ভট্ট এমন কি যে সকল ব্রাহ্মণ মুক্তকামী...সকল ব্যক্তি যাঁরা স্বাবহটকরে (স্বাবহটক সম্ভবত ডোম্মন পালদেবের শাসন কেন্দ্র বা রাজধানী ছিল) উপস্থিত থাকেন—তাঁদের সকলকে বিজ্ঞাপিত করেছেন এবং ঘোষণা করেছেন তাঁর প্রদত্ত জমিটি মিত্রতার দান, এর জন্য কোন কর আদায় করা হবে না। কোন চট্ট-ভট্ট ঐ গ্রামে প্রবেশ করতে পারবে না। তাঁর দান বলবৎ থাকবে যতদিন চন্দ্র সূর্য পৃথিবীর অস্তিত্ব আছে। কেউ যদি এ গ্রাম অধিকার করে তাহলে তিনি ভূমি অপহরণের পাপে লিপ্ত হবেন। এই গ্রামের বাহিরে রত্নত্রয় (বৌদ্ধ) বিহার আছে ও গ্রামটি আম্রবৃক্ষ জলাশয় প্রান্তর প্রভৃতি দ্বারা বেষ্টিত।

তাম্রশাসনটি আয়তনে সাড়ে দশ ইঞ্চি × সাড়ে আট ইঞ্চি। সম্মুখে ভাগে ২২টি ছত্র খোদিত আছে, ভাষা সংস্কৃত কিন্তু তৎকালীন প্রচলিত রীতি অনুসারে বা প্রথায় বাংলা অক্ষরে লিখিত। তাম্র ফলকটির পশ্চাদপটে অপরূপ রেখাচিত্র, তাতে প্রায় স্পষ্টভাবে দেখা যায়—ভগবান বিষ্ণু রূপের উপর ললিতাসনে উপবিষ্ট এবং তাঁর সম্মুখে একটি ভক্ত নতজানু অবস্থায় অবস্থিত, তার বাহুসন্ধির নীচে একটি দণ্ড। দ্বিতীয় চিত্রটি সম্ভবত ভূমিদাতা বিষ্ণুভক্ত ডোম্মন পালের (মতান্তরে গরুড়ের)।

এই চিত্র শ্রীবিষ্ণুর মধ্যমণ্ডল দ্বিতীয়াংশ এবং ভক্তের অর্ধাংশ উৎকীর্ণ, উভয় মুখমণ্ডলের রেখা চঞ্চু এবং সূতীক্ষ্ণ নাসিকা এই রেখাচিত্র থেকে আমাদের দেশের স্বাদেশ শতাব্দীর শিল্পরীতি ও আদর্শের বিষয় উপলব্ধি করা যায়।

আলোচ্য তাম্রশাসনটি মানচিত্র থেকে ঐতিহাসিক ও গবেষকদের নিকট মহামূল্যবান, এর উপর নির্ভর করে অনুসন্ধানে অগ্রসর হলে সেন রাজবংশের শেষ অধ্যায়ের অজ্ঞাতপ্রায় ইতিহাস কিছু আবিষ্কার করা যেতে পারে। অন্য বৈশিষ্ট্যও আছে এই তাম্রশাসনটিতে সেগুলি অবশ্যই উল্লেখযোগ্য।

১। তাম্রশাসনটি দ্বাদশ শতাব্দীতে সম্পাদিত, কিন্তু এতে শকাব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

২। রাজা ভূমিদান করছেন মিত্রতার জন্য।

৩। এটি সম্পাদনকালে দেশবাসী ব্রাহ্মণ, রাজকর্মচারী, রাজন্যবর্গ প্রভৃতিসহ রাজ্ঞীকেও জ্ঞাত করা হয়েছে।

৪। তাম্রশাসনটির অপর পৃষ্ঠে শ্রীবিষ্ণু ও ভক্তের রেখাচিত্র। যা এ পর্যন্ত জ্ঞাত বা আবিষ্কৃত তাম্রপাণ্ডুলিপিগুলির [illegible] গ্রাম [illegible] সম্ভব নয়। [illegible] এ পর্যন্ত

CENTRAL LIBRARY

অংশ শতাব্দীর বা মধ্যযুগের উচ্চাঙ্গ শিল্পিদের সক্ষম মেয়।

৫। এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য তার উপর রূপায় সূক্ষ্ম কলাইয়ের কাজ. এ বিষয়ে তাম্রশাসনটি একেবারে অদ্বিতীয় এবং দ্বাদশ শতকে এদেশে ধাতুশিল্প কত উন্নত ছিল তার পরিচায়ক।

তাম্রশাসনটির অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করছি। তার আগে উল্লেখ করা দরকার এর অনেক স্থান (উপর ও নীচের অংশ) নষ্ট হয়ে গেছে (পাওয়া যায় নি) এবং বহু স্থান অস্পষ্ট, সে কারণ পূর্ণভাবে পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয় নি। সংস্কৃত ভাষায় রচিত হলেও সংস্কৃত ব্যাকরণের বিধান অনুযায়ী সম্ভবস্থলে পরস্পর শব্দের সন্ধি করা হয় নি। তবে বাংলা অক্ষরে প্রাচীন রীতি বা ছন্দায় লিখিত।

পাঠ—

ওঁ স্বস্তি।। পরম-ব্রাহ্মণ্যের সমস্ত-দুষ্কৃতসম্ভার-উদ্ঘোত মহারাজলিক শ্রীশ্রীপাল-দেবস্য-অনুধ্যাতঃ।

মহাসামন্ত — অধিপতি মহারাজ-অঙ্গ রাজ — বিগ্রহ = সামন্ত — ভগবান= নারায়ণ — নিষ্ক্রোধ — কমল-সমাসক্তমনঃ। শ্রীমদ্ভোজন পালদেব : কুশলী। অবোধ্য-বিনষ্ট-পাল-অন্বয় = অপরাজিত - পূর্ব খটিকা=অন্তর্গতি স্বী—

যমদণ্ড চূড়া শ্রীশ্বার-হট্টাকে সম=উপ-গত-অশেষকল্প—রাজগণ্য — রাজপুত্র রাজ্ঞী — সন্ত —অমাত্য যাদব=একা পাত্র— রণক — দণ্ডনায়ক—আরোহক—অশ্বরক্ষক — চট্ট-ভট্ট সেবকাদিন...রাজ পদ—উপজীবীনা।

তস্য — অস্ত ভবতাম। বামহিত্য গ্রামে= সমস্ত রত্ন ত্রয় বহিঃ:

চতুঃসীম=অবিচ্ছিন্নঃ সজলস্থল সংখণ্ডোপ ধঃ সকাট বিটপঃ স=আম্র—মধুকেরঃ।

অ-চট্ট-ভট্ট প্রবেশঃ

অ-কিঞ্চিত-কর গ্রাহ্য পরিহৃত সর্বপীড়ঃ

আচন্দ্র ক্ষিতি সমকালং

যাবৎ বাবদীনাস স গোত্রায় যজুর্বেদ

অন্তর্গত — কাশ্বশাখের

দেশ—অধ্যায়িনে সোমদেব পৌত্রায়

পুরুষোত্তম দেব পুত্রায়—মহারাণক শ্রীবাসুদেব শর্মণে সলিমিত্রায় মিত্র

দাসেন অক্ষর শাসনীকৃতা প্রদত্ত সম্মাতিঃ।

শকাব্দ ১১২৮ বৈশাখ দিনে

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য : আলোচ্য তাম্র-শাসন বর্ণিত খটিকা (বা খাড়ি অঞ্চলের) স্থানের সন্ধান পাওয়া যায়। বর্তমানে তাম্রমণ্ডলেশ্বরের মহকুমার অন্তর্গত একটি নগণ্য মৌজা বা পল্লী জয়নগর-মজিলপুর হতে ১২।১৩ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। কিন্তু আলোচ্য কালে খটিকা বা খাড়ির বিস্তৃতি ছিল বর্তমানের কল্পনাতীত।

আলোচ্য তাম্রশাসনটি রাক্ষসখালি স্বীপে বনহাসিলের কালে একটি ভগ্নস্তূপের ধ্বংসাবশেষ থেকে আবিষ্কৃত হয়। এটি সংগ্রহ করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ চিত্রশালার (অধুনা অবসর-প্রাপ্ত) অধ্যক্ষ শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়, আশুতোষ চিত্রশালায় সুরক্ষিত আছে।

বর্তমানে রাক্ষসখালি স্বীপ দুর্গম নয়—ডায়মণ্ডহারবার বা নামখানা থেকে জলপথে নৌকাযোগে যাওয়া যায়। অরণ্য মুক্ত মনোরম স্থান, এখানে কয়েকটি প্রাচীন স্তূপ ও গাছাদির ধ্বংসাবশেষ দেখা যায় এবং মাটির নীচ থেকে বহু প্রাচীন দ্রব্যাদি পাওয়া গেছে।

ঐ স্থান থেকে প্রাপ্ত একটি প্রাচীন জলপাত্র আমার সংগ্রহে আছে। আলোচ্য অঞ্চলে বর্তমানেও 'ডোম্মন' নাম ব্যবহার করতে দেখা যায়।

পরিশেষে স্বীকার করি — এই প্রবন্ধ রচনাকালে শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ ও প্রখ্যাত গবেষক শ্রীবিনয়চন্দ্র সেন (যুক্তভাবে) লিখিত 'এ ডেটেড কপার-প্লেট ফ্রম সুন্দরবন প্রবন্ধের উপর নির্ভর করেছি।

আলোকচিত্র শ্রীতারাপদ সাঁতরা (বাংলার মন্দির বিষয়ে গবেষক) মহাশয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

সাহিত্যের নেপথ্য প্রসঙ্গে

আপনাদের পত্রিকায় অধুনা প্রবর্তিত সাহিত্যের নেপথ্যে বিভাগটি পুস্তক প্রকাশ জগতের অনেক গোপন তথ্যসম্পদের অনুসন্ধান দিচ্ছে। প্রাচীন প্রকাশক সংস্থার ঐতিহাপূর্ণ ইতিহাসের অধ্যায়গুলিও কম-বয়সি আগ্রহী পাঠকের কাছে লোভনীয় বিষয়। নিত্য নূতন আকর্ষণীয় বিষয় ও বর্তমান বিভাগটি সূচনার জন্য আপনারা আন্তরিক অভিনন্দনার্হ। লেখক বই লেখেন, পাঠক পড়েন। কিন্তু এর মধ্যে প্রকাশকের একটা সেতুবন্ধন রয়েছে; মুদ্রণ সৌন্দর্য শোভন আঙ্গিকের ওপর রচনার উৎকর্ষ নির্ভর করে, লেখক সন্তুষ্ট ও পাঠক তৃপ্তি পায়; বলা বাহুল্য।

বর্তমান রচনাগুলি তথ্যনির্ভর সন্দেহ নেই। কিন্তু সর্বভারতীয় ভাষায় পুস্তক প্রকাশনার পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে অন্যান্য ভারতীয় ভাষা অপেক্ষা বাংলা ভাষায় পুস্তক প্রকাশনার হার নিম্নমুখী। তবে কি বাংলা ভাষার লেখক নেই? না রচনার উৎকর্ষ নেই না পাঠক নেই? না প্রকাশক নেই? পরিসংখ্যানে বাংলা ভাষায় পুস্তক প্রকাশের স্থান উন্নীত করার অবরোধটা কোথায়? প্রতিকারই বা কি? এইরূপ প্রশ্নের উত্তর সংগ্রহ করে তথ্য পুষ্টিবিধানকল্পে যদি সবিনয়ে (সরকার ও প্রকাশক সংস্থার সক্রিয় সহযোগিতায়) সচেষ্ট হওয়া যায় তবে বাংলা সাহিত্যে অনেক নূতন উৎকৃষ্ট গ্রন্থসম্পদের জন্ম হতে পারে না কি?

অমিররঞ্জন দাস

ঘাঁটি গলি । অসানসোল

উর্দু কবি জফর প্রসঙ্গে

২৭শে ফেব্রুয়ারীর অমৃত-এ প্রকাশিত শ্রীসতী গঙ্গোপাধ্যায়ের উর্দু কবি জফর বিশেষবার্ষিকী দীর্ঘ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সময়োপযোগী প্রবন্ধটি পড়ে তৃপ্তি পেলাম। রচনার বিষয়বস্তু ও আঙ্গিক নিঃসন্দেহে বাঙ্গালী লেখক ও পাঠকবর্গকে জফরের জীবন ও কবিতার প্রতি যথেষ্ট উৎসাহী ও অনুসন্ধিৎসু করে তুলবে সন্দেহ নেই। শ্রীগঙ্গোপাধ্যায় জফর এবং বাহাদুর শাহের উর্দু কবিতা সম্পর্কে ইতিপূর্বেও কিছু আলোচনা করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে ১৯৭৪ সালের ২৩শে নভেম্বর অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর মূল্যবান পত্রখানি। যার মুখ্য বিষয় ছিলো যথাযথভাবে বাহাদুর শাহের জন্মবার্ষিকী পালন ও তাঁর অনাবিষ্কৃত কবিতার উদ্ধার ও প্রকাশ। যতদূর মনে হয় সেই আবিষ্কারের কাজে আমরা এখনো সম্পূর্ণ সফলতা লাভ করতে পারিনি।

শ্রীগঙ্গোপাধ্যায়ের লেখাটি সুন্দর এবং বলিষ্ঠ হলেও আকারে খুবই ছোট। প্রবন্ধটি আরো বিস্তৃত এবং তথ্যপূর্ণ হলে অনুসন্ধানী পাঠকদের বেশি সুবিধা হতো সন্দেহ নেই। বর্তমান উর্দু কাব্য সাহিত্যের ধারাবাহিক আলোচনায় জফরের স্থান কোনো মতেই ছোট নয়। উর্দু কবিতা এখন যে স্তরে এসে পৌঁছেচে এবং যে বিস্ময়কর পরিমণ্ডল উর্দু কবিতার বিন্যাসে ধৃত, সেখানে জফরের দান অনস্বীকার্য। হালি, মহম্মদ ইকবাল ইত্যাদি প্রখ্যাত উর্দু কবিরা জফরেরই সার্থক উত্তর সাধক।

কিন্তু দুঃখের বিষয় জফরের প্রতি দেশ-বাসী এখনো যথেষ্ট সচেতন নন। উর্দু-ভাষী ভারতের বিশাল জনসমষ্টি এবং উর্দু কবি ও সাহিত্যিকরাও তাঁর কাব্য ও সাহিত্যের নব নব উন্মেষ পর্যন্ত উন্মোচনের জন্য বিশেষ কিছু করেছেন বলে মনে হয় না। যদি কোথাও তাঁর কবিতা আবিষ্কৃত হওয়ার জন্য এখনো পড়ে থাকে তাহলে উপযুক্ত গবেষণার মাধ্যমে তার উদ্ধার সম্ভব বলে আমরা মনে করি।

রেঙ্গুনে চরম অবহেলার মধ্যে অনাদৃত বাহাদুর শাহের পবিত্র সমাধিটি যাতে যথোচিত মর্যাদা সহকারে রক্ষিত হয়, তার জন্যও ভারতের প্রতিটি ভাষার কবি, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের যথেষ্ট কিছু করার আছে।

বিমলকান্তি ভট্টাচার্য, আদরা, পুরুলিয়া।

অঙ্গনা

যে জীবনে ধোঁয়া নেই

ধোঁয়া নেই। ধোঁয়াহীন জীবন। একি বিলাসী জীবনের কল্পনা? তাও বা কেমন করে হয়। ধোঁয়া তাড়াবার বিরাট পরিকল্পনা চলছে দেশে দেশে? ধোঁয়াহীন দেশ —যেখানে কারখানার চিমনির ধোঁয়ায় আকাশের ধূসর রং খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকবে না, যেখানে গাড়ীর ধোঁয়ায় আচ্ছন্নতে পথ অন্ধকার হয়ে যাবে না, যেখানে দৈনন্দিন আহার প্রস্তুতের জন্য শ্বাসরোধকারী উনুনের ধোঁয়ায় ঘর-বাড়ি কালি কালি হয়ে যাবে না।

উনিশ শতকের প্রারম্ভে শুরু হয়েছিল শিল্প বিপ্লব। এই বিপ্লবের ফলে সারা বিশ্ব যন্ত্রযুগে ঢুকলো। আবিষ্কার হল ছোট আকার ও বড় আকারের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি। মানুষ শিখলো কয়লা তেল ও গ্যাসের ব্যবহার। বাষ্পচালিত ইঞ্জিনের শক্তির দ্বারা চলতে লাগলো রেলগাড়ী ও বড় বড় জাহাজ। মানুষ হল উন্নসিত। সারা পৃথিবীর লোকই পরস্পর পরস্পরকে প্রতিবেশীরূপে জানতে শিখলো। বিজ্ঞানের জয়যাত্রা দুর্বার। সভ্যতার বিকাশ হল দ্রুতগতিতে।

বাষ্পের ব্যবহার প্রচলিত হল ইওরোপ মহাদেশ : ও আমেরিকায়। আফ্রিকা ও এশিয়ার দেশগুলিতে এর ব্যবহার কিছুটা পরে শুরু হল। এই দুই দেশে রেললাইন পাতা, রেলগাড়ী নির্মাণ ও অন্যান্য শিল্পের প্রসারের জন্য সাহায্য করতে এগিয়ে এল ইওরোপের শক্তিশালী দেশগুলি। আফ্রিকা ও এশিয়ার দেশগুলিতে প্রতিষ্ঠিত হল বহু কলকারখানা: প্রচুর শিল্পদ্রব্য এই কারখানাগুলি থেকে উৎপন্ন হতে লাগলো। দেশের অর্থনীতি শিল্পকেন্দ্রিক হয়ে উঠলো। কলকারখানার দূষিত ধোঁয়া ও আবর্জনা দিনের পর দিন বায়ুমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়ে মানুষের স্বাস্থ্যহানি ঘটাতে লাগলো। শিল্পপতিরা কলকারখানা থেকে নির্গত ধোঁয়া ও গ্যাসের দূষিত উপকরন সম্বন্ধে বুঝতে পারলেও শিল্প বিস্তারের তাগিদে চুপ করে রইল। বৈজ্ঞানিকেরা বিকল্প ব্যবস্থা অবলম্বন না করতে পেরে ভবিষ্যৎ-গণনায় নিজে ভবিষ্যৎ হইলেন। অথচ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ক্রমাগত বিষাক্ত হতে লাগলো। বৈদ্যুতিক শক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ধোঁয়া উদ্গিরণ কোন কোন ক্ষেত্রে কিছুটা কমে গেলেও বায়ুমণ্ডল বিষাক্ত করার কাজ কিন্তু কমলো না।

ভারতের বিভিন্ন নদনদী কারখানার দূষিত জলে নালীরূপে রোগের বীজাণুর সৃষ্টি করছে। গঙ্গার জল নানারূপ তৈল শোধনাগারের দূষিত জলে কলুষিত হচ্ছে। কলকাতা ও অন্যান্য শিল্পনগরীর চতুর্দিকে কলকারখানার ধোঁয়া বাতাস সমানে দূষিত করে চলছে। এই কলকারখানাগুলির অধিকাংশ চুল্লী নীচুতে। অনেক জায়গায় ধোঁয়া নিষ্কমনের পাইপেরও সুব্যবস্থা নেই। এ-ছাড়া দৈনন্দিন ব্যবহারের উনুনগুলিও স্বাস্থ্যসম্মতভাবে জ্বালানো ও নিভানো হয় না।

বহু বছর আগে থেকেই হয় কাঠ পুড়িয়ে নয়তো কয়লার উনুনে গৃহিণীদের রান্না করতে হয়। রান্নাঘর নিয়েই একসময় ছিল মেয়েদের জীবন। যে জীবন মোটেই স্বাস্থ্যসম্মত নয়। বর্তমান হয়তো মেয়েরা চাকরী-বাকরীর জন্য রান্নাঘরে আর দীর্ঘসময় কাটান না। তবুও রান্নাঘর বন্ধ দিয়ে তাদের জীবন নয়। অথচ আমাদের দেশের রান্নাঘরগুলি যেমন তেমন একটা খুপরি হলেই হল। পুরো রান্না সারতে তাকে বার চারেক অন্ততঃ জলন্ত উনুনে কয়লা দিতে হয়। একটা বাড়ীতে একসঙ্গে তিন-চারটেও উনুন জ্বলে। সেই উনুনের ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ে গোটা বাড়ীতে। ধোঁয়া বেরিয়ে যাবার তেমন কোন ব্যবস্থা নেই। ফলে সেই ধোঁয়ার অধিকাংশ সময় স্বাস্থ্যহানি ঘটে বাড়ীর মেয়ে ও শিশুদের স্বাস্থ্যের সঙ্গে সঙ্গে ধোঁয়া বাতাসকে করছে দূষিত।

বেশ বছরকয়েক আগে বেরুলো ইনডেন ও অন্যান্য গ্যাসচুল্লী। রান্না করতে আর কয়লার ব্যবহার না করলেও চললো। তাছাড়া সেই মুখের গ্যাসের চুল্লীতে রান্নাটও সারা যায় অনেক তাড়াতাড়ি তাই গৃহিণীরা গ্যাসের চুল্লী নিতে বেশ তৎপর হয়ে উঠলো। কিন্তু কয়েক বছর যেতে না যেতেই গ্যাসের আকাল পড়লো। যাঁরা আগেভাগেই চুল্লী নিয়েছেন তারা—এখনও অনেক ঝামেলা-ঝকিকিতে গ্যাস হয়তো পাচ্ছেন আর যারা নতুন গ্যাস চুল্লী নিতে চাইছেন তাদের হয়রানির একশেষ। গ্যাস চুল্লী পাবে কিনা নিশ্চিত কোন ভরসা নেই।

ধোঁয়া এড়াবার জন্য ছোট পরিবারের কোন কোন মহিলা সপ্তাহের অধিকাংশ দিন বাইরে সারতেন হিটারে। গৃহিণীদের এমনি পোড়া কপাল সাবস্টাকশন হিটারও উঠে গেল, খরচ বেড়ে গেল অনেক। শুধু তাই নয় গ্যাস সিলিন্ডারের দামও দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে। আবার তাদের কপালে উনুন জ্বালিয়ে ধোঁয়ার মধ্যে ফিরে আসতে হল। খরচ কুলিয়ে ওঠা খুব সোজা কথা নয়।

বেরুলো কেরোসিন কয়লা-ঘুঁটের ধোঁয়া নেই বললেই চলে। সেও আবার কতদিনের জন্য? নেই নেই। বাজার থেকে কেরোসিন উধাও। যও মিলছে নিয়মিত উনুনে ধরাবার মত নয়। গৃহিনীদের ফিরতে হল কয়লার জীবনে। কয়লার ধোঁয়ার বাতাস ক্রমাগত বিষাক্ত হচ্ছে। ধোঁয়া তাড়াবার প্রচেষ্টার কয়লার ধোঁয়াকে যেন কোনরকমেই এড়ানো যাচ্ছে না। যত সহজে নির্মল করত আরও অন্যান্য জিনিসের মত ধোঁয়া সরাতেই হবে। তাই অধুনিক বাড়ীগুলিতে রান্নাঘরের ধোঁয়া বেরুবার সুব্যবস্থা করা হচ্ছে। সেসঙ্গে গ্যারেজের ধোঁয়াও কিভাবে কমানো যায় তার কথা ভাবা হচ্ছে।

স্বাস্থ্য সমীক্ষায় দেখা গেছে কলকাতা ও বোম্বে ও অন্যান্য শিল্পনগরী ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার ধোঁয়ার প্রাদুর্ভাবে কানসার রোগ লোকে ক্রমাগত আক্রান্ত হচ্ছে। এই শিল্পাঞ্চলগুলিকে আমরা তো ফেলতে পারবো না ঠিকই কিন্তু সে অঞ্চলের ধোঁয়া নিষ্কাশন ও স্বাস্থ্যহানির প্রতিরোধক ব্যবস্থা নেওয়ার যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। এ ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্মোক নুইসেন্স অবজারভেটরি ও স্মোক নুইসেন্স ডাইরেকটোরেট-এর অধীনে একটি বিভাগের সৃষ্টি করে সতর্কদৃষ্টি রাখার ব্যবস্থা করেছে। এদের সাথে আমাদের সহযোগিতার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। ব্যক্তিগতভাবে ধোঁয়ার স্বাস্থ্যহানিকারক নিষেধাজ্ঞাগুলি সবাইকে মেনে চলা দরকার। বিশেষজ্ঞরা দেখেছেন যে কলকাতার টালীগঞ্জ, যাদবপুর, দমদম, কাশীপুর ও হাওড়া জেলার বেলুড় ও গঙ্গার পার্শ্ববর্তী হীরাঝিলের পর্যন্ত এলাকাগুলি ধোঁয়ায় কলুষিত। তাই এইসব জায়গার বাতাস অত্যন্ত বিষাক্ত।

ধোঁয়ার চিন্তা শুধু ভারতেই নয় পৃথিবীর শিল্পোন্নত অঞ্চলের দেশেই অল্পবিস্তর এই একই আশংকা দেখা দিচ্ছে। সুইডেনের জনগণ শুধু দূষিত ধোঁয়া থেকেই সচেতন নয় দেশের মোটর যানের ধোঁয়াও যাতে আবহাওয়া কলুষিত না করতে পারে সেদিকেও তাদের দৃষ্টির শেষ নেই। তাই প্রতিবছর কয়েক লক্ষ মোটর ও ট্রাকের সমুদ্রের জলে নিক্ষেপ করা হয়। আমেরিকার কোন কোন শিল্পোন্নত শহরে স্কুলের ছাত্রদের নাকে যাতে দূষিত হাওয়া প্রবেশ না করে সেজন্য অনেকসময় স্কুলগুলির ছুটি করে দেওয়া হয়। আমেরিকার পরেই এই ব্যাপারে বিশেষ সচেতন হচ্ছে জাপান। অন্যান্য দেশেও এই ব্যাপারে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা উন্নত দেশগুলির কাছে আবেদন করে চলেছে যে তারা যেন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলকে যাতে নির্মল ও রোগমুক্ত রাখা যায় সেজন্য ঐকাবদ্ধ ও সচেষ্ট হয়।

অঞ্জলি চৌধুরী

আজও মনে পড়ে

পোর্ট অব স্পেন, ১৭ই মার্চ—সমাচার : সুভাষ গুপ্তে ও পলি উমরিগড় একদা দীর্ঘদিন একই দলে ক্রিকেট খেলেছেন। ১৯৫৩ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরকারী প্রথম ভারতীয় দলের সদস্য ছিলেন দুজনেই। ১১৯২তে দুজনে ভাড়াভাড়ি গুপ্তে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ চলে আসায়। সে অনেক দিন আগেকার কথা। তারপর দুজনে আজ আবার মুখোমুখি সাক্ষাৎকার ঘটায় ওঁরা পরস্পরকে পাঁচ জানিয়ে জড়িয়ে ধরেন। দুজনেই যেন স্মৃতির আবেগে কাঁপছিলেন।

সাগর পার থেকে ভেসে আসা ওপারের ওই এক টুকরো খবর পড়তে পড়তে আবেগের হঠাৎ ঢেউটা গলার মধ্যে হঠাৎই স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। এক যুগেরও বেশী, কোথায় যেন আত্মগোপন করে বসে ছিলেন সুভাষ গুপ্তে। হঠাৎ সেদিন দেখা দিয়ে পুরোনো দিনের অনেক কথা নতুন করে মনে করিয়ে দিলেন।

সুভাষ গুপ্তে আজ অবশ্যই ওয়েস্ট ইণ্ডিজের স্থায়ী বাসিন্দা। বয়স (৬৬) হয়েছে। খেলাধুলো ছেড়েই দিয়েছেন। শরীরের দিক থেকে সম্পূর্ণ সুস্থও নন। এখন ওয়েস্টইণ্ডিজেরই নাগরিক। ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান মহিলার সঙ্গে পঞ্চাশের বেশি সংসার পেতেছেন যে সেখানেই। কিন্তু মনের সব নাড়ীর যোগ এখনও ছিঁড়ে ফেলতে পারেন নি। তাই পোর্ট অব স্পেনে ভারতীয় ক্রিকেটাররা উপস্থিত হওয়া মাত্র তিনি ছুটে এসেছেন তাঁদের স্বাগত জানাতে।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরকারী বর্তমান ভারতীয় দলের অনেক সদস্যই গুপ্তেকে চেনেন। কিন্তু ম্যানেজার পলি উমরিগড় তাঁর পুরোনো দোস্ত। ক্রিকেট মাঠের সাথী-দিনের সাথীজনী। তাঁরা দল থেকে ভারতীয় দল পর্যন্ত, সবত্রই গুপ্তে ও উমরিগড় একসঙ্গে ছিলেন ছায়ার মত অঙ্গাঙ্গী। সে সব কত দিন আগেকার কথা। তবু বুকের ভেতরটা অসুবিধে হয় না হঠাৎ পাওয়া সুযোগে দুজনকে নেওয়াই স্মৃতিচারণের হিড়িং অবকাশ দিয়েছিল।

বিশ্বাস করতে ইচ্ছে যে গুপ্তে ও উমরিগড় সেই মাঝখানে সংবহারে ঋণিকের জন্যে পুরোনো কালে ফিরে গিয়েছিলেন। যেহেতু পুরোনোর প্রতি মানুষের ভালবাসার কোন খাদ নেই। আর কাজের ফাঁকে স্মৃতিচারণের মুহূর্তগুলি যদি তাঁদের কপালে না জুটতো তাহলেও বলা যে সেইন ফিরে তাকাতে আমাদের বাধাটা কোথায়? এক দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় ভীষণের গোলাপী লনে যাঁদের আজ দুপুর মিলন ঘটালো অন্যথা বরং তাঁদেরই জীবন মধ্যাহ্নের আলোয় আর একবার দেখে নেওয়ার চেষ্টা করি।

পলি উমরিগড় ও সুভাষ গুপ্তে পঞ্চাশের দশকে ছিলেন ভারতীয় ক্রিকেটের অবিচ্ছেদ্য মূলধন। বাঁটায়ে উমরিগড়ের পাশে মানানসই হয়ে দাঁড়াবার মত যোগ্যতা সেকালে যদিও বা কেউ দেখিয়ে থাকেন বোলার হিসেবে গুপ্তের জুড়ি কিন্তু কেউ ছিলেন না। বহুক্ষেত্রে দলের স্বার্থে তিনি জলে জলে মূল্য পালন করে গেছেন। উমরিগড় বান তুলেছেন গুপ্তে বিপক্ষের বান করেছেন। বিপক্ষের আক্রমণ প্রতিরোধে উমরিগড় নিজেকে ঘিরে চক্রব্যূহ সৃষ্টি রচনা করেছেন বহুবার গুপ্তেও তাল মিলিয়ে বিপক্ষের প্রতিরোধ ভেঙে তাঁদের ইনিংস ধস নামিয়ে দিয়েছেন। একজন মূলতঃ ব্যাটসম্যান অন্যজন আক্রমণের অগ্রে বোলার। জুয়ের কাজ দুজনে ভিন্নধর্মী হলেও দলের স্বার্থে পরিপ্রেক্ষিতে একজন ছিলেন অন্যজনের পরিপূরক।

যখনে ওঁরা যখন একসঙ্গে খেলতেন তখন বিষয়টি কেউ নজরে আনেন নি। কিন্তু ইতিহাসের পুরোনো অধ্যায় গুটড়াতে আজ এই আশ্চর্য বিষয় আবিষ্কার করেছি যে

সুভাষ গুপ্তে

টেস্ট ক্রিকেটের যে কোন ব্যাটসম্যান হিসেবে উমরিগড় সফল, ঠিক সেই মুহূর্তে গুপ্তেও বোলার হিসেবে রীতিমত কার্যকর। আর ব্যর্থতার বদনা যখন ধেয়ে এসেছে তখন যেন দুজনকেই ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। সাফল্য ও ব্যর্থতার এই সব বাহুনী মনে করলে গুপ্তে ও উমরিগড়ের খেলোয়াড় জীবনের এক আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। দুজনের মধ্যে এমন মিল যে কেন ছিল তেবে তার কূল পাওয়া কঠিন।

কোথায় এবং কি যে মিল ছিল দুজনার তা বোঝাতে অজস্র দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যায়। যথা ১৯৫৩-তে পোর্ট অব স্পেন প্রথম টেস্টে উমরিগড় রেই না ১৩০ করলেন, অমনি গুপ্তে খেলেন সাত-সাতটি উইকেট। সেবার তৃতীয় টেস্টে উমরিগড়ের রান হলো ৬১ ও ৬৮, আর গুপ্তের ঘরে জমা পড়লো ছটি উইকেট। পঞ্চম টেস্টে আবার উমরিগড়ের সেঞ্চুরীর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে গুপ্তে এক ইনিংসে পাঁচটি উইকেট সংগ্রহ করে নিলেন। পরের বছর ঢাকায় প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসে গুপ্তে যেমন একটির বেশি উইকেট পাননি, তেমনি উমরিগড়ও রান করতে পারেননি ৩২-এর বেশি। ভাওয়ালপুরেও একই কাণ্ড, উমরিগড়ের ২০ রান আর গুপ্তের নমস্কার একটি উইকেট। লাহোরে কিন্তু পরিস্থিতি গেল বদলে। সেই গুপ্তে খেলেন এক ইনিংসে পাঁচ উইকেট, অমনি উমরিগড়ের রান লাফিয়ে উঠলো ৭৮ এ কোঠায়। পেশোয়ারেও তাই, গুপ্তের পাঁচ উইকেট আর উমরিগড়ের সেঞ্চুরী। করাচীতে এসে দুজনে আবার বিপক্ষের মুখোমুখি —দু ইনিংস মিলিয়ে গুপ্তের সংগ্রহ মাত্র একটি। আর উমরিগড়ের রান উভয় ইনিংসের যোগফলে তিন।

১৯৫৫-তে হায়দরাবাদ প্রথম টেস্টে উমরিগড় ডাবল সেঞ্চুরী করলেই গুপ্তে নিউজিলাণ্ডের সাতজনকে আউট করে দেন। সে-বছরই নয়াদিল্লীতে উমরিগড় (১৮) আর গুপ্তে (১টি উইকেট), দুজনেই গেলেন হারিয়ে। পঞ্চম টেস্ট উপলক্ষে

বঙ্গশ্রী
হাওড়া
৪১/১, জি, টি, রোড, হাওড়া
• বেনারসী
• জেড • সিল্ক
• তাঁত • মিল
• প্রোমাক
• সার্টিং • সুটিং
ও চিট কাপড়

মাদ্রাজে উঠলেন ভেঙ্গসরকার—উমরিগড় রান করলেন ৭৯, আর গুপ্তে পেলেন ম্যাচে নটি উইকেট। ১৯৫৬-তে সফরকারী অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে দুজনের ভূমিকা অনুরূপ। দুজনেই বড় একটা সুবিধে করতে পারেননি। শুধু যে ম্যাচে উমরিগড় করেছিলেন ৭৮, সেই ম্যাচেই গুপ্তে পান তিনটি উইকেট।

পরের পরিসংখ্যান আরও মজাদার। মরশুমে ১৯৫৮-৫৯ প্রথম টেস্টে গুপ্তের উইকেট ৪ ও ২, উমরিগড়ের রান ৫৫ ও ৫৬, দ্বিতীয় টেস্টে গুপ্তের ১টি উইকেট, উমরিগড়ের রান ৪৪ ও ২, চতুর্থ টেস্টে গুপ্তের উইকেট ১ ও ৪, উমরিগড়ের রান ৪ ও ২৯। ১৯৫৯-তে প্রথম তিনটি টেস্টে দুজনেই সামগ্রিক হিসাবে ব্যর্থ হওয়ার পর চতুর্থ টেস্ট উপলক্ষে ম্যাঞ্চেস্টারে এসে নিজেদের মূল্যবৃদ্ধি ধরলেন। এবার গুপ্তে পেলেন ছটি উইকেট আর উমরিগড় রান করলেন একটি সেঞ্চুরী সমেত ১২০।

এক এক করে আরও অনেক দৃষ্টান্ত রাখা যায়। কিন্তু এ-প্রসঙ্গকে আর দীর্ঘায়িত করার দরকারই বা কি। শুধু বলি যে সুভাষ গুপ্তে ও পলি উমরিগড় বোলার ও ব্যাটসম্যান ছিলেন পরস্পরের পরিপূরক। এবং এই দুটি প্রতিভার সমন্বয়ে ভারতীয় ক্রিকেটে যে সংগীত বেজেছিল, তা ইতিহাস-স্বীকৃত তথ্য।

আর এক ঐতিহাসিক তথ্য এই যে আমাদের দেশে লেগ স্পিন বোলার হিসেবে সুভাষ গুপ্তেই হলেন সর্বকালের নির্বাচনে সর্বাধিক। সর্বকালের সেরা ভারতীয় দল গড়তে চাইলে সুভাষ গুপ্তেকে অস্বীকার করার কোনো উপায়ই নেই। আগের আমলের আমীর এলাহী, সি এস নাইডু সিদ্ধে বা পরের বেদীর চন্দ্রশেখর—সবাই ছিলেন লেগ-স্পিনার। কিন্তু গুপ্তের সঙ্গে তাঁরা কেউই তুলনীয় নন। চন্দ্রশেখর ছিলেন প্রকৃতির দুস্বপ্নালী। হঠাৎ হঠাৎ তিনি এমন কিছু করে বসতে পারেন যার তুলনা মেলা ভার। তবু চন্দ্রশেখর গুপ্তের মতো বিশ্বস্ত নন এবং ধারাবাহিক সাফল্যের পরিচয়ও চন্দ্রশেখর গুপ্তের নাগালও পৌঁছতে পারবেন না।

গুপ্তের বল করতেন কেতাবী ঢংয়ে লেংথ, ফ্লাইট, লাইন ও স্পিন ছিল তাঁর সম্বল। একজন লেগ স্পিন বোলারের যা কিছু থাকা দরকার, গুপ্তের আয়ত্তে ছিল তা সবই। কবজী ঘুরিয়ে হাতের তালুর পেছন দিক ব্যাটসম্যানের দিকে রেখে অথচ বলটিকে তালুতে লুকিয়ে রেখে তিনি বল করতেন। লেগ স্পিন, গুগলি ও টপ স্পিন, সবেতেই তিনি ছিলেন সিদ্ধকর্ম। তাঁর গুগলি ও টপ স্পিন চিনে নেওয়া ছিল ব্যাটসম্যানদের পক্ষে অসাধ্যসাধন। আর টপ স্পিনের গতি মাটি ছোঁয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বেড়ে যেতো। এক কথায় গুপ্তে প্রতিটি বলে ব্যাটসম্যানদের মস্তিষ্কের পরীক্ষা নিতেন। যাঁরাই তাঁর বিরুদ্ধে খেলেছেন, তাঁরাই একবাক্যে গুপ্তের বোলিংয়ের উচ্চমানের উচ্চশ্রেণী অকাতর সার্টিফিকেট উপঢৌকন করেছেন। সর্বসম্মত রায়ে পঞ্চাশের দশকের বেশির ভাগ সময়ে গুপ্তেই ছিলেন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ লেগ স্পিন বোলার—১৯৫৩ থেকে ষ্টিভ ডেলোর পূর্ব পর্যন্ত প্রায় পরবর্তীকাল পর্যন্ত গুপ্তের সমকক্ষ লেগ স্পিনার ক্রিকেট দুনিয়ায় আর কেউই ছিলেন না।

সুভাষ গুপ্তে টেস্ট খেলেছেন ৩৬টি উইকেট পেয়েছেন ১৪৯, গড় ২১-৫৪ রানে এক-একটি উইকেট। তাঁর কাজ ভারতে তৈরী পিচেই খেলা ছোট দেশ। কাজেই পিচ থেকে বাড়তি সহায়তা পাওয়ার কোনো প্রশ্নই তোলা যায় না। হয়তো আরও কয়েকটি টেস্ট খেলার সুযোগে গুপ্তে নিজের সংগ্রহকে আরও পরিণত করতে পারতেন। কিন্তু শেষ দিকে ভারতীয় ক্রিকেট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁর বনিবনা হোত না। তাই গুপ্তেকে কিছুং অকালেই খেলা থেকে সরে দাঁড়াতে হয়। প্রশাসন তাঁকে একবার শাস্তিমূলক ব্যবস্থাও আওতাতেও রেখে দিয়েছিলেন।

টেস্ট ক্রিকেটে সুভাষ গুপ্তে দাঁড়ি বোলারের কতো নম্বর যে নিজের হাতে গড়ে রেখেছেন তার হিসেব রাখাই কঠিন। তবু দু একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করার লোভ সামলাতে পারছি না।

১৯৫৮-৫৯ মরশুমে হার্ভে সোবার্স কানহাই, বুচার, সলোমনকে নিয়ে গড়া দুর্ধর্ষ ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রথম ইনিংস বোম্বাইয়ের লাল-বাঁধানো পিচে মাত্র ২২২-এ খতম হয়ে গিয়েছিল। গুপ্তে সেই ইনিংসে নজনকে আউট করেন ১০২ রানের বিনিময়ে। সিম বোলার রঞ্জনে নতুন বলে গিবসকে বোল্ড আউট না করলে সেদিন গুপ্তেই হয়তো এক ইনিংসে দশটি উইকেট পাওয়ার সূত্রে টেস্ট ক্রিকেটে জিম লেকারের সর্বকালীন বিশ্ব রেকর্ড স্পর্শ করতে পারতেন।

টেস্ট ক্রিকেটের এক ইনিংসে সাতটি করে উইকেট তিনি পেয়েছেন আরও বার দুয়েক। প্রথমবার ১৯৫৩ সালে পোর্ট অব স্পেনে। তাঁর শিকার হয়েছিলেন বিখ্যাত ফটন মেয়ার, ওয়াল্ক ওরেল, এভারটন উইকস নেয়ারেভো প্রমুখেরা। আর দ্বিতীয়বার ১৯৫৫-তে হায়দরাবাদে নিউজিল্যাণ্ডের বিপক্ষে। সেবার তাঁর বোলিংয়ের গড় ছিল ১২৮ রানে ৭। এছাড়া অন্ততঃ এক ডজন বার গুপ্তে টেস্টের এক ইনিংসে পাঁচটি করে উইকেট পেয়েছেন।

টেস্ট ম্যাচের বাইরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটেও তাঁর কীর্তি অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। সফরকারী এস জে ও সি-র বিরুদ্ধে এক ইনিংসে ৯২ রানে ৮ ও ১৭ রানে ছটি উইকেট পাওয়ার কথা অনেকেই মনে রাখতে পারে। আর ১৯৫৪ সালে বোম্বাই সফরকারী পাকিস্থানী সাভিসেস ভাওয়ালপুরের বিরুদ্ধে তাঁর কীর্তি তো অবিস্মরণীয়ই। সেবার সেই ম্যাচের প্রথম ইনিংসে গুপ্তে মাত্র ৭৮ রানে আটটি উইকেট পেয়েছিলেন।

বিদেশের মাটিতে সুভাষ গুপ্তে তাঁর কাজে সরকারী ও বেসরকারী টেস্ট পর্যায়ে প্রায় প্রতিবারই ভারতীয় বোলারদের মধ্যে সবচাইতে উইকেট পেয়েছেন। ১৯৫৩-তে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সিরিজে তিনি পান ২৭টি উইকেট (গড় ২১-৫৭), ১৯৫৩-৫৪ মরশুমে এম সি সি-র বিরুদ্ধে ২৭টি (গড় ২৫-০৩), ১৯৫৪ সালে পাকিস্থানে গিয়ে ২৪টি (২২-৬৪), ১৯৫৫-৫৬ মরশুমে স্বদেশে নিউজিল্যাণ্ডের বিপক্ষে ৩৪টি (১৯-৩৭), ১৯৫৮-৫৯ মরশুমে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে ২২টি এবং ১৯৫৯-তে ১৭টি। সমকালীন সব ভারতীয় বোলারকে ডিঙিয়েই গুপ্তে সিঁড়ি বেয়ে প্রায় প্রতিবারই সাফল্যের শিখরে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন।

বহুর কুড়ের বাঙ্গালার এবং রঞ্জিক্ষানের প্রতিনিধিত্ব করা ছাড়া গুপ্তে সারাজীবনই খেলেছেন বোম্বাইয়ের পক্ষে, একটা ভাল একটি দলকে জিতিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা ধরতেন বলেই ইংলণ্ডের লীগ ক্রিকেটে গুপ্তের যথেষ্ট আদর কদর ছিল। পেশাদার হিসেবেই তিনি সে-দেশের ল্যাংকাশায়ার লীগে রিসটনের পক্ষে (১৯৫৬-৫৭), সেণ্ট্রাল ল্যাংকাশায়ার লীগে হেউডের পক্ষে (১৯৫৭-৫৮) ও নর্দার্ন লীগে ল্যাংকাস্টারের পক্ষে (১৯৬০-৬১) খেলেছেন। তাছাড়া ১৯৬১-৬২-তে ব্যাঙ্কসের তত্ত্বাবধানে সম্মিলিত কমনওয়েলথ নামে যে দলটি বিদেশ সফর করে সুভাষ গুপ্তে ছিলেন সেই দলের বিশিষ্ট সদস্য।

গুপ্তের সময় বিশ্ব বার দুই এক দেশের দেশ-বিদেশ পরিক্রমণের সুযোগ তাঁর হয়নি। হলো পরে। বহর কয়েক পর কলমালে গুপ্তে নির্দ্বিধায় সেই সুযোগ নিজের ঠাঁই করে নিতেন, সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহই থাকতে পারে না।

অজয় বসু

রিডাকশন সেল
শাড়ী • ধুতি • শোয়াক • বেডসিট • তোয়ালে • কাটপিস
৭৩, জি, টি, রোড (সাউথ)
হাওড়া • ফোন: ৬৭-৫৩২৫
রঞ্জনী

খেলাধুলা

দর্শক

অল-ইংল্যান্ড ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা

১৯৭৬ সালের অল-ইংল্যান্ড ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতার পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনালে ইন্দোনেশিয়ার তুখ্যাত খেলোয়াড় লিয়েম সুই কিং-কে হারিয়ে মোট ৮বার সিঙ্গলস খেতাব জয়লাভের সুবাদে সর্বাধিকবার পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব জয়ের রেকর্ড করেছেন। এখানে উল্লেখ্য গত ৯ বছরে (১৯৬৮-৭৬) তুখ্যাত হার্তোনো ইপর্যুপরি ৯বার ফাইনালে খেলে ইপর্যুপরি ৭বার (১৯৬৮-৭৪) এবং মোট ৮বার পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব জয়ী হয়েছেন। প্রতিযোগিতার ইতিহাসে তুখ্যাত হার্তোনো এই দুটি বিষয়ে রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন (১) সব থেকে কম বয়সে সিঙ্গলস খেতাব জয় (১৯৬৮ সালে ১৮ বছর বয়সে) (২) ইপর্যুপরি সর্বাধিকবার ফাইনালে খেলা (৯বার) (৩) ইপর্যুপরি সর্বাধিকবার সিঙ্গলস খেতাব জয় (৭বার—১৯৬৮-৭৪) (৪) মোট সর্বাধিকবার সিঙ্গলস [illegible] ফাইনালে ইন্দোনেশিয়ার তুখ্যাত হার্তোনো ইপর্যুপরি ৭বার সিঙ্গলস খেতাব জয়ের পরিসংখ্যান [illegible] ইপর্যুপরি ১বার সিঙ্গলস খেতাব জয়ের সমান সমান অর্জন করেছেন।

এবছরের প্রতিযোগিতার ফাইনালে তুখ্যাত ফাইনালে ৩নং বাছাই লিয়েম সুই কিং (ইন্দোনেশিয়া) ১৮-১৭ ও ১৫-২ পয়েন্টে ৭নং বাছাই [illegible] (ডেনমার্ক) চ্যাম্পিয়ান হয়ে [illegible] সুই-কিং প্রতিপক্ষ ৭নং বাছাই [illegible] ১৫-১৩ ও ১৫-১ পয়েন্টে।

জাপান এ বছরের প্রতিযোগিতা বর্জন করায় ইংল্যান্ড সহজেই পুরুষদের সিঙ্গলস ও ডাবলস খেতাব জয়ী হয়। বহু বছর জাপান পুরুষদের সিঙ্গলস ও ডাবলস খেতাব জিতেছিল। ইংল্যান্ডের গিলিয়ান গিলকস ইপর্যুপরি সিঙ্গলস ফাইনালে [illegible] ফাইনালে খেলে নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন। ইংল্যান্ডের গিলিয়ান গিলকস ও তার সতীর্থ হেলেন ট্রোকেটনলের সহযোগিতায় ডাবলস খেতাব জয় করেন।

ইংল্যান্ডের শ্রীমতী গিলিয়ান গিলকস ১৯৭৬ সালের অসরে সিঙ্গলস ডাবলস এবং মিকসড ডাবলস খেতাব জয়ের সুবাদে দুর্লভ ট্রিমুকুট সম্মান লাভ করেছেন। অল-ইংল্যান্ড ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতার ইতিহাসে দীর্ঘ ৫০ বছর পর একজন খেলোয়াড়কে একই বছরের খেলার অসরে তিনটি খেতাব জয় করতে দেখা গেল। শ্রীমতী গিলিয়ান গিলকসের ঠিক আগে শেষ এই ট্রিমুকুট সম্মান লাভ করেছিলেন ডেনমার্কের টনি আইয় ১৯৫২ সালে।

ফাইনাল খেলা

পুরুষদের সিঙ্গলস : ১নং বাছাই তুখ্যাত হার্তোনো (ইন্দোনেশিয়া) ১৫-৭ ও ১৫-৩ পয়েন্টে ৩নং বাছাই লিয়েম সুই কিং-কে (ইন্দোনেশিয়া) পরাজিত করেন।

মেয়েদের সিঙ্গলস : ১নং বাছাই শ্রীমতী গিলিয়ান গিলকস (ইংল্যান্ড) ১১-০ ও ১১-০ পয়েন্টে শ্রীমতী মার্গারেট লকউড (ইংল্যান্ড) পরাজিত করেন।

মেয়েদের ডাবলস : শ্রীমতী গিলিয়ান গিলকস এবং সিউ হেলেটনল (ইংল্যান্ড) ১৫-১০ ও ১৫-১০ পয়েন্টে শ্রীমতী মার্গারেট লকউড এবং কুমারী নোরা গার্ডনারকে (ইংল্যান্ড) পরাজিত করেন।

মিকসড ডাবলস : শ্রীমতী গিলিয়ান গিলকস এবং ডেরেক টালবোট (ইংল্যান্ড) ১৫-১ ও ১৫-১১ পয়েন্টে কুমারী নোরা গার্ডনার এবং মাইক টেডলোটকে (ইংল্যান্ড) পরাজিত করেন।

টমাস কাপ

আন্তর্জাতিক টমাস কাপ ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতার ইউরোপীয় অঞ্চল ফাইনালে [illegible] ৫-৪ খেলায় সুইডেনকে হারিয়ে [illegible] পুরুষদের ইন্টার-জোন ফাইনালে [illegible] ইংল্যান্ড [illegible] ইন্টার-জোন ফাইনালে উঠেছে। এই নিয়ে ইংল্যান্ড ১০বার ইন্টার-জোন ফাইনালে উঠল।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বাইচ প্রতিযোগিতা

রবীন্দ্র সরোবরে আয়োজিত তৃতীয় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বাইচ প্রতিযোগিতায় লেক ক্লাব ৩৫ পয়েন্ট সংগ্রহের সূত্রে দলগত চ্যাম্পিয়ান হয়েছে এবং গত বছরের চ্যাম্পিয়ান ক্যালকাটা রোয়িং ক্লাব মাত্র এক পয়েন্ট কম পেয়ে দ্বিতীয় হয়েছে। তৃতীয় স্থান পেয়েছে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি (২১ পয়েন্ট)।

সিনিয়র বিভাগের তিনটি ইভেন্টেই ক্যালকাটা রোয়িং ক্লাব জয়ী হয়। অপরদিকে লেক ক্লাব পাঁচটি ইভেন্টের ফাইনালে উঠে একটিতে জয়ী হয় এবং বাকি চারটিতে রানার্স-আপ হয়।

সিনিয়ার বিভাগ : ক্যালকাটা রোয়িং ক্লাব চার দাঁড়ি, দুই দাঁড়ি এবং এক দাঁড়িতে জয়ী হয়।

জুনিয়র বিভাগ : চার দাঁড়িতে বিশ্ববিদ্যালয় রোয়িং বি, দুই দাঁড়িতে বিশ্ববিদ্যালয় রোয়িং বি এবং এক দাঁড়িতে মেদগল রোয়িং ক্লাব জয়ী হয়।

নবিস চার দাঁড়িতে লেক ক্লাব এবং এক দাঁড়িতে এন সি সি জয়ী হয়।

জাতীয় ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতা

কোচিনে আয়োজিত ২৮তম জাতীয় ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতায় রেলওয়ে ১১৫ পয়েন্ট সংগ্রহ করে দলগত চ্যাম্পিয়ান হয়েছে এবং সার্ভিসেস ১০০ পয়েন্টে দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে। তিনদিনের এই প্রতিযোগিতায় ৩০০জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেছিলেন। এবারের আসরে ৬টি নতুন জাতীয় রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়—জার্কে ৩টি এবং মোট লিফটে ৩টি।

জাতীয় রেকর্ড

বহুভীওয়েট : জার্নেল সিং মালী (পাঞ্জাব)
নতুন রেকর্ড : জার্ক ১৭২-৫ কেজি এবং স্নাচ ১৪৭.৫ কেজি।
ব্যান্টামওয়েট : এস ভেলাইস্বামী (রেলওয়ে)
নতুন রেকর্ড : স্নাচ ১৭২-৫ কিলো।
ফেদারওয়েট : কে সালমুরুগানন্দন (তামিলনাড়ু)
নতুন রেকর্ড : জার্ক ১৫১-৫ কেজি
মিডল-হেভীওয়েট : গিয়ান সিং ভিরা (পাঞ্জাব)
নতুন রেকর্ড : জার্ক ১৭৭-৫ কেজি
এবং মোট ১৬৭.৫ কেজি

খেতাব বিজয়ী

মাছি : অনিল মনুজা (রেলওয়ে)
পালক : এস ভেলাইস্বামী (রেলওয়ে)
ফেদার : আর্থার ডিসুজা (কর্নাটক)
লাইট : এম এল খোজা (রেলওয়ে)
লাইট-হেভী : [illegible] (মহারাষ্ট্র)
মিডল : [illegible] (তামিলনাড়ু)
মিডল-হেভী : গিয়ান সিং ভিরা (পাঞ্জাব)
হেভী : জার্নেল সিং মালি (পাঞ্জাব)

শতবর্ষের স্মরণীয়

(পূর্বে প্রকাশিতের পর)

অভিনয় শিক্ষণের জন্য জন্মগত প্রতিভা ছাড়া দৈহিক সম্পদেও শিশিরকুমারের বিধাতা সম্পদশালী করে গড়েছিলেন। সুঠাম দেহ আর সুললিত উদাত্ত কণ্ঠ ছিল অভিনয়-প্রতিভা বিকাশের উপযুক্ত ক্ষেত্র।

ছাত্রজীবনে গভীর স্পৃহার তাড়নায় শিশিরকুমারের অস্থিরতা যেমন ছিল তেমনি ছিল না নিয়মমাফিক পড়াশুনোর মানসিক স্থিরতা। তাই সমবয়সীদের কাছে পাণ্ডিত্যে শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হলেও, পরীক্ষার কষ্টিপাথরে তাদের অনেকের সঙ্গেই প্রতিযোগিতায় হার স্বীকার করতে হয়। অধ্যাপনা জগতে প্রবেশ করেন নিতান্ত আর্থিক প্রয়োজনে—পরিবার প্রতিপালনের দায়িত্বে। যেমন পিতার ইচ্ছায় এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর কিছুদিন আইন ব্যবসায়ী হবার জন্য তাঁকে তখনকার প্রখ্যাত আইনজীবী দাশরথী সান্যালের কাছে শিক্ষানবিশীও করতে হয়েছিল।

অধ্যাপক জীবনে প্রবেশ করে অধ্যাপনা-বৃত্তির সাধারণ নিয়মপদ্ধতি মত তিনি চলতে পারেননি, অর্থাৎ নির্দিষ্ট পাঠ্য-তালিকার মধ্যে ছাত্রজীবনে নিজেকেও যেমন আবদ্ধ রাখতে পারেননি, তেমনি তাঁর ছাত্রদেরও সেই পথ-পরিক্রমার উপযোগী করে তোলার দিকে ছিলেন বিরোধী। ফলে একটা অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রতিনিয়ত তাঁকে ভাড়িয়ে নিয়ে বেড়াতো।

১৯০৮ থেকে ১৯২১—এই ত্রয়োদশ বর্ষের মধ্যেই অর্থাৎ ছাত্র ও অধ্যাপক জীবনে অলৌকিক অভিনয়-প্রতিভার অধিকারীরূপে তিনি খ্যাত হয়ে ওঠেন পেশাদার বা অপেশাদার—উভয় অভিনয়-ক্ষেত্রেই শিশিরকুমারের অভিনয় প্রতিভা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পেশাদার রঙ্গশালাও যেন পুরোতনের জীর্ণতাকে ঝেড়ে ফেলে নতুনের আগমন প্রতীক্ষায় ছিল। সেই প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে অধ্যাপনা বৃত্তি পরিত্যাগ করে ১৯২১ খৃষ্টাব্দে শিশিরকুমার এসে দাঁড়ালেন পেশাদারি রঙ্গমঞ্চের আলোকমালার সামনে।

এখানেই নটশেখর নরেশচন্দ্র মিত্রের সঙ্গে শিশিরকুমারের যোগাযোগ হয়। নবীনচন্দ্র সেনের 'কুরুক্ষেত্র' অভিনয়ে শিশিরকুমার অভিমন্যু আর নটশেখর আত্মপ্রকাশ করেন দুর্যোধন চরিত্রে। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে মুক্তিদেব নাটকে শিশিরকুমার নামভূমিকা অভিনয় করেন। গিরিশচন্দ্রের জনা নাটকে শিশিরকুমার প্রবীর চরিত্রে অভিনয় করেন। রায়বাহাদুর রাধাকৃষ্ণ ব্যানার্জি ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রে, কাস্তি মুখোপাধ্যায় অভিনয় করেন জনা চরিত্রে। অভিনীত হলো 'চন্দ্রগুপ্ত'। চাণক্য চরিত্রে সাড়া জাগালেন শিশিরকুমার। দানীবাবু আর শিশিরকুমারের তুলনা শুরু হয় এই অভিনয় থেকে। নরেশচন্দ্র মিত্রের অভিনয়ও প্রশংসিত হয়। রাধাকৃষ্ণ ব্যানার্জি—নন্দ, শ্রীশ চক্রবর্তী—চন্দ্রকেতু, ইন্দুভূষিত সরকার—চন্দ্রগুপ্ত বিনোদন রায়—ছায়া প্রভৃতি অন্যান্য অভিনেতাই ছিলেন দ্বিতীয় চরিত্রে।

পাণ্ডব গৌরব, রঘুবীর, হরিশ্চন্দ্র প্রভৃতি নাটকে অভিনয়েও শিশিরকুমারের খ্যাতি ব্যাপ্তি লাভ করে। সাতকড়ির আমন্ত্রণকে অভ্যর্থনা করার জন্য ইনস্টিটিউটে গিরিশ-চন্দ্রের আলোক নাটকে শিশিরকুমার অলোক আর মাখন চরিত্র অভিনয় করেন নরেশ মিত্র। বেঙ্গলীর পাতায় শিশিরকুমার অভিনয় আর কিরীটি চরিত্রে অভিনয় করেন নরেশ মিত্র। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিক থেকে তাদের পক্ষ থেকে স্টার রঙ্গমঞ্চে শিশির-কুমার পাণ্ডবের অজ্ঞাত বাস নাটকে ভীম ও নরেশ ব্রাহ্মণ চরিত্রে স্মরণীয় অভিনয় চিত্তের পরিচয় দেন। ওল্ড ক্লাবে তখন থিয়েটারেই যাতায়াত করতেন, অমি মটু মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য ভারতী গোষ্ঠীর প্রেমেন্দ্র-কুমার রায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, মাখন-লাল সেন প্রভৃতির সঙ্গে এই সময়ই হৃদ্যতা গড়ে ওঠে। রবীন্দ্রমোহন রায় বিদ্যাসাগরে শিশিরকুমারের সহপাঠী ছিলেন। এই তিন ছাত্রটিকে অশোক নাটকে শিশিরকুমারই সুযোগ দেন এবং পরবর্তীকালে দীর্ঘদিন তাঁর সম্প্রদায়ে অভিনয় করেন। দলনেত্রী-হিসেবে তাঁ: হরেন মুখোপাধ্যায় শিশিরকুমারের চাইতে ছিলেন।

কলকাতার অপেশাদার অভিনয় জগতে শিশিরকুমার সুপ্রতিষ্ঠিত। আজ যেমন গ্রুপ থিয়েটারগুলো নাট্যান্দোলনের দিগদর্শী রূপে স্বীকৃত তখন কলকাতায় ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটকে কেন্দ্র করে সেখানে নাট্যান্দোলনের দিগদর্শী ছিলেন ছাত্র সম্প্রদায়। এদের অভিনয় আসরে উপস্থিত থাকতেন দেশের বেশীর ভাগ বিদগ্ধজন। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের বার্ষিকী উৎসব ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে টাউন হলে অনুষ্ঠিত হয়—আর সভাদের আপ্যায়িত করার জন্য ইনস্টিটিউটে আয়োজন করা হয়েছিল শিশিরকুমারের অধিনায়কত্বে চন্দ্রগুপ্ত নাটকের অভিনয়। উপস্থিত সুধীজন শিশিরকুমারের 'চাণক্য' দেখে বিস্ময়-বিমুগ্ধ অভিমত ব্যক্ত করেন। নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল শিশিরকুমারের চাণক্যের অভিনয়ে মুগ্ধ হয়ে নান্দীভূমিতে করেন বলেও রটিত আছে।

ছাত্র জীবনের বাঁধা-ধরা নিয়মমাফিক পড়াশুনোর মধ্যে কোন দিনই শিশিরকুমার নিজেকে বন্দী করে রাখতে পারেন নি—জ্ঞান পিপাসায় অতৃপ্ত মন সমস্ত তুফান তুলে রাখতো। তাঁর জ্ঞানপিপাসা তীক্ষ্ণ ধীশক্তি—কারণসন্ধিৎসা ও রসবোধ সহপাঠি-বন্ধু মহলে ছিল পরম বিস্ময়। সাহিত্য-সমাজের বা যে কোন আলোচনায় তাঁর জ্ঞান-ভাণ্ডারকে তিনি এমন সুকৌশলে প্রতি-পন্ন করতেন যে সহপাঠীরা যেন তাঁর কাছে পরাজয় স্বীকার করেও আনন্দ পেতেন। রবীন্দ্রকাব্যের রসাস্বাদনে যখন বন্ধুদের পরিতৃপ্তি লাভ করতে পারেন নি—শিশিরকুমার তখনই রবীন্দ্রপ্রতিভার পরম ভাষ্যকার রূপে সহপাঠীদের মধ্যে খ্যাতি লাভ করেন। শ্রদ্ধেয় শিক্ষাবিদ ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন শিশিরকুমারের অন্যতম সহপাঠী। বাল্যস্মৃতি পরিক্রমায় শিশিরকুমার সংখ্যায় তাঁর মন্তব্য এ বিষয় প্রণিধানযোগ্য। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখছেন : 'রবীন্দ্রনাথের কাব্য প্রকাশ সেই আমলের প্রথম পঞ্চ-পুরুষদের। আমাদের কৈশোরে রবীন্দ্রনাথ তখনও স্কুল কলেজের ছাত্রদের মাঝে প্রায় অজ্ঞাত ছিলেন। মধুসূদন হেমচন্দ্র নবীন-চন্দ্রই আমাদের নিকট ছিলেন অত্যন্ত সহজ স্বরূপ বিরাজিত। শিশির ঘটনাচক্র-প্রতিভা স্বীকার করিত। কিন্তু তেমনভাবে রবীন্দ্রকাব্যের প্রতি তাহার বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল না। রবীন্দ্র-নাথ যে তাহাদের অপেক্ষা বহু গুণে শ্রেষ্ঠ তাহা ইহাই প্রতিপন্ন করিতে সে মনঃস্থির ছিল। কবির বিচারের যে মানদণ্ড সে উপ-স্থাপিত করিত তাহা হইল আমাদের নিকট একটা সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত। তাহলের একটা সুবিধা—মনের হারাও যেন লঘুত্ব প্রকাশিত। উদ্ধৃত করিয়া সে তাহার কবি-মনের স্পর্শকাতরতাকে ঔদ্ধত্যপূর্ণ ভঙ্গিতে প্রকাশিত করিত আর মনে মনে বিচার আপেক্ষা শ্রোতের এ পুরাকালের উপায় তাহার মনের উপর কাজ করিয়া রবীন্দ্রনাথের কাব্য হইতে চরম আনন্দ করিয়া সে আমাদের রবীন্দ্রকাব্যের সম্ভোগ পথকে বাধা করিত। আমরা হয়ত মনে মনে ইহার প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা করিতাম। কিন্তু অনুপম কণ্ঠস্বরে অনর্গল ঝরিত ভাব ও রসের সঙ্গে প্রকাশ ভঙ্গির সেই ছন্দ সঙ্গীত প্রবাহকে ঠেকাইব কি দিয়া? আবৃত্তির পরবর্তী পদক্ষেপই ত অভিনয়। নটগুরু গিরিশচন্দ্র এক পরবর্তী কালের বিভিন্ন উক্তির সাধকেরা সকল নাট্য-শিক্ষা দিতেন—সর্বপ্রথমে আবৃত্তিতেই তাদের অভ্যস্ত করে নিতেন। শিশিরকুমার নিজেও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। শিশির-কুমারের শিক্ষাদান প্রসঙ্গেই এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো।

ছাত্র জীবনের আবৃত্তি-স্পৃহা ও সফলতা শিশিরকুমারের পরবর্তী জীবনে অভিনয়-

অভিনেতা প্রবেশের প্রস্তুতি বলা চলে। তবে এই প্রস্তুতির জন্য তার নিজস্ব কোন পরিকল্পনা ছিল না। অভিনয় শিল্পশাস্ত্রী নিজ প্রয়োজনে যেমন তত্ত্ব জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিলেন তেমনি অবচেতন নাট্য প্রতিভা শিশিরকুমারের অজ্ঞাতে অবচেতনেই প্রস্তুতিতে হবার তাড়নায় শিশিরকুমারকে অস্থির করে তুলছিল। মাতৃগর্ভ থেকে নিষ্ক্রান্ত হবার সময় কী ভবে কোন পথ নিয়ে শিশু নিষ্ক্রান্ত হবে—তা তার জানা থাকে না; ভূমিষ্ঠ হবার জন্য অস্থিরতাই তাকে পেয়ে বসে এবং উপযুক্ত সময়ে ভূমিষ্ঠ হয়। যে কোন প্রতিভার বিকাশের মধ্যেও প্রকৃতির এই স্বাভাবিক নিয়ম পরিলক্ষিত হয়।

১৯২১। জাতীয় জীবনের স্মরণীয় বছর। দেশবন্ধুর নেতৃত্বে সারা বাংলা অগ্নিগর্ভা। ব্রিটিশ সরকারও বদ্ধপরিকর—যেমন করে হোক যেভাবে হোক এই আগুন নেভাতে হবে।

(২)

চলচ্চিত্র ব্যবসায়ে মাডান কোম্পানী তখন, একচ্ছত্র সম্রাট। তাঁরা ধাটিয়ে ছবি দেখাতে সুরু করে শেষ পর্যন্ত সমগ্র ভারত ব্রহ্মদেশ ও সিংহলে গড়ে তুলেছেন চিত্র সাম্রাজ্য। চিত্র নির্মাণেও সাড়া জাগিয়েছেন। টাউন স্কুলের পেছনে তাঁবু খাটিয়ে ছবি দেখাতে সুরু করে ধীরে ধীরে একই পাকে গড়ে তুলেছেন কলিকাতা (উত্তর) আর বর্ণওয়ালিস (খ্রী) স্থায়ী চিত্রগৃহ। চলচ্চিত্রের সঙ্গে সঙ্গে মাডান কোম্পানী বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের কেন্দ্রস্থান রঙ্গমঞ্চে পার্শী থিয়েটার নামে হিন্দী ও উর্দু নাটকের অভিনয়ের আয়োজনও করেছিলেন। এখানকার শিল্পীরাই নির্বাক চলচ্চিত্রে অংশ গ্রহণ করতে থাকেন। পার্শী থিয়েটারের চমকপ্রদ দৃশ্যাবলী নৃত্যগীত এবং সুন্দরী এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েদের সমাবেশ বাঙ্গালী দর্শকদেরও আকৃষ্ট করেছে। রক্ষণশীল জোসেফরাও ছিলেন মাডান কোম্পানীর সর্বাধ্যক্ষ। তিনি ব্যবসায়বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁর বিচক্ষণতার জন্যই বহু বাঙ্গালী প্রতিভার সমাবেশ ঘটেছিল মাডানের পতাকাতলে। নীতিশ লাহিড়ী প্রিয়নাথ গাঙ্গুলী জ্যোতিষ সরকার জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ছাড়া আরো বহুজনই মাডান কোম্পানীর সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন শিল্পী প্রযোজক ও কর্মী হিসেবে। ভারতের নির্বাক চলচ্চিত্র প্রযোজনার চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠানের বিকাশের পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছিল মাডান কোম্পানী। মাডান কোম্পানী স্থির করলেন বর্ণওয়ালিস থিয়েটারটিকে ভেঙ্গে নাট্যগৃহে রূপান্তরিত করে নিয়মিত বাংলা নাটকের অভিনয়ের আয়োজন করবেন। পার্শী থিয়েটারের নাট্যকর্ম ভালভাবে বোঝেন এমন পরিচালক ও নাট্যকার হিসেবে। তাই কাহিনীর অনুবাদ করলেন সর্ভোত্তমে। অপরাধী কে নাটক নিয়ে সুরু হলো মাডান থিয়েটারের জয়যাত্রা। শিশিরকুমার সকলকে বিস্ময়াভিভূত করে যোগদান করলেন মাডান থিয়েটারে। কিন্তু অপরাধী কে নাটকে তিনি অংশ গ্রহণ করলেন না। তিনি নির্বাচন করলেন ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের আলমগীর। ১৪ মে ১৯২১ খৃষ্টাব্দে অপরাধী কে মঞ্চস্থ হলো।

পেশাদার রঙ্গমঞ্চে সর্বপ্রথম অভিনয় জানালেন শিশিরকুমার আলমগীর নাটকের নামভূমিকায় ১০ ডিসেম্বর ১৯২১ খৃষ্টাব্দে। দেশবন্ধুর নেতৃত্বে স্বাধীনতা আন্দোলনে উত্তেল কলকাতা। সাধারণ রঙ্গমঞ্চে শিশিরকুমারের আত্মপ্রকাশের দিনই ধৃত হলেন দেশবন্ধু সুভাষচন্দ্র যতীন্দ্রনাথ সাদমল মৌলানা আবুল কালাম আজাদ প্রভৃতি। আলমগীরের অন্যান্য চরিত্রে প্রভাবতীকুমারী, কুসুমকুমারী - উজিরুন্নেসা। বসন্তকুমারী—বাঁদীবাঈ। প্রবোধ বসু—রাজসিংহ। সুরেন সে—ভীম সিংহ। নীতিশ পাল—দরালশা। তুলসী বন্দ্যোপাধ্যায়—কামবক্স। গোপাল ভট্টাচার্য—ধর্মসিংহ। নৃপেন বসু— গরীব দাস হাস্যার্ণব অক্ষয় চক্রবর্তী প্রভৃতি আরো অনেকে ছিলেন। অনেকের ধারণা আলমগীর অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা অর্জন করে। কিন্তু তা ঠিক নয়। আলমগীর নাটকের সূক্ষ্ম অভিনয় রসধারা সুধী সমাজকে এক অনাস্বাদিত অভিনয়রসধারায় পরিতৃপ্ত করলেও সাধারণ নাট্যামোদীরা খুব খুশী হতে পারেন না। স্থূল অভিনয় রস-সম্ভোগে অভ্যস্ত মন শিশিরকুমারের সূক্ষ্মতাকে উপলব্ধি করতে পারলেন না। অথচ শিশিরকুমারের মধ্য দিয়ে মোঘল সম্রাট আলমগীর প্রত্যক্ষভাবেই দেখা দিয়েছিলেন বিদগ্ধ নাট্যরসিকদের সামনে। চিরাচরিত সংস্কারে আবদ্ধ রীতি নীতির প্রাচীর ভেঙ্গে নাটকের লক্ষ্মীকে শিশিরকুমার নতুন রূপে রূপায়িত করে তুলে ধরলেন আলমগীরের মধ্য দিয়ে। আলমগীর পরবর্তী কালে জনপ্রিয়তা অর্জন করে সর্বশ্রেণীর দ্বারা অভিনন্দিত হয়।

ক্ষীরোদপ্রসাদের রঘুবীরে শিশিরকুমার রঘুবীর চরিত্রে বিস্মিত করলেন সর্বসাধারণকে। তাঁর কণ্ঠস্বর সুতীব্র দেহ-ভঙ্গীমা অভিনয় বিস্মিত হলেন সকলই। রঘুবীরের অন্যান্য চরিত্রে ছিলেন প্রবোধ বসু—অনন্ত রাও। বসন্তকুমারী— শ্যামলী। নলীনীবালা—পরিমল। পান্না—সখার মা। হীরালাল দত্ত—বেলল প্রভৃতি। মনস্তত্ত্ব মূলে রঙ্গমঞ্চস্থ। রঘুবীরের মধ্যেই অভিনন্দিত হলো। কিন্তু মাডান কোম্পানীর সঙ্গে মতবিরোধ হেতু নিজে শিশির-কুমার মাডানের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। ১৯২২ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে মাডানের কাজ ইস্তফা দেন। মাডানে থাকাকালীন সময়ে তিনি একাদশী এবং কমলেকামিনী পরিচালনা করেন। চলচ্চিত্রের আলোচনার প্রসঙ্গেই এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো।

শিশিরকুমারের সঙ্গে তখনও মাডানের যোগাযোগ হয়নি। ১৯২২ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে মিনার্ভার চন্দ্রগুপ্তের অভিনয় করেন। নটশেখর নরেশচন্দ্র মিত্র চাণক্য আর কাত্যায়ন চরিত্র অভিনয় করেন শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী মুখোপাধ্যায়। এই অভিনয়ও জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

শিশিরকুমার পেশাদার রঙ্গমঞ্চে যোগদানের সঙ্গে সঙ্গে বহু শিক্ষিত যুবকেরা অভিনয়কে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। অভিনয় বৃত্তি তখন পর্যন্ত অন্যে এবং পুরুষ সকলের কেহেই নিন্দনীয় ছিল। শিশিরকুমারের আবির্ভাবে পুরুষদের সামনে থেকে নিন্দার অবরোধ খানিকটা অপসারিত হয়।

পরবর্তীকালে মাডান কোম্পানী তাদের বেঙ্গল লিরেটিকাল কোম্পানী বন্ধ করে দেন। স্টার থিয়েটারের অবস্থা শোচনীয় হয়ে এলে আর্ট থিয়েটার লিঃ নামে যৌথ প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দ নানা দিক দিয়ে বাংলার রঙ্গজগতকে বৈচিত্র্যময় তুলে। প্রযোজনা অভিনয় ও নাটকে এমন কী শিল্পী সমাবেশেও এলো নতুনত্ব। এর মূলে পেশাদার রঙ্গজগতে শিশিরকুমারের যোগদানের কথা অনস্বীকার্য। আর্ট থিয়েটার ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের ৩০ জুন উদ্বোধন দিবসে কর্ণার্জুন। শিশিরকুমারকেও অনুরোধ করা হয়েছিল আর্ট থিয়েটারে যোগদানের। কিন্তু নটবিদ্রোহের জন্যই তাঁর পক্ষে আর্ট থিয়েটারে যোগদান করা সম্ভব হয় না। তিনি নতুন ভাবে আত্মপ্রকাশের প্রস্তুতিতে মেতে উঠলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সীতা নাটক নিয়ে বহুদিনের সময় ৫২ দিনের জন্য কলকাতা ময়দানের প্রদর্শনীতে আস্তানা জমালেন। অভিনয়ে রইলেন শিশিরকুমার— রাম। নরেশকুমার ভাদুড়ী— ভরত, বিশ্বনাথ ভাদুড়ী লক্ষ্মণ। মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য বাল্মিকী। সরীসনাথ রায়—শম্বুক ও সুমুখ। জীবন গাঙ্গুলী—লব। ননী মালাকার—কুশ। প্রভা দেবী—সীতা। তারাকুমারী তুলসী বন্দ্যোপাধ্যায় চৌধুরী স্বামিত্র ও বসু প্রভৃতি আরো অনেকে ছিলেন।

সমগ্র কলকাতার লোক যেন ভেঙ্গে পড়েছিল ময়দানের প্রদর্শনীতে। সকলের মুখে মুখে এক কথা যা দেখলাম বা শুনলাম তা কখনও দেখিনি শুনিনি। অভূতপূর্ব। অবিশ্বাস্য। অবিশ্বাস্য নয় সত্য হয়ে উঠেছে।

(ক্রমশঃ)

—কালীশ মুখোপাধ্যায়

CENTRAL LIBRARY

স্টুডিওর ফ্লোরে অনেক অকল্পনীয় ব্যাপার করা যায়—কিন্তু জাহাজ উল্টে পড়েছে—এটা করা অসম্ভব ব্যাপার। ছবির দৃশ্যটা এমন যে স্টক শট দিয়ে তা ম্যানেজ করা যাবে না। পরিচালক নির্মল দা তখন বললেন—তোমরা সবাই মিলে চেষ্টা করে দেখো কি করা যায়। করতে তো হবেই একটা কিছু। না হলে ছবি দাঁড়াবে কি করে? মাথা ঠাণ্ডা করো ভাই সবাই। জাহাজ ভাঙা করে সমুদ্রে গিয়ে শুটিং করা যাবে না—

শুনে প্রযোজক ভদ্রলোক যারপর নাই উৎসাহের সঙ্গে পরিচালককে সমর্থন করলেন—হ্যাঁ ঠিক বলেছেন—ভারি তো ছবি—তাতে আবার জাহাজ।

ছবির প্রধান সহকারী দিলীপ রায় চৌধুরী মুচকি হেসে বলল—বটেই তো—তাতো আর মেট্রো গোল্ডেন মায়ারের প্রোডাকশন নয়—এ হচ্ছে বাংলা ছবি—তে ঝড়ও চাই জাহাজও চাই—সবই চাই তবে বিনি পয়সায়—

প্রযোজক ভদ্রলোক ক্রুদ্ধ হলেন। —তা মনে না মশাই জাহাজে শুটিং—কে প্রস্তাব করেছে। কিন্তু ঝড় কি আমাদের কিয়ু বে রিক্যুইজিশান দেশের সঙ্গে সঙ্গে জাগাতে এসে হাজির হবে?

একজন মুখ ফোড় সেই আলোচনাচক্রে সব শুনেছিল। সে এবার প্রতিবাদ করে বলল—না স্যার—কথাটা ভুল হলো।

ইংলিশ ছবির প্রোডাকশন হলে ওরা মাঝ দরিয়ায় সত্যিই ঝড় তুলে ছেড়ে দিত। ঝড় তৈরীর কত মেশিন বেরিয়েছে। এই তো কিছুদিন আগে বক হাডসনের একটা ছবি দেখলাম—জাহাজ ঝড়ে পড়ে স্রেফ গোত্তা খাচ্ছে—কি করে সট নিল ওরা? নিশ্চয় মেশিন দিয়ে কাজ সেরেছে—

—মেলা; বক বক করো না। আমি মরছি নিজের জ্বালায় আর উনি এলেন—বক্তব্য হয়ে—প্রযোজক বিরক্ত হয়ে উঠে গেলেন। নির্মলবাবু, যা ডিসিশান নেবেন যাতে ফোন করে জেনে নেবে। আমি চললাম। আমার মাথা গরম হয়ে গেছে—

শেষ পর্যন্ত আর ডিরেক্টর বিমলবাবু ভদ্রলোক এর্নিতেই কম কথা বলেন, তিনি গলা সাফ করে বললেন—আমি একটা কথা বলব?

—বলুন।

দেখুন আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে। আপনারা হাসবেন না—

—আরে না না—বলুন না আপনি—

—আমি যদি সেটের মধ্যে জাহাজ লে-আউট করি?

কিছুক্ষণ কারো মুখে কথা যোগায় না। তারপর নির্মল দে, ছবি কিছুক্ষণ পরিচালক, বললেন—আপনি ফ্লোরের মধ্যে জাহাজ লাগাবেন?

বিমলবাবু প্রত্যুত্তরে ভদ্রভাবে বললেন—মানে যদি ভালো দেখায়—

নির্মলবাবু কিছুক্ষণ চুপচাপ কি যেন ভাবলেন। তারপর প্রশ্ন করলেন—পারবেন আপনি?

—বলে হাতে পারব।

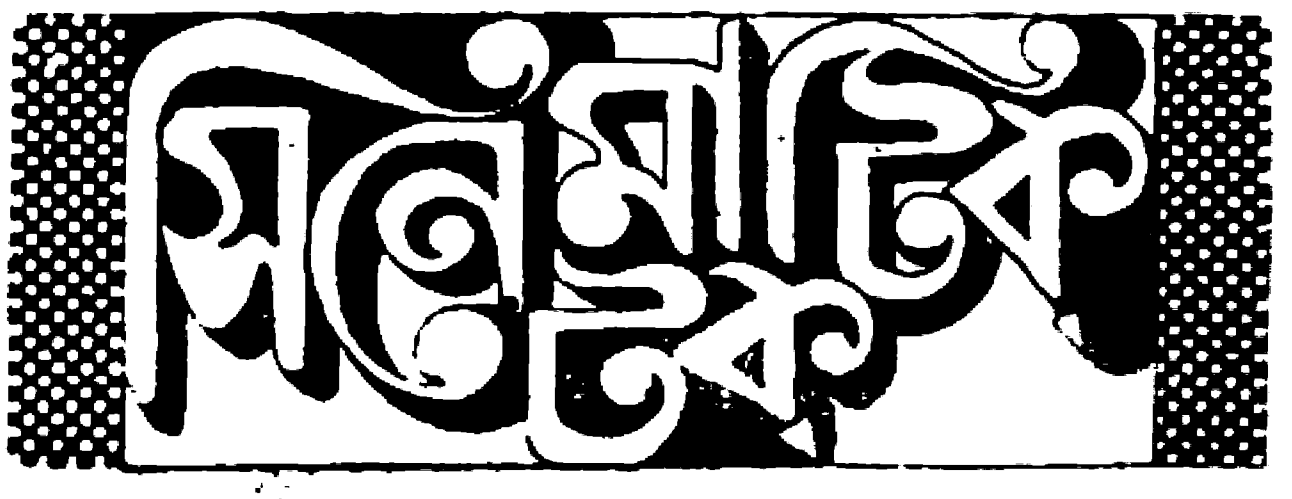

চলচ্চিত্র কলা
ঠু মুখার্জি

-ব্যাক প্রোজেকশান নয় কিন্তু সেটা লাগাতে হবে। দশটা ঝড়ের। এসব করছেন কী ?

া দাদা।

-কেন, তাহলে অপর্ণা একসপোজন কিভাবে করবেন।

বিমলবাবু থেমে থেমে সমস্ত ব্যাপারটা মুখে বোঝালেন। তারপর এক সময় ন—এছাড়া এই পার্ট পার হবার অন্য াস্তা নেই। আমি অনেক চিন্তা করে এটা বলছি—

ালকাটা মুভিটোন স্টুডিওতে টন রাই কাঠ এসে পড়ল। জনখানেক স্টার সেই কাঠ কেটে-কুটে সেট তৈরীর লেগে পড়ল। অন্যান্য স্টুডিওতে রটে যে, কালকাটা মুভিটোনে জাহাজ ছচ্ছে। দলে দলে লোক এসে দেখে লাগল। সবারই বিরাট কৌতূহল—এ-যে সাংঘাতিক কাণ্ড হচ্ছে। এই কি শেষ পর্যন্ত জলে ভাসবে?

বিমলবাবু মৃদুহাস্যে হেসে জবাব দেন—ধাক্ক চেষ্টা করে।

রা প্রতিদিন সকালে সেট তৈরীর সবতে স্টুডিওতে যাই। একদল মিস্ত্রি পরিশ্রম করছে। বিমলবাবু প্রোজি

গায় দাঁড়িয়ে তদারক করে যাচ্ছেন। মধ্যে এই প্রথম ভালো লাগছে। স মুখে একটা সন্তুষ্টি। এই করতে করতে পরশু সেটটা মাথা তুলে দাঁড়াবে স্টুডিও ফ্লোরে। পরিচালক সব বিমলবাবুকে প্রশংসা করলেন—হ্যাঁ চ হয়েছে। মনে হচ্ছে সিকোয়েন্সটা এবার জমে যাবে স্ক্রীনে। কী বল হে দিলীপ

দিলীপ আর কি বলবে—ক্যামেরাম দিকে তাকায় সে—কী রামদা (রা সেনগুপ্ত), আপনি কি বুঝেছেন? চল

রামানন্দ সেনগুপ্ত ইংরিজী ছবি ব্লাড রিভার-এর অপারেটিং ক্যা ম্যান ছিলেন। ওই ছবিতে কাজ ক জন্যে উনি সে সময় কিছুদিন লন্ডনে ট্রেনিং নিয়েও এসেছিলেন। খুব রসিক স্বভাবিক ভদ্রলোক। সহাস্যে জবাব দি চলবে মানে জাহাজটা চলবে কিনা ব চাইছেন?

—হ্যাঁ।

—না না—অসম্ভব ব্যাপার—এ ভ পারে না।

শুনে বিমলবাবু মুখ পাংশু গেলেন ভদ্রলোক এত পরিশ্রম, অর্থ ব্যয় ব্যাপারটা বাঁচ ছাড়লেন—তার

প্যাটরা। সবই অবশ্য ভাড়া করা মাল। সকলকে বলে দেওয়া হল—এটা ঝড়ের দৃশ্য। সুতরাং ডিরেকটর যখন 'অ্যাকশান' বলবেন—আপনারা ছুটোছুটি করতে থাকবেন। ভয় পেয়ে মানে প্রাণের ভয়ে মানুষ যা করে আর কি। আর মেয়েরা অসহায়ের মত কান্নাকাটি করতে থাকবেন। বুঝেছেন?

সবাই তো ঘাড় নাড়ল। হ্যাঁ বুঝেছি।

ইতিমধ্যে প্রপেলার দুটো সেটের দু প্রান্তে বসানো হয়ে গিয়েছিল। মোটা মোটা বাঁশের টানা দিয়ে বেশ মোটা দড়ির সঙ্গে ভাল করে বাঁধা হল। পাছে ছিটকে বেরিয়ে যায় এই ভয়ে।

বিমলবাবু প্রচুর পরিমাণে ফ্লেক্সচক এনেছিলেন। দু জায়গায় দু জনকে দাঁড় করিয়ে দেয়া হল ফ্লেক্সচকের থলে হাতে—প্রপেলার চললে ওরা ফ্লেক্সচক ছড়িয়ে দেবে। জলের ঝাপ্টার সঙ্গে মিশে গিয়ে সেটা অদ্ভুত একটা এফেক্ট দেবে ক্যামেরায়।

আর উপর থেকে জল ফেলবার জন্যে প্রচুর জলের ব্যবস্থা করা হল। সেই জল একগাদা ঝারিতে (ফুলবাগানে জল দেবার জন্যে যে ঝারি ব্যবহার করা হয়) করে পাঠিয়ে দেয়া হল স্টুডিওর গ্যাংওয়েতে। সেখান থেকে একদল সেটিং কুলী হাতে জাহাজের ডেকে হরদম জল ফেলে যায় তার ব্যবস্থাও করা হ'ল।

ক্যামেরা চড়ল ক্রেনে। একেবারে নায়িকার ক্লোজ-আপ থেকে ক্যামেরা সটান চোদ্দ পনের ফুট ওপরে উঠে লং শটে জাহাজের একটা বিশেষ অংশকে ফ্রেমে ধরবে। ক্রেনের ওপর বসবার জায়গা। ক্যামেরাম্যান এবং তার সহকারীর। রামানন্দবাবু কেন্টবাবুকে নিয়ে ক্রেনে চড়ে গেলেন। ক্রেন অপারেটার দুবার ক্রেন অপারেট করে হাত সড়গড় করে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াল।

ইতিমধ্যে মেক-আপ নিয়ে ফ্লোরে মঞ্জুলা দেবী পৌঁছে গেছেন। তাঁকে পরিচালক কি কি করতে হবে সব ভালভাবে বুঝিয়ে দিলেন। আশীষকুমারও হেঁটে চলে গেল ব্যাপারটা। এক ফাঁকে আমাকে বলল—হ্যারে, গণ্ডগোল হবে নাতো?

আমি অভয় দিলাম। —না, বেশ জাবদা সেট। চিন্তার কারণ নেই।

এইসব দৃশ্যের কখনও রিহার্সাল হয় না। একেবারে সোজাসুজি টেক করতে হয়। পরিচালক শেখরবাবুর মত সব মেকআপ করে নিয়ে বললেন—রেডি ফর টেক—

রামানন্দ সেন তৈরী হলেন। কেন্টবাবু ক্যামেরার ফোকাস দ্রুত পুল করবার জন্যে তৈরী হলেন।

—স্টার্ট ক্যামেরা—নো নো—প্রথমে প্রপেলার স্টার্ট—প্রপেলার—

হঠাৎ বিকট গর্জন করে প্রপেলার দুটি সশব্দে চালু হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ক্যামেরার সুইচ পড়ল। ওরেফ্ ফাদার—এ কি কাণ্ড!

ভীষণ ভিজে মঞ্জুলা দেবী ভয় চীৎকার করে পিছিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে ক্রেন আপ হতে থাকল—পেছনে ডেক প্যাসেঞ্জারদের ভীত সন্ত্রস্ত অ্যাকশান দেখা যাবে। একই সময়ে আশীষকুমার দৌড়ে এসে নায়িকাকে

হাবানো প্রান্ত নিরুদ্দেশ দীপঙ্কর দে / সন্ধ্যা রায়

দুহাতে জাপ্টে ধরে—কাট টু কাট—দুই চুম্বকের মিলন—বাঁচাবে। তারপর এই মাস্টার-শটের বিরতি ঘোষণা করবেন পরিচালক। কিন্তু তার কিছুই হলো না।

হলো যেটা সেটা বড় সাংঘাতিক কাণ্ড। একসঙ্গে প্রপেলার দুটি যেই চলতে আরম্ভ করেছে—জাহাজের সেট হঠাৎ কেমন যেন পেছনে হটতে শুরু করল। যেন ভূমিকম্প হচ্ছে সেটে মড় মড় করে আওয়াজ উঠল অচিরে। ওদিকে উপর থেকে জল ধারাবাহিক পড়তে শুরু করেছে। প্রবল বাতাসের মুখে পড়ে সেই জল ভয়ঙ্কর জোরে ছুটে সমস্ত স্টুডিও ফ্লোরে যেন বৃষ্টির সূচনা করল। ফ্লেক্সচক উড়ে সবার চোখ কানা হবার দাখিল। নায়িকার পায়ের তলার সেট হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল। মঞ্জুলা দেবী আর্তনাদ করে গর্তে আধেক ঢুকে গেলেন। আশীষকুমার ছুটে ওঁকে যথার্থ অ্যাক্সিডেন্ট থেকে বাঁচাল। আর একজনের অবস্থা শোচনীয়। প্রচণ্ড বাতাসের ঝাপটে জাহাজ তো ফ্লোরে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে—তাদের অনেকেই আটকে গেছে সেখানে। তাদের কান্নাকাটি এমনিতেই বেরিয়ে পড়ছে—আর অভিনয় করবার দরকার হচ্ছে না। জাহাজের তলার রোলিং দেওয়া হয়েছিল—রোলিং করাবার জন্যে। আরও দরকার হল না। এমনিতেই জাহাজ রোল করতে আরম্ভ করল। এমন বিপজ্জনকভাবে যে মনে হতে লাগল এই বুঝি ছুটে এসে ঘাড়ে পড়ে যায়।

ক্রেন অপারেটর বেগতিক দেখে ক্রেন ছেড়ে দিয়ে পে-হাওয়া। ফলে ক্রেন সোজা ফ্লোরের মাথায়। রামানন্দবাবু সেখানে আটকে গেছেন। যারা সুটিং দেখতে সেট করেছিল—এরা 'আপরে' বলে লাফিয়ে দে-দৌড়। পরিচালক দু হাত মাথার ওপর তুলে চেঁচাতে লাগলেন—কাট কাট কিন্তু প্রপেলারের গর্জনে তাঁর কথা কেউ শুনতে পাচ্ছে বলে মনে হল না। যারা প্রপেলার চালাচ্ছিল তারা ভাবল—এই বোধহয় শট্। ফলে তারা উৎসাহের সঙ্গে প্রপেলারের স্পীড আরও দু'স্টেপ বাড়িয়ে দিয়েছিল। রিয়েল কীর্তি বেধে গেল।

আমরা ভয়ের চোটে ফ্লোরের বাইরে তখন। একজন ছুটে গিয়ে প্রপেলার অপারেটরকে ধাক্কা মেরে বোঝাতে তখন তার যেন আক্কেল হল—বাঃ—সে তাড়াতাড়ি সুইচ অফ করল। তখন সব ঠাণ্ডা হল।

পরিচালক কিছুক্ষণ পরে ফ্লোরের বাইরে এলেন। রাগে তাঁর মুখ বিচ্ছিরি রকম লাল হয়ে উঠেছে। হিরোইন উধার পেয়ে রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে মেকআপ রুমে চলে গেলেন। একজন দৌড়ে একটা ট্যাকসি ডেকে নিয়ে এল। হিরোইন সটান বাড়ী চলে গেলেন ওই মেকআপ করা অবস্থাতেই। কোন কথা গ্রাহ্য করলেন না। একস্ট্রা আর্টিস্টরা আমার গলুইয়ের স্রেফ ঘাড়ধাক্কা করে ছেড়ে দিল গালাগাল দিয়ে। বেগতিক দেখে প্রযোজক মশাই হাওয়া। তিনি আবার কিছু বন্ধু সঙ্গে এনেছিলেন এই অভিনয় পটি দেখাবার জন্যে। তারাও ভ্যাবাচাকা খেয়ে কেটে পড়ল। আশীষের পায়ে চোট লেগেছিল। সে নেচে নেচে হেঁটে করুণ-কণ্ঠে বলল—এখন আমি প্র্যাক্টিস করব কিভাবে-এ্যাঁ? ও বিমলবাবু—

সবাই টাল্পাট তখন বিমলবাবু। অবশ্য তার মুখে কথাটি নেই। অনেকক্ষণ পর পরিচালক শুধু বললেন—আমার মাথায় আর একটা প্লান এসেছে। যদি ছবিটা বাঁচাতে চান তো—

শুনে সবার আগে চেঁচালেন পরিচালক—ওরে কে আছিস—আমার ট্যাকসি ডেকে দে—

রামানন্দ সেনগুপ্ত বললেন—বলুন বলুন, মনে হচ্ছে এবার চলবে.....

রঞ্জন মজুমদার

CENTRAL LIBRARY

যদি জানতেন-নগর দর্পণে) করেছে প্রত্যেকটিই হিট্। প্রথম ও শেষ দুটি তো সুপার হিট্।

উ'র ছবি করার একটা ফিচার লক্ষণীয়। বাহিরের ছবিতে উত্তমকুমার ইজ এ মাস্ট।

ঃ কেন? —একই ধরনের আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে বলেছিলাম উত্তমকুমারের পপুলারিটির কথা ভেবেই কি ও'কে নেন?

বেশ ফরে বোঝালেন উত্তমকুমারের সঙ্গে তাঁর অ্যাডজাস্টিং এর কথা...তাঁর অভিনয় ক্ষমতা...স্ক্রিপ্ট না শুনেই ডেট দেওয়া...ইত্যাদি অনেক কিছু।

এবং শেষ অব্দি বোঝা গেল উত্তমকুমারকে উ'নি নেন মূলত তিনটি কারণে। (ক) দিলীপবাবুর সঙ্গে উত্তমকুমারের দারুণ অ্যাডজাস্টিং (খ) দুজনেই দুজনার সঙ্গে কাজ করে আনন্দ পান. (গ) উত্তমকুমারের অ্যাকটিং পোটেনশিয়ালিটি তিনি কাজে লাগান। ও'র বক্স নয়।

তিন নম্বর কারণের সপক্ষে তিনি যুক্তি দিলেন—উত্তমকুমারের 'গরু' ইমেজকে কাজে লাগালো তো আমি ও'র মুখে একখানা মদের বোতল দিয়ে নাচাতাম। যা কোনো ছবিতেই আমি করিনি। প্রতিটি ছবিতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন চরিত্র দিয়েছি ওঁকে। ...এইতো 'চেনা ফকসে' সাতখানা গান রয়েছে উত্তমের গলায়। কিন্তু দেখবেন কিভাবে এনেছি সেগুলো! আমার ছবিতে উত্তমকুমার কখনও 'গরু' আওয়াজ পাবে না। ও'র ইমেজটা একবারে বদলে দিতে চেষ্টা করি।.....'

ঃ উত্তমকে নেওয়ার অর্থই আর্থিক নিশ্চয়তা নয় কি?

একথা তিনি অস্বীকার অবশ্য করলেন না। তবে আর্থিক নিশ্চয়তাই প্রথম বা শেষ কথা নয়—এটা তিনি জানিয়ে দিলেন।

ইতিমধ্যে কখন যেন প্রোডিউসার অমর নান এসে বসেছেন আমার পাশে। 'চেনা ফকসের' প্রযোজক ইনি। আমাদের আলোচনা নির্বিঘ্নে শুনে যাচ্ছিলেন।

উত্তম-প্রসঙ্গ ছেড়ে ছবির কথায় এলাম। ও'র প্রতিটি ছবিতেই নাটকের ঘনঘটা। চড়া সুরে বাঁধা থাকে ঘটনার বিস্তার। ইন রিয়্যালিটি—বাস্তব জীবনে এগুলো সত্য নয়—এই কথাটা পেড়েছিলাম।

স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন—'রিয়্যালিস্টিক ছবি মানে কিছুটা ম্যাজিক, কিছুটা সার্কাস, কিছুটা কাটিন তো নয়। 'আমার মতে রিয়্যালিস্টিক ছবি হচ্ছে সাধারণের জন্য সাধারণ গল্প নিয়ে সহজবোধ্য ছবি করা। এ ব্যাপারে আমার কাছে বড়য়া সাহেব হচ্ছেন দি গ্রেটেস্ট ডিরেক্টর। ভাবুন তো সাইত্রিশ বছর আগে যে সব ছবি করে গেছেন তিনি আজও তা আমরা বসে দেখি। আমার ছবি সাইত্রিশ মাস বাদে কেউ দেখবে না। তাছাড়া আমার ছবিগুলোর কোন 'সে' নেই যে তা নয়। প্রত্যেকটা ছবিতেই একটা না একটা সমস্যা নিয়ে ভিল

বাঁহাশিখা : বলাই মল্লিক/অলিন্দ্য

করি আমি। সাধারণের চেনা ছবি করতে গেলে নাটক তো সেখানে থাকবেই।'

সত্যি কথা। দর্শকের পালসকে তিনি বুঝতে পেরেছেন। না পারলে সবকটা ছবি হিট করলো কি করে।

বললাম—'পাবলিক ডিম্যান্ড তাহলে আপনি বুঝতে পারছেন?'

—'ঠিক বুঝেছি বলছি না। তবে পাবলিককে সহজে ফাঁকি দেওয়া যাবে না। একবার দুবার ফাঁকি দেওয়া যায়, বারবার নয়। আমার ছবিগুলো এ পর্যন্ত লেগেছে, তাই বলে পরের কোনো ছবি হুড়কাবে না এটা বলি কি করে?

সাফল্যের হাসিমুখ মুখে প্রত্যয়ের আভাস।

আর অভিনয়?

অভিনেতা দিলীপ মুখার্জি? তিনি এখন পরিচালক দিলীপ মুখার্জি ওরফে বাহ্নিকের আড়ালে চলে গেছেন। 'কাঁচের স্বর্গ' ছবির সঞ্জয় চৌধুরী দর্শক সমালোচকের কাছ থেকে যে প্রশংসা পেয়েছিল তারপর অভিনেতা হিসাবেই ছবি পরিচয় হয়েছিল কিছুদিন। পর পর কয়েকখানা ছবিও করেছিলেন।

'নগর দর্পণের' অভিজ্ঞতাকে এখনও বোধহয় ভোলেননি কেউ। এখন আর করছেন না।

ঃ কেন?

—ছবির ডাইরেকশন দিতে গেলে আর অভিনয় করা যায় না। অসুবিধে হয়। দুটো কাজই হ্যাম্পার করে।

ঃ 'নগর দর্পণে' তো করলেন?

—উত্তম খুব পীড়াপীড়ি করেছিল। না করে পারলাম না। চরিত্রটাও ভালো ছিল।

'আমরা'তেও ছোট্ট একটা রোল করছেন। আর করবেন না। নিজের ছবিতে অন্তত নয়। অন্যের ছবিতে ভালো চরিত্র পেলে তবেই অভিনেতা দিলীপ মুখার্জি পরিচালক দিলীপ মুখার্জির আড়াল থেকে বেরিয়ে আসবেন, নচেৎ নয়।

পরিচালনার কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকবেন ব্যস্ত মানুষ দিলীপ মুখার্জি। কাজ ছাড়া একমুহূর্ত অলস আড্ডায় তাঁকে দেখা যায় না কখনও। কখনও কখনও একই সময়ে তিনখানা ছবির কাজ করেন।

বললাম—'অসুবিধে হয় না?'

—হয় একটু আধটু। তবে দুটো ছবিতে অসুবিধে হয় না। চুপচাপ বসে থাকা আমার চরিত্র নয়।

এই ছবি করাই দিলীপ মুখার্জির আনন্দ—অবসরবিনোদনের একমাত্র উপায়। 'ফিল্মকে তিনি বেঁচে থাকার জন্যতম উপাদান হিসাবে নিয়েছেন। সেক্ষেত্রে বাহ্নিক বা দিলীপ মুখার্জি যে নামেই হোক না কেন, আসল পরিচয় রবে কাজে। নামে নয়।

নির্মল ধর

টেলিভিশন মানেই
"টেলিকিং"
অর্থাৎ
টি. ভির রাজা।
আজই আসুন, দেখুন, শুনুন ও
কিনে খুশী হোন।
এ-ছাড়া আমাদের এখানে রকমারি রেডিও, রেকর্ড প্লেয়ার, রেকর্ড, ট্রানজিস্টার রেডিও, টেপ রেকর্ডার, স্টিরিওগ্রাম ইত্যাদি ইত্যাদি।
মেরামতের সুবন্দোবস্ত তো আছেই।
রেডিও এণ্ড ফটো স্টোরস্
৬৫নং গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিঃ-১৩
ফোন : ২৯-৪৭১০

লাকেশন থেকে

ত বাইশে মার্চ হটিকালচার
ইটির বাগানে চুনুদার (অরবিন্দ
ী) ইউনিটের কেউই বোধহয় সূর্য-
প্রতি প্রসন্ন হতে পারেন নি; অবশ্য
রও সেদিন ওদের প্রতি প্রসন্ন ছিলেন
ক্যামেরাম্যান শক্তি বানার্জি থেকে শুরু
হর রায় রণজিৎ মল্লিক প্রযোজক
ী ইউনিটের প্রায় প্রতিটি লোক মহা-
র্কদেবের বিটলেমিতে বিরক্ত হয়েছেন
বিড়বিড় করেছেন অস্ফুটে।
ন্তু কোনো কাজ হয়নি। মিনিটে
মেঘের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে ব্যস্ত
ছিলেন তিনি। এই আলো আর
াঁধার। সাউন্ড—ক্যামেরা—মেক-আপ
ভি। হঠাৎ সাহেবের মুখে লুকোলেন
আড়ালে। শট নেওয়া গেল না।
গেল সব ব্যস্ততা।

ক্যামেরাম্যান শক্তি ব্যানার্জি রণজিৎ
র দিয়ে মাথার ওপরে মেঘের পাঞ্জাবি
ন। দূরে একখণ্ড মেঘ, আশেপাশে
কছু নেই। তাই দেখে তিনি বলছেন
ক্যামেরা ট্রলিটার কাজ করুন চুনুদা।'

স্টার্ট সাউন্ড—রানিং' ইত্যাদি
চুনুড়ে ক্যামেরাও চলছে ঠিক
জহর রায় রণজিৎ মল্লিক ডায়লগও ঠিক
বলে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ একখণ্ড ম
কোথেকে এক দঙ্গল মেঘ এসে মুখ
দিল সূর্যের।

'কাট্—কাট্—কাট্।'

ক্যামেরা বন্ধ। সাউন্ডের সুইচ অফ
রণজিৎ মল্লিক ব্যাপারটা বুঝতে
নি বোধ হয় প্রথমটায়। চুনুদার

কাজে নিমগ্ন হয়ে আছে সে

কবি ক
অমিতাভ বচ্চন / র

কবি কবি

প্রযোজনা—যশ চোপড়া

নিজ জীবনেই প্রথম দৃষ্টিতে অমিত
ও একে অপরকে ভালবেসে ফেলে।
এই ভালবাসার ফল একদিন বিজয়
উঠে। এবং এক তরুণ ইঞ্জিনিয়ারের
র সঙ্গে পূজার বিয়ে হয়ে যায়।
পূজার নামে অনেক কবিতা লিখে
সেই কবিতাগুচ্ছ নিয়ে কবি কবি
পুস্তকাকারে ছেপে পূজার নামে
। হিসাবে পাঠিয়ে দেয়। তারপর
স্মৃতি মুছে ফেলবার জন্যে নিজের
ন স্থান থেকে অনেক দূরে
ন নিয়ে এক ফ্যাকটরীর সর্বময় কর্তা
ঠে অমিত। এবং অঞ্জু নামের একটি
ঃখে করে। দীর্ঘদিন পরের কথা।
তার এক ষোড়শী কন্যা আছে।
বিজয়ও এক পুত্র সন্তানের জনক।
ব বিজয়ের ছেলে রাকে ভালবাসে
পিঙ্কি আসলে অঞ্জু ও বিজয়েরই
অন্য এক নিঃসন্তান পরিবার ওকে
নয়ে মানুষ করে তুলছে। এরপর
ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে বিজয়

পূজা ও অমিতের পূর্ব প্রণয়
জানতে পারে। এবং অমিতও বুঝতে
অঞ্জুর এক কন্যা সন্তান আছে ও
স্বামী, যিনি এক বিমান দুর্ঘটনায়
যান। অতঃপর ডাকির সঙ্গে অঞ্জুর পি
মিলন হয়।

অর্থাৎ মধুরেণ সমাপয়েৎ কবি
যশ চোপড়া যিনি একদা 'দুল কা
এর মতো বাস্তবধর্মিতাকে কাহিনী নিয়ে
পরিচালনা করেছেন, তাঁর কাছ থেকে এ
অবান্তর ও কাল্পনিক কাহিনী কেউই
কল্পনা করা যায় না।

অভিনয়—অমিত (অমিতাভ) বি
পূজা (রাখী) অঞ্জু (তনুজা)
হিন্দি (কাম) পন্ডী (নিরু) ও
গোবিন্দ সকলই সুন্দরভাবে চরিত্রগুলির
ফুটিয়েছেন। আলোকচিত্র সুন্দর কে
শিল্প নির্দেশনায় বেশ কিছু
বৈচিত্র্যের সঙ্গে সংযোজনা করেছেন।

মোটিফ ঘাত
কমল পালেকর/বিদ্যা সিনহা

ভারত-জার্মান সাংস্কৃতিক উৎসব

সম্প্রতি ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেশনস ও কলকাতার ম্যাকসমুলার ভবনের উদ্যোগে ভারত-জার্মান সাংস্কৃতিক উৎসব '৭৬ হয়ে গেল।

পনেরো দিনব্যাপী এই উৎসবের বিভিন্ন দিন পঃ জার্মানদের চলচ্চিত্র যন্ত্রসংগীতের আসর, বাংলা নাটক, ভারত-নট্যম নৃত্যানুষ্ঠান ইংরেজী নাটক ও রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে জার্মানীর সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবের উদ্বোধন করেন মন্ত্রী শ্রীসুব্রত মুখোপাধ্যায়। প্রথম দিন শুভোদ্বোধন বক্তৃতার অনুবাদ পরিবেশিত হয়।

মোট চারদিন জার্মান ছবি দেখানো হয়। যথাক্রমে 'টাটু' (পরিচালক জে সুচাক। সবচেয়ে জার্মান ছবি হিসেবে অবশ্যই সার্থক-নামা ছবি এটি। 'দি কাপটেন অব কোপে-নিক' (পরিচালক এইচ কেটনার) ছবির প্রকৃত ব্যাপ্ত ভাবটি লক্ষণীয়। 'চেটন' (পরি-চালক এইচ বহম), ছবিটি যুদ্ধোত্তর-কালের তরুণদের শ্রেষ্ঠ ছবি। 'দি একস-পার্টস' (পরিচালক এন কারোলমান), ছবিটি বিস্ময়বোধ ও আধুনিক সমাজের মানসিকতা নিয়ে ছবি। চারটি ছবির মধ্যে এই ছবিটি অন্তত মনকে বিশেষভাবে নাড়া দিয়েছে। এমন বিষয় বস্তুর ওপর ছবি করা এদেশে এখনও অবিশ্বাস্য।

ইংরেজী যে নাটকটি উৎসবে পরি-বেশিত হয়, তার নাম 'বার্লিন্ডেকী'। ম্যাকসমুলার ভবনের থেস থিয়েটার ইউনিট (থিয়েটার গ্রুপ অব দের গটেডেস্টেনহাইস) এর উদ্যোক্তা। পরিচালনা পি. কে. মিঃ।

ফ্রেডারিচ ডুরেনমাট-এর নাটক দি ভিজিট এর বাংলা রূপান্তর 'অতিথি' পরিবেশন করেন থিয়েটার ইউনিট। পরি-চালনা করেন শেখর চট্টোপাধ্যায়। এ নাটকটি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করার ইচ্ছা রইল।

উৎসবে একদিন চেম্বার কনসার্ট (পিয়ানো ও বেহালা) ও দুদিন পিয়ানো কনসার্ট ও শুধুমাত্র পিয়ানো বাদন অনুষ্ঠিত হয়।

এছাড়া যাদবপুর অধ্যাপক অমলেন্দু দেব পরি-চালনায় 'থাকসার আন্দোলন ও জার্মানী' দের স্টুডেন্টনহাইস ও বিশ্বভারতী শান্তিনিকেতন-এর জার্মান ভাষা শিক্ষণ-এর ছাত্রদের যৌথ উদ্যোগে জার্মানীতে রবীন্দ্রনাথ (১৯২৬)-৫০তম বার্ষিকী, নেতাজী রিসার্চ ব্যুরো ও ইন্দো-জার্মান এসোসিয়েশনের যৌথ উদ্যোগে দিল্লী ম্যাকসমুলার ভবনের ডঃ হেমো রাউ-এর তত্ত্বাবধানে টেগোর ও জার্মানী এবং নেতাজী রিসার্চ ব্যুরো ও ইন্দো-জার্মান এসোসিয়েশনের যৌথ উদ্যোগে ডাঃ এম আর ব্যাস, এম পি, ডাঃ কে কে বসু, মিঃ এ এইচ জাকরানী ও নেতাজীর সঙ্গে বার্লিনে ছিলেন এমন কয়েকজন প্রখ্যাতনামা ব্যক্তির আলোচনা সভা বসে বিভিন্ন দিন। এই আলোচনা যেমন মূল্যবান তেমনি মনোজ্ঞ হয়ে উঠেছিল।

এই সঙ্গে রবেন্দ্র দত্তর এক শিল্প প্রদর্শনীও অনুষ্ঠানের সৌষ্ঠব বাড়ায়। এটি উদ্বোধন করেন ফেডারেল রিপাবলিক অব জার্মানীর কনসাল মিঃ ওয়ারো এ্যান্ডট।

এমন একটি উৎসব উপহার দেবার জন্য উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ।

অ. র. ভ

নাটমঞ্চ

রবীন্দ্রসদনের নাট্যোৎসব

গত ৬ থেকে ১২ মার্চ পর্যন্ত রবীন্দ্র সদন কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে সদন মঞ্চে সাত দিন ব্যাপী এক মনোজ্ঞ নাট্যোৎসব হয়ে গেল।

বিভিন্ন দিন কোমল গান্ধারের ঘোড়া (পরিচালনা অমিত মুখোপাধ্যায়), ইন্দ্র-সভার দর্শামিক (পরিচালনা বরুণ রায়-গুপ্ত), সুন্দরমের পরবাস (পরিচালনা : মনোজ মিত্র), শৌভনিকের মহাটের রক্ত মুহূর্ত (নাট্য নির্দেশনা : কৃষ্ণ কুন্ডু), মাস থিয়েটার্সের কালবৈশাখী (পরিচালনা জ্ঞানেশ মুখার্জি) ইংগতের পঞ্চপাল (পরিচালনা সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়), থিয়েটার সেন্টারের ত্রিশূল (পরিচালনা তরুণ রায় ও অভিনেতৃ সংঘের বিশে জুন (নাট্য নির্দেশনা জ্ঞানেশ মুখার্জি) পরিবেশিত হয়।

মোটামুটি অংশ গ্রহণকারী সমস্ত দলই গ্রুপ থিয়েটার এবং নব নাট্য আন্দোলনের ক্ষেত্রে সুখ্যাত। কয়েকটি নাটক ইতিপূর্বে বহুবার অভিনীতও হয়ে গেছে। তাই তাদের নাটক, তার পরিবেশন রীতি ও অভিনয়দক্ষতা সম্পর্কে কিছু বলার নেই। এই নাটকগুলির দু-একটি সম্পর্কে ইতিপূর্বে অমৃতের পৃষ্ঠায় সমালোচনাও হয়ে গেছে (সুযোগ মত অন্য নাটকগুলির সমালোচনাও প্রকাশ করার ইচ্ছে আছে)।

এই নাট্যোৎসব উপলক্ষ্যে রবীন্দ্র সদন কর্তৃপক্ষ যে সুভেনিয়রটি বের করেছেন, নানা কারণে সেটিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এতে প্রহসন সম্পর্কে একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখেছেন ডক্টর শান্তি লিপিটী এবং নাট্যপ্রসারে রবীন্দ্র সদনের ভূমিকা সম্পর্কে একটি বিশেষ নিবন্ধ লিখেছেন সদনের বর্তমান প্রশাসন অধিকর্তা শ্রীশংকর কন্দ্যোপাধ্যায়। এই রচনাটিতে রবীন্দ্র সদনের ভূমিকা, পরিকল্পনা এবং উদ্যম সম্পর্কে এমন অনেক বিষয়, যেই সঙ্গে রবীন্দ্র সদনের গৃহীত প্রস্তাবগুলি থেকে তুলে ধরেছেন, যেগুলিকে বাস্তবে রূপায়িত করতে পারলে রবীন্দ্র সদনের ভূমিকা এবং গুরুত্ব আরও বেড়ে যাবে। এই উদ্যমের সঙ্গে আরও একটি প্রশংসনীয় প্রচেষ্টার কথা তিনি উল্লেখ নিজস্ব নাট্য প্রযোজনা। সেই সঙ্গে সদনের করেছেন। সেটা হোলো রবীন্দ্র সদনের উত্তরাংশের প্রাঙ্গণে ক্ষুদ্রায়তন প্রেক্ষা-গৃহ ও গবেষণা কেন্দ্র স্থাপনের পরি-কল্পনা এবং আগামীতে নাট্যাভিনয়ের

ব্যাপারে রবীন্দ্র সদন আগামী দিনে যে ভূমিকা গ্রহণের কথা উল্লেখ করেছেন তা নাট্য আন্দোলনকে জোরদার করার ক্ষেত্রে যে বটেই রবীন্দ্র সদনের ক্ষেত্রেও একটি ঐতিহাসিক নজীর হয়ে থাকবে বলেই বিশ্বাস।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্র সদন গ্রন্থাগারের কথা স্মরণ করা যায়। এই পাঠাগারটি রবীন্দ্র অনুরাগী পাঠকের কাছে সত্যই মূল্যবান।

রঙ্গসভার চন্দ্রনাথ

শরৎ জন্ম-শতবার্ষিকীতে রঙ্গসভা নাট্য-সংস্থা পরিবেশন করলেন চন্দ্রনাথ এর নাট্যরূপ (নাটক : বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র)। শরৎ-চন্দ্রের এই কাহিনীটি 'খাঁটি' আবেগধর্মী। এবং বলাই বাহুল্য আবেগধর্মী কাহিনী পাঠককে যতখানি আকর্ষণ করে সহজেই তার মঞ্চায়নও ঠিক ততখানিই দুরূহ। কিন্তু রঙ্গসভা সে দিক থেকে অনবদ্যই সার্থক। বিশেষ করে শিল্পীদের আন্তরিক অভিনয় নাটকটিকে সপ্রাণ করে তুলেছে।

অভিনয়ে মোটামুটি সকলেই দর্শকদের মনে ছাপ রাখতে পেরেছেন। বিশেষ করে তুষার ভৌমিকের চন্দ্রনাথ অনেকদিন মনে থাকবে। সেই সঙ্গে নারী চরিত্রের চারজন অভিনেত্রী যথা সঙ্গীতা মুখোপাধ্যায়, দিপালী ঘোষ, কল্যাণী রায় ও শ্রীমতী পাইনের অভিনয়।

অন্যান্য ভূমিকায় অভিনয় করেছেন কমল মুখার্জী, অচিন্ত্য মজুমদার, শ্যামানন্দ দাসগুপ্ত, কৃষ্ণলাল রায়চৌধুরী, রমাপ্রসাদ চ্যাটার্জি, নির্মলেন্দু, অতীন রায়চৌধুরী, সুকোমল দাস, ডি সি দাস প্রভৃতি দত্ত, অমল দত্ত ও মানিক বিশ্বাস।

নাটকটির নির্দেশনায় ছিলেন তুষার ভৌমিক। নাট্যানুষ্ঠানের পূর্বে রঙ্গসভা কর্তৃক প্রদত্ত এবারের ছবি বিশ্বাস স্মৃতি পুরস্কার দেওয়া হয় 'দেবদাস' নাটক অভিনয়ের জন্য 'নবরঙ্গ' নাট্যসংস্থাকে। শরৎ জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে এবার শরৎ-চন্দ্রের নাটকের ওপর এই পুরস্কার দেওয়া হয়।

অনবদ্য নাট্যাভিনয়

স্কেয়ারল পি ডব্লিউ ডি এমপ্লাইজ ইন্সটিটিউট, কলকাতা তাঁদের রজত জয়ন্তী বর্ষে মঞ্চস্থ করলেন সুশীল মুখার্জির অনবদ্য নাটকটি। বলতে বাধা নেই, অফিস ক্লাবের কাছ থেকে এমন নাটক দেখতে পাওয়া সত্যই দুর্লভ।

অভিনয়ে প্রথমেই নাম করা যায় শ্রীসন্তোষ ঘোষাল (পরিচালক), তুষার বসু, সুবল দত্ত, তপন বাবুর কথা। অন্যান্য ভূমিকায় চরিত্রোচিত অভিনয় করেছেন সুব্রত চক্রবর্তী সুপ্রিয় চ্যাটার্জি সুন্দর ঘোষ, কালীপদ দাস, রবি তারা-শঙ্কর ব্রহ্মচারী, মনোজ আচার্য, সুনীতি চ্যাটার্জি, রঞ্জন ভদ্র, জীতেন রায়চৌধুরী প্রশান্ত মিত্র, পুলিন রায়চৌধুরী, সুধাময় মুখার্জি, সুধীর আইচ রতনকান্তি সোম, কল্যাণ দাস, তপন রায়, স্বরূপানন্দ দাস ও সুভাষ চক্রবর্তী। নারী চরিত্র মমতা চক্রবর্তী সুন্দর। শর্মিষ্ঠা চ্যাটার্জি, মীরা বোস ও মঞ্জু দেবী, চরিত্র অনুযায়ী।

অসাধারণ

চিত্রকুমার। পরিচালনা : সলিল সেন। অমৃত ফটো

বঙ্গশ্রীর দুটি নাটক

বঙ্গশ্রী নাট্যদল সম্প্রতি দর্শকদের উপহার দিলেন দুটি স্বল্পপরিসরের নাটক অমর গাঙ্গুলীর জীবন যৌবন ও তাঁর সাহা রচিত (উভয় নাটকেরই পরিচালকও বটে) মর্তে সংবাদ।

বঙ্গশ্রী ছোট্ট দল হলেও এঁরা ইতি-পূর্বে তাঁদের নিষ্ঠার স্বাক্ষর রেখেছেন একাধিক নাটকে।

জীবন যৌবন নাটক অবক্ষয়ী মধ্য-বিত্ত সমাজের কঠোর বাস্তবতার একটা প্রতিফলন দেখা গেছে। অভিনয়ে ছিলেন শেখর দাস, অলক সাহা, রবীন দাস, অলোক সামন্ত রাধানাথ দাস ও করুণ পাইন।

মর্তে সংবাদ খানিকটা ফ্যান্টাসীর আঙ্গিকে পরিবেশন করা হয়েছে কাহিনী একালের হলেও রূপকের মোড়কে মোড়া। এ নাটকের মূল চরিত্র রাজার ভূমিকায় তাঁর সাহার অভিনয় দর্শকেরা বহুদিন মনে রাখবেন।

এছাড়া ভাল অভিনয় করেছেন অলক-জ্যোতি পণ্ডিত, বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য, স্বপনা ব্যানার্জি, তপন দে, বরুণ পাইন, করুণ লাহা, অলোক সামন্ত, নারায়ণ দে, হিমের ঘোষাল, রূপা ঘোষাল, দীপা দাস, শেখর দাস, রাধানাথ দাস, গৌর সিনহা ও রবীন দাস।

শ্রীমতী কৃষ্ণা ঘোষালের আবহ সঙ্গীত পরিচালনায় নিষ্ঠার ছাপ আছে, স্বপন

অদ্বিতীয় ফরমুলা...অপারেশন ছাড়াই অর্শের সঙ্কোচন করে

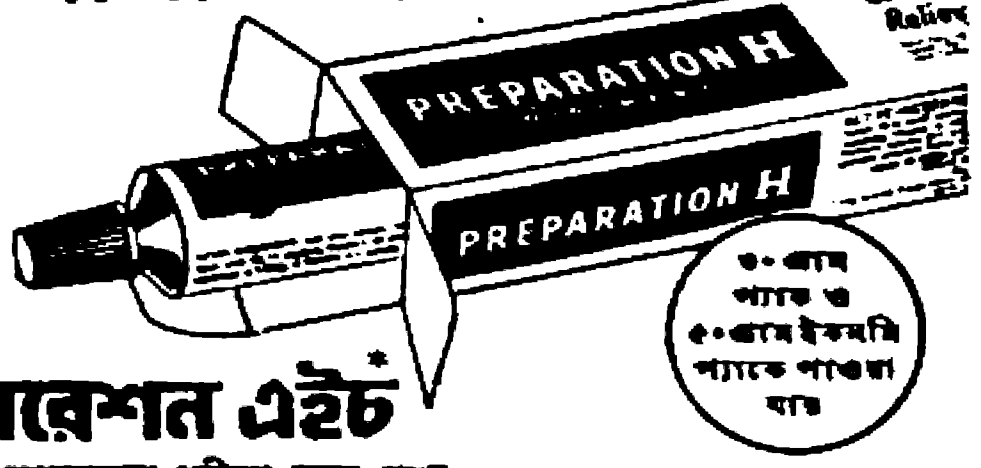

প্রেপারেশন এইচ*

আমেরিকার ডাক্তারদের পরীক্ষা করে দেখা

- কয়েক মিনিটেই চুলকানি বন্ধ করে
- সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণার উপশম হয়
- খুব বাড়াবাড়ি না হলে, অপারেশন ছাড়াই অর্শের সঙ্কোচন করে
- পিচ্ছিল ক'রে মলত্যাগের কষ্ট কমিয়ে দেয়

বিনামূল্যে ! অর্শ সম্বন্ধে তথ্যপূর্ণ পুস্তিকার জন্যে আজই এই ঠিকানায় লিখুন (সঙ্গে ২৫ পয়সার ডাকটিকিট পাঠাবেন) : ডিপার্টমেন্ট PH-88 পোঃ বঃ নং ১০১৩৩, বম্বে ৪০০ ০০১

*Regd. User of TM : Geoffrey Manners & Co. Ltd.
743-PH-92 BEN

সাজসজ্জা ও আলো বিশ্বাসের। কাজ সুন্দর।

কাঁথতে কাস নাট্যাভিনয়

স্থ মহকুমা হাসপাতাল রিক্রিয়েশন ক্লাবের সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়ে গেল সামাজিক নাটক কাঁচ।

ছন্দের সৃষ্টিকর্তা দাস (নাটক), নিত্যরঞ্জন সাউ, নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, মিহির অমলেন্দু জানা এবং নাট্য চরিত্র রূপায়ণে মাইতি ও অন্যান্য বিশিষ্ট শিল্পীদের প্রশংসা কুড়িয়েছিল।

এছাড়া মনোরঞ্জন ধাবক, শঙ্কর মণ্ডল, ডঃ কে এন ত্রিপাঠি, নারায়ণচন্দ্র ঘোড়ই, কানাইলাল বেরা, কানাই ঘোষ ও অরুণ মাইতি সু-অভিনয় করেন।

কেদার রায় অভিনয় : ২ মার্চ ১৯৭৬ রামকৃষ্ণ মঠে রমেশ গোস্বামী রচিত কেদার রায় নাটকটি অভিনীত হয়। এই নাটকটি সাধারণত সৌখীন নাট্য সংস্থা

পুলিস প্রযোজনা অত্যন্ত ফলে সেটা ফোটানো সহজ হয় না। বি বিষয় এখা সোনিক থেকে বাঁচ নাটকটি প্রথম থেকে শেষ পর্য হৃত গতিতে অগ্রসর হয়। প্রেস ক্লাবের সভ্যরা বহিরাগত নিখু নাটকটি পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহের দর্শ হার নিয়েছেন এবং আনন্দও দিয়ে

অভিনয়ে সর্বাধিক সর্বাধিক কুড়িয়েছেন যথাক্রম : হারাধন

U-PP-4 BEN

আপনার শিশুসন্তানের ফীডার দিয়ে খাওয়াবার বয়স হলেই আপনি অবশ্য ব্যবহার করবেন —

পপপু

—অতি সাবধানে বানানো ফীডার

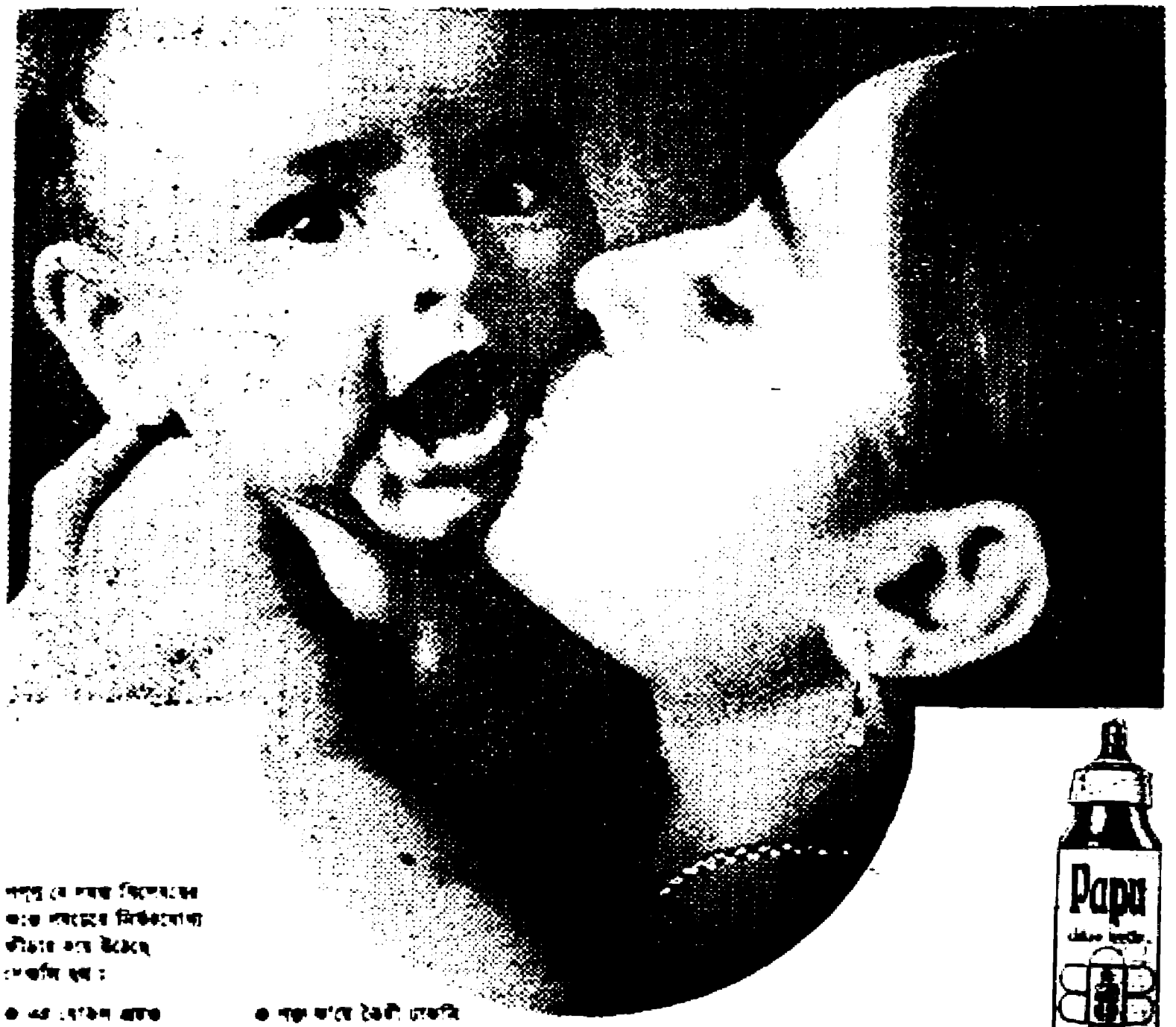

পপপু যে সব দিকে শিশুদের আরো সুস্থতার নিশ্চয়তাযুক্ত ফীডার তার উদাহরণ দেওয়া হল :

● এর বোতল প্রান্ত উঁচু হাতে নরম রবার তৈরী কাপ দিয়ে বানানো। সেই জন্যে নিরাপদ।

● নিপলটি নিপেল ধরনের। তাই শিশু সহজেই দুধ খেতে পারে আর তার পেটে কম হাওয়া ঢুকতে পারে। খুব সহজ দিয়ে ধোয়া যায়। তাই জীবাণুর হাত থেকে রক্ষা।

● শক্ত কাঁচে তৈরী ঢাকনাটি ফিক্সড আর তাতে আছে ছোটদের ছেঁড়া যায় না। সেই জন্যে খুব ভরসার।

● অতিরিক্ত নিপলের ওপর (প্রতিটি বোতলের সঙ্গে আছে) নিপলকে ঢেকে রেখে দুধোধানি আর রোগের জীবাণু থেকে রক্ষা করে। সেই জন্যে পরিচ্ছন্নতা ও সুরক্ষার দিক থেকে অনুপমীয়।

পপপু

ফীডার ও টিপ্পল

পপপু দুটি মাপের পাওয়া যায় : স্ট্যান্ডার্ড ও মিনি। বোতল ও নিপলের ওপর গ্রাম মেপে মেপে।

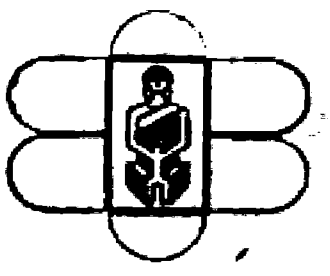

ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া কোনো ওষুধ খাবেন না

CENTRAL LIBRARY

উপলক্ষে শ্রীশ্রীগোপাল জিউ ও রাধা
জীউয়ের কীর্তন এবং বর্ণাঢ্য
লোকমঙ্গায় সুসজ্জিত মন্দিরে পূজা
ষ্ঠিত হয়। ঐ দিন বহু মানুষেরা
গ্রাম দত্তবাটী মুখরিত হয়ে ওঠে এবং
সাদৃশ্য আতসবাজি পোড়ানোর
গ্রামে সন্ধ্যাটি মনোরম হয়ে ওঠে।

বার্ষিক উৎসব

সম্প্রতি টালিগঞ্জ বৈশাখী সংঘের
র্ষিক উৎসব বৈশাখী পল্লী অঞ্চলে
ষ্ঠিত হোলো। প্রথম দিন সংঘের সভা-
কর্তৃক অভিনীত হোলো অসিত
ক্তি রচিত অর্থকিম্ব ও রতন ঘোষের
গ্রামবাসীদের উদ্দেশ্যে। নাটক দুটির পরি-
নায় ছিলেন যথাক্রমে সনৎ মিত্র ও
গাথ ভট্টাচার্য। প্রথম নাটকটির রচনায়
নত সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অভি-
সনৎ মিত্র অসিত বানার্জী • বিকা
ঘোষ ও বিশ্বজিৎ সেনগুপ্তের নাম
রণযোগ্য। দ্বিতীয় দিন বহুরূপী কর্তৃক
ক বামাক্ষ্যাপা ও তৃতীয় দিন সত্যম্বর
পরার যাত্রাভিনয় একদিন রাত্রে প্রচুর
ক উপভোগ করল।

আনন্দিন এ
আপ
আ
সব
যে ছবির প্রতীক্ষ
চাঞ্চল্যকর ছবি

শুভারম্ভ
৯লা বৈশা
(ইং ১৬ই এপ্রিল
রূপবা
ভারতী-তরু
এবং শহরতলীর অন্যান্য

জলসা

যুগ্মযাত্রীর-র রজতজয়ন্তী উৎসব

বি. এল. নাহা রোডে মুক্ত আকাশের মঞ্চে যুগ্মযাত্রী সংস্থার সভ্যরা রজত-জয়ন্তী বর্ষ উদ্‌যাপন করে সাধারাত-ব্যাপী এক উচ্চাংগ সংগীতের আসর দিয়ে।

গত পঁচিশ বছর ধরে তারা এই সংগীতাসর উপহার নিয়ে আসছেন সম্পূর্ণ সাংস্কৃতিক ভিত্তিতে। দর্শকদের গান শোনবার জন্য কোনো দক্ষিণা দিতে হয় না এবং শিল্পীরাও বিনা দক্ষিণায় সহযোগিতা করে এঁদের উদ্দেশ্যের সহায়ক হন। সাধারণ মানুষের মনে ভারতীয় রাগ-সংগীতের গানধারণা গড়ে তোলা এবং উচ্চাংগ সংগীতের শ্রোতা তৈরী করাই এঁদের লক্ষ্য। এই মহৎ উদ্যমের সার্থকতা ঘোষিত হয়েছিলো সন্ধ্যা থেকে সকাল সাড়ে সাতটা অবধি বিপুল জন-সমাগমে।

অম্বর দেব তবলা সংগতে কুমকুম ভট্টাচার্যের কণ্ঠসংগীত দিয়ে অনুষ্ঠান সুরু হয়। রাগ শংকরাভরণ।

স্বীকারোক্তি

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা :
জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়

চলন্ত অবস্থায় হঠাৎ প্লেনটা প্রচণ্ড-ভাবে কেঁপে উঠল যাত্রীরা আর্তনাদ করে ওঠে। মৃত্যু আসন্ন। জনৈক পাদ্রী সকলকে কৃত পাপ স্বীকারের আহ্বান জানাল। সুরু হয় স্বীকারোক্তি। প্রথমে পাদ্রী (শেখর) ও পরে ব্যবসায়ী মুখার্জী। তারপর ডাঃ মুখার্জী (জ্ঞানেশ) অনিন্দিতা (নন্দিতা) রেবেকা (পূরবী) জন সমুদ্দর) মন্ত্রী (সাবিত্রী) ইত্যাদি সকলেই একে একে স্বীকারোক্তি করার পর প্লেন কোলোরকমে সমুদ্রতীরে ক্রাস-ল্যাণ্ড করে। সবাই বক্ষা পায় বটে কিন্তু মুখোসিয়া হার্টফেল করে। আর মাদ্রা একটি সন্তান প্রসব করে। জন্ম ও মৃত্যু দেখিয়ে পরিচালকও ছবি শেষ করেন।

বৈচিত্র্যবস্তু অভিনব এবং তুলনামূলক-ভাবে কিছু কলাকৌশলগত কাজ ভালহওয়া সত্ত্বেও ছবিটি প্রেমন জমে ওঠে নি। যে গতিতে ছবি সুরু হয় পরে ক্রমশঃ তা হারাতে থাকে। মূল ঘটনার থেকে ফ্লাশ-ব্যাক আরও বেশী এইখানেই ছবির আসল ছন্দপতন। শান্তার ঘটনা আরও গোলমেলে করে এবং অপ্রাসংগিক চরিত্রগুলোকে টেনে আনা হয়। পাদ্রী এবং জনিন্দিতার ক্ষেত্রেও তাই। ওদের মধ্যে দু'জনের স্বীকারোক্তিতে (জন ও মুখার্জীর) ফ্লাশ-ব্যাক না থাকায় মূল ঘটনার সংগে যোগসূত্র অব্যাহত থাকে। অবশ্য স্বীকারোক্তি মানেই ফ্লাশ-ব্যাক। যাই হোক পরিচালক কিন্তু যাটাকে ধ্রুপদী স্বীকারোক্তির হাত থেকে বেহাই দিয়েছেন। কলাকৌশলগত কাজ এই ধরনের ছবিতে আরও উন্নত মানের হওয়া উচিত ছিল এবং ফ্লাশ-ব্যাকের সময় অন্তত একবার প্লেনটাকে দেখা যাবে এই আশা করা গিয়েছিল। যাই হোক সুমিত্রা মুখোপাধ্যায় সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, উৎপল দত্ত রবিন মজুমদার অনুপকুমার শেখর চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি শিল্পীরা সকলেই মোটামুটি ভাল অভিনয় করেন। তবে সবচেয়ে ভাল লাগে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়কে। অতিনবেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের সংগীত পরিচালনা গতানুগতিক।

চিত্র.

অফিস এবং ইনজিনীয়ারিং-এর নিখুঁত সরঞ্জাম
এখানে এসে কিনে নিয়ে যান

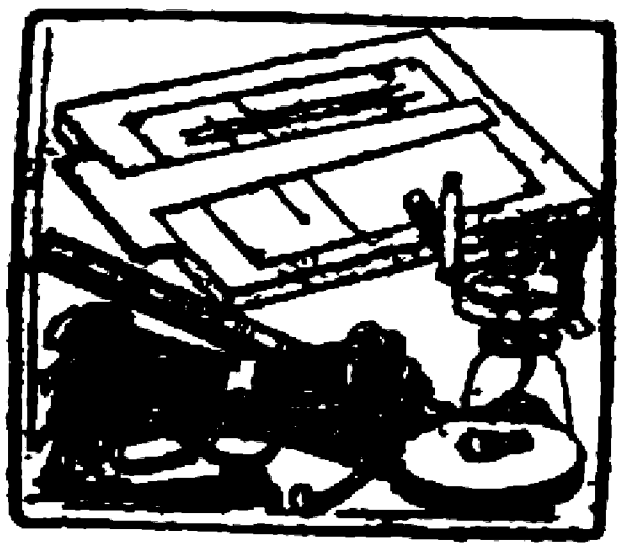

সার্ভে, ড্রইং, নানা রকম কাগজ
খাতা, লেজার, ক্যাশবই, কালি ও
উৎকৃষ্ট ছাপার জন্য
অন্যতম প্রতিষ্ঠান

কুইক ষ্টেশনারী ষ্টোর্স
৬৩ই, রাধাবাজার ষ্ট্রীট কলিঃ-১
ফোন : ৩২-৮৫৮৮ ৬৭-৪৬৬৯
গ্রাম: স্বাবলম্বিন, পোষ্ট বক্স—০৮ যুগল্লা
পরিবেশক : কার্বালন প্রডাক্টস
(ষ্টেশনারী বিভাগ)

মধ্যবাত্রির মেজাজের সুন্দর সমন্বয় রেখে ক লিঙ্গ সানাল ধরলেন দরবারী কানাড়া। তাঁর সুবেলা সুগম্ভীর কণ্ঠের জোয়ারী এবং ধীর বিস্তার সংযত-আবেগের এই রাগের ধীরোদাত্ত ভাবকে আপন স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করে। দরবারী কানাড়ার মত ভারী রাগের পর ঠুংরী-তে এক আনন্দময় পরিবেশ সৃষ্টি করে শ্রী সানাল সবরকম অংগের শাস্ত্রীয় সংগীতে তাঁর অধিকার ও অনুশীলনের স্বাক্ষর রাখেন।

এলাহাবাদ থেকে খাঁ ঘরাণার স্বনামধন্যা শিল্পী কল্যাণী রায় নটভৈরব রাগের এক মুখবন্ধী রূপ মেলে ধরলেন তাঁর দক্ষ

মুর বেহাগ ও খাম্বাজ রাগে মঞ্জুলাল নাগের সেতারবাদন এ আসরের অন্যতম আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান। যন্ত্রানুগ অলংকরণে রাগরূপকে সাজানো এবং পরিবেশনায় শিল্পীর প্রদক্ষ ভাব প্রসাদে তাঁর উপস্থাপন শ্রোতাদের কাছে এক মনোরম অভিজ্ঞতা হয়ে ওঠে। সকলের তারিফে তিনি পাহাড়ী ধুন দিয়ে অনুষ্ঠান সমাপ্ত করেন। তাঁর সংগে সুযোগ্য তবলাসংগত করেছিলেন শামল বসু।

সুমিত্রা ঘোষের কথক নৃত্য সকলের করতালি পেয়েছে টুকরো পায়ের কাজ ও অভিনয়-কুশলতার জন্য। এঁর সংগে তবলা সংগত করেন রবিলাল শর্মা।

মধ্যরাত্রির মেজাজের সুন্দর সমন্বয় রেখে ক লিঙ্গ সানাল ধরলেন দরবারী কানাড়া। তাঁর সুবেলা সুগম্ভীর কণ্ঠের জোয়ারী এবং ধীর বিস্তার সংযত-আবেগের এই রাগের ধীরোদাত্ত ভাবকে আপন স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করে। দরবারী কানাড়ার মত ভারী রাগের পর ঠুংরী-তে এক আনন্দময় পরিবেশ সৃষ্টি করে শ্রী সানাল সবরকম অংগের শাস্ত্রীয় সংগীতে তাঁর অধিকার ও অনুশীলনের স্বাক্ষর রাখেন।

এলাহাবাদ থেকে খাঁ ঘরাণার স্বনামধন্যা শিল্পী কল্যাণী রায় নটভৈরব রাগের এক মুখবন্ধী রূপ মেলে ধরলেন তাঁর দক্ষ

রোলো এবং ছুট্ ও সাপাট [illegible] মুখী গতিবৈচিত্র্যে। এখন [illegible] পণ্ডিত বরসের শিল্পীবা[illegible] লেগেছে ধ্রুপদী রোলের [illegible]। এলাহাবাদী ঘরাণাকে [illegible] কাঠামো ছাপিয়ে তা [illegible] যেন বিকশিত [illegible] গোলের মতই অনুভব করা যা[illegible] সংগে সংগত করেন তরুণ তবলিয়া গোবিন্দ বসু, সর্বশেষ শিল্পী সংগীতালংকার সুনন্দা পট্টনায়ক। রাত্রির বিদায়ী অলকাবে ছোরের আলো এসে ছুঁয়েছে ঠিক এই রকম এক কারুময় ক্ষণে শিল্পী ধরলেন বৈরাগী। শান্তি ও পরিপূর্ণ রঞ্জনায় এক নিঃসঙ্গ নিবন্ধতা যেন রাগবিস্তারের সংগে সংগে পরিবেশকে ধীরলয়ে করে তোলে। ষড়জ পঞ্চমের পরিবর্তে তিনি ষড়জ মধ্যম সমন্বয় ভিত্তিতেই রাগবিস্তার করেছেন। হয়ত বা রাগের গাম্ভীর্যকে মূর্ত করে তোলবার জন্যই। অসাধারণ কণ্ঠের পরিধি তারসপ্তকের, সব কটি পর্দাকে অতিক্রম করে অনায়াসদক্ষতায় যখন অতি-তারাকে বারবার স্পর্শ করছিলেন শ্রোতাদের মনও শিল্পীর সংগে সংগে যেন আকাঙ্ক্ষাবী হয়ে উঠেছিলো। সুনন্দার তবলা সংগতের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কারণ এ বিষয়ে তিনি অবিসংবাদিতভাবেই অদ্বিতীয়া।

চিত্রাংগদা

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুধীর সরকার কর্তৃক পটকা প্রেস ১২, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।

15 APR 1976

১৩৮১ সালের মৌচাক পত্রিকা কর্তৃক
সুধীরচন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত
শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ রচিত
ছোট বড় সকলের **মনের মত**
বাংলা সাহিত্যের দু'খানি আশ্চর্য বই

বিচিত্র কাহিনী

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

মূল্যঃ—চার টাকা

(সপ্তম সংস্করণ চলছে)

ছোটদের উপযোগী সরস রচনা বাংলা সাহিত্যে খুব বেশী লেখা হয় নি। বিশেষ করে নানাবিষয়ে সত্য ঘটনা অবলম্বন করে ছোটদের মনের মত বিচিত্র রোমাঞ্চকর লেখা খুব সহজ নয়। 'বিচিত্র কাহিনী'তে লেখক সত্য ঘটনাগুলিকে নিজের সরস মুন্সিয়ানা দিয়ে এমন জীবন্ত আর আকর্ষণ করে তুলেছেন যে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি রচনাই অনবদ্য রস ও রোমাঞ্চে টইটম্বুর। মোট পনেরোটি কাহিনী ভিন্ন ভিন্ন রসের ফল্গুধারায় সিক্ত, বর্ণনায় মনোমুগ্ধকর।

'আরও বিচিত্র কাহিনী' বইটি কিশোর ও বয়স্কদের জন্য সমভাবে রচিত। লেখক শুধু ছোটদের জন্যই রস পরিবেশন করেননি, বড়রাও এই অমৃত আস্বাদন করে পুলকিত হবেন। অনবদ্য রস রচনাশৈলী এবং প্রতিটি কাহিনীর ভিন্ন ভিন্ন আকর্ষণ চুম্বকের মত পাঠককে টেনে নিয়ে যাবে। এই বইটিতে দশটি বিভিন্ন রসের কাহিনী রয়েছে এবং লেখক তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কাহিনীগুলি এমন সুন্দরভাবে রসযুক্ত করে উপস্থিত করেছেন যে পাঠককে বিমুগ্ধ করবে।

আরও বিচিত্র কাহিনী

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

মূল্যঃ—চার টাকা

(চতুর্থ সংস্করণ চলছে)

এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ : ফোন ৩৪-১৭৪২

Regd. No. WB NC-13
Gram AMRITA Calcutta-70000
AMRITA

Friday 30
Phone
'F 6 AP 19

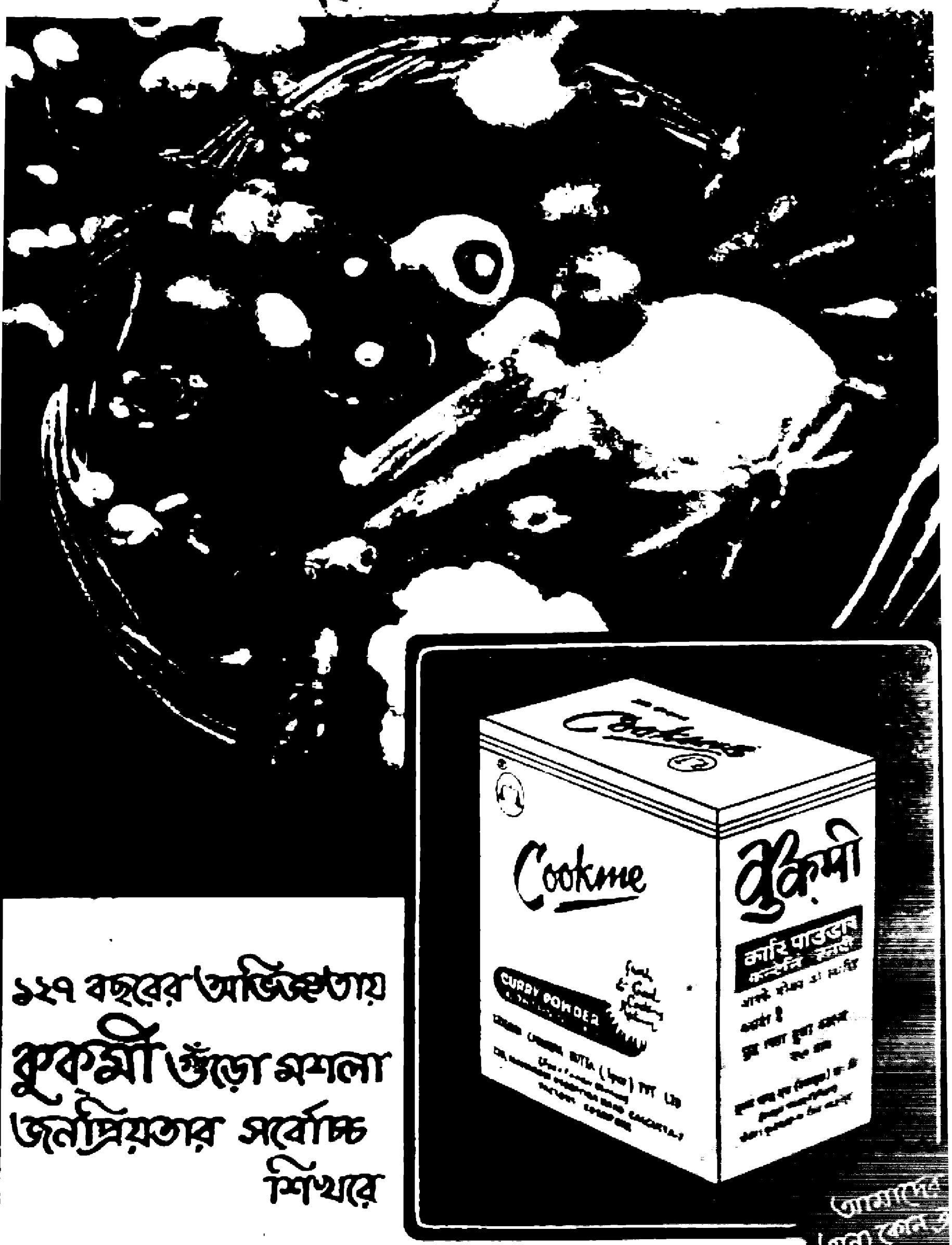

১২৭ বছরের অভিজ্ঞতায়
কুকমী গুঁড়ো মশলা
জনপ্রিয়তার সর্বোচ্চ
শিখরে

কুকমী
গুঁড়ো মশলা

প্রস্তুতকারক :
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাঃ লিঃ
(স্পাইস পাউডার ডিভিশন)
২৩৫, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা- ৭০০০৭৩
পোষ্ট বক্স নং :— বড়বাজার ৬৮৮৫